ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৩—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

পৌষ—১৩৬৩

দ্বিতীয় খণ্ড	চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

অয়মহং ভোঃ

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি প্রাচীন কাল। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যুগ। রাজা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে প্রজাশাসন করেন। মুনি তপোবনে তপস্যা করেন। এমনি এক তপোবনের মধ্যে আশ্রম। হঠাৎ সেই শান্ত আশ্রমপদের শান্তির পরিবেশকে ভঙ্গ ক'রে এক রুক্ষ কর্কশ স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'অয়মহং ভোঃ'।

কে যেন জানিয়ে দিতে চান যে তিনি এসেছেন, তিনি একজন গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোক। কাজেই সকলেই শশব্যস্ত হয়ে স্থির করলেন তাঁকে স্বাগত জানান উচিত এবং আড়ম্বরসহকারে অভ্যর্থনার আয়োজন করা উচিত। সে অভ্যর্থনার জন্য একটা রীতিমত কোলাহল পড়ে যাওয়া উচিত। তা না হলে তাঁর মহত্ত্বের উপযুক্ত সম্মান তাঁকে দেখান হয় না যে।

কিন্তু এ যে শান্ত আশ্রমপদ। এখানকার মানুষের আদর্শ বিভিন্ন। এখানে যে অর্থ বা প্রতিপত্তি বা অনিষ্ট করবার ক্ষমতা তা শ্রদ্ধা বা ভয় আকর্ষণ করে না। এখানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে শিখেছেন। তাঁরা শক্তিমানের নিকট নতি স্বীকার করতে শেখেন নি। অবশ্য তাঁরা সৌজন্যকে বিসর্জ্জন দেন নি। যিনি অতিথি হয়ে আসবেন তাঁকে সেবা করতে তাঁরা সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত। যদি কোন শক্তিমান পুরুষ আসেন তাঁরা অতি যত্নসহকারে তাঁর পরিচর্য্যা করবেন। যদি কোন

অখ্যাত নগণ্য ব্যক্তি আসেন তিনিও সমান সমাদর পাবেন। শক্তিমান মানুষ বা বিশিষ্ট মানুষ হিসাবে সেখানে সেবার আয়োজন নয়, কেবল মাত্র অতিথি হিসাবেই সেবার আয়োজন।

যিনি হাঁক ডাক দিলেন, কৈ তাঁর দম্ভভরা আহ্বানে কেউ ত সাড়া দিল না। তাঁর যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে চলেছে। আর তিনি যে ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি এমন খ্যাতিও তাঁর নাই। এই রে—পৃথিবী রসাতলে যায় আর কি! এই শক্তিমান মানুষের রোষবহ্নি একবার প্রজ্জ্বলিত হলে ত আর রক্ষা নাই। তখন প্রশ্ন হল—কোন হতভাগ্য সেই রোষানলে পুড়বে।

কে পুড়বে তা ঠিক হয়ে গেছে। স্থানটি কণ্বমুনির আশ্রম। দাম্ভিক ব্যক্তিটি সুলভ-কোপ দুর্ব্বাসা মুনি। আশ্রমে মহর্ষি কণ্ব অনুপস্থিত। অতিথি সেবার ভার পড়েছে দুহিতা শকুন্তলার উপর। ভাগ্যদোষে তিনি আজ সগু-বিরহিণী। তাই হৃদয়ে অসন্নিহিতা। মন কোথায় যে পড়ে রয়েছে তার ঠিক নাই। তাই মুনির আহ্বান কানে পৌছাল না। কাজেই দুর্ভাগা শকুন্তলার পরিত্রাণ নাই। তাঁর উপর অভিশাপ বর্ষিত হল।

'যাকে ধ্যান ক'রে আমার বচনে কর্ণপাত করলে না, সে তোমাকে স্মরণ করবে না। এই বলে রোষদৃপ্ত পদক্ষেপে দুর্ব্বাসা চলে গেলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার শত অনুনয়-বিনয়েও কোন ফল হল না। যিনি প্রকৃতি বক্র তাঁর মন কি ফেরান যায়?

এই রোষানল-প্রণোদিত অভিশাপের ফলই হল কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। শক্তিমান মানুষকে অবহেলা করার, তা সে অনিচ্ছাকৃত হক বা অজ্ঞানিতভাবে হক, ফল ভাল হয় না। বিশেষ ক'রে তিনি যদি প্রকৃতিতে বক্র হন, তা হলে ত তাঁর রোষানল প্রজ্জ্বলিত হবেই এবং তার ফলে যে দুর্ভাগা তাঁকে অবহেলা করেছে, তার বিরুদ্ধে তাঁর সেই শক্তি প্রযুক্ত হবেই। এই ভাবে জগতে কত মানুষের ভাগ্যেই না কত দুর্ভোগ ঘটেছে।

ক্ষমতাবান ব্যক্তির এমন প্রবৃত্তি হয় কেন? একটু চেষ্টা করলে এর কারণ বার করা শক্ত হয় না। কোন ব্যক্তি-বিশেষের সমৃদ্ধিলাভ হলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সেটা মনোমত হয় না। তাকে আমরা মাৎসর্য্য দোষ বলি। অন্যের উন্নতিতে নিজের অসন্তোষ হেতুই এই দোষের উৎপত্তি। হৃদয়ের প্রসারের অভাবই তার ভিত্তি।

কিন্তু যে রোগে দুর্ব্বাসা ভুগেছিলেন তা ঠিক এই রোগ নয়। এ তার পাল্টা রোগ। অহমিকাই এই রোগের ভিত্তি। মানুষ বড় হয়, হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন নিজের চোখে নিজে বেশ গণ্যমান্য হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। তখন তার ইচ্ছা হয়, আত্মপ্রচার করব। আমি যে বড়, সেই কথাটা সে তখন প্রচার করবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। শুধু এই পর্য্যন্ত এসে থামলেই ক্ষতি ছিল না। কিন্তু অহমিকার স্ফীতি তাকে এখানে থামতে দেয় না। আমি যে বড় হয়েছি সেটা অন্যে নজর করুক, শুধু এই ইচ্ছা তাকে তৃপ্তি দেয় না। আর এক ইচ্ছা তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সে তখন চায় আমি যে বড় হয়েছি, সে কথা অন্যে স্বীকার করুক।

এইখানেই এসে বাঁধে গোল। অন্যকে স্বীকার করানটা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন হয় না। কিন্তু আত্মপ্রচার কর্ম্মটি এক রকম তার ইচ্ছাধীন। অন্যে তা দেখে যাবে এবং এক রকম সহ্য করতেও প্রস্তুত হবে। কিন্তু আত্ম-প্রচারকারী যে সত্যই গণ্যমান্য ব্যক্তি, সেটা স্বীকার অন্যে নাও করতে পারে। এই পরস্পরের ইচ্ছার বিরোধেই এসে পড়ে সংঘর্ষ। ফলে যিনি ক্ষমতাবান, তিনি বলপূর্ব্বক নতি স্বীকার করাতে চেষ্টা করেন। এই সূত্রেই সুরু হয় অত্যাচারের।

যে বিত্তশালী হয় তার নিজের সমৃদ্ধির প্রচারের একটা ইচ্ছা তীব্র হয়ে ওঠে। নিজের বিলাস, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান ছাড়াও তার অর্থকে সে ব্যবহার করে অন্যের দৃষ্টিকে তার সমৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট করতে। সকল সুখসুবিধার ব্যবস্থা ক'রে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রেই সে ক্ষান্ত হবে না। সেই অট্টালিকার আকৃতিতে সে এমন একটা বৈশিষ্ট্য দানের চেষ্টা করবে, যা তার প্রতি অন্যের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট করবে। হয় ত সে অট্টালিকা জাহাজের ধরণের রূপ নেবে। হয় ত, তা প্রাচীন বিলাতী কেল্লার অনুকরণে গড়ে উঠবে। কিম্বা আর কিছু না হক একটা উচ্চ গম্বুজ তার থাকবে।

ঘোরাফেরার পক্ষে মটর বেশ সুবিধার বাহন। যে অর্থবান ব্যক্তি সে মটর গাড়ী কিনবে। অনেকে মিলে একসঙ্গে যাবার সুবিধার জন্য বড় মটর কেনার যুক্তি আছে। কিন্তু তাতেও অনেক সময় মটরের মালিক সন্তুষ্ট হন না। তিনি মটরের হর্ণের মধ্যে এমন কায়দার ব্যবস্থা করেন যে হর্ণ যখন বাজে তা কেবল পথিককে সাবধান ক'রে দেয় না, তার চিত্তকে সুরের খেলায় চমক লাগিয়ে দেয়। তা যেন মালিকের হয়ে বলে, অহমহং ভোঃ।

অহমিকার এই ধরণের অভিব্যক্তিতে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। বরং অনেক সময় তা কৌতুকের উপাদান যোগায়। কিন্তু অহমিকা যখন স্ফীত হয়ে নিজের মহত্ত্বকে শুধু প্রচার ক'রে আর তৃপ্তি পায় না, অন্যকে দিয়ে তা স্বীকার করিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তা অত্যাচার আর নিপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

এর উদাহরণ পৌরাণিক গল্পে মেলে। কিন্তু এ বিষয় সব থেকে সুন্দর গল্পটি পাই বেহুলার উপাখ্যানের মধ্যে। সাপের দেবতা মনসা দেবীর নিজেকে বড় মনে করবার যথেষ্ট কারণ ছিল, বিশেষত নানা বিষধর সর্প যখন তাঁর আজ্ঞাবাহী। এ হেন দেবতাকে কিনা চাঁদ-সদাগর পূজা করতে অস্বীকার করেন? তিনি শিবভক্ত। শিব ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে তিনি দেবতা বলে স্বীকার ক'রে পূজা করতে প্রস্তুত নন।

এই মনোভাব মনসা দেবী বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নন। তিনি তখন তাঁকে বাধ্য করবার জন্য ভয় দেখালেন। তাতে ফল হল না। তখন হল দারুণ নিপীড়ন আরম্ভ। কত সমৃদ্ধিশালী সদাগর তিনি, তাঁর অগণিত বাণিজ্য-তরী দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। একে একে তাঁর তরী ডুবতে আরম্ভ করল। তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়ে গেল। তবু তিনি নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তখন সুরু হল মানসিক নিপীড়ন। একে একে ছয়টি পুত্র চোখের সামনে অকালে মৃত্যুবরণ করল। তবু তাঁকে বশে আনা গেল না। বাকি রইল কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দর। তার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল, নির্দ্দেশ হল বাসর ঘরে সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হবে। এ পরিকল্পনায় বাহাদুরী আছে যথেষ্ট। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু সাধারণ অবস্থাতেই মর্ম্মন্তুদভাবে বেদনাদায়ক। তার পর বিবাহের অব্যবহিত পরেই বধূকে বিধবা রেখে মৃত্যু আরও কতগুণ দুঃখের। নির্য্যাতনের ব্যবস্থাটি চূড়ান্ত-রূপে বেদনাদায়ক করা হয়েছিল। ঘটলও তাই। তবু চাঁদ সদাগর নতি স্বীকার করলেন না। সর্ব্বস্ব হরণ, চরমতম মানসিক নির্য্যাতন, কোনটাতেই ফল হল না।

বর্ত্তমানকালেও এরূপ নির্য্যাতনের উদাহরণ বিরল নয়। হয়ত কোন বড় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে কেউ অধিষ্ঠিত। তিনি একটি বিশেষ ইচ্ছা পূরণ করতে চান। কোন অধীনস্থ কর্ম্মচারী হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে সে ইচ্ছা পূরণ করতে অক্ষম হন। অমনি সুরু হল নির্য্যাতন। যিনি ইচ্ছায় বাধা পেয়ে রুষ্ট হলেন, তাঁর অহমিকাবোধ স্ফীত হয়ে এমনি তাঁকে অন্ধ করেছে যে কর্ম্মচারীর কাজটি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না হয়েছে তা ভাবেন না। তিনি তার সহজ ও সরল ব্যাখ্যা ক'রে নেন যে তাঁকে মানতে বা তাঁর প্রতি নতি স্বীকার করতে অনিচ্ছা হেতুই এই বাধা সংঘটিত হয়েছে। হয়ত এমনও হতে পারে যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করার বিপক্ষে কোন সংগত কারণ ছিল এবং নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েই কর্ম্মচারীটি এমন কাজ করেছেন। কিন্তু অধ্যক্ষের নজরে তা আসে না। অবহেলিত অহমিকা বিনা বিচারেই তাঁর নির্যাতন সুরু ক'রে দেয়। নানা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি, নানাভাবে অবমাননা, অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক স্থানে যাবার নির্দ্দেশ প্রভৃতি সংঘটিত হয়। এগুলি এখানে নির্য্যাতনের অস্ত্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সম্পর্কে একরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে পাঠককে একটি গল্প উপহার দেওয়া সম্ভব। স্যর্ জন্ হার্বার্ট তখন বাংলা দেশের গভর্ণর। দ্বিতীয় পার্থিব মহাযুদ্ধ তখন সুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশকে যুদ্ধ বিষয়ে মিত্রশক্তির সাহায্যের জন্য উন্মুখ ক'রে তোলা তখন তিনি একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই সূত্রে তিনি বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার শাসনকেন্দ্রে সফর করতে সুরু করলেন। তার পূর্ব্বে এদেশে গভর্ণরের মফঃস্বলে ভ্রমণ সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণের মতই একটা দুর্লভ বস্তু ছিল। তখন কালগুণে সেটা অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু ব্যাপারটি ঘন ঘন ঘটলেও তার আভিজাত্য ত যায় না। বিশেষ ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্মান ত সংরক্ষিত করতেই হয়। কাজেই গভর্ণরকে সম্মান দেখানর জন্য প্রতি জেলা শাসনকেন্দ্রে তাঁর আগমন উপলক্ষে নানা উৎসবের আয়োজন হয়। দরবার ত আছেই, তার সঙ্গে ব্যবস্থা হয় নানা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে তাঁকে অভিনন্দন পত্র প্রদানের, চা-পার্টি, ডিনার-পার্টি ইত্যাদি কত কি বিষয়ের।

সেবার এক জেলার কেন্দ্রীয় সহরে গভর্ণরের আগমন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে, এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল—হাঁসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ হতে একটি অভিনন্দন পত্র দেবার। নিমন্ত্রিতের মধ্যে জেলার জজও ছিলেন একজন। ঠিক সেইদিন, সেই সময় একজন-হিতকর কাজের জন্য তাঁর ডাক পড়েছিল নিকটবর্ত্তী এক ছোট সহরে। এখন সে ভদ্রলোক বেশ দোটানায় পড়ে গেলেন। তিনি জনহিতকর কার্য্যে—যেখানে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়, সেখানে যাবেন, না গভর্ণর বাহাদুরকে যে সভায় অভিনন্দন দেওয়া হবে সেই সভায় যাবেন? অনেক ভাবনা ও চিন্তার পর তিনি যুক্তি করলেন গভর্ণরের সভায় তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় নয়: আরও কত গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোক সেখানে আসবেন, তার মধ্যে তাঁর অনুপস্থিতি এমন কারও নজরে পড়বে না। অতএব তিনি সেই জনহিতকর কার্য্যেই যোগ দিতে গেলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে খোদ মালিক স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুর তাঁর অনুপস্থিতি নজর করেছিলেন এবং স্বয়ং এর জন্য তাঁর কৈফিয়ত চেয়ে তাঁকে রীতিমত ব্যতি-ব্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন। নিশ্চয় গভর্ণর বাহাদুর মনে করেছিলেন যে তাঁকে তাচ্ছিল্য করবার জন্যই এই সামান্য জেলা জজটির এমন দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। অহমিকার স্ফীতি মানুষকে এমনি অন্ধ ও অত্যাচার-পরায়ণ ক'রে বসে।

যাঁরা এই ভাবে জবরদস্তি নতিস্বীকার করতে চেষ্টা করেন তাঁরা একটি স্থূল সত্য একেবারে ভুলে যান। সুখ খুঁজলে যেমন সুখের নাগাল পাওয়া যায় না, তেমন বলপূর্ব্বক শ্রদ্ধা বা সম্মান আদায় করা যায় না। সম্মান আদায় করবার সোজা এবং সরল পথ হল সম্মানের যোগ্যতা অর্জ্জন করা। যোগ্যতা থাকলে মানুষ স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে সম্মান দেখিয়ে যাবে। কিন্তু জোর ক'রে আদায় করতে গেলে তা পাওয়া যাবে না। বলপ্রয়োগে যদিই কিছু পাওয়া যায়—তা মেকি জিনিষ, তার কোন মূল্য নাই।

এক রসিক ভদ্রলোক মফঃস্বলের এক জেলা জজকে একটি বেশ সুন্দর কথা বলেছিলেন। আমলাতন্ত্রের যুগে মফঃস্বলে জেলা জজ ও জেলা শাসকের মধ্যে অনেক সময় একটা রেশারেশির ভাব ফুটে উঠত। সেখানে যিনি জেলা শাসক ছিলেন তিনি ভারি রাশভারি মানুষ ছিলেন। কত গণ্যমান্য লোক প্রতিদিন তাঁর বাংলোতে গিয়ে শুধু মাত্র তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই হাজির হতেন। জজের কাছে এঁরা বড় একটা যেতেন না। একদিন কথা উঠেছিল—জজ বড় না হাকিম বড় এবং এই প্রতিপত্তিটাই প্রমাণ কিনা যে হাকিম বড়।

এই সম্পর্কেই ভদ্রলোক বলেছিলেন যে এই অবস্থাটা কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ জজ হলেন বৃহস্পতির সামিল, আর হাকিম হলেন শনির সামিল।

এ কথাটার বেশ তাৎপর্য্য আছে। আমরা শনি ও বৃহস্পতি দুই গ্রহের কথাই জানি। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু, তাঁকে শ্রদ্ধা করি মনে মনে, কিন্তু আড়ম্বর ক'রে পূজা দিই না। শনিকে কিন্তু রীতিমত ঘটা ক'রে পূজা দিয়ে থাকি। তার কারণ শনি রুষ্ট হলে অমঙ্গল করতে পারেন, কিন্তু বৃহস্পতি অমঙ্গল সাধন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এখানে বৃহস্পতি যে আড়ম্বরহীন নীরব শ্রদ্ধা পান তার মূল্য আছে। কিন্তু শনি যে ভয়ে-ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সমারোহ সহকারে পূজা পান তা কৃত্রিম বস্তু, তার মূল্য নাই। প্রকৃত জহুরী তার প্রতি লালায়িত হয় না।

যিনি গুণী ব্যক্তি, যাঁর সাধনা দশের কল্যাণ অর্জ্জন করে, সম্মান তাঁর কাছে তুচ্ছ জিনিষ, তিনি তা চাননা। আর যিনি অহমিকা-নিয়ন্ত্রিত হয়ে আত্ম-সেবাকেই পরম ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেন, তিনিই সম্মান পাবার জন্য উৎসুক হন। বিধির এমন ব্যবস্থা যে যিনি সম্মানকে তুচ্ছ করেন, তাকে চাননা, শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁর ভাগ্যেই জোটে। আর যিনি তার জন্য লালায়িত, তাঁর ভাগ্যে তা জোটে না। বলপ্রয়োগ ক'রে, জবরদস্তি ক'রে তা আদায় করা যায় না; কেবল অত্যাচারের ও নিপীড়নের কলঙ্কই তাঁর ললাটকে মসীলিপ্ত করে।

কিরণ দিয়ে সূর্য্য পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রাণ তর্পণ করেন। চন্দ্র তাঁর স্নিগ্ধ আলো দিয়ে রাত্রির অন্ধকার দূর ক'রে মানুষের মনকে তৃপ্তি দেন। তাঁরা নিঃশব্দে আসেন, নিঃশব্দে যান। তাঁরা ত সম্মান আদায় করবার জন্য আদৌ ব্যগ্রতা দেখান না। ওদিকে সামান্য বজ্র, তুলনায় তার কতটুকু স্থান আলোকিত করবার ক্ষমতা, আর কতক্ষণই বা তার দ্যুতি স্থায়ী হয়? অহমিকায় স্ফীত হয়ে সে আকাশের বুক কাটিয়ে কর্কশ শব্দে ঘোষণা করে 'আমাকে সম্মান কর, আর যদি না কর ত তোমার ঘাড় ভাঙব।' মানুষের মাথায় পড়ে তার ঘাড় ভাঙেও ঠিক। কিন্তু শ্রদ্ধা কি পায়?

বন্দী

দুর্গাদাস ভট্ট

জৈবিক চেতনার কাছে হার মানল ভাবাদর্শের নীতিসুধা। নইলে দাম্পত্যকলহে নাক গলানোটা ভদ্রতার পর্য্যায়ে পড়ে না। বাচ্চা ছেলেটার অবস্থা দেখে বৌদির পক্ষ নিয়েই বলে উঠলাম—দোহাই হীরেনদা, এবারটা আর ছেলেটার ওপর আপনার রেডলাইন খাটাবেন না। হীরেনদার মুখের ওপর দিয়ে একটা রঙের স্রোত বয়ে গেল। এ রঙ লজ্জার। হয় তো বা অপমানেরও। কেমন যেন একটা আত্মস্থ ভাবের ভঙ্গিতে বললেন—বেশ তোমাদের যখন এতই অবিশ্বাস আমার ওপর—তখন—কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত হয়ে এল তাঁর। মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। চিকিৎসাশাস্ত্রে ধৈর্য্যের স্থান যে কত উঁচুতে একথা বারংবার শুনে এসেছি তাঁর কাছ থেকে। কত গল্প বলেছেন তিনি কতবার।

একটা দিনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ল। সামান্য একটু সর্দ্দি হয়েছিল আমার। শীতের সকালে শিশির জমেওঠা ঘাসগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে মেঠো পথ দিয়ে পৌছলাম হীরেনদার ডিস্পেন্সারিতে। কথা প্রসঙ্গে জানালাম তাঁকে আমার সর্দ্দি হওয়ার খবর। কিন্তু কথার পাহাড় বেড়েই চলল। একথা সে কথা। নানা রকম খোস গল্প—কিন্তু হীরেনদা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন আর লেখেন না। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে নাকের ডগাটা একটু চুলকাতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন হীরেনদা। দু এক মিনিটের মধ্যেই তিন পুরিয়া ওষুধ তৈরী হয়ে গেল। হীরেনদা এতক্ষণে কথা বল্লেন—নাও খেয়ে ফেল। আমার ততক্ষণ বাক্‌-রোধ অবস্থা। বহু কষ্টে বিস্ময়ের দরজা খুলে বল্লাম—সত্যি হীরেনদা, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।

—বুঝবে বুঝবে—বুঝিয়ে দিলেই বুঝতে পারবে। হীরেনদা বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়লেন। অগত্যা এক পুরিয়া ওষুধ উদরস্থ করে নতুন কিছু শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলাম।—এতক্ষণ তোমায় কেন ওষুধ দিই নি, আর হঠাৎ কেন দিয়ে ফেল্‌লাম? এই তো তোমার জিজ্ঞাস্য। আমি ঘাড় নাড়লাম।—বুঝলে হে, এ হচ্ছে রেড লাইনের ব্যাপার। এইখানেই আমাদের সংগে এলোপাথিকের পার্থক্য। যতক্ষণ তোমার রেড লাইন পাই নি ততক্ষণ তোমায় কথায় বার্ত্তায় অন্যমনস্ক রেখেছিলাম। কিন্তু যেই তুমি নাকের ডগা চুল্‌কালে, আমি রেড লাইন পেলাম। আচ্ছা তোমাকে কেণ্ট সায়েবের একটা গল্প শোনানো যাক্।

—কি আশ্চর্য্য, আপনার রুগীর দল যে বাইরে অপেক্ষা করছে। এ সময় গল্প করে কি আপনার সময় নষ্ট করা উচিত হবে?

—তুমি থামো তো হে, ওরা তো রোজই আছে। ওদের বেশী লায় দিতে নেই, বুঝলে। তাতে নিজের প্রেষ্টিজ কমে যায়। আর তা ছাড়া ডাক্তারী করছি বলেই কি সমস্ত জীবনটাকে লাভ-ক্ষতির হিসাবের খাতা বানিয়ে বসে থাকতে হবে নাকি! তুমি এতদিন পরে এলে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করব না?

এই জন্যেই বোধ হয় লোকে হীরেনদাকে ছিটগ্রস্থ বলে বিদ্রূপ করে। হ্যানিমেন সায়েব কিম্বা কেণ্ট সায়েবের গল্প পেলে ওঁর নাওয়া খাওয়া ভুল হয়ে যায়। অগত্যা আমাকেও চুপচাপ শুনতে হ'ল কেণ্ট সায়েবের গল্প।

ধৈর্য্য আর মনীষার সে এক গৌরবদীপ্ত কাহিনী। অনন্তের স্রোতের মুখে জেগেছিল এক বাস্তব বাধা। চমকিয়ে থেমেছিল কালের গতি। ক্ষণ মুহূর্ত্ত পরিণত হয়েছিল অনন্ত মুহূর্ত্তে। রুগীর তখন যাই যাই অবস্থা। অথচ কেণ্ট সায়েব বসে আছেন স্থির হয়ে। মুখের

একটা রেখাও নড়ছে না বুঝি এক চুল। সকলের মুখেই চাপা অসন্তোষ। অন্তিম অবস্থাতেও তো কই ওষুধ খাওয়াচ্ছেন না উনি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সেই সময়, মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য বুঝে নিলেন কেণ্ট সায়েব। সপ্ত রঙের রামধনু জানিয়েছে বর্ষণ শেষের ইঙ্গিত। চরম মুহূর্ত্তের কিছু আগেই রেড লাইন পাওয়া গেল। মাত্র এক ডোস ওষুধেই উন্মত্ত ব্যাধির উঁচিয়ে-রাখা মাথাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল।

এ কাহিনীর কতটা সত্য কতটা মিথ্যা এ বিচারবুদ্ধির অবলুপ্তি ঘটেছিল ক্ষণিকের জন্যে। হতচকিত হয়ে তাকিয়ে ছিলাম হীরেনদার মুখের দিকে। দারুণ উত্তেজনায় তাঁর সুগৌর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। এই ভীষণ শীতেও কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

স্মৃতি পথের সীমানায় জেগে-ওঠা গুটিকয় মুহূর্ত্তকে সরিয়ে দিয়ে তাকালাম আবার বৌদির দিকে। বৌদি ততক্ষণ রুগ্ন ছেলেটার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন আল্‌তোভাবে। নিস্তব্ধতা আর সহ্য হল না, বললাম—তা হলে তো একটা কিছু করতে হয় বৌদি।

—যা ভাল হয় কর ঠাকুরপো। যদি দরকার হয় এলোপাথিক···

—বলো কি বৌদি—হীরেনদা···

—সহ্য করতে পারবেন না এই তো, কিন্তু ভাই আমি ধৈর্য্যের শেষ সীমানায় পৌচেছি। এখন ওঁর মনে আঘাত লাগতে পারে বলে···ছেলেটাকে হারাতে পারব না। কিছুতেই পারব না। অন্তরের নিঃশব্দ বিক্ষোভ ফেটে পড়ল এবার। চাপা কান্নার ভাষায় কথা কয়টা বলে উঠলেন বৌদি।

নিজেকে নিয়ে মেতেছিলাম দিনকয়। তাই মাঝে কয়েকদিন হীরেনদাদের বাড়ীর খোঁজ নিতে পারি নি। মেজ ছেলেটার অসুখের সময় আমার দিক থেকে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় নি। ওদের সঙ্গে আমার নাড়ির টান না থাকলেও কেমন যেন একটা প্রাণের টান ছিল। প্রত্যেক দিনই ডাক্তার সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। ভিজিটের টাকাটা অনেক দিন হীরেনদাদের অজান্তে দিয়ে দিতাম ডাক্তারকে, আর মিথ্যে করে কিছু একটা তৈরী করে বলতাম তাঁদের। যখনই ডাক্তারকে সঙ্গে করে গিয়েছি ওঁদের বাড়ী, হীরেনদাকে সামনে পাই নি। কোথায় যেন আত্মগোপন করে থাকতেন। ছেলেটার আরোগ্য-লাভের পর নিশ্চিন্ত হলাম। আর তার কিছুদিন পর দেশে চলে যেতে হ'ল বিশেষ একটা কাজে। ফিরতে প্রায় দিন পনেরো দেরী হ'ল। ফেরার দিন-তিনেক পরেই ধর্ম্ম-তলা ষ্ট্রীটের মোড়ে সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল হীরেনদার সঙ্গে। হীরেনদা বলে ডাকতে গিয়েই থমকে থামলাম! একি দেখছি? মাত্র পক্ষকালের অসাক্ষাৎএর মধ্যে এই আমূল পরিবর্ত্তন। হীরেনদাকে নধরকান্তিই বলা চলে। অথচ মনে হ'ল সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে একটা সামুদ্রিক ঝড় বয়ে গিয়েছে। রগের হাড় দুটো বিশ্রী-নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অতন্দ্রচোখের জাগ্রত সীমানায় পৃথিবীর সমস্ত ক্লান্তির ভিড়। কাছে গিয়েই বলে উঠলাম—

—হীরেনদা! আপনি কি অসুস্থ?

—হ্যাঁ ভাই অসুস্থই! তোমার সংগে কদিন থেকেই দেখা করব করব ভাবছিলাম। দেখা হয়ে গেল ভালই হ'ল। আমার অসুখটা তোমার সেই ডাক্তারকে দেখানোর ইচ্ছা আছে।

—সে কি হীরেনদা? আপনি না এলোপাথিক ডাক্তারদের অপছন্দ করেন! আর্ত্তনাদ করে উঠলাম আমি।

—আগে করতাম, কিন্তু এখন করি না···চল চল তোমার সেই ধন্বন্তরীর কাছে। বিদ্রূপ না অন্য কিছু, বুঝতে না পেরে হাঁ করে থাকলাম মিনিটকয়, তারপর বললাম—বেশতো চলুন না, দেখাই যাক আমাদের সেই ডাক্তার আপনাকে সারিয়ে তুলতে পারেন কিনা।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলাম দুজনে নির্দ্দিষ্ট নিশানায়।

ডাক্তারবাবু বারকয় ষ্টেথিস্কোপ ছোঁয়ালেন হীরেনদার পাঁজরায়। ভ্রুকুটী-কুটীল কপালে সন্দেহের ঘনঘটা।

—আপনার খাওয়া দাওয়া ঠিকমত হচ্ছে না বোধহয়।

—দেখুন আপনি ডাক্তার হয়েছেন, আমার পারিবারিক অর্থনীতিতে নাক গলাতে আসবেন না। হীরেনদা সশব্দে হুংকার দিয়ে ওঠেন। অগত্যা আমাকেই মধ্যস্থতা করতে হয়। প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের আর পথ্যের ফিরিস্তির দিকে

নজর পড়তেই কেমন যেন খট্‌কা লাগে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাতেই উনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আমার দিকে। এই দৃষ্টি আমি চিনি। বাঙালি ঘরের গুমোট-ধরানো আলোবাতাসে যে বিভৎস রোগের অজস্রকীট তাদের খাদ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে—তাদেরই শিকার হয়েছেন হীরেনদা। দৈহিক দুর্ব্বলতার অনুকুল পরিবেশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিধ্বংসী রোগের আকাশভেদী মিনার। পরে অবশ্য এক্সরে রিপোর্টে সে রকম কিছু পাইনি।

দীর্ঘ তিনমাসের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের নামই বোধহয় জীবন-যুদ্ধ। বৌদির হাতের আর এক গাছ চুড়িও অবশিষ্ট থাকল না। হাসি কান্নার ছায়ায় মায়ায় প্রাণিত হয়ে থাকত ছোট্ট একটু সংসার—তারই ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল দুঃস্বপ্নের দুরন্ত জোয়ার। বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল সব কিছু। সবার মুখেই বিষাদের কালো মেঘ, শুধু হীরেনদাকে বাদ দিয়ে। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসত তাঁর,আর কথা বলতে আরম্ভ করতেন আমার আর বৌদির সঙ্গে। বৌদি বাধা দিয়ে বলতেন—কথা বোলো নাগো, ওতে তোমার ক্ষতি হতে পারে।

"—তোমাদের ডাক্তার তাই বলে বুঝি?" কেমন যেন একটু বিদ্রূপের হাসি লেগে আছে ওঁর ঠোঁটে। শরীরের কোমল স্থান গুলোতে আঘাত লেগে লেগে কঠিন হয়ে যায়। বৌদিরও বোধহয় তাই হয়েছিল। বেশ একটু ঝাঁজ দিয়েই বলে ওঠেন—হ্যাঁ ডাক্তারেই বলে। সব ডাক্তারই তো আর তোমার মত পণ্ডিত নন্। আত্মস্থ হয়ে যান হীরেনদা, কিছুক্ষণ পরেই আপন মনেই বলে ওঠেন—হারতে এবার হবেই?

—"কাকে হারতে হবে হীরেনদা?" কথার সূত্র ধরে প্রশ্ন করি আমি।

—"কাউকে না ভাই, কাউকে না—ও এমনি আমার মুখ ফস্কে কথাটা বেরিয়ে গেছে।" কথাটা সামান্য তবু প্রতিধ্বনি করে ফিরছে আমার মনের অদৃশ্য স্নায়ুতন্ত্রে। কার জিত? কার হার? প্রশ্ন করি নিজেকে শতবার সহস্রবার। উত্তর পাইনা কিছুতেই। কিন্তু অপেক্ষা আর করতে হ'ল না বেশীদিন। দিন কয়েক পরেই সঠিক উত্তর পেয়ে গেলাম।

আগের দিন সারারাত ধরে অক্সিজেন দিয়েছি। কাজেই সমস্ত দিনটা হোটেলের ঘরখানায় দিবানিদ্রা দিতে হ'ল। সন্ধ্যে নাগাদ হীরেনদাদের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। সদর দরজার বাইরে থেকে হাজার লোকের মিছিল। সকলেই বুঝি দুখের তিমিরে হাবুডুবু। আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতেই অদৃশ্য একটা হিমস্রোত শির শির করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শিহরণ জাগালো। কয়েকগজ এগিয়ে বৌদিকে দেখলাম—তাঁর মেজ আর ছোট ছেলেটাকে বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছেন রান্না ঘরের দুয়ারের কাছে। ভাবলেশহীন মুখ। কালো চোখের পটভুমিতে দুকুল ছাপানো অশ্রু নেই, আছে শুধু বিহ্বলতার অন্তিম আকুতি। আমি কাছে যেতেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন। ঢোক গিলে বললাম—কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই—বাষ্পাকুল উত্তর বৌদির। আমি কিছু বলার আগেই বলে উঠলেন—আমাদেরই বোধহয় ভুল হয়েছে। ওঁর সেই রেডলাইনের পথ ধরে এগুলেই বোধহয়···আর কিছু বলতে পারলেন না। দুরন্ত বন্যার মত উদ্গত অশ্রুর জোয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ল গণ্ডের ওপর।

ততক্ষণ মৃতদেহকে নামানো হয়েছে মেঝেয়। কাঁঠাল কাঠের খাটটার ওপর পাতা রয়েছে বিছানাটা। তোষক বালিসগুলো নামিয়ে আনলাম। কিন্তু একি? মাথার দিকের তোষকের তলায় ছোট্ট একটা শিশিতে সাদা গুঁড়া গুঁড়া মতন? এগুলো কি? নিজেও মেডিক্যাল সায়ান্সের ছাত্র, কাজেই কৌতুহল বশে হাতের চেটোয় খানিকটা গুঁড়ো ঢেলে নিলাম। যে সন্দেহটা প্রথম থেকেই জাগছিল এবার বুঝি তার নিরসনের সময় আসন্ন। উত্তেজনার চরম পর্য্যায়ে ছটফট্ করে উঠ্‌ল স্নায়ু তন্ত্রের অদৃশ্য আবেগ। স্থানকাল ভুলে ছুটে গেলাম কলেজ ল্যাবরেটরীতে। সামান্য একটু এক্সপেরিমেন্ট। উত্তরটা মিল্‌ল হাতে হাতে—আর্সেনিক্। কোনো ভুল নেই এতে। হীরেনদার রোগগ্রস্ত প্রলাপের গোটাকয় টুক্‌রো কথা ছুটে এল বিগত দিনের ওপার থেকে—

—"হারতে এবার তাকে হবেই"। তখন প্রশ্ন জেগেছিল কাকে হারতে হবে? কেই বা হবে বিজয়ী? আজ আর প্রশ্ন নেই একটাও? প্রকাশ্য দিবালোকের মতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সবকিছু।

বাঙালী নৈয়ায়িকের দূতকাব্য

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

বেশির ভাগ দূতকাব্যের বিষয়বস্তু প্রায় একরূপ। মুষ্টিমেয় রচনার ব্যতিক্রম বাদ দিলে সমস্ত দূতকাব্যেই দেখা যায়—বিচ্ছেদকাতর নায়ক বা নায়িকা কোন এক কল্পিত দূতের কাছে দয়িতজনের উদ্দেশে হৃদয়ের আর্তি জ্ঞাপন করছেন।(১) সংস্কৃত আলংকারিকেরা এ শ্রেণীর কান্তমধুর লঘু রচনার নাম দিয়েছেন 'খণ্ডকাব্য'। বর্তমান সময়ে নানা গ্রন্থে অজ্ঞাত দূতকাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং নানা পুঁথিশালায় অপ্রকাশিত দূতকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেকালে হয়ত এরূপ কাব্য প্রচুর রচিত হয়েছিল। যে কখানি গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে, তাদের সংখ্যাও অর্ধশতের অধিক। এদের মধ্যে কালিদাসের মেঘদূত গুণোৎকর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্ভবতঃ বয়সেও সবচেয়ে প্রাচীন। তবে আদি-কবির কাব্যে হনুমান যে সীতার কাছে রামের বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছিল, আর মহাভারতে নলোপাখ্যানের হংস যে নলের কথা দময়ন্তীকে জানিয়ে দিয়েছিল, তাতেই আছে দূতকাব্যের সূত্রপাত।

দূতকাব্যের দৌত্য বড় বিচিত্র। রাজনীতির দৌত্যে সর্বত্রই বাক্য-নিপুণ ব্যক্তি দূতকর্মের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু দূতকাব্যে যারা প্রেমিক-প্রেমিকার কল্পলোকের দূত, তারা সবই প্রায় বাক্যহীন ইতর-প্রাণী কিংবা নিস্পন্দ জড়বস্তু। বেদের আখ্যায়িকায় ইন্দ্রের দূতী ছিল সরমা নামে এক কুক্কুরী, আর যমের দৌত্য করত উলূক আর কপোত। হয়ত এই লোকোত্তর দৃষ্টান্ত থেকেই লৌকিক কবিরা পশুপক্ষীর দৌত্য-কল্পনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। শুক, পিক, বক, কাক, গৃধ্র, গরুড়, ময়ূর, চাতক, চক্রবাক, চকোর, ভৃঙ্গ—সবই দূতকাব্যের দূত। এদের মধ্যে হংস ও ভ্রমর কবিদের বড় প্রিয়। একাধিক কবি এদের বার্তাবহ ক'রে কাব্য রচনা করেছেন। এরা সকলেই চেতন প্রাণী; এদের ধ্বনি-গুঞ্জনও আছে। কিন্তু কালিদাসের মেঘদূতে যক্ষের দূত হয়েছিল আকাশের মেঘ, ধোয়ী কবির পবনদূতে গন্ধর্বকন্যার দূত হয়েছিল মলয়ের বায়ু। অবশ্য চেতন প্রাণীর মত মেঘ আর বায়ুরও গতিবেগ দেখা যায়, তাদের গর্জন-শ্বসনও শুনতে পাওয়া যায়। দূতকাব্যের পরবর্তী কবিরা কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা পর্বত, পাদপ, পদাঙ্ক, চন্দ্র, পদ্ম, তুলসীকেও দূতের কাজে নিযুক্ত করেছেন; মন, চিত্ত, হৃদয়, ভক্তি, এমন কি বাগ্মিতাকে দিয়েও ভিন্ন ভিন্ন কর্মে বার্তা বহন করাতে দ্বিধা বোধ করেন নি। অবশ্য দু'চারজন কবির কাব্যে মানুষ-দূতেরাও স্থান পেয়েছেন, যেমন, পান্থ, বিপ্র, গোপী, উদ্ধব।

অতি প্রাচীন কালেই এসব অস্বাভাবিক দৌত্যের অযৌক্তিকতার কথা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের আলংকারিক ভামহ দূতকাব্যের কবিদের কটাক্ষ করে বলেছিলেন—

যারা বাক্যহীন বা অযুক্তবাক্ কিংবা যারা অতিদূরস্থ, তারা যে কি ক'রে দূতের কাজ করে, তা যুক্তি বুদ্ধির অগম্য।

> অবাচোঽযুক্তবাচশ্চ দূরদেশবিচারিণঃ।
> কথং দূত্যং প্রপদ্যেরন্নিতি যুক্ত্যা ন যুজ্যতে॥

ভামহের মত সমালোচকের আক্রমণ আশঙ্কা করেই বোধহয় কালিদাস মেঘদূতে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—

> কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু—
> 'সচেতন কিবা অচেতন কিছু কামাতুর নাহি বাছে'।

লক্ষ্মীদাসও তাঁর শুকসন্দেশে বলেছেন—বিরহাতুর ব্যক্তিরা আপন আপন প্রার্থনা নিয়ে অর্থানর্থবোধরহিত প্রাণীদের কাছে উপস্থিত হয়ে থাকেন।—

> অর্থানর্থোপগমবিগমেষর্থিতা চাতুরাণাম্।

সমালোচনার আশঙ্কাই হয়ত শ্রীহর্ষ তাঁর নৈষধচরিতে প্রণয়দৌত্যে ইতর-প্রাণীর নিয়োগপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। যুক্তি হচ্ছে এই যে, পশু-পক্ষীরা কারো কাছে লজ্জা পায় না, আবার তাদের কাছেও অপর কারোর লজ্জা হয় না।

> জিহ্রেতি যন্নৈব কুতোঽপি তির্যক্ কশ্চিত্তিরশ্চস্ত্রপতে ন তেন।

প্রকৃতপক্ষে ভাববিমূঢ় প্রেমার্ত ব্যক্তি আত্মপ্রবুদ্ধ মুনির মত সর্বত্র জীবচৈতন্য দর্শন করেন। সে অবস্থায় তাঁর কাছে কিছুই চেতনাবিহীন থাকে না।—

> জীবং পশ্যামি সর্বত্র ন চৈতন্যং ন বিদ্যতে।

আমাদের আলোচ্য কাব্যের দূত একটি ষট্‌পদ ভ্রমর। আরও একাধিক কাব্যে ভ্রমরকে দূতরূপে পাওয়া যায়—যেমন ভৃঙ্গদূত, ভ্রমর-সন্দেশ। শ্রীমদ্ভাগবতেও একজন কৃষ্ণসঙ্গমার্থিনী গোপী একটি মধুকর দেখতে পেয়ে তাকে দূত কল্পনা করেছিলেন—

> কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্।
> প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ॥

(১) কাকদূতে একজন কারারুদ্ধ মদ্যপায়ী কাকমুখে সুরার উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠিয়েছিল। বাগ্মণ্ডনগুণদূতে কবি তাঁর বাক্‌শক্তিকে [দূ]ত ক'রে রাজার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। হংসসন্দেশে ভক্তের হৃদয়-[হ]ংস ভক্তিকে দিয়ে শিবের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এরূপ বিচিত্র [দ]ৌত্যের দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি আছে।

* আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

ই ভাগবতকথাই হয়ত পরবর্তী কবিদের ভ্রমরদূত রচনায় প্রেরণা গিয়েছিল।

ভ্রমর-দূতের কবি রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি প্রায় তিন শ পঞ্চাশ বৎসর র্বে এক প্রদীপ্ত পাণ্ডিত্যের বিশাল পরিবেশের মধ্যে বাংলাদেশে ন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ, পিতা, সহোদর সকলেই ছিলেন শ-বিশ্রুত পণ্ডিত। পিতা কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের বিদ্যার খ্যাতি সমগ্র রতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দিল্লীর মুঘল রাজসভায় স্বীকৃতি লাভ রেছিল। কবি স্বয়ং ব্যাকরণ, কাব্য আর ন্যায়শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করে ন্মান পেয়েছিলেন। রসভাবসমৃদ্ধ ভ্রমরদূত কাব্য তাঁর কবিপ্রতিভার শিষ্ট নিদর্শন। তিনি মন্থরগম্ভীর মন্দাক্রান্তা ছন্দে এক শ পঁচিশটি াকে এই লঘু কাব্য গ্রন্থন করেছেন। অন্যান্য দূতকাব্যের কবিদের 5 ভ্রমরদূতের কবিও মেঘদূতের সর্বাতিশায়ী প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে রেন নি। তাঁর গ্রন্থে স্থানে স্থানে কালিদাসের রচনার ছাপ সুস্পষ্ট। ন্তু তা সত্ত্বেও ভ্রমরদূতে রুদ্র কবির কবি-সামর্থ্যের পরিচয় নগণ্য । তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। তিনি একই লেখনীর াহায্যে দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রের জটিল বিচারের নিষ্পত্তি করেছেন, বার সুমধুর ছন্দে প্রসন্নললিত পদ্যবন্ধের সৃষ্টি করেছেন। এ শক্তি াভ নয়।

ভ্রমরদূতকাব্যে বিরহী রামচন্দ্র তাঁর বন্দিনী প্রিয়ার কাছে বিচ্ছেদ-ায়ার আকুল আকুতি পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য একটি ভ্রমরের শরণাপন্ন য়েছেন। ভ্রমরের গন্তব্যস্থান লঙ্কা-নগরীর অশোক-বন। মাল্যবান্ ত থেকে লঙ্কাপুরের যাত্রাপথে যে সব নদী পর্বত মঠ মন্দির জনপদ য় পড়ে, রামচন্দ্র তাদের বর্ণনা করেছেন। মেঘদূতের অনুকরণে ন্ত দূতকাব্যের কবিরাই দেশ-নগর-গ্রাম-গিরি-নদী-কান্তারের বিবরণ য় থাকেন এবং বর্ণনার প্রলোভনে অনেক সময়ে গন্তব্য পথের সীমা ক্রম করে ফেলেন। ভ্রমরদূতেও সেরূপ দৃষ্টান্ত আছে। তবুও ালী ন্যায়বাচস্পতি সুদূরবর্তী কর্ণাট, কাঞ্চী, রেবা, কাবেরীর যে র পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর ভৌগোলিক প্রজ্ঞার বেশ প্রমাণ য়া যায়।

কবি ভ্রমরদূতের প্রারম্ভশ্লোকে দেখিয়েছেন—পত্নীর সন্ধানে চতুর্দিকে প্রেরণের পর সীতাবিয়োগবিধুর ক্ষীণতনু রামচন্দ্র অঞ্জনা-নন্দনের াবর্তন প্রতীক্ষায় মাল্যবান্ গিরির গুহাগর্ভে অতিকষ্টে সাশ্রুনেত্রে র্ঘ দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছেন।—

> রামঃ সীতাবিরহবিধুরো মাল্যবৎকন্দরায়াং
> পাণ্ডুক্ষামচ্ছবিরবিরতং বাষ্পসক্তেক্ষণান্তঃ।
> প্রত্যাবৃত্তিং মনসি বিমৃশন্নাঞ্জনেয়স্য নিত্যে
> দীর্ঘোৎকম্পঃ কথমপি তদা দীর্ঘদীর্ঘাণ্যহানি॥

একদিন পবননন্দন সীতাদেবীর বার্তা নিয়ে সেখানে উপস্থিত ন। বাষ্পাকুল নেত্রে সীতা-কথা শ্রবণের পর রামচন্দ্র সেদিন ও বেশি বিমনা হয়ে উঠলেন। সহসা তাঁর চোখে পড়ল শৈলোপান্ত সরোবরে এক নব কমলিনী। কমললতাটি পরিমলভরে দিগন্ত আমোদিত করছিল, আর তাকে উপভোগ করছিল নির্ভরপ্রেমমগ্ন এক জোড়া শ্যামল ভ্রমর-ভ্রমরী। রামচন্দ্রের বৈধুর্য দুঃসহ হয়ে উঠল। তিনি ভ্রমরকে সম্বোধন ক'রে বললেন—

ভ্রমরবন্ধু, তুমি কি মালতীমধু আস্বাদন করেছ, কুসুমিত কদম্বের সেবা করেছ? তুমি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়ায় যূথিকাকুঞ্জে নিভৃতে কাল কাটিয়েছ ত?

> কচ্চিদ্ ভ্রাতর্ভ্রমর ভবতা লীলিতো মালতীনাং
> সীধুঃ কচ্চিৎ কুসুমিতশিখাঃ সেবিতা বা কদম্বাঃ।
> নীতাঃ কচ্চিৎ কথমপি সখে বাসরা বারিবাহ-
> ব্যূহচ্ছন্নে নভসি নিভৃতং যূথিকাবীথিকাসু॥

শ্লোকটি ব্যঞ্জনার চাতুর্যে আর অনুপ্রাসের মাধুর্যে উৎকৃষ্ট কাব্যের পর্যায়ে পড়ে।

সুমিষ্ট সম্ভাষণের পর রাম ভ্রমরকে আরও প্রশ্ন করিলেন—

ভাই, তুমি প্রবল বাত্যার তাড়নায় কখনো যূথিকাক্রোড় থেকে বিচ্যুত হও নি ত? বিধির বিড়ম্বনায় কেতকের সংসর্গে পড়ে তোমার মর্মগ্রন্থি কণ্টকে বিদ্ধ হয় নি ত, কিংবা বাতাক্ষিপ্ত ধূলিজালে সহসা তোমার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় নি ত?

> মর্মগ্রন্থিঃ স্ফুটতি বহুশো যেষু বঃ কণ্টকাগ্রৈ-
> র্ধূলীজালৈঃ সপদি চ দৃশোরায়ুরন্তং প্রয়াতি।
> কচ্চিৎ প্রৌঢ়ানিলপরিচয়াদ্বিচ্যুতো যূথিকায়াঃ
> সংসর্গোঽভূর্ন বত বিধিনা তেষু কিং কেতকেষু॥

এ ভাবে সমবেদনা জানিয়ে রামচন্দ্র ভ্রমরের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন—

মধুব্রত, তুমি চেনো, আমি বীরবিজয়ী দশরথের গৃহে রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করেছি। আজ ভাই দৈবদোষে এমন এক ব্যসন উপস্থিত হয়েছে, যাতে আমার অভিজাত-কুলের কথা লোকের বিশ্বাস হয় না। মধুকর, আমি আজ দৈব-পীড়িত। আমার পরিচয় কথাই বা আর কি আছে? বৃথাই আমি জায়াশঙ্কিত বাহুদ্বয় ধারণ করছি। ভাই, আমি প্রাণাধিক প্রিয়তমার রক্ষায় অক্ষম হ'য়ে রঘুবংশের পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক লেপন করেছি।

> মাং জানীয়া রণমদজুষাং ভূপতীনাং বিজেতু-
> র্জাতং পুষ্পন্ধয় দশরথাদন্বয়ে রঘূণাম্।
> ভ্রাতঃ কিঞ্চিদ্ ব্যসনমুদভূত্তস্য মে দৈবদোষাৎ
> সন্তানেঽস্মিন্ জনিমপি জনো যেন নৈব প্রতীয়াৎ॥

> অস্তৎ কিংবা পরিচয়কথাস্তস্য দৈবার্দিতস্য
> জায়াত্রাতৌ মধুকর মুধা সন্দধানস্য বাহূ।

যেন প্রাণাধিকমিত্রবধূসন্তাপজিদেন
প্রান্তর্ন্যস্তো রঘুকুলশরৎপূর্ণচন্দ্রে কলঙ্কঃ ।

এর পর রামচন্দ্র প্রকৃত বক্তব্যের অবতারণা ক'রে বললেন—

ভদ্র, আমি দয়িতার দীর্ঘবিরহে কাতর হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আমায় বিমুখ করো না বন্ধু। আমার এই দুঃখে তুমি আত্মসুখ উপেক্ষা করো। বন্ধুত্বের অনুরোধে কিছুকাল কান্তাকে ছেড়ে থেকো ভাই। তোমার পরমানুরাগিণী সহচরীর কাছে বিদায় নিয়ে কয়েকটা রাত্রি কোনরকমে কাটিয়ে দিতে অনুরোধ করো। প্রণয়মধুর সম্ভাষণে তাঁকে আশ্বস্ত করে নিও, কারণ অনুরাগী পুরুষ কখনো প্রিয়ার অনভিমতে চলতে পারে না।

তত্মাং যাচে কিমপি দয়িতাদীর্ঘবিশ্লেষদীনো
মা বৈমুখ্যং কথমপি কৃথাঃ সাধুবন্ধো তদস্মিন্ ।
নীচৈঃ কুর্বন্ সুভগ সুজতো বন্ধুহেতোর্নিজাহন্
মৎকারণ্যাৎ কমপি সময়ং যাপয়েবীতজানিঃ ॥

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সহচরীং তাঁদ্গতপ্রৌঢ়রাগা-
মাগামিস্তঃ কথমপি নিশা যাপনীয়াত্বয়েতি ।
এনামিত্থং প্রণয়মধুরৈর্বোধয়েস্ত্বং বচোভিঃ
প্রায়ঃ প্রাণাধিকযুবতয়ো ন স্বতন্ত্রা যুবানঃ ॥

গন্তব্য পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাম ভ্রমরকে বললেন—

ভাই ভ্রমর, তুমি গমনপথে নয়নাভিরাম দেশ সকল দেখতে দেখতে যাবে। তোমার কোন অস্বচ্ছন্দ বোধ হবে না। সে সব দেশ যাদের একবারও দৃষ্টিগোচর হয় নি, বিধাতা বৃথাই তাদের চোখ দিয়েছেন।

সমুদ্রের অপরপারে লঙ্কাপুরীর পরিচয় দিয়ে রামচন্দ্র ভ্রমরকে বললেন—তুমি যখন অশোকবনে উপস্থিত হবে, তখন বিরহক্লিষ্টা দেবীর বাষ্পাকুল মুখখানি দেখে তোমার মনে হবে যেন হিমাচ্ছন্ন চন্দ্রবিম্ব দেখছ। সেখানে তরুশাখার আশ্রয় নিয়ে তুমি ধীরে ধীরে আমার কথা আরম্ভ করবে। তুমি সীতাদেবীকে বলবে—

সুতনু, তুমি যাকে একদিন আপন হাতে দূর্বাকাণ্ড দিয়ে পুষ্ট করেছিলে, যার চোখে তোমার নেত্রসৌন্দর্যের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে, সেই মৃগ-শাবক আজ দর্ভাঙ্কুর গ্রহণেও নিস্পৃহ। এখন সে কুঞ্জগর্ভে কেবলই তোমার পদচিহ্নের উপর লুণ্ঠিত হচ্ছে।

তুমি সীতাকে আরও বলবে—

দেবি, তোমার চিরসহচর রামচন্দ্র আজ বড় ক্ষীণ, বড় দুর্বল। কিন্তু তবু তিনি দুর্মর—তাঁর মৃত্যু হচ্ছে না। তিনি দিবারাত্র তোমার বিকম্পিত ভ্রূলতার সৌন্দর্য ধ্যান করছেন, অরণ্যবাসে তোমার বচনমাধুরীর কথা নিরন্তর স্মরণ করছেন, আর সমস্ত গরিমা বিসর্জন দিয়ে জানকী জানকী রবে কুঞ্জে কুঞ্জে বিলাপ করে বেড়াচ্ছেন।

দূর্বাকাণ্ডৈর্নিজকরতলেনৈব যঃ পালিতোঽভূদ্
যস্তে ভূয়ঃ সুতনু বদনে লোচনাভ্যাং মিমীতে।
সোঽয়ং দর্ভাঙ্কুরকবলনে নিস্পৃহো রঙ্কুশাব-
স্তৎপাদাঙ্কে বিলুঠতিতরাং কেবলং কুঞ্জগর্ভে ॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মুহুরনিভৃতভ্রূলতাবিভ্রমং তে
স্মারং স্মারং গৃহিণি গহনে ত্বৎকথাকৌশলানি ।
কুঞ্জে কুঞ্জে গলিতগরিমা জানকী জানকীতি
কামক্লান্তস্তব সহচরো দুর্মরো রোরবীতি ॥

কাব্যের অন্তিম দুটি কবিতায় রামচন্দ্র সীতার উদ্দেশ্যে রাবণবধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর ভ্রমরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন।

ভ্রমরদূত গৌড়ীয় কবির রচনা। কিন্তু এতে গৌড়ী রীতির দৃঢ়বন্ধতার সঙ্গে বৈদর্ভী রীতির প্রসাদ গুণ পরিপূর্ণভাবে বর্তমান। যে যুগে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রায় সর্বত্রই কৃত্রিম আড়ম্বরবাহুল্যের গ্লানি দেখা দিয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে নীরস তর্কবিদ্যার উপাসক রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি বাংলাদেশে একখানি সরল সরস কাব্য রচনা করেছিলেন—এ আমাদের গৌরবের কথা।

রামমোহন

শ্রীনীলরতন দাশ

যুগসঞ্চিত কালরাত্রির গভীর অন্ধকারে
মিথ্যা, ভীতি ও মৃত্যুর দূত বিরাজিত চারিধারে।
মোহাচ্ছন্ন জাতির জীবন মহা দুর্যোগময়,—
প্রেতভূমি সেই বঙ্গে তখন তোমার অভ্যুদয়!
তমোময় যুগে দেশ জুড়ে যবে আলোকের রেখা নাহি,—
হে জ্যোতির্ময়! তুমি সে সময় আলোর বার্তাবাহী।
ভগীরথ সম আনিলে বঙ্গে আলোর গঙ্গাধারা;—
অবগাহি' সেই পুণ্য সলিলে সকলে আত্মহারা!

প্রাচ্যপ্রতীচী—সেতু বন্ধনে, হে রাম যুগাবতার!
বন্দিনী লোক-বুদ্ধি সীতা'রে করেছিলে উদ্ধার।
মৃতের মুলুকে অমৃতলোকের তুমি দিলে সন্ধান—
মরণোন্মুখ জাতির জীবনে ফিরায়ে আনিলে প্রাণ।
স্বদেশের প্রতি, স্বজাতির প্রতি তব সুগভীর প্রেম—
লাঞ্ছনা-গ্লানি-নিন্দা-অনলে দগ্ধ যেন সে হেম!
স্মরি' তব ব্রত, সাধনা ও বাণী, হে রাজা রাজ্যহীন!
হৃদয়-রাজ্যে তোমার আসন পাতিয়েছে চিরদিন।

রামায়ণী-কথা

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরণ্যবাসের প্রথম পর্ব। চিত্রকূটে ফেনহাসিনী মন্দাকিনীর অবিদূরে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে বাস করছেন রাম-সীতা-লক্ষ্মণ। গভীর অরণ্যের উপকণ্ঠে চিত্রকূট। হংসসারসসেবিত মন্দাকিনীর রম্য পুলিনে শ্রীরামচন্দ্র বললেন, দেবী, বনবাস আমাদের পক্ষে শুভকর—পিতাকে অসত্য হতে রক্ষা করেছি, ভরতের প্রিয়সাধন করেছি। রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ মনে আর কোন ব্যথা জাগায় না। শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত মন্দাকিনীর পুণ্য জলে অবগাহন করলেন, পদ্ম তুলে সীতার করপদ্মে দিয়ে বললেন, দেবী, এই নদীর স্নিগ্ধ সম্ভাষণ তোমার সখীগণের তুল্য, মন্দাকিনীকে তুমি সরযূ বলে মনে কর। অযোধ্যায় এর চেয়ে বেশী সুখে ছিলাম বলে আর আমার মনে হয় না।

দর্শনাচ্চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ সর্বশঃ।
অধিকং পুরবাসে ন মন্যে তব দর্শনাৎ॥

অযোধ্যা—১০৪।১২

কবির অমল তুলিকাস্পর্শে অমর হয়ে আছে চিত্রকূটে রামসীতার দাম্পত্যজীবনের অনবদ্য আলেখ্য—তাঁদের শৈলবিহার ও মন্দাকিনী দর্শন। এ-চিত্রগুলি এখানে না থাকলে সীতা-বিরহ যে কত তীব্র তা আমরা অনুভব করতে পারতাম না, বিবাহের অব্যবহিত পরে আদিকাণ্ডে বর্ণিত হ'লে তা এতদিনে মন হ'তে মুছে যেত। অযোধ্যায় প্রণয়িযুগলের কোন মধুর ছবি কবি ইচ্ছা করেই দেখান নি।

চিত্রকূটে তাঁদের দাম্পত্যজীবন ক্রমশঃ মধুর হতে মধুরতর হচ্ছে। বনান্তলীন পর্বতের শ্যামায়মান সানুদেশে পুষ্পিত বৃক্ষমধ্যে বন্য কোকিলের রব শুনে সুধাহাসিনী সীতা বিস্মিত, অবাক হয়ে দেখছেন বনলক্ষ্মীর শ্যাম-শোভা। তাঁদের সামনেই একটি কুসুমিত বনলতা এক বনস্পতিকে আচ্ছন্ন করে জড়িয়ে উঠেছে, তা দেখে শ্রীরামচন্দ্র বললেন, দেবী, দেখ কি সুন্দর, শ্রমার্ত হয়ে তুমি যেমন আমাকে আশ্রয় কর, এ-লতাটিও তেমনি করে উঠেছে।

এষা কুসুমিতং বৃক্ষং পুষ্পভারানতা লতা।
দৃশ্যতে মামিবাত্যর্থং শ্রমাদ্দেবী ত্বমাশ্রিতা॥ ১০৫।১৬

প্রকৃতি-প্রিয়া সীতা মুগ্ধ হয়ে বনশোভা দেখছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন মনঃশিলার উপর জলসিক্ত আঙুল ঘষে দেবীর ললাটে তিলক এঁকে দিলেন।

স নিঘৃষ্যাঙ্গুলিং রামো ধৌতে মনঃশিলাশিরৌ।
চকার তিলকং পত্ন্যা ললাটে রুচিরং তদা॥ ১০৫।১৭

কবি লিখলেন, সীতা যেন জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, তিলক যেন চন্দ্রলেখা। এমন সময় এক বানরযূথপতিকে তাঁদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে ভীতি-বিহ্বলা বামোরু সীতা রামচন্দ্রের বক্ষে মুখ লুকালেন। ললাটের সদ্য-রচিত তিলক রামের বিশাল বক্ষে সংক্রমিত দেখে জনকনন্দিনীর বিম্বাধরে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

মনঃশিলায়াস্তিলকং সীতায়াঃ সোহথ বক্ষসি।
সমদৃশ্যত সংক্রান্তো রামস্য বিপুলোরসঃ॥
প্রজহাস ততঃ সীতা গতে বানরযূথপে। ১০৫।২৫

তারপর সেই 'নীল-লোহিত' প্রণয়িযুগল (নবজলধরশ্যাম রাম ও হেমগৌরাঙ্গী সীতা) অদূরের পুষ্পিত 'শোক-নাশন' অশোক-কাননে প্রবেশ করলেন, যেন কৈলাস ভ্রমণরত হর-পার্বতী।

চিত্রকূটে আর একদিন। বনাশ্রমে সীতা গৃহবধূ। 'সুবর্ণচ্ছবি' লক্ষ্মণ কৃষ্ণ মৃগ শীকার করে এনেছেন। আহৃত মধু ও মাংসে স্বামী ও দেবরকে তৃপ্তি করে ভোজন করিয়ে সীতা প্রাণধারণের উপযোগী সামান্য কিছু গ্রহণ করলেন—বিধিবজ্জানকী পশ্চাচ্চক্রে সা প্রাণধারণম্। ১০৫।৩৮

আহারান্তে সীতা অবশিষ্ট খণ্ডীকৃত মাংস শুষ্ক করবার জন্য রোদে দিচ্ছেন, এমন সময় মাংসের লোভে এক কামাচারী বায়স সেখানে বসল। বারণ অগ্রাহ্য করে ধূর্ত বিহঙ্গ দেবীকে নখ ও চঞ্চু দিয়ে আঘাত করল। এ-ভাবে কাক সীতাকে জ্বালাতন করছে দেখেও অদূরে বসে শ্রীরামচন্দ্র হাসলেন।

কাকেনালোভ্যমানাং তাং রামোহথাহসদাতুরাম্।
সা চুকোপানবদ্যাঙ্গী ভর্তুঃ প্রণয়দর্পিতা॥ ১০৫।৪১

রোষারুণনয়না অনিন্দিতা সীতাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র ঐষিক অস্ত্রে দুষ্ট বায়সের একটি চক্ষু নষ্ট করে দিলেন। চক্ষুহীন কাককে দেখে করুণাময়ীর হৃদয় ব্যথায় ভরে গেল—বৈদেহী বিস্মিতা তত্র কাকস্য নয়নে হৃতে। ১০৫।৫৭

সহসা শোনা গেল মহাসাগরের ভীমগর্জ্জন। গজবাজিরথসমাকুল মহাসৈন্যের তুমুল আরবে দাম্পত্যজীবনের পূতমধুর লীলাভিনয় ডুবে গেল।

অথ সৈনস্য মহতো গজবাজিরথোদ্ধতম্।
শুশ্রাব তুমুলং শব্দং সাগরস্যেব বর্দ্ধতঃ॥ ১০৬।৫৯

সন্ত্রস্ত পাখীরা বৃক্ষাশ্রয় ত্যাগ করে আকাশে উড়ে গেল, স্বচ্ছন্দচারী মৃগগণ যূথভ্রষ্ট হয়ে বন মধ্যে প্রবেশ করল, বানররা গুহা মধ্যে আশ্রয় নিল, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ শালবৃক্ষে উঠে আর্তনাদ করলেন:—

রতিং সংশময় ভার্য্য সীতা নিবিশতাং গুহাম্।
কুরু সজ্যে চ ধনুষী কবচং ধারয়স্ব চ॥ ১০৬।১১

আর্য, আমোদ বন্ধ করুন, দেবীকে গৃহাভ্যন্তরে যেতে বলুন, আপনি শরাসনে সজ্জিত হ'ন।

ক্রোধমূর্চ্ছিত লক্ষ্মণ বৃক্ষচূড় আবার গর্জন করলেন—আর্য, ইক্ষ্বাকুবংশের কোবিদারধ্বজবিশিষ্ট রথ এদিকে অগ্রসর হচ্ছে। কৈকেয়ী পুত্র রাজ্যকামুক ভরত আমাদের বধ করে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগের অভিলাষী। চিত্রকূটের বনভূম আজ রাজ-রক্তে কলঙ্কিত হবে। রাজ্যাভিলাষিণী কৈকেয়ী দেখবে লক্ষ্মণ তার প্রিয় পুত্রকে বধ করেছে।

শান্তির আধার শ্রীরামচন্দ্র বললেন—লক্ষ্মণ, ভাই, তুমি নেমে এস। ভরত তোমার কি অনিষ্ট করেছে যার জন্য তুমি আজ তাকে হত্যা করবে। দুরন্ত বিপদে কি কখনও পুত্র পিতাকে, ভাই ভাইকে বধ করতে পারে?

কথং নু পুত্রঃ পিতরং হন্যাৎ কস্যাঞ্চিদাপদী।
ভ্রাতা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রিয়মাত্মনঃ॥ ১০৭।৩

আর্ত হয়ে ভরত আমাদের দেখতে আসছে, তার সুখলালিতা ভ্রাতৃজায়াকে গৃহে নিয়ে যাবার জন্য আসছে। ভরতের প্রতি তুমি যে দুরুক্তি করলে তা আমাকেই বলা হয়েছে। রাজ্যলাভের বাসনা যদি তোমার হয়ে থাকে তবে আমি ভরতকে বলব, কোশলরাজ্য তোমাকে দিতে। সে অবশ্যই আমার আদেশ পালন করবে।

যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমা বাচঃ প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥ ১০৭।৭

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে লক্ষ্মণ লজ্জায় মরমে মরে গেলেন।

হায় ভরত! সন্দেহ চক্ষুর বিষবাণে জর্জরিত তোমার দেহ মন। সন্দেহ করেছেন পিতা দশরথ, মাতা কৌশল্যা, 'গহনগোচর' গুহ, ব্রহ্মবিত্তম ভরদ্বাজ ও সর্বত্যাগী লক্ষ্মণ। আকাশের মত নির্মল ভরতের বিষাদময় জীবনে একি বিড়ম্বনা!

দীন ভরত রামান্বেষণে যাচ্ছেন। শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদরাজ গুহ বললেন—

কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে॥ ৯২।১৬

অক্লিষ্টকর্মা রামের প্রতি কোন দুষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে যাচ্ছ না তো? তোমার এই বিপুল বাহিনী দেখে আমার শঙ্কা হচ্ছে।

উত্তর দিলেন ভরত, তোমার শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়, রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য। তাঁকে ফিরিয়ে এনে অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করব। ভরতের আশ্বাস বচনে আনন্দিত হয়ে গুহ বললেন, ধন্য তুমি ভরত, বিনা চেষ্টায় যে রাজ্য হস্তগত হ'ল, তা তুমি অনায়াসে ত্যাগ করলে, জগতে এর তুলনা নেই।

ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি॥ ৯২।২১

তার পর ভরতের প্রশ্নের উত্তরে গুহ বললেন, ইঙ্গুদীবৃক্ষমূলে তৃণশয্যায় রাম রাত্রিযাপন করেছিলেন, ফলমূল কিছু গ্রহণ করেন নি, মাত্র গঙ্গাজল পান করে উপবাসী রইলেন।

সেই তৃণশয্যা দেখে ভরতের নয়ন বাষ্পাচ্ছন্ন হ'ল। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের তৃণশয্যা! একি স্বপ্ন! তৃণশয়নে রাম পার্শ্বপরিবর্তন করেছিলেন, এই তো দেখছি তৃণদল এখনও বিমর্দিত। ভ্রাতৃজায়ার অলঙ্কার হতে স্খলিত স্বর্ণরেণু-কনকবিন্দবঃ তাঁর কৌশেয় বাসের ছিন্ন সূত্র ঐ তো এখনও তৃণ-লগ্ন। আজ হ'তে আমিও জটা চীরাজিন ধারণ করব, ফলমূলাহারী হয়ে ভূতলে শয়ন করব।

অদ্য প্রভৃতি ভূমৌ হি স্বপস্যামি কুশসংস্তরে।
ফলমূলাশনো নিত্যং জটাচীরাজিনাম্বরঃ॥ ৯৬।২৪

প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রমে ভরত। আবার সন্দেহ দৃষ্টি। ঋষি বললেন, ভরত, তুমি কি রাজ্যলোভে সেই নিষ্পাপ রামের প্রতি স্নেহহীন হয়ে কোন পাপ কার্য করতে এখানে এসেছ? মন খুলে সব কথা বল, আমার ভাল মনে হচ্ছে না—ন হি শুধ্যতি মে মনঃ। বিবর্ণ মুখে ভরত বললেন—ভগবান, আপনিও যদি আমাকে এমন মনে করেন, তবে আমার মরণই ভাল। প্রসন্ন করে শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ফিরিয়ে আনব। দশরথের অবর্তমানে তিনি আমার পিতা, আমি তাঁর দাস। এখন বলুন, কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাব।

চিত্রকূট অভিমুখে ভরত। ভক্ত কবি তুলসীদাস লিখলেন, অনুরাগভরে 'রামসীতা' 'সীতারাম' কীর্তন করতে করতে চলেন ভরত।

নহিঁ পদত্রান্ সীস নহিঁ ছায়া।
প্রেমু নেমু ব্রতু ধরমু আমায়া॥

পায়ে জুতা নেই, মাথায় ছাতা নেই, অকপটে প্রেম, নিয়ম, ব্রত ও ধর্ম আচরণ করতে করতে চলেছেন।

ভরতের আর সে লাবণ্য নেই, মস্তকে জটাভার, দেহে চীরবাস। আশ্রম পীড়ার আশঙ্কায় চিত্রকূটের অনতিদূরে চতুরঙ্গ বাহিনী স্থাপন করে পদব্রজে অগ্রসর হলেন। পর্ণকুটিরে জটাবল্কলধারী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে ভরতের শোকাবেগ উদ্বেলিত হল। স্বেদবিজড়িত দেহে বিষাদিত ভরত, শ্রীরামচন্দ্রের পাদমূলে লুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'আর্য!'

দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ।
উক্ত্বার্যেতি সকৃদ্দীনঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন॥ ১০৮।৩৬

ভরতের হৃদয়াবেগ মাত্র 'আর্য' শব্দে পর্যবসিত হ'ল। এখানে কবি ভরতের মুখে আর কোন শব্দ যোজনা করেন নি। পদতলে পতিত ভরতকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন, বৎস, অযোধ্যার অধীশ্বর হয়ে তোমার এ-বেশ কেন? পিতাকে একা ফেলে এ-ভাবে কেন এলে?

চিত্রকূটে রাম-ভরত-মিলন রামায়ণের এক অপূর্ব চিত্র। অনেক কথা, বহু তর্ক-বিতর্ক হ'ল। দুই ভ্রাতার মিলন দেখে, তাঁদের কথাবার্তা শুনে সমবেত ঋষিবৃন্দ বিস্মিত হলেন। ভরতের সকল অনুনয়, কাতর নিবেদন, শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হ'ল। বশিষ্ঠের অনুরোধ জাবালির হেতুবাদও নিষ্ফল হ'ল। বশিষ্ঠ বলেছিলেন, বৎস রাম, ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠই রাজা হয়ে থাকেন, তুমি এই কুলধর্ম নষ্ট করো না। সংসারে মানুষের তিনজন গুরু—পিতা, মাতা, আচার্য। এঁদের মধ্যে আচার্যই শ্রেষ্ঠ, কারণ পিতা-মাতা দেন স্থূল দেহ, গুরু দেন জ্ঞান দেহ। আমার কথা শোন রাম।

পিতা হ্যেনং জনয়তি মাতা সংবর্দ্ধয়ত্যপি
প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে॥ ১২০।৩

জাবালিকে তিরস্কার করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন, সত্যই সকল ধর্মের মূল, সত্যই ঈশ্বর, দান যজ্ঞ-তপস্যার প্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। সত্যরক্ষাই ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধন। ধর্মই বিশ্বসংসারকে ধারণ করে আছে। রাজা দশরথ সত্যরক্ষার জন্য প্রিয়তম পুত্রকে বনবাস দিয়ে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন তথাপি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সত্যভ্রষ্ট হন নি। বনবাস করব বলে পিতার নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞা করেছি, তা লঙ্ঘন করে কেমন করে আমি ভরতের বাক্য রক্ষা করব ?

কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ।
ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিত্বা গুরোর্বচঃ॥১১৮।২৪

রাম বললেন, ভরত, শোক ত্যাগ করে অযোধ্যায় ফিরে যাও, পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট কর্তব্য পালন কর, আমার প্রীতির নিমিত্ত পিতাকে ঋণমুক্ত কর।

ত্বং রাজা ভবাশু নাগরাণাং
বন্যানামহমপি রাজরাজো মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সংপ্রহৃষ্টঃ
শান্তাত্মা ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষে॥১১৫।১৭

ভরত, অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে মানুষের রাজা হও, আর আমি বন্যমৃগদের রাজাধিরাজ হই। তুমি প্রফুল্ল মনে রম্য পুরী অযোধ্যায় যাও, আমিও প্রশান্ত হৃদয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি।

ততো মুনিগণাঃ সর্বে দশগ্রীববধৈষিণঃ—

তারপর উপস্থিত মুনিগণ দশানন রাবণের নিধন কামনা করে বললেন, ভরত, রামের কথা তোমার শোনা উচিত, রাম পিতৃঋণ হতে মুক্ত হ'ন, এই আমাদের ইচ্ছা।

শ্রীরামচন্দ্র এখন অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করতে পারেন না, সামনে তাঁর বিরাট কর্তব্য—দক্ষিণ ভারতে আর্য-সভ্যতা বিস্তার, বৈদিক ধর্ম স্থাপন, সেইজন্যই তো তিনি এসেছেন দক্ষিণভারতের মহাবনে।

শরভঙ্গ ঋষি প্রদত্ত কুশপাদুকা শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে পবিত্র হ'ল। ভরত সেই পাদুকা নিয়ে অযোধ্যার উপকণ্ঠে নন্দীগ্রামে এসে বললেন, এই রাজ্য রাম আমাকে ন্যাস রূপে দিয়েছেন, পাদুকা তাঁর প্রতিনিধি, তিনি ফিরে এলে তাঁর চরণে এই পাদুকা পরিয়ে আমি পাপমুক্ত হ'ব।

পাদুকে ত্বভিষিচ্যাথ নন্দীগ্রামে বসংস্তদা।
ভরতঃ শাসনং সর্বং পাদুকাভ্যাং ন্যবেদয়ৎ॥
এবং কালো ব্যতিক্রামদ্ ভরতস্য মহাত্মনঃ।
যাবদাগমনং তস্য রামস্যাক্লিষ্ট কর্মণঃ॥১২৭॥১৮৯

পাদুকাদ্বয়কে অভিষিক্ত করে ভরত সমস্ত শাসন-বার্তা পাদুকার নিকট নিবেদন করতেন। রামের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করে ভরতের জীবন এইভাবে কাটতে লাগল।

রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে ভরত একদিন বলেছিলেন, জড়-পদার্থ এই অযোধ্যা রাজ্য যেমন শ্রীরামচন্দ্রের বস্তু, চেতন পদার্থ আমিও তেমনি। অচেতন পদার্থের ন্যায় আমিও শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত অধীন। ভরতের রাগমার্গীয় দাস্যভক্তিকে আচার্যগণ বলেছেন, "অচিৎবৎ-পারতন্ত্র্য।"

শ্রীরামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে অভিযান। বিস্তৃত ভৌগলিক পরিধি দণ্ডক বনের—চিত্রকূট হতে পঞ্চবটী (বর্তমান নাসিক)। প্রয়াগ হতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বরাবর বোম্বাই যাবার রেলপথ কল্পনা করুন। জীবন-ব্রতের সফলতা কামনা করে, এক মুনির আশ্রম হতে আর এক মুনির আশ্রমে অগ্রসর হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র—অত্রি, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য। সর্বত্র মুনিগণ একই কথা সমস্বরে বলছেন—রাম, অনার্যের অত্যাচার, রাক্ষসের উৎপীড়ন আর সইতে পারি না, সেজন্য তোমার শরণাগত হয়েছি। মানুষ হয়ে তারা মানুষ খায়, সমাধিমগ্ন ঋষির কর্ণমূলে তুমুল শব্দ করে, যজ্ঞস্থলে ভূমিতে অশুচি দ্রব্য নিক্ষেপ করে, রক্তবর্ষণ করে, নর-অস্থি ফেলে দেয়, তাদের উপদ্রবে সনাতন বৈদিক ধর্ম লুপ্ত হ'ল। রাক্ষস হতে তপস্বীদের মহাভয় উপস্থিত হয়েছে।

রক্ষাংসি পুরুষাদীনি নানারূপাণি রাঘব।
বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে ব্যালাশ্চ রুধিরাশনা॥ অরণ্য—১।১৪

হে রাঘব, নরখাদক হিংস্র রক্তপায়ী নানারূপধারী রাক্ষস এই মহাবনে বাস করে।

রাবণাবরজো রাম খরো নামেহ রাক্ষসঃ।
উদ্বেজয়তি নঃ সর্বাঞ্জনস্থাননিবাসিনঃ॥১।১৭

রাম, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খর জনস্থানবাসী আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
হতানাং রাম রক্ষোভির্বহূনাং বহুধা বনে॥১০।১৭

রাম, রাক্ষসরা কত বিশুদ্ধাত্মা মুনি হত্যা করেছে, এদিকে এসে একবার দেখ তাদের অস্থি-স্তূপ।

ভক্ত কবি তুলসীদাস লিখছেন—

নিশিচর নিকর সকল মুনি খায়ে।
মুনি রঘুনাথ নয়ন জল ছায়ে॥

রাত্রিচরী রাক্ষসরা মুনিদের খেয়েছে শুনে রঘুনাথের নয়ন জলে ভরে গেল।

নিশিচর হীন করউ মহি ভুজ উঠাই পন্ কীন্হ।
সকল মুনিন্হ আশ্রমন্ হি জাই জাই সুখ দীন্হ॥

বিশাল দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে দয়াল রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করে বললেন, পৃথিবী রাক্ষস শূন্য করব, তারপর মুনিদের আশ্রমে গিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন।

আর্ত্তাঃস্ম শরণং রাম ভবন্তং সমুপাগতাঃ।
পরিপালয় নঃ সর্বান্ স্বদাহুবলমাশ্রিতঃ।
ঐশ্বরোঽয়ং পরোভাবঃ শূরস্তং নাম রাঘব॥১০।২০

সঙ্কটত্রাতা রাম, আমরা আর্ত হয়ে তোমার শরণাগত হয়েছি, তুমি নিজ ভুজবলে আমাদের রক্ষা কর। আর্তত্রাণই রাজার ঈশ্বরত্ব।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমি আপনাদের আজ্ঞাধীন, পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে এসেছি, রাক্ষসরা যে উপদ্রব করছে তারও আমি প্রতীকার করব, তাতে আমার বনবাস সার্থক হবে।

ঋষিদের রক্ষার জন্য রামের সর্বত্র রাক্ষস বধের প্রতিশ্রুতি শুনে সীতা ব্যাকুল হয়ে বললেন—আর্যপুত্র, মিথ্যাভাষণ ও পরদার-গমনের মত হিংসাও একটি ব্যসন। কেন তুমি হিংসাব্রত অঙ্গীকার করলে? অস্ত্রের সংসর্গে বুদ্ধি কলুষিত হয়, তুমি অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে ক্ষাত্রধর্মের অনুশীলন করো। এখন যে দেশে আছি সেই তপোবনের ধর্মই আমাদের পালনীয়। সৌম্য, তুমি এই তপোবনে শুদ্ধ স্বভাব হয়ে নিত্য ধর্মাচরণ কর।

কদর্য কলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি॥
নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।

সীতার ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা করে রাম বললেন, দেবী, তুমি অহিংসার অর্থ ঠিক বুঝতে পার নি। দণ্ডকবনের মুনিগণ রাক্ষসের উৎপীড়নে আর্ত হয়েই আমার শরণাপন্ন হয়েছে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয় বীরগণের কর্তব্য, আর্তত্রাণই তাদের ধর্ম। যা বলেছ তাতে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার সহধর্মচারিণী হও।

দক্ষিণ ভারতে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা—শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-ব্রত। যৌবনের প্রারম্ভ হতেই আরম্ভ হয়েছে সে-ব্রত পালন। উত্তর ভারতে বৈদিক ধর্ম বিস্তারে যে-কিছু বিঘ্ন ছিল বিশ্বামিত্রের আহ্বানে তা তিনি দূর করেছেন। এবার দণ্ডকারণ্যের শরণাগত আর্ত ঋষিদের আবেদনে সে-ব্রত উদ্‌যাপিত হবে।

দণ্ডকবনে শ্রীরামচন্দ্র রুদ্ররূপে দেখা দিলেন। রাবণের প্রতিনিধি জনস্থানের রাজ্যপাল খরের সহস্র সহস্র রাক্ষসসেনা নিশ্চিহ্ন হ'ল, খর নিহত হ'ল, জনস্থান হতস্থান হ'ল। মারীচ লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে বললে—

বৃক্ষে বৃক্ষে চ পশ্যামি চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
গৃহীতং ধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকম্॥

বৃক্ষে বৃক্ষে কৃষ্ণাজিন পরিহিত করলে মৃত্যুসদৃশ ধনুপাণি রামকে আমি দেখতে পাই।

যে কুসুম-সুকুমার রামের পরিহিত বল্কলাগ্র দন্তাগ্রে ধারণ করতে মৃগশিশুগণও সঙ্কুচিত হয় না তিনিই আজ বজ্রের মত কঠোর—দুষ্টের দণ্ডদাতা শ্রীরামচন্দ্র। লঙ্কায় রাবণবধে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-ব্রতের পরিসমাপ্তি হ'ল।—

রাম-রাবণের যুদ্ধ রামায়ণের কেন্দ্রস্থ ঘটনা। দক্ষিণ ভারতে আর্য শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তার ও বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাই হ'ল রামায়ণের নিগূঢ় ইতিহাস। যে-সব শরণাগত অনার্য সনাতন ধর্ম স্থাপনে সহায়তা করলেন এবং আর্য বশ্যতা স্বীকার করলেন, শ্রীরাম তাঁদের হাতেই দক্ষিণ ভারতের শাসন—শৃঙ্খলার ভার অর্পণ করে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এ-দেশের মানুষের ধারণা ভগবদপ্রসঙ্গই শ্রোত্রপেয়, ধর্মের কথাই কথা, আর সব তুচ্ছ কথা। নিছক রসাত্মবাক্য বা নির্ভেজাল ইতিহাস এ-দেশের প্রাণে স্পন্দন জাগায় না। তাই কবিগুরু বাল্মীকি ধর্মমূলক কাব্যের আবরণে ইতিহাস আচ্ছন্ন করেছেন। ইতিহাসের ঘটনাকে ধর্ম শিক্ষার বাহকরূপে গ্রহণ করে রসাত্মক বাক্যে রামায়ণ রচিত বলেই এ-গ্রন্থ আজও সমাজের সকল স্তরের সমগ্র নরনারীকে মুগ্ধ করে রেখেছে। নীরস ইতিহাস হ'লে তা কেবল সমাজের উচ্চস্তরে নিবদ্ধ থাকতো, নগরে—প্রান্তরে হাটে—মাঠে—ঘাটে এমন করে বিসর্পিত হ'ত না। কবি সত্যদ্রষ্টা, ক্রান্তদর্শী পুরুষ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের সংবাদ কবি-মানসে প্রতিভাত হয়, ইদানীন্তনের পরে চিরন্তনের ইঙ্গিত দান করি। ধন্য কবিগুরু বাল্মীকি। তাইতো বঙ্গ কবির কলমর্মর—

কে শুনিত রামসীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল।
জগতে ঐশ্বর্য বীর্য সকলি নশ্বর,
কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।

যুগের দাবী
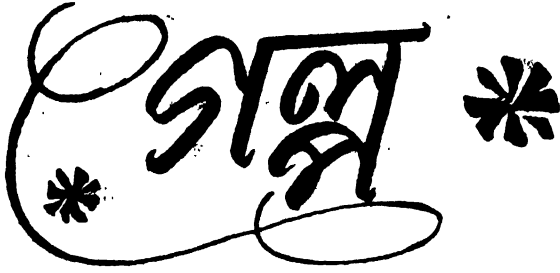
স্নভাষ সমাজদার

বালুরঘাট থেকে পতিরাম পর্য্যন্ত কাঁচামাটির সড়কটা আগে ছিল জেলা বোর্ডের। গোরুর গাড়ীর চাকার অনুগ্রহে একেবারে সহস্র দীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পথ চলতে গেলে লালধুলোর আলিঙ্গনে কোমর পর্য্যন্ত গেরুয়া রঙ হয়ে যেত। এই সড়কটার ডানদিকে উঁচুডাঙ্গার জমি—প্রায়ই পতিত জমি। শরবন, কুলঝোপ আর আকন্দ গাছের ছোট ছোট ঝোপে আকীর্ণ হয়ে আছে বিপুল ব্যাপ্ত মাঠ। আবার কোথাও কোথাও দু'একটা ছোট ছোট পুকুর টলমল করছে পদ্ম ফুলের ঐশ্বর্য্যে। দূরে রাঙামাটির টিলায় টিলায় তাল-বীথির মর্ম্মর। আর বাঁদিকটা আত্রাই নদীর পলিমাটিতে উর্ব্বর ঢালু জমি। সেখানে মটর কলাই আর পটলের ক্ষেত ঘন সবুজের ছবি এঁকে রেখেছে। তারপরেই শীর্ণ আত্রাই নদীর রূপালী স্রোত বয়ে চলেছে ঝির ঝির করে। সহর থেকে অনেক দূরে এই পরিবেশটা যেন শান্ত স্তব্ধতার প্রবাল-বলয় দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে ধূলোর কুয়াশা বুনে চলা দু'একটা গরুর গাড়ী যাতায়াত করে এই পথে, আর যায় দু'একজন সাইকেল-আরোহী।

কিন্তু যুগ বদলে গেছে। আজ মানুষের প্রয়োজন বেড়েছে। চাহিদা বেড়েছে, সভ্যতার দুরমুশ পড়ছে আজ স্নিগ্ধ শ্যামল প্রকৃতির বুকে। বড় বড় রাস্তা তৈরী হচ্ছে, ব্রীজ কনষ্ট্রাকশান হচ্ছে। ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে প্রশান্ত আরণ্য পরিবেশ। তাই লালধুলোয় ভরা বালুর-ঘাট—পতিরামের যে রাস্তাটা ঘুমিয়ে ছিল শিমূল পলাশের ছায়া কুঞ্জের ভেতরে, তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে এল সরকারী জীপ, ইট ঢোলাই করা বড় বড় ট্রাক। এল তাঁবু, বিচিত্র যন্ত্রপাতি, চকচকে শাবল, ঝকঝকে গাঁইতি কোদাল আর কলকাতা থেকে এলেন ইষ্টার্ণ জোনের হেড ওভারশিয়ার বিষ্ণুরাম মিশ্র। হাজার বছরের ঘুম থেকে জেগে উঠল বরিন্দের এই শান্ত শুব্ধ মৃত্তিকা—বৃহত্তম প্রয়োজনের বাস্তবতম পরিবেশের ভেতরে।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী নর্থ বেঙ্গল রোড কনষ্ট্রাকশানের কাজ আরম্ভ হবে এই বালুরঘাট-পতিরাম রাস্তায়। ছাপান্ন মাইল দূরে কালিয়াগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের সঙ্গে এই রাস্তাটা জুড়ে দেওয়া হবে। বালুরঘাট থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্য্যন্ত পাচ বাঁধানো রাস্তাটার নাম হবে ন্যাশানাল হাইওয়ে। জেলার এই অঞ্চলে রেল নেই। সুদূর কলকাতা থেকে দৈনন্দিন জিনিষপত্রের আমদানী-রপ্তানি, জনসাধারণের যাওয়া আসার সমূহ অসুবিধা। তাই গভর্ণমেন্ট 'টপ্ প্রায়োরিটি' দিয়েছেন এই কাজটা। দ্রুতগতিতে কাজ অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। স্থানীয় কুলীরা রাস্তার দুই দিকের আগাছার ঝোপ কেটে পরিষ্কার করছিল। কিন্তু হঠাৎ তারা সবাই এক সঙ্গে কুড়ুল নামিয়ে রাখল। ন্যাকড়া-কালীর পাকুড় গাছে তারা কেউ কোপ বসাতে পারবে না। একেবারে হাত গুটিয়ে বসে রইল তারা।

পাগলীগঞ্জ গ্রাম পার হয়ে ঐ রাস্তার ডান দিকে একটা ঝাকড়া পাকুড় গাছের নীচে ন্যাকড়া কালীর থান। দূর থেকে গাছটার কাণ্ড দেখা যায় না। শুধু অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চারিদিকে বিস্তার করেছে অজস্র ডালপালা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন একটা শিকার-সন্ধানী চিতা গুঁড়ি মেরে বসে আছে। সেই গাছটার ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ময়লা বিবর্ণ ছোট ছোট ন্যাকড়ার খণ্ড ঝুলছে। স্মরণাতীত কাল থেকে এ অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস—এই পাকুড় গাছের নীচে থানে যে কালী আছেন, তিনি জাগ্রত এবং অলৌকিক তাঁর শক্তি। গ্রামের কারো কোন কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি যখন হয়, ডাক্তার কবিরাজ সবাই যখন জবাব দেয়, তখন এই কালীর থানে এসে সেই রোগীর মা কিম্বা বাবা বা কোন অভিভাবক মানত করে হলুদ রঙের

একখণ্ড ন্যাকড়া এই পাকুড় গাছে টাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়। অবিশ্বাস্যভাবে দিন কয়েকের মধ্যে যমের দুয়ার থেকে রোগী ফিরে আসে। হাসি ফুটে ওঠে তার রোগ-পাণ্ডুর শীর্ণ মুখে। এই তো বাহিগার তালুকদার বাড়ীর বড় ছেলে এই তাগড়া জোয়ান চেহারা, কাষ্টগড় থেকে মাছ ধরে ফিরে এসেই এমন জ্বর হলো যে দু'দিন বেহুঁস হয়েছিল। ভুল বকছিল। রক্তের ডেলার মত হয়ে গিয়েছিল তার চোখ দুটো। পূর্ণ তালুকদার সহর থেকে ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তারপর তালুকদার-গিন্নি নিজে এসে ন্যাকড়া-কালীর কাছে ধন্না দিলেন। হলুদ ন্যাকড়া টাঙালেন। ছেলে ভাল হয়ে উঠল। এমনি কত সংখ্যাতীত ঘটনা এ অঞ্চলের মানুষের মনে জ্বল জ্বল করছে। সেই দুর অতীত কাল থেকে বহু দুঃখ, শোক, আনন্দ, বেদনার স্মৃতি নিবিড় মমতার মত জড়িয়ে আছে গাছটার সর্ব্বাঙ্গে।

হরিদাস কণ্ট্রাক্টারের মুখে কুলীদের অবাধ্যতার কথা শুনে ওভারশিয়ার বিষ্ণুরাম মিশ্রের মুখ কালো মেঘের মত থমথমে হয়ে উঠল। নির্ব্বিঘ্নে এতদূর কাজ হয়ে এসে এ কী বাধা? ওদিকে দিল্লী থেকে আরো দ্রুত কাজ করার তাড়া দিয়ে ঘন ঘন আসছে সার্কুলার। এই রাস্তাটার কাজের উপর নির্ভর করছে তার পদোন্নতি,তার সুনাম—সব কিছু। বাঘের মত গর্জ্জে উঠে তিনি হরিদাসকে বললেন, ও সব ন্যাষ্টি 'সুপারষ্টিশানে'র জন্য সরকার বসে থাকতে পারে না। যাও সাইকেলে করে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে ডবল মজুরীর লোভ দেখিয়ে এই বেলাই কুলী নিয়ে এস, আর যে কুলীরা ষ্ট্রাইক করেছে তাদের এই সপ্তাহের মাইনে আটকে রাখ। হাত দুটো পেছনে নিয়ে তাঁবুর বাইরে মাঠে অস্থির পায়ে তিনি পায়চারী করতে লাগলেন। চৈত্রের আগুন-ঝরা রোদে দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে বরিন্দের মাঠ। ওভারশিয়ার বিষ্ণুরাম মিশ্রের মাথার ভেতরে যেন আগুনের ঝড় বইছে।

হরিদাস সাইকেলে আশপাশের প্রায় ত্রিশটা গ্রাম ঘুরল। সাঁওতাল, উরাঁও পল্লীর মোড়লদের কাছে ন্যাকড়া-কালীর কথা বলা মাত্র আঁতকে উঠল তারা। হাত জোড় করে তারা বলল—অমকা কুচ্‌কনা কথা বুলিস না বাবু; ঐ গাছোত হাত দিলি একেবারে নির্ব্বংশ হয়ে যামু; রক্ত উঠবি মাগ ছাওয়ালের মুখ দিয়ে—আবার কেউ বলল, ডবল মজুরী ক্যান একটা গোটা তালুক লেখাপড়া করে দিলেও হামরা কেউ ঐ গাছোত কোপ দিমু না বাবু। ভয় আর আশঙ্কার কালো ছায়া ভেসে উঠল তাদের শীর্ণ মুখে। হতাশ হয়ে গেল হরিদাস। ক্লান্তিতে তার সারা শরীর যেন ভেঙ্গে আসছে। পাগলীগঞ্জে যখন ফিরে এল তখন চারিদিকে থম থম করছে রাত্রি। ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠে ঘনীভূত অন্ধকার খাঁ খাঁ করছে। আত্রাইয়ের ওপারে জ্বলছে আর নিভছে আলেয়ার আলো। হেড ওভারশিয়ার বিষ্ণুরাম মিশ্রের তাঁবুতে জ্বলছে হ্যাজাক্‌। চারিদিকের জমাট অন্ধকারের বুক চিরে সে আলোর রেখা আছড়ে পড়ছে পদ্মপুকুরের পাড়ে। বিষ্ণুরাম একটা বড় টেবিলে কাঠি দিয়ে আঁটা রাস্তার নক্সাটা দেখছেন। হ্যাজাকের আলো তার মুখের ওপর আগুনের জ্বালার মত জ্বলছে। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তার দুটো চোখের দৃষ্টি। তাঁবুর গায়ে দীর্ঘাকৃতি হরিদাসের ছায়া পড়ল। তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন বিষ্ণুরাম মিশ্র। আড়ষ্ট গলায় হরিদাস বলল—স্থানীয় কুলীদের একজনও পাওয়া যাবে না স্যার। ন্যাকড়া-কালীর নাম শোনামাত্র সবাই চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে—গাছ কাটার কথা বলতেই ভয়ে সিটিয়ে যাচ্ছে তারা।

ডবল মজুরীর কথা বলেছিলেন? ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চীৎকার করে বললেন বিষ্ণুরাম—এতদিন ধরে এ অঞ্চলে কণ্ট্রাক্টরী করে করে হাড় পাকিয়ে ফেললেন, আর একটা কুলী যোগাড় করতে পারলেন না। যান, যা পারি আমি করবো। তার ক্ষিপ্ত চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে হরিদাস পিছু হটতে আরম্ভ করল। বাইরের কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার দেহটা।

গভীর হয়ে এল রাত্রি। হুহু করা বাতাসে কলোচ্ছ্বাস উঠেছে পদ্মপুকুরের জলে। থর থর শব্দ হচ্ছে তালগাছের পাতায় পাতায়। অস্বাভাবিক জোরে শব্দ করে আত্রায়ের ওপার থেকে শিয়াল ডেকে উঠল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের নিশান। ঘুম নেই বিষ্ণুরামের চোখে। অসহ্য একটা উদ্বেগ আর অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যাচ্ছে তার শরীর। পুড়ে যাচ্ছে তার মন। এই একদিন যে কাজের ক্ষতি হলো, তার কি এক্সপ্ল্যানেশন তিনি দেবেন? কি বলবেন

তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার ঘনশ্যাম সিংকে? না প্রমোশনের তো কোন আশাই নেই, নির্ঘাত ডিগ্রেড হয়ে যেতে হবে—বাইরের সমস্ত ঝিঁঝিঁগুলো যেন তার মাথার ভেতরে ডাকতে সুরু করেছে। ক্যাম্প ঘাট থেকে নেমে এসে তাঁবুর ভেতরে কালিলেপা অন্ধকারের মধ্যে তিনি ভূতের মত পায়চারী করতে লাগলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে হল, গাছটা তো খুব বড় নয়, কি ক্ষতি হয় যদি নিজের হাতেই গাছটা কাটা যায়। দুই ঘণ্টা কুড়ুল চালালেই তো যথেষ্ট। উৎসাহে, আনন্দে কলধ্বনি বেজে উঠল তার বুকের রক্তে। ভোর হতে তখন আর বেশী দেরী নেই। ফিকে হয়ে আসছে পূবদিকের অন্ধকার। তার তাঁবুর পাশে যে টিন 'সেডে'র নীচে স্তূপাকৃতি করা আছে শাবল গাঁইতি কুড়াল। সেখান থেকে একটা কুড়ুল নিয়ে চারিদিকের ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে কালো ছায়ার মত তিনি এগিয়ে চললেন পাকুড় গাছটার দিকে। নিচ্ছেদ স্তব্ধতায় তলিয়ে আছে চারিদিক। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ঝাপসা কালোর প্রেক্ষাপটে আরো একছোপ নিকষকালোর ইঙ্গিত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাকুড়গাছটা। ওদিকে নজর পড়তেই হঠাৎ চমকে উঠল তার হৃৎপিণ্ড। তার কানের কাছে কে যেন বলে উঠল—এ কি করছো তুমি? চাকরীর মায়ায় এতবড় একটা পাপ করবে? ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার মুখে রক্তের কণা, মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেল তার চেতনা। নিষ্ঠাবান বিহারী ব্রাহ্মণের ছেলে বিষ্ণুরাম। তিন পুরুষ থেকে তাদের পুরোহিতের ব্যবসা। এক লহমায় তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল তার বাবার মুখ, স্ত্রীর মুখ, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মুখ। শেষরাতের সেই ঝাপসা অন্ধকারে শ্মশানের মত নির্জ্জন মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি চোখের সামনে বিভীষিকা দেখতে লাগলেন—এ অঞ্চলের মানুষের দেবতার মত ঐ গাছটাকে তিনি কেটে ফেলেছেন বিধর্মী কালাপাহাড়ের মত। আর সেই পাপের ফলে ফুলের মত তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে; শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছে তার স্ত্রী—হাতের মুঠোয় শিথিল হয়ে গেল কুড়ালটা। ঘাম জমে উঠল চুলের গোড়ায় গোড়ায়। তবুও সাহসে ভর করে আরও দু' একপা এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ চারিদিকের প্রেতায়িত স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা বুকফাটা করুণ বিলাপ ভেসে এল পাকুড়গাছের নীচ থেকে। কে যেন কাতর আবেদন জানাচ্ছে ন্যাকড়াকালীর কাছে—হামার ঐ একমাত্র ছাওয়াল—বংশের বাতি, অক তুমি নিও না ঠাকুর, তোমাক জোড়া পাঁঠা দিমু—সেই দীর্ঘ করুণ ভক্তি গাছের নীচের জমাট অন্ধকারে আবর্ত রচনা করে ভেসে যাচ্ছে দূরে। হিম হয়ে গেল বিষ্ণুরামের বুকের রক্ত। আটকে গেল তার পা দুটো। ভয়ে আতঙ্কে তিনি চীৎকার করে উঠলেন—কে ওখানে? কান্না থেমে গেল। কোনরকমে টলতে টলতে তিনি এগিয়ে এসে দেখলেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে আঠাশ উনত্রিশ বছরের একটি যুবক। ছিবড়ে শুকনো চেহারা। আর ন্যাকড়াকালীর থানের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে এক বুড়ী। বিষ্ণুরামের ভারী জুতোর শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ী। দূর থেকে তাকে পুরুষমানুষ বলে মনে হয়। মাথায় খাড়া খাড়া চুল। বয়সের ভারে তাতে কাশফুলের মত সাদা রঙ ধরেছে। শালিকের ঠোঁটের মত লম্বা টিকালো নাক। মুখের চামড়া জড়িয়ে ঝুলে পড়েছে। শুধু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুটো জলে-ভরা চোখ ঝাপসা-অন্ধকারে চক চক করছে। বিষ্ণুরাম শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন—আচ্ছা তোমাদের প্রার্থনা ন্যাকড়াকালী পূরণ কোরবেন? তোমার ছেলে উনি বাঁচাবেন?

—নিশ্চয়ই বাঁচবি বাবু—উগ্র গলায় ক্যাকারুর মা মোক্ষবুড়ী বলল—মোর বয়স হলো তিনকুড়ি দশ বছর, মোর বাপের আমল থে দ্যাখোছি এ তল্লাটের কত মানতিক এই মাকালী যমের দুয়ার থে ফিরে আনিছে। মোর নাতিক ক্যান মুখ তুলে দেখবি না? কঠিন গলায় বিষ্ণুরাম বললেন—কিন্তু তোমাদের এ গাছ তো গভর্ণমেণ্ট কেটে ফলবে—

—কি? কাটমেন? গাছ? আর দুইদিন বাদে ন্যাকড়া কালীর পূজা, তার আগেই কাটমেন?

—হ্যাঁ।

যেন মুহূর্তে বদলে গেল মোক্ষবুড়ী।

—মা কালীর থানোত যে কাটারী বসাবে তার হাতোত কুড়িকুষ্ঠী হবি, হাতপা-আঙুল খসে যাবি, মুখেতে পোকা পড়বি—মর্মান্তিক আক্রোশে নিদারুণ

অভিশাপ দিয়ে চীৎকার করে উঠল মোক্ষবুড়ী। কান্না-টান্না কোথায় উড়ে গেছে। আগুনের বৃষ্টি ঝরছে তার দুটো চোখে। ভয়ানক উত্তেজনায় দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল তার হাড় জিরজিরে বুকটা। ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে বিষ্ণুরাম তাকিয়ে রইলেন বুড়ীর দিকে। ক্যাকারু মোক্ষ-বুড়ীর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে সরিয়ে নিয়ে বলল—ও বাবু, রাস্তার সাহেব, সরকারী লোক, অমকা বুলিস না মা—ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মোক্ষবুড়ী আকাশফাটা চীৎকার করে বলল—তুই ছাড়ে দে, বুড়া হাড় নিয়ে মুই গাঁয়ে গাঁয়ে যামু—সাতগাঁ একজোট হমু। দেখি, ক্যামন করে অঁই গাছ কাটে—বিষাক্ত গোক্ষুরের দৃষ্টিতে একবার ওভারসিয়ারের দিকে তাকিয়ে ক্যাকারুকে নিয়ে হন হন করে মদনগঞ্জের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল মোক্ষবুড়ী। সত্তর বছরের জীর্ণ প্রাণশক্তিহীন বুড়ীর শরীরে আজ কোথা থেকে যেন একটা অবিশ্বাস্য দৃঢ়তার প্রলেপ লেগেছে। মোক্ষবুড়ীকে এ তল্লাটের সবাই চেনে। মেয়েমানুষ হয়েও অস্বাভাবিক দীর্ঘ তার দেহ। বয়সের ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে এত জোরে হাঁটে যে কোন পুরুষ মানুষ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। এখনও সে নিজে ধান কাটে। নিজেই ধান মাড়াই করে। কেউ কেউ বলে—ও বুড়ী ডাইনী, তুকতাক জানে। সেই মোক্ষ-বুড়ীর মাথায় খুন চেপে গেল। সে নিজের গ্রামে এসে রাজবংশী পাড়ার মোড়ল নটবরকে বলল—তুই কিছু জানিস? ন্যাকড়াকালীর গাছ যে কাটোছে সরকারী লোক—

শিউরে উঠল নটবর। উৎকণ্ঠিত হয়ে সে বলল—পূজার আগেই কাটবি?

হ্যাঁ। চিবিয়ে চিবিয়ে মোক্ষবুড়ী বলল—তুই গাঁয়ে গাঁয়ে ঢোলসহরৎ কর। কাল হাটের দিন আছে। রামকিষ্টপুর হাটখোলায় সাঁজের সময় পঞ্চায়েত ডাক। কলিজার অক্ত দিমু, তবু গাছ কাটবা দিমুনা—উগ্র ক্রোধ তার দুটো চোখে চক চক করে উঠল।

নটবর বোল্লার হাটে ঢোল পিটিয়ে দিল।

বিকাল গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যা নামল। রাত্রির ছায়া পড়ল রামকৃষ্ণপুর হাটখোলার পাশে চক্রবাল বিস্তীর্ণ মাঠে। হাটখোলার নীচে আশপাশের প্রায় বিশটা গ্রামের লোক জড়ো হল। হাটফিরতি মানুষগুলো কাঁধের বাঁহুক বস্তা নামিয়ে রেখে গোল হয়ে বসল। আমগাছের নীচের ডালে একটা কালিপড়া লণ্ঠন ঝুলছে। বাতাসে দোল খাওয়া লণ্ঠনের সেই রক্তাভ শিখাটার ছায়া নাচছে লোকগুলোর মুখে মুখে। শান্ত নির্বিরোধ রাজবংশী এরা। তাদের দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট আর দুঃখ বিধাতার দান বলেই মাথা পেতে নেয়। কিন্তু তাদের সংস্কারকে আঘাত করলে রুখে ওঠে তারা। একটা হিংস্র প্রতিবাদ ধারালো উত্তপ্ত ইস্পাতের মত ঝলকে ওঠে তাদের রক্তে। চারিদিকের জমাট স্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে এল মোক্ষবুড়ীর খনখনে গলার আওয়াজ—এই নাটু, বাংরু, কাঁদন মুখ বুঁজে কি ভাবোছো? চল সবাই একজোট হয়ে কাল হাকিমের কাছে বলা যাক্—সভার একপাশ থেকে একটু লেখাপড়া জানা মাহিষ্য-পাড়ার মাতব্বর বাসুদেব বলল—বুড়ী! মোর মনে হয়, দরখাস্ত করা যাক সরকারের কাছে এই বলে যে ন্যাকড়া-কালীর গাছটা ছাড়ে দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে নিয়ে যাওয়া হোক। যার যার জমির উপর দিয়ে রাস্তাটা যাবি তারা বিনা খেসারতে জমি ছাড়ে দিবি। দরখাস্তের একটা নকল উপরে পাঠে দিমু, আরেকটা নিয়ে পাগলীগঞ্জের রাস্তার সাহেবোক তুমি—

ঘাড় নেড়ে সবাই সায় দিল এই প্রস্তাবে। সমস্ত সভাটাকে শুনিয়ে হেঁকে মোক্ষবুড়ী বলল—এই তোমরা সব কাল খুব বিহানে ঝুকঝুকি আঁধার থাকতে এঠে আসে জমায়েত হমেন—রাস্তার সাহেবের কাছে যাবা হবি—

—নিশ্চয় নিশ্চয়ই আসমু!!! সবাই সমস্বরে বলে উঠল। সভা ভাঙ্গল। ধানকাটা মাঠের উপর তরঙ্গিত হয়ে বয়ে যাওয়া অন্ধকারের মধ্যে আরো কালো ছায়ার মত তারা যে যার গ্রামের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল।

বিষ্ণুরাম সকালে তাঁবুতে বসে হরিদাস কণ্ট্রাক্টারের সঙ্গে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। ওভারসিয়ারের চোখের কোনে কোনে পড়েছে কালির আঁচড়। দৃষ্টি হয়েছে রুক্ষ। চাকুরীতে 'ডিগ্রেড' হওয়ার আশঙ্কাটা সর্ব্বদা তার মাথার উপরে খাঁড়ার মত ঝুলছে। হঠাৎ তিনি

দেখলেন, প্রায় একশো লোকের একটা জনতা তার তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। মোক্ষবুড়ী তার হাতে দরখাস্তটা দিয়ে বলল—পড়ে দ্যাখেন বাবু—কপালটা কুঁচকে পড়লেন বিষ্ণুরাম। পড়া হয়ে গেলে একমুখ হেসে গদগদ হয়ে বললেন—জমি ছেড়ে দিতে তোমরা রাজী আছো? বাঃ এ তো ভাল প্রস্তাব। আমি এখুনি কলকাতায় হেড-কোয়াটারে তার করে দিচ্ছি। তোমরা এখন যাও—কাল খোঁজ নিও—দলের একজন সাবধান করে দিয়ে বলল—পূজার আগে যেন ন্যাকড়াকালীর থানোত আঁচড় না লাগে বাবু—

—না, না, কেউ হাত দেবে না গাছে। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

আশ্বাস দিয়ে বিষ্ণুরাম বললেন।

তিনি তার করলেন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ইষ্টার্ণ জোনের হেড কোয়ার্টার কলকাতায়। উত্তর এল বিকেলে। জানিয়েছেন, চীফ ইঞ্জিনিয়ার ঘনশ্যাম সিং নিজে—রাস্তার ডিরেকসান বদলানো অসম্ভব, নতুন জমির জরিপ করার খরচ অনেক। তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি—টেলিগ্রামটা হাতেনিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই ছ্যাঁত করে উঠল বিষ্ণুরামের বুকের ভেতরটা। পাঞ্জাবী ইঞ্জিনীয়ার ঘনশ্যাম সিংকে ভয় করে না এমন লোক কেউ তাদের ষ্টাফে নেই। তার ক্লান্ত শরীরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। তিনি ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইলেন গোরুর হাড়ে পরিকীর্ণ ধুধু মাঠটার দিকে। একটা সূচীমুখ আশঙ্কায় তার মাথার ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল।

৩রা বৈশাখ রাত্রি বারোটায় অমাবস্যা তিথিতে ন্যাকড়াকালীর পূজা। সেই সকাল থেকে এখানে মেলা বসবে। দলে দলে লোক আসবে। ক্ষেত খামারি আর একটানা অভাবের কফিনে আটকানো তাদের মরার মত জীবনে জাগবে উল্লাসের ঝিকিমিকি। কিন্তু ঠিক তার আগের দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ কলকাতা থেকে এলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার ঘনশ্যাম সিং। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় চেহারা। লম্বায় প্রায় ছয় ফিট। বাঘের মত প্রকাণ্ড মুখখানায় জাঁদরেল একটা মানানসই গোঁফ। আপেলের মত গাল দুটোর পাশ দিয়ে কালো কুচকুচে চাপ-দাড়ি। মাথায় হলদে রঙের রেশমী পাগড়ী। হেক্সগন ফ্রেমের চশমার নীচে জ্বল জ্বল করছে তার চোখদুটো। বিষ্ণুরাম মিশ্র তাঁবুর ভেতরে জপ করতে বসেছিলেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। জীর্ণ গলায় বললেন—স্যার! একেবারে কোন খবর না দিয়েই—

হ্যাঁ, নির্বিঘ্নে কাজ করা আপনার তো গোত্রে নেই—আমি তখুনি জানতাম আমাকে আসতেই হবে—ঠোঁটের কোনায় সিগারেট ঝুলিয়ে চাপা গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বললেন ঘনশ্যাম। প্যান্টের পকেট থেকে স্কচ হুইস্কীর চ্যাপ্টা বোতলটা বের করে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন।

ভয় পাওয়া গরুর মত বড় বড় চোখে তাকিয়ে বিষ্ণুরাম বললেন—স্যার, গাছটাকে এ অঞ্চলের ছোট জাতেরা দেবতার মত—

—থামুন—হুঙ্কার দিয়ে ধমকে উঠলেন ঘনশ্যাম সিং—গাছে নিজে কোপ মেরে দেখিয়ে দেন নি কেন, যে তাদের বিশ্বাসটা একটা 'ফিলথি সুপারস্টিশান' ছাড়া আর কিচ্ছু না—ভয়ানক রাগে কুটিল হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে ঘনশ্যাম সিং কটু গলায় বললেন—আপনাকে ওভারসিয়ার হতে কে বলেছিল? বাপ-ঠাকুদার মত পুরুতের ব্যবসা করলেই পারতেন—

সেই মুহূর্তে বিষ্ণুরামের শীর্ণ স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলের মত দৃঢ় হয়ে উঠল। তার নিষ্প্রভ চোখ দুটোয় ঝিকিয়ে উঠল আগুন। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললেন—বাপ-ঠাকুদ্দাকে টানবেন না স্যার—

ঘনশ্যাম আগুন-ঝরা চোখে বিষ্ণুরামের আপাদমস্তক তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন—আসুন আমার সঙ্গে, গাছ আমি নিজেই কেটে দিচ্ছি—বিষ্ণুরামের বুকের ভেতরে সহস্র নিষেধ হাহাকার করে উঠল। তিনি একবার বলতে চাইলেন—কালকের দিনটা বাদ দিয়ে কাটুন। কিন্তু তার গলা দিয়ে একটুকু শব্দ বেরুল না। সম্মোহিতের মত তাঁকে অনুসরণ করে চললেন বিষ্ণুরাম মিশ্র। বাইরে অবারিত মাঠের ওপরে বোবারাত্রির বুকের ভেতর থেকে যন্ত্রণার একটা চাপা গোঙানির মত বাতাস আর্ত্তনাদ করছে। ন্যাকড়াকালীর পাকুড়গাছের পাশে ডোবার জলটা

খানিকটা অন্ধকার আর নক্ষত্রের আলো বুকে নিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছে। রাত্রির বাতাসে ঝমর ঝমর করে সর্ব্বনাশের করতাল বাজছে তালগাছের পাতায় পাতায়। চারিদিকের কফিনের স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে ঘনশ্যামের কুড়ুল শব্দ করে উঠল—ঠক্—ঠক্—ঠক্। থর থর করে কেঁপে উঠল পাকুড় গাছটা। ঘুম থেকে জেগে উঠে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উড়ে গেল কতগুলো পাখী। সেই ঠক্‌ঠকাঠক্ শব্দ বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল আত্রাইয়ের ওপার থেকে। পাগলের মত অবিরাম কুড়ুল চালাতে লাগলেন ঘনশ্যাম সিং। তার চওড়া কপালটায় ঘাম জমে উঠল ফোঁটা ফোঁটা। একটু থেমে পকেট থেকে স্কচ হুইস্কীর বোতলটা বের করে কয়েক চুমুক খেয়ে নিলেন। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আবার কুড়ুল তুলে ধরলেন। তার লাল চোখের তারা দুটো কাঁপছে পৈশাচিক বিকৃতিতে। রাস্তার পাশে দুই হাঁটুর মাঝে মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে রইলেন বিষ্ণুরাম। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মোক্ষবুড়ীর জলেভরা চকচকে চোখ দুটো; সেই ভোরের ঝাপসা অন্ধকারে নাতির আরোগ্য কামনা করে তার সেই কাতর কান্না বিষ্ণুরামের কানের কাছে বাজতে লাগল। কতজনের নিদারুণ দুঃখ দিনে আশা ভরসার আশ্রয়স্থল ছিল এই ন্যাকড়াকালীর থান। তার আসন্ন বিলুপ্তিতে বিষ্ণুরামের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

শেষ হয়ে আসে রাত্রি। আত্রাইয়ের বুক থেকে হুহু করে বয়ে আসছে ভিজে বাতাস। কুড়ুলের অবিরাম শব্দকেও ছাপিয়ে দুরাগত মেঘের ডাকের মত দিগন্ত থেকে ভেসে এল জয়ঢাকের শব্দ—ড্যাড্যাং—ড্যাং—ড্যাড্যাং—বিষ্ণুরাম মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, ভোরের তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে দলে দলে ছায়ামূর্ত্তি। তারা আসছে ন্যাকড়াকালীর পূজা দিতে। তারা আসছে বাঁহিচা থেকে, পতিরাম থেকে, জগন্নাথবাটী থেকে, কোল্লা থেকে, আরও পশ্চিম দিকের গ্রাম থেকে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল মানুষগুলোর চেহারা। সকলের আগে আসছে মোক্ষবুড়ী। তার নাতি সেরে উঠছে। দুটো পাঁঠার দড়ি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনছে সে। সারা বছরে ন্যাকড়াকালীর কাছে যে যা মানত করেছে সব নিয়ে আসছে হাতে করে। কেউ নিয়ে আসছে হাঁস, কেউ চালকুমড়া। মেলার দোকানীরা ঘোড়ার পিঠে দোকানের জিনিস বস্তায় করে চাপিয়ে দিয়ে পাশে পাশে হেঁটে আসছে। তাদের সকলের চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি ঝলমল করছে। হঠাৎ দলটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। প্রায় দুইশো লোক কান পেতে শুনল সেই কুড়ুলের নিদারুণ ঠক্-ঠকা-ঠক্ শব্দ। দূর থেকে তাদের চোখে পড়ল, হ্যাজাকের আলোয় জলজল করছে ন্যাকড়াকালীর গাছটা। আর একটা দৈত্যের মত মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে কুড়ুল চালাচ্ছে তাদের কালীর থানের গাছে। মুহূর্তে থেমে গেল তাদের জয়ঢাক, আর কাঁসির আওয়াজ। আকাশ-ফাটা গলায় চীৎকার করে উঠল মোক্ষবুড়ী—ন্যাকড়াকালীর গাছ কাটছে কোন ব্যাটা রে? উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল প্রায় দুইশো মানুষ। তাদের চোখে আকাশের বজ্র-ঝিলিক। কিন্তু ততক্ষণে পাঞ্জাবী ইঞ্জিনীয়ারের বলিষ্ঠ হাতে কুড়ুলের কোপ খেয়ে খেয়ে সরু হয়ে গেছে গাছের গোড়াটা। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘনশ্যাম শেষ বারের মত কোপ মারলেন। মড় মড় শব্দ করে ডোবার ধারে হতচেতন মানুষের মত লুটিয়ে পড়ল গাছটা। ডুকরে কেঁদে উঠল মোক্ষবুড়ী। তারায় ভরা ঝাপসা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিষ্ফল ক্রোধে মূঢ় মানুষগুলো অভিশাপ দিতে লাগল ঘনশ্যামকে—তোর হাত খসে যাবি, কালী তোর বৌ বেটির মুখ দিয়ে রক্ত তুলবি—

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে ঘনশ্যাম সিং গর্ব্বিত চোখে তাদের দিকে তাকালেন। রক্তাভ শিরায় আকীর্ণ মোটা নাকটা একবার ঘৃণাভরে কুঞ্চিত করে জুতোয় মস মস শব্দ তুলে চলে গেলেন তাঁবুর দিকে। দেহাতী মানুষগুলোর হাত থেকে ন্যাকড়াকালীর বলি ঐ হাঁস, চালকুমড়াগুলো খসে পড়ল রাস্তার ধুলোর উপর। বহুকাল ধরে ন্যাকড়াকালী যত রক্ত খেয়েছে তারই প্রায়শ্চিত্ত করে মানুষের বৃহত্তর প্রয়োজনের কাছে সে নিজেই বলি হয়ে গেল। নিকট-আত্মীয়ের শবদেহকে ঘিরে মানুষ যেমন বসে থাকে, ঠিক তেমনি করে তারা গাছটাকে ঘিরে বসে রইল। শোকে দুঃখে যেন পাথর হয়ে গেছে লোকগুলো। রাস্তার লাল ধুলোর ওপর

নিশ্চল হয়ে বসে আছে মোক্ষবুড়ী। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আত্রাইয়ের ওপারে ধু ধু বালুচরের দিকে। দুটো চোখ দিয়ে টস টস করে জলের ধারা পড়ছে গড়িয়ে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর করে।

*   *   *   *

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। আজ বালুর-ঘাট—কালিয়াগঞ্জের পীচ-বাঁধানো রাস্তার দুই পাশে গড়ে উঠছে সমৃদ্ধ জনপদ। সাত আটটা রাইস মিলের চিমনীর কালো ধোঁয়া বরিন্দের অবাধ প্রান্তরের ওপর দিয়ে কালো মেঘের মত ভাসতে ভাসতে আকাশে মিলিয়ে যায়। এই রাস্তার ওপর দিয়ে মিনিটে মিনিটে গর্জন করে ছুটে চলে হাই-লোডেড ট্রাক আর যাত্রী-বোঝাই বাস। এই পথ বেয়ে আসছে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাইয়ের সংবাদ সুদূর এই পশ্চিম দিনাজপুরে। আজ আর কোন মোক্ষবুড়ীর ন্যাকড়াকালীর গাছের জন্য দীর্ঘশ্বাস পড়ে না। নতুন কালের হাওয়ায় এ অঞ্চলের মানুষের মন থেকে মুছে গেছে ন্যাকড়াকালীর স্মৃতি।

একাল ও সেকাল

সুবোধ আচার্য চৌধুরী

যুগে যুগে মানুষ বলে আসছে পৃথিবী পাপে ভরে উঠল। অন্যায় ও অবিচার শত লক্ষ রূপে সংসার ঘিরে রেখেছে। তবু তো পৃথিবীর আলো নিভে গেল না। কোন সে অদৃশ্য হস্ত সে দীপের ধারক? কারা সেই মঙ্গলের আলো যুগ থেকে যুগে অনির্বাণ রেখেছে?

মানুষ জড় পদার্থ বা ছবি নয়। তার জীবন গতিশীল। সেই গতির আবেগে সে সৃষ্টি করে তার জীবনের নতুনতর সমস্যা ও তার অভিনব সমাধান। যারা শুধু পিছনে চেয়ে থাকে, সম্মুখে চাইতে ভুলে যায়, তারা ভাবে,—সব বুঝি গেল, এমনতরো সমাধান কখনো তো দেখিনি শুনিনি; এর যারা স্রষ্টা তারা সমাজের মঙ্গলকারী নয়। এরকম ধারণার কারণ, পৃথিবীতে এক শ্রেণীর পাণ্ডিত্য আছে যারা কোনো যুগে কোনো দেশেই সমসাময়িক কোনও মহত্বকে চিনতে পারে নাই, কেননা তার কথা পুঁথিতে লেখা থাকে না। পৃথিবীতে মানুষ তার সমস্ত কৃষ্টির মাধ্যমে কামনা করেছে নিজেকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়তে। এই সৌন্দর্যের অভিযানই মনুষ্য-সভ্যতার ইতিকথা। জীবনকে মধুর ও শোভন করে গড়া। এই মাধুরী ও প্রজ্ঞা—এরই অনুসন্ধানে মানুষ কত সভ্যতার ধারা বেয়েই না চলেছে; কত সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এমনি এক সমস্যাসঙ্কুল জীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে বিখ্যাত সমালোচক I. A. Richards বলেছেন—Persistent concern with sex is the problem of our generation, as religion was the problem of the last.

রিচার্ডস একথা বলেছেন তাঁর "Principles of Literary Criticism" বইখানিতে সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে ও প্রতীচ্য দেশ সম্বন্ধে। কিন্তু আমার মনে হয় একথা আমাদের দেশ ও কাল সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। আর সাহিত্য তো মানুষের আত্মারই অভিব্যক্তি। গ্রন্থ মাত্রেই তো গ্রন্থকারের চিন্তারাজির পদচিহ্নের পদাবলী। তাই সাহিত্যকে ভিত্তি করেই আমি একাল ও সেকালে দেখবার চেষ্টা করেছি।

গতযুগে সাহিত্য-উপভোগের ধারা ছিল জীবনকে কতকটা আড়ালে রেখে বাস্তব-মুক্তির সাধনা; আর তাই ছিল রসচর্চার নিপুণতম কৌশল। It was a means of escape from the ills of life। কিন্তু এই artistic monasticismএর দ্বারা যে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যেত তা' তৈলধারবৎ অবিচ্ছিন্ন নয়। তাই জার্মান দার্শনিক Schopenhawer ছিলেন খাঁটি Asceticismএর পক্ষপাতী। তাঁর মতে "The Hindu Sannyasin shows the way"।

কিন্তু বর্তমান যুগে নব-জীবনের মহিমা, নব-চরিত্র ও নব-হৃদয়ের গহনতল মানুষের চোখে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সাহিত্য-দৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে নতুন করে 'জীবন-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এ দর্শন—উপনিষৎ বেদান্ত-ষড়দর্শন; এই দর্শন প্রাণভরে দর্শন—সৃষ্টি-শতদলের মর্মকোষে মধু-সন্ধানী প্রাণ-ভ্রমরের পুলক-শিহরণ। অর্থাৎ রস আর বিশুদ্ধ রস থাকল না, তাতে চিন্তার ছায়া পড়েছে—রস-পিপাসার সঙ্গে জীবন-জিজ্ঞাসা যুক্ত হয়েছে। অহং সংস্কার মুক্ত হয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখবার যে রসদৃষ্টি, তার পরিবর্তে নিজেরই মানস চেতনার আদালতে জগৎকে জবাবদিহি করবার জন্য ডাক পড়েছে—এবং এই হোলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশেষ প্রবৃত্তি:

যেমন,—

> "আমার কামনা কভু নিষ্ফল না হবে।
> যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে—
> চারিদিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
> তার চেয়ে বেশি নই আমি?"

অথবা;—

"বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।"

অথবা,—

"পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান—
গেয়েছিল আলো বায়ু নদীজল তরুলতা—মধুমান!
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হতে পারে কভু? হবে তার অপযশ?"

এ সবই সেই Persistent concern with sex। কিন্তু আধুনিক কালে কিছুই আর ঝাপ্‌সা থাকতে পারে না, সহজও হতে পারে না। যে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমরা পরম পূত বলে মনে জানি, তা' আর তেমনিভাবে পরম বা পূত নয়। প্রেম শুধু স্নিগ্ধ নয়, এর অর্থ উদ্বাহ; মরণ মানেই মৃত্যু-কর। মানুষের আত্মা জেগে ওঠে এক বিরাট অতলান্ততায়, অদৃশ্য অন্তরীক্ষে শ্রুত হয় অস্ফুট প্রেত-নৃত্য, একটা তীব্র অনুভূতি—যেন প্রেম ও ঘৃণা একই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে—বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

সেকালে শ্রমের ছিল মূল্য, বিশ্রামের মাধুর্য। একালে শ্রমই সব। আর কিছুতে সম্ভ্রম নেই। সর্বদাই কাজ করতে হবে, যদি দেহ ও আত্মাকে রক্ষা করতে চাই। অন্ততঃ কর্ম-ব্যস্ততার ভাণ করতে হবে, বেশির ভাগ মানুষ যা' করে। সেই মাধুরী ও প্রজ্ঞা, Sweetness and light নতুন অর্থে মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে। এ নগরী মানুষের প্রিয় নয়। কিন্তু যে লক্ষ্যে মানুষ এই জনপদ গড়ে তুলেছে—সভ্যতার সেই কর্ম-প্রবণতা মানুষের যত প্রিয়, সভ্যতা তত নয়। অর্থের চেয়ে পরমার্থ শ্রেয়ঃ হতে পারে, দৃষ্টের চেয়ে অদৃষ্ট; কিন্তু তা' নিয়ে চিন্তিত হওয়া সঙ্গত নয়। আধুনিক মতে তা' রুগ্নতা, সেকেলেপনা।

সেকালের ভূম্যধিকারে সম্ভ্রম ছিল। কিন্তু আধুনিক অস্থাবর মালীকানায় মানুষকে যাযাবর করে তুলেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এই হোলো সব চেয়ে বড় অভিশাপ। আবার মানুষ সেই বস্তু-সভ্যতায় ফিরে চলেছে। আগামীকালের ঐতিহাসিক হয়ত লিখবে কেমন করে বর্তমানের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আহুতি ভূমিতে শিকড় গাড়েনি এবং হয়ত এরই মধ্যে তাদের কল্পিত দৈন্যের রহস্যও খুঁজে পাবে।

এই একাল ও সেকালের দ্বন্দ্বে মানুষ শুধু নিজেকেই ঠকিয়েছে, তাই নয়, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ্বাস-প্রবণতার ভেক্কি মানুষেরই কর্ম-সূচীতে। কিন্তু অবিশ্বাসের ভেক্কি হোলো শয়তানের কাজ। সেই শয়তান আধুনিকতার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। একাল ও সেকালের সত্যিকার মর্মঘাতী-দ্বন্দ্ব এইখানেই চরম হয়ে উঠেছে।

"Men have left God not for other Gods, but for no
God; and this has never happened before.
That men both deny gods and worship gods,
professing Joint Reason.
And then money, and Power, and what they call
Life, or Race, or Dialectic."

তাই,

"দেখি, মৃত্যু-র—শিথরে—নেওয়া চির-বিলাপের শপথ শাপ হয়ে ওঠে,
শুনি, বৃদ্ধ তার যৌবনের প্রেম নিয়ে পরিহাস করছে!
জীবনকে ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।"

মনুষ্য-জীবনের একাল ও সেকাল বুঝতে গিয়ে সমস্ত উদ্ধৃতিই নিয়েছি কাব্য-গ্রন্থ থেকে। এর কারণ এই যে, যে কোনো জাতির কবিতা তার জীবনী সংগ্রহ করে মানুষের কথিত বাণী থেকে এবং পরিবর্তে প্রাণবন্ত করে সেই জাতির অকথিত বাণী। বহন করে সেই মানুষের দুষ্প্রধর্ষ আত্মপ্রত্যয়, তার মহত্তম বীর্য, ও নমনীয় অনুভূতি। আর এই ইতিহাসই মনুষ্য জীবনের সত্যিকার ইতিবৃত্ত। মানুষ আবহমানকাল থেকে বলে আসছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" আনন্দে পৃথিবীর গায়ে প্রাণের রোমাঞ্চ হচ্ছে, আনন্দেই এর সব কিছু সৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান-দর্শন মানুষের কাছে আর কিছুই গোপন রাখল না। মানুষ নিজের অন্তর পর্যন্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। যে রহস্যময়তার ভিতর মানুষের আনন্দ, তার সুখ, তা' যখন আর রহস্য রইল না, তখন একালের মানুষ তার রূপ-হীন নগ্ন বীভৎসতায় নিজ জীবন-মুকুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে—

"On the shelf
On the shelf
Boys, Boys, I'm on the shelf."

সঙ্গীতশাস্ত্র ও ব্যবহারিক সঙ্গীত

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-মাস, সঙ্গীত-বিশারদ (লক্ষ্ণৌ)

অতিপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ভারতীয়-সঙ্গীতের নিয়মাদি বর্ণনা-সমন্বিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বৈদেকোত্তর কালে লিখিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ; কিন্তু নানা বিপ্লবে অধিকাংশ গ্রন্থই নষ্ট হইয়া গিয়াছে মনে হয় ; যেগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহারও একাংশ মাত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়ক এই সকল গ্রন্থের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সঙ্গীত গুরুপরম্পরা-বিদ্যা, ইহার প্রচলিত স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন শিল্পীর মনে না জাগাই সম্ভব। তবুও শিল্পী চিরদিনই শিল্পী থাকেন না ; প্রৌঢ় বয়সে শিক্ষক এবং পরিণত বয়সে শাস্ত্রচর্চাশিক্ষিত শিল্পীর স্বাভাবিক কর্ম্ম-পরিণতি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একথা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে শাস্ত্রপ্রণয়ন কালে তাঁহাকেও তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে এমন কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিতে হয়, যে পরিভাষা-গুলির সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধির অভাব থাকা সম্ভব। সুতরাং অধিকাংশ গ্রন্থই আংশিক বা পূর্ণভাবে সঙ্কলন মাত্র। পক্ষান্তরে ব্যবহারিক সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ দার্শনিক বা পণ্ডিতগণ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাদি সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়ক মাত্র। বৈদিক যুগে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সমস্ত বিষয় মনে রাখিতে হইত এবং পরবর্তীকালে কিয়দংশ বা স্মৃতি হইতে, কিয়দংশ অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া, লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। সঙ্গীতের ন্যায় জটীল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা ব্যতীত লিখিলে সঙ্কলন মাত্র হয় এবং পরবর্তীকালে ব্যবহারে প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সপ্তস্বর, তিনগ্রাম, একবিংশ মূর্চ্ছনা, বাইশ শ্রুতি ইত্যাদি কতকগুলি সাঙ্গীতিক পরিভাষা লিখিতে সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাদি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে (১) প্রাচীন কাল হইতে ত্রয়োদশ শতক (২) ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতক ও (৩) আধুনিক। প্রাচীন সঙ্গীতের উপপত্তি (Theory) মাত্র আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে ; কারণ প্রচলিত সঙ্গীতের স্বরূপ স্বরলিপি-বদ্ধ করবার প্রয়োজন শাস্ত্রকারগণের হয় নাই। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আদি-গ্রন্থ গন্ধর্ববেদ ও রুদ্রডমরুস্তব সূত্র বিবরণম্। (নন্দীকেশ্বর—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশ পাওয়া যায়) মার্গ-সঙ্গীত অথবা যন্ত্রগীতির নিয়মাবলী লইয়াই রচিত। আদি প্রামাণ্য গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্রই মানিয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু নারদীয় শিক্ষা বোধ হয় ইহারও পূর্বে লিখিত।

"গান্ধর্বমেতৎ কথিতং ময়া হি
পূর্বং যদুক্তং ত্বিহ নারদেন॥ নাট্যশাস্ত্রঃ

নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তীকালে লিখিত পুস্তকাদি—পূর্বলিখিত এবং নাট্য-শাস্ত্রের সঙ্কলন ও টীকা মাত্র। পরবর্তীকালে বিশাখিল, মতঙ্গ, দক্ষ-প্রজাপতি (ইনি বেদ হইতে ব্রহ্মগীতি রচনা করেন,) কশ্যপ (ইনি মার্গ-রাগবিষয়ে তৎকালে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন,) তুম্বুরু ইত্যাদি আচার্য্যগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শার্ঙ্গদেব তাঁহার সঙ্গীতরত্নাকরের সঙ্কলনে প্রত্যেক অধ্যায়ের বর্ণনার জন্য নান্যদেব ও অভিনব গুপ্তের নিকট ঋণী। সঙ্গীতরত্নাকর সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব। মতঙ্গ, কশ্যপ, অভিনবগুপ্ত, যাষ্টিক, আঞ্জনেয় (হনুমান) আদি গুণীগণ মার্গ ও দেশী উভয়বিধ সঙ্গীতেরই অনুশীলন করিয়াছিলেন দেখা যায়। নান্যদেবের ভরতভাষ্যে মার্গরাগের সঙ্গে দেশী রাগেরও আলোচনা আছে, নান্যদেব লিখিত 'ভরতভাষ্য' অথবা 'সরস্বতী হৃদয়লঙ্কার' একখানি স্বতন্ত্র প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে ১৬০টী মার্গ রাগের নিয়মাদি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত যাষ্টিকের মত লইয়া তাঁহার নিজস্ব যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। যাষ্টিক সম্ভবতঃ প্রথম মার্গ ও দেশী রাগের সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং (আঞ্জনেয়) হনুমান তাঁহার নিকট লক্ষ্য (প্রচলিত) বিরুদ্ধ নিয়মাদির মীমাংসার জন্য 'কদলীবনে' (তাঞ্জোর, যাষ্টিকের স্বগৃহ) গিয়া সঙ্গীত-শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"কদাচিদ গাৎ কদলীবনান্তু মাসো দিবান্ যাষ্টিকমাঞ্জনেয়।
সঙ্গীত বিদ্যোপনিষদ্রহস্যমধ্যাপয়ন্তং ধুরিদক্ষ্য মুখ্যান্॥
দেশীয় রাগেম্বপি চ স্বরেষু শ্রুতিম্ব মুখমপি লক্ষণেষু।
নানা বিরোধানিহ যাষ্টিকং তং তে দক্ষমথ্যাস্থি পর্য্যপৃচ্ছন্॥
সপ্তস্বরা দ্বাদশ বৈকৃতা…
আলোচ্য বুদ্ধ্যাচির মাঞ্জনেয়ো লক্ষ্য বিরুদ্ধং প্রণিনায় শাস্ত্রম্॥

সঙ্গীত সুধা

ইহা হইতে ধারণা করা সহজ যে অতি প্রাচীনকালেই শ্রুতি গ্রামাদির ব্যবহারে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল ও অল্পদিনেই প্রাচীন শ্রুতিগ্রাম মূর্চ্ছনাবাদ সঙ্গীত হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল। প্রচলিত ব্যবহারিক সঙ্গীতে এই নিয়মগুলি অনুপযুক্ত হইলে কি হইবে শাস্ত্রকারগণ পূর্বাচার্য্যগণের "শ্রুতি-গ্রাম মূর্চ্ছনা অধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া চলিলেন এবং শিল্পীও দুর্বোধ্য এই অংশ পরিত্যাগ করিয়া রাগাধ্যায় দিতে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু স্বরস্থান না বুঝিয়া রাগ রচনা বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা—কাজেই তাঁহাকে গুরুমুখাপেক্ষী হইতে হইল। শাস্ত্রগ্রন্থাদি সসম্ভ্রমে দূরে সরাইয়া রাখা হইল বটে, তবুও যুগে যুগে নূতন গ্রন্থাদিরও সঙ্কলন হইতে লাগিল।

আমাদের পূজ্যপাদ গুরু পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতন জঙ্কার বলিয়াছেন :

"If we take a rational view of what could have

happened regarding the creation of music, the prime fact about mwsic is that it is like religion, language, art, man-made. It is a creation of man." "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমরা সঙ্গীতের স্রষ্টা খুঁজি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ধর্ম, ভাষা, শিল্পাদির মত ইহাও মনুষ্যসৃষ্ট।" আমরা দেখি কিরূপে সঙ্গীত জন্মগ্রহণ করিয়াছে! আদিম মানব প্রথম দিকে আকার ইঙ্গিতে এবং পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বনি বা শব্দ সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিত। পরবর্তীকালে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি বর্ণের সৃষ্টি হয়. কতকগুলি বর্ণ বা অক্ষরের সমষ্টিতে শব্দ বা পদ এবং ক্রমে ক্রমে পদের সমষ্টিতে বাক্য ও বাক্যের সমাবেশে সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়। সঙ্গীতেও সেইরূপ প্রথমে ভাবাভিব্যক্তির ধ্বনি, উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া ধ্বনিগুলির নামকরণ, নানাবিধ ধ্বনির সাহায্যে ভাবপ্রকাশের শাব্দিক মাধ্যমরূপে সঙ্গীত জন্মগ্রহণ করে। একদিকে ধ্বনি বা নাদগুলির নামকরণ করা হইলে ভিন্ন ভিন্ন রচনার সাহায্যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হইতে পারে, অন্যদিকে স্বতস্ফূর্ত কাব্যিক ভাবাভিব্যক্তি হইতে যে সঙ্গীতের রূপ পাওয়া যায় তাহা হইতেও নাদ অথবা স্বর গ্রহণ করিয়াও নূতন নূতন রূপ সৃষ্টি করা সম্ভব। মার্গ-সঙ্গীত প্রচলিত হইবার পূর্বেও এই কাব্যিক দেশী সঙ্গীত সর্বত্র প্রচলিত ছিল—"তত ইদানীং······মার্গদেশ করণ সংশ্রয়ং সমুত্থাপনকেন বাদ্যং যোজ্যম্। নাট্যশাস্ত্র মার্গ ও দেশী একসঙ্গেই প্রয়োগ হইত ইহাই দ্রষ্টব্য।

"সামবেদাৎ স্বরাজাতাঃ স্বরেভ্যো গ্রামসম্ভবঃ

গ্রামেভ্যো জাতয়ো জাতা জাতিভো রাগসম্ভবঃ।

সপ্তস্বর তিন গ্রাম ইত্যাদি —গন্ধর্ববেদ

এই 'গন্ধর্ববেদ' (শিবোক্ত নন্দীকেশ্বর লিখিত) সংস্কৃত ব্যাকরণের এক অংশরূপে লিখিত হইয়াছিল এবং উচ্চারণও জিহ্বাস্থাপন লক্ষ্য করিয়া বেদগানে ব্যবহৃত নাদগুলির নামকরণ করা হইয়াছিল (সা, নি, ধা, পা ইত্যাদি) উচ্চস্থানে প্রথমে একটী মাত্র স্বরে বেদগান হইত যাহা স্তোত্রপাঠের মতই ছিল। কালক্রমে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ স্বরের ব্যবহার হইয়াছিল—একস্বরের গান আর্চিক, ২ স্বরের গাথিক, ৩ স্বরের সামিক, ৪ স্বরের স্বরান্তর, ৫ স্বরের ঔড়ব, ৬ স্বরের ষাড়ব, ও ৭ স্বরের সম্পূর্ণ নাম দেওয়া হইয়াছিল। সামবেদ হইতে এইরূপে জ্ঞান বা নাদ গ্রহণ করিয়া বৈয়াকরণিকের সাহায্যে তাহাদের নামকরণ করিয়া মার্গসঙ্গীত বা মন্ত্রগীতি সৃষ্ট হইয়াছিল। সাতটি স্বর লইয়া একটী গ্রাম গঠিত—এইরূপ তিনটী গ্রাম ব্যবহৃত হইয়াছিল এইরূপ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। গ্রামগুলি হইতে জাতি ও জাতি হইতে রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। পরবর্তীকালে এই বাক্যগুলিই কিঞ্চিৎ ভাষা পরিবর্তন করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ মাত্র "সামবেদাৎস্বরা জাতা" শুনিয়াই সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন—এই স্বরগুলির অবস্থান কিরূপ অর্থাৎ সা হইতে রে, রে হইতে গা—কত উচ্চে অবস্থিত; শ্রুতি কাহাকে বলে, শ্রুতির বিন্যাসের উপরে কিরূপে স্বরগুলি স্থাপনা করা যাইতে পারে—ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি লইয়া আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখন দেখি—মার্গসঙ্গীত বলিতে কি বুঝায়—

"যো মার্গিতো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।

দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তাভ্যুদয়প্রদঃ।"

—রত্নাকর মার্গিতস্থান মার্গ

'চতুর্বেদেষু অম্বিষ্য কৃতত্বাৎ' ইতি। যে সঙ্গীত ব্রহ্মাদি চারি বেদ অন্বেষণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও ভরতাদি দ্বারা 'অভ্যুদয়' উদ্দেশ্যে শিবের সম্মুখে প্রযুক্ত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতের ভাষা সংস্কৃত এবং "ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ সম্যক প্রযুক্তাঃ শঙ্কর স্তুতৌ" অর্থাৎ ব্রহ্মার রচিত শঙ্করের স্তুতি গান। এই মন্ত্রগীতি গন্ধর্বগণ যাগযজ্ঞাদিতে নানাবিধ যন্ত্রবাদ্য ও নৃত্যাদি সমন্বয়ে প্রয়োগ করিতেন। ইহার নিয়মাদি অত্যন্ত জটীল, সামান্যমাত্র অনিয়মও 'প্রত্যবায়' অর্থাৎ পাপ বলিয়া গণ্য হইত। সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়মাবদ্ধ এই সঙ্গীতে শ্রুতি, মাত্রা, গ্রাম, ছন্দ, মূর্চ্ছনা ইত্যাদির অতি শুদ্ধপ্রয়োগ হইত। যদিও শার্ঙ্গদেবের মতে ব্রহ্মাদি এই সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া ভরতাদিকে শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভরত নাট্যশাস্ত্রে লিখিয়াছেন:

"এবং রূপেশ্চ, হোমৈশ্চ দেবতাভ্যর্চনেন চ।

স্তুত্যাশীর্বচনৈর্যুক্তং কর্মভাবানুকীর্তনাৎ॥

সর্বাতোদ্য নিনাদৈশ্চ যথা গীতস্বনানি চ।

ময়া চ পাপহরণে কৃতে বিঘ্ননিবর্হনে॥

—নাঃ শাঃ

তবুও ইহা স্বীকার্য্য যে এই সঙ্গীত গন্ধর্বগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল; সাধারণ লোকে যে সঙ্গীত ব্যবহার করিত তাহা দেশী সঙ্গীত, ইহাতে পরবর্তীকালে মতঙ্গ, যাষ্টিক, আঞ্জনেয় আদি সঙ্গীত-বিদ্বানগণের প্রচেষ্টায় রাগরূপ গঠন করা হইয়াছিল। দেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব লিখিয়াছেন:

"দেশে দেশে জনানাং যদ্রুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্।

গানং চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে॥

—সঃ রঃ

বিভিন্ন প্রদেশে জন সাধারণ আপন আপন রুচি অনুসারে জনমনোরঞ্জনের জন্য যে নৃত্য, গীত ও বাদ্য ব্যবহার করিত তাহা দেশীসঙ্গীত। এই সঙ্গীত পরিবর্তনশীল ও শ্রুতিগ্রামাদির নিয়ম বর্জিত। এই সঙ্গীত অধিক চিত্তাকর্ষক হওয়ায় সংসারী মুনিগণও ইহা ব্যবহার করিতেন ও নূতন নূতন রাগ সৃষ্টি করিতেন দেখা যায়।

বেদগানের সঙ্গে লোক সঙ্গীতের যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশী সঙ্গীতে মার্গরাগের বিশুদ্ধরূপ নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া দেশী রাগাদির জন্য স্বতন্ত্র নিয়মাদি প্রণয়ন করা হইয়াছিল। আঞ্জনেয় (হনুমান) লিখিত পুস্তক পাওয়া গেলে এ বিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। পরবর্তী শাস্ত্রকারগণ (শার্ঙ্গদেবও) মার্গ রাগের শ্রুতি গ্রাম মূর্ছনার নিয়মাদির মাধ্যমে দেশী রাগের বর্ণনা করিয়াছেন

বলিয়া রাগগুলি দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলিব, বেদগানে প্রথমে 'ওঁ'কার উচ্চারিত হইত বলিয়া কণ্ঠস্বরের কিয়দংশ অপ্রকাশিত থাকিত; অর্থাৎ 'ওঁ'কার নাভিমূল হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে, তাই ৪র্থ শ্রুতির উপরে ষড়্‌জ স্বর স্থাপিত হইত, নাট্যশাস্ত্রে ভারত বলিয়াছেন: "চতুর্ণামপি বেদানামাদাবোঙ্কার মুচ্যতে" কিন্তু আমরা যে সঙ্গীত ব্যবহার করি তাহা মন্ত্রগীতিও নহে বেদগানও নহে—ইহাতে কণ্ঠস্বর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম শ্রুতি হওয়া উচিত মনে হয় না কি? একটিমাত্র সপ্তকের মধ্যে কোন রাগ গাহিলে তাহাতে তিনটি শ্রুতি অব্যবহৃত থাকিয়া যায় ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? আমাদের মনে হয় (প্রাচীন) শাস্ত্রকারগণ শ্রুতিগামাদির নিয়ম বিশেষরূপে না বুঝিয়াই তাহাদের গ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গান্ধার গ্রাম স্বর্গে ব্যবহৃত, মধ্যম গ্রামও ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গেল—ইহার কারণ এই গ্রামগুলির রচনা শাস্ত্রকারগণ নিজেরাই বুঝিতে পারেন নাই। ষড়্‌জ পঞ্চমাদিও স্থানচ্যুত হইত কেন ও কিরূপে? গ্রাম বলিতে সপ্তক বা ঠাট বুঝাইলে এই ঠাটগুলি নিশ্চয়ই অপরিণত ছিল (সপ্তকে ব্যবহৃত নাদের নিয়মানুযায়ী) তাই শেষ পর্য্যন্ত ষড়্‌জ্‌ গ্রাম আবিষ্কৃত হইলে গান্ধার ও মধ্যম গ্রাম ধীরে লুপ্ত হইয়া গেল।

সঙ্গীত প্রচলিত ছিল—কাজেই স্বর স্থানও নির্দিষ্ট ছিল। শ্রুতির সাহায্যে স্বরস্থান প্রদর্শনের প্রচেষ্টায় প্রকৃত জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতির কোন নিয়মিত 'মান' বা মাপ হইতে পারে না ইহা আমরা আষাঢ়ের 'প্রবাসীতে' আলোচনা করিয়াছি। ভারতের শ্রুতির মাপ ষড়্‌জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রামের পঞ্চমের ১ শ্রুতি কম বা বেশী। শঙ্গ‍দেবের শ্রবণশক্তির সাহায্যে "মনাক উচ্চ ধ্বনি প্রমাণে" শ্রুতির ২২টি তার বাঁধিবার কল্পনাও গ্রাহ্য নহে, কারণ ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন স্বরস্থান সৃষ্টি হইবে। কাজেই শ্রুতির সাহায্যে স্বর স্থাপনার প্রচেষ্টা আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন না। ইহা ব্যতীত ৪, ৭, ৯, ১৩, ১৭ ২০, ২২ শ্রুতির উপরে স্বরগুলি স্থাপনা করিলে—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে প্রায় 'কাফি' ঠাটের মতো হয় দেখা যায়। ইহার প্রথম শ্রুতিতে অর্থাৎ কোমল নিষাদে ষড়্‌জ স্থাপনা করিলে 'বিলাবল' ঠাট হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে শুদ্ধ ঠাটের মাধ্যমে অন্যান্য ঠাট ও রাগ বর্ণিত হয় কাজেই শুদ্ধ স্বর সপ্তক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আধুনিক রাগ সঙ্গীতের শুদ্ধ ঠাট বিলাবল। ইহা ব্যতীত "মার্গসঙ্গীতে ষড়্‌জস্তু চুতস্বং দেশ্যাং তু স অচ্যুত স্বর" 'অনুপ রত্নাকর' মার্গ সঙ্গীতে ষড়্‌জ এবং পঞ্চম ও স্থানচ্যুত হইত কিন্তু দেশীসঙ্গীতে ইহারা অচল। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি হনুমান (আঞ্জনেয়) যাষ্টিকের নিকট দেশীরাগ শিক্ষা করেন এবং ইহার নিয়মাদি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলিয়াছেন:

"যেষাং শ্রুতিস্বরগ্রাম জাত্যাদি নিয়মো নহি।
নানা দেশ গতিচ্ছায়া দেশীরাগাস্তুতে মতাঃ।"

—হনুমান

যে সঙ্গীতে শ্রুতি স্বর গ্রাম জাতি ইত্যাদির নিয়ম নাই এবং নানা দেশগত ছায়াবলম্বনে রাগ গঠিত তাহাকে দেশী রাগ বলা হয়। শার্ঙ্গদেবের সময়ে (ত্রয়োদশ শতকে) দেশের সর্বত্রই দেশীরাগ প্রচলিত ছিল অথচ তিনি তাঁহার রাগ, গ্রাম, মূর্ছনা, জাতি ইহাদের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও টিকাকার সিংহভূপাল বলিয়াছেন "ভারত দত্তিলকোলাহলাদি প্রণীতানি সংগীত শাস্ত্রানি ভূতল বত্তিভির্বিপুল প্রাজ্ঞৈ দুর্রবোধরত্নানীতিমত্বা.........লোকোপকারায় ইত্যাদি"—অর্থাৎ শার্ঙ্গদেবের পূর্বাচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থ ভূতলবাসীর দুর্বোধ্য হওয়ায় তিনি তাঁহাদের 'মত পয়োনিধি' মন্থন করিয়া সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থ সঙ্কলন করিলেন—আধুনিক পণ্ডিতগণের নিকটও তাঁহার মতাদি তদপেক্ষা কম দুর্বোধ্য হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ মার্গরাগের উপপত্তির সাহায্যে দেশীরাগ বর্ণনার প্রচেষ্টা বলিয়াই আমাদের মনে হয়। রত্নাকর সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

সঙ্গীতকে বাঁচাইয়া রাখার ও ক্রমবিস্তারের পথে অগ্রগামী করিবার দায়িত্ব কাহাদের? শিল্পী অথবা শাস্ত্রকারগণের? সঙ্গীত বিষয়ক কোন শাস্ত্র না লিখিলেও সঙ্গীত লুপ্ত হইয়া যাইত কি? নিম্নের বাক্যগুলি ইহার উত্তর দিবে: Had the philosophers never meddled with it (music) had they allowed the practical musicians to construct and tune their own instruments in their own way, so as to please their ear, it is scarcely possible that they should not have hit on what they wanted" Art Temperent. সঙ্গীতের বিষয়বস্তুতে দার্শনিক পণ্ডিতগণ হস্তক্ষেপ না করিয়া শিল্পীগণকে তাঁহার যন্ত্রনির্মাণ ও সুরনিয়ন্ত্রণ করিবার স্বাধীনতা দিলে, ইহা সম্ভব নহে যে শিল্পীগণ তাঁহাদের কর্ণপরিতৃপ্তিকর আসল বস্তুটি খুঁজিয়া পাইতেন না। সঙ্গীত পরিবর্তনশীল ও অগ্রগামী; তাহাকে শাস্ত্রের (অথবা অশাস্ত্রীয় শাস্ত্রের?) শাসনাধীন রাখা সম্ভব কিনা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলির ব্যবহারিক উপযুক্ততার উপরেই সেগুলির প্রণয়ন সাফল্য নির্ভর করে। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ সঙ্গীত অভিজ্ঞ গুণীগণের শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলেও সঙ্গীতোৎকর্ষের সাহায্য হইতেছে দেখা যায়। শাস্ত্র তাহার জ্ঞানের বোঝা বুকে করিয়া বসিয়া আছে কিন্তু শিল্পী তাঁহার উপলব্ধিতে মাতাল। শিল্পীই তো স্রষ্টা—যুগে যুগে প্রতিভাবান শিল্পী নব নব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন—শাস্ত্রকার তাহাই গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিতেছেন; কাজেই শাস্ত্র সমসাময়িক হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল—এই জন্য ধর্ম্মের নামে অনেক অপপ্রচার হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সঙ্গীত ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায় বা মাধ্যম হইয়াছে দেখা যায়—তবুও সমস্ত সঙ্গীতকেই ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করা বা রাখা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীত ধর্ম্ম (মার্গ) ও দেশী (বা লোক) সঙ্গীতের মিশ্রণে রচিত। তাই দেখা যায় রাগ সঙ্গীতের অতি শৈশবকালে ইহা ধর্ম্মের এবং পুজার্চনাদির নিয়মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে সে সঙ্গীত আজ লুপ্ত। Asiatic Researches এ Patterson সাহেব লিখিয়াছেন: "It is lively that these melodies ...

in former times appropriated to the services of different dieties......We may therefore suppose it possible that it originated in the religious restraints to which music appears to have been subjected when first reducted to fixed principles as a science." এই সঙ্গীতের বর্ণনায় দেবতা, বাহন, ধূপ, দীপ গন্ধ, বর্ণ মূর্তি ইত্যাদি উল্লেখ থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবর্তিত সঙ্গীতে এই সকল বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত বলিয়া পরিত্যজ্য নহে কি? মুষ্টিমেয় যোগী বা সন্ন্যাসী শিল্পী ছিলেন বা আছেন সন্দেহ নাই কিন্তু এ পর্য্যন্ত সঙ্গীত কাহাকেও যোগী বা ঋষি করিয়াছে এরূপ সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। ষট্‌চক্র, মূলাধার, দ্বাবিংশতি নাড়ি, পাবক. প্রভৃতি হঠযোগীসুলভ বাক্যাদিতে বিদ্যার্থীগণের কোনই সাহায্য হয় নাই বা হইবেও না। আজকাল দেখিতেও পাওয়া যায় যে শিক্ষিত সমাজ সঙ্গীতকে (পুনরায়) 'বিদ্যা' বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও শিল্পীকে লোকে বিশ্বাস করিত না। অবশ্য এখনও করে না। তাঁহাদের নানাবিধ কু-অভ্যাসের মূল কারণ সঙ্গীতচর্চা, একথাও বলা হইত। নাদ যদি 'ব্রহ্ম' হইবেন তবে তাহার চর্চায় কু-অভ্যাসাদি হইবে কেন? আমরা যে নাদে সঙ্গীত রচনা করি তাহা:

> "সুখিনি সুখনিদানং দুঃখিতানাং বিনোদঃ।
> শ্রবণহৃদয়হারি মন্মথস্যাগ্রদূতঃ।
> অতি চতুর সুগম্যো বল্লভঃ কামিনীনাং।
> জয়তি জয়তি নাদ পঞ্চমশ্চোপবেদ॥"
>
> —গানশাস্ত্র

সুখীর সুখপ্রদাতা, দুঃখীর সান্ত্বনা, শ্রবণমাত্র হৃদয়হারি, মন্মথের অগ্রদূত কামিনীগণের চতুরতার সহায়ক এবং সহজলভ্য বলিয়া অত্যন্ত প্রিয়, ইহা পঞ্চম বেদ বা উপবেদ—এই নাদের 'জয়' হউক। ইহার সহিত হঠযোগীর কোন কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তো মনে হয়না। ইহা দেশীসঙ্গীত, জনসাধারণের সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিরহ, আশা, আনন্দ অবলম্বন করিয়াই ইহার অধিকাংশ গীত রচিত।

দেশের শ্রেষ্ঠ গুণীগণের সঙ্গীত হইতে প্রচলিত রাগরূপ স্বরলিপি সাহায্যে লিখিয়া রাখা এবং ঔপপত্তিক নিয়মাদিরও গ্রন্থপ্রণয়ন করা পরবর্তীকালের সঙ্গীত সাধকের বিশেষ প্রয়োজন সন্দেহ নাই—কারণ এই সকল শিল্পীগণই নূতন নূতন রাগের এবং গায়নভঙ্গীর স্রষ্টা; ইঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের সৃষ্টিও লুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য Capt. Willard সাহেব 'Treatise on the Music of Hindusthan গ্রন্থে লিখিয়াছেন; "The practice of so fleeting and peristable a science as that of a succession of sounds, without a knowledge of the Theory to keep it alive or any mode to record it on paper dies with the professors.".

কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়নকালে প্রাচীন মার্গ সঙ্গীতের স্বরাধ্যায়, যাষ্টিকের রাগাধ্যায়, দত্তিল কোহলের নৃত্যাধ্যায়, উত্তর পদ্ধতির রাগ রাগিনী, দক্ষিণ পদ্ধতির স্বর সাহায্যে বর্ণনা, ব্যবহারিক সঙ্গীতের কোন কাজেই লাগে না। শিক্ষার্থীর প্রথম প্রয়োজন স্বায়ত্ত, সাবলীল-উত্তম কণ্ঠস্বর তৈয়ারী করা। নাদোৎপত্তির (Vice production) মূল সূত্র শ্বাসনিয়ন্ত্রণ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু লেখা নাই। কিরূপে মেঘগর্জ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া মৌমাছির গুণ্ গুণ্ পর্য্যন্ত কণ্ঠ হইতে প্রকাশ করা যায় সে বিষয়ে কোন আলোক সম্পাত করা হয় নাই। হয়তো কোথাও লেখা আছে প্রাতঃকালে শার্দূলের মত কণ্ঠস্বরে গাহিতে হইবে—তাহা দ্বারা কি বুঝা যাইবে ইহা আমরা বুঝি নাই—অন্য কেহ বুঝিয়াছেন কিনা জানিনা। ইহা ব্যতীত পৌরাণিক যুগে সমস্ত বিষয়ই রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করা হইত বলিয়া অজ্ঞাত বিষয় আরও দুর্বোধ্য হইয়াছে। ষড়্‌স্থান হইতে জাত বলিয়া প্রথম স্বরটীর নাম ষড়্‌জ বা 'সা'—এই নামটীকেই 'গা' বলিয়া উচ্চারণ করিলে, অথবা, 'পা', বা 'মা', বলিয়া উচ্চারণ করিলেও (অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে) তাহাও তো ষড়্‌স্থান-জাত হইবে। এই প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে যাহা হয় না—তাহা 'গুরু প্রণিপাতেন, প্ররিপ্রশ্নেন, সেবয়া' সহজ লভ্য হয়। শিক্ষার্থী চিন্তা ও অন্বেষণ করিতে করিতে এবং শ্রেষ্ঠ গুণীগণের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে অনেক রহস্যেরই সন্ধান পাইয়া থাকে—যাহা শাস্ত্র পাঠে হয় না। শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য বিষয় রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির অবস্থান, ঠাট, বাদী, সম্বাদী, গাহিবার সময়, কিভাবে আওয়াজ বাহির করিতে হইবে,—রাগবিস্তারের প্রণালী, তান, অলঙ্কার, গানের ঢঙ (style) ইত্যাদি।

আরও একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই কণ্ঠ সঙ্গীতের শাস্ত্রগ্রন্থ রচয়িতা নিজে যন্ত্রী অর্থাৎ 'ধাণকার,' কাজেই ২২ শ্রুতি ইত্যাদির বিষয় লিখিয়া রাখিলেন। কিন্তু কণ্ঠে তো পাশাপাশি শ্রুতিগুলি গাওয়া সম্ভব হয় না, গাওয়া প্রয়োজন ও হয় না; তাই পারিজাতে অথবা হৃদয় প্রকাশে তারের দৈর্ঘ্যের উপরে স্বরস্থাপনা করিবার সঙ্কেত পাইবামাত্র কণ্ঠ সঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীতের শাসন মুক্ত হইল ও আধুনিক সঙ্গীতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন স্বর হইতে স্বরসপ্তক পরিবর্ত্তন করিয়া নানাবিধ গ্রাম অথবা ঠাট উৎপন্ন করা যন্ত্রীগণের পক্ষেই অধিক সম্ভব। ইহা ব্যতীত শ্রুতির প্রত্যক্ষ ব্যবহারে নানাবিধ সন্দেহের অবকাশ আছে তাহা কল্লিনাথ ও সিংহ ভূপাল উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। সিংহভূপাল:—"তদুক্তং সঙ্গীত সময়সারে (পার্শ্বদেব) তে তু দ্বাবিংশতিনাদা ন কণ্ঠেন পরিস্ফুটাঃ। শক্যা দর্শয়িতুং তস্মাদ্বীণায়াং তন্নিদর্শনম্॥"

সঙ্গীতের 'রস' সম্বন্ধেও নানা কথা শোনা যায়। কিন্তু সঙ্গীতের রস বলিতে গীতে ব্যবহৃত কাব্যের রসই মুখ্য হয় ইহাই সম্ভব। নাদ বা স্বরগুলির রচনারও যথেষ্ট রসাভাব আছে সন্দেহ নাই,—কিন্তু রসের মূল তথ্যাবলী কাব্যের অন্তর্গত। কাব্যের ও পূর্ণ সহযোগিতা থাকিলে তবেই রসসৃষ্টির প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব। কতকগুলি স্বর সাহায্যে

দুই ভিন্ন প্রকারের বাণী গাহিলে ভিন্ন রসের অবতারণা দেখা যায়। একই সুরে, "কেন গো সে ফিরে ফিরে চায়" "বাজারেতে মাছ মিলে না" গাহিলে একই রস উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। আমরা বলিতে চাই—স্বর রচনার দ্বারা যে সুর সৃষ্টি করা যায় তাহা জল মনে করা যাইতে পারে—জলেরও নিশ্চয়ই নিজ স্বরও অথবা বর্ণ আছে কিন্তু কাব্যের রঙ বা বর্ণই তাহাকে বর্ণান্তরে পরিবর্ত্তন করে। কণ্ঠ সঙ্গীতে সাধারণতঃ কাব্যের রসই মুখ্য হয়। সঙ্গীত বলিতে মাত্র রাগ সঙ্গীতই বুঝায় না—রাগ সঙ্গীত প্রচলিত মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশে।

বিভিন্ন প্রদেশ জাত এই দেশী রাগগুলিতে (রাগ) নিয়মের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, এইজন্য আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য প্রত্যেক রাগের 'নাম' (standard) নির্দিষ্ট করা (অবশ্য "সর্বৈামিলিত্বা) এবং যগান্তব্যাপী বিরোধের নিষ্পত্তি করা। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যেক পরিমাণে গুরুত্ব আছে। রাগ সঙ্গীতকে ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া লওয়া, লুপ্ত রাগের পুনঃ প্রচার,উত্তর ও দক্ষিণ পদ্ধতী একত্র সম্মিলন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সঙ্গীতের সঙ্গেও রাগসঙ্গীতের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন ভাবিকালের সঙ্গীতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন গ্রন্থগুলি ভিন্ন প্রদেশজাত বলিয়া রাগমূর্তি-গুলির মধ্যেও নানা বৈষম্য দৃষ্ট হয়; এ সম্বন্ধেও গবেষণা দ্বারা সর্ব্ব-ভারতীয় ভীত্তিতে—পরিবর্ত্তিত রাগ স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন মুর্ত্তির কল্পনা আবশ্যক। ভারতীয় সঙ্গীত এখন আর ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী বোঝাই ক্ষুদ্র তরণী নয়; এখন সে এক বিশাল 'অর্ণবপোত', দশটী পালতুলিয়া (অবশ্য আরও পাল সজ্জিত আছে) দিগ্ দিগন্তহীন মহাসমুদ্রে আজ তর্ তর্ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; এক মহান্ গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহাকে তাড় স্বরে আহ্বান করিয়াছে "কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

বাংলার পশুপাখী

শ্রীদুর্গাচরণ সরকার

বিচিত্র এই বাংলাদেশ। বিচিত্র এর আভরণ। বাংলামায়ের বুকে চির-সবুজের অপরূপ সমারোহ। দেহের অঙ্গে অঙ্গে এর সবুজের শ্যামায়িত প্রকাশ। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলেও বাংলার পদতলে বুকভরা সুধা নিয়ে রয়েছে বিশাল বারিধি, আর শিয়রে রয়েছে বিরাটকায় প্রহরী দেবাত্মা হিমালয়। তাই বাংলা আজ উষর তৃণময় না হয়ে শস্যশ্যামলা, নীলবনরাজি শোভিতা। চিরসুন্দর বাংলা তাই বনজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী। সেই জন্তেই প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাক্ষেত্রে হয়েছে জীবজন্তুর বিচিত্র সমাবেশ।

বনের বন্য পশু রাষ্ট্রীয় সম্পদ। প্রাচীনকালে গিরিগুহায়, পাহাড়ের গায়ে গায়ে খোদিত হয়েছে আদিমদের হাতে, বন্য জীবজন্তুর প্রতিমূর্তি। বৈদিকযুগে ঋষির তপোবনে নির্ভয়ে স্থান পেয়েছে হরিণশাবক আর সিংহের বাচ্চা। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সিংহ, হস্তী, হরিণ, ময়ুর, বৃষ প্রভৃতি সম্রাটের রাষ্ট্রশক্তির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মাশোকের স্তম্ভে স্থান পেয়েছে পশুরাজ সিংহ, পালযুগে রাজপতাকায় চিত্রিত হয়েছে হরিণ, দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত ময়ুরকে প্রতীক গ্রহণ করেছিলেন, আর বৃষের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে কুষাণ সম্রাটের মুদ্রায়। ভারতের গৌরবময় যুগের স্মারক সে যুগের কত না সম্রাটের রাজপতাকায়, কত না দিগ্বিজয়ীর গৌরবধ্বজায় শোভিত হয়েছিল। তার কথাই আগে বলি।

বাংলার উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে বিশাল তরাই অঞ্চল। দার্জিলিং-এর দক্ষিণে শিলিগুড়ি পর্যন্ত তরাই অঞ্চলের বনভূমি প্রসারিত। এই বনে ছোট ছোট বহু জন্তু ছাড়াও বড় বড় হাতী প্রায়ই দেখা যায়। হাতীর দল মাঝে মাঝে রাতে শস্যক্ষেত্রে এসে ফসল নষ্ট করে চলে যায়। কিন্তু এই সব বন্য হাতী বশ করতে পারলে মানুষের অনেক কাজে লাগে। গঙ্গরিরিদের বিরাট হস্তী সৈন্য এক সময়ে আলেকজাণ্ডারের ভয়ের কারণ হয়েছিল। এরা ভারী কাঠ উত্তোলনে বেশ সাহায্য করে। সাধারণতঃ মাটিতে গর্ত করে তার ওপর ডাল-পালা সাজিয়ে রাখা হয়। হাতী সেই পথে আসলে খাদে পড়ে যায়। বুনো হাতী বন্দী হলে পোষা হাতীর সহিত তাকে আনা ও রাখা হয়। এরূপে ক্রমশঃ বুনো হাতী পোষ মানে। এই রকম করে হাতী ধরার নাম 'খেদায় ধরা'।

হাতী শিকার বেশ কঠিন কাজ। ঠিকভাবে গুলি না লাগলে হাতী আহত হয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে, আর ভয়ঙ্কর ভাবে চারিদিক তছ্‌নছ্‌ করে দেয়। তখন শিকারীর প্রাণরক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। হাতীর দাঁত ও হাড় খুব মূল্যবান। মুর্শিদাবাদে হাতীর দাঁতের সুচারু কাজ হয়। বর্তমানে হাতী শিকার সরকারের কর্তৃত্বাধীন। পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য গণ্ডার, পার্বত্য হরিণ ও নানারকমের পাহাড়ে-সাপ দেখতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমের অনতি-উচ্চ মালভূমি। শাল মহুয়ার বনে মাঝে মাঝে ভল্লুক দেখা যায়। ছোট বাঘ, নেকড়ে বাঘ, খরগোস ও মাঝে-মিশেলে হায়নাও দেখতে পাওয়া যায়। হায়নাগুলো শেয়ালের মতই। এদের রং ছেয়ে, কান দুটো লম্বা লম্বা—আগা সামনের দিকে ঈষৎ ঝোলান। এরা স্বভাবতঃ চতুর ও হিংস্র হয়।

বহু পূর্বে হুগলী ও নদীয়া জেলায় হরিণ পাওয়া যেত। 'নদীয়া কাহিনী'তে মদনপুরের মাঠে ইতস্ততঃ ভ্রমণরত হরিণের উল্লেখ আছে।

শান্তিপুর ও বাঁগাচড়ার মধ্যবর্তী বিরাট মাঠেও আমার ঠাকুরদাদা হরিণের পাল দেখেছিলেন। সেটা আনুমানিক ১৮৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে। এখনও নদীয়ার বেত ও সেগুন বনে গুলবাঘ দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ মানুষ খায় না।

সজারু বাংলার সর্বত্রই দেখা যায়। এদের গায়ে প্রায় এক ফুট লম্বা চক্‌চকে কাঁটা থাকে। গভীর রাতে যখন সজারু চলাফেরা করে তার গায়ের কাঁটায় ঝম্ ঝম্ শব্দ হয়। এদের কাঁটায় কলমের হাণ্ডেল, তুলি ও মেয়েদের মাথার কাঁটা হয়। সজারুর রঙ তামাটে ও সাদাটে বা ধূসর। সজারুর মত গায়ে-আঁসওয়ালা ছোটজাতের আর্মাডিলো কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে হাঁসখালির বনে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এদের নাম বজ্রকীট ; স্থানীয় কৃষকেরা বলে 'বনরুই'। এরা সাধারণতঃ দু'ফুট লম্বা হয়।

পশ্চিমবাংলার সর্বদক্ষিণে গঙ্গার পলিমাটি সঞ্চিত সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চল। এখানে সুন্দরী, গরাণ, গেঁউয়া প্রভৃতি সুউচ্চ গাছের ঘন বনের মধ্যে বহুপ্রকারের জীবজন্তুর বাস। এদের মধ্যে বাঘ, গণ্ডার, হরিণ, বানর, কুমীর, বিরাট বিরাট সাপ ও বহুপ্রকারের পাখী উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিখ্যাত। এই জাতীয় বাঘই পৃথিবীর বিশালতম বাঘ। এরা প্রায় সাত আট হাত লম্বা হয়। রয়েল বেঙ্গলের গায়ের রঙ্ হলদের ওপর কাল ডোরা কাটা। পেতেল বা বেতবনের মধ্যে আত্মগোপন করার পক্ষে এ রকম রঙ বেশ সুবিধাজনক। এদের শক্তি যেমন ভীষণ, স্বভাবও তেমনি ভয়ঙ্কর। সুন্দরবনের হরিণ ও অন্যান্য জন্তুই এদের প্রধান খাদ্য। দলভ্রষ্ট একাকী মাঝি বা কাঠুরিয়াও এদের হাত এড়ায় না।

সুন্দরবনে আরেক রকমের বাঘ আছে! তারা গুলবাঘ, এরা আকারে সাধারণ বাঘ হতে ছোট, এ জাতীয় বাঘের গায়ে ছোট কাল 'ফুলকি' থাকে। কাল্‌চে রঙের গুলবাঘকে প্রাচীন লোকেরা 'নাগেশ্বরী বাঘ' বলত। চিতাবাঘ বাংলার আর এক জাতীয় বাঘ। এরা একটু লম্বা ধরণের। চিতার পা ও পেট খুব সরু। এদের গায়ে হলদের ওপর কাল ফুল ফুল থাকে। পেটের কাছের রঙ্ সাদা। এরা সহজেই গাছে উঠতে পারে। চিতাবাঘ খুব দ্রুতগামী। অল্প পাল্লার দৌড়ে চিতা ঘণ্টায় প্রায় ৩০ মাইল পর্যন্ত দৌড়িতে পারে! বাঁকুড়ার জঙ্গলে চিতাবাঘ দেখা যায়।

সুন্দরবনের হরিণ দেখতে অতি সুন্দর। হরিণগুলো প্রায় তিন হাত লম্বা হয় ; গায়ে হল্‌দের উপর সাদা ফুটুকি থাকে। এরা খুব ক্ষিপ্রগতি ; এদের মাথায় একজোড়া লম্বা সুন্দর শিং আছে। শিংগুলি সরু সরু বহু শাখাতে বিভক্ত। ছোট শিংওয়ালা হরিণও দেখতে পাওয়া যায়। পাকান শিংওয়ালা কৃষ্ণসার জাতীয় হরিণ এখন বাংলাদেশে দুর্লভ। এরা কুশভূমি পছন্দ করে। বনের লম্বা লম্বা ঘাস ও গাছের ফলই হরিণের খাদ্য।

গণ্ডার সুন্দরবনে এখন লুপ্ত। প্রায় পঞ্চাশ, ষাট বছর আগে সুন্দরবনে গণ্ডার দু'একটা দেখা যেত। আমার জ্যাঠামশাই সে সময় সুন্দরবনে নায়েব থাকাকালীন গণ্ডার দেখেছিলেন! খড়্গবিশিষ্ট গণ্ডারের নমুনা এখন মিউজিয়ামে মাত্র দেখা যায়।

ছোট বড় কুমীর বাংলায় সর্বত্রই দেখা যায়। গঙ্গা, খড়িয়া, ইছামতী, চূর্ণি প্রভৃতি নদীতে এবং হাঁসাডেঙ্গা প্রভৃতির বিলে প্রায়ই কুমীর দেখতে পাওয়া যায়। কুমীরের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে ; যেগুলি মাছ ও কচ্ছপ খায়, তাহাদের মেছো-কুমীর বলে। মেছোকুমীরের মুখ চোঙার মত লম্বা। মানুষ-খেকো কুমীর ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ; এদের বড় বড় সুতীক্ষ্ণ দাঁত করাতের মত সাজান থাকে এবং গাও খুব অমসৃণ। কুমীর সাধারণতঃ ষোল সতেরো ফুট লম্বা হয়। খড়িয়া নদীর চরে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড কুমীরকে রোদ পোহাইতে দেখা যায়।

সুন্দরবনের বিশালবনে অজস্র সাপ দেখতে পাওয়া যায়। কেউটে, গোখরা, পাতরাজ, শঙ্খচুর প্রভৃতি বিষধর সাপ ছাড়াও অজগর নামে অতিবিশাল এক সাপ এই বনে থাকে। এরা অনায়াসে আস্ত হরিণ কিংবা মোষ গিলে পেতে পারে।

বুনো মোষ বোধহয় আর নেই। বুনো শূয়োর প্রায় সব বনেই দেখা যায়। বুনো ও সাঁওতালরা বনের খানিকটা ঘেরোয়া করে ঠেঙিয়ে শূয়োর শিকার করে। সুন্দরবনের বড় বড় গাছে অসংখ্য বানর সব সময়ে কিচমিচ করে আলাপে ব্যস্ত। এরা সময় সময় গাছ হতে ফল ফেলে বিচরণশীল হরিণকে বাঘ হতে সাবধান করে দেয়।

পাঁচ সাত বছর আগে হুগলির বনে একটি বনকুকুর শিকার করা হয়। বুনো শিকারীরা ডোমকুকুর বলল। ইহারা দেখতে কাল ও ছোট। অষ্ট্রেলিয়ার বনকুকুরের সহিত নামের মিল লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এখানে যেমন জীবজন্তুর বিচিত্র সমাবেশ তেমনি এই চিরসবুজ বাংলার আকাশ-বাতাস নানারকমের জানা-অজানা পাখীর মধুর কূজনে মুখরিত। পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে কত যে পাখী দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই। বুলবুলি, টুনটুনি, ফিঙে, পাপীয়া, কাঠঠোকরা, হলদে পাখী, বউ কথা কও, কুকো, হুতোম তোমা, দোয়েল প্রভৃতি বাংলার ঝোপে ঝাড়ে প্রায়ই দেখা যায়। কাক ও কুকো এক জাতীয়। তবে কুকোর রঙ্ লালচে ও কালোর মিশান ; দেখতেও ভাল। এর ডাকও মন্দ নয়।

বুলবুলি চার জাতীয়—খয়েরি, সাহেব, পটুলে ও বাঁশপাতা বুলবুলি। বুলবুলির মাথায় ঝুঁটি থাকে। খয়েরী বুলবুলির রঙ্ খয়েরি—লেজের গোড়ায় লাল। সাহেব বুলবুলির রঙ্ সাদায় কালোয় মিশান। পটুলে বুলবুলি পটলের মত ছোট ; ইহারা ময়ূরের মত ছোট ছোট পেখম ধরে। বাঁশপাতার বুলবুলের রঙ্ শুকনো বাঁশপাতার মত—ইহাদের লম্বা সাদা লেজ আছে। পাপিয়াও একরকমের বড় জাতীয় বুলবুল। বসন্ত বুলবুল—সবুজ ও লালের সঙ্গে সামান্য একটু সাদায় অতি সুন্দর দেখায়। এরা কাঠ ঠোক্‌রায়, আর মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 'কুক্ কুক্' করে ডাকে।

বাঁশপাতা পাখী প্রায়ই টেলিগ্রাফের তারে বসে লেজ দোলায় ; এদের সবুজ বরণ, চিকণ-গড়ন। দোয়েলের শিস্ সকলেরই প্রিয়। এদের গায়ের রঙ্ সাদায় কালোয় মিশান। দোয়েল কতকটা 'রবিন রেড ব্রেষ্ট' জাতীয়। কাব্যেও দোয়েল স্থান পেয়েছে—'ডাকিছে দোয়েল

ইছে কোয়েল তোমায় কানন সভাতে।' গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামের পথে তকের করুণ 'ফটি-ইক-জল' প্রাণে সাড়া দেয়।

বাবুই, চড়ুই, মুনুয়া, পারুল, ছাতার প্রভৃতি পাখীও যেখানে খানে দেখা যায়। পারুল 'খাস' জাতীয়। সব পাখীই প্রায় জ্যৈষ্ঠ ষাঢ় মাসে বাসা বাঁধে ও ডিম পাড়ে। বাবুই-এর বাসা ভারী সুন্দর; সে তৈরী বাসাগুলো তাল-বাবলা গাছে উল্টো কুজার মত ঝোলে। নুয়া আষাঢ়ে-ধান পাকবার সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ধানের ভুঁই-এ আসে। য়ের চাষীরা ক্যানেস্তারা বাজিয়ে ভুঁই থেকে এদের তাড়ায়।

ছাতার অবশ্য পেঁচা জাতীয় বলেই মনে হয়; এরা চ্যাক চ্যাক শব্দ রতে করতে ডালে ডালে উড়ে বেড়ায়। কুটুরে পেঁচা, কাল পেঁচা ও চার রাজা লক্ষ্মী-পেঁচা রাতের আঁধারে বের হয়। হুতোম-তোমা চাজাতীয় একরকমের মস্ত বড় পাখী। গভীর রাতে হুতোমতোমার ই থুলি, মুই থুলি' ডাক শুনে ছোট ছেলেরা ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে। চকীও মস্ত বড় পাখী। এদের প্রায়ই বিলের ধারে দেখা যায়। ড়গিলেও নির্জন বিলের ধারে মাঝে মাঝে নেমে শিকার খুঁজে বেড়ায়; দের গলায় পিণ্ড থাকে।

শিকারীদের কাছে বালি হাঁস এক লোভনীয় জিনিস। বালিহাঁস ধারণতঃ জলার ধারে দলে দলে নীচে দিয়ে উড়ে যায়। খালবিলের রে গাংচিল (সিগল) নামে একরকমের পাখীদের উড়তে দেখা যায়। দের রং সাদা, ঠোঁট ও পা হলদে।

দু'তিন রকমের বক বিলের ধারে মাছের আশায় নীরবে বসে থাকতে থবা মাঠে কীটপতঙ্গের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মাছরাঙা খতে ভারী সুন্দর; মাছরাঙার গায়ের রঙ্ উজ্জ্বল নীলবর্ণ; এদের য়ই খালবিলের ধারে নল বনে বসে মাছ ধরতে দেখা যায়। লপিপিও একরকমের মাছলোভী পাখী। 'হট্টিমাটিম'ও একরকমের ভুত পাখী। এদের মুখ চেপ্টা আর পা খুব লম্বা।

নীলকণ্ঠ পাখী বাংলার বন আলো করে ঘুরে বেড়ায়। এদের রঙ্ জ্জ্বল নীলাভ,দেখতে অতি সুন্দর; নদীর ধারে প্রায়ই এদের দেখা যায়।

পূর্বে নদীয়ার শালিগ্রামে (মুড়াগাছার কাছে শালিবাহন রাজার জধানী ছিল। এখন বেড়বাঁশে ঘেরা প্রাসাদ ও গভীর পরিখার ংসাবশেষের উপর ঘন বিশাল বন দেখতে পাওয়া যায়। ভগ্নসেতুর চে সুগভীর খাদে বেতবন নেমে গিয়ে ভাষণ জঙ্গলের সৃষ্টি করেছে) য় ৬০ বছর আগে ময়ুর দেখা যেত। বনমুরগী (ফেসাণ্ট) এখনও নামবাজারের বিস্তীর্ণ শালবনে যথেষ্ট মেলে। বনমুরগী সাধারণ মুরগীরই ত তবে একটু চিকণ, লেজলম্বা ও দ্রুত চরণশীল। তিতিরও মুরগী তীয়; এদের গায়ে বাদামি ছিটে ফোঁটা দাগ থাকে। ডাক বা হুকও শিকারীদের অতি প্রিয়। এই সকল পাখী বাংলার বনে প্রায়ই ত্র দেখা যায়। পায়রা, হরিয়াল ও ঘুঘু এখানে যথেষ্ট চোখে পড়ে। য়রার মধ্যে গোলা পায়রাই বেশী দেখা যায়। হরিয়াল ঘুঘু জাতীয় কটু ফিকে সবুজ রঙের। ঘুঘু দেখতে বেশ। বনে-জঙ্গলে প্রায়ই ঘুর 'কৃষ্ণ গোকুল তরাও তরাও' রব শোনা যায়। হরিয়ালও ঘুঘুরও কে যেন একটু বিরহ মাধুর্য্য আছে।

কোকিল ও ময়নার কণ্ঠস্বর বেশ ভাল। ময়না সাধারণতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দেখা যায়। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে বড় বড় গাছের পাতায় লুকাইয়া ডাকে। টিয়া ও চন্দনা পাখী বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বর্তমানে পশ্চিম বাংলার পশুপাখী ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। দেশের অস্বাভাবিক লোকবৃদ্ধিই বন্যজন্তুর লোপ পাবার কারণ। বর্তমানে ভূমি-অসংকুলানের দিনে বনজঙ্গল কেটে কলোনি স্থাপিত হচ্ছে এবং জমি কৃষিকার্যের উপযোগী করা হচ্ছে। বন নিশ্চিহ্ন হওয়াতে এবং সর্বোপরি জনসাধারণের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য বন্য জীবজন্তুর বংশ ক্রমশঃ ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু পূর্বে বন্য পশু এমন অবহেলিত ছিল না। প্রাচীনকালে তপস্বীরা সযত্নে তাদের লালন পালন করতেন। আত্রেয়ী, অজয়, ময়ূরাক্ষী ও ভাগীরথীর তীরে শান্ত রসাস্পদ তপোবন সমূহের মাঝে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াত হরিণ আর ময়ূরের দল। ঋষিরা এদের প্রাণরক্ষার জন্য সর্বদা উন্মুখ থাকতেন। তাই শকুন্তলাতে পাই "মা খলু মা খলু বাস সন্নিপত্যো অয়ম্মিন মৃদুনি মৃগশরীরে তুলারাশৌ ইবাগ্নি। ক বত হরিণকানাং জীবিতং জাতিলোলং ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারা শরাস্তে॥" রাজারা পর্যন্ত তপোবন-মৃগ মৃগয়া হতে নিবৃত্ত হতেন। অরণ্য হস্তী বধের জন্যও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। অশোকের সময় পশুবধ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী যুগে রাজারা নিজেদের পশুপালায় বন্য পশু সমাদরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এও দেশের অরণ্য পশু সংরক্ষণ নীতির বিশেষ রূপ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাট চিড়িয়াখানার কথাও ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শিকারীদের যথেচ্ছ শিকারের আনন্দ দান করতে গিয়ে শত শত নির্বাণোন্মুখ পশুর বংশ ধ্বংস হচ্ছে। এ অবস্থা ভরতের অন্যান্য অংশে যেমন বাংলাতেও তেমনি। এ ছাড়া আবার উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বনভূমি উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে। এতে বনচারী পশুদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ছে। কিন্তু বন ও বন্য পশু-জাতীয় সম্পদ। এদের নির্বংশ হতে রক্ষা করা এবং সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। বাবার মুখে শুনেছি ফ্রান্সের ক্যাভেন্নিস মাল ভূমিতে অরণ্যচারী পনি ঘোড়ার বংশকে নির্ম্মূল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেখানকার সরকার বনরক্ষার বিশেষ বিধি প্রণয়ণ করে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরও এরূপ কোন ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিত। সুখের বিষয় ভারত সরকার কিছুদিন হল যথেচ্ছ শিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এখন আর হাতী, বাঘ বা গণ্ডার শিকার অনুমতি ব্যতীত সম্ভব নয়। সরকার বন সংরক্ষণ ও বন্য জন্তু রক্ষা করেছেন বটে, কিন্তু যে সকল জন্তুর বংশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তাদের আর বংশ-বিস্তার সম্ভব নয়। তাছাড়া অস্বাভাবিক লোক বৃদ্ধির জন্য বন্য জন্তু সংরক্ষণ সহজসাধ্য নয়। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে বন্য পশুপাখী অবলুপ্ত হবে। বাংলার বন উজাড় হওয়ার জন্য জীবজন্তুর বংশ যাও বা অবশিষ্ট আছে, তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং অবিলম্বে জনসাধারণ এবং সরকারের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।
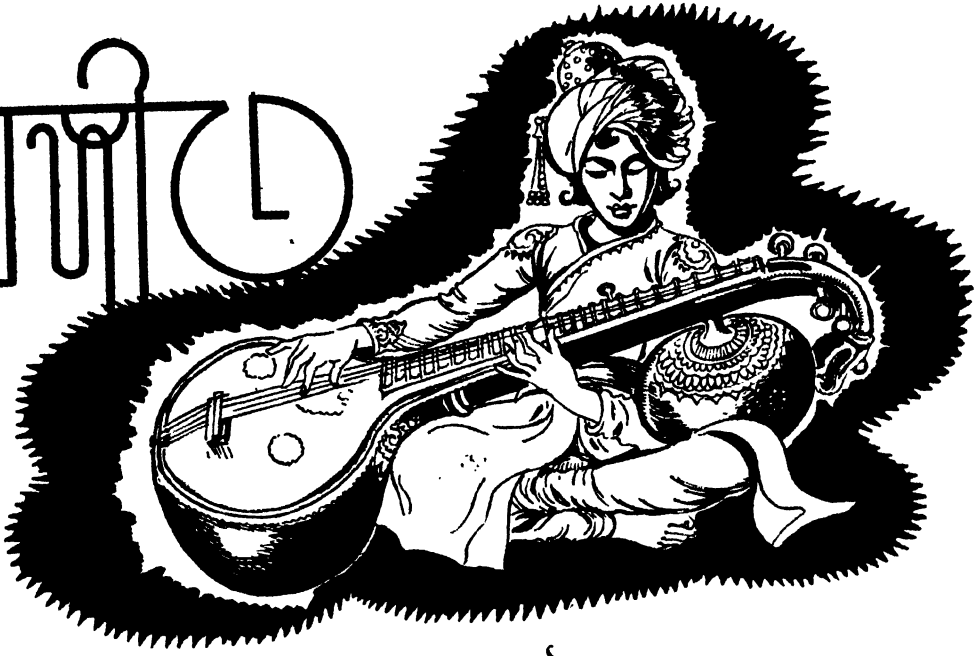
কেদারা। একোণ চৌতাল।*

নমো নমো নমো নমো হে
অন্তরতম নমো হে
সুন্দর-শিব নমো হে
শ্রীঅরবিন্দ নমো হে।
সকল আঁধার হরিয়া
গুরু তুমি এস জীবনে,
তোমার চরণ স্মরিয়া
লভুক আলোক ভুবনে॥

কথা ঃ নৃপেন্দ্রনাথ রায় (পণ্ডিচেরী)   সুর ও স্বরলিপি ঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II	সা	সা	মা	মা	।	মা	মা	।	মা	গা	।	মা	-া	-া	I
	ন	মো	ন	মো		ন	মো		ন	মো		হে	০	০	
I	মগা	-পা	পা	পা	।	পা	পা	।	পা	হ্মা	।	ধপা	-া	-া	I
	অ০	ন	ত	র		ত	ম		ন	মো		হে	০	০	
I	ধা	-র্সা	র্সা	র্সা	।	ধা	ধা	।	পা	হ্মা	।	ধপা	-া	-া	I
	সু	ন্	দ	র		শি	ব		ন	মো		হে	০	০	

I মা -া মা মা | মা -ধা | ধপা মা | রা সা -া I
শ্রী ০ অ র বি ন্ দ ন মো হে ০

I পা পা না ধা | র্সা -া | র্সা র্সা | র্রা র্সা -া I
স ক ল আঁ ধা ০ র চ রি য়া ০

I র্সা র্সা র্মা র্মা | র্মর্গা -র্মা | র্রা র্সা | না র্রর্সা -া I
গু রু তু মি এ০ ০ স জী ব নে ০

I নধা না র্সা র্রা | সনা র্রর্সা | -া নধা | পক্ষা পা -া I
তো০ মা র চ র০ ণ ০ স্ম রি০ য়া ০

I মা মা মা মা | মধা ধপা | মা -রা | রা সা -া II II
ল ভু ক আ লো০ ক ভু ০ ব নে ০

* চৌতালের ১২টি মাত্রা থেকে ১টি মাত্রা কম বলে এই তালটির নাম দিয়েছি 'একোণ চৌতাল'। এটি ১১ মাত্রার তাল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এর আগে ৩+২+২+৪=১১, মাত্রায় 'একাদশী' নাম দিয়ে একটি নুতন তাল রচনা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত 'একাদশী' তালের সঙ্গে একোণ চৌতালের মাত্রা সামঞ্জস্য থাকলেও এই দুটি তালের গতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ 'একোণ চৌতাল' ৪+২+২+৩ গতিচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে।

একোণ চৌতালের ঠেকা ঃ—

১´ ২ ৩ ৪
I ধা ধা ধিন্ ধা | কৎ তাগে | ধিন্ ধা | ধেনে ঘেনে নাগ I
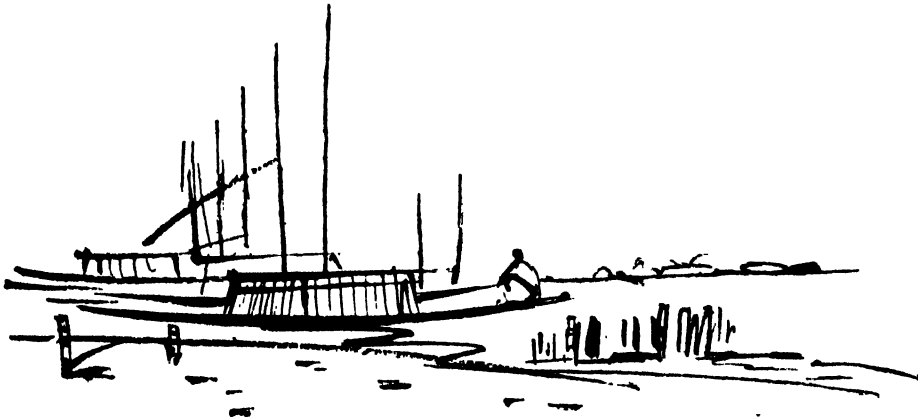
পরিণাম-বাদ

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিণাম-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আত্মনিবেদন'-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—'শ্রীপাদ রামানুজাচার্য একথা অতি উত্তমরূপেই জানিতেন যে, পরিণামে বিকারের আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাঁহার যুক্তি এই যে, শ্রীভগবান অবিচিন্ত্য-শক্তি সম্পন্ন। তাঁহার অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্য প্রভাবে চিদ্‌চিদ্‌ বস্তুসমূহ বিপরিণমিত হয়, কিন্তু তাহাতে তিনি বিকৃত হন না।

শ্রীধর স্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় ইহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা এই—

নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্‌॥

—বিষ্ণুপুঃ।

—কারণরূপে স্থিত সূক্ষ্ম বস্তু পরিণামশক্তি দ্বারা বস্তুতা (স্থূলরূপতা) প্রাপ্ত হয়। বস্তুর দুইটি কারণ আছে—নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্ত হইতে যাহা ভিন্ন তাহা স্থূলরূপ পরিণামের অপেক্ষা করে না। যেমন ধান্যাদির বীজসমূহে সূক্ষ্মাকারে স্থিত অঙ্কুরাদি বৃষ্টি হইলেই স্বীয় পরিণাম-শক্তি দ্বারা ধান গাছ রূপে আপনি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। জগৎ-সৃষ্টিও সেইরূপ।

বীজাদ্‌ বৃক্ষ প্ররোহেণ যথনাপচয়স্তরোঃ।
ভূতানাং ভূতসর্গেন নৈবাস্ত্যপচয়স্তথা॥৩৫
সন্নিধানাদ্‌ যথাকাশ কালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ।
তথৈব পরিণামৈব বিশ্বস্য ভগবান্‌ হরিঃ॥৩৬

—বিষ্ণুপুরাণ, ২।৭

৩৬ শ্লোকের টীকার অর্থঃ সর্বকারণ হরি নিজে নির্বিকার হইয়াও প্রকৃতিরূপে জগতের উপাদান হন। এই প্রকৃতিরই পরিণাম হয়, কিন্তু তদীয় স্বরূপের পরিণাম হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

ব্যাসের সূত্রে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস-ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এই কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্তেতে ধরি॥
নানারত্ন রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃতে বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী আত্ম-নিবেদনধৃত পরমাত্ম সন্দর্ভে বলিয়াছেন—'পরমাত্মা নির্বিকার স্বভাববিশিষ্ট হইলেও নিত্য অবিকৃত পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে বিশ্বাকার পরিণামাদি হইয়া থাকে। চিন্তামণি যেমন অবিকৃত থাকিয়াও রাশি রাশি স্বর্ণ প্রসব করে, পরমাত্মা অবিকৃত থাকিয়াও সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে বিশ্ব প্রকটন করেন।'

ভগবৎ সন্দর্ভে আছে—'নিত্য সত্য পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে এই বিশ্বরূপ পরিণাম। সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপের সন্মাত্র বলিয়া অবভাসিক দ্রব্যাখ্যাশক্তিরূপেই এই পরিণাম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্বরূপের পরিণাম হয় না।

দ্রব্যাখ্যা-শক্তি শ্রীভগবানের সঙ্গিনীশক্তির প্রকারান্তর। ব্রহ্মই যখন বিশ্বের উপাদান কারণ তখন ইহা গীতোক্ত অপরা প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাই দ্রব্যাখ্যা শক্তি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মুখ্য সিদ্ধান্ত

১। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর— এই তিনটি মূল তত্ত্ব।

২। 'চিৎ' জীবের এবং 'অচিৎ' প্রকৃতির নামে। এই প্রকৃতি—অবিদ্যা, মায়া ইত্যাদি।

৩। এই তিনটি তত্ত্বই সত্য এবং নিত্য।

৪। সমস্ত জগতের জন্মস্থিতি সংহার—আদির কারণ পরব্রহ্ম।

৫। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সমস্ত কার্য্যের দুইটি কারণ আছে—একটি উপাদান অপরটি নিমিত্ত। মৃত্তিকানির্মিত-কুম্ভের উপাদান কারণ মৃত্তিকা—নিমিত্তকারণ কুম্ভকার।

৬। জীব; প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক পদার্থ ও ব্রহ্ম—এই তিন পদার্থের সমুদায়কেই 'জগৎ' বলিয়া থাকে।

৭। পরব্রহ্মে কোন দুষ্টগুণ (হেয়গুণ) নাই। তিনি সমস্ত কল্যাণগুণে পরিপূর্ণ।

৮। পরব্রহ্মজ্ঞানানন্দস্বরূপ। তিনি জ্ঞান, শক্তি, বল ঐশ্বর্য্য, বীর্য, তেজঃ আদি অনন্ত গুণবান্‌। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি এব সর্বব্যাপী।

৯। জীবজ্ঞানানন্দ স্বরূপ। জ্ঞান গুণবান এবং অনন্ত। তাঁহার পরিমাণ 'অণু'।

১০। জীব অনাদি। অবিদ্যা (অজ্ঞান) বশে সঞ্চিত পুণ্য-পাপরূপ

কর্মের করণ প্রকৃতি সম্বন্ধে (শরীরাদি সম্বন্ধ) রূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। জীবের স্বাভাবিক স্বরূপ জ্ঞানানন্দাত্মক প্রকৃতি সম্বন্ধ হেতু তাঁহার স্বাভাবিক স্বরূপ আচ্ছাদিত হইয়া যায়।

১১। প্রকৃতি—সত্ত্ব রজস্তমোগুণময়া, ত্রিগুণাত্মিকা সর্বদা পরিণাম শালিনী। নানা বিকার উৎপন্নকারিণী মূল প্রকৃতি এক এবং নিত্যা।

১২। অসৎ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হয় না। একপ্রকার অবস্থাযুক্ত এক পদার্থের অন্যপ্রকার অবস্থাপ্রাপ্তিকে উৎপত্তি বলে। সে অবস্থা ত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির নাম নাশ। মৃত্তিকারূপ এক বস্তু প্রথম যখন পিণ্ডাবস্থাযুক্ত থাকে তাহাকে মৃত্তিকা বলা হয়। ঐ মৃত্তিকা যে সময় কপাল এবং উদরযুক্ত হইয়া ঘট আকারে পরিণত হয়, তখন ঐ মৃত্তিকাকে ঘট বলা হয়। ঐ মৃত্তিকা পুনরায় ঘট অবস্থা ত্যাগ করিয়া চূর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। ইহার দ্বারা দেখা গেল একই মৃত্তিকা নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকার অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম ঘটের উৎপত্তি, আর ঐ ঘটের চূর্ণতা অবস্থা প্রাপ্তির নাম নাশ। এইরূপ উৎপত্তি নাশ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

১৩। সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় অবস্থায় চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (প্রকৃতি) এই সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। যেমন সৃষ্টির পর পৃথিবী, জল আদি নানা নাম এবং বহুবিধরূপ হয় ; প্রলয় দশায় ঐরূপ থাকে না, জীবের স্থিতিও ঐরূপ জানিবে। ঐ সূক্ষ্ম অবস্থাকে কারণ অবস্থা বলে। সৃষ্টিকালে চিৎ ও অচিৎ এতদুভয়ের স্থূল অবস্থা প্রাপ্তি হয় এবং নানা প্রকার নাম হয়। এইরূপ স্থূল অবস্থা প্রাপ্তিই ইহাদের উৎপত্তি। এই স্থূল অবস্থার নাম কার্য্যাবস্থা।

১৪। পরিণামশীলা প্রকৃতির সূক্ষ্ম এবং স্থূল অবস্থা প্রাপ্তি, মৃত্তিকার পিণ্ডত্ব অবস্থা এবং ঘটত্ব অবস্থা-প্রাপ্তির তুল্য। সূক্ষ্ম অবস্থা যুক্ত প্রকৃতি স্থূলরূপে পরিণত হয়। জীব স্বরূপ পরিণাম রহিত। অতএব জীবের স্থূলাবস্থা সূক্ষ্মাবস্থা পরিণামের কারণ নহে। কিন্তু প্রলয়দশায় জীবের শরীরাদি শূন্য হওয়ার কারণ জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে। সৃষ্টিকালে স্থূল শরীর প্রাপ্তির হেতু জ্ঞানের বিকাশ হয়: এই জ্ঞানের সঙ্কোচ এবং বিকাশ ; জীবের সূক্ষ্ম এবং স্থূল অবস্থার কারণ। অর্থাৎ সঙ্কুচিত ভাবে জ্ঞানবান্ হওয়া সূক্ষ্ম অবস্থা এবং বিকসিত জ্ঞানবান্ অবস্থা। এই দুই অবস্থার কারণ জীবে উৎপত্তি এবং বিনাশের ব্যবহার হয়। জীব স্বরূপত নিত্যনির্বিকার।

১৫। চিদচিদাত্মক সমস্ত প্রপঞ্চ পরব্রহ্মের শরীর ভূত। যেরূপ পাঞ্চভৌতিক হস্তপদাদি যুক্ত শিশু জীবের শরীর, ঐরূপ চেতন এবং অচেতন পরব্রহ্মের শরীর। শরীরের ভিতর যেরূপ জীবের সত্তার দ্বারা ধারণ হয়, ঐরূপ চেতনও অচেতন পদার্থে পরমাত্মার সত্তার দ্বারাই উহার ধারণ হয়। পরমাত্মা সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণ ধারণ আদি করিয়া থাকেন।

১৬। উৎপত্তি এবং নাশ অবস্থা বিশেষের প্রাপ্তি (১২দেখ)। পরব্রহ্মেও সৃষ্টি এবং প্রলয় দশাতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয়। প্রলয় অবস্থায় পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম অবস্থা যুক্ত প্রকৃতি এবং জীবে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন। সূক্ষ্ম অবস্থা যুক্ত জীব এবং প্রকৃতি চিৎ অচিৎ এই উভয়ের আত্মরূপে স্থিতি এক অবস্থা এবং স্থূল অবস্থাযুক্ত জীব এবং প্রকৃতির আত্মস্বরূপে অবস্থান এক অবস্থা। প্রথমটী কারণ অবস্থা, দ্বিতীয়টী কার্য্যাবস্থা। যেরূপ একই মৃত্তিকা পিণ্ডত্ব অবস্থায় যুক্ত থাকিয়া কারণ এবং ঘটত্ব অবস্থায় যুক্ত হইয়া কার্য নামে কথিত হয়। এইরূপই পরব্রহ্ম ও সূক্ষ্ম অবস্থা যুক্ত থাকিলে কারণ এবং স্থূল অবস্থা যুক্ত হইয়া কার্য হন। অতএব ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং ব্রহ্মই জগৎ।

১৭। স্থূল অবস্থাযুক্ত চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (জড়পদার্থ প্রকৃতি) এই দুইটী পরব্রহ্মের শরীর (১৫ দেখ)। এইরূপ শরীর হওয়ার কারণ —ইহারা পরব্রহ্মের বিশেষণ। অর্থাৎ এই দুই পদার্থের পরব্রহ্মের প্রতি শরীর হওয়ায় বিশেষণত্ব। এই দুই পদার্থের পরব্রহ্ম আত্মা। অতএব এই দুই (জীব ও প্রকৃতি) বিশেষণের দ্বারা তিনি যুক্ত। এই কারণে পরব্রহ্মকে চিদচিদ্বিশিষ্ট বলা হয়। ইহার তাৎপর্য—চিৎ এবং অচিতের সহিত যুক্ত হইয়াই অবস্থান করেন, অর্থাৎ চিৎ (জীব) অচিৎ (প্রকৃতি) উভয়ের অন্তরাত্মা হইয়া সম্বন্ধ থাকায় পরব্রহ্মে চিদচিদ্ বৈশিষ্ট্য। চিৎ এবং অচিতের সূক্ষ্ম এবং স্থূল অবস্থা প্রাপ্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে (১৩ ও ১৪ দেখ।) এই দুই অবস্থাতেই এতদুভয় পরব্রহ্মের শরীর। অতএব পরব্রহ্ম স্থূলাবস্থাযুক্ত চিদচিদ্ বিশিষ্ট (চিদচিচ্ছরীরক) এবং সূক্ষ্ম অবস্থাযুক্ত চিদ্ অচিদ্ বিশিষ্ট। পরব্রহ্ম এক অতএব সিদ্ধ হইল স্থূলাবস্থাযুক্ত চিদ্ চিদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্ম, এবং সূক্ষ্ম অবস্থা যুক্ত চিৎ চিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম—এই উভয়েই অদ্বৈত অভেদ। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শব্দের অর্থ।

১৮। দেব মনুষ্যাদি নানা শরীরে অবস্থান করিলেও যেরূপ জীবের উপর শরীরগত দোষের সম্বন্ধ হয় না, ঐরূপই চিদ্চিদাত্মক (জীব এবং প্রকৃতি) সমস্ত প্রপঞ্চে পরব্রহ্ম অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিলে ও জীব এবং জড়ের দোষে পরব্রহ্মের সম্বন্ধ হয় না। অর্থাৎ পরব্রহ্মে উহাদের দুর্গুণের প্রভাব উপস্থিত হয় না।

১৯। জীবের অনাদি অবিদ্যা সঞ্চিত কর্মের সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধ হেতু স্বাভাবিক স্বরূপ তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত আছে (৯ ১০ দেখ)। কর্ম সম্বন্ধ হইতে পরিত্রাণ পাইবার পর স্বাভাবিক স্বরূপের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতি মণ্ডল হইতে বহির্গত হইলে ঐরূপ হয়। প্রকৃতি মণ্ডল পার হইয়া অপ্রাকৃত পরমপদে উপস্থিত হইলেই স্বাভাবিক স্বরূপের আবির্ভাব হয় ; অনন্তর পরব্রহ্মের অনুভব হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতি মণ্ডল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপ্রকৃতি লোকে যাইয়া স্বাভাবিক স্বরূপের আবির্ভাব হইলে পরব্রহ্মের অনুভব প্রাপ্তিই মোক্ষ।

২০। মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় ভক্তি (উপাসনা)। তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে এবং ঐধ্যান অনবরত করার হেতু প্রত্যক্ষের মত হইয়া যাইবে। পরব্রহ্মে অত্যন্ত প্রীতি হেতু তিনি অতীব প্রিয় হইবেন--উহার নাম 'ভক্তি'। প্রতিদিন ফল কামনা ও কর্তৃত্ব ত্যাগ করতঃ বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি সিদ্ধ হয়। ঐ ভক্তির দ্বারা পরব্রহ্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়।

মোহিতলাল ও বাংলা সনেট

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার

বাংলার বিশিষ্ট কবি-সমালোচক ও মনীষী মোহিতলালের নাম আজ অনেকের নিকট সুপরিচিত। বঙ্গ সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তিনি এক ক্ষুদ্র অথচ অতি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার প্রতিভা লোকোত্তর নয়, তথাপি একনিষ্ঠ বাণীব্রতীরূপে তিনি সুদীর্ঘকাল সারস্বত সাধনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক ও প্রখ্যাত ছান্দসিক। কিন্তু শুধু কবি-সমালোচক বা ছন্দবিৎরূপে নয়, সনেট-রচনার মত দুরূহ শিল্পকর্মেও তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অসামান্য না হইলেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। বাংলা-সনেট সাহিত্যে তাঁহার ভূমিকার একটা বিশেষ মূল্য আছে। মহাকবি শ্রীমধুসূদনের হস্তে যে বাংলা সনেটের সূত্রপাত মোহিতলালে তাহার যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এই জীবন-রসিক ও সত্য-সুন্দরের উপাসক কবি যে একজন উৎকৃষ্ট সনেট-রচয়িতা তাহা অনেকের কাছে নূতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু মধুসূদন-শিষ্য মোহিতলাল কবি শ্রীমধুসূদন-প্রবর্তিত এই কবিতাধারার ধারক-বাহক রূপে তাঁহার কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

এখন সনেটের গঠন পদ্ধতির একটু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, সনেট একজাতীয় মন্ময় কবিতা। কিন্তু অন্যান্য কবিতা হইতে এই জাতীয় কবিতার পার্থক্যও যথেষ্ট। সনেট রচনার পক্ষে প্রয়োজন এক অতিশয় সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি, কবিহৃদয়ে আবেগের দুর্লভ মুহূর্তেই এই জাতীয় কবিতার জন্ম। কিন্তু আবেশ-অনুভূতির উৎসমুখে এই জাতীয় কবিতার জন্ম হইলেও ইহার কায়াগঠনে থাকে নিয়ম শৃংখলার তথা ছন্দ-মিলের দুর্বার শাসন। এক কথায়, সনেট কবিহৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির নিয়মনিগড়বদ্ধ কাব্যরূপায়ন। তাই কবি D. G. Rosetti সনেট সাহিত্যের এইরূপ দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন: A Sonnet is a moment's moment. অর্থাৎ সনেট রচয়িতাকে এক মুহূর্তের মধ্যেই এক ইমারত গড়িয়া তুলিতে হয়; সময় তাহার অতি অল্পই থাকে. অথচ তাহাকে এই স্বল্পক্ষণের মধ্যেই এক অতি দুরূহ শিল্পসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিতে হয়। তাই একালের এক প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিকও লিখিয়াছেন:

> ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
> শিল্পী যাহে মুক্তি লভে,—অপরে ক্রন্দন।

কবি Theodore Watts Dunt তাঁর "Sonnet" নামক কবিতায় বলিয়াছেন:

> A sonnet is a wave of melody:
> From heaving water of the impassioned soul,
> A billow of tidal music one and whole
> Flows in the 'Octave', then returning free
> Its ebbing surges in the 'testet' roll
> Back to the deeps of life's tumultuous sea.

সনেটের চৌদ্দটি চরণের মধ্যে দুইটি ভাগ থাকে—অষ্টক ও ষটক; প্রথম অংশে একটি ভাবের উদ্বোধন হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে ঐ ভাবেরই সুসঙ্গত সমাপ্তি ঘটে। পেত্রার্কীয় সনেটের এই দুই ভাগের এইরূপ তাৎপর্য আছে। প্রথম আট চরণ লইয়া একটি অষ্টক গঠিত হয়—অষ্টকের মধ্যে আবার থাকে দুইটি চতুষ্ক (quatrain) এবং ষটকের মধ্যে থাকে দুইটি ত্রিপাদিকা (teryetts)। অষ্টকের প্রথম চার পংক্তিতে একটা কিছু প্রস্তাবিত ও দ্বিতীয় পংক্তি চতুষ্টয়ে তাহা প্রমাণিত হইবে; ষটকের প্রথম তিন চরণে এই প্রমাণকেও দৃঢ়তর করা হইবে এবং শেষ তিন পংক্তিতে সমগ্র ভাববস্তুর একটি সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা হইবে। তবে সর্বত্র যে ঠিক এইরূপে ভাবের উত্থান-পতন ঘটিবে তাহা নাও হইতে পারে। মোটামুটি প্রথম ভাগে থাকিবে একটি প্রশ্ন, দ্বিতীয়টিতে তাহার উত্তর প্রথমাংশে বিষয়, দ্বিতীয়ভাগে তাহারই হেতুনির্দেশ।

বাংলায় ১৪ অক্ষরই সনেট রচনার পক্ষে প্রশস্ত। তবে ১৮ অক্ষরের সনেটও লেখা যায়। এক্ষেত্রে কবির দায়িত্ব বেশী থাকে—ভাষাকে গাঢ়বদ্ধ করিবার জন্য অধিক সচেষ্ট হইতে হয়। মুক্তবন্ধ সনেটে সর্বশেষের দুই চরণ থাকে একটি সমিল যুগ্মক। সাধারণতঃ সনেটের মিল-বিন্যাস এইরূপ: কখখক কখখক গঘঙ গঘঙ, বা কখখক কখখক গঘ গঘ গঘ অথবা কখ কখ গঘ গঘ ঙচ ঙচ ছছ প্রভৃতি। শেক্সপীয়র প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিক যে ধরণের সনেট লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা romantic বা মুক্তবন্ধ সনেট বলিতে পারি। মহাকবি শেক্সপীয়র ইটালীয় কবি পেত্রার্কের সনেটের মিল-বিন্যাস অনুসরণ করেন নাই। মুক্তবন্ধ সনেটের শেষে থাকে একটি একই মিলনযুক্ত যুগ্মক। সনেটের মধ্যে ভাবগত বা আঙ্গিক মিল-বিন্যাস দুইই থাকা চাই।

বাংলা সনেট-সাহিত্য আজ সুসমৃদ্ধ। বাংলার সনেট-গঙ্গার ভগীরথ মহাকবি মধুসূদন একদা লিখিয়াছিলেন: It cultivated by men of genius our sonnets in time will rival the Italian. বাংলা সনেট সম্বন্ধে মহাকবির একান্ত আশা আজ সার্থক হইতে চলিয়াছে। অবশ্য মধুসূদন "ইটালীয় সনেট" বলিতে কবি পেত্রার্ক প্রবর্তিত সনেট বুঝিয়াছেন। মধুসূদনের "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" সনেট-সমষ্টি। তাহার পর কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের

"অশোকগুচ্ছে" ভাবগভীর ঘন সংহত সনেটের সন্ধান পাওয়া যায়। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি সনেট লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আধুনিক যুগে যাঁহারা সনেটের ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তন্মধ্যে কবি মোহিতলাল মজুমদার, অধ্যাপক সুশীলকুমার দে, কবি অজিত দত্ত ও সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর নাম উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথকেও সনেট-রচয়িতা বলিয়া থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে (চৈতালী, নৈবেদ্য ইত্যাদি) যদিও এক অখণ্ড ভাব আছে তথাপি তাহাতে সনেটের আঙ্গিক সম্পূর্ণতা নাই। তাই বিশ্বকবির ঐ কবিতাসমূহকে চতুর্দশপদী বলা গেলেও সনেট বলা সমীচীন হইবে না। এইবার সনেটের দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মহাকবি মধুসূদনের লিখিত একটি উৎকৃষ্ট সনেট মিল-বিন্যাস সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

সায়ংকালে তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি, ক
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ? খ
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে খ
রতন তোমার মত, কহ সহচরি ক
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী ক
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে ? খ
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে খ
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না সর্বরী ? ক
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে গ
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে ঘ
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে, গ
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ? ঘ
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে ? গ
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে। ঘ

মধুসূদন বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে সনেট রচনা করিয়াছেন। দেশী-বিদেশী কবি ও পণ্ডিতগণের সম্বন্ধেও তাঁহার কয়েকটি সনেট আছে। তাঁহার 'কাশীরাম দাস' 'কবি' 'সীতাদেবী' 'কপোতাক্ষ নদ' 'বিজয়া দশমী' 'কবিবর আলফ্রেড টেনিসন', 'ভিকতর হুগো' প্রভৃতি সনেট বিশেষ প্রসিদ্ধ। মধুসূদনের সনেটের মধ্যে পেত্রার্কীয় এবং মিশ্ররীতির সনেট আছে। রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, রাধানাথ রায় প্রভৃতি লেখক মধুসূদনের সনেটরচনা রীতির অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সনেটরচনায় তাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

ইহার পর কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের হস্তে বাংলা সনেট গাঢ় সংহত শ্রীধারণ করে। তাঁহার সনেটগুলি সংহত ও ভাব-গভীর। সনেটের রূপকর্ম ও ছন্দোবন্ধের অনুশাসন দেবেন্দ্রনাথের অতিশয় আবেগ-প্রবণ কবি-প্রতিভার বিকাশের পক্ষে একরূপ অনুকূলই হইয়াছে। তিনি ইটালীয় বা রোমান্টিক দুটি রীতির কোনটিকেই হুবহু অনুসরণ করেন নাই—তৎপরিবর্তে তাঁহার সনেটে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে বলা চলে মিশ্ররীতির অনুসরণ। দেবেন্দ্রনাথের সনেট শেষ দুই চরণে অন্ত্যমিযুক্ত, ছন্দোবিচারে কবির অধিকাংশ সনেটই মুক্তবন্ধ। তাঁর সনেটে প্রত্যেকপদে অক্ষরের সংখ্যা আঠারো। তাঁহার অন্যান্য কবিতার মত সনেটেও ইন্দ্রিয়োল্লাসপূর্ণ বর্ণনা প্রবল। ফুল, প্রকৃতি, প্রেম, দেশী-বিদেশী কবি-সাহিত্যিক ও আত্মমনোভাব প্রভৃতি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ সনেটরচনা করিয়াছেন। 'বিয়েট্রিস', 'ডেসডিমোনা' 'ভ্রমর', 'ইলা', 'সোনার শিকলি', 'যশ', 'ব্রজেন্দ্র ডাকাত', 'চিত্তরঞ্জন' প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথ-রচিত উল্লেখযোগ্য সনেট। কবির "অশোকগুচ্ছ" কাব্যের একটি সনেট "রাক্ষসী" এইরূপ :—

বসন্তের উষা আসি রঞ্জি' দিল যুগল কপোলে ক
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি আননে প্রিয়ার ! খ
নিদাঘের রৌদ্র আসি ঝিলমিল ললাট নিটোলে ক
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা ছটার ! খ
ঘন ঘোর বর্ষারাতি বিহরিল অলক-নিচোলে ক
তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার খ
নাচিলে শরৎশশী রূপহ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে ক
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার ! খ
রাহু-কেতু—দুই ঋতু শীত ও হেমন্ত শুধু হায়, গ
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি' ছড়াইল কঠিন তুষার ! খ
তাই বুঝি, তাই প্রিয়ে সুকঠিন হৃদয় তোমার ? খ
উপাসনা আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায়। গ
আমি গো বুঝিতে নারি—দেবী তুমি অথবা রাক্ষসী ! ঘ
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিম্বা ঘোর কৃষ্ণা চতুর্দশী ! ঘ

অতঃপর স্বতঃই কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের কথা আসিয়া পড়ে। তাঁহার সনেট তেমন গীতিরসোচ্ছল নয়, যদিও তাঁহার সনেটের ভাষা বেশ গাঢ় বদ্ধ। বড়াল-কবির সনেটের ত্রুটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোহিতলাল লিখিয়াছেন : অক্ষয়কুমারের সনেট নাগপাশের পীড়নেও ভাবের গভীরতা বা বন্ধন মুক্তির অধীরতা লাভ করে না, ছন্দেরও তেমন গীতি-মুখরতা নাই ; এ যেন একটি সুন্দর কৌটায় একটি সুস্পষ্টভাব বা সুন্দর চিন্তাকে সযত্নে ভরিয়া রাখা। তাঁহার সনেটগুলি ভাবে ও ভাষায় যেমন সুসমৃদ্ধ, গীতিরসে তেমন সমুজ্জ্বল নয় ("বাংলা কবিতার ছন্দ")। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের একটি সনেটের মিল-ক্রম এইরূপ—

মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ কবিগণ ক
লইলা বাঁটিয়া সুধা অমরা-বিভব। খ
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্মল কিরণ ; ক
নিল ঐরাবতে মধু—দ্বিতীয় বাসব। খ
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন ক
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ। খ
বিহারী—করুণালক্ষ্মী—করুণলোচন ; ক
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ। খ

তুমি মন্থনের শেষে আসিলে যোগেশ গ
উঠিল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল ! ঘ
কাল-কূট-কটুগন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ— গ
সুর-নর-যক্ষ-রক্ষ আতঙ্কে বিহ্বল ! ঘ
প্রজাপতি যুক্তকর—রক্ষ বিশ্বপ্রাণ, ঙ
মূর্তিমান প্রেমমন্ত্র—সাক্ষাৎঈশান ! ঙ

(ঈশানচন্দ্র—শঙ্খ)

সুসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীও সনেট লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। একহিসাবে তাঁহার সনেটগুলিকে বীরবলী গদ্যরীতিরই কাব্যরূপায়ণ বলা যাইতে পারে। "সনেট পঞ্চাশৎ"-এ বীরবল ফরাসী সনেটকারদের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ফরাসী মানসের বুদ্ধিদীপ্তি ও মনন-ধর্মিতা তাঁহার সনেটে বিদ্যমান। শেক্সপীয়রের সনেটের গীতিমূর্ছনা, মিল্টনের উদাত্ততা বীরবলের সনেটে অনুপস্থিত, তাঁহার সনেটের ভাবও প্রগাঢ় নহে। এ সনেটের ভাষাভঙ্গী পরিহাস-চটুল ও শ্লেষাত্মক—ফরাসী মনের সুতীক্ষ্ণ মোহমুক্ত জীবন-সমালোচনার বৈশিষ্ট্যে তাহা স্বতন্ত্র। বীরবলী সনেটের বিশেষত্ব সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেন বলিয়াছেন : তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয়সকলকে লঘুভাবে এবং লঘু বিষয়-সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু—তাঁহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দেশভঙ্গী আছে যে তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন কথাটিই বা অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন। "ভাববিন্যাসের দিক্ দিয়া শুধু নয়, রূপকল্পের দিক দিয়াও তাঁহার সনেটের বৈশিষ্ট্য আছে। বীরবলী সনেটে ষটকের বিন্যাস নূতন—শেক্সপীয়রের সনেটে অন্তিম চরণ দুইটিতে সমগ্র সনেটের আবেগ অনুভূতি কেন্দ্রায়িত হইয়া উঠে; প্রমথ চৌধুরী ঐ অন্তিম পয়ারটিকে ষটকের প্রথমে আনিয়াছেন। তাঁহার সনেটে ষটকের শেষাংশে থাকে একটি চতুষ্পদী। বীরবলের লেখা "ভাস", "জয়দেব", "ভর্তৃহরি" প্রভৃতি কবিপ্রশস্তিমূলক সনেট। তাঁহার "বালিকা বধূ", "বসন্তসেনা", "কাঠ মল্লিকা", "গোলাপ", "বার্ণাডশ", "শিখা ও ফুল", "পাষাণী" প্রভৃতি সনেটে আছে এক অম্লমধুর রস। প্রমথ চৌধুরীর "কাঁঠালী চাঁপা" সনেটটি উদ্ধরণ-যোগ্য।

কাঁঠালি চাঁপা

গড়নে গহনা বটে, রঙেতে সবুজ,— ক
ফুলের সবর্ণ নহ, বর্ণচোরা চাঁপা ! খ
বৃথা তব গন্ধভারে গর্বভরে কাঁপা খ
ফিরেও চাহে না তোমা নয়ন অবুঝ ॥ ক
নেত্রধর্ম খুঁজে ফেরা গোলাপ, অম্বুজ। ক
উপেক্ষিতা আছ তুমি, হয়ে পাতা চাপা। খ
তোমার কাঁঠালী গন্ধ নাহি রহে ছাপা,— খ
ছুটে আসে ভেদ করি পাতার গম্বুজ ॥ ক
ঠিক করে হও নাই পাতা কিম্বা ফুল ;— গ
দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল ? গ
পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হতে গন্ধ, ঘ
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার, ঙ
সর্ব ধর্ম সমন্বয় লোভে হয়ে অন্ধ— ঘ
স্বধর্ম হারিয়ে হ'লে সর্বজাতি বার ! ঙ

এখন মোহিতলালের সনেটের বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। তাঁহার সনেটগুলি এক অপরূপ ভাব-দ্যুতিতে ও লাবণ্যে সমুজ্জ্বল। তাহাতে একদিকে যেমন আছে ভাষার গাঢ়বদ্ধতা ও অতি সুকঠিন সংযম-শাসন, অন্যদিকে তেমনই আছে ঐ ছন্দমিল-সম্পুটে বিবৃত লঘু গম্ভীর ভাববিস্তার। কবির আবেগের দুর্দমনীয়তা সেখানে মিল-বিন্যাসের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়াছে এবং তাহাতেই উহা এক অপূর্ব সংযম-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। বীরবলের সনেটের পরিহাস-রসিকতা বা তির্যক বচনভঙ্গী কিম্বা শ্লেষাত্মক মন্তব্য মোহিতলালের সনেটে নাই। তাঁহার গদ্যরচনাভঙ্গী যেমন গুরু-গম্ভীর—তাহার আলোচনার বিষয়বস্তু যেমন গাম্ভীর্যপূর্ণ, তাঁহার সনেটও সেইরূপ ভাব-গভীর। মোহিতলালের "পয়ার," "বঙ্গলক্ষ্মী", "রূপার্টব্রুক," "সত্যেন্দ্রনাথ" "শরৎচন্দ্র," "এক আশা," "বিদায়" প্রভৃতি কবিতা সনেট-সঞ্চয়নে এক একটি উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু মোহিতলাল শুধু চতুর্দশপদী সনেট রচনা করেন নাই, চতুরশীতি পদবিশিষ্ট সনেটও তিনি লিখিয়াছেন। মোহিতলালের অনেক সনেট পেত্রার্কীয়; কি ভাববিস্তার, কি মিল-বিন্যাস সব দিক দিয়াই তিনি বিশ্বস্তভাবে ইটালীয় কবি পেত্রার্ক ও ইংরাজ কবি মিল্টনকে অনুসরণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার দুই-একটি সনেট তেমন গীতিকাব্যরসোচ্ছল হয় নাই, ভাষার গাঢ়বদ্ধতা সেখানে কাব্যরসোপভোগের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

"স্বপন পসারী," "বিস্মরণী," "স্মরগরল," ও "হেমন্ত গোধূলি"—এই কয়খানি কাব্য লিখিয়াই মোহিতলাল বাংলা কাব্য-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার "স্মরগরল" পরিণত মানসের সৃষ্টি। এ কাব্যের আবেগোচ্ছ্বাস লিরিক, কিন্তু ভাষাভঙ্গী ক্লাসিকাল! "স্মরগরল"-এর প্রথমাংশের নাম 'স্মরগরল'; ইহার দ্বিতীয় অংশ 'প্রেম ও ফুল', ফুলের মতই ইহা কমনীয় ও গীতিকাব্যরসোচ্ছল। ঐ কাব্যের অন্তিমাংশের নাম "সনেটসমূহ", ইহাতে আঠারটি সনেট আছে। 'সনেট'-কাররূপে মোহিতলালের যথাযোগ্য স্থান ও মাননির্ণয়ে আমাদের দৃষ্টি মুখ্যতঃ এই কবিতাগুলির উপরই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। "স্মরগরল" কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন : 'স্মরগরলে'র কবিতাগুলিতে আমার নিজস্ব স্টাইল আরও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সেই স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। ইংরাজীতে যাহাকে রচনার Form বলে তাহাই এতদিনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। ** এই 'Form'-এর একটি স্থূল দৃষ্টান্ত সনেট নামক কবিতা, যদি সেই সনেট খাঁটি সনেট হয়। স্থূল বলিলাম এইজন্য যে, সনেটের 'Form' কতকটা কৃত্রিম—উহা একটা সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ণ।

কিন্তু কাব্য সাধারণের ঐ "রূপ," প্রত্যেক কবিতায় স্বতন্ত্রভাবে তাহারই মত হইয়া ফুটিয়া উঠে। কবির নিজের কথাগুলি তাঁহার অন্য কবিতার মত সনেট-সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ভাববস্তু ও রূপ-কর্মের দিক দিয়া তাঁহার সনেটগুলি খাঁটি ইটালীয় সনেটই হইয়াছে।

মোহিতলালের সনেটগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) ছন্দ-বিষয়ক সনেট (২) কবি-সাহিত্যিক ও বিরাট ব্যক্তিত্ব বিষয়ক সনেট (৩) প্রকৃতির রূপ-শোভা ও (৪) আত্মভাবনামূলক সনেট এবং (৫) বিবিধ বিষয়ক সনেট। মোহিতলালের 'পয়ার' কবিতাটি ছন্দ সম্পর্কে লিখিত। এখানেও কবি কামনা করিয়াছেন স্বর্ণতন্ত্র সপ্তস্বরার উদার উদাত্ত গীতি। মহাকবি মধুসূদন পয়ারের যে মুক্তধারা বঙ্গের কপিল-আশ্রমে প্রবাহিত করেন, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যে সেই পয়ারই নবগতিতে নূতন ছন্দে মহোল্লাসে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তথাপি কবি চাহেন পয়ারের নির্বাধ প্রসার—তাহাতে থাকিবে মহাশূন্যের অনন্ত ব্যাপ্তি ও মহাসমুদ্রের উদাত্ত সঙ্গীতধ্বনি। তাই কবির জিজ্ঞাসা—

এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর নিক্কণ ?
কোথায় জাহ্নবীধারা—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে ?

সাহিত্যিক ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ক সনেটের মধ্যে পড়ে "সত্যেন্দ্রনাথ," "শরৎচন্দ্র" "রুপার্ট ব্রুক" ও "বিবেকানন্দ" নামক কবিতা। কবি সত্যেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ-উপলক্ষে 'সত্যেন্দ্রনাথ' সনেটটি লিখিত। "বিস্মরণীর" 'সত্যেন্দ্র বিয়োগে' কবিতায় কবি ঐ 'ছন্দের যাদুকর'কে 'বাংলা বুলির বুলবুলি বলিয়াছেন।

তাপস তুমি ! তপের বলে আনলে সকল বিঘ্ন নাশি'
ছন্দ ভাগীরথীর ধারা—উঠল জীয়ে ভস্মরাশি !
মৌনমৃত যাদের বাণী সংস্কৃতের পাতাল পুরে-
জয়-জয়ন্তী গাইল তারা নতুন করে তোমার সুরে !

আষাঢ়ের অমানিশা-শেষে সত্যেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন। বাহিরে বিদ্যুৎচমক, মেঘের গুরুগর্জন, আদ্রবায়ুশ্বাস ও চন্দ্রহারা ক্ষুব্ধ হাহাম্বরের মধ্যে কবির এই মৃত্যু মোহিতলালের কবি-মানসে জাগাইয়াছে জিজ্ঞাসা—এ কবি তাই প্রশ্ন করিয়াছেন :

পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'—দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ—
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে ?

"শরৎচন্দ্র" সনেটটি শরৎ-মানস ও শরৎ-সাহিত্যের চমৎকার দিগ্‌দর্শন। শরৎচন্দ্র বাণীর সেই অজ্ঞাত অখ্যাত পুজারী—যাঁহার দৃষ্টি অমৃতের সন্ধানে ডুবিয়াছিল মানুষের অন্তহীন হৃদয় সমুদ্রে—শবের উপর বসিয়াই এই শব-সাধকের সাধনা ; সে সাধনা নীলকণ্ঠের মতই অসামান্য। আর সেই বীরাচারীর সাধনায় ফল হইল এই—

যা কিছু কুৎসিত, হেয়, তারে তার চিত্ত-প্রবাহিনী
করাইল পুণ্যস্নান, মুহূর্তে সে কালিমা মিলায় !
চাহিনি যাহার পানে ভুলে কভু, তারে আজ চিনি
মূল্য তার ধরা প'ল হৃদয়ের নিকষ শিলায় !

'রূপার্ট ব্রুক' একটি দীর্ঘ সনেট। ইহাতে চৌদ্দটি করিয়া অনেকগুলি এক ছন্দের পংক্তি পদবন্ধের মতই একই ভাবসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাকে Sonnet sequence বা সনেট-পরম্পরা বলা যাইতে পারে। রূপার্ট ব্রুক-রচিত 1914 and other poems পাঠ করিয়া কবি এত মুগ্ধ হন যে এই সনেটে বিদেশী কবির উদ্দেশে তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। কবি তাঁহার জীবনবাদের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পান ব্রুকের কবিতাগুলিতে তাই এই সনেটে বলেন :—

যে সরল সত্য-মন্ত্রে জীবনের আমিও পূজারী—
তারি ছন্দ, তারি সুর, অনবদ্য প্রকাশ তাহারি
মর্মরি উঠিল মর্মে—এক আশা, এক ভালবাসা !
মনে হ'ল যে বিহঙ্গ স্বপ্নে মোর বেঁধেছিল বাসা
অন্ধকার, সে আজি অরুণালোকে উঠিছে ফুকারি।'

*   *   *

হে প্রেমিক, আয়ুহীন ! এ জীবন এত কি সুন্দর ?
সত্যকার তৃষাভরে যে করেছে সেই সুধাপান,
মৃত্যুর আঁধারে সে কি পাইয়াছে পূর্ণিমা সন্ধান ?

'বিবেকানন্দ' নামক সনেটটি বিবেকানন্দ-প্রশস্তি মাত্র নহে, ইহাতে এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও স্বামিজীর বিরাট অবদান সম্বন্ধে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান মেলে। এই সনেটে কবি লিখিয়াছেন :

কাল রাত্রি পোহাইল ?—পূর্বাভাস অসীম উষার
দেখা যায় প্রাচী প্রান্তে ! মুমূর্ষু এ জাতির শিয়রে
জেগে বসেছিল যেই, মহামন্ত্র সে কর্ণকুহরে
উচ্চারিয়া বার বার—সে যে তুমি, হে চিরকুমার !

ভারতীয় জাতি যখন মৃতপ্রায় তখন বিবেকানন্দই এই জাতির শিয়রে জাগিয়া বসিয়া তাহার কর্ণে 'শিবো ইহং' বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন ; কারণ, তিনি জানিতেন, জাতির এই অচৈতন্যাবস্থা সাময়িক মাত্র—তমোগুণের প্রাবল্যেই এইরূপ হইয়াছে ; কিছুকাল ঐ মন্ত্র জপ শুনিলেই তাহার তন্দ্রাজড়িমা দূরীভূত হইবে।

"নিশান্ত," "বনভোজন," "চৈত্ররাত," পৌর্ণমাসী", "নিবৃত্তি"—এই সনেটগুলিতে প্রকৃতির সৌন্দর্যপিপাসু কবির আনন্দোল্লাস ও নিসর্গ শোভা বর্ণিত। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে লিখিত কয়েকটি সনেট আছে —যেমন "ত্রিস্রোতা," "বঙ্গলক্ষ্মী", "জন্মাষ্টমী" প্রভৃতি। "কবিধাত্রী" কবিতাটি অপূর্ব। পুরাতন বাস্তুভিটার প্রতি কবির এমনই আকর্ষণ যে সেখানে বসিলে তিনি বাস্তব সমস্যা-জর্জরিত পৃথিবীর কথা বিস্মৃত হন, পিতৃ-পিতামহগণের স্মৃতি কবির মনকে উদাস করিয়া দেয়। জ্যোৎস্না-রাত্রে ভগ্ন পূজামণ্ডপের খিলান-প্রাচীরে যে গভীর কালো ছায়া প্রেতবৎ গুমরিয়া উঠে তাহা দেখিয়া কবির মনে হয়, আজও সেখানে করুণরাগিনীতে উৎসব-বাঁশরী বাজিতেছে ! তাই কবি সকরুণস্বরে গাহেন—

স্মৃতির সমাধি' পরে ব'সে দেখি সেদিনের ছবি,
এদিনের কলরব পশে না যে আমার শ্রবণে ;
চেয়ে থাকি—যেই দিকে অস্ত গেছে গৌরবের রবি
গাঁথি যে তারার মালা অন্ধকারে নিশীথ-স্বপনে !
যে সুর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি ।

শতস্মৃতিবিজড়িত কবির সেই বাস্তুভিটার চারিধারে অশ্বত্থ, তাল, তেঁতুল ও শিমূল প্রভৃতি বৃক্ষের সমারোহ—আকাশের নীলিমার প্রান্তে গিয়া সেই অনন্ত পল্লব-পারাবার শেষ হইয়াছে—সেখানে নীলে ও শ্যামলে একাকার !

* * ঊর্ধ্বে শূন্য মহা-নীলাম্বর,
নিম্নে হরিতের মেলা ; সারাবেলা বিহঙ্গের গান,
রহি' রহি' বায়ুমুখে কাননের উদাস মর্মর,
নীরব উদয়-অস্ত, মধ্যদিন নিশীথ-সমান ?—
এই মৌনী প্রকৃতির সুনিবিড় অরণ্য-বাসর,
এই মোর 'কবিধাত্রী'—জনহীন সবুজ শ্মশান !

"এক আশা" সনেটে আমরা আত্মচিন্তামগ্ন, একক কবিকে দেখিতে পাই। জীব-রঙ্গস্থল পৃথিবীতে কত কোটী মানুষ মিলিত হইয়াছে ; সেখানে তিনি একা, তাঁহার চক্ষে শুধু স্বপ্ন, আর বক্ষে ভগ্নবীণা, ধরার উদার অঙ্গনে তিনি চিরদিন একি হেলা ফেলা করিয়াছেন ! প্রাণহীন শ্লোকে তিনি যে গাথা রচনা করিয়াছেন জীবনের বিপণিতে তাহা আজ মূল্যহীন মনে হইতেছে ! তিনি তো ধরণীর সুধাপাত্র ধরিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার মনে একটি মাত্র আশা জাগিতেছে—

শুধু এক আশা—
বঞ্চিত সন্তান তরে কিছু কি বাঁধিয়া
রাখেনি আঁচলে মাতা ?

কবি জননীর প্রসাদকণাপ্রার্থী, কিন্তু তাহা যশের আশা নহে। তাই কবি কামনা করিয়াছেন—

আমি চাই নিজ প্রাণে পূর্ণ অভিলাষ—
হৃদি পুষ্প ভরি যাবে পরাগে কেশরে।
জীবনের সর্বশেষ পূর্ণিমা বাসরে
বাতায়নে ধরা দিবে সারাটি আকাশ !

জগতে সত্যতম বস্তু সম্বন্ধে কবি এখন নিঃসংশয়। তাই তিনি দ্বিধাহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেন :

জানি সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে-দুঃখে ভোগে ত্যাগে আপনা-বিস্মৃতি।

সনেট-কবি সম্বন্ধে জনৈক বিদেশী সমালোচক বলিয়াছেন :

He pipes a solitary tune of his own life, its fervour, its prophetic exaltation, its passion; its despair, its exceeding bitterness. মোহিতলালের "এক আশা" ও "কবি ধাত্রী" সম্বন্ধে এই উক্তি সার্থকভাবে প্রযোজ্য। মধুসূদন ১৪ অক্ষরের সনেট লিখিয়াছেন, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৮ অক্ষরের সনেটও রচনা করিয়া গিয়াছেন। মোহিতলালের অধিকাংশ সনেট ১৮ অক্ষরের। তাঁহার "এক আশা" "বঙ্গলক্ষ্মী" প্রভৃতি সনেটের প্রতি চরণে ১৪ অক্ষর আছে। মোহিতলালের সনেটের খুব সংযত ও গাঢ়বন্ধ ছন্দঃস্পন্দও বিরল নহে। 'আগমনী যামিনীর আভাস মলিন' অথবা 'সুন্দর কালের স্রোত মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গ-আঘাতে, প্রভৃতি ধ্বনিস্পন্দমান ভাষার চমৎকার উদাহরণ।

এইবার মোহিতলাল রচিত একটি ইটালীয় সনেটের মিল-বিন্যাস নিম্নে দেখাইতেছি।—

আজ সখি, সাঙ্গ হল আমাদের মিলন বাসর ;	ক
বাদলের কৃষ্ণা-তিথি, আর্দ্র বায়ু উঠিতেছে শ্বসি,'	খ
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,	খ
তোমারও কাঁপিছে হিয়া—ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর !	ক
চুরি করি এসেছিনু, ভেটিবারে নাহি অবসর—	ক
জান সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুখের প্রেয়সী !	খ
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী চন্দ্র-চতুর্দশী,	খ
বিনা ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর !	ক
যদি পুন দেখা হয় চন্দ্রকান্ত চৈত্র-রজনীতে,	গ
ফুলে ফুলে ভরি' দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী দুকূল,	ঘ
গাব গান প্রাণ ভরা, দুলি' দোঁহে স্বপ্ন-তরণীতে !	গ
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল—	ঘ
ওই যে ডাকিছে পাখি সারারাত কাতর-সঙ্গীত,	গ
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল !	ঘ

বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য কাব্যধারার ন্যায় সনেটও বিদেশী কাব্যকলা সন্দেহ নাই। বাংলা সনেট আজ ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ভাব-ভাষা ও মিল-বিন্যাসের দিক্ দিয়া মোহিতলালের সনেটগুলি ভাবীকালের রসজ্ঞগণের নিকট নিশ্চয়ই আরও সমাদৃত হইবে। খাঁটি সনেটের যাহা প্রাণবস্তু—একটিমাত্র ভাবের প্রবাহ ও পরিসমাপ্তি—কাব্যরসোচ্ছলতা ও সুসংযত গাঢ়বন্ধ ভাষা—তাহা প্রচুর পরিমাণে তাঁহার সনেটে বিদ্যমান। অতিশয় মননশীল ও প্রতিভাবান্ সমালোচকরূপে মোহিতলালের নাম সুপরিচিত। এক বলিষ্ঠ জীবনবাদী কবি ও নূতন কাব্যমন্ত্রের উদ্‌ঘোষক হিসাবেও তিনি রবীন্দ্র-পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যে অতিশয় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার ঐ বুদ্ধিদীপ্ত জীবন সমালোচনার মতই অদূর ভবিষ্যতে বাংলা সনেট সাহিত্যে কবির মূল্যবান্ অবদানও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিলাভ করিবে এবং বাণী-স্বাতন্ত্র্য কবি, বলিষ্ঠ সৃজনশীল সমালোচক ও নিপুণ সনেট-কার—এই তিনি পরিচয়েই মোহিতলালের নাম বঙ্গসাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নেশা

দিব্যেন্দু পালিত

সতেজ সুষুম্নায় ঝেঁকে উঠলো শুকলালের নিকষ কালো দেহটা। ক্রোধে আর উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে বুক আর কাঁধের পেশিগুলো। প্রাচীন যুগের কোন ব্রোঞ্জের মূর্ত্তির মতো আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে। অক্টোপাশের মতো ডান হাতের প্রবাহুটা জড়িয়ে ধরেছে একটা বিষাক্ত সাপ। পুষ্ট আঙুলের ফাঁসে ফাঁসে নিরীহ পাখীর কণ্ঠ পিষে ফেলবার মতো অত্যাচারের নিষ্ঠুর আনন্দে ফণাটা মুঠির ভিতর চেপে ধরে অমানুষিক হিংসায় মোচড় দিলে শুকলাল। গুঁড়ো করে দেবো।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে আর বিস্ময়ে শুকলালের কাণ্ডটা লক্ষ্য করছিল মেহেদী। আর্ত্তনাদের মতো অস্ফুট, ভয়ার্ত্ত একটা ধ্বনি বেরুল তার গলা দিয়ে। —জহর!

—জহর!—মুঠিটা শিথিল করে এবার স্পষ্ট রেখায় হাসলে শুকলাল। অন্তিম যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে মরে গেছে সাপটা। সাড়ে তিনফুট লম্বা বিষাক্ত কেউটে। জাত বেরী!

বিজয়ীর দীপ্ত গর্ব্বিত চোখে মরা সাপের কুঁকড়ে যাওয়া দেহটাকে একবার তাকিয়ে দেখল শুকলাল। তারপর নেকড়ের মতো হিংস্র থাবা দিয়ে ছোঁ মেরে হাতে তুলে নিলে সেটা। ঠোঁটে ছুঁইয়ে চুমু খেল। তারপর দু-তিন পাক ঘুরিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

কোথা থেকে দুটো শকুন নেমে এল ডানা ঝেড়ে।

—জহর!—ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠে আবার ডাকলে মেহেদী। আতঙ্কে আর বিস্ময়ে মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছল শুকলাল। কয়েক ফোঁটা নোনা স্বেদ ঝরে পড়ল মাটিতে। শোঁ শোঁ করে শুঁষে নিল তৃষ্ণার্ত্ত বসুমতী।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল দুজনে। দুপাশে অরণ্যের নিবিড় বেষ্টনী। শাল আর মহুয়ার ঘনবদ্ধ গাছের সারি। উটের কুঁজের মতো তার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মাংরুল পাহাড়। পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে বহুদূর পর্য্যন্ত চলে গেছে পায়ে-চলা সরু পথ। পথের শেষে শীর্ণকায়া পাহাড়ী নদীর শীতল স্রোত। ছোট ছোট নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ ঝাঁপ দিয়েছে দুশো ফুট নীচে—স্বচ্ছ ফেনায়িত তরঙ্গে দুরন্ত শিশুর মতো আঁছড়ে পড়েছে। মৃত্যু যেন হাঁ করে চেয়ে আছে গ্রাস করবার লোভে।

সেইখানে এসে একটা বিরাট পাথরের চাঙাড়ে পাশাপাশি বসল দু'জনে। শুকলাল আর মেহেদী। হাতের মুঠিতে তখনো রক্ত লেগে আছে! কেউটের রক্ত। ঝর্ণার জলে হাত মুখ ধুয়ে নিল শুকলাল। আঁজলা ভরে জলপান করল। তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে মেহেদীর উন্মত্ত যৌবনের দিকে।

লজ্জা পেল মেহেদী। কী সাংঘাতিক লোকটা! কী দুর্জ্জয় সাহস! নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভয় পায়না এতটুকু। ঠোঁটে তীব্র বিষ ছুঁইয়ে নির্ভয়ে চুমু খায়। অকারণে শিউরে উঠলো মেহেদী।—তুম্ বহুত্ খত্‌র্‌নাক্ আদ্‌মি, জী। বিদ্যুতের মতো তির্য্যক একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল শুকলালের ঠোঁটের ভাঁজে, উজ্জ্বল চোখের কোণে। হাসিটাকে আরো একটু বিস্তৃত করে বললে, তোর ঠোঁটে আরো জব্বর জহর মেহেদী।

—যাও জী।—কপট অভিমান জড়িত স্বরে মেহেদী বললে!

হো হো করে হাসলে শুকলাল। মাতালের মতো।

মেহেদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন যেন নেশা ধরে গেছে। রক্তে যেন ঝড়ের গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছে শুকলাল; কেমন একটা বন্য শক্তির সঞ্চার হয়েছে সারা দেহে। নিস্ পিস্ করছে হাতের আঙুলগুলো। কিছু একটা করতে হবে। যা হোক্ কিছু।

ক্রুদ্ধ কেউটের মাথা থেঁত্‌লে দিয়েও তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না আজকাল। আনন্দের আস্বাদটা কেমন ফিকে হয়ে যায়। সেবার মাংরুল পাহাড়ের জঙ্গলে একটা চিতাবাঘের সঙ্গে লড়েছিল। তীক্ষ্ণ নখে, থাবার জোরে জঙ্ঘার থানিকটা মাংস তুলে নিয়েছিল জন্তুটা। কিন্তু শুকলাল মরেনি। সাঁওতালের ম'দো রক্ত তার দেহে, আঘাত পেলে দ্বিগুণ হিংস্র হয়ে ওঠে। পট্টিশের একটি কোপে বাঘের মাথার খুলিটা অর্দ্ধেক করে দিয়েছিল। দুঃসাহসের জন্যে সরকারী ইনাম পেয়েছিল করকরে পঞ্চাশটা টাকা।

তবু সন্তুষ্ট হয়নি শুকলাল। আরো কিছু করতে চায়। আরো ভয়ঙ্কর এবং অসম্ভব কিছু। চুরি করবে। বীরু মাহাতোর লৌহ বেষ্টনী থেকে হরণ করবে মেহেদীকে।

বিষ! সত্যিই বিষ আছে মেহেদীর যৌবনে। সাপের চেয়েও মারাত্মক। মাদক দ্রব্যের মতো কেমন যেন নেশার উপকরণ ছড়িয়ে রাখে। আকর্ষণ করে শুকলালকে।

—এই, কী ভাবছো?—ঝর্ণার ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে জিজ্ঞাসা করল মেহেদী।

নেশা টুটে গেল শুকলালের। মরা গাছের একটা শুক্‌নো, বিবর্ণ ডাল স্রোতের টানে ঘুরতে ঘুরতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নীচের মহাশূন্যে। সেদিকে তাকিয়ে শুকলাল বললে, ভাব্‌ছি, চলে যাব এ-দেশ ছেড়ে।

শুকলালের আরো কাছে সরে এল মেহেদী।—চলে যাবে! কেন?

—এম্‌নি। ভালো লাগেনা এখানে। রুজি-রোজগার নেই। সহরে যাব, মজুরি খাটবো।

—আর বাঘ মারবে কে—সাপ?—ভ্রূ ভঙ্গী করলে মেহেদী।

ওর কথার কোন জবাব দিলে না শুকলাল। সে তখন অন্য কথা ভাবছিল। কী করে সরিয়ে আনবে মেহেদীকে? সে জাতে অন্ত্যজ। মেহেদীরা বড় জাত। তা ছাড়া, মাহাতোর শক্তি অনেক বেশি। অর্থে এবং সামর্থ্যে তার সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল। মাহাতোর মেয়ে মেহেদী। রূপে, যৌবনে এ অঞ্চলে সেরা সুন্দরী। সেই মেহেদীকে নিয়ে পালাতে চায় শুকলাল! সাঁওতালের বাচ্চা জীবনসঙ্গিনী করতে চায় ভূমিয়ারের মেয়েকে! দুঃসাহস বইকি!

কিন্তু এ এক আশ্চর্য্য নেশা। রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে যেন। ছেড়ে থাকা যায় না।

শুকলালের কণ্ঠে কাতর অনুনয় ঝরল: তুই আমার সঙ্গে চল মেহেদী। সহরে চল আমার সঙ্গে। আমি তোকে রাণী করে রাখবো।

একসঙ্গে অনেক কাঁচের পাত্র গুঁড়িয়ে যাওয়ার মতো, জলতরঙ্গের মিষ্টি রিণরিণে সুরের মতো শব্দ করে হাসল মেহেদী।—কিঁউ জী, এত্‌না পরেশান্ কিঁউ!

পরেশান্! বঙ্কিম হাসলে শুকলাল। মেহেদী বুঝবে না কিসের ক্লান্তি তার দেহে ও মনে। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় পাখীর মতো সাবলীল ডানা বিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে মেহেদী। শুকলালের যন্ত্রণার কথা বুঝবে না। তবু, শুকলাল জানে, ভালবাসে—মেহেদী তাকে ভালবাসে। তা না হ'লে হাজার বাধা নিষেধের উদ্ধত তর্জ্জনী সঙ্কেত উপেক্ষা করে এই শান্ত নির্জ্জনে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছুটে আসবে কেন!

—এই, খামোশ্ কিঁউ! কুছ্ ভি তো বোলো।

স্রোতস্বিনীর জলে কলসীটা ভরতে ভরতে মেহেদী বললে।

শুকলাল নিরুত্তর তবু। একটু যেন অবাক হ'ল মেহেদী। এমন নিশ্চুপ, অন্যমনস্ক তো কোনদিন থাকে না শুকলাল! কে জানে নেশা ধরল নাকি! মরদটাকে বিশ্বাস নেই। যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্যটুকু বুঝতে পারে না। শুকলালের দুটো পেশল বাহু আর বুকের আচ্ছুরিতক আলিঙ্গনে কতদিন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে মেহেদীর, কথা ফোটেনি মুখে, নরম বুকের ভিতর চল্‌কে উঠেছে উষ্ণ রক্ত।

কলসীটা কোমরে তুলে উঠে দাঁড়াল মেহেদী। আকাশে গেরুয়া রঙের আভাস। মাংরুল পাহাড়ের

মাথায় শকুন উড়ছে—নতুন কোন শিকার খুঁজে পেয়েছে বোধ হয়। কিন্তু এদিকে বেলাও ফুরিয়ে এল। সূর্য্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। তামাটে রঙ ধরেছে রূপোলী নদীর জলে।

ভীত, সন্ত্রস্ত চোখে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল মেহেদী। অনেকক্ষণ বেরিয়েছে ঘর থেকে। মাহাতো হয়তো এতক্ষণে ফিরে এসেছে মাঠ থেকে। মানুষ তো নয় মাহাতো—জানোয়ার।

এক পা দু' পা করে এগিয়ে চলল মেহেদী।—তোমায় চলুঁ।

ঘাড় নাড়লে শুকলাল। অন্যদিন অনেকটা পথ সঙ্গে সঙ্গে যায়—হলুদ, বেগুনী, নানা রঙের বনফুল তুলে গুঁজে দেয় মেহেদীর রুক্ষ চুলে, খোঁপার খাঁজে।

কিন্তু আজ আর ঝর্ণার পাশ থেকে নড়লে না শুকলাল। বসে রইল চুপ করে। ইচ্ছে হচ্ছিল লাফিয়ে পড়ে দুশো ফুট নীচের ওই ক্ষুব্ধ ফেনিল জলরাশির উপর। বিষাক্ত কেউটেটার মতো নিজের মাথাটাকেও থেঁতলে গুঁড়ো করে দেয়। কিন্তু কিছুই করলে না। শুধু বন্ধ আনন্দে একটা রঙীণ প্রজাপতির পাখাগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগল।

মন্থর পায়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল মেহেদী। আদিগন্ত ধূ ধূ মাঠের উপর সন্ধ্যার মলিন ছায়া। কোন্ দূর অরণ্যের ধ্বনির মতো বাতাসের সন্ সন্ শব্দ। সামনের জমিতে ঘাড় ফুলিয়ে চরে বেড়াচ্ছে দুটো মোরগ। কলসীটা মাটিতে নামিয়ে পরণের শাড়ীটা ভালো করে গুছিয়ে নিল মেহেদী। কান পেতে শুনলো আর কোন শব্দ আছে কিনা। তারপর ঢুকলো ঘরে।

বিছানার উপর স্থাণুর মতো বসেছিল মাহাতো। ছোট ছোট চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। প্রশস্ত কপালে বয়সের বলিরেখাগুলো কেমন জড়িয়ে উঠেছে যেন।

—মেহেদী!—ঘরে ঢুকতেই গর্জ্জন করে উঠ্লো মাহাতো। থর থর করে কেঁপে উঠলো মেহেদীর সর্ব্বাঙ্গ। মাহাতোর এ বজ্রনির্ঘোষ আগেও শুনেছে সে। আর মেহেদী খুব ভালো করেই জানে এ ডাকের অর্থ কী! বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে সভয়ে মাহাতোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

লাল টক্‌টকে চোখ তুলে তাকালে বীরু মাহাতো।—মেহেদী!

—বাপু!

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করে উঠ্লো মেহেদীর। গলায় যেন একটা কাঁটা ফুটেছে। অস্পষ্ট, মৃদু গলায় বললে, শিব্‌জীর মন্দিরে।

—ঝুট্!—বজ্রের মতো ফেটে পড়ল মাহাতো। ধারালো দাঁতে কামড়ে রক্তাক্ত করলে ঠোঁটটা—পুরানো খাটের বাজুটা উত্তেজনায় আঁকড়ে ধরলে।—বিল্‌কুল্ ঝুট্। শিব-মন্দিরে আমি খুঁজে পাই নি তোমায়। সত্যি করে বল্ কোথায় গিয়েছিলি—কার কাছে গিয়েছিলি?

জবাব দিলে না মেহেদী। দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে। মাহাতোর এ রাগ সে চেনে। বাপ তো নয়—একটা পশু, জানোয়ার।

—বোল্!

খাট থেকে নেমে মেহেদীর মুখোমুখি দাঁড়ালে বীরু। রক্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর সবল মুঠিতে মেহেদীর নরম হাতের কব্‌জিটা ধরে মোচড় দিতে আরম্ভ করলে।—বোল্?

অসহ্য যন্ত্রণায় অব্যক্ত চীৎকার করলে মেহেদী।—ছোড় দে, বাপু। দুটো চোখ ভরে উঠ্লো অশ্রুতে।

কিন্তু জানোয়ারটা ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। ভুলে গেছে বাপ-বেটির সম্বন্ধ। হিংস্র শক্তিতে মোচড় দিতে দিতে হাতটা ভেঙ্গে ফেলবার উপক্রম করলে।

—আঁ-আঁ-আঁ—বোবার মতো আর্ত্তনাদ করলে মেহেদী। হাতটা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। অশ্রুতপ্রায় কণ্ঠে বললে, শুকলাল।

শুকলাল! যেন চাবুক খেয়ে লাফিয়ে উঠলো মাহাতো। প্রচণ্ড ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে দরজার গায়ে ছিট্‌কে পড়ল মেহেদী। কপালের কাছটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

—বেইমান!—স্বগতোক্তির মতো বিড় বিড় করে বললে মাহাতো, আমার ইজ্জৎ মাটিতে মিলিয়ে দিতে চাস্? বেসরম্ কঁহীকা!

কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মাহাতো। আচ্ছন্নের মতো ঝিম্ ধরে কিছুক্ষণ মেজেয় মাথা গুঁজে পড়ে রইল মেহেদী। যন্ত্রণা। অসহ্য যন্ত্রণা ডান হাতের কব্‌জিটায়। ফুলে উঠেছে হাতটা, কোন রকম জোর পাচ্ছে না। চোখ তুলে তাকালে মেহেদী। কিন্তু শুকলাল! বিশ্বাস নেই পুরুষটাকে। আর মাহাতোর আরক্তিম চোখের দৃষ্টির অর্থও স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারে মেহেদী। ভালুকের লোমের মতো একটা কালো মেঘ যেন থম্‌কে থেমে আছে দিগন্তে। ঝড় উঠতে কতক্ষণ!

—বীরু চাচা, ঘর মে হো ক্যা?

সকালে ঘুম থেকে উঠে মোষ দুটোকে জাব্‌না মেখে দিচ্ছিল মাহাতো। ডাক শুনে বেরিয়ে এল বাইরে। পুরু ঠোঁটের ফাঁকে আপ্যায়নের হাসি হাসল একটু। আনতে চাইল একটা অন্তরঙ্গতার আভাস।

—আরে, রঘুবীর! তুম্ জী! ক্যোয়া বাত্ হ্যায়?

বিনয়ে গলে যেতে চাইলে রঘুবীর। বেঁটে মদের বোতলের মতো চেহারাটাকে একবার সঙ্কুচিত প্রসারিত করে দস্তুর হাসলে। মোমের মতো মসৃণ ফোলা ফোলা গালে একটা টোল পড়ল সে হাসিতে।

—চাচার কী সময় হবে একটু?

—জরুর, জরুর।—কাঁধের গামছায় হাত দুটো মুছতে মুছতে জবাব দিলে বীরু। তারপর মাঠের উপরেই একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে স্বল্প ব্যবধানে বসল দু'জনে।

পেঁপে গাছের আড়ালে লুকিয়ে সব লক্ষ্য করছিল মেহেদী। পয়লা নম্বরের শয়তান ওই রঘুবীর। তার ওপর অনেক দিনের নজর। পথে ঘাটে প্রায়ই দেখা হয় লোকটার সঙ্গে। হ্যাংলা কুকুরের মতো লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন লেহন করে নেয় ওর দেহের সুমিষ্ট রস মদিরাটুকু। মাহাতো ঘরে না থাকলে প্রায়ই এসে উঁকিঝুঁকি দেয়, ইশারায়, ইঙ্গিতে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সাপের চোখের মতো জ্বল জ্বল করে কামার্ত্ত চোখ দুটো।

সবুজ ঘাসের উপর কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বসে রইল দু'জনে। দৃষ্টিটাকে দূরান্বিত করে দিলে দূরের শাল মহুয়ার ঘন জঙ্গলের দিকে। মাংরুল পাহাড়ের মাথা থেকে সূর্য্যটা উঠে আসছে একটু একটু করে।

—কী ব্যাপার! চুপচাপ বসে রইলে যে?—মাহাতোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসার সুর স্পষ্ট হল।

নির্ব্বোধের মতো জোর করে হাসতে চেষ্টা করলে রঘুবীর। রোদ্দুরের আঁচ লেগে বোকা মুখটাকে আরো বোকা-বোকা লাগছে। এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করে অপ্রতিভ গলায় বললে, বীরু চাচা, তোমার লড়্‌কীর সাদী দেবে না?

সাদী?—ভ্রূ কুঞ্চিত করলে মাহাতো। সন্দেহের ধূসর ছায়া দুলছে চোখের কোণে। সাদী!—কে সাদী করবে? তুমি?

তীরের মতো রঘুবীরের মুখের উপর প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারলে মাহাতো। ভয়ে আর সঙ্কোচে যেন এতটুকু হয়ে গেল রঘুবীর। তার পর আস্তে আস্তে মাথা নাড়লে।

চিন্তার কতগুলো বিসর্পিল রেখা ফুটলো মাহাতোর কপালে। ঘন ভুরু দুটো জুড়ে গেল এক সঙ্গে। ঝানু ব্যবসায়ীর মতো মনে মনে ওজন করতে শুরু করলে মাহাতো। এতটুকু কম বেশি না হয়। মেহেদীকে সাদী করতে চায় রঘুবীর।

নতুন কিছু আবিষ্কারের আনন্দে শানানো হাসি কাঁপতে লাগল মাহাতোর পুরু ঠোঁটের কোণে। ভূমীয়ারের ছেলে রঘুবীর। বড় জাত। তার উপর জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তিও কিছু কম নেই। রঘুবীরের পাশে শুকলাল! চালচুলোহীন কালা কুত্তা?

থুক্ করে খানিকটা থুথু ফেললে বীরু মাহাতো।

—সাদী তো জরুর দেনা হ্যায়। লেকিন রূপেয়া?

হ্যাঁ। রূপেয়া। টাকা চাই মাহাতোর। জটিল দাবার খেলায় পাকা খেলোয়াড়ের মতো মস্তিষ্ক চালনা করতে হবে। হেরে গেলে চলবে না। রূপের বদলে রূপেয়া। আফিম ফুলের মতো শরীর মেহেদীর। এ অঞ্চলের সেরা সুন্দরী। রূপ আর যৌবনের ভরা নদী। সুযোগ বুঝে গুটি চালতে হবে।

অবজ্ঞায় চোখ তুললে রঘুবীর। হাসলে শয়তানি হাসি। ক্ষুধার্ত্ত বনবিড়াল যেন হঠাৎ শিকারের সন্ধান পেয়েছে। গলার কাছে কয়েকটা ঘামাচি চুলকে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেত্‌না রূপেয়া চাচা?

তাই তো! নতুন সমস্যায় ফেলেছে রঘুবীর। কত দাম হতে পারে মেহেদীর? একশো—দু'শো—পাঁচশো?

অসঙ্কোচে বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল রঘুবীরের চোখের সামনে তুলে ধরলো মাহাতো।

চাঁদ-পাওয়া আনন্দে সাপের জিভের মতো ঝিলিক দিলে রঘুবীরের লোভী চোখ দুটো।—বাত পাক্কা, চাচা?

—হুঁ।—একটা একাক্ষর অব্যয় উচ্চারণ করলে বীরু মাহাতো। তারপর উঠে এল ঘরের ভিতর।

নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল মেহেদী। পায়ের তলা থেকে ধীরে ধীরে যেন একটা শীতল ধারা উঠে আসছে—এক্ষুণি চেপে বসবে বুকের উপর। অর্থগৃধ্নু মাহাতোর ভব্যতার আবরণ ছিঁড়ে ওর আসল রূপটা এতদিনে পরিষ্কার হল মেহেদীর চোখে। টাকার বদলে রঘুবীরের কাছে তাকে বিক্রী করতে চায় মাহাতো।

কিন্তু শুকলাল! মোষের মতো শক্তি গায়ে, খোঁচা খেলে রুখে দাঁড়ায়। অথচ মনটা শিশুর মতো সরল—একদলা মাখনের মতো নরম। ওর দুটো বাহুর আশ্লেষে যাদু আছে—ওকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না মেহেদী।

মাহাতো বেরিয়ে গেলে পা টিপে টিপে বেরুলো মেহেদী। যা হোক্ একটা ফয়েসলা করতে হবে আজ।

শিংবোঙার বেদী পেরিয়ে মাংরুল পাহাড়ের গা-ঘেঁসা সিঁথির মতো সরু আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে দ্রুতগতি ছুটে চলল মেহেদী। স্রোতস্বিনীর ধারে এসে দেখা পেল শুকলালের। মাথা নীচু করে তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছে। নিঃশব্দে ওর পাশে গিয়ে বসল মেহেদী।

চোখ তুলে তাকালে শুকলাল। তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের যন্ত্রণা দুটো চোখে। ভাঙা ভাঙা গলায় সেই আগেকার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলে।—আমার সঙ্গে চল্ মেহেদী। সহরে চল্।

অন্যদিন হলে হাসতো—লঘু রসিকতার উচ্ছ্বাসে বুদ্বুদের মতো উড়িয়ে দিত শুকলালের কথাগুলো। কিন্তু আজ আর হাসতে পারল না মেহেদী। করুণ গলায় আশ্বাসের সুরে বললে, যাবো। চলে যাবো তোর সঙ্গে। কিন্তু—

একটু যেন উৎসুক হয়েছিল শুকলাল। সহসা নিবে গেল।—কিন্তু কী?

—পাঁচশো টাকা চাই, মাহাতোকে দিতে হবে।

আবেগে গলা কাঁপতে লাগল মেহেদীর। নিবে যাওয়া শুকলালকে জ্বালিয়ে তোলবার জন্যে খুলে বললে সব কথা। পাঁচশো টাকা পেলে হয়তো বা সন্তুষ্ট হবে মাহাতো—খালাস করে দেবে মেহেদীকে। তারপর—

কিন্তু পাঁচশো টাকা কোথায় পাবে শুকলাল? পাঁচটা পয়সা জোগাড় করতেই যার প্রাণান্ত হয়!

শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি ছড়িয়ে গেল শুকলালের। যাযাবরের মতো চঞ্চল চিত্তে পাহাড়ে অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে এতদিন। অব্যর্থ লক্ষ্যে তীরের ফলায় বিঁধেছে বুনো পাখী আর জংলা হাঁস—ক্ষিদে পেলে পাতার আগুন জ্বেলে তাই পুড়িয়ে খেয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের কথা কোনদিন ভাবেনি। হিংস্র বাঘের সঙ্গে শুধু-হাতে লড়তে পারে শুকলাল, শক্ত মুঠির মধ্যে একরাশ আঙুরের মতো ফাটিয়ে দলে নিতে পারে ক্রুর সাপের ফণা—মাগুা পরবের দিন শিংবোঙাকে সাক্ষী রেখে বিষ-মাখানো বাণ রুখতে পারে বুকে—এবং মেহেদীর জন্যে আরো সাংঘাতিক, আরো ভয়ানক কিছু করতে পারে। কিন্তু পাঁচশো টাকা!

যেন ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠেছে শুকলাল। এমন ভাবে তাকালে মেহেদীর মুখের দিকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে ওর হাতটা। চোখের কোণে মুক্তোর মতো দুটো জলবিন্দু চিক্ চিক্ করতে লাগল।

নিবাত-নিষ্কম্পতায় স্তব্ধ হয়ে আছে শাল আর মহুয়ার গাছগুলো। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস সম্বরণ করলে মেহেদী। শুকলালের হাতে একটু চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তবে?

কিছুক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করলে শুকলাল। অন্ধকারটা একটু ফিকে হয়ে এল যেন। মেহেদীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তোকে চুরি করব—মেহেদী, পালিয়ে চল্ আমার সঙ্গে।

তা ছাড়া আর উপায় কী? শুকলালের গায়ে জোর আছে—পরিশ্রমের শক্তি রাখে শুকলাল। দিনান্তে অন্তত

দু'মুঠো ভাত জুটিয়ে আনতে পারবে। ওর চোখে চোখ রেখে মেহেদী বললে, কবে ?

—কাল। খুব রাতে।

দাঁতে দাঁত ঘষল মাহাতো। একটা অশ্লীল গালি উচ্চারণ করলে। বেইমান মেয়েটা আজ পালিয়েছে এবং কেউ না বললেও বুঝতে পারে মাহাতো, সেই কালা কুত্তাটার কাছেই গেছে মেয়েটা।

কিন্তু আশ্চর্য্য! মেহেদী যখন ফিরল একটি কথা বললে না মাহাতো। অবাধ্যকে বাধ্য করবার ওযুধ খুব ভালো করে জানা আছে তার। শুধু একটা রাত, তারপরেই শান্ত হয়ে যাবে সব।

মাংরুল পাহাড়ের জঙ্গলে ভোর-পাখীর ডাক শোনবার অপেক্ষায় ছিল মাহাতো। সে ডাক শুনতেই মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় বেয়াড়া মেয়েটাকে ভালো করে ঘর-বন্দী করতে ভুললে না। সাত-আট মাইল পথ হাঁটতে হবে। অনাবশ্যক বীরত্বে শক্ত মাটিতে লাঠিটা দু'বার ঠুকে নিলে মাহাতো। পাঁচশো টাকা। না, পাঁচশো টাকা হাতছাড়া করা যায় না।

তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে আরাম করে বসেছিল রঘুবীর। কানে গুঁজেছে গোলাপী আতর, চোখে সুর্মা টেনেছে। বেঁটে মদের বোতলে যেন প্রোৎফুল্ল স্ফূর্ত্তির জোয়ার এসেছে।

কিন্তু মাহাতোকে এমন অসময়ে আশা করেনি রঘুবীর। তবু খাতির না করলে চলে না। কথা পাকা হয়ে গেলেও মাহাতোকে ভয় করে রঘুবীর—একটা বাঘ বা কুমীরকে যত ভয় করে মানুষ, তার চেয়ে বেশি।

—আরে, বীরু চাচা যে। এমন অসময়ে!—বিস্ময়ের ভাব করলে রঘুবীর। কিন্তু সেটা মাহাতোর চোখ এড়িয়ে গেল।

আধময়লা ফরাসের উপর মাহাতোকে সমাদর করে বসাল রঘুবীর। এগিয়ে দিল হুঁকোর নলটা।

—কী খবর, বীরু চাচা ?

এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে দম নিলে বীরু মাহাতো!

—শুকলাল, সেই কালা কুত্তাটা, তোমার আর মেহেদীর মাঝে কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে আছে রঘুবীর। ওটাকে সরাতে হবে।

মোম-মসৃণ ফোলা-ফোলা গালে একটা লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল রঘুবীরের। সাপের মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল চোখদুটো।—কুছ্ পরোয়া নেই। আমি ব্যবস্থা করছি, বীরু চাচা।

ভিতরে চলে গেল রঘুবীর। ইসারায় ডাকলে কতগুলো ষণ্ডামার্কা লোককে। ছুটে এল রঘুবীরের অন্নপুষ্ট সাকরেদের দল। ফিস্ ফিস্ চাপা স্বরে কথাবার্ত্তা চলল কিছুক্ষণ। তারপর সেলাম ঠুকে চলে গেল লোকগুলো।

মাহাতোর চোখে পাঁচশো টাকার স্বপ্ন। মেহেদীর দাম আছে এবং তার চেয়ে বেশি আছে রূপ আর লক্‌লকে আগুনের শিখার মতো প্রচণ্ড যৌবন। ইচ্ছা করে পুড়ে মরতে। নেশা ধরে যায় চোখে।

নেশা ধরে গেছে বীরু মাহাতোর চোখে। আপ্যায়িত করতে জানে বটে রঘুবীর। মাহাতোর কাণ্ড দেখে হাসলে সে। বিদ্রূপ করে বললে, মৌজ করে নাও, বীরু চাচা—দারুর অভাব নেই আমার ঘরে।

দারু! দারুতে যে এমন তৃপ্তি, এমন জ্বালা আর শান্তি, তা জানতো না মাহাতো। সাদা ফতুয়ার বোতামগুলো খুলে বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতিতে বীর্য্যগর্ব্বে হাত বুলোলে মাহাতো। তারপর মদের বোতলটা উপুড় করে দিলে গলায়।

শ্বাপদের মতো ধ্বক্ করে জ্বলে উঠ্‌লো রঘুবীরের চোখ।—এ তোমার নিজের ধর চাচা, সব তোমার। আমি, আমার লোকজন—সব তোমার গোলাম।

কান পেতে শুন্‌লো কী না শুন্‌লো বোঝা গেল না। শুধু দড়ির মতো জট পাকানো ঘড়ঘড়ে গলায় হাসতে লাগলে মাহাতো।

আর একটু সতর্ক হল রঘুবীর। মামলা-মোকদ্দমা, মদ আর মেয়েমানুষ—তিরিশ বছর এই পরিবেশে কাটিয়ে বুদ্ধিটা ক্ষুরের ফলার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। শিকারকে প্রথম দর্শনেই গুলি না করে, একটু খেলিয়ে খেলিয়ে পরিশ্রান্ত করে মারতে জানে।

—তোমার লড়কীকে নিয়ে সাঁঝের মধ্যে চলে এস আমার এখানে—তোমার নিজের ঘরে। তারপর শুকলালকে দেখছি আমি।

অকাট্য যুক্তি! মাহাতোর মাথায় ঢুকলো কথাটা। রঘুবীর, টাকা এবং দারু। সব তার—সব। আর একমুহূর্ত্ত দেরী করা চলে না। তীব্র নেশায় ঝিম্ ঝিম্ করছে মাথাটা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো বীরু। রঘুবীরের পিঠ চাপড়ে বললে, সাবাস্ বেটা, সাবাস্—জিতে রহো। ম্যয় আভি আয়া।

বেসামাল দেহে টলতে টলতে বেরুলো মাহাতো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রঘুবীর। আকাশে তাকালে। হল্‌দে হয়ে এসেছে দুপুরের রোদের রঙ। একটু পরেই গেরুয়া রঙ ধরবে। তারও পরে বীরু চাচা ঘরে পৌঁছে যাবে—এবং সন্ধ্যের একটু পরেই মেহেদীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে।

মেহেদী—মেহেদী। বুকের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠ্‌লো রঘুবীরের। স্নায়ুতে স্নায়ুতে আশ্চর্য্য শিহরণ।

ভুরু কুঁচকে নিজের পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতে লাগল রঘুবীর। না, কোথাও ভুল নেই এতটুকু। এখনই যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রঘুবীর: কঙ্কালের রক্তমাখা হাতের ছোপের মতো আকাশে লক্‌লকিয়ে উঠেছে আগুনের শিখাগুলো।

কিন্তু সে আগুনের উত্তাপ এতটুকু স্পর্শ করবে না মাহাতোকে বা মেহেদীকে। তার অনেক আগেই রঘুবীরের কথামতো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে মাহাতো।

* * *

রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে আক্রোশে ছট্‌ফট্ করতে করতে আর মাহাতোকে অভিশাপ দিতে দিতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল মেহেদী। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। অসহ্য গরম, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো মেহেদী—খড়ের চালে, জানলার কপাটে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। আকস্মিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঘরটা। লাল আগুনের ছোট ছোট ফুল্‌কিগুলো ছুটোছুটি করছে ঘরময়।

—বাপু, দরবাজা খোলো বাপু, আগ্।—দেহের সর্ব্বশক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল মেহেদী।

আগ। আগুন জ্বলে উঠেছে—মেহেদীর বুকে আর কাপড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন।

—বাপু—বাপু।—আরো দু'বার শোনা গেল মেহেদীর আতঙ্কিত আর্ত্তনাদ।

কিন্তু কোথায় মাহাতো! সামান্য একটু ভুল করে ফেলেছে রঘুবীর। ঘরে পৌঁছায়নি বীরু মাহাতো। মদের নেশায় চুর হয়ে পথের কোথাও বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে কিনা কে জানে!

আর মাংরুল পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে নিষ্পলকে আকাশে তাকিয়েছিল শুকলাল। আশ্চর্য্য লাল হয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশটা। কিন্তু এখনো আসছে না কেন মেহেদী? কথা দিয়েছিল মেহেদী—আজ রাতে আসবে। পালিয়ে যাবে সহরে। নিঃশব্দে। মাহাতোর শ্বাপদ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে। তারপর—

হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো শুকলাল। শাল মহুয়ার জঙ্গলে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লো একটা বুনো পাখী।

নরেন্দ্র দেব

প্রাচীন চীনের রহস্য-রোমাঞ্চ

(শেষাংশ)

ধরে নিয়ে এল তারা পথ থেকে ছুইনিঙ্ আর চেনকে।

চেন এসে দেখে তাদের বাড়ী একেবারে লোকে লোকারণ্য। ভীষণ হৈ চৈ শুরু হয়েছে। তাদের মধ্যে মোড়োলি করছে তার প্রতিবেশী বন্ধুর স্বামী চ্যু সব চেয়ে বেশি।

ওদের দেখে সবাই যেন একটা হিংস্র চিৎকার করে উঠলো—এই যে! ধরা পড়েছে তাহলে। হুঁ হুঁ বাবা! ও পড়তেই হবে! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পতিকে হত্যা করে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে উপপতির সঙ্গে উধাও হওয়া অত সহজ নয়। ভগবান আছেন।

চেন ওদের কথাবার্তার ধরণ দেখে বিস্মিত হ'য়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

রান্নাঘরের সামনেই লিউ খুন হয়ে পড়ে আছে। স্বামীর মৃতদেহ দেখে চেন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। চ্যু ধমক দিয়ে বললে —চুপ কর। আর ন্যাকামি করে কাঁদতে হবে না। আমরা কি জানি তখন যে খুনে মেয়েমানুষ স্বামীকে হত্যা করে আমার বাড়ী এসে রাত্রে আশ্রয় নিয়েছে? মতলব-বাজ খুব! ওকে কেউ সন্দেহ করবে না। কারণ রাত্রে আমাদের বাড়ী ছিল। ভোর রাত্রে ওঁর পেয়ারের লোকের সঙ্গে পালাবেন এসব আগে থেকেই গড়া-পেটা ছিল। তাই ভোর হতে না হতেই ছুঁড়িটা দড়ি-ছেঁড়া হয়ে পালালো! এখন বেশ সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। লিউর দেড় হাজার টাকার থলেটাও তো এই ছোঁড়ার কাছে পাওয়া গেছে। সুতরাং, প্রমাণের আর বাকি কি?

ছুইনিঙ্ এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। এইবার বলে উঠলো, ও আমার নিজের উপার্জনের টাকা। হাটে রেশমের কাপড় বেচে ও টাকা আমি পেয়েছি। আমার টাকা আপনারা আমাকে ফেরত দিন।

'এই যে—ফেরত দিচ্ছি এখনি!' বলে দু' চারজন এগিয়ে এসে চাঁদা করে মার শুরু করলে ছুইনিঙকে।

ছুইনিঙ্ যত বলে, আমি এ হাঙ্গামের কিছুই জানি নি। বিশ্বাস করুন আপনারা। এই মহিলার সঙ্গে হঠাৎ আজ মাঝ পথে আমার দেখা। আমি চুচিয়াতাঙ্ যাচ্ছি শুনে উনি বললেন, ওঁরও বাপের বাড়ী চুচিয়াতাঙ্। তাই এক সঙ্গেই গল্প করতে করতে পথ চলছিলুম।

কিন্তু, কে শোনে তার কথা! মুখের ওপর তার চটাপট্ চড়চাপড়, ঘুসি আর থাপ্পড় এসে পড়লো। চুপ্ কর্ হারামজাদা! খুন করে শালা পরের স্ত্রী নিয়ে সরে পড়ছিলেন, এখন ধরা পড়ে সাধু সাজছেন? মার! মার শালাকে—

চেনের বাবাকেও গাঁয়ের লোকেরা এ দুঃসংবাদটা পাঠিয়েছিল।

একটু বেলা হতেই তিনি এসে হাজির।

সব কথা শুনে বললেন, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের বটে। অবিশ্বাস করতে পারলে সুখী হতুম। কিন্তু, যুক্তি প্রমাণ সবই যে বিপক্ষে! কাল আমি জামায়ের হাতে দেড় হাজার টাকার থলে একটি দিয়েছিলুম। ও নতুন একটা ব্যবসা শুরু করবে বলে। ইদানিং ওর খুবই অর্থ-কষ্ট যাচ্ছিল।

চ্যু বললে, বাস! আর কিছু বলতে হবে না কর্তা। 'সেই অর্থকষ্ট সইতে না পেরেই আপনার মেয়ে এই ছোঁড়ার সঙ্গে সরে পড়েছিল। হাজার হোক্ বড়লোকের মেয়ে। সে পারবে কেন অভাব-অনটনের সংসারে থাকতে।

এবার চেন সাশ্রুনয়নে বললে, অর্থকষ্ট তো দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। সইতে না পারলে তো আমি অনায়াসে বাপের বাড়ী চলে যেতে পারতুম। কিন্তু তাতে আমার অসম্মান হ'ত। আমার স্বামীরও অসম্মান এবং আমার বাবারও মাথা হেঁট হত। তাই আমি সব কষ্ট সয়েও স্বামীর ঘরেই ছিলুম। কিন্তু কাল রাত্রে তিনি যখন দেড় হাজার টাকার একটা থলে এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন তোমাকে বেচে এই টাকাটা এনেছি, তৈরি হ'য়ে থাকো। যে ভদ্রলোক তোমায় সেবাদাসী করবেন বলে দেড় হাজার টাকায় কিনেছেন, তিনি কাল সকালে এসে তাঁর জিনিস গাড়ী করে তুলে নিয়ে যাবেন।

এই শুনে আমার মন ভাষণ খারাপ হয়ে পড়ে। উনি ঘুমিয়ে পড়তে টাকার থলেটা ওঁর পায়ের কাছে রেখে আমি চলে যাই চ্যুবৌয়ের বাড়ী। রাতটা তার স্ত্রীর কাছেই ছিলুম। ভোরে উঠে বাবার কাছে চলে যাচ্ছিলুম। পথে এই যুবকের সঙ্গে দেখা। উনিও চ্যুচিয়াতাঙ্ যাচ্ছেন শুনে বলেছিলুম আমাকে বাপের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাবেন। ভদ্রলোকের মেয়ের একা পথ চলা অমর্যাদাকর। যাবার সময় আমি চ্যুবৌকে বলে গেছলুম আমার স্বামীকে খবর দিতে যে আমি বাপের বাড়ী চলে গেছি। যে ভদ্রলোকের কাছে সে আমায় বাঁধা দিয়ে দেড় হাজার

াকা এনেছে, তিনি আমাকে নিয়ে যাবার জন্ত যদি সকালে আসেন বে তাঁকে নিয়ে আমার স্বামী যেন আমার বাবার কাছে যান। তিনি ব বিষয়ে যা হয় একটা মীমাংসা করে দেবেন। আমি ভগবানের ামে শপথ করে বলছি আমার স্বামীর এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনি।

চ্যুয়ের স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, চেন যা বলছে সব সত্যি। কাল রাত্রে সে যখন আমার কাছে এসে শুয়েছিল তখন এই সব কথাই আমায় বলেছিল।

একটি গ্রাম্যবৃদ্ধ এবার বললে, বেশ কথা। সবই সত্যি বুঝলুম। কিন্তু, চেনের বাবা ওয়াঙ্‌ কাল জামায়ের দুরবস্থার কথা শুনে তাকে নতুন কোনোও ব্যবসায়ে নামবার জন্ত যে দেড় হাজার টাকা দিয়েছিলেন সে টাকাটা এনে সে তোমার হাতেই তুলে দিয়েছিল যখন, তখন তোমাকে বাঁধা রেখে দেড় হাজার টাকা ধার করে এনেছি এসব মিথ্যে কথা বলবার তো তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তুমি যা বলছো বাপু, তা বিশ্বাস করা চলে না। দীর্ঘকাল থেকেই তোমার স্বামী অর্থকষ্টে পড়েছিলেন বলছো, সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তুমি আর অর্থকষ্ট সহ্য করতে না পেরে লিউকে খুন করে এই দেড় হাজার টাকা নিয়ে এই ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিলে। চ্যুর বাড়ী গিয়ে রাত কাটানোটা লোকের চোখে ধূলো দেবার তোমার একটা কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। চ্যুর স্ত্রীকে রাত্রে যা বলেছিলে সব তোমার বানানো মিছে কথা।

সেখানে যত লোক জড় হয়েছিল সবাই একবাক্যে বুড়ো ভদ্রলোকটিকে সমর্থন করে বললে, আপনি ঠিক বলেছেন। এ সবই ওই ছুঁড়ির শয়তানী।

এইবার তারা সেই রেশম ফেরিওয়ালা ছোকরা ছুই নিঙ্‌কে জেরা শুরু করলে। তার গালে সজোরে এক থাপ্পড় লাগিয়ে বললে, কিরে শালা! বল না, এ ছুঁড়ির সঙ্গে সল্লা পরামর্শ করে ওর স্বামী লিউকে খুন করে তার দেড় হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়েছিলি কিনা? তোদের মধ্যে নিশ্চয় ব্যবস্থা ছিল সকালে দু'জনে নির্জনে কোথায় দেখা হবে। তারপর, সেখান থেকে দু'টিতে মিলে নিরাপদে সরে পড়বে। বল না শালা। বলেই তারা চাঁদা করে ছুই নিঙ্‌কে আবার দু'চার ঘা দিলে।

ছুইনিঙ্‌ কেঁদে ফেললে। কাতরভাবে বললে, দোহাই আপনাদের, বিশ্বাস করুন, আমি এর বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানি না। এ মহিলাটিকে এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। আজই প্রথম পথের মাঝে দেখা। আপনারা খবর নিয়ে দেখুন। আমার নাম ছুইনিঙ্‌। আমি রেশম কাপড়ের ব্যবসা করি। আমার বাড়ী অমুক জায়গায়। এ দেড় হাজার টাকা আমার কাপড় বেচা উপার্জনের টাকা। চুচিয়াতাঙ্‌ যাবার পথে এঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এখানে যে এত সব কাণ্ড হয়ে গেছে আমি এর কিছুই জানি না।

সেই গ্রাম্য বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে এক ধমক দিয়ে বললে, চুপ কর্ হারামজাদা—ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে আর পাপ বাড়াসনি। ভগবান দোষীকে সাজা না দিয়ে ছাড়েন না। সিল্ক বিক্রী করে তোমার ঠিক দেড় হাজার টাকাই হয়েছিল না? একটি পয়সাও কম-বেশি নয়? শালা মিথ্যেবাদী—চোর—খুনে—লম্পট—বদমাইস। জনতাকে ডেকে বললেন, শালাকে এখন বেঁধে নিয়ে হাকিমের কাছে হাজির করি চল্। ছুঁড়িটাকেও ধরে নিয়ে আয়—

বলতে না বলতে ছেলের দল নিঙ্‌ আর চেনকে এক দড়িতেই বেঁধে নিয়ে চললো হাকিমের কাছে টেনে নিয়ে।

* * * *

হাকিম সমস্ত বিবরণ শুনে চেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ভদ্রবংশের মেয়ে হয়ে এমন নৃশংস কাজ কেমন করে করলে? স্বামীকে হত্যা করবার পরামর্শ বুঝি তোমার এই উপপতি ছেলেটিই তোমায় দিয়েছিল? তুমি একা এ কাজ করেছো বলে আমার মনে হয় না। নিশ্চয় এ ছেলেটি রাত্রে তোমার কাছে এসেছিল। তাই লিউ এসে অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর তবে তুমি এসে দরজা খুলেছিলে। সম্ভবতঃ এই ছুইনিঙ্‌ ছোকরাকে আগে বাড়ীর মধ্যে কোনও নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখে তবে তুমি এসে দরজা খুলেছিলে। তারপর, রাত্রে লিউকে হত্যা করে তার দেড় হাজার টাকার থলেটি নিয়ে ছুইনিঙ্‌ সরে পড়ে। তুমি সে রাত্রে ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে চ্যুয়ের স্ত্রীর কাছে এসে শুয়েছিলে। ভোরে উঠে এই খুনে ছেলেটির সঙ্গে তোমাদের পূর্ব ব্যবস্থা মতো মিলিত হয়েছো।

চেন কাঁদতে কাঁদতে বললে—ধর্মাবতার! আপনারা সবাই একটা মিথ্যা সন্দেহবশে দু'জন নিরপরাধীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর অবিচার করতে বসেছেন। আমার স্বামী আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমাদের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন খুবই সুখের ছিল। কিছুদিন থেকে অর্থকষ্ট শুরু হয়েছিল এ কথা ঠিক, কিন্তু, তা সত্বেও আমরা সুখেই ছিলুম। লোকজন সব ছাড়িয়ে দিয়ে আমি নিজেই সব কাজ করতুম। আমার স্বামী এতে দুঃখিত হতেন। অনেক সময় লজ্জিত হয়ে বলতেন, তোমার বাপের বাড়ী দশটা দাসদাসী, আর তুমি এ দুর্ভাগার হাতে পড়ে কিনা আমার বাড়ীই দাসীবৃত্তি করছো? আমিও আমার স্বামীকে মনেপ্রাণে ভালবাসতুম। তাঁর মধ্যে এমন অনেক মহৎ গুণ ছিল যাতে আমি তাঁকে শুধু ভালইবাসতুম না, আমার গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রতি। পতিগৃহে দাসীবৃত্তি করতে আমার কোনও লজ্জা ছিল না। নিজের বাড়ী—নিজের কাজ—নিজে করছি—এতে আমি গৌরববোধ করতুম। টাকা উপার্জন করে আনতে পারছেনা বলে কোন ভদ্রলোকের মেয়ে কোথায় স্বামীকে খুন করা দূরে থাক, স্বামীকে ছেড়ে পালায়? আমি তাঁর বিবাহিতা পত্নী, তার ঘরের গৃহিণী ছিলুম। বাজারের রক্ষিতা বেশ্যা নই যে—

হাকিম তাকে একধমক দিয়ে বললেন—তুমি সমস্ত মিথ্যে কথা বলছো? তোমার কথা আমি একটি বর্ণও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই। তুমি এই ছুইনিঙ্‌ ছোকরাকে যদি আগে থেকে না জানতে, তবে ওর সঙ্গে পথের মাঝে দেখা হতেই এ অচেনা অজানা পুরুষ মানুষের সঙ্গে

তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের বউ অনায়াসে একপ্রাণ হয়ে পথ চলতে শুরু করলে? তাছাড়া. সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে ওই দেড় হাজার টাকার থলেটি? ও'টিকে যদি তুমি সতী সাবিত্রীর মতো তোমার স্বামীর পদতলে বিদায়অর্ঘ্যরূপে রেখে এসো থাকো, তবে দেড় হাজার টাকার থলেটা এই পথভোলা পথিকের ঝোলার ভেতর এসে ঢুকলো কেমন করে? আমাদের কি তুমি নেহাৎ নির্বোধ মনে করে বোকা বোঝাবার চেষ্টা করছো না? তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে। গভীর রাত্রে তুমি একা কোন সাহসে বাড়ী থেকে পালিয়ে ওপাড়ার চুয়ের স্ত্রীর কাছে এসে উঠেছিলে? নিশ্চয় এই ছোকরাই তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়ে সে রাত্রে চুয়ের বাড়ী রেখে গেছলো। ভোরে উঠে তোমাদের পূর্ব পরামর্শ মতো ওই মেঠো পথে মিলিত হ'য়ে দুজনে সরে পড়ছিলে কোনও জাহাজ-ঘাটার দিকে নিশ্চয়। সত্যি কথা বলো। কোনও ভয় নেই। আমি জানি কোনও ভদ্রপরিবারের ভদ্র মেয়ের পক্ষেই মানুষ খুন করা সম্ভব নয়। খুনটা তোমার এই প্রণয়পাত্রটিই করেছেন। কেমন? সত্যি বল্লো?

চেন চুপ করে রইল।

গ্রামের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললে, কি আর বলবে হুজুর! বলবার কি আর মুখ আছে কিছু? আমাদের ছেলেরা ছুটে গিয়ে মাঝপথে যখন বামাল সমেত ধরে ফেললে দুই আসামীকে, ওরা কি আসতে চায়? ছুঁড়িটা বলে আমি কখনই আর ফিরে যাব না স্বামীর ঘরে। ছোঁড়াটা বলে আমায় আজ চুচিয়াতাং যেতেই হবে, নইলে আমার অনেক টাকা লোকসান হ'য়ে যাবে। তাহ'লেই বুঝুন, এ ব্যাপার আগে থেকেই ওদের গড়াপেটা ছিল।

হাকিম চেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চাওনি কেন?

চেন দৃঢ়স্বরে বললে, যে স্বামীকে আমি সুখেদুঃখে সমানভাবে এতকাল ভালবেসে, ভক্তি করে, সেবা করে এসেছি, আমার সেই দেবতুল্য স্বামী অর্থাভাবে মাত্র দেড় হাজার টাকার জন্য যখন আমার মতো স্ত্রীকেও একজন পরপুরুষের কাছে বেচে দিতে পারলেন, তখন সেই হৃদয়হীন আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তির ঘরে ফিরে যাওয়া আমার কাছে মনুষ্যত্ব-বিরোধী বলে মনে হয়েছিল।

হাকিম ধমকী দিয়ে উঠলেন—চুপ্। আমি কোনও কথা শুনতে চাইনি। তোমরা দুজনে মিলেই লিউকে হত্যা করে তার দেড় হাজার টাকার থলেটি নিয়ে সরে পড়েছিলে। তারপর ছুইনিঙকে ডেকে তিনি বললেন·কোথায় পেলে তুমি এ দেড় হাজার টাকার থলে—ঠিক বলো। সত্য বললে তোমাকে মাপ করবো। এ টাকাটা নিশ্চয় তোমার গুপ্ত প্রণয়িণী এই চেন সুন্দরী তোমায় উপহার দিয়েছেন না?

ছুইনিঙ জোড়হাত করে বললে, ও ভদ্রমহিলাকে আজ সকলের আগে আমি আর কখনো চক্ষে দিখিনি। টাকা আমার সঙ্গেই ছিল। কালকের হাটের মাল বেচার টাকা।

হাকিম এবার ওয়াঙকে ডেকে টাকার থলেটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন মশাই, এই দেড় হাজার টাকার থলিটিই তো আপনি কাল আপনার জামাই লিউকে দিয়েছিলেন?

ওয়াঙ্ বললে—আজ্ঞে হাঁ হুজুর—থলের গায়ে আমার নামের শীলমোহর রয়েছে।

হাকিম তখন হুকুম দিলেন, আসামীদের দোষ প্রমাণ হয়ে গেছে। এই নারীর মোহে নষ্ট চরিত্র ছুইনিঙের আগামীকাল সরকারী ফাঁসীমঞ্চে ফাঁসী হবে। আর, এই অসচ্চিরিত্রা পতিঘাতিনী স্ত্রীলোককে বাজারের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বিবস্ত্র করে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটা হবে।

চেন শুধু দুহাত জোড়করে আকাশের দিকে মুখ তুলে বললে. ভগবান! মানুষ বার বার ভুল করতে পারে। কিন্তু, তুমি তো কখনো ভুল করোনা। তোমার যদি এই বিচার হয় প্রভু—আমি তবে মাথা পেতে এ দণ্ড গ্রহণ করলুম।

এমন সময় দেখা গেল একটি স্ত্রীলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে হাকিমের কাছে। চিৎকার করছে, হুজুর! ভুল বিচার করবেন না—ওরা দুজনে সম্পূর্ণ নির্দোষ! এই নিন—সেই দেড় হাজার টাকার থলি। কাল রাত্রে লিউকে খুন করে, ওই দেড় হাজার টাকার থলি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল আমার স্বামী। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে ধরে এনেছি হুজুরের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য। ধর্মাবতার! আপনি শুধু বাইরের অবস্থা দেখে বিচার করবেন না। ধরুন যদি চেন আর ছুইনিঙ সত্যিই লিউকে খুন করে তার দেড় হাজার টাকার থলেটি নিয়ে পালাতো তাহলে রাত্রের অন্ধকারে উধাও হয়ে পালিয়ে যাওয়াই তো তাদের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ ও বুদ্ধিমানের কাজ হ'ত। কেন তারা বোকার মতো রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় একজন যাবে প্রতিবেশিনীর কাছে শুতে, আর একজন মাঠের পথে অপেক্ষা করবে সকালে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে মেলবার জন্য। এ সবই ওই বুড়ো আফিমখোর সয়তানের নেশার ঝোঁকে কল্পিত কেচ্ছা! আপনি ভাল ক'রে বুঝে দেখুন হুজুর! ছেলেটি ঠিকই বলেছে। ও দেড় হাজার টাকার থলে ওরই নিজের উপার্জনের টাকা। লিউর দেড় হাজার টাকার থলে যা তার শ্বশুর ওয়াঙ্ দিয়েছিল সে এই থলে যা আমার স্বামী নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। লিউকে খুন করবার একটু ইচ্ছা ছিল না তার। কিন্তু, লিউ জেগে উঠে ওঁকে ধরবার চেষ্টা করায় বাধ্য হয়ে উনি আত্মরক্ষার জন্য এ কাজ করেছেন।

হাকিম এবার মুস্কিলে পড়লেন। একটু ভেবে বললেন, তাইতো! দুটোই দেড় হাজার টাকার থলে! আবার দুটো থলেতেই ওয়াঙ্ সাহেবের শীলমোহর রয়েছে দেখছি। ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকছে।

ওয়াঙ এবার কন্যার জীবন সম্বন্ধে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ঠিক হয়েছে হুজুর। আমার মনে পড়েছে—আমি জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে অনেক মাল কিনে আগের দিন ও গাঁয়ের এক রেশম ব্যবসায়ীকে দেড় হাজার টাকার একটি থলি দিয়েছিলুম। ছুইনিঙ্ ছেলেটি মিথ্যে বলেনি দেখছি। ও সেই রেশম ক্রেতার কাছেই ওই দেড়হাজার টাকার

াটি পেয়েছিল। ওটি আমার জামাইকে দেওয়া দেড়হাজার টাকার ন নয়। আপনি ভাল করে থলে দুটি মিলিয়ে দেখুন ধর্মাবতার। ত্যক থলের গায়ে আমার শীলমোহর ছাড়া যেদিন যাকে যে থলিটি ওয়া হয় তাতে সেদিনের তারিখ আর টাকা দেওয়ার সময়ও লেখা ক। চুইনিঙের থলেতে রয়েছে—আগের দিনের তারিখ আর সময় ালবেলা। কিন্তু লিউকে দেওয়া থলেতে আছে—কালকের তারিখ য় সময় লেখা অপরাহ্ণ!—সুতরাং আমার মনে হয় চুইনিঙ্ ও ার কন্যা সম্পূর্ণ নির্দোষী। আপনি বিচার করে দেখুন হুজুর। যা র হয়ে গেছে। জামাই আমার আর ফিরবে না। কিন্তু, দুটো ীহ প্রাণীর অকারণ ফাঁসি হয়ে গেলে সেটা নিতান্ত অবিচার হয়ে বে না? আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন। আসামী যখন নিজেই ালতে এসে আত্মসমর্পণ করছে, চোরাই মাল ফেরত দিচ্ছে এবং ার করছে আত্মরক্ষায় বাধ্য হয়ে সে এই হিংস্র কাজ করেছে, তখন রের আদেশ বোধ করি পরিবর্তন করাই উচিত হবে।

হাকিম অনেক ভেবে শেষে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওই গ্রাম্য বৃদ্ধটি আমাকে ভুল পথে ঠেলে দিয়েছে, ওর হাজার টাকা জরিমানা করলুম। আমরা নিজেদের বড় বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে করি। কিন্তু আমাদের চেয়ে নির্বোধ আর কেউ নেই। আমরা বাইরে থেকে অবস্থা বিচার করে যা সাব্যস্ত করি, অনেক সময় প্রমাণ হয়ে যায় তা একেবারেই ভুল। যা আজকের এই মামলায় হ'তে বসেছিল। দুটি নিরীহ নির্দোষ প্রাণীর অকাল মৃত্যুর কারণ হচ্ছিলুম আমি। আমি ওদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিনা সর্তে ওদের মুক্তি দিলুম। আর যে প্রকৃত অপরাধী সে যখন বিচারালয়ে এসে আত্মসমর্পণ করেছে, অপহৃত অর্থ ফেরত দিয়েছে এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে, আমি তাকেও ক্ষমা করলুম। শুধু সে আমার কাছে সই করে একটা খত্ দেবে যে ভবিষ্যতে সে সৎজীবন যাপন করবে।

এই সুবিচারে সবাই বেশ খুশী হয়ে যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে চ্যুর স্ত্রীর কাছে রঙীণ নিমন্ত্রণ পত্র এলো—চেনের সঙ্গে চুই নিঙের বিবাহ!

(শেষ)

হাটের পশারী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পার হয়ে খেয়াঘাটে
পশরা বহিয়া আসিলাম বড় হাটে।
দরদর ঝরে ঘাম,
হেথা বটতলে পশরাটি বিছালাম।
কেহ ত না ফিরে চায়,
মিনতি করিয়া ডাকিলাম ক'জনায়।
র নাড়াচাড়া কহিল তাহারা—'এসব ঠুনকো, বাজে।
এই সব চীজ লাগবে না কোন কাজে।
সখের জিনিস—ঘর সাজাবার তরে
এসবের ঠাঁই নাই আমাদের ঘরে।
লো যদি তুমি আলু কি পটোল, হাতা বেড়ি ঝাটা হাঁড়ি,
াক, তেঁতুল, হলুদ, সুপারি—তা'হলে কিনতে পারি।'
াধা দামে দেব, সিকি দামে দেব, বিনা দামে দেব, নাও।'
বলিলাম কত, কেউ বলিল না 'দাও।'

ভাবিতে লাগিনু ব'সে ব'সে ভাঙা হাটে
আবার ওগুলো বয়ে নিতে হবে সেই দূর পার ঘাটে।
একটি বৃদ্ধ মাথায় বুলায়ে হাত,
কহিল আমারে স্নিগ্ধকণ্ঠে—'কোরো না অশ্রুপাত,
এসব তোমার হাটের পণ্য নয়,
নিজের গৃহেই সাজায়ে রাখিতে হয়।
যার প্রয়োজন সেই যাবে তব দ্বারে,
বাড়ীতে ব'সেই পাবে একদিন তারে।
কেউ আসে ভালো, না-ই আসে তাও ভালো।
করিবে এগুলি তোমার ঘরটি আলো।
হয়ত আসিবে একদিন দলে দলে,
তখন পশারী, রহিবে না ধরাতলে।
অন্য পণ্যে ভরাও পশরা উদরান্নের তরে
নির্ভর বাছা কোরো না ইহার 'পরে।'

এই কথা শুনে গুছায়ে পশরা ভরি'
খেয়াঘাট পানে চলিলাম ত্বরা করি'।

আধুনিক নগর-বিন্যাস

শ্রীভূপতি চৌধুরী

১। আধুনিক নগর বিন্যাসের মূল সূত্র বলতে হলে সামান্য একটু ভূমিকা প্রয়োজন।

২। আদিম মানুষ প্রথমে গড়েছিল শিবির বা উপনিবেশ, নদী বা জলাশয়ের ধারে মুষ্টিমেয় কয়েকটা পরিবারের প্রয়োজন মতো। তাদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল, জীবিকাবৃত্তি ছিল মাত্র একটা, শিকার বা কৃষিকার্য্য। প্রাথমিক স্তরের এই উপনিবেশগুলির পর কালক্রমে মাধ্যমিক স্তরের পল্লী বা বসতির সূত্রপাত হল। এ পল্লীতে একাধিক বৃত্তিজীবী মানুষের বাস, স্থাপিত হল হাট বাজার ও আদান প্রদানের কেন্দ্র। সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত হ'ল যৌগিক স্তরের পল্লী ও সহর—মানুষের মধ্যে ঘটেছে শ্রেণী বিভাগ, জীবিকানির্ব্বাহের নানা উপায় হয়েছে উদ্ভাবিত। দেশে শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ঘটেছে।

৩। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীকেন্দ্রিক সভ্যতা ধীরে ধীরে সহর অভিমুখী হ'য়ে উঠল। দেবমন্দির বা উপাসনা-মন্দির এবং রাজার প্রাসাদকে কেন্দ্র করে নানাস্থানে প্রাচীরবেষ্টিত ছোট ছোট সহর স্থাপিত হ'ল। ব্যবসা ও বাণিজ্য নির্ভর করত কৃষি ও কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের উপর। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সহর ও পল্লীরূপ বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয়নি। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতির উপায় ছিল অশ্ব বা অশ্বযান।

৪। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে উদ্ভাবিত হল ষ্টীম ইঞ্জিন। বাষ্পশক্তির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে সমস্ত জগতে এল, এক বিপুল পরিবর্ত্তন। দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল লৌহপথ। দূর দূরান্তের দেশ মানুষের অনায়াসগম্য হয়ে এল। যন্ত্রযুগের কল্যাণে ও বিদ্যুৎশক্তির প্রেরণায় শ্রমশিল্পের উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি পেল।

৫। প্রাচীরবেষ্টিত সহরগুলির সীমানার মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব, ভেঙে পড়ল সহরের গণ্ডী; সহরের অপ্রশস্ত সর্পিল পথের দুই পাশে নির্ম্মিত হতে লাগল বহুতল বিশিষ্ট হর্ম্ম্যরাজি ও সহরের উপকণ্ঠে গঠিত হতে লাগল অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বসতি—যেগুলিকে আজ আমরা "বস্তি" নামে অভিহিত করে থাকি।

৬। পল্লী থেকে লোক দলে দলে এসে এই সব বস্তিতে আশ্রয় নিল—যোগ দিল কলকারখানায়—অত্যন্ত বিশ্রী পরিবেশ। কিন্তু কে একথা চিন্তা করে। একমাত্র লক্ষ্য অর্থ উপার্জ্জন।

৭। সহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সহরের আবহাওয়া দূষিত হয়ে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল—প্লেগ কলেরা প্রভৃতি নানারকমের মহামারীর আবির্ভাব হতে লাগল। পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা, পথ ঘাট বাঁধানো ও আলোকিত করার সমস্যা ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠল।

৮। সহরের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য একদিকে চেষ্টা হতে লাগল সহর সংস্কারের, অন্যদিকে চেষ্টা হতে লাগল—সহরমুখী মানুষের গতিকে আবার পল্লীর পথে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

৯। কিন্তু মানুষ আর পল্লীতে ফিরে যেতে চায় না। আসল কথা, যতদিন না পল্লী ও সহরের বর্ত্তমান প্রভেদ দূরীভূত হচ্ছে, পল্লীতে জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন শুধু "গ্রামে ফিরে চল" এই ধূয়ায় লোক আকৃষ্ট হয়ে পল্লীতে ফিরে যাবে না।

১০। সুতরাং এখন প্রয়োজন ব্যাপারটাকে দুটী অংশে ভাগ করা—প্রথম বর্ত্তমান সহরগুলির সংস্কার এবং দ্বিতীয় পল্লী-পরিবেশে নতুন সহর স্থাপন।

১১। এখন প্রশ্ন হল নতুন সহরগুলির পরিকল্পনা করতে হলে কী কী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে?

(ক) যানবাহন চলাচলের সুবিধাজনক ব্যবস্থা—নদীপথ, রেলপথ, স্থলপথ এবং বায়ুপথ—এই সব কটী পথের কথা চিন্তা ও তাদের সংযোগ ব্যবস্থা।

(খ) সহরবাসীর জীবিকানির্ব্বাহের জন্য শ্রমশিল্পের ব্যবস্থা ও কলকারখানা স্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত স্থান ও সংযোগ ব্যবস্থা। কলকারখানা সহরের এমন অংশে স্থাপন করতে হবে যাতে সেগুলি ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের জন্য সহজেই জমি সংগ্রহ করতে পারে।

(গ) সহরবাসীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা এমন ভাবে করতে হতে যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও আবহাওয়া যেন কোনো রকমেই ক্ষুণ্ণ না হয়। আবাসিক অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে খোলা বাগান ও শিশুদের খেলা ধুলার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখতে হবে।

(ঘ) সহর ও সহরতলীর অঞ্চলের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করতে হবে। কারখানা, হাট, বাজার, সিনেমা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয় প্রভৃতির অবস্থান একটী পরিকল্পনার মধ্যে পূর্ব্ব থেকে স্থির করে রাখলে সহরবাসীদের অসুবিধার কারণ থাকবে না।

(ঙ) প্রত্যেকটী গৃহ এমনভাবে নির্ম্মাণ করতে হবে, যাতে তার চারপাশে, আলো ও বাতাস চলাচলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খালি জায়গা থাকে।

(চ) সহরের বিভিন্ন অং এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে—যাতে শাসন-পরিষদ, বিচারালয়, সংস্কৃতি ভবন, বিদ্যালয়, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটী কেন্দ্রের সংযোগ ব্যবস্থা সরাসরি ও সরলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

১২। নতুন সহর স্থাপন ব্যাপারে নানাপ্রকারের কল্পনাকে রূপদান করার চেষ্টা বিংশতাব্দীর আরম্ভ থেকে সুরু হয়েছে; সেই সব কল্পনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল "উদ্যানপল্লী" বা Garden City রচনার চেষ্টা।

১৩। উদ্যান-পল্লী রচনার প্রধান আকর্ষণ হল—মনোরম পল্লী পরিবেশে সহরের সকল সুখ সুবিধা—যথা বিদ্যুতের আলো, কলের জল, ড্রেণ এবং পাকা রাস্তা প্রভৃতি ব্যবস্থা—এই উদ্যান পল্লী রচনার ভিত্তির সূত্র চারটী—

প্রথম—বিঘাপ্রতি চারের অনধিক গৃহ নির্ম্মাণ

দ্বিতীয়—প্রত্যেকটী গৃহ স্বতন্ত্র বা যুগ্ম

তৃতীয়—প্রত্যেকটী গৃহের সামনে ও পিছনে বাগান

চতুর্থ—প্রত্যেকটী পথের দুই ধারে থাকবে ছায়া বহুল বৃক্ষশ্রেণী

১৪। কয়েকটী উপসহর বা উদ্যানপল্লী এই সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে নির্ম্মাণও করা হয়েছিল। বর্ণনায় এই সব উদ্যান পল্লী যতটা মনোজ্ঞ বলে মনে হয়েছিল—কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল যে এভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মানুষ থাকবে একজায়গায়—আর সকাল হলেই দূরান্তে যেতে হবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায়? ফলে না হল সহরের সমস্যার সমাধান, না রইল উদ্যানপল্লী রচনার সার্থকতা।

১৫। বর্ত্তমানযুগে মোটরকার, উড়োজাহাজ, ইলেক্ট্রিসিটি, টেলিফোন ও রেডিও আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত হয়ে গেছে যে আজ গতিবেগের ঘূর্ণাবর্ত্তে আমরা উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনা।

(১৬) সুতরাং সমস্যায় সমাধান করতে হবে—আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন ও আমাদের জীবন যাত্রার উত্তরোত্তর গতিবেগের দিকে লক্ষ্যরেগে। উদ্যান পল্লী রচনার মধ্যে, প্রকৃত সমস্যার মাত্র একটী দিক অর্থাৎ বাসগৃহ অঞ্চলের মনোরম পরিবেশের কথাই চিন্তা করা হয়েছে—আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও প্রকৃত আধুনিক সহরের বিভিন্ন অংশের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা সমগ্র ভাবে চিন্তা করা হয়নি।

(১৭) আধুনিক যুগের উপযোগী একটী সমগ্র সহরের এক বিচিত্র পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন এক জগদ্বিখ্যাত স্থপতি—তাঁর নাম—Corbusier। এঁর নাম ভারতবর্ষে অজানা নয় কেননা তিনি পূর্ব্বপাঞ্জাবের নতুন রাজধানী "চণ্ডীগড়ের" পরিকল্পনা-কার। এই সহরটী এখন সবে গড়ে উঠছে—কাজেই তাঁর পরিকল্পনা কতদূর সার্থক হয়েছে তা বলবার সময় এখনও আসেনি, তবে সহরটী যতদূর তৈরী হয়েছে তা থেকে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এর রচনা প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব।

(১৮) Corbusier এর নতুন যুগের আধুনিক সহরের পরিকল্পনার প্রধান কথা হল :—

(১) সহরের বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ সহরের কেন্দ্রস্থানটী একস্থানে নিবদ্ধ না রেখে সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কেন্দ্রগুলিকে স্থাপিত করে তাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করা।

(২) কেন্দ্রস্থলে ব্যবসা ও বাণিজ্যের কর্ম্মস্থলের গৃহ গুলির উচ্চতা বৃদ্ধি—এই গৃহগুলি Corbusierয়ের মতে হওয়া উচিত ৭০০ ফুট উঁচু এবং এগুলি অন্তত সিকি মাইল অন্তর অবস্থিত হবে। এগুলির আকার অনেকটা যোগ চিহ্নের মতো এবং এই আকাশস্পর্শী গৃহগুলির চতুষ্পার্শে থাকবে ২৪০০ গজ দীর্ঘ ও ১৫০০ গজ প্রশস্ত উদ্যান ও রাজপথ।

সহরের কেন্দ্রস্থলে খোলাজমি ও উদ্যানের পরিমাণ শতকরা ৯০ বা ৯৫ ভাগ।

আবাসিক গৃহগুলি দ্বিতল বা ত্রিতলের বেশী উচ্চ হবে না। এখানে খোলা জমির পরিমাণ শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ হবে।

(১৯) আদর্শ হিসাবে এই পরিকল্পনা যে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় অনেক উন্নত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থান, কাল এবং পাত্রের হিসাবে এই পরিকল্পনা যে সর্ব্বক্ষেত্রে কতদূর অনুসরণযোগ্য সে সম্বন্ধে বিচার ও বিবেচনা করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

(২০) বিগত মহাযুদ্ধের পর পুরাতন সহরগুলির সংস্কার এবং নূতন সহর স্থাপন সম্বন্ধে অনেকগুলি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরিকল্পনাগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায়,—যে বর্ত্তমান সহরগুলির জনসংখ্যার ঘনতা অত্যন্ত বেশী এবং সহরের খোলা জমি ও উদ্যানের পরিমাণ একান্ত নগণ্য।

(২১) জনসংখ্যার হিসাবে খোলা জমি ও উদ্যানের একটী মান নির্দ্ধারিত হয়েছে—প্রতি হাজার লোকের জন্য অন্ততঃ ১৫ থেকে ২০ বিঘা জমি প্রয়োজন এবং এর মধ্যে ২ বিঘা জমি রাখতে হবে ১৪ বছর বয়সের অনূর্দ্ধ শিশুদের জন্য! এগুলির অবস্থিতি হবে ½ মাইল অন্তর। বাকী জমি যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের খেলাধূলা ও বেড়াবার বাগান হিসাবে রাখতে হবে।

(২২) জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্বন্ধেও কয়েকটী নিয়ম প্রচার করা হয়েছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে লণ্ডনের বাসপল্লী অঞ্চলের ঘনত্ব ছিল বিঘা প্রতি ১৫০, কলকাতা সহরের কয়েকটী অঞ্চলে জনতার ঘনত্ব ছিল বিঘা প্রতি ২০০ থেকে ২৫০। এই ঘনত্ব সহরের স্বাস্থ্যের দিক থেকে একান্ত অবাঞ্ছনীয়। সহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য ঘনত্বের জন্য তিনটী শ্রেণী নির্দ্দেশ করা হয়েছে—সহরের কেন্দ্রস্থলে বিঘা প্রতি ঘনত্ব ৭০ এবং কেন্দ্র থেকে অল্পদূরে এই ঘনত্ব হ্রাস করে ৪০ থেকে ৫০য়ের মধ্যে থাকা উচিত। শহরের প্রান্ত ভাগে এই ঘনত্ব ৩০ থেকে ৩৫য়ের বেশী যেন না হয়।

(২৩) সহরের কেন্দ্রস্থলে প্রশস্ততর পথ এবং যানবাহনের জন্য সাময়িক অবস্থান ব্যবস্থা (Parking) পূর্ব্ব-পরিকল্পিত হওয়া উচিত ; এক অংশ থেকে আর এক অংশে যাতায়াতের জন্য প্রধান পথগুলির সংযোগ স্থলে বৃত্তাকার দ্বীপ বা দুই স্তরের পথ ও বৃত্তাকার অবতরণিকার ব্যবহার (Cloverleaf) দ্রুতগতির একান্ত সহায়ক।

(২৪) প্রত্যেকটী অঞ্চলের ব্যবহার এমন ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট করে দিতে হবে যাতে বাসগৃহ অঞ্চলের মধ্যে শান্তি ও স্বাস্থ্যের বিঘ্নকর কোনো অবস্থার উদ্ভবনা না হতে পারে। একটী বাসগৃহ পরিকল্পনার সময় যেমন একটী পরিবারের জীবনযাত্রা প্রণালীর যাবতীয় প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তার ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি একটী নগর পরিকল্পনার ব্যাপারে সমগ্র নগরবাসীর বিবিধ প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।

(২৫) আধুনিক নগর বিন্যাসের সমস্যা অনেক এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির রূপ এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হয় যে সেগুলির সমাধান সম্বন্ধে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। তবে একথা নিশ্চয় যে সমস্যার প্রকৃত রূপ বা আকার সম্বন্ধে যদি সতর্ক দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ মূলক মনোভাব প্রয়োগ করা যায় তবে তার সমাধান যে অনায়াসসাধ্য হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হ'তে ২৩শে নভেম্বর প্রচারিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাধানাথ প্রায় জন কুড়ি মজুর, প্রচুর বাঁশ-খড়, কোদাল-শাবল, কাটারি-দড়ি প্রভৃতি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কুমার গিয়া দেখিল গোটাচারেক গরুর গাড়িতে চৌকি আসিয়াছে, গঙ্গা চাকরদের সহায়তায় সেগুলি নামাইতেছে।

রাধানাথবাবুর সহিত চোখোচোখি হইতেই কুমার বলিল, "দাদার টেলিগ্রাম এসেছে, ওঁরা কিউলে আটকে পড়েছেন, ট্রেণের কনেক্‌শন পান নি। টেলিগ্রামটা কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছে, এতক্ষণে ডেলিভারি দিয়ে গেল। বলছে—পিওন ছিল না, তাই পাঠাতে পারে নি। আগের পোস্টমাস্টারবাবু থাকলে নিজেই এসে দিয়ে যেতেন"

গোপ মহাশয় নির্নিমেষে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এও যাবে। যে লোক সদরে সিভিল সার্জনকে ডাকতে যাচ্ছে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে' যায়। আমি তার হাতে একটা চিঠি দেব"

"আচ্ছা। দাদাকে আগে টেলিগ্রামটা করে' দিই, দাদা কিউল থেকে রিপ্লাই প্রিপেড টেলিগ্রাম করেছেন"

"সেখানে কোন ঠিকানায় টেলিগ্রাম করবে"

"কেয়ার অফ্ স্টেশন মাস্টার"

"বিরুবাবুর সবই বিচিত্র কাণ্ড"

রাধানাথ গোপের গম্ভীর মুখে হাসির আভাস জাগিল।

"গঙ্গাকে একটু ছুটি দেবেন? ও গিয়ে টেলিগ্রামটা করে' আসুক"

"হ্যাঁ, ও যাক না। গিরিধারী তুমি চৌকিগুলো নাবাও"

"আমাকে যদি কিছু করতে হয় বলুন"

"বলেইছি তো, তুমি তোমার বাবার কাছে চুপ করে' বসে থাক গিয়ে। আজ বিকেলের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে' দিচ্ছি, তুমি দেখ শুধু বসে' বসে'। ভাল কথা, চন্দরবাবুকে খবরটা দিয়েছ তো—"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"

"কোথা আছেন তিনি আজকাল, অনেকদিন দেখি নি তাঁকে"

"পুরীতে আছেন—"

"যদি আসেন, আসবেন তো নিশ্চয়ই, তাহলে দেখাটা হয়ে যাবে অনেকদিন পরে। আমি ওঁর ছাত্র তা জান তো, এখানে যখন প্রথম মাইনার স্কুল হয়, তখন উনিই হেড মাস্টার হ'য়েছিলেন। ও রকম মাস্টার আমি দেখি নি। দু' ভাইই অদ্ভুত—"

চন্দ্রসুন্দর সূর্য্যসুন্দরের একমাত্র ছোট ভাই।

গঙ্গা কুমারের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

"তুই টেলিগ্রামটা পোস্টাফিসে দিয়ে আয়"

গঙ্গা এতক্ষণ নীরব ছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে এবার সে বলিল, "রাধানাথবাবু যা কাণ্ড লাগিয়েছেন শেষে তোমাকে বিপদে না ফেলেন"

"কি বিপদ"

"শেষকালে যদি বলেন এসব করতে দু'শ পাঁচশ' টাকা খরচ পড়েছে—

"না, না—তা কি বলেন কখনও"

"কিছুই আশ্চর্য্য নয়। খগেনবাবুর মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী দেখাশোনা করবার সব ভার উনি নিয়েছিলেন। এমনি নিজে যেচেই নিয়েছিলেন। বিয়ে শেষ হয়ে যাবার ছ'মাস পরে উনি খগেনবাবুকে জানালেন যে বরযাত্রীদের জন্য তাঁর তিনশ' টাকা খরচ হয়েছে। খগেনবাবু বেচারাকে দিতে হ'ল টাকাটা। অথচ বরযাত্রী ছিল মাত্র পঁচিশ জন—

"খরচ নিশ্চয় পড়েছিল—"

"তুমি রাধানাথবাবুকে চেন না। উনি সব জায়গায় বাহাদুরি করে' এগিয়ে যাবেন, তারপর তার থেকে লাভ করবার চেষ্টা করবেন"

"কি যা তা বলছিস ভদ্রলোকের নামে"

"দেখো শেষে—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গা পুনরায় বলিল— "বাবার অসুখ করেছে তাতে এমন ধুমধাম করে' ঘরবাড়ি বানাবার কি আছে। কেউ যদি আসে, বাইরের বৈঠকখানায় বসবে—খবর নিয়ে চলে যাবে। এত ঘর বানাবার দরকার কি"

দরকার আছে। ঘর না থাকলে বেশী লোক এলে মুশকিল হবে। আমাদের বাড়িরই যদি সবাই আসে জায়গা দিবি কোথা। বেশী কয়েকটা ঘর থাকা ভাল—"

"তাহলে এক কাজ কর তুমি। ঘর তৈরি করতে যা খরচ হচ্ছে তা নগদ হিসেব করে' এখনি দিয়ে দিও। ছ'মাস পরে তোমার কিছুই মনে থাকবে না"

"আচ্ছা, সে যা হয় করা যাবে। তুই এখন টেলিগ্রামটা দিয়ে আয়। ট্রেণের গোলমালে দাদাকে নিশ্চয় অনেকক্ষণ কিউলে থাকতে হবে, তা না হলে টেলিগ্রাম করত না। টেলিগ্রামটা কাল রাত্তির থেকে এসে পড়ে আছে, এতক্ষণে দিয়ে গেল। নতুন পোস্টমাস্টারটি লোক সুবিধের নয়"

"তাই না কি !"

গঙ্গা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল। কুমার টেলিগ্রাম লিখিতেছিল কোনও জবাব দিল না। গঙ্গাও আর কিছু বলিল না, টেলিগ্রামটা লইয়া চলিয়া গেল। গঙ্গা চলিয়া যাইবার পর সাইকেলে চড়িয়া সুকুমার হাজির। সুকুমার স্টেশন মাস্টারের ছেলে।

"জ্যাঠামশাই কেমন আছেন আজ"

"কালকের চেয়ে অনেকটা ভাল। কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। খেয়েওছেন"

"তাহলে বালুয়াচকে চলুন না। সেখানে যা হাঁস বসেছে দেখে এলাম, একটা ফায়ার করলে অন্তত পঞ্চাশটা পড়বে। হাজার হাজার বসে' আছে। চলুন না, যাবেন ?"

"এখন কি করে' যাই বল"

"জ্যাঠামশাই তো ভাল আছেন বললেন"

"তবু একজন কাছে থাকা দরকার সর্ব্বদা। দাদারা আসুক, তারপর যাওয়া যাবে একদিন"

"আমাকে সঙ্গে নেবেন কিন্তু"

"বেশ"

"বাবা বললেন—কোন-কিছু যদি দরকার থাকে খবর দিতে"

"এখন তো কোন দরকার নেই, হ'লে নিশ্চয় পাঠাব"

"আচ্ছা"

সুকুমার আবার বাইকে চড়িয়া চলিয়া গেল। যদিও স্টেশন মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, তবু সুকুমার যখনই আসে বাইকে চড়িয়া আসে। বাইকটি নূতন কিনিয়াছে।

কুমার ভিতরে গেল। উর্ম্মিলা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া সূর্য্যসুন্দরের চোখের কোন পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। কুমারকে দেখিয়া সূর্য্যসুন্দর ঘাড় ফিরাইলেন।

"বিরুর কোন খবর আসে নি ?"

"খবর এসেছে। কিউলে ট্রেণ মিস্ করে' দাদা টেলিগ্রাম করেছে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালে এসে পড়বে নিশ্চয়"

"আর কারু খবর আসে নি ?"

"না"

সূর্য্যসুন্দর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। একটু অন্যমনস্ক হইয়াও পড়িলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, শেষ সময়ে সকলের সহিত দেখা হইবে তো ? অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে আশ্বাস দিল, হইবে। পৃথ্বীশও আসিবে। পৃথ্বীশ প্রায় সাত-আট বছর আগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। কেন করিয়াছে কেহ জানে না। কোথায়

আছে, কি করিতেছে কোনও খবরও সে দেয় না। সূর্য্যসুন্দরের মনে হইল সে-ও আসিবে। কুমারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আজ অনেকটা ভাল আছি"

"রাধাবাবু এসেছেন। তিনি বলছেন, সিভিল সার্জনকে আনিয়ে একবার দেখাতে। আজ এগারোটার ট্রেণে নবীনকে পাঠিয়ে দেব ভাবছি"

"ভালো তো আছি। কি দরকার তাঁকে কষ্ট দিয়ে"

"তবু একবার দেখে যান"

"হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করে' তিনি যদি মত দেন, তাহলেই সিভিলসার্জনকে খবর দিও। তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাও বরং"

"আচ্ছা—"

কুমার অনুভব করিল—বাবার মনে প্রফেসনাল এটিকেটের কথা যখন জাগিতেছে তখন জ্ঞানের মধ্যে আর কোনও আবিলতা নাই। কাল সন্ধ্যার সময় বাবার জ্ঞান এত পরিষ্কার ছিল না। সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার চিঠি লইয়া সিভিলসার্জনের কাছে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কুমার চলিয়া গেলে সূর্য্যসুন্দর উর্ম্মিলাকে বলিলেন, "মা, তুমি উঠে মুখ হাত ধুয়ে এস। সারারাতই তো মাথার শিয়রে বসে আছ"

"না, আমি ঘুমিয়েছি তো"

"কোথায় ঘুমুলে"

"আপনার মাথার শিয়রেই ঘুমিয়েছিলাম। এখানে অনেকটা জায়গা আছে যে"

"চা খেয়েছ ?"

"এইবার যাব। বিজলী আসছে, সে এলে তাকে বসিয়ে যাব"

"বিজলী কে"

"রমেশ কাকার নাতনী"

"ও, সে এসেছে নাকি"

"পরশু এসেছে"

সূর্য্যসুন্দর চক্ষু দুইটি ধীরে ধীরে বুজিলেন, কথা কহিয়া তিনি যেন একটু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার স্মৃতিপটে বিজলীর ছেলে-বেলার ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। ফ্রক-পরা বিনুনি-দোলানো ছোট মেয়ে একটি। বাড়িতে তখন একটি টিয়া পাখী ছিল, টিয়া-পাখীর খাঁচাটির কাছে ঘুরঘুর করিত। চন্দরের বন্ধু রমেশ। সূর্য্যসুন্দরই তাহাকে জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। রমেশের ছেলে সুখেন্দু (কোথায় আছে সে এখন ?)। রমেশ যখন প্রথম এখানে আসে সুখেন্দুর বয়স একবৎসর। সেই সুখেন্দুর মেয়ে বিজলী এখন যুবতী। সময় কত দ্রুত চলিয়া যায়···সূর্য্যসুন্দর আর ভাবিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নবীনকে সিভিলসার্জনের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কুমার চাকরদের মাঠে পাঠাইয়া দিল। আখের ক্ষেত, গমের ক্ষেত প্রভৃতিতে যেসব কাজ বাকী ছিল সেগুলি সারিয়া তাহারা যেন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়া আসে। বাড়িতে সদা-সর্ব্বদা লোক থাকা দরকার। অক্লান্তকর্ম্মী রাধানাথ একটা চালাঘর প্রায় খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, বাড়ির পিছনের দিকের মাঠে গোটা দুই তাঁবুও খাটানো হইয়া গিয়াছে। কিছু কাজ করিতে পারিলে কুমারের মনটাও অবলম্বন পাইয়া স্থির হইত। মাঠে অনেক কাজ, কিন্তু বাবাকে ফেলিয়া মাঠে যাইবার উপায় নাই। গোপ মহাশয়ও তাঁহাকে ওদিকে ভিড়িতে দিবেন না, সুতরাং সে পূর্ব্বদিকে পিয়ারা গাছতলায়, যেখানে রোদ পড়িয়াছে, সেইখানে ক্যাম্বিসের একটা 'ডেক্' চেয়ার পাতিয়া সূর্য্যসুন্দরের ডায়েরিটা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"আমার দেশের বাড়িতেই আমি বড় হইতে লাগিলাম। আমার জন্মের পর মামা কেবল মামীমাকেই সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন। মা এবং দিদিমাকে লইয়া গেলেন না। আমার ভাইপো দুইটি চাকরি পাইয়া পূর্ব্বেই বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল। তখন ঘরের গাই কালীর অনেক দুধ হইতেছিল, পুকুরে প্রচুর মাছ, জমি হইতে ধানও আসে প্রচুর। মামা বলিলেন, এসব ফেলিয়া বিদেশে যাওয়ার দরকার কি। সবাই বিদেশে চলিয়া গেলে পুকুর-বাগান কিছুই থাকিবে না। মা এবং দিদি এসব লইয়া এখানেই থাকুন, খেতু দেখা-শোনা করিবে, আমি প্রতি মাসে কিছু

টাকা পাঠাইয়া দিব। সুতরাং আমার বাল্যকালের প্রথম কয়েক বৎসর মামার দেশের বাড়িতে শঙ্করা গ্রামেই কাটিয়াছিল। সাত-আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। সে সময়ের স্মৃতি আমার মনে খুব স্পষ্টভাবে আঁকা নাই। আবছা-ভাবে কিছু কিছু মনে আছে। মামা যে নিজের মা এবং দিদিমাকে গ্রামে ফেলিয়া রাখিয়া নিজের বউটিকে লইয়া শহরে চলিয়া গিয়াছিলেন ইহাতে দিদিমা (আমার মা) খুব সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে অবশ্য মুখে তিনি কাহারও কাছে বিশেষ কিছু বলিতেন না; আমার মা তো নীরবতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইত না। তিনি মুখ বুজিয়া ঘরের সমস্ত কাজগুলি একের পর এক করিয়া যাইতেন। তাঁহার তখনকার যে ছবিগুলি আমার মনে আঁকা আছে, তাহাদের একটিতেও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া নাই! ঘর-দুয়ার-উঠান-গোয়াল পরিষ্কার করিতেছেন, দুধ দুহিতেছেন, পুকুর হইতে জল আনিতেছেন, রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করিতেছেন, অথবা দিদিমার পায়ে তেল মালিশ করিতেছেন—মায়ের এই সব ছবিই আমার মনে আঁকা আছে। কোথাও বসিয়া পর-নিন্দা বা পর-চর্চ্চা করিতেছেন এরূপ একটি ছবিও আমার স্মৃতিপটে আঁকা নাই। তবে মামা কেবল মামীমাকে লইয়া বিদেশ চলিয়া যাওয়াতে আত্মীয়দের মনে যে ঈষৎ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা খেতু-মামার আলাপে বুঝিতাম। খেতু-মামা প্রায়ই আসিয়া দিদিমার কাছে মামার প্রসঙ্গ তুলিয়া যাহা বলিতেন, তাহার কিছু কিছু আমার এখনও মনে আছে।

একদিন খেতু-মামা মাঠ হইতে ফিরিয়া আমাদের বাড়ি আসিলেন। মাঠের ফেরতই তিনি আমাদের বাড়িতে অধিকাংশ দিন আসিতেন। নিজের জমিতে জনমজুরদের সহিত নিজেই কাজ করিতেন তিনি। সেদিন দুপুরে মাঠ হইতে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়া মাথার টোকাটা খুলিয়া ফেলিলেন, হাতের কাটারিটা উঠানের একধারে রাখিলেন, তাহার পর হাঁকিলেন—"কই, বারাহী, এক ঘটি জল দে তো—"

মা রান্নাঘরে ছিলেন, আমি ছিলাম লেবু-তলার ওপাশে। উঠানে দুইটি লেবু গাছ ছিল। লেবু গাছের দক্ষিণ দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। তিনদিকে বাড়ির দেওয়াল, আর একদিকে লেবু গাছ। চমৎকার নির্জ্জন জায়গাটি, অথচ উঠানের মধ্যেই। আমি সেইখানেই খেলা করিতে ভালবাসিতাম! আমার সঙ্গী ছিল সন্তোষ। সন্তোষের মা ভবতারিণী দেবী মায়ের সখী ছিলেন, ইহাঁর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা সেদিন ইঁটের টুকরা ও কাদা দিয়া শিব-মন্দির গড়িতেছিলাম।

মা খেতু-মামাকে জল আনিয়া দিতে খেতু-মামা পা দুইটি বেশ ভালো করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন।

"আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল চাই, খাব। তারপর তামাক সাজ এক ছিলিম। তোর মতন তামাক কেউ সাজতে পারে না। কেদারকে তামাক সেজে খাইয়েছিলি একদিনও? খাওয়াস নি? খাওয়ালে তোকে ফেলে যেতে পারত না"

আমি লেবু গাছের আড়ালে বসিয়া সব দেখিতেছিলাম। মা খেতু-মামার কথাগুলি শুনিয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। ঘরে ঢুকিয়া একটি ছোট রেকাবী ও এক ঘটি জল আনিয়া দিলেন। রেকাবীতে সম্ভবত বাতাসা ছিল। বাতাসাগুলি মুখে ফেলিয়া দিয়া খেতু-মামা আলগোছে ঢক্‌ঢক্ করিয়া সমস্ত জলটি পান করিলেন, এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না। একটু পরেই দেখিলাম মা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছেন। খেতু-মামার কোমরে পিছন দিকে সর্ব্বদা একটি ছোট হুঁকা গোঁজা থাকিত। সেটি তিনি মায়ের হাতে দিলেন। মা কলিকাটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া হুঁকায় জল ভরিলেন। খেতু মামা দু'একবার টানিয়া খানিকটা জল ফেলিয়া দিয়া কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিলেন। তাহার পরই হুঁকার ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ

রাতের প্যারী

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম-এ (এড্), এম্‌-এ, (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন)

তখন প্যারিসের সন্ধ্যা। পথে আলোকের বন্যা। কোথাও নাচের আসর, কোথাও মিলনবাসর। কোথাও বা পাতালপুরীতে পাষাণের বুকে মাথা খুঁড়ে মরছে সোনার নূপুর।

সাইন নদীর জল দূর থেকে ঝকমক করছিল। নগরীকে বেষ্টন করে কণ্ঠহারের মত শোভা পাচ্ছে এই নদী। এর বাঁকে বাঁকে গড়ে উঠেছে অগণিত সৌধ, আর স্মৃতিস্তম্ভ। সেই চাঁদনী রাতে যেন স্বপ্ন দেখছিল সৌন্দর্য্যময়ী নগরী। নদী বয়ে চলেছে, ধারে ধারে কত পান্থনিবাস ও বার। রেঁস্তোরাগুলির বাইরে ত্রিপলের নীচে খানকয়েক করে চেয়ার পাতা। মাঝে মাঝে নানা ধরণের টব বসান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে চলেছে একটি সুরাপাত্র সামনে রেগে, অদ্ভুত এদেশের লোক। যেন চার্ব্বাকের দর্শনটিকে জীবনের সার বলে মেনে নিয়েছে—
—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।"

মাঝে মাঝে ভেসে আসে ওপারের কলকোলাহল। সেতু দিয়ে খণ্ডিত সর্পিল নদীটির বুকে ঢেউ জাগিয়ে ছুটে চ'লেছে কত তরণী। আছড়ে পড়ে সেই ঢেউ নদীর কুলে কুলে। আর আছড়ে পড়ে কত অসহায় দৃষ্টি ওপারের স্মৃতিমন্দিরের গায়ে।

প্রশস্ত ঝকঝকে রাজপথের 'পরে আলো ঠিকরে প'ড়েছে। সামনেই একটি বিরাট স্মৃতিমন্দির। দূর থেকে দেখতে অনেকটা তাজমহলের মত। শুনলাম সেটি একটি গির্জ্জা—নাম সিক্রেটহার্ট। কোথায় প্রেমের সমাধি মন্দির তাজমহল, আর কোথায় বিলাসপুরীর মাঝে এই ধর্মপীঠ সিক্রেটহার্ট! বসে রইলাম তারই ছায়ায়! জ্যোৎস্নার আলোয় সেই পাষাণপুরীর অঙ্গনতল অপরূপ লাগছিল।

স্থানটি নির্জ্জন, আশেপাশে কয়েকটি বিদেশী গাছের পাতায় ঝিরঝির শব্দ হচ্ছিল। চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো দূরান্তের স্তম্ভটি (আইফেল টাওয়ার)। প্যারিসের আভিজাত্য যেন শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। গর্ব্বোন্নত মাথা উঁচু করে আছে নীল আকাশের গায়ে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করে, পথিকের মনপ্রাণ হরণ করাই যেন এর কাজ। তাই আকাশের গায়ে তারই বিজয় ঘোষণা।…

দূর আকাশে চাঁদ হাসছে, আর হাসছে সারা নগরী। তন্ময় হ'য়েছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম নীরব পায়ের শব্দ শুনে। বুঝতে পারলাম এ মনের ভুল। এতরাত্রে কে আসবে এই গির্জ্জায়?

রহস্যময়ী রাত্রির অবগুণ্ঠনে স্বপ্নময়ী প্যারীর বিলাসের কথা শুনে এসেছি। কিন্তু মন যেন তখন অন্য কি খুঁজে ফিরছিল। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্পন্দন জেগেছে মনে। সহসা মনে হয় সৃষ্টির এই উন্মাদনা, এই অশান্ত কোলাহলের মাঝখানে, নিভৃতে যেন কার 'নির্জ্জন আসনখানি' পাতা—

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জ্জন
তোমার আসনখানি।

অসীমের ব্যাকুল বার্ত্তা, সেই শুভ্র জ্যোৎস্নারাতে মনপ্রাণ বুঝি উধাও করে দিতে চায়…।

কোনমতে দেহটিকে উঠিয়ে নিয়ে ফিরলাম রাতের আশ্রয়ে। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। আমার যেখানে আশ্রয় জুটেছে সেটি প্রায় প্যারীর কেন্দ্রস্থলে। হোটেলের মালিক ছিলেন একটি বৃদ্ধা। অল্প ভাঙা-ভাঙা ইংরাজী বলতে পারেন। আমাকে দেখে যেন একটু বিস্ময়ের হাসি হাসলেন, ব'ললেন "প্যারীর ত' এই সন্ধ্যা, তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কেন?" সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে কোন জবাব এলনা দেখে তিনি এবার যেন একটু কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে আমাকে ব'ললেন—প্যারীর সাথে শুভ-দৃষ্টির সেরা লগ্ন হ'ল নিশীথ রাতে। তখনি নাকি মেলে সুন্দরী প্যারীর আসল পরিচয়। ভাঙ্গা ইংরাজীতে ব'লতে ব'লতে বৃদ্ধার ভাঙ্গা বুক থেকে যেন একটি অলক্ষ্য দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সেই ঝিরঝিরে হওয়ার মত। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বৃদ্ধার চোখের কোণে একফোঁটা জল চাঁদের আলোয় ঝলমল ক'রছে।

তারপর বৃদ্ধা কত কথাই না বলে গেল। বুঝলাম বুড়ির একদিন সবই ছিল—ছিল স্বামী, পুত্র। কিন্তু গত যুদ্ধের অকাল গ্রাসে হারিয়েছে সে সবাইকে। জীবনের সব হারিয়েও প্রাণধারণের তাগিদ—তাই আজ এই হোটেলের ব্যবসা শুরু ক'রেছে। আমার মুখখানি নাকি তার ছেলের মত। তাই আমাকে দেখে তার এত উচ্ছ্বাস। বৃদ্ধার মাতৃস্নেহ যেন আমাকে পেয়ে অঝোরে ঝরে প'ড়তে চাইল।

…মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়ালাম প্যারীর আলোছায়া ঘেরা পথে। রাত্রি নিবিড় হ'য়ে আসছে। পথের আলোর সে দীপ্তি আর নেই। মাঝে মাঝে রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে একটি দুটি ট্যাক্সী ছুটে চলে। আর শোনা যায়, তরুণ তরুণীর কলোচ্ছ্বাস, ভরা যৌবনের কলরোল।

দূরে সেই রাজপথের সঙ্গমস্থল। কত দিক থেকে কত রাজপথ এই সঙ্গমে মিলিত হয়েছে। কত তীর্থযাত্রীর পায়ের চিহ্ন আঁকা র'য়েছে প্যারিসের এই মসৃণ রাজপথে। দূরে দেখা যায় নেপোলিয়নের বিজয় তোরণ—যেন মরণের সিংহদ্বার।

মন যেন উদাস হ'য়ে গিয়েছিল। আনমনে কত পথ পেরিয়ে এসে প'ড়েছি একটি ঘিঞ্জী পল্লীতে। প্যারিসের পথ বলে মনেই হয় না। স্যাঁৎ স্যাঁতে একটি গলির একটি পুরাণো ভাঙ্গা বাড়ী থেকে হঠাৎ ভেসে এল একটা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা…কৌতূহলী মন আবার সজাগ হ'য়ে উঠলো, অজানাকে জানবার দুর্নিবার আকর্ষণে উন্মুখ হ'য়ে উঠলাম!
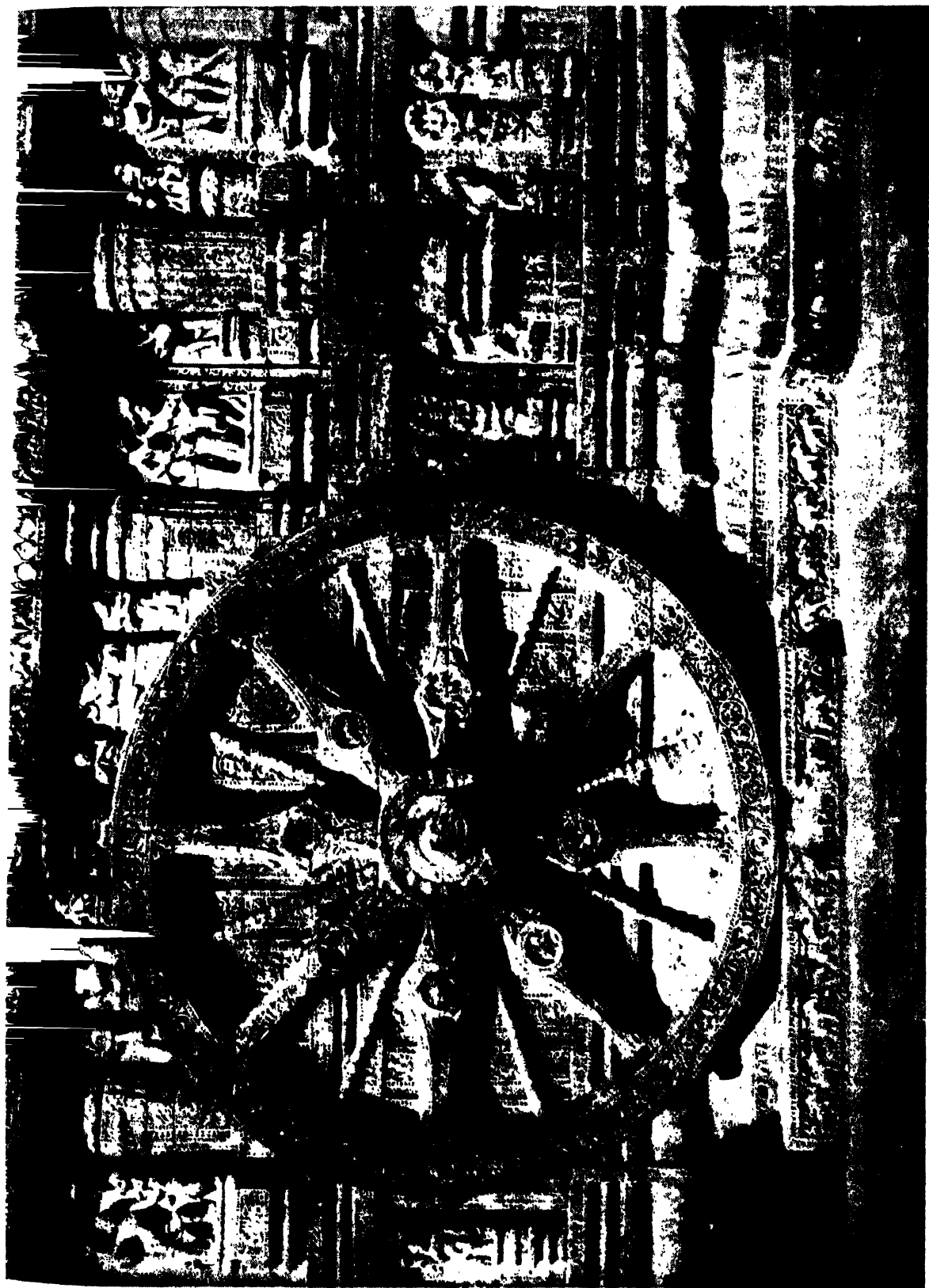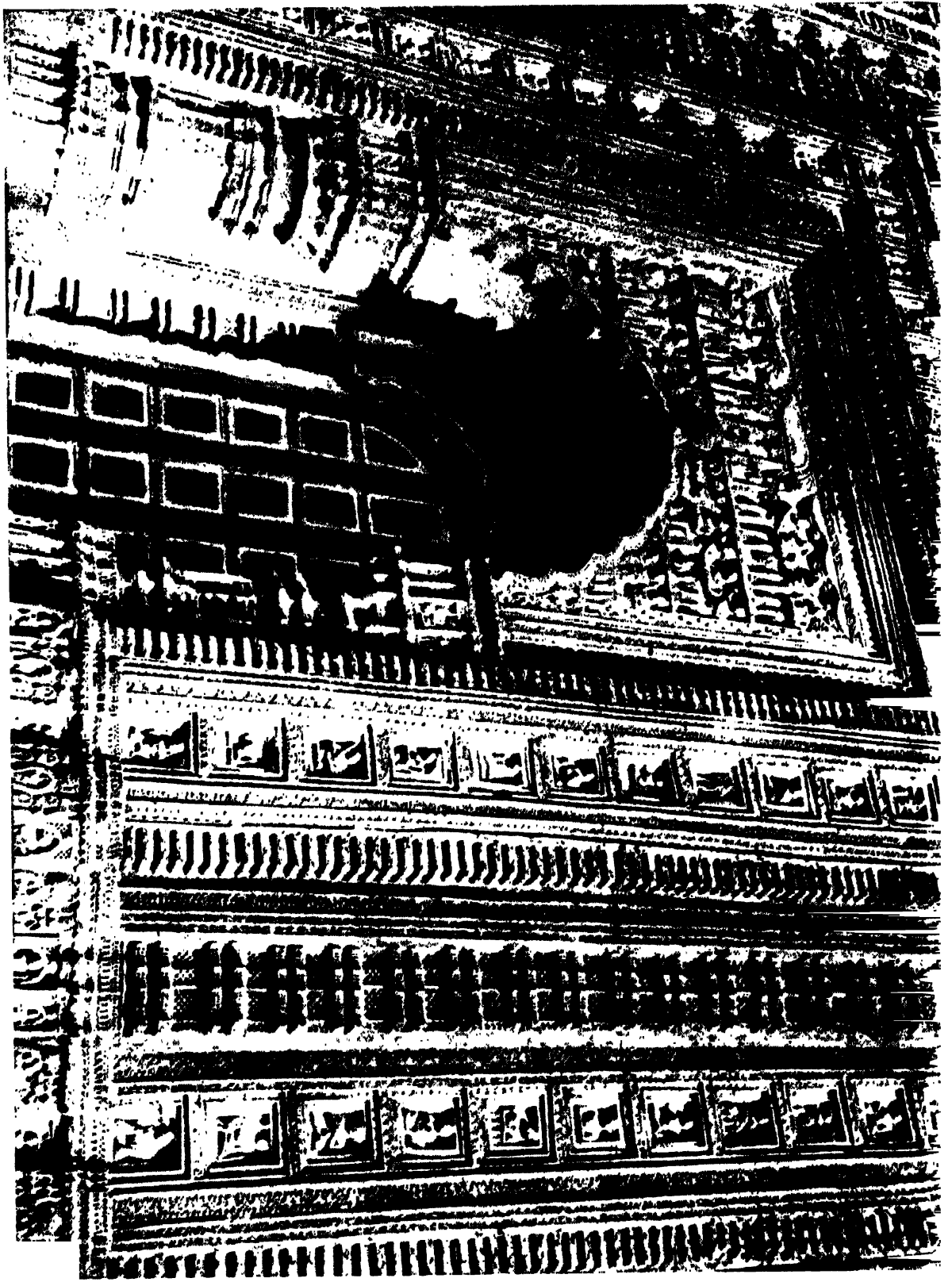
সামনে চেয়ে দেখি নীচে যাবার নির্দ্দেশ। তবে কি এইগুলিই প্যারিসের নাইট-ক্লাব! শঙ্কিত বুকে নীচে নেমে দেখলাম সে এক ভিন্ন জগৎ। চারিদিক থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন আমাকে বিদ্ধ ক'রতে চায়।···শুনলাম সেই পাতালপুরীর নিভৃতকক্ষে একদিন কত বন্দীর চোখের আলো নিভে গেছে। বদ্ধ আবহাওয়ায় হাঁফিয়ে উঠছিল মন! ঘরের একপাশে মঞ্চের মত একটি উঁচু জায়গা উদ্ভাসিত হ'য়েছে স্তিমিত আলোয়, বেজে চলেছে একটি করুণ রাগিণী, আর গান ধরেছে একটি স্থূলাঙ্গী—বর্ষিয়সী নারী। বিগত যৌবনের স্মৃতিকে ঘিরেই তার এই করুণ গীতি। আবার আলো জ্বলে উঠলো, আর জ্বলে উঠলো উগ্র কামনার শিখা। রঙিণ সুরা আর প্রেমের ফেনিল উচ্ছ্বাস। বাস্তবের সমস্ত দুঃখ সংঘাত ভুলে গিয়ে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেবার মধ্যে যে কি উন্মাদনা, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বেশীক্ষণ সহ্য হ'ল না এই পরিবেশ। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইলাম। নীচের সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, নীচ থেকে যেন শুনতে পেলাম শুমুন, শুমুনা—বাংলা কথা শুনে যেন কান জুড়িয়ে গেল। মনে হ'ল "আ মরি বাংলা ভাষা।" ফিরে দেখি অপরূপ সাজে সজ্জিত আমারই পরিচিত বন্ধু। এতক্ষণ চিনতে পারিনি। আর চিনবোই বা কি ক'রে। এই পরিবেশের মাঝে মানুষের রূপ যায় পাল্টে।

মনে সন্দেহ জাগে সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি। মানুষের জীবনে সংযমের মূল্য সম্পর্কে সন্দিহীন হ'তে হয়।

আমার পরিচিত বন্ধু মিঃ সেন বেরিয়ে এলেন আমার সাথে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ছোট কাঁটাটি বেশ খানিকটা ঝুলে প'ড়েছে। সময় এগিয়ে চলেছে মুহূর্ত্তের স্রোতে।

মিঃ সেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। আমাকে বহুদিন পরে পেয়ে ছাড়তে চান না। আমাকে ব'ললেন 'চলুন আর একটি বিখ্যাত স্থানে। 'কোথায়?'—'আগে আসুন না, সমস্ত প্যারী যেখানে ভিড় করে সেইখানে।' আমার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই আমাকে নিয়ে চল্লেন। উঠে বসলাম ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি এসে থামল এক নৃত্য-মঞ্চের সামনে। চারিদিকে গাড়ীর ভিড়। কে ব'লবে তখন প্যারিসের রাত্রি। আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। প্রাণবিনিময় ও উচ্ছ্বাসের বন্যা দেখে মনে হয় সমাজ সংসারের বাইরে এ যেন এক অপার্থিব জগৎ।

কবির কথা মনে প'ড়ল—

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।

সেই স্বপ্নলোকের মাঝখানে কখন এসে বসেছি ঠিক নেই।

রঙবেরঙের আলোকচ্ছটায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপান্তর ঘটছে হলটির। অপূর্ব্ব সুরের মূর্চ্ছনায় আবেশে চোখ বুজে আসে, কিসের যেন আমেজ লেগেছে মনে। দূরে বিরাট রঙ্গমঞ্চ, অপূর্ব্ব তার শোভাবৈচিত্র্য, বিচিত্র তার আয়োজন। মঞ্চের পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নব নব আলোকাভরণ ও রূপসজ্জা, সুনিপুণ তার সৌন্দর্য্যকুশলতা।···

···সেই মায়াময় পরিবেশ। সহসা শূন্য থেকে নেমে এল যেন কত শত পরী, অপ্সরী মনোরমা। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবলাম—

ঊষার উদয়সম অবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।
মুক্ত বেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।

সেই সুদর্শনা—অপূর্ব্ব তার তনুর তনিমা আর নৃত্যের ভঙ্গিমা। এতদিন যাকে কবির কল্পনা বলে মনে হয়েছে তাকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ ক'রব কোনোদিন ভাবিনি। মন একে একে মাটির মায়াকে অতিক্রম করে এক অতীন্দ্রিয় লোকে চলে যায়। মনে হয় এ কোন স্বপ্নরাজ্যে বুঝি এসে পড়েছি। এ কোন সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রপুরী, কত শত নিষ্পলক চোখের দীপ্ত আভা, রূপের বেদীতে অগণিত পূজারীর বিমুগ্ধ দৃষ্টির অঞ্জলি···একই লক্ষ্যে স্থির হয়ে আছে।

নৃত্যলীলার সেই অপূর্ব্ব প্রকাশ মনে পড়িয়ে দেয়—

নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সেই নৃত্যমাধুরী দেখে অভিভূত হ'য়েছিলাম। সেদিন স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির কত বড় অবদান এই নৃত্যগীতিকলা। এই সৌন্দর্য্য সুধাকে আকণ্ঠ পান ক'রে নিতে হৃদয় কত ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে, মনে হয় জীবনের পাত্র বুঝি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে এই সৌন্দর্য্য-মদিরা ধারায়।

কিন্তু মন যেন আর চায় না সেই মদিরা পান করতে। এক প্রচ্ছন্ন অবসাদ জেগে ওঠে অন্তরের অন্তস্তল হ'তে, সুন্দরের মধ্যে আছে কোথায় যেন একটা অপরি-সমাপ্তির ইঙ্গিত! বুঝলাম আবরণ ও আভরণের কি মহিমা। যা বেশী মধুর তারই মধ্যে আছে তিক্ততা। সভ্যতাও তাই আভরণের প্রয়োজন স্বীকার করেছে। পাতার আড়ালে ফুলের সুষমা যে বেশী মনোলোভা একথা কে অস্বীকার করবে?

কখন রাত্রি শেষ হয়ে গেছে কে জানে? যখন সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম তখন ঘুমিয়ে পড়েছে সারা জগৎ। প্রগাঢ় স্তব্ধতার বুকে আত্মসমর্পণ করেছে প্যারিস নগরী।

রাতের প্যারিসের বুকে কত কি যে ঘটে যায়, তা দিনের নগরী দেখে বুঝবে কে।

রহস্যময়ী প্যারিসের রাত্রি।······

কামরূপ-কামাখ্যার মেয়ে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ যে আখ্যায়িকার অবতারণা করবো, সেটা নিছক্ জল্পনার আল্পনায় জড়ানো রূপকথা নয়, ইতিহাসের কাহিনীও বটে। কামরূপ-কামাখ্যার মেয়েকে নিয়ে অনেক কল্পনাই উধাও হয়েছে, তারা লাস্যময়ী, তারা হাস্যময়ী, তারা সুন্দরী, তারা রূপসী, তারা শুধু তনুমন হরণ করে না, তারা 'পলক্ পলক্ লহু চোষে'। এই মোহিনীরা নাকি ভোজবাজির ম্যাজিক জানে, তুক্‌তাক্ করে মন্ত্রতন্ত্রের বেড়াজালে পুরুষদের ভেড়া বানায়, রাতে রাতে গাছ চালিয়ে শত যোজন দূরে চলে যায়, আবার তারাই ক্ষেত্রপাল অসিতাঙ্গ ভৈরবদের সঙ্গে বেড়ায়, পঞ্চ মকারের উত্তর সাধিকা তারা, ডামরী ঝামরী ডাকিনী যোগিনীদের সঙ্গিনী। উষা, রুক্মিণী, ভানুমতী, বেহুলাকে কামরূপ-কন্যা বলেই অনেকে গণ্য করেন। উলুপী, হিড়িম্বা, চিত্রাঙ্গদা, ঠিক কামরূপের না হলেও পাশের দেশের লোক। আসলে কামরূপ আর্য্য সংস্কৃতির পূর্বদিকে বিস্তৃতির কেন্দ্র হলেও মাতৃতন্ত্র প্রধান (matrilenial) আদিবাসীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় নি। তার উপর পরবর্তী কালে তান্ত্রিক আচার বিচার উচাটন বশীকরণের নানা খ্যাতি-কুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজতরঙ্গিনীতে পড়ি, কাশ্মীরের যুবরাজ মেঘবাহন কামরূপের রাজার মেয়ে অমৃতপ্রভার স্বয়ম্বরে চলেছেন। মেঘবাহন শুধু কন্যাকেই গ্রহণ করেন নি, তার সঙ্গে ভগদত্ত বংশীয় রাজছত্রটিও নিয়ে যান। দণ্ডীর দশকুমারচরিতে কল্পসুন্দরী নামে আর এক কামরূপ-কন্যার কথা পাওয়া যায়। নেপালের লিচ্ছবী বংশীয় এক রাজাও 'ভগদত্ত-রাজকুলজা' রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। কাশ্মীরের কিম্বদন্তী অনুসারে মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ-সংলগ্ন স্ত্রীরাজ্য অধিকার করতে যান। কিন্তু বুরঞ্জী মতে সেখানকার ঐ প্রমীলা রাজ্যের স্ত্রীলোকদের যৌবন "কাশ্মীর সৈন্যের চিত্ত চঞ্চল করেছিল" বলে আর বেশীদূর এগুতে তিনি সাহস করেন নি। কামরূপীয় মেয়েদের ছলা-কলা যে সারা ভারতবর্ষে প্রবাদের মত ছড়িয়ে পড়েছিল তার আর একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই যে মীরজুমলা বিধ্বস্ত হবার পর আওরঙ্গজেব যখন জয়সিংহ-পুত্র রামসিংহকে কামরূপ বিজয়ে পাঠান, তখন রামসিংহ শিখগুরু তেগ্‌বাহাদুর ও আরো পাঁচ জন সাধুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন—যাতে তাঁরা সৈন্যদের উপরে কামরূপ-কুমারীদের কামকলার প্রভাব ব্যাহত করতে পারেন।

রাধা, রুক্মিণী, কুরঙ্গনয়নী, জয়মতী, কমলকুমারী, ফুলেশ্বরী, মদম্বিকা, সর্বেশ্বরী, রমণীগাভরু, মূলাগাভরু, কণকলতা প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নাম। সতী জয়মতীর কথা কামরূপে ও উত্তর বাংলার ঘরে ঘরে আজও গীত হয়। এঁর স্বামী রাজ্যচ্যুত হয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন, বলে যান—একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় পেলেই খবর দেবো। রাণী দিন গোণেন। বিপক্ষের দল মারমুখী হয়, তাঁকে উত্যক্ত করে, রাজার গন্তব্যস্থলের হদিশ্ বলে দিতে। ক্রমশঃ সেটা অত্যাচার ও নির্যাতনে দাঁড়ায়। রাজকুলবধূ কিন্তু নিশ্চল, মূক, অটল। সতী বললেন না পতির কোন কথা—নিঃশব্দে প্রাণ দিলেন তিনি। মহারাজ রুদ্রসিংহ উত্তরবঙ্গে রংপুরে এই সতীর স্মৃতির সম্মানে বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করিয়ে দেন, নাম যার জয়সাগর এবং তারই পারে জয়দেউল নামে দেবতার মন্দির।

আর এক মহিয়সী মহিলার নাম শোনা যায় চারণদের কাহিনীতে। কিম্বদন্তী যে, সেবার দেশজুড়ে লেগেছে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ—সব গেছে শুকিয়ে, হেজে মজে পুড়ে। রাজা ম্রিয়মান, সভাসদরা স্তব্ধ, যাগযজ্ঞ হোমপূজা সবই বিফল, পর্জন্যদেব তুষ্ট হন না—অগ্নিদগ্ধ দিন এগিয়ে চলে। রাণী কমলা ছিলেন ভক্তিমতী—তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে—রাজাকে ডেকে বলেন—এ হচ্ছে দেবতার অভিশাপ, একমনে তাঁর করুণা ভিক্ষা করো, সবচেয়ে তোমার যা প্রিয় তাই উৎসর্গ করো—সুজলা সুফলা হোক্ দেশ। সেই রাত্রেই রাজা স্বপ্ন দেখলেন—বরুণ দেবতা বলছেন—বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাও এবং সেইখানে আহুতি দাও তোমার ঐ প্রিয়তমা মহিষীকে—তাহলেই জলে ভর্ত্তি হবে ঐ পুষ্করিণী, দুঃখদুর্দ্দিনের হাত থেকে পেয়ে পরে বাঁচবে তোমার প্রজারা, অন্ন হবে বহু।

স্বপ্ন ভেঙে রাজা চমকে উঠলেন—সেকী—এও কি সম্ভব—না, না, তা হতে পারে না—তাঁর অতি আদরের প্রিয়তমাকে কোন মুখে তিনি বলি দেবেন। কিছু বলেন না তিনি। মহারাজ গম্ভীর, বিষণ্ণ, চিন্তাকুল, সভাসদরা মুহ্যমান, বাইরে প্রজাদের আর্ত্তনাদ, কোলাহল—জলের ব্যবস্থা করো মহারাজ, তৃষ্ণার জল চাই এক গণ্ডুষ। রাণী কাতর হয়ে পড়েন—রাজা আর থাকতে পারেন না—বলে ফেলেন স্বপ্নের কথা। রাণী কমলা হেসে বলেন—এতো বড় সৌভাগ্য হবে আমার। রাজা আকুল হয়ে বলেন—এ স্বপ্ন মিথ্যা, না, না, হতে পারে না। রাণী বলেন—মহারাজ, ভুল বুঝো না, এ হল দেবতার ডাক্—এই তুচ্ছ দেহের বিনিময়ে যদি হাজার হাজার প্রজার প্রাণরক্ষা হয়, তবে কেন অমত করো প্রভু। দলে দলে শোকার্ত্ত প্রজারা নিজেরাই দীর্ঘিকা খোঁড়ে—দৈবজ্ঞরা শুভক্ষণ গণনা করে দেয়—রাণী আস্তে আস্তে নামেন তার গহ্বরে—যেন মেদিনী গ্রাস করছেন কর্ণের রথচক্রকে—জনকনন্দিনী নতুন করে পাতাল প্রবেশ করছেন। তারপর হঠাৎ উঠলো জলের কলরোল—যেখানে এতদিন মাটি কেটেও একফোঁটা জল বেরোয়নি সেখানে কলস্বনা ভোগবতী, পাতালগঙ্গার বন্ধন ছেড়ে কোলে নিলেন কন্যাকে। মিলিয়ে

গেলো অনন্তের রসসীমানার রহস্যসাগরে কমলকুমারী। কিন্তু মানুষের অজর মন থেকে আজও মিলিয়ে যায়নি তাঁর নাম।

আর এক কামরূপ-দুহিতার কথা বলেই এই আখ্যায়িকা শেষ করবো। এঁর নাম রাণী ফুলেশ্বরী, বড় কুমারী বা প্রমথেশ্বরী দেবী। এঁকে অনেকে বলেন যে ইনি আসামের নুর-জাহান। অসমীয়া সমাজে রাজা রুদ্রসিংহ শুধু একজন পরাক্রান্ত আহোম নৃপতিই ছিলেন না, তিনি সঙ্গীত, সাহিত্য, কলার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আসামে 'পাখোয়াজ' বাদ্যযন্ত্র তিনিই প্রচলন করেন। উত্তরবঙ্গে রংপুর পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। করতোয়ার পারেও সাম্রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা তিনি করেছিলেন কারণ তাঁর মনে বোধহয় প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সীমানার কথা জাগতো—"নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রি ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম, করতোয়া সমাশ্রিত্য যাবদিক্কর বারিনী"। সেই সময় বাংলায় নবাব মুর্শীদকুলী খাঁর আমল। তিনি আসাম ও বাংলার বহু সামন্ত ও স্বাধীন নরপতির কাছে দূত পাঠান—মুঘল সার্বভৌমতার বিরুদ্ধে অভিযানের আশায়। এইরূপ একটি দৌত্যের ফলেই আমরা "ত্রিপুরা দেশের কথার লেখা" নামে একটি অসমীয়া বুরঞ্জী পাই—যার সাহিত্যিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিশেষ মূল্য আছে। এই সময়েই রুদ্রসিংহের মনে জাগে যে শক্তি সঞ্চয় করতে গেলে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াই সমীচীন। মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব গোঁসাইদের কাছে তিনি মাথা নত করতে রাজী হন না। নদীয়ায় লোক ছুটলো—নবদ্বীপই তখন পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র—রাজার গুরুপদে বৃত হবার অধিকার-যোগ্য এমন কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় কিনা। মাতৃসাধক তন্ত্রসেবী কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ রাজী হলেন কামরূপে আসতে। কিন্তু রাজা তাঁর ছোটখাট চেহারা দেখে ভাবলেন এর দ্বারা বুঝি শক্তিপূজা হবে না। ফিরে এলেন ন্যায়বাগীশ ক্ষুব্ধ হয়ে—ধরণীও নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে দুলতে থাকে,—ভূমিকম্পেই ভূমাতা কি জানালেন তাঁর বিরূপতা। রাজা ভাবলেন ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে দেওয়াতেই বোধহয় তাঁর অপরাধ হয়েছে। পুত্র শিবসিংহকে ডেকে বললেন—দেখো, আমার দিন ঘনিয়ে আসছে, ন্যায়বাগীশের হাতে পায়ে ধরেও তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো—শক্তিসাধনা না করলে শক্তিবৃদ্ধি হবে না!

আবার চললো আসামের দূত বাংলার শ্যামল পল্লী-কুটীরে—অপরাধ ক্ষমা করুন দেবতা, চলুন ফিরে।

এর মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেছে—যার দূত হয়েছিলেন স্বয়ং পুষ্পধনু বসন্তসখা মীনকেতন। তরুণ শিবসিংহ ফুলশরে জর্জ্জরিত হয়েছিলেন। এই নাটকের যিনি নায়িকা কুমারীকালে তাঁর নাম ছিল ফুল বা ফুলবতী। বাপ সর্বানন্দ ছিল একজন কুললুপ্ত (কলিতা) নাট—গানবাজনা করে নেচেগেয়েই সংসার নির্বাহ করতো—তারই ঘরে জন্ম নিয়েছিলো এই রূপসী কন্যা। একদিন রাজার এক অমাত্য রূপচন্দ্র বরবরুয়া চলেছেন মাঠের মাঝ দিয়ে পাল্কী করে—এমন সময় তাঁর নজরে পড়লো দুটি রূপলাবণ্যময়ী বালিকা খেলা করছে। ফুলই এগিয়ে এসে পরিচয় দিলে—হুজুর, আমরা দুইবোন, বড়ই গরীব। পিতৃমাতৃহীন ভায়ের সংসারে থাকি, গরু ছাগল চরিয়ে পেট চালাই। মন্ত্রী ভাবলেন—সুযোগ মন্দ নয়, রাণীর পরিচারিকা দরকার—তারপরে মেয়েটি শুধু সুশ্রী সুলক্ষণা নয় রূপসীও বটে—কর্তাদের নজরে পড়লে যৌবনকালে ভিন্ন হয়ে যাবে। ফুলবতীর স্থান হলো রাজপ্রাসাদে। কৈশোর পেরিয়ে বয়ঃসন্ধিকালে সে ফুটে উঠলো অম্লান ফুলেরই মত—যেন ইন্দ্রসভার তন্দ্রাজড়িত আসরে একটি সদ্যস্ফুট পারিজাত। যৌবনের লীলাচপল দিনে রাজা শিবসিংহের দৃষ্টি পড়লো কন্যার উপর—দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মহিষী হিসাবে ফুলবতী আশ্রয় পেলে শিবসিংহের অঙ্কে। কেউ কেউ বলেন, রাজার ধাত্রীমাতার ঘরেই এই পিতৃমাতৃহীনা কন্যা প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং এর রূপযৌবনের আভাস দেখেই পাছে অনর্থ ঘটে এই ভেবে ধাইমা এঁকে রাজপ্রাসাদ থেকে সরিয়ে নেন—কিন্তু শিবসিংহ তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। যাইহোক্ প্রধানা পাটমহিষী ছিলেন রাণী রত্নকান্তি। দ্বিতীয়ার এই অভ্যুদয় প্রথমাকে যে বিশেষ বিচলিত করবে সেটা অস্বাভাবিক নয়, তাই মনে হয় মহারাণীর আদেশেই ধাত্রীমাতা তাকে নির্বাসিত করেছিলেন। সে যাইহোক্ রাজা শিব সিংহ একথা জানতে পেরেই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন রাজপ্রাসাদে এবং স্বভাবতই ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতাপ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। রাজা তাঁকে পাটরাণীত্বে অভিষিক্ত করলেন এবং তাঁর বিচারশক্তি, মেধা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে ক্রমশই রাজকার্য্যে তাঁর সহায়তা গ্রহণ করতে লাগলেন। এই সময়েই ঘটলো আর একটি ব্যাপার। রাজার জ্যোতিষীরা গণনা করে দেখলেন যে গ্রহসংস্থানের ফলে রাজা শিবসিংহের দুঃসময় আসছে—রাজছত্র হরণের যোগ অর্থাৎ রাজ্যচ্যুতি। কি রকম করে এই গ্রহরোষ তুষ্টি হয়। শেষকালে স্থির হলো রাজা স্বেচ্ছায় রাণীকে এই রাজছত্র দিয়ে দিন। এই নির্দেশ অনুসারে রাণী ফুলবতী রাজার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি হিসাবে রাজকার্য্য পরিচালনের পূর্ণভার পেলেন। তাঁর নাম হোল বড়কুমারী বা মহারাণী ফুলেশ্বরী, প্রমথেশ্বরীও উপাধি নিলেন তিনি। রাণী রাজ্য চালাতে লাগলেন, রাজা তন্ত্র-সাধনে, পূজায় হোমে ব্যস্ত রইলেন। এমন কি নুরজাহানের মত মুদ্রাতেও তাঁর নামাঙ্কিত হতে লাগলো। একটি মুদ্রার লিপি এই রকম—শ্রীশ্রীশিব-সিংহ নৃপ মহিষী—শ্রীপ্রমথেশ্বরী দেব্যা শ্রীশ্রীহরগৌরী পাদপরায়ণা, শকে ১৬৫৩—ফার্সীতে লেখা মুদ্রাও পাওয়া যায়—আহোম বেগম প্রমথেশ্বরী।

সভাকবি কবিরাজ চক্রবর্তী তাঁর "শঙ্খচূড়বধ কাব্য" ও "শকুন্তলায়" এবং কবি অনন্ত আচার্য্য তাঁর "আনন্দ লহরীতে" রাজা ও রাণীর যে প্রশস্তি গেয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অত্যুক্তিতে ও অতি বন্দনে ভরা হলেও দেখা যায় যে এই প্রিয়দর্শিনী মহিলা সাহিত্য ও কলার সহায়িকা ছিলেন এবং তন্ত্রসাধনে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। এই সময়ে অঙ্কিত কয়েকটি সুন্দর চিত্রও পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবের একটি ছবি সমধিক প্রসিদ্ধ। অবশ্য রাজদম্পতীর শাক্তমত অবলম্বন ও ন্যায়বাগীশের শিষ্যত্ব স্বীকার তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব মহলে অপ্রিয় করে তুলেছিল ও পরবর্তীকালে বিদ্রোহের বীজ (মোয়ামোরিয়া বিদ্রোহ) বপন করেছিল।

কিন্তু ভগবান এই শক্তিমতী রূপবতী মহিলাকে বেশীদিন এই পৃথিবীতে রাখেন নি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর শিবসিংহ মদম্বিকা এবং মদম্বিকার মৃত্যুর পর সর্বেশ্বরীকে বিবাহ করেন। এঁদের উল্লেখ করছি এইজন্য যে এঁরাও রাজকার্য্য পরিচালনা করতেন। কামরূপ দুহিতারা শুধু লীলাকলায় ছলাতেই মন ভোলাতেন না, সহধর্মিণী ও সহকর্মিণীও ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের নিকট প্রেরিত চিঠিপত্রের মধ্যে চার্লস রোজ নামে একজন ইংরাজের একটি অভিমত পাওয়া যায়—"The Assomese were a most war like nation and had for a length of time successfully resisted all foreign Invaders. Even Aurangzeb had failed. They never prospered more than when governed by females, as was the case in the earlier part of the eighteenth century."

জুলি রোম্যাঁ

অনুবাদক—গঙ্গাধর ঘোষাল

বছর দুই আগে একদিন বসন্তকালে ভূমধ্যসাগর সৈকতে বেড়াচ্ছিলাম। নির্জ্জন রাস্তায় একাকী বেড়াতে বেড়াতে স্বপ্ন দেখার আনন্দ যে কি তীব্র মধুর,তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পাহাড়ে ওঠার কিম্বা সমুদ্র তীরে বেড়ানর সময়ে সূর্য্যকিরণ এবং বারে বারে চুম্বন করে যাওয়া বাতাস সকলকে আনন্দ মুগ্ধ করে তোলে। মৃদুমন্দ পদক্ষেপে অলস গতিতে যখন কেউ চলেছে এগিয়ে—কত দিবাস্বপ্ন, প্রেমগাঁথা আর দুরাভিষান তার মনের মধ্যে খেলা করে যায় তার ইয়ত্তা নেই। উষ্ণ হাল্কা বাতাস যখন যে প্রাণ-ভরে গ্রহণ করে, সাথে সাথে তার মনের মধ্যে প্রবেশ করে প্রত্যেকটি সম্ভাব্য আশা, তার জটীলতা আর আনন্দের দ্বন্দ্ব নিয়ে। ঐ আশা সাথে করে নিয়ে আসে সুখের আকাঙ্ক্ষা, বেড়াবার সময় ক্ষুধার মত যা কেবল বৃদ্ধি পেতে চায়। প্রকৃতির যত নিকটবর্ত্তী সে হয়, মধুর ভ্রাম্যমাণ চিন্তাও তার আত্মাকে তত মুখর করে তোলে।

সেণ্ট রাফেল থেকে যে রাস্তাটি ইতালী পর্য্যন্ত চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। কিম্বা বলতে পারা যায় পৃথিবীর সমস্ত প্রেমের কাব্যে যে সমস্ত সদা-পরিবর্ত্তন-শীল প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী স্থান পাবার অধিকার দাবী করতে পারে তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছিলাম। ভেবে মনে মনে দুঃখ হচ্ছিল যে এ রাস্তায় কেবল তাদেরই আসতে দেখা যায়, যারা কেবল তাদের কষ্ট বাড়াতে চায়, অর্থ নিয়ে ভেল্কী দেখাতে চায়, যারা কমলা আর গোলাপের এই বাগিচায় হীনগর্ব্ব, মূর্খ অভিনয়, নীচ কুটিলতা প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক, কিম্বা মানুষের মনের সত্যকার রূপ—দাসত্ব, অজ্ঞানতা, ক্রোধ এবং চাঞ্চল্য দেখাতে যারা আগ্রহশীল—একমাত্র তারাই এ পথে পা বাড়ায়।

হটাৎ চোখে পড়লো সমুদ্রের এক বাঁকে সমুদ্রের দিকে মুখ করে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে বাংলো ধরণের কয়েকটা ছোট ছোট বাড়ী। পিছনে তাদের পাইনের জঙ্গল, দুটো উপত্যকাকে প্রহরীর মত আগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনা থেকেই দাঁড়িয়ে গেলাম একটা ছোট বাড়ীর সামনে। শাদা রংএর সুন্দর বাড়ী, ধূসর বর্ণে সজ্জিত গোলাপ কুঞ্জে আবৃত। গোলাপ লতাগুল্ম ছাদ পর্য্যন্ত উঠে গেছে ওপরে। সুচিন্তিত পরিকল্পনায় সাজান নানা বর্ণের নানা আয়তনের ফুলগুলি বাগানকে পূর্ণ করে রেখেছে। লনটার মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফুল গাছ, বারাণ্ডায় ওঠবার সিঁড়ির পাশে একটা মাটীর টব থেকে উঠেছে লতানে আঙ্গুর গাছ, জানলার ওপর ঝুলছে থোকো থোকো বেগুনি রংএর আঙ্গুর, সারা বাড়ী ঘিরে ছোট ছোট থাম দিয়ে তৈরী বারাণ্ডার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মর্নিং গ্লোরী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবিন্দুর ন্যায় প্রস্ফুটিত। বাড়ীর পিছনে সপুষ্প কমলা গাছের সারী চলে গেছে বহুদুর সেই পাহাড়ের তলদেশ পর্য্যন্ত।

বাড়ীর দরজায় ছোট্ট করে সোনার জলে লেখা ছিল 'ভিলা দাণ্ডা'। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলুম, কোন কবি বা সুন্দরী এমন গৃহে বাস করে? কোন নির্জ্জনতা-লোভী উৎসাহী মানুষ একে আবিষ্কার করেছে, এই স্বপ্ন মায়া সৃষ্টি করেছে, দেখলে যাকে মনে হয় বুঝি ফুল থেকে এর জন্ম।

রাস্তার ওপর অল্প কিছু দূরে একজন শ্রমিক পাথর ভাঙ্গছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলুম—বাড়ীর মালিক? উত্তর পেলুম, বাড়ীটী হচ্ছে স্বনামধন্যা শ্রীমতি 'জুলি রোমঁ্যা।'

জুলি রোমঁ্যা। শৈশবে তাঁর নাম প্রায়ই শুনতাম।

বিখ্যাত অভিনেত্রী রাচেল ছিলেন তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। রোম-নারী তাঁর থেকে বেশী প্রশংসা অর্জ্জন করতে পারে নি, মানুষের কাছে বেশী প্রিয় হয়ে ওঠে নি। সকলের থেকে অধিক ভালবাসা পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর জন্য কত যে ডুয়েল, কত আত্মহত্যা, কত দুর্গমস্থানে দুঃসাহসিক অভিযান হয়েছিল তার সংখ্যা নির্ণয় করা শক্ত। ঐ মায়াবিনীর বয়স কত হবে এখন? ষাট—না, সত্তর —পঁচাত্তরও হতে পারে। জুলি রোম্যা! এখানে এই বাড়ীতে! মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা। তখন আমার বয়স বছর বার হবে। সারা দেশ জুড়ে সে কি আলোড়ন —যেদিন তিনি এক প্রেমিকের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করেন। আর প্রেমিক, তিনি ছিলেন কবি, তাঁর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন সিসিলিতে।

যেদিন তিনি পালিয়ে যান সেদিন কোন নাটকের ছিল প্রথম-অভিনয়-দিবস। দর্শকেরা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তাকে অভিনন্দন জানায়, আর দর্শকদের অনুরোধে এগার বার তাঁকে মঞ্চে দেখা দিতে হয়েছিল। যখন বার দিনের ধারা অনুসারে ফিটন গাড়ীতে করে কবির সঙ্গে পালিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ঘোড়া বদল করতে হয়েছিল। তারপর প্রেমের জন্য পার হলেন সমুদ্র, গিয়ে পৌছালেন কমলা কুঞ্জে ভরা গ্রীসকন্যা আদিম দ্বীপ সিসিলিতে।

তাঁদের এট্‌না পাহাড়ে আরোহণ করা নিয়ে সাধারণের মধ্যে খুব জল্পনা কল্পনা চলতে লাগলো। তারা কল্পনা করতে লাগলো—অসংখ্য আগ্নেয় গহ্বরের মধ্যে, হাতে হাত দিয়ে গালে গাল রেখে তাঁরা কেমন করে পাহাড়ে উঠছেন! প্রেমের তীব্র উত্তাপে তাঁরাও বুঝি মিশে যেতে চান গহ্বরাভ্যন্তরের প্রজ্জ্বলিত বহ্নির সাথে।

এই প্রেমিক ভদ্রলোকটি, বহু প্রাণ-মাতান ছন্দের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এমন সব কবিতা, যার জৌলুষ এক পুরুষ ধরে সারা দেশকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। তিনি আর এখন বেঁচে নেই। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে এক রহস্যময় শান্ত গভীরতার সন্ধান পাওয়া যেত, অন্যান্য কবিদের এক নূতন জগৎ খুলে ধরেছিল তারা।

তাঁর অন্য প্রেমাস্পদটী—যিনি ঐ বিশেষ নারীর জন্য সৃষ্টি করেছিলেন বহু সুরের ঝঙ্কার, যা সমস্ত মানুষের মর্ম্মে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তিনিও আর এ জগতে নেই। তার সঙ্গীত ছিল একাধারে জয় এবং পরাজয়ের অভিব্যক্তি, উত্তেজক এবং তৃপ্তিদায়ক নানা মূর্চ্ছনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

তিনি বাস করছেন এখানে, এই বাড়ীতে, পুষ্পাবরণে আত্মগোপন করে?

আমি আর ইতস্ততঃ করলাম না। ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলাম। বছর আঠারর এক চাকর, কিম্ভুত প্রকৃতির আর লাজুক স্বভাবের, এসে দরজাটা খুলে দিল। হাত দুটী সাধারণ চাকরের মত। আমার কার্ডের পেছনে বৃদ্ধা অভিনেত্রীকে উদ্দেশ করে কয়েক ছত্র মধুর অভিনন্দন লিখে দিলাম। আর সঙ্গে জোরাল প্রার্থনা জানালুম, যাতে তাঁর দর্শন লাভ ঘটে। হয়ত আমার নাম তিনি শুনেছেন, দেখা করার অনুমতিও হয়ত পেতে পারি।

ছোকরা চাকরটী অন্তর্ধান করলো। অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে তাকে অনুসরণ করতে অনুরোধ করলো। আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। ঘরটী লুই ফিলিপের ষ্টাইলে সাজান। আসবাবগুলো সমস্ত সেকেলে এবং বড় বেশী জমকাল। আসবাবের ঢাকানাগুলি একটী যুবতী দাসী এসে খানিকটা সরিয়ে দিয়ে গেল। হয়ত আমাকে সম্মান দেখানর জন্য। দাসীর বয়স বছর ষোল হবে, কৃশা তন্বী কিন্তু বিশেষ সুন্দরী নয়।

ভৃত্যটী আমাকে সেখানে বসিয়ে রেখে চলে গেল। আগ্রহ নিয়ে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলুম। দেওয়ালে তিনটী প্রতিকৃতি। একটী হচ্ছে অভিনেত্রীর এক বিখ্যাত চরিত্র রূপায়ণের বিশেষ ভঙ্গিমা। আর একটী হচ্ছে তাঁর প্রেমিক কবির ফটো, পরণে তখনকার দিনের এক শার্ট এবং ফ্রক কোট, কোমরটা শক্ত করে আঁটা। তৃতীয় ছবিটী সঙ্গীত-বেত্তার—একটী বাদ্যযন্ত্রের সামনে উপবিষ্ট। ছবিতে মহিলাটীকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল, কিন্তু ভঙ্গিমাটী সেকেলে। তাঁর মনোমুগ্ধকর মুখকান্তি এবং নীল আঁখি দুটী যেন সুমধুরভাবে হাসছে। ছবিগুলির অঙ্কনভঙ্গী অতুলনীয়। মুখ তিনটী তাকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের দিকে, আর তাঁদের চারপাশে ঘিরে আছে অতীত দিনের আবহাওয়া এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। এখন আর যা দেখা যায় না।

একটি কপাট খুলে গেল এবং ছোট্ট একটি স্ত্রীলোক

প্রবেশ করলেন ঘরে। স্ত্রীলোকটি দেখলুম অত্যন্ত বুড়ী হয়ে গেছেন এবং দেখতেও খুব ছোট হয়ে গেছেন। মাথার চুলগুলি তাঁরা সব পাকা, সাদা ধবধব করছে। তাঁকে দেখে কেন জানিনা একটি শাদা ইঁদুরের কথা মনে উদয় হল, ইঁদুরটা যেন দ্রুত আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে। তাঁর হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং প্রাণময় সুস্পষ্টস্বরে বললেন, "ধন্যবাদ আপনাকে। দয়া না থাকলে আজকের দিনের কোন মানুষ বোধহয় অতীত দিনের নারীকে মনে রাখে না। বসুন !"

তাঁকে বললুম, তাঁর বাড়ীটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল। প্রশ্ন করে যখন জানতে পারলুম বাড়ীর অধিকারিণীর নাম,তখন সাক্ষাৎ করবার লোভ আর সামলাতে পারলুম না।

বললেন, 'আপনার এই আগমন অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে আমাকে। এইরকম ঘটনা আজ এই প্রথম ঘটলো। মধুর অভিনন্দন বহন করে কার্ডখানি যখন আমার হাতে এল—মনে হল কুড়ি বছর পরে কোন এক পুরাতন বন্ধুর আগমন বার্ত্তা বুঝি কেউ ঘোষণা করলো। আমাকে ভুলে গেছে মানুষে, সত্যই ভুলে গেছে, কেউ আজ আমাকে মনে করে না, মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত কারও মনে আর আমার নাম দেখা দেবে না। মরে গেলে দিন তিনেক ধরে আমার জীবনী বার হবে কাগজে—একদিকে থাকবে আমার জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় মুহূর্ত্ত, অন্যদিকে থাকবে কুৎসা, অতীত জীবনের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হয়ত বলা হবে—হয়ত জাঁকাল প্রশংসাও বার হবে অনেক। ব্যস্, সবশেষ—সেখানেই আমার ইতি।'

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে আবার সুরু করলেন, 'সেদিনের আর খুব বেশী দেরী নেই। কয়েক মাসের মধ্যে, হয়ত কয়েকদিনের মধ্যে এই বুড়ি একটা শবদেহে পরিণত হবে মাত্র।'

চোখ তুলে তাকালেন ওপরের দিকে। চোখে পড়লো তাঁর নিজের ফটোগ্রাফ। মনে হল তাঁর নিজের এই হাস্যকর পরিবর্ত্তনে সে যেন বেশ আমোদ উপভোগ করছে। তারপর অন্য দুটি ছবির দিকে তাকালেন। কবি যিনি জগতের সব কিছুর ওপর ছিলেন বিরক্ত, আর সেই অনুপ্রাণিত সঙ্গীতজ্ঞ, দুজনেই যেন প্রশ্ন করছেন ঐ মৃতপ্রায় বুড়ী কি বলছে আমাদের ?

নিমজ্জমান মানুষের মত মৃতপ্রায় কোন ব্যক্তি তার অতীত জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চাইলে যে বিষণ্ণতা তাকে অধিকার করে বসে, আমার সারামন সেইরকম বিষণ্ণতায় ভরে গেল।

যে জায়গায় আমি বসেছিলাম সে জায়গা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল নীস থেকে মন্টি-কারলো যাবার রাস্তা। দেখছিলুম সুন্দর সুন্দর দ্রুতগামী গাড়ী সব ছুটে চলেছে। গাড়ীতে বসে আছে ধনী নারী, সুখী যুবতীর দল, তাদের পাশে হাস্যমুখর পরিতৃপ্ত পুরুষের দল। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তিনি সেদিকে তাকালেন এবং আমার মনের ভাব কিছুটা আন্দাজ করতে পেরে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, দুটি জিনিষ একই সঙ্গে পাওয়া যায় না। পাওয়া সম্ভব নয়।'

বললুম, 'আপনার জীবন কত সুখের না ছিল ?'

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'হ্যাঁ, সুন্দর আর মধুর। সেই কারণেই জীবনকে আজ গভীরভাবে অপছন্দ করি।'

দেখলুম নিজের কথাতেই তিনি আত্মহারা। ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম সাবধানতার সঙ্গে কথা বলছেন, যেন গভীর কোন ক্ষতের ওপর হাত বুলাচ্ছেন। তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলাম তিনিও বলে চললেন, তাঁর সাফল্যের কথা, মন উত্তাল করা আনন্দের কথা, বন্ধুদের কথা এবং তাঁর জয় গৌরবে সমুজ্জ্বল জীবন কথা।

প্রশ্ন করলুম, 'আচ্ছা আপনার সবচেয়ে আনন্দ এবং গভীর সুখ কিসের থেকে পেয়েছিলেন ? থিয়েটার থেকে ?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ওহ ! না !

হাসলুম। পুরুষ দুজনের ছবির দিকে বিষাদময় দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেন, জীবনে বৃহত্তম সুখ আমি ওঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

প্রশ্ন না করে থাকতে পারলুম না, ওদের মধ্যে কার কাছ থেকে তিনি তা পেয়েছিলেন।

ওদের দুজনের কাছ থেকেই। কখন কখনও নিজের মনে ওদের গুলিয়ে ফেলি। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে তাদের জন্যে মনস্তাপ হয়।

তাহলে তাদের থেকে নয়, আপনার গভীর সুখ

এসেছিল প্রেমের থেকেই, তারা ছিলেন কেবল প্রেমের যন্ত্রস্বরূপ।

তা হয়ত সত্যি। কিন্তু ওহ! কি আশ্চর্য্য যন্ত্র।

আপনি কি স্থির নিশ্চিত যে সাধারণ মানুষের ভালবাসা আপনি পাননি?—ঐ দুজন মানুষের মত কিম্বা তাদের থেকে বেশী ভালবাসতে পারতো না একজন সাধারণ মানুষ? সে মানুষ হয়ত বিরাট কিছু হতনা—কিন্তু তার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করতো, সমস্ত প্রাণমন অর্পণ করতো প্রতিটি মুহূর্ত্ত আপনার জন্য ব্যয় করতো। ঐ দুজনের সঙ্গে সঙ্গীত ও কাব্যের ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত আপনার কাছে এসে হাজির হয়েছিল।

প্রাণপূর্ণস্বরে—এখনও যে স্বরে মানুষকে রোমাঞ্চিত করে দেওয়া যায় সজোরে চিৎকার করে উঠলেন। 'না, মশাই না, সাধারণ মানুষ হয়ত তাঁদের থেকে বেশীই ভালবাসতো, কিন্তু তাঁরা দুজন আমাকে যেমন ভাবে ভালবাসতেন তেমন ভাবে ভালবাসতে পারতো না কেন জানেন? তারা জানতেন প্রেমের গান কেমন করে গাইতে হয়। পৃথিবীর কোন মানুষই তা পারতো না।'

'আমাকে যে কেমন করে তাঁরা মাতাল করে তুলতেন! শব্দ এবং সুরের মধ্যে যা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কোন মানুষের পক্ষে তা করা কি সম্ভব? যারা জানেনা স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের সমস্ত গান এবং কবিতাকে কেমন করে প্রেমের মধ্যে অণুরণিত করে তুলেতে হয় তারা শুধু ভালবাসতেই জানে আর কিছুই নয়। কেমন করে গানের মধ্যে দিয়ে,ভাষার মধ্যে দিয়ে একজন নারীকে আনন্দোন্মত্ত করা যেতে পারে তা তাঁরা জানতেন, তাঁরা দুজনেই জানতেন। আমাদের কামনার মধ্যে হয়ত বাস্তবতা থেকে অলীক কল্পনা থাকতো বেশী, কিন্তু অলীক কল্পনাই কেবল আপনাকে পৃথিবীর মাটী থেকে এতটুকু ওপরে উঠতে দেয় না। যদি অন্য কেউ আমাকে বেশী ভালবাসতো? না, কেবল তাদের থেকেই প্রেমের শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম, প্রেমকে অনুভব করেছিলাম, প্রেমকে শ্রদ্ধা করতে শেখেছিলাম।'

হঠাৎ তিনি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। তীব্র দুঃখের এক অনুভূতি ছিল তার অশ্রুর উৎস। আমি যেন লক্ষ্য করিনি—এমনিভাবে জানলা দিয়ে বহুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে লাগলেন, দেখুন অধিকাংশ মানুষেরই দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও বুড়ো হয়ে যায়। আমার তা হয় নি। আমার এই দেহটার বয়স উনসত্তর বছর হল, কিন্তু মনটা কুড়ি বছরের মেয়েদের মত থেকে গেছে। আর সেইজন্যেই আমার ফুল এবং স্বপ্নকে নিয়ে আমি একলাই থাকি।

এর পর দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনটা শান্ত হয়ে এল, হেসে বললেন— "আবহাওয়া যেদিন বেশ ভাল থাকে সেদিন সন্ধ্যাটা কেমনভাবে কাটাই তা শুনলে হয়ত হাসবেন আপনি। আমার ভুলের জন্য আমি লজ্জিত, তাই নিজের ওপর দয়া হয়।"

তাঁকে প্রশ্ন করা অর্থহীন, কারণ জানতুম তিনি বলবেন না। উঠে দাঁড়ালাম যাবার জন্যে, কিন্তু তিনি চিৎকার করে উঠলেন "কি এত তাড়াতাড়ি যাবেন?"

তাঁকে জানালুম, মন্টি-কারলোতে আহার করবো মনস্থ করেছি। শুনে যেন একটু ভয়ে ভয়ে তখনি প্রশ্ন করলেন, "আমার এখানে খাবার জন্যে যদি অনুরোধ করি কিছু মনে করবেন? ভারী আনন্দ পাব তাহলে।"

তৎক্ষণাৎ তাঁর নিমন্ত্রণে রাজী হয়ে গেলাম। মনে হল বেশ আনন্দিত হয়ে উঠলেন। ঘণ্টাটা বাজালেন, যুবতী দাসীকে কয়েকটা আদেশ দিয়ে আমাকে বললেন, "চলুন বাড়ীটা দেখিয়ে আনি আপনাকে।"

কাচ দিয়ে ঘেরা বারাণ্ডাটি লতাগুল্মে পূর্ণ। বারাণ্ডা থেকে দেখা যায় কমলা-কুঞ্জের সারি সোজা চলে গেছে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত। গুল্মজালে ঘেরা নীচু জায়গায় গোপন একটি বসার জায়গা লক্ষ্য করলুম। বোধহয় বৃদ্ধা মাঝে মাঝে এসে বসেন সেখানে।

তারপর আমরা গেলুম বাগানে ফুল দেখতে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। শান্ত উষ্ণ সন্ধ্যা, পৃথিবীর সমস্ত সুমধুর গন্ধকে পৌছে দিল আমাদের কাছে। যখন খেতে বসলাম বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল প্রচুর, অনেকক্ষণ ধরে আমরা খেলাম। আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলো। মনে তখন তাঁর জন্যে সহানুভূতি জাগছিল। এক গ্লাস মদ

খেয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর গোপনীয় কথা সব বলতে সুরু করলেন।

বললেন, চলুন বাইরে গিয়ে চাঁদ দেখি। চাঁদকে ভারী ভাল লাগে আমার। চাঁদ হল আমার জীবনের বৃহত্তম আনন্দের সাক্ষী। মনে হয় আমার জীবনের মধুরতম ক্ষণগুলি বুঝি সেখানে জমা হয়ে আছে। জীবনে সেই মধুর স্মৃতিগুলি যদি অনুভব করতে চাই তাহলে চাঁদের দিকে তাকাতেই হবে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় সুন্দর এক দৃশ্যের যা অবতারণা আমি করি, যদি আপনি তা জানতেন! না সে কথা জানলে আমাকে নিয়ে হাসবেন খুব—আপনাকে আমি বলতে পারবো না—আমার সাহস হয় না—না না আপনাকে আমি বলতে পারবো না—সে কথা।

"দয়া করে আমাকে বলুন"—আমি অনুরোধ করলুম—কি সেই আপনার ছোট্ট গোপন কথা? বলুন আমাকে! আমি কথা দিচ্ছি হাসবো না—আমি শপথ করছি।

তিনি ইতস্ততঃ করলেন, আমি তাঁর ছোট্ট হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিলাম এবং অসংখ্য চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম। তাঁর যৌবনে তাঁর প্রেমাস্পদরাও বোধহয় এমনটী করতো না। তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু তবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

"আপনি ব্যঙ্গ করবেন না ত?" ভয়ে ভয়ে বললেন তিনি।

"না, আমি শপথ করে বলছি আপনাকে।"

"বেশ তাহলে আসুন।"

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তাঁর সেই গেঁয়ো চাকরটা তাঁর পিছন পিছন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তার কানে কানে খুব আস্তে কি যেন বললেন।

সশ্রদ্ধভাবে সে উত্তর দিল, হ্যাঁ এখুনি।

তিনি আমার হাত ধরে বারাণ্ডার দিকে নিয়ে চললেন, সারি সারি কমলা গাছ। ভারী সুন্দর লাগছিল দেখতে। সমস্ত গাছগুলোর মধ্যে চাঁদের রৌপ্য কিরণ খেলা করে বেড়াচ্ছিল। গাছগুলোর মাঝে মাঝে ফাঁক, আর সেই ফাঁক দিয়ে এসে চন্দ্রকিরণ যেন খেলা করছিল বালুর ওপর। গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে অসংখ্য, তার গন্ধে সমস্ত বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। গাছগুলোর অন্ধকার ছায়ায় অগুণতি জোনাকি ছোট তারার মত কেবল জ্বলছে আর নিবছে।

প্রেমের কি উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতাই না গড়ে উঠেছে—আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম।

তিনি হাসলেন, বলুন, বলুন আপনি, ঠিক না? একটু অপেক্ষা করুন, দেখাব আপনাকে।

তাঁর পাশে আমাকে বসালেন এবং বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, এই ধরণের দৃশ্য যখন দেখি, নিজের জীবনের জন্য দুঃখ হয় খুব। কিন্তু আপনারা আজকের দিনের মানুষ যাঁরা, তাঁরা সে সব জিনিষ স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। আপনারা কেবল ব্যবসাই চেনেন, অর্থই আয় করতে শিখেছেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় সেটুকু পর্য্যন্ত জানেন না। আমাদের মানে—যুবতী নারীদের কথা বলছি। প্রেমের ক্রিয়াকাণ্ড সব সংযোগ রক্ষার দায় হিসাবে কেবল ব্যবহার করা হয় আজ, সেগুলির উৎপত্তিস্থল হল দর্জ্জির বিল, একথা অনেকেই হয়ত জানে না বা স্বীকার করে না। যদি স্ত্রীলোকটী অপেক্ষা দর্জ্জির দাবী আপনার কাছে বেশী মূল্যবান বলে মনে হয়, তবে স্ত্রীলোকটীকে বিদায় করেন কিন্তু দর্জ্জির দাবীর ওপর যদি স্ত্রীলোকটীকে আপনি স্থান দেন তবে আপনাকে দাম দিতে হয়। কি সুন্দর ব্যবহার! কি সুন্দর আকর্ষণ আপনাদের!

আমার হাতটী নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, "দেখুন।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। যে চমকপ্রদ দৃশ্যের উদয় হল আমার সামনে—তা দেখে সমস্ত মন ভরে উঠলো আনন্দে। বাগানের সরু রাস্তাটী যেখানে শেষ হয়ে গেছে, একটী যুবক এবং একটী যুবতী কোমর জড়াজড়ি করে ধরে চন্দ্রালোকের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। দুজনের হাত দুজনার হাতের মধ্যে নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে সেই চাঁদের আলোয় আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। চাঁদের আলো তাদের সম্পূর্ণভাবে ম্লান করিয়ে দিচ্ছিল।

এক মুহূর্ত্তের জন্যে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে আবার তারা আলোকে বেরিয়ে এল। এবার তারা আমাদের অনেক কাছাকাছি।
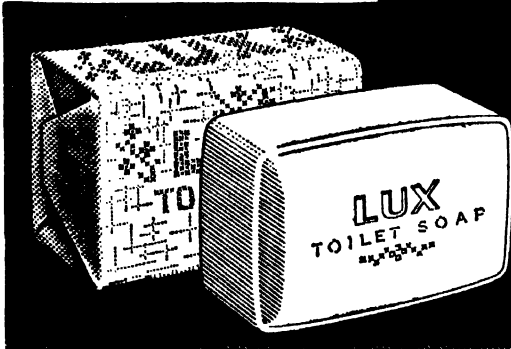
যুবকটীর পরণে একটি শাদা সার্টিনের জামা—গত শতাব্দার রুচি মাফিক প্রস্তুত। মাথায় একটী চওড়া টুপী। তাতে একটী উট-পাখার পালক গোঁজা। যুবতীটির পরণে স্কার্ট। স্কার্টের সঙ্গে চওড়া চাকতি লাগান। মাথার চুলগুলি রিজেন্সি-আমলের প্রৌঢ়া রমণীরা যেমন ভাবে বাঁধতেন—তেমনি ভাবে বাঁধা।

আমাদের থেকে প্রায় একশ গজ দূরে তারা এসে থামলো। গলিপথের ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে দুজনে আলিঙ্গন করলো দুজনকে।

হঠাৎ ভৃত্য দুজনকে চিনতে পারলাম। ভয়ানক হাসির বেগ উঠলো, হাসতে হাসতে বুঝি ফেটে পড়বো। বহু কষ্টে সে হাসি চাপলাম। অদ্ভুত এই প্রেমকাব্যে পরের দৃশ্যে কি আছে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

প্রেমিক দুজন ফিরে চললো গলিপথের অন্তপ্রান্তে। যতদূরে চলে যাচ্ছিল ততই তারা সুন্দর হয়ে উঠছিল। তাদের দেহটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল আলো অন্ধকারে শেষে স্বপ্নের ছবির মত একেবারে মিলিয়ে গেল। গলিপথটা আবার বেশ সুন্দর হয়ে উঠলো।

আমি বিদায় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করলুম। আবার যাতে তাদের না দেখতে হয়। আমি জানতুম আবার সে দৃশ্যের অবতারণা করা হবে। জীবনের পুরাতন দৃশ্যাবলী, সেই অলীক মায়াময় সুখস্মৃতি, মিথ্যা অথচ চমকপ্রদ ছবি আবার দেখা দেবে। এই বৃদ্ধা অদ্ভুত-প্রকৃতির অভিনেত্রীর বুকে যাতে জেগে ওঠে যৌবনের প্রাণস্পন্দন এবং আমাকে প্রেমের শেষ যন্ত্র হিসাবে যাতে ব্যবহার করতে পারেন।*

* মোপাসাঁর "Julee Romain" গল্প অনুসরণে

ধীরে কথা কও *

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাহিত্যভূষণ

আমরা দুজনে তরী বেয়ে চলি সাঁঝের অন্ধকারে
অস্তরবির উজল আভায় নদী বাঁকে বাঁকে ফিরি
পাইন বন আর দেবদারু তরুছায়ায় ঢাকা
ঝালর ঝুলানো অসমান নদী প্রান্ত ঘিরি।
আমাদের দাঁড় দাগ কেটে যায় গভীর জলের বুকে
চুপ চুপ সখি, ধীরে কথা কও মোর কানে কানে সুখে।
অলক্ত-রাঙা প্রভাতে মোদের যাত্রা সুরু
অভিযান হলো চন্দন-বন ছায়ে
আমরা কাটানু মধ্য নিদাঘ বেলা
রৌপ্যগলানো উপত্যকার গায়ে;
শক্ত করিয়া হাল ধরো সখি, তরীতে তব,
মোর কানে কানে ধীরে কথা কও, আমিও কবো।

সুরভি আকুল উদ্যানতলে দিনের শেষে
ফুটন্ত ফুলে ক্লান্তি দিয়েছে নাশি'
শ্যামশাখাগুলি ধীরে মিশে গেছে ছায়ার দেশে
দূর হতে যেন শুনেছি বিদায় বাঁশী—
এই তো সময় ধরো মোর হাতখানি
হাতখানি ধরে ধীরে কথা কও রাণি!
পুরাণো দিনের মোদের এ ভালবাসা
তিলে তিলে গড়া হয়েছে মোদের প্রীতি
বহু সাধনায় এ প্রেম এসেছে দ্বারে
বহু সংঘাত পেয়েছে সে নিতি নিতি।
আমাদের প্রেম রহিবে জীবন ভ'রে
ধীরে কথা কও, চুম্বন করো মোরে।

* W. H. Ogilvieএর 'Whisper Low' কবিতার অনুবাদ

দ্বারিকানাথ শিশু-মন্দির

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্বানে—গিয়েছিলাম সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন কাজগুলি পরিদর্শন করতে। দেখলাম অনেক, কিন্তু সে সবের বর্ণনার জন্যে এ প্রবন্ধ নয়। এই প্রবন্ধে পরিচয় দেব এমন এক প্রতিষ্ঠানের, যা অত্যন্ত দারিদ্র্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে তিল তিল করে ভিক্ষালব্ধ অর্থে গ'ড়ে উঠেছে এবং যার পরিচালনায় রয়েছেন আমারই অনুজপ্রতিম জেলার একজন খ্যাতনামা বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী—যিনি আজ যশ প্রতিষ্ঠা ও অর্থের মোহ পরিত্যাগ ক'রে সুদূর পল্লীগ্রামে এই কল্যাণব্রতে ব্রতী আছেন।

১৭ই নভেম্বর শনিবার। সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে ২৪ পরগণা ক্যানিং টাউনের মোটর-লঞ্চ ষ্টেশনের যাত্রীনিবাসে শয্যাত্যাগ করলাম। গত সন্ধ্যায় আমরা তেত্রিশ জন সাংবাদিক এসে আতিথ্য নিয়েছিলাম বন্ধুবর শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্করের উদ্যোগে স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীদের। তাঁরাই এখানে আমাদের বাসস্থান নিরূপণ করেন। ক্যানিং টাউনে সরকারী সাহায্যে বা সরকারী উদ্যোগে যে সকল উন্নয়ন কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে তা দেখতে বেরুনো গেল। দেখলাম শিশুমঙ্গল, দেখলাম বালিকা বিদ্যালয়, দেখলাম যাত্রীনিবাস—হাসপাতাল। ক্যানিংএর সার্কেল অফিসার শ্রীউদারঞ্জন বসু সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম, মাইল দুই দূরে আছে এক সোস্যাল ওয়েল-ফেয়ার হোম। সহযাত্রীগণ উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন—চল যাওয়া যাক্। দেখতে বেরিয়েছি, পথের ভয় করলে চলবে কেন!…দূর! কোথায় দু' মাইল! মাত্র মাইল খানেকের একটু বেশী। এই তো এসে পড়েছি। আরে, সামনে দাঁড়িয়ে ও কে? আমাদের মুরারিশরণ চক্রবর্ত্তী নয়? ছেলেবেলায় আদর ক'রে ওর নাম দিয়েছিলাম আমরা sun-proof water-proof. দেশের কাজে শ্রান্ত হ'তে দেখিনি ওকে কোনও দিন। ইংরেজ আমলে জেল খেটে, পুলিশের মার খেয়ে, আজ শান্ত হ'য়ে বসেছে শতখানেক অসহায় বালককে মানুষ ক'রে তোলার ভার নিয়ে। বয়স হয়েছে—তবু ছেলেমানষি যায় নি; ছুটে এসে আগের মতই জড়িয়ে ধরলো, টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেলো 'আশ্রমে'র মধ্যে।

"দ্বারিকানাথ শিশুমন্দির"। স্থানীয় সম্পন্ন গৃহস্থ পরলোকগত দ্বারিকানাথ মণ্ডলের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির ওপর এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। দ্বারিকাবাবুর একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রনাথ তথন নাবালক, ভাগিনেয় শ্রীভূষণচন্দ্র পাত্র সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। তাঁরই চেষ্টায় এই জমি আশ্রমকে দেওয়া হয়। মুরারিশরণের মুখে শুনলাম এর ইতিহাস। ১৯৪২ সনের দুর্ভিক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখভোগ করেছিল সুন্দরবন বা আবাদ-অঞ্চলের জনসাধারণ। এই অঞ্চল হ'তেই দলে দলে নরনারী ভিড় ক'রে গিয়েছিল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাঁচার আশা নিয়ে। বাঁচেনি অবশ্য তারা—ভাত ত' দূরের কথা, একটুখানি ফ্যানের আশায় তাদের কাতর আর্ত্তস্বর আজও আমাদের কানে বাজে। হাজার হাজার জ্যান্ত মানুষ জীবন দিয়ে করলো পরাধীনতার, আর মানুষের লোভের প্রায়শ্চিত্ত।

সে ত' হ'ল; কিন্তু দুর্ভিক্ষোত্তর সময়ে আর এক সমস্যা দেখা দিল কতকগুলি মাতৃ-পিতৃহীন নিঃসহায় শিশু নিয়ে। আমেরিকান্ ফ্রেণ্ডস্ এ্যাম্বুলেন্স ইউনিট্ এখানে গঠন করলো এক শিশুপালন কেন্দ্র ১৯৪৩ সনে। নিরাশ্রয় বালক-বালিকাগণের কয়েকজনের অন্ততঃ একটা আশ্রয় মিললো। বছর দেড়েক চলার পর ইউনিট দেখলো—ব্যবস্থার চেয়ে অব্যবস্থা হয় বেশী। কেন্দ্রের ছেলেমেয়েরা খেতে পাক্ আর না পাক্, খরচ পড়ে অপরিমিত। তাঁরা ঠিক করলেন কেন্দ্র বন্ধ করে দেবেন। এবার পালা হরিজনসেবক সঙ্ঘের—তাঁরা এই কেন্দ্র পরিচালন করেছিলেন মাত্র মাস তিনেক। কিন্তু ঠিক একই কারণে তাঁরাও বাধ্য হ'লেন এই কেন্দ্র বন্ধ ক'রে দিতে।

কেন্দ্র উঠে যায়—আশ্রয়প্রাপ্ত বালকবালিকাগণ পুনরায় নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়ে—কোনও প্রতিষ্ঠান ভার নিতে রাজী হয় না। সেই বিপদের মাঝে স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী কর্ম্মী উদ্যোগী হ'লেন প্রতিষ্ঠানটিকে চালিয়ে যেতে—ভিক্ষামাত্র অবলম্বন ক'রে। দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করতেও দ্বিধা করেন নি এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর দল। কিন্তু এমনি ভাবে কতদিন চলে? এমন সময় এক সুযোগ এলো। এই প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান সম্পাদক ডাঃ নির্ম্মলকুমার রায়ের পরিচয় ঘটে গেল প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি শুনলেন সব; প্রতিশ্রুতি দিলেন সরকারী সাহায্যলাভে সহায়তা করতে। তাঁরই আনুকুল্যে এবং কর্ম্মিগণের অক্লান্ত চেষ্টায় সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হ'ল ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে।

কিছুদিন চললো বেশ সহজ গতিতে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান—মোটামুটি স্বাবলম্বী। তদানীন্তন অধ্যক্ষ যিনি এই প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত দুর্দ্দিনেও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই আশ্রমের সেবা করেছিলেন, তাঁর হাতে ভার দিয়ে কর্ম্মিগণ নিশ্চিন্ত রইলেন। পরিচালক সংসদের সদস্যগণ, এমন কি সম্পাদকও এই অধ্যক্ষ ভদ্রলোকের হাতে ছেড়ে দিলেন আশ্রমের অর্থভাণ্ডার ও পরিচালনার সকল দায়িত্ব। তিনি অধ্যক্ষ, তাঁর পত্নী হলেন সহঃ-অধ্যক্ষা, দুই ভাই হ'লেন শিক্ষক, আরও কয়েকজন আত্মীয়স্বজন এসে নিলেন তাঁর আশ্রয়। আরও কিছুদিন পরে অধ্যক্ষ নিলেন আর এক চাকুরী—আশে পাশে নয়, একেবারে জেলা পার হয়ে—হাওড়া সহরে। আশ্রম থেকেই ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করেন। সকাল সাতটায় বার হয়ে যান, ফেরেন রাত্রি ন'টায়। একই

সময়ে দু' জায়গায় হোল-টাইমার—মাঝখানে পঁয়ত্রিশ মাইল তফাৎ। ছেলেরা পায় না পেটপুরে খেতে। এততেও তদানীন্তন কমিটীর টনক নড়লো না—টনক নড়লো গভর্ণমেন্টের পুরাতন কমিটী হ'লো বাতিল, গভর্ণমেন্ট নূতন কমিটি করলেন মনোনীত। কমিটীর সভাপতি হলেন স্থানীয় সার্কেল অফিসার—সম্পাদক ডাঃ নির্ম্মলকুমার রায়। কমিটীর ওপর হুকুম হ'লো, যে। ষ্টাফ্ বদল কর। অবশ্য যত সহজে লেখা গেল, সমস্তাগুলির সমাধান হয়নি ততখানি সহজে। অনেক হা-হুতাশ, অনেক মামলা মোকদ্দমা, অনেক ইন্‌জাংসন করেছেন পুরাতন দল। এই তুলকালাম হাঙ্গামের মাঝে ২৪ পরগণা স্কুল বোর্ডের সহ-সভাপতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্করের নেতৃত্বে স্থানীয় কর্ম্মিরা আমার এই কনিষ্ঠ সহকর্ম্মিটিকে এনে বসান অধ্যক্ষের পদে। কাজেই পথ তাঁর কুসুমাস্তৃত হয় নি, এমন কি বিপদের আশঙ্কাও ঘটেছে কয়েকবার। কিন্তু আরও বিপদ অপেক্ষা করে বসেছিল—সেটা জানা গেল কয়েকদিন পরে। একে একে পাওনাদারের দল এসে হাত পেতে দাঁড়ালো—প্রতিষ্ঠান দেনা করেছে তাঁদের কাছে—টাকা চাই! হিসাবপত্র ঘেঁটে দেখা গেল প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা ঋণ! ছেলে-মেয়েদের প্রতি-পালনের দায়িত্ব নিয়েছেন গভর্ণমেন্ট, আজ কয়েক বছর ষ্টাফের বেতন যুগিয়েছেন গভর্ণমেন্ট—তবু দেনা—তাও দুদশ টাকা নয়—একেবারে অযুতের ওপর! নিষ্কৃতি নেই—ঋণের টাকা শোধ করতেই হবে।

* * *

তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। কমিটী সচেতন হয়েছেন, সম্পাদক সতর্ক হয়েছেন; আমার সহকর্ম্মীর—তাঁদের অধ্যক্ষের—সুনিপুণ কর্ম্ম-শক্তিকে ওঁরা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সুবিপুল ঋণ প্রায় শোধ হ'য়ে এসেছে, নূতন ঘর উঠেছে, বেশ বড় একখানি অট্টালিকা প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে—শিল্প-বিদ্যালয় তৈরী হবে। বাঁধা ঘাট তৈরী হ'য়েছে. টিউবওয়েল বসেছে—কুড়ি বিঘা ধান-জমি কেনা হ'য়েছে। ছেলেদের চাষ শেখানো হ'চ্ছে, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ শেখানো হচ্ছে। ছেলেদের দেখলাম, বেশ সহজ স্বচ্ছন্দগতি—সরল আনন্দে আমাদের অভ্যর্থনা করলো, নিজেদের হাতে আমাদের যা করে খাওয়ালো—তথ্য নিয়ে জানলাম কেউ তাদের শিখিয়ে দেয়নি। স্থানীয় এক চাষী বন্ধু বলছিলেন—"আগে অরফিনের ছেলে দেখলেই চেনা যেত। এখন ভদ্দরলোকের সঙ্গে মিশে গেছে।"

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বৌদ্ধ সংঘে মতভেদ

Appearance and Reality গ্রন্থের ভূমিকায় ব্রাড্‌লে লিখিয়াছেন যে তিনি দর্শনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব কখনও আরোপ করেন নাই। তাই এক সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন "যাহা সহজাত সংস্কার বশে আমরা বিশ্বাস করি, তাহার জন্য ভ্রান্তযুক্তির অনুসন্ধানই তাত্ত্বিক দর্শন (Metaphysics)। কিন্তু এবংবিধ যুক্তির অনুসন্ধানও সহজাত সংস্কারের ফল।" ব্রাড্‌লের মতে প্রতিভাস হইতে স্বতন্ত্রভাবে সৎকে জানিবার প্রচেষ্টা, অথবা প্রথম তত্ত্বাবলী বা চরম সত্যের অনুশীলন, অথবা বিশ্বকে খণ্ডশঃ না বুঝিয়া সমগ্রভাবে বুঝিবার প্রচেষ্টাই তাত্ত্বিক দর্শন। বুদ্ধ তাঁহার উপদেশে তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা সযত্নে পরিহার করিতেন এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শিষ্যদিগকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাত্ত্বিক বিষয়ে মতভেদের জন্য তাহার শিষ্যগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বুদ্ধের উপদেশসকল প্রথমে মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। তাহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করিবার জন্য একাধিক সংগীতির অধিবেশন হয়। প্রথম সংগীতি আহুত হয় রাজগৃহে—বুদ্ধের পরিনির্বাণলাভের কিছু পরে। এই সভায় সন্ন্যাসের কঠোরতা হ্রাস করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহাতে প্রাচীনগণ প্রবল বাধা দান করেন। দ্বিতীয় সংগীতির অধিবেশন হয় ইহার একশতবৎসর পরে বৈশালী নগরে। এ সভাতেও সংঘের নিয়মাবলী আলোচিত এবং তাহাদের কঠোরতা হ্রাস করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু স্থবিরদিগের বিরুদ্ধতা বশতঃ সে চেষ্টা এবারও বিফল হয়। তখন সংস্কারপন্থিগণ (মহাসংঘিক) স্বতন্ত্রভাবে এক মহা-সংগীতির আহ্বান করেন। দীপবংশে লিখিত আছে যে এই সভায় প্রাচীন শাস্ত্র বিপর্য্যস্ত হয় এবং বুদ্ধের উপদেশের বিকৃত অর্থ করা হয়। স্থবিরদিগের মতে বিনয়পিটকে যে সকল নিয়ম বিহিত আছে, কেবল তাহাদিগের সম্পূর্ণ পালন করিলেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সংস্কারপন্থীদিগের মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বুদ্ধত্ব শক্যরূপে বর্ত্তমান এবং ইহার যথোচিত বিকাশদ্বারা প্রত্যেকেই তথাগত হইতে পারে। স্থবিরবাদই সিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম্মের (হীনযান মতের) মূল।

বুদ্ধের মৃত্যুর পরে দুইশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ১৮ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধের মৃত্যুর পর ২৫০ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও প্রচারিত হয়। খৃঃ পূ ৩য় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কাশ্মীর, সিংহল, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান এবং মঙ্গোলিয়ায় প্রবেশ করে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের সময়ে পাটলীপুত্রে তৃতীয় সংগীতির অধিবেশন হয়, এবং বৌদ্ধ সংঘে যে সকল অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল তাহা দূর করিবার চেষ্টা হয়। অশোকের সময় হইতে কয়েক শতাব্দী বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে প্রবল থাকে। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটদিগের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হয় এবং বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্য প্রবল প্রয়াস উদ্‌ভূত হয়। তখন এই সকল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ মত ব্যাখ্যাত হইতে থাকে। বুদ্ধ তখন দেবতারূপে গৃহীত হন এবং তাঁহার মূর্ত্তি পূজা আরব্ধ হয়। এই সময়ে নাগার্জুন (কনিষ্কের সময়ে) মহাযান সম্প্রদায় সুগঠিত করেন। থেরাবাদীদিগের হইতে মহাসংঘিকদিগের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণতি মহাযান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠায়। কনিষ্কের সময় জলন্ধরে যে সংগীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাযান মত স্থিরীকৃত হয়। হীনযান সম্প্রদায়ের দাবী এই যে বুদ্ধের উপদেশের বিশুদ্ধি তাহারাই রক্ষা করিয়াছেন, এবং বুদ্ধ যে সকল নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অবিকৃত অবস্থায় তাহা তাঁহাদের সম্প্রদায় প্রচলিত রাখিয়াছেন। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে হীনযান, এবং নেপাল, তিব্বত চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে মহাযান প্রচলিত। হীনযান অন্তর্মুখী এবং বৈরাগ্যপ্রধান। মহাযান জাগতিক অবস্থার সহিত সমন্বয়সাধক। কনিষ্কের আহূত সংগীতিকে হীনযানীগণ স্বীকার করেন না। মহাযানীগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহাদের সর্ব্বস্বীকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ নাই। তাহাদের অনেকে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম

পালি ভাষায় রচিত ত্রিপিটক ও "মিলিন্দ পন্‌হে" যাহা অসংবদ্ধ ভাবে বিবৃত আছে তাহাই বৈভাষিক দিগের অভিধর্ম্ম। বুদ্ধঘোষের গ্রন্থাবলী এবং অভিধর্ম্ম সংগ্রহে শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শনের আকারে এই মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হীনযান মতে "যৎ সৎ, তৎ ক্ষণিকম্" (সর্ব্ববস্তুই ক্ষণিক)। আকাশ ও নির্বাণকে স্থায়ী বলা হয়, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বই নাই। তাহারা অভাবের নাম। কোন বস্তুতেই ক্ষণিক ভিন্ন কিছু নাই। মনন (চিন্তা) আছে, কিন্তু মন্তা কেহ নাই। বেদনা আছে কিন্তু বেত্তা নাই। যে ক্ষণিক বস্তু দ্বারা সকল বস্তু গঠিত তাহাকে ধর্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ধর্ম্ম সকল সূক্ষ্ম, অন্যনিরপেক্ষ, কিন্তু ক্ষণমাত্র স্থায়ী। তাহারা সৎ কিন্তু ধ্বংসশীল। কোনও দ্রব্যের (Substance) অথবা ব্যক্তির অস্তিত্ব এই মতে নাই। কারণ ও কার্য্যরূপে দলবদ্ধ হইয়া আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মগণই ভ্রান্ত ব্যক্তির (Pseudo indivi-duals) সৃষ্ট করে। ধ্যান ও ধারণা বলে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় চেষ্টা দ্বারা মুক্ত হইয়া অর্হৎ হইতে পারে। ইহাই পুরুষার্থ। বিজ্ঞানের নিবৃত্তিই নির্বাণ। বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন

কিছুর অনুভবই তৃষ্ণা। বিজ্ঞানই বন্ধ। হীনযান অবিমিশ্র প্রতিভাসবাদ। ইহাতে স্থায়ী কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত, ব্যক্তির অস্তিত্ব (সত্য অস্তিত্ব) এই মতে নাই। (পুদ্গল নৈরাত্ম্যবাদ)। অর্হৎগণ বুদ্ধত্ব লাভ করেন কিনা, সে সম্বন্ধে হীনযানের কোনও নিশ্চিন্ত মত নাই, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যে স্বীয় চেষ্টা দ্বারা বুদ্ধত্বলাভ করিতে পারে, তাহাও এই মতে নাই। অর্হৎ অবস্থায় সর্ব্বকামনার নিবৃত্তি হয়, তাহাই সর্ব্বোত্তম অবস্থা। ইহার জন্য অন্য কাহারও—কোনও অপ্রাকৃত শক্তির—অনুগ্রহের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ স্বীয় জীবনে নির্বাণলাভ করিয়া যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্যই তাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, অন্য কিছুর জন্য (তাহার কৃপার জন্য) নহে। সংসার হইতে দূরে—নির্জনে সাধনাদ্বারা হীনযানিগণ জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হইতে সচেষ্ট। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সমাজে বাস করিলেই স্নেহমমতায় বদ্ধ হইতে হয়, তাহার ফল দুঃখ। রাস্তায় চলিবার সময় চক্ষু মুদিত করিতে হইবে, বাহ্যসৌন্দর্য্য যাহাতে দৃষ্টিগোচর না হয়। বিবাহিত জীবন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড সদৃশ। সংসার ও মানবজীবন যে ক্ষণবিধ্বংসী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শ্মশানে বাস উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রেম ও কর্ম্মদ্বারা পুরুষার্থ লব্ধ হয় না। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মে দুঃখীর দুঃখমোচন কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে বলা হইয়াছে। সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

হীনযান সম্প্রদায়ে পরে বহু দেবতা এবং তাহাদিগের উপরে এক পরম দেবতায় বিশ্বাস প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধ দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ দেবাতিদেব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্‌, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রাচীন হীনযানী সম্প্রদায়ে তিনি মানুষ রূপেই পূজিত হইতেন। তাঁহার পূজার অর্থ ছিল, তাহার স্মৃতির সম্মান করা।

এইরূপে হীনযান সম্প্রদায়ে বুদ্ধের অদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার নিষেধ আজ্ঞা অবহেলিত হইয়াছিল, এবং metaphysics প্রবেশলাভ করিয়াছিল। হীনযানিগণ সৎকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলোক-প্রাপ্তির এবং পরিণামে বুদ্ধ হইবার আশা পোষণ করেন। বুদ্ধকে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করিয়া এবং হিন্দু দেবতা দিগকে স্বীকার করিয়া তাঁহারা বহু দেববাদ, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব, এবং অর্হৎদিগের অনুগ্রহ বলে ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার লোকে) প্রাপ্তিতে বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াছেন। *

মহাযান

"যান" শব্দের দুই অর্থ—মার্গ (যেমন দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতিতে) ও বাহন (যেমন জলযান, ব্যোমযান প্রভৃতিতে)। কেহ কেহ বলেন 'মহাযান" শব্দের অর্থ—বৃহৎ অথবা প্রশস্ত মার্গ, যে মার্গে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে, এবং হীনযান ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ মার্গ, যাহাতে বহু লোকে প্রবেশ করিতে পারে না। অন্য মতে মহাযান শব্দের অর্থ উত্তমমার্গ বা বাহন, এবং হীনযান অর্থ নিকৃষ্ট মার্গ বা বাহন।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণ পর্য্যন্ত বৌদ্ধসংঘে যে সকল মত প্রচলিত ছিল, তাহারাই বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম রূপ। অশোকের সময় যে মত প্রচলিত হয়, তাহা হীনযান। অশোক হইতে কনিষ্ক পর্য্যন্ত যুগে যে সকল মত ক্রমশঃ ধর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহারাই পরে সুসংবদ্ধ হইয়া মহাজান নামে পরিচিত হয়। হীনযান ধর্ম্ম নীরস; তাহাতে ভক্তির স্থান নাই, তাহা দ্বারা মানুষের অন্তরের ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। বুদ্ধের জীবনের সৌন্দর্য্যে হীনযানীদিগের মন মুগ্ধ এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। তিনি দেবত্বে উন্নীতও হইয়াছিলেন; কিন্তু পণ্ডিতদিগের মতে তিনি নৈতিক আদর্শের প্রতীকের অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না। তিনি যে উপদেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন তাঁহার নিকট হইতে অন্য কিছু পাইবার ছিল না। কিন্তু মানুষের অন্তরতম প্রদেশে একটি চরম আশ্রয়লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান—হীনযান বুদ্ধকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে এতাদৃশ আশ্রয় স্থানে পরিণত করিতে পারে নাই। সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জনের আদর্শও সকলে সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। মানুষ সংসারের সহিত বদ্ধ। বুদ্ধ এই সংসার বন্ধনচ্ছেদন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সংসারে আসক্তি বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সংসারী জীবের দুঃখনাশের জন্য চেষ্টা করিতেও বলিয়াছিলেন। সংসারের দিকে অন্ধ হইতে বলেন নাই। কিন্তু হীনযান সংসারকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া তাহার সর্ব্ব ব্যাপার তুচ্ছ করিতে উপদেশ দিত। ইহা সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। হীনযানের লক্ষ্য নির্ব্বাণের অর্থ জীবের ঐকান্তিক বিনাশ। ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক বিনাশ সাধারণ লোকের কাম্য হইতে পারে না। হীনযান দার্শনিক পণ্ডিতের গ্রাহ্য হইলেও, তাহার অনাত্মমূলক দর্শন সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে অসমর্থ।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন নানা জাতির মধ্যে প্রচারিত হইল, অসভ্য অনেক জাতি যখন এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের অনেক বিশ্বাস ও কুসংস্কারও এই ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সংস্কারপন্থী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মকে সাধারণের গ্রহণ যোগ্য করিবার জন্য তদানীন্তন হিন্দু-সমাজের অনেক মত গ্রহণ করিলেন। ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সংস্কৃত রূপ গ্রহণ করিল, তাহাই মহাযান। তাঁহারা বলিলেন "বুদ্ধ বলিয়াছেন যাহাদিগের কোনও রক্ষাকর্ত্তা নাই, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব, পথচারীদিগের ও সমুদ্রগামী জাহাজের পথপ্রদর্শক হইব, তাহাদিগকে তৃষ্ণার জল সরবরাহ করিব, সংসার-সমুদ্রের পারযাত্রীদিগকে পারে পৌছাইয়া দিব। যাহাদিগের আলোকের প্রয়োজন তাহাদিগের নিকট প্রদীপ হইব, ক্লান্ত পথিকের শয্যা হইব, যাহাদের ভৃত্যের প্রয়োজন, তাহাদের দাস হইব।" "(বোধিচর্য্যাবতার)" সাধারণ লোকে আগ্রহের সহিত এই সকল কথা শুনিল। মহাযানীগণ বলিলেন বুদ্ধ যে ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সকলের বিভিন্ন প্রয়োজনের উপযোগী। হীনযানী জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, এবং ব্যক্তির নির্ব্বাণ-প্রাপ্তিই তাহার

* Dr. Radha Krishna's Philosophy P. 507-81

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
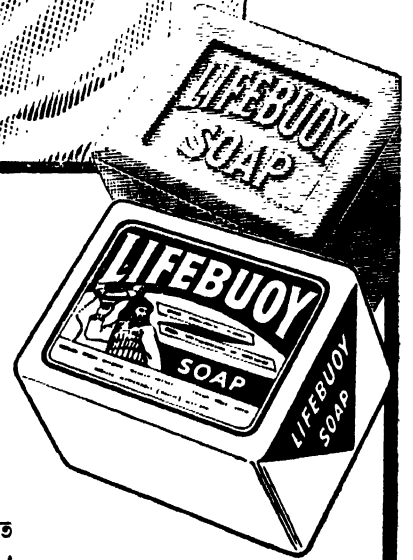
পুরুষার্থ। মহাযানী করেন প্রেমের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং প্রত্যেক জীবের মুক্তিই তাহার লক্ষ্য! মহাযানীর নির্ব্বাণ জীবের আত্যন্তিক বিনাশ নহে, তাহা ব্যক্তিত্বের সীমাবর্জ্জিত সৎপদার্থ। মহাযান সংসার বর্জ্জন করিতে বলেন না, সংসারের মধ্যে যে সকল দোষ আছে তাহা দূর করিতে বলেন। হীনযান জ্ঞানমার্গীর ধর্ম্ম, মহাযান ভক্তিমার্গীর ধর্ম্ম।

হীনযান মতে জীবাত্মা, কতকগুলি অনিত্য স্কন্ধের সমবায়। মহাযানমতে এই সকল স্কন্ধেরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। হীনযান মতে স্কন্ধদিগের আধার স্বরূপ কোনও স্থায়ী সৎবস্তু নাই। কিন্তু মহাযান এক স্থায়ী দ্রব্যের (substance) অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই বস্তুর নাম "ভূত-তথতা"। ইহা সর্ব্ব বস্তুর সার। ইহাকে "ধর্ম্মকায়"ও বলে,—সর্ব্ব "ধর্ম্মে"র কায় বা আধার! এই ধর্ম্মকায় ক্লিষ্ট মানব মনে শান্তির বিধান করে বলিয়া ইহাকে "নির্ব্বাণ"ও বলে। ইহা জ্ঞানস্বরূপ—ইহাই বোধি। ইহা দ্বারাই জগৎ পরিচালিত। জগতের যাবতীয় বস্তু স্বরূপে এক। কিন্তু ইহার স্বরূপ বর্ণনার অযোগ্য। ইহার পরিবর্ত্তনও নাই। বিনাশও নাই। যাবতীয় বস্তু একই আত্মার প্রকাশ। এই আত্মাই "তথতা"। যে কথা বলে, তাহার যেমন অস্তিত্ব নাই, যাহা বলে তাহারও অস্তিত্ব নাই, যাহা মনন করে, তাহারও অস্তিত্ব নাই। তথতা অসঙ্গ, সর্ব্ব আপেক্ষিকতা-বর্জ্জিত। ইহার কোনও কারণ নাই, ইহা স্ব-প্রতিষ্ঠ, এবং সর্ব্ব বস্তুর প্রতিষ্ঠা ভূমি। ইহা জ্ঞানের জ্যোতি, "ধর্ম্মধাতু"র (বিশ্বের) সার্বিক জ্যোতি, সত্য জ্ঞান, বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল মন; শাশ্বত, সুখময়, স্ব-নিয়ত, অপরিণামী, এবং স্বতন্ত্র।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ প্রতিভাসিক, সত্য নহে। ইহা স্বপ্নের মতো, কিন্তু অর্থহীন নহে। ইহা মায়া, মরীচিকা, অথবা বিদ্যুৎ প্রকাশের মতো। প্রত্যেক বস্তুরই তিন রূপ (১) দ্রব্য, (২) গুণ ও (৩) ক্রিয়া। গুণ ও ক্রিয়ার উৎপত্তি ও বিলয় আছে। কিন্তু দ্রব্যত্বের বিনাশ নাই। সমুদ্রের তরঙ্গের উৎপত্তি লয় আছে। কিন্তু সমুদ্রের জলের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। বিশ্বের দুইটি রূপ একটি অপারবর্ত্তনীয় অপরটি পরিবর্ত্তনীয়। ভূত-তথতা তাহার অপরিবর্ত্তনীয় রূপ। ইহা যাবতীয় পরিবর্ত্তনের ভিত্তিরূপে অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইহাই নাম ও রূপের আবির্ভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়। জগৎ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। ইহার ব্যাবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। ইহার সত্তা প্রাতিভাসিক, অস্থায়ী পরিণামী। সকল প্রতিভাসের মধ্যে সৎ অনুপ্রবিষ্ট। সুতরাং প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে সমগ্রতা শক্যরূপে বর্ত্তমান। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধত্ব শক্যরূপে অবস্থিত। তথাগতের মধো যে পূর্ণজ্ঞান বর্ত্তমান, এমন জীব নাই যাহার মধ্যে তাহা নাই। কিন্তু মিথ্যা চিন্তায় তাহা আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া সকলে তাহা অবগত নহে। যাহার পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহা অহংরূপী আত্মা, (হীন আত্মা) অবিনশ্বর আত্মা নহে। হীন আত্মার মধ্যেও তথতা বর্ত্তমান।

অবিদ্যাই জগতের উৎপত্তির কারণ। আমাদের মনের বিভ্রান্তিবশতঃ সকল বস্তু বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। এই বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিলে বস্তুদিগের মধ্যে ভেদরেখা সকল বিদূরিত হয়, এবং জগতের কোনও চিহ্নই থাকে না। প্রত্যেকের মন স্বরূপে বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল। যখন অবিদ্যা বায়ু ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন বিভিন্ন মানসিক তরঙ্গ উত্থিত হয়। কিন্তু মন, অবিদ্যা ও মানসিক ভাবের কাহারও পারমার্থিক সত্তা নাই। মনকে যখন শূন্য করা যায়, তখন বিশুদ্ধ আত্মা শাশ্বত ও অপরিণামীরূপে দৃষ্ট হন, যাবতীয় বিশুদ্ধ বস্তুর আধার রূপে। প্রকৃত পক্ষে জগতের অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যা হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। কিন্তু অবিদ্যার উদ্ভব কোথা হইতে হয়, তাহার কোনও ব্যাখ্যা নাই। অশ্বঘোষ অবিদ্যাকে বিশুদ্ধ সত্তার অতল গহ্বর হইতে উত্থিত স্ফুলিঙ্গ বলিয়াছেন। তাহার মতে সংবিদই অবিদ্যা। সংবিদের প্রথম উদ্ভিদ্ধি জগতের আবির্ভাবের প্রথম সোপান। তাহার পরে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ উদ্ভূত হয়। মূল তথতার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় একীভূত ছিল। তাহা সম্পূর্ণ অভাবের অবস্থা না হইলেও বর্ণনার অযোগ্য। বোধিতে এই বিষয়ী-বিষয়হীন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অবস্থা হইতে জাগরিত হইবামাত্র আমরা বিভেদ ও সম্বন্ধযুক্ত জগতে প্রত্যাগত হই। ইহা ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিশ্বের সৃষ্টিও অবিদ্যা সম্ভূত। অবিদ্যা তথতার (absolute) মধ্যেই বর্ত্তমান। "মণি পদ্মে হুঁ"—পদ্মের মধ্যে বর্ত্তমান। অসঙ্গের মধ্যে তাহার সৃষ্টিশক্তি বর্ত্তমান। সৎ ও প্রতিভাস একান্ত ভিন্ন নহে।—এক বস্তুর দুই দিক। এই বিশ্ব অসঙ্গেরই প্রকাশ, সতেরই প্রতিভাস। তাহা যদি না হইত বিশ্ব অর্থহীন হইত। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে অমৃতই প্রকাশিত। দেশ ও কালে অসঙ্গের প্রকাশই বিশ্ব। *

মহাযানের এই দার্শনিক তত্ত্ব মহাযান ধর্ম্মে রূপ গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন (মজ্জিমানিকায় ২২) "যাহারা অষ্টাঙ্গ মার্গে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহাদেরও যদি আমাতে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, তাহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।" ইহার উপর মহাযান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন দেশে এই ধর্ম্ম বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহার কারণ বৌদ্ধ প্রচারকগণের পরমতসহিষ্ণুতা। জীবে দয়া, জীবনের মূল্য এবং আত্মসমর্পণই প্রধানতঃ তাহাদের শিক্ষার বিষয় ছিল। বৌদ্ধ নীতি পালন করিয়া সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত কাহারও ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানের উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না। চরিত্র যদি উন্নত হয়, তাহা হইলে কে কোন্ দেবতার উপাসনা করে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই ছিল তাহাদের মত। কেননা সকল ধর্ম্মেই ধর্ম্মকারেরই প্রকাশ, এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই কিছু না কিছু সত্য আছে।

মহাযানে বহু বুদ্ধের কথা আছে। তাহাদের মধ্যে আদি বুদ্ধ শাশ্বত ঈশ্বর। তিনিই জগতের স্রষ্টা। পরবর্ত্তী বুদ্ধগণ জগতের পালন করেন। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ও প্রেমময়। এ পর্য্যন্ত অসংখ্য বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে অসংখ্য বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন। মুক্তিলাভ করিয়াও বুদ্ধগণ জীবের মঙ্গলের জন্যে মুক্তি গ্রহণ করেন না। গৌতম বুদ্ধ এই বুদ্ধদিগের মধ্যে একজন, কিন্তু তিনি "তথতা" নহেন-

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণের গ্রন্থে উদ্ধৃত সুজুকির Awakening of Faith ১২৩-১২৬।

...নি বহু দেবের মধ্যে একজন। তাঁহার এক পার্শ্বে বোধিসত্ত্ব অমিতাভ ...ঃ অন্য পার্শ্বে বোধিসত্ত্ব করুণাময় অবলোকিতেশ্বর উপবিষ্ট। ...র্জুন ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব ও কালীর উপাসনার বিধি দিয়াছেন। হিন্দু ...বতাদিগের যথানির্দিষ্ট স্থান মহাযান ধর্ম্মে প্রদত্ত হইয়াছে। বহুসংখ্যক ...ধিসত্ত্বের অস্তিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে।

...হীনযানে অর্হৎই মানব জীবনের আদর্শ। মহাযানের আদর্শ ...ধিসত্ত্ব। "বোধিসত্ত্ব" শব্দের অর্থ "বোধি বা পূর্ণজ্ঞান যাহার স্বরূপ, ...দৃশ সত্ত্ব বা জীব।" কিন্তু যিনি এখন পর্য্যন্ত বোধি লাভ না করিলেও ...হার সন্নিকটে উপনীত হইয়াছেন, তিনিও বোধিসত্ত্ব। গৌতম বুদ্ধ ...ন নির্বাণলাভের জন্য সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি বোধিসত্ত্ব ...লেন। ভাবী বুদ্ধ, যিনি ইহজন্মে অথবা পরজন্মে বুদ্ধত্ব লাভ ...রিবেন, তাহাতেও "বোধিসত্ত্ব" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নির্বাণ ...ধিগত হইলেও জীবের প্রতি অপার করুণাবশতঃ বোধিসত্ত্বগণ তাহা ...হণ করেন না। দুর্বল জীবকে নির্বাণের পথে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ...হারা মুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। অর্হৎ স্বকীয় মুক্তি কামনায় সংসারে ...লিপ্ত ও একাকী নির্বাণ-সাধনায় মগ্ন। মহাযান মতে কেবল নিজের ...ক্ত-সাধন স্বার্থপরতা—মারের প্রলোভন ইহার মূলে। বোধিসত্ত্বের ...রূপ করুণা ও প্রজ্ঞা। নাগার্জ্জুন বলেন—বোধিসত্ত্বের প্রকৃতির ...রভাগ হইতেছে তাহাদের "মহাকরুণা চিত্তা।" যাবতীয় জীবই ...হাদের করুণার পাত্র। এই জন্যই জীবদিগকে দুঃখমুক্ত ...রিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক প্রবলশক্তিসমন্বিত হইয়াও ...ম ও মৃত্যুর গ্লানি স্বীকার করেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া আপনা-...দিগকে জন্মমৃত্যুর নিয়মের অধীনতায় স্থাপিত করিলেও তাঁহাদের ...ন্তঃকরণ পাপ ও আসক্তিমুক্ত। মলিন পঙ্ক হইতে উদ্ভূত পদ্মে যেমন ...ঙ্কের মলিনতা সংক্রামিত হয় না, বোধিসত্ত্বদিগকেও তেমনি সংসারের ...লিনতা স্পর্শ করে না। তাঁহারা স্বকীয় পুণ্যের ফল জীবকে অর্পণ ...রিয়া, তাহাদের পাপ গ্রহণ করেন (পরিবর্ত্ত) এবং তাহা হইতে ...ভূত দুঃখ ভোগ করেন।

মহাযানদর্শন অদ্বৈতবাদ। এই মতে তথাত্বই একমাত্র সত্য বস্তু। ...ই যিনি প্রাপ্ত হন, তিনি তথাগত। এই অদ্বৈতবাদ হইতে উদ্ভূত ...ই বহু দেবতার স্থান থাকিলেও, সকল দেবতাই এক পরম দেবতার ...ন। মহাযান্ ধর্ম্মে ত্রিবিধ কায়ের বর্ণনা আছে। "ধর্ম্মকায়," ...ম্ভোগকায়" এবং "নির্ম্মাণকায়"। ধর্ম্মকায় কালাতীত, কারণহীন, ...াত্মিক পারমার্থিক সত্তা। ইহা কোনও পুরুষ নহে, কিন্তু যাবতীয় ...র মধ্যে বর্ত্তমান ও তাহাদের ভিত্তি। ইহা বহুরূপে প্রকাশিত ...লেও নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকে। বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের সদৃশ। ...হইতে যাবতীয় সত্তার উদ্ভব হয়। নাম ও রূপের সহযোগে ...কায় হইতে সম্ভোগ-কায় উদ্ভূত হয়। সম্ভোগ-কায় বিষয়ী ও ...ক্তা। এই রূপই ঈশ্বর। তিনি আদি বুদ্ধ, নাম ও রূপ কর্ত্তৃক ...ষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান, অন্যান্য বুদ্ধদিগেরও অধীশ্বর। ...ই "নির্ম্মাণ-কায়" ধারণ করিয়া মর্ত্তে অবতীর্ণ হন।

প্রত্যেক জীবের মধ্যে এই তিন কায়ই বর্ত্তমান। ধর্ম্মকায় তাহার ...তীত ভিত্তি। তাহার উপর সম্ভোগকায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভোক্তা। ...র উপর নির্ম্মাণকায়—পাপ পুণ্যেরআধার।

বুদ্ধদিগের সংখ্যা বহু হইলেও বোধিই প্রত্যেক বুদ্ধের স্বরূপ। কিন্তু নির্ব্বাণ-লাভের পূর্ব্বে প্রত্যেক বুদ্ধই স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্ব, সম্ভোগকায়সমন্বিত। বোধিসত্ত্বগণ বিভিন্ন লোকের অধীশ্বর। তাঁহারা মানবজাতির মুক্তির জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।" মহাযানিগণ গৌতম বুদ্ধের এই প্রকার এক বাণীর উল্লেখ করেন। "বহু বুদ্ধের মধ্যে আমি একজন। তাহাদের অনেকে ইতিপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেকে পরে জন্মগ্রহণ করিবেন। যখন পৃথিবীতে দুষ্কৃতি ও পাশবিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন।" "অঙ্গুত্তরনিকায়ে" আছে "ভগবান্ অনুকম্পাবশে বহু লোককে মুক্তি এবং বহু লোককে আনন্দ দান করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হন।"

ডাঃ রাধাকৃষ্ণের মতে গীতার ধর্ম্ম এবং মহাযান ধর্ম্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। গীতার ব্রহ্ম এবং মহাযানের ধর্ম্মকায় অভিন্ন। কৃষ্ণ আপনাকে "সর্ব্বলোক মহেশ্বর" বলিয়াছেন। বুদ্ধও পরমেশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি দেবতাদিগের অধীশ্বর, তিনি বোধিসত্ত্বদিগেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি যে গয়াধামে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা কল্পনা মাত্র। তিনি শাশ্বত, পরম কারুণিক। তিনি বলিয়াছেন "যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, আমি তাহাদের মঙ্গল করি। যাহারা আমাকে আশ্রয় করে তাহারা আমার সুহৃদ্।"

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সাধনার প্রারম্ভেই সংকল্প করিয়াছিলেন, যে যতদিন একটি ধূলিকণাও অবিমুক্ত থাকিবে, ততদিন তিনি নির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন না। মহাযানে অর্হত্ত্বের উপরে মুক্তির আরও দুইটি ক্রম অঙ্গীকৃত—বোধিসত্ত্বত্ব এবং বুদ্ধত্ব। বোধিসত্ত্বের বিশেষত্ব সর্ব্বজীবে —(ইতর জীব ও মনুষ্যে)—প্রসারিত অপার প্রেম। ইহা ব্যতীত বুদ্ধত্ব লাভ হয় না।

দান, বীর্য্য (তিতিক্ষা), শীল (সুনীতি), ক্ষান্তি (ধৈর্য্য), ধ্যান এবং প্রজ্ঞা—এই সকল গুণ নৈতিক জীবনলাভের জন্য প্রয়োজনীয়। সন্ন্যাসগ্রহণ মুক্তির জন্য অপরিহার্য্য নহে। বিবাহিত জীবনেও মুক্তিলাভ সম্ভবপর। দারিদ্র্য ও সংসারত্যাগ সকলের জন্য বিহিত হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুক্তির জন্য অপরিহার্য্য। নিজের শক্তিতে মুক্তিলাভ মহাযান মতে অসম্ভব। তাহার জন্য মুক্তিদাতার সহায়তা অত্যাবশ্যক। হীনযান মতে মুক্তি সকলের অধিগম্য নহে। অল্প সংখ্যক লোকই মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহাও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া। কিন্তু মহাযান মতে সকলেই মুক্তিলাভে সমর্থ। হীনযান মতে সুনীতি নিষেধাত্মক—দুষ্কৃতি হইতে নিবৃত্তি এবং মনকে কামনা এবং অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত করাই সুনীতি। মহাযানের সুনীতি বিধিমূলক—দয়া, দান প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবর্ত্ত—পাপীকে স্বীয় পুণ্যফলে দান করিয়া তাহার পাপ গ্রহণ করা—উহার অন্তর্গত। কিন্তু জগতে কিছুই যদি সত্য না হয়, সকলই যদি মায়া হয় তাহা হইলে এই পরোপকারেরই বা মূল্য কি? ইহাও তো মায়া?

নির্বাণ ঐকান্তিক নাশ নহে। বিশ্বের আত্মার সহিত মিলনই নির্বাণ—বন্ধনহীন স্বাধীন অবস্থা, অবিদ্যার অতীত অবস্থা। নির্বাণলাভের পরেও বুদ্ধগণের অস্তিত্ব থাকে। বোধিসত্ত্ব লাভের পূর্ব্বে সাধকগণ বিভিন্ন স্বর্গলোকে বাস করেন।

(পূর্বানুবৃত্তি)
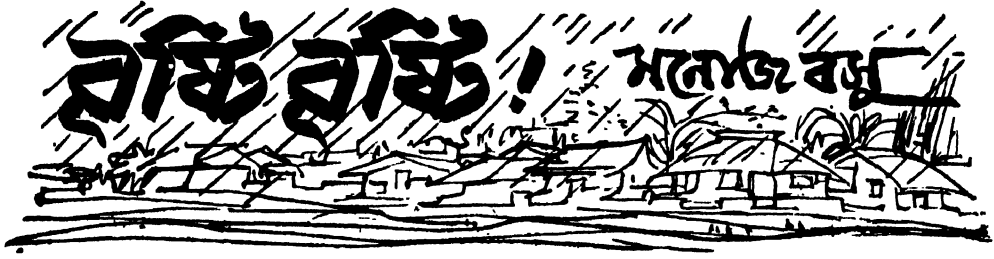
গাড়ি ছাড়ল। অরুণাক্ষ বলে, নেমন্তন্ন তো করে এলে কলকাতায় যাবার জন্য। কিন্তু আমাদেরই বাড়ি ঢুকতে দেয় কিনা দেখ।

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে ইরা বলে, কে দেবে না শুনি ?

বাবা মা—যাঁরা হলেন মালিক। দরোয়ান দিয়ে ফটক বন্ধ করে দেবেন। যাঁদের অগ্রাহ্য করে দাদুর কাছে ধর্না দিয়ে পড়লাম।

ইরা বলল, ঢুকতে তোমায় না দিতে পারেন। আমার শ্বশুর-বংশের এমন কুচ্ছো করেছ, আমি হলে কক্ষণো দিতাম না। কিন্তু আমায় কি জন্য দেবেন না, আমি তো দোষ করি নি।

হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ—ব্যাপার অত সোজা নয়। আমাকে দেখে ভেবো না বাবা-ও আমার মতন।

ইরা কৌতুক-চোখে তাকিয়ে বলে, নয়ই তো। এদ্দিন ধরে শুনেছি বাবার গল্প—ডাকাবুকো সরল মানুষ, নাম ভাঁড়িয়ে আঁধারে আবডালে কোন-কিছু করেন না। দেখ, তোমায় জানতে বুঝতে যদি দু-বছর লেগে থাকে, বাবাকে জানতে দুটো দিনও লাগবে না—এই বলে দিলাম।

অরুণ বলে, ষড়াননের চিঠিতে পেলাম আমাদের চিরশত্রু সাধন মিত্তির তোমাদের গাঙ-পারে নিয়ে তুলছে। তখন আর মাথার ঠিক রইল না। সে বিপদ কেটে গেছে, এবারে এখন পরের ভাবনা। ভেবে ভেবে থই পাচ্ছিনে ইরা—

এবারে ইরা চটে উঠল : চুপ করো বলছি। ভাবছি, কতক্ষণে দাদুর কাছে গিয়ে হাত-পা মেলে জিরোব—চারদিকে এই ঝোপজঙ্গল, আর উনি এখন ভয় দেখাতে শুরু করলেন !

তবু অরুণ কি বলতে যাচ্ছিল, ইরাবতী তর্জনী তু... বলে, চুপ ! তোমার হল কি বল তো, সারারাত এম... বকবক করবে ? আমার ঘুম পেয়ে গেছে।

অরুণ বলল, একটা-দুটো চুরুট খাই, তা তু... কৌটো-সুদ্ধ কেড়ে নিয়ে নিলে। চুরুটে মুখ আটক থাকলে কথা বেরুত না, একা একা মসগুল হ... ভাবতাম।

কাতর অনুনয় করে, দাও না গো একটা—

সে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। চুরুট পাবে না—ইরা দেবী ঘুমুবেন, দুষ্টু মানুষের মুখে চাবি পড়ে গেল এই দেখ।

আবছা অন্ধকারে নিটোল হাতখানা অরুণাক্ষের মু... চাপা দিয়ে ইরাবতী তার কোলের উপর গড়িয়ে পড়ল।

মোটরগাড়ি ছুটেছে। মেঘ কেটে গেছে, চাঁদ দে... দিয়েছে গাছপালার মাথার উপর। বৃষ্টি-ভেজা গাছপাল... জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিকমিক করছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। এক সময় অরুণ ড্রাইভারকে বলে উঠল, ওহে শুনছ ? অত জোরে চালিও না।

আজ্ঞে ? ড্রাইভার চোখ রগড়াতে রগড়াতে পিছন দিকে তাকায়।

তোমারও ঘুম ধরেছে দেখছি। এই যাচ্ছে-তাই রাস্তা, তার উপর ফুল-স্পীডে চালিয়ে দিয়েছ। নির্ঘাৎ এক কাণ্ড ঘটাবে।

ড্রাইভার একমুখ হেসে বলে, কিচ্ছু হবে না। ঠিক পৌছে দেবো।

অরুণ বলে, পৌছে তো দেবেই। কিন্তু দাদুর বাড়ি কি যমের বাড়ি, সেইটে ভাবছি। তুমি বাপু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাড়ি চালাও—বছরে কতগুলো ঘায়েল হয়, ঠিক করে বলো দিকি।

ঘাড় নেড়ে লোকটা বলে, ঐ কথাটি বলতে হবে না

দেখুন!
অর্দ্ধেকটা
সানলাইট
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে !
সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
S. 242-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

স্যার। বোশেখ মাসে একদিন খেজুরগাছে লেগে গাড়ি চিৎ হয়ে উলটে গেল, যত প্যাসেঞ্জার তক্ষুণি অমনি ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর একবার হল কি, আষ্টেপিষ্টে মেলার মানুষ বোঝাই দিইছি—

রক্ষে করো, আর একবারের কাজ নেই, তুমি এদিকে ফিরে গল্প কোরো না। ভাল বিপদ দেখছি, যতক্ষণ জেগে থাকবে পিছন ফিরে গল্প করবে। সামনে ফিরলে তো চোখ বুঁজবে অমনি।

ড্রাইভার সগর্বে বলে, চোখ বুঁজলে কি হয়, রাস্তাঘাট মুখস্থ। চোখ না মেলেই বলে দেবো, কোনখান দিয়ে যাচ্ছি—

ড্রাইভারের সিটে সহসা জোরে মাথা ঠুকে গেল অরুণের। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়েছে। বলে, নেমে পড়ুন স্যার।

কি হল ?

ঝাড়ের বাঁশ রাস্তার উপর নিচু হয়ে পড়েছে। বাঁশের মাথা একপাশে টেনে ধরুন, গাড়ি বেরিয়ে গেলে ছাড়বেন।

ইরার মাথা কোলের উপর থেকে নামিয়ে অরুণাক্ষ দরজা খুলছে সেই সময়টা সাড় হল। চোখ বুঁজে বুঁজেই ইরা জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি এসে গেল ?

আর গিয়েছে বাড়ি! গজর-গজর করতে করতে অরুণ নেমে পড়ল।

রাস্তার পাশে পগার ও জঙ্গল। সেইখানে দাঁড়িয়ে বাঁশের আগা টেনে ধরতে হবে। না-ই কপাল গুণে যদি সাপে ঠুকে দেয়, দু-চার গণ্ডা জোঁক লাগবে নিশ্চয়। ট্যাক্সি খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অরুণাক্ষ আবার গিয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে ইরার ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে বসেছে সে। বলল, আর কতদুর সাতবেড়ে ?

অনেক। সিকি পথ হয়তো এসেছি।

ওরে বাবা!

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বলে, যত দেরি হয় ততই ভাল। গিয়েই বোধহয় বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

ইরা অবাক হয়ে বলে, ওখান থেকে কলকাতায় যাব, তখনই তো দেখাসাক্ষাৎ। বাবা ওখানে আসবেন, কে তোমায় বলল ?

অরুণ বলে, আমি এক কাণ্ড করে বসেছি ইরা। ভাল করেছি কি মন্দ করেছি বুঝতে পারছি না। মাকে চিঠি দিয়েছি—বিয়ের তারিখ চার দিন পিছিয়ে লিখেছি।

ইরা বলে, বাবাকে বাদ দিয়ে মাকে লিখলে কি জন্য ?

মাকে লেখা মানেই বাবাকে জানানো। বাবার কাছে সোজাসুজি মিথ্যে লিখতে সাহস হয় না।

তারিখ মিথ্যে করেই বা লিখলে কেন ?

বাবাকে জানি—বিষম জেদি, বিয়ে বন্ধ করতে তিনি সাতবেড়ে ছুটে যাবেন। গিয়ে পড়েছেন বোধহয় এর মধ্যে, সমস্ত শুনেছেন। আমরাও যাচ্ছি। দাদামশায় দিদিমা রয়েছেন, বিশেষ করে দিদিমা—দিদিমা বড্ড রাশভারি মানুষ। তাঁরা ধরে পেড়ে মিটিয়ে দেবেন। এত সমস্ত ভেবে ঐ রকম চিঠি ছেড়েছি।

ইরাবতী গম্ভীর হয়ে বলে, অন্যায় কাজ করেছ। আমি জানলে মানা করতাম। কলকাতায় গেলে তারপরে মারুন কাটুন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বের করে দিন, তবু সে হল নিজের জায়গা। এখানে যা-ই কিছু হোক—শুধুমাত্র দাদু-দিদিমার সামনে হলেও বড় লজ্জা, বড্ড অপমান।

অরুণ সায় দিয়ে বলে, তাই মনে হচ্ছে এখন। যত কাছাকাছি হচ্ছি, ভাবনায় বুক শুকিয়ে উঠছে। কী যে হবে ইরা!

তার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গিতে ইরা হেসে উঠল। এত গম্ভীর ছিল, লহমার মধ্যে আর এক মানুষ। বলে, অত ভাবতে হবে না বীরপুরুষ মশায়। আমি না হয় এগিয়ে দাঁড়াব, কথাবার্তা ঝগড়াঝাটি আমার সঙ্গে—চুপটি করে তুমি আড়ালে থেকো আমার।

অনেকক্ষণ কাটল, কথাবার্তা নেই। আওয়াজ করে গাড়ি চলেছে। কোন এক গ্রাম—রাস্তার পাশে সারবন্দি খোড়োঘর ক'খানা। ছেলে কাঁদছে ঘরের মধ্যে। টেমি-হাতে কে-একজন বেরিয়ে এলো। বেগুনক্ষেত, আম-বাগান। গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ি বিলের ভিতর এসে গেল। জোলো হাওয়া বইছে হুহু করে। মাঠের জলে ঢেউ উঠেছে, রাস্তার গায়ে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ এসে লাগছে।

ইরাবতী খিল খিল করে হেসে ওঠে: তাই তো বলি, এমন ভাল ছেলে হয়ে চুপচাপ রয়েছ তুমি!

অরুণাক্ষ বলে ওঠে, উঁহু, ঘুমোই নি আমি।

তবে মাথা ঝুঁকে পড়ছে কেন? কি জন্যে শুনি? ভাবনার ভারে?

কেন ঝুঁকে পড়ে শুনবে? শুনতে চাও? উঃ, কী হাওয়া! মুখটা আনো ইদিকে, কাছে নিয়ে এসো, তবে তো শুনবে!

ইরা বলে, ইস—মাথা তুলবার জো নেই, দুষ্টুমিটুকু আছে বেশ!

কত রাত হল কে জানে! পশ্চিমে চাঁদ নিচু হয়ে এসেছে। তারপর অনেক দূরে ঝাপসা জঙ্গলের আড়ালে চাঁদ ডুবে গেল। রহস্যমধুর অন্ধকার।

এক সময়ে অরুণাক্ষ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। কী কাণ্ড! জল কেন গাড়ির মধ্যে? থইথই করছে জল। ইরা, ইরাবতী!

ড্রাইভার আগেই নেমে পড়ে এক-হাঁটু জলে দাঁড়িয়েছে, টর্চ জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। তারপরে রায় দিল, গাড়ি আর চালবে না। আপনারা নেমে পড়ুন স্যার।

অরুণাক্ষ রাগ করে বলে, মাঝ-সমুদ্রে নিয়ে এসে বলে নেমে পড়ুন। গাড়ি চলবে না, বললেই হল?

ড্রাইভারও সমান তেজে জবাব দেয়, ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেছে, চলবে কেমন করে?

পাকা-রাস্তা ছেড়ে বিলের ভিতর নামলে কেন?

ইচ্ছে করে নামিনি। আঁধারে দেখা যায় না, কি করব?

হেডলাইট আছে তবে কি করতে?

ড্রাইভার বিষম রাগে অরুণের হাত ধরে সামনে টেনে এনে বলল, কোথায় আছে দেখুন না। টর্চের আলো ফেলে বলে, মিছে কথা বলছি? সে ঘোড়ার ডিম জখম হয়ে আছে—আজ তিন বছর।

ভিতর থেকে ইরা বলে, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি লেগেছে। আর সওয়াল কোরো না। ডাঙায় উঠে পড়ি আগে।

অরুণ বিপন্নভাবে বলে, আমরা না হয় উঠলাম। কিন্তু জিনিষপত্রের কি হবে, বিলের ভিতর ফেলে রেখে চলে যাব?

ড্রাইভার এমনি খারাপ মানুষ নয়। সে বলল, জিনিষপত্রের ভাবনা নেই। যান আপনারা। বাক্স-বিছানা আমিই বয়ে রাস্তার উপর তুলে দিচ্ছি।

আবার বলে, রাস্তাতেই বা হা-পিত্যেশ বসতে যাবেন কেন? দু'কদম গিয়ে সিরাজকাটি—থানা আছে, থানার পাশে ডাক-বাংলা। তোফা খাট-গদি রয়েছে, রাতটুকু আরাম করে ঘুমুনগে। সকালে উঠে তিনটে টাকা ফেলে দেবেন ডাক-বাংলার চৌকিদারকে, খুশি হয়ে সে তিন বার সেলাম দেবে।

ইরা পরমোৎসাহে বলে, সেই ভাল। আমার মজা লাগছে। নেমে পড়, আর দেরি কোরো না। এই ব্যাগট্যাগগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি।

খুচরা দু-একটা জিনিষ ছিল, তাড়াতাড়ি সে হাতে টেনে নিল।

বোঝা মাথায় নিয়ে জল ছপছপ করে ড্রাইভার আগে আগে চলেছে। অরুণাক্ষ ডাকে, কই বসে রইলে কেন? সবাই তো নেমে পড়েছি। তুমি এসো—

ইরা বলে, পায়ে জুতো, যাই কি করে?

জুতো হাতে নাও। এই যেমন আমি নিয়েছি।

তবু ইরাবতী ঘাড় নাড়ে: এই যে আলতা পরিয়ে দিয়েছে আমার ইস্কুলের মেয়েরা—কত যত্ন করে পরিয়েছে, কাদা লেগে সব বিচ্ছিরি হয়ে যাবে।

হাসছে মিটিমিটি। বলে, আমি এত জিনিষ নিয়েছি তুমি কিচ্ছু নিলে না। তুমি তবে নাও আমাকে।

অরুণাক্ষ বলে, এ তো বিচার ভাল! তোমার ভার, আর তোমার হাতের ঐ সব জিনিষের ভার। সমস্ত পড়বে যে আমার উপর।

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ইরা বলে, ও—আমি বুঝি ভারবোঝা তোমার কাছে!

অরুণ ততক্ষণে টপ করে কোলের মধ্যে লুফে নিয়েছে ইরাবতীকে। এক বিচিত্র অনুভূতি, সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ক'টা দিন আগে কত দূরের ছিল একেবারে আপন এই মেয়েটি!

ইরা ফিসফিসিয়ে বলে, ধেৎ—তুমি যেন কী! ড্রাইভারটা পিছন ফিরে দেখল একবার যেন। কি ভাবছে বল দিকি! আর তুমিও চলেছ ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে—

গভীর স্নেহে অরুণ বুকের মধ্যে বেঁধে ফেলেছে। খোঁপা খুলে বিনুনি জল ছুঁয়ে যাচ্ছে। ইরা বলে, দেখ কাণ্ড! না, তোমার জ্বালায়…এ কি, সিঁদুর-টিঁদুর দিলে তো সারা কপালে লেপটে?

অরুণাক্ষ ভয় দেখায়: ঝগড়া করবে তো দিলাম ফেলে জলের মাঝখানে। দেবো? দিই?

ডাক-বাংলোয় চৌকিদার আছে বটে—ড্রাইভার বলে, হাটে হাটে মনোহারীর দোকান দেয়, এখনও ফিরেছে কি না কে জানে? পুকুরপাড়ের ঐ চালাঘরে বাসা। সকাল-বেলা ঠিক হাজিরা দেবে। ইঁদুরে-কাটা পাগড়ি আছে, আপনাদের ভদ্রলোক দেখতে পেলে একছুটে মাথায় পরে এসে দাঁড়াবে।

কামরা একটিমাত্র, তা-ও ভিতর থেকে বন্ধ। প্রায়ই তো খালি পড়ে থাকে—আজকে দায়ে পড়ে এরা এসে উঠল তো আগেই আর কারা ঘর দখল করে ঘুমিয়ে আছে। ড্রাইভারের টর্চটা নিয়ে অরুণ এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখছে। পিছনের বারান্দায় খানিকটা ঘেরা মতো জায়গা। বেঞ্চি চার-পাঁচখানা ও হাতাভাঙা চেয়ার—অর্থাৎ দিনমানে এখানে পাঠশালা বসে।

একটা বেঞ্চির উপর ইরাবতী ধপাস করে বসে পড়ল। অরুণকে অন্য একটা দেখিয়ে দেয়: ঐটে হল তোমার। খাসা জায়গা পাওয়া গেছে। আর কি, শুয়ে পড়ো এবারে।

এবং তিলার্ধ দেরি নয়, টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

অরুণাক্ষ বলে, শুয়ে পড়লে—কাপড় ভিজে জবজবে, ও সমস্ত ছাড়তে হবে না?

ঝনাৎ করে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে ইরাবতী নিশ্চিন্ত আলস্যে চোখ বুজল।

ট্রাঙ্ক খুলে উলটে-পালটে দেখে অরুণাক্ষ বলে, কি হয়েছে দেখ। ভিতর অবধি জল ঢুকে গেছে। শাড়ি একটাও শুকনো নেই, কি হবে?

ঝিকিমিকি হাসি হেসে ইরাবতী বলে, হবে আবার ছাই! শুয়ে পড়ো দিকি।

অরুণাক্ষ বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি মানুষ নও।

নই-ই তো! ঐ যে নবেলে লেখে প্রাণপ্রতিমা, হৃৎপিণ্ডেশ্বরী, সোনার পরী—ওগো বলো না শুনি, ঐ সমস্ত ভাল ভাল কথা—

দেখুন দিকি, অজানা জায়গায় এমন দুঃসময়ে কবিত্ব শুরু করল। অরুণ রাগ করে বলে, পরী না আরো কিছু! এক নম্বর হাঁদারাম—ভিজে কাপড়ে থাকলে নিউমোনিয়ায় ধরে, এই বুদ্ধিটুকু নেই।

তবু হাসছে ইরা। উচ্ছল জলতরঙ্গের হাসি—বকাবকি গালিগালাজ হাসির তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অরুণের মাথায় এক মতলব এসেছে ইতিমধ্যে। ওদিক থেকে ঘুরে কাপড় হাতে এসে বলে, ওঠা হোক। ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড়টা পরে নিয়ে কৃতার্থ করা হোক আমাকে।

চোখ মেলে ইরাবতী বলে, এই যে বললে সমস্ত কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে। কী মিথ্যুক তুমি গো!

ওধারের বারাণ্ডায় খানকয়েক কাপড় মেলে দেওয়া। কামরায় যাঁরা আছেন, তাঁরা শুকুতে দিয়েছেন।

ইরা বলে, তাই অমনি নিয়ে এলে? না না, ও হবে না। পরের কাপড় পরতে আমার ঘৃণা হয়।

অরুণাক্ষ রাগ করে বলে, জলকাদা মাখা নোংরা কাপড় পরে আছ—তাতে ঘৃণা হচ্ছে না? এ তো দিব্যি মটকার শাড়ি। আসল কথা, উঠতেই আলসেমি। যা-ই তুমি বলো, সারারাত ভিজে কাপড়ে থেকে একখানা কাণ্ড ঘটাবে সে আমি কিছুতে হতে দেবো না।

ইরা উঠে বসে বলে, বাপরে বাপ! এত শাসন শুরু করলে যাই কোথায় আমি!

উঠে গিয়ে সে কাপড় বদলে এলো। বলে, কোন লোক কি বৃত্তান্ত কিচ্ছু জানিনে। যাঁদের কাপড়, সকালে উঠে তাঁরা কি ভাববেন বলো দিকি!

উঠবার আগেই যেমনকার কাপড় মেলে রেখে দিও। তোমার শাড়িটাও শুকাতে দিয়ে এলাম, শুকিয়ে যাবে ততক্ষণে।

পূবে ফরসা দিয়েছে কেবল, ভাল করে ভোর হয়নি। ড্রাইভার ডাকাডাকি করছে, শুনছেন স্যার?

অরুণাক্ষ ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে ইরাবতী মুড়িসুড়ি দিয়ে বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে ওদিকে। দেখলে মায়া হয়। এত

প্রতাপ, অথচ একেবারে ছেলেমানুষটি! ঘুমন্ত অবস্থায় অসহায় একটি শিশুর মতন মনে হচ্ছে ইরাবতীকে। অজানা জায়গা, তা বলে এতটুকু হুঁস নেই—নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণের মতো ঘুমোচ্ছে কেমন দেখ। আহা, ঘুমোক!

ড্রাইভার বলছে, 'ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিন স্যার। সদরে রওনা হয়ে পড়ি। পায়ে হেঁটে যাব, সকাল সকাল না বেরুলে কষ্ট হবে।

তোমার গাড়ি?

ও ঘোড়ার ডিম থাকবে পড়ে জলের মধ্যে। বেরিয়ে এসে রাস্তার গতিক দেখে যান না।

বিলের জল ছাপিয়ে রাস্তার উপর দিয়ে পড়ছে, জলের তোড়ে ভেঙে গেছে বেশ খানিকটা। বাঁয়ের ঢালু বিলে গাড়ি ভাগ্যিস নেমে গেছে, নয় তো ঐ রাস্তায় ডাঙা জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়লে সবসুদ্ধ চুরমার হয়ে যেত।

ড্রাইভার বলে, হেঁ-হেঁ, কায়দাটা দেখুন আমার। কেমন আবেশে গড়িয়ে নামলাম, আপনাদের গায়ে ঝাঁকুনিটুকুও লাগল না। আর এই নিয়ে খামোকা বকাবকি করলেন। অবিশ্যি, আমিও তখন যে ভাল ঠাহর পেয়েছিলাম, তা নয়। ঘুমুই বলে দোষ দিচ্ছিলেন, ঘুমের মধ্যেও কি রকম হুঁশ থাকে দেখতে পেলেন তো? গোটা রাস্তা আমার মুখস্থ। ভাড়ার টাকাটা পুরোপুরি চাই কিন্তু স্যার।

বাড়ি পৌছলাম না, পুরো ভাড়া কি রকম?

মনিব শুনবে না। তা ছাড়া আমার কি দোষ বলুন?

তা কেন! রাস্তা ভেঙেছে সে দোষ আমার। লোকজন ডেকে গাড়ি জল থেকে তুলে অন্য কোন পথে যাবার জোগাড় দেখ। শুনেছি, ঝাঁপার বাঁওড়ের পাশ দিয়ে ঘুরপথ আছে একটা।

ড্রাইভার বলে, গাড়িই নড়বে না তার ঘুরপথ আর সোজা পথ! পেট্রোল-ট্যাঙ্কে জল ঢুকেছে। কারবুরেটার খুলে পড়ে গেছে কোথায়। খোঁজাখুঁজি করলাম, জল কমে এলে আবার দেখা যাবে। সদরে যাচ্ছি মিস্ত্রি আর মালমশলা আনতে। গাড়ি কদ্দিন অচল হয়ে থাকে ঠিক কি, ডাকবাংলোয় আপনারাই বা কতদিন পড়ে থাকবেন? আমার টাকাকড়ি চুকিয়ে দিয়ে পালকি-টালকি করে চলে যান।

ডাকবাংলোরই এলাকার মধ্যে পুকুরের ওধারে দোচালা ঘর, পালকি দেখা যাচ্ছে সেখানে। অরুণাক্ষ বলে, ঐ যে পালকি। দুটোই রয়েছে। ঠিক করে দাও না তুমি।

ভাড়া-করা পালকি স্যার। বেহারাদের সঙ্গে তামাক খেয়ে এলাম। কাল রাত্রে ভদ্রলোকেরা পালকি করে যাচ্ছিলেন, জলঝড়ের গতিক দেখে ডাকবাংলোয় উঠেছেন। এখনই আবার রওনা হয়ে পড়বেন।

ভরসা দিয়ে বলে, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? গাঁয়ের ভিতর বেহারাপাড়া। টুকটুক করে চলে যান সেখানে। পালকি দু-খানা কেন, দশখানা পেয়ে যাবেন। চলুন না হয় আমার সঙ্গে। পাড়াটা দেখিয়ে দিয়ে যাব ঐ পথে।

কামরার লোকেরা জেগে উঠেছেন। ঘুম পাতলা হয়েছে ইরাবতীর—চোখ বুঁজে বুঁজেই শুনছে ভিতরে দু-তরফের কথা। পুরুষটি বিরক্তস্বরে বলছেন, গড়গড়া সঙ্গে আনা যায় না, তা দশ-বিশটা চুরুট তো নিয়ে আসা যেতো। হরিহরের কখনো এমন ভুল হয় না।

স্ত্রীকণ্ঠের জবাব: আমি হরিহর তো নই—যে চুরুট-গড়গড়া নিয়ে পিছু পিছু ছুটব?

চুরুট আনলেই অমনি বুঝি হরিহর হতে হয়! আমি তোমার জন্য কি না করেছি! তুমি পানে দোক্তা খেতে, আমি পানই খেতাম না। শেষে তোমার খাতিরে দোক্তা অবধি অভ্যাস করে ফেললাম। মনে রাখ সে সমস্ত কথা?

আমাকেও চুরুট অভ্যাস করতে বলো নাকি?

নিরালা এই ডাকবাংলোয় আজকে এঁরা সুবিখ্যাত অম্বুজ ডাক্তার ও প্রৌঢ়া গৃহিণী সুহাসিনী নন। অনেক কালের হারাণো বয়সগুলো ঐ গাছপালা আর পদ্মভরা বিলের আশপাশে বুঝি লুকিয়ে ছিল, উড়ে এসে পড়েছে এঁদের দেখতে পেয়ে। সেকালের লঘু চাপল্য কণ্ঠস্বরে, কথাবার্তায় একটু যেন প্রলাপের ঘোর।

অম্বুজাক্ষ বলেন, তবেই হয়েছে! পথে বেরিয়েছি, নিদেন পক্ষে এক বাণ্ডিল বিড়ি সম্বল করে নিতেও যার হুঁশ থাকে না, আমার খাতিরে চুরুটের অভ্যাস করবেন তিনি! জানো তো, সকালবেলা ধোঁয়া না হলে আমার মন খিঁচড়ে যায়, কোন কিছু ভাল লাগে না।

সুহাসিনী বলেন, পথে এমনধারা পড়ে থাকবার কথা তো নয়—মোটরে রাত দশটার ভিতর নিয়ে পৌছে দিত। আগে জানব কি করে, গাছ পড়ে পড়ে পথ বন্ধ—গাড়ি চলবে না ?

হাসি পাচ্ছে ইরাবতীর। কথাবার্তায় মনে হচ্ছে সর্বনাশ হয়ে গেছে, ধোঁয়ার বস্তু ভাণ্ডারে না থাকায়। সব পুরুষ কি একরকম ? ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়ে, পুরুষেরাও তাই—নইলে বোধ করি নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বেশ্বর ঋষি-তপস্বী মানুষ—তাঁর কথা অবশ্য আলাদা। ধোঁয়া টানবার উপায়ও ছিল না তাঁর, কাগজপত্রে পাছে আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ে।···আবার ঘুম একটু গভীর হয়েছে, তড়াক করে সে উঠে বসল। কথা কাটাকাটি নয় এবারে, রীতিমত সোরগোল। দু-জনে ওঁরা বাইরের বারান্দায়। গিন্নি উত্তেজিত স্বরে বলছেন, শাড়ি চুরি হয়ে গেছে। বললাম, ঘরের মধ্যে যদ্দূর শুকোয় শুকোক, চোর-ছ্যাচোড়ের দেশ—তুমি আমল দিলে না। মটকার এমন শাড়িখানা আমার !

ইরাবতী উঠে দাঁড়িয়েছে। সর্বনাশ, ওঁরা এইদিকেই আসছেন যে ! মটকার শাড়ি এখনো তার পরণে। এমনি রাগ হতে লাগল অরুণাক্ষর উপর ! আচ্ছা মানুষ—ঘোর থাকতে উঠে নিজে কোন দিকে বেরিয়েছে, যাবার আগে তাকে ভাল করে ডেকে তুলে দিয়ে যেতে হয় !

ইরাবতীর সামনে এসে সুহাসিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তুমি কে বাছা ?

ইরাবতী হাসবার মতো ভাব করল। বলে, এক জায়গায় যাচ্ছিলাম ; পথ-ঘাট ভেসে গেছে, এইখানে আশ্রয় নিয়েছি। আপনাদেরই মতো—

সুহাসিনী বললেন, সে তো বুঝলাম। কিন্তু ঐ কাপড় পরে আমি ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করি। তোমায় চিনিনে জানিনে, কোন জাত কি বৃত্তান্ত ঠিক-ঠিকানা নেই—মটকা পরে দুর্গাঠাকরুণ হয়ে বসেছ কোন বিবেচনায় শুনি ?

কথার ধরণে এমন অবস্থায়ও হাসি পেয়ে যায়। প্রগল্‌ভ কণ্ঠে ইরা বলে, জাতে আমরা মুচি। চেহারায় ঠিক ধরতে পেরেছেন। কিন্তু মটকা-গরদ ছোঁয়াছুঁয়িতে মরে না বলেই তো শুনেছি—

কাপড় পেয়ে গেছ ? কার সঙ্গে কথা হচ্ছে ?

বলতে বলতে অম্বুজাক্ষও চলে এলেন এদিকে। বলছেন, তাই তো বলি, পুরানো কাপড় কে আবার চুরি করতে আসবে ? মিথ্যে খানিক চেঁচামেচি—বয়স হয়ে চেঁচানো তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুহাসিনী বললেন, ঐ কাপড় আমি ছুঁতে যাবো ? উঠোনের কাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেবো না ? চুরি আর কাকে বলে ?

এইবার, বোধ করি পুরুষের সামনে হচ্ছে বলেই, ইরাবতীর চোখে-মুখে যেন আগুন ধরে গেল। পুরাণো-দিনের অভিমানী ইরা। বলে, কাপড় আপনার ফেলতে হবে না, আমিই ফেলে দিচ্ছি।

ছুটে আড়ালে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে আগের দিনের কাপড়টা পরল, বাক্স খুলে এক মুঠো টাকা নিয়ে ঝনঝন করে ফেলে দিল ওঁদের সামনে। বলে, ক'টাকা দাম, নিয়ে নিন। আর লাগবে ? কত লাগবে বলুন—

গতিক দেখে ওঁরা হতভম্ব। শেষে অম্বুজাক্ষ বিরক্ত স্বরে বললেন, এটা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি। অন্যায় করবে আবার চোখ রাঙাবে, দুটো কখনো এক সঙ্গে চলে না।

অধীর কণ্ঠে ইরাবতী বলে, অন্যায় করিনি আমি। কক্ষণো না।

না বলে পরের জিনিষ নিয়ে নিয়েছ, খুব ন্যায়সঙ্গত হল বুঝি ?

ইরা বলে, দরজায় খিল এঁটে আপনারা অঘোর ঘুমে ঘুমোচ্ছেন, বলি কেমন করে ? রাত দুপুরে জলে ভিজে এদিকে হি-হি করে মরছি।

বলতে বলতে দু-চোখ জলে ভরে গেল। বলে, ঐ রকম ভিজে কাপড়ে থাকলে নিউমোনিয়ায় ধরত, তাই থাকা আমার উচিত ছিল। বুঝতে পারিনি।

চোখের জল এবং এই রকম রোগের কথাবার্তায় ডাক্তার অম্বুজাক্ষ মনে মনে বিচলিত হলেন। সুহাসিনীকে বললেন, যা-ই বলো, না জেনে-শুনে তোমার কিন্তু অমন করা ঠিক হয়নি।

সুহাসিনী ভয়ে ভয়ে তাকালেন একবার ইরার দিকে। বললেন, তুমি তো আমারই দোষ দেখবে ! জিজ্ঞাসা করে

দিকি, আমায় কিছু খুলে বলেছে ও-মেয়ে? আমি বেকুব হবো, গালি খাবো—এই সকলে চায়।

এদিকে আবার কণ্ঠ ভিজে আসে। অম্বুজাক্ষ বিব্রত হয়ে বললেন, এই দেখ, গালি আবার কখন কে দিল তোমায়? ঐ যা বললাম, সকালবেলাতেই মন খিঁচড়ে আছে—কোন দিকে আজ সুবিধা হবে না। যে জায়গায় যাচ্ছি, সেখানেও খণ্ডপ্রলয় বেধে না যায়।

ইরাবতী গটগট করে গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলল। চুরুটের কৌটো নিয়ে এসে বলে, এই নিন। প্রলয়ে কাজ নেই, মন ঠাণ্ডা করুন গে বসে বসে।

চুরুট দেখে অম্বুজাক্ষের মুখ হাসিতে ভরে গেল।

বাঃ বাঃ, বাঁচালে মা। এই এক বেয়াড়া অভ্যাস, গড়গড়া-হুঁকো, নিদেন পক্ষে চুরুট-সিগারেট—একটা কিছু চাই-ই সর্বক্ষণ। যারা সর্বদা কাছে পিঠে থাকে, তারা ভুলে মেরে দেয়। কিন্তু তুমি এ খবর জানলে কেমন করে? আর এমন খাঁটি জিনিষ পেলেই বা কোথায় হঠাৎ?

মহানন্দে চুরুট ধরিয়ে হাতল-ভাঙা এক চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সুহাসিনীকে উদ্দেশ করে বললেন, তিরিশ বছর ঘরবসত করেও তোমার হুঁশ থাকে না, আর ঐ এক ফোঁটা মেয়ের বিবেচনাটা দেখ। দেখে শিখে নাও।

ইরাবতী খর কণ্ঠে বলে, ঝগড়ায় আর দরকার নেই। তার চেয়ে ঠাণ্ডা মনে ভেবে বলুন, মটকার শাড়ি পরার জন্মে কি খেসারত আমায় দিতে হবে।

বলে সে উঠানে নেমে গেল। ডাকবাংলোর চৌকিদার অদূরে দাঁড়িয়েছিল, হাত-মুখ নেড়ে কি বলছে তাকে। চেয়ারে বসে অম্বুজাক্ষ চুপচাপ ধোঁয়া ছাড়লেন খানিকক্ষণ। তারপরে একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার প্রান্তে এসে বেহারাদের উদ্দেশে হাঁকডাক শুরু করলেন: ওহে সর্দার, কী ব্যাপার তোমাদের? পালকি নিয়ে এসো এদিকে, রওনা হওয়া যাক। দেরি করছ কেন তোমরা?

সর্দার-বেহারা এসে বলল, চার জন মাত্তর আছি হুজুর। গাঁয়ে আমাদের স্বজাতি রয়েছে, সবাই বলল, সেখানে গিয়ে আরাম করে শুইগে। চার জনে আমরা পালকি পাহারায় থেকে গেলাম। রাত পোহালেই এসে পড়বার কথা, এখনো কারো দেখা নেই। ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে কোথাও পড়ে রইল কিনা সন্দ হচ্ছে। আমি না হয় ছুটে ওদের তাড়িয়ে তুড়িয়ে নিয়ে আসি।

দলে পড়ে তুমি আবার ব্যোম-ভোলানাথ হবে না তো? বুঝো সেটা সর্দার!

ঘাড় নেড়ে সর্দার-বেহারা ছুটে বেরুল। একটা চুরুট শেষ করে অম্বুজাক্ষ দু-নম্বর ধরালেন। প্রসন্ন কণ্ঠে ডাক দিলেন, এদিকে আসবে একটু মা-লক্ষ্মী?

ইরাবতী এসে দাঁড়াল।

তোমার সঙ্গে কে যাচ্ছেন? মানে, আর কাউকে দেখছি না কিনা!

তিনি পালকির জন্মে বেরিয়েছেন। আমি ঘুমুচ্ছিলাম, এখানকার চৌকিদারকে বলে কয়ে গেছেন। ঐ যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল, আমি কথা বলছিলাম—সেই হল চৌকিদার। আমাদের ট্যাক্সি, ঐ যে দেখুন না, ঐ বিলের ধারে জল খাচ্ছে।

খিল খিল করে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছল হাসি হেসে উঠল।

অম্বুজাক্ষ মুগ্ধ চোখে চেয়ে বললেন, এমনি তো খাসা মানুষ! বুদ্ধি-বিবেচনাও খাসা। কেবল ঐ পলকে পলকে মেজাজ বিগড়য়। রাগটা কম কোরো মা, সুখে থাকবে।

দরজার ওধারে সুহাসিনা ফোঁস করে ওঠেন: তুমি আর উপদেশ দিও না। যত হেনস্তা তোমারই জন্মে। নিজের পেটের মেয়ের মতো—সে কি না মুখের উপর টাকা ছড়িয়ে দেয়, শাড়ি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে!

অম্বুজাক্ষ বলেন, কিন্তু আমার দোষটা কি হল?

দোষ তোমার নয়? ছেলের বিয়ে—তা বন্দুক নিয়ে কোন লজ্জায় বিয়ে-বাড়ি ছুটলে শুনি? মেয়েওয়ালার জাতকুল মজাবে? আমি তখন আর কি করব—

ইরার দিকে এক ঝলক অগ্নিদৃষ্টি হেনে কথা শেষ করলেন: নইলে বয়ে গেছে আমার পথে বেরিয়ে শতেক অপমান সইতে!

ইরাবতী চমকে যায়। একবার অম্বুজাক্ষের দিকে একবার সুহাসিনীর দিকে দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। ভালমানুষের ভাবে প্রশ্ন করে, ছেলের বিয়েয় অমত বুঝি আপনাদের? মেয়ে খুব খারাপ?

সুহাসিনী বলেন, সত্যিকার ভালো মেয়ে ক'টা আর

পাওয়া যায়—তোমার মতন মেয়ে ক'জন ? খারাপ মেয়ে তা বলে পড়ে থাকে না তো! খারাপ কি ভাল, কোন কথাই ওঠেনি—মেয়ে আমরা চোখে দেখিনি এখনো।

অম্বুজাক্ষও কৈফিয়তের ভাবে বলে ওঠেন, টাকা-কড়ির খাঁইও নেই আমার! কিন্তু যারা আমার বংশ ধরে গালিগালাজ করে—তা-ও দু-দশজনের কাছে নয়, কাগজে ছাপিয়ে দেশের দশের মাঝে ঢাক পিটিয়ে—

সুহাসিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তারই জন্য তুমি বন্দুক নিয়ে ছুটবে ?

অম্বুজাক্ষের দিকে চেয়ে লঘুকণ্ঠে ইরা প্রশ্ন করে, গুলি করতে যাচ্ছিলেন ? কাকে করতেন—মেয়েটাকে বোধ হয়। পরের মেয়ে—সেইটেই সুবিধা—নিজেদের তো কেউ নয়!

সুহাসিনী বলেন, রাগ হলে উনি সব পারেন মা, সে চেহারা তো দেখনি! আমিই কেবল সারাজন্ম ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে গেলাম। তোমার মতো একটি রণরঙ্গিণী ঘরে আনতে পারতাম, সে-ই ওঁকে জব্দ রাখতে পারত। দেখলে না, চুরুট নিয়ে কি রকম সুড়সুড় করে গিয়ে বসলেন!

সর্দার-বেহারা দলবল নিয়ে এতক্ষণে ফিরে এলো। পালকি দুটো বারান্দার সামনে এনে রেখেছে। এইবারে রওনা হবেন এঁরা। ইরাবতী কোন দিকে গিয়েছিল, চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। এক হাতে দুটো বাটি, আর হাতে কেটলি। কেটলির নল দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। চৌকিদার ঝাড়ন দিয়ে বারাণ্ডার টেবিলটা ঝেড়ে পুঁছে দিচ্ছে।

অম্বুজাক্ষ বললেন, আমি চা খাইনে। তুমি হয়তো ভাববে, হাতে খেতে চাচ্ছিনে। ওসব বায়নাক্কা ওদিকের, আমি কিচ্ছু মানিনে। সত্যি বলছি, চায়ের অভ্যাস নেই আমার।

ইরা বলে, চা নয়, দুধ। পাশেই গোয়ালাবাড়ি—চৌকিদারের কাছে শুনে তাকে দিয়ে দুধ আনিয়ে নিয়েছি। কেটলি-বাটি খুব ভাল করে ধুয়েছি।

অম্বুজাক্ষ এক গাল হেসে হাত বাড়ালেন: দাও, দাও—আর বলতে হবে না, অমৃতে আবার অরুচি! আচ্ছা মা, কি করে টের পেলে এখানে এক বুড়ো-খোকা এসেছে, সকালে পেটে কিছু না পড়া পর্যন্ত খালি ছটফট ক বেড়ায়।

ইরাবতী হাসতে লাগল। আর এক বাটিতে দুধ ঢে সুহাসিনীকে বলল, আপনি খাবেন না? অজাত-কুজ নই আমি, সত্যি কথা বলছি—

সুহাসিনী গম্ভীরমুখে বললেন, রোসো, ইষ্টমন্ত্র আউড়ে নিই তাড়াতাড়ি। এত সকালে আমি কি খাইনে। কিন্তু সেকথা বললে এক্ষুণি তো বাটি সুদ্ধ ছুঁ ফেলে দেবে। তার কাজ নেই। খাচ্ছি আমি, এক দেরি করো—

পালকিতে উঠতে যাবেন, এমন সময় ষড়াননে দেখা গেল—হনহন করে সে রাস্তা দিয়ে চলেছে অম্বুজাক্ষ ডাকেন, শোন শোন, ওদিকে কোথা যাচ্ছ গোমস্তা মশায় ?

ষড়ানন উঠানে এসে পায়ের ধুলো নিল।

কোথায় চলেছ এত ব্যস্ত হয়ে ?

ষড়ানন আমতা-আমতা করে বলে, দত্তমশায় আমায় সাতবেড়ে টেনে টুনে নিয়ে এলেন। তাঁর হুকুম হেল করি কেমন করে? ঘোর থাকতে তিনিই আবার রওনা করে দিলেন, বর-বউয়ের পাত্তা নেই—দেখে এসো, বৃষ্টিজলে হয়তো বা রওনাই হতে পারেনি।

বর-বউ ? বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে ?

ষড়ানন দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নির্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম হয়ে গেল মঙ্গলবারের দিন।

অম্বুজাক্ষ বোমার মতো ফেটে পড়লেন: আমাদের তারিখ লিখেছে শুক্রবার। ভাঁওতা দিয়েছে। কুকুর-বিড়ালের সামিল ভেবেছে আমাদের, মজা করেছে।

সুহাসিনীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া হবে না। কক্ষণো না। চুকে-বুকে গেছে, তখন আর গরজই বা কি ? পালকি ফিরিয়ে নিয়ে যাক স্টেশনে।

ষড়ানন বলে, আজকে ফুলশয্যা। তাই তো দত্তমশায় ব্যস্ত হয়ে আমায় পাঠালেন।

অম্বুজাক্ষ বললেন, আমার বাড়িমুখো কখনো যেন না হয়। ভাল করে সমঝে দিও ষড়ানন। বাড়ি গেলে জুতো মেরে তাড়াব ঐ বউ সুদ্ধ—

সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ, ইরাবতী ঐ বারান্দায়

গিয়েছিল, এই সময়টা এসে পড়ল।—বউ যে ঐ! ষড়ানন জিভ কাটে। কথা ঠিক তার কানে গিয়েছে। সামলে নেবার ভাবে তবু তাড়াতাড়ি সে বলে, এই যে—এখানে তোমরা? দত্তমশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ছোটবাবু কোথায়?

ইরা কিন্তু হাসছে। ষড়াননকে আমল না দিয়ে অম্বুজাক্ষের দিকে চেয়ে বলল, বউকে জুতো মারবেন কেন বাবা, বউ তো কিছু করেনি। বউয়ের বাবাও কিছু করেনি, আপনারা ভুল জেনে বসে আছেন।

স্তম্ভিত হয়ে আছেন এঁরা, কথা বলার শক্তি নেই। ইরাবতী বলতে লাগল, আমার বাবা ঐতিহাসিক—তথ্য খোঁজা তাঁর কাজ। গালিগালাজ দেবার লোক তিনি নন। 'যুগচক্রের' গালি অন্যলোকের। আমি ধরিয়ে দেবো—যা-কিছু করতে হয়, সেই মানুষকে করবেন।

'যুগচক্রের' নামে ষড়াননের জরুরি কথাটা মনে পড়ে যায়। বলে, ইলেকসনে নাম দেবার সময় কিন্তু এসে গেছে। আসছে হপ্তায়। সঠিক তারিখ জানেন তো ডাক্তারবাবু? নয় তো জেনে নিন। সাধন মিত্তিরের একটা লোক আমায় বলল, ঐ ব্যাপারে তিনি সদরে চলে যাচ্ছেন।

অম্বুজাক্ষ ম্লানকণ্ঠে বললেন, আমি দাঁড়াচ্ছি না—সাধন এমনিই হয়ে যাবে।

ইরা বলে, দাঁড়াবেন না কেন বাবা?

কাশীশ্বরের নাতিকে ও-তল্লাটের কে ভোট দেবে? রামনিধির ফাঁসির কারণ যে কাশীশ্বর।

ইরা জ্বলে উঠল, রামনিধির নাতি হলেন আমার বাবা। তাঁর সবচেয়ে বড় আপনজনকে ও-তল্লাটের কোন লোক ভোট না দেয় দেখব।

সুহাসিনীর কাছে গিয়ে ইরা বলল, মুশড়ে পড়লে হবে না, বুঝিয়ে বলুন। নইলে আমার বাবার নামে দোষ থেকে যাবে। কাশীশ্বর সেকালে কি করেছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা মাথা ফাটাফাটি করুন গে। কিন্তু মণিরামপুরের লোক কানা নয় মা, একালে তারা দেখছে হতকুচ্ছিৎ মেয়েটার দায় উদ্ধার করে আমার মা-বাপের কত বড় দুর্ভাবনা ঘুচালেন আপনারা।

গলা ধরে আসে। সুহাসিনী তাড়া দিয়ে উঠলেন: তুমি হতকুচ্ছিৎ? খবরদার বলছি, আমার বাড়ির বউয়ের মিথ্যে নিন্দে করবে না। রক্ষে রাখব না।

বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। বললেন, ও সমস্ত পরের কথা মা—সাতদিন তো সময় আছে, পরে ভাবা যাবে।

কামরার ভিতর নিয়ে চললেন সুহাসিনী। একটিমাত্র ছেলে, তার এই বউ। দেখবেন মুখখানা তুলে ধরে। শাশুড়ী বউয়ের নিরালা কথাবার্তা দু-দশটা। সবুর সইছে না।

অম্বুজাক্ষ নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে নিলেন। ধোঁয়া ছাড়ছেন পথের দিকে তাকিয়ে। একবার বলে উঠলেন, অরুণটা গিয়েছে তো গিয়েছে! হতভাগা ছেলে কোনও একটা কাজ যদি চটপট সারতে পারে! এক কাজ কর ষড়ানন। বেলা চড়ে যাচ্ছে—দুটো পালকি তো রয়েছে, শাশুড়ী-বউকে পৌঁছে দাও সাতবেড়েয়। শ্বশুর মশাইকে খবর দাওগে, অরুণ পালকির জোগাড়ে গেছে—এসে পড়লে আমরা সেই পালকিতে যাবো।

একটু পরে অরুণাক্ষকে দেখা গেল। বাপকে দেখে সে হকচকিয়ে গেছে, সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল। অম্বুজাক্ষ ডাকলেন, পেয়েছিস পালকি?

এবেলা ক্ষেতের কাজে যাচ্ছে বেহারারা। ওবেলায় হবে।

অত দেরি চলবে না। চুলোয় যাকগে। পায়ে হেঁটেই যাবো সাতবেড়ে। এই তো ষড়ানন এলো. আড়াই ক্রোশ মোটে এখান থেকে। আমি বুড়োমানুষ যাচ্ছি, আর নবাবনন্দন তোমার পালকি লাগবে? চলে এসো পালকির পিছু পিছু।

শেষ
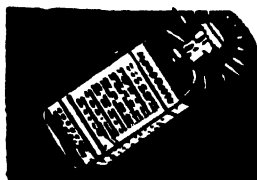
বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

মিশরের বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের আক্রমণ সাত দিন চলিবার পর গত ৬ই নভেম্বর স্যার এন্থনী ইডেন বৃটিশ কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা যুদ্ধ-বিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ইঙ্গ-ফরাসী ছত্রীবাহিনী সুয়েজ খালের উত্তর প্রবেশদ্বার পোর্ট সৈয়দে অবতরণ করিয়াছিল। স্যার এন্থনীর ঘোষণার পূর্ব্ব দিন সোভিয়েট রুশিয়া অবিলম্বে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইস্রাইলকে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলে। বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে এই বলিয়া সে ভীতি প্রদর্শন করে যে, দুর্ব্বল মিশরের প্রতি তাহারা যেরূপ বর্ব্বর আক্রমণ চালাইতেছে, প্রবলতর শক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে উহা অপেক্ষা বহুগুণ প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে পারে ; ইস্রাইলকে বলা হয় যে, মিশরের বিরুদ্ধে এই ঔদ্ধত্যের জন্য তাহার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। বস্তুতঃ, সোভিয়েট রুশিয়ার লিপিতে এইরূপ ইঙ্গিত ছিল যে, মিশরের বিরুদ্ধে আক্রমণ যদি অবিলম্বে বন্ধ না হয়, তাহা হইলে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধিবার ঝুঁকি লইয়াই সে মিশরকে সাহায্য দানে অগ্রসর হইবে। ইহার পরই প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বৃটেন ও ফ্রান্সকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য কঠোর নির্দেশ দেন ; সে নির্দেশ উপেক্ষা করা ইডেন-মলে কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী—

বৃটেন ও ফ্রান্সের আক্রমণ আরম্ভ হইবামাত্র জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহা বৃটেন ও ফ্রান্স প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদের প্রধান বক্তব্য ছিল যে, সুয়েজ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য জাতি সঙ্ঘের পক্ষ হইতে পুলিসী তৎপরতার ব্যবস্থা না হইলে তাহারা আক্রমণ বন্ধ করিতে পারে না। ইহার পর গত ৫ই নভেম্বর জাতি-সঙ্ঘ মধ্য-প্রাচ্যে শান্তি রক্ষার জন্য আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আক্রমণকারী শক্তি তিনটিকে মিশরীয় এলাকা হইতে অবিলম্বে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেন। সোভিয়েট রুশিয়ার হুমকিতে এবং আমেরিকার চোখ রাঙানীতে আক্রমণ বন্ধ করিলেও সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে ইঙ্গ-ফরাসী ধুরন্ধররা এখন নানারূপ টালবাহানা করিতেছেন। প্রথমে তাঁহারা আবদার ধরিয়াছিলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনীতে তাঁহাদের সৈন্য রাখিতে হইবে। আক্রমণকারীর এই অন্যায় আবদার স্বভাবতঃ রক্ষিত হয় নাই। তাহার পর তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জাহাজ ডুবিয়া সুয়েজ খালে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং সুয়েজ অঞ্চলে আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী "কার্য্যকররূপে" নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা সৈন্য অপসারণ করিতে পারেন না। জাতি-সঙ্ঘ এই আবদারও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু সৈন্য অপসারণে আক্রমণকারীদের দীর্ঘসূত্রতা এখনও চলিতেছে।

বৃটেনের উভয় সঙ্কট—

সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার পর হইতে খালের উপর আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্স মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। নানাভাবে মিশরকে চাপ দিয়া সে বিষয়ে সফল হইবার সম্ভাবনা যখন দেখা গেল না, তখন তাহারা মিশরকে খালের কর্তৃত্বে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং এই আন্তর্জ্জাতিক জলপথে "কার্য্যতঃ" আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার জন্য সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হয়। পরিকল্পনা ছিল—তড়িৎ গতি সামরিক অভিযানের দ্বারা বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য সুয়েজ অঞ্চল অধিকার করিবার পর অন্যান্য শক্তির সহযোগিতায় লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে "আঠার শক্তির" কায়িক কর্তৃত্ব খালের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ; তাহার পর মিশরকে সেই "সজ্ঘটিত ব্যবস্থা" মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইবে। এই পরিকল্পনায় প্রথম বাধা ঘটে পোর্ট সৈয়দে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য অবতরণ করিবামাত্র যুদ্ধের বিরতিতে। তবু খালের উত্তর মুখে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ায় উদ্দেশ্য আংশিক সফল হইয়াছিল। ইহার পর আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনীতে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য থাকিবার আবদার প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ইডেন-মলের পরিকল্পনায় দ্বিতীয় বাধা ঘটে। এখন জাতি-সঙ্ঘের নির্দেশে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য যদি বিনাসর্ত্তে সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এই অভিযানটা একেবারেই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। অভিযানের নৈতিক পরাজয় তো হইয়াছেই ; বাস্তব ক্ষেত্রেও পরাজয়টা ইহাতে সুসম্পূর্ণ হয়। বৃটিশ জনসাধারণ কোনও দিনই মিশর-অভিযান সমর্থন করে নাই। বিনাসর্ত্তে যদি লেজ গুটাইয়া সরিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে বৃটিশ রক্ষণশীল দলের নিকটও অভিযানের কোনও কৈফিয়ৎ আর থাকে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ রক্ষণশীল দলের জন পঞ্চাশ এম-পি (ইহারা সুয়েজ গ্রুপ নামে পরিচিত) মিশর অভিযানের এই মান-বাঁচানো ফলটুকু ত্যাগ করিতে কিছুতেই রাজী নহেন। বৃটিশ সৈন্য যদি অবিলম্বে মিশর ছাড়িয়া আসে, তাহা হইলে ইহারা রাগ করিয়া রক্ষণশীল মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন প্রত্যাহার করিতে পারেন এবং তাহার ফলে বৃটেনে রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটাও অসম্ভব নয়। এক দিকে এই অবস্থা, অন্য দিকে মিশর অভিযানে বৃটেনের ১৫ কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, সুয়েজ খালের পথ বন্ধ হওয়ায় দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে ; সর্ব্বোপরি

মধ্য প্রাচ্য হইতে পেট্রল আমদানী একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে পেট্রোলের "রেশন" ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে' বৃটেনেও পেট্রোলের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মিশর অভিযানের ফলে সমগ্র আরব জগতে বৃটেনের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে; সর্ব্বোপরি, আমেরিকার সহিত বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্পর্ক চিড় খাইয়াছে। এই সঙ্কট অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী স্যর এন্থনী ইডেন (রাজনৈতিক) অসুস্থতার জন্ম সাময়িকভাবে বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন মিঃ বাটলার।

বৃটেন ও ফ্রান্স সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বেই মিশর-বিরোধী সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে সুয়েজ খাল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রস্তাবে বৃটেন ও ফ্রান্স শেষ পর্য্যন্ত মার্কিণনীতি মানিয়া লইয়া তিনটি শক্তির মধ্যে ঐক্য দেখাইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্ভাবিত সামরিক অভিযান সম্পর্কে তাহারা আমেরিকাকে কিছুই জানায় নাই। তাহারা জানিত যে, আমেরিকা এই ধরণের তৎপরতা সমর্থন করিবে না। তবে, তাহাদের মনে ভরসা ছিল—শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। পাশ্চাত্য শিবিরের এই প্রধান দুইটী শক্তির সহিত আমেরিকার বিরোধের অর্থ গত সাত বৎসরের সোভিয়েট-বিরোধী নীতির ব্যর্থতা। এই বিরোধ যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে আতলান্তিক চুক্তি সংস্থা ভাঙ্গিয়া যায়, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে "গায়ের জোরের" (position of strength) নীতি ব্যর্থ হয়। ইডেন্-মলে কোম্পানীর এই হিসাবে ভুল হয় নাই; তবে, তাঁহারা আইসেন্‌হাওয়ার নামক ব্যক্তিটি সম্বন্ধে হিসাবে একটু ভুল করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির রাজনৈতিক দৃষ্টি সোভিয়েট-বিরোধিতার উগ্রতায় আচ্ছন্ন নয়। তিনি জানেন যে, আমেরিকার সহিত সম্প্রীতি রক্ষার গরজ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের অনেক বেশী। তাহাদের দুষ্কৃতির সমর্থন যদি আমেরিকা না করে,—ইহার জন্ম তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইতে সে বাধ্য করে, তাহা হইলেও আমেরিকার মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আমেরিকার সহিত বৃটেন্ ও ফ্রান্সের বিরোধ স্থায়ী হইতে পারে না। অথচ, বৃটেন ও ফ্রান্সের দুষ্কৃতির বিরোধিতায় আমেরিকার নৈতিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে: অ-কম্যুনিষ্ট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির নিকট আমেরিকার মর্য্যাদা সম্প্রতি ক্ষুণ্ণ হইতেছিল; তাহা পুনরুদ্ধারের ইহাই সুযোগ। ইহা ছাড়া, আরব জগতে সোভিয়েট প্রভাবের অবাধ বিস্তৃতি রোধের উপায়ও ইহাই; আমেরিকা যে অন্যায় সমর্থন করে না, এবং আরবদের সে শত্রু নয়, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে। ইডেন্-মলে কোম্পানীর দুর্ভাগ্য—ঠিক এই সময় মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ অসুস্থ হইয়াছেন; আইসেন্‌হাওয়ারের অনুসৃত নীতিতে সোভিয়েট-বিরোধী উগ্রতার "ব্রেক" আর নাই। "With Mr. Dulles now recuperating in Key West, Mr. Eisenhower's personality is making itself felt as never before in the conduct of America's foreign relation. (New Statesman and Nation) প্রেসিডেন্ট আইসেন্‌হাওয়ার এই সম্পর্কে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন যে, জাতি-সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে মানিতেই হইবে। মধ্য-প্রাচ্যের পেট্রল সরবরাহ বন্ধ হইবার পর তৈলপিপাসু বৃটেন ও ফ্রান্স এখন স্বভাবতঃ অতলান্তিক মহাসাগরের অপর পারে আকুলভাবে তাকাইতেছে। কিন্তু আইসেনহাওয়ারের নির্দ্দেশ,—মিশর হইতে সৈন্য সরাইয়া না আনিলে আমেরিকার পেট্রল এই দুইটি রাষ্ট্রে পৌছিবে না। তাঁহার আর একটি সিদ্ধান্ত—সুয়েজ খালকে বাধামুক্ত করিবার কাজে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহযোগিতা লওয়া হইবে না। বৃটেন ও ফ্রান্সের মতলব ছিল—খাল পরিষ্কার করিবার কাজে সহযোগিতা করিবার অছিলায় সুয়েজে কতকটা কর্ত্তৃত্ব তাহারা রাখিবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সে সুযোগ দিলেন না; বিনা সর্ত্তে জাতি-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে হইবে—ইহাই তাঁহার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নীতি। বলা বাহুল্য, শেষ পর্য্যন্ত বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর হইতে বিনা সর্ত্তে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য হইবে: মিশর অভিযান সম্পর্কে "ইকনমিষ্ট" পত্রিকার এই মন্তব্যই অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইবে—"......This country has suffered a total and unmitigated defeat."

হাঙ্গেরি—

হাঙ্গেরিতে নাগী মন্ত্রিমণ্ডল অপসারিত হইয়াছেন। কাদারের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে; তবে পূর্ব্বের দুই এক জন মন্ত্রী নূতন মন্ত্রিমণ্ডলে রহিয়াছেন। এদিকে জাতি সঙ্ঘে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, হাঙ্গেরির পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য জাতি-সঙ্ঘের প্রতিনিধি-মণ্ডলকে ঐ রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক। কাদার গভর্ণমেণ্ট এখনও এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। সোভিয়েট সেনাবাহিনীও হাঙ্গেরিতে রহিয়াছে। বহুসংখ্যক বিদ্রোহী হাঙ্গেরিয়ানকে রুশিয়ায় নির্ব্বাসিত করিবার অভিযোগ শোনা যাইতেছে।

হাঙ্গেরির প্রকৃত অবস্থা এখনও অস্পষ্ট। তবে, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, গত এগার বৎসর হাঙ্গেরিতে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ ছিল, তাহার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। ষ্ট্যালিন-আমলের কঠোর ব্যবস্থার জন্য সে অসন্তোষ এতদিন বাস্তবক্ষেত্রে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ষ্ট্যালিন্-নীতি পরিবর্ত্তিত হইবার পর এই গণ-বিক্ষোভ এখন প্রকাশিত হইয়াছে; কারণ কর্ত্তৃপক্ষের নীতি এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়াছিল। হাঙ্গেরির গণ-অভ্যুত্থান খুবই ব্যাপক; শ্রমিক শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইহাতে সর্ব্বতোভাবে যোগ দিয়াছিল। সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, গণ-অভ্যুত্থানের পশ্চাতে বাহিরের উস্কানি ছিল। এই সম্পর্কে 'নিউ ষ্টেটসম্যান্ এণ্ড নেশন' পত্রিকার বার্লিনস্থিত সংবাদদাতার একটি রিপোর্ট উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "The Free Democratic Party has complained to the Government against Radio Free Europe, which broadcasts from Munich, for sending messages to Hungary

which asked the people to fight on because foreign succour was on its way. The Sueddeutsche Zeitung places responsibility for bloodshed in Hungary upon these broad-casts, and suggests that the radio station should be removed from German territory." আমেরিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত এই "রেডিও ফ্রি ইউরোপ" বহুদিন যাবৎ পূর্ব্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। সেই রেডিওর এই প্রচারের সহিত বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্রও হাঙ্গেরিতে গিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সামন্ততান্ত্রিক আমলের যে শ্রেণীটি হাঙ্গেরিতে কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত ও স্বার্থ ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদের অনুচররা স্বভাবতঃ এই সুযোগে তৎপর হয় এবং কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এইভাবে হাঙ্গেরিতে কমুনিজমের মূলচ্ছেদ হইয়া আবার পুঁজিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াই সোভিয়েট বাহিনী একবার অপসারিত হইবার পর দ্বিতীয়বার এখানে নিযুক্ত হইয়াছে। হাঙ্গেরির গণ-অভ্যুত্থানে বাহিরের প্ররোচনা ও সহযোগিতা থাকিলেও ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, গত এগার বৎসর যাবৎ এখানে উপর হইতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল না; এত কাল কম্যুনিষ্ট শাসন চলিবার পর সেই কম্যুনিজমকে ঠেকাইবার জন্যই আজ সোভিয়েট সেনাবাহিনী নিয়োগ করিতে হইল! হাঙ্গেরির গণ-অভ্যুত্থান দমনে বৈদেশিক সৈন্য নিয়োগের নীতিগত প্রশ্ন সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের দ্বারা কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; বিজয়ী সোভিয়েট বাহিনীর সমর্থনেই এই সব দেশে কম্যুনিষ্টরা শক্তিলাভ করিয়াছিল। আর, অন্য দেশে সৈন্য রাখিবার নীতিগত দায়িত্ব কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট দুই পক্ষেরই সমান। যে ওয়ার্স চুক্তি অনুসারে হাঙ্গেরিতে রুশিয়ার সৈন্য রহিয়াছে, তাহা অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটো) প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট। আজ ইংলণ্ডে সশস্ত্র কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সফল হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে ন্যাটোর সর্ত্ত অনুসারে সেখানে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্য সে বিপ্লব দমনে নিযুক্ত হইবে কিনা, তাহা অনুমানমূলক প্রশ্ন হইলেও কথাটা ভাবিবার মত। অবশ্য, ইহা সত্য যে, হাঙ্গেরির ব্যাপারে সোভিয়েট রুশিয়ার আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

আমেরিকার নির্ব্বাচন—

আমেরিকার নির্ব্বাচন গত নভেম্বর মাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই নির্ব্বাচনে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ নিক্সন্ পুনরায় প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই বিজয়ে আইসেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার দল—রিপাবলিক্যান্ দল দুইটি পরিষদেই প্রতিদ্বন্দ্বী ডিমোক্রেটিক পার্টির নিকট পরাজিত হইয়াছে। (১।১২।৫৬)

অনামিকা

সমর ভট্টাচার্য এম-এ

এই ভালো অনামিকা। এমনি অপরিচিত-সাজে
তুমি পাশে এসে বসো। জীবনের মুহূর্ত্ত দু-চার
সলাজ-চুম্বন দিয়ে পূর্ণতায় ভরে দাও, আর
সংগীত-মূর্চ্ছনা তোল কর্মক্লান্ত জীবনের মাঝে।
এসো তুমি কোন এক অলস দুপুরে চুপে চুপে
দুহাতে আদর নিয়ে; কিংবা কোন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
যখন তৃষিত মন সব ভুলে তোমাকেই চায়,
তুমি এসে পাশে বসো এমনি রহস্যভরা রূপে।

পরিচয় না পেলাম—না চেনার ক্ষতি কিছু নেই।
অস্পষ্ট ইংগিত নিয়ে, সহাস্য কৌতুকী ছলনায়—
বেনামী নামেতে কোন কিংবা এক অবুঝ ভাষায়
যদি লুকোচুরি খেলো, অনামিকা তবে ভালো সে-ই।
সীমায়িত ক'রব না পরিচয়-কঠোর বাঁধনে,
অচেনার বেশে এসো আমার বিবর্ণ-শ্রান্ত মনে।

তুমি

কুমুদ ভট্টাচার্য

কথার রেখা টেনে টেনে তোমার ছবি আঁকি।
মনের ইচ্ছে এতটুকু না থাক কোথা ফাঁকি।
যেমন পারি একটুখানি রঙ-বুলোনো সাধ
মিটিয়ে দিতে ডেকে আনি রক্ত-ক্ষরণ স্বাদ।
অল্পে খুশি তুমি তো নও শোণিত-সুধা-লোভী,
বিন্দু-কয়েক দিয়েই ফোটাই লোভন তোমার ছবি।

এবার তৃপ্তি আনো আমার তৃষ্ণা-হরণ-করা,
আমার সুধায় করো সুধা তোমার তৃষাহরা।
ছবির রেখা ফোটাও আমার বুকের রেখা ক'রে,
দেহের শোণিত দাও মিশিয়ে মনের শিরায় ভ'রে।
তোমার রঙে আমার রঙে ঘোচাও ব্যবধান।
আপন-রূপে করো গোপন-মনে অধিষ্ঠান।
তোমায় চিনে আমায় চিনি, আমায় চেনো তুমি।
মনের পাদভূমি করো তোমার পীঠভূমি।

পরিচালক—উপানন্দ

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পথে

ছাব্বিশে অক্টোবর রাত্রে কল্‌কাতার মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আগ্রার পথে। জনতা-মুখর বৈদ্যুতিক আলোক-বিকীর্ণ হাওড়া ষ্টেশন পিছনে পড়ে রইলো। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা গেল না। আকাশে অজস্র তারা। হৈমন্তিক হাওয়ায় ছিল কিঞ্চিৎ শৈত্য। ট্রেণের জানালা বন্ধ করে দিয়ে বসে রইলাম পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণীর মত। চলেছি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাত্রিংশ অধিবেশনে যোগ দিতে, একটু আগেই বাহির হয়েছি তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়ে। ১লা থেকে ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত আগ্রাতেই সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছে—কিন্তু কোথায় হবে সে সম্বন্ধে উদ্যোক্তাদের নীরবতা আমাকে একটু ভাবিয়ে তুল্‌লো।

উত্তর ভারতের যেদিকে চলেছি, সেদিকে আমার একাধিকবার পরিক্রমা হয়েছে—তবু বারে বারে এদিকটায় আস্‌তে ভালো লাগে। ইতিহাস ও পুরাণের পাতায় যে সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তারা যেন মুখর হয়ে ওঠে আমারই সম্মুখে, যখন ঘটনাস্থলের মাঝে এসে দাঁড়ানো যায়। পরিচয়ের ক্ষেত্রে কত না মনের সান্নিধ্যে এসে, জানবার আর দেখবার অনুসন্ধিৎসা বেড়ে ওঠে! কত অপরিচিত আত্মার-আত্মীয় হয়ে ওঠে!

দুটি রাত্রি পেরিয়ে আটাশে অক্টোবর আগ্রাফোর্টে এলাম। সূর্য্য তখন প্রাতঃকালীন পরিমণ্ডল ত্যাগ করে মাধ্যাহ্নিক গতিপথে পদক্ষেপ করবার জন্যে আয়োজন করছেন। ঘড়িতে সবেমাত্র দশটা বেজেছে। আগ্রা থেকে মথুরা আর মথুরা থেকে বৃন্দাবনে যখন বাসের আশ্রয় অবলম্বন করে অবতরণ করা গেল, তখন মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য্য দেদীপ্যমান। রৌদ্রের প্রখরতা অনুভূত হোলো। উত্তর ভারতরাজ্যে পরিবহনে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ অপ্রীতিকর হয়নি। বৃন্দাবনে আমি একটার সময়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত হলাম।

দুধারে গাছপালা, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে প্রশস্ত রাজপথ দিল্লীর দিকে—যেতে যেতে নজরে পড়্‌লো কত না পাথরে তৈয়ারী মিনার, গম্বুজ, বুরুজ নানাদিকে ছড়িয়ে রয়েছে! কোথাও দেখলাম বিচ্ছিন্ন হয়ে একক অবস্থায় মাথা উঁচু করে আছে সুপ্রাচীন ভগ্ন সৌধ, দুর্গ, মন্দির আর মসজিদ—কোথাও দেখলাম ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সমাধি, কোথাও বা দেখলাম পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপ। হয়তো এখানে মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার বহু পূর্ব্বের সভ্যতার কঙ্কাল ঐ সব স্তূপে পড়ে আছে। হয়তো আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের কঙ্কাল।

পাঁচ হাজার বছর আগেকার স্মৃতিজড়িত ব্রজমণ্ডলের মধ্যে এসে ভগবানের নরলীলার কথাই মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো। একশো পঁচিশ বছর ধরে যে মহামানব উত্তর ভারত থেকে সুরু করে মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত লীলা দেখিয়ে গেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করা গেল। এদিকে এলে বিশিষ্ট বৈষ্ণবদের নানাপ্রকার ভাব অন্তরে জাগ্রত হয়। ভগবান স্বয়ংই রূপ পরিগ্রহ করে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়েছিলেন। তাই ওদিকের আবহাওয়া অতি সুন্দর।

আমরা ভারত সেবাশ্রমের আশ্রয় নিলাম। দোতালার সুন্দর একখানি প্রকোষ্ঠে সেবাশ্রমের পরিচালক স্বামীজী মহারাজ আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রশস্ত তক্তপোষের ওপর পনরো নম্বর ঘরে আমি রইলাম, আমার দু'টি অনুচর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মেঝের ওপর বিছানা পেতে নিল। প্রচুর আলো বাতাস ও বিজলী আলোর জন্য কক্ষটির আভিজাত্য-মর্য্যাদা লক্ষ্য করা গেল। সন্নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবন ষ্টেশন—মিটার গেজ লাইনের গাড়ী এদিকে যাতায়াত করছে—লাইনটা এসেছে আগ্রাফোর্টের কাছ থেকে।

বৃন্দাবনে এসেই বিকালে টঙ্গা নিয়ে বাহির হওয়া গেল। প্রায় বছর চারেক আগে এখানে এসেছিলাম বনমহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর প্রেমমহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে। সেবার বহু দেখবার জিনিষ

অ-দেখাই ছিল, তাই এবার ভালো করে বৃন্দাবন দেখবার সঙ্কল্প নিয়ে আসা গেল, তবুও সব দেখা হোলো না। টঙ্গা চলতে থাকে উঁচু নীচু পাথরের রাস্তা ধরে—প্রশস্ত রাজপথ থেকে এসে পড়লো গলির ভিতর। দুধারে প্রাচীন দিনের ইষ্টকালয়, পণ্যবীথি আর ঘনবসতি। এদের পিছনে ফেলে রেখে যমুনাপুলিনে আসা গেল। যমুনার রূপ পূর্ণ যুবতীর মত পরিলক্ষিত হোলো। স্রোতের উদ্দামগতি। বন্যা হয়ে যাওয়ার ফলে এর নীল জল দেখা গেল না, দেখা গেল ঘোলা জল। প্রথমে কেশীঘাটে আসা গেল। জনৈক দেশীয় নৃপতির দাক্ষিণ্যে এই ঘাটটী সুন্দর ভাবে বাঁধানো হয়েছে, সুউচ্চ হর্ম্ম্য পরিবেষ্টিত হয়ে কেশী ঘাটের শোভা অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করেছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অসুরবধ করেছিলেন, প্রেমানন্দে বৈষ্ণব মাত্রেই উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। কিছুক্ষণ মৌন বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম যমুনার দিকে—জলের শব্দ হচ্ছিল ছলাৎছল, ছলাৎছল।

বংশীবটের কাছে আসা গেল। এখানে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনিতে ব্রজগোপীগণকে একত্র করে রাসলীলার সূচনা করেছিলেন। তারপর চীর-ঘাটে এলাম। এখানে একটি বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে সানবাঁধানো চত্বর। এই বৃক্ষের ওপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের বস্ত্র নিয়ে বসেছিলেন। এখান থেকে যমুনা দূরে চলে গেছে, কিন্তু এবার বন্যার ফলে যমুনার জল চীরঘাটের বাঁধানো সিঁড়িগুলি ডুবিয়ে দিয়ে গাছের দিকে উঁচু হয়ে উঠেছিল। যে ঘাটে কালীয় দমন হয়েছিল, সে ঘাটও আমাদের নয়নের অন্তরালে ছিল না।

যা হোক্ ঘাটগুলি পরিক্রমা করতে করতে ওপারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কর্‌লাম। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। নৌকায় পার হয়ে চলেছে ঘরে-ফেরা মানুষেরা। ওদিকেও তীর্থভূমি। যমুনা পুলিন ত্যাগ করে এলাম নিকুঞ্জবনে। এ বনের অলৌকিক রহস্য পূর্ব্বেই অবগত ছিলাম, তাই সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এখানে আস্‌তে হোলো। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে এখানে কোন প্রাণী থাকে না, শাপামৃগ পর্য্যন্ত প্রস্থান করে। গোপীদের নিয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রতি রাত্রে এখানে পার্থিব আয়তনে অপার্থিব লীলা করেন, তাই এ বনে আজও কোন পাখী নীড় বাঁধ্‌তে সাহস কর্‌লো না।

ভিতরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ছোট মন্দিরের মধ্যে রয়েছে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পূজা সমাপন করে পূজারী চলে যায়—প্রভাতে এসে সে দেখে ফুল ছড়ানো রয়েছে, আর ভোগ নৈবেদ্য দেবতা গ্রহণ করে কিছু প্রসাদ রেখে গেছেন। এখানে একটি কুণ্ড আছে, কুণ্ডের ভিতর প্রবেশ নিষেধ। গাছপালাগুলি তৃণগুল্মাদি মাটির সঙ্গে নুয়ে আছে—এদের নম্রনত রূপ দেখে ভাব্‌লাম এদের ভেতরও কি বৈষ্ণবতা পূর্ণরূপ নিয়েছে! কুঞ্জের ভেতর সাধু মহাত্মাদের সমাধি আত্মগোপন করে আছে। রাত্রে এখানে লুকিয়ে থাক্‌লে নাকি মৃত্যু হবার আশঙ্কা আছে, আর হয়েছেও তাই। এজন্যে রাত্রে কাউকে নিকুঞ্জবনে থাক্‌তে দেওয়া হয় না। আশে পাশে অনেক বাড়ী আছে—সেই সব বাড়ী থেকে নৈশ দৈবীলীলা দেখা যায় কি না তা কে জানে!

নিধুবনে এসে তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর বিরাট সমাধি প্রান্তে প্রণাম কর্‌লাম। এই স্থানে মহাত্মা হরিদাস সুরে সুরে রাধাকৃষ্ণের চরণে অর্ঘ্য দিতেন। এখানে একটি কুণ্ড আছে—সিঁড়ি দিয়ে এর অতল গহ্বরের নীল জলে নাম্‌তে সাহসী হলাম না। এখানেও রাধা-কৃষ্ণের লীলা প্রকট হয়ে আছে। দুই বনেই বানরের উপদ্রব অত্যধিক পরিমাণে দেখে একটু ভীত হয়ে পড়েছিলাম। যা হোক্ নানা মন্দির দর্শন করতে অগ্রসর হওয়া গেল। মৃদুমন্দ বাতাসে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বেলা পড়ে এলো।

বৃন্দাবনে অসংখ্য মন্দির, তাই একে City of Temples বলা হয়। মন্দিরগুলির মধ্যে রাধাগোবিন্দ, গোপীনাথ, রাধারমণ, রাধা-বিনোদ, রাধামদন, রাধাশ্যামসুন্দর আর রাধাদামোদর—এই সাতটি মন্দির বৈষ্ণবদের কাছে প্রধান দেবালয়রূপে গণ্য, তার কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও পরিকরগণ এগুলির সেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের রাধাগোবিন্দ জীউর স্থাবর সম্পত্তির আয় সব চেয়ে বেশী, বল্‌তে গেলে বৃন্দাবন সহরটি এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। মোগল যুগে জয়পুরের মহারাজা গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের বিগ্রহ জয়পুরে নিয়ে গেলেও সম্পত্তি পূর্ব্ববৎ এখানকার মন্দিরের অধীনেই রেখে গিয়েছিলেন। এখানে প্রাচীন বিগ্রহ বঙ্কুবিহারীকে দেখ্‌লাম—মূর্ত্তিটী চমৎকার। এমন উজ্জ্বল কালো বর্ণের প্রস্তর মূর্ত্তি একান্ত বিরল। মূর্ত্তিটী এত কালো, আর এত উজ্জ্বল যে, কিছুক্ষণ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে থাক্‌লে চোখ ঝল্‌সে যায়।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউর পুরাতন মন্দির একটি অদ্ভুত কীর্ত্তি বলা যেতে পারে। এই মন্দির সপ্ততল ও নয়টী চূড়াবিশিষ্ট ছিল। মধ্য-স্থলের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সওয়া মণ ঘৃতের একটি প্রদীপ প্রতি রাত্রে প্রজ্জ্বলিত হোতো। প্রবাদ আছে, আওরঙজেব আগ্রার প্রাসাদ থেকে ওর উজ্জ্বল আলো দেখ্‌তে পেয়ে অনুসন্ধানে জান্‌তে পেরেছিলেন, ওটি বৃন্দাবনের গোবিন্দ জিউর মন্দিরের চূড়ার আলো। তিনি অবিলম্বে ঐ মন্দির ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ করলেন। ঐ আদেশ জয়পুরের মহারাজা জান্‌তে পেরে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনকে জয়পুরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। পথে যেতে দুটি বিগ্রহকে তিনি নাকি অন্যত্র রাজপুতরাজ্যে রেখে যান।

এদিকে বাদশাহের ফৌজ কামান নিয়ে এসে মন্দিরের উপরকার পাঁচতলা ভেঙ্গে দিয়ে যায়। তারা যে দয়া করে নীচের অংশটী রেখেছিল, এটা হিন্দুদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় বল্‌তে হবে। আজ যদি ঐ মন্দির অক্ষত অবস্থায় থাক্‌তো তাহোলে এটা ভারতের ভিতর একটি শ্রেষ্ঠ মন্দির বলে কীর্ত্তিত হোতো, আর কারু-কার্য্য হিসাবে বোধহয় আগ্রার তাজমহলের নীচেই স্থান পেতো। মন্দিরের যে অংশ আজও বর্ত্তমান রয়েছে তা দেখ্‌লে বিস্ময়াভিভূত হোতে হয়। এরূপ একটি মন্দির গাত্রে কী অদ্ভুত স্থাপত্য শিল্পেরই না নিদর্শন রয়েছে! মন্দিরটী লাল পাথরের প্রস্তুত, আর উচ্চতায় তাজমহলের চেয়েও বেশী ছিল। যে অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, তা খুব প্রাচীন হোলেও এখন নতুন

বলে বোধহয়। বৃন্দাবনে স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই গোবিন্দজিউর এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। জয়পুরের মহারাজা মানসিংহ এই মন্দিরের নির্ম্মাতা। মন্দিরটী নির্ম্মাণের বিশেষত্ব এই যে, চতুর্দ্দিক থেকে মন্দিরের ভিতর আলো ও বায়ু প্রবেশের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

মথুরার ধনকুবের লছমীপতি শেঠের মন্দির যা শ্রীরঙ্গজিউর মন্দির নামে পরিচিত, পরিক্রমা করা গেল। এর বর্হিপ্রাচীরের পরিধি এক মাইলের অধিক, অভ্যন্তরে মূল মন্দিরটী তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এখানে সোনার তালগাছ আছে। বস্তুতঃ এটা সোনার তাল গাছ নয় —একটি স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ। অরুণ স্তম্ভ নামেই এটী খ্যাত। সাড়ে বারো মণ সোনা দিয়ে এই স্তম্ভ গঠিত হয়েছে, পাশে একটি ছোট স্তম্ভ। ওটায় আছে সওয়ামণ সোনা। মন্দিরের পিছনে শেঠজীর বাগান। ওর নাম রাধাবাগ। ওর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখ্‌লে বিমুগ্ধ হোতে হয়। শ্রীরঙ্গ জিউর মন্দিরের উত্তর পার্শ্বের গলিতে লালাবাবুর মন্দির। মন্দিরটী অতি বৃহৎ, আর দুর্গ প্রাচীরের মত সুউচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

লালাবাবুর মন্দিরের প্রায় একশো গজ দূরে ব্রহ্মচারীর মন্দির। গোয়ালিয়রের মহারাজা এই বিশালকায় মন্দির নির্ম্মাণ করে তাঁর গুরুদেব ব্রহ্মচারীকে দান করেছিলেন। এই মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচারী মন্দিরের কিছুদূরে সাহজীর মন্দির। শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত; তাজমহল ভিন্ন মর্ম্মর প্রস্তরের এরূপ সুবৃহৎ মন্দির কোথাও দেখা যায় না। এই মন্দিরের এমন দু'একটি জিনিস আছে যা তাজমহলে নেই, যেমন মর্ম্মর প্রস্তরের রজ্জুর ন্যায় পাক দেওয়া থাম— এর এক একটি থাম যে কত অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হয়েছিল, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। দেওয়াল গাত্রে নানাবিধ পাথর বসিয়ে যে কয়েকটি বৃহৎ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে, তা অতি অদ্ভুত ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৩০শে অক্টোবর বৃন্দাবন থেকে ট্রেণে উঠে মথুরায় নেমে গোবর্দ্ধনগামী বাস ধর্‌লাম। বাসে যেতেই নজরে পড়্‌লো একটি বিরাট ভগ্নসৌধের চূড়ার ওপর লেখা—"এখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান।" এই ভিটার ওপরই প্রকাণ্ড মসজিদ। বেশ বুঝ্‌তে পারা গেল, বর্ত্তমান মথুরা আসল মথুরা থেকে অনেকখানি দূরে এসে দিক্‌ভ্রষ্ট হয়েছে—যমুনাও চলে এসেছে অনেকদূরে। বৃন্দাবন আর মথুরার মাঝখানে যমুনা নেই। শুধু আছে বিরাট সমতলক্ষেত্র। হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। পাঁচহাজার বছরের আগেকার কথা, এর মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন কতই না হয়ে গেছে! ফেরার পথে দেবতার জন্মভিটায় কিছুক্ষণ বসেছিলাম, আর বহুক্ষণ নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেই বুঝ্‌তে পারিনি।

কাঠফাটা দুপুর রৌদ্র। চারিদিকে মাঠ আর গাছপালা। বাস চল্‌তে লাগ্‌লো রাজেন্দ্রপ্রসাদ সড়ক ধরে। এলাম গোবর্দ্ধনে প্রায় বারোটার সময়ে। গোবর্দ্ধন গিরির উপর উঠ্‌বার নিয়ম নেই,—ওর উদ্দেশ্যে প্রণামই করতে হয়। ব্রজের খেলার সাথীদের প্রাণরক্ষার জন্যে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সময় কিশোর শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠাঙ্গুলির ওপর এটীকে ধারণ করেছিলেন। এরই ছত্রচ্ছায়ায় ছিল ব্রজকিশোরকিশোরীরা। গোবর্দ্ধন দর্শন করে টঙ্গায় যাওয়া গেল রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ডে, যেখানে সর্ব্বতীর্থের সমন্বয় হয়েছে, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর উত্তর সাধক শিষ্যবর্গের পুণ্যস্মৃতিপূত ঐতিহ্যের সমাধি রয়েছে। গোস্বামীগণের জীবন-তীর্থ পাদপীঠে প্রণাম কর্‌লাম। যাহোক্ চন্দ্রসরোবর, মানসীগঙ্গা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কুসুম সরোবর প্রভৃতি দর্শন করে রাত্রে বৃন্দাবনে ফিরে এলাম। ভাগ্যে গোকুল দর্শন আর হোলো না। দুবার বৃন্দাবনে গেলাম, কোনবারই গোকুলে যাওয়ার সময় করা গেল না! বর্ষান, নন্দগ্রাম বা গোকুল প্রভৃতি দেখা এ জীবনে হবে কিনা তা কে জানে! ব্রজভূমি ৮৪ ক্রোশব্যাপী, লীলাস্থলও বহু। বোধহয় ক্রমাগত তিনমাস কাল পর্য্যটন ও ভ্রমণ কর্‌লে প্রধান প্রধান স্থানগুলির দর্শন শেষ করা যায়। রাধাকুণ্ডে যেতে যেতে দেখ্‌লাম নানাদেশের বহু ভক্ত পদব্রজে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বেরিয়েছে। তাদের দেখে ভারি আনন্দ হোলো। রাধাকুণ্ডের পথে পড়্‌লো কয়েকজন দেশীয় নৃপতির সৌধ সরোবর ও বাগ—লাল পাথরের সৌন্দর্য্য ওদের অঙ্গে ঝলমল করে উঠ্‌ছে। শান্তসৌম্য সরোবর বায়ুহিল্লোলে ঈর্ষাপ্লুত।

৩১শে অক্টোবর প্রাতে সাতটায় বৃন্দাবন থেকে বাসে উঠে আগ্রায় এলাম। প্রতিনিধি শিবিরে থাকা গেল আগ্রা কলেজ-হোষ্টেলের প্রাঙ্গণে। শিবির খুঁজে বের করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল অভ্যর্থনা সমিতির ঔদাসীন্যের জন্যে। ১লা নবেম্বর থেকে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হোলো, আর এর সমাপ্তি রেখা টানা হোলো ৩রা নবেম্বর রাত্রে কলিকাতার 'সাংস্কৃতিকী' কর্ত্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনয়ের শেষে। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন হুমায়ুন কবীর। এ সম্মেলনে বাংলা পরীক্ষায় সাফল্যমণ্ডিত অবাঙ্গালী ছাত্রদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়েছিল। বাংলা পুস্তক প্রদর্শনী ও বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ মাদ্রাজ এবং মহীশূরের কলাশিল্পের প্রদর্শনীর উদ্বোধন, হিন্দী সাহিত্য ও কবি সম্মেলন, বাংলা সাহিত্য শাখা, সমাজ সংস্কৃতিবিভাগ, শিল্পকলা বিভাগ প্রভৃতির অধিবেশন মনোজ্ঞ হয়েছিল। এবারের সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আন্তর্রাজ্য-সাহিত্য ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিভাগের অধিবেশন। হিন্দী সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীবালকৃষ্ণ শর্ম্মা (নবীন) অভিভাষণে বলেন—'আমি হিন্দীর এক দীন লোক হিসাবে ইহাই বলিতে চাই যে হিন্দী ভাষা এবং সাহিত্যের উপর বঙ্গ ভাষা এবং সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। আমি যদি ইহা স্বীকার না করি তবে আমি সত্য গোপনের অপরাধে অপরাধী হইব...' সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যালের অভিভাষণ সুচিন্তিত ও অতীব মনোজ্ঞ, এর মধ্যে নানা দিক আলোচিত হয়েছে। সার যদুনাথ রবীন্দ্র পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে কিছুকাল পূর্ব্বে এক সর্ব্বদলীয় লেখক সম্মেলনে যে কথা বলেছিলেন অর্থাৎ বিগত বিশ বৎসরকালের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যে একজনও শক্তিমান লেখক জন্মগ্রহণ করেন নি এবং শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য একখানি গ্রন্থও রচিত হয় নি অথবা একটি রচনাও সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি, তারই প্রতিবাদ করে সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল তাঁর অভিভাষণে বলেন..."এই প্রকার আক্রমণশীল বক্তৃতাদানের কালে

রবীন্দ্রনাথের কথা সার যদুনাথের স্মরণ পথে ছিল কিনা জানিনে, কিন্তু এই ত্রিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরও বহু শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সে যাই হোক আধুনিক সাহিত্যের সেই বস্ত্র হরণ সভায় ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর শল্য ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অসম্মানিত নতমুখে উপস্থিত ছিলেন।...বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে প্রকাশিত এমন অন্তত: পঞ্চাশখানি বাংলা গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায়, যেগুলি জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ ও আধুনিক সাহিত্যের পাশে সত্যকার গৌরব নিয়ে দাঁড়াবার অধিকারী।...বলা বাহুল্য সার যদুনাথের এই অসঙ্গত অতিশয়োক্তির জন্ম রবীন্দ্র পুরস্কারটী আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন লেখক মহলের চোখে হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে উঠেছে..." মূল সভাপতি হুমায়ুন কবীরের অভিভাষণ ও জ্ঞানগর্ভ। আন্তর্জাতিক ইউনেস্কো অধিবেশনে স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ তাঁর অভিভাষণে বলেন..."মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্য দানই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের মূল সুর। মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়া অবশ্য সব সাহিত্যেরই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, লাভ প্রতিদানের আশা ছাড়াও প্রেমের এত উদাহরণ বাংলা সাহিত্যের বিশেষত্ব। প্রাচীন কবি গেয়েছেন :—"সোনে ভারতী করুণা নাবী" সোনায় ভরা আমার করুণার নৌকা। মানুষের প্রতি করুণা। তার সংসারের সব সংগ্রামের জন্য করুণা। বাংলা সাহিত্য হচ্ছে মানুষের গান।" ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার প্রভৃতি অভিভাষণ দিয়েছিলেন। আমরাও কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করেছিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্ন্যাল আমাকে ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। হুমায়ুন কবীরও আপ্যায়িত করলেন। সব চেয়ে আলাপ জমে গেল ইউনেস্কোর এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর জেনারেল মঁসিয়ে মেহন ও মস্কোর ম্রাত্যুক দানিল চুকের সঙ্গে। রুশীয় প্রতিনিধিদ্বয় হিন্দী ও বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। ম্রাত্যুক দানিল চুক প্রতিনিধি শিবিরে প্রীতিসম্মেলনে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ সুন্দর চল্‌তি বাংলায় কথা বল্‌তে লাগলেন, তাঁর বক্তৃতায় ও চল্‌তি বাংলা ছিল। বাঙালীর মতই বাংলা তিনি সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পারেন। মনে হোলো কল্‌কাতার খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোক! দুঃখের বিষয় বাঙালীর ইংরাজী পড়ায় পেলাম উচ্চারণ দোষ। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু নারী পুরুষ প্রতিনিধি আলাপ আলোচনা করেছিল। আমাদের কবিতা ও কথা সাহিত্যের সঙ্গে দানিল চুকের নিবিড় পরিচয় আছে দেখে বিস্ময়াভিভূত হলাম। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকেরাই বা কজন খবর রাখে! দানিল চুক আমার ঠিকানা নিয়ে তাঁর মস্কোর ঠিকানা দিলেন—বল্‌লেন—'এর পর যোগাযোগ হবে।' মনোজ বসুর সম্বন্ধে উল্লেখ করে তিনি আমাকে বল্‌লেন—'মনোজবাবুকে বল্‌বেন, তাঁর একটি গল্প উমা নাম দিয়ে রুশীয় ভাষায় তর্জ্জমা করেছি। কল্‌কাতায় গেলে আপনার বাসায় যাবো—' কয়েকদিন পরে অবশ্য দিল্লীতে কার্ড পেয়ে ইউনেস্কোর অধিবেশন যেটি ন্যাশান্যাল ষ্ট্যাডিয়ামে হয়েছিল তাতে যোগ দেওয়া গিয়েছিল। বিজ্ঞানভবনে আর যাওয়া হয়নি। ভারতের বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েরা প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের বিরাট প্রাঙ্গণে নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখিয়েছিল, আর নাচ গান করেছিল।

আগ্রায় থাক্‌তে শেষরাত্রে আমি আর দিল্লীর ইউনিয়ন একাডেমির প্রিন্সিপ্যাল ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য তাজমহলের কাছে গিয়ে বসতাম, আর বেলা হোলে শিবিরে ফিরতাম। তোমরা বোধ হয় জানো মমতাজের সমাধির ওপর সম্রাট সাহজাহান বিশ্বের বিস্ময় তাজমহল নির্ম্মাণ করেছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের এরূপ অনুপম নিদর্শন পৃথিবীতে বিরল। ১৬৩২ থেকে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ একুশ বছর ধরে এর নির্ম্মাণ কার্য্য চলেছিল। এই অপূর্ব্ব স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের কাজে মুকররমৎ খাঁ ও মীর আবদুল করিম নামক দু'জন শিল্পী অধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। তাজমহল সাদা পাথরের তৈরি। জাঠেরা এর কিছু কিছু অঙ্গহানি করে গেছে। সন্ধ্যার সময়ে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্ন্যাল এখানে বসে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন—নিছক আড্ডা নয়, ভ্রাম্যমানের সুদীর্ঘ দিনের কৌতূহলোদ্দীপক পথ চলার ইতিহাসই তাঁর গল্পে পাওয়া যেতো—আর তা চিত্তাকর্ষক। বন্ধুদের নিয়ে আগ্রার রমণীয় প্রাসাদ-দুর্গের ভেতর পরিক্রমা করা গেছে। আগ্রা ফোর্টের অমর সিং গেটটী প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর এই কেল্লার পরিকল্পনা করে কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু আজ একে যেভাবে দেখা যায়, তাতে পরবর্ত্তী অন্যান্য সম্রাটদেরও দান আছে। এই দুর্গের শক্তিশালী সৌন্দর্য্য পরিকল্পনা আর সুক্ষ্ম কারুকার্য্যগুলি সত্যই অপূর্ব্ব। ফোর্টের ভিতরে শ্বেতপাথরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত দেওয়াল, বিভিন্ন মহল, মতিমসজিদ, দেওয়ান-ই আম, দেওয়ান-ই খাস,শাহবুরুজ. হারেম, সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত বিরাট স্তম্ভ প্রভৃতি দেখে বিস্ময়াভিভূত হোতে হয়। যে কক্ষে সাহজাহান শেষ শ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেই গৃহের অলিন্দের গায়ে একটি ছোট পাথর দেখা গেল। পাথরটীর ভিতর দৃষ্টি করলে দূরের তাজমহলের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা যায়। এই কেল্লার সঙ্গে ইতিহাসের বহু ঘটনা জড়িয়ে আছে। এখান থেকেই মহারাষ্ট্রকেশরী ছত্রপতি শিবাজী আওরঙজেবের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছিলেন,—রাজপুত বীর অমর সিং এই দুর্গ থেকে অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়েছিলেন। এখানেই জাহানারার নারীত্ব ও দৈবশক্তির সম্যক্ বিকাশ হয়েছিল। ভোর ৪টায় সাজাহান এখানে শয্যাত্যাগ করে নমাজ সেরে রোজ সকালে প্রজাদের দর্শন দিতেন, হাতীর লড়াই, কুচকাওয়াজ দেখতেন। আর রাত্রি সাড়ে দশটায় ঘুমোতে যেতেন। সারাদিন তাঁর কাজের বিরাট তালিকা পাওয়া যায়। দানের তো কথাই নেই!

আমরা আগ্রা থেকে বাসে ফতেপুর সিক্রী দেখতে গিয়েছিলাম—আমাকে পর পর দু'দিন যেতে হয়েছে। শেষ দিন শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্ন্যালের চাপে পড়েই গেলাম। আকবর ফতেপুর সিক্রী শহরটীর প্রতিষ্ঠাতা। দূরে দেখা গেল আরাবল্লীর পার্ব্বত্যশিখরশ্রেণী। এখান থেকেই লক্ষ্য করা গেল যেখানে খানুয়ার যুদ্ধে রাণা সংগ্রাম সিংহের

পতন হয়েছিল। ফতেপুর সিক্রির সুরম্যপ্রাসাদ লাল পাথরে তৈয়ারী, এর বিরাট বুলন্দ দরওয়াজা দেখে বিস্মিত হোতে হয়। সমগ্র প্রাসাদটী ঘুরে দেখা শেষ করতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগেছিল। আকবরের সৌন্দর্য্য-বোধের অপূর্ব্ব নিদর্শন এখানেই সমুজ্জ্বল। পারসিক ও হিন্দু কলা-শিল্পরীতির সমন্বয় এখানে পরিলক্ষিত হোলো। প্রাচীন ভারতীয় চারুকলার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা গেছে। আকবর তাঁর গুরু চিস্তির বিরাট সমাধিসৌধ নির্ম্মাণ করে গুরুভক্তি দেখিয়ে গেছেন এখানে। এই সৌধ প্রাঙ্গণে চিস্তির বংশধরদেরও কবর দেখা গেল। যোধাবাঈমহলে হিন্দুস্থাপত্য শিল্প ও দেবদেবীর চিত্র দৃষ্টিপথে এলো। এই মহলেই প্রতিদিন পূজাপাঠ যজ্ঞ হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান হোতো। একটি জলাশয়ের মধ্যভাগে বসে যেখানে তানসেন সম্রাটকে সঙ্গীত শোনাতেন, আর সম্রাট সৌধের ওপর থেকে শুনতেন সেটিও দেখলাম। তা ছাড়া দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই আম, মহাফেজ খানা, হারেম, হাতীশালা, ভোজনশালা, স্নানাগার, পায়খানা, শয়নকক্ষ, ইবাদৎখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করা গেল। যেখানে বসে তাঁর জ্যোতিষী নিত্য গণনা করে তাঁকে শুভাশুভ সমাচার দিতেন, সেখানেও গিয়েছি। সুন্দর শিল্প-আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর জ্যোতিষী থাকতেন। আবুলফজলের প্রাসাদও লক্ষ্য করবার বিষয়। এখানে ফৈজী, বীরবল প্রভৃতির কণ্ঠে ধ্বনিত হোতো কত না মধুর কবিতা! কাব্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন কলাশাস্ত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন ফতেপুরসিক্রীতেই আকবরের আনুকূল্যে সম্ভব হয়েছিল। এখানেই তাঁর ধর্ম্মসভা হোতো। নিরক্ষর সম্রাট সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে আর হিন্দুমুসলমানের মৈত্রীবন্ধনের উদ্দেশে যা রেখে গেছেন তা ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। তিনি ছিলেন যুগপ্রবর্ত্তক। ফতেপুরসিক্রী দেখে আমরা সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিক্ষেত্রে এসে তার শোচনীয় পরিণতি দেখে ব্যথিত হলাম, আর ইত্‌মদউল্লার নিখুঁত শিল্প-কার্য্যমণ্ডিত স্মৃতিস্তম্ভ দেখে পরমানন্দ লাভ করলাম। এলাহাবাদে আমাকে নিয়ে গিয়ে শ্রীমান্ অম্বিকা ভট্টাচার্য্য সাহিত্যের আসর করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বৃদ্ধ উৎসবের জন্যে দিল্লীতে যেতে হোলো।

তারপর নয়াদিল্লীতে এসে রাজসিক আতিথ্য পুষ্ট হয়ে চারদিন থাকা গেল। ইউনেস্কোর অধিবেশনে যোগ দিয়ে নয়াদিল্লীর শিমূলতলার সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ হওয়া গেল। রোটাক রোডে ওঁরা বন্ধুবর ব্রজমাধবের বাড়ীতে এসে প্রথম দিনে আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় জমিয়ে নিলেন। পরদিন কবি বিভূতি বাগচীর আবাসে একটি ঘরোয়া সাহিত্য বৈঠকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হোলো। ওঁদের গল্প কবিতা শুনে পরমতৃপ্তি লাভ করলুম। রাজকীয় বিশিষ্ট কর্ম্মচারী উমানাথবাবু আমার কবিতার বিশেষ অনুরাগী। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বন্ধুবর প্রিন্সিপ্যাল ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে বসে বৃন্দাবনের উপর যে কবিতাটী লিখেছিলাম সেটি শুধু এঁদের সাহিত্যবৈঠকে পড়লাম না, কবি বিভূতি বাগচী মহোদয়ের অনুরোধে তাঁর কবিতার খাতায় লিখে নাম ও তারিখ স্বাক্ষরিত করতে হোলো। কবি বাগচী ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। যা হোক্ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পথপরিক্রমা করে আর সাহিত্য সম্মেলনে বৈদেশিক সুধীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরমতৃপ্তি লাভ করা গেছে। আগামী বৎসরে আমেদাবাদে সম্মেলন হবে—সেদিনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকা গেল। ভারতের চৌদিকটা ঘুরতে পারলে মোটামুটি সবদিক দেখা হয়ে যায়। ভ্রমণ না করলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। তোমরা সুযোগ সুবিধা পেলে নানা স্থানে ভ্রমণ করবে। জেনে রেখো অভিজ্ঞতাই জ্ঞান। কত অজানার সঙ্গেই না জানা হয় ভ্রমণে পথে প্রবাসে! কত মানুষই না আপনার জন হয়ে ওঠে!

—

স্নেহের দান

শ্রীজগদীশ লাহিড়ী

সোনাতে খাদ না মেশালে তা' নাকি শক্ত হয় না, কিন্তু সুনির্ম্মলের ভালবাসার মধ্যে খাদ ছিল না এতটুকুও। মকুকে সে সত্যিই ভালবাসতো।

এত ভালবাসার কারণও ছিল সুনির্ম্মলের—মকুর মতো তার এক সুন্দর ভাই ছিল। ওদের গাঁয়ে সে বছর ভয়ানক কলেরা দেখা দেয়। গাঁকে গাঁ উজাড় হয়ে গিয়েছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওর বাবার শেষ কাজ করে বাড়ী ফিরে এসে মাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পায়—কিন্তু দেখতে পায় না ওর ছোট্ট ভাইকে। কোথায় যে গেছে আজও তা' রহস্যাবৃত সকলের কাছে। উন্মাদ মাকে কোন রকমে এনে ফেলেছে এই রসারোডের বস্তির একটা ছোট ঘরে। মায়ের কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে, যেমন করেই হোক্ খুঁজে বের করবে তার হারানো স্নেহের ছোট্ট ভাইকে। সেই আশায় রোজই ঘুরে বেড়ায় ছোট ছোট ছেলেদের আস্তানায়—শিকারীর দৃষ্টি নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানে তাদের ওপর।

একদিন হাজরা পার্কের ছোট্ট দোলনাটাতে দুলতে দেখলো রাজা প্রতাপভূষণের একমাত্র ছেলে মকুকে। চমকে উঠেছিল সে এক মুহূর্ত্তের জন্যে। কিন্তু না, তার বহু আকাঙ্ক্ষিত এ' নয়। এর তো রাজা-বাদশার ছেলের মতো পোষাক!

তবু তার পা টেনে নিয়ে চললো সেই দোলনাটার

দিকে। একভাবে তাকিয়ে রইলো তার মুখের ওপর। ওকে দেখে ছেলেটি মধুর কণ্ঠে বললে, আমায় একটু দোল দেবে ?

যেন বেঁচে গেল সুনির্ম্মল। মাত্র একদিন নয় রোজই দোল দেবার পাকা ব্যবস্থা করে ফেললো সেদিন থেকে।

দোল খেতে খেতে ছেলেটি বলে উঠলো, তোমার নাম কি ? আমি কি বলে তোমায় ডাকবো ?

অনেক ভেবে সুনির্ম্মল বলেছিল, তুমি আমায় ভাই বলে ডেকো—এই বলে বুকে তুলে নিয়েছিল সুনির্ম্মল। ওদের দারোয়ান ছুটে এসেছিল একটা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নিয়ে। মকু বিজ্ঞের মতো তাকে বলেছিল, দারোয়ানজী, একে কিছু বলো না, এ আমার ভাই হয়েছে।

মিষ্টি গলার মিষ্টি কথাটা শুনে তার চোখে দু'ফোঁটা জল চিক্ চিক্ করে উঠেছিল। দারোয়ানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা' এড়ায়নি।

কারখানার কাজ আর তার ভালো লাগতো না। সব সময়েই সে বিকেলটা প্রার্থনা করতো ভগবানের কাছে—আরও প্রার্থনা জানাতো বিকেলটাকে দীর্ঘতর করার জন্যে।

মকু যখন হেসে হেসে তার সঙ্গে কথা বলতো, তখন তার সুন্দর, শুভ্র দাঁত-দুপাটী তার কাছে মনে হোতো রূপকথার সেই ছোট্ট পাখীটা এসে তার দাঁত তুলে নিয়ে তারই জায়গায় একটার পর একটা মুক্তো সাজিয়ে রেখে চলে গিয়েছিলো। মকুর চলনে সে যেন দেখতে পেতো নতুন উন্মাদনা। মকুকে বুকে চেপে ধরে সে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কাকে বেশী ভালবাসো ? মকু উত্তর করতো, তোমায়। ভালবাসার পরিমাণটা জিজ্ঞাসা করলে, ছোট্ট হাত দুটি ফাঁক করে, সুর টেনে বলতো, এ—তো।

রোজই যেতো পার্কে—সারা বিকেলটা কাটতো তার মকুকে নিয়ে। বৈচিত্র্যহীন এক ঘেয়ে—কোন পরিবর্ত্তনই ছিল না তার মধ্যে। হঠাৎ কোনদিন এর পরিবর্ত্তন হতে পারে তা' সে কোন দিনই ঠাঁই দেয়নি ওর মনের মধ্যে।

পৃথিবীটাই পরিবর্ত্তনশীল—এর মধ্যেও পরিবর্ত্তন হল একদিন।

প্রথম দিন যথাসময়ে অপেক্ষা করলো সুনির্ম্মল—কিন্তু মকু এলো না। তার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনেও তাই—ব্যথার তাড়নায় বুকটা তার মাঝে মাঝে মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলো। তৃতীয় দিন আর সে স্থির থাকতে পারলো না—রাজপথ ধরে দৌড়ে চললো মকুর বাড়ীর দিকে। রাস্তায় হেঁটে চলা কত বিপদ, তার ওপর ছুটছে সে। কতবার ট্রাম, বাস, মোটরের হাত থেকে বেঁচে গেল তার আর শেষ নেই—নেহাৎ পরমায়ু ছিল তাই রক্ষে পেয়ে গেল।

এবার সে এসে পড়লো মকুর বাড়ীর গলিটায়—ছুটতে গিয়ে ধাক্কা লেগে গেল গ্যাসের আলো জ্বালায় যে, তার মইএর সঙ্গে। বিশেষ কিছু হল না, ঝেড়ে-মুছে আবার চালালো তার অভিযান।

মকুর বাড়ীর গেটে দাঁড়াতেই দারোয়ানটা চিৎকার করে তেড়ে এলো প্রথম দিনের মতো। অবাক হয়ে যায় সে—আজ তার কি অপরাধ তা' সে বুঝতেই পারে না। তবু ধীর কণ্ঠে গেটের বাইরেথেকেই বলে ওঠে দারোয়ানটা, কুমারবাবুকে তো রোজই তুমি পার্কে নিয়ে যেতে, আজ-কাল আর কেন নিয়ে যাও না ? কুমারবাবু ভালো……।

শেষ কথাগুলো তার চাপা পড়ে যায় মোটরের তীব্র হর্ণের শব্দে। দারোয়ান তার টুল থেকে লাফিয়ে উঠে লম্বা এক সেলাম দিয়ে গেটের দু'টো দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়ালো।

গাড়ী বারাণ্ডায় গিয়ে মোটারটা দাঁড়ালো। দারোয়ান দৌড়ে গিয়ে মোটারের দরজা খুলে দিয়ে কি যেন বললো। গাড়ী থেকে নেমে সোজা গেটের দিকে এগিয়ে এলেন রাজা প্রতাপভূষণ।

ভারী গলায় প্রশ্ন করলেন সুনির্ম্মলকে, কি চাই ?

আজ্ঞে, যদি মকুকে একবার……

কথাটা অসম্পূর্ণই থেকে গেল। রাজা বাহাদুর গলাটাকে সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, তার খোঁজে তোমার কি প্রয়োজন হে। ও একটা দুধের বালক, আর তুমি এত বড়, তার ওপর আবার স্বদেশী করো। তুমিই মাথাটা খেয়েছ আমার ছেলের। যাও, এখনই বিদেয় হও। হবে না মকুর সঙ্গে দেখা।

যুদ্ধের বাজার। রাস্তায় একটানা চলেছে মিলিটারী ট্রাক-গুলো। একটার পর একটা চলেছে—যেন ট্রাকের ঢেউ।

*** *** *** ***

পরের দিন, খবরের কাগজের যেখানে সহজে কারো পড়ে না চোখ, ছোট্ট একটা জায়গায় একটা খবর বের হ'ল,—"গত কাল একজন অজ্ঞাতনামা যুবক মিলিটারি ট্রাকের ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়ে যায় রাস্তার ফুটপাতে। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক রক্তে লাল হয়ে যায়। এম্বুলেন্সবাহিনী তৎক্ষণাৎ তাকে মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিকারের ঝোঁকে তাকে বলতে শোনা যায়, মকু, তোমায় আমি খারাপ করেছি ভাই? তোমার বাবা আমায় বললেন। একবারটি বলো না ভাই, তুমি আমায় কতো ভালবাসো। সেই সুর করে একবার বলো—এ—তো।"

নীতা

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী

চারিদিক্ রিম্‌ঝিম্ রাত্রির নিঃঝুম,
আকাশের কালো বুকে নীহারিকা খায় চুম।
নিশীথের তারা-দল বিরহেতে নিমগন,
চাঁদ নেই আলো ক'রে ধরণীর ফুল-বন।

যদি পথ ভুলে যাই পথে হায় লোক নেই,
মাঝে মাঝে জোনাকীরা আলো জ্বালে আঁধারেই।
গৃহ-কোণে জ্বলে দীপ্ আঁধারেতে টিপ্‌টিপ্,
বিদ্-ঘুটে কালো-রাতে বুক ক'রে ঢিপ্‌টিপ্।

চুপ্‌চাপ্ চারিদিক্ নেই কোন শব্দ,
মা'র বুকে নীতা তাই হ'য়ে আছে স্তব্ধ।
ফাট্‌লেতে পেঁচা বুঝি ডাকে ওই সঘনন্,
বন থেকে ডাকে শিবা গলা ছেড়ে প্রাণপণ্।

মা'র ক্রোলে নীতা তাই ভয়ে হলো মহাভীতা,
দুই হাতে গলা ধরি' হয়ে ওঠে সচকিতা।
ধীরে ধীরে ওই ঘরে নিভে গেল দীপ যেই,
দু'টি চোখ বুজে 'নীতা' মনে করে সেও নেই।

শিশু সাময়িক-পত্র

শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে

প্রতি দেশে সাহিত্যের উন্নতির মূলে থাকে সাময়িক পত্র। আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, সংবাদ পত্রই সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোড়ন এনে উন্নতির পথে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের এ দেশের শিশু সাহিত্যের উন্নতির মূলে সাময়িক-পত্রের দান রয়েছে প্রচুর। উনবিংশ শতাব্দীতে ছাপা খানার প্রতিষ্ঠা হওয়ার কিছুকাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছোটদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রথম বই লিখলেন। এর পর কেরী সাহেব "ইতিহাস-মালা' প্রকাশ করেন। এই ভাবে এ দেশে বই প্রকাশিত হতে থাকে। তবে এই সমস্ত বইগুলোর অধিকাংশই হল নীতিকথা বা অনুবাদ। ১৮৮২ সনে কেশবচন্দ্র সেন বিলাত থেকে ফিরে এসে "বালক বন্ধু" প্রকাশের সাথে সাথে শিশু সাহিত্যের বিষয়বস্তু পরিবর্ত্তন হতে থাকে। শিশু সাহিত্যে নূতন ভাবে প্রাণ সঞ্চার হয় "সন্দেশ" পত্রিকা প্রকাশের পর। সাময়িক পত্রিকা ও বার্ষিকীতে সে সমস্ত গল্প কবিতা প্রকাশিত হয় সেইগুলো পরবর্ত্তী কালে এই আকারে শিশু সমাজে বহুল প্রচার লাভ করে। শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশের কথা জানতে হলে আমাদিগকে শিশু সাময়িক পত্রের ইতিহাসের কথা জানা প্রয়োজন।

খ্রীষ্টান ভার্ণাকুলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা ছোটদের জন্য "সত্যপ্রদীপ" নামে একটি মাসিক পত্রিকা ১২৬৬ সনে (ইং ১৮৬০) প্রকাশ করে। এটাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ছোটদের জন্য প্রথম পত্রিকা। পত্রিকাটি ছোটদের জন্য হলেও এতে বড়দের জন্য লেখা বহু গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। চার বছর প্রকাশের পর পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয় নি। সত্যপ্রদীপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রায় আট বছর পরে ১২৭৮ সালের মাঘ মাসে (ইং ১৮৭২) মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও তারাকুমার কবিরত্নের সম্পাদনায় "বিশ্বদর্শন" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল—"বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি, সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সব প্রকাশ করা।" এক বছর পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশের পর পত্রিকাটি মাসিক হিসাবে প্রকাশ হতে থাকে। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ৺কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হতে ফিরে আসার পর বিলাতের চিলড্রেন ফ্রেণ্ড পত্রিকার অনুকরণে ১২৮৫ সনের ২০শে বৈশাখ (ইং ১৮৭৮) "বালকবন্ধু" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হতে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং ১২৮৭ সন হতে মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন প্রকাশের পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। ১২৯৩

সনে পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হয় এবং ১২৯৮ সনের বৈশাখ মাস হতে বালকবন্ধুর "নূতন প্রকরণ" প্রকাশিত হয়। ১২৮৮ সনের কার্ত্তিক মাসে জানকীপ্রসাদ দে'র পরিচালনায় "বালক হিতৈষী" নামে একটি মাসিক; এই বছরে ছোটদের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা "আত্মকাহিনী" প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পাদনা কোরতেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়! ১২৯০ সনে (ইং ১৮৮৩) "সখা" প্রকাশিত হলে শিশু সাহিত্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ ছোটদের জন্য সখাই প্রথম সাময়িক পত্র। "সখা"র পূর্ব্বে যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর ভেতর বড়দের জন্য বহু রচনা প্রকাশিত হত। এমন কি কয়েকটি পত্রিকায় বড়দের উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন প্রমদাচরণ সেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকাটি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হত। লেখকদের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে তিনি লেখা সংগ্রহ করতেন, নিজে ছবি আঁকতেন আবার নিজেই দোকানে দোকানে পত্রিকা বিলি করতেন। ১৮৮৫ সনের জুন মাসে প্রমদাচরণের মৃত্যু হলে পরবর্ত্তী জুলাই মাস (সখার ৩য় বর্ষের ৭ম সংখ্যা) হতে ১৮৮৬ সন পর্য্যন্ত পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন শিবনাথ শাস্ত্রী। শিবনাথ শাস্ত্রীর পর পত্রিকাটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন অন্নদাচরণ সেন। পত্রিকাটির সর্ব্বশেষ সম্পাদক ছিলেন কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

১২৯০ সনের ভাদ্র মাসে ঢাকা হতে ছোটদের জন্য একটি মাসিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম "বালিকা"। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ছোটদের মাঝে খ্রীষ্টিয় মতবাদ প্রচারের জন্য ১২৯০ সনের কার্ত্তিক মাসে জে, ই, সেন "বাল্যবন্ধু" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী হতে কিশোরদের জন্য ১২৯২ সনের বৈশাখ মাস হতে "বালক" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "জীবনস্মৃতি"তে লিখেছেন—"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজ বউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ীর বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে।" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ইহার সম্পাদিকা ছিলেন। এক বছর প্রকাশের পর পত্রিকাটি "ভারতীর" সাথে মিলিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন এর সম্পাদনা করেছিলেন।

"বালকের" সমসাময়িক কালে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ হতে "প্রকৃতি" ও বরদাকান্ত মজুমদারের সম্পাদনায় "শিশু" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। যশোহর হতে ছোটদের জন্য নীতি বিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। তার নাম ছিল "সুখীপাখী"। পত্রিকাটি ১২৯৫ সনে প্রকাশিত হয়। "খৃষ্টীয় বান্ধব" পত্রিকার প্রকাশক জি, এইচ রুজ ১২৯৬ সনে (ইং ১৮৮৯) "শিশুবান্ধব" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা অনুসন্ধান করে ১৮৮৯ সনের জুলাই সংখ্যায় "শিশু বান্ধবের" নাম দেখতে পাওয়া যায়।

১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায় "সাথী" প্রকাশিত হয়। "সখা"র মত সাথীও শিশু সমাজের বিশেষ প্রিয় ছিল। তখনকার দিনে ছোটদের ভেতর দু'টি দল ছিল একটি সখার পাঠকদল, অপরটি সাথীর পাঠকদল। মাসের শেষে এই দুই দলের শিশুরা পত্রিকার জন্য সকলে এসে ভিড় করত। এক বছর প্রকাশের পর সাথী সখার সাথে মিলিত হয় এবং "সখা ও সাথী" নাম ধারণ করে।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় হতে ১৩০২ সনের আষাঢ় মাসে "মুকুল" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়! পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। চট্টগ্রাম হতে রাজেশ্বর গুপ্তর সম্পাদনায় ১৩০৫ সনে (ইং ১৮৯৮) "অঞ্জলি" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল—"এইখানি শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা ইহার প্রাণ।"

"সন্দেশ" পত্রিকাটি শিশু সাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা করে। পত্রিকাটি ছোটদের প্রিয় লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩২০ সনে (ইং ১৯১৩) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সখার মতই ছোটদের খুবই প্রিয় ছিল, পত্রিকাটির নামকরণ সার্থক হয়েছিল। এই পত্রিকায় চির সবুজের কবি সুনির্ম্মল বসুর কয়েকটি কবিতার সাথে কবির নিজের হাতে আঁকা ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা দেশের কয়েকজন শিশু সাহিত্যিকের হাতে খড়ি হয় এই পত্রিকায়। উপেন্দ্র-কিশোরের মৃত্যুর পর কবি সুকুমার রায় ও তারপর সুবিনয় রায় ও সুধাবিন্দু বিশ্বাস পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন।

বর্ত্তমানে ছোটদের জন্য যে সমস্ত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার ভেতর "মৌচাকে"র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩২৬ সনে (ইং ১৯১৯) সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় মৌচাক প্রকাশিত হয়। মৌচাকের প্রথম সংখ্যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

"ঝরঝরে মৌচাকের মধু গন্ধ
পাওয়া যায় হাওয়ায়,
দাওয়ায় বসে ভাবিস কি আর
আয় রে তোরা বেরিয়ে আয়।"

১৩২৭ সনে ফণীন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় "অঞ্জলি" প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কিন্তু কয়েক বছর পরে বন্ধ হয়ে যায়। মৌচাক প্রকাশের প্রায় তিন বছর পরে "শিশুসাথী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা ১৩২৯ সনে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি এখনও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন আশুতোষ ধর, বর্ত্তমানে হরিশরণ ধরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। ১৩৩০ সনে নিশিকান্ত সেনের সম্পাদনায় "খোকা খুকু," শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে শিশির মিত্রের সম্পাদনায় "আমার দেশ"; ১৩৩৩ সনে সুনির্ম্মল বসুর সম্পাদনায় "আলপনা," ১৩৩৪ সালে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও গিরিজা বসুর সম্পাদনায় "যাদুঘর," সুধাংশুশেখর গুপ্তের সম্পাদনায় "রাজভোগ," বীরেন রায়ের সম্পাদনায় "পাততাড়ি," ভূপেন্দ্রকিশোর

রক্ষিত রায়ের সম্পাদনায় "বেণু" প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সনে শিশু সাময়িক পত্রের আকাশে আশা ও আনন্দের প্রতীক "রামধনু" দেখা দেয়। অধ্যাপক মনোরঞ্জন বসুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। পরবর্ত্তী কালে অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুর পর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবং আজো তাঁরই সম্পাদনায় পত্রিকাটি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ১২৩৫ সনে ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায় মাসিক "মাস পয়লা" প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর নিয়মিত ভাবে প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কয়েক মাস পরে আবার প্রকাশিত হয় ও কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৩৫ সনে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সতীকান্ত গুপ্তের সম্পাদনায় "চিত্রা," ১৩৩৮ সনে হৃষিকেশ ভৌমিকের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "আদর্শ," শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় "সাজি," প্রিয়নাথ দাসের সম্পাদনায় "অঙ্কুর," ১৩৪১ সনে রবীন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় "মোহন বেণু," ১৩৪২ সনে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় "ধ্রুব" প্রকাশিত হয়। ১৩৪৩ সনে "রংমশাল" মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে বার বছর প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পর যাদের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তাদের ভেতর রয়েছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সতীকান্ত গুহ, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৪৩ সনে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "কিশোর," ১৩৪৪ সনে শৈলেন্দ্রনাথ গুহর সম্পাদনায় "কৈশোরিকা," সুহৃৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "ছেলে খেলা," প্রভাতকিরণ বসুর সম্পাদনায় "জলছবি," নীহার সিংহ ও অনিল চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় "কচি কথা" প্রকাশিত হয়। ১৩৪৪ সনে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় "কৈশোরক" প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বার বছর প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৪৫ সনে প্রভাতকিরণ বসুর সম্পাদনায় "ভাই বোন," কবি নরেন্দ্র দেবের সম্পাদনায় "পাঠশালা," "কিশোর কিশোরী," রমাপ্রসাদ মিত্র ও কুমুদরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় "আলো," জনাব নাসিরুদ্দিন সম্পাদনায় "শিশু সওগাত," সব্যসাচীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "শিশু ভারত," ১৩৪৬ সনে বাণী দেবী ও মিনতি ঘোষের সম্পাদনায় "ছেলে খেলা," অনিল ঘোষ ও জগদীশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় "নব ভারতী," ১৩৪৭ সনে রবিরঞ্জন মিত্রের সম্পাদনায় "রূপকথা," বিজন গাঙ্গুলীর সম্পাদনায় "শিখা," ১৩৪৮ সনে অন্নপের সম্পাদনায় "কিশোর বাংলা," ১৩৪৯ সনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "আমার কাগজ" প্রকাশিত হয়। দেব সাহিত্য কুটীর হতে ১৩৫৪ সনে "শুকতারা" প্রথম প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি এখনও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন মধুসূদন দেব। ১৩৪৬ সনে ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বিশু মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "রবিবার" প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সনের ৫ই এপ্রিল শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় "কিশোর" নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটাই বাংলা দেশ তথা ভারতের কিশোরদের প্রথম দৈনিক পত্রিকা; মাঝে এমন একটা সময় এসেছিল যখন কয়েক বছরের ভেতর ছোটদের জন্য খুব বেশীসংখ্যক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন পত্রিকাই দুবছরের বেশী স্থায়ী হয় নি। ঐ সময়ে যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলোর ভেতর ১৩৫৩ সনে বিজন গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "আমার কাগজ", ১৩৫৪ সনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "মশাল", খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "ছোটদের মহল", ১৩৫৬ সনে শ্যামাপদ কর্ম্মকারের সম্পাদনায় "আমরা", শঙ্কর মিত্রের সম্পাদনায় "উন্মেষ", তারাপদ সাঁতরায় সম্পাদনায় "পথের আলো", ১৩৫৭ সনে শ্যামাপদ কর্ম্মকারের সম্পাদনায় "সোনার বাংলা" শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় "অরুণোদয়", খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "নূতন মানুষ" ১৩৬০ সনে অমিয়কুমার রায়ের সম্পাদনায় "সাপ্তাহিক কিশোর" নামক প্রকাশিত পত্রিকা গুলোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশু সাহিত্যের হাট হতে ভাল ভাল রচনা চয়ন করে ছোটদের মনের খোরাক সংগ্রহ করে দেবার জন্য ১৩৫৭ সনে প্রতিনাথ চক্রবর্ত্তী ও অনিলকুমার চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় "চয়নিকা" নামক মাসিক পত্রিকাটি প্রভাবিত হয়। পত্রিকাটি আজো নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আলোকনাথ চক্রবর্ত্তী পত্রিকাটির প্রধান পরিচালক। ১৩৫৯ সনে প্রসুন বসুর সম্পাদনায় "আগামী" প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে যে সমস্ত পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় তার ভেতর "আগামী" একটি।

এখানে যে সমস্ত পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছি এ ছাড়াও এমন কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলো এককালে ছোটদের খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকাগুলো বিষয়ে কোন সংবাদই সংগ্রহ করা যায় নি। সেই সমস্ত পত্রিকার ভেতর ঢাকা থেকে প্রকাশিত "তোষিনী", মহম্মদ শহীদুল্লার সম্পাদনায় প্রকাশিত "অঙ্কুর", সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত "খেলাঘর", হেমেন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত "সোপান", মধুসূদন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত পাক্ষিক "সাধনা" ও "কবি কথা"র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিরদিনের ছড়া

বিশ্বনাথ দে

ছেলেখেলার ছড়া

ছোটোরা যে সব ছড়া কেটে কেটে নিজেদের মধ্যে খেলাকরে সাধারণতঃ সেগুলিকেই ছেলেখেলার ছড়া বলা হয়। কতকগুলি ছেলেখেলার ছড়া আছে যেগুলির কথা আলাদা আলাদা হলেও এক রকমের খেলাতেই তাদের ব্যবহার। যেমন এই ছড়াটি :

চাক্কুলাটা পানের বাটা,
চাক্কু দুই তুলে থুই,
চাক্কু তিন ঘোড়ার ডিম,
চাক্কু চার পগার পার
চাক্কু পাঁচ ধিন্‌তা নাচ,
চাক্কু ছয় খুকুর জয়,
চাক্কু সাত কুপোকাৎ,
চাক্কু আট গড়ের মাঠ,
চাক্কু নয় বাঘের ভয়
চাক্কু দশ খেজুর রস,
চাক্কু এগারো ফক্কা গেরো,
চাক্কু বারো কিস্তি মারো ॥

ওপরের ছড়াটির মতো ছড়াগুলি দু'জন বা দু'দলে আলাদা হয়ে খেলা করার জন্যে। একজন বা একদল বলবে 'চাক্কু লাটা' অন্যজন বা অন্যদল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে 'পানের বাটা'। এই ধরণের আর একটি ছড়ায় কথা বলা যায় :

দিদিগো দিদি একটা কথা
কী কথা ? ব্যাঙের মাথা।
কেমন ব্যাঙ্‌ ? সুরু ব্যাঙ্‌।
কেমন সুরু ? বামন মুরু।
কেমন বামন ? ভাট বামন।
কেমন ভাট ? ঘোড়ার চাট।
কেমন ঘোড়া ? আচ্ছা ঘোড়া।
কেমন আচ্ছা ? বাঁদর বাচ্ছা।
কেমন বাঁদর ? মুড়ার বাঁদর।
কেমন মুড়া পাতা মুড়া।
কেমন পাতা ? মিছা কথা ॥

দু'দলে বা দু'জনে খেলার মতো ছড়া আরো আছে, একটু অন্য ধরণের। ছড়ায় প্রশ্ন হবে : ওপারে কে রে ? জবাব : আমি খোকা। এই ভাবে পুরো ছড়াটি :

ওপারে কেরে ? আমি খোকা।
মাথায় কিরে ? আমের ঝাঁকা।
খাসনে কেনরে ? দাঁতে পোকা।
বিলোসনে কেনরে ? ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌ !

এই ওরে 'বাপ্‌রে বাপ্‌' কথাটি বলবে যেন খুব ভয় পেয়েছে। খুব অবাক হয়েছে, এমনি ভাবে। দাঁতে পোকা হবার জন্যে খেতে না পারা, মাথায় নিয়ে বয়ে বেড়ানো আমগুলি অপরকে বিলিয়ে দিতে হবে শুনলে কে না ভয় পায়, কার না অবাক হবার পালা আসে !

ঝড়-বৃষ্টির দিনে ছোটোরা বাইরে বেরুতে না পেরে ঘরের মধ্যে বা দাওয়ায় বসেই এই রকম সব ছড়া কেটে কেটে নিজেরা খেলা করতো।

পুরোনো-দিনের ছেলেখেলার ছড়া আরো অনেক রকম আছে। যেমন মেয়েদের খেলার একটি ছড়া হলো এই রকম :

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো গে
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোট গে।
ও বেগুনটা কুটো না, বীজ রেখেছে,
ও দুয়ারে যেয়ো না বঁধু এসেছে।
বঁধুর পান খেও না ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে ॥

মেয়েদের খেলার আরো একটি ছড়া হ'লো :

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
তায় পলো মাকড় বিছি।
মাকড়েরা লড়ে চড়ে
সাত কুমড়ার ডিম পাড়ে।
এলের পাত্‌ বেলের পাত্‌
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়ি কুড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাড়ি।
চাল কাড়তে হ'লো বেলা—
খল্‌সে মাছের চোকা
উড়ে বসে পো—কা ॥

আর একটি খেলার ছড়া খুব প্রচলিত আছে 'আগাডুম্‌ বাগাডুম্‌ ঘোড়াডুম্‌ সাজে। ডান মিরগেল ঘাঘর বাজে' ॥ কিন্তু এ ছড়াটি অনেক রকম ভাবে প্রচলিত আছে কোথাও কোথাও, সেটাই বলি :

অ্যাংটুল্‌ ব্যাংটুল্‌ ঘোড়াটুল্‌ সাজে।
ঢাল মেঘর ঘোঘর বাজে ॥
বাজতে বাজতে চললো ডুলি।
ডুলি গেলো সেই কর্ণফুলি ॥
কর্ণফুলির টিয়েটা।
সুর্য্যিমামার বিয়েটা ॥
অ্যাংটুল্‌ ব্যাংটুল হাটে যায়।
পান্‌ সুপারী কিনে খায় ॥
একটি পান ফোঁপ্‌রা।
মায়ে ঝিয়ে চোপড়া ॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল—
মামার নামে টগর ফুল ॥

ছেলেখেলার ছড়া আরো অন্য ধরণের আছে। শুধু ঘরে বসে বসেই নয়, বাইরে—বাগানে—মাঠে—উঠানে ঘুরে ঘুরে দল বেঁধে, যে সব ছড়া কেটে কেটে ছোটোরা খেলা করে। যেমন :

আয় টিনের বাক্‌সো
ড্যাডাং ড্যাডাং ডেক্‌সো।

চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
কাল বলেছে যেতে
পান-সুপারী খেতে।
পানের ভেতর মৌরি বাটা
ইস্কাবনের চাবি আঁটা॥

এই রকম আর একটি হ'লো :

ওপেনটি বেইস্কোপ
টান টুন টেইস্কোপ।
আমপাতা জোড়া জোড়া
মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া।
ওরে বিবি সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া খেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে।
অল্‌রাইট ভেরি গুড্
পাঁউরুটি বিস্কুট॥

অন্য একটি :

আই কাম ভাই কাম তাড়াতুড়ি।
যদুর মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী॥
রেল কাম ঝমাঝম্।
পা পিছলে আলুর দম॥
জলসাবু পাতিনেবু।
বলে গেছেন ডাক্তারবাবু॥
ইষ্টিসানের মিষ্টি কুল।
সখের বাদাম গোলাপফুল॥

ওপরের ছড়া তিনটি ছেলেখেলার ছড়া। কিন্তু বেশ বোঝা যায় এসব ছড়া তৈরী হয়েছে আমাদের দেশে ইংরেজ আসার পর বা ইংরাজী কথাবার্তা চালু হবার পর। কারণ এগুলির মধ্যে ইংরাজী শব্দের ছড়াছড়ি 'অল্‌রাইট, ভেরিগুড' 'ডাক্তার' 'মাষ্টার' 'আই কাম' 'ষ্টেসন' ইত্যাদি শব্দগুলি থেকেই তা বুঝা যায়।

আবার খুব নতুন একটি খেলার ছড়ার কথাও বলা যেতে পারে :

সা রে গা মা পা ধা নি
বোম ফেলেছে জাপানী।
বোমার ভেতর কেউটে সাপ্
ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ্॥

ছড়া খুব প্রচলিত বলে তার রচয়িতার নাম যে কেউ মনে করে রাখে না, এই ছোট্ট ছড়াটাই সে কথা প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছে। কেন না, ছাপাখানায় বই ছাপাবার আগের যুগের মুখে মুখে তৈরী আর মুখে মুখে প্রচারিত ছড়া নয়, মাত্র কয়েক বছর আগেকার ইংরেজ-জাপান যুদ্ধের সময় তৈরী হয়েছে এই ছড়াটি। তবু কে যে এর লেখক, কে যে এটিকে সে সময় বানিয়েছিল, তা এখন আর কেউই জোর করে বলতে পারবে না।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে শুধু পুরোণো দিনের ছড়ার লেখকরাই নয়, এই সেদিনের ছড়া-লেখকদের নামও হারিয়ে যেতে পারে, যদি তার বানানো ছড়া সত্যিকারের ছড়া হয় আর তা' জনে জনে প্রচারিত হয়। মুখে মুখে শুধু ছড়াটি প্রচারিত হয় বলেই তার লেখকের নামটি লোকে ভুলে যায়।

এবারে ছেলেখেলার ছড়ার কথা হলো। এরপর আরেক রকম মজার ছড়ার কথা হবে 'ধাঁধার ছড়া'। সেও একরকমের খেলার ছড়া। তবে বুদ্ধির খেলা। ছড়া কেটে কেটে তার মানে জিজ্ঞেস করে, লোককে বোকা বানানোর খেলা।

অকলঙ্ক

শ্রীহরিপদ গুহ

বহু বৎসর পূর্ব্বে আমাদের স্কুলে বিয়োগান্ত যে নাটকীয় ঘটনার অভিনয় হয়েছিল, তার স্মৃতি মনে হলে আজো আমার চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, তা' সুখেরই হোক্, আর দুঃখেরই হোক্, যার স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না! মাঝে মাঝে তা মনে উদয় হয়ে ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়কে চঞ্চল ও ব্যথাতুর করে তোলে।

আজ প্রথমেই মনে পড়ে সেই দিনটির কথা—যেদিন পাঠশালার গণ্ডী পার হয়ে ইংরেজী স্কুলে এসে ঢুকলাম। মফঃস্বলের ছাত্র আমি, পল্লীর একটি স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশের মধ্যে নিরুদ্বিগ্ন জীবন গড়ে উঠেছিল।

ক্লাসে অম্বিকাই প্রথম আমার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে আলাপ কর্‌তে আস্‌ল। প্রথম দর্শনেই সে আমাকে আপন করে নিয়ে অকপটে তার জীবন-কথা বল্‌ল। বয়স তার আমারই মত, শ্যামবর্ণ, ছিপ্‌ছিপে গড়ন। তার মা নেই, বাবা আবার বিয়ে করেছেন। বিমাতা তাকে একটুও ভালবাসেন না। নিজে তো সারাদিন খিট্‌ খিট্‌, বকাবকি করেনই, রাত্রে বাবা বাড়ী এলে, অনেক মিথ্যা কথা বলে তাকে মার খাওয়ান। তার এই করুণ কাহিনী

শুনে, আমার অন্তরটা বেদনায় ভরে উঠল। কিছুতেই চোখের জল গোপন কর্‌তে পার্‌লুম না। এই ভাগ্যহীনের অন্তর বেদনা আমার মনের দুয়ারে আঘাত কর্‌ল।

লেখাপড়ায় সে অতি সাধারণ ছাত্রই ছিল। কিন্তু তার কতক গুণ ছিল, সেসব গুণ অন্য ছাত্রদের মধ্যে ছিল না। তার কণ্ঠ ছিল অতি মধুর। স্কুলে কোন উৎসব হলে সে গান গাইত এবং আবৃত্তি কর্‌ত। এতে সে বরাবরই প্রথম পুরস্কার পেত। কারো অসুখ বিসুখ এবং বিপদে আপদে সে প্রাণ ঢেলে সেবা ও সাহায্য করত। এইজন্য সকলেই তাকে স্নেহ কর্‌ত।

সে দিনটির কথা আজো ভুল্‌তে পারি না। সেক্রেটারীর ছেলে বিনোদও আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত। সে একখানি সুন্দর ছোট ছুরি নিয়ে স্কুলে আস্‌ত। আমরা অনেকেই সেটা দিয়ে পেন্সিল কাটতুম। সেদিন টিফিনের পর তার ছুরিখানি পাওয়া গেল না। প্রত্যেককেই সে ছুরির কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ল, কিন্তু কেউই সেটা নিয়েছে বলে স্বীকার কর্‌ল না। অগত্যা সে গিয়ে হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে নালিশ কর্‌ল। তিনি ক্লাশে এসে সকলকেই ছুরির কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। সকলেই একবাক্যে জবাব দিলে—জানে না! তখন তিনি সকলের জামার পকেট তল্লাস কর্‌তে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত অম্বিকার পকেট থেকেই ছুরি বেরুলো। অম্বিকা দৃঢ়স্বরে বল্‌ল—সে এর কিছুই জানে না। কেউ হয় তো তার পকেটে রেখে দিয়েছিল।

হেডমাষ্টারমশাই তার কথা বিশ্বাস কর্‌লেন না। তাঁর অত্যন্ত রাগ হলো। এই চৌর্য্য অপরাধের জন্য একখানি বেত দিয়ে তাকে ভীষণ ভাবে প্রহার কর্‌তে লাগলেন। সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বেতটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভাঙ্গল, তিনি আঘাতের পর আঘাতই করে যেতে লাগলেন। অম্বিকা একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

তিনি কাঁপতে কাঁপতে অফিস ঘরে চলে গেলেন।

আমি গ্লাসে করে জল এনে অম্বিকার চোখে মুখে দেওয়ার পর তাহার জ্ঞান ফিরে এলো। সে ছল্‌ ছল্‌ চোখে সকাল মাথর দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বলে—'সত্যি ভাই, ছুরি আমি নেই নি।' আমরা সেদি[ন] কোন সান্ত্বনাই দিতে পারলুম না!

ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই সে বাড়ী চলে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। হে[ডমাষ্টার] মশাই পত্রদ্বারা ঘটনাটা অম্বিকার পিতাকেও [জানিয়ে] দিলেন।

রাত্রে পিতা তাকে আর এক দফা প্রহার [করলেন] এবং সে রাত্রে আহার বন্ধ করে দিলেন। বিমা[তা] সুযোগে তাকে অনেক তিরস্কার করে মনের [ঝাল] মেটালেন।

সারারাত আম্বিকা মাটিতে শুয়ে ছটফ্‌ট্‌ করে ক[াটাল]। কেউ তাকে একটা মিষ্ট কথা বলেও সান্ত্বনা দিল ন[া]।

পরদিন অম্বিকা ক্লাশে এলো না। আম[রা মনে] কর্‌লুম—লজ্জায় সে আজ আসে নি, কাল [সে] তো আস্‌বে।

পরদিন একটি ছেলের মুখে শুনলুম—তার খু[ব জ্বর]। বিকার ঘোরে সে খালি বল্‌ছে—'ছুরি আমি নিই [নি]'

পরদিন স্কুলে এসে শুন্‌লুম—অম্বিকা আজ [ভোরে] মারা গেছে। মরেই বোধ হয় সে এই মিথ্যা কল[ঙ্ক থেকে] মুক্তি পেলো! একটি কুসুম অকালে ধরণীতে ঝরে [পড়ল]। সে যে লজ্জা, বেদনা ও অপমান পেল, একমাত্র [ভগবান] ছাড়া বোধ হয় আর কেউ তার সে অন্তর-বেদ[না বোঝে] না! তাই হয় তো তিনি তাকে কোলে তুলে নিলে[ন]।

অম্বিকার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মন্মথ আমাকে বল্‌লে—'সত্যিই ছুরি অম্বিকা নেয় নি, [আমি] তার পকেটে রেখে দিয়েছিলুম। সেদিন ভয়ে বল্‌তে পারি নি। মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি বলে[ই] তোকে বল্‌লুম।'

কত বর্ষ অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিনের সে দৃশ্য আজো আমার চোখের সাম্‌নে জল্‌ জল্‌ কর্‌ছে[।] মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি যখনই মনে আসে, আমাকে এ[কেবারে] অস্থির করে তোলে।

এবারের বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাত্রিংশৎ অধিবেশন গত ১লা, ২রা ও ৩রা নভেম্বর (১৯৫৬) ঐতিহাসিক আগ্রা নগরীতে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা বৎসরের এই সময়ের অর্থাৎ সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের অপেক্ষায় থাকেন। এই সম্মেলনের সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তিনটি দিক আছে।

এবারের আগ্রা অধিবেশনে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল; কারণ প্রায় সাড়ে তিনশ প্রতিনিধির থাকার মত বড় খালি কোন বাড়ী পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতিনিধিরা অন্য অন্য অধিবেশনে 'প্রতিনিধি-শিবিরে'র নামে বাড়ীতেই সাধারণতঃ থেকেছেন; কিন্তু এবারে তাঁরা সত্যিই "প্রতিনিধি-শিবিরে" থাকার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এতে অবশ্য সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই ছিল; তবুও এটা একটা সুযোগ, যা সাধারণতঃ পাওয়া যায় না।

এবারের অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের থাকবার জন্য প্রতিনিধি-শিবিরগুলির কয়েকটি

এবারের অধিবেশনের মূল-সভাপতি ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগীয় প্রাক্তন সেক্রেটারী এবং বর্তমানে সংসদ-সদস্য অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে—সাহিত্যে শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, সমাজ ও সংস্কৃতি শাখায় ডঃ কালিদাস নাগ, শিল্পকলা শাখায় শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর; হিন্দী সাহিত্য শাখা ও কবি-সম্মেলনে শ্রীবালকৃষ্ণ শর্মা নবীন এবং কবি-সম্মেলনে প্রধান অতিথি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

অধিবেশন আরম্ভ

১লা নভেম্বর দুপুর আড়াইটায় সমবেত জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে এবারের অধিবেশন সুরু হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি আগ্রার পুরানো বাসিন্দা, প্রতিষ্ঠাবান আইনব্যবসায়ী ও সাহিত্যানুরাগী শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী তাঁর ভাষণে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলেন—"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর যে বাংলা সাহিত্য একেবারে অন্ধকারে গিয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা গিয়াছিল, তাহা সৌভাগ্যক্রমে অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে। কত পুস্তক যে কত গুরুগম্ভীর বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বাঙ্গালী মাত্রই জানেন। কি বিষয়ের অভিনবত্বে, কি মৌলিকতায়, কি বস্তু সম্পর্কে সকল দিক দিয়াই ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। প্রবাসের অধিকাংশ লোকই লেখেন না বটে, তবে তাঁহারা যে রসগ্রহণেচ্ছু তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীহুমায়ুন কবীর মূল সভাপতির ভাষণে বলেন যে নব নব শক্তি ও ভাবধারার অভিঘাতের আহ্বান গ্রহণের ভিতর দিয়েই যে মানুষের জীবন ও তার সাহিত্য সার্থক হয়ে ওঠে, প্রাচীন যুগ থেকে বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশের জনগণের মত বাঙ্গালার জনজীবনের ইতিহাসে বহু উত্থান পতন ঘটেছে। যখনই সাহস ও উদ্যমশীলতার সঙ্গে বাঙ্গলাদেশ দুর্যোগ এবং নানা শক্তি ও ভাবধারার সম্মুখীন হতে পেরেছে, তখনই তার সাহিত্যের জয়যাত্রা ঘটেছে। তিনি আরও বলেন, বাঙ্গলা দেশের রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদ স্বীকার করে নেওয়া হলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরবার কোন কারণ নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উভয় রাজ্যের জনগণের অনুরাগ শুভ লক্ষণ।

অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ তারিণীচরণ বসু চৌধুরী অধিবেশন উপলক্ষে প্রাপ্ত ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষণ ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের বাণী পাঠ করেন। সম্মেলনের পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদক অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ বোর্ডের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং তারপর শ্রীকবীর বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উপাধিপত্র প্রদান করেন। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীষষ্ঠীকুমার মুখার্জীর বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্রনাথ ঘটক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গানটি সমবেত কণ্ঠে গীত হওয়ার পর বিকাল সাড়ে চারটায় এই অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত বাংলা ও হিন্দী গ্রন্থ, আলোকচিত্র এবং শিল্প কাযের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর শ্রীকে, পি, ভাটনগর। প্রদর্শনী উদ্বোধনের আগে শ্রীভাটনগর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতিতে বাঙ্গালীদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। প্রদর্শনীর একটি ঘরে ছিল বাংলা পুস্তক, ভারতের বিভিন্ন ভাষার

প্রকাশিত পত্রপত্রিকা এবং বাংলা দেশের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে খ্যাতনামা তিরিশজন ব্যক্তির আলোচনাকারী কর্তৃক গৃহীত

প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে বক্তৃতারত আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর শ্রীকে, পি, ভাটনগর (ডানদিকে), বামদিকে এবারের অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীহুমায়ুন কবির এবং সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ

আলোকচিত্র। আর একটি ঘরে ছিল হিন্দী পুস্তক সমাবেশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগও একটি ঘরে শিল্প কার্যের নানা সুন্দর জিনিষ সাজিয়েছিলেন, আরও একটি ঘরে ছিল ভারতের নানা প্রদেশের শিল্প কার্যের নিদর্শন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আরম্ভ হয় হিন্দী সাহিত্য শাখার অধিবেশন এবং কবি সম্মেলন। হিন্দী সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল সংসদ-সদস্য বিখ্যাত হিন্দী কবি পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্মা নবীনএর। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি উপস্থিত হতে না পারায় শ্রী পি, পালওয়াল তাঁর ভাষণটি পাঠ করেন এবং সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীগুলাব রাই। শ্রীনবীন তাঁর লিখিত ভাষণে স্বীকার করেন যে শুধু হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের যে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে তা নয়, সমস্ত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপরই বাংলা সাহিত্যের প্রভাব আছে। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে বাংলা দেশে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্রোতে অবগাহন করে সমগ্র ভারতই উন্নততর হয়েছে। শ্রীনবীনের এই রকম স্বীকারোক্তিতে আজকের হিন্দী প্রচারকদলের অনেকেই হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করার সৎসাহস তাঁর মনের উদারতার পরিচায়ক। সম্মেলনে ডাঃ রামবিলাস শর্মা ও অধ্যাপক জি, আর, ধর বক্তৃতা দেন এবং শ্রীহুমায়ুন কবীর ও শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

কবি সম্মেলনের প্রধান অতিথি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী কন্যার অসুস্থতার জন্য আগ্রায় যেতে পারেন নি। তাঁর আধুনিক কাব্যছন্দে লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন শ্রীমমতা গঙ্গোপাধ্যায়। কবি সম্মেলনে কয়েকজন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

২রা নভেম্বর সকাল সাড়ে নটায় আরম্ভ হয় বাংলা সাহিত্য শাখার অধিবেশন। এই শাখার সভাপতিত্ব করেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই শাখার উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু কার্য্যোপলক্ষে আটকে পড়ায় তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল অপূর্ব বাচনভঙ্গিতে সভাপতির ভাষণে সাহিত্যের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী
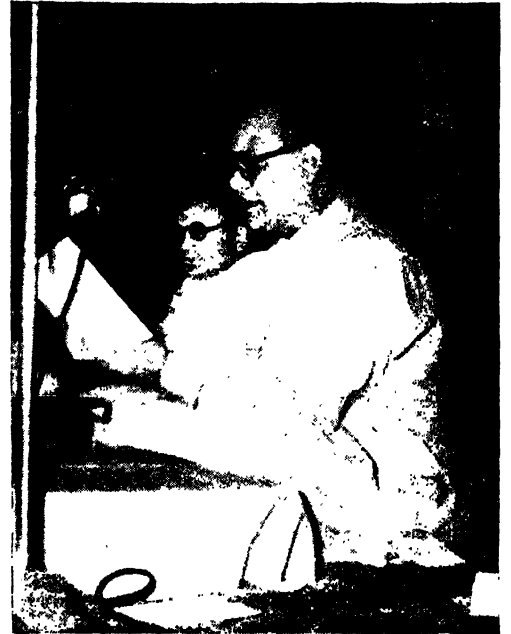
সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর অভিভাষণ পাঠ করছেন

শুনিয়ে উপস্থিত সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন—এই সম্মেলন আজ যাঁদের অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতার গুণে 'নিখিল ভারত' বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' রূপান্তরিত হয়েছে, তাঁদের প্রতি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। কেননা বাঙ্গালীর হৃদয় বৃত্তিকে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত করার দুরূহ কর্তব্যে তাঁরা সিদ্ধকাম হয়েছেন।

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের অন্তঃপুরিকা এবার বৃহত্তর ভারতে প্রসারিত ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে পদচারণা করুক, সেটি তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতারই পরিচয় হবে। ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে এবার বাঙ্গলা সাহিত্যের সুনিবিড় সংযোগ ঘটুক। তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে তিনি আরও বলেন—বাঙ্গলা সাহিত্যে আজ আবার নতুন জোয়ার এসেছে। লেখক-সমাজের মনের ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রেখে গেছে অনেক কলঙ্কের দাগ। অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারী, দাঙ্গা—এই ইতিহাস রয়েছে তাদের মনে। এদেরই হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে তারা কলম ধরেছে। জীবনের সর্বব্যাপী অপচয়ের কাল থেকে তারা পেয়েছে নতুন একটি চেতনা। তার ফলে আজ নব্যকণ্ঠের কাকলী শুনছি। শুনছি একদল শক্তিমান লেখকের পদধ্বনি। তারা আসছে যুগসন্ধিক্ষণে। তাদের পিছনে রয়েছে পরাধীন ভারতের বিপুল পরিমাণ ভগ্নস্তূপের জটলা, সামনে রয়েছে স্বাধীন ভারতের বিরাট কর্মসাধনা। অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে যাত্রা করেছে।' ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী, ডঃ বিজন-বিহারী ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজন এই শাখায় সাহিত্য বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

দুপুর আড়াইটায় 'সমাজ ও সংস্কৃতি' শাখার অধিবেশন বসে। দুঃখের বিষয় এই শাখার সভাপতি ডঃ কালিদাস নাগ মহাশয় জ্যেষ্ঠা কন্যার অসুস্থতার জন্য আগ্রায় যেতে পারেননি। তাঁর ভাষণটি পাঠ করেন শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। এই শাখায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শ্রীপাঁচকড়ি সরকার। ডঃ নাগ তাঁর ভাষণে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে বলেন যে সুদূর অতীতকাল থেকে সত্যসন্ধানী বঙ্গসন্তানদের চেষ্টায় বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক সাধনা ভারতবর্ষ ও তাহার প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলা সাহিত্য সেই ঐতিহ্যকে আরও নতুনতর সার্থকতার দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে। এই শাখার অধিবেশনে আগ্রার শ্রীমতী অপরাজিতা রায় এবং কলকাতার শ্রীমতী চিত্রিতা গুপ্তাও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় বসে চারুশিল্পকলার অধিবেশন। অনিবার্য-কারণবশতঃ এই শাখার সভাপতি লক্ষ্ণৌ কলাশিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। তাঁর সুলিখিত ভাষণটি পাঠ করা হয়। এই শাখায় সভাপতিত্ব করেন লক্ষ্ণৌয়ের সুরসিক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল। শ্রীখাস্তগীর তাঁর ভাষণে দেশের শিল্পীদের পরশ্রীকাতরতা ও আলস্য ত্যাগ করে নিজের দেশের কৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক শিল্পকলা ও সঙ্গীত গড়ে তুলতে আবেদন জানান। তিনি বলেছেন, 'শিল্পকলায় সজীবতা আনতে হলে শিল্পীদেরও হতে হবে সজাগ ও সজীব। আপনাকে জানতে চেষ্টা করতে হবে, ধার করা সম্পত্তি নিয়ে বড় হওয়া যায় না। নিজের দেশের কৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তুলতে হবে আমাদের শিল্পকলা ও সঙ্গীত। নূতনত্ব আনতে হবে কাজের মধ্যে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিদেশী শিল্পীর অনুকরণে নয়। বিদেশী শিল্পের নকলনবীশী থেকে বাঁচিয়েছিলেন দেশকে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ—পঞ্চাশ বাট বছর আগে। আবার সময় এসেছে, বিদেশী অতি-আধুনিকতার নকলনবীশী থেকে বাঁচতে হবে, অজন্তা যুগে পড়ে থাকলেও চলবে না।'

সন্ধ্যায় বিষয় নির্বাচনী সমিতি ও পরিচালকমণ্ডলীর বৈঠক বসে। ঐদিন রাত নটায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যালের পরিচালনায় "পার্থ সারথি" নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান উপভোগ্য হয়।

তৃতীয় ও শেষ দিনের অধিবেশন

৩রা নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন বসে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। এই সভায় কতকগুলি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। বিভিন্ন বিষয় আলোচনার পর আগামী বৎসরের জন্য সম্মেলনের কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হয়। এইদিন সকাল সাড়ে দশটার পর আন্তঃরাজ্য সাহিত্যশাখার অধিবেশনের সময় পৃথিবীর নয়টি বিভিন্ন দেশের তেরোজন ইউনেস্কো সম্মেলনের প্রতিনিধি

এবারের অধিবেশনে যোগদানকারী কয়েকজন ইউনেস্কো প্রতিনিধি। বামদিক থেকে: ম্যাডাম কুট্রোলি (ফ্রান্স), ভারতে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত ম্যাডাম আলভা মায়রড্যাল, শ্রীদেবেশ দাশ, ইউনেস্কোর সহকারী ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ বেনি ম্যাহো, জার্মানীর ডঃ বুনাকম্যান এবং গ্রেট বৃটেনের মিস মেরী ফিল্ড

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশএর বিশেষ আমন্ত্রণে এই দিনের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য আসেন। তাঁরা মঞ্চে বসার পর ভারতীয় প্রথায় তাঁদের কপালে চন্দনতিলক দিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানান হয়। শ্রীযুক্ত দাশ এক এক করে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন। সে সময় সভাকক্ষে বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালি শোনা যায়। রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইরাণ ও সিংহল প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাঁরা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে তাঁরা নিজ নিজ জাতির পক্ষ থেকে সম্মেলনের প্রতি শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে এসেছেন। ইউনেস্কোর (সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদের) সহকারী ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ আর, ম্যাহো বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে

উদার দৃষ্টি, অনুভূতিপ্রবণতা, গভীর মানবপ্রেম এবং বিশ্বমানবতার মহৎ স্বপ্নের চরিতার্থতার জন্য জ্বলন্ত অভিলাষ—রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্গালার অন্যান্য লেখকদের রচনার এইসব বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালা সাহিত্যকে একটা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছে। এই সাহিত্য দীর্ঘকাল বহু কৃতী লেখকের রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালার যে সাহিত্য সম্পদ রহিয়াছে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে বাঙ্গলাভাষীর যে সংখ্যা তাহাতে এই ভাষা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নহে পৃথিবীতে অন্যতম প্রধান ভাষারূপে পরিগণিত হইবার অধিকারী। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি অধ্যাপক গ্রাতুক দানিলচুক বাঙ্গালায় এবং মিঃ চেলিশেব হিন্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর বক্তৃতা করে উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করে দেন। আন্তর্জাতিক সাহিত্য শাখার অধিবেশনে সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ তাঁর অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন,—'রাজনীতির খেলায় বাংলাদেশের সীমা অনেকবার বদলে গেছে। কিন্তু বর্তমানের মত এত সঙ্কুচিত বোধহয় কখনও হয়নি। আমাদের নদীতে ভরা দেশে নদী যখন দুই কূলই ভেঙ্গে দিয়ে যায়, তখন বন্যার বুকেই আমরা বাসা বাঁধি। . এই হচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন মন্থন করা বিষে নীলকণ্ঠ বাঙ্গালীর অমৃত সাধনা'। তিনি আরও বলেন,—'মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্য দানই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের মূল সুর। মানুষের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়া অবশ্য সব সাহিত্যেরই মূল লক্ষ্য; কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, লাভ-প্রতিদানের আশা ছাড়াও প্রেমের এত উদাহরণ বাংলা সাহিত্যেরই বিশেষত্ব। বাংলা সাহিত্য হচ্ছে মানুষের গান।'

এই অধিবেশনে সম্মেলনের অন্যতম সহ-সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের ওপর গত দুটি মহাযুদ্ধের প্রভাব এবং তার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের নবযুগ সূচনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বের পুনর্গঠনের নূতন ভিত্তির সন্ধান করতে করতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ও কবিরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, এই কাজে বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের মত আর কিছুই প্রয়োজনীয় নয়। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের গতির একটি পরিচয় দেন।

অধিবেশন শেষে একটি বৈকালিক চায়ের আসরে ইউনেস্কো প্রতিনিধিগণ উপস্থিত সকলের সঙ্গে মিলিত হন। এই অনুষ্ঠানটিতে পরস্পরের সঙ্গে আলাপপরিচয় করা এবং ভাবের আদানপ্রদানের বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়। সন্ধ্যা ৭টায় বিদেশী অতিথিদের উপস্থি কোলকাতার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "সাংস্কৃতিকী" ক রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে সকলের অকুণ্ঠ প্র অর্জন করে। ইউনেস্কো প্রতিনিধিরা এই আনন্দানুষ্ঠান দেখে যে খুশী হয়েছিলেন, তা তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চে শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে। রাত্রি টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। সর্ব সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ শিল্পীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞ করেন। উপস্থিত সকলের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে তিনি এবছ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এবারের সম্মেলনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর বিভিন্ন দে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী যোগদান। ভারতের অন্য কোন ভাষার সম্মেলনে এর আগে এ আন্তর্জাতিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য আলোচনা হয়েছে মনে হয় না। এর জন্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশের প্রচেষ্ট উদ্যম প্রশংসনীয়।

সম্মেলনের উৎসাহী প্রতিনিধি-সমগ্ররা অপেক্ষায় থাকবেন—আ একবছর পরে ভারতের নানা রাজ্যের বাঙ্গালীদের সঙ্গে পুনর্মিলন সাহিত্য ও সংস্কৃতির আনন্দময় ক্ষেত্রে।

সম্মেলনের সার্থকতা

এই সম্মেলনের সার্থকতা কি—এ সম্বন্ধে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে আজ সারা ভারতে নানাকারণে বাঙ্গালীদের স্থান কোথায়, তা বোধ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের অজানা নয়। সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটি স্ম রেখে একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এরকম একটি প্রতিষ্ঠ বজায় রেখে তার কার্যাবলী চালিয়ে যাওয়া কতটা প্রয়োজন; কা বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর বর্তমান অবস্থায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহি সম্মেলন বার্ষিক অধিবেশনগুলি করে, আর কিছু না হোক, অন্ততঃ সা ভারতে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর সাহিত্য-সংস্কৃতির বাণী প্রচারে, ভারতে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এমন কি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের স যোগসূত্র স্থাপনে, ভারতের নানা প্রদেশে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর অবদানে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কাজে এবং ভারতের নানা রাজ্যে ছড়া বাঙ্গালীদের মিলনের সুযোগদানে যে সহায়তা করছে তার মূ অনস্বীকার্য।

বাংলার প্রাচীন প্রবাদ

শ্রীসবিতা চৌধুরী

সেকালে বাংলার পল্লীর মেয়েদের মজলিশ বসত পুকুরঘাটে। সকাল বিকেল গা-ধোওয়া, স্নান-করা এবং কাপড়কাচা বা বাসনমাজা এবং জল আনার অছিলায় পাড়া পড়্শীর সঙ্গে মিলিত হবার উপযুক্ত স্থান ছিল পুকুরঘাট। সারাদিনের কাজের ক্লান্তি মুছে ফেলতেন তাঁরা এই আনন্দ-মুখর মুক্ত পরিবেশে এসে। নানা রকম হাসি-তামাসার, সুখ-দুঃখের কথা হত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নানা প্রবাদ বচন জানতেন। মুখে মুখে ছড়া কেটে কথার ফাঁকে ফাঁকে নানা ধরণের রঙ্গ-রসের সৃষ্টি ক'রতে তাঁরা ছিলেন পটিয়সী। তাঁদের সেই ছড়াগুলোকে বলা হ'ত "শোলোক" অর্থাৎ শ্লোক। আজও ঘরে ঘরে পল্লীর বর্ষীয়সী মহিলাদের মুখে এ-গুলোর চলন আছে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এগুলোর তাৎপর্য্য বেশ উপলব্ধি হয়। তবে গ্রাম্যতা দোষ থাকায় কোন কোনটি শ্রুতিকটু বোধ হয়। আমি কতকগুলো ঐ ধরণের শ্লোক এখানে উল্লেখ করছি, ভুলত্রুটি থাকলে মার্জ্জনা করে নেবেন।

১। "কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি।"

কাজের সময় যা'কে দিয়ে কাজ উদ্ধার করা হ'বে তাকে যথেষ্ট তোষামোদ করা হয়, কিন্তু কাজটি হাঁসিল হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত সেই কাজের লোকটিকে 'পাজি' বা এ ধরণের আখ্যা দিতে সংকোচ হয় না।

২। 'আল্পনা জানি মনে মনে,
ধার আসে না হাতের গুণে।'

অনেকে যে-কাজ জানেন না, সেই কাজ নিয়ে মুখে বড়াই করেন, কিন্তু প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে যোগ্যতা দেখাতে পারেন না।

৩। 'দেখবে, শুনবে, বলবে না, কোনও
বিপদে পড়বে না।'

সংসারে বোবার শত্রু নেই। কারও কাজের বা কথার যে প্রতিবাদ না করে চুপচাপ থাকে, তা'র অপ্রিয় হ'বার ভয় থাকে না।

৪। 'যদি হয় আপন বাম,
দাঁত দিয়ে ভাঙি শালটি থাম!'

পরের কাজের সময় শরীরে আলস্য ভর করে। বিশেষতঃ ঝি-চাকরদের মধ্যে এ-ভাবটা খুব বেশী দেখা যায়। কিন্তু যখন নিজেদের কাজ হবে, তখন গরজও হবে তাদের নিজের। তখন যত শ্রমসাধ্যই হোক্, তা'রা নিজের কাজ অক্লেশে করে ফেলবে।

৫। "সাত গিন্নীর ঘর, কাউরি আসে মাথা ব্যথা,
কাউরি আসে জ্বর।"

পাঁচজনের সংসারে যদি পাঁচজনই কর্ত্তৃত্ব করেন, তবে সে-সংসারে ভাঙন আসাই স্বাভাবিক। সে পরস্পরের মধ্যে সংসারে কাজকর্ম্ম বিষয় নিয়ে দেখা দেয় রেষারেষি: দেখা দেয় শৈথিল্য।

৬। 'যদি শোনেন কোন্দলের গন্ধ,
তবে নারীর মনে আনন্দ।'

মেয়েদের 'কলহ-প্রিয়া' এ-দুর্নাম বহু যুগ থেকে চলে আসছে। আজও ইতরশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে এ-গুণটি বর্ত্তমান আছে। 'কোন্দলের' একটু গন্ধ পেলেই তা'রা এসে সেখানে হাজির হ'বে এবং তাতে সানন্দে যোগ দেবে।

৭। "এখন বুঝলি নারে মন, বুঝবি পরিণামে—
যখন শুকাবে ডুবিবে নৌকা মনেরই ভরমে।"

মানুষ যখন ভুল করে, ভুল কি ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু যখন বুঝতে পারে তখন হয়ত সে ভুলের মারাত্মক পরিণামের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হ'য়ে পড়ে।

৮। 'জার কালে জার কাঁটা, গ্রীষ্মকালে ঘামাচি,
বৌ ছিল কোন্ কালে রূপসী ?'

অনেকের রূপ না থাকলেও রূপের গরব করেন। এখানে দেখানো হ'চ্ছে কোনও বধূর শীতকালে একরকম চর্ম্মরোগ 'জারকাঁটা' হ'য়ে মুখশ্রী ম্লান হ'য়ে যায় এবং গ্রীষ্মকালে সেগুলো সেরে দেখা দেয় ঘামাচি। ফলে আবার মুখশ্রী ম্লান হ'য়ে যায়। এ-ক্ষেত্রে কবে তা'কে 'রূপসী' আখ্যা দেওয়া চলে ?

৯। "দিলে থু'লেই 'মা' 'মাসী',—
না দিলেই সর্ব্বনাশী !"

সংসারে স্বার্থই বেশী। স্বার্থপর লোকেরা পাওনা ভাল পেলে আত্মীয়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, না পেলে অতি নিকট আত্ম-জনও 'পর' হ'য়ে যায় তা'দের কাছে।

১০। "না যাইলে রাধা বধে ; যাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ ॥"

এ অবস্থার অর্থ উভয়-সঙ্কট। যেমন অবস্থা ঘটেছিল মারীচের 'হরিণ' বেশ ধারণ ক'রে। সাংসারিক জীবনে অনেক সময় এই ধরণের উভয় সমস্যার মধ্যে প'ড়তে হয়।

১১। 'এত রঙ্গ দেখালি লো ভবানন্দের মা,
পিঠে বানালি তা'র চার হাত পা !'

এই কথাটি স্মরণে থাকলে মেয়েরা পিঠে (পিষ্টক) তৈরীর সময় সাবধান হ'বেন, যা'তে পিঠের গোলা অকারণে ছড়িয়ে প'ড়ে পিঠের গোল আকৃতিটিকে বিকৃত না করে। পিঠে ভাজবার সময় বেশ নিপুণতার সঙ্গে এবং ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করতে হয়—একটু হলেই নষ্ট হ'য়ে যা'বে পিঠে।

১২। 'চাল দিও যত তত।
জল দিও তিন তাত ॥
উথলালে দিও কাঠি।
তবে জালে দিও ভাটি ॥
এতে যদি মন্দ হয়।
সে কভু রাঁধুনী নয় ॥'

আরও কত যে আছে এই ধরণের ছড়া তার ইয়ত্তা নেই। কয়েকটি উল্লেখ করেই শেষ ক'রব—এর অর্থ-গুলোও সবারই বোধগম্য।

যেমন—

(ক) 'মা বিয়ালো, না বিয়ালো মাসী,
ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী।

(খ) 'যা'র বিয়ে তা'র খোঁজ নেই,
পাড়া পড়্শীর ঘুম নেই।'

(গ) 'আঁতি চোর, পাঁতি চোর,
দিনে দিনে সিঁদেল চোর।'

(ঘ) 'পরের সোনা দিও না কানে,
টেনে নেবে হ্যাঁচ্কা টানে।'

(ঙ) 'আ'র মনে যা—ফাল্ দিয়ে ওঠে তা।'

(চ) 'ভাল ভাল ক'রে গেলাম সোনার মা'র কাছে।
সোনার মা বলে, 'আমার ছেলের সঙ্গে আছে'।

আজকাল শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে এগুলির প্রচল নেই সত্যি—প্রয়োজনও তেমন নেই—কিন্তু সেকালে ঠাকুরমা দিদিমারা এই সব ছড়া থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চ করতেন এবং নিজেদের জীবনে এসবগুলির শিক্ষা কাে লাগাতেন।

আধুনিক প্রণালীতে বস্ত্র-ধৌত-প্রকরণ

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

দিনে দিনে কাপড়-চোপড়ের দর আগুন হয়ে উঠ্ছে—পূর্ব্বের মত কোন কাপড়-চোপড়ের সুতা মজবুত নয় দু'চারবার ধোপ পড়লেই কাপড়ের অবস্থা শোচনীয় হে ওঠে। ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় যখন কেচে আে তখন দেখা যায় অনেক কাপড়ের সুতো সরে গেছে, অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, ধোপারা ব্লিচিং পাউডা বেশী ব্যবহার করে। ডাইংক্লিনিং প্রতিষ্ঠানে নানা রক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের ফলে কাপড়-চোপড়গুলির অবস্থ ক্রমেই খারাপ হোতে থাকে, এক্ষেত্রে আমরা নিজেরা যদি স্বাবলম্বী হয়ে বাড়ীতে কাপড়-চোপড় কেচে ধোপদুরস্ত করে নি, তা হোলে কিছুটা ব্যয়সঙ্কোচ সম্ভব হোতে পারে। আজ কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না যে, আজ্কে

দিনে ঘরসংসার করতে গেলে অগোছালো হোলে, আর পর মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকলে আত্মবিলোপ সাধনের আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে মহিলা সমাজের পক্ষে স্বাবলম্বন অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন।

সভ্যসমাজে বাস করতে গেলে পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি নেওয়া দরকার, সাজ-পোষাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য্য। মলিন কাপড়-চোপড় পরে চলাফেরা করলে কোথাও সমাদর পাওয়া যায় না, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে। সহরে যাঁরা ধূলো আর ধোঁয়ার মধ্যে বাস করেন, সহজেই তাঁদের কাপড়-চোপড় ময়লা হ'য়ে যায়, তাই তাঁদের সাজপোষাক যা'তে সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। নিজেরা একটু আলস্য ত্যাগ করে নিত্য নজর নিলে ধোপদুরস্ত কাপড় সর্ব্বদাই পরা যেতে পারে, ময়লা বেশী পরিমাণে না ধরতে পেলে কাপড়-চোপড় কিছুদিন টিঁকে যায়।

কাপড় কাচবার প্রধান উপকরণ সাবান, সোডা আর জল। কাপড় কাচতে ঠাণ্ডা ও গরম দু'রকমের জল দরকার। তা ছাড়া আনুষঙ্গিক মালমসলা দিতে হয়, সেই কথাই বল্‌ছি। আজকাল বাজারে নানারকম কাপড় কাচা সাবান প্রচলিত হ'য়েছে। এর মধ্যে যা উৎকৃষ্ট, তা বেছে নেওয়া দরকার। সানলাইট, লাক্স প্রভৃতির সমাদরও হয়েছে। তা ছাড়া আছে বার সোপ, ঢাকাই সাবান প্রভৃতি। সাবানকে ছুরি দিয়ে খুব পাতলা পাতলা করে কেটে এক বাল্‌তি গরম জলে ফেলে গলতে দেওয়া দরকার। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণ সোডা দেওয়া উচিত। বেশী সোডা দেওয়ার কোন দরকার হয় না, সাবানেই তো সোডা আছে।

যেদিনে কাপড় কাচতে হ'বে, তার পূর্ব্ব রাত্রে এই রকম সাবান ও সোডা মেশানো জল তৈয়ারী করে রাখতে পারলে ভালো হয়। জলে কাপড় ভিজিয়ে পরে তা'তে সোডার গুঁড়ো দিতে নেই। কারণ তা'তে সোডা কাপড়ের ওপর লেগে থেকে কাপড় নষ্ট করে ফেলতে পারে। জামা কাপড় অধিক ময়লা হোলে ঠাণ্ডা জলে অল্প সাবান গুলে তা'তে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ফলে জামা কাপড়ের ময়লা নরম হ'য়ে আসে, তারপর ময়লা বের করে পরিষ্কার করা সহজসাধ্য হ'য়ে থাকে। সাবান জলে ভিজানো ময়লা কাপড় ভালো করে ধুয়ে নিয়ে পূর্ব্বোক্ত সাবান ও সোডা মিশ্রিত জলে দিয়ে ঐ কাপড় মৃদুভাবে ফুটোতে হবে। আধঘণ্টা তিন কোয়াটার পর্য্যন্ত ফুটিয়ে নিলেই যথেষ্ট, আর এই রকমে ফুটোবার সময় কাঠের লম্বা লাঠি দিয়ে অনবরত কাপড়গুলি উল্টোনো দরকার। এভাবে ফুটানো শেষ হোলে সাবান জল থেকে কাপড়গুলি তুলে নিয়ে প্রথমতঃ অল্প গরম জলে, পরে ঠাণ্ডা জল দিয়ে উত্তম ভাবে থুবে থুবে কেচে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

এক্ষেত্রে একটা কথা বলা দরকার। পশমী ও রঙীণ কাপড়ের জন্যে কখন কঠিন সাবান ও সোডা ব্যবহার করা উচিত নয়। এরকম কাপড়-চোপড় কাচবার জন্যে নরম হলুদে রঙের সাবান ব্যবহারই প্রশস্ত, লাক্সের গুঁড়া দিলে ভালো হয়। সোডায় রঙীণ কাপড়ের রঙ উঠে যায়। পশমী কাপড় বেশীক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখলে তার সুতো কুঁচ্‌কে যায়, ফলে কাপড় খাটো হয়। পশমী কাপড় গরম জলে ফুটোতে নেই, এ'তে কাপড় গলে নষ্ট হ'য়ে যায়। রিঠা ভিজানো জল আর বার-সোপ বা সানলাইট, লাক্সের গুঁড়ো দিয়ে সুন্দর ভাবে পরিষ্কার হোতে পারে। কতখানি জলে কতটা সাবান দিয়ে ফুটোতে হবে, সেটা আগে হিসেব করে নেওয়া দরকার। হিসেবের ভুল হোলে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা যায় না। পঁচিশ ত্রিশ সের জলে আধসের পরিমিত সাবান গলিয়ে নিলেই যথেষ্ট হোতে পারে।

কাপড় ফুটোবার সময়ে সাবান জলের সঙ্গে এক বা দেড় ড্রাম আন্দাজ তার্পিন তেল মিশিয়ে নিলে কাপড় বেশী ফরসা হয়, কাপড়ে দাগ থাকলে উঠে যায়, আর কাপড় থেকে ময়লা বেরিয়ে আস্‌বার পথ পায়, ফলে কাপড় সহজেই পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। কাপড় ফুটোবার সময় জল কম পড়লে, কড়ায় আবার দেওয়া দরকার। ফুটোবার পর পরিষ্কার জল দিয়ে কাপড় ভালো করে কেচে নিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাপড়ে বিন্দুমাত্র সাবানের সংস্পর্শ থাকবে, ততক্ষণ ঠাণ্ডা জল দিয়ে কাপড় বারে বারে কাচতে হবে। যখন কাপড় নিংড়োলে সাবান জল একটুও বেরোবে না, তখনই কাপড় কাচা ঠিক হয়েছে, বুঝতে হবে।

কাপড়ে নীলবড়ি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সাবান দিয়ে কাচবার পরও কাপড় বেশ ধব্‌ধবে সাদা হয় না, একটু লাল্‌চে ভাব থেকেই যায়। এই লাল্‌চে রংটা দূর করে কাপড় ধব্‌ধবে রকম কর্‌বার উদ্দেশ্যে কাপড়ে নীল দেওয়া হয়ে থাকে। কাপড়ে নীল দেবার সময় হুঁসিয়ার না হোলে, তার মাত্রার কম বেশী প্রয়োগের ফলে কাপড়ের চেহারা খারাপ হয়ে যেতে পারে। বেশী নীল দিলে ওর রূপই ফুটে ওঠে, আবার পরিমাণ কম হোলে, ফর্‌সা ভাব বেশ ফোটে না।

একটুক্‌রা ন্যাকড়াকে তিন চার ভাঁজ করে নিয়ে তার ভেতরে নীলবড়ির কয়েকটা টুক্‌রো বেঁধে দিতে হয়। কাপড়ের মাত্রা অনুসারে একটি গামলায় জল দিয়ে ঐ নীলবড়ির পুঁটুলিটা ধীরে ধীরে সেই জলে কচ্‌লাতে হবে। জলে পরিমিত নীল গোলা হোলো কিনা, একখানা কাপড়ের একটা খুঁট তাতে ডুবিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। পরিমাণ ঠিক হোলে পরিষ্কার করা কাপড়-চোপড় ভিজা অবস্থাতেই নীল জলে চুবিয়ে নিংড়ে নিলেই চল্‌বে। এখানে একটা কথা বলা দরকার,—নীল দেবার সময়ে নীল জলটাকে অনবরত নাড়তে হয়, নতুবা নীল জলের নীচে থিতিয়ে গিয়ে কাপড়ের জায়গায় জায়গায় নীল ছোপ ধর্‌তে পারে, তাতে নীল দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

এখন নীলের পরিবর্ত্তে অনেকে 'টিনোপল' (Tinopal Bvn) প্রভৃতি রাসায়নিক গুঁড়ো বা বটিকা প্রয়োগ করেন, তাতে কাপড়ের শুভ্রতা খুব ফুটে ওঠে। কাপড় কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রি কর্‌বার প্রয়োজন আছে। ইস্ত্রি কর্‌বার পূর্ব্বে কাপড়ে মাড় (starch) দেওয়া হয়ে থাকে। সস্তায় কাজ সার্‌তে হোলে ভাতের ফেনের মাড়ই ভালো। ময়দা বা এরোরুটের মাড়ও মন্দ হয় না। দু'রকম মাড় ব্যবহার হয়—ঠাণ্ডা আর গরম।

যে সব কাপড়ে খুব কড়া মাড়ের প্রয়োজন, সেগুলিতে ঠাণ্ডা মাড় দিতে হয়—যেমন কলার, কাফ্‌, সার্ট ইত্যাদি কিন্তু পরণের কাপড়, টেব্‌লক্লথ, মশারি প্রভৃতি জিনিষে গরম মাড় আবশ্যক।

কড়া মাড় দেবার আগে কাপড়-চোপড় সবার আগে বেশ শুকিয়ে নিতে হয়। কিন্তু নরম মাড় কাপড়ে ভিজা অবস্থাতেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কলার, কাফ্‌ প্রভৃতি যে সব জিনিষে কড়া মাড় দেওয়া হয়, সেগুলির উপর মাড় লাগিয়ে শুক্‌নো কাপড়ে আধ ঘণ্টা জুড়িয়ে রেখে তবে ইস্ত্রি করা দরকার।

নরম মাড় কাপড়ের ভিজা অবস্থাতে লাগিয়ে রৌদ্রে বেশ করে শুকিয়ে রাখতে হয়। পরে ইস্ত্রি কর্‌বার সময় অল্প জলের ছিটে দিয়ে দু'এক মিনিট ময়দা দলার মত কাপড় দলে নিয়ে ইস্ত্রি করা হয়ে থাকে।

কড়া মাড় তৈয়ারী করতে হোলে সিকি পাউণ্ড আন্দাজ সাদা এরোরুটের গুঁড়ো দু-পাউণ্ড পরিমিত জলে গুলে নিতে হয়, তার পর তা'তে চা-চামচের এক চামচ সোহাগার গুঁড়ো প্রয়োগ কর্‌তে হয়। তার পর তাতে অল্প অল্প করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে বেশ মোলায়েম ও পাত্‌লা করে নিলেই কড়া মাড় তৈয়ারীর কাজ শেষ হয়। নরম মাড় তৈয়ারী কর্‌তে হয় কড়া মাড়েরই মত, তবে তফাৎ এই যে, এ'তে সোহাগা দেওয়া হয় না আর জল দিয়ে বেশ মোলায়েম ও পাতলা করে মৃদু তাপে ফুটিয়ে নিতে হয়। অথবা ঠাণ্ডা জলের পরিবর্ত্তে খুব ফুটন্ত গরম জল অল্প অল্প ঢেলে মোলায়েম ও পাত্‌লা করে নিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা ঘরেই কাপড়চোপড় এ ভাবে কেচে নেয়, আমরাই বা কর্‌ব না কেন?

পটলের খোকা

প্রথমে পটলের খোসা চেঁচে ফেলুন এবং দু মুখ কেটে নিন, পরে আস্ত পটল, একটা শিক দিয়ে ফুটো ফুটো করে নিন (নতুবা ঝোল ঢুকবে না)। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ ফোড়ন দিয়ে পটল ছেড়ে দিন। এবার পরিমাণ মত ধনে, জিরে, লঙ্কা, পেঁয়াজ-বাটা ও দই দিয়ে নাড়তে থাকুন। এখন মাংসের চর্ব্বি ছোট ছোট

করে কেটে, লবণ, হলুদ, তেজপাতা দিয়ে মেখে কড়াইতে চাপিয়ে ঢেকে দিন (জল দিতে হবে না, আপনি সিদ্ধ হবে)। নাড়তে নাড়তে আমেজ হলে নামিয়ে দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচগুঁড়ো দিয়ে পরিবেশন করুন। আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন সুস্বাদু হয় কিনা ?

লাউবিচির চচ্চড়ি

বড় লাউয়ের আস্ত বিচি ছাড়িয়ে নিয়ে, বেশ করে ধুয়ে ফেলুন। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে লঙ্কা পেঁয়াজ ফোড়ন দিয়ে বিচিগুলি ছেড়ে দিন। এবার লঙ্কা, পেঁয়াজ-বাটা, লবণ, হলুদ, তেজপাতা (একটু চিনি ফেলে দেবেন) দিয়ে নাড়তে থাকুন। যখন জল মরে যাবে, তখন সরষে-বাটা দিয়ে একটু কাঁচা তেল ঢেলে নেড়েচেড়ে নামিয়ে রাখুন। অল্প খরচে ইচ্ছা করলে সব কিছুই রান্না করা যায়, তবে একটু খাটুনি। প্রত্যেক ঘরে ঘরে চেষ্টা করলেই পারেন নিত্য নতুন রুচি বদলাতে।

—মিনতী বসু

উলের প্যাটার্ণ

চন্দ্রিকা

১০ ঘর হিসাবে ঘর নিতে হয়, সবশেষে ৪ ঘর বেশী।

১ম সারি—১ সোজা, * সামনে সুতো, ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলে দিন, * পুনরাবৃত্তি করুন। সবশেষে ১ সোজা।

২য় সারি—সব উল্টো। প্রতি একান্তর সারিতে এইরূপ বোনা হবে।

৩য় সারিতে—১ সোজা, * ১ জোড়া, সামনে সুতো, * পুনরাবৃত্তি করুন। সবশেষে ১ সোজা।

৫ম সারি—প্রথম সারির মত।

৭ম সারি—১ সোজা, * ১ জোড়া, সামনে সুতো, ৬ সোজা, ১ জোড়া, সামনে সুতো, * পুনরাবৃত্তি করুন। সবশেষে, ১ জোড়া, সামনে সুতো, ১ সোজা।

৯ম সারি—১ সোজা, * (সামনে সুতো, ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলে দিন) ২ বার, ৬ সোজা * পুনরাবৃত্তি করুন। সবশেষে, সামনে সুতো, ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলে দিন, ১ সোজা।

১১শ সারি—৭ম সারির মত।

১৩শ সারি—৯ম সারির মত।

১৫শ সারি—৭ম সারির মত।

১৬শ সারি—সব উল্টো।

এর পর আবার প্রথম সারি হতে বোনা হবে।

সর্পমুখী

১৩ ঘর হিসাবে ঘর নিতে হবে।

১ম সারি—* ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলে দিন, ৪ সোজা, (সামনে সুতো, ১ সোজা) ২ বার, ৩ সোজা, ১ জোড়া,* পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় সারি—সব উল্টো। প্রতি একান্তর সারিতে এইরূপ বোনা হবে।

৩য় সারি—* ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলে দিন, ৩ সোজা, (সামনে সুতো, ৩ সোজা) ২ বার, ১ জোড়া*, পুনরাবৃত্তি করুন!

৫ম সারি—* ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলে দিন, ২ সোজা, সামনে সুতো, ৫ সোজা, সামনে সুতো, ২ সোজা, ১ জোড়া, * পুনরাবৃত্তি করুন।

৭ম সারি—* ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলে দিন, ১ সোজা, সামনে সুতো, ৭ সোজা, সামনে সুতো, ১ সোজা, ১ জোড়া * পুনরাবৃত্তি করুন।

৯ম সারি—* ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলে দিন, সামনে সুতো, ৯ সোজা, সামনে সুতো, ১ জোড়া, * পুনরাবৃত্তি করুন।

১০ম সারি—সব উল্টো।

এর পর আবার প্রথম সারি হতে বোনা হবে।

—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
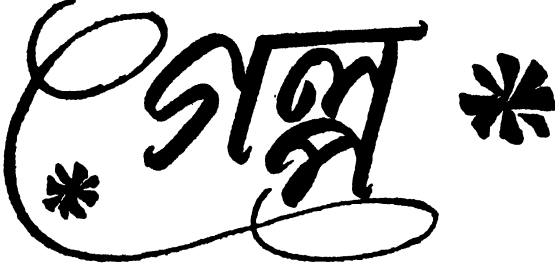
সেতারের তার

নারায়ণ মণ্ডল

সমুদ্র শাসনের ভঙ্গি নিয়ে ম'সিয়ে তুপ্লের কালো মার্বেল পাথরের হাফ-বাস্ট মূর্তিটার জল জলে চোখ দু'টোয় সমুদ্র যেন হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট।

সামনেই গংগা। ফিট পনের বিশ নিচেই গর্ভবতী রমণীর মত ভাদরের ভরা নদী ঝাঁক ঝাঁক কচুরিপানার বহর বুকে গুটি গুটি হেঁটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। ঝক্‌মকে ষ্টিমার ঘাটটার মরা জেঠিটা থেকে পা ঝোলালেই জল। বারোদুয়ারীর দুয়ারে দুয়ারে বুড়ি ছুঁই ছুঁই করেও পারল না—সুরু হয়ে গেল ভাঁটির টান।

ইভনিং-ইন-প্যারির গন্ধ ছড়িয়ে ফরাসী কর্তৃপক্ষ তৈরি করেছে এই ষ্টাণ্ডের ধারটুকু। গংগার কিনারা ধরে একসার অশ্বত্থ গাছ প্যারেড গ্রাউণ্ডের একটা রো'য়ের মত ড্রিলের একটা ভঙ্গিমায় হাতগুলো ছড়িয়ে আছে দু'ধারে। এক দিকের ডালগুলোয় ছায়াছন্ন থাকে ফুটপাথ।

প্রায় ফুট দশেক চওড়া এই পথে ধনুকের মত একটা বাঁক নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। তার ডান পাশটা ধরে আর একটা লাল কাঁকরের মসৃণ রাস্তা। বাস লরী চলার হুকুম নেই তাতে।—শান্তিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হবার কথা লেখা আছে দু'মুখের দুটো নোটীশ্‌ বোর্ডে। এই দুই পথকে ভাগ করতে করতে সারবন্দি দুমুখো লাইট পোষ্টগুলোও উত্তর থেকে মিলিয়ে গেছে দক্ষিণে।

এছাড়াও সবুজ ফিতের মত আর এক ফালি জমি কাঁকর-বিছোন পথটার ডানহাত ধরে এগিয়ে গেছে, আর তারই বুক থেকে সমান ব্যবধানে একসার সম বয়েসী ঝাউ গাছ উঠেছে কেউ কারো থেকে এক ইঞ্চি ছোট বড় নয় এরা।

তুমি যদি উত্তর থেকে চলতে আরম্ভ কর দক্ষিণে, তাহালে প্রথমেই পড়বে এষ্টোরিয়া হোটেল। তার সামনা-সামনি রাণীঘাট, জলমটরের আস্তানা। আর সামনে যে বড়বাজারের দিকে পথটা পড়ে রয়েছে তার ডানপাশে পড়বে ট্রাইবুনাল। দেবদারুর ছায়াছন্ন সিং দরজাটা দিয়ে যে ক'জন আসামী হাসি হাসি মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসে, তাদের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি ফেললেই তারা বলে যাবে 'নতুই আইনে খালাস'। এর আশপাশে উকিল-মোক্তারদের দপ্তর—বরোদা উকিলের চেম্বারটা কোর্টের আগেই চোখে পড়ে।

আর দক্ষিণ দিক থেকে যদি চলতে থাক তাহলে পাবে হোটেল উড্‌ল্যাণ্ড। তারপর পড়বে পাতাল বাড়ী, তার সামনা-সামনি পান্থপাদপের ছায়া ভরা-মরিস সাহেবের বাগানবাড়ী। পাশে পুরোণ চার্চ, সোকেশে মাতা মেরির মূর্তি। টগর, হংসরাজ, আর সোঁদাল ফুলের ছোট্ট বাগানটি পার হলেই কন্‌ভেণ্ট।

গোল গোল মুখ, তুলি আঁকা চোখ, আর তুল তুলে গালের সব ছেলেমেয়েরা নীল রঙের স্কার্ট প্যাণ্ট আর দুধের মত জামা পরে পড়তে বসে। কালো কারের প্রান্তে যেসাস বিদ্ধ ক্রুশ ঝুলিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে মাদার রা।—গংগায় তখন বাণ ওঠে, কিংবা জোয়ার ছোটে, কিংবা সারবন্দি অশ্বত্থ গাছের মাথায় মাথায় মন্থর একটা বাতাস হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়। কিছু না হলেও অন্ততঃ জে টমাস কম্পানীর ডেকসর্বস্ব জাহাজটা কোন একটা জুট মিলের জেটির উদ্দেশ্যে জল দু' ফাঁক করে ছুটতে থাকে।

মাদার রা ওমনি চেঁচিয়ে ওঠে না বেত হাতে, ডিসিপ্লিন্‌ ভংগের অপরাধে বেঞ্চেও দাঁড়াতে হয় না তাদের। দেখতে থাকে তারাও, আর ভাবতে থাকে হুগোর মত-ভিক্টরের মত একটা প্রতিভাও কি জন্ম নিতে পারে না!

কন্‌ভেণ্টের ডান পাশ দিয়ে একটা মসৃণ গলি, যেটা

চলে গেছে মেরীর মাঠে, সেটা বাদ দিলেই সুরু হয়ে যাবে রেসিডেন্ট হাউস। এখানে এলেই যে কোন একটি ঝাউয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে ড্রাইভার মুস্তাক পালিশ লাগিয়ে নম্বর-বিহীন গাড়ীটার গা ডলছে—আর ডলছে তো ডলছেই!

তবে উত্তরদিক থেকে চললেই সুবিধে হবে তোমার। হোটেল এ্যাষ্টোরিয়ায় বসে দুটো ফাউলের সংগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে উঠলেই মনে হবে প্যারী এসে গেলাম—সেনের তীরে আইফেল টাওয়ারের আশ পাশের দুধ চেলি পরা আওরৎ সেই প্যারী!

যেটা এখন সরকারি দপ্তরখানা হয়েছে, দু'দশ বছর আগেও ওটা তো ছিল নাচঘর। গেলে তুমিও চিনতে পারবে, দেখবে পাথর কুঁচি বসান মেঝেয় অসংখ্য নারীমূর্তি ফুটে উঠেছে আর মানুষ জনের পায়ের ঘসা খেয়ে খেয়ে তা কত উজ্জল। তারপর দেখবে সার্সি ঝলমল্ হলঘরগুলো—আগ্রা যদি দেখা থাকে তোমার, তাহালে দু' একটা ভাস্কর্যেরও অন্ততঃ মিল খুঁজে পাবে।

এখনো মাঝে মাঝে মাত্র পাঁচ মিনিটের নোটিসে সরে যায় দপ্তর। আর কোমর ধরে ধরে সুরু হয়ে যায় নাচ। অর্কেষ্ট্রা রুম থেকে ওমনি বেজে ওঠে ভাওলিন জলতরঙ্গ অর্গান পিয়ানো।

শ্বেতপাথরের সিঁড়ির কাছে মটর এসে দাঁড়াবার জন্তে দুটো গেট। মাঝখানের অর্ধচন্দ্র বাগানটায় একটা ফোয়ারা, আর কয়েকটা নগ্ন ষোড়শী ফরাসীনির নিটোল মূর্তি। মুস্তাকের মটরটা এখানে দু'বার যাতায়াত করে দিনে।

এই দপ্তরখানার গায়ে গায়েই পুলিশ ব্যারাক। সদর থানা। তার মাঝে অবশ্য জেলখানা আছে। আর আছে টাওয়ার ক্লক। তোল্লা পাঁচেক উঁচুতে। ঘড়িটা প্রকাণ্ড। এর ঘণ্টায় সচকিত হয়ে কলেজের ছেলেমেয়েরা জোরে জোরে পা চালায়, কলের নৌকার মাঝিরা আরো জোরে ঝিকে মারে, ঘরে ফেরবার তাগাদা আসে তাদেরই মনে, যারা জোড় বেঁধে বেঁধে বিকেলে বেড়াতে এসে রাত দশটা বাজিয়ে ফেলে।

পুলিশ ব্যারাকটা পার হলেই পড়বে দুপ্লেস কলেজ। পরিচ্ছন্ন মার্জিত আর ছবির মত চেহারা।

তারপরই সমুদ্র শাসনের ভঙ্গি নিয়ে দুপ্লের হাফ বাস্ট মূর্তিটা তেমাথার মোড়ে মরা ষ্টিমার ঘাটটার দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে আছে—সে সমুদ্র অনেক দূরে—ভারতবর্ষের বুকে স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এখানে এসে আর পা উঠবে না তোমার। পশ্চিম পথটার দিকে তাকালেই কেমন যেন একটা কান্নায় উথলে উঠতে চাইবে তোমার বুকটা। সামনেই রোমান ক্যাথলিক গির্জা। টুরিংটরা এসে চার্চের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে—এই পরিবেশের মধ্যে এমন সুন্দর চার্চ ভারতবর্ষে যে কটা আছে তা আঙ্গুলে গুণলে একটা আঙ্গুলও ভর্তি হবে না;

দুপ্লের মূর্তিটা থেকে চার্চের গেট এই পথটুকু দু-পাশেরি মেহগ্নি গাছের দম্পতিসুলভ নিবিড় আলিঙ্গনে একেবারে ছায়াচ্ছন্ন। হঠাৎ যদি বৃষ্টি আসে ঝমঝম। ভেলভেটের শাড়ী কিংবা মখমলের পাঞ্জাবীর নিরাপত্তার জন্তে তুমি কিংবা তোমার কেউ ছুটে এসে এখানে আশ্রয় নাও, তাহলে অন্ততঃ পনেরটা মিনিট একটি ফোঁটাও বিরক্ত করতে সাহস পাবে না।

এমন একটা পরিবেশকে তুমি যদি খুঁটিয়ে না দেখেই পা চালাও, তাহলে নির্দ্দিষ্ট ঝাউগাছগুলোর ফাঁক দিয়ে তুমি দেখতে পাবে মুস্তাক গাড়ী ডলছে—আর ডলছে তো ডলছেই।

এরপর হয়তো তুমি পাতাল বাড়ীর গা বেয়ে মরিস সাহেবের বাগানবাড়ী ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাটখোলা পেরিয়ে চলে যাবে, কিন্তু তার আগে একটা গল্প শুনে যাও। গঙ্গার দিকে মুখ করে যে কোন একটা বেঞ্চে বসে পড়ি এসো। সিগারেট ধরিয়ে নাও একটা। এক সময় হয়তো কান্নায় চোখ ভরে যেতে পারে তোমার, তখন হাতের সিগারেটের টুকরোটা আছড়ে ফেলে দিয়ে বলতে পারবে—না না, হাওয়াটা ধোঁয়া ঢুকিয়ে দিল চোখে!

—ধন্তবাদ। আমি খাই না!—আর জানেন সিগারেট মুস্তাকও খেত না কোন দিন। জলের মত মানুষ ছিল। যে পাত্রে ঢালবে সে পাত্রে তেমনি আকারে থিতিয়ে উঠতে পারত ও।

সকাল তখন সাতটা আটটা হবে। বরোদা উকিল সুটপরে ছড়ি হাতে এসে হাজির। খপর পাঠাতে সায়েবও

বেরিয়ে এলেন। বরোদাবাবু প্রাতঃপ্রণাম জানালেন: বঁদর মুজিয়ে—।

—বঁদর মুজিয়ে, বঁদর মুজিয়ে। বার দুয়েক কথাটা ফেরৎ দিয়ে গাড়ীতে উঠলেন সায়েব। বরোদা উকিল বসলেন পাশে। গাড়ী ষ্টার্ট দিল মুস্তাক। সায়েব বললেন, মুষ্টাক—ডম্ ডম্—।

বিকেল চারটেয় গাড়ীটা এয়ার পোর্টের ধুলোমেখে বাড়ী এলো। পেছনে পেছনে ভ্যান এলো একটা। ভ্যানটা বোঝাই একদল তরুণ তরুণী।

কাজ বেড়ে গেল মুস্তাকের। প্যারী থেকে এগারোটা ছেলেমেয়ে ভারত দেখতে এল এই ফরাসী উপনিবেশে। এখানে থেকে তারা কোলকাতা দেখবে আগে—তারপর দিল্লী যাবে ট্রেণে, সেখান থেকে বোম্বাই, বোম্বাই হয়ে মাদ্রাজ—তারপর পণ্ডিচারী থেকে জাহাজ খুলবে—ক্যালে কি মার্সেলিস।

কোলকাতা দেখতে সময় লাগবে তিনদিন। মুস্তাকের কাঁধে আর বরোদা উকিলের মাথায় চাপবে এ ভার। মুস্তাক ভ্যান নিয়ে পাকমারবে কোলকাতা আর বরোদা উকিল হন্‌টার পিটার। সাত সকালে গাড়ী ছাড়বে ফিরবে রাত করে—না হলে তিনটে দিনে কোলকাতা দেখা সম্ভব!

দুটোদিন কেটে গেল রাজধানি কোলকাতায়। ছেলে-গুলোর থেকেও মেয়েগুলো বড় অস্থির। যেখানে সেখানে থামো থামো করে ওঠে। একটা চার্চ কি একটা ষ্টাচু কিংবা একটা ঘাস-বিছোন জমিতে দুটো গাং-সালিখ হলেই হলো; ওমনি, থামো থামো। বরোদা উকিল হয়তো বোঝাতে চেষ্টা করবে, ওটা কিছু নয়—ঘাস ফুলের বনে দুটো গাং সালিখ! কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছটা মেয়েই লাফ মেরে নেমে পড়বে আগে, পরে ছেলে পাঁচটা নামতে বাধ্য হবে। তারপর ইটপাটকেল মেরেও সালিখটাকে উড়িয়ে দিয়ে তবে গাড়ীতে উঠবে।

এস্‌প্লানেড রোয়ের শো রুমগুলোর ধারে ধারে হয়তো এরা চলেছে দক্ষিণে, ওদিক থেকে আসছে একদল ইংরেজ তরুণ-তরুণী, ব্যাস আর যায় কোথা। হাত বাড়িয়ে এরা আটকে দিল তাদের। দেখতে এক। পোষাকে আষাকে এক, তবে আর কি আলাপ হবে বুঝি। ততক্ষণ ফুটপাথের গায়ে গাড়ীর পেছনটা তুলে দিয়ে একটু গা এলিয়ে দিতে পারবে মুস্তাক।

কিন্তু ওদিকে এরা চালায় ফ্রেঞ্চ, আর ওরা চালায় ইংরেজী। ওরা বলে হ্যালো হ্যালো, আর এরা বলে, বঁদর বঁদর; তারপরই সব বোবা। ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যায় আর এরা গাড়ীতে ফিরে এসে বরোদা উকিলকে বলে, না, বাংলা আর ইংরেজী সমান দুর্বোধ্য।

বরোদা উকিল হাসতে হাসতে বলেন, আমায় ডাকলেন না কেন, আলাপ করিয়ে দিতুম। তার আগেই মুস্তাক গাড়ী ছুটিয়ে দিয়েছে চৌরঙ্গির দিকে।

তিন দিনের দিন এগারো দফা ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়িয়ে নেমে গেল এগারো জন। হাঁপ ছাড়ল মুস্তাক। ফের ষ্টার্ট দিতে হল, বাড়ী পৌছে দিতে হবে বরোদাবাবুকে।

গাড়ীতে উঠেই বরোদা উকিল বললেন, বড় চমৎকার কথা বলে গেলরে মেয়েটা, বললে, কোলকাতা তো নয় —যেন বাজার থেকে বাড়ী ফিরলুম। মেয়েটা বোধহয় খাস প্যারিসে থাকে না বুঝলি, তাই এত হৈ হাই ভাল লাগল না,—মেয়েটা কে জানিস?

—কে? কথা বললে মুস্তাক।

—মেয়েটা আমাদের লাট সায়েবের ভাগ্নের, আর নামটিও বড় চমৎকার—লিসা।

গাড়ীটা ব্রেক কসে ধুলো উড়িয়ে ফেলল খানিকটা।

এগারো দফা জ্বর ছাড়লেই ছাড়া পেল না মুস্তাক। আবার ডাক পড়ল তার। শহরের লাইব্রেরী হল থেকে বিদায় অভ্যর্থনা দেবে নাগরিক প্রতিষ্ঠান-সভাপতি দুপ্রে ইস্কুলের ফ্রেঞ্চ সেকশনের হেডমাষ্টার। এক ছাপান চিঠি এল মুস্তাকের নামে, সন্ধ্যে সাতটায় হাজির থাকতে বলা হয়েছে তাকে।

নরম ঘাসের ওপর আস্তে আস্তে সেতারটা নামিয়ে রাখল মুস্তাক। তারপর হিরণের থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগল। নারিকেল গাছটা মাথা নেড়ে নেড়ে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল পড়ার—সোনার জল দিয়ে ছাপা কার্ডটায় চাঁদের ছায়া বড়ই অস্পষ্ট করে তুলেছে অক্ষরগুলো। ঘাড়টা তাই একটু বেঁকিয়ে চোখের কাছে তুলে আনলো কার্ডটা।

কোলকাতা থেকে এই মাত্র ফিরেছে সে। রীতিমত ক্লান্ত। তবুও সন্ধ্যাকালীন রেওয়াজটাকে ছুটি না দিয়ে নতুন গজিয়ে-ওঠা ঘাসগুলোর ওপর সেতারটা এনে বসেছিল। তারপর হিরণ এলো চিঠি আর কার্ড নিয়ে।

হিরণ বললে, ওস্তাদ, আনবো নাকি তবলটা—হাতটা একটু শানিয়ে নেবে ?

—নিয়ে আয়—। মুস্তাকের প্রাণেও জোয়ার ছুটে গেল যেন কোথা দিয়ে। ক্লান্তি হারিয়ে গেছে তার। চেঁচিয়ে বলে উঠল : অমনি মাদুরটাও আনিস—বড্ড কুট-কুট করছে-রে।

হিরণ বামুনদের ছেলে। চ্যাটার্জী। জবাবী বাজনা বাজাতে ওস্তাদ সে। মাদুর আর বাঁয়া তবলটা রেখে কলাইয়ের তোবড়ানো একটা গ্লাস নিয়ে বেরিয়ে গেল, ফিরে এল দুটো মাটির ভাড়, এক গ্লাস চা, আর দুটো সিগারেট নিয়ে। তারপব বসল জুত করে। চা ভাগ করে নিল ভাঁড় দুটোয়, সিগারেট ধরাল, তবলা বাঁধল। খানিকটা পাওডার ছিটিয়ে কসে একটা সিগারেটে টান দিয়েই আকাশের দিকে তাকাল হিরণ। মুখ নামিয়েই বললে, ওস্তাদ, চাঁদ উঠেছে আকাশে, টুকরো টুকরো মেঘও পাড়ি জমাচ্ছে উত্তরে, তোমার গোলাপ ফুটেছে গাছে—ওস্তাদ, আশাবরী বাজাও—আশাবরী।

লাল সালুর ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ফ্রেঞ্চে লেখাগুলো মাথার আধহাত ওপরেই ঝুলছে। কোলাপশিবল গেটটা দু'ভাগ হয়ে লজ্জায় জড়সড়। ভদ্রলোকেরা যাচ্ছে, উকিল ব্যারিষ্টার অধ্যাপক মাষ্টার আর আর শহরের রসগ্রাহী শিল্পী নাগরিকেরা।

প্রথম সারির বাক্সগুলো ফাঁকা ছিল তখনও। ভরে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। মুস্তাকের গাড়ী থেকেই নামল পাঁচজন। প্রথমেই লাট এম বঁজা ! জামাই-ষষ্ঠীর নতুন বরটির মত মানিয়েছে তাকে। পরেছে ফরাসডাঙ্গার ধাক্কামারা ধুতি, ওস্তাদ লোকেরা দেখলেই বলে দেবে এর কারিকর লালবাগানের বল্লভদাস। গায়ে চড়িয়েছে কনক-চাঁপা রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবী—ফিন্‌ফিনে প্যারিস সিল্ক। হাতে ঘড়ি, পকেটে পেন, চোখে সুক্ষ্ম ফ্রেমের চশমা, নিটোল ধবধবে মুখ, কালো চুল। পেছনে পেছনে ম্যাদাম বঁজা। টকটকে লাল পাড়ের শাড়িতে মোটেই মানায়নি তাকে, মনে হচ্ছে কাদের ঘরের নতুন বৌ হঠাৎ যেন গিন্নির প্রোমশান পেয়ে গেছে।

মুস্তাক এসে বসল হলের মাঝ বরাবর। যন্ত্র নিয়ে অনেক আগেই এসে পড়েছে হিরণ, একটা চেয়ার উল্টে জায়গা করে রেখে দিয়েছিল তার।

মঞ্চের পর্দা সরে গেল। চক্‌চক করে উঠল মাইকের রঙটা। পেছনের নীল পর্দার দেওয়ালটায় বঁলার একটুকরো বাণী ফরাসী ভাষায়, আর বাংলায় লেখা রবীন্দ্রনাথের একফালি গান। এগারোটা ছেলেমেয়ে হাসি হাসি মুখ নিয়ে ডায়সে উঠে এল। হেড-মাষ্টার রেবতীবাবু উঠলেন বক্তৃতা দিতে।

দুপ্লের মূর্ত্তিটা বাঁয়ে রেখে মটর দুটো ফিরে এল রেসিডেণ্ট-হাউসে। এক এক বোঝা মালা নিয়ে নামল এক একজন। কেবল লিসা নামল শক্ত মুঠোয় গিটারটা চেপে, মালাগুলো তার মটরের মধ্যেই রইল পড়ে। হিল-তোলা জুতোর শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই আওয়াজ উঠল একটা—হাতের গিটারটা আছড়ে ফেলে ছুটে পালাল লিসা। দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। গিটারটা চুরমার হয়ে গেছে।

মুস্তাকেরও কেমন যেন ভয় ভয় করে উঠল সারা শরীরটা। ব্যাপারটা যেন বিপদ্‌জনক বলে মনে হল তার, তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরিয়ে গ্যারেজের দিকে পালিয়ে গেল সে। উঠোন তখন ফাঁকা, সকলেই ছুটে গেছে তখন লিসার রুমস্তে।

রাত তখন অনেক হয়েছে। হিরণ বাড়ী চলে গেছে অনেকক্ষণ। চাঁদটা ঝিমিয়ে পড়েছে নারকেল গাছের মাথায়। বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মুস্তাক। হঠাৎ বরোদা উকিলের গলা পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল সে।
—কি ব্যাপার উকিলবাবু ?

—শিগ্‌গীর গাড়ী বের করে emoকে নিয়ে আসগে যা।

মুস্তাকের মুখটা পাণ্ডুর হয়ে এলো। চোখদুটো খুব বেশী চকচকে ভয়ার্ত দেখে জবাব দিলেন বরোদাবাবু। বললেন, মেয়েটা ভুল বকছেরে, মনে হচ্ছে ভারি অসুখ, বলছে, অবাক করে দিয়েছে ভারতবর্ষ—একটা ড্রাইভার সেও—মুস্তাক দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ঘরদোর হাট করাই রইল।

গাড়ীটা থামিয়ে রীতিমত হাঁপাতে লাগল মুস্তাক। নেমে গেল emo। মুস্তাক মটর থেকে নেমে গুমটী ঘরের শূন্য টুলটায় বসে পড়ল। গংগাটা থম থম করছে। দ্বিতীয়া তিথি বান ডাকবে বুঝি এক্ষুণি। তাহলে তো একটা বেজে গেছে। চব্বিশপরগণার কিনারে কিনারে আলোর লাইন। ইউরোপিয়ান কোয়াটারগুলোর জানলায় জানলায় সবুজ আলো তন্দ্রাকীর্ণ। ঝিমোতে ঝিমোতে কখন ঢুল এসে পড়েছিল মুস্তাকের। বরোদা উকিলের হাতটা তার পিঠে পড়তেই লাফিয়ে উঠল সে।

—ভয় নেই ভয় নেই। সাহস দিলেন বরোদাবাবু, বললেন, emo বললে—সেতার আনতে বল মুস্তাককে, বড় সাহেব বললে মটর নিয়ে যেতে। তারপর মুখটা কানের কাছে এনে ফের বললেন, বুঝলি, মেয়েটা বোধহয় পাগলি রে, খালি বলছে মুস্তাক আরো বাজাও, আরো—

হাঁপাতে লাগল মুস্তাক। চলচ্ছক্তি রহিত। ঠেলা দিলেন বরোদাবাবু, নে, আমি শুদ্ধু না হয় উঠছি মটরে।

চুরি করা মালের মত সেতারটা বগলে করে পা টিপে টিপে বরোদা উকিলের পেছনে পেছনে ঘরে উঠে এল মুস্তাক। ডিম একটা আলোয় বিভীষিকা সৃষ্টি করে আছে ঘরটা। একটা চেয়ারে সেই পোষাকেই হতাশ হয়ে বসে আছে বঙ্গা—বড় সাহেব, ম্যাদাম হাতল ধরে দাঁড়িয়ে। ডেলিগেটদের কয়েকজন আর নেতা পল ইভান চলতে চলতে হঠাৎ যেন থেমে গেছে সব। emoর হাতে সিগারেটটা অনর্থক পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে।

মুস্তাক আসতেই সব কটা চোখ ফিরে গেল এদিকে। প্রাণ পেল যেন একটা জড়জগৎ। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মুস্তাক। প্রকাণ্ড হলঘরটার মাঝখানে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল তাকে। emo নির্দ্দেশ করলেন বসতে। বললেন, বেডের ঠিক নীচে বস।

যন্ত্রচালিতের মত বসে পড়ল মুস্তাক। সেতারটা রাখল কোলের ওপর, তারপর ভীতু চোখ দুটো মেলল ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার বললেন, বাজাও, কি বাজিয়েছিলে লাইব্রেরীতে দরোবারী কানাড়া না—হাঁ হাঁ দরোবারীই বটে।

বেডের ওপর নিশাড়ে পড়েছিল লিসা। ফিকে সবুজ গাউনটার আড়ালে বুকটায় অগণন ঢেউ উঠছে সমুদ্রের। মাখনের মত চুলগুলো বিছানায় অবিন্যস্ত। চোখ বন্ধ, মনে হচ্ছে অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন।

ঝন্ ঝন্ করে উঠল, সেতারের তারগুলো। আর সংগে সংগেই চোখ মেলল লিসা! টকটকে গোলাপের মত রঙ। বন্ধ করে ফেলল তৎক্ষণাৎ।

ইনিয়ে বিনিয়ে বেজে চলল দরোবারী, উঠে নেমে থেমে থেমে। দুলতে লাগল ঘরের মানুষগুলো আর বায়ুস্তর-ইথর। নিথর সকলে চুপচাপ। গঙ্গার বুক থেকে ছড়ান কুয়াসাগুলো ক্রমশ যেন উঠে আসছে ঘরটায়, সাদা হয়ে আসছে নীলচে আলোর আবহাওয়াটা। আর নীল লাল কাঁচের সার্শিগুলো থেকে যেন অজস্র কান্নার লাইন তালগোল পাকিয়ে ছুটে এসে এক একটা করে খসে পড়ছে মুস্তাকের তারযন্ত্রে।

ক্রমশ শান্ত হয়ে এলো লিসার ওঠা নামা বুকটা। ভাঁটা শেষ—গঙ্গার থমথমে ভাবের মত। তাল নেই, তবুও লয়ে লয়ে ধরে ধরে যাচ্ছিল পৃথিবী। উত্তাপ যেন কমে আসছে তার—তার আড়ালে থেকেও সূর্য যেন ছাই হয়ে আসছে।

একটা আর্তনাদ করে উঠে বসল লিসা। কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না ও। শূন্যে হাত চালাতেই পেয়ে গেল সেতারের মাথাটা আর সংগে সংগেই জড়িয়ে ধরল বুক দিয়ে—কামড়াতে লাগল মুক্তোর মত দাঁতগুলো দিয়ে।

রক্ত-গোলাপ চোখ দুটো দেখে ভয় পেয়ে হাত তুলে নিয়েছিল মুস্তাক, তার মনে হল ড্রিঙ্ক করেছে মেয়েটা।

থেমে গেল বাজনা, কিন্তু সুর থামে নি। গঙ্গায় বান ছুটে যাচ্ছিল তখন, জেঠিতে জেঠিতে ধাক্কা খেয়ে, বালির চড়ায় শঙ্খ লাগা সাপের মত উদ্ধত অজস্র ফণা আছাড় খেয়ে খেয়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। মুস্তাকের মনে হল, ব্রেক করার সংগে সংগেই তার মটরের নীচে কতকগুলো পাঁজরা যেন গুঁড়িয়ে গেল!

সপ্তাখানেকের মধ্যেই সেরে উঠল লিসা। টুরিষ্টপার্টি দাঁড়ায়নি কিন্তু। দিল্লী কন্সাল আফিস থেকে বার বার তার পেয়ে চলে গেল তারা, বলে গেছল, লিসা সেরে উঠলেই টেলিগ্রাম করে প্লেনে ওঠে যেন—আমরা পালামে হাজির থাকব।

সেরে উঠেই টেলিগ্রাম পাঠাল লিসা। লিখে দিল;

আমি সম্ভবত বছরখানেক থাকব এখানে, ফ্রান্সের জন্তে নতুন একটা বাজনা নিয়ে যাব।

ভারতবর্ষ বন্ধুবিজন আইল্যাণ্ড নয়, চন্দননগরে প্যারিস পেণ্টের রেণু ওড়ে, কাজেই ফিরে দাঁড়াল না তারা। দিল্লী থেকে বোম্বাই, তারপর মাদ্রাজ হয়ে পণ্ডিচেরী থেকে তার পেল লিসা।

মাইনে বেড়ে গেল মুস্তাকের পঞ্চাশ টাকা। সন্ধ্যেয় তালিম দিতে হবে লিসাকে। ভারতীয় রাগ রাগিনীর—অ আ ক খ থেকে সুরু হবে তার শিক্ষা। তাতে যত বছরই লাগুক, আপত্তি নেই তাতে লিসার।

প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল ভাষা। মাত্র গুটি পাঁচেক ফরাসী শব্দ জানা আছে মুস্তাকের, আর লিসা বোঝে না এক বর্ণ বাংলা। দিন ক'য়েক বরোদাবাবু এসেছিলেন দুজনের মাঝে, তারপর ঠিক হয়ে গেল সব—সুরের ভাষা সংগীতের বক্তব্য ধার ধারে না কোন ডিক্সনারীর।

মাস দুয়েকের মধ্যেই হাত বসে গেল লিসার। আশ্চর্য স্মৃতি। গীটারের ছন্দ ভুলে সাতসুরের সাত পরতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল তার চাঁপা কলি আঙুল।

দিন চলল মটরের মাইলস্পিডারের সংগে পাল্লা দিয়ে। এক হাত দূরের গাউন-পরা মেয়েটার জ্বল-জ্বলে চোখ আর তপ্ত নিশ্বাসের ভাষা মুস্তাকের সেতারের তারে তারে ছড়াতে লাগল দীর্ঘশ্বাস। ঘন হয়ে আসতে চায় ক্রমশ। রামকেলি আর ভৈরবীর মত দুটি রাগের বিচিত্র অবস্থান—একটু ভুলচুকেই এক হয়ে যেতে পারে যখন তখন।

কি যেন হলো মুস্তাকের, কামাই করে বসল দুটো দিন। মটরটা না হয় চালালো পুলিশের একজন ড্রাইভার, কিন্তু দ্বৈত সেতারের ঝঙ্কার তো উঠল না পালিশ-করা মেঝেয়, রঙিণ সার্সির মসৃণ ত্বকে।

ছটফট করে লোক পাঠাল লিসা। ফিরিয়ে দিল মুস্তাক, বললে, শরীর খারাপ।

সন্ধ্যা নেমে গেছে তখন। ছিম ছাম অন্ধকার নেমেছে ষ্ট্রাণ্ডের ধারে। বারো দুয়ারের ঘাটগুলো থেকে অন্ধকার ছিটিয়ে পড়ছে জনপদের চার দিকে। শরৎ শেষের গোধূলি মেঘ ক্রমশ ছাই হয়ে যাচ্ছে।

লিসার একটা নরম হাত মুস্তাকের মাথায় নেমে আসতেই চমকে উঠে বসল মুস্তাক। আর বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতই লিসা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। মুস্তাকের অবাক হবার আগেই তার ফুলের পাপড়ীর মত ঠোঁট দুটো অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিল তার মুখমণ্ডল। বুকে মাথা রাখল লিসা। করুণ দুটো হরিণ চোখ তুলে বললে, মুষ্টাক, আমি তোমায় ভালবাসি!

এমন অনুরাগ-জড়ানো কথা কোথেকে শিখল লিসা! মুস্তাক অবাক হলো নতুন করে—প্রেমের ভাষাও কি ধার ধারে না কোন ডিক্সনারীর!

—চল মুস্তাক বোট চাপব আজ—একদিন বলে উঠল লিসা। রাণীঘাটের অজস্র পানসির একটা খোলা হয়ে গেল তক্ষুণিই। মাঝি নিতে ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানাল লিসা। বৈঠা হাতে শেষ পর্যন্ত গোলুইয়ের শেষে মুস্তাককেই বসতে হল।—তার মনেও ঢেউ উঠেছে, সমুদ্রের ঢেউ—দিগন্ত বিসারী।

শরৎ শেষের গঙ্গা। খোলস ছাড়া সাপের গতির মত স্রোতের পিঠে পানসিটা কখন যে ভেসে এসেছিল ষ্টিমার ঘাটটার সামনা-সামনি তা মুস্তাকও টের পায়নি। লিসার দুরন্ত চোখ দুটো থেকে চোখ নামাতেই চমকে উঠল লিসা—রেসিডেণ্ট হাউসের মাথায় ম্যাদাম বঁজা।

মুহূর্ত্তেই শিটিয়ে গেল মুস্তাক, আর হাত দুটো হয়ে উঠল লোহার সাবলের মত। নৌকাটা নিয়ে প্রাণ-পণ ছুট দিল উত্তরে।

একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করল লিসা: কি হইল মুস্তাক?

ভয়-কাতুরে চোখ দুটো তুলে মুস্তাক ইসারা করে দেখাল ম্যাঁদামকে।

আর সংগে সংগেই হাসিতে ফেটে পড়ল লিসা। নৌকা টলমল করে চলকে উঠল জল, তবুও থামে না লিসার হাসি! তপসে মাছের নৌকাগুলো পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাল ছেড়ে দিল অবাক হয়ে, মুস্তাক তো কুঁকড়ে গেল আরো। তার চেনা লোকের নৌকা—জাত ভাই—মুখটা চোরের মত হয়ে গেল তার। তবুও থামল না লিসার হাসি। রাগ ধরে গেল মুস্তাকের।

ইমন থেকে ভূপালী প্রায় গোটা আষ্টেক রাগ রাগিনী

তাহার উদ্দেশে যেন উপযুক্ত শ্রদ্ধা সম্মান জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁহার রচনার জন্ম উপযুক্ত পুরস্কার ঘোষণা করিতে কেহ নিশ্চেষ্ট না থাকেন। বাংলার কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে মানিকের দান হীরকাক্ষরে লিখিত থাকিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

কলিকাতায় চীনা নেতৃদ্বয়—

গত ৮, ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর তিনদিন মহা-চীনের ২ জন নেতা, দেশের সুসন্তান চৌ-এন লাই ও হো লুং কলিকাতায় থাকিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনে কলিকাতায় যে চাঞ্চল্য ও জনসমাগম দেখা গিয়াছে, তাহা অসাধারণ। কিছুকাল পূর্বে রুশ-নেতা বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের আগমনের মত চীননেতাদের আগমনও সহরবাসীর এক স্মরণীয় ঘটনা। প্রথম ব্যক্তি চৌ-এন লাই বর্তমান চীন গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। তিনি ১৮৯৮ সালে জন্মিয়া অল্পবয়সে খ্যাতি লাভ করেন ও ১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বিশ্বে এক মনীষী ও রাজনীতিক বলিয়া পরিচিত হন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে জেনিভা সম্মেলনে যোগদানের পর তিনি ভারতে আসিয়া শ্রীনেহরুর সহিত পঞ্চশীল সম্বন্ধে এক যুক্ত-বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে চীন-নেতা হিসাবে তিনি বান্দুংয়ে এসিয়া-আফ্রিকা সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হো লুং চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার জন্ম ১৮৯৬ সালে। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি ভাল খেলোয়াড়। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে তিনি চীনের প্রতিনিধি হিসাবে পোলাণ্ডে গিয়াছিলেন ও ঐ বৎসর সেপ্টেম্বরে তিনি চীনের মার্শাল উপাধি লাভ করেন। গত মার্চ মাসে তিনি পাকিস্তানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উৎসবেও যোগদান করিয়াছেন।

তাঁহারা ৮ই ডিসেম্বর শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় দমদম বিমান ঘাটিতে নামিলে দমদম হইতে রাজভবন—সমস্ত পথ সাজাইয়া অগণিত নরনারী তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। সন্ধ্যায় বিধানসভা ভবনে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হয় এবং ২৬ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী, ৮ খণ্ড বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, স্বামী বিবেকানন্দের ৭ খণ্ড রচনাবলী প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়। রবিবার তাঁহারা ষ্ট্যাটিসটিকাল ইনিষ্টিটিউট, ট্রপিক্যাল স্কুল ও মহাবোধী সোসাইটী দর্শন করেন। বিকাল ৩টায় গড়ের মাঠে ১০ লক্ষ লোক সমবেত হইলে কলিকাতাবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে চৌ-এন লাই চীন মার্কিণ সম্পর্কের উন্নতি বিধান, হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী, ফরমোজা, কাশ্মীর ও সুয়েজখাল সমস্যা প্রভৃতির কথা বলেন। তাঁহার বক্তৃতায় বুঝা যায় যে তিনি একজন ধীর, স্থির, পণ্ডিত দেশ-সেবক। তাহার কথার মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না—অথচ সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত ছিল। ঐ বক্তৃতাটি প্রচার বিভাগ হইতে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে দেশবাসী চীন প্রধানমন্ত্রীর অভিমত ও ব্যক্তিত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবে। রাত্রে আনন্দোৎসবে যোগদানের পর সোমবার সকাল ১০টায় তাঁহারা দমদম হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন।

সম্রাট হাইলে সেলাসী—

ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী ১৫ই নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া তিনদিন কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। ১৫ই তারিখে বিধানসভা ভবনে তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় সম্বর্দ্ধনা ও ১৬ই কলিকাতা কর্পোরেশন গৃহে পৌর-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি শুধু সম্রাট নহেন, তাঁহার দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন—সে মুক্তি-সংগ্রামের তিনি নায়ক ছিলেন। ১৭ই নভেম্বর তিনি কলিকাতা হইতে জাপান যাত্রা করেন।

এই সকল মহামান্য অতিথির স্বাধীন ভারতে আগমন ও ভারত দর্শনের ফলে শুধু ভারতবাসী মনে উৎসাহ ও দেহে শক্তি লাভ করিবে না—নূতন ভারত-গঠনে সকলের সাহায্য লাভ করিয়া দেশকে নূতন রূপ দিতে সমর্থ হইবে। চীনে ৬০ কোটি লোক বাস করে—আর ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা ৪০ কোটি—এই উভয় দেশ যদি মিলিত হইয়া বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বের সর্ববিধ উন্নতি সাধনে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে কত বড় ও অধিক পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিবে, আজ তাহা সকলের অনুধাবনের বিষয়। শ্রীজহরলাল নেহরু সেজন্য পৃথিবীর সকল দেশের সহিত নূতন, বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ

স্থাপনে এত উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি গত ১৪ই ডিসেম্বর নিজে আমেরিকায় গিয়াছেন—তথায় একপক্ষ কাল বাস করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত বিশ্বমৈত্রী ও ভারতের কল্যাণসাধন বিষয়ে আলোচন করিবেন। তিনিও যেমন আশা করেন, ভারতের সকল লোক তেমনই আশা করে যে শ্রীনেহরুর মার্কিণ ভ্রমণের ফলে ভারত তাহার নবরাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনায় প্রভূত সাহায্য লাভ করিতে পারিবে।

খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীঅতুল বসু, শ্রীরাসবিহারী দত্ত, শ্রীকিশোরী রায়, শ্রীকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলাইলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীজগদীশ রায়, শ্রীদেবাংশু রায়চৌধুরী, শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীরসময় ভট্টাচার্য্য তৈলচিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছেন। শীঘ্রই তথায় আরও নিম্নলিখিত ২২ জনের তৈলচিত্র রক্ষিত হইবে—(১) ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ (২) শ্রীজহরলাল নেহরু (৩) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দিল্লীতে দালাই লামা। ডক্টর শ্রীরাধাকৃষ্ণন ও শ্রীজহরলাল নেহরু পালাম বিমান বন্দরে সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান

বিধান সভায় নেতাদের চিত্র—

গত ১০ই নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীজহরলাল নেহরু পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা ভবনে ১৮ জন জাতীয় নেতার তৈল-চিত্রের আবরণ উন্মোচন উৎসব সম্পাদন করেন। ১৮ জনের নাম—(১) মহাত্মা গান্ধী, (২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৩) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, (৪) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, (৬) হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (৭) রাজা রামমোহন রায়, (৮) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (৯) রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, (১০) স্বামী বিবেকানন্দ, (১১) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, (১২) আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, (১৩) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৫) যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (১৬) শরৎচন্দ্র বসু, (১৭) শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও (১৮) মতিলাল নেহরু।

দাশ (৪) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (৫) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (৭) কেশবচন্দ্র সেন (৮) লালালাজপৎ রায় (৯) বালগঙ্গাধর তিলক (১০) বিপিনচন্দ্র পাল (১১) অশ্বিনীকুমার দত্ত (১২) মদনমোহন মালব্য (১৩) দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৪) গিরীশচন্দ্র ঘোষ (১৫) নলিনীরঞ্জন সরকার (১৬) কিরণশঙ্কর রায় (১৭) সরোজিনী নাইডু (১৮) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৯) চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাচারী (২০) কৈলাসনাথ কাটজু (২১) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও (২২) সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। বিধান সভা ভবনে এই ৪০খানি চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হওয়ায় নেতাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইল ও সঙ্গে সঙ্গে একদল চিত্রশিল্পীকে কাজ দিয়া ও তাঁহাদের কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া সম্মানিত করা হইল। ইহা দেশের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা।

মার্কিণ কংগ্রেসে ভারতীয়—

ভারতের সন্তান বিচারপতি শ্রীদিলীপ সিং সুন্দ গত ৭ই নভেম্বর কালিফোর্ণিয়ায় ২৯তম নির্বাচন কেন্দ্র হইতে মার্কিণ যুক্তরাজ্য কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ডেমোক্রাট দলভুক্ত ছিলেন—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান দলভুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয়—যিনি মার্কিণ কংগ্রেস অর্থাৎ প্রতিনিধি-সভার সদস্য হইলেন। গত ৩৬ বৎসর কাল তিনি আমেরিকায় বাস করিতেছেন। তিনি আমেরিকায় থাকিয়া বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য করিতেন। তিনি এক মার্কিণ মহিলাকে বিবাহ করেন ও কয়েক বৎসর পূর্বে ৪০০ বিঘা জমী লইয়া উৎকৃষ্ট কৃষিক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালে তাঁহাকে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি তিনি কৃষিক্ষেত্র বিক্রয় করিয়া একটি সার-উৎপাদন কারখানার মালিক হইয়াছেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত তিন বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের লেখকদের সাহিত্য একাডেমী হইতে গত ৬ই নভেম্বর দিল্লীতে যে ১১টি পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে একটি পাইয়াছেন, বাংলার খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার রচিত 'আরোগ্য নিকেতন' পুস্তকের জন্য। আমরা তারাশঙ্করবাবুর এই সম্মান লাভে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। প্রার্থনা, করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করুন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী—

সম্প্রতি তিন দিন ধরিয়া কলিকাতা সহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। সে জন্য বেলিয়াঘাটায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক গৃহীত মাঠে ৫০ হাজার লোকের বসিবার উপযুক্ত বিরাট মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাহার নিকট একটি বিরাট জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনী ৩রা নভেম্বর তারিখেই খোলা হইয়াছিল। ১৫ দিন ব্যাপী প্রদর্শনীতে প্রত্যহ বহু সহস্র দর্শক আসিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শিল্প সম্ভার দেখিয়া গিয়াছেন। সর্বত্র কুটীর শিল্প ও ছোট ছোট শিল্পের উন্নতির জন্য যে ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, যাহার ফলে শিল্পসম্ভার সম্পর্কে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাই প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। ৯ই শুক্রবার সকালে নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর মণ্ডপ সংলগ্ন মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং ১১ই রবিবার বিকাল ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় জনসাধারণকে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও তিন দিনে কয়েকবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে—সে সকল সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। শনিবার বিকাল তিনটায় গড়ের মাঠে ব্রিগেড্ প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক জনসভায় প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ১ঘণ্টা ২০ মিনিট বক্তৃতা করেন। তিনি ঐ সময় মিশর ও হাঙ্গেরীতে যুদ্ধের কারণ ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বক্তৃতার শেষভাগে ভারতের জনসাধারণকে কর্তব্যে অবহিত হইতে উপদেশ দেন। ভারত এখনও খাদ্য বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় তিনি সকলকে খাদ্য উৎপাদনে অধিকতর মন দিতে অনুরোধ জানান। সকল শ্রমিককেও তিনি অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন বিষয়ে সচেতন করিয়া দেন। যুদ্ধ হউক আর নাই হউক, ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইলে প্রত্যেক মানুষকে সর্বদা এই দুইটি কথা মনে রাখিতে তিনি উপদেশ দেন। ঐ সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বন্যার ভয়াবহতা বর্ণনা করিয়া বন্যা সাহায্যের জন্য আবেদন জানান ও দুর্গতদের জন্য যে সরকারী ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহার বর্ণনা করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রথম দিনের সভায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সকলকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করার পর ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক সঙ্কট সম্বন্ধে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তাহাতে ইসরাইল কর্তৃক মিশর আক্রমণে ও মিশরের বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের সশস্ত্র অভিযানে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা

হয় ও তাহার তীব্র নিন্দা করা হয়। হাঙ্গারী সম্পর্কে ঐ প্রস্তাবে বলা হয়, সেখানে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, তাহার ফলে যথেষ্ট লোক নিহত হইয়াছে। প্রস্তাবে হাঙ্গেরী হইতে বৈদেশিক সেনা-বাহিনী অপসারণ করিয়া হাঙ্গেরীর অধিবাসীগণকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতে দিতে আশা প্রকাশ করা হয়। কমিটীর ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ঐ দিন তিন শতেরও অধিক সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবিবারের সভায় কংগ্রেসের নিয়মাবলী পরিবর্তন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে বন্যার ক্ষতিও সে বিষয়ে জনগণ ও সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের শিল্পনীতি সম্বন্ধে আর একটি প্রস্তাবে দেশের ভয়াবহ বেকার-সমস্যা দূর করিবার জন্য কুটীরশিল্প ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠায় সকলকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে এই অধিবেশনে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। কি ভাবে কংগ্রেস নির্বাচন পরিচালনা করিবেন, তাহার বিস্তৃত কর্মসূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে ও কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার স্থিরীকৃত হইয়াছে। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথমেই ইন্দোরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থিরীকৃত হইবে। কয়েক বৎসর পরে কলিকাতায় আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা হওয়ায় নেতাদের দেখিবার জন্য ও তাঁহাদের বক্তৃতা শুনার জন্য প্রত্যেক দিন হাজার হাজার লোক বেলিয়াঘাটায় গমন করিয়াছিল। ইহার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্যের মনোভাব কতকটা বুঝা গিয়াছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে জেনারেল শা নাওয়াজ, নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ও শ্রীশঙ্করনাথ মৈত্র আই-সি-এসকে লইয়া সরকার এক কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটী জাপান, ব্রহ্মদেশ, ইণ্ডোনেসিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। শা নাওয়াজ ও শ্রীমৈত্র যুক্তভাবে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে বলা হয়, নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। কিন্তু সুরেশবাবু সে রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন নাই। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া বহু তথ্য সম্বলিত এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহাতে প্রমাণ করিয়াছেন যে নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই, তিনি রুশে চলিয়া গিয়াছিলেন। বিষয়টি এমনই জটিল যে এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা কঠিন। নেতাজী জীবিত আছেন, এ সংবাদ প্রকৃত হইলে প্রত্যেক ভারতবাসী আনন্দিত হইবেন। আমরা এখনও নেতাজীর পুনরাবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।
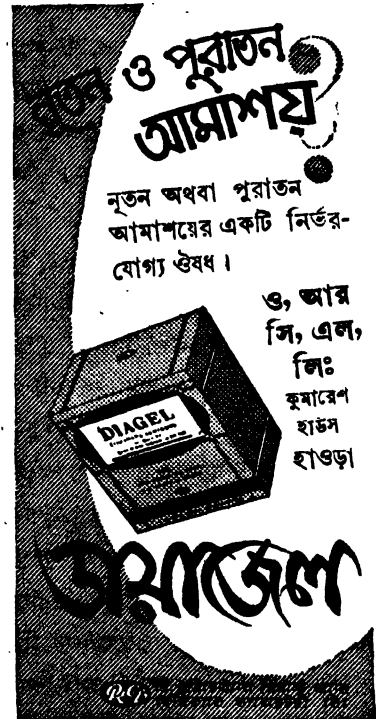
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ষোড়শ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানকে নানা কারণে ১৯৫৬ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের পদমর্য্যাদায় ফেলা যায়। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আকাশে যখন আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার কালছায়া ঘনঘটা হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময় মেলবোর্ণের অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামের মেঘমুক্ত আকাশে হাজার হাজার শ্বেত পারাবত মুক্তির আনন্দে প্রাণচঞ্চল হয়ে মানুষের মনে সুস্থ পরিবেশ রচনা করেছিলো। ষোড়শ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিস্ময়কর সাফল্য আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। আধুনিক কালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকেই সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন গ্রীসের অনুকরণে অলিম্পিক ক্রীড়ার সময় 'শান্তি' অনুষ্ঠান পালন করা হয়। আই ও সি-র (International Olympic Committee) চেষ্টাতেই হাঙ্গেরীর পক্ষে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান সম্ভব হয় এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্মানী সম্মিলিতভাবে ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করে। খেলাধুলা যে মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় করতে পারে এই ঘটনাবলি তারই পরিচায়ক।

ষোড়শ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রীসের অলিম্পিক প্রান্তরে প্রজ্জ্বলিত পবিত্র পূতাগ্নি সহস্র সহস্র মাইল দূরে মেলবোর্ণ অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামে বহন ক'রে আনা হয়। ২২শে নভেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেই অলিম্পিক পূতাগ্নি মেলবোর্ণ অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামে দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত ছিল। ৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় অলিম্পিক সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তূর্য এবং তোপ-ধ্বনির মধ্যে প্রায় এক লক্ষ দর্শক-সাধারণের উপস্থিতিতে পবিত্র পূতাগ্নি কুণ্ডটি নির্ব্বাপিত করা হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ৬৯টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরস্পর মিলেমিশে এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে কুচকাওয়াজ করেন। অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ইতিহাসে এ ঘটনাও সম্পূর্ণ অভিনব। এই আচার অনুষ্ঠানটি দর্শক সাধারণের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। এই অভিনব অনুষ্ঠানের প্রস্তাবক হলেন, জনৈক অজ্ঞাতনামা চীনা কিশোর। তাঁর প্রস্তাব ছিল, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর প্রসারকল্পে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দেশ হিসাবে বিভক্ত না হয়ে মিলে মিশে কুচকাওয়াজ করাই উচিত। চীনা কিশোরের এই প্রস্তাবটি অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তির শেষ মুহূর্ত্তে পেলেও অষ্ট্রেলিয়ান অরগানাইজিং কমিটি প্রস্তাবটির গুরুত্ব উপেক্ষা করেন নি—প্রস্তাবটি বিপুলভাবে সমর্থিত হয়।

২২শে নভেম্বর ৬৯টি দেশের চার সহস্রাধিক এ্যাথলেটের উপস্থিতিতে এডিনবরার ডিউক আধুনিক কালের ষোড়শ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন অষ্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠের উপর নবনির্ম্মিত অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে ১১০,০০০ দর্শক সমাগম হয়।

অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষ ঃ

হকি প্রতিযোগিতা ছাড়া ভারতবর্ষ এ পর্য্যন্ত অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিশেষ কোন সম্মানজনক পদ লাভ করতে

পারে নি। সুদূর অতীতের কথা—১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে নর্মাণ পিচার্ড নামে জনৈক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এ্যাথলেট ভারতবর্ষের পক্ষে বেসরকারী ভাবে যোগদান করেন এবং ২০০ মিটার দৌড় ও ১১০ মিটার হার্ডল রেসে যথাক্রমে ২য় ও ৫ম স্থান লাভ করেন। কোন দেশের পক্ষে বেসরকারী ভাবে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করার বাধা নিষেধ ঐ সময় ছিল না। এই নর্মাণ পিচার্ড ছিলেন কলিকাতাবাসী এবং ইণ্ডিয়ান

এবং ১৯৫২ সালে কুস্তি প্রতিযোগিতায় ১টি ব্রোঞ্জ পদক। ১৯৫২ সালে কুস্তি প্রতিযোগিতার ব্যাণ্টমওয়েট বিভাগে মল্লবীর কে ডি যাদব ৩য় স্থান পেয়ে ঐ ব্রোঞ্জ পদকটি লাভ করেন।

১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ অলিম্পিকে ভারতবর্ষ যোগদান করেছিল এ্যাথলেটিক্স, হকি, ফুটবল, কুস্তি, সাঁতার স্যুটিং এবং ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায়। ভারতবর্ষ হকি খেলায় বিজয়ী হয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করে এবং

অলিম্পিক গ্রামে জাতীয় পতাকাতলে ভারতীয় অলিম্পিক দলের সভ্যগণ

ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সেক্রেটারী। নর্মাণ পিচার্ডই ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম অলিম্পিক পদক লাভের গৌরব লাভ করেন। ১৯২০ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ভারতবর্ষ সরকারী ভাবে প্রথম যোগদান করে। ভারতবর্ষের পক্ষে সরকারী ভাবে অলিম্পিক পদক লাভের সৌভাগ্য হয়েছে—হকি খেলায় ৬টি স্বর্ণপদক (১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৬টি অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে)

ফুটবল প্রতিযোগিতায় ৪র্থ স্থান পায়। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—৪ গোলে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে পরাজিত হয় এবং ৩য় স্থান লাভের জন্য দুর্দ্ধর্ষ বুলগেরিয়ার সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে শেষে ০-৩ গোলে পরাজিত হ'য়ে ৪র্থ স্থান লাভ করে।

হকি এবং ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই সাফল্য ছাড়া ভারতবর্ষ অন্যান্য প্রতিযোগিতায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

ষোড়শ অলিম্পিকে অর্জিত পদক ঃ

ষোড়শ অলিম্পিকে প্রথম দশটি দেশের অর্জিত পদকের তালিকা দেওয়া হ'ল। মেলবোর্নে ১৪৭টি স্বর্ণ, ১৪৭টি রৌপ্য এবং ১৫৭ টি ব্রোঞ্জ পদক বিতরণ করা হয়।

অলিম্পিকের ১১০ মিটার হার্ডল রেসের ফাইনাল—১ম লী কলহুন, ২য় ডেভিস এবং ৩য় সেম্বল (আমেরিকা)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
রাশিয়া	৩৭	২৯	৩২
যুক্তরাষ্ট্র	৩২	২৫	১৭
অষ্ট্রেলিয়া	১৩	৮	১৪
হাঙ্গেরী	৯	১০	৭
ইটালী	৮	৮	৯
সুইডেন	৮	৫	৬
জার্মাণী	৬	১৩	৭
বৃটেন	৬	৭	১১
রুমানিয়া	৫	৩	৫
জাপান	৪	১০	৫

ম্যারাথন রেস ঃ

একটি মর্ম্মান্তিক প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাকে গ্রীসের জাতীয় জীবনে অমর ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে ম্যারাথন রেস অনুষ্ঠানটি অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে তালিকাভুক্ত করা হয়. আধুনিক কালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রথম থেকেই ম্যারাথন রেস তালিকায় স্থান পায়। মাত্র তিনটি আধুনিক কালের অলিম্পিয়াডে এই অনুষ্ঠানটি বাদ পড়ে। ম্যারাথন রেসের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ পথ। পায়ে হেঁটে এই পথ অতিক্রম করা হয়। ৪৯০ খৃঃ পূর্ব্বেম্যারাথন নামক স্থানে গ্রীস এবং পারস্যের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। Pheidippides নামক জনৈক এথেন্সবাসী ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ পথ ছুটতে ছুটতে অতিক্রম ক'রে গ্রীসের জয়লাভের সংবাদ এথেন্সে পৌছে দেন। "Rejoice! We conquer!" এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করতে করতে পথশ্রমক্লান্ত Pheidippides প্রাণত্যাগ করেন। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিয়াড় ক্রীড়ানুষ্ঠানে 'ম্যারাথন রেস' তালিকাভুক্ত হয়। এবার এ্যালেন মিমোন (ফ্রান্স) ম্যারাথন জয়ী হ'ন।

অলিম্পিক ফুটবল ঃ

ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাশিয়া ১-০ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত ক'রে স্বর্ণপদক লাভ করে।

অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার এই প্রথম স্বর্ণপদক লাভ। ১৯৫২ সাল থেকে রাশিয়া অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, এই নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া পর পর তিনটি অলিম্পিয়াডের (১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬) ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পরাজিত হ'ল। তারা পরাজিত হয়েছে—১৯৪৮ সালের ফাইনালে ১-৩ গোলে সুইডেনের কাছে, ১৯৫২ সালে ০-২ গোলে হাঙ্গেরীর কাছে এবং ১৯৫৬ সালে ০-১ গোলে রাশিয়ার কাছে। প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে যুগোশ্লাভিয়া ৪-১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ প্রথম খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের নেভিল ডিসুজা 'হ্যাট-ট্রীক করেন। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে রাশিয়া অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ২-১ গোলে বুলগেরিয়াকে পরাজিত করে। নির্দিষ্ট সময়ের খেলায় কোন দলই গোল করতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ প্রথম খেলাতেই ১৯৪৮ সালে ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে এবং ১৯৫২ সালে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ১-১০ গোলে পরাজিত হয়েছিল।

রাশিয়ার সাফল্য ঃ

বহুদিন থেকেই সংবাদপত্রে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১ম স্থান থেকে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী দেশগুলিকে পয়েন্ট
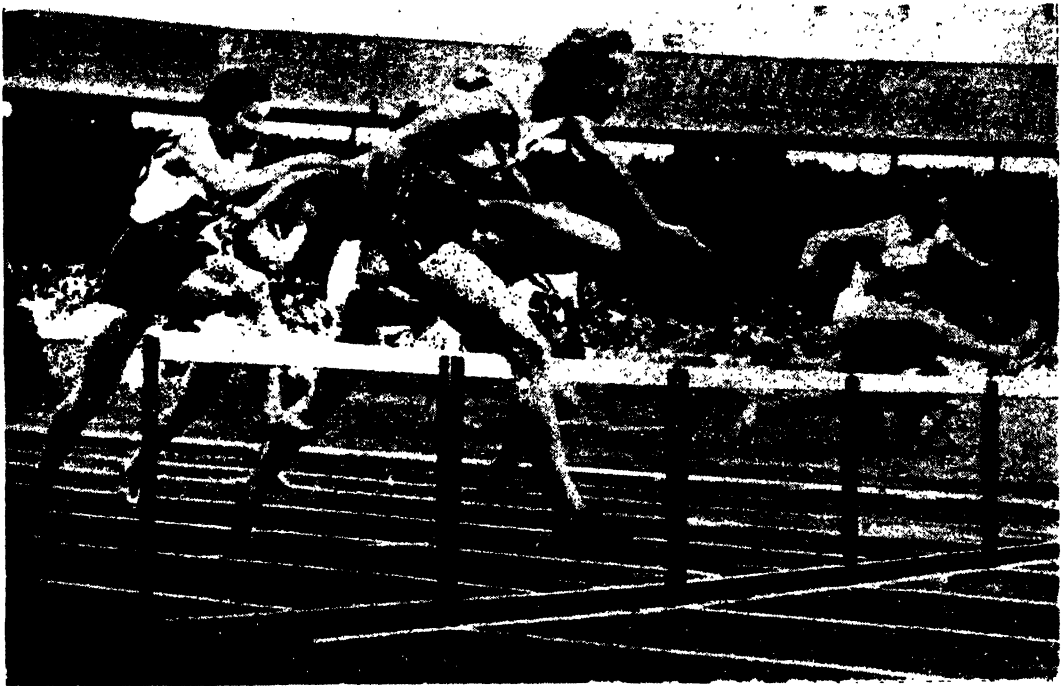
৮০ মিটার হার্ডলে ১ম অষ্ট্রেলিয়ার শার্লি ষ্ট্রিকল্যাণ্ড (মধ্যভাগে), ২য় জার্মানীর জি কিলার (ডানদিকে) এবং ৩য় অষ্ট্রেলিয়ার এন থ্রোয়ার (বামদিকে)

১-১০ গোলে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে হেরেছিল। এবার প্রথমার্দ্ধে কোন পক্ষই গোল করতে পারে নি। দ্বিতীয়ার্দ্ধের সপ্তম মিনিটে ভারতবর্ষের ডিসুজা প্রথম গোল দেন। কিন্তু দু'মিনিট পর যুগোশ্লাভিয়া গোলটি শোধ দেয় (১-১)। পনের মিনিটের খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ আরও তিনটি গোল খায়। শেষটি গোলটি হয় সালামের দোষে, একটি বল ফেরাতে গিয়ে সালাম নিজ গোলেই বল ঢুকিয়ে দেন।

বিতরণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। এই ভাবে পয়েন্ট বণ্টন করা সম্পূর্ণ বেসরকারী। অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের কার্য্যক্রমের আওতায় পড়ে না। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্থান লাভ অনুযায়ী এই ভাবে পয়েন্ট বণ্টন করা হয়—১ম স্থান ৭ পয়েন্ট, ২য় ৫ পয়েন্ট, ৩য় ৪ পয়েন্ট, ৪র্থ ৩ পয়েন্ট, ৫ম ২ পয়েন্ট, ষষ্ঠ ১ পয়েন্ট। গতবার ১৯৫২ সালে রাশিয়া অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম যোগদান

ক'রে পয়েণ্টের হিসাবে ২য় স্থান পেয়েছিল। আমেরিকা ছিল ১ম স্থানে। এবার ষোড়শ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাশিয়া বিপুল পয়েণ্টের ব্যবধানে প্রথম স্থান লাভ করেছে। পদকপ্রাপ্তির দিক থেকেও রাশিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে।

অলিম্পিকের ৫,০০০ মিটারে জয়ী ভি কুটস (২০০) ছবির ডানদিকে

অলিম্পিক হকি ঃ

হকি ফাইনালে ভারতবর্ষ ১-০ গোলে পাকিস্তানকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি ৬ষ্ঠবার অলিম্পিক হকি খেতাব লাভ করেছে। ভারতবর্ষ প্রথম হকি খেতাব লাভ করে ১৯২৮ সালে আমস্টর্ডামে। ক্রমশঃ ভারতবর্ষকে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে তার আর এক প্রমাণ মেলবোর্ণ অলিম্পিকের হকি খেলার ফলাফল। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ মাত্র ১-০ গোলে জার্ম্মান দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে একটির বেশী গোল করা সম্ভব হয় নি; হাফ-ব্যাক জেণ্টল পেনাল্টি কর্ণার থেকে জয়সূচক গোলটি করেন। এই গোল হওয়ার পর পাকিস্তান পেনাল্টি বুলি পায় কিন্তু গোল করতে সক্ষম হয় না। ভারতবর্ষের উপর্য্যুপরি ৬ষ্ঠবার হকি খেতাব লাভের সংবাদে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতীয় হকি খেলার 'যাদুকর' ক্যাপ্টেন ধ্যানচাঁদ সতর্ক বাণী উচ্চারণ ক'রে বলেছেন, "এই বৎসর সেমি-ফাইনালে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে এবং ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় হকি দলকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। এই থেকেই বুঝা যায়, আগামী অলিম্পিকে ভারতকে আরও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। সুতরাং উপর্য্যুপরি ৬বার জয়লাভে ভারতবর্ষকে আত্মতুষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না।"

অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দেশ তিনটি গ্রুপে ভাগ হ'য়ে লীগপ্রথায় খেলেছিল। প্রতি গ্রুপে চারটি ক'রে দেশ ছিল। 'এ' গ্রুপ থেকে ভারতবর্ষ, 'বি' গ্রুপ থেকে বৃটেন এবং 'সি' গ্রুপ থেকে পাকিস্তান এবং জার্ম্মান সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ১-০ গোলে জার্ম্মানকে এবং পাকিস্তান ৩-২ গোলে বৃটেনকে পরাজিত করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, ভারতবর্ষ বিগত ৬টি অলিম্পিক হকি প্রতি-যোগিতায় ২০৩টি গোল দিয়েছে এবং মাত্র ৯টি গোল খেয়েছে।

ভারতবর্ষ ঃ আফগানিস্থানকে ১৬-০ গোলে, আমেরিকাকে ১৪-০ গোলে, সিঙ্গাপুরকে ৬-০ গোলে, জার্ম্মানকে ১-০ গোলে, এবং ফাইনালে পাকিস্তানকে ১-০ পরাজিত করে।

পাকিস্তান ঃ বেলজিয়ামকে ২-০ গোলে, নিউজি-ল্যাণ্ডকে ৫-০ গোলে, জার্ম্মানীর সঙ্গে ০-০ গোলে খেলা ড্র, সেমি-ফাইনালে বৃটেনকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে এবং ফাইনালে ০-১ গোলে ভারতবর্ষের কাছে পরাজিত হয়।

অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল ঃ ১ম ভারতবর্ষ, ২য় পাকিস্তান, ৩য় জার্ম্মান, ৪র্থ বৃটেন, ৫ম অষ্ট্রেলিয়া এবং ৬ষ্ঠ নিউজিল্যাণ্ড।

ফটো ঃ এই বিভাগে প্রকাশিত ছবিগুলি ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প : নারায়ণ সান্যাল

দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষদের নিয়ে সরকারী আশ্রয় শিবির-গুলিতে যে-সকল সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে সে সকল নিয়ে অতি চমৎকার কাহিনী রচনা করেছেন লেখক। গল্প রচনার ভঙ্গি বড় এলোমেলো—তবু—কোথায়ও রসহানি হয় নি। কাহিনীর নায়ক ঋতব্রতর প্রতি পাঠক-পাঠিকার মন সহানুভূতিতে ভরে থাকবে সারাক্ষণ।

দেশবাসী ও সরকার যদি লেখক প্রদর্শিত সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে মনোযোগ দেন তবেই সার্থক হবে লেখকের এই কাহিনী রচনা—রক্ষা পাবে হাজার হাজার পঙ্গুভূয়মান মানুষের জীবন।

[প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা—১২ : মূল্য ৩৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

মধুবাগ : শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

আলোচ্য গ্রন্থে বত্রিশটি কবিতা আছে। প্রত্যেকটির পাদদেশে সাল তারিখ এমন কি সময় পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকারের 'আমার কথা'য় বলা হয়েছে 'সমুদয় কবিতাগুলোই বিভিন্ন মাসিক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত', পাদদেশে পত্রিকাগুলির নাম উল্লেখ থাক্‌লে আরও ভালো হোতো। অধিকাংশ কবিতা ভাববাদের উপর গড়ে উঠেছে। বাংলার কাণ ও সুর কবিতাগুলির মধ্যে পাওয়া গেল। গ্রন্থকার কাণে বেহুঁস না হোলেও পদরচনায় মিল দিতে গিয়ে স্থানে স্থানে বেহুঁস হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে মিলহারা কবিতা লিখ্‌লে সমালোচকের বক্রোক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আত্মপ্রসাদলাভ করতে পারতেন। বহুস্থানেই মিলের দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে, কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল যেমন—ঝগড়াঝাঁটি—ছুটি (৭ম পৃষ্ঠা) দেখি—দশাকে (৮ম পৃষ্ঠা) রজনীতে—নিভৃতে (১৮ পৃষ্ঠা) রহিবে—আসিবে (২০ পৃষ্ঠা) কপোলে—ছাল (২০ পৃষ্ঠা) বাঁধনহারা—দিলে ধরা (২৪ পৃষ্ঠা) চারিধারে—ঘরে (৩৯ পৃষ্ঠা) কথা—গাঁথা (৪১ পৃষ্ঠা) রোগে—কোলাহলে (৪৫ পৃষ্ঠা) সাথে—মিলাইতে (ছচল্লিশ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি। কবিতাগুলির গতি ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করে দেখা গেল দুর্বোধ্যতা নেই, যতি দোষ নেই, ব্যঞ্জনায় গতানুগতিকতা আছে, ভাব সম্প্রসারণে স্থানে স্থানে চিন্তার বিচ্ছিন্নতা ও ভাষার দুর্ব্বলতা আর রসাভাব আছে। এতদ্‌-সত্ত্বেও কুঁড়ির মরণ, অসমাপ্ত, খোকার চিন্তা প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা পড়ে আনন্দ পাওয়া গেল। ছাপা, কাগজ ও মলাট চলন-সই।

[প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান স্থাশন্তাল পাব্‌লিসিটি এণ্ড প্রেস লিমিটেড ৫০ এ, সাতকড়ি মিত্র লেন, কলিকাতা—১১। মূল্য ॥০ আনা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির এই পরিকল্পনার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে—সেজন্য অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপযুক্ত সময়ে এই পুস্তক প্রকাশে জনসাধারণ উপকৃত হইবে। তিনি পরিকল্পনার ভূমিকা ও রূপের পরিচয় দিয়াই প্রথম ও দ্বিতীয়—দুইটি পরিকল্পনা পাশাপাশি দিয়া উভয়ের তাৎপর্য্য বুঝাইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পরে (১) কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন (২) সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি (৩) শিল্প ও খনিজ উন্নয়ন (৪) পরিবহন ও যোগাযোগ (৫) শিক্ষা (৬) স্বাস্থ্য (৭) গৃহ নির্ম্মাণ (৮) শ্রমিক কল্যাণ (৯) অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন (১০) শরণার্থী পুনর্ব্বাসন (১১) পশ্চিম বঙ্গের পরিকল্পনা—বিষয়গুলি পৃথক ভাবে বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন। পরিকল্পনায় অর্থের ও কর্ম্মের সংস্থান প্রধান বিষয়—সে দুইটিও বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি, ভাষা সহজ ও সরল—কাজেই এই কঠিন বইখানিও তাঁহার হাতে সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রাপ্তিস্থান : বুক একস্‌চেঞ্জ—২১৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ২৲ টাকা]

বাংলার দাতাকর্ণ (ডক্‌টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনী) : শ্রীসুরেন নিয়োগী

লেখক প্রথমেই ঘোষণা করিয়াছেন—এই পুস্তকের সমস্ত লভ্যাংশ ডক্টর হরেন্দ্রকুমারের স্মৃতি রক্ষায় দেওয়া হইবে। সুরেনবাবু প্রবীণ সাংবাদিক ও সুলেখক। হরেন্দ্রকুমার বর্ত্তমান যুগের শুধু খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী, দানবীর, পণ্ডিত ও সুশাসক ছিলেন না—যে শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, সে শ্রেণীর মানুষ এ যুগে দুর্লভ। আমরা 'দেবতা' প্রত্যক্ষ করি নাই, তবে ইহার মধ্যে দেবত্ব দেখিয়া মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছি। তাই তাঁর জীবনী হাতে পাইয়া সত্যই আনন্দলাভ করিয়াছি। তাহার উপর লিখনভঙ্গী চমৎকার, ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। বইখানি বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা দ্বারা

মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করিবে। রামায়ণের রামের মত এই দাতাকর্ণ হরেন্দ্রকুমার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন।

[প্রাপ্তিস্থান: সংহতি প্রকাশনী—২০৩।২বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ॥৵০ আনা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্ভিদ জীবন: শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

প্রাচীন যুগ থেকে মানুষের মন ছুটে চ'লেছে সত্যের সন্ধানে। যা কিছু সুন্দর যা' কিছু সত্য মানুষ হয় তার পূজারী, তাই অবচেতন মনেও মানুষ হ'য়ে পড়ে সত্যের পূজারী। উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশ। সভ্যতার প্রথম আমল থেকেই অনুসন্ধিৎসু মানব চায় সত্যকে উপলব্ধি করতে। বিশেষ জ্ঞান লাভ করবার জন্যই বিজ্ঞানের প্রকাশ। জ্ঞানলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা সভ্যজগতে অনেকেরই থাকে কিন্তু তা' উপলব্ধি করবার ক্ষমতা যোগায় বৈজ্ঞানিকের শিক্ষা পদ্ধতির ওপর।

এই স্বল্পপরিসর "উদ্ভিদ জীবন" পুস্তকখানির মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক উদ্ভিদ জীবনের জটিল সমস্যাগুলি সহজপদ্ধতিতে আর সুবোধ্য ভাষায় এমন সমাধান করেছেন যে পাঠ করলে চমৎকৃত হতে হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়—যথা অঙ্গ বিন্যাস, শারীর স্থান, শারীর বৃত্তি, স্বাস্থ্য, ব্যাধি, ব্যাক্‌টিরিয়া, উদ্ভিদের ইতিহাস প্রভৃতি সুসন্নিবিষ্ট করে এবং বিশদভাবে বুঝিয়ে সকলের মনে জ্ঞানের আলোকপাত করতে পেরেছেন। এমন কি মেণ্ডেলবাদের মত দুরূহ ব্যাপারকেও অতি সহজবোধ্য ও মনোজ্ঞ করে উপস্থিত করেছেন। পুস্তকখানি বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক:—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ৯৩, অপার সারকুলার রোড কলিকাতা—৯। দাম—১৲]

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
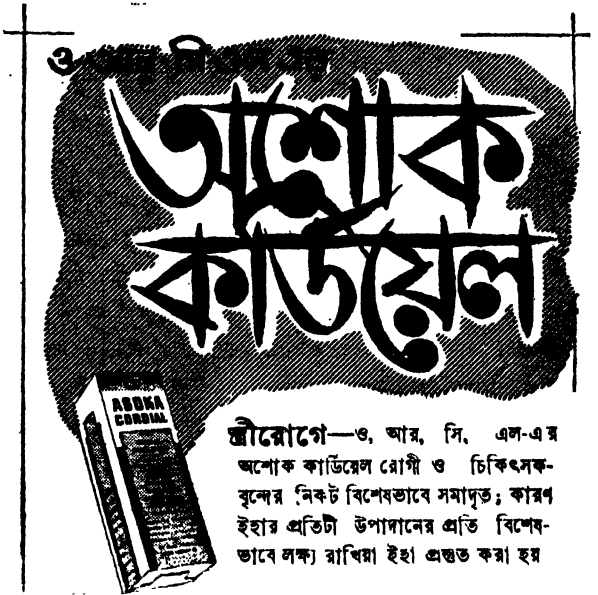
হাসির তুবড়ি শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

হাসির তুবড়ি ছেলেমেয়েদের পাঠ্যোপযোগী রঙচড়া ছড়া ছবির বই। গ্রন্থকার বয়সে নবীন হোলেও বাংলার শিশুকাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে অতি অল্প দিনের মধ্যেই—সুনাম অর্জ্জন করেছেন। তাঁর নানা ধরণের ছেলেমেয়েদের মনভুলানো ছড়া ও কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বেরিয়ে থাকে, ভারতবর্ষের কিশোর জগতের পাঠক-পাঠিকারাও ওঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত। ওঁর কবিতা ও ছড়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিশু ও কিশোর মনে হাসির খোরাক জুগিয়ে দেওয়া। আলোচ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যখন গ্রন্থকার আমার কাছে এনেছিলেন, তখনই সমস্ত হাসির কবিতা পড়ে আনন্দ পেয়েছিলাম। সুচিত্রিত হয়ে তারা গ্রন্থের ভেতর যথাযোগ্য স্থানে আশ্রয় নিয়ে আজ অভিবাদন জানাচ্ছে দেখে খুব খুশী হয়েছি। বেশীর ভাগ কবিতাই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে। সহজ সরল ভাষা ভাব ও ছন্দে আন্তরিকতার সঙ্গে মনের প্রেরণা অনুপ্রেরণা, কল্পনা ও আবেগের সুন্দর পরিচিতি আলোচ্য গ্রন্থে লক্ষ্য করা গেল। ছেলেমেয়েদের জগতে এর সমাদর হবে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

[প্রকাশক: দ্বারকানাথ সাহিত্য সংসদ: ২৮।৪এ বিডন রো, কলিকাতা-৬: মূল্য ১।০ আনা]

উপানন্দ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "দিব্যদৃষ্টি"—২॥০
শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জানি তুমি আসবে"—৩৲
শ্রীবিজয় গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "সীঁথির সিঁদুর"—৩৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকান্ত" (১ম—২০শ সং)—৩৲, "রামের সুমতি" (নাটক—৭ম সং)—১॥০, "বামুনের মেয়ে" (১০ম সং)—২৲
নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত নাটক "বঙ্গেবর্গী" (২৩শ সং)—২॥০
শ্রীসুরেন নিয়োগী প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "বাংলার দাতাকর্ণ" (ডক্টর হরেন্দ্রকুমারের জীবনী)—॥৵০
শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (২য়—৩য় সং)—৪৲
মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া" (একত্রে ২য় সং)—৩॥০
বনফুল প্রণীত উপন্যাস "পিতামহ" (২য় সং)—৬৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীয ৷খর সা | ন্যা | ভারত ৷র্কস্
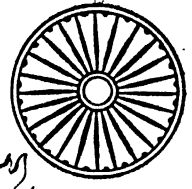
মাঘ—১৩৬৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

দার্শনিকের কর্ম

অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী

জটিল জগতে আমরা জন্মেছি। এই পৃথিবী আমাদের সৃষ্টি করা নয়। আমরা জগৎকে এই ভাবেই পেয়েছি। ভদ্রভাবে যাতে আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি—সেই চেষ্টাই আমরা করি। সীমিত ক্ষমতা নিয়ে বিপুলা এ ধরণীর কোন পরিবর্তন সাধন আমাদের পক্ষে সহজ-সাধ্য নয়। বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে আমরা জন্মেছি। সুতরাং জগৎটাকে বুঝবার চেষ্টা আমাদের সকলেরই করা উচিত। এই সাধনা আমাদের জীবন-চর্য্যাকে সুন্দর ও শোভন করে তুলবে।

জগৎ ও জীবনকে বুঝবার চেষ্টা এবং পৃথিবীতে নিজের স্থান নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষাই দার্শনিক জিজ্ঞাসার মূলে রয়েছে। এই দিক থেকে আমরা সবাই দার্শনিক, কারণ জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। হয়ত কারও কারও ধারণা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, কারও কারও আবার অতি সাধারণ। তাতে দর্শনের মূল্য-বিচারে সব ধারণা এক রকম হ'বে না, কিন্তু এগুলো যে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন, তাও কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। অবশ্য বিশেষ-ভাবে দর্শন বলি আমরা সেই সমস্ত চিন্তাধারাকেই যা সুসংবদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাধারণলোক সাধারণ ভাবে জগৎকে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেন, দার্শনিক যুক্তি-তর্ক-

বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেন। সাধারণলোকের সঙ্গে দার্শনিকের বোধ হয় এইটুকুই তফাৎ।

দর্শন যুক্তিতর্ক-বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপার। জগৎও জীবনকেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখবার চেষ্টা করেন দার্শনিক। নূতন নূতন দৃষ্টিকোণ খুলে দেন তিনি। অঙ্ক-শাস্ত্র বা ব্যাকরণ যে অর্থে শেখা যায়, দর্শন কিন্তু সে অর্থে কখনই শেখা যায় না। দর্শন পড়া মানে কতকগুলো নূতন তথ্য জানা নয়। অবশ্য দর্শনে নূতন তথ্য আমরা একেবারেই পাই না, এমনও নয়। পুরাতন পরিচিত বস্তুকেই নূতন ভাবে দেখ্‌তে শেখা বিশেষভাবে দার্শনিকের কাজ।

দর্শন কিন্তু শেখানো যায় না। দর্শন করতে হয়। আগেই বলেছি দর্শন চিন্তার ব্যাপার। চিন্তা নিজে নিজেই করতে হ'বে, অন্যে কখনও তা শিখিয়ে দিতে পারে না। দর্শন যে শেখানো যায় না তার অবশ্য আর একটা কারণও আছে। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা বা ইতিহাস শেখানো যায় কারণ এই সমস্ত বিষয়ে মোটামুটি সর্ব্বজন-গৃহীত কতগুলি সিদ্ধান্ত আছে। দর্শনে কিন্তু সর্ব্বজন-স্বীকৃত কোন সিদ্ধান্ত নেই বল্‌লেই চলে। একজন দর্শনিক যে-কথা বলেন, প্রায়ই দেখা যায় অন্য আর একজন দার্শনিক সে-কথা বলেন না। একই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যই মতের এরকম গরমিল হ'য়ে থাকে।

প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক-মতবাদের মধ্যে কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে—তা বলা যায় না। দর্শনের ইতিহাসে কেউই সর্বজন-স্বীকৃতির দাবী করতে পারেন না। যার বুদ্ধিতে জগৎ ও জীবনের চেহারা যে ভাবে ধরা দিয়েছে, তিনি তা-ই প্রকাশ করেছেন।

যে জগতে আমরা জন্মেছি তাকে বুঝতে গেলে নানা রকমের জটিলতা এসে দেখা যায়। পরিচিত জগৎকে রহস্যময় বলে বোধ হয়। দুনিয়ার ব্যাপার যে খুব সহজ-বোধ্য নয়—এ জ্ঞান প্রায় সকলেরই আছে। আমাদের জ্ঞান যে কী বস্তু এবং কী করেই বা আমরা জানি—এসব ব্যাপারও কিন্তু কম রহস্যময় নয়। জগৎকে জান্‌তে বা বুঝতে গেলে জানা বা বোঝা যে কি জিনিস তা জান্‌বার প্রয়োজন আছে। দার্শনিক প্রথমেই তা জান্‌তে চেষ্টা করেন।

আর একটা কথা মনে রাখ্‌তে হ'বে যে দার্শনিকের প্রশ্নগুলি একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যদি প্রশ্ন করা যায়—'এই বইটি কি টেবিলের ওপরে ছিল না আলমারিতে ছিল? প্রশ্নের আগে এর উত্তর আমাদের মনেই আসেনি। কিন্তু এমন কতগুলি প্রশ্ন আছে যা জিজ্ঞেস করার আগেই তাদের উত্তর আমাদের মনে মনে থাকে। জগতের প্রকৃতি, পৃথিবীতে মানুষের স্থান—প্রভৃতি দার্শনিক প্রশ্নগুলি এই ধরণের। এই সব প্রশ্ন করার আগেই এদের উত্তর আমরা ঠিক করে রেখেছি।

একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হ'ল—কাল কি দেশ-নিরপেক্ষ ভাবে পরিমাপ করা যায়? সাধারণ দৃষ্টিতে সাধারণ লোকের কাছে প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল বলে মনে হ'বে। আর সাধারণ লোক এমন ধরণের প্রশ্নের কথা কখনও চিন্তা করেছে কি-না তাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই, সাধারণ লোক এরকম ধরণের প্রশ্ন না জেনেই তার উত্তর একটা ধরে নিয়েছে। অনেকেই ত মনে করেন, দেশ-নিরপেক্ষ ভাবেই কাল পরিমাপ করা সম্ভব। আমরা সবাই ভাবি কোলকাতা রেডিও ষ্টেশনে ৪৫ মিনিট ধরে যে নাটক হ'ল, দার্জ্জিলিংএও ঠিক ৪৫ মিনিটই সে নাটকটা আমরা শুন্‌বো। যদি এর পেছনের যুক্তি জিজ্ঞেস করা হয়—তবে হয়ত অনেকেই আমরা তার সদুত্তর দিতে পারবো না। কিন্তু আমাদের সহজ বুদ্ধিজাত এই ধারণাকেও আমরা সহজে ছাড়তে পারবো না।

অন্য আর এক ধরণের ধারণার উদাহরণও গ্রহণ করা যেতে পারে। শীতের তীব্রতায় যখন আমরা কষ্ট পাই, তখন ভাবি শীতের পরই ত বসন্ত আস্‌বে। তখন আমাদের কষ্ট আর থাক্‌বে না। শীতের পর বসন্ত আস্‌বে, এই বিশ্বাস আমাদের এমনই দৃঢ় যে এর অন্যথা আমরা ভাবতেই পারি না। আমাদের ধারণা হ'য়ে গেছে যে, ঋতু-বিবর্ত্তন চিরকাল একরকম ভাবেই হ'বে। আমরা ধরেই নিয়েছি যে, প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—এই ধারণার ভিত্তি কি? একথা বল্‌লে অবশ্য চল্‌বে না যে, শীতের পরই বসন্ত আসে। যা

প্রশ্ন তাইত আবার ঘুরিয়ে এখানে উত্তরে বলা হ'য়েছে। এ'ত আর কোন ব্যাখ্যা হ'ল না। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, ঋতুবিবর্ত্তন একরকম ভাবেই হ'বে, এটা আমাদের একটা ধারণা। কিন্তু আমরা জানিনা যে এটা আমাদের ধারণামাত্র।

অবশ্য সবাই এ ধারণা করবে তার কোন মানে নাই। পর্ব্বতবাসী অরণ্যচারী বহু মানুষের মধ্যেই ঋতু বিবর্ত্তন সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। তারা মনে করে, বসন্ত কখনও আস্‌বে না—যদি বসন্তাগমনের কোন ব্যবস্থা তারা না করে। সে জন্যই নানা দেবদেবীর পূজো আর যাগযজ্ঞ তারা করে থাকে। আরাধনায় তুষ্ট হ'য়ে বসন্ত আসবে—এই তাদের আশা। যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়—পূজোর ফলেই বসন্ত আসে, একথা তাদের বল্‌লে কে? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর তারা দিতে পারবে না। আসলে এটা তাদের একটা ধারণা।

এই সমস্ত উদাহরণ থেকে দু'টো কথা খুব স্পষ্টই হ'য়ে দেখা দিচ্ছে! প্রথমতঃ—আমরা সবাই খুব জটিল বিষয় সম্বন্ধেও বিশেষ ধারণা পোষণ করে থাকি। দ্বিতীয়তঃ—এই সব ধারণা যে আমাদের সৃষ্টি সে সম্বন্ধে প্রায়ই আমরা অবহিত থাকি না।

আমাদের জীবনে এ সমস্ত ধারণা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমাদের সমস্ত কার্য্যাবলী এ সমস্ত ধারণা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। ধারণার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কার্য্যক্রমেরও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। বন্ধুকে বলা যাবেনা যে তুমি দেরী করে এসেছ—যদি আমরা বিশ্বাস না করি যে ভিন্ন ভিন্ন লোক একই রকমভাবে সময়ের পরিমাপ করে থাকে। কৃষক তার কৃষিকাজই করতে পারবে না, যদি সে বিশেষ রকম ঋতু বিবর্ত্তন ধারায় বিশ্বাস না করে। কখন বর্ষা আস্‌বে না জান্‌লে কৃষক কৃষিকাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। আর তার ফলে কৃষিকাজ করাই তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠে। সুতরাং আমরা যে নিরুপায়-ভাবে আমাদের বিশ্বাস ও ধারণার উপর নিভর করে থাকি, তা অস্বীকার করা যাবে না।

আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয়, তবে সেই ধারণা-নির্ভর-কর্ম্ম নিশ্চয়ই সফল হ'বে। কিন্তু আমাদের ধারণা যদি হয় ভুল তবে কাজ করতে গিয়ে বিড়ম্বনার আর শেষ থাকবে না। যে কৃষক স্বাভাবিক ঋতু বিবর্ত্তন ধারায় বিশ্বাস করে, সে অতি সহজেই সুফল পেয়ে কৃষি কাজ করে থাকে। কিন্তু যারা মনে করে, দেবতাকে তুষ্ট করে ঋতু বিবর্ত্তন ঘটাতে হয়, তারা এই ভুল ধারণার জন্য অযথা পূজো অর্চ্চনায় খানিকটা সময় নষ্ট করে।

আমরা কিন্তু নিজেদের ধারণা সম্বন্ধে খুব কমই অবহিত থাকি। যাঁরা নিজেদের খুব সাংসারিক লোক বলে পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে এ-কথার সত্যতা খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। যদিও তাঁরা বলেন যে, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা সাংসারিক জ্ঞান আহরণ করেছেন, তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ধারণা দিয়েই পরিচালিত হ'য়ে থাকেন। কিন্তু এই ধারণাগুলোকে তাঁরা অভিজ্ঞতা-জাত জ্ঞান বলে ভুল করেন। সেইজন্যই তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা মুস্কিল।

আমরা কি কি ধারণা করেছি, তা জানা আমাদের পক্ষে একান্তভাবেই অপরিহার্য্য। তার তা জান্‌তে গেলে নির্ম্মোহ মন নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। এই চিন্তাই ত দার্শনিক-চিন্তা। যতক্ষণ আমরা আমাদের ধারণা সম্বন্ধে অবহিত না হই, ততক্ষণ আমরা এদের দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হই এবং নানারকমের অসুবিধে ভোগ করি। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আমাদের মজ্জাগত ধারণার জ্ঞান না থাক্‌লে আমরা কখনই স্বাধীন-ভাবে কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারি না। সুতরাং সাধারণ লোকে যে মনে করে, মানুষ নিজ ক্ষমতা ও ভাগ্য অনুসারেই কাজ করে' সাফল্য বা অসাফল্য লাভ করে এবং দার্শনিক চিন্তা আমাদের জীবন-যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্য নয়, তারা কিন্তু ভুল করে থাকে। চিন্তা করে কাজ করলেই সহজে সাফল্য আসে। আমরা বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব যখন না ভেবেচিন্তেই কাজ করি তখন কিন্তু আমরা আমাদেরই অপমান করি, আমাদের বুদ্ধির শক্তিকে অশ্রদ্ধা করি। আমাদের এরকম ব্যবহার কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

চিন্তা করে কাজ করি না বলেই প্রায়ই আমাদের অনু-শোচনা করতে হয়। যদি সব সময়েই মাথা খাটিয়ে কাজ করি, তবে অসুবিধা খুব কমই ভোগ করবো। আর বিচার-বুদ্ধি নিয়ে আমরা মানুষ যারা জন্মেছি তাদের ত

বিচার করেই কাজ করা উচিত। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা আমাদের কার্য্যাবলীর নিয়ামক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যেহেতু আমরা মজ্জাগত ধারণা দিয়েই বিশেষভাবে পরিচালিত হ'য়ে থাকি, সুতরাং এ সব ধারণার যৌক্তিকতা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। এই যৌক্তিকতা-বিচার কিন্তু সহজ কাজ নয়। যদি কোন ধারণা অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে তা পরিত্যাগ করে নূতন ধারণা গ্রহণ করতে হ'বে। মজ্জাগত ধারণার যৌক্তিকতা-বিচার ও সময় বিশেষে নূতন ধারণার সৃষ্টি—এই হ'চ্ছে দার্শনিকের কাজ। কাজটা মোটেই সহজ নয়। দার্শনিক তাঁর কাজের গুরুত্ব বোঝেন। তিনি বিনীতভাবেই তাঁর বিচার-বুদ্ধি-মত কাজ করে যান। ফলের ভাবনা তিনি ভাবেন না। দার্শনিক সত্যিই নিষ্কাম কর্ম্মী।

চিন্তার যে সমস্ত কাজ আছে তার মধ্যে দার্শনিক চিন্তা অত্যন্ত কঠিন ও একটু নূতন ধরণের। সক্রেটিস, প্লেটো, হিউম, কাণ্ট প্রভৃতি সমস্ত প্রখ্যাত দার্শনিকেরাই দ দুরূহতা স্বীকার করেছেন। দর্শনের দুরূহতা একটা বি কারণে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ত শুধু যুক্তি পরিচালিত হই না। প্রায়ই ভাব-প্রবণতা আম নিয়ন্ত্রিত করে।

মজ্জাগত সমস্ত ধারণাই ভাবপ্রবণতার কোমল কে লালিত হ'য়ে থাকে। তাই যুক্তি দিয়ে ধারণার দে গুণ-বিচার অধিকাংশ লোকেই ভাল চোখে দেখে ; যার পেছনে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা আছে—তা শত খারাপ হ'লে আমরা সহজে তা ত্যাগ করতে পারি না। সে জ নির্ম্মোহ মনে দার্শনিক-বিচার জনসাধারণ প্রীতির চো দেখে না। তবু যাঁরা সত্যসন্ধী তাঁরা শত প্রতিবন্ সত্ত্বেও কাজ করে যান। দার্শনিকের কাজ স্বাভাবি ভাবেই শক্ত। যেহেতু লোকে তাঁদের কাজ ভালো চো দেখে না, সেজন্য এ কাজ আরও শক্ত।

চন্দ্রকেতু গড়

শ্রীসত্যেন রায়

এখানে অযুত প্রাণ সহস্র বছর ধরে' তন্দ্রায় বিলীন,
মাটির বুকের তলে সুপ্তির আঘ্রাণ সহস্রের,
আজিও শুনিতে পাই অতীতের বাণী মুখরিত'
অনুচ্চার ইতিহাস, অনুভব লাগে গায়ে আমাদের পূর্বপুরুষের॥
কোথা হ'তে এলো এরা, কোন্ জাতি, কোন্ মানবের বংশধর
ঐতিহাসিকের প্রশ্ন পায়ে তারা মাথা খুঁড়ে মরে
অব্যক্ত ভাষার এক অনুক্ত বাণীর ক্ষুরধার
সুরটুকু পড়ে আছে এখানের মৃত্তিকার পরে॥
এ মাটিতে লাঙলের শাণিত ফলকে কত যক্ষ দেছে প্রাণ
কত যক্ষ-প্রিয়া—
নীরব ব্যথায় অশ্রু করে বিমোচন
আজিও মাটির তলে স্মৃতি তার বুকেতে চাপিয়া॥
প্রান্তরের বাতাসেতে সে ক্রন্দনে যেন আজো শুনি
উত্তর মেঘের পানে বন্দি-যক্ষ আকুতি জানায়,
বিনায়ে বিনায়ে এক নবমেঘ দূতের কাহিনী
বিরহিনী যক্ষপ্রিয়া তন্দ্রাহারা নিশি যাপনায়॥
আরও শুনিয়াছি হেথা পুরাতন ইঁটের পাঁজরে'
খনা-মিহিরের আত্মা আজিও নিসর্গ-গণনায়
মগ্ন আছে, ভূত-ভবিষ্যের কোন্ জ্যোতিষ্ক বিচারে'
নক্ষত্রের পরিণতি, কোথা হ'তে ঘটিছে কোথায়॥
এ প্রান্তরে পড়ে আছে সমুদ্রের নাবিকের মস্তভাণ্ড কত
রোম হতে পাড়ি দেওয়া জাহাজের পালে করি ভর',
এশিরীয়, মিশরীয় সভ্যতার স্পর্শে গর্বোদ্ধত
স্মৃতিরে বহিয়া আজো প্রাচীনের গৌরব মুখর॥
এখানে মিলেছে এসে' গ্রীক, মঙ্গোলীয় কত জাতি
রেখে গেছে এ মাটিতে' ছোঁওয়া তার, হয়তো তাদের
রক্তস্রোত আজো জাগে, তাদেরই সন্ততি
কঙ্কাল খুঁজিয়া ফেরে' স্মরণীয় অতীত কালের॥
আজো তাই স্পর্শ তার পেতে' চাই বুকের পাঁজরে
প্রাচীন বাঙালীর স্মৃতি, দেবালয় চন্দ্রকেতু গড়ে॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

দিদিমার দৃষ্টি তখনও একেবারেলোপ পায় নাই। খেতু-মামার গলার আওয়াজ পাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া রোজ দুপুরে তিনি খানিকক্ষণ ঘুমাইতেন।

খেতু মামা বলিলেন, "খুড়িমা, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যে। চেঁচামেচি করে' ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম না কি"

"না। ঘুম আমার হ'য়ে গেছে। বারাহী খেয়েচিস ?"

"এইবার খাব"

"কি যে সমস্ত দিন ঘুটঘুট করিস রান্না ঘরে। আমার খাওয়া তো সেই কথন হ'য়ে গেছে"

মা কোনও উত্তর না দিয়া দিদিমার চওড়া কাঠের পিঁড়িখানি বারান্দায় পাতিয়া দিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। দিদিমা বসিতেই খেতুমামা প্রশ্ন করিলেন, "শক্তির খবর পেয়েছ ? সব ভালো আছে তো"

"দিন কয়েক আগে এসেছিল একটা চিঠি। বৌমার নাকি ছেলেপিলে হবে। এ সময় আমাদের ওখানে থাকলেই ভালো হ'ত"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু আজকালকার ভদ্র-লোকরা দেখছি বউ নিয়ে একা একা থাকাটাই উচিত মনে করছেন। মা বোন বা আত্মীয়-স্বজনদের ঘেঁসটা পছন্দ করছেন না। কিছু টাকা মনি-অর্ডার করেই মনে করছেন যে কর্তব্য সমাপন হ'ল"

খেতুমামা মাঝে মাঝে খুব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন।

দিদিমা বলিলেন, "সন্তোষের বাবা মুঙ্গেরে চাকরি করে, সেখানে ভালো একটা বাসাও পেয়েছে, কিন্তু কই বৌকে তো নিয়ে যায় নি। বৌ তো মায়ের কাছে আছে"

"তোমার ছেলে শক্তি সে জাতের নয় খুড়ি। তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়"

খেতুমামা বাক্যটি সম্পূর্ণ না করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

"কি সন্দেহ হয়"

"ও একটু স্ত্রৈণ"

দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "না, তা ঠিক নয়! নিজের বৌকে কে না ভালবাসে, বাসাই তো উচিত"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু তা বলে' বউকে নিয়ে মজা করে শহরে একা একা থাকব, আর মা বোন পাড়া-গাঁয়ে পড়ে থাকবে এটা কি উচিত"

"কিন্তু এখানকার বিষয়-আশয় কে দেখে বল"

"বিষয়-আশয় তো দেখে তোমাদের দুখীরাম আর ছিরু, আর সামলাই আমি। তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখেও ভাল দেখতে পাওনা আজকাল, আর বারাহী তো ছেলেমানুষ, তোমরা যে বিষয়-আশয় দেখতে পারবে না এ কথা শক্তি ভালো করেই জানে। ওটা ওর একটা ছুতো—"

দিদিমা ইহার প্রত্যুত্তরে আর কিছু বলিলেন না। মনে হইল খেতুমামার কথায় তিনিও যেন সায় দিতেছেন।

...কতদিন আগেকার ঘটনা, কিন্তু এখনও কথাগুলি স্পষ্ট মনে আছে। বড় বয়সের অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিছুদিন আগেকার কথাও মনে নাই, শৈশবের ওই কথা-গুলি কিন্তু মনে আছে।

আর একটি ঘটনাও মনে পড়িতেছে। রাস-উপলক্ষে গ্রামে কোথায় যেন যাত্রা হইতেছিল, আমরা শিশুর দল সন্ধ্যা হইতেই আসরের সামনেই জাঁকাইয়া বসিয়াছিলাম এবং বলা বাহুল্য, কলরব করিতেছিলাম। যাত্রা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বে একজন লোক আসিয়া বলিল, "তোমরা বড্ড গোলমাল করছ, ওঠ এখান থেকে"

আমি সকলের হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম, আর আমরা গোলমাল করিব না। "তবু উঠতে হবে। চৌধুরী বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বসবে এখানে"

চৌধুরিরা গ্রামের জমিদার ছিল। যাত্রার আসরে তাহাদেরই স্থান যে সর্ব্বাগ্রে এ জ্ঞান তখন ছিল না, তাই বলিলাম, "বা, আমরা বিকেল থেকে জায়গা দখল করে' বসে' আছি—"

"ওঠ ওঠ উঠে পড়, মেলা গোলমাল কোরো না। ওই পটল কর্ত্তা আসছে—"

এ কথা শুনিবামাত্র আমার সঙ্গীরা একযোগে উঠিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। আমিই কেবল বসিয়া রহিলাম, কারণ পটলকর্ত্তা কে তাহা আমি জানিতাম না।

সেই লোকটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি বসে' রইলে কেন খোকা, উঠে পড়, উঠে পড়"

"আমি আগে থাকতে এসে বসেছি, আমি উঠব কেন"

পর মুহূর্ত্তেই পটলকর্ত্তা আসিয়া পড়িলেন। আমার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া আমার কান দুইটি ধরিয়া আমাকে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন।

"দূর হ'য়ে যা, বাঁদর কোথাকার, সামনে এসে বসেছেন—"

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন আমাকে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলাম। এ অপমানের কথা কাহাকেও কিছু বলিলাম না। তাহার পরদিন সকালেই পটলকর্ত্তা আমাদের বাড়িতে আসিয়া হাজির, হাতে একটী সোলার তৈরি পাখী।

"ও বারাহী, তোর ছেলে কোথা, কাল আমি চিনতে পারিনি তাই কাণ মলে' চড় মেরেছি ওকে। জরিমানা দিতে এসেছি আজ। ডাক তাকে—"

সোলার সুন্দর পাখীটি পাইয়া আমি সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেলাম। মায়ের নির্দ্দেশে তাঁহাকে প্রণামও করিলাম। পটলকর্ত্তা সত্যই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি গ্রামে থাকিতেন না, পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে আসিতেন। কলিকাতায় কোন একটা সদাগরি আপিসে চাকরি ছিল তাঁহার।

পটলকর্ত্তার শারীরিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খুব বেঁটে-খাটো মানুষ ছিলেন তিনি। ঘাড় বলিয়া কোনও জিনিস তাঁহার ছিল না। মনে হইত বুকের উপরই মুখটি বসানো আছে, মাঝে কিছু নাই। খুব ধপধপে ফরসা রং ছিল। ডান পায়ে ছিল গোদ। হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা 'চায়না' কোট পরিতেন। চোখ দুইটি খুব ছোট ছোট ছিল। নাকটি খাঁদা, চিবুকটি চওড়া, চিবুকের নীচে বেশ থল্‌থলে চর্ব্বি। গোঁফ-দাড়ি ছিল না। বেঁটে মোটা চিনেম্যান গোছের চেহারা ছিল তাঁহার। অত্যন্ত বদরাগী ছিলেন। রাগিয়া মাঝে মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় এমনি একটি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার নিজের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। গ্রামের কুম্ভকার পঞ্চানন গ্রামের সমস্ত প্রতিমা গড়িত, কিন্তু পটলকর্ত্তা নিজের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাটি গড়াইতেন কৃষ্ণনগরের কারিগর আনাইয়া। একবার অসুস্থতার জন্য কৃষ্ণনগরের সেই কারিগরটি আসিতে পারিল না। অগত্যা পটলকর্ত্তা পঞ্চাননকেই প্রতিমা গড়িবার ভার দিলেন। বলিলেন, "মজুরি তোমাকে বেশী দেব, প্রতিমাটি কিন্তু নিখুঁত হওয়া চাই। সোনার বেনেদের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়তে পারবে তো—"

পঞ্চানন বলিল, "পারব"

"বেশ, তাহলে গড়। জগদ্ধাত্রী পুজোর আগের দিন আমি কোলকাতা থেকে আসব। এসে যেন দেখতে পাই প্রতিমাটি তৈরি আছে, নিখুঁত প্রতিমা চাই"

পটলকর্ত্তা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িতে লাগিল! জগদ্ধাত্রী পূজার আগের দিন সন্ধ্যায় পটলকর্ত্তা যখন ষ্টেশনে নামিলেন তখন প্রিয় বন্ধু ও পারিষদ ভোলানাথের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভোলানাথ তাঁহাকে লইবার জন্যই ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। পূজার জিনিসপত্র সঙ্গে থাকিবে বলিয়া ভোলানাথকে তিনি ষ্টেশনে থাকিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

নামিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রতিমা কেমন হয়েছে"

"নিজের চোখেই দেখো। আমি আর কি বলব—"

"তার মানে? ভালো হয় নি?"

"আমি কিছু বলব না ভাই। পঞ্চানন ভাববে আমি তার নামে লাগিয়েছি"

"লাগাবার কি আছে এতে। কেমন গড়েছে বল না"

"পঞ্চানন চিরকাল যেমন গড়ে তেমনি গড়েছে"

ইহার বেশী আর কোনও কথা তিনি ভোলানাথের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু একথা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে প্রতিমা ভোলানাথের মনোমত হয় নাই। আর একবার প্রশ্ন করিলেন।

"প্রতিমা তোর পছন্দ হয় নি তাহলে"

"পূজো করবে তুমি, আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তোমার দরকার কি"

পটলকর্ত্তার গৃহিণীও (সকলে তাঁহাকে পটল-গিন্নি বলিয়া ডাকিত) ট্রেণ হইতে নামিয়াছিলেন! তিনি মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া বলিলেন, "তখন বলেছিলাম কেষ্টনগর থেকেই কারিগর আনাও। একজনেরই না হয় অসুখ করেছে, আর কারিগর ছিল না সেখানে? তার ভাইও তো আসতে চেয়েছিল"

পটলকর্ত্তা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "পঞ্চা আমাকে বললে কেষ্টনগরের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়ে' দেবে সে। সোনার-বেনেদের প্রতিমা ওই তো গড়ে ফি বছর"

ভোলানাথ বলিলেন, "এবার গড়ে নি। সোনার-বেনেরা এবার কেষ্টনগর থেকে লোক আনিয়েছিল। চমৎকার প্রতিমা হয়েছে তাদের"

"তাই না কি"

পটলকর্ত্তার গালে কে যেন একটা চড় কসাইয়া দিল। সোনার-বেনেদের প্রতিমা চমৎকার হইয়াছে! তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। গ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা ছিল। বংশ-পরম্পরাগত শত্রুতা।

এই সুবর্ণ-বণিকরা মকোর্দ্দমা করিয়া পটলকর্ত্তার পিতামহকে ঋণের দায়ে নাকি সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল। পটলকর্ত্তা বলেন—উহারা জাল হ্যাণ্ডনোট তৈয়ারি করিয়াছিল। সত্য কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু পটলকর্ত্তার ধারণা সেই মকোর্দ্দমার ফলেই তাঁহাকে আজ বিদেশে চাকুরি করিতে হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষদের বিষয়-আশয় থাকিলে তিনি স্বচ্ছন্দে এই গ্রামেই পায়ের উপর পা দিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন। দৈন্য সত্বেও পটলকর্ত্তা পূর্ব্বপুরুষদের জগদ্ধাত্রী পূজাটা বজায় রাখিয়া-ছিলেন এবং সেই পূজা উপলক্ষ করিয়া সোনার-বেনেদের উপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করিতেন। ঠিক টেক্কা দিতে পারিতেন না, কারণ সোনার-বেনেরা প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন। বাজি পুড়াইয়া, লোক খাওয়াইয়া, যাত্রা থিয়েটার করিয়া তাঁহারা যে বিপুল উৎসব করিতেন তাহা করিবার সামর্থ্য পটলকর্ত্তার ছিল না। তবু তিনি চেষ্টা করিতেন প্রতিমাটা অন্তত যাহাতে সোনার বেনেদের প্রতিমার অপেক্ষা ভালো হয়; প্রতি বৎসর তাহা হইতও, অন্তত ভোলানাথ-প্রমুখ তাঁহার পারিষদেরা একথা তাঁহাকে বলিত এবং তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মুখে একি কথা!

বাড়িতে ঢুকিয়াই তাঁহার দেখা হইয়া গেল হাবুর সহিত! হাবু পাড়ারই ছেলে এবং সম্পর্কে তাঁহার নাতি।

"হাবু প্রতিমা কেমন হয়েছে রে—"

"সিংহ ভালো হয় নি দাদু। কান দুটো ইঁদুরের কানের মতো হয়েছে—"

পটলকর্ত্তা ক্রোধে অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে দালানের দিকে হন হন করিয়া আগাইয়া গেলেন। চটিয়া গেলে পটলকর্ত্তার গলা হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হইত যাহা অবর্ণনীয়। দাঁতও কড়মড় করিত। দালানে পঞ্চানন বসিয়া তখনও প্রতিমার গায়ে রং দিতেছিল। পটলকর্ত্তা দালানের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রতিমাটি নিরীক্ষণ করিলেন। পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল—

"পঞ্চা! এ কি করেছিস? এই কি সিংহের কান?"

পঞ্চানন একলম্ফে পাশের দরজা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পটলকর্ত্তাকে সে চিনিত। ইহার পর পটলকর্ত্তা যাহা করিলেন তাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত। তিনি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া পঞ্চাননকে না পাইয়া সিংহেরই কানটা মলিয়া দিলেন। মাটির কান মট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

"ও কি করলে, ও কি করলে, কাল যে পূজো—"

পটল-গিন্নি ছুটিয়া আসিয়া মুক্তকচ্ছ কম্পিত-কলেবর পটলকর্ত্তাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। পুনরায় পঞ্চাননের কাছে গোপনে লোক পাঠানো হইল। সে লুকাইয়া আসিয়া সমস্ত রাত জাগিয়া সিংহের কান জোড়া লাগাইল।

এ গল্পটি আমি সন্তোষের মায়ের কাছে শুনিয়াছি। তিনি খুব চমৎকার গল্প বলিতে পারিতেন। কতদিন আগে শোনা গল্প এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার জীবনে পটলকর্ত্তার সহিত দেখা আরও দুই একবার ঘটিয়াছিল। তাহা যথাস্থানে বলিব। পটলকর্ত্তার সহিত আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তিনি আমার মামার দূর-সম্পর্কের কাকা হইতেন। আমার মামা আত্মীয়বৎসল ছিলেন। অনেক গরীব আত্মীয়কে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। পটলকর্ত্তাকেও করিতেন। একথা তখন জানিতাম না, পরে শুনিয়াছিলাম...”

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল একটি দোয়েল পাখী সামনের গাছের ডালে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে পুচ্ছটি উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। ক্ষীণ কর্কশ কণ্ঠ। অথচ এই দোয়েলই গ্রীষ্মকালে কি চমৎকার ডাকে। তাহার মনে পড়িল কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে শীতকালে দোয়েলরা ভালো ডাকিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে যাহার গলায় অত সুর, শীতকালে সে বেসুরা। কুমার একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল, পাখীদের কি পক্ষাঘাত হয়? দোয়েলটা উড়িয়া গেল। আবার পড়িতে শুরু করিল সে। ক্রমশঃ

অজয়ের প্রতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কান্ত-কোমল গীত-গোবিন্দ দেশের আমরা লোক,
তোমার কণ্ঠে সাজে কি অজয় ‘মোহ-মুদ্গার’ শ্লোক?
সহসা হইলে প্রলয় পয়োধি ঋণ করা ভিন্ জলে,
দুকূল ভাসায়ে, ছুটিতে লাগিলে ভীম কল কল্লোলে।
তোমার এ বারি নয় তো অজয়—এ বারি গরল ভরা,
তোমার স্নেহের কণা নাই এতে—এ শুধু বিষের ছড়া।

২

ভালবাসি আমি মাটির কুটীর—তোমার শ্যামল তীর,
প্রতিমার মত সজ্জিত গৃহ, তরু ও লতার ভিড়।
‘মথুরেশে’ মোরা পূজিনা, আমরা রাখাল-রাজারে ডাকি,
বৃন্দাবনের কুঞ্জের লাগি উৎসুক হয়ে থাকি।
মালতী মাধবী ঘেরা কুটীরের নিবিড় আকর্ষণ—
পাকা ঘরে বাস চাহেনা ঠাকুর, সুদামা এ ব্রাহ্মণ।

৩

কত বার বাড়ী ভাঙিলে অজয়—গড়িব বা আমি কত?
জিদ্ যে তোমার দুর্দ্দমনীয়—বড়ই অসঙ্গত।
কাটালাম দিন শ্রীবৎস রাজ চিন্তা দেবীর সাথে,
আনন্দ আর অভাব আমার বন্ধু দিবস রাতে।
মাটিতে যে পাই স্নেহের পরশ, পদ্ম হস্ত মার
এইবার বুঝি মানিতে হইবে তোমার নিকটে হার।

৪

শ্রীমন্ত গেল যেথান হইতে সাতডিঙা সাজাইয়া।
আমি যে সেথানে রচেছিনু বসে মাটি খড় কাঠ দিয়া।
গলে গেল আহা সুন্দর বাড়ী লাগালে বড়ই ত্রাস
এবার দেখছি পাকা ঘরে বুঝি করাবে আমারে বাস।
এ মাটির সাথে সংযোগ মোর অল্প দিনের নয়—
বন্য হরিণ চিড়িয়াখানার পিঞ্জরে করি ভয়।

৫

শ্রীমন্তের যে মধুকর ডিঙা লয়ে গেলে সিংহলে,
রাজৈশ্বর্য্য দিলে তুমি তাকে, নানাবিধ কৌশলে।
দেখাইলে তাঁরে কমলে কামিনী, সাগরে কমল বন,
সেই রূপ সেই দৃশ্য দেখিতে মন হয় উচাটন।
উজানির দীন সন্তান আমি—নই বটে সদাগর—
সুদূরের সেই রূপের পিয়াসী—চাহি নাক পাকা ঘর

৬

ইট ও কাঠের ঘরে যদি মোরে করাইতে চাহ বাস
ভাঙন বন্ধ কর—আনো নিতি আনন্দ উচ্ছ্বাস।
সুখের এবং শান্তির নীড় কর তুমি প্রতি গৃহ,
ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রেম—সঙ্গী আমারে দিয়ো।
অটুট রাখিয়ো দেব ও দেবীর করুণার নির্ঝর—
কর অক্ষয় বটের বেদিকা তব দেওয়া পাকা ঘর।

শিল্প যুগে যুগে

শ্রীশান্তনু উকীল

বহুযুগের কথা—মানুষ তখনও জানিত না শিল্প কী! কাঠ পুড়াইয়া তাহারই দুই তিন টানে তাহাদের আবাসগুহার দেওয়ালে যে অদ্ভুত রেখাকৃতির সৃষ্টি করিত, তাহাই আমাদের নিকট প্রাচীনতম শিল্পকলার নিদর্শনরূপে পরিচিত। যদিও আমরা সেই আদিকালের শিল্পীগোষ্ঠীকে চিনিনা এবং কালের ব্যবধানে আমরা, এই বিংশশতাব্দীর শিল্পীরা সেই আদিম শিল্পীদের হইতে অনেক দূরে, তবুও সমগোত্রীয়রূপে মধ্যে একটা যোগসূত্র রহিয়াছে।

প্রস্তরযুগ হইতে আজ বৈজ্ঞানিকযুগে আসিয়াছি। কালের এই মহাপরিবর্ত্তনের অন্যতম প্রধান সাক্ষীরূপে শিল্পকলা আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। যুগের পরিবর্ত্তন আমাদের কোন পথে চালায় তাহাই আমাদের বিষয়বস্তু।

সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগের পর বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। যুগযুগান্তের সঞ্চিত ধূলিমলিন, অর্দ্ধভগ্ন বিস্মৃতপ্রায় অবলুপ্ত শিল্পসৌন্দর্য্যের নিদর্শনগুলিকে নূতন কৌতূহলের আলোকে দেখিতেছে, যাচাই করিতেছে আধুনিক কালের শিল্পরসিক। অনুসন্ধিৎসুরা সন্ধান করিতেছে নূতন কোনও শিল্পনিদর্শন পাইবার আশায়। এমনিভাবে হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হইল প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন গুহা-চিত্র। তৎকালীন শিল্পীরা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার 'যে' সকল ঘটনা আঁকিয়াছেন তাহা হইতে সহজেই বোঝা যায় যে তাঁহাদের চিন্তাধারা আবর্ত্তিত হইত দৈনন্দিন গৃহস্থালীকে কেন্দ্র করিয়া, জীবনধারণ এবং গৃহস্থালীই ছিল তাঁহাদের শিল্পপ্রেরণার প্রধান উৎস।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পায় প্রাপ্ত মৃৎপাত্রে যে রঙীন রেখাচিত্র আছে আধুনিক শিল্পরসিক এবং পণ্ডিত মাত্রেই তাহার উৎকর্ষ সম্পর্কে একমত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর বৈদিক যুগ এবং পৌরাণিক যুগের কোনও চিত্রশিল্পের নিদর্শন এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমানকালের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কারে সক্ষম হ'ন নাই। কিন্তু চিত্রশিল্প যে আমাদের দেশে একটি প্রধান কলারূপে সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইত তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়।

ইহার পরে বৌদ্ধযুগে আমরা শিল্প-ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে আসি। মৌর্য্য রাজগণের শাসনকাল হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত অজস্র গুহা-চিত্র, স্তূপ, চৈত্য, বিহার ও মন্দির এই সহস্র বৎসরের এক ধারাবাহিক শিল্প-ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্র-কলার এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সকল নিদর্শনগুলির মধ্যে অজন্তাগুহার ভিত্তিচিত্রাবলী সারা পৃথিবীর বিস্ময়। এই গুহা-গুলির অলঙ্করণ তথা চিত্রণকার্য্য খৃষ্টীয়-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল। বিষয়বস্তুর দিক হইতে অজন্তার চিত্রগুলিকে বলা চলে পুরাণ-চিত্র বা Mythological Painting। পুরাণ বলিতে এস্থলে বৌদ্ধপুরাণ, হিন্দুপুরাণ নহে। প্রতিটি চিত্র কোন না কোন জাতক-কাহিনী বা বুদ্ধ-জীবনের বিশেষ ঘটনাকে বিচিত্র বর্ণে রূপায়িত করিয়াছে। চিত্রের বিষয়বস্তু অজন্তায় বিশুদ্ধভাবে বৌদ্ধ। গৌতমের পূর্ব্বতম জন্মের কাহিনী স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা ব্যতীত যে সকল পুষ্পলতা, কল্পবৃক্ষ, পশুপক্ষী এবং অপার্থিব প্রাণী বা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ইত্যাদির চিত্র আছে, সমগ্র চিত্রাবলীর বৈচিত্র্য সাধন এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই চিত্রাবলী জনমানবহীন নিস্তব্ধ নির্জ্জন পর্ব্বত গুহার মধ্যে নিঃশব্দে ভগবান বুদ্ধের জয়গান ঘোষণা করা ছাড়া আরও একটি কার্য্য করিতেছে—যাহা মুখ্যত অপ্রধান হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। অজন্তা চিত্রের প্রতিটি রেখায় রেখায় আমরা পাই তদানীন্তন দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার নিখুঁত ছবি। অন্ধকার এই গুহাগুলির মধ্যে কত না রাজা, তাঁহাদের বিলাসিনী সুন্দরী মহিষী, রূপসী সখীবৃন্দ, কুরূপা চামরধারিণী, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা নর্ত্তকী, ক্রন্দন-রতা পুরস্ত্রী, নাগরিক পুরুষ ও তাহার পুষ্পসজ্জায় সজ্জিতা লজ্জিতা প্রেমিকা—কত রথ, কত সৈন্য, শত শত অস্ত্রের ঝণৎকার, শিকারী কুকুরের চীৎকার, ভীতত্রস্ত মৃগের চাহনি—শত সহস্র হস্তীযূথ সমন্বিত বাহিনীর রণতরীতে লঙ্কাবিজয়, ভগবান বুদ্ধের উপদেশ দান, কত মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুক, পর্য্যটক, ব্যাধ, রাজান্তঃপুরের কঞ্চুকী, প্রহরী, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী—বহুকাল পূর্ব্বের খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর এক সমৃদ্ধিশালী নগরী যেন প্রাণচঞ্চল প্রভাতে সহসা মন্ত্রবলে অজন্তার চিত্র হইয়া গিয়াছিল।

আজ দর্পণের প্রতিফলিত আলোকে গুহার ঘন অন্ধকার কাটিয়া গেলে এক একবার উদ্ভাসিত হইয়া যেন মুহূর্ত্তের জন্য কথা কহিয়া ওঠে। অজন্তার চিত্রে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছবি এত সাবলীল, এত প্রাণবন্ত যে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলে গায়ে কাঁটা দেয়, মনে হয় "আমি ইহাদের চিনি, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে ইহাদেরই মধ্যে আমি বাঁচিয়া ছিলাম।" মনে হয়, "আমিই ইহাদের আঁকিয়াছি, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ইহাদের মাঝখানে আমি আবার ফিরিয়া আসিয়াছি।" অদ্ভুত আশ্চর্য্য এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি রাখিয়া গিয়াছেন অজন্তার নাম-না-জানা শিল্পীরা শাশ্বতকালের শিল্পীদের জন্য।

তখনকার দিনে ব্যবহৃত, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে উল্লিখিত নানা অলঙ্কার, তৈজসপত্র, আসবাব, অস্ত্রশস্ত্র এবং রাজভবনের স্থাপত্য, উদ্যান ও গৃহবাটিকাসমূহ যাহা অজন্তার ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে সে সমস্তই গুপ্তযুগে। ভারতবর্ষে যে উন্নত জীবনযাত্রার মান প্রচলিত ছিল তাহারই

সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় বহন করে। ইতিহাস, সাহিত্য এবং ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত ভূষণ—কুণ্ডল, মুক্তাবলির বিলম্বিত শিরস্ত্রাণ, বলয়, কেয়ুর, কঙ্কন এবং রত্নখচিত বিচিত্র মেখলা ও নীবিবন্ধেভূষিত অজন্তা চিত্রের অসংখ্য পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতিগুলি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় অভিজাত সমাজের সাজসজ্জার নিদর্শন। ইহাদের বসনও কত বিচিত্র! যুদ্ধসাজ, রত্নাভরণ এবং বেশবাস সহজেই চিত্রদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু রাজান্তঃপুর, গৃহবাটীকা ও উদ্যানের দৃশ্যের আশেপাশে এমন অনেক ছোটখাটো বস্তুর চিত্র আছে যাহা তখনকার দিনের মানুষগুলির অভ্যাস এবং স্বভাবের পরিচয় দান করে।

অজন্তার শিল্পগোষ্ঠী কর্ত্তৃক অঙ্কিত এই প্রাণময় চিত্রাবলী দেখিয়া বিস্ময় বোধ হয়। আজ হইতে বহু শত বৎসর পুর্ব্বে আমাদের দেশের শিল্পীগণ চিত্রের বিষয় বস্তুকে প্রাণময় করিয়া তুলিবার যে বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ আমরা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এবং যুগ-যুগান্তে আহৃত অভিজ্ঞতায় এত অগ্রসর হইয়াও ঐরূপ সার্থক চিত্র রচনা করিতে পারি না কেন? মনে হয় সেই শিল্পীদের সম্মুখে একটি সুমহান আদর্শ ছিল, যাহা তাঁহাদের অন্তরে অনির্ব্বাণ প্রেরণা যোগাইত। চিত্রবিদ্যা ছিল সাধনার ধন। হেলার বস্তু নহে। তদানীন্তন কালের ভারতীয় জীবনে সৌন্দর্য্য এবং আধ্যাত্মিকতা ছিল বেশী। সেই জীবনের চিত্ররূপও তাই হইত সুন্দরতর। তখনকার শিল্পীরা মনে মনে বিশুদ্ধ সৌন্দয প্রকাশের যে তীব্র স্পৃহা অনুভব করিতেন আমরা তাহা তত গভীরভাবে হয়তো করি না।

বিশুদ্ধ fine art বা চারুশিল্পের চর্চ্চা করিয়া আধুনিক শিল্পীদের তেমন অর্থাগম হয় না। হতাশ হইয়া শিল্পী ভাবে ভারতবাসীর মন হইতে সেই সৌন্দর্য্যবোধ কোথায় গেল! কেন জনসাধারণ চিত্রশিল্পের প্রতি আর তেমন গভীর আকর্ষণ অনুভব করে না।

পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর অজন্তা গুহায় আর নুতন কোন কাজ হয় নাই। কয়েকটি গুহার কাজ আজিও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

সপ্তম শতাব্দীর পর ইতিহাসের চক্র কতবার আবর্ত্তিত হইয়াছে, কত বিচিত্র ঘটনার স্রোত বাহিয়া আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর মধ্যপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। অজন্তার পরে ভিত্তিচিত্র আরও অনেক অঙ্কিত হইলেও ঐরূপ বৃহৎ, বিস্তৃতরূপে আর হয় নাই। সবগুলি কালের করাল স্পর্শ বাঁচাইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া পৌছাইতে পারে নাই। হিন্দুমুসলমানের মিলনক্ষেত্রে মধ্যযুগে আমরা দেখিতে পাই চিত্রাঙ্কন বিদ্যা ভারতীয় সমাজের দুইটি স্তর বহিয়া চলিয়াছে। একদিকে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে রাজারাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিজাত শিল্পীমণ্ডলী অপূর্ব্ব দক্ষতায়, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কারুকার্য্যে, সুকুমার রেখায় বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়া চলিয়াছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, রূপসী রাজকন্যা ও মহিষীদের প্রতিকৃতি, রাগরাগিণীর রূপক—যাহা আমাদের নিকট রাজপুত, মোগল ও কাংড়া নামে পরিচিত। অপর দিকে দীনদরিদ্র ধর্ম্মপ্রাণ জনগণের বিপুল পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁচিয়া আছে দেবদেবীর পট আঁকিয়া পটুয়াশ্রেণীর গণশিল্পী। সামান্য সস্তার রং আর স্বহস্তরচিত তুলিকার সাহায্যে বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের পটচিত্রীগণ কতকাল হইতে পট আঁকিতেছেন তাহার স্থিরতা নাই। যুগের পর যুগ ইহারা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জ্জিত দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছে। সংস্কার বা "ট্র্যাডিশন" ইহাদের প্রধান সম্বল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বুকের উপর ইংরাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চিত্রশিল্পের সমাজে পাশ্চাত্য রীতিতে অঙ্কিত তৈলচিত্র আসন লাভ করিল। এই বিদেশী পদ্ধতির মাধ্যমে রবিবর্ম্মা প্রমুখ শিল্পীগণ ছবি আঁকিতে সুরু করিলেন। এই সকল চিত্রের ভাবহীনতা এবং অসারতা অনুভব করিয়া এই অন্ধ অনুকরণের অবসান ঘটাইয়া কী ভাবে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ নুতন করিয়া ভারতীয় পদ্ধতির সহিত চীনা জাপানী প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় অঙ্কনরীতির সংমিশ্রণে ভারতীয় চিত্রশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন তাহা কোন শিল্পরসিকেরই অবিদিত নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলিয়া প্রবন্ধকে দীর্ঘতর করিতে চাহি না।

এক্ষেত্রে শুধু একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। রবিবর্ম্মা অয়েল পেন্টিংএর মাধ্যমে প্রধানতঃ পৌরাণিক চিত্র অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বনে চিত্র রচনা করিলেও তাহা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ—৺সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর "কার্ত্তিকেয়," ৺সারদা উকিলের "অনন্ত প্রেম" ও "কৃষ্ণলীলা" নামক চিত্রাবলী, নন্দলাল বসুর "উমার তপস্যা" "সতীর দেহত্যাগ" এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের "দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা" "শ্রীচৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়া" এবং অপরাপর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পৌরাণিক চিত্রগুলির মতো আমাদের মনে রেখাপাত করে না। তাহার প্রধান কারণ রবিবর্ম্মা প্রমুখ শিল্পীগণ যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে রূপদান করিয়াছিলেন সেই পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণরূপে বিদেশী এক পদ্ধতি। আর চিত্রগুলি ছিল অতিমাত্রায় বাস্তবানুগ বা realistic। কতক স্থলে বা হুবহু আলোকচিত্রের মতো। কিন্তু এই দেশের আদর্শ অনুযায়ী ভারতীয় শিল্প বরাবরই একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করে। সেখানে কল্পনার খেলাই প্রধান। শিল্পী বাস্তবের সহিত কল্পনার রং মিশাইয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন। এই অতি-বাস্তবতায় ভাবশূন্য চিত্রাবলীর অঙ্কন পদ্ধতি হইতে সরিয়া অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুসরণকারী প্রবীণ শিল্পীগণ, যাঁহারা আজ "বেঙ্গল স্কুল" নামে বিখ্যাত, যে শিল্প সৃষ্টি করিলেন সকলেই একবাক্যে তাহার সার্থকতা স্বীকার করে। অথচ মজার কথা এই যে আজকের নবীন শিল্পীরা যাঁহারা "ওয়াশ" পদ্ধতিতে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত স্কুলকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের "ট্র্যাডিশন্যাল ইণ্ডিয়ান পেন্টার" নামে অভিহিত করেন তাঁহাদের কাজের যথাযোগ্য আদর নাই। ইহার জন্য শিল্পরসিক বা চিত্রদর্শীদের উপর দোষারোপ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকাটা উচিত নহে। কাজের সমাদর যখন নাই তখন গলদটা কোথায় তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রবীণ এবং নবীন শিল্পীদের চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে একটি সত্য সহজেই অনুভূত হয় যে "বেঙ্গল স্কুলের" প্রধান

শিল্পীরা যে একাগ্রতা, অধ্যবসায় এবং সততার সহিত কাজ করিতেন তাহা নবীনশিল্পীদের মধ্যে একেবারেই নাই। তাঁহাদের সম্মুখে ছিল একটি উচ্চ আদর্শ, চিত্র ছিল ভাব-কল্পনার ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। এই ভাবপ্রধান চিত্র রচনা করিতে হইলে বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচয় থাকার, প্রকৃতিকে লক্ষ্য করার একান্ত প্রয়োজন। যদি কেহ মনে করেন যে ভারতীয় আদর্শে, প্রাচ্য রীতিতে ছবি আঁকিতে গেলে বাস্তবানুগতার কোন প্রয়োজন নাই, পারিপার্শ্বিককে দেখিবার, জানিবার বা বুঝিবার দরকার করে না—তাহা ভুল। "ট্রাডিশন্যাল" বলিতে অজ্ঞান হইয়া, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির নামে স্বাভাবিকতাকে বিকৃত করিয়া আমরা বস্তুবিশেষের এমন এক চিত্ররূপ দিয়া থাকি যাহা না হয় সুন্দর, না হয় 'ট্রাডিশন্যাল', না হয় ভারতীয় বা 'ইণ্ডিয়ান'! এই উদ্ভট অস্বাভাবিক তথাকথিত "ইণ্ডিয়ান পেন্টিং" দেখিয়া শিল্পরসিকগণ হতাশ হ'ন, প্রবীণ শিল্পীরা গালাগালি দেন; সমালোচকের লেখনী হইয়া উঠে তীক্ষ্ণধার। আর এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া "আর্ট সমঝদার" পদলোভী নির্ব্বোধ জনসাধারণের নিকট আত্ম-প্রশংসার দামামা বাজান আমাদের দেশের "মডার্ণ আর্টিস্ট" বা আধুনিক চিত্রশিল্পীগণ। "ট্রাডিশন্যাল ইণ্ডিয়ান পেন্টিং"এর সমাদর না থাকার আর একটি প্রধান কারণ হইল বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্র্যের অভাব। "কেমন করে আঁকছি"র চেয়ে "কী আঁকছি" কোন অংশেই কম নয়—বরং "কী আঁকছি"র গুরুত্বই বেশী। রবিবর্ম্মা পৌরাণিক চিত্র আঁকিলেও তাহা বিলাতী পদ্ধতিতে আঁকিয়াছিলেন বলিয়া আজ তাহা দাঁড়াইতে পারে নাই। আর এখন আমরা দেশী পদ্ধতিতে আঁকিলেও বিষয়বস্তুতে বা "কী আঁকছি"র উপর বৈচিত্র্য সাধন করিতে পারি না বলিয়া আমাদের সকল শ্রম ব্যর্থ হইতেছে।

এক্ষেত্রে দুই একটি উদাহরণের অবতারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে বহু পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ এবং বৌদ্ধজাতকের গল্পমালায় এমন অনেক কাহিনী আছে যাহার চিত্ররূপ অদ্যাপি হয় নাই। একই কাহিনীর আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট রুচিভেদে বিশেষ বিশেষ আবেদন আছে। ইহা অবলম্বনে কত যে চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাব্যপুরাণ ও ইতিহাস লইয়া সামান্য নাড়াচাড়া করিলেও শিল্পীর সম্মুখে চিত্রজগতের এক শাশ্বত সৌন্দর্য্যলোকের দ্বার খুলিয়া যায়। অথচ বর্ত্তমানের 'ট্রাডিশন্যাল ইণ্ডিয়ান পেন্টিং'এ বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য নাই, আশ্চর্য্য!

ভারতীয় সমাজ জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নাই, একথা বিদেশী মাত্রেই স্বীকার করেন। এদেশের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লইয়া অসংখ্য ছবি আঁকা যায়। অথচ ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রে দেখা যায় একই ভঙ্গিমা, একই বিষয়বস্তুর চিত্ররূপায়ণ। সেই অজন্তা, বাঘগুহা বা প্রবীণ শিল্পীগোষ্ঠীর কারও না কারও প্রতিচ্ছায়া কখনও বা অনুকরণ!

শিশু যখন ক্রমশঃ বড় হয় সে তাহার মাতাপিতাকে অনুকরণ করিয়া হাঁটিতে, কথা বলিতে শেখে। বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে উপনীত হইবার পর তাহার নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটে। আমরা বুঝিতে পারি ভবিষ্যতে সে কী হইবে—শিল্পী না কবি, ব্যবসায়ী, ঐতিহাসিক, না চিকিৎসক! তেমনই ভারতীয় পদ্ধতিতে কাজ করিতে হইলে আমাদের প্রথম পা-ফেলা, কথা-বলা এ সমস্তই অনুকরণ করিতে হইবে প্রাচীন ভারতের নাম-না-জানা শিল্পীদের, জানিতে হইবে অজন্তা, বাঘ, কাংড়া আর মোগল। শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে হইবে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত প্রবীণ শিল্পীগোষ্ঠীর ছবি। কিন্তু তার পরের ধাপ অনুকরণের সহ-অনুকরণের। নূতন কিছু দানের, স্বকীয় সাধনার।

বর্ত্তমানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের শিল্পীদের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছে। প্রথম দল যাঁহাদের "ট্রাডিশন্যাল ইণ্ডিয়ান পেণ্টার" নামে অভিহিত করা হয় তাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় দল হইলেন 'মডার্ণ আর্টিস্ট'রা। এই মডার্ণ বা আধুনিক শিল্পীদের প্রচারকার্য্য সাধিত হয় দুই জাতীয় লোকের দ্বারা। একদল ইঁহাদের এত গালাগালি দেন যে তাহা শুনিয়াই জনসাধারণ ইঁহাদের চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া চিত্রপ্রদর্শনীতে ভীড় জমায়। অন্যদল ইঁহাদের স্তুতিগান করেন কিন্তু "মডার্ণ আর্ট" কতটা বোঝেন অনেক সময় নিজেরাই সঠিক তাহা বলিতে পারেন না।

আমরা যাহারা প্রাচীন বা 'ট্রাডিশন্যাল' পদ্ধতিতে ছবি আঁকিয়া থাকি, অনেক সময় মডার্ণ আর্টকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও মনে হয় আজ এমন একটা সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে যখন এ দেশের আধুনিক শিল্পীরা কতদূর কী করিতেছেন তাহা তাকাইয়া দেখা আবশ্যক।

'মডার্ণ আর্ট' অনেকের নিকটেই বহুল পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য ঠেকে তাহার কারণ বস্তুবিশেষের বাস্তবানুগরূপায়ণ এই রীতিতে অঙ্কিতচিত্রে দেখা যায় না। মডার্ণ আর্ট কী তাহা বুঝাইবার জন্য দুইচার কথা লিখিতেছি। আমার মতে মডার্ণ আর্ট শিল্পজগতে দুইটি নূতন জিনিষ দান করিয়াছে। প্রথম হইল বস্তুবিশেষকেই অতি সহজে, সরল রেখায় ব্যক্ত করা। আধুনিক শিল্পী গাছ আঁকিবার সময় গাছের গুঁড়ি, ডাল-পালা এবং পাতার বাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত করেন না। শুধু যে বিশেষ গাছ আঁকিতেছেন তাহার বৈশিষ্ট্যমাত্র গ্রহণ করিয়া অতি অনাড়ম্বরভাবে রং তুলির সাহায্যে ক্যানভাসে রূপায়িত করেন। বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রাখিয়া আর সবটা বর্জ্জন করা মডার্ণ আর্টের এক নূতন অবদান।

দ্বিতীয় হইল মডার্ণ আর্টের রীতিতে অঙ্কিত চিত্রে অনেক সময় একটি মানসিক ভাব বা 'মুড' প্রধান থাকে। প্রায়ই দেখি চিত্রে কোনও বস্তুর ছবি নাই, শুধু রং আর রেখার পাক। এই সকল ছবি সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য ঠেকে—কিন্তু ইহা আর কিছুই নহে, শিল্পীর কোন একটি বিশেষ মানসিক ভাবের (Mood) রঙীন প্রকাশমাত্র। এই জাতীয় ছবিতে শিল্পী কোথাও রং, কোথাও ছন্দ, কোথাও বা রেখার দ্বারা নিজ মনের অবস্থাকে ক্যানভাসে রূপ দিবার

চেষ্টা করেন। এ একরকমের খেলা। শিল্পীশিশুর রং তুলির খেলা। কিন্তু কোনও বস্তুবিশেষের সার্থক রূপায়ণ না পাইয়া সাধারণ মন এই বর্ণ, ছন্দ ও রেখার লীলায় আনন্দ পায় না।

সার্থক 'মডার্ণ আর্ট' সৃষ্টি করিতে গেলে বস্তুসমাবেশ, যথাযথরূপে অঙ্কন এবং পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনের সুস্থ স্বাভাবিক পরিণতি (Maturity) একান্ত আবশ্যক। পারিপার্শ্বিক এবং প্রকৃতির সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া আধুনিক-শিল্পী যদি একটা অদ্ভুত অবাস্তব লোকে বসিয়া মডার্ণ আর্ট করেন তবে তাহা ক্যানভাসের উপর রং লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইবে, সেই সৃষ্টি শিল্পপদবাচ্য হইবে না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে ইহাই চলিতেছে। আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীরা বিদেশী শিল্পীদের অনুকরণে ছেলেখেলা করিতেছেন কিন্তু পৃথিবীকে সত্য সত্যই "মডার্ণ" ধরণে দেখিবার এবং রূপ দিবার মতো চোখ, হাত ও মানসিক পরিণতি কোনটাই তাঁহাদের হয় নাই। চিত্রপ্রদর্শনীতে মডার্ণ আর্টের নমুনা দেখিয়া এই কথাই বারবার মনে হয়, এ দেশের আধুনিক শিল্পীদের কাজ করিবার ইচ্ছা আছে, অথচ যথাযথ ভাবে জানিবার কিম্বা পরিশ্রম করিবার মতো ধৈর্য্য নাই। অনেকেই ভ্রমবশতঃ ইহা মনে করিয়া থাকেন যে আধুনিক চিত্রকলায় অধ্যবসায় ও শিক্ষা করিবার কিছু নাই। এমন অনেক যুবক আছেন যাঁহাদের প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে কাজ করিবার মতো একাগ্রতা এবং ধৈর্য্য কোনটা নাই, কেবলমাত্র শিল্পীপদবাচ্য হইবার আশায় মডার্ণ আর্ট করিয়া সস্তায় কিস্তিমাত করেন। আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে ইহারাই সংখ্যায় বেশী এবং ইহাদের জন্যই আধুনিক চিত্রকলার এই দুর্ণাম।

আমাদের দেশে প্রাচীন ভারতীয় রীতি অথবা বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত "আধুনিক চিত্রকলা" কোনটি শেষ পর্য্যন্ত স্থায়িত্ব এবং সফলতালাভ করিবে তাহা বলা কঠিন। বর্ত্তমানে যে প্রকারের আধুনিক শিল্পরীতি প্রয়াস লাভ করিতেছে তাহার মূল রোপিত আছে বিদেশে, স্বদেশের মাটীতে নয়। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় রীতির জন্ম হইয়াছে বহুদিন—সুদূর অতীতের সহিত এক যোগসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে বর্ত্তমানের শিল্পীদের অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত এই প্রাচ্যশিল্পের রীতি—শুধু প্রয়োজন নূতন সাধনার, নূতন ভাবধারা।

ভারতীয় পদ্ধতি ও আধুনিক চিত্রকলার সাফল্য সম্পর্কে অমীমাংসিত প্রশ্ন একদিন কালের কষ্টিপাথরে কষা হইবে। বর্ত্তমানে শুধু এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি অথবা আধুনিক শিল্প রীতি যে মাধ্যমেই চিত্র অঙ্কিত হউক না কেন, জীবনের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর গভীর যোগ থাকা চাই। এই যোগসাধনার মূলে আছে মানবজীবন এবং বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে শিল্পীর সজাগ দৃষ্টি এবং দরদী মন।

পাঞ্জাব-ললনার সঙ্গ ও সৎসঙ্গ

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

সঙ্গ হ'ল গৃহীমানুষের সুখ দুঃখ ক্ষোভ লোভ শোক কষ্টময় চেনাশোনা, তাতে ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের প্রতিদিনের কাহিনী ও সংঘাতের সঙ্গে পরিচয় হয়; মানুষ নিজের সঙ্গে অন্যের সুখ দুঃখ মিলিয়ে দেখে—কখনো হয় ক্ষুব্ধ তাদের সুখ দেখে, কখনো পায় সান্ত্বনা নিজের চেয়ে দুঃখী দেখে।

আর সৎসঙ্গ হলো যেন তারি মাঝে আনন্দের কণিকা কুড়িয়ে নেওয়া—নিজের অজানাতেই কেমন করে জীবনের পথের মাঝে কারুর কোনো শান্তসমাহিত সাধুসন্ত ভক্ত সজ্জনের সঙ্গলাভ। যেন হরিলুটের বাতাসা ছড়িয়ে পড়ছে, আর লোকে ভিড় করে কুড়িয়ে নিচ্ছে। কেউ একখানা, কেউ দু'খানা—কেউ বা ভাঙ্গা টুকরা এককুচি—তাতেই যেন মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। না পেলে সঙ্গী সাথীদের কাছে নিঃসঙ্কোচে একটু চেয়েও নেয়। বাতাসার অভাব কি? এক পয়সায় ৪।৫ খানা, খেতেও কিছু সন্দেশের মত নয়। তবে হরির লুটের সময় না পেলে কেমন যেন মনে হয়—কি পেলাম না, কি পাই নি। পেতে হবেই একটুখানি। এই সৎসঙ্গগুলি যেন আকস্মিক ভাবে কুড়িয়ে পাওয়া 'হরির লুট'। যা' ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে সময়ে সময়ে।

মজা এই যে, সঙ্গের মাঝেই কখনো কখনো সুজন-সঙ্গ এসে পড়ে। সন্তসাধু না হলেও মানুষ না জেনেই সুজন সজ্জন যা খুঁজে পায়। এমন কি নিজের স্তরের লোক না হলেও নানা স্তরে নিম্নস্তরের মাঝখান থেকেও তা' পাওয়া যায়। অনেক সময় সেই স্তরেই সরল সজ্জন দেখতে পাওয়া যায়, যা' নিজেদের গণ্ডী-ঘেরা সমাজ থেকে পাওয়া না। সেদিন মন অকস্মাৎ আনন্দিত হয়ে ওঠে। লাভালাভের নয়—সে আনন্দ, সে আর এক অনুভূতি। আজ অবশ্য সৎসঙ্গের কথা বলছি না।

১৯৩৪ সালে আমি তখন পাঞ্জাবে অমৃতসরে। আমার কাছে কাজ করতে এলো একটী শিখ মেয়ে, 'অকালী' শিখ। মুখে বসন্তর দাগ, রংটা ফর্সা, চোখদুটী ছোট, একটু শান্ত বিনীত হাসি মুখে। সালোয়ার কামিজ পরা, বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা, পাঞ্জাবিনীদের মতই। কি রকম ধরণের মানুষ জানি না। কথাবার্ত্তাও বেশী বুঝি না পাঞ্জাবী। একটী ভদ্র শিখ মহিলা বিখ্যাত মাষ্টার তারাসিংদের আত্মীয়া—তাকে আমার কাছে পাঠালেন। কোলে একটী মাস আটেকের শিশু।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম—সামান্য ৫৲ মাহিনায় সে আমাদের মাতাপুত্রের সব কাজ করতে রাজী। তখন পাঞ্জাবে সব সস্তা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের দিন। (আটা টাকায় ১৬।১৭ সের, ঘৃত একসের পাঁচপো টাকায়, দুধ গরুর দশসের, মহিষের আটসের দর। বাসমতী চাল ⁄৫ সের টাকায়।)

মেয়েটী কাজ নিলে। আসে নিয়মমত। ঠিক বাঙালী ধরণেই বাসন মেজে দেয় আমার কথা মত। মৃদু মৃদু হাসে কিছু কাজ বললে। বালতী বালতী জলভরে রাখে। গায়ে খুব জোর। আর বাসন মাজার অবসরে কথাবার্ত্তার ফাঁকে বিড়বিড় করে আপন মনে বকতে থাকে। ক্রমশঃ ওর সঙ্গে কথা কয়ে একটু পাঞ্জাবী আয়ত্ত করেছি। সামান্য বুঝি মাত্র। সেও আমার মিশ্র হিন্দী বুঝতে পারছে একটু করে। বিড়বিড় বকুনিতে কিন্তু আমার মনে বেজায় ভয় যে, রাগ করে কিছু বলছে না তো! আমাদের দেশের রাগী বুড়ী ঝিদের মত। হয়ত বিরক্ত হয়েছে, আমাদের কালীহীন বাসন মাজানোর জন্য। কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারি না—পাছে সত্যই রাগ করে।

ছেলেকে বল্লাম, সে অনেকদিন আছে পাঞ্জাবে, সেদেশের কথাবার্ত্তা শোনা ও বলাতে অভ্যস্ত হয়েছে। সে কানপেতে শুনল। তারপর হাসলে, বল্লে—'মা ও প্রীত-মকুমারী রাগ করে নি। ও পাঠ করছে, স্তব বলছে।' তার নাম প্রীতম কোঙর।

ও হরি সত্যই! মুখের দিকে লক্ষ্য করে চেয়ে দেখলাম, আমি স্নান করে যখন আহ্নিক জপ করতে বসি, আর ও তাড়াতাড়ি বাসন মেজে তুলতে থাকে মুখে থাকে একটী শান্ত হাসি ও কণ্ঠে মৃদুস্বরে স্তোত্র।

বড় ভালো লাগল। খুব মিল হয়ে গেল। যেন বন্ধুর মত। এ মিল শ্রেণীর ধার ধারে না, এ হ'ল মনের গভীর স্তরের মিল।

ক্রমে সে তার দুঃখের দারিদ্র্যের কথা বলে। স্বামীর চোখ খারাপ—কাজ করতে পারে না তাই। গৃহস্থঘর—দেশে জমিজমা আছে বটে, সকলের পেটভরার মত নয়। তাই বড় ছেলেটীকে শিখদের অনাথ-আশ্রমে (এতিমখানা) দিয়েছে। ছোট তিনটী, একটী মেয়ে আর দুটী ছেলে কাছে আছে। খুব খাটিয়ে, কাজকর্ম্ম করে যা উপায় করে তাতে চলে যায়। অনেক রকম কাজ করত। গরু মহিষের জাব দেওয়া লোকের ঘরে, চরকা কাটা নিজের ঘরে—আরো দরকার মত কাজ করত।

আমার বাড়তি ভাত তরকারী থাকলে নিত। কিন্তু তেলের রান্না তরকারী ওরা ভয় পায় খেতে। তাই তরকারী নিত না। ভাত নিত। বলত আমার মেয়ে এসে নিয়ে যাবে। মেয়েটী সুন্দর দেখতে, ৭।৮ বছরের মেয়ে। এসে বলত, মাতাজী, একটু চিনি দাও ভাতের জন্য। তখন রেশন বা চিনির আকাল হয় নি। চিনি দেবার অসুবিধা ছিল না!

ওর লোভহীন মা এসে বললে, মা চিনি দিও না। ওর অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। চেয়ে চেয়ে খাবে। দুদিন তিনদিন চিনি নিয়ে যাচ্ছে। 'লালচ' বাড়বে।

তারপর কয়েকমাসবাদে হঠাৎ ওর ছোট ছেলেটীর অসুখ করল। আমার কাছে ভেবেচিন্তে বলে, 'মা'—কি হয়েছে ছেলের—দুধ খাচ্ছে না মোটে। আর কাঁদছে খালি। মুখে জল, আমার নিজের দুধ কিছুই নিচ্ছে না। রাত্রিভোর কেঁদেছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই মনে হ'ল না, যে ডিপথিরিয়া হ'তে পারে। শুধু বল্লাম, হয়ত গলায় ব্যথা হয়েছে কিম্বা জিবে ঘা হয়েছে। ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও—নয়ত হাসপাতালে যাও। আমার কাছে সামান্য হোমিওপ্যাথিক যা ছিল তা গলাব্যথা সারার ঔষধ নয়: সোহাগার খই করে নিতে বল্লাম। সোহাগাকে কি বলে আবার পাঞ্জাবী ভাষায় জানি না। সে বল্লে—'মা, গরীব লোকের ছেলেকে কি হাসপাতালে যত্ন করে দেখবে। দেখে না।

হাসপাতালে সে গেল না।

রাজার দেহ মন্থন করতে আরম্ভ করলেন। মন্থিত দেহ থেকে আবির্ভূত হ'লেন এক পুরুষ সুলক্ষণযুক্ত বিশাল দেহ তাঁর। তাঁকে মন্ত্রীরা 'পৃথু' নাম দিলেন ও রাজাপদে বরণ করলেন।······ধর্ম্ম অত্যাচারী রাজার ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ছিলেন আবার তিনি ফিরে এলেন পৃথিবীতে· । (অত্যাচারী রাজা সেযুগেও ছিল !)

সেদিনের মত পাঠ শেষ হ'ল। আমরা সমস্ত দিক ঘুরে তীর্থ কুণ্ডটীতে স্নান করে নিলাম। ওদেশে সর্ব্বত্র মেয়েদের ও পুরুষের স্নানঘাট একেবারে পৃথক এবং ঘেরা ঢাকা রীতিমত পর্দ্দাওয়ালা। শিখদের অমৃত-সরোবরে, দরবার সাহেবের, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে—দুর্গিয়ানার জলাশয়েও—এখানেও তাই। দেওয়াল দিয়ে অনেকখানি গাঁথা, সিঁড়ি অবধি ঘেরা জলে স্নান করে নেওয়া যায়। হরিদ্বারেও এই ব্যবস্থা আছে। তার একটা প্রধান কারণ বুঝলাম, এই প্রদেশের মেয়েরা কাপড়-চোপড় ছেড়ে রেখে স্নান করে।—আমাদের দেশের মত কাপড় জামা পরে স্নান করে আবার অন্য কাপড় পরে না। কাপড়ও ভেজায় না, ডুবও দেয় না। সাধারণতঃ মাথাও ভেজায় না। স্নান করে উঠে ওই ছাড়া কাপড় জামা পরে নেয়। এক ঘাট মেয়ে থাকলেও ওদের স্নানের প্রথা প্রায়ই এই।—একটুখানি সিঁড়ির জলে বসে বসে গা-ধুয়ে নিলেই স্নান হয়ে গেল। কেউবা ছোট পাজামা পরে কেউবা সামান্য গামছা জড়িয়ে গা-ধোয়।

আমার সঙ্গিনী প্রীতম ছোট্ট একটা 'কাছেড়া' জাঙিয়া ভাবের পাজামা যা' ওদের পরা নিয়ম সেইটা পরে স্নান করল।

এই প্রসঙ্গে খালসা বা শিখধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বেশের কথা একটু বলি। সেটা হচ্ছে—পঞ্চ 'ক' ধারণ। অর্থাৎ প্রত্যেক শিখকে পাঁচটী 'ক' আদ্যক্ষরযুক্ত বেশ অঙ্গে রাখতে হবে। কেশ, কৃপাণ, 'কাঁথ' (চিরুণী), 'কড়া' (হাতে একটী লোহার বালা পরতে হয় সেটীকে 'কড়া' বলা হয়), 'কাছেড়া' (ছোট পাজামা অন্তর্বাস)। এটী নরনারী নির্বিশেষে প্রথা। এখনো অনেক গ্রামের মেয়েদের বুকে বা কোমরে 'কৃপাণ' বা তরবারী ঝোলানো থাকে। চুল বা কেশ এঁরা জীবনে কখনো কাটেন না। শিখদের এই পাঁচটী বস্তু বাদ দিতে বলা বা বাদ দেওয়া মহা অন্যায়। একবার একটী শিশুর মাথায় ভীষণ ফোড়া দেখে আমি—তখন জানিনা এতটা সংস্কারের কথা—বলেছিলাম ওর ওই জায়গার চুলগুলি আস্তে আস্তে কেটে দিলে ফোড়াটা মুখ পাবে, ওষুধ লাগাবার জায়গা পাবে। ওঃ—সে কি আতঙ্কিত হয়ে উঠলো সবাই, হিন্দুকে অখাদ্য খেতে বলার মত! আমি অপ্রতিভ! জিজ্ঞাসা করলাম এতে দোষ কি? তাঁরা বল্লেন—একথা শিখদের কাছে বলা এবং তাঁদের কাণে শোনাও পাপ।

এই 'কাছেড়া', কাঁথ, কৃপাণ, কেশ, কড়া—শিখদের অবশ্য পরিধেয় ধর্ম্মীয় বেশচিহ্ন। বৈষ্ণবের মালা তিলকের মত, আমাদের বিধবাদের শ্বেত বস্ত্রের মত।

* * * *

এখন রামতীর্থ শেষ করি।

কুণ্ডের মেয়েদের স্নানের দিকের ঘাটে একটী জায়গায় দু'একটী গাছে, দেওয়ালে, কাঁটার বেড়ায় অসংখ্য চুলের দড়ি (চুটলা), ফিতে বাঁধা, চুলও বাঁধা আছে কারুর বা। আমাদের ঠাকুরতলার 'ভারা' বাঁধার মত।

প্রীতম বল্লে, 'ছেলে হবার জন্য, সন্তানের অসুখের জন্য এইসব লোকে মানসিক করে বেঁধে যায়। মনের কামনা পূর্ণ হলে পূজা দিয়ে খুলে দিয়ে যাবে।' নারী প্রকৃতি বা মানুষের প্রকৃতি সর্ব্বত্রই একরকম।

আস্তে আস্তে জলাশয়টী প্রদক্ষিণ করে ফেরার মুখে এলাম। লবকুশের কাঁথা, সীতার আঁতুড় ঘর, বাল্মিকীর গদী, আসন সে সব রামনবমী ও সীতানবমীর মেলা ছাড়া দেখা যায় না।

আস্তে ভগ্নাবশেষ ছাড়িয়ে—বাসের পথের জঙ্গলের রাস্তায় এলাম। তখনো ফেরার বাস আসেনি। অশথ-তলার বাঁধানো জায়গায় বসলাম।

প্রীতমকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাতিপুতি হয়েছে?'

মৃদু হেসে বল্লে, 'হ্যাঁ মেয়ের বুঝি চারটী, বড়বৌয়ের (ওরা বৌকে ন্যুঃ বলে সংস্কৃত স্নুষা থেকে?) তিনটী না দুটী।—'

খুসী হয়ে বল্লাম, 'তারা আসে তোমার কাছে। কেমন সব বড় হয়েছে—তোমার 'নেওটো' হয়েছে?'

প্রীতমের হাসিভরা মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল।

বল্লে—'মেয়ের ছেলেরা আসে। ছেলের ছেলেমেয়েরা আসে না।'

'কেন?' আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। ওর বড়-ছেলেটী তখন দশ বারো বছরের যখন প্রীতম আমার কাছে কাজ করেছিল '৩১।৩৫' সালে। তাকে দেখেছি সুকুমার সুন্দর দেখতে ছেলেটী, ছোট্ট মাথায় মস্ত পাগড়ী পরা। অনাথাশ্রমে পড়ত ও থাক্‌ত। মার কাছে মাঝেমাঝে আসত 'এতিমখানা' থেকে।

প্রীতম অপ্রতিভ ম্লানমুখে বল্লে, তারা আমার ছেলেকে (পুত্রবধূ ও তার মা) বলে, তোমার মা বাপ তোমার কি করেছে? তোমাকে অনাথাশ্রমে রেখে মানুষ করেছে, তুমি কত দুঃখদারিদ্র্য সহ্য করেছ—নিজেই মানুষ হয়েছ কষ্ট করে, মা বাপের কাজ—ওরা কি করেছে……। মাসে ৫০৲ টাকা করে দেয় লোকলজ্জার ভয়ে, চিঠিও দেয় না। চিঠির জবাবও দেয় না।

প্রীতমের চোখে দু'ফোঁটা জল এলো। বল্লে, 'সব গুরুর ইচ্ছা'। সে চিরকালই ধার্ম্মিক মেয়ে। প্রথম দিন শান্তভাবে সে বলেছিল, 'মাতাজী বড়া সুখী'। ছেলে সুখী হয়েছে তো তার।

কিছু বলতে পারলাম না। ওদের মা ছেলের সম্পর্ককে অস্বীকার করে পুত্রের স্ত্রী ও শাশুড়ী। আর ছেলেও তাই মেনে নেয়। তার নিজেরই সন্তান। এ দুঃখের কথা ওই বা কার কাছে বলবে? কি বা বলব আমরা। আর সংসারে এরকম ছেলের অভাবও নেই। পিতামাতা সব-রকমে মানুষ করে দেওয়া সত্ত্বেও বহু সন্তানই অস্বীকার করে তাদের করাকে।

মনে পড়ে গেল বিখ্যাত দার্শনিক চৈনিক পণ্ডিত কনফুসিয়াসের একটী কথা এক জায়গায় পড়েছিলাম। চীনদেশের পিতৃমাতৃবিয়োগে অশৌচ বা শোক গ্রহণ প্রথার কথা।

কনফুসিয়াসের কাছে কে একজন আসে, তার মাতৃ-বিয়োগে কতদিন সে শোকগ্রহণ করবে জিজ্ঞাসা করতে। তিনি বল্লেন, পাঁচ বছর।

সে বল্লে, 'সে বড় বেশী দিন। তিন বছরই যথেষ্ট নয় কি?'

তিনি বল্লেন, 'তাই কোরো।'

সে লোকটী চলে গেল।

তাঁর আশেপাশে আরো দু'চারজন ছিল। একজন বল্লে, 'আপনি সেদিন আমাকে বল্লেন পিতামাতা বিয়োগে ৪।৫ বছর শোকগ্রহণ করা উচিত। একে যে কমিয়ে দিলেন!

কনফুসিয়াস বল্লেন, 'চার পাঁচ বছর অবধি মা কাপড় পরিয়ে দিলে তবে পরতে পার। খাইয়ে দিলে তবে পেটভরে খাও। মার সাহায্য ছাড়া একা হাটতে পার নি। পাঁচটা বছরও তাঁকে মনে করবে না? ও করবেই না, তাই ওকে তিন বছর বলেছি। আমার মনে হল, এ জননী বেঁচে আছে! সে জননীর মৃত্যু হয়েছিল। তিনি তাঁর শোক গ্রহণ দেখতে আসেননি আর।

মৃত্যু

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যভারতী, সাহিত্যবিনোদ

মৃত্যুতে সমাপ্তি নহে, পরিব্যাপ্তি দূরে দূরান্তরে,
ইথার-সমুদ্র পারে, সীমাহীন দূর নীলাম্বরে—
জ্যোতির্ম্ময় লোক হতে বিচ্ছুরিত একটি শিখার;
অনিত্য ধরার বুকে শাশ্বতের উজ্জ্বল লিখার।

মৃত্যু তাই মিথ্যা নহে, কভু তার নাহিক বিস্মৃতি;
চিরকাল সত্য তার লোকে লোকে বিপুল বিস্তৃতি।
বুঝিতে চাহি না মোরা, জীবনের দীপ নিভে না যে;
হারায় শিখাটি তার অসীমের আলোকের মাঝে।

সবুজ প্রাণ

অমিয় চৌধুরী

জানালার ফাঁক দিয়ে পথ করে এসে সকালের শিশুরোদ হামাগুড়ি দিচ্ছে সাদা বিছানায়। আমার কালো শরীরেও। শীতের সকাল। তার ওপর এই মিষ্টি রোদের সুখস্পর্শ আমেজ? মন্দ লাগছিল না বিছানায় শুয়ে থাকতে। বাইরের দিকে চোখ দুটো ঠেলে দিয়েছিলাম। ওপাশের নিমগাছটার ছায়ায় মধু বেদনার অনুভূতি কাঁপছে থির থির করে। পাশের বাড়ীর রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর। আস্তে আস্তে রেডিও থেকে বেরিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসের অলক্ষ্য কোলে। আকাশটাও বেশ ঝকঝকে তকতকে। সব কিছুই মিষ্টি বলে মনে হচ্ছিল। সব কিছুই নতুন করে নতুন।

এই নতুন সকালটাকে আরও কতক্ষণ ধরে অনুভব করতাম বলা যায় না। হয়ত আরও অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে শরীরটা টান-টান করে আড়া মোড়া ভেঙ্গে যেতাম। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠলো না। আপাততঃ ও নেশাটা কাটাতে হল। আমার স্ত্রীর ডাকে।

লীলা এসে ডাক দিল, ওগো শুনছো।

ইচ্ছে হচ্ছিল জেগে ঘুমিয়ে থাকতে। অর্থাৎ লীলার কথার প্রত্যুত্তরে কোনও কথা না বলে। চুপটী করে গুমটী মেরে শুয়ে থেকে। কারণ এতে আমি বিশেষ অভ্যস্ত। অনেকদিন এমনি করে ঠকিয়েছি লীলাকে। আমি ঘুমিয়ে আছি মনে করে মিষ্টি অনুযোগ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে রান্নাঘরের দিকে চা তৈরী করতে।

কিন্তু আজ আর তা হল না। লীলা ডাকলো আবার, ওগো ওঠো একবার। অনেক বেলা হয়ে গেল যে। দেখো বাহিরে কে একজন ডাকছেন।

লেপ থেকে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলাম, কে ডাকছে?

তা কি করে জানবো—আমি কি রাজ্যিসুদ্ধ লোককে চিনি নাকি? তোমার যত সব। ওঠে একব দেখেই এসো গে না। সামান্য বিরক্তি গলে পড়ে লীলার কথায়। সামান্য রাগও।

অগত্যা বিছানার মায়া কাটাতে হল। উঠে গর চাদরখানা গায়ে নিয়ে নিলাম। যা শীত পড়েছে ক'দি ধরে। এতটা বেলা হল, তবু এখনো পর্য্যন্ত যেন মাঝরাতে হিম পড়ছে।

কিন্তু বাইরের চেম্বারে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। একটু নয়। রীতিমত। ডাক্তারিটা আমার পেশা। সেই সঙ্গে নেশাও। সাড়ে আটটা থেকে প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ডিসপেনসারীতে বসি আমি। টেথিস্কোপ দিয়ে স্পন্দনের গতি পরীক্ষা। নানা রোগীর নানা সিম্‌টম্‌স্ দেখা। তার সঙ্গে কত লোকের মুখোমুখি হওয়া। আশা নিরাশায় দোলা লাগা কত হৃদয়। মরা কাতলা মাছের মত অসহায় দৃষ্টি তুলে ব্যথাতুর চাউনী। বাঁচবার আকুলি। রোগমুক্ত হওয়ার বিকুলি। সব কিছুই চোখে পড়ে। কারো মুখ বাসি-ফুলের মত পাণ্ডুর। সেই বহুমুখের ভিড়ের মধ্যেই যে একটা মুখ আমায় এতদিন পরে আশ্চর্য্য করে দেবে সেটা ভাবতে পারিনি! অনেক দিন পর আনন্দকে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার থেকেও আরো বেশী অবাক্ হয়েছিলাম তার মুখ-চোখের ভীরু ভাব দেখে। নিতান্ত অসহায়।

জিজ্ঞেস করলাম, আরে আনন্দ যে! ব্যাপার কি?

প্রথমে কোনও কথা বলতে পারলো না আনন্দ। চুপ করেই রইলো মাথা নীচু করে। লক্ষ্য করলাম, আনন্দর চোখে অপরাধীর কাতর দৃষ্টি। আবার জিজ্ঞেস করলাম, আরে চুপ করে রইলে কেন?

ক্লান্তস্বরে উত্তর দিল আনন্দ, বড় বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছি সুমন্ত।

বিপদ! কিসের বিপদ? জিজ্ঞেস করলাম।

ডালিয়ার বড় অসুখ সুমন্ত। তোমাকে এক্ষুণি একবার যেতে হবে।

ডালিয়ার অসুখ! সে এখন কোথায়?

এখানেই নিয়ে এসেছি ওকে।

ও। তা একটু দাঁড়াও আমি আসছি। বলে ভিতরে গিয়ে কাপড় চোপড় বদলে নিয়ে এসে বসলাম ট্যাক্সিতে। সঙ্গে ওষুধের ব্যাগটাও নিলাম। আমার পাশেই বসলো আনন্দ। ট্যাক্সিখানা ছুটলো লোকজনের ভিড়ে পথ কেটে কেটে। এই ট্যাক্সিখানার মতই হয়ত আনন্দর বুকের ভেতরটাও ধুকে ধুকে পুড়ছে আস্তে আস্তে। বোম্বাইএর আনন্দকে আজকের আনন্দর মাঝে খুঁজে পেলাম না। সে আনন্দ হারিয়ে গেছে কোথায়।

আনন্দ বললে, তুমি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলে ভাই। ডালিয়া আমাকে সত্যিই ভালবাসে। আমি তাকে ভুল বুঝে ছিলাম।

অসংলগ্ন কয়েকটী কথা। পারম্পর্য্যহীন খাপ-ছাড়া। তবু ওই কথাগুলোই যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তার অন্তরের ক্ষতটাকে। কোনও উত্তর দিলাম না। শুধু পাশ ফিরে চেয়ে দেখলাম আনন্দর মুখের দিকে। ছায়া-ছায়া নিরাশার কালো জাল বোনা। চেতনার কোলে কোলে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে। বাইরের চোখে তা দেখা যায় না। অনুভবে বোঝা যায়। আকাশের চাতালে অসংখ্য অনামিকা তারকার ভিড়। তাদের ভেতর কতকগুলো বেশ স্পষ্ট। কতকগুলো অস্পষ্ট। আর বাকীগুলো হারিয়ে গেছে দূরত্বের আঁধিয়াতে। মনের প্রান্তরটাও তেমনি স্মৃতির শিশির কুড়িয়ে কুড়িয়ে দৃপ্তে উজ্জ্বল, তারকা বিন্দুর মত। তার মধ্যে কতক বেশ ভালোভাবে মনে পড়ে। কতক আবছা। আর অন্য-গুলো বিদিশা হয়ে গেছে নাম-না-জানা বিস্মৃতি পথে। তবু আনন্দর কথা ভুলতে পারিনি। ভুলতে চেষ্টা করেছি বলেও মনে পড়ে না। বিশেষ করে ডালিয়াকে যখনি মনে পড়েছে, তখনি আনন্দর মুখটাও স্মৃতির পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে গেছে একবার নিমেষের জন্য। কিন্তু সেদিনের আনন্দ আর আজকের আনন্দ বহু তফাৎ। বোম্বাইএর পটভূমিকায় যে আনন্দ শিরীষ কালির সজীবতা নিয়ে চলাফেরা করতো, কলকাতার পটভূমিকায় তাকে নিতান্ত বিশীর্ণ পাতা ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না।

মনে আছে, সেদিন বৈকালীন ভ্রমণ শেষ করে এসে বসেছিলাম আমার রুমে। চারতলার ফ্ল্যাটের একখানা রুম। জানালার পাশেই টেবিল চেয়ার। নীল পর্দাটা সরিয়ে দেখছিলাম বাইরের জগতকে। সূর্য্যাস্তের বেদনা সমুদ্রের দিগন্ত রেখায়। আকাশের গায়ে ঘনীভূত নীল পাহাড়ের রেখাটাকে আড়াল করে দেবার জন্যই বোধ হয় ধূপছায়া সন্ধ্যার এত আয়োজন। তবু একটু একটু দেখা যায়। ভুলে-যাওয়া স্মৃতিলিপির নিমেষের দ্যুতির মত। বেড়াতে গিয়েছিলাম বোম্বাই। কৌতূহল বশে। কাজেই চিন্তার ভারে মনের ডানাটা তখন ভেঙ্গে পড়েনি। বেশ শান্তই ছিল। তাই এইসব সন্ধ্যার স্বপ্ন মায়া আজো ছড়িয়ে আছে অন্তরের ভিতে ভিতে। এর বেশ খানিকটা অর্থ-ভরা আবেদন আছে আমার কাছে। সমুদ্রের কোলে সূর্য্য ডুবে যায়। অন্ধকার ঝরে আকাশ নিঙড়ে নিঙড়ে। আর তারই বুকে পথ কেটে কেটে লাইটহাউসের আলোকবিন্দু জ্বলে ওঠে। রাজপথেও বৈদ্যুতিক আলোর চোখাচোখি।

সুইচ টিপে দিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার রুমখানা নীলাভ আলোর চাদরে ঢেকে যায়। রাস্তার ওধারের বাড়ীটাতে আলো জ্বলে। এ পাশে ও পাশে—সমস্ত বাড়ীগুলোয়। সহরের সে এক মায়াবী রূপমদিরা। আমার জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়—সামনের দোতালা বাড়ীটা শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। বল্ ড্যান্স চলে প্রতি রাত্রে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের কাঁচভাঙ্গা হাসির টুকরো কানে আসে। যুগল-চরণের নৃত্যভঙ্গিমাও যে কখনো কখনো চোখে পড়েনি তা নয়। তারই পাশে একটা বিরাট বাড়ী। বার্। বেশ সাজানো গোছানো। শ্বেত পাথারের ছোট ছোট টেবিল। সারি সারি সাজানো। পাশে পাশে স্যুটকোটের বিচিত্র বাহার। কাঁচের গেলাশ আর কাঁটা চামচের টুংটাং আওয়াজ। লাল জলের মায়া। কিন্তু সব থেকে বিস্মিত হয়ে যাই একটা কথা ভেবে। এরা মদ খায়, কিন্তু মাতলামো করে না এত বড় বার্। এত লোকজন।

ঠিক যেন একটা কর্ম্মব্যস্ত সংস্থা। অদ্ভুত ডিসিপ্লিন। মাঝে মাঝে পার্শী বার্‌ওয়ালা চাকরবাকরকে মুখ খিঁচে উঠছে। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সবাই এক মনে গেলাশের পর গেলাশ শেষ করছে। আর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিচ্ছে। হট্টগোল করবার কোন ফুরসৎই নেই।

রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেছে। নীচের হোটেল থেকে বয় এসে রাতের খাবার দিয়ে গেছে। টেবিলের ওপর বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এবার খেতে হবে অনেকক্ষণ ধরে পেটে কিছু পড়েনি। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসতে যাবো হঠাৎ দরজার নীল পর্দ্দাটা একটু নড়ে উঠলো। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা সারসী হাতের ছোঁয়া লাগছে নীল পর্দ্দাটার গায়ে। আশ্চর্য্যই হলাম খানিকটা। সবটুকু দেখা না গেলেও স্পষ্টই বুঝতে পারলাম মেয়েটি কে। ওর সাথে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার পথে অনেকবারই চোখাচোখি হয়েছে। মেয়েটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। পাতলা মসৃণ একটা গাউন পরে। আমার নীচের ফ্ল্যাটেই থাকে। ওর স্বামীকে কোনও দিন দেখিনি। তবে শুনেছি সে নাকি ওয়ার্কশপে কি একটা মেকানিক্‌সের কাজ করে। রোজগারও মন্দ করে না। সে যাই হোক্‌, মেয়েটিকে কিন্তু আমার ঘরের দরজায় আশা করিনি মোটেই।

কানে এলো মেয়েলী জিজ্ঞাসা, মে আই কাম ইন্‌?

ইয়েস্‌। আনহেজিটেটিংলি।

নীল পর্দাটা সরে গেল। মেয়েটা এসে ঢুকলো ঘরের ভেতর। বলে উঠলো, ও আই য়্যাম সরি। বাট্‌ আই ডিড্‌ন্ট্‌ নো ছাট ইউ আর টেকিং ডিনার।

উত্তর দিলাম, নো নো স্থাট্‌স্‌ নট্‌ ম্যাটার। আপনি আপনার দরকার বলতে পারেন।

কিছু সময় চুপ করে থাকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটা —কি যেন ভেবে নেয়। তারপর আমার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। বলে, আর ইউ এ বেঙ্গলি?

ইয়েস্‌।

ভেরি গুড্‌। মাই হাজব্যাণ্ড অল্‌সো এ বেঙ্গলি।

শুনে আনন্দ পেলাম। কিন্তু ভেবে পেলাম না এত রাত্রে এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটার এখানে আসার কারণটা কি। এক হতে পারে আলাপ করার জন্য। কিন্তু তা তো দিনের আলোতেই বেশী জমে। তার জন্যে এত রাত্রে না বলে কয়ে আসবার কি প্রয়োজন থাকতে পারে।

বললে, উইল্‌ ইউ লেণ্ড মি টেন্‌ রুপীজ্‌। বিলিভ মি, আই উইল্‌ পে টু মরো ইভিনিঙ্গ্‌। রিয়্যালি আই এ্যাম্‌ ইন্‌ এ গ্রেট নীড্‌।

টাকা তাকে সেদিন দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আশ্চর্যও হয়ে গিয়েছিলাম তার সঙ্কোচহীনতা দেখে। আমাকে চেনে না মেয়েটা। আমিও তাকে চিনি না। কেবল সিঁড়িতে দু একবার দেখা হওয়া ছাড়া। অথচ সোজাসুজি এসে টাকা ধার্‌ চেয়ে বসাটা হেঁয়ালী বলে ঠেকাই স্বাভাবিক। পরের দিনে অবশ্য বুঝেছিলাম। তার ওই জড়তা কাটিয়ে হঠাৎ টাকা চাওয়ার পেছনে লুকিয়ে ছিল অনেকখানি বেদনাবোধ। মাসের শেষ। অথচ টাকার দরকার। কালই মাইনে পাবে তার স্বামী। কিন্তু পার্শি বারওয়ালার কাছে মদের দরুণ ধার হয়ে গেছে অনেক টাকা। আর সে দেবে না। তাই মেয়েটা আমার কাছে সরাসরি এসে টাকা চেয়েছিল। তার স্বামীর জন্য মদ আনতে হবে। মদ ছাড়া বাঁচতে পারবে না।

আর রুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় অনুরোধ করে গিয়েছিল মেয়েটা। তার বাঙ্গালী স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। আমিও বাঙ্গালী, তিনিও বাঙ্গালী। বিদেশে এত সুখের জিনিস আর কিছু থাকতে পারে বলে মনে হয় না আমার। অবশ্য এর আগে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে ইচ্ছে করেনি, তা নয়। তবে গা ঢিলে দেওয়ায় সেটা আর হয়ে ওঠেনি। আমারই কুঁড়েমীর জন্যে।

যাই হোক্‌ মেয়েটা চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম বেদনা জমে উঠলো বুকের গভীরে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের দেখেছি আমি কলকাতায়। ট্রামে বাসে ফুটপাতে ছড়িয়ে আছে তারা। পার্কের বেঞ্চিতে ছুরির মত ধারালো হাসির শব্দ অনেক সময়েই কানে এসেছে আমার। রাতে বৈদ্যুতিক আলোর নীচে তারা যতখানি কামনা ছড়িয়ে উজ্জ্বল হয়ে চলাফেরা করে, দিনের আলোয় তারা ঠিক তেমনি নিষ্প্রভ। রাত জাগা কালির

ছোপে কাল্চে। গাউনের অস্থিরতায় কম্পমান কামনা-গুলো যেন লুটোপুটি খেয়ে বেড়ায় তাদের দেহের ভাঁজে ভাঁজে। মানুষকে মোহাচ্ছন্ন মাদকতায় আকর্ষণ করতেও দেখেছি অনেকবার। কিন্তু তাদের সাথে এই মেয়েটির কোথাও মিল আছে বলে মনে হয় না। কেমন একটা ছায়া-ঘন পাণ্ডুরতায় ম্লান। কামনা-চঞ্চল নয়। বেল ফুলের মত শান্তস্বভাবা; নম্র। ভাবছিলাম খেতে খেতে। হঠাৎ কিসের একটা আর্তনাদ এলো কানে। দুম্‌দাম কয়েকটা শব্দ কেঁপে কেঁপে আসছে। কান পেতে রইলাম। হ্যাঁ নীচের ফ্ল্যাট থেকেই আসছে। করুণ বিলাপের মত কাতর অভিমান। আবার দুম্‌দাম আওয়াজ। ব্যাপারটা আগাগোড়াই হেঁয়ালী ঠেকলো আমার কাছে। এক বিন্দুও অনুমান করতে পারলাম না। অন্যদিন কানে আসে না। হয়ত ঘুমিয়ে পড়ি বলেই শুনতে পাওয়া যায় না। আরও মিনিট কুড়ি জেগে রইলাম। না থেমে গেছে। বাইরের দিকে একবার চোখ ফেরালাম। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। শ্রান্ত হয়ে এসেছে গাড়ী ঘোড়ার আনাগোনা। টুং টাং গেলাসের শব্দটা কমে এসেছে অনেকটা। দূরে সমুদ্রের বুকে লাইট হাউসের ফোঁটা ফোঁটা আলোগুলোয় নিঃসাড় একাকীত্ব। আকাশে নক্ষত্রের কথা। কিন্তু তবু একটা কিসের খট্‌কা যেন খচ্ খচ্ করে যেতে থাকে মনের ভেতর, কাঁটার মত।

পরের দিনেই আলাপ হয় আনন্দর সঙ্গে। আনন্দ চক্রবর্ত্তী ওয়ার্কশপে কি একটা সেকেণ্ড গ্রেড মেকানিক্‌সের কাজ করে। সুদর্শন চেহারা—ডালিমের দানার মত গায়ের রঙ, লাল-লাল। শরীরের কাঠামোটাও বেশ মজবুত। কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল। মোট কথা ডালিয়া নামে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটীর পাশে তার চেহারাখানা একেবারে বেমানান তো হয়ই নি; বরং সুন্দরই মানিয়েছে। দুটী পাশাপাশি ডালিম ফুলের মত। তারপর থেকে বেশ ভালভাবেই দানা বেঁধে ওঠে আমাদের অন্তরঙ্গতা। আর সত্যি কথা বলতে কি—ওদেরকে দেখে আমি আনন্দও পেতাম যথেষ্ট। আলাপটা ক্রমে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে গেয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত, প্রিয় বন্ধুর মত। তাছাড়া আরও খাপ খেয়েছিল এইজন্যে যে—ও আমার প্রায় সমবয়সী। ডালিয়াকে দেখেও আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। অনেক সময় শুনেছি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মেদমজ্জায় কোষে কোষে নাকি বহুপতিত্বের বীজ ছড়িয়ে আছে। তারা কোনদিন পতিপরায়ণা হয় না। বিভিন্ন মৌমাছিদের সাথে উড়ে গিয়ে বহুবার জীবনের বাসা বাঁধে। ভেঙ্গে দিয়ে আবার পালিয়ে যায়। শেষ বয়েসে সম্বল হয় বহুদিনের পাপের পাওনা নানা রোগ, আর দুর্বল দেহ দিনে দিনে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যায়। কিন্তু এর থেকে বড় মিথ্যে বুঝি আর কিছু নেই। অন্ততঃ ডালিয়াকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল সে'দিন। ও ভালবাসে আনন্দকে; আনন্দকে পেয়ে ও সুখী। তাতে কোনও খুঁত নেই। কপটতার লেশশূন্য সেটা দেহ পর্য্যন্ত গলিয়ে দিতে দেখেছি। মনে পড়ে, একদিন সামান্য একটু সর্দি-কাশি হয়েছিল আনন্দর। একটু হয়ত জ্বরভাবও, কিন্তু তাতেই কতখানি চঞ্চল হয়ে পড়েছিল ডালিয়া। আমি তখন বেরিয়ে গিয়েছিলাম কক্ষ থেকে। আমাকে না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত ও নিজেই চোলে গেয়েছিল ডাক্তারখানা। অন্তঃস্বত্বা অবস্থাতেই।

কিন্তু একটা জিনিষে সত্যি অবাক্ হতাম। রাত্রি বারোটা বাজতো। সহরটা একটু ঝিমিয়ে আসতো। বাঁশী বাজিয়ে বন্দর ছেড়ে যেত জাহাজ। তারই কিছুক্ষণ পর সেই শব্দটা ভেসে আসতো। প্রতিদিন নয়। তবে প্রায়ই। যেদিন ঘুমিয়ে পড়তাম সেদিন শুনতে পেতাম না। আর যেদিন জেগে থাকতাম সেদিন অশ্বস্তিতে মন ভরে যেত! স্পষ্ট অনুভব করতাম মেয়েলীকণ্ঠের চাপা কান্না। আর এও বুঝতে পারতাম শব্দটা আসছে ডালিয়ার ঘর থেকে। ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। ডালিয়ার কান্না, না অন্য কারো। কিন্তু ডালিয়া কাঁদতে যাবে কেন? দিনের আলোয় তো তাকে দেখেছি। সব সময় ভোরের প্রশান্তি ছড়িয়ে থাকে তার চোখেমুখে। সর্ব্বদাই বেশ একটা স্ফুর্ত্তির আমেজ নিয়ে কাজ করে যায়। সকালে উঠেই আনন্দ চোলে যায় কাজে। ফেরে বেলা বারোটায়। কালিঝুলি মেখে। তারপর যতক্ষণ আনন্দকে দেখি ততক্ষণ তো বেশ খাসা মানুষ বলেই মনে হয় তাকে। সুতরাং তাদের ঘর থেকেই কান্নাটা আসছে কি না সন্দেহ হয়। যাচাই করে নিতে

াইলো মন। সেদিন রাত্রেও অল্প অল্প কাতরানি ভেসে াসছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুমদাম আওয়াজ।

বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ারপর সিঁড়ি দিয়ে বিড়ালের মত পা ফেলে নেমে গেলাম। সাজা ডালিয়ার দরজায় গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালাম। ভুল নিনি, তার ঘর থেকেই আসছে শব্দটা। আস্তে আস্তে রজার কাছে সরে এলাম। ভেতর দিক থেকে দরজা ন্ধ। কিন্তু নীল আলো জ্বলছে ভেতরে এটুকু বুঝতে কষ্ট ল না। কপাটের ছোট্ট ফুটোটায় চোখ লাগালাম। মুহূর্তে ন সমস্ত চেতনাগুলো নিঃসাড় হয়ে আসতে চাইলো। বকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল চোখের সামনে। আনন্দ-লিয়ার জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল খানিকটা ্য। এবং এও জানি এ কৌতূহল থাকাটা ভাবিক হলেও পরিপূর্ণরূপে অনধিকারচর্চা। তবু ল। তাদের সঙ্গে আমার মাখামাখিটা এতখানি ঘনিষ্ঠ য় উঠেছিল বলেই। কিন্তু এতদিন ভাবতাম খুব বেশী খ না থাকলেও মোটকথা শান্তির অভাব নেই তাদের ট সংসারে। শান্তির সমুদ্রজলে সরস তাদের সত্বা। কিন্তু আজ যেন সব কিছু মিলিয়ে গেল মন ক। জোলো রংএর মত মুছে গেল। বুঝতে পারলাম রা বাঁশের মত ওপরের জীবনটা ভাল দেখা গেলেও রে ভেতরে ক্ষয়ে এসেছে অনেক। ফুটো দিয়ে তে পেলাম, বিছানাটার ওপর উবুড় হয়ে পড়ে আছে য়া। কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দেখলাম, নীলাভ সখানার পিঠের দিকটা ছিঁড়ে গেছে। আর দেখলাম ন্দকে—মদের বোতলটা মুখে লাগিয়ে খানিকটা গিলে ়। পরক্ষণে জোর জোর কিল মারছে ডালিয়ার । চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকড়ে নিচ্ছে। চাপা গলায় ;, হুঃ! অ্যাংলো মেয়ে! তার আবার এত ঠাট। ব বোগাশ। কেন তুমি আমায় ওখান থেকে নিয়ে বলো। কৈফিয়ৎ দাও।

ানন্দের এ মূর্তি কিন্তু কোনও দিন দেখিনি দিনের ায়। হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে চোখ দুটো। ল দুটো শক্ত হয়ে এসেছে অসম্ভব রকম। বেশ-বিন্যস্ত। চুলগুলোও বেপরোয়াভাবে ঝুলে পড়েছে ার দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না আনন্দ। অল্প অল্প কাঁপছে। টলে টলে পড়ছে। আবার চাপা গলায় খিঁচিয়ে উঠলো, উঃ! কান্না হচ্ছে। ওসব দেখিয়ে আমায় ভোলাতে পারবে না।

ডালিয়া কোন কথা বলতে পারছে না। ডুকরে ডুকরে ওঠে কেবল।

নিঃসীম বেদনায় কখন আবার নিজের রুমে উঠে এসেছি খেয়াল করি নি। কোনও কথা বলতে ইচ্ছে হল না আনন্দকে। অথচ বুঝতেও পারলাম না ডালিয়াকে এমনিভাবে মারবার কারণ।

সকালে উঠে আগাগোড়া জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা। আনন্দ বেরিয়ে গেছে কাজে। ঘরের ভেতর ফুটফুটে ডালিয়া কি সব নাড়াচাড়া করছিল। দরজায় আমায় দেখে বলে উঠলো, ও গড। ইউ আর ওয়েটিং ফর মি। কাম্ ইন্।

ঘরের ভেতর গিয়ে বসলাম। আবার অবাক্ হলাম। কাল রাতের নীলিম আলোয় সে ঘরখানাকে করুণ হয়ে থাকতে দেখেছিলাম, আজ সকাল বেলায় সেটা যেন পাল্টে গেছে রাতারাতি। চেনবার উপায় নেই। সব গুছিয়ে রাখা হয়েছে। কোণের টেবিলটার ওপর সাদা চাদরের ওপর সূচীশিল্পের ফসল। হয়ত ডালিয়ারই হাতের কাজ। ওপাশে সুন্দর একটা গীটার। কে বাজায় কে জানে।

এ কথা সে কথার পর আসল কথায় এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা প্রতিদিন রাত বারটার পর আনন্দ এত ব্রুট হয়ে ওঠে কেন?

চকিতে চোখ তুলে তাকালো ডালিয়া। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল দাঁড়িয়ে যায়। ডালিয়া যেন ঠিক ভাবতে পারিনি আমি তাকে এই কথা জিজ্ঞেস করে বসবো। লক্ষ্য করলাম, আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে তার লাল মুখখানা। অস্পষ্ট গলায় শুধালো, আপনি জানলেন কি করে?

বললাম, দেখুন আমি থাকি ওপরের ফ্ল্যাটের রুমে। আর আপনারা নীচেই। সব কথাই প্রায় কানে আসে; তাছাড়া রাত্রি বারোটার পর লোকজনও কম আসে। প্রতিদিনই একটা কান্না সেই সময় শুনতে পাই। তাই কাল রাত্রে……

কথা শেষ হতে পারলো না। আবার ক্লান্ত চোখদুটো তুলে ধরলো ডালিয়া, অদ্ভুত করুণ। দিনের আলোয় এই প্রথম করুণ হতে দেখি ডালিয়াকে। দেখলাম, অবরুদ্ধ কান্নার টুক্‌রো যেন গলায় আটকে গেছে তার। কথা বলবার শক্তি নেই যেন।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নেয় ডালিয়া। সব কথাগুলো একটী একটী করে বলে যায় আস্তে আস্তে। আমাকে বিশ্বাস করেই বোধ হয় কোনও কথা গোপন রাখে না। বিরাট বড়লোকের ছেলে আনন্দ। কলকাতায় বাড়ী। ডালিয়াও কলকাতায়ই থাকতো। দুজনের আলাপ হয় খেলার মাঠে। রেস খেলায়। নিজের দামী হাতঘড়িটা বন্ধকী রাখতে যাচ্ছিল আনন্দ ডালিয়ার কাছে। তাছাড়া আরো অনেকবার দেখা হয় গ্র্যাণ্ডের যুগল নৃত্যসভায়। আনন্দ আসত সেখানে শুধু মাত্র নিঙড়ে নেবার ইচ্ছায়। কিন্তু ডালিয়া তো সে ধরণের মেয়ে নয়। ডালিয়া নিজেনিজেই সেই ভেবে অবাক্ হয়ে যায়। তাদের আরো অন্যান্য মেয়েদের মত উজ্জল হয়ে উঠতে পারে না সে। এই সব লাল জলের নেশা ছড়ানো পরিবেশের থেকে অনেক বেশী দাম আছে ছোট্ট একটী ঘরে কপোতকপোতীর সংসারের। সেইটাই কেবল মনে হয় ডালিয়ার। তারই প্রেরণায় ভালোবাসে সে আনন্দকে। তাকে হাজব্যাণ্ডরূপে পেতে চায়। বলে ডালিয়া: কতবার কত নীচে দিকে তলিয়ে যেতে চেয়েছিল আনন্দ। কিন্তু ডালিয়া তো সব জানে—পাঁকে আটকে গেলে আর রক্ষে নেই। তাই সব সময় আনন্দকে ঘিরে ঘিরে রাখতো। তাকে অপমান করতো আনন্দ। ঘৃণা করে পাশ কেটে চোলে যেত। তবু ডালিয়া তাকে ছাড়েনি। সেইজন্যই একদিন আনন্দকে নিয়ে কলকাতা থেকে বোম্বাই চলে আসতে পেরেছিল। কিন্তু এখানে এসে আরও বিপদ হয়েছে যেন। চারিদিকেই গড়িয়ে যাবার পথ। বার, বল্‌ড্যান্স ভবন। সিনেমা জগৎ। তাই আনন্দও আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। যতক্ষণ মদটা পেটে না পড়ে, ততক্ষণ বেশ থাকে। ডালিয়াকে নিজের মত ভাবে। মিলেমিশে থাকে। অনেকবার চেষ্টা করেছে ডালিয়া আনন্দকে মদ ছাড়াতে। অনেক সময় মদের বদলে আঙুর-বেদানার রসও দিয়েছে, তাতে ফল হয়নি। আনন্দর হজমে গোলমাল শুরু হয়েছে। রাতের ঘুম পালিয়েছে। মন-মেজাজও রগচটা হয়ে পড়েছে; তাই অবশেষে ডালিয়া নিজেই তাকে মদ খেতে বলেছে। নইলে বড় অসুখ-বিসুখ হয়ে গেলে আবার বিপদ হবে। অথচ কয়েক ঢোক মদ পেটে পড়বামাত্র মাথা গরম হয়ে যায় আনন্দর। ছুটে চলে যায় সামনের দোতালা ঘরে। বল্‌ড্যান্সের আসরে নেশায় বুঁদ হয়ে যায়। সেখান থেকেই প্রতিদিন উদ্ধার করে আনে ডালিয়া। জোর করে তাকে তুলে নিয়ে আসে ঘরে। আর পর মুহূর্ত্তেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে আনন্দ। রেগে লাল হয়ে যায়। ফুঁলতে থাকে পরাজিত ব্যাঘ্রের মত। কোনও কোনও দিন মারতেও ছাড়ে না ডালিয়াকে। চাপা গলায় বিষ ঝাড়ে, তাতে অবশ্য ডালিয়া কিছু মনে করে না। কারণ সে জানে আনন্দকে পাপ থেকে সরিয়ে রাখতে গেলে অনেক কষ্টই সহ্য করতে হবে চোখকান বুঁজে।

লক্ষ্য করি ডালিয়ার মুখের দিকে। একটুক্‌রো কাতর স্বপ্নলেখা যেন তির তির বয়ে যাওয়া নদীর জলের মত কাঁপছে, তার নীলাভ চোখের তারায়। মাথার সোনালী চুলে তারই স্বপ্নাভাষ। কষ্ট স্বীকার করতে তার আপত্তি নেই। তার দুঃখ শুধু আজও আনন্দকে তার ভালবাসার পবিত্রতায় আটকে রাখতে পারছে না বলে।

মনে আছে, সেইদিনই বিকেল বেলায় আনন্দ আসে আমার রুমে। বলে, চলো সুমন্ত, বেড়িয়ে আসি একটু সমুদ্রের ধার থেকে।

আশ্চর্য্য হয়েছিলুম একটু। কারণ কোনওদিনই তো সে আমার সাথে বেড়াতে যায় না। আর আজ হঠাৎ কেন আমার সঙ্গ পেতে চায় কল্পনা করে উঠতে পারলাম না। তবু তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। বেড়াতে গেলাম। উঁচু নীচু সমুদ্র তীরের ওপর দিয়ে! পথ ছেড়ে আঁকাবাঁকা পথে। সুমুখের কিনারা থেকে একটু দূরে ষ্টীমারের চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে চাপ চাপ। দিনের আলোটা ফ্যাকাশে হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ছোট ছোট জেঠিগুলো বন্দরের ভিড়ে সন্ত্রস্ত। ওপাশে পাহাড়-গুলোর আড়ালে রক্তসূর্য্যের আত্মগোপন করা। আজকের রাতের মত। তারই ছটা এসে পড়েছে সাগরের জলে। করঞ্জার রসগোলার মত দেখাচ্ছে। পায়ে লাগছিল

অনেকক্ষণ ধরে। ছোট ছোট টিল পাথর এলোপাথাড়ি ছড়ানো।

বললাম, এইখানে একটু বসা থাক্।

সমুদ্রতীরেই একটা সমতল জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ি দুজনে। কলকল সাগরের বেআইনী ঢেউগুলো একটার সাথে আর একটা জড়িয়ে যায়। পরক্ষণে শুয়ে পড়ে। ভালোই লাগছিল দেখতে। এই ওঠাপড়ার ভেতরে একটা দার্শনিক মানেও উঁকি দেয় মনে। কিন্তু আনন্দই তা ভেঙ্গে দেয়। বলে, তুমি তো ডাক্তার সুমন্ত। আমার একটা উপকার করে দেবে ?

জিজ্ঞেস করি, কি উপকার বলো। সাধ্য থাকলে করবো বৈ কী !

আবার চুপ করে যায় আনন্দ। কি সব যেন হিসেব করে নেয় মনে মনে। তারপর বলে, কাজটা অবশ্য খারাপই।

বিস্মিত হয়ে শুধোলাম, খারাপ কাজ মানে ? আমি তো তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না ভাই।

বুঝতে না পারার কিচ্ছু নেই। আসল কথা আমি ওই মেয়েটার হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। যত সব ট্র্যাশ্।

কার কথা বলছো, ডালিয়ার ?

তা নয়ত কি। উঃ কি কঠিন পাল্লাতেই না পড়েছি ভাই। কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে।

বললাম, স্পষ্ট করে খুলে বলো।

আনন্দ বললে, মেয়েটা প্রেগ্‌নেণ্ট তা বোধ হয় জানো আশা করি। সেই অজুহাতেই আমাকে এই মাসেই বিয়ে করতে বলছে। অথচ দেখোনা, ওসব মেয়েকে বিয়ে করে কি সুখ পাওয়া যায়।

আবার ধাক্কা খেলাম। প্রশ্নিল চোখে তাকালাম ওর দিকে। তুমি ওকে বিয়ে করোনি নাকি ?

পাগল নাকি, আমি ওকে বিয়ে করতে যাবো কোন্ দুঃখে। স্রেফ রোমান্স ছাড়া আর কিছু নয়। আর সত্যি কথা বলতে কি আমি কি, জানতাম যে একটা বাজে অজুহাত নিয়ে আমাকে ছাড়তে চাইবে না ও। আবার বলে ভালবাসি। হুঁ! ওসব চিপ-সেন্টিমেণ্ট আমার নেই। নেহাৎ ছাড়ছে না···বলে আমার দিকে তাকালো আনন্দ। বললো, তোমাকে ভাই একাজটা করতেই হবে।

বলবার কিছু নেই। তাই নিশ্চুপ হয়েই বসে থাকি। আনন্দ আবার বলে, কিন্তু খুব গোপনে কাজটা সারতে হবে ভাই, যাতে ও টের না পায়। ওষুধ আমি জোগাড় করে নেব। তুমি শুধু······

কি বললে, লজ্জা করে না তোমার ওকথা বলতে। অ্যাংলো মেয়ে বলে কি তাদের মাতৃত্ব নেই ? তিরস্কার করে উঠি হঠাৎ। ঝাঁঝিয়ে উঠি। আনন্দর চরিত্রগত দিকটা ভালো বলে ঠেকেনি আমার কাছে কোনওদিনই। কিন্তু এ কথার পর থেকে যেন খানিকটা ঘৃণাও জমাট বাঁধতে শুরু করলো একটু একটু করে। বললাম, আমি ওসব পারবো না। বরং কোর্টে যদি কেশ ওঠে, তবে ওর হয়েই সাক্ষী দেবো।

মনে আছে, এর পরেও আর তার পাশে বসে থাকতেই ইচ্ছে করেনি আমার। রুচিতে বেধেছিল। সরে এসে ছিলাম অবহেলাভরে। ডালিয়ার সাথে আনন্দর চালচলনে হয়ত বিশেষ বেমানান্ হয়নি। বড়লোকের ছেলে আনন্দ। সাহেবী কায়দায় কেতাদুরস্ত। কিন্তু মনের দিক থেকে একেবারে ফাঁকা ঐশ্বর্য্যহীন সে। বিশেষ করে ডালিয়ার পাশে।

তার পর আরও দিন সাত-আটেক ছিলাম বোম্বাইতে। যতদিন ছিলাম হাজার কাজ ফেলেও প্রতিদিনই একবার করে গিয়ে দেখা করতাম ডালিয়ার সঙ্গে। তারপর ফিরে এলাম তাদেরকে ছেড়ে। আনন্দর সঙ্গে আর কোনও কথা বলিনি তার পর থেকে! আসবার সময় শুধু আর একবার ভালো করে বুঝিয়ে এসেছিলাম। ডালিয়া তাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা কোনও হঠাৎ-চাওয়ার মাতলামো নয়। মনে পড়ে আনন্দর ওপর আমার চরম রাগ হয়ে ছিল। স্বজাতি হলেও তার নীচতাকে প্রশ্রয় দিতে পারিনি। একবার মনে হয়েছিল, ডালিয়াকে গোপনে ডেকে সাবধান করে দিই। কিন্তু তা পারিনি। কুণ্ঠায় গলা বুঁজে এসেছিল। মনের কথা মনেই শুকিয়ে মরেছিল।

তার পর চলে আসি কলকাতা। দিনগুলো পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডালিয়ার স্মৃতিটাও ফিকে হয়ে আসে।

কেবল কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে শ্রান্ত অবসরে তার কোমল হাসিটা মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে যায় আনন্দকে। এত বড় একটা অপরাধ করেও কেমন হেসেখেলে বেড়াতো বেহায়ার মত। অনুশোচনা নেই বিন্দুমাত্র। ভুলে গিয়েছিলাম। তবু বোম্বাইএর নীচের ফ্ল্যাটের আড়ালের ক্লান্ত স্বপ্নপুরীকে একেবারে মনের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। মাঝে মাঝে যে ইচ্ছে হয়নি তাদের দেখে আসতে তা নয়। তবে সেটা তো আর সোজা নয়। কাজকর্ম্মের চাপ বেশী। শুধু ভেবেছি। কিন্তু এখান থেকে তাদের কোনও খবরই পাইনি। এমন কি একটা চিঠিও না। তাই হঠাৎ আমার বাড়ীতেই আনন্দকে এতদিন পরে দেখে অবাক্ হবারই কথা।

সহসা চোখে পড়ে আমার। আনন্দর সারা চোখে-মুখে কালো কাজলের কালিমা। শত রাত্রির অন্ধকারের পাংশুটে ছায়া তার দুটি চোখের কোলে। কোনও কথা বলতে পারছে না। অস্ফুট আবেগে ঠোঁট জোড়া কাঁপছে শুধু। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে আনন্দ, সত্যি বড় ভুল করেছিলাম আমি।

বললাম, সে তো করেছোই। কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ নেই। ডালিয়াকে তুমি নিজের বাড়ীতে এনেছো শুনে সুখী হলাম।

আবার চেয়ে দেখলাম আনন্দর মুখের দিকে। চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে তার। বেশ খানিকটা বেদনার জল ঝরে তার কথায়। বুঝলাম, আনন্দর জীবনের সহজ গতিটা কোথায় মুখ থুবড়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কেমন যেন অগোছালো, যার জন্যে তার এই করুণ নিস্পৃহতা। জিজ্ঞেস করলাম, একট কথা খুলে বলবে সমস্ত, তোমার এ ভুল ভাঙ্গলো কি করে?

সে অনেক কথা। বলে গেল আনন্দ ছায়াঘন মুখ নিয়ে। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আনন্দর প্রতিভার কথা। অদ্ভুত গান গাইতে পারে সে। মানুষের হৃদয় নিঙড়ানো অশ্রুজলে ভেজা তার সমস্ত গানগুলো। যা মানুষকে মুহূর্ত্তে আকর্ষণ করে। সেই গানই আকর্ষণ করেছিল বোম্বাইএর বিখ্যাত বাঙ্গালী অভিনেত্রী স্বাতী সোমকে। ডালিয়াকে ছেড়ে দিয়ে স্বাতীর সাথে আবার উড়ে গেছিল আনন্দ। উচ্ছৃ্খল হয়ে ভেসে গিছল। ইচ্ছে করলে ডালিয়াও হয়ত নিজের পথ করে নিতে পারতো অনায়াসেই। সে প্রস্তাবও করেছিল বোম্বাইএর এক পাশা বারওয়ালা। কিন্তু সে তা করেনি। যে সভ্যতার কাছে মানুষের মানবতার লেশ নেই তাকে গ্রহণ করতে চায়নি মন। তাই দোতালার ফ্ল্যাটেই গোপনে গোপনে শুকিয়ে মরেছিল একটী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ফুল। কেমন করে তার দিন কেটেছে জানে না আনন্দ। জানতে চায়নি। তার পানে একবার ফিরে চাইতেও মনে ছিল না তার। পুতুলকে নিয়ে খেলা শেষ হয়ে গেছে। ওর আর দরকার নেই। নূতন পুতুল এসেছে। কিন্তু অভিনেত্রী স্বাতী সোমের অভিনয় শেষ হল। আনন্দ খেলার পুতুলের মত পড়ে রইলো। একান্ত অনাদরে স্বাতীর বিয়ে হয়ে গেল কোন্ এক বিখ্যাত অভিনেতার সাথে।

তাতে হয়ত একটুও বুকে বাজতো না আনন্দর। ওসব ব্যাপারে সে বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু সে নিজেও জানতে পারেনি যে কখন্ কোন্ সময় অজ্ঞাতসারে তীব্র একটা আকর্ষণ এসে পড়েছিল স্বাতীর ওপর। পৃথিবীর প্রতি সূর্য্যের আকর্ষণের মত। সেইদিনই প্রথম আঘাত পেল আনন্দ। আঘাত পেয়েছে আনন্দ স্বাতীর কাছ থেকে এবং সে আঘাত নির্ম্মমভাবেই বিঁধেছে তার বুকে—যার দরুণ নিজের সব ক্রটীবিচ্যুতি-গুলো আজ চোখের সামনে দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ হয়ে গেছে। নিজে আঘাত পেয়ে উপলব্ধি করেছে ডালিয়ার বুকের জ্বালা।

বললো আনন্দ, আমার এ অপরাধের শাস্তি নেই সুমন্ত। স্বাতী মেয়েটা সত্যি বড় খারাপ। আজ আমার সঙ্গে কাল অপরের সঙ্গে—এমনি করে গা এলিয়ে বেড়ায়। অথচ সে জায়গায় ডালিয়াকে চিনতে পারিনি আমি। এই দেখো ডালিয়া চিঠি দিয়েছে আমাকে। এত অবহেলা সত্বেও সে আমাকে ক্ষমা করেছে। তাই এই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ওকে নিয়ে এসেছি আমার ঘরে।

হাত বাড়িয়ে নিলাম চিঠিটা। অসুখ করেছে ডালিয়ার। আকুল আহ্বান। ছত্রে ছত্রে তার লোনা জল আটকে আছে। চুপ করেই পড়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক ফেটে। কিন্তু তবু স্বাতী সোমকে ধন্যবাদ। অমঙ্গল সে করেনি আনন্দর। বরং এতে আনন্দ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

নইলে কবে তার ভুল ভাঙ্গতো বলা যায় না। হয়ত ভাঙ্গতোও না কোনও দিন।

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে আনন্দর। অনেক দেরী।

ট্যাক্সিখানা এসে থামলো একটা গেটের সামনে। আনন্দের বাড়ীটার দিকে চেয়ে দেখলাম এক চোখ.। শীতের বাতাসে মেহেদি গাছটার পাতা ঝরে গিয়েছে। অবহেলিত.অবস্থায় পড়ে আছে বাগানটা। ফুলগাছগুলো মরা স্বপ্নের মত বিশীর্ণ। দোতালার কার্ণিশে দুটো পায়রা গলা ফুলিয়ে ঝগড়া করছে ঝটপট করে। এই বিপর্য্যস্ত পরিবেশের সাথে হয়ত ডালিয়ার জীবনেরও বেশ খানিকটা মিল আছে।

কিন্তু ও দৃশ্য কোনওদিন ভুলবো না। চোখ ফেটে জল আসে আমার। আহত ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে যাই। ডালিয়ার কক্ষের সামনে গিয়ে হাত থেকে স্টেথিস্কোপটা খসে যায়। রোগ পরীক্ষার প্রয়োজন নেই আর। কিছুক্ষণ আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে ডালিয়ার। বেতস পাতার মত শীর্ণ পাতলা দেহখানা বিছানার সাথে মিলিয়ে গেছে যেন। মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। তারই তাজা রক্তে বালিশটা এখনো ভিজে। এরি মধ্যে দু একটা পিঁপড়ে লেগেছে। রক্ত খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। অনেকদিনের আত্মক্ষয়ে গোলাপী রঙটা বিবর্ণ হয়ে তামাটে হয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে আলোর আভা এসে পড়েছে মুখে। তাইতে এত রোগা হয়ে যাওয়া সত্বেও যেন একটুক্‌রো স্মিত হাসি অস্পষ্ট দ্যুতি ছড়াচ্ছে। আত্ম-সমর্পণের অভিব্যক্তির মত। সবুজ-ঘ্রাণ।

ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেটা তখনো মায়ের স্তনে মুখ গুঁজে চুষছে। বুকের ওপর বসে বসে খেলা করছে তার মরা মা-কে নিয়ে। আমাদের দেখে অবুঝ চোখ তুলে তাকালো একবার। তারপর আবার চুষতে লাগলো। নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়।

এর পরেও আর চোখের জল সামলানো সম্ভব হয় না আমার পক্ষে।

কালিকাট

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

আমরা চলেছি মালাবারের ভিতর দিয়ে। এখানকার ভাষা মালায়ালাম। প্রচলিত আছে আরও তিনটি ভাষা দক্ষিণ ভারতে। অন্ধ্রে তেলেগু, তামীলনাদে তামীল, আর মহীশূরে ক্যানেরিজ্‌। মাঙ্গালোর এক্সপ্রেস যাচ্ছে এঁকে বেঁকে, নীলগিরি পর্বতমালার ভিতর দিয়ে, সবুজ বনানী আর পাহাড়ের শ্রেণীকে কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে রেখে। এই নীলগিরির শীর্ষদেশেই আছে দক্ষিণের শ্রেষ্ঠ শৈল নিবাস, উটাকামণ্ড বা উটি, দাঁড়িয়ে আছে সৌন্দর্য্যের প্রতীক হ'য়ে। এই স্থানই পালঘাট নামে খ্যাত। এইখানেই এক পাহাড়ের চূড়ায় আছে অগস্ত্য মুনির আশ্রম। তাঁর তপঃপ্রভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হ'য়েছিল বিন্ধ্য পর্বতকেও, মাথা নীচু করে পথ করে দিতে হ'য়েছিল তাঁকে—যেতে দিতে হ'য়েছিল দক্ষিণ ভারতে। দিতে হ'য়েছিল উত্তর আর দক্ষিণের সংযোগ স্থাপন করবার জন্য। কথা দিতে হ'য়েছিল যতক্ষণ ঋষি ফিরে না আসেন, ততক্ষণ মাথা উঁচু করতে পারবেন না পর্বত-প্রধান। ঋষি ও ফিরলেন না, বিন্ধ্যর ও উঁচু মাথা নীচুই রয়ে গেল। সুগম হ'য়ে রইল উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার পথ। ক্রমে, সেই পথ দিয়ে উত্তরের আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবেশ করলো দক্ষিণে, দ্রাবিড় স্থানে। সমৃদ্ধি-শালী হ'ল দক্ষিণ সভ্যতায় ও কৃষ্টিতে। উত্তর গেল জগতগুরু শঙ্করাচার্য, পেল তাঁর অসামান্য প্রতিভা, শিক্ষা আর বাণী। রক্ষা পেল হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধের কবল থেকে। পেল আচার্য শ্রেষ্ঠ রামানুজকে। ধন্য হ'ল উত্তর। মিলন হ'ল দক্ষিণে, উত্তরে। দ্রাবিড়ে, আর্যে।

আজ পালঘাট সারা দক্ষিণ ভারতকে সরবরাহ করে কাঠ। দক্ষিণে আর কোথাও এমন সুন্দর আর শক্ত কাঠ নাই। পাহাড়ের গা ছুঁয়ে প্রবাহিত হয় অনেক প্রশস্ত খাড়ি বা ব্যাকওয়াটার, আর বেগবতী স্রোতস্বিনী। কাঠ কেটে, পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে, চালান দেওয়া হয় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এই নদী আর খাড়ি দিয়ে। যায় বড় বড় নৌকা বোঝাই হ'য়ে।

ওড়ালকোট ষ্টেশনে নীলগিরি পর্বতমালা সামনে এসে পথ জুড়ে দাঁড়ায়। মনে হয় এইখানেই হ'বে বুঝি যাত্রার শেষ। সম্মুখে সুউচ্চ পাহাড় দু'পাশে সবুজ বৃক্ষ শ্রেণী সৃষ্টি করে এক অতি রমণীয় পরিবেশ। বড় ভাল লাগে দেখ্‌তে। গাড়ী ছাড়তেই বদলে যায় রাস্তার রূপ। নীলগিরির পর্বতমালা পশ্চাতে রেখে আমরা এগিয়ে চলি সমুদ্রের দিকে। রাস্তার দু'পাশেই বড় বড় নদী আর খাড়ি, এত প্রশস্ত : দেখে মনে হয়

সমুদ্রই বুঝি। মনে হয় খুব কাছেই আছে সমুদ্র। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এসে থামে সেরোনুরে। এইখান থেকেই গাড়ী বদল করে যেতে হয় কোচীনে। গাড়ী এসে দাঁড়ায় একটি সেতুর উপর, নীচে দিয়ে বয়ে যায় একটি বেগবতী স্রোতস্বতী, বুকে নিয়ে অসংখ্য মাছের নৌকা, এসেছে তারা মাছ চালান দিতে। সেতুর পাশ দিয়ে নেমে গিয়েছে একটি সিঁড়ি, মিশেছে গিয়ে নদীর বুকে। মাছের টুকরি মাথায় নিয়ে জেলেরা একে একে উঠে আসে সেতুর উপর, মাছ দিয়ে ভর্ত্তি করে ওয়াগন। সুন্দর সে দৃশ্য।

আমরা যাই ম্যাঙ্গালোরের পথে। এবারে আমাদের বাঁ দিকে দেখা যায় এক একটি বিশাল-কায়া খাড়ি, তাদের বুকের উপর দিয়ে চলে কত রকমের নৌকা, বয়ে' নিয়ে যায় পণ্য, নিয়ে যায় কাঠ। মাঝে দেখা যায় সমুদ্রও, কখনও দূরে কখনও অতি নিকটে, অপরূপ সে দৃশ্য।

—বেলা বারোটায় আমরা নামি কালিকাটে। গাড়ী চলে যায় ম্যাঙ্গালোরে, আরও ছিয়াত্তর মাইল দূরে, সেইখানেই পরিসমাপ্তি এই লাইনের।

স্বাধীনতা লাভের পর, কালিকাট পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে কোবিনকোটে, যেমন হ'য়েছে ভিজাগাপটম বিশাখাপত্তনমে, ত্রিচিনোপল্লী তিরুচরাপল্লীতে, আর টিনাভেলী তিরুন্নল ভ্যালিতে।

এই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালিকাট! বন্দর শ্রেষ্ঠ কালিকাট। দক্ষিণে মামাল্লাপুরম (মহাবলীপুরম) এর পরেই ছিল এর স্থান। বাস করতেন এখানে কত শ্রেষ্ঠী, কত ধনী। তাঁদের নৌকা বহন করে নিয়ে যেত ভারতের পণ্য সম্ভার, এই বন্দর থেকে সুদূর পশ্চিমে। সাথে করে' নিয়ে যেত' ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টি। ফিরে আসতো নিয়ে রূপা, সোনা, হিরে জহরৎ, নিয়ে আসতো নৌকা বোঝাই করে'। তেমনই সমাগত হ'ত এখানে নানা দেশের নানা লোক, বিচিত্র তাদের পণ্য সম্ভার, বিভিন্ন তাদের ভাষা। বিনিময় হ'ত পণ্যে পণ্যে, সুবর্ণে। মুখরিত হ'য়ে থাক্‌তো এর সমুদ্র তীর, মুখর হ'ত এর পথ ঘাট, অট্টালিকা আর রাজপ্রাসাদে, নানা ভাষায় আর আনন্দের কোলাহলে।

এলো সপ্তদশ শতাব্দী, মহাশক্তিশালী হ'ল আরব আফ্রিকা মহাদেশে। বন্ধ হ'য়ে গেল যাতায়াত ভারতে পশ্চিমে। বন্ধ হ'ল সহজ বাণিজ্য। মুনাফা চায় আরব। তাদের চাহিদা মিটিয়ে অবশিষ্ট যা থাকে, তাতে লাভের অংশ যায় অনেক কমে'। সহ্য হয় না পশ্চিম দেশের লোকেদের। উপায় খুঁজতে থাকে। কোথায় পাবে দ্বিতীয় রাস্তা, বাধা দিতে পারবে না যেখানে আরব। সহজ হবে যাতায়াত। বেড়ে যাবে লাভের অঙ্ক। পর্তুগাল হ'ল অগ্রণী। তাদের রাজা দিলেন অসংখ্য টাকা। নির্মাণ করা হ'ল জাহাজ, ভরা হ'ল নাবিকে, খাদ্যে আর পানীয়ে। এগিয়ে এলেন কলোম্বাস, দুঃসাহসী, কিন্তু বুদ্ধিমান। একটা বড় কিছু করবেন এই ছিল তাঁর মনের একান্ত অভিলাষ, বাসনা অন্তরতম প্রদেশের। তিনিই হ'লেন পুরোধা। বহু কষ্টে, অনেক রকমের বিপদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে আবিষ্কার করলেন এক দেশ। ভাবলেন ভারতবর্ষই নিশ্চয়। কিন্তু সে ভারতবর্ষ নয়, তাই নাম রাখা হ'ল New India. নতুন ভারতবর্ষ। তাঁর কৃতকার্যতায় সাহস বেড়ে গেল। পশ্চিম দেশের লোকেদের যত ছিল দুঃসাহসী, ছুটে এলো রাজার কাছে। যাবে ভারতবর্ষ আবিষ্কারে, যাবে নতুন পথের সন্ধানে। রাজারও বাড়লো লোভ। নতুন দেশ আবিষ্কার, নতুন সম্পত্তি, নতুন উপনিবেশ, নতুন বাণিজ্য। মুক্ত হস্তে খরচ করতে লাগলেন অর্থ। নির্মিত হ'ল কত জাহাজ, সংগ্রহ করা হ'ল কত নাবিক, কত দুঃসাহসী অধিনায়ক। তারা জাহাজ নিয়ে ছুটলো সমুদ্রের বুকে, পাড়ি দিল অজানার পথে।

এদেরই মধ্যে ছিলেন Vas-co-da-gama, ভাস্কো-ডা-গামা এক পর্তুগীজ্ নাবিক। তিনিই সাহসে বুক ভরে নিয়ে, ভীষণ, ভয়াল, তরঙ্গসঙ্কুল উত্তমাশা অন্তরিপ ঘুরে, প্রথমে এসে পৌছলেন এই মহাভারতের সাগরতীরে। নামলেন এসে কালিকাটে, জামরীনের রাজধানীতে। সেদিন ছিল সাতাশে মে, ১৪৯৮ সাল। আবিষ্কার হ'ল ভারতের বাণিজ্য পথ পশ্চিমের সাথে। মিলন হ'ল পর্তুগীজে ভারতবাসীতে, পশ্চিমে পুরবে। জন্ম নিল সভ্য জগতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী এক সম্ভাবনা। অমর হ'য়ে রইল এই তারিখটি ইতিহাসের পাতায়, সেই সাথে অমর হলেন ভাস্কো-ডা-গামা আর জামরীন। কালিকাট ফিরে পেল তার হৃতগৌরব। তার বন্দর হ'ল দ্বিগুণ মুখর, দেশ বিদেশের কত বিচিত্র নৌকায় আর জাহাজে ভ'রে গেল সাগরের বুক। বিভিন্ন দেশের লোকের ভাড়ে সাগরতীরে সহজ চলা-ফেরা হ'য়ে উঠলো কঠিন। বিভিন্ন ভাষার কোলাহলে পরিপূর্ণ হ'ল দিগন্ত। আলোয় আলোকিত হ'ল সমুদ্র-সৈকত। গড়ে উঠলো একে একে সহরের বুক কত প্রাসাদ, কত অট্টালিকা, রচিত হ'ল রাস্তার পাশে পাশে কত ফুল ভরতি উদ্যান।

গাড়ীতে বসে' বসে' স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠেছিল ১৪৯৮ সালের স্মরণীয় দিনটির কথা, চোখের সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছিল একটি ছবি, সে চিত্র কালিকাটের পূর্ব্ব গৌরবের। ভাবছিলাম কিছুই কি নাই অবশিষ্ট! নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা স্মরণ করিয়ে দেবে সমৃদ্ধিশালী কালিকাটের কথা, জানিয়ে দেবে, সে ছিল একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নগরীর অন্যতমা, ছিল এক স্বপনপুরী। এক রূঢ় বাস্তবের ধাক্কায় স্বপ্ন যায় টুটে। সম্ভব হ'তে পারে কি ইতিহাসে এত বড় পরিবর্ত্তন? এমন করে সর্ব্বস্ব হারিয়ে, এমন দৈন্য-মূর্ত্তি নিয়ে কেমন করে' দাঁড়িয়ে আছে কালিকাট বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ পৃথিবীর বুকের উপর? বন্দর আছে, নাই একখানিও জাহাজ। রাস্তা অপরিষ্কার, দুপাশের বাড়ীগুলি ক্ষুদ্র আর জরাজীর্ণ, নাই কোন চিহ্ন প্রাসাদের। বেশীর ভাগ বাড়ীরই খড়ের চাল, লালমাটি দিয়ে তৈরী করা হ'য়েছে তাদের দেওয়াল। তার উপর, বিষাক্ত তার জল।

ব্যথায় ভরে যায় বুক। মনে হয় যতশীঘ্র এখান থেকে চলে যেতে পারি ততই মঙ্গল। একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়ে সমুদ্রতীর, সহর আর বাজার ঘুরে উপস্থিত হই ষ্টেশনে। তিনটের গাড়ী ধরে' যাত্রাকরি কোচীনে।

গান্ধীবাদে ব্যষ্টির ভূমিকা

শ্রীঅজিতকুমার হালদার

একটা মতবাদ গড়ে তুলতে গেলে তার পেছনে একটা ভিত্তি থাকা চাই। সে ভিত্তিটা হোল জীবনের প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টিভংগি। নানা রকমের স্বার্থ, সমস্যা ও পরিবেশ নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের এই বহুমুখী জীবন। তাদের প্রত্যেককেই আমরা বিচার করি বিভিন্ন মূল্যমান দিয়ে। জীবনকে গড়ে তোলার আদর্শ আমাদের সকলের এক নয়। মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভংগির এই পার্থক্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদগুলির মধ্যে বিভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য বহন করে আনে।

ভিত্তিকে বাদ দিয়ে যেমন আমরা বাড়ী তৈরী করতে পারি না, তেমনি এই মূল্যবোধকে অস্বীকার করে কোনো মতবাদ বিচার করতে পারা যায় না। গান্ধীজির মতবাদ বিচার করতে গেলে এই বিষয়টির অনুধাবন আমাদের প্রথমেই করতে হবে। কমিউনিজ্‌ম্ বা সোস্যালিজ্‌ম্ যে দৃষ্টিভংগি দিয়ে গড়ে উঠেছে, সেই দৃষ্টিভংগিতে তাঁর পরিকল্পিত সমাজের আলোচনা করা উচিত হবে না। তার কারণ সমাজকে বিচার করার ভংগিই তাঁর আলাদা। জগৎ ও জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছে অন্যরূপ নিয়ে প্রতিভাত; তাই তাঁর সমাজ-সংস্কারের প্রারম্ভও অন্য সূত্র ধরে।

সমাজের সম্বন্ধে গান্ধীজির মতামত ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যখনই আমরা আলোচনা করি, তখন তাঁর দৃষ্টিভংগির বৈশিষ্ট্য এক নূতনত্বের সন্ধান দেয়। মানুষকে সামগ্রিকভাবে বিচার না করে তিনি একক মানুষের ওপর জোর দিয়েছিলেন। দেশের প্রত্যেকটি লোক হয়ে উঠুক এক একজন আদর্শ মানুষ। মানুষ হয়ে জন্মাবার ফলে যে সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী সে, তার পূর্ণ প্রতিফলন হতে হবে, এইটেই গান্ধীবাদের মূল লক্ষ্য। সমাজের প্রত্যেকটি লোকই যদি আদর্শবান হয়, সমগ্র সমাজও তখন আদর্শ হয়ে উঠবে; আর সে হয়ে ওঠার স্থায়িত্বও হবে বেশী, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর। অবশ্য লক্ষ্যের দিক থেকে গান্ধীজির মতবাদের খুব বেশি বৈশিষ্ট্য নেই। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখি, সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য একই: আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে উঠুক, যাতে সেটা আদর্শ হয়ে ওঠে, যাতে প্রত্যেক লোকই তার মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে।

লক্ষ্যের মাপকাটিতে গান্ধীজি বিশিষ্ট নয়; তাঁর বৈশিষ্ট্য সমস্যা-সমাধানের উপায়ে। সমাজকে সামগ্রিক ভাবে বিচার তিনি করেন নি। সমাজ ছাড়া আমরা যেমন সাধারণ মানুষের জীবনকে কল্পনা করতে পারি না, তেমনি মানুষ ছাড়া সমাজের কল্পনাও অবাস্তব। শেষেরটির ওপরেই গান্ধীজি প্রাধান্য দিয়েছিলেন বেশী। বর্তমানে যে দুইটি মতবাদ পৃথিবীর রাজনীতিকে প্রভাবান্বিত করেছে, তা হোল সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র। এই দুইটিই ব্যষ্টির চাইতে সমষ্টির ওপর দৃষ্টি দিচ্ছে বেশী। দুইটিরই লক্ষ্য: আগে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন কর; পরিবেশ ও স্বাধীনতাই মানুষকে গড়ে তুলবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোক যখন নির্বাচনী ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রচারকার্য মারফত নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ পাবে ও তাদের চেতনাবোধ জেগে উঠবে, তখন দায়িত্ববোধ, সামাজিক দৃষ্টিভংগি, সহনশীলতা মানুষের মধ্যে এসে যাবে। আবার সাম্যবাদী ব্যবস্থায় লোকের অর্থনৈতিক স্বার্থে যখন সাম্য আসবে, তখন প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতা ও গুণাবলীর পূর্ণ প্রকাশ করতে পারবে। দুইয়েরই লক্ষ্য হোল সমগ্র থেকে অংশে, আর গান্ধীজির লক্ষ্য হোল অংশ থেকে সমগ্রে। মানবতার ওপরে গান্ধীজির আছে অগাধ বিশ্বাস, তাই তাঁর কাজ আরম্ভ হচ্ছে ব্যষ্টিকে অবলম্বন করে। মানুষের সদ্‌বৃত্তিতে তিনি বিশ্বাসী। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা সমাজ-পরিবর্তনের গতির পথে মানুষকে নিঃসহায় করে ফেলেছে। ইতিহাসই সেখানে চালক, মানুষ দ্রষ্টা মাত্র। আর গান্ধীজির সমাজে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারবোধ বিশেষ স্থানের অধিকারী। এখন এই দুইটি বিপরীতমুখী দৃষ্টিভংগীর মধ্যে থেকে যে প্রশ্নটা প্রধান হয়ে ওঠে, তা হোল: মানুষ সমাজকে পরিবর্তন করে, না সমাজ মানুষকে পরিবর্তন করে। ইতিহাসের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে যে সমস্ত মতবাদগুলি গড়ে উঠেছে, তাঁদের সকলেই ব্যষ্টির চাইতে সমষ্টির ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। কেননা, তাঁদের মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুগত পরিবেশই মানুষের মনকে গড়ে তোলে। সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমন কি মানসিক দৃষ্টিকে এক নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তোলে। যদি সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় সাম্য আসে, এবং প্রত্যেকটি লোকের সামাজিক মর্যাদা না থাকে, তখন তাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ সমলক্ষ্য হয়ে উঠবে—আর তাতে মানুষের ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপুষ্টি হবে। অপরদিকে গান্ধীজির দৃষ্টি মানবতার দিকে। মানুষের ওপরে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিতে তিনি রাজি নন। কালের পরিবর্তনে প্রতিষ্ঠানের রূপ বদলাবে, পুরাতন সমাজ-সংস্থা সভ্যতার নবীন পদক্ষেপে অচল হয়ে পড়বে। কিন্তু হৃদয়ের যে সমস্ত উপাদান দিয়ে গড়ে উঠেছে মানুষের মনুষ্যত্ব, তারা চিরকাল ধরেই মহীয়ান হয়ে থাকবে। প্রেমের মাধুর্য, কারুণ্যের উদারতার আদর মানুষের কাছে চিরকালই। শুধু তাই নয়! সমাজ-সংস্থার পরিবর্তনের কাজেও তার প্রাধান্য। বিবর্তনের গতিতে ইতিহাসের মূল্য অনস্বীকার্য, কিন্তু রূপের পরিকল্পনা ও কার্যক্ষেত্রে তার আসল প্রয়োগ করবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও আদর্শবাদিতা। গান্ধীজির সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

মতামতের প্রত্যেকটিই এই মানবতাকে জাগিয়ে তোলার কাজে সচেষ্ট।

তাঁর বিকেন্দ্রীকরণের কথাই ধরা যাক্। বিরাট মেশিনের সাহায্যে আজ যে বিরাট শিল্প পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে, গান্ধীজি তাকে সমর্থন করতেন না। কেননা, এর ফলে কেবল যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সীমাবদ্ধ হচ্ছে, তা নয়; এর বহুল ব্যবহারে মানুষ ক্রমে ক্রমে যন্ত্রের অধীন হয়ে পড়ছে। সুতরাং তাঁর মত হোল উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত না করে কুটীর শিল্প ও ছোটো শিল্পের মারফত সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়, তার মধ্যে প্রধান হোল, এই ব্যবস্থায় আমাদের জীবন-যাত্রার মান অনেকখানি কমে যাবে। বিজ্ঞানের কল্পনাতীত উন্নতি আমাদের জীবন-যাত্রার মানকে প্রভূতভাবে পরিবর্তন করেছে। আজ পৃথিবীতে যে জাতি বিজ্ঞানে যত বেশী উন্নত, তার জীবন-যাত্রার মান তত উঁচুতে। মেশিনের বহুলপ্রচার আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীগুলিকে অনায়াসলভ্য ও প্রচুর করে তুলেছে। গান্ধীজির বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় মেশিনের large-scale production এর সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত হব। দেশ থেকে মেশিনের ব্যবহারকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় দিতে গান্ধিজি বলেননি। Machine has its place, it has come to say," কিন্তু large-scale production বিকেন্দ্রীগত ব্যবস্থায় সম্ভব হবে না এবং তার ফলে জিনিষের প্রাচুর্যও কমে যাবে। এই অভিযোগের উত্তরে যা বক্তব্য, তার ভিত্তি ভারতের তথা প্রাচ্যের দর্শনের মধ্যে নিহিত। বিজ্ঞানের উন্নতি সামগ্রীর প্রাচুর্য এনে দিয়েছে বটে; কিন্তু মানুষের অভাব দূর করতে পারেনি। প্রাচুর্য অভাবকে সাময়িকভাবে নিবৃত্তি করতে পারে; কিন্তু অন্যদিকে তার চাহিদাকে বৃদ্ধি করে দেয়। আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তির এটাও একটা প্রধান কারণ।

আরাম ও আনন্দ এক কথা নয়। আরাম এলেই আনন্দ আসে না, যদি না তা আমাদের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। সীমাহীন মানুষের আকাংখার প্রসার। চরম ঐশ্বর্যের কালেও সে আকাংখা করে। আরাম উপভোগ করছে, দৈহিক সুখলাভ করছে; কিন্তু অন্তরের পরিতৃপ্তি তার আসে না। আনন্দটা হোল অন্তরের জিনিষ, আর আরাম বাহিরের। বাহিরের জিনিষ মনকে আনন্দ দিল, কিন্তু সে দেওয়াটা ক্ষণস্থায়ী; দৈহিক সুখের অবসানের পূর্বেই আবার অশান্তি জেগে উঠছে—আরও চাই। মেশিনের বিপুল উৎপাদন শক্তি এই ভাবকে তীব্রতর করে তুলেছে। Lerge-seale production যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামগ্রী উৎপাদন করছে, তখন বাজারে মন্দা দেখা দেয়। আর সেই মন্দাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে মেশিনের অব্যবহৃত বাড়তি শক্তি আশ্রয় নেয় নূতন ভোগের সামগ্রী উৎপাদনে। এই প্রকারে নিত্য নূতন অভাব-বোধ আমাদের মধ্যে প্রতিদিনই জেগে উঠছে। পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিশ্লেষণে এইটেই আমরা বেশী অনুভব করি। সেখানকার বস্তুগত উন্নতির সীমা নেই; কিন্তু তা আরামের সংগে সংগে সামাজিক অশান্তি এনে দিয়েছে।

গান্ধীজির বিকেন্দ্রীকরণ নীতির পেছনে বেকার সমস্যার সমাধান ছিল; কিন্তু এর প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষের হৃদয় ও দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন। বিকেন্দ্রীকরণ নীতি কেবল যে মানুষকে আসক্ত বা ভ্রম-বিমূঢ়তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তা নয়; এটা তাকে যথার্থ স্বাধীনতার সুযোগ দান করবে, সরল সংযত জীবনের প্রশান্তি তার জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে। সংযম ও ত্যাগের মধ্যে যে শান্তি ও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়, তা সমাজ-বিবর্তনের একটা প্রয়োজনীয় অংগ। মানুষ যদি শান্ত ও সংযত হয়, সমাজে তখন শান্তি আসবেই। এবং এই সামাজিক শান্তি গান্ধীজির সমাজ-ব্যবস্থায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গান্ধীজির approach ছিল অংশ থেকে সমগ্রে। সমাজের অংশ মানুষকে পরিবর্তন করে—সমাজে শান্তি আসবে, অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে, অবসান হবে ভিন্নমুখী স্বার্থের প্রতিক্রিয়ার।

পৃথিবীর সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের সমস্যা আছে। আবার সেই সমস্যা বিভিন্ন স্বার্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। সব ক্ষেত্রেই যে সমস্যার সমাধান মাত্র একটি, একথা বলা যায় না। তবে অন্ততঃ একটা বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি। যে কোনো মতবাদকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, মানুষের প্রাধান্য সমাজ-সংস্থার ওপরে থাকবেই। ওপর থেকে কোনো সমাজ-ব্যবস্থা জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিলে সেটা কখনোই স্থির হতে পারে না, যদি না তারা সেই সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্রের spirit না থাকে, তাহলে দেশে যথার্থ গণতন্ত্র আসতে পারে না। সহনশীলতার অভাবে, উৎসাহের অভাবে, নিরপেক্ষ বিচার-শক্তির অভাবে গণতন্ত্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা একটা প্রহসন হয়ে ওঠে। সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় এই কথাই প্রযোজ্য। দেশের মধ্যে হঠাৎ বিপ্লব এনে যে অর্থ-নৈতিক সাম্য আনা হয়, তা চিরস্থায়ী হতে পারে না, যদি না জনসাধারণের প্রত্যেকে তাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা আইনের সূক্ষ্ম সূত্রকেও পরাজিত করে দেয়। এসব ক্ষেত্রে সমাজ-বিপ্লব ওপর থেকে আনা ব্যর্থ হবে। গান্ধীজি তাই বলেছেন মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের কথা। কেননা, সেটা ছাড়া তাঁর অহিংসাবাদ যথার্থ সাফল্যলাভ করতে পারে না। অহিংসাবাদের প্রতিষ্ঠা ভ্রাতৃত্ব, প্রেম ও সহনশীলতার উপর। ব্যষ্টিক সম্পর্কটাই সেখানে বড় কথা। সমাজ-সংস্থা পরিবর্তন করে সমাজের মধ্যে অহিংসাবাদের প্রয়োগের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্তন আইন কিংবা রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে আসতে পারে না। ব্যষ্টিগতভাবে মানুষই সেখানে প্রধান অভিনেতা।

গান্ধীজির সমাজ বিপ্লবের পথ বিলম্ব, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের পথ। মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা সোজা কথা নয়। তার জন্যে চাই ত্যাগের উদারতা, আত্মবিশ্বাসের মহত্ত্ব।—মানুষের সদ্‌বৃত্তির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই সেখানে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। একদিনে কিংবা হঠাৎ সে জিনিষ আসবার নয়। "We are not content to remain what we are.···We, therefore, go on saying 'not this, not this' and continually try to press forward."

কেন্দ্রীয়-সরকার ও পশ্চিম বঙ্গের দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

কোন বৈষয়িক পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে কিনা সেটা কেবলমাত্র ব্যয় বরাদ্দ থেকে বুঝা যায় না। তা ছাড়া খরচের পরিমাণের উপরও কোন পরিকল্পনার সাফল্য এবং সার্থকতা নির্ভর করে না। পরিকল্পনার সাফল্য এবং সার্থকতার প্রধান দুটো মাপকাঠি হল রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি ও সংহতি, এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান। আমরা সে পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন সার্থক বলে বিবেচনা করব যে পরিকল্পনা রূপায়িত হবার ফলে রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক ভিত্তির দৃঢ়তা সম্ভবপর হয়েছে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যসরকার পশ্চিম বঙ্গের দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে প্রাথমিক খসড়া তৈরী করেছিলেন সে খসড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের অনেকেরই হয়ত মনে আছে। সে খসড়ায় দেখান হয়েছিল—পাঁচ বছরে মোট চার শত তেষট্টি কোটি টাকা বৈষয়িক পরিকল্পনার জন্য ব্যয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারকে এক শত তের কোটি টাকা দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার যখন রাজ্যের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়া তৈরী করেন, তখন এই টাকা বাদ দিয়ে মোট খরচের হিসাব করা হয়েছিল। কিন্তু খসড়াটি যখন পুনরায় পরীক্ষা করা হল তখন রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, চার শত তেষট্টি কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের জন্য মঞ্জুরী চাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ অত টাকা ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করার মত সঙ্গতি কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। তাই শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যসরকার পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খরচ বাবদ তিন শত বাইশ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। অর্থাৎ প্রাথমিক খসড়ায় উল্লিখিত চার শত তেষট্টি কোটি টাকা থেকে এক শত একচল্লিশ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যসরকার বলেছেন, পাঁচ বছরে সরকারের পক্ষে কয়েকটা নির্দিষ্ট সূত্র থেকে নব্বই কোটি টাকা তোলা কষ্টকর হবে না। রাজ্য সরকার চারটি সূত্রের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রথম সূত্র হল করবৃদ্ধি। ঋণকে দ্বিতীয় সূত্র বলা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ রাজ্য সরকার আশা কচ্ছেন, জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবেন। চতুর্থতঃ আমরা দেখেছি, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়টুকুর মধ্যে নানা রকমের কাজ সম্পাদিত হয়েছে। রাজ্য সরকার মনে করেন, এই সব কাজ থেকে অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা আছে।

জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো থেকে পশ্চিম বঙ্গের গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা এবং আরো কয়েকটা বিষয়কে কেন্দ্রীয় সরকার আলাদা করে বিবেচনা কচ্ছেন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এই মর্মে সুপারিশ করেছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের হাতে কতকগুলো কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ কোলকাতার উপকণ্ঠে লবণাক্ত জলা উদ্ধার, কোলকাতায় ময়লা থেকে গ্যাস তৈরী করা এবং দুর্গাপুরে কোক চুল্লীর কথা বলা যেতে পারে। এই ধরণের কাজগুলো দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হোক, এটা কেন্দ্রীয় সরকার চান্ না।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে ডাঃ রায় যা বলেছেন তা থেকে মনে হচ্ছে, পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম বাংলার প্রয়োজন এবং দাবীর গুরুত্ব কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরে তৃতীয় ইস্পাত কারখানা স্থাপন করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এছাড়া পশ্চিম বঙ্গ কর্তৃক উত্থাপিত কয়েকটা প্রস্তাব যত্ন সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ পাঁচটি প্রধান প্রস্তাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম প্রস্তাবের কথা আমরা আগেই বলেছি। সেটা হল গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা সম্বন্ধে। নিজের খরচে এবং তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনার কাজ দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনার আমলেই সুরু করবেন বলে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সহরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবটিও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে দেখ্‌বেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই মর্ম্মে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল যে, সুন্দরবনের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব কেন্দ্রীয় সরকার উপলব্ধি করেছেন। শুধু তাই নয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটিও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিবেচিত হবার আশা আছে বলে জানা গিয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চায়েৎ গঠনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে চতুর্থ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, পঞ্চায়েৎ গঠন করতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন হবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য না পেলে 'পঞ্চায়েৎ গঠন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করবেন কিনা—কিম্বা কতটুকু অর্থসাহায্য করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হবে সেটা এখনও পর্য্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। তবে অর্থ সাহায্যের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পঞ্চম প্রস্তাবটি করা হয়েছে চিনিকল স্থাপন সম্পর্কে। জানা গিয়েছে, চিনিকল স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা সেটা কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষা করে দেখ্‌বেন। এখন লক্ষ্য করবার বিষয় হল, প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার কি ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং পশ্চিম বাংলার জনমতকে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত সন্তুষ্ট করতে পারবে কিনা। ইতিমধ্যে প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ, পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য দুইশত সাড়ে চুয়াত্তর কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে। অবশ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে সে ব্যয়বরাদ্দও এর মধ্যে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যে সব প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সব প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবগুলো কার্যকরী করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিনা।

প্রকাশিত খবরে প্রকাশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট কেন্দ্রীয় সরকার দশ কোটি টাকা ঋণ দিতে রাজী আছেন। প্রশ্ন হতে পারে, কোন্ নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ঋণ দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র সমবায় ব্যবস্থা, কৃষিপণ্য বিক্রয় সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, সার বিতরণ ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন কাজে এই ঋণ ব্যবহার করা যাবে না। এখানে মনে রাখা দরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কীয় নিজের প্রাথমিক খসড়া পুনরায় পরীক্ষা করে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার এই ধরণের কাজের জন্য মোট সাতাত্তর কোটি টাকার এবং বাকী রাজ্যগুলোর জন্য মোট দুইশত পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ নির্দ্ধারণ করেছিলেন। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, দুইশত পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মাত্র একশত পঞ্চান্ন কোটী টাকা অনুমোদিত হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, কেন পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমিত দুইশত পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা অনুমোদন করতে পারলেন না। পরিকল্পনা কমিশন বল্‌ছেন, প্রধানতঃ দুটো কারণে পশ্চিম বঙ্গের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটান সম্ভবপর হবে না। প্রথম কারণ হল এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসঙ্গতি বিভিন্ন রাজ্যের চাহিদার অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসঙ্গতি আশানুরূপ হবে কিনা সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

স্মরণ থাকতে পারে, পশ্চিম বাংলার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল খসড়ায় বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র উনসত্তর কোটি কিন্তু পরিকল্পনার কাজ যখন সুরু হল তখন কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পারলেন, প্রয়োজনের তুলনায় ব্যয় বরাদ্দ খুব কমই হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ চড়িয়ে দেওয়া পরিকল্পনা কমিশন যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। তবে, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক রচিত খসড়ায় কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সূত্র থেকে পাঁচ বছরে নব্বই কোটি টাকা তোলা সম্ভবপর বলে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে সে অভিমতের পিছনে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি আছে বলে পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন না। পরিকল্পনা কমিশনের ধারণা, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার সাড়ে উনত্রিশ কোটি টাকার বেশী তুলতে পারলেন না। শুধু তাই নয়। পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন, সাড়ে উনত্রিশ কোটি টাকার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারকে সাড়ে ছয় কোটি টাকা পশ্চিম-বঙ্গ উন্নয়ন কমিশনের জন্য আলাদা করে রাখতে হবে। বাকী রইল তেইশ কোটি টাকা। এই টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কাজের জন্য খরচ করা হবে। আমরা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত একশত পঞ্চান্ন কোটি টাকার কথা আগেই বলেছি, এই টাকা থেকে যদি তেইশ কোটি টাকা বাদ দেওয়া হয় তাহলে বাকী থাকবে একশত বত্রিশ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের মতানুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার এই একশত বত্রিশ কোটি টাকা সাহায্য লাভ করবেন। মোটামুটিভাবে হিসাব করে দেখা গিয়েছে, দ্বিতীয় পাঁচ বছরের জন্য পশ্চিম বঙ্গে তিনশত পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা লগ্নী করা হবে। অবশ্য এই টাকা কেবলমাত্র দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজের জন্য লগ্নী হবে না। গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা, পশ্চিম বঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত দায়িত্ব, এবং অন্যান্য কয়েকটা কাজ বাবদ টাকাও তিনশত পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে ধরা হয়েছে। তাছাড়া শোনা যাচ্ছে, দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার জন্য অতিরিক্ত একশত পনের কোটি টাকা খরচ করা হবে। আশা করা যাচ্ছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে দামোদর উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো শিল্প গড়ে উঠবে। এছাড়া দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা এবং কোকচুল্লী ক্রমশঃ শিল্পের প্রসার সম্ভবপর করে তুলবে বলে অর্থনীতিবিদ্‌রা অভিমত প্রকাশ করেছেন। মোট কথা হল এই যে, যদি দ্বিতীয় পাঁচ বছরের মধ্যে বৃহৎ, মাঝারি, এবং ছোট শিল্প অনুরূপভাবে প্রসারিত হয় তাহলে দুদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লাভবান হবেন। প্রথমতঃ কর্ম্মসংস্থান সমস্যার

সমাধান সহজ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসাবাণিজ্য এবং লেনদেনের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের হাতে যথেষ্ট সুযোগ এসে পড়বে।

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলছেন, সাড়ে উনত্রিশ কোটি টাকার বেশী রাজ্য সরকার তুলতে পারবেন না বলে পরিকল্পনা কমিশন যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সে অভিমত তিনি মেনে নিতে রাজী নন। তাঁর আশা, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার নিজের চেষ্টায় মোট ৮৯॥ কোটি টাকা তুলতে সমর্থ হবেন। অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে যে টাকা তোলা সম্ভবপর বলে পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন সে টাকার চাইতে আরো ষাট কোটি টাকা বেশী পশ্চিম বঙ্গ নিজের চেষ্টায় তুলতে পারবেন বলে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমাদের মনে হচ্ছে, সত্যিই যদি পশ্চিম বঙ্গ নিজের চেষ্টায় মোট ৮৯॥ কোটী টাকা তুলতে পারেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বৈষয়িক পরিকল্পনার পরিধি বিস্তার করবার জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করা হবে। তবে যেহেতু আপাততঃ আমাদের পক্ষে পরিকল্পনা কমিশনের অভিমতের উপর সবচাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া উপায় নেই সেহেতু আমাদের মনে হচ্ছে, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের অর্থসঙ্গতি ততটা বাড়েনি। কাজেই, যদি রাজ্য সরকারকে বৈষয়িক পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তাহলে সরকার ঋণের হাত থেকে রেহাই পাবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া ইতিমধ্যে সরকার ঋণের জন্য নানাভাবে চেষ্টা কচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যখন "বঙ্গদর্শন" সম্পাদন করেন, সেই সময় যে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেন, তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় অন্যতম। চন্দ্রশেখর সুললিত ছন্দময় এক নতুন গদ্যরচনা রীতির প্রবর্ত্তন করেন। এই গদ্যে তিনি তাঁর "উদভ্রান্তপ্রেম" গদ্যকাব্য রচনা করেন। 'উদভ্রান্তপ্রেম' বাঙলা সাহিত্যের একখানি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। এ বাঙলা সাহিত্যে নতুন জিনিস ; এর পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্যে এ রকম কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। এই একটিমাত্র গ্রন্থের জোরে চন্দ্রশেখর বাঙলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

চন্দ্রশেখরের জন্ম হয় মাতুলালয়ে ১২৫৬ সালে ১২ই কার্ত্তিক। তাঁদের আদি বাসস্থান নদীয়া জেলায়। তাঁর পিতার নাম বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখরের পিতামহ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেশমের ব্যবসায়ী ছিলেন। কলকাতায় ও মুর্শিদাবাদে তাঁর কুঠি ছিল। চন্দ্রশেখরের পিতা বিশ্বেশ্বর খাগড়ায় থেকে পিতৃদেবের ব্যবসা দেখাশোনা করতেন।

বিশ্বেরের ইচ্ছা ছিল পুত্র চন্দ্রশেখরকে ইংরেজী শিক্ষা দেন। কিন্তু পিতা রামচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি পৌত্র চন্দ্রশেখরকে খাগড়ার পণ্ডিত ঠাকুরদাস বিদ্যারত্নের টোলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি করে দেন। তখন চন্দ্রশেখরের বয়স আট বছর। কয়েক বছর পর টোলের পাঠ শেষ হলে বিশ্বেশ্বর পুত্র চন্দ্রশেখরকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। এই স্কুল থেকেই চন্দ্রশেখর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাসময়ে তিনি এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁদের ব্যবসায় ভীষণ আর্থিক ক্ষতি হয়। তাঁদের অবস্থা এমনি খারাপ হয়ে যায় যে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চন্দ্রশেখরকে চাকুরীর সন্ধান করতে হয়। তিনি বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ওই চাকুরী ছেড়ে দেন এবং রাজসাহীর পুঁটিয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

পুঁটিয়ায় অবস্থান কালে চন্দ্রশেখর আইন পরীক্ষা দেন এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে তিনি বহরমপুর জজ-কোর্টে ওকালতি সুরু করেন। এখানে ওকালতি ব্যবসায় তেমনি পসার করতে না পেরে তিনি কলকাতায় আসেন, এবং হাইকোর্টে ওকালতি করতে থাকেন। এখানেও তিনি ওকালতি ব্যবসায় তেমন উপার্জ্জন করতে সক্ষম হন নি। শেষে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ষ্টেটে ম্যানেজারের চাকুরী গ্রহণ করেন।

বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে শ্রীকৃষ্ণ দাস চন্দ্রশেখরের সহপাঠী ছিলেন। সাহিত্যরসিক শ্রীকৃষ্ণ দাসের সহিত তাঁর বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালে শ্রীকৃষ্ণদাস যখন "জ্ঞানাঙ্কুর" (আশ্বিন ১২৭২) সম্পাদনা করেন, সেই সময় বন্ধু চন্দ্রশেখরকে "জ্ঞানাঙ্কুরে" লেখার জন্য অনুরোধ করেন। চন্দ্রশেখর "জ্ঞানাঙ্কুরে" ডিসরেলির Curiocities of Literature অবলম্বনে "বিদ্যা বিড়ম্বনা" নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এই তরুণ লেখকের সহিত পরিচিত হতে চান। বহরমপুরের কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয় চন্দ্রশেখরকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নিয়ে যান। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। আলাপ আলোচনা কালে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে উৎসাহিত করে বলেন, যে

তিনি "বঙ্গদর্শনে" লিখলে তা প্রকাশ করা হবে। এতে তরুণ লেখক চন্দ্রশেখর যথেষ্ট উৎসাহিত হন এবং "বঙ্গদর্শনে" কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন।

পাঠ্যাবস্থায় চন্দ্রশেখর "কমলাকান্তের দপ্তরে"র মত "মসলা বাঁধা কাগজ" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে এটি "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই অপূর্ব্ব রস-রচনাটি সে যুগে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করে। চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় গ্রন্থ "কুন্তলতার মনের কথা" উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি নরনারীর প্রকৃতি, অধিকার-ভেদ ও স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

রাজসাহীর পুঁটিয়ায় অবস্থান কালে চন্দ্রশেখরের প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করেন। পত্নী বিয়োগের পর তিনি তাঁর বিখ্যাত গদ্যকাব্য "উদভ্রান্ত প্রেম" রচনা করেন। গ্রন্থটির রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন, "তখন শোকাবেগে আপনার তৃপ্তির জন্য আপনি লিখিতাম। প্রথম প্রবন্ধটি বহরমপুরে, দ্বিতীয়টি কলিকাতায়, তৃতীয়টি ও আর কয়েকটি পুঁটিয়ায় লিখিত হয়। তখন আমি পুঁটিয়ার স্কুলের মাষ্টারী করি। ছুটির সময় বহরমপুরে আসিতে হইলে রাজসাহীর পথে আসিতে হইত। আসিবার সময়ে আমি শ্রীকৃষ্ণদাসের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসিতাম। সেবার সেই রচনার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিবার জন্য খাতাখানি রাখিয়া দিলেন। আমি বহরমপুরে আসিলাম। ইহার পরই শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতায় হরিশচন্দ্র শর্ম্মার ছাপাখানায় যোগ দেন। তিনি খাতাটি কলিকাতায় লইয়া যান। কিছুকাল পরে তিনি আমাকে লিখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একদিন ছাপাখানায় যাইয়া কোন রচনা তাঁহার কাছে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীকৃষ্ণ আমার রচনার কথা বলেন। রচনাগুলি পাঠ করিয়া তিনি "শ্মশানে" নামক প্রবন্ধটি "বঙ্গদর্শনে"—প্রকাশের জন্য লইয়া গিয়াছেন। আমাকে না জানাইয়া প্রবন্ধ দেওয়া সঙ্গত কিনা, শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায়—বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তিনি প্রবন্ধ লইয়া গিয়াছেন শুনিলে আমি বোধ হয় আর প্রবন্ধ দিতে অস্বীকার করিব না। আমি সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার কয়দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ লিখিলেন, তিনি রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন--তবে পুস্তকখানি বড় স্বল্পায়তন হইবে, সুতরাং একটু বাড়াইলে ভাল হয়; আর আমি যদি বাড়াইতে চাহি তবে যেন অতি শীঘ্র আর কিছু রচনা পাঠাই; কারণ পুস্তক ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। পত্র অপরাহ্নে পাইয়া রাত্রিতে "শয়ন মন্দিরে" লিখিতে বসি এবং পরদিন অপরাহ্নে উহা শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "উদভ্রান্ত প্রেম"—পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রশেখরের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইংরেজ কবি গ্রে যেমন একমাত্র 'এলেজী' কাব্য রচনা করে ইংরেজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন, তেমনি চন্দ্রশেখর একমাত্র—"উদভ্রান্তপ্রেম" গদ্য কাব্য রচনা করে অক্ষয় যশ অর্জ্জন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই গদ্যকাব্যটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন পছন্দ করতেন না। তিনি "পুরাতন প্রসঙ্গ-" এর লেখক বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন, "আমি এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে "উদভ্রান্তপ্রেমকে বঙ্কিমবাবু কেন ভাল বলিতেন।" "রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রশংসিত না হলেও "উদভ্রান্তপ্রেম" বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বাঙালী পাঠককে উদ্বেলিত করেছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর "মাসিক-সমালোচক" নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। তাঁর সুসম্পাদনায় পত্রিকাটি সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে—"সারস্বত কুঞ্জ" ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে "স্ত্রীচরিত্র" নামক চন্দ্রশেখরের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "সারস্বতকুঞ্জ" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে তিনি কবিওয়ালা রাম বসুর বিরহ সঙ্গীতের সমালোচনা করেন।

চন্দ্রশেখর কবিগান, যাত্রাগান, পাঁচালী গান প্রভৃতির ভয়ানক অনুরাগী ছিলেন। তিনি কবিওয়ালা হরু ঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গীর কবিগান, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা গান, দাশরথী রায়ের পাঁচালী ও নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্ত) টপ্পা গান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় এই সঙ্গীত সংগ্রহ "রস গ্রন্থাবলী" নামে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তকটির ভূমিকায় চন্দ্রশেখর এই সমস্ত প্রাচীন সঙ্গীতের যে আলোচনা করেছেন তা যেমন পণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী।

কলকাতায় অবস্থান কালে ওকালতি ব্যবসায় অর্থোপার্জ্জনে ব্যর্থ হয়ে যখন চন্দ্রশেখর ভীষণ আর্থিক কষ্ট ভোগ করছেন এবং নানা ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছেন সেই সময় উদারচেতা দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন এবং নিজে চন্দ্রশেখরের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তিনি চন্দ্রশেখরকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিতেন। এ ছাড়া চন্দ্রশেখরের অর্থ কষ্ট দূর করবার জন্য তিনি "উপাসনা" (১৩১১) নামে একটি নতুন মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এর সম্পাদনের ভার দেন চন্দ্রশেখরকে। চন্দ্রশেখর একাদিক্রমে নয় বছর "উপাসনা" সম্পাদন করেন। "উপাসনায়" তৎকালীন সকল বিখ্যাত লেখকের রচনা প্রকাশিত হত।

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত চন্দ্রশেখরেরও ধাতে ওকালতি সয়নি। তিনি সারা জীবন সাহিত্য সাধনায় অতিবাহিত করেন। তিনি "বঙ্গদর্শন", "জ্ঞানাঙ্কুর", "মাসিক সমালোচক", "সাহিত্য", "উপাসনা", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী" প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনের" তিনি সমালোচক ছিলেন। তিনি যে বিষয়েই লিখতেন, তা সরস ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠত। তাঁর রচনা রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল মনোরম। এই রচনা-বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। "বঙ্গদর্শনের" অনেক লেখকের রচনা তিনি সংশোধন করে প্রকাশ করতেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের রচনা সংশোধন দূরের কথা একটি শব্দও বদলাতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য শিষ্যবর্গের মত চন্দ্রশেখরও সুপণ্ডিত ছিলেন।

তিনি ওয়ালেসের সৃষ্টিবাদ, ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ, জন স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ, কোমতের প্রত্যক্ষবাদ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ প্রভৃতি অতি যত্নসহকারে অনুশীলন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে যেমন তাঁর অধিকার ছিল, তেমনি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রেও তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। ইংরেজী সাহিত্যের মত ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় কম ছিল না। ফরাসী ভাষার উপর তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। তিনি ফরাসী ভাষায় রচিত ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনাবলীপাঠ করলে তাঁর এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুলেখক ও সুপণ্ডিত চন্দ্রশেখর যে একজন সুগায়ক ছিলেন তা শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয়। তাঁর কণ্ঠ যেমন ছিল সুমধুর, তেমনি সুর, তান, লয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রভূত। তিনি কীর্ত্তন, খেয়াল, গজল, টপ্পা প্রভৃতি সব রকম গানই গাইতেন। তবে তিনি নিধুবাবুর টপ্পার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নিধুবাবুর মত তিনি কতকগুলি টপ্পা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

শেষ জীবনে চন্দ্রশেখর "উপাসনা" পত্রে "বিবাহের উৎপত্তি ও ইতিহাস" সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করছিলেন। কিন্তু গ্রন্থটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রেও তিনি এ বিষয়ে "যৌন নির্ব্বাচন", "রাক্ষস বিবাহ", "কৌমার", "একনিষ্ঠ বিবাহ", "যৌন-সম্মেলন", "অপরাধ তত্ত্ব" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে যৌন বিষয়ক রচনায় যাঁরা প্রথম অগ্রসর হন চন্দ্রশেখর তাদের অন্যতম ও প্রধান।

চন্দ্রশেখর সরল, সহৃদয় ও উদার ছিলেন। সারা জীবন তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তথাপি তাঁর স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা ও হৃদয়মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়নি কোন দিন। তাঁর সন্তান ছিল না। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর থেকেই সংসারের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। সাহিত্য সাধনাই তাঁর একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা ছিল; সাহিত্য সেবার মধ্যেই তিনি সারা জীবন সুখের সন্ধান করে গিয়েছেন। তাই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি লেখনী ত্যাগ করেন নি।

১৩২৯ সালের ২রা কার্ত্তিক ৭৩ বছর বয়সে তিনি পরলোক-গমন করেন। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর তীরে তাঁর নশ্বর দেহ বিলীন হয়ে যায়।

বাঙলা সাহিত্যে চন্দ্রশেখরের দান কম নয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "চন্দ্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের কেমন পুরুষ ছিলেন আধুনিক যুবজন জানে না—বুঝিবা তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টাও করে না। চন্দ্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন ঋষি বা স্রষ্টা প্রবর্ত্তক ছিলেন। গদ্যে পদ্যের ভাব ও রসোল্লাস, মাধুরী ও রচনাচাতুরী তিনি প্রথমে আমদানী করেন। তাঁহার "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" গদ্যে একখানি মহাকাব্য—অপূর্ব্ব, অতুল এবং অদ্বিতীয়। উহা আর হইবে না, বুঝিবা হইবার নহে। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমযুগের একজন সন্দর্ভকার ছিলেন। এত প্রবন্ধ নিবন্ধ আর কেহ লেখে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন—চন্দ্রশেখরের লেখায় কলম গলিবার যো নাই। সে এমন সাজাইয়া গোছাইয়া লিখে, এমন ওজন করিয়া শব্দ চয়ন করে যে একটি শব্দও বদলাইবার অবসর থাকে না। চন্দ্রশেখরের গদ্য সত্যই অতুল ও অনুপম ছিল।"

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

রামায়ণ

রামায়ণ মহর্ষি বাল্মীকির রচিত। ইহাতে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের কাহিনী বর্ণিত হইলেও, প্রধানতঃ রামের জীবন চরিত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে আদি ও উত্তরা কাণ্ড বাল্মীকির রচিত কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কাণ্ডে রামকে আদর্শ মানবরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার অবতারত্বের কথা নাই। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে।

রামায়ণে বৈদিক দেবতাদিগের সঙ্গে কয়েকটি নূতন দেবতার নাম পাওয়া যায়। গঙ্গা, লক্ষ্মী, উমা ও কার্ত্তিকেয়, এই নূতন দেবতাদিগের অন্তর্গত। বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে সর্প, নদী ও বৃক্ষের উপাসনার কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। শক্ যবন ও পহ্লব জাতির উল্লেখও আছে।

চিত্রকূট পর্ব্বতে রাম্ যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভরত তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহুলোকের সহিত তথায় গমন করেন। জাবালি নামক এক ব্রাহ্মণ তখন পিতার সত্য পালনের জন্য বনবাসের ক্লেশ সহ্য করা মূঢ়তা, ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে চার্বাক দর্শন তাহার নিকট ব্যাখ্যা করেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রামায়ণ রচনার পূর্ব্বেই চার্বাক দর্শন উদ্ভূত হইয়াছিল। রামায়ণে বুদ্ধের নামও পাওয়া যায়। বুদ্ধ নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। মহাভারতে বুদ্ধের উল্লেখ নাই। (যদিও সৌগত ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন আছে। কিন্তু এই অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে) ইহা হইতে মহাভারতের পরে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যায়। কিন্তু রামায়ণে বর্ণিত ঘটনা মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর।

রামায়ণে দার্শনিক আলোচনা বিশেষ নাই। আর্য্যগণ যখন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করিতেছিলেন, তখনকার প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের গৌরব ব্যাখ্যাত হইয়াছে? কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

মনুসংহিতা

উপনিষদোত্তর যুগের আর এক গ্রন্থ মনুসংহিতা। ঋগ্বেদে এক মনুর উল্লেখ আছে। মনু মানবজাতির পিতা, তিনিই প্রথম যাজ্ঞিক। শতপথ ব্রাহ্মণেও মনুর উল্লেখ আছে। কাঠক সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে এই বচনটি পাওয়া যায়—"যৎ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ, তৎ ভেষজম্।"—মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। সুতরাং মনুপ্রণীত একখানা সংহিতা যে প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। সার উইলিয়ম জোনসের মতে ১২৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে মনুসংহিতার রচনা কাল। শ্লেগেল বলেন ১০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পরে এই গ্রন্থ রচিত, ইহা বলা যায় না। মনিয়ার উইলিয়মসের মতে ইহা খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের নিকটবর্ত্তী কালে রচিত। ওয়েবর বলেন ইহা মহাভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী কালে রচিত অংশেরও পরবর্ত্তী। মোক্ষ মুলারের মতে বর্ত্তমান মনুসংহিতা প্রাচীন সংহিতার ভিত্তির উপর রচিত। প্রাচীন সংহিতা ছিল গদ্যে রচিত। মনুসংহিতার ভাষা ও রচনাপ্রণালী হইতে ইহাকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সংহিতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত হইলেও প্রাচীন একখানা মনুসংহিতা যে ছিল, এবং বর্ত্তমান সংহিতা প্রাচীন সংহিতা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মহাভারতে আছে—পুরাণ সকল, মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ-বেদাঙ্গ ও চিকিৎসা শাস্ত্র ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনু-সংহিতাই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র। এই গ্রন্থ যে মনুর রচিত নহে, গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাহার প্রমাণ আছে। ঋষিগণ মনুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বর্ণের ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মনু প্রথমে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছিলেন "ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছি। ভৃগু আমার নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি ইহা তোমাদিগকে শুনাইবেন।" ইহার পরে যাহা আছে, তাহা ভৃগুবাক্য। গ্রন্থ শেষে এই শাস্ত্রকে "ভৃগু-প্রোক্ত মানব শাস্ত্র" বলা হইয়াছে। মনুসংহিতার টীকাকার গোবিন্দরাজ লিখিয়াছেন "এই গ্রন্থে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা অনাদি পরম্পরায় প্রাপ্ত যে সকল স্মার্ত্ত ধর্ম্ম, তাহাই কোনও ভৃগু শিষ্য বলিয়াছেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় ভৃগুও এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। তাঁহার কোন শিষ্যই ইহা রচনা করিয়াছেন।

এই ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা ব্যতীত "বৃদ্ধমনু" ও বৃহন্মনু" নামে প্রসিদ্ধ আরও এক বা দুইখানি ধর্ম্ম সংহিতা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। সেই গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি শ্লোক মাত্র অবশিষ্ট আছে। মহাভারতে, পুরাণে, ধর্ম্মসূত্রাদিতে বহু স্থানে মনুর নাম পাওয়া যায়। সুতরাং মনু নামে একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার যে ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মনুসংহিতায় প্রাচীন গ্রন্থের সার সংকলিত হইয়াছে, ইহাই সম্ভবপর।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যবন, শক, পাহ্লব, পহ্লব প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনেকে বর্ত্তমান মনুসংহিতা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পরে রচিত বলিয়া মনে করেন।

সে যাহা হউক গ্রন্থের প্রথমে যে সৃষ্টির বর্ণনা আছে, তাহা এইরূপ:

এই জগৎ প্রথমে "তমোভূত", অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় ছিল! যেন প্রসুপ্ত ছিল। তারপরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত বৃত্তৌজা (অব্যাহত সৃষ্টি সামর্থ্যসম্পন্ন) তমোনুদ (প্রকৃতির প্রেরক বা চালক) ভগবান মহাভূতাদি সহ মহাদাদি তত্ত্ব স্থূলরূপে ব্যক্ত করিয়া স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইলেন। যিনি অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য ছিলেন তিনি (মহদাদি কার্য্যরূপে) আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বীয় শরীর (প্রকৃতিরূপে পরিণত) হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া অভিধান (সংকল্প) করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে (আপন শক্তিরূপ) বীজ অর্পণ করিলেন। সেই বীজ সূর্য্যপ্রভা মণ্ডিত সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিতের ন্যায় একটি অণ্ড হইল। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহাতে শরীর গ্রহণ করিলেন। সেই অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং তাহার ঊর্দ্ধখণ্ড স্বর্গ এবং অপর খণ্ড পৃথিবী হইল এবং মধ্যভাগ আকাশ, অষ্ট দিক ও সমুদ্র হইল। পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা সৎ ও অসৎ স্বভাব মন ও অহংকার সৃষ্টি করিলেন। তাহার পূর্ব্বে মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে সত্ত্ব রজ-তমোগুণ যুক্ত অন্যান্য পদার্থ সৃষ্টি করিলেন।

এই সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে সাংখ্যের সৃষ্ট তত্ত্বের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাতে পরমাত্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত। নিরীশ্বর সাংখ্যের সহিত এইখানে প্রভেদ। সাংখ্য এখানে সেশ্বর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মনুসংহিতা প্রধানতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহাতে প্রাচীন আচার ও ব্যবহার সর্ব্বকালে পালনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্মকে ঈশ্বর সৃষ্ট বলা হইয়াছে, এবং বৈদিক যজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে। "সন্তানার্থে মানব এবং প্রজননার্থে স্ত্রী সৃষ্ট হইয়াছে।" "পুরুষ একলা নহে, ভার্য্যা, আপনি ও অপত্য এই তিনে মিলিয়া পুরুষ সংজ্ঞা হয়। পুরুষ একাকী অর্দ্ধেক—ভার্য্যাসহ সম্পূর্ণ হয়। যে ভর্ত্তা সেই স্ত্রী।" "দ্বিজতিবা বেদাধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তবে নরকে গমন করেন।" "যে দ্বিজাতিগণ প্রাণিমাত্রের কোনও ভয় উৎপাদন করেন না, তাহাদের দেহনাশ হইলে, কোনও ভয় থাকে না।" "ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি পরলোকে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে।" "পণ্ডিত লোকেরা কেহ অপকার করিলে প্রত্যপকার

না করিয়া ক্ষমা করেন।" এইরূপ যদি পাপকারী কোনও লোকে প্রকাশ করে "আমি অতি পাপী" তাহা হইলে অনুতাপ, তপস্যা ও অধ্যয়ন দ্বারা সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। "পাপ করিয়া কেহ যদি অনুতাপ করে, এবং আর পাপ করিব না, এইরূপ সংকল্প থাকে তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়।" ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে আছে—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতৎ চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।"

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি, ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। বেদ, স্মৃতি শিষ্টাচারের সঙ্গে নিজের তৃপ্তিকেও ধর্ম্মের নিয়ামক বলা হইয়াছে। বেদ স্মৃতি ও শিষ্টাচার অনুমোদিত হইলেও কোনও কর্ম্ম হইতে যদি আত্মতুষ্টি না হয়, অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মবিবেক যদি তাহা অনুমোদন না করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্ম নহে। যজ্ঞে পশুবধের বিধি থাকিলেও যদি তাহা কাহারও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী হয়, তাহা হইলে পশুবলি তাহার কর্ত্তব্য নহে। ইহা দ্বারা সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন মনুসংহিতায় একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব খ্যাপিত হইয়াছে, তেমনি নিম্ন স্তরের জাতিদিগের প্রতি একটা অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ্যেরই গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হইলেও যদি কেহ ব্রাহ্মণ্য বর্জিত হয়, তাহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে। মনুসংহিতায় আছে "কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন বস্তুতঃ হস্তীও নহে, মৃগও নহে, তাহারা কেবল নামেই হস্তী বা মৃগ, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ হইয়া বেদাধ্যয়ন করে না, সেও নামমাত্রই ব্রাহ্মণ (২।১৬৮)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে বেদের রক্ষার ভার ব্রাহ্মণের উপরই ন্যস্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর্য্য সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। অর্থ সঞ্চয়ের দ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষণ ও পোষণের জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই ব্রাহ্মণের রক্ষণের জন্য কর্ত্তব্যানুযায়ী ব্রাহ্মণের প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য বিশেষ ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ অসদাচারী ব্রাহ্মণের নির্ব্বাসনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের একটা অংশ। ইহা আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি। ইহা শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত না হইলেও এবং স্মৃতি বলিয়া গণ্য হইলেও সর্ব্ব উপনিষৎই ইহার ভিত্তি। ইহার মাহাত্ম্য অপরিসীম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সর্ব্বোপনিষদঃ গাবঃ দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ ॥
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

সর্ব্ব উপনিষৎ গাভী। অর্জ্জুন বৎস। শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধা, উপনিষৎ দোহন করিয়া তিনি যে দুগ্ধ বাহির করিয়াছেন, তাহাই গীতারূপ অমৃত, সুধিগণ সেই অমৃত পান করেন। ইহা কেবল বৈষ্ণব দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই ইহার প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধকালে ইহা সর্ব্বত্র পঠিত হইয়া থাকে। শ্রুতি না হইলেও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ইহা "গীতোপনিষৎ" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত। যুদ্ধ যখন আরব্ধ হইয়াছে, শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইয়াছে তখন অর্জ্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত দর্শন, নীতি ও ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা অনেকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণের মতে মহাভারতের রচনাকাল হইতেই গীতা তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। মহাভারত ও গীতার রচনা শৈলীর মধ্যে যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেও গীতা ও মহাভারত একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য দর্শন সম্বন্ধেও মহাভারত ও গীতায় একই মত ব্যক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম যে অকর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর তাহা উভয়ত্রই বলা হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে উভয়ের একই মত। সৃষ্টির ক্রম, একই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগ দর্শনের বর্ণনাও একরূপ। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে দার্শনিক আলোচনা সংগতিবিহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহাও সত্য যে যুদ্ধের মত সংকট কালেই চিন্তাশীল লোকের মনে "চরম মূল্য" (ultimate values) সম্বন্ধে চিন্তার উদয় হয়। কেবল তখনই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মনে এমন টান পড়ে যে ইন্দ্রিয়ের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহা জগতের অন্তরস্থ চরম সত্তার সম্মুখীন হয়। ইহা সম্ভবপর যে অর্জ্জুন কৃষ্ণের নিকট হইতে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই কবি সাতশত শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। মহাভারতকার সুযোগ পাইলেই ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। গীতাতে তিনি সেই সুযোগের ব্যবহার করিয়াছেন।"

গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মহাভারতে বিভিন্ন কালের রচনা একত্রিত হইয়াছে। তেলাংএর মতে ইহা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। ভাণ্ডারকারের মতে ইহা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত নহে। গার্বের মতে ইহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। কিন্তু বোধায়নের গৃহ্যসূত্রে ভগবানের কথিত বলিয়া এক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত বলিয়া মনে হয়। আপস্তম্বের কাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইলে বোধায়নের কাল খৃঃ পূঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতক। সুতরাং গীতাকে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের রচনাকাল মনে করিলে ভুল হইবে না।

গীতার পটভূমি

কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ কুরুক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান। শ্রীকৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন উভয় সেনাদল পরিদর্শনের জন্য বাহির হইয়াছেন। উভয় সেনা-বাহিনী হইতে শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি বাদিত হইতেছে। অর্জ্জুন উভয় সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধে উদ্যত আত্মীয়গণকে

দেখিতে পাইলেন। যুদ্ধে তাহাদিগের অনেকেই হত হইবেন। বিপক্ষ দলভুক্ত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরু ও স্বজনদিগকে বধ না করিয়া রাজ্যলাভ সম্ভবপর হইবে না। মনে হইল এই ভীষণ মূল্যের বিনিময়ে যে রাজ্য-লাভ হইবে, তাহার মূল্য কি? তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, মুখ শুকাইয়া গেল, গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "আমি জয় চাহি না, রাজ্য চাহি না, সুখ চাহি না। আমি যুদ্ধ করিব না।" ইহাই গীতার আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণ তখন নানা যুক্তি দ্বারা অর্জ্জুনের মনের সংশয় দূরীভূত করিয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। এই উপলক্ষে তিনি ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কেবল হিন্দু সমাজে নহে জগতের সর্ব্বত্র অতি সমাদরের সহিত তাহা গৃহীত হইয়াছে। আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ তাহা লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছে, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়াছে, দর্শনের গহনারণ্যে পথভ্রষ্টদিগকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

গীতার মর্ম্ম

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্য বা জ্ঞান যোগ। এই দুই অধ্যায়ে আত্মা যে অবিনশ্বর, তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই, ইহা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। লোকে জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া যেমন নূতন বাস পরিধান করে, তেমনি দেহী জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধে যদি লোক হত্যা করিতে হয়, তাহার জন্য শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। কেন না আত্মা কখনও হত হয় না। বেদ ত্রিগুণবিষয়াত্মক। বৈদিক যজ্ঞ ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু স্বর্গের উপরেও প্রাপ্তব্য আছে। যিনি তাহা জানেন বেদে তাহার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মেতে লোকের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে নাই। নিষ্কাম ভাবে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া, কর্ম্মের ফল কামনা না করিয়া যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার কোনও ফল উৎপন্ন হয় না। সমত্বই যোগ। যে কৌশলে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় না, কর্ম্মে সেই কৌশলই যোগ। যিনি সকল কামনা ত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকেন, তিনি স্থিত-প্রজ্ঞ। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞই মুনি। যিনি সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহংকার ভাবে বিচরণ করেন তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। এই ব্রাহ্মী স্থিতিবান অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্ম্মযোগ। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে শরীররক্ষাই হয় না। কর্ম্ম না করিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের চিন্তা করে, সে মিথ্যাচারী। যিনি আত্ম-রতি, আত্মতৃপ্ত, তাহার করণীয় কোনও কার্য্য নাই। অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ লোকে যাহা করে ইতর জনে তাহার অনুকরণ করে। শ্রেষ্ঠ লোকে যদি কর্ম্ম না করে, ইতর লোকেও কর্ম্ম করিবে না। সুতরাং "লোক সংগ্রহের" জন্যও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনাসক্ত ভাবে ফল কামনা না করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "আমি পূর্ব্বে বিবস্বানকে এই জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম। বিবস্বান মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। রাজর্ষিরা এই যোগের কথা জানিতেন। কিন্তু কালে তাহা নষ্ট হইয়াছে। অর্জ্জুন তুমি আমার ভক্ত, আমার সখা, তাই তোমাকে সেই যোগ আমি বলিলাম। আমি অজ, অব্যয়াত্মা, ভূতদিগের ঈশ্বর হইলেও নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার মায়াবলে আবির্ভূত হই। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে (মানবরূপে) আবির্ভূত হই। যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করুক না কেন, আমি তাহাকে তাহার অভিলাষিত ফল দান করি। যে ভাবেই করুক না কেন, সকলে আমাকেই ভজনা করে। দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়। অখিল কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।

পঞ্চম অধ্যায় কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ ও ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যান যোগ। সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) ও কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স্কর। কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগে কোনও ভেদ নাই। উভয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করিলেই উভয়ের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে যে কর্ম্ম করে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না। যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্ব্বলোক মহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ভগবানকে জানিয়া লোকে শান্তি প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মফল কামনা না করিয়া যে করণীয় কর্ম্ম করে, তাহাকেই সন্ন্যাসী বলে। যোগীও তাহাকেই বলে—যে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে বলে না। যাহা সন্ন্যাস তাহাই যোগ (কর্ম্মযোগ)। কামনা ত্যাগ না করিয়া কেহ যোগী হয় না। যোগারোহণে ইচ্ছুক যিনি, তাহার সাধন কর্ম্ম, আর যিনি যোগে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহার সাধন শম বা শান্তি।

ধ্যান যোগ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

যোগী নির্জ্জনে একাকী আকাঙ্ক্ষাহীন, পরিগ্রহশূন্য, সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ হইয়া মনকে সমাহিত করিবেন। পবিত্র স্থানে আসন স্থাপন করিবেন—আসন অতি উচ্চ অথবা অতি নীচ হইবে না। প্রথমে কুশ, তাহার উপরে অজিন, তাহার উপর বস্ত্র পাতিয়া আসন রচনা করিতে হইবে। আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সংযত করিয়া একাগ্র মনে আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করিবেন। দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সমস্ত অচল ভাবে ধারণ করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ করিবেন। প্রশান্তচিত্ত, ভয়রহিত, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অবস্থিত যোগী সংযত মনে ভগবানে চিত্ত স্থির করিয়া তাঁহাতেই আপনাকে ঢালিয়া দিবেন। সংযতমনা যোগী এই ভাবে মনঃসমাধান করিয়া ভগবানের মধ্যে যে নির্ব্বাণ-ফল শান্তি আছে,

তাহা প্রাপ্ত হন। যে অতিরিক্ত অথবা অতি অল্প আহার করে, যে অতিরিক্ত নিদ্রাবশ অথবা অতিরিক্ত জাগরণশীল, তাহার যোগ আরম্ভ হয় না। নির্বাত প্রদেশে স্থিত নিশ্চল দীপশিখার মতো যতচিত্ত যোগীর চিত্ত নিশ্চল থাকে। যে অবস্থায় যোগ—সেবাদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত বিনষ্টপ্রায় হয় এবং আত্মা আপনি আপনাকে দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় আত্যান্তিক সুখের অনুভব হয় এবং আত্মা স্ব-ভাব হইতে বিচলিত হয় না, যাহা লাভ করিয়া অপর কোনও লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিক মনে হয় না, যাহাতে অবস্থিত চিত্ত গুরু দুঃখেও বিচলিত হয় না, তাহাই দুঃখ-সংযোগরহিত যোগ। নির্ব্বেদরহিত (ইষ্ট-সিদ্ধিতে বিলম্বহেতু যে চেষ্টাশৈথিল্য, তাহাই নির্বেদ) চিত্তে স্থিরবিশ্বাসে যোগ সাধন করিবে। ধৈর্য্যশালিনী বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ সমস্ত বিষয় হইতে উপরত হইবে। আত্মাতে মন স্থির রাখিবে এবং কোনো বিষয় চিন্তা করিবে না।

যোগ আরম্ভ করিয়া যদি কেহ যোগভ্রষ্ট হয়, তাহার কি গতি হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "কল্যাণ কৃৎএর কখনও দুর্গতি হয় না। যোগভ্রষ্ট বহুদিন যাবৎ স্বর্গে বাস করিয়া পরে শুচি ও শ্রীমান্ লোকের গৃহে, অথবা ধীমান্ যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন। ইচ্ছা না থাকিলেও পূর্ব্বের অভ্যাসবশতঃ তিনি যোগতত্ত্ব জানিতে উদ্‌যোগী হন, কর্ম্মফল অতিক্রম করিয়া জ্ঞান লাভ করেন এবং অনেক জন্মের পরে পাপমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

গীতায় তাত্ত্বিক দর্শন

সপ্তম, অষ্টম, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে গভীর দার্শনিক তত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশ তত্ত্ব গৃহীত হইয়া তাহাতে নূতন অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত পুরুষোত্তম তত্ত্ব সংযোজিত হইয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র ও অচেতন। পুরুষ চেতন, সংখ্যায় অনন্ত এবং স্বরূপে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূত ও তাহাদের বিকার জড় জগৎ এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উদ্‌ভূত হইয়াছে। গীতায় প্রকৃতি পরমাত্মার প্রকৃতি—পরমাত্মার শক্তি—বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অপরা ও পরা—পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকৃতি। পঞ্চভূত ও মন, বুদ্ধি ও অহংকার—ইহারা অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি হইতে জীব উদ্‌ভূত হইয়াছে। জীব পরমাত্মারই অংশ। পরা ও অপরা প্রকৃতি উভয়ই পরমাত্মারই প্রকৃতি, এবং উভয়ের মধ্যেই পরমাত্মা বর্ত্তমান। তথাকথিত জড় জগৎ দৃশ্যতঃ অচেতন হইলেও, বাস্তবিক অচেতন নহে; তাহা চিৎস্বরূপ পরমাত্মার শক্তি। প্রত্যেক জীব পরমাত্মার অংশ, এবং তাহার মধ্যে পরমাত্মা বর্ত্তমান। চেতনা দ্বিবিধ—জীব ও আত্মা। ব্রহ্মা হইতে তির্য্যকযোনি প্রাণীগণ পর্য্যন্ত সকলে জীব। আর পুরুষোত্তম একমাত্র আত্মা। আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই। জড় ও চেতন সকলই আত্মা। বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। কৃৎস্ন জগৎ তাহা হইতেই উদ্‌ভূত এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি পরমাত্মা যাবতীয় বস্তুর মধ্যে সূত্রস্বরূপে বর্ত্তমান ও তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন। জলের মধ্যে তিনি রস, শশী ও সূর্য্যের মধ্যে তাহাদের প্রভা, সর্ব্ববেদের মধ্যে তিনি প্রণব, নরের মধ্যে পৌরুষ পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন, তপস্বীতে তপস্যা। তিনিই সর্ব্বভূতের বীজ। তিনি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানের কামরাগ-বর্জিত বল এবং প্রাণীদিগের ধর্ম্মের অবিরোধী কাম। মানুষের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সকল ভাবই তিনি। সত্ত্ব, রজ, তমোময় প্রকৃতি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, ইহা তাঁহারই মায়া, তাঁহার সক্রিয় ইচ্ছা, চিৎশক্তি। পুরুষোত্তম ও তাঁহার পরা প্রকৃতি অভিন্ন। পুরুষোত্তম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। তাঁহার পরা প্রকৃতি তাঁহার অনন্তশক্তি। এই পরা প্রকৃতিই জীবরূপে অংশতঃ অভিব্যক্ত—কিন্তু এই আংশিক কালিক অভিব্যক্তির পশ্চাতে—কালাতীত পুরুষোত্তম তাঁহার অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তিতে বর্ত্তমান। তিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও বিশ্বাতিত জীব তাঁহার অংশমাত্র।

পুরুষোত্তমের মধ্যে যাবতীয় জীবাত্মা বর্ত্তমান, তিনি জীবাত্মাদিগের আত্মা। তিনি এক হইয়াও বহু। জগতে যেখানেই শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার পরা প্রকৃতিরই অংশ। তাঁহার পরা প্রকৃতিই বিশ্বের সমগ্র শক্তি।

ব্রহ্ম, আধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ—যাবতীয় সত্তা, ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। পরম অক্ষরই ব্রহ্ম। অপরিণামী, স্বয়ম্ভু, কালাতীত পুরুষ—যিনি জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের নিম্নদেশে বর্ত্তমান, তিনিই অক্ষর, তিনি ব্রহ্ম—সর্ব্বউপাধিশূন্য, অব্যাকৃত আকাশাণ্ড কৃৎস্ন প্রপঞ্চের ধারয়িতা এবং ইন্দ্রিয়-সমন্বিত দেহে নিরুপাধিক চৈতন্য। স্বভাবই অধ্যাত্ম। পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতির স্বরূপই "স্বভাব।" প্রত্যক্-আত্মারূপে দেহ অধিকার করিয়া ভোক্তৃরূপে অবস্থান এই স্বরূপ। "ভূত-ভাবোদ্ভব-কর বিসর্গ" কর্ম্ম। ভূত অর্থাৎ উৎপত্তিশীল স্থাবর জঙ্গমের "ভাব" অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্ভব অর্থাৎ বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ সৃষ্টি-প্রেরণা এবং সৃষ্টিই কর্ম্ম। (বিসর্গ—বিসৃষ্টি। "বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং"—চণ্ডী)। অধিভূত অর্থে উৎপন্ন যাবতীয় নশ্বর বস্তু। প্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ—বিশ্বের যিনি আত্মা তিনিই অধিদৈবত। পুরুষোত্তমই অধিযজ্ঞ—যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর। পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম, বিশ্বের আত্মা, জীবাত্মা, ভূতগণ ও কর্ম্ম—সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব এই সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট। যিনি পুরুষোত্তম তিনিই প্রাকৃতিক যাবতীয় সমুৎপাদের তলদেশে অবিকারী নিশ্চল ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান। তিনিই আবার বিশ্বের চৈতন্যময় সার্বিক আত্মা (অধিদৈবত)। তাহার শক্তিই নিশ্চল নির্বিকার ব্রহ্মের উপরিভাগে নানা ক্ষর বস্তুর উৎপাদন-ক্রীড়া-পর। এবং তিনিই জীবদেহে প্রত্যক্ আত্মারূপে অবস্থিত। তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বত্র বিভক্তের মতো অবস্থিত।

লোকে—সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মধ্যে—দুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। "সর্ব্বাণি ভূতানি"—যাবতীয় ভূত, চেতন ও অচেতন, নিখিল বস্তু ক্ষর—

প্রকৃতির মধ্যে চঞ্চল, নিত্যপরিণামী, ক্রীড়াশীল। সার্বিক আত্মাই ক্ষর পুরুষ! কার্য্যরূপে এই ক্ষর আত্মাই প্রকৃতির উপরিভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই ক্ষর পুরুষের অন্তরালে অক্ষর পুরুষ বর্ত্তমান। অক্ষরে কোনও চাঞ্চল্য নাই। তাহা স্থির অপরিণামী কূটস্থ, প্রকৃতির বহির্ভাগের কলকোলাহলের তলদেশে অবিচ্ছেদ মৌনী শান্তিরূপে বিরাজিত। তাহা হইতেই সমস্ত গতির উদ্ভব, কিন্তু তাহা নিজে গতিহীন। যাবতীয় জীবাত্মা ক্ষর-পুরুষের মধ্যে অবস্থিত হইলেও অক্ষর পুরুষই তাহাদের আধার।

নিত্য ক্রিয়াপর ও পরিণামী বিশ্বের সার্বিক আত্মা ক্ষর পুরুষ এবং নিষ্ক্রিয় অপরিণামী নিশ্চল মৌনী অক্ষর পুরুষ দৃশ্যতঃ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও উভয়েই একই সনাতন পুরুষের বিভাব। ঈশোপনিষদে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে জগতে যাহা কিছু "জগৎ" (গতিশীল, পরিণামী) তাহা ঈশ্বরই। তিনি "অনেজৎ" (গতিহীন অপরিণামী) হইলেও মন অপেক্ষাও বেগবান্। তিনি "এজতি" (গমন করেন) আবার "ন এজতি" (গমন করেন না)। গতিমান্ তিনি ক্ষর, গতিহীন তিনি অক্ষর। চঞ্চল মন সমন্বিত জীব ক্ষর। মনকে অতিক্রম করিয়া "নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপে"র ন্যায় জীব যখন সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন অক্ষরকে অনুভব করে।

যিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত, তিনিই পুরুষোত্তম। বিশ্বে অক্ষর ব্রহ্মই পর-তত্ত্ব। যাবতীয় প্রাকৃতিক সমুৎপাদের পশ্চাদভাগে এবং যাবতীয় জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সুখ দুঃখ, ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিকভাবের নিম্নদেশে অক্ষরই তাহার অবিচলিত মৌন ও শান্তির মধ্যে নিশ্চল স্থিতিতে বর্ত্তমান। কিন্তু যে শক্তিবশে অক্ষর হইতে চঞ্চল বিশ্বের উদ্ভব হয়, তাহা পুরুষোত্তমেরই শক্তি। অক্ষর পুরুষোত্তমেরই বিভাব। চঞ্চল বিশ্বে ও জীবে পুরুষোত্তমই অচঞ্চল অক্ষররূপে বর্ত্তমান। তাঁহার শক্তির ক্রিয়ার ফলে, তাঁহার পরাপ্রকৃতির সৃষ্টি-প্রেরণায় ফলে, তাঁহার অপরিণামিত্বের অপহ্নব হয় না।

অক্ষর ও পুরুষোত্তম বস্তুতঃ এক হইলেও পুরুষোত্তম অক্ষর অপেক্ষা উন্নততররূপ। সাধক অক্ষরকে প্রাপ্ত হইবার পরে, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া, তাহার উৎকৃষ্টতররূপ পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। পুরুষোত্তম অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাভূমি। তিনি অব্যয়, তিনি অমৃত। শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত।

অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগৎ উদ্ভূত এবং তাহাতে বিলীন হয়। ব্রহ্ম-লোক (ব্রহ্মারলোক)-সহ যাবতীয় লোক পুনরাবর্ত্তী—তাহাদের একবার ধ্বংস হয়, আবার আবির্ভাব হয়। মানুষের যাহা সহস্র চতুর্যুগ (অর্থাৎ মনুষ্য পরিমাণি চারি সহস্র যুগ) তাহা ব্রহ্মার একদিন; এবং তাহার পরে চতুঃ সহস্র যুগ ব্রহ্মার একরাত্রি। চতুঃ সহস্র যুগ পরিমাণ দিনের প্রারম্ভে সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ অব্যক্ত নির্গুণ অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়। আবার এই দিনের অবসানে রাত্রির আগমনে ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে বিলীন হয়। এইভাবে সকল ভূত বারংবার উদ্ভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের উদ্ভব এবং যাহাতে তাহা বিলীন হয়, তাহা হইতে ভিন্ন আর এক অব্যক্ত আছেন, যাহা সর্ব্বভূত বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও বিনষ্ট হয় না। এই দ্বিতীয় অব্যক্তও অক্ষর অর্থাৎ বিকার-রহিত, অপরিণামী। তিনিই গতির শেষ। তিনি উত্তম পুরুষ, তিনিই পরম ধাম। সকল ভূত তাঁহার অন্তঃস্থ, তিনি সর্ব্বব্যাপী। দেশ ও কালাতীত হইয়াও তিনি দেশ-কালে জগৎরূপে প্রকাশিত। তাঁহাকে অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ। তিনি কবি (সর্বজ্ঞ), পুরাণ (চিরন্তন), অনুশাসিতা (সর্ব জগতের নিয়ন্তা), অণু হইতেও সূক্ষ্মতরঃ, সকলের বিধাতা (কর্ম্মফল দাতা), অচিন্ত্যরূপ, আদিত্য-বর্ণ (সর্ব্ব জগতের প্রকাশক) এবং তমঃ পারে (প্রকৃতির পারে) অবস্থিত। যিনি অনন্য চিত্ত ও নিত্য সমাহিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন, তাহার নিকট তিনি সুলভ।

পরমাত্মা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মরূপে জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। যাবতীয় বস্তু তাঁহাতেই অবস্থিত; কিন্তু তাঁহাকে তাহাদের মধ্যে অবস্থিত বলা যায় না। বস্তুসকল তাঁহাতে অবস্থিত হইলেও তিনি অসঙ্গ। বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত হইলেও, তাহার সহিত আকাশের স্পর্শ নাই, সেইরূপ পরমাত্মার সহিত বস্তু জগতের সংসর্গ নাই। তবু এই জগৎ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। তিনিই গতি (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, জীবের নিবাসস্থান, শরণ ও সুহৃৎ। তাহা হইতে জীব উৎপন্ন এবং তাহাতে বিলীন হয়, তিনিই সর্ব্ব বস্তুর বীজ (কারণ)। এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সকলই তিনি। চেতন ও অচেতন জগতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, সকলই তিনি। তিনি কাল, তিনি মৃত্যু। তিনি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা। তিনি তাঁহার এক অংশ দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।
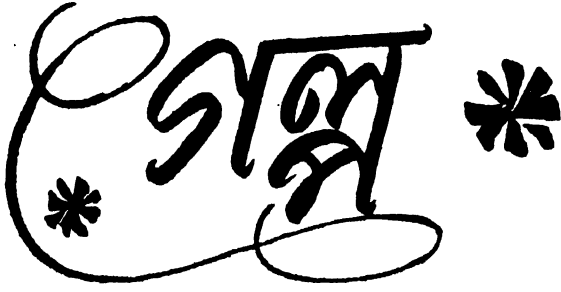
আধুনিকা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী

ভগবান মন বুঝে ধন দেন। আমাকেও দিয়েছেন। আমি নিজে আধুনিক, আমার কাম্য ছিল আধুনিকা নারী। বিয়ের হৈচৈটা ঠাণ্ডা হ'লে উপলব্ধি করলুম আমার গৃহিণী হয়ে যিনি এসেছেন তিনি শুধু আধুনিকাই নন্, অতি-আধুনিকা। আমাদের দিদিমা-ঠাকুরমাদের সময়কার ফ্যাশনগুলোই চক্রবৎ নিয়মে আধুনিক ফ্যাশনের পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। ব্লাউজের হাতা বগল থেকে নামতে নামতে বর্তমানে কব্জি পর্যন্ত এসেছে—ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে যেমনটি ছিল। এককালের পাতাকাটা কেশবিন্যাস আবার দেখা দিয়েছে কলকাতার সাউথ-এণ্ডে। কিন্তু প্রাচীনতায় প্রত্যাবর্তনের এই পাদক্ষেপের গতি খুব দ্রুত নয়। আমার গৃহিণীকে আমি এই কারণে অতি-আধুনিকা বলছি যে তিনি কারু পদাঙ্ক অনুসরণ না ক'রেই একেবারে পঞ্চাশ কি একশ' বছর আগের একটি ফ্যাশন হুবহু আত্মসাৎ করতে পেরেছেন—সর্বক্ষণই তাঁর মুখে একটি দেড় হাত ঘোমটা দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি মোটেই প্রাচীন রীতি মানেন না। মাসিমা-পিসিমা-খুড়িমা-জ্যেঠিমা এবং কয়েক ডজন ছেলেপিলেয় ভরা সংসার আমাদের। স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ ভগবানের সাক্ষাৎ পাবার মতই দুর্লভ ব্যাপার। তবুও যদি কখনো কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেই সুযোগ এসে পড়ে আর আমারও যদি ঠিক সেই মুহূর্তে কোনো ভীষণ জরুরী কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাঁর নিকটবর্তী হবার আগেই দেখি তিনি ঘোমটাসহ অন্তর্ধান করেছেন চক্ষের নিমেষে।

ভদ্রমহিলা শুধু ঘোমটার ভেতর থেকেই দেখতে পান না, তিনি তৃতীয় নেত্রেরও অধিকারিণী। পিসিমা জেঠিমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যদি কখনো পা টিপে টিপে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়াই, কোনোপ্রকার চপলতা প্রকাশ করার আগেই শুনতে পাই তাঁর চাপা তর্জন—'কী বেহায়া।' প্রাণটি হাতে নিয়ে আমি এক পা এক পা করে পশ্চাদ-পসরণ করি। বেহায়া? হয়ত তাই!

বলা বাহুল্য আমার মা এবং মায়েরা অর্থাৎ মাসিমা পিসিমা খুড়িমা জ্যেঠিমা এবং বাবারা অর্থাৎ বাবা কাকা এবং জ্যেঠামশাই বউমা বলতে অজ্ঞান। এবং এটা বলা আরও বাহুল্য যে তাঁদের ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করতে বউমাকে সর্বক্ষণই ব্যস্ত থাকতে হয়—কোনো কোনোদিন রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত।

পাঠক যদি সহৃদয় হন তাহলে আমার মনোবেদনার কারণটা উপলব্ধি করতে পারবেন নিশ্চয়ই। দুঃখের বিষয় আমার নিজের সংসারে কেউ সেটা বোঝে না। শুধু ছোট বোনটা মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে জিভ দেখিয়ে বলে—'ঠিক হয়েছে, যেমন আপ-টু ডেট মেয়ে চেয়েছিলে, তেমনই পেয়েছ। এখন বউয়ের কপালে লেবেল এঁটে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াও।' স্ত্রীর কপালে নয়, নিজের কপালেই এখন লেবেল মারতে ইচ্ছে করে—গাধা। গাধা নই তো কা। আমি কি নিজেই দেখে শুনে এবং তাঁর আধুনিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে ভদ্রমহিলাকে ঘরে আনি নি? অবশ্য তখন তাঁকে আধুনিকা না ভেবেও উপায় ছিল না। জামাইবাবুর পরামর্শে প'ড়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'আচ্ছা বলুন তো ভাত রাঁধতে হলে জলটা কখন দিতে হয়?' অবিচল গাম্ভীর্যে ভদ্রমহিলা জবাব দিয়েছিলেন—'ফেন গালবার পর।' কন্যাপক্ষের দিক থেকে একটা গুঞ্জন উঠেছিল, আমি তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে নতুন উদ্যমে প্রশ্ন করেছিলুম, 'আপনি ভূগোল পড়েছেন নিশ্চয়ই? আয়ন বায়ুর বিপরীত বায়ুটা কী জানেন?'

'ঊনপঞ্চাশ বায়ু' সংক্ষেপে উত্তর হয়েছিল। আর

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়াক্‌স্‌

শীত

ফটো : সত্যপ্রকাশ বালা

সমস্ত ঘর হাসিতে ফেটে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। ও রকম জবাব শুনলে কোন পুরুষ না কাৎ হয়?

গত কাল শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ ছিল। আমার কপালটা সব দিক দিয়েই মন্দ, শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ একটু ঘন ঘনও হয় না। সেখানে আমার স্ত্রীর ঘোমটার দৈর্ঘ্য অনেকটা কমে যায়, যদিও আমার তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না; কেননা সারাটা সময় তিনি পিতামাতার পরিচর্যাতেই ব্যয় করেন। যাই হ'ক, আমি কালকের কথাটাই বলি—দিনটা আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয়। শ্বশুরালয় থেকে একটু তাড়াতাড়িই বের হয়েছি। ট্রাম হ্যারিসন রোডের কাছে এলে বললুম, "এখানে একটু নামতে হবে।"

"কেন?" সরাসরি প্রশ্ন হ'ল।

"এই ইয়ে—মানে একটু দরকার আছে।"

"কী দরকার?"

ভেবেছিলুম ভাঙব না, একেবারে সিধে দোকানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিস্মিত ক'রে দেবো। কিন্তু বলতে হ'ল। বললুম, "দরকার, মানে এমন কিছু নয়, তোমার জন্যে একখানা শাড়ি কিনব। এমনিতে তো তোমাকে নিয়ে বেরুনো হয়ে ওঠে না, আজকে সঙ্গে রয়েছ, তাই।"

একটু ভাবলেন ভদ্রমহিলা। বোধহয় দয়া হ'ল। বললেন, "বেশ চলো। তবে বড় দোকানে নয়, হকার্স কর্নারে। কম দামে পাওয়া যাবে।"

হকার্স কর্নারে! সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণি হয়ে হকার্স কর্নারে যাতায়াত নেই এমনটা কখনই হতে পারে না; কিন্তু তাই ব'লে নবপরিণীতা স্ত্রীর উপস্থিতিতে হকারদের সঙ্গে দরাদরি করা! সে যে অতি বীভৎস ব্যাপার। বললুম, "না চলো দোকানেই যাই, হকাররা ঠকায়।"

ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল ভদ্রমহিলার। বললেন, "ঠকাবে না! তোমার মত গোবেচারা পেলে কার না ঠকাতে ইচ্ছে হয়?"

গোবেচারা! আমাকে বলা হ'ল কিনা গোবেচারা! নাঃ, এ অপমান সহ্য করা যায় না। আমার দরাদরি করার ক্ষমতাটা তাহলে তো দেখিয়ে দিতে হচ্ছে।

বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। স্টলগুলোর ধারে যেতেই কলস্বরে অভ্যর্থনা হতে লাগল—'আসেন দাদু।' বঙ্গবিভাগের পর আমরা একটা নতুন সম্বোধন শিখেছি—দাদু। সবাইকেই এ সম্বোধনে আপ্যায়িত করা চলে—দাদু থেকে দাদুর নাতিকে পর্যন্ত। একটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে গৃহিণী বললেন—"আনারকলিটা দেখি।" ভাবলুম এখানে বুঝি সিনেমার বইও বিক্রি হয়, কিন্তু দোকানদার দেখি বইয়ের বদলে একখানা শাড়ি আমার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে, "এই দেখেন দাদু। কী পাড় আর কী জমীন। বাহারখানা দেখেন।"

কাপড়খানা আমার হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে গৃহিণী বললেন, "কত দাম?"

দোকানদার যেন তাঁর কথা শুনতেই পেলে না। আমাকে তখন বোঝাচ্ছে—ওরকম শাড়ি আর কোনো হকারের কাছে নেই, সারা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটেও আছে কিনা সন্দেহ।

স্ত্রী আবার জিজ্ঞেস করলেন—"কত দাম?"

লোকটা তখন ব'লে চলেছে—'রঙ একেবারে পাকা—গ্যারান্টি দেয়া। এত্তটুকু ফেড হইয়া গেলে নিয়ে আসবেন, দাম ফিরৎ দিয়া দেবো।"

উচ্চস্বরে স্ত্রী বললেন—"কত দাম?"

লোকটা তখন দামের কথায় এসেছে…আর দামও জানেন দাদু খুব কম—মাত্র বাইশ।

আমি নীরবে সব লক্ষ্য করছিলুম। শাড়িখানা গৃহিণীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললুম, "ভদ্রলোকেদের সঙ্গে কী ভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আগে শিখে তারপর দোকানদারি করতে আসুন।"

গিন্নীর শাড়িখানা ছেড়ে যাবার ইচ্ছে খুব ছিল না, আমি তাঁকে জোর ক'রে সরিয়ে নিলুম। একটু দূরে গিয়ে অনুচ্চ-কণ্ঠে বললুম, "ছোটলোক!"

দ্বিতীয় দোকানে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'ল। স্ত্রী একটা সিনেমার নাম করলেন, দোকানী একখানা শাড়ি আমার হাতে তুলে দিলে, আর আমার সঙ্গেই কথা ব'লে যেতে লাগল তাঁকে একেবারে উপেক্ষা ক'রে।

আমি বিস্মিত।

স্ত্রীর মুখ থমথমে, অপমানে লাল। সেখান থেকে সরে এসে বললেন, "এবার তুমি একটু দূরে দূরে থেকো তো।"

আমি তফাতে রইলুম। তৃতীয় স্টলের দোকানী অন্য একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছিল, গিন্নীকে প্রথমে দেখতে পায় নি। স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে তাঁকে না দেখেই বললে, "দিচ্ছি মা।" তারপর প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরে তাকানো মাত্র তার মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল। গিন্নীকে যেন আদপেই দেখেনি এই রকম ভাব ক'রে আগের খদ্দেরের সঙ্গেই কথা ব'লে যেতে লাগল, শাড়িখানা আলগোছে রেখে দিলে অন্য পাশে।

স্ত্রী কর্কশ স্বরে বললেন, "কী হ'ল, কাপড়টা রেখে দিলেন কেন? শুনতে পাননি নাকি?"

অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে আশঙ্কায় আমি স্ত্রীর আদেশ অগ্রাহ্য ক'রে কাছে গিয়ে বললুম, "কী ব্যাপার?"

আমাকে দেখেই দোকানদার উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"এই যে আসেন দাদু। দেখেন একখানা শাড়ির মত শাড়ি। সারা কলেজ ষ্ট্রীটে পাইবেন না।"

সংক্ষেপে জবাব দিলুম—"শাড়ি আমি দেখতে আসি নি। যিনি চাইছেন তাঁকেই দেখান।"

"ঐ একই কথা হইল দাদু। আপনিই দেখেন জিনিষটা। আপনার মনের মতন হইল কিনা দেখেন। দামও আপনার মনের মতন। মাত্র একুশ টাকা। এক দাম। এই দেখেন লেখা আছে।"

সিধে তার চোখের দিকে চেয়ে গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন, "কত দাম? একুশ?"

দোকানদার যেন কেঁচো হয়ে গেল। বললে, "আইজ্ঞা দিদিমণি। মাত্র একুশ। লেখা আছে।"

এবার আমার যোগ্যতা প্রদর্শনের পালা। আমি গোবেচারা!

আন্দাজ করলুম শাড়িখানার দাম উনিশ টাকার বেশি হতে পারে না। তাহলে ষোলো থেকে আরম্ভ করা যাক।

তাই বলতে যাচ্ছিলুম কিন্তু কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে থেমে পড়তে হ'ল। চেয়ে দেখি গিন্নীর মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছে। বললেন, "ঠিক ঠিক বলুন দিকিনি কতোয় দেবেন?"

অন্য খদ্দের ততক্ষণে জিনিস কিনে চ'লে গেছে। দোকানদার করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "আইজ্ঞা দিদিমণি, একুশ টাকার এক পয়সা কমে আমাদের পড়তায় পড়বে না। আপনি অন্য দোকানে যাচাই ক'রে দেখতে পারেন।"

অবজ্ঞায় স্ত্রীর নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বললেন, "দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ানো আমাদের স্বভাব নয়—আমরা কিনতে আসি। এ শাড়ির দাম আট টাকার এক পয়সা বেশি নয়।"

আট টাকা! একুশ থেকে আট! বিস্ময় আর্তনাদ ক'রে উঠতে যাচ্ছিলুম, সামলে নিলুম। বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা, দরাদরি করবার সুযোগ পেয়ে নিজের স্মার্টনেস জাহির করতে চাইছে। বিশেষতঃ স্বামীর কাছে বাহাদুরি দেখাবার সুযোগ পেলে কোন্ মেয়ে চুপ করে থাকতে পারে?

কিন্তু তাই ব'লে একুশ থেকে আট! কেনাকাটা করার অভিজ্ঞতা থাকলে কোনোদিন কেউ এ রকম অদ্ভুত দাম বলতে পারে? মনে মনে একটু হাসলুম—মন্দ কী একটু অভিজ্ঞতা হ'ক না ভদ্রমহিলার। বেশি স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে একটু শিক্ষাও হ'ক। এই নিয়ে সবার কাছে গল্প করা যাবে।"

আমার এক প্রিয় বন্ধুর পিতার কাহিনী মনে পড়ে। ভদ্রলোক ডাক্তার। একদিন হঠাৎ শখ হ'ল বাজার করতে হবে। ভাল দেখে একটা মাছ পছন্দ করলেন—চার টাকা দাম। ডাক্তারবাবু জানতেন বাজারে দরাদরি ক'রে মাছ কিনতে হয়। সুতরাং মেছুনীকে বললেন, "তিন টাকা পনেরো আনা হবে?" চার পয়সা কম চার টাকায় মাছ কিনে বাড়ি ফিরে সগর্বে সেকথা সবাইকে শোনালেন। আমার স্ত্রীর মনোভাবটাও আসলে সেই একই ধরণের। তবে কৌশল প্রয়োগের ধরণটা একেবারে বিপরীত—এই যা তফাৎ।

দোকানদারের চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল কোটর থেকে। "কী বললেন, আট টাকা!" আর কিছু সে বলতে পারলে না।

"হ্যাঁ আট টাকা।"

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে দোকানদার বললে, "আপনারা খরিদ্দার যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে দরাদরি করতে চাই না—আমি অষ্ট গণ্ডা পর্যন্ত কমাইতে পারি!"

"না, আট টাকা।" স্ত্রী অদমনীয়া।

লোকটা কপালে হাত বুলিয়ে বললে, "একটু চিন্তা করিয়া কথাটা কন দিদি। একটা সম্ভব অসম্ভত তো আছে। একুশ টাকা কাপড়ের আট টাকা দাম বলছেন শুনলে লোকেই বা কী কইবে! আচ্ছা আপনার কথাই রইল, কুড়িটা টাকা দেবেন।"

"আমরা কি গাঁ থেকে এসেছি যে এ কাপড়টা কুড়ি টাকায় নেব? নাকি আমরা কাপড় চিনি না! সব খদ্দেরকেই বোকা ভাবা খুব বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয় দোকানদার মশাই।"

ভাষাটা শুনে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করি। এতটা আধুনিক হতে গেলে শেষরক্ষা করা যাবে তো?

দোকানদার বললে—"আইজ্ঞা কুড়ি টাকার এক পয়সা কমে দিতে পারব না। বান্ধা দাম একুশ, তার থেকে এক টাকা লাভ কমাইছি। এর চেয়ে কমানর ক্ষমতা আমাদের নাই।"

"এ সব কথা অন্য লোকদের শোনাবেন। এটা কলকাতা—দোতলা বাস চলে, গোরুর গাড়ি নয়। এটাও নে রাখবেন, আট টাকার কাপড়ে বারো টাকা লাভ করার দিনও আর নেই।"

দোকানদার হাতজোড় ক'রে বললে, "বার টাকা লাভ দিদিমণি। এ রকম অপবাদ আমাগো দেবেন না। আমাদের ধর্ম আছে। শুধু আপনার জন্য আর একটা টাকা কমাইতে পারি।"

"থাক ধর্মকে আর এর মধ্যে টানবেন না—জানতে তো কিছু বাকি নেই। আচ্ছা আর আট আনা পয়সা দিচ্ছি, দিন দেখি কাপড়টা।"

সর্বহারার দৃষ্টিতে দোকানদার আমাদের দিকে তাকালে। বেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে ভাবার পর কাপড়টা কাগজে মুড়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, নেন দাদু, আজকে আমাদের একটা পয়সাও লাভ হ'ল না।"

ব্যাগ বের ক'রে বললুম, "কত দিতে হবে?"

"কেন বাবু ঐ আঠেরোই দিন। বউনির সময়, তাই লাভ না করিয়াই দিলাম। খরিদ্দার লক্ষ্মী।"

গিন্নী থরথর ক'রে উঠলেন, "কে আপনাকে আঠেরো টাকায় দিতে বলেছে? পয়সা অত সস্তা নয়।"

শাড়িখানা দড়িতে ঝোলাতে ঝোলাতে দোকানী বললে, "তাহ'লে আর পারলাম না আইজ্ঞা। সাড়ে আট টাকায় শাড়ি হয় নাকি আজকাল? আপনি কত দিতে পারবেন কন দেখি?"

"তা এতক্ষণ শোনেন নি নাকি? লাভ যদি একান্তই না কমাতে চান, তবে ন'টাকা পর্যন্ত উঠতে রাজী আছি, তার বেশি নয়।"

"নয় টাকা! সে কি একটা দাম হইল দিদিমণি! আচ্ছা কর্তা আপনিই বিচার করবেন—একুশ টাকার কাপড় নয় টাকায় দেওয়া যায় কিনা।"

বেচারার ওপর মায়া হচ্ছিল এবং স্ত্রীর ওপরও যে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলুম না এমন নয়। প্রকাশ্য রাস্তার ওপর এসব কী ছেলেমানুষি! নিজের সম্মান-অসম্মান জ্ঞানও নেই। শেষকালে একটা হকারের মুখ থেকে কতগুলো আজে-বাজে কথা শোনাই কি আধুনিকার উপযোগী হবে? স্ত্রীর উৎসাহে বাধা দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ভ্রূকুটি খেয়ে নিরস্ত হলুম। ততক্ষণে তিনি দশে উঠেছেন।

দোকানী চোখ কপালে তুলে বললে, "দশ! একটা কাপড়ে এত লাভ থাকলে তো আমরা এতদিনে চৌরঙ্গিতে চাইর তলা বাড়ি তুলতে পারতাম। বিশ্বাস করেন, বউনির সময় ব'লে আপনাদের লাভ না করিয়াই দিতেছি!"

স্ত্রী খিল খিল করে হেসে উঠলেন: "আপনারা বুঝি দানসত্র খুলে বসেছেন? ওগো শুনলে তো? রোজ সন্ধ্যে বেলায় এখানে এসো। এখানে বিনি পয়সায় কাপড় পাওয়া যাবে।"

লোকটাও হাসল। লজ্জার হাসি: "কী যে কন দিদিমণি! আপনাগো মুখে কিছু আটকায় না। সত্য কইছি আমাদের এতে কিছুমাত্র লাভ থাকবে না।"

এবার স্ত্রী একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, "বার বার একই কথা বলছেন কেন? পোষাবে দেবেন, না পোষায় দেবেন না। আমি দশ বলেছি, আর একটা টাকা নিন। এগারোর বেশি এর দাম হাওয়া অসম্ভব।"

"তাহ'লে দিদিমণি সতেরোটা টাকা দেন।"

"না: আর বকতে পারছি না, মাথা ধ'রে গেল। অন্য দোকানে গেলেই ভাল করতুম দেখছি। দিন দেখি

কাপড়টা বেঁধে দিন। ওগো বারোটা টাকা দিয়ে দাও তো।"

"বার টাকা! আর চারটে টাকা দেন, নইলে মরে যাব। এইতেও এক পয়সা লাভ থাকবে না।"

"ফের ওসব বলছেন? উনিশ টাকা যখন বলেছিলেন তখনও লাভ রাখেন নি! আর ষোলো টাকায় এসেও বলছেন লাভ করছেন না! এমনি করেই লোকের গলায় ছুরি বসান আপনারা! এই বুঝি আপনাদের ধর্ম? বারো টাকার এক পয়সা বেশি পাবেন না।"

বাকি ঘটনাটুকু সবিস্তারে আর বলব না। শত হক ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী তো বটেন। চোদ্দ টাকা দিয়ে তিনি যখন শাড়িখানা নিয়ে স্বগৃহ অভিমুখে রওনা হলেন, তখন আমি ফুলে উঠব, না চুপসে যাব—তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না।

হকার্স কর্ণার থেকে কিছু দূরে চ'লে এসেছি, পেছনে ডাক শুনলুম, "দাদু, দাদু, শোনেন। চেয়ে দেখি সেই দোকানদার। নিম্নকণ্ঠে বললে, আপনি একলা এইদিকে একটু আসবেন, একটুখানির জন্য?"

স্ত্রীকে দাঁড়াতে বললুম। একটু তফাতে এসে দোকানদার আতঙ্কিতকণ্ঠে বললে, "উনি আপনার ওয়াইফ বুঝি?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললুম, হ্যাঁ স্ত্রী। কিন্তু কেন?

আকুল হয়ে সে বললে—"দোহাই আপনার। আপনার পায়ে পড়ি ওনারে আর এইখানে নিয়া আসিবেন না। আমরা উদ্বাস্তু, গরীব মানুষ, দিন আনি দিন খাই—একেবারে মারা পড়ে যাব। আপনেরে বিয়া করনের আগে উনি এখানে প্রায়ই আসতেন, এখানের সব দোকানদার ওনারে চেনে। শুধু নিজেদের টাই না, পাড়াশুদ্ধ সকলের জামা কাপড় উনি কিনিয়া দিতেন। ওনার কাছে জিনিস বেইচা আজ পর্যন্ত কেউ এক টাকার বেশি লাভ করতে পারে নাই। বিশ্বাস করেন, আপনার শাড়িটাতে আমি মাত্র অষ্ট গণ্ডা লাভ করেছি। দূর থেইকা ওনারে দেখলেই আমরা সবাই ভয়ে কাঁপতে থাকি। ওনার দেখাদেখি অনেক লোক দরদাম করা শিখা গেছে। কয়েক মাস ওনারে না দেইখা একটু স্বস্তি পাইছিলাম—ভগবান বুঝি মুখ তুইলা চাইছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা সার, আপনি আর ওনারে এইদিকে আইনেন না, আমরা তা'হলে ধনে প্রাণে মারা যাব।"

সব শুনলুম। স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলছিল লোকটা?"

একটা ঢোঁক গিলে বললুম—"ইয়ে, বলছিল আমি যেন ওর দোকান থেকেই জামা-কাপড় কিনি। তুমি ওর অনেক দিনের খদ্দের।"

মনোলীনা

অধীর সরকার

একটি বেদনা নিয়ে নিপীড়িত আমাদের মন
বারবার ঘোরে ফেরে কেন যেন পাখীর মতন
অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে মরুভূর রুক্ষ চৈত্রাকাশে;
অবশেষে সকরুণ ক্লান্তি নিয়ে নীড়ে ফিরে আসে।

তোমারে পাবার তৃষ্ণা আছে এক আমারো হৃদয়ে;
তোমারে যেটুকু পাই বুঝি তার পূর্ণ অন্বেষণ
করে আজো রাত্রিদিন বেদনার স্বাদ বিনিময়ে
উৎকণ্ঠ পাখীর মতো আমাদের মন।

সকল তৃষ্ণার এক তৃপ্তি আছে, আছে প্রান্তসীমা
তোমার হৃদয় ঘিরে আজো মোর কাঙাল হৃদয়
অতৃপ্ত অপূর্ণ-সাধ; এই নিয়ে প্রাণের মহিমা
ঘিরে আছে জীবনের সব জয়, সব পরাজয়।
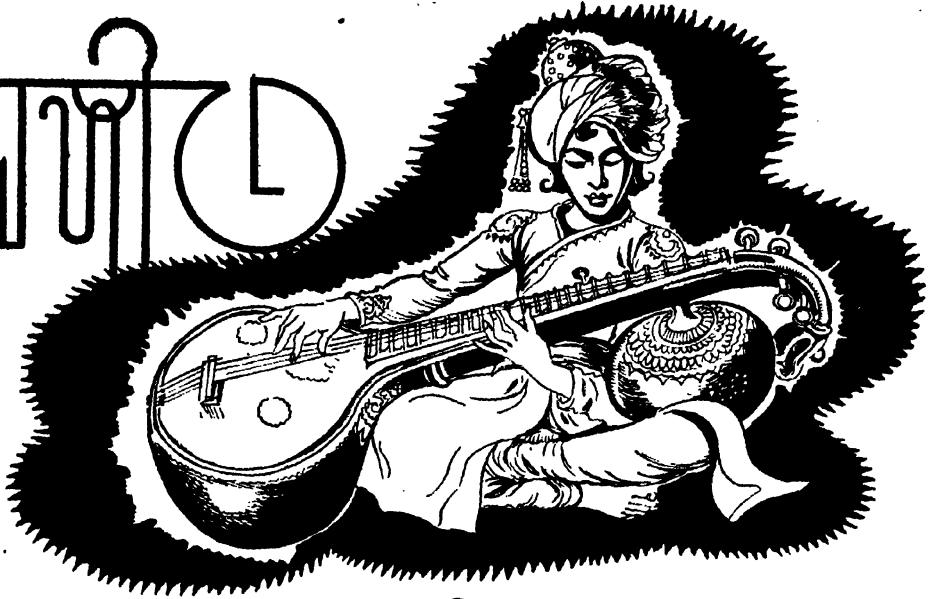
প্রভাতী

(কীর্তন)

জাগো গৌরীসুত নরহরি
জাগো জগন্নাথ নন্দন
জাগো খণ্ড-বাসীর নয়নানন্দ
মাধবী মন-মোহন।
জাগে পূরব আকাশে অরুণ আভাস
উদিবে তরুণ তপন
জাগো রতিকান্তের মদন গোপাল
প্রিয়াজীর হৃদি-রঞ্জন।
জাগো প্রেম সুরধনী রামী-রজকিনী
স্বরগ-মন্দাকিনী গো
জাগো রাসবিলাসের রসবৈশালী
শুকতারা লাজে রাজে গো।

জাগো অনুরাগে রাঙা দেবী অনুরাধা
কবি মানসের লীলা রঙ্গিনী
জাগো লোচনের মিতা কবির কবিতা
প্রেমিকের প্রিয় সঙ্গিনী।
জাগো পুরনারী ভাঙো ঘুম ঘোর
জাগো গো পুলকানন্দা
মালতীকুঞ্জে জাগে মধুমতী
জাগে পুষ্পিতা নিশিগন্ধা।
জাগো শ্রীগোপীনাথের প্রাণ-বিহঙ্গ
শ্রীমুকুন্দ নন্দন
জাগো নরহরিসুত চির অনুগত
ল'য়ে ভক্তি কুসুম চন্দন।

কথা—শঙ্করানন্দ ঠাকুর

সুর ও স্বরলিপি—হরিদাস কর

পরিচিতি

উদারা—স্‌ মুদারা—স তারা—র্স মীড় ⌒

তাল—লোফা

স	সগ	গ	|	স	স	স	|	ন্‌স	-	স	|	ন্‌	ধ্‌	প্‌
জা	গো	গৌ		রী	সু	ত		ন	-	র		হ	-	রি
জা	গো	প্রে		ম	সু	র		ধ	নি	রা		মী	রজ	কিনী
জা	গো	পু		র	না	রী		ভা	ঙো	ঘু		ম	ঘো	র

স সম ম | ম গমপ ম | গ গ গমপ | ম - স I
জা গো জ গ ন্না থ ন ন্ দ ন - -
স্ব র গ ম ন্ দা কি - নী গো - -
জা গো গো পূ ল কা ন - ন্ দা - -

II স সম ম | ম ম ম | ম গমপ প | ম পম গ
জা গো খ ণ্ড বা সীর ন য় না ন - ন্দ
জা গো রা স বি লা সে র ব স বৈ শালী
মা ল তী কু ন্ জে জা গে ম ধু ম তী

গ ম ধ | - প ম | গ - গমপ | ম - - II
মা ধ বী - ম ন মো - হ ন - -
শু ক তা রা লা জে রা - জে গো - -
পু ষ্ পি তা নি শি গ - ন্ ধা - -

I গ ম ধ | ধ ধ ধস | ন নর্স র্স | ন ঋ´ র্স |
জা গে পূ - র ব আ কা শে অ রু ণ
অ নু রা গে রা ঙা দে বী অ নু রা ধা
শ্রী গো পী না থে র প্রা ণ বি হ ঙ্ গ

র্স সঋ ঋ´ | ঋ´ ঋ´ ঋ´ | স ঋর্ম র্গ | ঋ র্স র্স |
আ ভা স উ দি বে ত রু ণ ত প ন
ক বি মা ন সে র লী লা র ং গি নী
শ্রী - মু কু ন্ দ ন - ন্ দ ন -

II নর্স ন ধ | প ম ম | ম মপ ম | ম ম গ |
জা গো র তি কা ন্তের ম দ ন গো পা ল
লো চ নে র মি তা ক বি র ক বি তা
ন র হ রি সু ত চি র অ নু গ ত

গ ম র্ধ | - প ম | গ গ গমপ | ম - স II
প্রি য়া জীর - হৃ দি র ন্ জ ন - -
প্রে মি কে র প্রি য় স ং গি নী - -
ভ ক তি কু সু ম চ ন্ দ ন - -

সুন্দরবন ভ্রমণ

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

সার্ধ দুই শত বৎসর ইংরাজ শাসনে এ দেশের জনসাধারণের মেরুদণ্ড বক্র হয়ে গিয়েছে। রাজকোষ হয়েছে শূন্য। দিকে দিকে উঠেছে হাহাকার—হা অন্ন! হা অন্নর ধ্বনি। সর্ব্বোপরি প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত দেশবাসীর মন। এরূপ এক সমস্যা-সঙ্কুল সময়ে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির কবল হতে মুক্ত পায় নি দেশ, সে সময় শাসন দণ্ড গ্রহণ করলেন দেশের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ। শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় অপটু এই সব নেতৃবৃন্দের বেশ কিছুদিন গেল অনুশীলন করতে—আর সিভিলিয়ানদের কবল থেকে শাসনব্যবস্থা মুক্ত করতে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলো সাধারণ নির্ব্বাচন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে দেশবাসীকে একটী সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ শাসনব্যবস্থা উপহার দিলেন নেতৃবৃন্দ। যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত পুরাতন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছে নতুন শাসন ব্যবস্থাকে—তাতে অনবধানতা-বশতঃ ভুল ত্রুটী থাকা সম্ভব। কিন্তু মহাসমুদ্রে তাহা জলবুদ্‌বুদের ন্যায়। দেশের কোটী কোটী মানুষকে জাতি-ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলকে ভোটাধিকার দিয়ে বিশ্বে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলো ভারতবর্ষ। সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হলো। শাসনব্যবস্থায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হলেন নেতৃবৃন্দ। এবার পূর্ণোদ্যমে চল্‌তে লাগ্‌লো দেশগঠনের কাজ। সর্ব্বাঙ্গে যার ক্ষত, তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার স্থান কোথায়? তাই সব কিছু ঢেলে সাজতে হলো। এরই ভিতর দ্রুত গতিতে এগিয়ে চল্‌লো চিত্তরঞ্জন রেলখানা, বোম্বের পেনিসিলিন তৈরীর কারখানা, পাঞ্জাবের ভাক্‌রা নাঙ্গল বাঁধ, আর পশ্চিম বাংলার দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের কাজ, হরিণঘাটা দুধের ফার্ম্ম প্রভৃতি। এ সব বৃহৎ কাজের সঙ্গে সঙ্গে দেশ গঠনের ছোট ছোট বহু কাজ চল্‌তে লাগলো পাশাপাশি—সমভাবে। তার কটা সংবাদ রাখি আমরা, সরকারী প্রচারযন্ত্র নিশ্চল। তাই গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসী অজ্ঞতার অন্ধকারে আজও হাবুডুবু খাচ্ছে।

দেশ গঠনের কাজ পুরা উদ্যমে চলছে সত্য।...কিন্তু নয় বৎসর হলো দেশ পরবশতা থেকে মুক্ত হয়েছে—এই নয় বৎসরে কি হয়েছে আমাদের বেঁচে থাকার মত সামান্য জিনিষের অর্থাৎ ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা? উত্তর—না। এর কারণ ভাত কাপড়ের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক সমস্যা—যেমন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও বেকার সমস্যা। একটী অপরটীর পরিপূরক। একটাকে বাদ দিয়ে অপরটার কথা চিন্তা করাই যায় না। সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন আমাদের দেশের সরকার-বিরোধী দল-সমূহ। দেশের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে সরকারী ব্যর্থতার ফিরিস্তির সঙ্গে দেশগঠনে সরকারী কৃতকার্য্যতার সামান্যতম স্বীকৃতিও যদি থাক্‌তো এদের ফিরিস্তিতে—তাহলে আমার কিছু বলার থাক্‌তো না এই সব সরকার-বিরোধী দলসমূহকে। এখানে পরিস্কার ভাবে বলে রাখা দরকার যে, আমি কোন গোষ্ঠীভুক্ত নই। এদেশের একজন সামান্য নাগরিক মাত্র। অন্যান্য দশ জনের ন্যায় দেশের শুভাশুভের সহিত আমিও জড়িত। আমার ইচ্ছা দিকে দিকে দেশগঠনে সরকারী পরিকল্পনাসমূহ দেখে তার ব্যর্থতা ও কৃতকার্য্যতার বিচার করা। ২৪ পরগণা জেলার অধিবাসী আমি। সর্ব্বপ্রথমে নিজের জেলাকে ভালোভাবে জান্‌তে চাই। আমার জেলার বিভিন্ন অভাব অভিযোগের সহিত আমি সম্যক পরিচিত। সেই সব সমস্যা সমাধানে সরকার কি করছেন সেটা জানা নিশ্চয়ই বাতুলতা নয়। কিন্তু কিরূপে সেটা সম্ভব? এ চিন্তাই আমাকে বিব্রত করে তুলেছে বেশ কিছুদিন। এমন সময় এক আশার রশ্মি আমার সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো। ২৪ পরগণার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত আই, এ, এস একখানি ষ্টীমার দিতে স্বীকৃত হয়েছেন জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য। অত্র সঙ্ঘের দীনতম সেবক আমি। সেকারণ অন্যান্য সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার যাওয়াও ঠিক হলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সুন্দরবনে ইহা আমার দ্বিতীয় অভিযান। ইতিপূর্ব্বে ২৩শে সেপ্টেম্বর স্থলপথে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল দেখে তথাকার জনসাধারণের জন-জীবনের সুবিধাঅসুবিধা, আচারব্যবহার জান্‌বার সুযোগ হয়েছিল। আর আজ জলপথে সুন্দরবনের অন্য অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য নতুন অভিযান। যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে সেই সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমার প্রণতি জানাই। ফণীদা আমাদের সঙ্ঘের সভাপতি।

১৬ই নভেম্বর যাওয়ার দিন ঠিক। ট্রেণ সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে। আগের দিন ট্রেণে ক্যানিংএ গিয়ে আমাদের থাক্‌বার কথা এবং পরের দিন সকালে ক্যানিং হতে ষ্টীমার যোগে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে যাওয়া স্থির। পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত সকলে শিয়ালদহ ষ্টেশনে জমায়েত হতে লাগলেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। অফিস খোলা—সে কারণ অধিকাংশ ব্যক্তিকে নিজেদের কাজ সেরে আসতে হয়েছে। তাতে একটু দেরী হওয়া স্বাভাবিক। তা না হলে সকলেই পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সময়ে পৌছতে পারতেন। যখন ষ্টেশনে পৌছলাম তখন ৭টা বাজতে ১০ মিনিট বাকী। সংঘের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ ফণীদা পূর্ব্বাহ্নে এসেই অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন হাওড়া-বার্ত্তার সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল। একে একে এলেন—ইছাপুর থেকে স্বাধীনতার প্রতিনিধি মানিক সরকার, বনগ্রাম থেকে সাধুজনপত্রিকার প্রতিনিধি বন্ধুবর গোপালচন্দ্র সাধু, ভ্যাবলা (বসিরহাট) থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার

প্রতিনিধি অশোক মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ চাতরা থেকে আনন্দবাজার-পত্রিকার প্রতিনিধি হরেন রায়, বাটানগর থেকে লোক-সেবকের প্রতিনিধি বন্ধুবর জিতেশ বসু, বসিরহাট থেকে ইউ, পি, আইএর প্রতিনিধি, সংঘের সহ-সভাপতি বিজয়চন্দ্র দাশ বি-এল, বরাহনগর থেকে ইউ, পি, আইএর প্রতিনিধি বিষ্ণুপ্রসাদ কুমার ও তাঁহার ভ্রাতা প্রেস-ফটোগ্রাফার আদিত্য কুমার, খড়দহ থেকে সুবাস ঘোষ ও সঙ্গে তিন চার জন বন্ধু, মিতালীর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি স্বামীনাথ বসু ও ইটাগু়া-নিবাসী তারকনাথ সেন প্রভৃতি ৩০ জন সাংবাদিক। সকলে ট্রেণে যথানির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। অপেক্ষা করছি আমি ও ফণীদা—গ্রামের কথার প্রতিনিধিদের জন্য। তাদের আসবার কোন ইঙ্গিত না পেয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরাও গিয়ে উঠলাম ট্রেণে। ঘড়ির কাঁটা তার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে গেল কিন্তু ট্রেণ ছাড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট দেরীতে ট্রেণ ছাড়লো। সম্ভবতঃ ট্রেণের সময় রক্ষার ইহাই উজ্জ্বলতম উদাহরণ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী না ছাড়া এবং গন্তব্যস্থলে গাড়ী না পৌঁছানর জন্য প্রায়ই রেলকর্ম্মচারীদের সঙ্গে ডেলী-প্যাসেঞ্জারদের সংঘর্ষ হয়। এ নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরং!

অবশেষে গাড়ী ছাড়লো—পিছনে ফেলে কলকাতা সহর, শিয়ালদহ ষ্টেশন আর প্রিয় জিনষে। ট্রেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কথার কর্ম্মীদের সংবাদ জানবার জন্য সকলেই উৎসুক হয়ে উঠলেন। কে যেন জানালেন তাঁরা বালীগঞ্জ ষ্টেশন থেকে উঠবেন। দেখতে দেখতে গাড়ী বালীগঞ্জে এসে পৌঁছালো। ট্রেনে জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন সবাই গ্রামের কথার কর্ম্মীদের সন্ধানে। গ্রামের কথার কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রীতিভাজন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় সুসজ্জিত অবস্থায় অপেক্ষা করছিল ষ্টেশন প্লাটফরমে—সঙ্গে ছিলেন বন্ধুবর নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দ, এবারে আনন্দের শেষ নেই। ক্ষণিকের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মিলবার যে সুযোগ পাওয়া গেল তার সদ্ব্যবহার করতে কেহই ত্রুটী করলেন না। মিতালীর সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি বন্ধুবর স্বামীনাথ বসু একাই একশ। সমস্ত গাড়ী জমিয়ে রেখেছেন। সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বিধান চট্টোপাধ্যায়, শচীন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এইভাবে শীতের রাতের ভিতর দিয়ে তেপান্তরের মাঠ, খাল, বিল, নালা, আর ধান ক্ষেত পেরিয়ে গাড়ী গিয়ে যখন ক্যানিংএ পৌঁছাল তখন ১০টা ১০ মিনিট। গাড়ী থেকে নেমেই দেখলাম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন জেলা স্কুল বোর্ডের প্রতিভূ-সভাপতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্কর মহাশয়ের প্রতিনিধি। আমাদের এই পরিক্রমার প্রথম দিনে খগেনবাবুর অতিথি হবো বলে স্থির ছিল। খগেনবাবু এই অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী ও বিত্তবান লোক। ধীরে ধীরে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম মাতলা নদীর তীরে—লঞ্চ সিণ্ডিকেটের নবনির্ম্মিত দ্বিতল ভবনে। সরকারী সাহায্যে লঞ্চ সিণ্ডিকেটের কর্ত্তৃপক্ষ এই দ্বিতল ভবনটী নির্ম্মাণ করেছেন যাত্রীদের জন্য। এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন সার্কেল অফিসার শ্রীউষারঞ্জন বসু, ক্যানিং ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীরামরঞ্জন সেন ও ডাঃ নির্ম্মলকুমার রায় এম-বি। আমরা যেদিন এখানে পৌঁছালাম সেদিন ছিল রাস-পূর্ণিমা। পূর্ণিমার রাতে পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার সুষমারাশি নদী বক্ষে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছিল—আর দ্বিতল হতে তা অবলোকন করছিলেন সাংবাদিক বন্ধুগণ।

নিতান্ত অসময়েই এসেছি আমরা। সে-কারণ একটু বিব্রত বোধ করছিলাম। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা না যাওয়া পর্য্যন্ত রান্নার কোন ব্যবস্থা করেন নি। কারণ কতজন আমরা যাবো সেটা তাদের জানা ছিল না। যাহা হউক ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা আমাদের ভুরিভোজে আপ্যায়িত করলেন। যেরূপ নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও অতিথি সৎকারের পরিচয় দিলেন তাঁরা, তা সত্যই প্রশংসার্হ। ভেবেছিলাম পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত রাতটা নির্ব্বিঘ্নে কাটবে, কিন্তু সে হবার নয়। ক্ষণিকের মিলনের উন্মাদনা সকলকে পেয়ে বসেছে—শুরু হই একের পর এক চলেছে আবৃত্তির হুল্লোড়। সকলকে হারমানিয়ে চললেন পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বারাকপুরনিবাসী শ্রীশচীন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে। সঙ্গে মাঝে মাঝে বাঁশী বাজিয়ে শোনাচ্ছেন বিধান চট্টোপাধ্যায় ও শচীন মুখোপাধ্যায়। এরূপ হাসি-তামাসা ও হৈ হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে রাত কেটে গেল। ভোরেই বিছানা ছেড়ে সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন পরবর্ত্তী যাত্রার জন্য। কেহ কেহ বা স্নান পর্ব্বও সেরে নিলেন, ইতিমধ্যে এসে গেলেন সার্কেল অফিসার মহাশয়। সকলে যাত্রা করলাম ক্যানিংএর উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ দেখতে। বালিকা বিদ্যালয়, থানা-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দেখে আমরা এসে পড়লাম কুমারশায়ে অনাথ আশ্রমে, সরকারী সাহায্যে এখানে একদল অনাথ বালক শিক্ষালাভ করছে। সরকারী অনাথ আশ্রম দেখে খুসী হলেন সাংবাদিকগণ। আরও খুসী হলেন জেনে যে, এই অনাথ আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জেলার খ্যাতনামা সমাজসেবী শ্রীমুরারীশরণ চক্রবর্ত্তীর উপর। আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের জলযোগে আপ্যায়িত করলেন। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে দলের নেতা আশ্রম বালকদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য দশটী টাকা দিলেন শ্রদ্ধেয় মুরারীদার হাতে।

আশ্রম থেকে ফিরবার পথে আমরা এক বৃদ্ধ কৃষক রমণীর সন্ধান পেলাম। নাম তার নীরোদামোহিনী দাসী। এই বিধবা গ্রাম্য কৃষক-রমণী—তার সমস্ত জীবনের সঞ্চিত ও একমাত্র উপজীব্য ৮ বিঘা ধানের জমি তার দেশের বিধবাদের কল্যাণের জন্য দান করেছেন। তার একান্ত ইচ্ছা, সরকার তার গ্রামে একটী বিধবা আশ্রম স্থাপন করুক। ক্যানিংএর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাসমূহ দেখে আমরা মোটামুটি খুসীই হয়েছি। যেস্থান একদিন ছিল বন জঙ্গলে ভরা শ্বাপদ-সঙ্কুল আজ সে-স্থান মানুষের পদধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর সরকারী প্রচেষ্টায় এই সুদূর পল্লী অঞ্চলে সহরের সর্ব্ববিধ সুখ-সুবিধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছিয়েছে—হাসপাতালের শীঘ্রই দ্বারোদ্ঘাটন হবে। কলকাতার সঙ্গে

সরাসরি বাস সংযোগ স্থাপনের জন্য বিরাট রাস্তা তৈরী হচ্ছে—শীঘ্রই এর নির্ম্মাণ কাজ শেষ হবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রণীত ভ্রমণ-সূচী অনুযায়ী ১৭ই নভেম্বর সকাল ৮-৩০ মিঃ-এ ক্যানিং থেকে আমাদের যাত্রা করার কথা। সঙ্গে যাচ্ছেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা উন্নয়ন অধিকর্ত্তা শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার। ক্যানিং-এর উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ দেখ্‌তে বেশ কিছু দেরী হয়ে গেল। সেজন্য ৮-৩০ মিনিটের পরিবর্ত্তে ১০টায় আমরা যাত্রা করলাম। বিমলবাবু ঐ দিন সকালবেলা কল্‌কাতা থেকে এসে ষ্টীমারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সম্পাদক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। এবার অন্যান্য সাংবাদিকবন্ধুদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন দলের নেতা কর্ণাদা। বিমলবাবুর মত অমায়িক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সরকারী কর্ম্মচারী সত্যই দুর্লভ। তাঁর সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা হতে লাগ্‌লো, ততই যেন তাঁকে নতুন করে চিন্‌তে বা জান্‌তে লাগলাম। জেলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী হলেও তাঁর মধ্যে কোন অভিমান নেই। কিভাবে দেশকে গঠন করা যায়—তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কিভাবে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন, এই চিন্তাই তাঁকে সর্ব্বক্ষণের জন্য গ্রাস করে রেখেছে। আমার বেশ মনে আছে সুন্দরবন পরিক্রমা শেষ করে ফিরবার পথে আমরা মসজিদ্‌বাটীতে একটি বিদ্যালয় দেখ্‌তে যাই। সনাতন নস্কর নামে একজন গ্রাম্য কৃষক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১২৫ বিঘা ধানের জমি ও নগদ ৩ হাজার টাকা দান করেছেন। সরকার হতেও এখানে ১০ হাজার টাকা দান করা হয়েছে; ২৩ হাজার টাকা খরচ করে যে বিদ্যালয় ভবন নির্ম্মাণ করা হয়েছে সেটা দেখে সাংবাদিকগণ পরিতৃপ্ত হন। এখানে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এক অভিনব প্রথায় আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। অভ্যর্থনা সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে সরকারী প্রতিনিধি বিমলবাবুকে বিদ্যালয় নির্ম্মাণে তাঁরা যে সাহায্য দিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সম্বর্দ্ধনার জবাব দিতে উঠে বিমলবাবু প্রথমে যে কথাটী বল্লেন তা সত্যই অনুধাবনযোগ্য; কোনরূপ দ্বিধা না করে তিনি বলে দিলেন যে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কারণ তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। আর সে দায়িত্ব পালন করবার জন্য জনসাধারণ তাঁকে মোটা টাকা বেতন দিচ্ছেন। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর মুখে জনসাধারণের নিকট থেকে যে বেতন পাচ্ছেন এ স্বীকৃতি এই প্রথম শুনলাম। আলাপ আলোচনার মধ্যে আমরা এসে পৌঁছালাম মৌখালীতে। মৌখালীর দূরত্ব ক্যানিং থেকে বেশী নয়।

বর্ষায় নদীর লবণাক্ত জলসমূহ যাতে পার্শ্ববর্তী সমতল জমিতে প্রবেশ করে ফসলের ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য এই অঞ্চলে নদীর উভয় তীরে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী মাটির বাঁধ দেওয়া আছে। কিন্তু এই বাঁধসমূহের উপর সব সময় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। সেজন্য সংরক্ষণের জন্য এক নতুন প্রচেষ্টা চল্‌ছে মৌখালীতে। ওখানে ইহা সাফল্য-মণ্ডিত হলে সর্ব্বত্র এই ধরণের বাঁধ নির্ম্মাণ করা হবে। ২০০০ ফিট লম্বা এবং ১০ ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট এই বাঁধটা প্রথমে মাটি দিয়ে তৈরী করে তার উপর ইটের গাঁথুনী দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৪ সালে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে শেষ হয়। কিন্তু আজও সে বাঁধ অটুট রয়েছে। বাঁধের কোথাও কোন ছিদ্র এখনও দেখা যায় নি। ঐখান থেকে সাংবাদিকগণ পুনরায় ক্যানিংএ ফেরেন মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য। এবারও আমরা খগেনবাবুর অতিথি। খগেনবাবুর অবর্ত্তমানে ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি রামবাবু কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সাহায্যে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছ-ভাতের ব্যবস্থা করলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ১২টা ১০ মিনিটে আমরা যাত্রা করলাম সুন্দরবনের অভ্যন্তরের দিকে মাতলা ও বিদ্যাধরী নদীর মধ্য দিয়ে। ভ্রমণ-সূচী অনুসারে আজই আমাদের ডাবুগেট, বাসন্তী, মসজিদবাটী, মন্মথনগর দেখে গোসাবায় পৌঁছানর কথা। পূর্ব্বেই দেরী হয়ে গিয়েছিল যাত্রা করতে, তারপর পথিমধ্যে ডাবুগেটে গিয়ে বেশ কিছুটা দেরী হয়ে গেল। সর্ব্বোপরি ষ্টীমারের মন্থর গতির ফলে ঐ দিন বাসন্তী ও মসজিদ-বাটীতে নামা সম্ভব হলো না। ডাবুগেট থেকে সোজা চলে গেলাম মন্মথ নগরে। সেখান থেকে গোসবায় রাত্রি যাপন। যাত্রা পথে বাসন্তী ও মসজিদ্‌বাটীতে অসংখ্য নরনারী নদীতীরে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। তাদের নিরাশ করে চলেছি আমরা।

ডাবুগেটে সাংবাদিকদের সেচ ব্যবস্থার একটী অংশ দেখান হলো। সোনারপুর আরাপাঁচ পরিকল্পনার উহা শেষ অংশ। কতকগুলি খাল খনন করে স্লুইস গেট নির্ম্মাণ করে ঐ অঞ্চলের আটক জল নিষ্কাশন করে ৬০ বর্গমাইল অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা চল্‌ছে এখানে। সঙ্গে সঙ্গে কল্‌কাতার সহিত সরাসরি সংযোগ সাধনের জন্য উত্তরভাগ থেকে একটী বিরাট রাস্তাও নির্ম্মিত হচ্ছে। বর্ত্তমান বৎসরেই উহার কাজ শেষ হবে। ডাবুগেট থেকে সাংবাদিকগণ চল্‌লেন মাতলা নদী ধরে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে। নদীর উভয়তীরে সহস্র সহস্র জনতা দু হাত তুলে সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। দিন শেষে ক্লান্ত রবি তখন অস্তাচলগামী। বাসন্তী ও মসজিদবাটী ছেড়ে সাংবাদিকগণ এসে পৌঁছালেন মন্মথনগরে। সাংবাদিকগণ বিশেষ ক্লান্ত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৈকালিক আহার তাদের হয় নি—বিশেষ করে চা। সেজন্য মন্মথনগরে কৃষি ফার্ম্ম দেখ্‌তে সকলে নামলেন না। যাঁরা নামলেন তাঁরা জ্যোৎস্না রাতে মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে আইল ধরে চলেছেন কৃষি ফার্ম্মের দিকে। গেঁয়ো, সুন্দরী ও গরাণ গাছে ভরা সুন্দরবনের প্রকৃত রূপের কিছুটা অবশ্য দেখা গেল। বাংলার বিখ্যাত রয়েল টাইগার দেখা তাদের ঘটে নি। জনবসতিশূন্য স্থানে একদল সরকারী কর্ম্মচারী লোনা জলেও যাতে ফসল হতে পারে এবং উন্নত ধরণের বীজধানের জন্য এখানে গবেষণায় ধ্যানমগ্ন। ১৫০ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে সরকারী কৃষি ফার্ম্ম। বর্ত্তমান বৎসরে প্রথম চাষ করা হয়েছে—ফসলও হয়েছে প্রচুর।

ঐখান থেকে সাংবাদিকগণ গিয়ে পৌছলেন গোসাবাতে। আজকের মত শ্রান্ত ও ক্লান্ত সাংবাদিকদের এইখানে বিশ্রামের ব্যবস্থা। হ্যামিলটন ষ্টেটের অতিথি আমরা। এখানে পৌছাবার পূর্ব্ব থেকে একদল সমাজসেবী কর্ম্মী, গ্রামবাসীগণ ও ষ্টেটের সদস্তবৃন্দ আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্ত নদীতীরেই অপেক্ষা করছিলেন। হ্যামিলটন ষ্টেটে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের চা পানের ব্যবস্থা হয়, চা পান করে সাংবাদিকগণ সুস্থ বোধ করতে থাকেন এবং সমাজসেবী কর্ম্মীদের সহিত আলোচনায় রত হন। রাত্রি ৯টায় সংঘের সদস্তগণ সাংগঠনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গোসাবা ষ্টেটের কর্ম্মীবৃন্দ সাংবাদিকদের আদর আপ্যায়নের কোন ক্রটী করেন নি। রাত্রিতে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করে তাঁহারা ধন্তবাদভাজন হয়েছেন। পরদিন রবিবার সকালে গোসাবা ত্যাগ করে মসজিদবাটীতে পৌছলেন সাংবাদিকগণ। ঐ স্থানে তাহাদিগকে একটী নূতন উচ্চ বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন একটী ছাত্রাবাস দেখান হয়। ছাত্রাবাসে ৩০ জন ছাত্র বাস করে, তাহারা অতি অল্প খরচে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। ঐখান থেকে এবার বাসন্তীতে যাত্রা করা হোলো। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সাংবাদিকগণ ক্ষুধার্ত্ত, বাসন্তীতে তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন ক্যানিংএর সার্কেল অফিসার শ্রীউষারঞ্জন বসু মহাশয়। পূর্ব্বদিন ক্যানিং হতে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি বাসন্তী পর্য্যন্ত এসেছিলেন এবং সেই দিনেই বাসন্তীতে সাংবাদিকদের আহারের ব্যবস্থা করে রেখে নিজের লঞ্চে ক্যানিং-এ ফিরে গেছেন।

বাসন্তীতে দুই জন শ্বেতাঙ্গ যুবক অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন। সরকারী সাহায্যে ও স্বেচ্ছাশ্রমে এখানে সাত মাইল দীর্ঘ একটি মাটীর রাস্তা তৈরী হয়েছে। মিশনারীগণ স্নেহলতা মাতৃসদন, বিদ্যালয় ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন। জনৈক মিশনারী কর্ত্তৃক বিনা বাল্‌বে নতুন রেডিও আবিষ্কার সত্যই অদ্ভুত। মিশনারীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বাতাস-চালিত নলকূপ হইতে সেচের জন্ত জল নির্গমন সাংবাদিকদের উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। এখানে মিশনারীগণ সাংবাদিকগণকে প্রচুর জলযোগ ও মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন। মিশনারীদের কার্য্যাবলী সাংবাদিকদের মনে গভীর রেখাপাত করে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর সাংবাদিকগণ ক্যানিং অভিমুখে যাত্রা করেন এবং রাত্রির ট্রেণে কল্‌কাতায় এসে পৌছান।

সাংবাদিকগণ যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই জনসাধারণের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। তাঁদের ভ্রমণ-পথে জনসাধারণ ঐ সব অঞ্চলের উন্নয়নের জন্ত সরকারী প্রচেষ্টাসমূহকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সুন্দরবনের সমস্তাসমূহের সমাধানে সরকারের আন্তরিকতায় তাঁরা সন্দিহান নহেন। তবে সরকারী লাল-ফিতার বেড়াজাল ভেদ করে যেরূপ মন্থর গতিতে কাজ চলেছে তাতে তাঁরা বিক্ষুব্ধ। আমরা যে সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছি তার প্রায় সর্ব্বত্রই বাঁধ বাঁধার সমস্তাই প্রধান। তার পর পানীয় জল। বাঁধ সংরক্ষণের জন্ত সরকার থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, কিন্তু তার অধিকাংশই যাচ্ছে ঠিকাদারের কবলে। ঠিকাদারদের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সমবায় সমিতির মারফৎ সরকার যদি বাঁধ বাঁধার ব্যবস্থা করেন তাহলে সুফল ফলতে পারে। ৫২ ঘণ্টাকাল ৩০ জন সাংবাদিক এক সঙ্গে কেবল শুধু নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করে নি। দেশ, বিশেষ করে অনগ্রসর সুন্দরবনের নতুন বাংলার সঙ্গে সম্যক পরিচিত হয়েছেন। এই অঞ্চলে যে সকল জমি উদ্ধার করা হয়েছে তার বহু স্থানে উদ্বাস্তু কৃষক ও ধীবরগণকে পুনর্ব্বসতি দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চল নদীবহুল বলে মৎস্ত শিকার ও তার ব্যবসা প্রসার লাভ করেছে। সাংবাদিকদের এই ভ্রমণ আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, কিন্তু সুন্দরবনের প্রকৃত রূপ দর্শনে বঞ্চিত হয়ে অনেকে মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

দেবতা হাসে

শ্রীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর আলোকের ঝলমলে সাজে
নগরের প্রাণ-কেন্দ্র হাসে ;
ভীড় করে আছে যত বিলাসীর দল
পরম পুলকে তারা ভাসে।
বড় বড় হোটেলেতে শুধু শোনা যায়
পিয়ানোর টুংটান সুর ;
সুরা আর উপাদেয় খাবারের গন্ধে
চারিদিক করে ভরপুর।

রাজপথে উপবাসী ভিখারীর দল
চেয়ে থাকে ক্ষুধিত নয়নে ;
খোঁজে এক টুকরো রুটী কিংবা মাংস
পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ডাষ্টবিনে।
যাহা মেলে বসে খায় কুকুরে, মানুষে
পরম আকণ্ঠ গোগ্রাসে ;
মানুষে মানুষে এই প্রভেদ হেরিয়া
অলখেতে দেবতা যে হাসে !

সমালোচক

(আণ্টন চেকভ্)

অনুবাদক—হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্যামিওনিচ্ মস্কোর বাসিন্দা। আইন পরীক্ষায় পাস করে রেলওয়ে বোর্ডে কাজ করে। তার পেশা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে চায়, মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, াহিত্যচর্চা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করবার পর স্যামিওনিচ্ একটি সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখে। সেটি 'নাট-মঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তার সাহিত্য-জীবন সেখান থেকেই আরম্ভ। সে মালোচনা-প্রবন্ধ রচনা করতে থাকে, ঐ কাগজটিতেই তার াপ্তাহিক সাহিত্য-সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। াহিত্যকর্ম তার কাছে ক্ষণিকের অবসর নিবেদন মাত্র য়। তার চেহারা, প্রশস্ত ললাট ও সুদীর্ঘ কেশরাজি াখে ও কথাবার্তা শুনে মনে হয়—সাহিত্য তার ধমনীর ক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে, মস্তিষ্কের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ পে গড়ে উঠেছে। কথাবার্তায়, হাবভাবে ও চালচলনে ার সাহিত্যিক জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। সে ম্ভীরভাবে কফিনের উপর পুষ্পমাল্য দান করে, জন-াধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ রে, বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হবার গভীর াগ্রহ দেখায়, প্রতিভা আবিষ্কারের চেষ্টা করে। তার ৎসাহ, কর্মশক্তি, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, নাড়ির দ্রুত ান্দন, দরিদ্র ছাত্রদের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত সংগীত ও হিত্যসভায় যোগদান, তারুণ্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ত্যাদি গুণাবলী ও কর্ম তাকে সাহিত্য-জগতে খ্যাতিমান রতে পারে। প্রবন্ধ রচনা না করলেও কিছু যায় াসে না।

সংগ্রামশীল সে নয়, সামনের দিকে এগিয়ে চলে না সে। তবু সে সাহিত্যিক। আদর্শ সম্বন্ধে তার বক্তৃতা পরিহাস বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময় ও উৎসবের দিনে সে মদ খায়, বেসুরো গান ধরে, উৎফুল্লভাবে বলে, দেখ আমি মদ খেয়েছি, কিন্তু নেশা হয় নি। তার এ আচরণও অশোভন মনে হয় না।

সাহিত্যবৃত্তির উপর স্যামিওনিচ্-এর অবিচল আস্থা—এতটুকু সন্দেহ নেই। আত্মতৃপ্ত সে। একমাত্র আপশোস—যে কাগজে সে লেখে তার প্রচার সীমাবদ্ধ। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস—সে অবিলম্বে কোন বিশিষ্ট সাময়িকপত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাবে। আশার উজ্জ্বল দীপ্তির মধ্যে তার এই বেদনা প্রকাশের সুযোগই পায় না।

সেদিন স্যামিওনিচ-এর বাড়িতে তার বোন ভেরার সঙ্গে পরিচয় হলো। ভেরা লেডি-ডাক্তার। তার অবসন্ন দৃষ্টি ও ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তরুণী সে, লম্বা-দোহারা গড়ন—অসঙ্গতি নেই কোথাও। তবু তার দাদার সঙ্গে তুলনা করলে তাকে উদাস, নির্লিপ্ত ও গম্ভীর মনে হয়। তার চলাফেরায় হাসিতে ও কথায় যেন রয়েছে উদাসীনতার ছাপ। তাকে ভালো লাগলো না আমার। সে যেন গর্বিতা, বুদ্ধিমতী নয় তেমন।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথায় হাতখানি রেখে তার দাদা বলল, দেখ বন্ধু, চেহারা দেখে লোক চেনা যায় না। এই বইটি দেখ। বইটি পড়া হয়ে গেছে। ধূলিমলিন, মোচড়ানো, ছিন্ন অবস্থায় বইটি পড়ে আছে সম্পূর্ণ অনাদৃত ভাবে। কিন্তু বইটি একবার খুললেই তোমার চোখের জল

বেরোবে, বিবর্ণ হয়ে যাবে তুমি। আমার বোনটিও ঠিক বইটির মতো। বাইরের আবরণটি খোল, তার মনের মধ্যে উঁকি মেরে দেখ, শিউরে উঠবে তুমি। গত তিনমাসে গোটা একটি জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ভেরা।

স্যানিওনিচ্ একবার চারদিকে দেখলো। আমার জামার কোণ ধরে চুপি চুপি বলল:

জান, ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে সে এক স্থপতির প্রেমে পড়ে, তাকে বিয়ে করে। সে এক বিরাট ট্রাজেডি। বিয়ের পর এক মাস হতে না হতেই স্বামী টাইফাস্ রোগে মারা যায়। সুধু কি তাই? ভেরা নিজেও টাইফাস রোগের কবলে পড়ে। সুস্থ হয়ে সে যখন শুনলো তার স্বামী মারা গেছে, তখন সে একডোজ "মরফিয়া" খেয়ে ফেলে। তার বন্ধুরা যদি তার সেবা-যত্ন না করতো, তবে এতদিনে আমার ভেরা চলে যেত স্বর্গে। বল, এটা কি ট্রাজেডি নয়? আমার বোন কি এমন একজন শিল্পী নয়—যে তার জীবনের পাঁচটি অঙ্কই অভিনয় করে ফেলেছে? শ্রোতৃবর্গ হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের প্রতীক্ষায় থাকুক, শিল্পীকে এবার বিশ্রাম নিতেই হবে।

তিনটি মাস কষ্টে যাপন করার পর সে এসেছে দাদার কাছে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উপযুক্ত সে নয়—হাঁফিয়ে পড়েছে সে, তৃপ্তি পায় নি এই বিদ্যায়। তাকে দেখে মনে হয় না—চিকিৎসা বিদ্যায় তার কোন বোন আছে। কখনও সে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি কথাও বলে না।

ডাক্তারী ছেড়ে সে বেকার অবস্থায় বন্দীর মতো নীরবে গভীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে কাটাতে লাগলো তার যৌবনের বাকী দিনগুলি। সুধু একটিমাত্র বস্তুর উপর সে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নয়। তার দাদাই তার জীবনের গোধূলিবেলায় ক্ষীণ আলোকরশ্মি। তাকে সে ভালবাসে, ভালবাসে তার দৈনন্দিন কর্মসূচী, পরম শ্রদ্ধাভরে পাঠ করে তার রচিত প্রবন্ধগুলি। তার দাদা কী করছে জিগ্যেস করলে চাপা-গলায় বলে, লিখছে। ভয় পায়—তাকে জাগাতে কিংবা তার অভিনিবেশ নষ্ট করতে।

স্যামিওনিচ লেখে, তার বোন পাশে বসে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার হাতখানির দিকে। তাকে দূর থেকে দেখে মনে হয়—একটি রুগ্ন প্রাণী রোদ পোহাচ্ছে।

শীতের সন্ধ্যা। স্যামিওনিচ একটি প্রবন্ধ লিখছে। ভেরা বসেছে তার পাশে, ঠিক তেমনি ভাবে চেয়ে আছে দাদার হাতখানির দিকে। সমালোচক লিখে যাচ্ছে অনর্গল, কলমের খচ্ খচ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। টেবিলের উপর হাতের কাছে পড়ে রয়েছে একটি খোলা সাময়িকপত্র। কৃষকজীবন সম্বন্ধে একটি গল্পের সমালোচনা লিখছে স্যামিওনিচ। তার মনে হলো—লেখক অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে কৃষকজীবনের বর্ণনা দিয়েছে, প্রকৃতির শোভা বর্ণনায় টুর্গেনিভের সঙ্গে লেখকের তুলনা করলো, ভাবলো—কৃষক জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সমালোচক নিজেই কৃষকদের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ. লোকমুখে যা শুনেছে ও বই পড়ে যা জেনেছে তাই তার সম্বল। তবু, গল্পটির মধ্যে সে পেলো সত্যের স্পর্শ। ভবিষ্যদ্বাণী করলো—লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, লিখলো—গল্পের শেষটুকুর জন্য সে অধীরভাবে অপেক্ষা করবে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আনন্দে চোখ বন্ধ করে বলল, চমৎকার গল্প। সুরটি মনোজ্ঞ।

ভেরা তার দিকে চাইলো, হাই তুললো।

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বলতো, অন্যায়ের অপ্রতিরোধ মানে কী?

চোখ তুলে স্যামিওনিচ বলল—অন্যায়ের অপ্রতিরোধ!

: হ্যাঁ; তার মানে কী?

: না—না, ন্যায় সম্মত সংজ্ঞা বল।

স্যামিওনিচ ভাবলো। বলল, ন্যায়সম্মত সংজ্ঞা! হুঁ—বেশ। অন্যায়ের অপ্রতিরোধ মানে হলো—যাকে নৈতিকতার দিক থেকে অন্যায় বলা হয়, তাতে হস্তক্ষেপ না করা।

টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একখানি উপন্যাস তুলে নিল স্যামিওনিচ। উপন্যাসটি লিখেছেন জনৈকা মহিলা। উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে একটি নারীর জীবনের বিশৃঙ্খল অবস্থার একটি বেদনাবিধুর আলেখ্য। সেই নারী তার প্রেমিক ও অবৈধ সন্তানের সঙ্গে বাস করছিল। গল্পটির ভাব, বিন্যাস ও বিষয়বস্তু তার ভালো লেগেছে। সে গল্পটির সার সংকলন করলো, গল্পটির একটি অংশ বেছে নিল। তার সঙ্গে জুড়ে দিল নিজের মন্তব্য: "জীবন্ত, বাস্তব ও অনির্বচনীয় মধুর! লেখিকা শুধু শিল্পী নন, প্রকৃত মনোবিজ্ঞানী।

তিনি তাঁর স্পষ্ট চরিত্রের মনোরাজ্যে প্রবেশ করেছেন। প্রেমিকের সঙ্গে মিলনে নায়িকার আবেগ ও মনোভাবের সজীব বর্ণনাটি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে।"

ভেরা বলল, গতকাল থেকে আমার মনে একটি অদ্ভুত ভাব জেগেছে। যদি অন্যায়কে প্রতিরোধ না করার ভিত্তিতে মানুষের জীবন চলতো, তবে আমরা সব কোথায় যেতাম ?

: হয়তো কোথাও না। ত'াতে মানুষের অপরাধ-বৃত্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হতো, সভ্যতার কথা বাদ দিলেও, তার ফলে পৃথিবীতে জাগতো একটি প্রচণ্ড আলোড়ন। একটি পাথরও স্থির হ'য়ে থাকতো না।

: কী থাকতো তবে ?

: পতিতালয়। আমার পরবর্তী প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো। তুমি সেকথা আমায় মনে করিয়ে দিয়েছ সেজন্য ধন্যবাদ।···

স্যামিওনিচ তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলো। যুগোপ-যোগী হলো তার প্রবন্ধটি। এখন যুদ্ধ ও অপ্রতিরোধ সম্বন্ধে লোকে বক্তৃতা দেয়, লেখে—বিচারের অধিকার, শাস্তিবিধান ও যুদ্ধঘোষণা সম্বন্ধে আলোচনা করে, সাধারণ লোকেরা বাড়ীতে চাকর রাখে না, অনেকে ইতিমধ্যে পাড়াগাঁয়ে বসবাস এমন কি কৃষিকার্য আরম্ভ করেছে, মাংসাহার ও দেহজ কামনা পরিহার করেছে। সুতরাং স্যামিওনিচ অন্যায় করেনি।

দাদার প্রবন্ধটি পাঠ করে ভেরা চিন্তা করলো, ঘাড় নাড়লো। বলল, চমৎকার! কিন্তু অনেক কিছুই বুঝি নি। যেমন—লেস্‌কভের সেই গল্পটি—"গীর্জার সম্পত্তি।" সেখানে রয়েছে এক অদ্ভুত মালা, সে সকলের কল্যাণের জন্য বীজ বপন করে—ক্রেতাদের জন্য, ভিখারীর জন্য—আর যারা চুরি করে তাদের জন্য। সে কি বুদ্ধিমানের কাজ করে ?

ভেরার বাচনভঙ্গি থেকে স্যামিওনিচ অনুভব করলো প্রবন্ধটি তার ভালো লাগেনি। লেখক হিসাবে তার আত্মাভিমানে আজ লাগলো প্রথম আঘাত। একটু বিরক্ত হয়ে বলল, চুরি করা অন্যায়। চোরের জন্য বীজ বপন করার মানে হলো চোরদের বেঁচে থাকার অধিকার মেনে নেওয়া। আমি যদি একখানি কাগজ বার করি—আর তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ থাকে যাতে নিন্দনীয় ও উদার মত প্রচার করা যায়, তা'হলে কি মনে করবে তুমি? সেই মলীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত শয়তানদের জন্য আমারও তেমনি একটি বিভাগ খোলা দরকার। কেমন, না ?

উত্তর দিল না ভেরা। অবসন্নভাবে সোফায় এলিয়ে পড়লো। তারপর একটু ভেবে বলল, আমি কী জানি তার ? তোমার কথা হয়তো ঠিক; কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের অপ্রতিরোধ নীতির মধ্যে মিথ্যে একটা কিছু রয়েছে, হয়তো বলছে গোপন, না-বলা একটা কিছু। অপ্রতিরোধ নীতি হয়তো আমাদের কুসংস্কার—যা আমাদের মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, আমরা তা' ছাড়তে পারিনা, ঠিক মতো বিচারও করতে পারি না।

: তার মানে ?

: তোমায় বোঝাতে পারবো না আমি। হয়তো এ ধারণা ভ্রান্ত যে মানুষ অন্যায়কে প্রতিরোধ করবেই, তার সে অধিকার রয়েছে। আবার এও ভুল যে মানুষের অন্তরটা একেবারে নগণ্য, তার কোন দামই নেই। অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমরা বলপ্রয়োগ না করতে পারি, কিন্তু তার বিপরীতটা তো ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ যেমন ধর—যদি চাও যে তোমার এই ছবিটি চুরি না হোক, তবে ছবিটি তালা বন্ধ করে না রেখে কাউকে দান করে দিতে পার।

: তাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আমি যদি কোন ধনী নিম্নশ্রেণীর রমণীর পানিগ্রহণ করতে চাই, তাহ'লে এই গর্হিত কাজ থেকে আমায় নিবৃত্ত করবার জন্য নিজেই আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসা হবে তার কর্তব্য।···

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দু'জনে আলাপ-আলোচনা করলো। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না। বাইরের কোন লোক যদি আড়ি পেতে শুনতো, সেও বুঝতে পারতো না—তারা কী বলছে।····

সন্ধ্যাটা ঘরে বসেই কাটায় দু'জনে। তাদের কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। বন্ধুর প্রয়োজনও অনুভব করে না তারা। নতুন নাটক মঞ্চস্থ হলেই তারা থিয়েটারে যায়।

গান শুনতে যায় না তারা, গানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তাদের।…

পরদিন ভেরা আবার আরম্ভ করল, তুমি যাই মনে কর না কেন, প্রশ্নটা সমাধান করে ফেলেছি অনেকটা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর কোন অন্যায় করা হলে তাতে বাধা দেবার কোন দরকার নেই। কেউ যদি আমায় খুন করতে আসে, করুক। আত্মরক্ষা করতে গেলে খুনীকে তো আর শান্ত করা যাবে না। কেউ যদি আমার প্রতিবেশীদের অনিষ্ট করতে চায়, কী করবো আমি?

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো স্যামিওনিচ্। বলল, দেখ ভেরা, ক্ষিপ্ত হয়োনা। অপ্রতিরোধ দেখছি একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার কাছে।

সে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলে, কিন্তু পারলে না। তার হাসিটি হয়ে উঠলো কৃত্রিম, কটু।…

ভেরা তার টেবিলের পাশে বসলো না আর। রোজ সন্ধ্যায় তার মনে হয় তার পেছনে সোফায় শুয়ে রয়েছে একজন—যে তার সঙ্গে একমত নয়। তার পিঠে ব্যথা হলো, অন্তরখানি হিম হয়ে গেল। লেখকের আত্মাভিমান প্রতিহিংসাপরায়ণ, অশান্ত, ক্ষমাহীণ। আর তার বোনই জাগিয়ে তুলেছে সেই অস্থির অশান্ত ভাবটি—এ যেন একটি মোড়ক যা সহজে খোলা যায়, কিন্তু ঠিক তেমনি করে বাঁধা যায় না আর।

…সপ্তাহ কেটে গেল, মাস অতীত হলো। ভেরা অবিচল। সে আর টেবিলের পাশে বসে না।

সন্ধ্যা।

স্যামিওনিচ একখানি উপন্যাসের সমালোচনা লিখছে। উপন্যাসটিতে দেখানো হয়েছে—জনৈকা শিক্ষয়িত্রী অন্তরের গভীর প্রেম সত্ত্বেও তার শিক্ষিত বিত্তমান প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করেছিল শিক্ষয়িত্রী-জীবনের প্রতি তার অধিকতর আকর্ষণে।…

ভেরা সোফায় শুয়ে শুয়ে ভাবলো। বলল, জীবনটা কী শূন্য, কেমন নীরস! জানিনা, কী করবো। তোমার জীবনের অমূল্য সময়টুকু নষ্ট করছ তুমি। অপর রসায়নবিদের মতো বসে বসে পুরানো আবর্জনা ঘাঁটছ।

স্যামিওনিচ কলমটি রাখলো। তাকালো ভেরার দিকে। ভেরা বলল, তোমার দিকে চাইতে কষ্ট হয়। ফাউষ্ট-এর ওয়াগনার মাটি খুঁড়ে পোকা বার করতো, কিন্তু সে খুঁজছিল ঐশ্বর্য্য, তুমি সুধু পোকাই খুঁজছ।

: স্পষ্ট করে বল, কী বলতে চাও।

: এতদিন ধরে আমি সুধু ভেবেছি। এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে তুমি প্রতিক্রিয়াশীল ও নিতান্ত মামুলি। বল তো, তোমার এই কঠোর পরিশ্রম ও কাজের উদ্দেশ্য কি? আবর্জনাটুকু ফেলে না দিয়ে সব কিছু বিসর্জন দিয়েছ সুধু সেই আবর্জনারই জন্য। জলকে যতই বিশ্লেষণ কর না কেন, রাসায়নিকেরা যা' আবিষ্কার করেছে তার চেয়ে বেশি আর কিছু করতে পারবে না।

উঠে দাঁড়ালো স্যামিওনিচ। বলল, ঠিক, এসব আবর্জনা, কেননা এ ভাবধারা চিরন্তন। কিন্তু তোমার মতে নতুন কী।

: ভাবের রাজ্যে বাস কর তুমি। তুমিই ভাববে নতুনের কথা। আমি তোমায় শেখাতে যাবো কেন?

বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বিস্ময় ও ঘৃণার সঙ্গে সে বলল, আমি অপ-রসায়নবিদ? শিল্প, সভ্যতা—সবই কি অপ-রসায়ন?

: দেখ, তোমরা—সব চিন্তানায়কেরা যদি বড় বড় সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা কর, তবে ছোটখাট সমস্যাগুলিও আপনা থেকেই মিটে যাবে। যদি বেলুনে চড়ে শহর দেখতে চাও, তবে তারই সঙ্গে মাঠ, পল্লী ও নদী দেখতে পাবে। আমার মনে হয়—সমসাময়িক চিন্তাধারা এক যায়গায় এসে আট্‌কে গেছে। আমরা যেমন উঁচু পাহাড়ে উঠতে ভয় পাই—ঠিক তেমনি আমাদের চিন্তাও হয়ে পড়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভীরু—বেশিদূর অগ্রসর হতে ভয় পায়।

এধরণের কথাবার্তায় ভাই-বোনের সম্পর্ক দিনের পর দিন স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে গেল। বোনের সামনে বসে ভাই কাজ করতে পারে না, বোন সোফায় বসে তার দিকে চেয়ে আছে—একথা মনে হতেই অস্বস্তি বোধ করে। ভাই বোনের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেই বোন দুর্বলতার সঙ্গে ভ্রূকুঞ্চিত করে, সোফার উপর অবসন্নভাবে এলিয়ে পড়ে। রোজ সন্ধ্যায় বলে, একঘেয়েমি সহ্য হচ্ছে না তার, মনের স্বাধীনতা ও ঐতিহ্যের কথা তোলে। নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মন্তব্য করে, তার দাদার কাজটির মধ্যে

কোন বৈশিষ্ট্য নেই—যা' হয়ে গেছে তাকে ধরে রাখবার বৃথা চেষ্টা করে সংরক্ষণশীলেরা। মনে মনে তুলনার পর তুলনা করে। একবার ভাবে—তার দাদা অপ-রসায়নবিদ্, আবার ভাবে গোঁড়া—যে প্রাণ গেলেও কোন যুক্তি মানে না।

ভেরার আচরণেও পরিবর্তন দেখা গেল। সারাদিন কোন কাজ করে না, সোফার উপর শুয়ে থাকে; তবু তার মুখে উৎসাহহীনতা ও ক্লান্তি ফুটে উঠেছে। নিজেই নিজের ঘর ঝাঁট দেয়, মোছে, জুতো সাফ করে। এসব কাজ করতে দেখে তার দাদা রাগ করে। ভাবে, এর মধ্যে আন্তরিকতা নেই, সবই লোক-দেখানো। কৌতুক করে বলে, অন্যায়কে তুমি প্রতিরোধ করবে না। তুমি প্রতিরোধ করছ ভৃত্যকে। চাকর রাখা যদি অন্যায় হয়, তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ কেন?

ভেরাকে কাজ করতে দেখে সে কষ্ট পায়, অস্বস্তি বোধ করে, লজ্জিত হয়। অপরিচিত লোকের সামনে সে যখন কাজ করে তখন স্যামিওনিচের লজ্জার সীমা থাকে না।··

গভীর হতাশার সঙ্গে স্যামিওনিচ আমায় গোপনে বলল, এ হলো নিয়তির লীলা। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে সে। আমি কিছু বলি না তাকে। যা' খুশি করুক সে। কিন্তু আমার ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করবে কেন? কেন সে আমায় উত্তেজিত করবে? তার ভাবা উচিত—তার কথা শুনে আমার মনের অবস্থা কেমন হয়ে যায়। যীশুখৃষ্টের বাণীর সাহায্যে সে যখন তার ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করে, তখন আমার দম আটকে যায়, মনে হয় শিক্ষা ও পূর্ণতার অভাবের ফলই এমনি। ডাক্তারী পড়তে গিয়ে সে সাধারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছুই শেখে নি।···

আপিস থেকে ফিরে স্যামিওনিচ দেখলো—তার বোন কাঁদছে! সে মাথা হেঁট করে সোফার উপর বসে আছে, হাত কচলাচ্ছে, আর তার দু'গণ্ড বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা।

বেদনায় কেঁপে উঠলো সমালোচকের অন্তরখানি। তার চোখেও অশ্রু দেখা দিল। ভাবলো, সে তার কাছে ক্ষমা চাইবে, তাকে ক্ষমা করবে, আদর করবে, দুজনের মধুর সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে। সে ভেরার কপালে চুমো খেলো, চুমো খেলো তার হাতে ও কাঁধে।···মুচকি হাসলো ভেরা। স্যামিওনিচ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, টেবিলের উপর থেকে সাময়িকপত্রটি নিয়ে বলল, কী আনন্দ! আমরা দুজনে আবার ঠিক তেমনিভাবে থাকবো। আমাদের আশীর্বাদ কর ভগবান্!···এই নাও ভেরা, এটি একবার পড়ে দেখ, অবাক হয়ে যাবে তুমি। তোমারই জন্য রেখে দিয়েছি। আজকের এই আনন্দের দিনে স্যাম্পেনের বদলে এসো দু'জনে মিলে এটা পড়ি। সত্যিই আশ্চর্য্য, অভিনব।

সাময়িকপত্রটি শঙ্কিতভাবে ঠেলে দিয়ে সে বলল—না, না। দরকার নেই, আমি এটা পড়ে ফেলেছি।

: কবে পড়লে?

: এক বছর—দু'বছর—না, অনেক দিন হলো। আমি জানি সব।

টেবিলের উপর সাময়িকপত্রটি সশব্দে রেখে স্যামিওনিচ বলল, হুঁ। তুমি দেখছি অতি-উৎসাহী।

: না, অতি-উৎসাহী আমি নই, তুমি!

আবার কাঁদতে লাগলো ভেরা। স্যামিওনিচ তার সামনে দাঁড়ালো; ভাবতে লাগলো তার দিকে চেয়ে। একাকিত্বের ও নৈতিক বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী বেদনার কথা সে ভাবলো না, ভাবলো—তার নিজের কর্মসূচীর অবমাননার কথা, লেখক হিসাবে তার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ করার কথা।···

ক্রমশঃ ভেরার উপর বিরূপ হয়ে উঠলো সে। অসহ্য মনে হতে লাগলো তার উপস্থিতি। সহজ ও স্বাভাবিক-ভাবে আলাপ করতে পারলো না তার সঙ্গে। বাক্যবাণে জর্জর করতে লাগলো। ভেরা চুপ করে শোনে, কোন উত্তর দেয় না। তা'তে স্যামিওনিচের রাগ আরো বেড়ে যায়।···

···গ্রীষ্মের সকাল। ভ্রমণের পোষাক পরে কাঁধে একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে দাদার কাছে এলো ভেরা। উদাস-ভাবে চুমো খেলো দাদার কপালে। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল স্যামিওনিচ, কোথায় যাচ্ছ?

: বাইরে যাচ্ছি—টিকা দেবার কাজ করতে।

স্যামিওনিচ ভেরার সঙ্গে রাস্তায় নেমে এলো। বলল, তাহ'লে যাওয়াটাই ঠিক করেছ। টাকা চাই কিছু?

: না, ধন্যবাদ।

সে তার দাদার করমর্দন করলো, তারপর হাঁটতে লাগলো।

স্যামিওনিচ্ বলল, একটি ঘোড়ার গাড়ি নিচ্ছ না কেন? উত্তর দিল না ভেরা।

তার দিকে চেয়ে রইলো স্যামিওনিচ্। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কিন্তু দুঃখ জাগলো না মনে। দু'জনের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে গেছে। 'ভেরাও ফিরে চাইলো না একবার।···

ঘরে ফিরে স্যামিওনীচ্ লিখতে বসলো।···ভেরা কোথায় আছে জানিনা। তাকে দেখিনি আর। স্যামিওনিচ প্রবন্ধ রচনা করতে লাগলো, কফিনের উপর পুষ্পমাল্য দিতে লাগলো। মস্কোর সাংবাদিক—সঙ্ঘে কাজ করলো।···

ফুস্‌ফুসের স্ফীতিতে সে শয্যাগত হলো। তিন মাস ধরে কেবল ভুগলো—প্রথমে বাড়িতে, তারপর হাসপাতালে। তার হাঁটুতে একটি ফোড়া হলো। সবাই বললো, তাকে ক্রিমিয়ায় পাঠানো দরকার, সেজন্য অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলো তারা। কিন্তু সে ক্রিমিয়ায় গেলনা—মারা গেল। আমরা তাকে সমাহিত করলাম—শিল্পীও সাহিত্যিকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে।

* * * *

সেদিন রেস্তোরায় বসেছিলাম আমরা ক'জন সাহিত্যিক।

বললাম, এখানকার সমাধিভূমিতে এসেছিলাম কিছুদিন আগে। সেখানে স্যামিওনিচ্-এর কবরটি অনাবৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ক্রশটি ভেঙে মাটিতে পড়ে গেছে। কবরটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে—চেনাই যাচ্ছে না।

কবরটি মেরামতের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব করলাম। কোন উৎসাহ দেখা গেল না, উত্তর দিল না কেউ। একটি পয়সাও আদায় করা সম্ভব হলো না। স্যামিওনিচের কথা কারো মনে নেই। বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে সে।

স্মৃতির ব্যথা

শ্রীকোকিলকণ্ঠ গোস্বামী

প্রায়ই নিশুতরাতে,
ঘুমাইতে যাই—স্বপ্ন যখনো জড়ায়না আঁখিপাতে
অতীতের কত স্মৃতির-কমল
মানস-সরসে মেলে শতদল
সুখ-মধু-ঢালা নয়নের জল শুকি' যায় বেদনাতে
এমনি নিশুতরাতে।

শিশুর অশ্রু হাসি,
কিশোরকালের আশা-কিশলয় কত ভালবাসাবাসি;
ঘুমিয়ে পড়া সুখ-নিরালায়,
জননী সোহাগ-স্বর্ণ গলায়,
গতজীবনের যত যামিনীর কত কথা প্রিয় সাথে—
এমনি নিশুতরাতে।

পরিচিত যত মুখ—
যাদের লইয়া ভুঞ্জিয়াছি কত নন্দন-বন-সুখ;
শীতকালেরি ঝরাপাতাসম,
ঝরি' একে একে যত প্রিয়তম
ফেলিয়া আমায়, মিলাল কি হায়, ধরণীর ধূলি মাঝে
এমনি নিশুতরাতে।

বিশ্ব-উৎসব-ঘর,
তাদেরি আনন্দ-আগমনে শুধু হয়েছিল সুমুখর,
নিভেছে প্রদীপ আঁধার বাসর,
বাসি মালাটির ফুল ঝর ঝর;
হেথা কেহ নাই, খুঁজিছি মিছাই শূন্য দেউটী হাতে
এমনি নিশুতরাতে।

ইংরেজ-কবি টমাস মুরের "দি লাইট অব আদার ডেজ্" কবিতার ছায়াবলম্বনে।

সাহিত্যে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব

শ্রীসতীরঞ্জন রায়

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সমাজ জীবনের ধারা কৃষিকে কেন্দ্র করেই প্রবাহিত হয়ে চলছিল এবং সেই অবধি সামন্ত প্রথা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভূমিই ছিল সমাজের প্রধান সম্পদ। সেদিনের সেই ভূমির অধিকারের ক্রমসঙ্কুচীয়মান স্তরকে কেন্দ্র করেই বর্তমান যুগের সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ফলে জনপদজোড়া ভূমির অধিকার আত্মসাৎ করেছে সামন্তগণ। অপরপক্ষে পরমুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূমিহীন প্রজার দল। এ দু'য়ের টানা-পোড়েনের মধ্যপথ ধরে ভূমি সমৃদ্ধির ও অধিকারের বিভিন্নরূপ স্তর দেখা দিয়েছে। বৈচিত্র্যময় স্তরের অভ্যন্তর থেকেই শ্রেণীবৈষম্যের মন্ত্র উচ্চারিত হ'তে শোনা গিয়েছিল। এমনিভাবে এই দু'টি সম্প্রদায় বিভেদের সীমারেখা নিয়ে পরস্পর পাশাপাশি বাস করে চলেছে। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, সমাজে ভূমিদারের প্রাধান্য প্রবল হয়ে প্রতিভাত হয়েছে. কিন্তু ভূমিহীনের প্রাধান্য একেবারেই কেউ স্বীকার করে নিলনা। সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। শিল্পী আছে তার শিল্পকর্ম নিয়ে, ব্যবসায়ী রয়েছে ব্যবসাকর্ম নিয়ে, বণিক রয়েছে তার বাণিজ্যকর্ম নিয়ে। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের কাজের পেছনে রয়েছে ধনোৎপাদনের বিশেষ উপায়। সমাজের ধনের প্রাধান্য রয়েছে। ফলে এদেরও প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষিনির্ভরশীল সমাজে কৃষি প্রকৃতপক্ষে ধনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত নয়, যতটা জড়িত ফলনের সাথে। এই কারণের জন্যই বোধহয় শ্রেণী হিসেবে ভূমিহীনদের কোন মূল্য সমাজে দিতে চাইল না।

সামন্তদের হাতেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌লো। সেই সময় থেকেই রাজা নামধারী এক বিশেষ শ্রেণী বহু সামন্তরাজদের শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ কর্‌লো। এই আত্মপ্রকাশনার বিকাশের মাধ্যমেই রাষ্ট্র-সেবক শ্রেণীর আভাস পাওয়া যায়। ভূমিহীন সমাজের দিকটি পর্যালোচনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, সে সমাজে শ্রমিকের অস্তিত্বও ছিল। তবে ইহারা অধিকাংশই ছিল অন্ত্যজ। পালযুগের অধ্যায়ে আমরা দেখ্‌তে পাবো সমাজের নিম্নতম শ্রেণী চণ্ডাল অবধি সমাজের শ্রমিক হিসাবে পরিগণিত হতো। সেন আমলে এসে এর ব্যবধান নতুন অপর এক বৈষম্যমূলক সমাজের সূচনা করলো। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটলো—উদ্ধত ও উন্নত দৃষ্টি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ব্রাহ্মণ্যধর্ম। একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও অন্যদিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে অন্ত্যজ শ্রমিক সম্প্রদায় অগ্রসরমান সমাজের এক কোনে জড়পিণ্ডের মত গড়িয়ে গড়িয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। এরা রয়েই গেল সমাজ দৃষ্টির বাইরে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের 'চর্যাগীতি' অনুসন্ধান করলে বৌদ্ধ মহাযান, বজ্রযান, সহজযান, ডোম ডোমী, শবর শবরীদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় এবং এরা সমাজে স্বীকৃতিও লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি উক্ত সম্প্রদায় থেকে পৃথক ছিল। কাজেই সেন আমলে শ্রমিক শ্রেণীর অস্বীকৃতি অস্বাভাবিক ছিল না।

একদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের স্রোতধারা সম্প্রসারিত হ'তে পারলো না। বরং অবনতির দিকেই প্রধাবিত হ'তে লাগ্‌লো। ক্ষতি দেখা দিল ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে। ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায় রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ হয়ে তার বন্ধনকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের তখনও জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্য অনুভব করবার সময় আসেনি। দশজনের কর্তব্য সম্পাদনকারী হিসেবে দায়িত্ব রাষ্ট্র নিতে শেখেনি।

পালযুগ ছিল স্বাঙ্গীকরণের পর্ব। উদার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর বৃহত্তর সামাজিক চেতনা জাগ্রত করাই ছিল তৎকালীন যুগের পালরাজাদের সাধনা। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ থেকে ব্রহ্মণ্যধর্মের স্রোত অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে, সেই ধর্মের বন্যধারা ব্রাহ্মণেতর ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে সামঞ্জস্য বিধানের প্রবাহ সৃষ্টিই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। সেইহেতু ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যেও সমন্বয় সাধনের এক আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া চলছিল। একদিকে ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের দেবীকে শুধু স্বকৃতি নয়, আত্মসাৎও করেছিল, অপরদিকে বৌদ্ধগণও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীর আকৃতিপ্রকৃতি অনুকরণ করবার প্রবৃত্তি এড়াতে পারেনি।

সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্র ও বন্ধনকে খণ্ড খণ্ড করে ধ্বংস করবার খড়্‌গ নিয়ে এসে উপস্থিত হলো সেন রাজারা। পাল পর্বের আদর্শ সেন রাজাদের বিভেদ শোণিতে প্লাবিত হ'য়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। এই ভাঙ্গাগড়ার মূলে সমন্বয়ের সুরধ্বনি বিষাক্ত বাতাসে আত্মগোপন করেছিল। দেখা দিল সমাজ-বৈষম্য, দেনা-পাওনার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। অনতিক্রমণীয় ব্যবধান মিলনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালো। বিধিনিষেধের বেড়াজাল জড়িয়ে গেল খণ্ডিত সমাজের স্তরে স্তরে। মনে হয়, সেদিনের সে সমাজ ও নবগঠিত বাংলা পঙ্গু হয়ে যাওয়ার মূলে ছিল সেন রাজার শ্রেণী বৈষম্য নীতি।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি। ব্রাহ্মণ সমাজ ও বৌদ্ধ সমাজ যেমন পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সুর অনুসন্ধান করেছিল, তেমনি এরা উভয়েই বৌদ্ধেতর বা ব্রাহ্মণ্যেতর আর এক সমাজের স্বল্প বিস্তর আত্মসাৎ করে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঐ ইতর সমাজের চিন্তাধারা উভয় ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে কামজপ্রেরণায় কলুষিত করে দিয়েছিল। ফলে উচ্চবর্ণের সমাজশ্রেণীতে কামজ বিলাসধারার প্রবাহ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। শ্রেণীবৈষম্যপ্রপীড়িত সেন আমলেই সম্ভবতঃ দেবদেবীর সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

এবারে আমরা সেন আমলের অপর একটি দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, বাংলা দেশ সেন আমলে সংস্কৃত সাহিত্যের 'সুবর্ণ' যুগ। এই সাহিত্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেন আমল প্রবর্তিত সমাজের ক্রিয়াও সক্রিয় ছিল। কামজ বিলাসের ইঙ্গিত দিয়ে জয়দেব বলেছিলেন—ত্রুটিবিহীন শৃঙ্গার কাব্য প্রণয়নে গোবর্ধন কবির তুলনা ছিল না। সে আদর্শ থেকে স্বয়ং জয়দেবও রস আহরণ করেছেন। তাঁর 'গীতগোবিন্দ'ও এক হিসেবে শৃঙ্গার কাব্য। তৎকালীন যুগের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ যৌনাতিশয্যের মদিরতায় মোহগ্রস্ত। সেনরাজাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও রাষ্ট্রের কাঠামো নিতান্তই দুর্বল ছিল। সামাজিক স্তরে স্তরে দুর্নীতির ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো, চারিত্রিক অবনতির সুর প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো। কামজ বিলাস ও শৃঙ্গার রস পুষ্ট সাহিত্যে সুর জাগ্‌লো। শ্রেণীবৈষম্য, ব্যক্তি ও বিশ্বাসঘাতকতা সমাজের বুকে হানলো প্রচণ্ড আঘাত। এমনই পরিণতিই বহন করে এনেছিল সেন আমল।

কৃষ্ণকলি

শ্রীশীতল সেন

পরিচয়

নীলকণ্ঠ মিত্র	...	মধ্যবিত্ত গৃহস্থ
কণক মিত্র	...	ঐ পুত্র
রজত বসু	...	ঐ বন্ধু-পুত্র
রমেন চট্টোপাধ্যায়	...	অবসর-প্রাপ্ত আই. সি. এস. অফিসার
অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	রজতের সহপাঠী
সুকল্যাণ	...	চিত্র-পরিচালক
পুলকেশ পাকড়াশী	...	কবি ও নাট্যকার
চঞ্চল চৌধুরী	...	কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী
যুগল-মিলন ভট্টাচার্য্য	...	ঘটক
দামোদর	...	রজতের পুরাতন ভৃত্য
ডাক্তার		
চঞ্চলের তিনজন বন্ধু		
মহামায়া	...	নীলকণ্ঠের স্ত্রী
কৃষ্ণা	...	ঐ কন্যা
কুন্তলা	...	কণকের স্ত্রী
করবী	...	কৃষ্ণার সখী
এলা	...	রমেনের স্ত্রী
লালিমা	...	ঐ কন্যা
রাণী ও আইভি	...	লালিমার বান্ধবী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নীলকণ্ঠ মিত্রের শয়ন-কক্ষ—বাহুল্য-বর্জ্জিত—সাধারণ আসবাবপত্রে সজ্জিত। তখন অপরাহ্ন। নীলকণ্ঠ মিত্রের স্ত্রী মহামায়া দেবী কাচানো জামাকাপড়গুলি আলমারীতে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতে ব্যস্ত। মহামায়া দেবীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

কাজ শেষ করিয়া আলমারীর ডালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আঁচলের চাবি দিয়া মহামায়া দেবী আলমারীতে চাবি দিতেছেন, এমন সময়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে অফিস হইতে ফিরিলেন নীলকণ্ঠ মিত্র।

নীলকণ্ঠ মিত্র কোন এক সওদাগরী অফিসের কর্ম্মচারী—মধ্যবিত্ত বাঙালী—সরল প্রকৃতির। বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। কলিকাতার এককালে-বনেদী বংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া নীলকণ্ঠ মিত্র বেশ গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

নীলকণ্ঠ॥ ওগো, শুনছো—

মহামায়া॥ কী?

নীলকণ্ঠ॥ ভা-রী সুখবর!

মহামায়া॥ কী হয়েছে? (আগাইয়া আসিলেন)

নীলকণ্ঠ॥ রজত হাকিম হয়েছে।

মহামায়া॥ বল কী গো! রজত হাকিম হয়েছে?

নীলকণ্ঠ॥ হ্যাঁ। আজ অফিসে গিয়েই ওর টেলিগ্রাম পেলাম। আই, এ, এস্ পরীক্ষায় পাশ করে রজত হাকিম হয়েছে। দিল্লী থেকে আজই ফিরছে 'প্লেনে'—সন্ধ্যার আগেই দমদমায় পৌছবে।...আঃ! এরা সব গেল কোথায়? ও কণক—ও কৃষ্ণা—

বাড়ীর ভিতর হইতে পুত্র কণক আসিল। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ

নীলকণ্ঠ॥ এই যে কণক! চট্ করে এখনি একবার দমদম্ 'এ্যায়ার পোর্টে' চলে যা বাবা।

কণক॥ এমন সময় আবার দমদমায় কেন বাবা?

নীলকণ্ঠ॥ দিল্লী থেকে রজত আসছে—

মহামায়া॥ আর শুধু এমনিই আসছে না—একেবারে হাকিম হ'য়ে আসছে।

কণক॥ তা বেশ তো। রজত আসছে—হাকিম হ'য়ে আসছে—ভালো কথা। তা আমি দমদমায় গিয়ে কী করবো?

নীলকণ্ঠ॥ ওরে মুক্ষু! তাকে 'রিসিভ' করতে যাবি—আবার কী করতে যাবি!

কণক॥ হ্যাঃ! 'রিসিভ্' না ছাই! ছোটবেলা থেকে যাকে দেখে এলাম—বলতে গেলে, আমাদের বাড়ীতেই যে মানুষ, তাকে আর 'রিসিভ' করে অতো খাতির দেখাতে হ'বে না। আর তা' ছাড়া ও 'রিসিভ'-টিসিভ বড়মানুষী চাল্ বাবা।

নীলকণ্ঠ॥ বলিস্ কীরে হতভাগা! বেনেটোলার মিত্তির বাড়ীর ছেলে হ'য়ে এটুকু ভব্যতাজ্ঞানও তোর হলো না? আজই আমরা না হয় গরীব হ'য়ে পড়েছি; কিন্তু এককালে কলকাতার মধ্যে এই বাড়ী ছিল ডাক্‌সাইটে বনেদী বাড়ী।

মহামায়া॥ হলোই বা রজত আমাদের বাড়ীর ছেলের মতো, তবুও আজ সে হাকিম। হাকিমকে তোর খাতির করা উচিত বৈকি।

কণক॥ আমি তো আর মা উকিল-মোক্তার নই, চোর-ডাকাতও নই—যে হাকিম সাহেবকে খাতির করতে যাবো।

নীলকণ্ঠ॥ নাঃ! তোকে নিয়ে আর পারা গেল না কণক। বলি, হাকিম সাহেব তোর একটা ভাল চাকরী তো জোগাড় করে দিতে পারে।

কণক॥ চাকরী সব মিঞাই করে দেয়। বড় চাকরী পেলে তখন আর চেনা লোকদের চিনতেই পারে না। সাধে কী আর চাকরীর মায়া ছেড়ে 'বিজ্‌নেসে' নেমেছি।

মহামায়া॥ ওরে না, না, রজত আমাদের তেমন ছেলেই নয়। আজ সে হাকিমই হোক্, আর জজই হোক্, আমাদের রাজু চিরদিন রাজুই থাকবে।

নীলকণ্ঠ॥ নিশ্চয়ই। আজ না হয় রজত শুধু আমার বন্ধুর ছেলে; কিন্তু দু'দিন পরে ও তোর নিকট আত্মীয় হবে। তখন দেখে নিস্, একটা বড় চাকরী রজত তোকে করে দেয় কিনা। ওরে হতভাগা, তিরিশ বছর চাকরী করে চুল পাকিয়ে ফেললুম। চাকরী কারা পাচ্ছে—কারা পায়—সব দেখছি—সব শুনছি। নিজের ভাই চাকরী পাক্ আর না পাক্, স্ত্রীর ভায়েরা চাকরী আগে পেয়েই থাকে। 'ব্রাদার্' আর 'ব্রাদার-ইন্-ল'—অনেক তফাৎ। মায়ের পেটের ভায়ের চেয়ে আইনতঃ ভাই অনেক আপনার। তাই বলছি, তোর একটা হিল্লে হ'য়ে যাবেরে কণক—তোর একটা হিল্লে হ'য়ে যাবে।

কণক॥ তোমরা যখন বলছো, যাই দেখি গিয়ে—বাদশাহ কী হিল্লে করেন। শেষে ঢিলে না মেরে যায়।

কণক বাহিরে চলিয়া গেল। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া কণকের উদ্দেশ্যে বলিল

নীলকণ্ঠ॥ (নেপথ্যের উদ্দেশ্য) একটা বকুলের মালা আর একটা তোড়া নিয়ে যাস্ কণক। (পরে মহামায়ার দিকে ফিরিয়া) নাঃ! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না গিন্নী।

মহামায়া॥ কেন গো? আমি আবার কী করলুম?

নীলকণ্ঠ॥ তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রইলে? আরে যাও—যাও—রজত আসছে—তার জন্যে ভালো ভালো খাবার তৈরী করোগে' যাও। আঃ! এরা সব গেল কোথায়? ওরে ও কৃষ্ণা—

মহামায়া॥ দমদম থেকে রজত কি এই বাড়ীতেই আগে আসবে জানিয়েছে?

নীলকণ্ঠ॥ নাঃ! তোমায় নিয়ে সত্যিই আর পারা গেল না গিন্নী। এতোটুকু বেলা থেকে রজতকে তুমি দেখে আসছো, আজও তুমি ওকে চিনলে না? আজ ও হাকিমই হোক্, আর জজই হোক্—আমাদের প্রণাম করতে সবার আগে এ বাড়ীতে রাজু আসবেই আসবে—এই এখনি এসে পড়লো বলে।

বাড়ীর ভিতর হইতে কন্যা কৃষ্ণা আসিল—অষ্টাদশী…শ্যামবর্ণা

কৃষ্ণা॥ কে এখনি এসে পড়বে বাবা?

নীলকণ্ঠ॥ রজত—ওরে, আমাদের রজত আসছে—হাকিম হ'য়ে আসছে।

কৃষ্ণা॥ (সানন্দে) রজতদা' 'আই, এ, এস' পাস করেছেন! হাকিম হয়েছেন!!

নীলকণ্ঠ॥ হবে না? রজত হবে নাতো কে হ'বে? ওর মতো 'ব্রিলিয়াণ্ট' ছেলে সারা ভারতে কটা আছে?

কৃষ্ণা॥ রজতদা' আজকেই বুঝি আসছেন?

নীলকণ্ঠ॥ হ্যাঁ, এই এখনি আসবে। কণক গেছে দমদমে তাকে 'সিরিভ' করতে। তুই ততোক্ষণে ওর জন্যে ভালো ভালো খাবার তাড়াতাড়ি তৈরী করে ফেল্, মা কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা॥ এই যে এখনি যাচ্ছি বাবা।

মহামায়া॥ বৌমাকে ডেকে নিয়ে রান্নাঘরে যা'—আমি যাচ্ছি।

কৃষ্ণা॥ আচ্ছা।

কৃষ্ণা বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল, পিতার ডাক শুনিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল

নীলকণ্ঠ॥ হ্যাঁ মা কৃষ্ণা!···রজত কী কী খাবার খেতে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে—তা' জানিস্ তো?

মহামায়া॥ নাঃ! এবার তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না। এতোটুকু বেলা থেকে এ বাড়ীতে যার আসা-যাওয়া, নাওয়া-খাওয়া, সে কী কী খাবার খেতে ভালবাসে—এ বাড়ীর তা' কে না জানে? কৃষ্ণা তো এ বাড়ীরই মেয়ে—ছোটবেলা থেকেই রজতের সঙ্গে খেলাধূলো করেছে, মেলা-মেশা করেছে—সেই কৃষ্ণা তো দূরের কথা, নতুন-বৌ কুন্তলা—যে দু'দিন হলো এ বাড়ীতে এসেছে, সেও জানে, রজত কী খেতে ভালবাসে আর কী খেতে ভালবাসে না।

নীলকণ্ঠ॥ তা' বটে! তা' বটে!! তাহ'লে তুই যা' মা কৃষ্ণা—তাড়াতাড়ি সব তৈরী করে ফেল্‌গে যা—রজতের আসার সময় হয়ে এলো।···দেখিস্ মা, বেশ ভালো করে তৈরী করিস্ খাবারগুলো।

মহামায়া॥ অতো খুঁতখুঁতে কাজ কী বাপু। কৃষ্ণা, তুই বরং সব জোগাড়যন্তর কর্ গিয়ে। আমি নিজেই সব তৈরী করবো এখন।

কৃষ্ণা॥ আচ্ছা।

কৃষ্ণা ভিতরে চলিয়া গেল

নীলকণ্ঠ॥ সেই ভালো। তুমি নিজে রাঁধলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বেণেটোলার মিত্তির-গিন্নীর মুখের কথার চেয়ে হাতের রান্না যে অনেক মিষ্টি, সে কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে।

মহামায়া॥ তাতো বলবেই। আমি যে সব সময়ে উচিত কথা বলি কিনা, তেঁতো লাগবেই তো।

নীলকণ্ঠ॥ আহা, চটো কেন গিন্নী—চটো কেন? আমি একটু ঠাট্টা করছিলুম তোমার সঙ্গে।

মহামায়া॥ থাক্, আর ঠাট্টায় কাজ নেই। অফিস থেকে অনেকক্ষণ ফিরেছো। জামা-টামা ছাড়ো। আমি তোমার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নীলকণ্ঠ॥ নাঃ! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না গিন্নী। রজত এখনি আসছে—মাননীয় অতিথি আসছে আমাদের বাড়ীতে, আর আমি একা চা খেয়ে নেবো? বেণেটোলার মিত্তির বাড়ীর গিন্নী হ'য়ে এটুকু বুদ্ধিও তোমার নেই? রজত আসুক—একসঙ্গে বসে চা-খাবার খাওয়া যাবে।

মহামায়া॥ তুমি ঠিক জানতো, রজত আগেই এ বাড়ীতে আসবে?

নীলকণ্ঠ॥ ত্থাখো গিন্নী, তোমার বয়েস হয়েছে—তুমি হয়তো ভুলে যেতে পারো, কিন্তু রজত কোনদিন ভুলতে পারে না যে, তার বাবা বিদেশে-বিদেশে চাকরী করতো—কলকাতায় ঝি-চাকর-সরকার থাকলেও ওই মা-হারা ছোট্ট ছেলেটিকে দেখা-শোনা যে করতো, সে আর কেউ নয়—সে এই নীলকণ্ঠ মিত্তির। স্কুলে কলেজে ওর 'লোকাল গার্জেন' কে ছিল? সেও এই নীলকণ্ঠ মিত্তির। লালবিহারী বোস শুধু টাকা পাঠিয়েই খালাস, কিন্তু নীলকণ্ঠ মিত্তির ওর সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ওকে আজ মানুষ করে তুলেছে। তাইতো লালবিহারী মারা যাবার সময় রজতকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে—"আমাদের বন্ধুত্বকে চিরদিনের মতো পাকা করে যেতে পারলাম না। তুমি কিন্তু তা' করো ভাই—এই আমার অন্তিম কামনা।"

মহামায়া॥ বেশতো, সেই ছেলে এখন হাকিম হ'য়ে আসছে—এবার সেই পাকা করার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি পাকাপাকি করে নাও। রজত এলে আজকেই তার কাছে কথাটা পেড়ে ফেল।

নীলকণ্ঠ॥ আহা, এতে ব্যস্ত হবার কী আছে, গিন্নী?

মহামায়া॥ নাঃ! তোমায় নিয়ে সত্যিই আর পারা গেল না। ঘটে যদি তোমার এতোটুকু বুদ্ধি থাকে। রজত আজ হাকিম হ'য়ে ফিরছে। আজকে তার খোস্ মেজাজ···দিল-দরিয়া মন। আজকেইতো ওর কাছ থেকে পাকা কথা নেবার দিন। নইলে পরে যদি রাজী না হয়—

নীলকণ্ঠ॥ না, না, গিন্নী, রজত আমাদের তেমন ছেলেই নয়। বাপের সেই অন্তিম কামনা সে কখনো অপূর্ণ রাখবে না। তার ওপর—আমাদের যে রকম ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে—কৃষ্ণার সঙ্গে ওর যেরকম ভাব, তাতে আমার খুব বিশ্বাস—

মহামায়া॥ তুমি তোমার ওই বিশ্বাস নিয়েই থাকো।

হাকিম ছেলেকে জামাই করবার জন্যে অনেক ভালো ভালো মেয়ের বাপ-মায়েরা ওৎ পেতে বসে আছে।

নীলকণ্ঠ॥ কেন? আমার মেয়েই বা খারাপ কিসে? বেণেটোলার মিত্তির বাড়ীর মেয়ে—এককালের কলকাতার বনেদী কায়েতের ঘর—

মহামায়া॥ নামেই তালপুকুর, ঘটী আর ডোবে না। তারা তো আর তোমার মতো খালি হাতে বসে নেই। মেয়ের সঙ্গে মোটা টাকার পণ গুণে দেবে। পারবে তুমি? একেতো তোমার মেয়ের ওই রূপ—

নীলকণ্ঠ॥ কৃষ্ণা-মা যে আমার দেখতে একটু কালো তা' আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ওই কালো মেয়ে যে শুধু একা আমার নয়, তোমারও মেয়ে—সেটা তুমি অস্বীকার করতে পারো না গিন্নী।

মহামায়া॥ পেটে ধরেছি বলেইতো আমার ভাবনা।

নীলকণ্ঠ॥ ও তোমার মিছে ভাবনা গিন্নী। কৃষ্ণা-মা আমার কালোই হোক্ আর যা-ই হোক্—পণ দেবার মতো আমার ক্ষমতা থাক্ বা না থাক্, এ তুমি দেখে নিও গিন্নী—রজত কৃষ্ণাকে বিয়ে করবেই করবে। ও বিষয় আমি একটুও ভাবি না।

মহামায়া॥ তা' ভাববে কেন? ঘরে অতো বড়ো আইবুড়ো কালো মেয়ে—বিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই—তুমি ভাববে কেন?

মহামায়া রাগিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। নীলকণ্ঠ সেইদিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৃষ্ণার ঘর—সাধারণ আসবাবে সজ্জিত। দেওয়ালে টাঙানো একখানি বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা প্রসাধন-রতা। পূর্ব্বেকার দৃশ্য অপেক্ষা এই দৃশ্যে কৃষ্ণাকে সুবেশা ও সুসজ্জিতা দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণার সমবয়সী বান্ধবী করবী ঘরে প্রবেশ করিল

করবী॥ আজ এতো সাজগোজের পালা কেন গো হাকিম-গিন্নী?

কৃষ্ণা॥ (ফিরিয়া) তোর জন্যে—আবার কেন?

করবী॥ মরি, মরি! আমার জন্য সাজগোজ হ'তে যাবে কেন? হাকিমের জন্যেই হাকিম-গিন্নীর সাজগোজের এতো বহর—তা' কী আর বুঝি না?

কৃষ্ণা॥ আচ্ছা, তা' নয় বুঝলি। কিন্তু হাকিমের খবর তুই জানলি কী করে রে করবী?

করবী॥ এসেছিলুম তোদের বাড়ীতে বেড়াতে। দেখলুম রজতবাবু এসেছেন। তোর বৌদির কাছে শুনলুম, রজতবাবু হাকিম হয়ে এসেছেন। তাই তাড়াতাড়ি 'কন্‌গ্র্যাচুলেট্' করতে এলুম।

কৃষ্ণা॥ তা' আমার কাছে কেন? আমি তো আর হাকিম হইনি। যে হাকিম হয়েছে, তাকেই 'কন্‌গ্র্যাচুলেট্' করতে যা'।

করবী॥ ওরে বাব্বাঃ! শেষে আদালত অবমাননার দায়ে ধরা পড়ি আর কি! ঘোড়া ডিঙিয়ে তো আর ঘাস খেতে পারি না। তাই হাকিম-সাহেবের 'প্রাইভেট-সেক্রেটারী'র কাছে আগে এলুম—হাকিম-সাহেবের দর্শন লাভের অনুমতি চাইতে।

কৃষ্ণা॥ অনুমতির কথা যদি বলিস্ করবী, তাহ'লে বলবো ভাই—অনুমতি দিতে সাহস হয় না।

করবী॥ কেন? অতো ভয় কিসের?

কৃষ্ণা॥ (করবীর চিবুক ধরিয়া সহাস্যে) এমন সুন্দর মুখ দেখে হাকিম-সাহেবের মন যদি মজে যায়, তাহ'লে—(নিজেকে দেখাইয়া) এই পোড়ারমুখার কপালে আর হাকিম-গিন্নী হওয়া জুটবে না।

করবী॥ (হাসিয়া) তাই নাকি! কিন্তু ভাই কৃষ্ণা,—বৃন্দাবনে তো সুপুরুষের অভাব ছিল না। তবুও বেছে বেছে ওই কালো মাণিকের জন্যেই বা রাধা পাগল হলো কেন?

কৃষ্ণা॥ কেন?

করবী॥ কেন? ওই যে কথায় বলে—"যার সঙ্গে যার মজে মন"—

নেপথ্যে রজতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল

রজত॥ (নেপথ্য হইতে) কৃষ্ণা কোথায় গেল কাকীমা? কৃষ্ণাকে দেখছি না যে!

মহামায়া॥ (নেপথ্য হইতে) কৃষ্ণা বোধহয় ওর ঘরে আছে।

রজতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কৃষ্ণা ও করবী উভয়েই সচকিত হইয়া উঠিল।
করবী কৃষ্ণাকে ইসারা করিলে কৃষ্ণা মৃদু হাস্য করিল

করবী॥ ওই আসছেন—আমি পালাই।

কৃষ্ণা॥ এই যে বললি—'কন্‌গ্র্যাচুলেট্' করবি?

করবী॥ আজ আর তোদের মধুর আলাপের মাঝে বাধা দিতে চাই না। কাল এসে করবো। আজ উনি এখানে থাকবেন তো?

কৃষ্ণা॥ হ্যাঁ।

করবী॥ তাহলে আজ চলি—'উইশ্‌ ইউ হ্যাপি ড্রিমস্ টুনাইট্।'

করবী বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণা সেইদিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।
বিপরীত দিক দিয়া রজত আসিয়া ঘরে ঢুকিল

রজত॥ এই যে কৃষ্ণা! তুমি এখানে?

কৃষ্ণা চমকিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধ নয়নে রজতকে দেখিল।
তারপর ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল

কৃষ্ণা॥ (সহাস্যে) হাকিম হয়েই দেখছি নামের ভুল। তারপর গদীতে বসলে বোধ হয় চিনতেই পাবে না।

রজত॥ ওহো, সত্যিই তো! তুমি তো কৃষ্ণা নও। তুমি যে কৃষ্ণকলি!

কৃষ্ণা॥ ও নাম তো তোমারই দেওয়া।

রজত॥ সত্যি কৃষ্ণা, কৃষ্ণকলি নামটা আমার ভারী ভাল লাগে। তোমায় সবাই কৃষ্ণা-কৃষ্ণা বলে ডাকে। আমার কিন্তু তোমায় কৃষ্ণকলি বলে ডাকতে খু-উ-ব ভাল লাগে।

কৃষ্ণা॥ আমারও শুনতে খু-উ-ব ভাল লাগে।

রজত॥ জানো কৃষ্ণকলি, ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণকলি ফুল আমার খুব প্রিয়।···তোমার মনে নেই?—সেই সেবার তোমাদের দেশের বাড়ীতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলুম, তোমাদের বাগানে কৃষ্ণকলি ফুলের গাছ দেখে আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলুম?

কৃষ্ণা॥ খুব মনে আছে।

রজত॥ তোমার মনে আছে—রোজ তোমাতে-আমাতে দুজনে বাগানে বেড়াতে যেতাম···আমি কৃষ্ণকলি ফুল তুলে এনে দিতাম আর বলতাম,—

'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো বলে তারে গাঁয়ের লোক

আর তুমি সেই কৃষ্ণকলি ফুল তোমার খোঁপায় গুঁজে রাখতে রাখতে গাইতে—গাও না কৃষ্ণকলি সেই গানটা—ভারী চমৎকার গান! ও গানটা শুনতে আমার এতো ভাল লাগে।

কৃষ্ণা "কৃষ্ণকলি" গানটি গাহিল

রজত॥ (গান শেষ হইলে) জানো কৃষ্ণকলি ও গানটা নেহাৎ কবিগুরু লিখেছিলেন, তাই রক্ষে। নইলে—

কৃষ্ণা॥ নইলে কী?

রজত॥ নইলে—আমি যদি গান লিখতে পারতাম, আর ওই গানটা যদি আমিই লিখতাম, তাহ'লে লোকে বলতো—ও গানটা আমি তোমার উদ্দেশ্যেই লিখেছি।

কৃষ্ণা॥ (সলজ্জভাবে) যাও! কী যে বল?

এমন সময়ে নেপথ্যে নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্বর শোনা গেল

নীলকণ্ঠ॥ (নেপথ্য হইতে) কৃষ্ণা-মা!

কৃষ্ণা॥ (শশব্যস্তে) যাই বাবা।

নীলকণ্ঠ ঘরের ভিতরে আসিল

নীলকণ্ঠ॥ তোর মাকে একবার এঘরে পাঠিয়ে দেতো মা।

কৃষ্ণা ভিতরে চলিয়া গেল

রজত॥ (হাতঘড়ি দেখিয়া) আমিও আজ চলি কাকাবাবু। রাত হয়ে গেল।

নীলকণ্ঠ॥ সে কী বাবা রজত! আজ আর যাবে কেন? আজ এখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে থেকে যাও।

রজত॥ আজ আর নয় কাকাবাবু। কাল এসে ভাল করে খাবো। চা খেতে এমনিতেই অনেক রাত হ'য়ে গেল। আজ চলি—

ইতিমধ্যে মহামায়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল

মহামায়া॥ কিন্তু—তোমার সঙ্গে আমাদের যে একটা কথা ছিল বাবা।

রজত॥ আমার সঙ্গে? কী কথা কাকীমা?

মহামায়া॥ তোমার হাকিম হওয়ার সুখবরটা আজ শুনে আমরা যেমন খুসী হলুম বাবা, তেমনি আরো একটা সুখবর তোমার মুখ থেকে আজ শুনে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।

রজত॥ (সাশ্চর্য্যে) সু-খবর! কিসের সুখবর কাকীমা?

মহামায়া॥ (নীলকণ্ঠকে) বলনাগো, এবার। কথাটা তো আমি পেড়ে দিলুম—তুমি এবার সবটা বলে ফেল। না, তাও আবার আমার বলতে হবে?

নীলকণ্ঠ॥ না—মানে—(গলা পরিষ্কার করিয়া) মানে—তুমিতো জানোই বাবা রজত, লালবিহারী ঘোস—মানে, তোমার বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিল—মানে, আমরা দু'জনে ছিলাম একেবারে হরিহর-আত্মা।

রজত॥ বিলক্ষণ জানি। এ আর নতুন কথা কী কাকাবাবু?

নীলকণ্ঠ॥ মানে—তোমার বাবাতো বরাবরই কাজ নিয়ে বিদেশে-বিদেশে ঘুরতো—মানে—মানে—(অযথা কাশিতে শুরু করিল)

মহামায়া॥ (রজতকে) তোমাকে কলকাতায় দেখা-শোনা করা—তোমার লেখাপড়ার তদারক করা—বলতে গেলে কি, তোমায় এক রকম আমরাই মানুষ করেছি। আমাদের নিজের ছেলে-মেয়ে কণক-কৃষ্ণা থেকে তোমায় আমরা কোনদিন ভিন্ন চোখে দেখিনি বাবা।

রজত॥ সেজন্তে আপনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ কাকীমা। আপনাদের ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারবো না।

মহামায়া॥ (নীলকণ্ঠকে) বলনাগো—তারপর—ওর বাবার সেই শেষ ইচ্ছার কথাটা।

নীলকণ্ঠ॥ তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে রজত—শেষ সময়ে লালবিহারী আমার হাতদুটো ধরে বললে—"আমাদের বন্ধুত্বকে চিরদিনের মতো পাকা করে যেতে পারলাম না। তুমি কিন্তু তা' করো ভাই—এই আমার অন্তিম কামনা।" (চক্ষু মুছিল)

মহামায়া॥ তাই বলছিলুম কি বাবা রজত—আজ এই শুভদিনে সেই শুভ ব্যাপারটা তুমি পাকাপাকি করে যাও।

রজত॥ আমি তো আপনাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছি না—কাকীমা।

মহামায়া॥ (নীলকণ্ঠকে) বলনাগো—বুঝিয়ে বলনা।

নীলকণ্ঠ॥ মানে—তোমার কাকীমা বলতে চাইছেন,—মানে—(মহামায়াকে) তুমি কি বলতে চাও, বলে ফেল গিন্নি—বলে ফেল। রজত আমাদের ঘরের ছেলে—ওকে বলতে আর বাধা কিসের?

রজত॥ আপনি কী বলবেন, বলুন না কাকীমা।

মহামায়া॥ না, না, বলাবলির তেমন আর কীইবা আছে? (নীলকণ্ঠকে) কী বলগো? রজত কৃষ্ণাকে বিয়ে করবে—এতো জানাই আছে।

রজত॥ (যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, এই ভাবে) আমি—বিয়ে করবো—কৃষ্ণাকে—!!

মহামায়া॥ হ্যাঁ। তাই বলছিলুম—বিয়ের দিন-স্থিরটা আজ তোমায় করে যেতে হবে বাবা।

নীলকণ্ঠ॥ মানে—শুভস্য শীঘ্রম্। শুভ কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেরাই ভালো।

রজত॥ না, না, এ আপনারা কী বলছেন? কৃষ্ণাকে বিয়ে করবো আমি!

মহামায়া॥ হ্যাঁ। কৃষ্ণাকে যে তুমি বিয়ে করবে—এতো জানা কথা। কিন্তু কবে বিয়েটা হবে—

রজত॥ কী আশ্চর্য্য। কৃষ্ণাকে যে আমি বিয়ে করবো—এ কথা আপনাদের বললে কে? আমি তো কোনদিন বলিনি—

নীলকণ্ঠ॥ আহা, বিয়ের কথা কি আর গুরুজনদের সামনে মুখ ফুটে কেউ কখনো বলে? তাও আবার তোমার মতো হীরের টুক্‌রো ছেলে? তাছাড়া—কৃষ্ণাকে তুমি বিয়ে করবে—একথা কী নতুন করে বলার দরকার আছে? বলতে গেলে,বিয়েতো একরকম ঠিকহ'য়েই আছে।

রজত॥ সে হয় না—সে হয়না কাকাবাবু। কৃষ্ণাকে আমি বিয়ে করবো—একথা আমি কোনদিন ভাবতেই পারিনা।

মহামায়া॥ কিন্তু তোমার ভাবগতিক দেখেতো তা মনে হয় না বাবা। কৃষ্ণার সঙ্গে যেভাবে তুমি মেলামেশা কর—হাসি-ঠাট্টা কর—এই একটু আগেইতো কৃষ্ণা তোমায় গান শোনাচ্ছিল—শুনতে পেলুম।

রজত॥ তাই বলে কৃষ্ণাকে আমার বিয়ে করা চলে না—না, না, কিছুতেই নয়—কিছুতেই নয়।

মহামায়া॥ (নীলকণ্ঠকে) নাও, এখন তোমার হীরের টুকরো রজতকে বিয়েতে রাজী করাও। তোমার তো খুব বিশ্বাস ছিল—

নীলকণ্ঠ॥ নাঃ! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না গিন্নী। তুমি একটু চুপ কর দেখি। (রজতকে) আচ্ছা বাবা রজত, তুমি মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে আমাদের কথাটা ভালো করে ভেবেই দেখ না। কৃষ্ণাকে বিয়ে করতে তোমার এতো আপত্তিই বা কিসের?

রজত॥ না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না কাকা-বাবু—কৃষ্ণার মতো মেয়েকে বিয়ে করা আমার কিছুতেই চলতে পারে না—কোন মতেই সম্ভব নয়।

নীলকণ্ঠ॥ কেন সম্ভব নয় বাবা? বেনেটোলার বনেদী মিত্তির বাড়ীর মেয়ে—

মহামায়া॥ তাছাড়া—তোমাদের-আমাদের কতো-দিনের জানাশোনা ঘর—ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণার সঙ্গে তোমার ভাব-ভালবাসা—

নীলকণ্ঠ॥ তবে—পণ-টনের কথা যদি কিছু বল বাবা, আমি কথা দিচ্ছি—আমার সাধ্যমত আমি তা দেবো—ধার-দেনা করেও দেবো। বেনেটোলার মিত্তির বাড়ির কোন মেয়েরই বিনা পণে বিয়ে হয়নি—হবেও না।

রজত॥ না, না, সে সব কিছুই নয় কাকাবাবু—সে সব কিছুই নয়। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। কৃষ্ণার মতো মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না।

নীলকণ্ঠ॥ ওহো। এতোক্ষণে বুঝেছি তোমার কথা; কিন্তু আমি বলছি বাবা, কৃষ্ণার গায়ের রঙ্‌ একটু মলিন হলেও—মা আমার লক্ষ্মীমন্ত। ওকে বিয়ে করলে তুমি সুখীই হ'বে।

রজত॥ কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না কাকাবাবু, সমাজ বলে আমার একটা কিছু আছে তো!

মহামায়া॥ সমাজ?

নীলকণ্ঠ॥ তোমার আবার আলাদা কোন সমাজ আছে নাকি? তুমি তো আমাদের এই সমাজেই মানুষ হয়েছো—এই সমাজেরই লোক। তোমার বাবা—লালবিহারী বোস আমাদেরই মতো মধ্যবিত্ত সমাজেরই লোক ছিলেন—এমন কিছু রাজা-উজীর কিম্বা জমিদারদের মতো উঁচু সমাজের ছিলেন না। আজ হয়তো তুমি হাকিম হয়ে ভাবছো—

রজত॥ আপনিই ভেবে দেখুন কাকাবাবু—আজ আমি হাকিম হয়েছি—আমার একটা 'পোজিসান্' হয়েছে,—সমাজে আমার 'প্রেষ্টিজ্' আছে, 'ডিগ্‌নিটী' আছে,—'হাই সার্কলে'র লোকজনদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হ'বে—'য়্যারিষ্টোক্র্যাট সোসাইটি'তে আমার মেলামেশা করতে হ'বে—'পার্টি'তে যেতে হবে—'পিক্‌নিকে' যেতে হবে। সেখানে তো আর ওই কৃষ্ণার মতো একটা কালো মেয়েকে নিজের 'মিসেস্' বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় না। আমার স্ত্রীকে দেখে দশজনে যে নিন্দে করবে, মুখ বেঁকাবে, কানাকানি করবে—তা' আমি সইতে পারবো না—কিছুতেই সইতে পারবো না। 'আই মাষ্ট হ্যাভ এ প্রেজেন্টবল্ ওয়াইফ'—সবার সামনে—সমাজের মাঝে বার করা যায়, এমনি মেয়েকেই আমি বিয়ে করতে চাই—কৃষ্ণার মতো একটা কালো মেয়েকে নয়।

মহামায়া॥ (নীলকণ্ঠকে) কেমন—হলোতো? তোমার রজত-হাকিম রূপসী মেয়ে বিয়ে করে ঘরে উঠুক—আর তুমি তোমার ওই আইবুড়ো কালো মেয়েকে ঘরে নিয়ে জুল্ জুল্ করে চেয়ে থাকো।

রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল

রজত॥ কাকাবাবু, আপনি আমায় নিজের ছেলের মতোই বরাবর দেখে এসেছেন। আজও আপনি একবার আমার দিকে চেয়ে দেখুন।

নীলকণ্ঠ॥ বল কী হে? তোমার দিকে চেয়ে দেখবো! তুমিতো আর আমার সেই বাল্যবন্ধু লালমোহন বোসের ছেলে—রজত বোস নও। তুমি যে এখন মিষ্টার র‍্যাজাট্ বাসু—হাকিম সাহেব—ওপরতালার লোক। আর, আমি হলুম 'মার্চেন্ট অফিসে'র এক গরীব কেরাণী—নীলকণ্ঠ মিত্তির—নীচেরতালার লোক। নীচেরতালার লোকের ওপর-তালার দিকে চেয়ে দেখা শুধু ঘোরতর অন্যায় নয়—মহাপাপ—মহাপাপ—

নীলকণ্ঠ চলিয়া যাইতেছিল, রজত আগাইয়া আসিয়া ডাকিল

রজত॥ কাকাবাবু!

নীলকণ্ঠ থমকিয়া দাঁড়াইল

রজত॥ আমার প্রতি আপনারা অনর্থক অবিচার করলেও আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি—কৃষ্ণার জন্যে ভালো পাত্রের সন্ধান আমি নিশ্চয়ই করবো, আর তেমন উপযুক্ত পাত্র পেলেই কৃষ্ণার সঙ্গে আমি তার বিয়ের

ব্যবস্থা করে দেবো—তাতে যতো টাকা লাগে, আমি দেবো। আপনি বিশ্বাস করুন কাকাবাবু—

নীলকণ্ঠ॥ থাক্, থাক্, জুতো মেরে আর গরু দান করতে হ'বে না। বেনেটোলার মিত্তিররা আজ গরীব হলেও ভিখিরী নয়—তারা ভিখিরী নয়—

বিচলিতভাবে নীলকণ্ঠ ভিতরে চলিয়া গেল। রজত বিমূঢ়ের মতো সেখানো দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরে কৃষ্ণা আসিল—কঠিন মুখাবয়ব।

রজত॥ এই যে কৃষ্ণকলি, তুমি এসে পড়েছো—ভালোই হয়েছে। দেখ দেখি, কাকাবাবু আর কাকীমা কী কাণ্ডটাই করে গেলেন—আমাকে অনর্থক ভুল বুঝে।

কৃষ্ণা॥ আড়াল থেকে আমি সবই শুনেছি। বাবা আর মা শুধু তোমাকে ভুল বোঝেননি, ওঁরা নিজেদের অবস্থার কথা—ওঁদের এই কালো মেয়েটার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন।...ওঁরা ভুলে গিয়েছিলেন—বড়লোকের সৌখীন 'সো-কেশে' স্থান পাবার মতো যোগ্যতা তাঁদের মেয়ের নেই।...ওঁরা ভুলে গিয়েছিলেন—বড়লোকের সমাজে—তাদের 'পিকনিকে পার্টিতে' সাজিয়ে রাখা হয় 'ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা', বাহারী গোলাপ আর রজনীগন্ধা। আর কৃষ্ণকলি—যেমন বনের অন্ধকারে সবার চোখের আড়ালে ফোটে, তেমনি অন্ধকারেই ঝরে যায়—। কেউ আর তাকে আদর করে তুলে নেয় না। কোন সমাজেই তার স্থান নেই—কোথাও তার স্থান নেই—

ঝড়ের মতো কৃষ্ণা বাহির হইয়া গেল

ক্রমশ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শারীরিক শিক্ষা

শ্রীচারুপদ ভট্টাচার্য্য

মানুষ জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত এবং এই শিক্ষা চলা উচিত তাহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। এই শিক্ষা আরম্ভ হয় মায়ের মধ্যে দুইটি ধারার ক্রিয়ায় :—প্রথমে তাহার নিজের উন্নতির জন্য এবং দ্বিতীয় যে শিশুকে সে অবয়ব দান করিতেছে নিজের মধ্যে তাহার জন্য। ইহা ধ্রুব সত্য যে, যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করিতে চলিয়াছে, তাহার অনেকখানি নির্ভর করিতেছে যে মা তাহাকে রূপ দান করিতেছে তাহার উপর, মায়ের আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প এবং যে জাগতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বাস করিতেছে তাহার উপর।

মায়ের শিক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে তাহার চিন্তাগুলি হওয়া উচিত সুন্দর এবং নির্ম্মল—অনুভবগুলিও হওয়া উচিত সুন্দর এবং মহৎ। মায়ের চতুর্দ্দিকের জাগতিক পরিবেশগুলি হইবে যথাসম্ভব সু-সমঞ্জস, একটি মহান সরলতায় পরিপূর্ণ—ইহার সহিত সে যদি রাখিতে পারে তাহার মহত্তম আদর্শ অনুসারে শিশুটিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য একটি সচেতন ও সুনির্দ্দিষ্ট ইচ্ছাশক্তি। এইরূপ করিলে একটি উত্তম সম্ভাবনা লইয়া শিশুটির এই জগতে আসিবার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা হইল। এইরূপ করিলে কত পরিশ্রম এবং অনর্থক জটিলতার অবসান হইতে পারে।

শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে মানব-সত্তার পাঁচটি প্রধান বৃত্তি অনুযায়ী তাহারও পাঁচটি প্রধান বিভাগ থাকা প্রয়োজন :—(১) শারীরিক (২) প্রাণিক (৩) মানসিক (৪) হৃদাত্মিক এবং (৫) আধ্যাত্মিক।

রুশীয় ব্যায়ামবীরগণ আশ্রম স্পোর্টস্ গ্রাউণ্ডে জাতীয় পতাকা হস্তে মার্চিং করিতেছেন
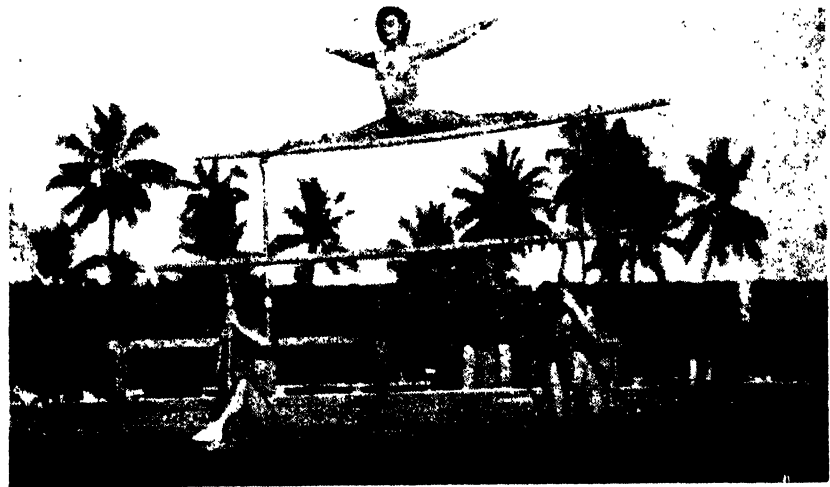
আশ্রম স্পোর্টস্ গ্রাউণ্ডে রুশীয় রমণীর ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন

সাধারণতঃ শিক্ষার এই পর্য্যায়গুলি মানুষের ক্রম পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে একটির পর একটি করিয়া এবং ইহার অর্থ

এই নহে যে একটির স্থান ক্রমে অন্যটি অধিকার করিবে, বরং এই কথা বলা যাইতে পারে যে সব কয়টি শিক্ষাই এক সঙ্গে চলিতে থাকিবে এবং একটি অন্যটিকে পরিপূরণ করিবে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত।

চেতনার যতগুলি স্তর আছে তাহার মধ্যে শারীরিক অংশই পরিপূর্ণ ভাবে বিধিবদ্ধ—অভ্যাস, নিয়ম, শৃঙ্খলা একটি প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই রকমের সু-শৃঙ্খলা গঠনে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে সত্তার সমস্ত অংশগুলি পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পর মিশ্রিত। ইহা সত্ত্বেও প্রাণিক কিম্বা মানসিক কোন বৃত্তি স্থূল স্তরে প্রকাশিত হইলে তাহাকে একটা যথাযথ সুনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। ইহাকে ফলপ্রদ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক শিক্ষাই শ্রমসাধ্য এবং সুবিশদ দূরদর্শী এবং নিয়মানুগ হইতে বাধ্য। ক্রমে ইহা অভ্যাসে পরিণত হয়। চারিদিকের অবস্থা, সত্তার বৃদ্ধি ও বিকাশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাদের আয়ত্তে আনিতে হবে।

সমস্ত শিক্ষাই আরম্ভ হওয়া উচিত ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এবং ইহা চলা উচিত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। শিক্ষার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, শিক্ষার সময় হয় নাই বা শিক্ষার সময় শেষ হইয়াছে বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

শারীরিক শিক্ষার তিনটি প্রধান দিক :—(১) প্রত্যেক যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব এবং তাহাদের সু-নিয়ন্ত্রণ (২) শরীরের সকল অংশের এবং তাহাদের গতিবিধির একটি পরিপূর্ণ, নিয়মানুগ পুষ্টি (৩) কোন খুঁত বা বিকৃতি থাকিলে তাহার সংশোধন।

বলা যাইতে পারে যে জন্মের প্রথম কয়দিনের, এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, শিশুর শিক্ষার প্রথম অংশ অর্থাৎ তাহার আহার নিদ্রা রেচন ইত্যাদি লইয়া শিক্ষা আরম্ভ হওয়া দরকার। প্রথম হইতেই শিশুর ভা[illegible] অভ্যাসগুলি আরম্ভ হওয়া উচিত। প্রথম হইতেই শিশু যদি ভাল অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলে সে নানা রকম অসুবিধা, বিপত্তি এবং দুর্ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। যাঁহারা শিশুর শৈশব অবস্থায় যত্ন লইবেন তাঁহারা দেখিবেন যে পরে তাঁহাদের কাজ অনেক সহজ হই[illegible] গিয়াছে।
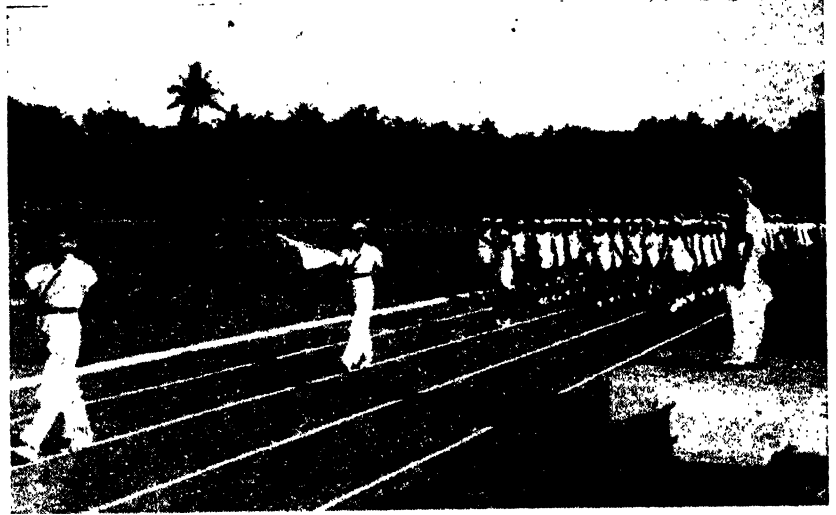
স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতায় মহিলাগণ শ্রী[illegible]ক অভিবাদন করিতেছেন

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ফিজিক্যাল ডাইরেক্টার শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য শিশুগণকে ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেছেন

শারীরিক গুরুত্ব শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রথম উপলব্ধি করেন ১৯৪[illegible] সালে। এই সালে শিশুবর্জ্জিত শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে, শিশুগণকে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিবার অনুমতি দান করেন, এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীঅরবি[illegible]

এখন

রেক্সোনা

আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরী লিমিটেড এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P.

আশ্রম শিশুদের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। শিশু-কল্যাণে নিমগ্না শ্রীমা তাহাদের শারীরিক শিক্ষার জন্য একটি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ দান করেন। ক্রমে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আগত শিশুর দল আশ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের শারীরিক

আশ্রম প্লে গ্রাউণ্ডে মার্চিং

অশ্রাম স্পোর্টস্ গ্রাউণ্ডে শ্রীমা শিশুগণের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন

শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া, বয়স্ক ব্যক্তিগণও এই বিষয়ে উৎসাহী হইয়া উঠেন এবং অবশেষে শারীরিক শিক্ষায় এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়।

প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি, পুরুষ, মহিলা, বালকবালিকা এবং শিশুগণ শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বয়স এই শিক্ষার পথে কিছুমাত্র অন্তরায় নহে এবং এই শিক্ষার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সও নাই। যে কোন বয়স্ক, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন সময়ে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। একথা সত্য যে, বয়স, সামর্থ্য, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শারীরিক শিক্ষা দান করা হয়। আশ্রমবাসীগণকে শারীরিক শিক্ষার যথাসাধ্য সুযোগ এবং সুবিধা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক না হইলেও শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই আনন্দের সহিত শারীরিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বিষয়টিকে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে পরিচালিত করিবার জন্য এই সহস্রাধিক ব্যক্তিকে তাঁহাদের যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ছয়টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং এই ছয়টি প্রধান শ্রেণীকে কতকগুলি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। অতি প্রত্যূষে আশ্রমবাসীগণ ব্যক্তিগত অথবা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, টেনিস খেলার মাঠে, স্পোর্টস গ্রাউণ্ডে এবং ব্যায়ামাগারে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে আশ্রমের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিয়মিতরূপে জিমনাষ্টিক মার্চিং কুচকাওয়াজ প্রভৃতি অভ্যাস করিয়া থাকেন।

শ্রেণী বিভাগ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কার্য্যের সুবিধার জন্য সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে ছয়টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং এই শ্রেণী আশ্রমে নিম্নলিখিত নামে পরিচিত।

গ্রুপ এ ওয়ান্ এবং এ টু—এই গ্রুপ দুইটি শিশু এবং বালক-বালিকাদিগের জন্য। সবুজবর্ণ হাফপ্যান্ট, গেঞ্জী, সাদা মোজা এবং সাদা জুতা ইহাদের গ্রুপ ইউনিফরম। এই গ্রুপ দুইটি কতকগুলি বালক এবং বালিকার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং বালকবালিকাগণকে মনোনীত করা হয়।

গ্রুপ বি—রেড গ্রুপ নামে পরিচিত এই গ্রুপটি কিশোর এবং যুবকগণকে লইয়া গঠিত! লাল হাফপ্যাণ্ট, সাদা গেঞ্জী, সাদা জুতা এবং সাদা মোজা ইহাদের গ্রুপ ইউনিফরম। ইহারা নেতা নির্ব্বাচিত করে একটি কিশোরী ও তিনটি কিশোরের নেতৃত্বে ইহারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

গ্রুপ সি—কেবলমাত্র যুবকগণকে লইয়া এই দলটি গঠিত। ইহারা ইহাদের নেতাগণকে নির্ব্বাচিত করে এবং ইহাদের দলপতিগণের সংখ্যা পাঁচজন। ধূসরবর্ণের হাফপ্যাণ্ট, সাদা গেঞ্জী, সাদা জুতা এবং মোজা ইহাদের গ্রুপ ইউনিফরম।

গ্রুপ ডি—যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ সকলেই এই গ্রুপের সদস্য হইতে পারেন। এই গ্রুপটিকে পুনরায় তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহারা নীল, খাঁকি, এবং শ্বেত গ্রুপ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের হাফপ্যাণ্ট নীল খাঁকি এবং সাদা জুতা ইত্যাদি অন্য গ্রুপের মত।

গ্রুপ ই—কেবলমাত্র মহিলাগণই এই গ্রুপের সভ্যা। ইঁহাদের ইউনিফরম সাদা হাফপ্যাণ্ট, সাদা হাফসার্ট, সাদা জুতা এবং সাদা মোজা। ইহারা ব্যায়ামের সুবিধার জন্য মস্তকে কিটি ক্যাপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সমস্ত শারীরিক শিক্ষার পরিকল্পনাগুলিকে দলপতিগণ রূপ দিয়া থাকেন। কর্ম্মতৎপরতা, যোগ্যতা, ব্যায়াম-পারদর্শিতা ইত্যাদি বিচার করিয়া দলপতিগণকে মনোনীত করা হইয়া থাকে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ব্যায়াম শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই আশ্রমে যোগদান করিবার পূর্ব্বেই নানাবিধ ব্যায়াম ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

অসিচালনা শিক্ষা

শারীরিক শিক্ষার জন্য বিশেষ লাইব্রেরী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের একটি নিজস্ব শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী আছে। শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় মূল্যবান পুস্তক, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদিতে এই পাঠাগার পূর্ণ। ইহা ব্যতীত আশ্রমে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বিশেষ শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে উৎকৃষ্ট এবং আধুনিক ছায়াচিত্রগুলি আনাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষার্থীগণকে দেখান হয়। আশ্রম পরিদর্শনের জন্য যে সমস্ত ব্যায়াম-কুশলী ব্যক্তিগণ আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসেন তাঁহারাও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। এইরূপে আশ্রমের শারীরিক প্রতিষ্ঠানটি জগতের শারীরিক শিক্ষা প্রগতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। শিক্ষকগণকে শিক্ষা দানের জন্য নিত্য নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়।

শিক্ষাপদ্ধতি এবং আদর্শ

আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ভেদে শ্রেণীগুলির মধ্যে, শিক্ষা পদ্ধতির কিঞ্চিৎ-অধিক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুগণকে আনন্দ, উৎসাহ এবং স্বাধীনতা দানই এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এইরূপ করিলে কৌতূহলী শিশু-হৃদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে এবং আনন্দে ও স্ব-ইচ্ছায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিতে আরম্ভ করে।

৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের বালক এবং বালিকাগণকে আরও বিস্তারিত ভাবে এই বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। এই সময় ধীরে ধীরে তাহাদের হৃদয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং কর্ম্মে সহযোগিতার বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দেওয়া হয়। নানারূপ খেলার মধ্য দিয়া, সহজ এবং সরল ব্যায়ামগুলি তাহাদিগকে অভ্যাস করান হয় এবং তাহারা যাহাতে প্রত্যেকটি অঙ্গ সুন্দর ভাবে পরিচালনা করিতে শিক্ষা করে তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। এই সময়েই তাহাদের দোষযুক্ত অপরিপুষ্ট অঙ্গগুলিকে দোষশূন্য করিবার চেষ্টা করা হয়। কর্ম্মতৎপরতার জন্য এই বয়সের বালক-বালিকাগণকে প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে।

এগার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালিকা এবং বালকগণের মধ্যে যাহাতে কর্ত্তব্য বোধ এবং দায়িত্ব জ্ঞানের উদ্রেক হয়, সেই ভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করা হয়। ইহারা যাহাতে ভীতিশূন্য এবং সাহসী হইতে পারে সেই জন্য তাহাদিগকে উত্তরোত্তর কঠিন ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করান হয়। ইহারা যাহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষাগুলি আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

১৫ হইতে ১৮ বৎসরের বালকবালিকাগণের শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্র বিশেষ ভাবে প্রসারিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাদিগকে উপযুক্ত ব্যায়ামগুলির সহিত পরিচিত করাইবার জন্য প্রায় সকল প্রকার ব্যায়ামই অভ্যাস করান হয়। এই সময়ে ইহারা নিজ নিজ প্রকৃতি এবং পছন্দমত বিশেষ ব্যায়ামে বিশেষজ্ঞ হইতে পারে। ইহারা যাহাতে সুন্দর ভাবে শরীর গঠন করিতে পারে সেইজন্য ইহাদিগকে বডি-বিলডিংএর ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করান হয়। যাহা কিছু মন্দ, অনিষ্টকর এবং তামসিক তাহা বর্জ্জন করিয়া যুবকগণ যাহাতে চরিত্রবান, নির্ভীক, অকপট এবং প্রাণবন্ত হয় তৎবিষয়ে ইহাদিগকে বিশেষ শিক্ষাদান করা হয়, যুবকগণকে ব্যায়ামের কোন বিশেষ শাখায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে দেওয়া হইলেও তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে নানা রকম ব্যায়াম অনুশীলনে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বিশেষ ব্যায়াম অনুশীলনে, বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির উন্নতি হইলেও সাধারণ শারীরিক ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যায়াম কার্য্যকরী হয় না।

স্পোর্টস্ গ্রাউণ্ডের সিলভার ট্র্যাক্

স্বাস্থ্য-পরীক্ষা এবং দন্ত-চিকিৎসা

শরীর এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়মিত ভাবে শিক্ষার্থীগণের স্বাস্থ্য এবং দন্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মাসাজ ক্লিনিকেও নানা রকম শারীরিক উপসর্গের চিকিৎসা হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীগণের শরীর নিয়মিত ভাবে গঠিত হইতেছে কি না—তাহা পরীক্ষার জন্য ইহাদের শরীরের নিয়মিত ভাবে মাপ লওয়া হইয়া থাকে।

শারীরিক শিক্ষার স্থান

আশ্রমের মনোরম স্পোর্টস গ্রাউণ্ডটি পণ্ডিচেরির উত্তর দিকে অবস্থিত। দর্শকবৃন্দের বসিবার জন্য ষ্টেডিয়াম, দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য সিল্ভার ট্রাক এবং হকি ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি খেলিবার জন্য এই স্পোর্টস গ্রাউণ্ডে ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বপ্রকার আধুনিক স্পোর্টসের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সমস্তই আছে। এইখানে একটি অতি মনোরম ডাইভিং বোর্ডযুক্ত সুইমিং পুলের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে।

টেনিস গ্রাউণ্ড :—

সমুদ্রতীরে হলো ব্লকসের প্রাচীর বেষ্টিত আশ্রমের টেনিস কোর্ট একটি দর্শনীয় বস্তু। এই ক্রীড়া প্রাঙ্গণে মুষ্টি যুদ্ধ, অসিচালনা, কুস্তি, লাঠি চালনা এবং বাসকেট বল খেলিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারগণ একটি প্রকাণ্ড কংক্রীটের দেয়াল নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানটিকে সমুদ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই প্রাচীরের পাশেই পদব্রজে ভ্রমণ করিবার জন্য একটি সুন্দর রাস্তা আছে। এই রাস্তা হইতে সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া সন্তরণ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সমুদ্রে অবতরণ করিয়া, সমুদ্র স্নান করিয়া থাকেন।

আশ্রম স্কুল প্লেগ্রাউণ্ড :—

জিমনাষ্টিক গ্রুপ একসারসাইজ, ড্রিল এবং বয়স্ক, বয়স্কাগণের জিমনাষ্টিক মার্চ্চিং এই স্থানে করান হইয়া থাকে।

এই প্লে গ্রাউণ্ডের পশ্চিম দিকে শিশুদের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে sea, sew chuts, sandpit, table tennis ইত্যাদির দ্বারা বিশেষভাবে সজ্জিত। মার্চ্চিং শেষ হইলে প্রথমেই শিশুর দল শ্রীমায়ের নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্য মিষ্টান্ন আদায় করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। প্লে গ্রাউণ্ডের পার্শ্বদেশে আশ্রমের ব্যায়াম আগার এবং এই আগার সম্পূর্ণ আধুনিক। ব্যায়াম আগারের উপরে একটি কক্ষ যোগা-

সনের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে এবং এই কক্ষে যোগাসন শিক্ষার্থীগণকে আসন অভ্যাস করান হয়।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যে শারীরিক শিক্ষা দান করা হয় তাহা কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধি অর্থাৎ নাম, যশ, রেকর্ড স্থাপন ইত্যাদির জন্য নহে। শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের যোগের জন্য শরীরকে প্রস্তুত করাই এই শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগে শরীরের বিশেষ স্থান আছে। এই শরীর যাহাতে মহাশক্তির যন্ত্র স্বরূপ হয় এবং ভা(ব্য)-শক্তি শরীরে অবতরণ করিলে, শরীর যাহাতে এই শক্তি ধারণ করিতে সক্ষম হয় সেই জন্যই এই শারীরিক ব্যবস্থা। ভগবান আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান। এই শরীর ভগবানের মন্দির, এই কারণে শরীরকে সুন্দর এবং মনোহর করিবার জন্যই এই শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা। রোগগ্রস্ত, অলস, দুর্ব্বল মানসিক শরীর যেমন যোগ পথের অন্তরায়, তেমনি শরীর এবং শরীরের শক্তির অপব্যবহারও যোগ পথের বিঘ্ন স্বরূপ। আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, কাজ, কর্ম্ম ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই সংযম অভ্যাস করিতে হয় এবং এইগুলিকে আয়ত্তাধীন করার অর্থ এই যে ইহা যে—কোন সৎকর্ম্মের প্রথম সোপান স্বরূপ।

ফিজিক্যাল বুলেটিন :—

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শারীরিক শিক্ষা বিভাগ হইতে নিয়মিত রূপে বুলেটিন বাহির হইয়া থাকে। এই বুলেটিনে শ্রীমা নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে এই বুলেটিন ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের জন্য যে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহার বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্যাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত এই বুলেটিনে অনেক সুন্দর সুন্দর ফটো ছাপা হইয়া থাকে।
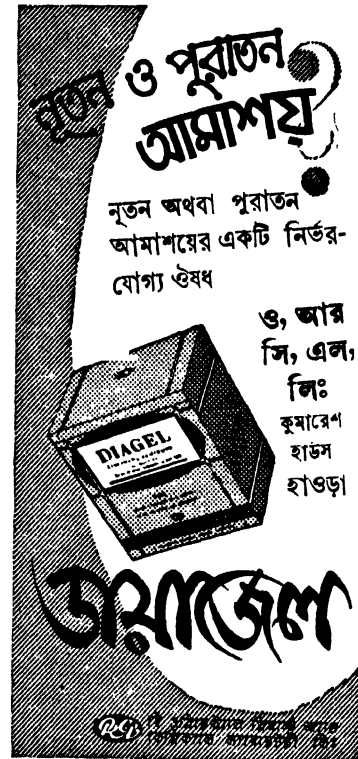
পল্লী-সন্ধ্যা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

তিমির-তড়াগ পার হয়ে আজ
পল্লীতে মোর কে তুই এলি ?
আঁচল থেকে ছড়িয়ে দিলি
কৃষ্ণকলি-জুঁই-চামেলী।
তোরি চরণ ধোবার লাগি'
কালো দীঘি আছেই জাগি'
স্বপন-ভরা গগন পানে
সোহাগ-ভরা নয়ন মেলি'!

গন্ধে মাখা ফুলের আতর,
ঘোম্‌টা কালো কিংখাবেরি,
আঁধারগুলে চাঁচর চুলে
বেড়াস্‌ আকাশ-আঙন্‌ ঘেরি'!
বনানী তোর বরণ-ছলে
জোনাক্‌-মালা দোলায় গলে,
ঝিল্লিদলের কলস্বরে
খবর জাগে আনন্দেরি!

সন্ধ্যা অয়ি শ্যামাঙ্গিনী,
আয় বলাকা ঝাঁকের সাথে,
পল্লী তোরে ডাকছে ওরে,
বল্লীবেণী দুলিয়ে মাথে।
রৌদ্রদাহে আর্ত্তধরা
ডাক্‌ছে তোরে আয়গো ত্বরা,
তরল সুধা পড়ুক ঝ'রে
স্নিগ্ধ মধুর নয়ন পাতে।

নারিকেলের শুষ্ক শিরে,
নিমের শাখে, বাঁশের বনে।
নীড়ে-ফেরা পাখীর তানে,
উতল শাঁখের কলস্বরে—
আয়গো লঘু চরণপাতে
চাঁদের সোনার প্রদীপ হাতে—
জুড়িয়ে দে তুই সকল জ্বালা
স্নিগ্ধ ঘুমের বিস্মরণে!

—পাঁচ—

বনশ্রী বেশিক্ষণ বসল না। চা খাওয়া শেষ হতে হীরেনকে একবার বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাঁচ সাত মিনিট কী আলোচনা করল নীচু গলায়। তারপর দরজার সামনে ফিরে এসে সত্যজিৎকে বললে, আজ আসি। স্কুল আছে।

—আচ্ছা।

—আমাদের বাড়ির ঠিকানাটা মনে আছে তো?

—আছে।

তারও পরে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলে বনশ্রী। যেন আরো কিছু বলবার আছে, কিংবা আরো কোনো কথা তার শোনবার আছে সত্যজিতের কাছে। কিন্তু বনশ্রী কোনো কথা বলল না—সত্যজিৎও না। সত্যজিৎ নিঃশব্দে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরাতে চেষ্টা করতে লাগল, আর বনশ্রী আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

জুতোর ক্লান্ত শব্দ ধীরে ধীরে নীচে নেমে যেতে লাগল। হীরেন আপ্যায়িত ভঙ্গিতে গাল চুলকোতে চুলকোতে ঘরে এসে ঢুকল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বেশ করে বসে পড়ল পা ছড়িয়ে! সত্যজিতের মুখোমুখি।

—বনশ্রীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ দু'বছর ধরে—হীরেন তথ্য পরিবেশন করল।

—ওঃ।

খবরটায় সত্যজিৎকে যথোচিত বিস্মিত হতে না দেখে হীরেন ক্ষুণ্ণ হল। বললে, পিয়োর বিজ্‌নেশ। মানে কি ব্যবসা।

—বঙ্গানুবাদ না করলেও বুঝতে পারব।—সত্যজিৎ হাসল: ব্যবসার কথাটা তো তুই আগেও বলছিলি। বনশ্রী কি তোকে ফিনান্স করছে নাকি।

—হুঁঃ, ফিনান্স করবে।—একটা দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে হীরেন কানের পরিচর্যায় মনোনিবেশ করলে। বিকৃত মুখে বললে, সেদিন আর ওর নেই—বুঝলি? বাপ রিটায়ার করেছে—পেন্‌শনের টাকায় চাল বজায় রাখা তো দূরের কথা, এখন সংসার চালানোই শক্ত।

—কেন—বনশ্রীর বড়দা? বনশ্রী যাকে বলত, 'এশিয়ার ব্রাইটেষ্ট্‌ বয়'—সে কোথায়? কী করছে?

—সেই গ্রেট্‌ হিতেন রায়? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতো অদ্ভুত ধরণে ইংরেজি বলত, আর বাঁ-হাতে টেবিল টেনিস খেলত? ওদের বাপই তার মাথাটি খেয়েছেন। এশিয়ার ব্রাইটেষ্ট্‌ বয়কে কী একটা ট্রেনিঙ্‌ নেবার জন্যে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন—ভেবেছিলেন বুদ্ধের পরে এই দু নম্বর 'লাইট্‌ অব্‌ এশিয়াটি' আমেরিকা আলো করে ফিরে আসবে। আমেরিকা আলো হয়েছে কিনা কে জানে—কিন্তু সে আর দেশে ফেরে নি।

—ফেরেনি?

—না।—হীরেন তিক্তভাবে হাসল: কান্‌সান্‌ না কোথায় একটা ফার্মে চাকরি জুটিয়েছে, সেখানেই বিয়ে করে ঘর-সংসার পেতেছে। একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে না। বনশ্রীর ছোট ভাই রীতেন কলেজ ডিবেটে তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—কিন্তু তিনবারেও বি-এ পাস করতে পারে নি। সে বলে, তার ইংরেজি পেপার বুঝতে পারে এমন কেউ ভারতবর্ষে নেই। হিতেন যদি গ্রেট্‌ হয়—রীতেন গ্রেটার। সে একটা মোটর বাইক কিনে তাইতে

ঘুরে বেড়ায়—আশা আছে দু' একবছরের মধ্যেই অল্ ইণ্ডিয়া সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ান হবে। তাকে সন্ধ্যেবেলায় প্রায়ই দেখা যায় ওয়াই-এম্-সি-এর সামনে। দেখলেই চিনতে পারবে। ক্যানাডীয়ান ছিটের বুশসার্ট, থুত্ নিতে আজকালকার অদ্ভুত ধরণের দাড়ি, আর সঙ্গে একটা মোটর সাইকেল। মুখে একটা পাইপও থাকে—সেটা প্রায় হুঁকোর মতো প্রকাণ্ড।

—চমৎকার।—সত্যজিৎ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। দড়ির আলনায় হীরেনের ময়লা কাপড় জামাগুলো হাওয়ায় দুলছে। তার মুখার্জি ভিলাকে মনে পড়ছে। এক ইতিহাস। একই অবক্ষয়ের অনুবর্তন। রিটায়ার্ড সেশন জজ আর বনেদী জমিদারের বংশধারায় একই বিষাক্ত জীবাণুর অনিবার্য বিস্তার।

হীরেন বলে চলল—আরে আমিই কি এত সব খবর জানতাম? আমাদের ছাত্রজীবনের 'হার ম্যাজেস্টি'—যিনি আমাদের কারো সঙ্গে হেসে একটা কথা কইলে বাকী সকলের বুকে আগুন জ্বলত—ভেবেছিলাম তিনি এতদিনে বাইরের কোনো এম্ব্যাসিতে কশ্চিৎ দু-তিন হাজারী মন্সবদারের ঘর আলো করছেন। কিন্তু হঠাৎ যখন তাঁকে সাউথের একটা গার্লস্ স্কুলে আবিষ্কার করা গেল, তখন নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

সত্যজিৎ শুনে যেতে লাগল। হীরেনের ময়লা কাপড় জামা হাওয়ায় দুলছে। অপরিচ্ছন্ন থাকবার একটা আশ্চর্য প্রবণতা আছে লোকটার। দেওয়ালে কতগুলো কালো কালো শুকনো রক্তের দাগ—দেখতে দেখতে গা ঘিন ঘিন করে। হীরেন ছারপোকা মেরেছে।

হীরেন বললে, একটা হাইস্কুল গ্রামার আর ট্র্যান্স্লেশন করেছিলাম—বাই এ গোল্ড মেডালিস্ট্। সেইটে নিয়েই গিয়েছিলাম তদ্বির করতে। গিয়ে দেখি হেড্-মিস্ট্রেস্ আর কেউ নয়—আমাদের 'হার ম্যাজেস্টি' স্বয়ং। একটা ময়লা দাগধরা পেয়ালায় নিম্‌কি বিস্কুট দিয়ে চা খাচ্ছেন। —হীরেন হেসে উঠল।

সেই জন্যেই এ ঘরের মেজেতে এত সহজে বসে পড়তে পেরেছে বনশ্রী—সত্যজিৎ ভাবল। সেই জন্যেই অবলীলাক্রমে অপরিচ্ছন্ন কেটলিতে রাস্তার দোকানের চা আনিয়েছে হীরেন, ঠোঙায় করে আনিয়েছে খাবার। এর মধ্যে শুধু আতিথেয়তা নেই—একটা অবচেতন প্রতিশোধ স্পৃহা লুকিয়ে আছে কোথাও—আছে খানিকটা হিংস্র আত্মপ্রসাদ।

ছারপোকার কালো কালো রক্ত চিহ্নের দিকে তাকিয়ে সত্যজিতের মনে পড়ল বহুদিন আগে দেখা বিলিতী কোনো চলচ্চিত্রের মতো!

গঙ্গার ধারে বুকে'তে সেই স্নিগ্ধ নীল আলো। এক কোনে মুখোমুখি দুজন। নিচে কালো গঙ্গার ওপর নানা রঙের অসংখ্য আলো। একটা স্টিমারের সার্চ লাইট চকিতে বহুদূর পর্যন্ত লেহন করে গেল। চকিতের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বনশ্রী।

রূপোর টি-পট আর কাঁটা চামচেগুলো ঝিকমিক করে উঠল। বনশ্রীর আঙুলে একটা হীরের আংটিও সেই সঙ্গে। জেটির গায়ে গঙ্গার জলে সেতারের ঝঙ্কার বাজছে। সব কিছুকে আশ্চর্য অবাস্তব বলে মনে হয়।

অবাস্তব বইকি। কোনো সন্দেহ নেই। হীরেনের ঘরে আর এক বনশ্রী। একটা অপরিচ্ছন্ন মেজের ওপর বসে পড়ল অসঙ্কোচে—স্বচ্ছন্দে রাস্তার দোকানের সিঙাড়া হাতে তুলে নিলে। চোখে মুখে স্পষ্ট ক্লান্তির দাগ। বনশ্রীর দিকে একবার তাকালেই বুঝতে পারা যায় ওর বয়েস বাড়ছে।

কত বয়েস হবে বনশ্রীর? পঁচিশ ছাব্বিশ? এর মধ্যেই কেন এমন করে বুড়িয়ে যাচ্ছে বনশ্রী।

হীরেন প্রসন্নভাবে বলে চলেছিল, তার পর আস্তে আস্তে সবই শুনলাম। বনশ্রীর ওই দুশো টাকার চাকরিটাও আজকে পরিবারের একটা অ্যাসেট। কিন্তু তাতেও কুলিয়ে ওঠে না—আরো কিছু হলে ভালো হয়।—হীরেন গাল চুলকোতে লাগল: আমিও দেখলাম, এই চান্স। বললাম, 'টেক্‌স্‌ট্ বই লিখুন।' বনশ্রী বললে 'আমার আসে না।' আমি বললাম, 'ভাবনা কী—লেখার লোক আছে, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু নামটা লেণ্ড্ করবেন—তাতেই ফিফ্‌টি—ফিফ্‌টি।' বনশ্রী বললে, 'ছিঃ ছিঃ সে ভারী অন্যায়।' আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনি মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন। আপনি আমি কোন ছার—নামের পাশে

হাতখানেক ডিগ্রিওলা অনেক প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত এ কাজ করে থাকেন। তবে তাঁদের দামী নামের খেসারৎ আরো বেশি—এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ওঠে। আপনি ফিফ্‌টি ফিফ্‌টিতে রাজী হলে বরং অসাধারণ ঔদার্যের পরিচয় দেবেন।' তবু রাজী হয় না—জানিস তো, মেয়েরা কেমন ফেস্টিডিয়াস হয়। শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে ছাড়লাম। তবে ভদ্রমহিলা একেবারে ব্ল্যাঙ্ক চেক দেননি—বইগুলো রিভাইজ করেন, কিছু কিছু লিখেও দেন।

বনশ্রী টেক্‌স্‌ট বুক লেখে। সত্যজিৎ জিনিসটাকে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। ইউনিভার্সিটির পত্রিকায় একবার একটা উজ্জ্বল মননতীক্ষ্ণ প্রবন্ধ লিখেছিল বনশ্রী। আজো সত্যজিতের মনে আছে। 'দি আর্ট অব্‌ জেম্‌স্‌ জয়েস্‌।'

হীরেন বললে, যাই বলিস, মেয়েরা এখনো প্রিমিটিভ। বাইরে যতই স্মার্ট হোক—আর ধারালো ঝকঝকে কথা বলুক, আসলে পুরোনো এথিকাল কোডের মায়া ওরা কিছুতেই কাটাতে পারে না। এখনো ওদের মনে জেলাসি আছে, ওরা ভালোবাসাকে বিশ্বাস করে, সাধুতার ওপরে ওদের আস্থা আছে, এখনো ওরা একটুখানি ঘর গড়তে পারলে আর কিছু চায় না, এখনো নিজের দুরন্ত ছেলেকে কোনো প্রতিবেশী একটুখানি শাসন করলেই ওরা ঝগড়া করবার জন্যে তৈরি হয়। আফটার অল্‌ অ্যাডাম্‌স্‌ রিব রিমেন্‌স্‌ দি সেম্‌। বনশ্রী রায়ও ব্যতিক্রম নয়।

বনশ্রীর প্রসঙ্গ থেকে একেবারে দার্শনিকতায় চলে এসেছে হীরেন। সত্যজিৎ হাসল।

—অ্যাডাম্‌রাই কি খুব বদলেছে? এথিকাল কোডকে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না বলেই অস্বাভাবিক ভাবে সংস্কার ভাঙবার চেষ্টা করে। চালটা কিছুতেই বদলাতে পারে না বলেই ওপর দিকে পা তুলে হাঁটতে চেষ্টা করছে—তার প্রমাণ আমেরিকা। ওটা চমকপ্রদ বটে—কিন্তু মানুষের মৌলিক পরিবর্তন নয়। বরং ও থেকে এইটেই প্রমাণ হয় যে নিজের কাছে সে যত বেশি হেরে যাচ্ছে—ভাঁড়ামো করে তত বেশি ঢাকতে চেষ্টা করছে তাকে। ইভদের মুখোসটা আজও তত শক্ত হয়ে এঁটে বসেনি—তাই চট করে ওদের এখনো চেনা যায়। তফাতটা এইখানেই।

হীরেন বিব্রত হয়ে বলল, থাম-থাম। প্রোফেসারের মুখ একবার খুলে দিলে আর রক্ষে নেই—সঙ্গে সঙ্গে চলল পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের গ্রামোফোন রেকর্ড। ওয়ু বন্ধ কর প্লীজ।

—আমার দোষ নেই। কথাটা তুই-ই তুলেছিলি।

—ঘাট হয়েছিল।—হীরেন একটা পুরোনো সিগারেটের টিন খুলে বিড়ি বের করলে: এবার নিজের কথা বল্‌। অনেকদিন পরে তো দেখা হল। নাটকীয় কিছু ঘটল না?

—না।

—হোপ্‌লেশ! হীরেন বিরক্ত হয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলে।

—মেলোড্রামার যুগ চলে গেছে এখন।

হীরেন ট্যারা চোখে তাকালো। একটা বাঁকা হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণায়।

—গেছে নাকি?

সত্যজিৎ এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল: না গিয়ে উপায় কী? এ যুগে মেলোড্রামা লজ্জার কথা। জীবনে হয়তো কখনো কখনো অতি-নাটকীয় এখনো ঘটে—কিন্তু লোককে সে-কথা বলবার জো নেই। বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। আগে জীবনকে বিস্তৃত করাই ছিল আর্ট—এখন জীবনকে সংকুচিত করে বলতে হয়। নইলে কন্‌ভিন্‌সিং হয় না।

—প্লীজ—প্লীজ।—হীরেন দু-হাত জোড় করল: আবার সেই দুর্বোধ্য বক্তৃতা। ওটা তোর ছাত্রদের জন্যই তোলা থাক। আমার সোজা কথার সোজা বাংলায় জবাব দে। বনশ্রী রায় কিছু বলেনি? নাথিং? হোয়াট অ্যাবাউট দি ওল্‌ড ফ্লেম্‌?

—ফ্লেম কোনোদিন জ্বলেছিল কিনা তাই জানি না। ও কথা থাক।—সত্যজিৎ একটা হাই তুলল: কিন্তু যে-জন্যে এই সাত-সকালে ছুটে এলাম তাই যে এখনো ঠিক হল না। তুই একটা অ্যাডভাইস দে। রাজী হয়ে যাব ওই টাকায়?

—হওয়াই তো উচিত। কেন সেধে ছেড়ে দিবি কাজটা?

—কিন্তু প্রেসটিজ—

—প্রেস্‌টিজের বালাই থাকলে এ সব কাজ চলে না ব্রাদার। টাকা ইজ টাকা। একবার নোটবইটা ভালো করে চালু হোক—বাজারে ডিম্যাণ্ড হোক,তারপর আপনিই তোর রেট বেড়ে যাবে।

—তা হলে—

হীরেন একটানে বিড়ির আগুনটাকে একেবারে তলা পর্যন্ত টেনে আনল: কলেজের পরে স্ট্রেট চলে আয় পাব্‌লিশারের ওখানে। ধর পাঁচটা ছ'টা নাগাদ। আমি ওখানে থাকব, তোর জন্যে আগাম টাকাও তৈরি করে রাখব।

—তবে তাই কথা রইল। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকালো সত্যজিৎ—আল্‌সেমি ভেঙে উঠে পড়ল।

—চললি ?

—হ্যাঁ—উঠি এখন। কলেজ আছে।

আবার ট্রাম। বাইরে বেলা সাড়ে নটার চঞ্চল কলকাতা। একদল এর মধ্যেই অফিসে বেরিয়ে পড়েছে, আর একদল এখনো বাজার করে ফিরছে। পরণে লুঙ্গি, হাতে থলের ভিতরে পালং শাকের শীষ।

বনশ্রী। ওল্‌ড্‌ ফ্লেম্‌।

সত্যিই কি কখনো আগুন জ্বলেছিল ? এই প্রশ্নটা সত্যজিতের মনের মধ্যেও ঘুরপাক খেতে লাগল।

ছুটির পরে তোমার কোনো কাজ আছে আজ ?

না।

যাবে সিনেমা দেখতে ?

ক্ষতি কি।

পাশাপাশি বসে ছবি দেখা। প্রায়ই প্রেমের গল্প।

আশ্চর্য ড্রামা তৈরি করেছে—না ?

অদ্ভুত। চলো—চা খাই।

এখানে ?

একটু নিরিবিলি হলে ভালো হয়—না ?

তোমার যদি আপত্তি না থাকে—

ডোণ্ট্‌ বী শিলি—

সান্নিধ্য—সাহচর্য। কাছে কাছে থাকতে ভালো লাগা। এক ধরণের অন্তরঙ্গ বন্ধুতা। পরস্পরকে একান্ত-ভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। নিয়মিত দেখা না হলে কোথায় কী যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়।

বন্ধু মহলে ঈর্ষ্যার তুফান উঠেছিল।

: কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।

: লাল চিঠি আর কতদূরে ?

আশ্চর্য, লাল চিঠির কথা কখনো মনে হয়নি। শুধু এই কাছে কাছে থাকা। এই বন্ধুত্ব। যে একান্ত বেদনা একেবারে নিজের—সেইটে বলতে পারা। যে ভালো লাগার অর্থ আর কারো কাছে ধরা পড়বেনা—সহযাত্রীর মনে সেটুকু সঞ্চার করে দেওয়া।

তারপরে সুতো কেটে গেল। যেন স্বাভাবিক নিয়মেই কাটল। পরীক্ষার পরে বাইরে চলে গেল বনশ্রী। খান দুই চিঠি লিখল। সত্যজিৎ জবাব দিয়েছিল। কিন্তু আর সাড়া আসেনি বনশ্রীর।

খুব খারাপ লেগেছিল কিছুদিন। বছর খানেক ধরে অসহ্য লাগত বিকেলটাকে। ভারী বিশ্রী সময় এই বিকেল —ক্লান্তিতে সারা শরীরকে অবশ করে দেয়—একটা যন্ত্রণা থেকে থেকে হৃৎপিণ্ডকে মোচড় দিতে থাকে। লক্ষ্যহীন ভাবে ট্রামে বাসে ঘুরে বেড়ানো—তারপর সন্ধ্যা একটু গভীর হলে গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চেতে চুপ করে বসে থাকা।

আজ আবার সেই পুরোনো অভ্যাসের যন্ত্রণাকে যেন জাগিয়ে দিতে চায় বনশ্রী। কেন আসতে বলে তাদের বাড়িতে ? সুতো কেটে গেছে। বনশ্রীকে আর সন্ধ্যাগুলো এখন দিতে পারবেনা সত্যজিৎ। সেখানে নতুন আর একজনের দাবি এসেছে।

পূরবী।

সত্যজিতের চমক ভাঙল। সামনের স্টপেই তাকে নামতে হবে।

মুখার্জি ভিলার গেট্‌ পেরিয়ে পা দিতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বীথি। সমস্ত মুখে আতঙ্কের ছায়া।

—ছোট্‌দা—শিগগির চল। এখনি একবার যেতে হবে মেডিক্যাল কলেজে।

—মেডিক্যাল্‌ কলেজে ? কেন ?

শীর্ণ আতঙ্কিত গলায় বীথি বললে, বাবা গিয়েছিলেন বাগবাজারের ভাড়াটেদের ওখানে। সেখানে খুব উত্তেজিত হন—তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ওখান থেকে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সত্যজিতের পায়ের তলায় মাটি দুলতে লাগল।

—কেমন আছেন এখন ?

বীথির ঠোঁট কেঁপে উঠল। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, ভালো নয়। দিদি খুব কান্নাকাটি করছে। রঘু বাবার সঙ্গে হাসপাতালেই রয়েছে। চল্‌ ছোট্‌দা—

দুটো অসাড় আড়ষ্ট পা-কে রাস্তার দিকে এগিয়ে দিলে সত্যজিৎ: চল্‌—

ক্রমশঃ
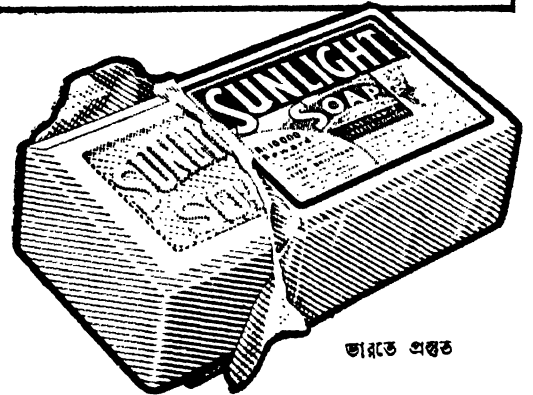
পরিচালক—উপানন্দ

জন্মতিথি উৎসব ও সাধারণ প্রজাতন্ত্রদিবস

মাঘ মাস। পাতাঝরার দিন শেষ হয়ে আসছে। নবমুকুলের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করবার সময় হোলো বসন্তের সমাগমে। মলয় হিল্লোল অনুভূত হচ্ছে। প্রকৃতি আনন্দ-বিহ্বল। আম্রমুকুলের গন্ধে বনানী মাতোয়ারা। ফসল কাটার দিন চলে গেছে, নতুন ফসলের বীজ বুনবের প্রত্যাশায় মাঠে মাঠে ভূমি কর্ষণের সময় হোলো। এ মাসটী শীত-ঋতুর অন্তর্গত। তবুও এ মাসে বসন্তের আমেজ পাওয়া যায়। বনে বনে অশোক, বকুল, শিমুল, পলাশের তন্দ্রা এখনও ভাঙেনি। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিচিত্র প্রবাহধারায় অবগাহন করে শুচিস্নাত হবার মুহূর্ত্ত এলো। প্রকৃতির সন্তান মানুষ। তার দুয়ারে কখন বসন্তের জাগরণী গান হিন্দোলের সুরে সুরে উঠে আন্দোলিত করবে, সেই আশায় দূর পানে চেয়ে আছে। উল্লাসে ও বিস্ময়ে আমরা মধুমাসের মাধবীরাতের পানে চেয়ে হর্ষাপ্লুত। দক্ষিণ হাওয়ায় যেদিন চৈতালী শস্যের ঢেউ দেখবার সুযোগ পাবো, সেদিন আরও হবে আনন্দ।

তোমাদের কিশোর প্রকৃতিতে এখনও জীবনের জটিলতার রেখা পড়েনি, তাই প্রকৃতির উদার স্নেহের ছত্রছায়ায় বসে এর রূপ-মাধুর্য্য উপভোগ করো, আর এ মাধুর্য্যের স্রষ্টা কে?—তার সন্ধান করো। প্রকৃতির রূপ অনাদিকাল থেকে আমাদের দুঃখ-সুখের সহচর হয়ে আছে, প্রকৃতির পটভূমিতেই আমাদের ভাগ্যের আলেখ্য অঙ্কিত।

ভোরের কুয়াশা লাগছে ভালো—জীবনের কুয়াশা ভেদ করেই তো আমাদের পথ চলা আলোর পানে, আর তাতেই তো আনন্দ। 'মানুষ দোলক শুধু হাসি-অশ্রু মাঝ। এই হাসে, এই কাঁদে; এই তার কাজ।' প্রকৃতির সন্তান মানুষ, তাই প্রকৃতির হাসি কান্নার সঙ্গে আছে মানুষের নিবিড় যোগাযোগ। পূর্ব্বের মত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হোলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমরা শিক্ষার মাধ্যমে আজ সচেতন।

মেঘমুক্ত নীল আকাশের বিস্তৃতির ভেতর সহস্র সহস্র তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে। দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত্রের অপূর্ব্ব সমারোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোনো—কে যেন গাইছে—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনা তোমারে—' কে যেন মায়ার অঞ্জন বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।······গাঁয়ের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে নদী, ওর কলধ্বনি কানে আসছে, আর আসছে অরণ্যের মর্ম্মর ধ্বনি। পারে যাবার যারা, এপার থেকে তারা চলে গেল। একটু আগে সমস্ত আকাশে দেখেছি অস্তগামী সূর্য্যের পশ্চিম দিগন্ত হোতে অপূর্ব্ব স্বর্ণরশ্মির বর্ণ-বিলাস। হর্ষে হৃদয় পরিপ্লুত হয়েছে, এখনও সে হর্ষ পরিব্যাপ্ত রাত্রির আলোছায়ায়। রাত্রির প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌লো আকাশে চাঁদ হয়ে।

এ মাসে আমাদের ভারতীর বন্দনা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে। এ মাসেই আমাদের বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষের জন্মোৎসব আর মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মতিথি। বঙ্গ ভারতীর এইসব শ্রেষ্ঠ সন্তান আমাদের জাতির ত্রাণকর্ত্তা হয়ে এসেছিলেন। এঁদের স্মৃতি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত আমাদের হৃদয়াকাশ আলোকিত করে রয়েছে। মহাকবি মাইকেল গেয়ে গেছেন—'সেই ধন্য নর কুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন—' এঁদের জন্মোৎসব করবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হও।

বহুকালের পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের পর এই মাসে প্রতিষ্ঠিত হোলো সাধারণ প্রজাতন্ত্রদিবস। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী আমাদের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে আমাদের ভারতবর্ষ একটি সার্ব্বভৌমিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এই দিবসের শুভ্র-তোরণ দ্বারে তোমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে উৎসব করো, স্বাধীন রাষ্ট্রের সুদীর্ঘ জীবন রক্ষার জন্যে তোমাদের জীবনীশক্তি সুদৃঢ় হোক। শ্রীপঞ্চমীতে করো বিদ্যাদায়িনী বাণীর অর্চ্চনা, দেবীর করুণা লাভ করে তোমরা স্বদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প কলা সভ্যতা সংস্কৃতিকে বিশ্বের ভেতর সর্ব্বোত্তম করে তোলো।

বাঙ্গলার সীমানার কিছু বৃদ্ধি হয়েছে, এতদিন যারা আমাদের ঘরে থেকেও পর হয়েছিল অন্য প্রদেশ ভুক্তিতে, আজ নতুন দিনে তাদের ডেকে এনে আনন্দে আলিঙ্গনবদ্ধ হও, আর যারা দূরে এখনও রয়ে গেল, তাদের কাছে তোমাদের অজস্র অমর তারুণ্যের বাণী পাঠিয়ে দাও, তোমাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা গড়ে তুলুক তাদের তারুণ্য শক্তি—তোমাদের ভাষা, তোমাদের সাহিত্য, তোমাদের শিল্প, তোমাদের বিজ্ঞান, তোমাদের ধর্ম্ম বিশ্ব-সমাদৃত, এ সমাদর অক্ষুণ্ন রাখ্‌বার জন্য আজ বসন্ত দিনে তোমরা শপথ গ্রহণ করো—তোমরা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধন, তোমরা আমাদের মুখোজ্জ্বল করো।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা এই মাসের প্রারম্ভে। এই অবতার-পুরুষের উদ্দেশ্যে তোমরা হৃদয়ের যজ্ঞাহুতি দাও, আর ভগবদ্-বাণী লাভের জন্য প্রার্থনা করো। মহামানব মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান হোলো এই মাসে।

যিনি জাতির সম্মুখে মহান্ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেলেন স্বদেশের স্বাধীনতা, তাঁর মহাপ্রয়াণ আমাদের অন্তরে যে গভীর ক্ষত রেখে গেছে, সেই ক্ষতস্থানে তোমরা তোমাদের পবিত্র অন্তরের প্রলেপ দিয়ে তাকে আরোগ্য কর্‌বার চেষ্টা করো। যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন জাতির জন্যে অমর কাব্য রেখে গেলেন, আজ বিরুদ্ধ সমালোচকদের লেখনী তাঁর অমর আত্মাকে যে বেদনা দিচ্ছে, তোমরা তার লাঘব করো। মহাকবি বঙ্গভারতীর অর্চ্চনায় আত্মোৎসর্গ করে গেছেন, আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী।

ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ ভগবানের মর্ত্ত্যলীলা সহচর স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র আদর্শ ও বাণী তোমরা গ্রহণ করে আত্মিক ঐশ্বর্য্যবান হও! সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনের মহাকাব্য বারে বারে পাঠ করো। শোনো তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গীত—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

তিনি বলেছেন—"হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ [illegible]ত্যাগী শঙ্কর।......হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার [illegible]; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী [illegible]র ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, [illegible]র সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার [illegible]কার বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের [illegible]ণ আমার কল্যাণ।"

জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির ত্রিধারায় তিনি ত্রিবেণী-সঙ্গম তীর্থ রচনা করে [illegible]বর্ষকে মহাশক্তির মহাপীঠস্থান করে গেছেন। তোমরা এখানে [illegible] তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সিদ্ধ সাধক হও, আর শ্রীঅরবিন্দের বহু আকাঙ্ক্ষিত অতিমানবের রূপ ধারণ করো। মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলে জীবনের আত্মবিস্মৃতির পথ প্রশস্ত হয়, অন্তরের গতি ও প্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে ঊর্দ্ধমুখী হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র শুধু স্বজাতির ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে পরম বিস্ময়। নিজের জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে বিপন্ন করে আর রাজশক্তি ও বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তিনি সংঘর্ষ করে বারে বারে জয়ী হয়েছেন, বহুধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ত্যাগে, সাধনায়, বীরত্বে, সেবায় মহান্ জীবনাদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন—তাঁর জীবনের সর্ব্বস্তরে সর্ব্বক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি শাশ্বত কল্যাণের সন্ধান—তাঁর আদর্শ ও নেতৃত্ব অবলম্বন করেই ভারতের ঐতিহাসিক জয়যাত্রা সাফল্য গৌরবমণ্ডিত। তাঁর ভেতর দিয়েই ভারতের দৈবী আত্মার শাশ্বত স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে, তাই তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালনে তোমরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করো—যাতে করে বীর পূজায় তোমাদের হৃদয় মন প্রাণ অর্পণ করতে পারো। নরাধম মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাঙ্গলার তথা ভারতের ইতিহাস যে ভাবে কলঙ্কিত হয়েছিল, সেই কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন। তাঁরই আনুকূল্যে ভারতের দাসত্বের ইতিহাস, দুঃখেরই ইতিহাস, গ্লানির ইতিহাসের শোকাবহ যবনিকা অপসৃত হ'তে পেরেছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুন চেকোশ্লোভোকিয়ার কার্লসবাদ থেকে তিনি যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে পাই—'আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁহারা স্বভাবতঃ নৈরাশ্যপূর্ণ ও নৈরাশ্যবাদী। ইঁহারা সদাসর্ব্বদা এই কথা প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত যে বাঙ্গালী জাতি নিজের শক্তি সামর্থ্য হারাইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে সব ব্যক্তি উক্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন তাঁহারা স্বভাবতঃ আত্মবিশ্বাসহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন যে সমগ্র জাতি তাঁহাদের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ—তাঁহারা নিজেরা যেরূপ উন্নতিশীলতা ও অগ্রগামিত্ব হারাইয়াছেন সমগ্র জাতি বুঝি তদ্রূপ এই সব বৃত্তি হারাইয়াছে।

আমি স্বভাবতঃ আশাবাদী; তাই আমি সর্ব্বদা অন্যের হৃদয়ে আশা ও আত্মবিশ্বাস জাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি মনে করি না যে জাতি হিসাবে আমরা মূলতঃ অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং নানা দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। তবে বাস্তবতার দিক দিয়া আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের চরিত্রে এবং আমাদের সমাজে অনেকগুলি আবর্জ্জনার সমাবেশ হইয়াছে। এই জন্যই আজ ভারত পরাধীন—এই জন্যই আমাদের মধ্যে এখনও পরপদলেহনকারী, বিশ্বাসঘাতক, কুক্কুরজাতীয় মানব পাওয়া যায়।

অন্য প্রদেশের তুলনায় রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গলার বিশেষ রকমের

অসুবিধা হইয়াছে—দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেশবন্ধুর সমসাময়িক নেতারা আজও জীবিত। তাঁহাদের শক্তি ও প্রভাবের ফলে ঐসব প্রদেশের কর্ম্মধারা সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। (যেখানে ঐরূপ নেতা নাই, সেখানকার অবস্থা বাঙ্গলা অপেক্ষাও হীন—যথা পঞ্জাব) তার পর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বসাইবার জন্য আমাদের ভাগ্যদেবতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে অকালে অপহরণ করিলেন।

তথাপি আমি একথা বলিতে পারি যে, নেতৃত্বের দিক দিয়া এত অসুবিধা ভোগ করিলেও বাঙ্গালী জাতি ১৯২৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যেরূপ ত্যাগ, জনসেবা, সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে তাহা অন্য কোন প্রদেশের অপেক্ষা কম নয়, বরং অনেক বিষয়ে অন্য প্রদেশের অপেক্ষা অধিক প্রশংসার্হ।......যেখানে কল্পনা এত খাটো এবং আদর্শ এত ছোট, সেখানে সাধনা যে পঙ্গু হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও হেতু নাই।......আমাদের হীন মনোবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারি না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে; অথচ আজকাল দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য? যদি তাহা হয়, তবে ইহার কারণ কি? আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্রমহলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ সমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। তার পরিবর্ত্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুবপ্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—কারণ মনুষ্যসমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তদ্রূপ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে। চরিত্রগঠনের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না। আমাদের তৃতীয় অভাব—উপযুক্ত নেতা......শেষবার আমি ঐ কথা বলি—আজ আমাদের প্রধান অভাব উপযুক্ত নেতার। নেতা আকাশ হইতে আসে না—সংগ্রামের ভিতর দিয়া এবং কঠিন সাধনার সাহায্যে সর্ব যুগে সর্ব দেশে নেতা গড়িয়া উঠে। যাঁহারা অতীতে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সাধ্যমত জনসেবা করিয়া গিয়াছেন এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজ আমাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও মনোবৃত্তি লইয়া আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে আগুয়ান হইতে হইবে এবং দেশবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।...."

পৃথিবীর ইতিহাসে নেতাজী এক অত্যাশ্চর্য্য আবির্ভাব। এক বস্ত্রে একান্ত অসহায় অবস্থায় তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, শেষে কেমন করে তিনি পৃথিবীর নানা প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় জয় করে বিরাট বাহিনী নিয়ে ইম্ফল পর্য্যন্ত এসেছিলেন, তা ভাব্লেও বিস্মিত হ'তে হয়। তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে অসাধারণ পুরুষ হয়েছিলেন। তিনি আমাদের চির-নমস্য, চির-বন্দনীয়।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় এক আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধী প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর ন্যায় নির্ভীক, সরল, সত্যনিষ্ঠ নেতা পৃথিবীতে একান্ত দুর্ল্লভ। অহিংস মন্ত্রের তিনি ছিলেন সিদ্ধসাধক, জীবে প্রেম ও সেবা ছিল তাঁর পরম লক্ষ্য, স্বার্থত্যাগ ও সত্যবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান সম্পদ। স্বদেশের স্বাধীনতা তাঁরই সাধনা-লব্ধ। তিনি বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যের উত্তর সাধক ও আলোকের বার্ত্তাবহ। অসহযোগ আন্দোলন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এসো, আমরা তাঁর উদ্দেশে স্মৃতিতর্পণ করি।

সত্য অবিনশ্বর, তার ধ্বংস হয় না। কীর্ত্তি শাশ্বত, সে কখন ম্লান হয় না।

কবি বলেছেন—

'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে।'

পৌষে

শ্রীপার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়

আম্রের কুঞ্জে
সবুজের পুঞ্জে
ভোম্‌রারা গুণ গুণ গাইল।
আকাশের চক্ষে
ধরণীর বক্ষে
কুয়াসার ধূম্রজাল ছাইল।
ফাঁকা মাঠ বহুদূর
মুঠো মুঠো রোদ্দুর
প্রান্তর চারিদিকে রিক্ত।
পুষ্পের বন্যা,
গরবিনী ধন্যা
শিশিরের সুবাসেতে সিক্ত।
চঞ্চল সমীরণে
প্রজাপতি বনে বনে
নীল লাল পাখ্‌নাটি মেলল।

হাঁড় কাঁপা শৈত্যের
বুঝি কোন দৈত্যের
নিঃশ্বাস বারে বারে ফেলল।
পৌষের স্পর্শে,
সুমধুর হর্ষে
ঘুমঘোর প্রকৃতির টুটল।
ধরণীর অঙ্কে
অযুত শঙ্খে
অমৃতের পুত্রেরা জুটল।

ম্যাজিকের খেলা

যাদুকর রাজেন রায়

আজ ভাই তোমাদের একটা সুন্দর "ম্যাজিকের খেলা" শিখিয়ে দোব, যে খেলাটা তোমরা তোমাদের ছোট ছোট ভাই, বোন, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতিদের অতি সহজেই দেখিয়ে আনন্দ দিতে পারবে এবং নিজেও খুব আনন্দিত হবে। প্রথমে খেলাটা কি তাই বলছি।

যাদুকর ষ্টেজ্-এর (stage) উপর এসে বোললেন যে মাননীয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা আমার হাতে একটা সাধারণ চায়ের ডিস্ এবং তার উপর কতকগুলি টাকা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা বেশ, এবারে আপনাদের মধ্যে যিনি এক হতে দশ অবধি সংখ্যা গুণতে পারেন দয়া করে তিনি ষ্টেজ (stage) এর উপর আমার কাছে এসে আমার ডিসের উপর রাখা সমস্ত টাকাগুলি তুলে আপনার হাতে রেখে দর্শকদের দেখিয়ে গুনুন যে কতগুলো টাকা আপনার হাতে আছে। তখন সেই ভদ্রলোক (যিনি দর্শকদের প্রতিনিধি) বোললেন যে "আমার হাতে দশ টাকা আছে।" তারপর যাদুকর বোললেন যে এবারে সমস্ত টাকাগুলি আমার বাম হাতের ডিসের উপর রেখে দিন এবং আপনার ধুতিখানার এক অংশ থলির (bag) মত করে ধরুন—যাতে আমি টাকাগুলি আপনার কোঁচড়ের ভিতর ঢেলে দিতে পারি। আর একটা কথা জেনে রাখুন যে আমি যখনই টাকাগুলি দিয়ে আপনার কোঁচড়ের মুখ বন্ধ করে দেব সমস্ত টাকাগুলি হাতের মধ্যে চেপে ধরবেন। রেডি ওয়ান, টু, থ্রী বলেই যাদুকর (Magician) সমস্ত ডিসের টাকাগুলি কাপড়ের ভিতর ঢেলে দিলেন এবং ডিসটা খালি দেখিয়ে দিলেন। এবার দর্শক ভদ্রলোকও পূর্ব্ব কথা মত কাপড়ের ভিতরকার টাকাগুলি বেশ করে দুহাতের মধ্যে চেপে ধরলেন।

কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর যাদুকর দর্শক ভদ্রলোকদের হাতের দিক লক্ষ্য করে বোললেন যে এবার আমি হাত দিয়ে তালি বাজাব এবং আপনারা মনে রাখবেন যে আমি কবার তালি বাজাই; কারণ আমার একটা প্রধান দোষ হলো আমি কোন জিনিষ মনে রাখতে পারি না। এই বলে যাদুকর হাত তালি বাজিয়ে চোললেন, তারপর হাত তালি বাজান বন্ধ করে দর্শকদের জিজ্ঞাসা কোরলেন যে আমি কবার হাত তালি বাজিয়েছি বলুন তো? তখন দর্শকবৃন্দ হতে বোলতে আরম্ভ কোরলেন যে আপনি পাঁচবার হাত তালি বাজিয়েছেন। তখন যাদুকর বোললেন যে অলরাইট, (All right) আপনারা হয়ত অনেকে জানেন না যে যাদুকরেরা এক, একটা হাততালি বাজালেই এক একটা টাকার সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমি পাঁচবার হাত তালি বাজিয়েছি। তাহলে পাঁচ টাকার সৃষ্টি হোলো। কিন্তু আপনারা বোলবেন যে পাঁচ টাকা সৃষ্টি হোল কোথায়? আমি তার উত্তরে বোলব যে ঐ দর্শক ভদ্রলোকের মুঠা করে রাখা টাকার মধ্যে।

কি…? আপনারা বিশ্বাস কোরছেন না? তখন যাদুকর সেই দর্শক ভদ্রলোককে বোললেন যে দেখুন—আপনি দয়া করে আস্তে আস্তে আপনার হাত খুলে আবার টাকাগুলি গুন্তি করে দেখুন সত্যই টাকা বেশী হয়েছে কিনা। তখন সেই ভদ্রলোক কথা মত হাত খুলে গুন্তি করে দেখেন সত্যই পাঁচ টাকা বেশী হয়ে গেছে। দিলেন দশ টাকা কিন্তু এখন দেখছেন হয়েছে পনর টাকা। এই দেখা দেখি সবাই খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলো। আর যাদুকরের খুব প্রশংসা কোরতে আরম্ভ কোরল।

তোমরা হয়ত বা অনেকে শুনে ভাবছ যে, কোন মন্ত্র, তন্ত্র আছে নাকি? না মন্ত্র বা তন্ত্র কিছুই নেই, কেবল আছে হাতের কৌশল। তোমরা যারা এই খেলা কোরতে চাও তারা মন দিয়ে শোন। আমি এবার খেলার কৌশল বলে যাচ্ছি।

এ খেলা দেখাতে হলে প্রথমতঃ পনরটা কাঁচা টাকা এবং একটা সাধারণ চায়ের ডিস্ জোগাড় করতে হবে। তারপর ঐ পনর টাকা হতে পাঁচটা টাকা তোমার বাম হাতের উপর চারটে আঙুলে রাখ। এখন ঐ ডিসের তলার দিকের মাঝখানটা তোমার বাম হাতের পাঁচ টাকার উপর রেখে বুড়া আঙুলের সাহায্যে ডিস্খানা ধর। তাহলে এখন পাঁচটা টাকা ডিসের নিচে রয়ে গেল। লোকে তোমার বাম হাতের টাকা দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। ব্যাস্ তোমার কাজ হাসিল। এখন ঐ বাকি দশ টাকা ডিসের উপর রাখো এবং দর্শকদের গুণ্‌তি করতে বলো যে কটা টাকা আছে। তারপর টাকা গুণতে হয়ে গেলে যখন তুমি দর্শক ভদ্রলোকের কাপড়ের মধ্যে টাকা ঢালবে সেই সময় তোমার ডিসের পিছনের দিকে যে লুকান পাঁচ টাকা আছে, ছেড়ে দাও। এই কৌশল। এবারে পূর্ব্ব কথামত কাজ করলেই কৃতকার্য্য হতে পারবে।

আমার প্রথম জীবনে আমি অনেক জায়গায় এ ম্যাজিকটা দেখিয়েছি এবং এখনও সুযোগ পেলে প্রায়ই দেখিয়ে থাকি। আশা করি তোমরাও দেখতে পারবে। তবে খেলা দেখাবার আগে ভাল করে নিজে কয়েকবার অভ্যাস্ (Practice) করে নিও।

একতালা ঘরটা

নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

একতালা বাসা ঘর—সোঁদা সোঁদা গন্ধ
আলোহীনসেঁত সেঁতে তিনদিক বন্ধ।
যাই হক বাসা ঘর। তালা দিয়ে দেশেতে,
ঘুরে ফিরে এলো রাম মার্চ্চ মাস শেষেতে।
ঘুমেতে বিভোর হয়ে শুয়ে যেই পড়ল,
লাখে লাখে ছারপোকা ছেঁকে তারে ধরল!

মশকীরা দলে দলে পল্ পল্ করিয়া,
রক্ত চুষিয়া খায় হয়ে সব মরিয়া।
ছট্ফট্ করে রাম—তবু ঘুম টুটেনা,
ঘুম তার এত জোর মুখে কথা ফুটে না!
হঠাৎ পায়েতে তার ইঁদুরেতে কামড়ে,
রাত্রের সাথে যেন তুলে নেয় চামরে।
কোথা হতে আরসুলা মুখে তার উড়িয়া,
সুড় সুড়ি দেয় যেন নাকে শুঁড় পুরিয়া।
আলো জেলে উঠে দেখে চমকি সে চাহিয়া,
রক্ত ঝরিছে যেন শ্রীচরণ বাহিয়া।
পালে পালে ছারপোকা দেখে মশা হাজারে,
কামড়ে করেছে লাল কি বিষম সাজাঁরে!

পিঁপড়েও দলে দলে ছেয়ে গেছে বিছানা,
ইঁদুর পালায় ছুটে পেয়ে তার নিশানা।
বিভীষিকা দেখে এত ভয় খুব বাড়লো,
খিল খুলে পালালো সে—ঘরখানা ছাড়লো।

*　　*　　*

কলকাতা সহরের একতালা ঘরটা,
ভাব্‌লেই কথা তার—আজো আসে জ্বরটা।

মেঘরাজার দেশে

শ্রীমতী প্রভাবতী ভট্টাচার্য্য

(রূপকথা)

নারদ মুনি ঝগড়া লাগাতে ভালবাসেন। সে তো তোমরা জান নিশ্চয়ই—তাই না? তাঁর কাজই এর কথা তার কাছে—তার কথা ওঁর কাছে লাগিয়ে একটা ঝগড়া বাঁধানো।

একদিন সেই নারদ রাস্তা দিয়ে চলছেন—সহসা তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে গেলো—প্রজাপতি বসে বসে গণনা করছেন।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের গণনা ভাই?

প্রজাপতি বললেন—বিয়ের গণনা।

কার বিয়ের? উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন নারদ।

—মেঘরাজার ছেলে···আর রৌদ্ররাজার মেয়েতে।

—তোমার গণনা কি অব্যর্থ?

হাঁ—দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন প্রজাপতি।

—আচ্ছা, কতদিনের মধ্যে বিয়ে হবে?

—সাতদিনের মধ্যে।

নারদ বললেন—সাতদিন পরে এসে তোমার কাছে খবর নিয়ে যাব—বিয়ে হল কিনা। মনে মনে বললেন—দাঁড়াও হওয়াচ্ছি তোমার বিয়ে। তোমার গণনা আমি ব্যর্থ করবো।

নারদ সোজা চলে গেলেন মেঘরাজার বাড়ী। অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছে পথঘাট কর্দ্দমাক্ত। মানুষগুলো ভিজে চুপচুপুর। মেঘরাজকুমার উদ্যানে ভিজে ভিজে সঙ্গীদের নিয়ে খেলা করছে। আট বছরের নধরকান্তি ছেলে, নারদ তাকে কোলে নিয়ে বললেন—যাবে আমার সঙ্গে এক জায়গায়—খুব সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখতে পাবে।

ছেলেটি বললো—হাঁ যাব—মায়ের কাছে বলে আসি।

না—না, বলতে হবে না। এক্ষুণি চলে আসবো। বলে, নারদ ছুট দিলেন। বাড়ী এসে বৌকে বললেন—নাও এ ছেলেটাকে কেটে-কুটে রান্না কর। দেখো পালিয়ে না যায়। এই বলে একটা ঘরের মধ্যে ছেলেটাকে বন্ধ করে রেখে আবার বেরিয়ে পড়লেন নারদ।

নারদের স্ত্রী ভাবলেন—বহু জন্মের পাপের ফলে বুঝি এজন্মে আমরা সন্তানের মুখ দর্শন করতে পারলাম না। তার উপর আবার এমন সুন্দর নধরকান্তি শিশুটিকে হত্যা করবো? কিন্তু কী করা যায়—হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসে গেলো মাথায়।

রুদ্ধ ঘরে বসে কাঁদছিলো মেঘরাজকুমার—নারদ-পত্নী বললেন···কেঁদো না বাবা, তোমাকে আমি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব। এখন আমি যা বলি তা' করো। এই না বলে ছেলেটিকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘরের পাটাতনে তুলে রাখলেন।

নারদ খেতে বসে বললেন—ছেলেটাকে রান্না করেছ তো? নারদ-গৃহিণী নিঃশব্দে একবাটী মাংস এগিয়ে দেন তাঁর থালার কাছে।

নারদ পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠে প্রজাপতির কথা মনে করে একটু মুচকি হাসলেন।

তারপর দিন নারদ আবার রৌদ্ররাজার বাড়ি গিয়ে দেখেন লাল টুকটুকে রৌদ্র রাজকুমারী পুতুল খেলা করছে। পাঁচ বছরের মেয়েটি, নারদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—আমার সঙ্গে চল, খু-ব সুন্দর একটা পুতুল দেবো। বলে তাকে নিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন—তার সঙ্গিনীরা কেউ দেখলো, কেউ দেখলো না।

বাড়ী এসে স্ত্রীকে বললেন নারদ—নাও আজ এ মেয়েটার মাংস রান্না কর। বলে তেমনি নারদ বেরিয়ে গেলেন।

নারদ-গৃহিণী মেয়েটিকে দেখে খুব খুশী হ'লেন—মনে মনে বললেন, ভালই হ'য়েছে—ছেলেটির খেলার সাথী হল।

ছেলেটিও মেয়েটিকে পেয়ে খু-ব খুশী হল। নারদ

ফিরে এলে সেদিন নারদের স্ত্রী পরিতৃপ্ত করে মাংস দিয়ে স্বামীকে ভোজন করালেন।

নারদ বাড়ী হ'তে চলে গেলেই নারদের স্ত্রী পাটাতনের উপর উঠে ছেলে মেয়েদের স্নান করান সাজান—আর বসে বসে ওদের খেলা দেখেন। একদিন তাঁর খেয়াল হল—দুটিতে বিয়ে দিলে বেশ হয়। পরদিন ফুলের মুকুট তৈরী করে মালা গেঁথে ও চন্দন পিষে নিয়ে পাটাতনের উপর উঠলেন। তারপর···মেয়েটিকে ফুলের গয়না ও মুকুট পরিয়ে বধূবেশে আর—ছেলেটিকে মালা ও মুকুট পরিয়ে বরবেশে সাজালেন। তারপর মালা বদল করিয়ে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ দিলেন দুজনের।

সাতদিন পরে নারদ যেয়ে দেখা করলেন প্রজাপতির সঙ্গে। ভ্রু বাঁকিয়ে বললেন—কি হে প্রজাপতি, মেঘরাজার ছেলেতে আর রৌদ্ররাজার মেয়েতে বিয়ে হল।

প্রজাপতি হাসি মুখে উত্তর দেন হ্যাঁ, হ'য়ে গেছে। অট্টহাসি তুলে নারদ বল্লেন—হ্যাঁ হ'য়ে গেছে যমের বাড়ী। যমের বাড়ী নয় হে তোমার বাড়ীতে—স্মিতহাস্যে উত্তর দেন প্রজাপতি।

অবাক্ হ'য়ে নারদ বল্লেন—বল কিহে আমার বাড়ী? হ্যাঁ···হ্যাঁ···। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস কর গিয়ে তোমার স্ত্রীকে।

নারদের মনে সন্দেহের উদয় হয়—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললেন তিনি বাড়ীর দিকে।

নারদের স্ত্রী তখন এক মনে পাটাতনের উপর বসে ক্ষুদে স্বামী স্ত্রীদের সংসার দেখছিলেন। স্বামীর ডাক শুনে যেমনি তিনি সন্ত্রাসে মই বেয়ে নামতে গেছেন—আর অমনি নারদ এসে ঘরে ঢুকলেন আর স্ত্রী নামার সঙ্গে সঙ্গেই নিজে পাটাতনের উপর উঠে গেলেন। উঠে তো তাঁর চক্ষুস্থির—মেঘরাজার ছেলেটি বরবেশে—আর রৌদ্র-রাজার মেয়েটি বধূবেশে বসে আছে।

তারপর নেমে এসে স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন—তুমি কি ওদের বিয়ে দিয়েছ?

নারদ গিন্নী বললেন—হ্যাঁ। প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন। কত জন্মের পাপের ফলে না জানি এজন্মে সন্তান-মুখ দেখতে পেলেম না। তার উপর আবার শিশু-হত্যা করবো?

তা হ'লে আমাকে কিসের মাংস খাইয়েছ? ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন নারদ।

আপনাকে আমি পাঁঠার মাংস খাইয়েছি প্রভু! কিন্তু প্রভু আমার মনে একটা ঔৎসুক্য জাগ্‌ছে—এরা কারা? দেবশিশুর মতো মনে হচ্ছে। আর কেনই বা এদের মায়ের বুক থেকে কেড়ে আনলেন?

নারদ সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর নিকটে বললেন—তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন—কিন্তু তোমার জন্ত প্রজাপতির কাছে আমার হার হল! দাও, তবে এদের বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসি।

নারদ গিন্নী ওদের বর-বধূ বেশে সাজিয়ে দিয়ে মেঘরাজার ছেলেকে বললেন—বাবা-মার কাছে যেয়ে বলোগে রৌদ্ররাজার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। রৌদ্ররাজার মেয়েকে বললেন—বাড়ি যেয়ে মা-বাবাকে বলো মেঘরাজার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'য়ে গেছে! তারপর কাঁদতে কাঁদতে ওদের বিদায় দিলেন।

ওদিকে মেঘরাজার রাজ্যে আর রৌদ্ররাজার রাজ্যে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেছে—রাজা রাণী কেঁদে কেটে আকুল। এরই মধ্যে হঠাৎ ছেলে মেয়েদের বাড়ির ভিতর পেয়ে তাঁরা তো অবাক। বললেন তোমরা ছিলে কোথায়? আর কেমন করেই বা হঠাৎ এলে?

দুজনেই দুজনের মা-বাবার কাছে সব খুলে বললো।

মেঘরাজা বললেন—বিয়ে যখন হ'য়েই গেছে তখন বৌ আনবার জন্যে রৌদ্ররাজাকে দূত পাঠাই।

রৌদ্ররাজাও তেমনি ভেবে দূত পাঠালেন মেঘরাজার কাছে।

মেঘরাজা বললেন—বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন বৌ আসবে আগে শ্বশুরবাড়ী—তারপর যাবে বর।

রৌদ্ররাজার রাজধানীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো—হাতী-ঘোড়া-লোক-লস্কর বোঝাই করে যৌতুক পাঠাতে লাগলেন রৌদ্ররাজা। মেঘরাজ্যের সীমানায় পড়তেই সব ভিজে একশেষ।

রৌদ্র রাণী বললেন মেয়েকে—মা তোমার শ্বশুরের দেশেতো রোদ নেই। ওরা সব সময় ভিজে পোষাক পরে—ওদের সয়ে গেছে—কিন্তু ভিজে কাপড় পরলে তোমার যে অসুখ করবে। তোমাকে আমি এক কৌটো

রোদ দিয়ে দিচ্ছি স্নান করে অন্তঃপুরের উঠোনে সে রোদটুকু ছেড়ে দিয়ে তুমি কাপড় শুকিয়ে নিও।

রৌদ্র রাজকুমারী শ্বশুর বাড়ী এসে দেখে সত্যি! সারাক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে মেঘরাজার রাজ্যে। সবাইর পরণে ভিজে জবজবে পোষাক। পরদিন স্নান করে মায়ের কথামতো রৌদ্ররাজকন্যা অন্তঃপুরে রোদ খুলে দিয়ে শুকোতে দিলো।

সে দেশের মানুষ তো কোন দিন রোদ দেখেনি। রাজবাড়ি থেকে এমন একটা সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বেরোতে দেখে সমস্ত লোক ছুটে আসতে লাগলো।

মেঘরাজা রাজসভা থেকে অন্দরমহলের দিকে ওরকম গম্ গম্ শব্দ শুনে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রী, অন্তঃপুরে এত লোক সমাগমের শব্দ শুনছি কেন?

মন্ত্রী খবর নিয়ে বললেন—মহারাজ, আপনার পুত্রবধূ রোদ নিয়ে এসেছেন। কাপড় শুকোবার জন্যে তা খুলে দিয়েছেন অন্তঃপুরে, আর তাই দেখতে সমস্ত রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পড়েছে আপনার বাড়িতে।

মহারাজ নিজেই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বললেন—বৌমা শিগগির রোদ তুলে রাখ। নয়তো রাজবাড়ি ভেঙ্গে ফেলবে প্রজারা। চল আজই তোমাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তোমার বাবার কাছ থেকে বেশি করে রোদ চেয়ে এনে আমার সমস্ত রাজ্যে ছড়িয়ে দেবো। বৃষ্টির জন্যে আমার প্রজারা মরে যাচ্ছে, শস্য পচে যাচ্ছে। গরু ঘাস পায় না—মানুষ ভাত পায় না।

রৌদ্ররাজার কাছে মেঘরাজা যেয়ে এ প্রস্তাব করতেই রৌদ্ররাজা হেসে বললেন—যত খুসি রৌদ্র নিয়ে যান মেঘরাজ।

তারপর তিনি বস্তা ভর্ত্তি করে হাজার হাজার লোক দিয়ে রোদ পাঠিয়ে দিলেন মেঘরাজার রাজ্যে। রোদে ঝল্‌মল্ করে উঠলো মেঘের দেশ—মানুষের ভাত হল, গরুর ঘাস হল—

বৃষ্টি গেলো কেটে—
এমন রোদ উঠে গেলো—
বসুধা যায় ফেটে।

যে গল্পের শেষ নেই

প্রশান্তকুমার মৈত্র

রাজা ভয়ানক গল্প ভালবাসতো। সে সকলের কাছে নানারকম গল্প শুনতো, কিন্তু তাতেও তার মন উঠতো না কিছুতেই। যতই সে গল্পশোনে তার গল্প শোনার ইচ্ছে আরও বেড়ে যায়। একদিন সে তার নিজের মনে মনে চিন্তা করলো যে, সমস্ত গল্প শেষ হয় কেন? এমন একটিও কি গল্প নেই যার শেষ থাকবে না? তারপর সে সমস্ত দেশের মধ্যে প্রচার করে দিল যে, যদি কেউ তাকে এমন একটা গল্প শোনাতে পারে যার শেষ নেই—অনন্ত, তবে তাকে সে তার রাজত্ব দিয়ে দেবে, আর তার কন্যার সাথে তার বিয়ে দেবে। আর যদি কোন লোক চেষ্টা করে অসমর্থ হয় তবে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

দলে দলে কত লোক রাজাকে গল্প শোনাতে এল। নানানজনে নানানরকম গল্প শোনাতে আরম্ভ করলো। কিন্তু তারা কেউ বাঁচলো না, সকলেই মরে গেল—কারণ কারো গল্প একসপ্তাহ, কারো একমাস আবার কারো গল্প ছ'মাস ধরে চল্লো, কিন্তু যাই হোক তাদের গল্প একদিন না একদিন শেষ হয়ে গেল, আর বেচারা সব মারা পড়লো।

তারপর একদিন অনেক দূর থেকে এক রাজপুত্র রাজাকে গল্প শোনাতে এল। মন্ত্রীরা তাকে কত নিষেধ করলো রাজাকে গল্প শোনাতে, কিন্তু সে একেবারেই কান দিল না। অবশেষে রাজার কাছে গিয়ে রাজাকে বল্লো, "মহরাজ আমি আপনাকে একটা গল্প বলবো যার শেষ নেই।"

রাজার আনন্দ হল, তাকে বল্লো, "সত্যি তুমি বলবে? —বেশ তাহলে বলতে আরম্ভ কর।"

রাজপুত্র গল্প আরম্ভ করলো:

"একদেশে এক রাজা ছিল—সে ভয়ানক নিষ্ঠুর, অত্যাচারী। প্রজাদের কাছ থেকে সে সমস্ত শস্য কেড়ে নিল নিজের জন্য। কত লোক অনাহারে মারা গেল—কিন্তু সেদিকে তার বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই। সে

পাহাড়ের সমান উঁচু বিরাট একটা গোলা তৈরী করলো। তারপর আরম্ভ করলো ওটাকে শস্য দিয়ে ভরতে। দশ বছর—পাঁচমাস—তেরদিন পরে তার গোলা ভরে গেল। এবার সে সেই গোলার দরজা, জানলা বন্ধ করে দিল, এমন কি একটা ছোট ছিদ্রও থাকতে দিল না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে একদম নীচে তার অলক্ষ্যে একটা ছোট্ট ফুটো রয়ে গেল। আর পিঁপড়ের দল এসে এক এক করে শস্য নিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু গর্ত্তটা এত ছোট যে, একটামাত্র পিঁপড়ে একবারে ঢুকতে পারে তার বেশী পারে না।

তাই, একটা পিঁপড়ে ঢুকে একটা শস্য নিয়ে বের হয়ে এল, তারপর আর একটা ঢুকে শস্য মুখে নিয়ে ফিরে এল; তারপর আর একটা ঢুকে শস্য নিয়ে ফিরে এল; তারপর আর একটা ঢুকে শস্য নিয়ে ফিরে এল; তারপর আর একটা ঢুকে শস্য নিয়ে ফিরে এল"—এইভাবে সেই রাজপুত্র দিনরাত বলে যেতে লাগল ধৈর্য্যশীল রাজা বিরক্ত হয়ে বল্লো, "আচ্ছা ঠিক আছে, না হয় ধরলাম যে পিঁপড়েরা সমস্ত শস্য নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তারপরে কি হল?"

রাজপুত্র উত্তর দিল, "আপনি যা বলছেন আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। সর্ব্বপ্রথম কি হল, সেটা বলতে দিন, তারপরে—পরের ঘটনা পরে বলবো। সুতরাং দয়া করে শুনুন: "তারপর আর একটা পিঁপড়ে ভেতরে ঢুকে একটা শস্য নিয়ে বের হয়ে এল; তারপর আর একটা ঢুকে শস্য নিয়ে বের হয়ে এল, তারপর আর একটা ঢুকে শস্য নিয়ে বের হয়ে এল, তারপর আর একটা ঢুকে শস্য নিয়ে বের হয়ে এল"—এইভাবে গল্প আরো ছ'মাস চল্লো।

তারপর রাজা বল্লো, "আমি তোমার গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তবে এইভাবে পিঁপড়েরা আর কতদিনে শস্য নিয়ে যাবে?"

সে উত্তর দিল, কে জানে আর কতদিন চলবে? এতদিনে তারা মাত্র একটুখানি জায়গা খালি করেছে। আর এখনও অনেক পিঁপড়ে বাইরে দাঁড়িয়ে। একটু ধৈর্য্য ধরুন—তারা একদিন না একদিন এগুলি সব শেষ করবে—সন্দেহ নেই।

আবার একবছর ধরে গল্প চল্লো। অবশেষে রাজা বিরক্ত হয়ে গেল, ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আর শুনতে ইচ্ছে করলো না। তাই সে বল্লো, "আর প্রয়োজন নাই, আর প্রয়োজন নাই—আর আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার রাজত্ব নিয়ে নাও, আর আমার কন্যাকে বিয়ে কর এবং আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে নাও—আমি আর ঐ পিঁপড়ের গল্প শুনতে চাই না।

রাজকন্যার সাথে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল, সে রাজত্ব পেল, তারপর রাজ্যশাসনের ভার নিয়ে সিংহাসনে বসলো। —কিন্তু সেই গল্পের বাকী অংশ অর্থাৎ শেষটুকু কেউ জানে না।

"The story that had no end"—গল্পের অনুবাদ।

সাম্যবাদ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এরণ্ড ভাবে 'অশত্থের সাথে তফাৎ কি মোর আছে?
মাটি ফুঁড়ে উঠি দুজনেই মোরা গাছ।'
পুঁটী ভাবে জলে সাঁতারি কাতলা তাহারি মতন বাঁচে
পাতলা সে বটে, দুজনেই তবু মাছ।
টুনটুনি ভাবে 'ময়ূরও ত পাখী মোরই মত, মোরই জাতি,
তা ছাড়া তাহার আমারি মতন নাচ।'
ফেরু ভাবে তার ব্যাঘ্রের আর উভয়েরই একজাতি,
চলে সদর্পে তাই তার পাছ পাছ।

বনের জোনাকি ভাবে 'চাঁদ সেত সগোত্র আত্মীয়
আলো দিই মোরা, দুজনেরই নেই আঁচ।'
মণির সঙ্গে তফাৎ কি আছে দুজনেই রমণীয়
সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বলি', বলে কাঁচ।
মানুষও তাহাই ভাবিতে শিখেছে। গুরু দায়িত্ব ভার
বয় যেই জন, আর যেবা বয় মোট
দুজনই সমান, সব ক্ষেত্রের মুটে কয় হাত পা-র
নেইক তফাৎ, দুজনেরই এক ভোট।

কল্‌হনের দেশে

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

(১)

পাঠানকোট পর্য্যন্ত

এ ধরণের ট্রেণে চড়া বড়ো হয় নি। তাই অদ্ভুত লাগছিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটে চলেছে। একেবারে যাকে বলে চোঁ-চোঁ দৌড়। দিল্লী ছেড়েছে;—থামবে সেই পাঠানকোটে। মাঝে যা থামবে তা কেবল জল নিতে।

নানা রকম চিত্র বিচিত্র এঁকেছে ছেলেরা গাড়ীর গায়ে রঙ্গীণ খড়ি দিয়ে।...বুড়ো হিমালয় বরফ ঢাকা টুপি পরে, নদীর জটা আর পপ্‌লারের দাড়ি পরে অতিকায় দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে হাঃ হাঃ করে হাসছে, আর রোমশ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে নীচের তলার ক্ষুদে ছেলেটার পানে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে পরম-নির্ভর হাসি মেখে ছেলেটা এক হাতে ঠেসে ধরে আছে দেশের পতাকা, অন্য হাত এগিয়ে দিয়েছে ভয়ানক হিমালয়-পিতামহের পানে। সমতলের শিশুরা চলেছে হিমালয়ের নন্দন-কানন কাশ্মীরে। এই ছবিটাই এখন মনে পড়ে। আরও বহুতর ছবি ছিল। ছিল আগাগোড়া গাড়ীর মাথায় দোলানো দেবদারু আর আমের পল্লব, ফুলের মালা, রংবেরঙ্গা পতাকার সার। সাজানো গোছানো গাড়ীর মাথায় বড় বড় হরফ দুলছে "কাশ্মীর স্পেশাল—দিল্লী টীচার্স' এ্যাসোসিয়েশন্‌"। ছশো ছাত্র, তিনশো ছাত্রী, শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, সব সমেত প্রায় ৯০০ প্রাণী চলেছে এই গাড়ীতে এক মাসের সফরে; কাশ্মীর পরিক্রমা। লোকে লোকারণ্য প্লাটফর্ম।

ছট্‌ফটে চলন, চট্‌পটে বলন, চিক্‌চিকে চোখের চাউনি;—এরা তরুণদল, ছাত্রদল। রং ঢেলেছিল ছাত্রীদের সহযোগিতা। বরং এদের তুলনায় শিক্ষয়িত্রীরাই আড়ষ্ট, শিক্ষকরা আরও আড়ষ্ট। কৈশোর আর তারুণ্যের সজীবতা সংক্রামক;—তাই ওদের দৌলতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মরচে-পড়া মনও যেন চাঙ্গা হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

ওরাই মোট বইছে, ওরাই বন্ধুদের ব্যবস্থা করছে। হেনার ভারী মোটটা অশোক নিতে চাইলো—"তুমি পারবে না। আমায় দাও। খুশীর সঙ্গেই নিয়ে যাবো।" হেনা বলে, "তা জানি ভাই; দেখি না, পারবো না কেন? ওরা তো বলেই দিয়েছিলো যে যার নিজের ভার বইতে পারবে এমন বোঝা সঙ্গে নিও।" বেডিংটার দড়িতে ঢুকিয়ে দেয় অশোক হাতের স্কাউট-লাঠিটা। একধার ধরে হেনা, একধার অশোক। ভার হয় লঘু, গতি পায় ছন্দ, কাজ হয়ে ওঠে আনন্দ।
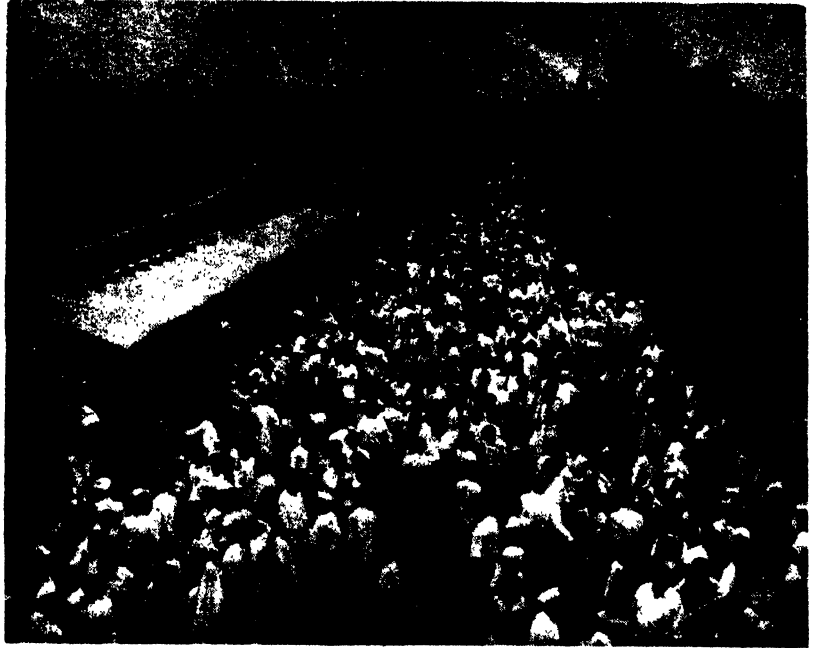
কাশ্মীর স্পেশাল—লোকে লোকারণ্য প্লাটফর্ম

"ও কি, কার ঘড়া বইছো?" ঠাট্টা করে সুশীলা মঞ্জরীকে দেখে। মঞ্জরী বলে—"একটা ছেলে আমার হোল্ড-অল্‌টা খুলে গুছিয়ে দিচ্ছে ওপরের বাঙ্কে, ওর জলটা আমি ভরে আনছি।"...এমনি কথার টুকরো। ছবি যেন সুসম্পূর্ণ।

এরই মধ্যে এক সময় গাড়ী ছাড়লো। যারা বিদ্যালয়ের প্রধান তারা চড়েছেন একটা গাড়ীতে। দিব্যি নাদুস্‌-নুদুস্‌ ঘরোয়া চেহারার একটা মহিলা বসে আছেন। ওঁর বিছানা, আর উনি নিজে প্রায় একই

সাইজের বলে বিছানাই ওঁকে বেশী কাবু করছিলো, উনি বিছানাকে কাবু করতে পারছিলেন না। অগত্যা আমি গিয়ে ওঁর বিছানাটা টেনে এনে বেণুর পাশে সামনা-সামনি দুটো বেঞ্চে করে দিলাম। আমি নিজে স্থান করে নিলাম ওপরের বাঙ্কে। বেণু আমার ছোট বোন। বেণুও একটা বিদ্যালয়ের প্রধান পদে আছে। সেই সুবাদে আমাদের স্থান এই কামরায়। এ কামরায় বাকী ক'জন পুরুষ। বেণুকে জড়িয়ে মনোরমার সম্বন্ধটাও চটপট বোনের পর্য্যায়ে এসে গেলো। বোন দুটী হলেন আমার উন্নাসিক চন্দ্রবিন্দুর পরে উপযুক্ত বিসর্গ। এ তাকিয়া তো—ও বালিশ। এ বেডিং তো ও কুঁজো ; এ কুমড়ো তো ও তরমুজ। দিব্যি খানদানি চেহারা মনোরমা ও বেণুর। ওদের মিতালি তাল রেখে তালে তাল মিশে যাবার মতো হয়ে একেবারে ক্ষীর হয়ে গেল পাঠান-কোট পৌঁছুবার আগেই।

প্রথম দিকটায় সন্ধ্যার একটু পরেই কি একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামলো। অন্য গাড়ী যাবে, তাই পাশ দিতে দাঁড়ালো। নেমে চা খেয়ে নিলাম। তার কিছু পরেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে আরামে শুয়ে শুয়ে গল্প জুড়েছি। গাড়ী চলেছে নির্ব্বিবাদে স্পেশাল যাত্রী নিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে আম্বালায়। রাত তখন বারোটা হবে। আম্বালার শিক্ষকরা এসেছেন আমাদের অভিনন্দন জানাতে। বরফ জল বালতি করে করে সবাইকে পরিবেশন করলেন। তারপর আর ঘুম এলো না।

কৃষ্ণা ষষ্ঠী। ট্রেণ চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে। গভীর রাত্রি। চাঁদ উঠেছে কোথাও। ট্রেণের কোণে সে চাঁদের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। আকাশে তার কৃষ্ণপক্ষের পুঁজীর মুষ্টিভিক্ষা ছড়িয়ে পড়েছে। অজানিত পথের মধ্য দিয়ে চলেছি। মনোরমা আর বেণু জড়াজড়ি করে ঘুমুচ্ছে। ওরা কেমন মিশে গেছে। বাইরের দিকে জড়িয়ে পড়ে আছে চাঁদের ভালবাসা আর ধরণীর রেণু। চোখের ওপর ভেসে উঠছে পাঞ্জাবের মানচিত্র। পানিপথ, কার্ণাল, থানেশ্বর। আম্বালা ছেড়ে এলাম। এরই পর সরহিন্দ্। আশে পাশে আছে ইতিহাসবিশ্রুত রণক্ষেত্র মুদ্‌কী, আলিওয়াল, সত্‌লেজের ওপারে সোব্রাওঁ। নাভা, পাতিয়ালার মধ্য দিয়ে গাড়ী চলছে এখন। সামনে আসছে শতদ্রু। লুধিয়ানায় গাড়ী থামলো না, সোজা চলে গেল। শতদ্রুর সেতু পার হচ্ছে ঝম্ ঝম্ শব্দ হচ্ছে তার। শতদ্রুর বিস্তীর্ণ জলে কৃষ্ণাষষ্ঠীর চন্দ্রালোক ঝলমল করছে। ওপারে গাড়ী থামলো ; ষ্টেশন—নাম ফিলৌর।

এবার গাড়ী চলেছে লহরের পর লহর পার হতে হতে। সামনে পার হতে হবে বিপাশা। জলন্ধর পার হোলো। বিপাশার সাঁকো পার হ'ল। শতদ্রু মনভরা নদী, কিন্তু বিপাশা সুন্দর। অমৃতসরে পৌঁছেও গাড়ী থামলো না ; সামনে চলতে লাগলো। এমনি করে বেরিয়ে গেল বাতালা, গুরুদাসপুর। ঘুমের মাঝে মাঝে উঠছি দেখছি। জানি পাঠান-কোট এসে গেল বলে। এই বেলা ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিই।

নয় শত প্রাণী নামলো পাঠানকোটে। পাঠানকোট ছোট্ট ষ্টেসন। এখান থেকে বাস্-পথে যেতে হয় কাশ্মীর-শ্রীনগর। পুরো দেড়দিনের পথ। আগেকার দিনে, যখন ভারতের ল্যাজা-মুড়ো কেটে পেটীর দম্ভ আমরা করতে শিখিনি তখন শ্রীনগরে যাবার রাস্তা ছিল জম্মু দিয়ে ঘুরে। জম্মু অবধি রেল লাইন ছিল। এখন সে সব ইতিহাসের গর্ভে। তাই এদিকে আসাম-লিঙ্কের যন্ত্রণার মতো ওধারে এই দেড় দিন বাস্-বাসের নরক। জানা ছিলো, তাই প্রথমেই বেণুকে সাবধান করে দিলাম—"দেখে নে। ন'শো প্রাণী—ষ্টেসনের বাথ্‌রুম কটাই বা। কোনোমতে ছুটো-পাটী করে চো-চাঁ দৌড় মেরে চান্ সেরে নে।"

"মালপত্র ?" যথারীতি নারীর চিন্তা।

"স্পেশালের মাল। পড়ে থাকলেই বা। এসে হবে।"

পরে বারংবার বেণু এই উপদেশের সদ্ব্যবহার করে জেনেছে যে জগতে চোরের চেয়ে চুরি যাবার ভয় অনেক বেশী, ভূতের চেয়ে ওঝার দল ভারী। হারাণো আর ধরে রাখার মধ্যে ধরে রাখার বোঝা বওয়া ঢের বেশী কষ্টকর।

কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট এ দলটাকে ছেড়ে দিয়েছেন ৩৬ খানা বাস। সমগ্র কাশ্মীর এই কনভয়ে দলটী ঘোরাফেরা করবে। কাশ্মীর সরকার এই যানবাহন ব্যবস্থায় আমাদের যে সাহায্য করেছিলেন সেটা না পেলে যাত্রীদের চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হতো।

পাঠানকোট স্টেশনের গায়েই কাশ্মীর সরকারের চমৎকার খবরাখবর—দপ্তর। বড় বড় হরফে লেখা "কাশ্মীর ট্যুরিষ্ট ইনফরমেশন ব্যুরো।" সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাবে, দেওয়া যাবে। এমন কি নালিশ, আবেদন, নিবেদন, উদ্দানী নির্দেশ—সব জানাতে পারা যায়। কাশ্মীরি শাল জানা আছে, কাশ্মীরি পোলাও জানা আছে, কাশ্মীরি চেরী জানা আছে,—জানা ছিল না কাশ্মীরী সোহবত, আদবকায়দা। এমন বিনয়নম্র সৌম্য ব্যবহার পেলাম এই দপ্তরে যে মেজাজ একেবারে হাল্কা হয়ে কাশ্মীরি রেশমের মতো রং ধরলো, ঝিলমের স্বপ্নের মতো দোল খেলো।

হবেই বা না কেন ? কাশ্মীর যে পৃথিবীর একটা সুউচ্চ অধিত্যকা এতো সবার জানা। এই অধিত্যকার চার পাশেই পাহাড় ;—একেবারে সুগোলভাবে ঘিরে। কোনাদিকে কোন বর্ত্ম নেই। ছেলে বেলায় পড়েছি দুটো কথা। একটা 'গিরিবর্ত্ম' অন্যটা 'গিরিসঙ্কট'। দুটোই গিরিপথের দুর্বোধ্য সংস্করণ। দুটোর তাৎপর্য্য বুঝতাম না। মানে যা বুঝতাম তা ম্যাপের গায়ে আঁকা শুঁয়োপোকার শুড়ের মতো স্পষ্ট। পাহাড় তো ডেঙ্গানো যায় না ; তাই পাহাড়ের মাঝে মাঝে যে পথ তাকেই বলে গিরিপথ। একরকম পথ হয় পর্বত শ্রেণীর মাঝে। দুটো লম্বা পর্বতশ্রেণী বেরিয়ে গেছে। মাঝ দিয়ে পথ। যেন চাঙ্গার মতো পথ। তাকে বলো, গিরিবর্ত্ম-বেশ কথা। কিন্তু নেই-পথ ! পাহাড়গুলো বেয়াড়া কম্পালসারি প্রশ্নের মতো সাফল্যের পথ আটকে আছে দাঁড়িয়ে। সব গিরিবর্ত্মের শেষেই নিজের দেয়াল নিরেট করে গেঁথে রেখেছে। সেখানে কি করা যায় ?......পাথরের গা চিরে, কুরে কুরে, কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে পথ নিয়ে আবার নীচে গড়িয়ে নামিয়ে আনো। সেই পথ যদি গিরি-সঙ্কট না হবে, সঙ্কট তাহলে হবে কোথায় ? এই পথ গিরিসঙ্কট !

এমনি বেয়াড়া পাহাড়ের বলয়ের মধ্যে ওই নন্দনকানন কাশ্মীর। আর কাশ্মীরের যেখান থেকে চেয়ে দেখা যাক না কেন-পাহাড়ের মাথায় বরফ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। সুতরাং ওঁরা কেউ পনের হাজার ফুটের কম যান্‌ না।

এমনি দুর্দান্ত পাঁচিল ঘেরা কাশ্মীর অধিত্যকা। তার ভেতরে মানুষকে নিয়ে না যেতে পারলে তত্রত্য অধিবাসীদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে কি করে? রাজতরঙ্গিনী কাশ্মীরীদের এই দৈন্যদুর্দশার কারণ দুটী পংক্তিতে বলেছেন,—

"হিমসংঘাত দুর্লঙ্ঘ্য ক্ষিতিভিদ্‌
রুদ্ধ নির্গমাঃ
বদ্ধদ্বারকুলায়স্থ খগবদ্‌ বিবশাঃ
জনাঃ"

[হিম তুষারাচ্ছন্ন পর্বতবেষ্টিত কাশ্মীর থেকে বেরুবার পথ বন্ধ থাকায় লোকেদের অবস্থা খাঁচায় পোরা পাখীর মতো বিবশ।]

সুতরাং বাইরে থেকে ভ্রমণকারী, পর্যটক, বিলাসীদের আনা কাশ্মীরের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় আরাধনা। কাশ্মীরের দুরন্ত শীতে বরফের দিনে চুল্লী জ্বেলে ওরা বসে পশম পাকায়, শাল বোনে, নক্সীকাজ করে। তারপর? এতো কাজ যে করলো, শীতের দৌলতে ওদের পাওয়া এতো অবকাশকে ওরা যে এতো কাজে লাগালো—তার বিনিময়ে কিছু না পেলে ওরা খাবে কি? কেবল চাষের ওপর নির্ভর করে বাঁচা চলে, জীবন চলে না। জীবনকে বাঁচার ওপরে নিয়ে যাবার বাসনাতেই তো মানুষ পশুত্বকে অতিক্রম করে উচ্চতর জীবের মর্যাদা লাভ করেছে। চাষ বাঁচায়, শিল্প বাণিজ্য দেয় জীবন। কিন্তু আদান-প্রদান শিল্প বাণিজ্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সেই আদান-প্রদানের পথে বাধা ওই-মানুষ জীবন বিপন্ন করে এই তুষার বলয় পার হতে চাইবে কেন?

তাই যুগে যুগে কাশ্মীরকে কাশ্মীরীরা সুন্দরতর করে, রমণীয় করে, নব মনোবিলাসের লীলাভূমি করে তুলেছে। প্রকৃতির অকৃপণ দানকে শ্রী ও সমৃদ্ধি দ্বারা মণ্ডিত করে তুলেছে। তাই "আসুন, চলুন" বলাতে ওদের এতো বিনয়, এতো সদাচার। কাশ্মীরের বিচিত্র জীবন প্রবাহই ওদের শিষ্টাচারী করেছে। যার প্রথম স্পর্শ পাওয়া যায় পাঠানকোটের ট্যুরিষ্ট ব্যুরোতে।

বাস ছাড়লো। বাইরে একটা বাজার। পথটা একদিকে গেছে কাংড়া, জ্বালামুখী; অন্যদিকে জম্মু।

(২)

লাখনপুর ব্যারিয়র

পাঠানকোট স্টেশন

সেদিন আজ আর নেই। কাশ্মীর যেতে এখন 'ভিসা'র প্রয়োজন; —সরকারি ছাড়পত্র। ঢাকায় যেতে হলে ধর্না দিতে হবে সরকারি দপ্তরে; অনুমতি পেলে তবে যাওয়া। যাঁরা দণ্ডধর তাঁরা আকাশে ওড়েন; নড়েন-চড়েন মেপে, ওজন করে। তাঁরা তো আমাদের মর্মবেদনা বোঝেন না! লাউড স্পীকারে, রেডিয়োতে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে

সংবাদপত্রে, বাণীতে মধুপর্ক ঢেলে দেন,—"মানিয়ে নাও, স্বীকার করে নাও, এখন আর ওসব কথা তুলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলো না!" কিন্তু মন মানে কৈ। "চৌদ্দ পুরুষ যেখানে মানুষ সে মাটী সোনার বাড়া।" চিরদিন যে তুলসীতলায় পিদিম দিয়েছি, যে পুকুরে ঝাঁপাই ছুড়েছি, যে খাল, বিল, বাওড়ের আনাচে-কানাচে দস্যুতা করে কৈশোরে মধ্যাহ্নগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পুঁতে রেখেছি, তাদের কাছে যদি আজ যেতে চাই, কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। তবে যাবো আমার সেই ঝালকাঠীতে, নলচিটিতে, গৌরীপুরে, ভাওয়ালে, বুড়ীগঙ্গায়, গুগুঙ্গে! এ যেন একটা জ্বলন্ত পরিহাস।

তারই অন্ত সংস্করণ এই কাশ্মীরে। ১৯৪৭ সাল। ভারত স্বাধীন হবে। সন্ধ্যায় রেডিয়োর কাছে জড়ো হয়েছি। জিন্না, জওহরলাল, আজাদ একত্রে বাণী দেবেন, চরম সিদ্ধান্ত শোনাবেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কৃতসংকল্প, চার্চিলের কবলে আর ভারতকে ছাড়বেন না তিনি। এ্যাটলি আর লেবরপার্টির শুভেচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করে ছাড়বেন। রফা একটা কিছু করতেই হবে। আমরা শুনলাম পাকিস্তান হবে। মোটামুটী ভাগটাও জানলাম। আর জানলাম বাকী চুল-চিরবেন র‍্যাড্‌ক্লিফ্ সাহেব। অনেক বাণী অনেক বক্তৃতাই তো শুনেছি জীবন-ভরে। সেদিন রেডিও মারফৎ এই বাণীর স্পষ্টরূপ ধরতেই পারিনি। সত্যিই এই অসম্ভাব্য, অকল্পনীয়, প্রলয়ঙ্কর অভিশাপকে বক্ষে, মর্মে, মস্তিষ্কে, চিন্তায় স্থান দেবার সামর্থ্য, শিক্ষা, প্রকৃতি ছিল না। কিন্তু হোলো। খান্ খান্ হয়ে গেল আসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত বিরাট বর্ষ এই ভারতবর্ষ। অশোকের স্বপ্ন, আকবরের সাধনা, ইংরাজের শৃঙ্খল আবদ্ধ শৃঙ্খলা—সব শেষ হয়ে গেল। এক নিমেষে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমান দাদা, চাচা, দোস্ত, বন্ধু, সখী, জেলে, মুচী, ধোপা—আমার জীবনে বিদেশী হয়ে গেল, যেমন বিদেশী ফিজির অধিবাসী, গুয়াটিমালার লোক, এস্কিমো আর উজবেগরা। যারা স্বপ্ন দেখে আমাদের ভাষায়, কাঁদে আমাদের সুরে, হাসে আমাদের গানে—কথা কয়, গাল দেয়, রাগ করে, জড়িয়ে ধরে, আমাদেরই মতো, আমাদেরই ভাষায়, যারা ভুলবে না ময়মনসিংহের গান, বেহুলার ভাসান, হুমড়োসর্দারের কাহিনী, খোঁড়া হাঁসের বৃত্তান্ত, চাঁদ সদাগরের, বিল্বমঙ্গলের, শ্রীবৎস রাজার গল্প; যারা ভুলবে না মধুকানকে, মুকুন্দদাসকে, গোবিন্দদাসকে;—যারা ভুলতে পারে না "শিকলপরার ছল", "বন্দেমাতরম্ বলে, যায় যাবে জীবন চলে," এ সব গানের রক্তাক্ত ইতিহাস, তারা হয়ে গেল বিদেশী। আমরা বিদেশী; তারাও বিদেশী!

তখন প্রশ্ন এলো দেশীয় রাজ্যেরা কি করবে? সর্দার বল্লভভাইয়ের দৃঢ়চিত্ততা ও সৎসাহসের কাছে ভারতের রাজন্যবর্গ নতি স্বীকার করে পরমবন্ধুর কাজ করলেন। বৃহত্তর ভারত গঠনে পূর্ণ সহযোগিতা করলেন। বাকী রইলো হায়দ্রাবাদ আর কাশ্মীর। সেই কাশ্মীর যার মন্ত্রী রামচন্দ্র কাক। আর সেই রামচন্দ্র কাক যিনি এক হেকলে বন্ধ করেছিলেন জওহরলালকে আর শের-এ-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লাকে। যেদিন ভারতবর্ষ জানলো জওহরলালকে বন্দী এবার করেছে কোনও বিদেশী নয়, একজন ভারতীয়, একজন হিন্দু, একজন ব্রাহ্মণ, একজন কাশ্মীরী,—আর জওহরলাল এই বন্দীত্ব গ্রহণ করেছেন একজন মুসলমানের সঙ্গে একত্র হয়ে, সেদিন সমস্ত ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে হরতাল হোলো, সভাসমিতি হোলো। ভারত সরকার নড়ে উঠলেন। দিল্লী থেকে হুমকি গেল কাশ্মীরে। রামচন্দ্র কাক বাধ্য হলেন জওহরলাল ও তৎসহ শের-ই-কাশ্মীরকে ছেড়ে দিতে। সেই রামচন্দ্র কাক তখনও মন্ত্রী। কাজেই তিনি যোগ দিলেন না এই সর্ব-ভারতীয় সম্মেলনে, এই নব মহাভারত সংরচনে। তিনি কাশ্মীরকে স্বাধীন রাজ্য থেকে স্বাধীন দেশে উন্নীত করবেন।

আশ্চর্য্য এই উপদেশ বাক্য অনুমোদন করলেন রাজা হরিসিং। তিনি স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীন নরপতি হবেন এই স্বপ্নের ঘোরে ভিখারী হলেন। অথচ এই রাজার ঐতিহ্য খুব সুখপাচ্য নয়।

নাদিরশার আক্রমণে যখন মোগল মহিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তখন কাশ্মীরও গেল আফগানদের হাতে। রইল আমেদশা আবদালির সময় পর্য্যন্ত। সেটা পাঞ্জাবের একটা গৌরবময় যুগ। রঞ্জিৎ সিং তখন বিপুল বিক্রমে আফগান তাড়াতে ব্যস্ত। কাশ্মীর তখন তাঁর অধিকারে। সে অধিকার অপহৃত হোলো যখন ইংরাজের হাতে প্রথম শিখ পরাস্ত হোলো। এ পরাস্ত নামে পরাস্ত। রণজিৎ সিংয়ের রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিকে ইংরাজ বিশেষ ভয় করতো। এই কূটবুদ্ধির ফলে শতদ্রুর ওপারে ইংরেজ যেতে পারে নি। এই কূটবুদ্ধির ফলে ভবিষ্যত বাণী "সব লাল হো যায়গা!" এই কূটবুদ্ধিতেই রণজিৎ সিং আর্তনাদ করেছিলেন—"হায় হায়, দরিয়া—এ সিন্ধ দেখলিয়া অংরেজ নে? ওয়হ্ তো গয়া।" (সিন্ধুনদী ইংরেজের চোখে পড়ে গেছে? হায়, হায়, এ নদীও এবার গেল বলে!) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং মারা গেলেন। জম্মুর এক নগণ্য জাগীরদার ডোগরা রাজপুত রাজা রঞ্জিৎ দেবের বংশধর গুলাব সিং এই রণজিৎ সিংয়ের অধীনে সৈন্যদলে চাকরী পায়। অপূর্ব তার যুদ্ধক্ষমতা, অদ্ভুত তার ভুয়োদর্শন। রাজনী জয় করার পুরস্কার স্বরূপ রণজিৎ সিং তাকে জম্মুর রাজা করেন। রাজপুত হিন্দু এই যুবক তখন অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠায় পঞ্জাবের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর সারা পঞ্জাব এই গুলাব সিংয়ের দিকে চাইলো। তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে দৃঢ় হস্তে কাশ্মীর লদ্দাক জয় করে পঞ্জাবের দিগ্বিজয়ী বীর। কিন্তু গুলাব সিং জানতো ইংরেজ কি জিনিষ। ইংরেজকে যুদ্ধে ঘাঁটানো সহজ নয়। অথচ পঞ্জাব সরকারকে সরাসরি সাহায্য প্রত্যাখ্যান করাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না। কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। পাঞ্জাবে সরাসরি মীরজাফরি না করে তীর্থযাত্রার অছিলায় বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে শতদ্রু নিয়ে গোলমাল বেধেছে। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে। মুদকী, ফেরোজশা, আলিওয়াল, সোব্রাওঁ এর যুদ্ধে হেরে শিখেরা আবার চাইলো গুলাব সিংয়ের পানে। এবার গুলাব সিং নিপুণ কূটনীতিজ্ঞের মতো শিখ সরকার এবং ইংরেজের মধ্যে সন্ধি করানোর দালালি করলেন। সেটা ১৮৪৬ লাহোরের সন্ধি। ফলে তিনি জম্মুর রাজা বলে স্বীকৃত হলেন।

এবং তার অত্যল্প পরে কাশ্মীর যখন ইংরেজের ভাগে পড়লো তখন ইংরেজ মাত্র দশলক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে কাশ্মীর বেচে দিলে গুলাব সিংয়ের কাছে। সেটা ১৮৪৬ সালের সন্ধি। কাশ্মীর আর লাদ্দাক গুলাব সিংয়ের জানা জায়গা। শিখেদের হয়ে তিনিই এসব জয় করেন। কিন্তু তখন গুলাব সিং স্যার জন্ লরেন্সের বিশেষ বন্ধু। হরি সিং এই গুলাব সিংয়ের প্রপৌত্র। কাজেই তার রক্তে বিদেশীর সঙ্গে এক হয়ে স্বদেশকে কাবু করার স্পৃহার অভাব থাকার কথা নয়। তা নৈলে এক ছেকলে জওহরলাল আর শেখ আবদুল্লাকে বন্দী করে কারাগারে ফেলতে পারে, এমন মরদ আছে কে? ভাগ্যে গুলাব সিং ডোগরা ইংরেজের সুবিধা করে দিলো—তাই হরি সিং ডোগরা জম্মুরলোক হয়েও কাশ্মীরের নরপতি হলেন, যে কাশ্মীরে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় রাজত্ব করেছে, যে কাশ্মীরের মুকুটমণি সুলতান জয়নাল আবেদিন।

ভারত স্বাধীন। দেশীয় রাজ্যেরা এই স্বাধীনতা মেনে নিলো। কাক-পরিচালিত হরিসিং স্বপ্নালু চোখে স্বাধীন কাশ্মীরের নেশা পোষেন। ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলেছে। লীগপন্থীরা কাশ্মীরের তক্তে ঘুণের মতো ধরেছে। কাশ্মীর মুসলমান-প্রধান জায়গা। পাকিস্তান সবে পাঞ্জাবে রক্তস্নান করে ক্ষুধা বাড়িয়েছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত-বাসী আফ্রিদিরা ভেবেছিলো স্বাধীন পাকিস্তান হয়ে তাদের দু'পয়সা হবে। উল্টে তাদের এজেন্সীর মারফৎ প্রাপ্য টাকা—অর্থাৎ বাৎসরিক বরাদ্দও বন্ধ। উস্‌খুস্ করে পাঠান, আফ্রিদিরা চির-জীবনটাই যারা উঞ্ছবৃত্তি, দস্যুতা যাদের উপজীবিকা—ইংরেজ যাদের করে রেখেছে হীনাতিহীন, দীনাতিদীন, বর্বর, অভিধানে অবহেলিত, দস্যুতার কলঙ্কে আশ্রিত। এরা ক্ষেপে গেল নতুন মালেকদের ওপর। টাকা কই, সম্পদ কই, লুটের মাল কই। হঠাৎ পাকিস্তানের সঙ্কেত নজর করিয়ে দিলো কাক-শাসিত হিন্দু কাশ্মীরের ওপর। মুসলমানপ্রধান এলাকা, ওটাই হোক পাকিস্তান ভুক্ত।

হঠাৎ হোলো আক্রমণ, কেউ বলে পাকিস্তানী আক্রমণ, কেউ বলে দস্যুদের। পর পর নগর, গ্রাম, জনপদ ধ্বংস হোতে লাগলো। হিন্দু বাদ গেল না, মুসলমান? না সেও বাদ গেল না, খৃষ্টান বাদ গেল না। আগুন জ্বললো, সংসার ভাঙ্গলো, জায়া, জননী, কন্যা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত বলাৎকৃত হোলো। কাক সাহেবের স্বাধীন রাজ্যের সেলামী দিতে সহস্র সহস্র প্রাণী চিরদিনের হাহাকারে মিলিয়ে গেলো। তখন হরি সিং কাতর আবেদন জানালেন ভারত সরকারের নিকট—বাঁচাও, গেলাম। সেটা ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৭। ভারত সরকার সাহায্য পাঠালেন তখনই

জম্মুর পথ—লাখনপুর ব্যারিয়ার থেকে

যখন কাশ্মীর স্বীকার করলো ভারতভুক্তির। ভারতীয় সৈন্যদল তখন সমূহ বিনাশ থেকে কাশ্মীরকে বাঁচালো। প্রথম ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে প্রবেশ করলো ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৭, হরি সিংয়ের রাজত্ব শেষ হোলো। প্রজাদের শাসন প্রবর্ত্তিত হোলো। কিন্তু তবুও কাশ্মীর হয়ে রইলো যুদ্ধক্ষেত্র। নিষ্পত্তি হোল না। দস্যুরা যে সব জায়গা নিয়েছিলো তার অনেকটা থেকে তারা সরে গেল বটে, কিন্তু একেবারে গেল না। আজও এই অস্পষ্ট ব্যবস্থা বহাল আছে। মানে, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সর্বদাই রাখতে হচ্ছে। তাই কাশ্মীর সম্পূর্ণ যুদ্ধ এলাকার মতো শাসিত। তার বাহিরে ভেতরে যাতায়াত তাই 'ভিসা' বা ছাড়পত্র মারফৎ চলে। এখনও চলে। যদিও কাশ্মীর এখন ভারত সভায় প্রতিনিধি পাঠায়, যদিও কাশ্মীর সরকার ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে রেখেছে, যদিও কাশ্মীরের বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ ভাবে ভারতভুক্ত ও ভারতীয় বলে নিজেকে স্বীকার করে, তবুও নিরপত্তার খাতিরে ভিসা আজও বর্ত্তমান।

এই ভিসা সম্বন্ধে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ খুব সতর্ক। তাদের ঘাঁটি লাখনপুরে। যাত্রার মুখে ভিসার জন্য এমনি দাঁড়িয়ে থাকা খুব আরামপ্রদ নয়। লাখনপুর একটা অনুর্বর সমতল, বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নেই, এমন কি কোনও কারণেই ইণ্টারেষ্টিং নয়, মনকে টানে না। তবে টানা হ্যাঁচড়া করে বেশ।

বেশ বিরক্ত দেখলাম একজন শিক্ষককে। "নিজেদের দেশ, এতো ঝামেলা কেন মশাই। একে একে সকলের ছাড়পত্র পরীক্ষা করা কি সহজ কথা। ন'শো ছাড়পত্র পরীক্ষা করতে ঝাড়া ৫ ঘণ্টা সময় তো নেবেই, ততক্ষণ কি করবো বলুন তো?"

এদিকে ক্ষিধের জোর। সকালে বাস্ ছাড়ার আগে পকোড়া, ঝুরিভাজা, আর চা মিলেছিলো। দুপুরের খাওয়া আর মিলবে না বোধহয়। একেবারে সন্ধ্যার খাদ্য পাওয়া যাবে কুদে। সে এখনও বহুত দূর।

লাখনপুরে বড় বড় কয়েকটা গাছের ছায়া পেয়ে মন জুড়ালো। চা পাওয়া যায়, দুধ পাওয়া যায়। আমার লোভ লাল কালো মেশানো চেরীগুলোর ওপর। সের খানেক কিনে নিয়ে বেণুর হাতে দিয়ে বললাম —"দেখিস যেন মনোরমাটা না পাও।"

শুনে অসিত হাসছে। অসিতের কথা বলিনি। একই প্রতিষ্ঠানের কর্মী। বয়সে আমার ঢের ছোট, তাই দাদা বলেও, দাদা ভাবেও। চেরীর বোঝা সম্বন্ধে বেণুকে সাবধান করায় অসিত হাসলো।

মনোরমা রেগে বল্লে "আমার নাম করে ভাই সাহেব কি বললো বেণু? অসিতদা হাসছেন। বাংলায় কথা বললে আমি কিন্তু চটে যাবো!"

ওর মোটামোটা গালদুটো আরও ফুলে উঠলো। ওর কৃত্রিম অভিমান আমাদের কৌতুক বাড়িয়ে দিলো।

বেণুর বিনয় কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আমাদের বেণু আকারে বেতস নয় বটে কিন্তু প্রকৃতিতে একেবারে তাই। নুয়ে যাবার জো থাকলে প্রতিরোধ করা জানে না। সবিনয়ে বললো—"দাদা বললেন চেরী থেকে একটাও যাতে তুমি না পাও সাবধানে রাখতে।"

হন্ হন্ করে চলে গেল মনোরমা চেরীওয়ালার কাছে, গিয়েই চেরী কিনলো এক পোয়া, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে।

বেচারি ঠোঙ্গাটা নিয়ে যেই এগিয়েছে, অসিত ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে পালালো। এবার মনেরমার কাঁদো কাঁদো ভাব বদলে গিয়ে একেবারে হাসির নির্ঝর বয়ে গেলো। বেণু আর অসিত দিব্যি চেরীভক্ষণে নিযুক্ত হোলো। মনোরমা ততক্ষণ বড় ঠোঙ্গাটা নিয়ে বসেছে।

লাখনপুর থেকে আমাদের বাস ছাড়লো চতুর্থ। পথ এখান থেকে জম্মু পর্য্যন্ত প্রায় সমতল। খুব ধুলো পথে। আগাগোড়াই সামরিক বিভাগের নির্মিত পথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীর বিস্তৃতি। তার বুক শুকনো। রাশি রাশি নুড়ি, বড়ো ছোট দুধারে জমে আছে। লোহার বড় বড় পাত পাতা আছে। তার ওপর দিয়ে বাস যাচ্ছে।

এপারে এসে গেল মাধোপুর, ওপারে কাঠুয়া, মাঝে রাভী। শুকিয়ে আছে রাভী। সেই শুকনো, নুড়ি-ঢাকা অববাহিকার বুকের ওপর দিয়ে লম্বা সাঁকো। সাঁকোর খানিক ডাইনে টল্ টল্ করছে এপার ওপার ঢাকা জল। বাঁধ দিয়ে ঘেরা। এই রাভী গিয়ে মিশছে পুব পারে সরায় সিধু—পশ্চিম পারে রংপুর ছুঁয়ে চীনাবে, পাকিস্তানের মধ্যে। রাভাকে বেঁধে জলকে করা হয়েছে পূর্বগামী। এতো জল, যে পাশাপাশি দু'তিন টুকরো করে সেই জল নিয়ে যেতে হয়েছে। পাঞ্জাব পূর্ত্তকলার জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম সার্থক পূর্ত্ত ব্যবস্থা পাঞ্জাবেই হয়। বর্ত্তমান সরকারের পাঁচশালা ব্যবস্থার পূর্ত্ততত্ত্ব বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘাঁটী এই পথে পড়ে।

পাঠানকোট ষ্টেশন থেকে শ্রীনগর যাবার পথে প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে ভারতবর্ষের সব প্রজেক্টের মডেল তৈরী করা হয়েছে। পূর্ত্ত ও এঞ্জিনীয়রিং বিভাগের অনুসন্ধান কেন্দ্র। ভাখরা, নাঙ্গল বাঁধের ও একটা অনুকৃতি এখানে। রাভির খাল দুটীর রমনীয়তা দেখে মনে হোলো পূর্ত্তকলায় পাঞ্জাবের খ্যাতি অলীক নয়। দুধারে বড় বড় শিশুগাছের ছায়া, মাঝ দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে নহর। ফেনায়িত জল হেলে দুলে সেজে গুজে চলেছে।

বাস যাচ্ছে উত্তর পশ্চিম দিক ঘেঁষে। ডান ধারে পাহাড়ের শ্রেণী। খুব উঁচু নয়। রাশি রাশি নুড়ি, বড়-ছোট নুড়ির সমাবেশ। পরে দেখেছি জম্মুতে বহু বাড়ী ঘর দোর এই নুড়ি গেঁথে গেঁথে তৈরী। বর্ত্তমান হরবনে প্রাচীন কাশ্মীরের মন্দিরের বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সেখানে এই নুড়ির সাহায্যে গাঁথা অপূর্ব স্থাপত্য রীতির পরিচয় পাওয়া গেছে। হরবনের প্রাচীন নাম ষড়র্হদ্বন। (ছয় অর্হৎ এই বন স্থাপন করেন)।

দামন্ ঈ কোহ্ ডানে। একটার পর একটা নালা পার হচ্ছি। মাঝে মাঝে সেনানিবাস। ছাউনির শিবির দেখা যাচ্ছে। বাস ছুটে চলেছে। পথে কেবল ধুলো, কাঁকর, নুড়ি, আর উষর বিস্তৃত মাঠ। মাঝে মাছে ছোটো ছোটো পাহাড়ী। দূরে দূরে পাঁচ ছয় মাইল অন্তর এক একটা সেনানিবাস। সারা কাশ্মীরে এই সেনানিবাস দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমরা নগরপালিত সুখলালিত মন নিয়ে বুঝতে পারিনা দূরে দূরে গিরিতে, কন্দরে, প্রান্তরে, অরণ্যে, শিখরে, তুষারে, ভারতবর্ষের প্রতি কোণ থেকে সিপাহীরা এসে সীমান্ত রক্ষা করছে। তার দায়িত্ব, তার মর্য্যাদা আমরা অন্তর দিয়ে বুঝি না। কাশ্মীরে এলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান কথঞ্চিৎ বোঝা যায়। সদাসর্বদা এই রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাদের ওপর সেই সব সামরিক সিপাহীদের নমস্কার জানাই।

ক্রমশঃ

গিয়েছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে একদিন সাগরের অফিসে দেখা হওয়ায় তিনি বাক্যালাপ করেন ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাগরের পরিচয় করিয়ে দেন—কথাবার্তা চলে ইংরেজিতেই। অদ্ভুত ব্যাপার! সলীলা পুরীর সমুদ্র তটে যে সাগরকে আত্মনিবেদন করেছিল সে তাকে চিনতে পারে না। পরে সাগরের গাড়ীতে নবদম্পতি তাদের বাড়ি ফেরেন বায়স্কোপ দেখে এবং ওঁরা নেমে গিয়ে ধন্যবাদ জানাবার পর সাগরের মুখনিঃসৃত একটি ওড়িয়া কথা শুনে সলীলা চিনতে পারে—কিন্তু তখন সাগর গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বাসার দিকে ছুটেছে—আর উভয়ের দেখা হয়নি। বুকভরা ব্যথা নিয়ে সাগর শিমলা ত্যাগ করে—এইখানেই বইএর শেষ।

ওড়িয়া ভাষার শব্দলালিত্য কিরূপ 'কর্ণপ্রিয়', বাংলা ভাষার সঙ্গে উহার কি নিবিড় সম্পর্ক, এই বইএর কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যাবে।—

পুস্তকের প্রারম্ভ—বন্ধুত্ব-প্রয়াসী সাগরের স্বগতোক্তি :—

"সাথীশূন্য অন্তর মোর শরতর আগমনরে হাহাকার করি উঠিলা। শুভ্র, সুনীল আকাশর নীরব আহ্বান, অলস পবন দেহরে প্রস্ফুটিত শেফালির সুরভি রোমাঞ্চন, গগন পবন চারি আড়ে দাগ তুলে দিন (দিকে) প্রকৃতির শোভাসম্পদ এ সমস্তংকর গৌরব গাই কোলাহল শংখ দিগ দিগন্তরে তার মৃদু গুঞ্জন বীণা বজাইথাএ। মন একা হোই রহিবাকু স্থির হেউ না থায়ে মোটে। ইচ্ছা হেউথাএ, গোটা এ সাথী কাহাকু সঙ্গরে নেই এ শরৎ ঋতুটাকু ভলকরি উপভোগ করিবাকু—শেফালি ফুলর ডাক সঙ্গরে নিজর কণ্ঠ মিলাই দেই অভাবনীয় ঘটনার লীলা তরঙ্গরে ভাসিযিবা পাঁই।

সলীলার মানসলোকের পরিচয়—'সহকার' পত্রিকায় তার লেখা 'পরিণয় ও সমাজ' প্রবন্ধের কয়েক ছত্র :—

"বিবাহ করিবার দাবী নারীর জন্মগত। তা উপরে পরিবার কিম্বা সমাজর হস্তক্ষেপ কৌনসি যুগরে যুক্তিসঙ্গত নুহেঁ। নারীকু তার ইচ্ছা বিরুদ্ধরে গোটাক সহিত হস্তসংযোগ করাই দেবার ফিজিক্যাল এফেক্ট হেউছি স্ত্রীটিকু আপনা ভিতরে কুহুলাই কুহুলাই মৃত্যুমুখরে ছাড়ি দেবা। সেথী পাঁই নারীকু তার ইচ্ছানুসারে স্বামী বাছিনেবাকু অধিকার দেবা সমাজর কর্তব্য। নারী যদি নিজ ইচ্ছানুসারে একরু অধিক পুরুষ গ্রহণ করি যথার্থ সুখী হোই পারে, তাহা হেলে সমাজরে সেথিপাঁই কৌনসি আপত্তি উঠিবার কারণ না হিঁ।..."

সলীলা চালিত মোটরে পুরীযাত্রার আগের রাত্রে সাগর বলছে :—

"সেদিন রাত্রিরে নিদ্রা নাহিঁ। কালু সকালে যাত্রা হেব মোর রূপদক্ষা সলীলা সাঙ্গরে। ওঃ সে যেউ আনন্দ। কবি হরিশ হইথিলে হুএত উন্মাদ হই গাই উঠিথান্তে :—

সে কি হরষ সে কি বেদনা,
সে কি কিশোর চিত্তে বিকাশ ব্যথার
তীব্র তড়িত চেতনা!—

অজিতের সঙ্গে সলীলা বায়ু পরিবর্তনে শিমলা গেলে বিরহী সাগরের মনের অবস্থা :—

"পরাণপ্রিয়া দূররে রহিলে কি পরি মাধুরী অনুভূত হুয়ে, তাহা জানিলি এই প্রথম। শীঘ্র তাকু নিজ ভিতরে পাইবার উৎকণ্ঠা মধ্যরে যেঁউ স্নিগ্ধতা, তাহা অতি অদ্ভুত...অতি বিচিত্র মধ্য। মুঁ যেতে তা বিষয় ভাবে, সেতিকি সে রক্তকমল পরি মো আখি আগরে ফুটি উঠি মতে আত্মবিস্মৃত করি দিএ...।" সলীলার টেলিগ্রামে অজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সাগরের বিলাপ :—

"অজিত নন্দাংকর অকস্মাৎ মৃত্যু"—সলীলা। (টেলিগ্রাম—ইংরেজীর অনুবাদ)

"সম্বাদটি মোউপরে যে পরি বজ্রপাতকলা (করিল)। মতে সমস্ত অন্ধার দেখাগলা। মুঁ স্থির হই বসি পারিলি, নাহিঁ। মোর চিরসহচর, চির প্রাণপ্রিয়, পরম বন্ধু অজিতর মৃত্যু—এই কেতোটি অক্ষর উচ্চারণ বেলে মো হৃদয় ভিতরে যে পরি হু হু হোই নিয়াঁ (আগুন) জলি উঠিলা। আখি ভিতরে ভ্রমরে নিয়াঁ হুলা বাহারি পড়িলা। ছাতি ভিতরে কিএ যে পরি কুঠার ঘাত কলাপরি বোধ হেলা...।"

যে সলীলার ধ্যান জ্ঞান ছিল সাগর—সাগর ভিন্ন অপর কাউকে সে জীবনসঙ্গী করবে না বলে বার বার হাবে-ভাবে কথায়-বার্তায় প্রকাশ করেছে—সেই সলীলা তাকে ভুলে গিয়ে অপর ব্যক্তির সঙ্গে পরিণীত হয়েছে এবং বায়স্কোপ হলে তাকে দেখে এবং তারই গাড়ীতে স্বামী পল্লবের সঙ্গে শিমলার তাদের গৃহে ফিরবার সময় কাছে বসেও সলীলা তাকে চিনতে পারল না দেখে সাগর মর্মান্তিক আঘাত পেল—এইখানেই গ্রন্থের শেষ।...

"মন ভিতরে অতীতর সমস্ত চিত্র ভাসি উঠিলা। অজিত সহিত প্রথম বন্ধুতা—সেই বন্ধুতার বিকাশ দ্বারা সলীলা সহিত বন্ধুতা—তার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত প্রেম, সমুদ্র নিকটরে হৃদয়র অদ্ভুত মিলন। তা পরি আজি পুনি তা পাখরে (পাশে) অপরিচিত ভাবরে পল্লব মধ্য দেই বন্ধুতা—এইটা মধ্য তারি নিজ ইচ্ছারে! মস্তিষ্ক মোর ঘূর্ণিত হোই উঠিলা।...

আশা করি উপরিলিখিত ছত্রগুলিতেই ওড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। অবান্তর হলেও একথা আজ বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, উৎকলের যে অসাধারণ কৃতী সন্তান বঙ্গবাণীর কণ্ঠহারে নিত্য নব অমূল্য রত্ন সংযোজন করে যশস্বী হয়েছেন—তিনি অন্ততঃ কয়েকখানি পুস্তকও যদি উৎকল ভাষায় প্রকাশ করতেন তবে ওড়িয়া আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারত এবং উহা বাংলার মতই ভারতীয় ভাষার মধ্যে অতি উচ্চ আসন লাভ করতে সমর্থ হত।

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এত দ্রুত প্রয়াণ সলীলার লীলা-চাঞ্চল্যের ছোঁয়াচেই ঘটল কিনা কে জানে? তবে এর জন্যে গোড়াতেই পাঠক-পাঠিকাদের ক্ষমা চেয়ে রেখেছি—কাজেই 'কৌনসি আশঙ্কা নাহি মোর'।*

* ১৩৬৩ সালের বৈশাখ মাসে লিখিত।

অতুল দত্ত

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে আর একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। শান্তি ও সহ-অবস্থিতির পথে অগ্রবর্ত্তী হইবার শুভ সূচনা লইয়া ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর শেষ হইল সে আদর্শের ব্যর্থতা লইয়া। মধ্যপ্রাচ্য ও হাঙ্গেরিকে কেন্দ্র করিয়া এই বৎসর আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে যে আলোড়ন হইয়াছে, তাহাতে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে; বিশ্ব-শান্তি ও সহ-অবস্থিতির আদর্শ পুনরায় সুদূরবর্ত্তী হইয়াছে। তবে, এই সময় উত্তেজনা, কটূভাষণ ও বিরুদ্ধ প্রচারের মধ্য দিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, শান্তিকামী জনমতের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; ক্ষমতামত্ত রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে সে প্রভাব উপেক্ষা করিয়া বিশ্বব্যাপী সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়ত আর সম্ভব নয়।

ভারত-মার্কিণ ঘনিষ্ঠতা—

শ্রীনেহরুর আমেরিকা পরিভ্রমণ এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত তাহার ব্যক্তিগত আলোচনা গত ডিসেম্বর মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা। গত ১৪ই ডিসেম্বর শ্রীনেহরু আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে গেটিস্‌বার্গে—আইসেনহাওয়ারের পল্লীভবনে দুই দিন অবস্থান করিবার পর তিনি ওয়াশিংটনে যান। সেখান হইতে নিউ ইয়র্কে যাইয়া জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা করেন। অতঃপর, ক্যানাডা ও বৃটেন হইয়া ২৮শে ডিসেম্বর তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গেটিস্‌বার্গের শান্ত পরিবেশে শ্রীনেহরু ও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার দীর্ঘ ষোল ঘণ্টা ধরিয়া ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তিগত আলোচনার বিবরণ স্বভাবতঃ অপ্রকাশ্য। তবে, আলোচনার ফলে ভারত ও আমেরিকার অনুসৃত নীতির প্রকৃত রূপ পরস্পরের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন; অর্থাৎ আমেরিকার মাটিতে দাঁড়াইয়া তিনি পরোক্ষে মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতিরই বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন।

ভারত ও আমেরিকা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে দুইটি বিপরীত নীতির পরিপোষক হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ও শ্রীনেহরুর দৃষ্টিভঙ্গীর মিল আছে। বর্ত্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী—সহ-অবস্থিতি, অথবা সহ-বিনষ্টি। ১৯৫৫ সালে জুলাই মাসে রাষ্ট্র-প্রধান সম্মেলনের পর হইতে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বহুবার মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই আণবিক যুগে যুদ্ধ অচিন্তনীয়। আইসেনহাওয়ারের এই যুদ্ধ-বিরোধী ব্যক্তিগত মনোভাব এখনও আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে প্রতিফলিত হয় নাই। তবে, আমেরিকার জনসাধারণ যে ভারতীয় জনগণের মত যুদ্ধের একান্ত বিরোধী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৯৫২ সালে আইসেনহাওয়ার কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৬ সালের নির্ব্বাচনেও "শান্তিই" ছিল তাঁহার প্রধান নির্ব্বাচনী "স্লোগান্"। সুতরাং, বলা যাইতে পারে, ভারত ও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি যাহাই হউক, গেটিস্‌বার্গে দুই জন রাষ্ট্রনায়ক নিজ নিজ দেশের শান্তিকামী জনগণের প্রকৃত প্রতিভূরূপেই মিলিত হইয়াছিলেন।

ভারতের ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন। কিন্তু সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা উপলক্ষ করিয়া মার্কিণ পররাষ্ট্রীয় নীতি ভারতীয় নীতির নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। ভারত সামরিক জোট গড়িবার বিরোধী; অস্ত্রসজ্জার বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা সে বন্ধ করিতে চায়। ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোতের প্রভাবে বিভিন্ন দেশে যে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়া শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা সে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চায়। এই উদ্দেশ্যে ভারত জাতি-সঙ্ঘকে শক্তিশালী করিবার পক্ষপাতী; শান্তি, স্বাধীনতা ও মানবীয় অধিকার রক্ষায় এই প্রতিষ্ঠান সর্ব্বজনীন সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করুক, ইহাই ভারতীয় পররাষ্ট্রীয় নীতির মূল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, আমেরিকা "শক্তিমত্তার" (Position of strength) সমর্থক। একমাত্র সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতায় অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া সে ঘোষণা করে। এই নীতি অনুসারেই সে জাতি-সঙ্ঘের বাহিরে সামরিক জোট গড়িয়াছে, এই জোটের সংখ্যা বাড়াইয়া সমগ্র অ-কম্যুনিষ্ট জগতকে তাহার নেতৃত্বে সশস্ত্র শিবিরে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জাতি-সঙ্ঘকে সে প্রধানতঃ প্রচারমঞ্চরূপে ব্যবহার করে; ইহার সাহায্যে প্রতিপক্ষকে হিংস্র সমরকামী প্রতিপন্ন করিয়া জাতি-সঙ্ঘের বাহিরে সামরিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা সে বুঝাইতে চায়। ভারত সামরিক জোটের বাহিরে থাকিয়া জাতি-সঙ্ঘের প্রতি অবিচলিত আনুগত্যের পক্ষপাতী; আর আমেরিকা জাতি-সঙ্ঘের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়া সামরিক জোট গঠনের প্রতি সমস্ত গুরুত্ব দেয়।

সম্প্রতি আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান সামরিক জোটের (উত্তর অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থা—"ন্যাটোর") দুইটি মূল অংশীদার—বৃটেন ও ফ্রান্সের ঔদ্ধত্যের ফলে এই সামরিক জোটে ফাটল ধরিয়াছিল। তাহারা গোঁয়ারতুমি করে এমন একটি অঞ্চলে, যেখানে আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

স্বার্থ গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রতিরোধ করা আমেরিকার রাজনৈতিক স্বার্থ। এই অঞ্চলের তৈলসম্পদে অধিকার বজায় রাখা এবং উহা প্রসারিত করা তাহার অর্থনৈতিক স্বার্থ। মধ্য প্রাচ্যে বৃটেন ও ফ্রান্সের ঔদ্ধত্য যদি আমেরিকা সমর্থন করিত, তাহা হইলে সমগ্র আরব জগতে সোভিয়েট রুশিয়ার নৈতিক ও বাস্তব প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিত, এবং আমেরিকার তৈল স্বার্থ বিপন্ন হইত। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সামরিক জোটে ফাটল বাড়িতে দিয়াছিলেন; "ন্যাটোর" সংহতির প্রতি গুরুত্ব না দিয়া জাতি-সঙ্ঘকে শক্তিশালী করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আমেরিকার ধনিক সম্প্রদায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের এই নীতির বিরোধিতা করিতে পারে নাই; কারণ এই নীতি মার্কিণ তৈল-স্বার্থ রক্ষার সহায়ক। উগ্র সোভিয়েট-বিরোধী সমরকর্মীরাও নীরব থাকিতে বাধ্য হইয়াছে; কারণ মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েট প্রভাব নিবারণের জন্য এই নীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য ছিল। এই বিচিত্র সুযোগে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী নীতি হিসাবে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। ভারতের সহিত আমেরিকার নীতিগত নৈকট্য ঘটে ইহাতেই। এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীনেহরু ও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মিলিত হইয়াছিলেন। মার্কিণ নীতি ভারতীয় নীতির নিকটবর্ত্তী হইবার ফলে মধ্য প্রাচ্যের ও সুদূর প্রাচ্যের সমস্যার যদি স্থায়ী সমাধান হয়, তাহা হইলে বিশ্ব-শান্তি সত্যই নিকটবর্ত্তী হইবে। শ্রীনেহরু ও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত আলোচনার ফলে এশিয়ার দুই প্রান্তের সমস্যাগুলির সমাধানের সম্ভাবনা আগাইয়াছে কিনা, তাহাই প্রশ্ন।

মধ্য প্রাচ্যের সমস্যা—

আরব-ইস্রাইল বিরোধের স্থায়ী অবসান এবং মিশরীয় সার্ব্বভৌমত্বের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সুয়েজ খাল পরিচালনার ব্যবস্থা করাই মধ্য প্রাচ্যের সমস্যা। ফরমোসা সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং গণতান্ত্রিক চীনের জাতি-সঙ্ঘে প্রবেশের প্রশ্নই সুদূর প্রাচ্যের মূল সমস্যা। মধ্য প্রাচ্যে বৃটেন ও ফ্রান্সের উদ্ধত আক্রমণের ফলে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে অনেকটা সরল হইয়াছে। গ্যাজা ও সিনাই হইতে ইস্রাইলী সৈন্য এখনও অপসারিত হয় নাই বটে। তবে, ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পোর্ট সৈয়দ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। ইহাদের আক্রমণের সময় সুয়েজ খালে জাহাজ ডুবিয়া যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়, জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাহা অপসারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত খাল পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ হইবে না বলিয়া আমেরিকা যে চাপ দিয়াছিল, তাহাতে কাজ হইয়াছে। সুয়েজ বন্ধ থাকিবার ফলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত লাগিয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্স এই অবস্থা অধিককাল চলিতে দিতে পারে না। খাল পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ হওয়ায় ইহারা এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে। আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথম হইতে খালের মধ্য দিয়া কিছু কিছু জাহাজ চলিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে; মে মাস হইতে স্বাভাবিক জাহাজ চলাচল আরম্ভ হইবে। এখন ইস্রাইল-আরব সমস্যা স্থায়ী মীমাংসার প্রশ্ন এবং সুয়েজ খাল পরিচালনের প্রশ্ন আবার মুখ্য হইয়া উঠিল। এই সম্পর্কে আমেরিকা কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করে, তাহা জানিবার জন্য বিশ্বের শান্তিকামী জনসাধারণ আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে। শোনা যাইতেছে, বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত পরামর্শ না করিয়া আমেরিকা মধ্য প্রাচ্য সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও শোনা যাইতেছে যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণের ক্ষমতা চাহিবেন। মধ্য প্রাচ্যে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে আশঙ্কাজনক। মধ্য প্রাচ্যে বৃটিশ ও ফরাসী প্রভাব স্তিমিত হইবার পর আমেরিকা যদি সামরিক শক্তির সাহায্যে সোভিয়েট প্রভাব রোধ করিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে এই অঞ্চলের সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে। মধ্য প্রাচ্যকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করাই এখানকার সমস্যা সমাধানের প্রকৃত উপায়। মধ্য প্রাচ্য হইতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভাব বিদূরিত হইবার পর এক্ষণে যে শূন্যতা (vacuum) সৃষ্টি হইল, মার্কিণ প্রভাব বিস্তৃতির দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা সমস্যা সমাধানের উপায় নহে; সর্ব্বরকম বৈদেশিক প্রভাব দূর করিয়া এই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সংহতি স্থাপনেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে। পক্ষান্তরে, মার্কিণ প্রভাব বিস্তৃতির চেষ্টা হইলেই সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত প্রবল কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব বাধিবে। কম্যুনিষ্ট জগৎ ও পাশ্চাত্য জগতের বিরোধের ফলেই মধ্য প্রাচ্যের সমস্যা বর্ত্তমানে জটিল হইয়াছে। সোভিয়েট বিরোধী ঘাঁটিরূপে মধ্য প্রাচ্যকে ব্যবহারের জন্য যে চেষ্টা, তাহা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই এই অঞ্চলে পাণ্টা প্রভাব বিস্তারের জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার প্রাণপণ প্রয়াস চলিতেছে। আরব রাষ্ট্রগুলি এই আগ্রহী প্রতিবেশীকে পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য শক্তির অনুগ্রহপুষ্ট ইস্রাইলের বিরুদ্ধে ইহার সহায়তা খোঁজে। পক্ষান্তরে, তুরস্ক, ইরাণ প্রভৃতি বাগদাদ চুক্তি সংস্থার রাষ্ট্রসমূহ সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার সাহায্যপ্রত্যাশী; পাকিস্থান সোভিয়েট বিরোধী জোটে ঢুকিয়া ভারতের বিরুদ্ধে নিজের সামরিক শক্তি বাড়াইতে চাহিতেছে। মধ্য প্রাচ্য যদি নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত হয়, পাশ্চাত্য শক্তি-দ্বন্দ্বের যদি এখানে অবসান ঘটে, তাহা হইলেই এখানকার রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক ও প্রীতিকর হইতে পারে। আরব-ইস্রাইল সমস্যাও সমাধানের অতীত থাকিবে না; জাতি-সঙ্ঘের মারফৎ এই সমস্যার সমাধান সহজেই হইতে পারিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মধ্য প্রাচ্যের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য সোভিয়েট-রুশিয়া ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ—উভয়ের প্রতিশ্রুতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি এই অঞ্চলের সহিত কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট জগৎ, দুইয়েরই স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

সুদূর প্রাচ্য—

সুদূর প্রাচ্যে ফরমোসায় চিয়াং কাই-শেককে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নূতন গণতান্ত্রিক চীনকে সর্ব্বদা উদ্যত সঙ্গীনের সম্মুখে রাখিবার নীতি মার্কিণ

রাষ্ট্র অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। তাহারই আপত্তিতে গণতান্ত্রিক ন এখন পর্য্যন্ত জাতি-সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার পায় নাই ; ফরমোজা দ্বীপের ং চক্রের অনুচর তাহারই প্রশ্রয়ে সমগ্র চীনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব রিবার হাস্যকর দাবী করিয়া আসিতে পারিতেছে। চীনের ৬০ কোটী ধিবাসীকে জাতি-সঙ্ঘে প্রতিনিধিত্ব না দেওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের সার্ব্বনীন রূপ অপূর্ণ রহিয়াছে ; সুদূর প্রাচ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা বলম্বনের নৈতিক অধিকার জাতি-সঙ্ঘ পাইতেছে না। নেহরু-আইসেনহাওয়ার আলোচনায় সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি এবং চীনের সঙ্গত দাবীর কথা উত্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। চীনের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ চৌ-এন্-লাই নভেম্বর মাসের শেষভাগে ভারতে আগমণ করেন ; আমেরিকা অভিমুখে রওনা হইবার পূর্ব্বে শ্রীনেহরু তাঁহার সহিত সুদূর প্রাচ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। চীনের বর্ত্তমান নীতি ও মনোভাব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লইয়াই তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন।

মিঃ চৌ-এন্-লাই ৯ই গত ডিসেম্বর কলিকাতার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আমেরিকার সহিত সদ্ভাব স্থাপনের জন্য চীন বিশেষ আগ্রহী, এবং এই সম্পর্কে সে যথাসাধ্য চেষ্টাই করিতেছে ; কিন্তু আমেরিকার নিকট হইতে এই বিষয়ে বিশেষ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ফরমোসা সম্পর্কে চৌ জানান যে, চীনের নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফরমোসাকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, এবং চিয়াং কাই-শেকের হৃদয় জয় করিতে চাহিতেছেন। চীনে আটক মার্কিণ বন্দীদের সম্পর্কে চৌ বলেন যে, মোট ৪৪ জন বন্দীর মধ্যে মাত্র ১০ জন এখন চীনের কারাগারে রহিয়াছে ; চৈনিক আইন অনুসারে তাহারা অপরাধী। কারাগারে সদ্ভাবে থাকিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে তাহাদিগকে চীনের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয় ; আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি-পত্র লিখিবার এবং মার্কিণ গভর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে (এই অনুমতি দেওয়া হয় নাই) আত্মীয় স্বজনরা চীনে আসিলে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকারও বন্দীদের আছে। মিঃ চৌ এন্-লাই দুঃখ করিয়া বলেন যে, আমেরিকায় আটক কোনও চীনাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ দেওয়া হইতেছে না। ফরমোস ও বন্দী-মুক্তি সম্পর্কে চীনের এই মনোভাব নিশ্চয়ই শ্রীনেহরুর মারফৎ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের গোচরীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে আমেরিকার পূর্ব্বানুসৃত নীতি পরিবর্ত্তিত হইবার কোনও আভাস এখনও পাওয়া যায় নাই। বরং এইরূপ কথাই শোনা গিয়াছে যে, ফরমোসা সম্পর্কে বলপ্রয়োগ না করিবার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চীন যতদিন না দিবে, এবং সমস্ত মার্কিণ বন্দীকে সে কারামুক্ত না করিবে, ততদিন চীন সম্পর্কে মার্কিণ নীতি পরিবর্ত্তিত হইবার প্রশ্ন নাকি ওঠে না। চীনের পক্ষ হইতে বক্তব্য করা হইয়াছে যে, কোনরূপ বাঁধাধরা সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে সে প্রস্তুত নয়।

হাঙ্গেরীর পরিস্থিতি—

হাঙ্গেরির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শান্ত হইয়াছে ; কাদার গভর্ণমেন্ট এখন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতি-সঙ্ঘে হাঙ্গেরির প্রসঙ্গ কয়েকবার আলোচিত হইয়াছে। সঙ্ঘের সর্ব্বশেষ নির্দেশ—হাঙ্গেরির গভর্ণমেন্ট ঐ দেশে জাতি-সঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষক প্রবেশের অনুমতি দিন। ইহা ছাড়া, হাঙ্গেরির পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ আহরণের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলিতেও পর্য্যবেক্ষক প্রেরণের সিদ্ধান্ত জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন। হাঙ্গেরিয়ান্ গভর্ণমেন্ট জাতি-সঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষক-মণ্ডলীকে হাঙ্গেরিতে প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত হন নাই। সঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ হ্যামারশীল্ডের ব্যক্তিগতভাবে বুদাপেস্তে গমনে তাঁহাদের আপত্তি নাই ; তবে, তাঁহাদের নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহাকে যাইতে হইবে—মিঃ হ্যামারশীল্ডের প্রস্তাব অনুসারে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে যাইতে দিবার অক্ষমতা হাঙ্গেরিয়ান্ গভর্ণমেন্ট জ্ঞাপন করিয়াছেন।

হাঙ্গেরির জাতীয় অভ্যুত্থান দমনে রুশ সৈন্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রতিবাদ উঠিয়াছে ; হাঙ্গেরিয়নদিগকে রুশিয়ায় নির্ব্বাসন দিবার অভিযোগও শোনা গিয়াছে ; প্রাক্তন হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী নাগীকে স্বগৃহে থাকিতে দিবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে রুমানিয়ায় পাঠাইবার অনুযোগও হইয়াছে। অবশ্য হাঙ্গেরির গণ-বিক্ষোভের সময় বৈদেশিক স্বার্থের ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অনুচররা কিরূপ নৃশংস অত্যাচার করিয়াছিল, এবং অবস্থা কিভাবে নাগী গভর্ণমেন্টের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা এখন ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। তবে, সমগ্র অবস্থাটা যে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের মস্কোস্থিত রাষ্ট্রদূত মিঃ কে, পি, এস, মেনন্ হাঙ্গেরি পরিদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন যে, বড় রকমের যুদ্ধ হইয়া গেলে সহরের যে চেহারা হয়, বুদাপেস্তের অবস্থা সেইরূপ। শ্রীনেহরু বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে অনুমান করেন যে, মোট পঁচিশ হাজার হাঙ্গেরিয়ান এবং সাত হাজার সোভিয়েট সৈন্য এই হাঙ্গামায় নিহত হইয়াছে। কাদার গভর্ণমেন্ট অবশ্য, ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বিবরণে বুদাপেস্তে দুই হাজারের অধিক লোক নাকি নিহত হয় নাই। রুশ সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা এবং হাঙ্গেরির অন্যান্য অঞ্চলে হতাহত হাঙ্গেরিয়ানদের সংখ্যা কাদার গভর্ণমেন্ট জানান নাই।

হাঙ্গেরির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের বুদাপেস্তে যাইবার দিন অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত পিছাইয়া দিয়া কাদার গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে প্রচারের সুযোগ করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা মস্কোস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে হাঙ্গেরির অবস্থা পরিদর্শন করিতে দিয়াছেন ; কিন্তু মিঃ হ্যামারশীল্ডকে হাঙ্গেরির বর্ত্তমান চিত্র দেখিতে দিলেন না। জাতি-সঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষকমণ্ডলীকে হাঙ্গেরিতে প্রবেশাধিকার দানে আপত্তি করা হইয়াছে এই যুক্তিতে যে, ইহাতে হাঙ্গেরির সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে। কিন্তু হাঙ্গেরির জাতি-সঙ্ঘের সভ্য। সেই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ যে সব সভ্য রাষ্ট্রের প্রতি হাঙ্গেরির আস্থা আছে, তাহাদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পর্য্যবেক্ষকমণ্ডলী যদি হাঙ্গেরিয়ান্ গভর্ণমেন্টের পূর্ণ

সম্মতিতে ঐ রাজ্যে গমন করে, তাহা হইলে সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয় কেমন করিয়া? হাঙ্গেরির গভর্ণমেন্টের এই আপত্তির ফলেই জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে হাঙ্গেরিয়ান্ সংলগ্ন দেশগুলিতে তদন্তকারী পাঠাইবার মারাত্মক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য সংলগ্ন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি জাতি-সঙ্ঘের তদন্তকারী গ্রহণে সম্মত হয় নাই। তবে, অষ্ট্রিয়ায় তাহারা যাইতে পারিবেন। সেখানে এই তদন্তকারীরা উদ্বাস্তুদের আজগুবি কাহিনী হইতে, তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শীদের অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এবং শোনা ও না-শোনা বিবরণের জাল হইতে তথ্য আহরণ করিবেন। স্বভাবতঃ, ইহাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না; অথচ, হাঙ্গেরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট ও সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রচারের শক্তিশালী উপকরণ সঞ্চিত হইবে। নজীর হিসাবেও ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভারতের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের তদন্ত যদি পাকিস্থানে বসিয়া চলে, তাহা হইলে উহার ফল সহজেই অনুমেয়। ১।১।৫৭

তাজমহলের নূতন কালান্তরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পম্পা উলারে গোমুখা গঙ্গা বুকে
আদিনাথ হোতে ক্ষীর ভবানীর কোলে—
তোমারে খুঁজেছি কত না গভীর দুখে,
বৈশালীপথে নয়নের বারি দোলে।
কত অরণ্য কেঁপেছে হৃদয়ে মোর,
কত কিশলয় ডেকেছে তাদের কাছে।
শ্রান্ত নয়নে ঝরেছে অশ্রুলোর
আজো যেন কানে তোমার কাঁকন বাজে।
তোমাতে আমাতে তাজমহলের ধারে'
ঘুমঘন বাগে স্বপনের খেলা হোলো।
ফুলের ফলের ফসলের দিনটারে
পার্থিবপ্রাণে কেমন করিয়া ভোলো!
তাজমহলের নূতন কালান্তরে
আবার এসেছি রঙ্ গুলে দিতে পটে,
আগ্রার পথে বীথিকার মর্ম্মরে—
বোধন করিতে নব জনমের ঘটে
তোমার প্রাণের কুসুমের মালাখানি
দিয়ে যেতে যদি রঙ্ করা আয়তনে,
আমার বীণায় বাজায়ে তোমার বাণী
আনন্দ গান দিতাম পান্থজনে!
মমি হয়ে গেছে কত প্রেমিকের আশা,
মায়ার ভুবনে প্রণয়ের যাদুঘরে।
ভাবের ভিতরে ফুটিল না কোন ভাষা
গুমরে বেদনা নিখিলের অন্তরে।
চিন্তা জটিল হৃদয়ের কুহেলিকা
ক্লেদমন্থর বাসনায় পথ চলা!
পাতাঝরা রাতে নিভিল কি দীপশিখা?
তোমারে আমার কিছুই হোলো না বলা।
প্রণয় দুকূলে না বলা কথার ঢেউ
ভেঙে ভেঙে ফেলে ইতিহাসহারা তট!
খুঁজিয়া পেলো কি তোমার লিপিকা কেউ?
কারো ছেঁড়া তারে বেজেছে কি ছায়ানট?
কল্পলোকের তারকাদলের সাথে
কত রাতধরে ছন্দের জাল বোনা!
তুমি দিয়ে গেছ প্রণয়ের রাখী হাতে
আলো আঁধারের পথে করি আনাগোণা।
কত সঙ্কেত নিতল নয়নে তব
ঋতু উৎসবে চপল করেছে মোরে।
জীবনে আমার জনম হোলো যে নব,
দুঃখ শুধুই—তুমি গেলে দূরে স'রে।
মেঘের অলক নভো ললাটের মাঝে
উড়ে উড়ে পড়ে রূপালি চাঁদেরে ডেকে।
ঊষার পুলক আসে নাক মোর কাছে,
সোনালি রবির কিরণ রশ্মি মেখে।
ঝাপ্‌সা বাতাস বয়ে যায় দিকে দিকে,
বুকে নিয়ে মিছে মুছে যাওয়া আলিপনা—
যৌবন রঙ্ হেরিতেছি আজ ফিকে,
তোমারে হারায়ে আমি যে অন্যমনা।

অভ্রান্ত

শ্রীমনীন্দ্র দত্ত

বিস্ময়ের একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেলো অমলেশের সারা শরীরে। ভালোও লাগলো। বুঝতে পারলো না কিছুই। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো খানিক মিসেস্ হালদারের মুখের দিকে। তারপর মুখ নামিয়ে মিসেস্ হালদারের হাত থেকে গপ্ গপ্ করে গিলতে লাগলো দলা-পাকানো ঘি-ভাত। কেন ও কি জানে, গলা দিয়ে যতো ঘি-ভাত নামলো, দু'চোখ ছাপিয়ে ততো নেমে এলো আনন্দের অশ্রুধারা।

বেচারি অমলেশ! ওর আর দোষ কি বল? ও অবস্থায় পড়লে তোমারও অমলেশের অবস্থাই হতো। ও না হয় মফস্বল কলেজ থেকে সদ্য বি-এ পাস করে কলকাতা এসেছে এম-এ পড়তে। ও না হয় একটু গোবেচারি—একটু হাবা-হাবা। দেবকীপ্রসাদের ভাষায়, একটু বা ইডিয়ট। কিন্তু তুমি যতোই খাস কলকাতার ছেলে হও, যতোই চৌকোশ হোক তোমার চোখ-কান-বুদ্ধি, তুমিই কি এ রকম একটা অবস্থায় পড়লে মাথা ঠিক রাখতে পারতে?

অবশ্য আমার গল্প অমলেশকে নিয়ে নয়। গল্পের নায়ক হবার মতো কোন বৈভবই অমলেশের নেই। এ-গল্প মিসেস্ হালদারকে নিয়ে। আর ঘটনাক্রমে মিসেস্ হালদারের জীবন-বৃত্তের মধ্যে এসে পড়েছে বলেই এ-গল্পে অমলেশের আবির্ভাব। তার বেশি কিছু নয়। অমলেশ এ-গল্পের ভূমিকামাত্র, গল্পের কেন্দ্রে আছেন মিসেস হালদার। অতএব যথারীতি ভূমিকা দিয়েই সুরু করি।

*　　*　　*　　*

পূজোর ছুটিতে অমলেশরা বেড়াতে এসেছে মধুপুরে। ফাঁকায় প্রায়-ফাঁকা ঢেউ-খেলানো মাঠের মাঝখানে বাড়ি। বাড়ি তো নয় যেন পটে-আঁকা ছবি।

সত্যি ছবি। রাস্তার দুধারে বাড়ি। সামনে বাগান। কোনটা অযত্নে মলিন। কোনটা সদ্য-ফোটা ফুলের সমারোহ নিয়ে বর্ণসুষমায় উজ্জ্বল। তবু ছবি। প্রাণ নেই। জনমানবের সাড়া নেই। কোন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে না কলকণ্ঠের আভাষ। কোন জানালার সার্সি খোলে না সকাল-সন্ধ্যেয়।

প্রথম দিন বেড়াতে বেরিয়েই এ সত্যটা আবিষ্কার করলো অমলেশরা। তাইতো, এ কোথায় এলাম বেড়াতে? এ যে রূপকাথার সেই ঘুমন্ত পুরীর বৃত্তান্ত। সেখানে তবু আছে ঘুমন্ত মানুষের দল। এ যে একেবারে ফাঁকা। একেবারে জনমনিষ্যির সাড়া নেই।

রাস্তার এ-পাশ থেকে ও-পাশ বেশ ভালো করে বার দুই চক্কর দিলো ওরা। কিন্তু সহর-ফেরৎ দু-চার জন দেহাতী লোক ছাড়া কোন চেঞ্জারের সাক্ষাৎ পেলো না। কোন বাড়ীর ছাতে চোখে পড়লো না শাড়ির এতটুকু আঁচলের আভাস।

সবাই মুষড়ে পড়লো একেবারে। ক'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। একটু হই-হুল্লোড় করবে, আমোদ-স্ফূর্তি হবে। তা নয় একেবারে নির্জন মরুভূমি।

সুকোমল বললো: এ কেমন হলো দেবীদা?

শ্যামল বললো: আমি তখনই বলেছিলাম, ও মধুপুর-ফধুপুর নয়, চলো দিল্লী যাই, তা আমার কথায় তো কেউ কান দিলে না, এখন বোঝ ঠেলা?

দেবীপ্রসাদ দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। সেই এ যাত্রার উদ্যোক্তা। ভিতরে ভিতরে মুষড়ে পড়েছে সেও কম নয়। তবু মুখ রক্ষার জন্য বলে উঠলো: তোমার তো আছে যতো হিল্লি দিল্লীর বায়না। আরে বাবা, মানুষের ভীড়ই যদি ঠেঙাবো তবে আর চেঞ্জে আসা কেন, সেজন্য তো কলেজ স্ট্রীট মার্কেটই ছিলো ভাল।

শ্যামল কাটা জবাব দিলো: তার চেয়েও ভালো ছিলো সাহারা মরুভূমি, কি বলো?

অমলেশ সত্ত গাঁ থেকে এসেছে। ওর আশংকা অন্ত রকম। ও বলে উঠলো: কাছে ভিতে তো মানুষ বলতে কেউ নেই। ধরো যদি রাত-বিরেতে ডাকাত পড়ে বাড়িতে, তাহলে?

দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো দেবীপ্রসাদ: তোমার মুণ্ডু পড়বে। ডাকাতের আর খেয়েদেয়ে ঘুম নেই, তোমার ভাঙা স্যুটকেস আর ছেঁড়া হোল্ড-অল্ নেবার জন্ত এই কুসমাতে এসে হাজির হবে? যতো সব!

দেবীপ্রসাদ শেষোক্ত কথাটার সংগে সংগে সমস্ত অংগ দিয়ে এমন অদ্ভুত একটা ভংগী করলো যে একটা অঘটন সত্যি সত্যি না ঘটা পর্যন্ত কেউ আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে সাহস করলো না। সন্ধ্যা হতেই অহেতুক চেঁচিয়ে আর বেসুরো গান করে এক সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

অঘটন কিন্তু সত্যি ঘটলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে, অজস্র রোদে চারদিক ঝলমল করছে! মুহূর্তে যেন রাতের কুয়াসা কেটে গিয়ে সকলেরই মন আনন্দে ঝিলমিল করে উঠলো।

এক লাফে উঠোনে নেমে শ্যামল বলে উঠলো: 'শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে—'

হুংকার দিয়ে উঠলো দেবীপ্রসাদ: হয়েছে, আর অতিথিকে ডাকতে হবে না। রাতের বেলায় যদি তিনি এসে হাজির হন তাহলে তো আবার বাবুদের দাঁত-কপাটি লেগে যাবে। যতো সব!

চায়ের পাট সারা করে শ্যামল বললো: আমি ভাই একটু বেরোলাম।

: কোথায় যাবে?

: যাবো একবার বাহান্ন বিঘের ওদিকে। শুনেছি ওখানে অনেক লোকের বসতি। দেখি যদি একটা ক্রিকেট ক্লাবের পাণ্ডা পাওয়া যায়। এমন 'ওয়েদারে' ক্রিকেট না হলে কি জমে?

মনীষ বললো: হ্যাঁ তাই যাও। আসবার পথে বরং স্টেশনের কাছ থেকে আমাদের জমবার একটু ব্যবস্থা করে এসো।

জুতোটা ঝাড়তে ঝাড়তে শ্যামল মুখ তুললো: মানে?

: মানে—কিছু রসগোল্লা নিয়ে এসো।

: সে দেখা যাবে। বলে গলার কলারটা তুলতে তুলতে লপেটা ফটফটিয়ে শ্যামল চলে গেলো। ওরা সবাই আর এক প্রস্থ চায়ের অর্ডার দিয়ে বারান্দায় জমায়েত হয়ে বসলো।

খানিক পরেই ফিরে এলো শ্যামল। গেটের কাছ থেকেই চেঁচিয়ে উঠলো: ইউরেকা! ইউরেকা!

কি ব্যাপার? সবাই সকৌতূহলে তাকালো।

সুকোমল ফোঁড়ন দিলো: কি বাবা, এরি মধ্যে জমে আবার গলে গেলে?

শ্যামল অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললো: জমবার ব্যবস্থা করে এলাম। আরে বাবা, এ মরুভূমিতেও ওয়েসিস আছে?

: তার মানে?

: মানে ক্রিকেট।

: ওঃ তাই বলো।

ওয়েসিসের কথা শুনে একটা রোমান্সের আশায় মুহূর্ত আগে সকলের চোখেমুখে যে আলোটা জুলজুল করে উঠেছিলো, ক্রিকেটের কথায় তা দপ্ করে নিভে গেলো। ধুত্তোর ক্রিকেট।

সুকোমল ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো: ঢাকার সহরে আগুন লাগে, দিল্লী হলো আলো। আরে বাবা, থাকবে তো দশদিন মাত্র কুসমায়, তাতে বাহান্ন বিঘের ক্রিকেটে আমাদের কি ফয়দা বলো তো?

শ্যামল বললো: সব না শুনেই তুমি অকারণে চটছ সুকোমল। আরে বাবা, বাহান্ন বিঘের, কুসমায়।

: কুসমায়: গুল মারবার আর জায়গা পেলে না? সারা অঞ্চলে একটা লোকের সাড়া নেই আর ক্রিকেট। এ কি ভুতুড়ে ক্লাব যে রাতারাতি গজিয়ে পড়লো?

: ভুতুড়ে নয়, জ্যান্ত। শোন বলছি।

গরম গরম আলু ভাজা কয়েকখান মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে শ্যামল বললো: এখান থেকে ষ্টেশনে যেতে রাস্তার ওই বাঁকটার আগে ডাইনে মস্ত বড় একটা মাঠ আছে দেখেছ তো তোমরা? সেই মাঠটা পেরিয়ে পুব দিকে বেশখানিকটা দূরে হলদে রঙের একটা বাড়ি দেখেছিলে কাল মনে পড়ে? সেই বাড়িতে লোক আছে?

: সত্যি ? অমলেশের গলায় উৎসাহ। ওর [illegible]কাতের ভয়টা বোধ হয় কমলো একটু।

: শুধু লোক নয়, ক্রিকেটের সরঞ্জামও আছে।

দেবীপ্রসাদ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো : কি করে জানলে তুমি ? তোমায় কি নেমন্তন্ন করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলো ?

শ্যামল একটু বিরক্ত হলো : এই দেখো, তোমরা আমার কথাই বিশ্বাস করছ না। আগে শোনই না ছাই। যেতে যেতে হঠাৎ চোখ পড়লো বাড়িটার দিকে। বেশ দূর তো বাড়িটা, তবু মনে হলো বাড়ির সামনে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কৌতূহল হলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। দেখি, চাইতে না চাইতেই জল। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে ক্রিকেট খেলছে।

অমলেশ সোৎসাহে বলে উঠলো : বলো কি শ্যামল, একেবারে খেল্‌ছে ?

: বিশ্বাস না হয় চলো আমার সংগে। এই দেখো না আমার হাতে এখনো ময়লা লেগে রয়েছে। কয়েক ওভার খেলে এলাম যে ওদের সংগে।

সুকোমল হেসে বলে উঠলো : থ্রি চিয়ার্স ফর ক্রিকেট ‘ব্লু’ শ্যামল চৌধুরী, হিপ্‌ হিপ্‌……

সবাই এক সংগে যোগ দিলো : হুর্‌রে—

* * * *

সত্যি ওয়েসিসের দেখা মিললো। ওয়েসিসই বা বলি কেন ? কয়েকদিনের মধ্যে গোটা মধুপুরই ওদের কাছে সুজল সুফল শস্য শ্যামল হয়ে উঠলো বুঝি। মরুভূমি হলো মধুপুরী।

তাই বলে ভেবো না যেন ওদের দলের সবাই ক্রিকেট খেলা নিয়ে মেতে উঠলো। মাতামাতি যা একটু সে [illegible]মলের। খেলতেও ওই যা একটু-আধটু পারে। আর [illegible]াই দায় পড়ে রায়মশায়। ক্রিকেট না খেললে সময় [illegible]টবে কি করে ?

তাছাড়া এ কি ক্রিকেট খেলা ? গোটা চারেক বারো-[illegible] বছরের ছেলে আর একটা ছোকরা চাকর, চারটে [illegible]ম্প, একটা ব্যাট আর একটা বল। তার সংগে যোগ [illegible]লো শ্যামলদের দল। ব্যাস্‌, সুরু হলো পেটাপিটি।

এমনি একদিন গেলো। দুদিন গেলো। তিন দিনের দিন—

আনাড়ি হাতে ব্যাট ধরতে যেয়ে হাতে বল লেগে আঙুল থেঁতলে অমলেশ খেলায় ইস্তফা দিয়ে বসে ছিলো মাঠের বাইরে। এমন সময় হলদে বাড়ির বুড়ো মালী এসে বললো : বাবু, মাইজি আপনাকে ডাকছে।

চমকে উঠলো অমলেশ : কে ডাকছে ?

: মাইজি। হুই যে—

আঙুল তুলে দেখালো বুড়ো মালী। অমলেশ চোখ তুলে দেখলো, হলদে বাড়ির ছাদ থেকে একটি মহিলা হাত ইসারায় ওকেই ডাকছে।

অমলেশের বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। মফস্বলের ছেলে। কলকাতার হাওয়া এখনো ভালো করে গায়ে লাগে নি। নিকট আত্মীয়া ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের সংগে আলাপ-পরিচয়ের কখনো সুযোগ ঘটে নি। এ হেন অমলেশকে ডাকছেন এক অপরিচিতা মহিলা, ছাদের উপর থেকে, হাতের ইসারায়—

অমলেশ প্রমাদ গুণলো।

মালী আবার ডাকলো : আসুন বাবু—

অগত্যা তার পিছু পিছু এগিয়ে চললো অমলেশ। ঢুকলো হলদে বাড়িতে।

বাইরের ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মহিলাটি। তাঁকে দেখে সিঁড়ির কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অমলেশ।

মহিলাটি বললেন : লজ্জা কি ? ঘরে এসো।

চোখ তুলে চাইলো অমলেশ। কী মিষ্টি গলা। পা বাড়ালো।

মিষ্টি গলায় আবার কথা ফুটলো : সবাই খেলছে। তুমি চুপ করে বসে ছিলে কেন ?

: আজ্ঞে—এই—বলটা হাতে লেগে—

আঁতকে উঠলেন ভদ্রমহিলা : কি হলো, কেটে গেছে না কি ?

: আজ্ঞে না, ঠিক কাটে নি, তবে—

: দেখি—দেখি—

হাতটা তুলে ধরলেন। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের মাথাটা বেশ থেঁতলে গেছে।

: ইস্, এ যে একেবারে থেঁতলে গেছে। এখনো রক্ত লেগে রয়েছে। কতোক্ষণ কেটেছে? কী দস্যি ছেলে বাপু, একটু ওষুধও লাগাও নি এতক্ষণ? ওরে সীতারাম, বাবুর ঘর থেকে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে আয়তো জলদি।

বিব্রত হয়ে পড়লো অমলেশ: না না, ও সব কিছু করতে হবে না। বাসায় আয়োডিন আছে। আমি এখুনি যেয়ে লাগিয়ে দেব।

: সে যা লাগাবে তাতো দেখতেই পাচ্ছি। ধমক দিয়ে উঠলেন মহিলা।

বাক্স নিয়ে সীতারাম ঘরে ঢুকলো। ভ্যাবাচেকা খেয়ে অমলেশ চুপচাপ বসে রইলো। মহিলাটি সযত্নে ওষুধপত্র লাগিয়ে আঙুলটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। বললেন: কাল সকালে আবার আসবে। খুলে দেখে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

সুবোধ ছেলের মতো অমলেশ ঘাড় নাড়লো।

* * *

ব্যাণ্ডেজ-করা আঙুল নিয়ে অমলেশ মাঠে ফিরলো এবং সেখান থেকে সদলে ফিরলো বাসায়। তারপরই সুরু হলো কুরুক্ষেত্র। প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণ। একেবারে সপ্তরথীর মার। বেচারি অমলেশ! ব্যূহে প্রবেশ করেছিলো কেমন করে তা ও জানে না। নিস্ক্রমনের পথ ততোধিক অজ্ঞাত। ওর জীবনের তূনীর থেকে একটা বাণও নিক্ষেপ করতে পারলো না। ফ্যাল ফ্যাল চোখে শুধু হজম করতে লাগলো একটার পর একটা প্রশ্ন-বাণ।

: কোথায় গিয়েছিলে চাঁদ?

: কোন্ ওয়েসিসের টানে?

: জগৎসিংহের রক্তাক্ত আঙুলে এ কার হাতের সুনিপুণ ব্যাণ্ডেজ?

সবাইকে ধমকে চুপ করিয়ে দেবীপ্রসাদ বললো: ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো ব্রাদার? কেমন যেন একটু রোমান্সের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, মানে—

বাধা দিলো অমলেশ: তোমরা ভুল করছ দেবীদা। একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে—

টিপ্পনি কাটলো সুকোমল: ওঃ বাবা, এযে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! ভদ্র মহিলার প্রতি দরদ যে বেজায়।

হঠাৎ রেগে উঠলো অমলেশ: হবেই তো দরদ। আঙুলের ব্যথায় মাঠের বাইরে আমি ছট্‌ফট্ করছিলাম, এসেছিলে তোমরা কেউ কাছে?

শ্যামল বললো: আহা-হা, রাগ করছ কেন? আরে বাবা, আমরা যাইনি এতো ভালোই হয়েছে। আমরা গেলে বড় জোর কাপড়ের আচলা ছিঁড়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতাম। তাহলে কোথায় পেতে এই অনুরোধের রাখী?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

ক্ষেপে গেলো অমলেশ: কি হচ্ছে সব যা তা। ভদ্রমহিলা আমার মায়ের বয়সী, তাকে নিয়ে—

বাধা দিলো দেবীপ্রসাদ: তুমি একটা ইডিয়ট অমলেশ।

: তার মানে?

: ইডিয়ট মানে জানো না? গর্দভ। সাদা বাংলায় যাকে বলে গাধা। তুমি একটি আস্ত গাধা।

: তার মানে?

: মানে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু। আরে গাধা, আমরা সব তোমার বন্ধু। আমাদের সংগে তোমার এক বছরের পরিচয়। আর আমাদের চেয়ে ওই এক মিনিটের দেখা ভদ্রমহিলা তোমার বেশি আপনার হলো? তাঁর পক্ষ নিয়ে তুমি আমাদের সংগে ঝগড়া করতে বসলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

দেবীপ্রসাদের ভর্ৎসনায় লজ্জা পেলো অমলেশ। তবু আমতা আমতা করে বললো: তাই বলে একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে—

: আবার! আরে ব্রাদার, ভদ্রমহিলা বলেই তো এতো কথা। মহিলা না হয়ে কোন ভদ্রমহল হলে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার একটুকরো ব্যাণ্ডাজ তো দূরের কথা এক থান মুর্শিদাবাদী সিল্ক দিয়ে তোমাকে আগাপাস্তলা মু[illegible] দিলেই বা কে কি বলতে যেতো? আসলে ব্যাপার কি জানো, মধুপুর এসে আমরা তো মরুভূমিতে পড়েছি। সবারই প্রাণটা খাঁ খাঁ করছে। এরি মধ্যে তোমার ও[illegible] ভদ্রমহিলা এলেন দখিনা বাতাসের ইসারা নিয়ে। সবারই মনের আকাশে একটু বা মেঘোদয় হলো। ব্রাদা[illegible] সাহিত্য নিয়ে পোস্টগ্রাজুয়েটে পড়ো আর এটুকু বোঝ [illegible]

...যে এর সবটুকুই ঠাট্টা—স্রেফ্ ইয়ার্কি। তোমার ওই ফাঁটা ...ঙুলকে নিয়ে একটু রসসৃষ্টির চেষ্টামাত্র।

হাত কচলাতে কচলাতে অমলেশ বললো: তাই বুঝি? তাই বুঝি? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

সুকোমল মুখ ভ্যাংচালো: বুঝতে তুমি পারবেও না। কুড়ি বছরের খোকা!

একটু পরে অমলেশ দেবীপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলো: আমি যে একটা মুস্কিলে পড়েছি দেবীদা, কি হবে?

: কিসের কি হবে?

: আমাকে যে ব্যাণ্ডেজ দেখাতে কাল সকালে আবার যেতে বলেছেন।

দেবীপ্রসাদ দুই চোখ মুদ্রিত করে নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললো: যেতে বলেছেন যাবে। সকালে যাবে, দুপুরে যাবে, সন্ধ্যায় যাবে, একশো বার যাবে।

সুকোমল গলায় গিটকিরি তুললো: জয়যাত্রায় যাও গো—

অন্য সবাই কোরাসে যোগ দিলো: ওঠো ওঠো জয়রথে তব।

অমলেশ চোখ-মুখ বেগ্নি করে বলে উঠলো: ধোত্!

পরদিন সকালে পাটভাঙা জামা-কাপড় পড়ে হলদে বাড়িতে যাবার জন্য পা বাড়ালো অমলেশ।

দেবীপ্রসাদ বললো: গুড্লাক ব্রাদার। আজ কিন্তু খালি হাতে এলে চলবে না। গুষ্টিগোত্তরের খবর নিয়ে আসা চাই।

কোন জবাব না দিয়ে হন হন করে চলে গেলো অমলেশ। আর ফিরলো ঘণ্টা দুই পরে। গেটের কাছ থেকেই চেঁচিয়ে বললো: গুড নিউজ দেবীদা, ভেরি গুড নিউজ।

: ব্যাপার কি ব্রাদার? মুখে যে ইংরেজির একেবারে ...ফুটছে?

অমলেশ ততক্ষণ সটান বসে পড়েছে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা একবার মুছলো ভালো করে। তারপর বললো: মিঃ হালদার এসেছেন আজ সকালের ট্রেনে। ভারি ভালো লোক।

মনীষ বলে উঠলো: উই আর নট ইন্টারেষ্টেড ইন মিঃ হালদার। মিসেস হালদারের খবর কি তাই বলো।

: খবর ভালো। এখুনি দূত আসছে তোমাদের জন্যে।

সুকোমল বললো: আমাদের জন্যে মানে? আমরা তো এখানে ইতরে জনা:।

অমলেশ হেসে বললো: সেই জন্যেই তো তোমাদের মিষ্টান্নের ব্যবস্থা হয়েছে। নেমন্তন্ন করবার জন্যে লোক এলো বলে।

উল্লাসে ওর পিঠে একটা থাপ্পর লাগিয়ে মনীষ বলে উঠলো: ব্র্যাভো অমলেশ, ব্র্যাভো! এ না হলে কি আর সাহিত্যে অনার্স হয়।

দেবীপ্রসাদ নাটকীয় ভংগিতে হাত জোড় করে বললো: হে বিজয়ী বীর, ক্ষমা করো মোর অপরাধ। ইডিয়ট নহ তুমি কভু। বুদ্ধিমান কুল সূর্য তুমি, তুমি নরোত্তম।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। অমলেশও।

একটু পরেই এলো দূত। হাতে মিসেস্ হালদারের চিরকুট। তারপর বিকেলে ক্রিকেটের আগে চা, সন্ধ্যার পরে কুক্কুট মাংস সহযোগে প্রচুর ভোজন, মিঃ ও মিসেস হালদারের অমায়িক ব্যবহার এবং মধুপুর প্রবাসের কয়েকদিনের জন্য চায়ের খোলা নিমন্ত্রণ—এক কথায় মধুপুরের নির্জন মরুভূমির প্রতিটি বালুকায় বাসন্তী ফুলের সমারোহ দেখা দিলো।

কিন্তু ফুলের পাপড়ির আড়ালে যে ছিলো কাল কেউটে, সুযোগ পেলেই যে সে ছোবল দেবে, এ কথা অমলেশ কেমন করে জানবে বলো? কেমন করেই বা জানবে ওর দলের আর সকলে—শ্যামল, সুকোমল, মনীষ, দেবীপ্রসাদরা? কলেজে পড়া ছেলেরা, বিচিত্র এ পৃথিবীর কতটুকুই বা জানে ওরা?

ওদের অবশ্য একটু খটকা-খটকা লাগছিলো কদিন ধরেই। হলদে বাড়িতে এখন অবারিত দ্বার ওদের সকলেরই। যখন-তখন যায়ও সবাই। মিঃ হালদারের সঙ্গে গল্প করে। মিসেস হালদারের হাতের চা খায়। বাচ্চাদের সংগে ক্রিকেট খেলে। তবু ওরা সবাই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে যে অমলেশের উপরেই মিসেস হালদারের টানটা একটু বেশি। চায়ে আর একটু দুধ

লাগবে কিনা সেটা বিশেষ করে ওকেই জিজ্ঞেস করা হয়। নিজের ডিসের এয়ার-কণ্ডিশন করা রসগোল্লাটা ওর ডিসেই চালান হয়। ওর কোনদিন পৌছুতে একটু দেরি হলে কাতর চোখ দুটি যেন বাইরের দরজার গায় আটকে থাকে!

অত্যন্ত বেদনার সংগেই এ পক্ষপাতিত্ব ওরা লক্ষ্য করেছে। এ বিষয়ে ছোটোখাটো টিপ্পনি কাটতেও কসুর করে নি।

শ্যামল বলেছে: আরে বাবা, ওর না হয় আঙুলে একটু লেগেছে। এমন জানলে একলব্যের মতো বুড়ো আঙুলটাই আমি কেটে দিতাম।

: এ কি আঙুলের কম্ম ব্রাদার এ হচ্ছে এই চার আঙুলের জোর।

গম্ভীর গলায় কথা কটি বলেই নিজের চুল-উঠে-যাওয়া কপালে একবার হাত বুলিয়েছে দেবীপ্রসাদ।

চোখ পাকিয়ে সুকোমল বলেছে: খুব টেক্ কেয়ার অমলেশ—খুব টেক্ কেয়ার।

অমলেশ আমতা আমতা করে প্রতিবাদ করেছে: এ তোমাদের অন্যায়। উনি তো সব্বাইকেই—

ওকে থামিয়ে দিয়েছে মনীষ: প্রিন্স, বী ব্রেভ্ মাই বয়। ইউ মাস্ট নো টু কল এ স্পেড এ স্পেড। সত্য কথা স্বীকার করতে তোমার এত আপত্তি কিসের? তোমার প্রতি যদি ভদ্রমহিলার একটু দুর্বলতা এসেই থাকে, তাতে দোষের কি হয়েছে? আরে ভাই, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কোথায় কে ধরা পড়ে তা কে জানে।

বলেই কোমরে হাত দিয়ে বাঈ নাচের ভংগীতে এমন এক পাক ঘুরে গেছে ও যে অমলেশ পর্যন্ত হেসে উঠেছে।

কমেডির সুর কিন্তু ক্রমেই ট্রাজেডির পর্যায়ে উঠতে লাগলো।

সেদিন বিকালে ওরা সবাই বেড়াতে গেলো স্টেশনের দিকে। গরজটা সুকোমলের। 'ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলি' বেরিয়েছে। অবশ্য কিনতে হবে। অমলেশ একটু গাই-গুঁই করেছিলো। কিন্তু দলছাড়া হতে সাহস করে নি।

সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরে এসে দেখে হলদে বাড়ির দূত বসে আছে। হাতে মিসেস হালদারের চিরকুট।

কি ব্যাপার? নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ। কিন্তু একা অমলেশের। আর সবাই নট্।

চিরকুট পড়ে ঘাবড়ে গেলো অমলেশ। বললো: কি করব দেবীদা?

: কি আবার করবে? নিমন্ত্রণ করেছেন যাবে। ভদ্রমহিলা আশা করে আছেন—

কথা বললো দূত: বিকেল বেলা থেকেই মা আপনাদের জন্যে বাইরে বসে ছিলেন। ভেবেছিলেন, মুখেই আপনাকে বলবেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যখন আপনারা কেউ গেলেন না তখন আমাকে এই চিঠি দিয়ে পাঠালেন। আপনাকে যেতেই হবে বাবু।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এখন যাও। মিসেস হালদারকে বলো, বাবু একটু পরেই যাবেন।

দূত চলে গেলো।

সুকোমল ফোঁড়ন কাটলো: যাও হে নটবর, পীতবসন পরো, শিরে শিখিপাখা লাগাও—

ধমকে উঠলো দেবীপ্রসাদ: তুমি থামো সুকোমল। সব সময় ইয়ার্কি-ফাজলামি ভালো লাগে না।

কি ছিলো দেবীপ্রসাদের গলায়। সুকোমল হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আর কারো মুখ দিয়েও কথা বের হলো না। কালি-পড়া লণ্ঠনের আবছা আলোয় ঘরের ভিতরটা কেমন থম্ থম্ করতে লাগলো।

অমলেশ মনে করলো, নিমন্ত্রণ না পেয়ে দেবীপ্রসাদ রেগে গেছে। মনে মনে একটু হেসে সেজেগুজে সে বেরিয়ে গেলো শিস দিতে দিতে। দেবীপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে এ নিয়ে কেউ কোনরকম উচ্চবাচ্য করতে সাহস করলো না।

* * *

রাতে আহারাদি সেরে ওরা সবাই বারান্দায় বসে গল্পগুজব করছে। এ-কথা সে-কথার পর ঘুরে ফিরে অমলেশের প্রসংগই উঠে পড়েছে।

সুকোমল শুধালো: আচ্ছা দেবীদা, তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে পড়লে কেন বলো তো?

দেবীপ্রসাদ বললো: দেখো সুকোমল, অমলেশকে নিয়ে অনেক মুখরোচক আলোচনা আমরা করেছি। ঠাট্টা করেই করেছি। কিন্তু আজ ওকে এমন ভাবে আলাদা

করে নেমন্তন্ন করাটা আমার কাছে কেমন ভালো ঠেকছে না। সাধারণ ভব্যতায় যেন কোথায় আটকাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

এমন সময় হন্ হন্ করে গেট পার হয়ে এলো অমলেশ।

চাঁদের আলোয় তার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো সবাই। কি হয়েছে অমলেশের? মাথার চুল এলোমেলো। চোখ দুটো জ্বলছে। থর্ থর্ করে কাঁপছে সারা শরীর। বোধ হয় ছুটতে ছুটতে এসেছে সারাটা পথ। এখনো হাঁপাচ্ছে।

দেবীপ্রসাদ প্রশ্ন করলো: কি হয়েছে অমলেশ? এমন করছ কেন?

কথা বলতে যেয়েও কোন কিছু বলতে পারলো না অমলেশ। থপ করে বসে পড়লো সেখানেই।

: কি হয়েছে অমলেশ? শিগগির বলো।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো অমলেশ: কি হবে দেবীদা? বাবা জানতে পারলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাবে অতিশয় সংকোচের সংগে একটু একটু করে যে কাহিনী অমলেশ বললো তা শুনে সকলেরই চক্ষু চড়কগাছ: বলো কি অমলেশ? এও কি সম্ভব?

অসম্ভব যে নয় অমলেশের ঝড়ো চেহারাই তো তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

কিন্তু কাহিনীটা কি?

সেই গল্প বলতেই তো বসেছি। এই কাহিনী দিয়েই তো গল্পের সুরু, যে গল্পের কেন্দ্রে আছেন মিসেস হালদার। না না, আমার মুখে নয়, প্রথম পুরুষেই শোনো সে কাহিনী অমলেশের মুখে:

হন্‌দে বাড়িতে ঢুকতেই মিসেস হালদার বলে উঠলেন: কী দুষ্টু ছেলে বাবা তুমি! সারা বিকেল আমি হাঁ করে পথের দিকে চেয়ে আছি।

মুখ নিচু করে বললাম: ওরা সবাই ধরলো তাই স্টেশনের দিকে একটু—

: হয়েছে। এখন খেতে চলো। রান্নাবান্নাগুলো এতোক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেলো কিনা কে জানে।

রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন: সেই কোন্ বিকেলে রান্না হয়েছে। খেয়েদেয়ে উনি কলকাতা চলে গেলেন—

আমি বললাম: মিঃ হালদার তাহলে—

: জরুরী চিঠি পেয়ে উনি সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতা গেছেন। ওকি? তুমি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালে কেন?

কি ভেবে ফিক করে হেসে বললেন: বোকা ছেলে কোথাকার!

বসলাম খেতে। পরিপাটি আয়োজন। ততোধিক পরিপাটি খাওয়ানোর আয়োজন। পাশে বসে এটা খাও ওটা খাও বলে কতো যত্ন। তোমরা বিশ্বাস করো দেবীদা, খেতে খেতে হঠাৎ আমার মার কথা মনে পড়ে গেলো। উঃ, তখন কি জানি এতো সব! তারপর শোনো। মার কথা মনে হতেই আমার কেমন কান্না পেতে লাগলো। যখন ফোর্থক্লাসে পড়ি তখন মা মারা যান। তারপর থেকে এতো আদর যত্ন করে আমাকে কেউ তো খাওয়ায় নি। ভাবতেই চোখে জল এসে গেলো। গলা আটকে গেলো। ভাত আর নামতে চায় না গলা দিয়ে। হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। আমার অবস্থা দেখে—তোমাদের কি বলব—মিসেস হালদার করলেন কি, পাতের ঘি-ভাত নিজের হাতে মাখিয়ে দলা করে আমার মুখে তুলে ধরলেন। বিস্ময়ের একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেলো আমার সারা শরীরে। ভালোও লাগলো। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক চেয়ে রইলাম মিসেস্ হালদারের মুখের দিকে। তারপর গপ গপ করে গিলতে লাগলাম দলা-মাখানো ঘি-ভাত।

ও কি? গল্প শুনতে শুনতে তোমরা হাসছ? বেচারি অমলেশ! ওর আর দোষ কি বলো? ও অবস্থায় পড়লে তোমারও অমলেশের অবস্থাই হতো। কিন্তু সে যা হয় হতো, আগে অমলেশের কাহিনীটা শেষ করতে দাও।

খাওয়া শেষ হলে মিসেস হালদার আমার হাত ধরে উপরের ঘরে নিয়ে বসালেন। মিষ্টি মশলা খেতে দিলেন। আমার যে তখন কি অবস্থা তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। না পারছি মুখ তুলে চাইতে, না পারছি কোন কথা বলতে। কেমন একটা দুরন্ত ঢেউ যেন ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে বুকের ভিতর থেকে। কি যেন এক দুরন্ত আবেগ।

হঠাৎ এক সময় বলে ফেললাম: আমি তাহলে আসি।

বলেই হাত বাড়িয়ে গেলাম ওকে প্রণাম করতে।

অমনি—তোমাকে কি বলব দেবীদা—অমনি মিসেস হালদার দুই হাত বাড়িয়ে আমাকে সজোরে চেপে ধরলেন বুকের মধ্যে। আমার কানের ভিতর ধাঁধাঁ করে উঠলো। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগলো। সারা শরীর জ্বালা করে উঠলো। চেয়ে দেখি, মিসেস হালদারের দুটি ঠোঁট কাঁপছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে, দুই চোখ যেন জলছে। ভীষণ ভয় হলো। বললাম: আমাকে ছেড়ে দিন—আমাকে—

আরো জোরে আমাকে চেপে ধরে মিসেস হালদার বললেন: না না, তোমাকে আমি ছাড়ব না—

তারপর কেমন করে যে সেই বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, কেমন করে ছুটতে ছুটতে এসেছি এতোটা পথ, সে আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না।

* * *

কাহিনী শুনে সুকোমল বলে উঠলো: কী সাংঘাতিক। একজন ভদ্রমহিলা হয়ে—

বাধা দিলো শ্যামল: আরে বাবা, ভদ্রমহিলা কি না তারি বা ঠিক কি?

: কিন্তু মিঃ হালদার—

স্ফূর্তি করবার জন্যে একটি মিসেস্ হালদার জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন বাজার থেকে। নির্ঘাৎ তাই।

মনীষ বললো: দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভন্ এ্যাণ্ড আর্থ হোরোশিও—

অমরেশ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো: তোমাদের ও সব ফিলসফি এখন রাখো ভাই। বলো এখন আমি কি করি? বাবা যদি একথা জানতে পারেন।

কথাটা আর শেষ করতে পারলো না অমলেশ। আতংকে দুই হাতে চোখ ঢেকে বসে রইলো।

সারা বাড়িটা সূচী-স্তব্ধ। ও-পাশের কুলগাছ থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁর একটানা ডাক।

দেবীপ্রসাদ ঠোঁট খুললো: চলো আমরা কাল ভোরের ট্রেনেই গিরিডি চলে যাই। সেখান থেকে পরেশনাথ দেখে সোজা কলকাতা। আর এমুখো নয়।

* * *

দশ বারো দিন পরে!

সবে ইউনিভার্সিটি খুলেছে।

বিকেলে হোস্টেলের কমন রুমে সবাই ক্যারম বোর্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। ফরটি ডিগ্রি এ্যাংগল্ করে রেডটাকে পকেটিফাই করবার জন্য শ্যামল সবে স্ট্রাইকারে আঙুল ছোঁয়াতে যাবে, এমন সময়—

: হ্যাঁ মশাই, অমলেশবাবু কোন্ ঘরে থাকেন? অমলেশ রায়?

একটি আধা বয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। কাঁচা পাকা চুল। মাঝখানে টেরি। হাতে ছাতা।

অমলেশ সেখানে ছিলো না। মুখ ফিরিয়ে কথা বললো দেবীপ্রসাদ: কোত্থেকে আসছেন আপনি?

ভবানীপুর অঞ্চলের একটা গলির নাম করলেন ভদ্রলোক?

: কি দরকার অমলেশকে?

: আজ্ঞে, একখানা চিঠি ছিলো—

: দিয়ে যান আমাকে। অমলেশকে দিয়ে দেব।

: আজ্ঞে—মা বলে দিয়েছিলেন চিঠিটা অমলেশবাবুর হাতে দিতে, তাই—

কে মা? তবে কি মিসেস্ হালদার? চকিতে মধুপুরের হলদে বাড়ীটা ভেসে উঠলো দেবীপ্রসাদের চোখের সামনে। বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করলো: আপনি কি মিসেস্ হালদারের ওখান থেকে আসছেন?

একগাল হেসে ভদ্রলোক বললেন: হেঁ-হেঁ—তবে তো আপনি চেনা লোক।

প্রায় ধমকে উঠলো দেবীপ্রসাদ: হ্যাঁ, চেনা লোক। চিঠিটা রেখে যান। ভয় নেই, আমরা খেয়ে ফেলব না।

: আজ্ঞে না, তা নয়। তবে কি জানেন, বাবু বলে দিলেন একটা জবাব নিয়ে যেতে, তাই—

: দেখি চিঠিটা।

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে জামার পকেট থেকে বের করে একখানি খাম দিলেন। একটানে খামটা ছিঁড়ে দেবীপ্রসাদ পড়লো চিঠি। সবাই তখন ঝুঁকে পড়েছে চিঠির উপর।

মুখ খিঁচিয়ে দেবীপ্রসাদ বললো: নেমন্তন্ন চিঠি। রাত্রে এখানেই খেয়ে যাবে! যতো সব! আপনি এখন যেতে পারেন। মিসেস হালদারকে বলে দেবেন, অমলেশ সে বাড়িতে যাবে না।

: কিন্তু বাবু—

: আঃ, বিরক্ত করবেন না। অমলেশ যাবে না। নাও হে, স্ট্রাইকার বসাও। যতো সব।

ভদ্রলোক তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবীপ্রসাদ বলতে লাগলো: আচ্ছা লোক বটে আপনাদের বাবু। চোখের উপর এমন লীলা-খেলা চলেছে, তবু হুঁস নেই।

সবাই হেসে উঠলো। ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে চলে গেলেন ঘর থেকে।

শ্যামল মুচকি হেসে বললো: আরে বাবা, সবার সেরা টান হলো পরকীয়া টান। এ কি সহজে যায়।

সুকোমল একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো: স্যাডেস্ট—ভেরী স্যাডেস্ট ব্যাপার।

* * *

সত্যি সত্যি 'স্যাডেস্ট' ব্যাপার ঘটলো সেদিনই সন্ধ্যার পরে।

সবে বেড়িয়ে ফিরেছে অমলেশ। শিস্ দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো। সুকোমল বললো: খুব টেক কেয়ার অমলেশ, আবার দূত এসেছিলো।

: আবার দূত এসেছিলো? তুমি সত্যি বলছ?

ঘরে ঢুকলো দেবীপ্রসাদ: হ্যাঁ ব্রাদার, একেবারে নৈশভোজনের নেমন্তন্ন নিয়ে।

: কি হবে দেবীদা? যদি একটা জানাজানি হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত?

: কোন ভয় নেই ব্রাদার, যা রগড়ে দিয়েছি আজ, মাথায় ঘিলু থাকলে আর এদিকে মাড়াবে না। বুঝিয়ে দিয়েছি, এ বড় কঠিন ঠাঁই।

: এ ভেরী হার্ড নাট টু ক্র্যাক, কি বলো? বলতে বলতে ঘরে ঢুকছিলো মনীষ। বাইরে একটা মোটর থামবার আওয়াজ শুনে ফিরে যেয়ে রেলিঙের উপর ঝুঁকে পড়লো। পরক্ষণেই চাপা গলায় বলে উঠলো: শিগগির এসো দেবীদা, টাইগার।

সবাই ঝুঁকে পড়লো রেলিঙের উপর। মোটর থেকে নামছেন মিঃ হালদার। পিছনে বিকেল বেলাকার আধাবয়সী ভদ্রলোক।

এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ওরা। অমলেশের অবস্থা শোচনীয়। এখুনি বুঝি কেঁদে ফেলবে। সুকোমল ফিস ফিস করে বললো: খুব টেক কেয়ার।

হোস্টেলের চাকরই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো উপরে।

ঘরের কাছে এসেই মিঃ হালদার বললেন: এই যে—আপনারা সবাই রয়েছেন। অমলেশবাবুকে যে এখুনি একটিবার যেতে হবে আমার সংগে।

: কোথায়? কড়া গলায় প্রশ্ন করলো দেবীপ্রসাদ?

: আমার বাড়িতে।

: দেখুন মিঃ হালদার, কথাটা আপনাকে খোলাখুলি বলাই ভালো। অমলেশ আপনার বাড়িতে যাবে না।

: যাবে না?

: আজ্ঞে না, যাওয়া উচিত নয়।

: উচিত নয়! আপনি কি বলছেন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

দেবীপ্রসাদ আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। এর একটা হেস্তনেস্ত ও আজ করবেই। গম্ভীর হয়ে বললো: বুঝতে পারা আপনার উচিত ছিলো অনেক আগেই। কিন্তু সে কথা থাক। মোট কথা হলো, অমলেশ যাবে না।

মিঃ হালদার মুখ নিচু করে কি যেন ভাবলেন। চোখ-মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠেছে। হাতের লাঠিটা মেঝেয় বার কয়েক ঠুকে ধীরে ধীরে বললেন: আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, মধুপুর থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ আপনারা চলে এসেছেন। বিকেলে হরিচরণবাবুকেও কড়া কড়া কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের মতো লেখাপড়া আমি জানি না। তাই বলে বয়সটা তো আমার ঘাস খেয়ে বাড়ে নি। আপনাদের রাগের কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। সুযোগ পাই তো আর একদিন তার জবাব দিয়ে যাব। কিন্তু আজ আমি বড় বিপদে পড়েই আপনাদের কাছে এসেছি। নইলে—

কি যেন বলতে যেয়ে থেমে গেলেন মিঃ হালদার। আত্মসংবরণ করে বললেন: দেখুন, আমার স্ত্রীর খুব অসুখ। মধুপুরেই তাঁর হার্টট্রাব্‌লটা হঠাৎ বেড়ে পড়ে। জরুরী তার পেয়ে আমি যেয়ে তাঁকে নিয়ে আসি। সেই থেকেই খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।

মিঃ হালদারের কথায় সবারই মুখ কাঁচুমাচু। কিন্তু

দেবীপ্রসাদ আজ ভাঙবে তবু মচকাবে না। সে বললো : আপনার স্ত্রীর অসুখ তার অমলেশ কি করবে ? ও তো ডাক্তার নয়।

: ডাক্তারের পরামর্শেই আমি ওকে নিতে এসেছি।

: তার মানে ?

: সে অনেক কথা দেবীপ্রসাদবাবু। তবু না শুনে যখন আপনারা ছাড়বেন না তখন শুনুন।

এতোক্ষণ ওদের খেয়ালই ছিলো না যে সেই থেকে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই আছেন। শ্যামল তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এনে দিলো ঘর থেকে। মিঃ হালদার বললেন : থাক থাক, আমি দাঁড়িয়েই বলছি।

...হালদার-দম্পতি নিঃসন্তান। ওদের একমাত্র ছেলে শুভেন্দু ষোল বছর বয়সে মারা গেছে পাঁচ বছর আগে। ছেলের শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে যান মিসেস্ হালদার। তাঁকে নিয়ে নানা স্থানে অনেক ঘুরেছেন তিনি। কালক্রমে পাগলামীর ভাবটা কেটে যায়। কিন্তু শরীর-মন আর সুস্থ হয় না। হার্টটাই 'ড্যামেজ' হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কলকাতার চেয়ে পশ্চিমের জলবায়ুটাই ওঁর 'স্যুট' করে ভালো। তাই বছরের বেশির ভাগ সময় ছোট ছোট ভাই-পো ভাই-ঝিদের সংগে নিয়ে ওঁরা পশ্চিমেই কাটান। বিশেষ করে মধুপুরে। সেখানে ওঁর নিজের বাড়ি আছে।

মিঃ হালদার বলতে লাগলেন : সেই থেকেই আপনাদের বয়সের ছেলেদের দেখলেই কাছে ডাকেন, আদর করেন। তাদের নিমন্ত্রণ করে নিজের হাতে খাওয়াতে ওঁর ভারী সখ। ঠিক যেমন করে শুভেন্দুকে খাওয়াতেন। মধুপুরের নির্জন বাড়িতে আপনাদের কাছে পেয়েও উনি ভারী খুসি হয়েছিলেন। বিশেষ করে অমলেশবাবুকে পেয়ে। উনি নাকি দেখতে ঠিক শুভেন্দুর মতো।

মিঃ হালদারের চোখ ছলছল্ করে উঠলো। ছলছলিয়ে উঠলো ওদের সকলেরই চোখ। কেউ কোন কথা বলতে পারলো না।

ধরা গলায় কথা বললেন মিঃ হালদার : কেন যে হঠাৎ আপনারা মধুপুর থেকে চলে এলেন তা আপনারাই জানেন। তারপর দিন থেকেই ওঁর হার্টের ট্রাবলটা আবার বেড়ে গেলো। সব 'হিষ্ট্রি' শুনে ডাঃ সেন বললেন, ওই ছেলেটি যদি এসে কাছে কাছে থাকে, একটু সেবা যত্ন করে, তবেই এ 'অ্যাটাক'টা উনি সামলাতে পারবেন। তাই তো জোড় হাত করে আপনাদের কাছে এসেছি—

: ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন। আপনি আমাদের পিতৃতুল্য--

বলেই দেবীপ্রসাদ মিঃ হালদারের পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেললো। দেখাদেখি আর সকলেও।

অমলেশ ভয়ে ভয়ে একটু দূরে সরেই ছিলো। বললো : দেবীদা, আমি কি তাহলে—

তাড়া দিয়ে উঠলো দেবীপ্রসাদ : তুমি একটি ইডিয়ট। এখনো জিজ্ঞাসা করছ ? তোমার মা তোমাকে ডেকেছেন, আর তুমি যাবে না ? নিশ্চয় যাবে। একশো বার যাবে। যতো সব।

মুখে হাসি ফুটে উঠলো অমলেশের। এগিয়ে প্রণাম করতে গেলো মিঃ হালদারকে। তিনি দুহাত বাড়িয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

* * *

সেই থেকে হালদার বাড়িতে অমলেশের ছেলের আদর। সেই সংগে ওর দলের সকলেরও। ওকে কাছে পেয়ে মিসেস হালদার যেন নতুন জীবন পেয়েছেন।

তবু অনেকদিন রাতে বিছানায় শুয়ে যখন ঘুম আসে না তখন হঠাৎ মধুপুরের হলদে বাড়ির একটি রাতের কথা অমলেশের মনে পড়ে যায়। আকাশ-পাতাল অনেক ভাবে, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না। সেই রাতে দোতলার নির্জন ঘরে মিসেস্ হালদারের অদ্ভুত আচরণ, তাঁর বিস্ফুরিত অধর, স্ফীত নাশারন্ধ্র, প্রদীপ্ত চোখ, যা দেখে অমলেশ ত্রস্তপদে ছুটে পালিয়েছিলো, সে সবের অর্থ কি ? সে সবই কি অমলেশের দৃষ্টিভ্রম ?

সাজসজ্জায় শালীনতা

অনামিকা দেবী

একবার ইয়োরোপ-যাত্রাকালে জাহাজে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক বিদেশিনী সহযাত্রিণীর যৌবনশ্রীর বহুল পরিমাণ উদ্ঘাটন লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন—'আমাদের মতো বিদেশীর পক্ষে তার এই বে-আব্রু বেয়াদবীটা বোঝা একটু শক্ত।' মরে বেঁচেছেন কবিগুরু। না হলে আজ পথে-ঘাটে তাঁরই স্বদেশীয়াদের প্রায়-অনাবৃত যৌবন-লাবণ্য দর্শন করে তাঁর অবস্থা কী হোতো? হয়তো বা মূক হয়ে যেতেন লজ্জায়—প্রার্থনা জানাতেন—'এবার নীরব করে দাও হে তোমাব মুখর কবিরে।'

সত্যি আজ আমাদের রুচি ও প্রবৃত্তি কতোটা নেবে এসেছে ভেবে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। পরিচ্ছদ ব্যবহারের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হোলো শালীনতা রক্ষা। কিন্তু এই 'শালীনতা' কথাটি আমাদের অভিধান থেকে হয়ে গেছে একদম বয়বাদ। তাই আমাদের জামার গলা নাবতে নাবতে নেমে আসে বুকের মাঝ্ বরাবর, আর ঝুল উঠে যায় কোমরের এক বিঘৎ উপরে। তাই আমাদের শাড়ীর আঁচল যতটা সম্ভব সরু হয়ে বুকের মাঝখান দিয়ে উঠে যায় আর ঝুলতে থাকে পিঠের এক কোন আশ্রয় করে। তার উপর আমরা ব্যবহার করি 'পয়োধর-বিস্তারয়িতৃ'—ফিন্‌ফিনে, গায়ে-লেপটে-থাকা রেশমি ব্লাউজের ভেতর—অসভ্যতাটা যাতে পুরোমাত্রায় হয়।

শুধু কী পোষাক! আজকাল তো ঠোঁটে-গালে-চোখে-মুখে-নখে-সর্ব্বাঙ্গে রঙ মাখাটা ফ্যাশান্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মধ্যে এমন মহিলার সংখ্যাও নেহাত নগণ্য নয়—যাঁরা কেবল লিপ্‌স্টিক্ রঞ্জিত ওষ্ঠাধর নিয়েই সন্তুষ্ট নন,—তাঁরা তার ওপর ব্যবহার করেন [illegible]লী-জাতীয় একরকম পদার্থ (খোদা মালুম কী তার [illegible])।

চিত্রতারকারা এই রকম সাজ-পোষাকের পক্ষে এই যুক্তি দেখাবেন হয়তো যে এটা তাঁদের করতে হয় ব্যবসার খাতিরে—লোক আকর্ষণ করবার জন্য। কিন্তু ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের নিজেদের পক্ষে কী যুক্তি আছে? দিদিমা-মা-মেয়ে সকলেরই এই একই রকমের সাজ। এখানে নেই কোনও বয়সের প্রশ্ন—নেই শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধনের কোনও প্রভেদ। একেবারে পুরোপুরি 'কমিউনিজম্'। এমন কি এক পুরুষ আগেও যে পরিবার ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল ও গোঁড়া—আজ তাঁদের বৌ-ঝিরাও এই সাজে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন অম্লানবদনে।

এই রকম সাজে কেউ যখন ট্রামে-বাসে ওঠেন—আর ট্রাম-বাস ভর্তি লোক 'উপোষিতাভ্যাম্ ইব লোচনাভ্যাম্' তাঁদের দেহমাধুরী লেহন করতে থাকে—তখন আমাদের মতো যে কয়টি মুষ্টিমেয় সেখানে উপস্থিত থাকে তাদের 'মা ধরিত্রী দ্বিধা হও' বলা ছাড়া 'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'।

আমি একথা বলছি না যে আধুনিকারা প্রাচীনাদের মত কাপড়-গয়নার পুঁটুলী হয়ে আবক্ষ ঘোমটাটেনে রাস্তায় চলতে গিয়ে হোঁচট খান। কিন্তু শালীনতা রক্ষা করেও 'স্মার্ট' হওয়া যায়। পাশ্চাত্য অনুকরণে 'পয়োধর বিস্তারয়িতৃ'টির অশোভন ব্যবহার না করলেও সৌন্দর্যের কোনও হানি হয় না। কৃত্রিম রঙে সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করলেই যে সৌন্দর্য বেড়ে যাবে এমন ধারণা আমাদের কোথা থেকে হোল? আমাদের ব্লাউজের হ্রস্বতা লক্ষ্য করে সরকারী চাকুরী প্রার্থিনীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—পোষাক যেন 'অফ্ এ্যাডিকোয়েট্ লেংথ' হয়। তবু আমাদের লজ্জা হয় না।

আমরা কী এতই হেয়? পুরুষের চোখে নিজেকে লোভনীয় করে তোলাই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? এইভাবে সাজ-পোষাক করে আমরা লোকচক্ষে নিজেদের কতটা হীন করে তুলছি সেইটুকু [illegible] শক্তিও কি

আমাদের নেই ? পুরুষের লালসায় ইন্ধন যোগানোই কি আমাদের নারী-জীবনের চরম সার্থকতা ? কে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে ? গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি আমরা—দু'দণ্ড যে দাঁড়িয়ে ভাববো তার সময় আমাদের কোথায় ? আজকাল নারীহরণ ও ধর্ষণের সংখ্যা যে দিন দিন বেড়ে চলেছে আমরাই কি তাতে পরোক্ষভাবে উস্কানী দিচ্ছি না ?

অতীত যুগে যখন নারীসমাজ অশিক্ষা ও অজ্ঞানের অন্ধকারে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত ছিলেন তখন কোনও কিছু না বুঝে অন্ধভাবে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা। আজ যখন আমরা জ্ঞানের আলো দেখতে পেয়েছি তখন আমাদের পক্ষে এই রকম আচরণ নিতান্তই গর্হিত নয় কি ? একথা আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

—

ঠাকুরমার টোট্‌কা

শ্রীমতী ইরা ভট্টাচার্য্য

এবার ঠাকুরমার ঝুলি থেকে যে সব মুষ্টিযোগ সংগ্রহ করেছি, নিম্নে সেগুলি দিলাম।

বন্ধ্যারোগে—আলকুসীর শিকড় ও কয়েতবেলের শাঁস গো-দুগ্ধের সঙ্গে পিষে নিয়ে পান কর্‌লে বন্ধ্যাত্ব দূর হয় এবং পুত্রবতী হওয়া যায়।

অশ্বগন্ধার কষায় দুগ্ধের সঙ্গে সিদ্ধ করে তা'তে গাওয়া-ঘি দিয়ে ঋতুস্নাতা নারীকে সকালবেলায় খাওয়ালে, বাধকের দোষ দূর হয় এবং সেই নারীর গর্ভধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

জন্মনিয়ন্ত্রণে—বহু নারী অনবরত প্রসব করে রুগ্ন হ'য়ে পড়েন, শেষ পর্য্যন্ত সম্যক্‌ভাবে সন্তান পালন কর্‌তে অক্ষম হয়ে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়ে থাকেন। ঠাকুরমার প্রদত্ত এই মুষ্টিযোগ ব্যবহার কর্‌লে আর সন্তান হবে না। ঋতুকালে পিপুল, বিড়ঙ্গ ও সোহাগার খই একত্র চূর্ণ ক'রে সমপরিমাণে দুধের সঙ্গে পান কর্‌লে কখনই গর্ভসঞ্চার হবে না।

ঋতুকালে জবাফুল কাঁজিতে বেটে তিন দিন খাওয়াবার সময়ে আটতোলা পুরাতন গুড় খেলে গর্ভ হয় না।

সর্পদংশনে—কেঁচোর গায়ে একরকমের লালার মত পদার্থ থাকে। সর্পাঘাতের রোগীকে কয়েক ফোঁটা খাইয়ে দিলে বিষ নষ্ট হয় আর রোগী আরোগ্য লাভ করে। ঈষার মূলের তিনটী পাতা দশটি গোলমরিচের সঙ্গে বেটে খাওয়ালে এবং ক্ষতস্থানে পাতার রস দিয়ে মালিশ কর্‌লে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

ক্ষয় রোগে—কাঁচা রশুন দুই এক কোয়া চিবিয়ে খেলে উপকার হয়। পরিষ্কার আবরণ-বিশিষ্ট কড়ায় দু'ঘণ্টাকাল ধরে দুধের সঙ্গে কয়েক কোয়া রশুন থেঁতো করে দিয়ে সিদ্ধ করে সেই দুধ পান কর্‌লে উপকার হয়। কণ্ঠনালীর ক্ষয় রোগে রশুন খাওয়া খুব ভালো। রশুনের মধ্যে ক্ষয়রোগের বীজাণুর সংহারিণী শক্তি আছে।

মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি—ওট্‌মিল চূর্ণ আর টাট্‌কা মধু একত্র করে মাখ্‌লে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। রাত্রে শোবার সময় গায়ে ও মুখে দধি মাখ্‌লে রং ফুটে রূপ খুল্‌তে পারে।

ক্ষতস্থানে—যষ্টিমধু ও তিল পেষণ করে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে দূষিত মাংস দূর হ'য়ে ক্ষতস্থান পূর্ণ হয়।

কাঁটানটের মূল অল্প আদার সঙ্গে বেটে ক্ষতস্থানে পটি দিলে পচা মাংস দূর করে যাবতীয় ঘা আরোগ্য করে।

নিমপাতা ও তিল বেটে মধুর সঙ্গে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

পুরাতন চর্ম্ম কান ও বাতরোগে—দেহের উপর চালমুগরার তৈল মালিস কর্‌লে খুব উপকার হয়।

দাঁতের পোকায়—রশুন অগ্নিতে উত্তপ্ত করে দাঁতে লাগালে দাঁতের পোকা ও যন্ত্রণা দূর হয়।

বসন্তরোগের প্রতিষেধক—প্রাতঃকালে খালি পেটে উচ্ছে পাতার রস ৵৹ কাঁচ্চা ও কাঁচা হলুদের রস এক কাঁচ্চা একসঙ্গে মিশিয়ে ঈষদুষ্ণ করে ৭ দিন পান কর্‌লে এক বছরের মধ্যে কোন রকমের বসন্ত হবে না।

চোখের ছানি রোগে—শ্বেত অপরাজিতার পাতার রস দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখের ওপর যতটুকু ধরে, প্রতিদিন একবার করে দিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিলে

ছানি ভালো হয়। ধৈর্য্য অবলম্বন করে কিছুকাল এম্নি ভাবে দিয়ে চল্‌লে ছানি কাটাতে হবে না, টোট্‌কার দ্বারাই সেরে যাবে।

মায়ের দুধ না টান্‌লে—হরিতকী আমলকী চূর্ণ সমভাগে নিয়ে তার সঙ্গে খুব অল্প গাওয়া-ঘি ও মধু মিশিয়ে শিশুর জিভে মাখিয়ে দিলে, যে শিশু মায়ের দুধ না টেনে অনবরত কাঁদতে থাকে, এই ওষুধে সেই শিশু সুস্থ হয়ে মায়ের দুধ টেনে খাবে।

মুখের ব্রণ—মসুর ডাল ও কর্পূর একসঙ্গে পিষে মুখে মাখ্‌লে পনরো দিনের মধ্যে মুখের দুর্গন্ধ ও মুখজাত ব্রণ নষ্ট হয়।

শিমূল গাছের কাঁটা দুধের সঙ্গে পিষে মুখে লেপন কর্‌লে তিন দিনের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষের গণ্ডস্থলজাত ব্রণ নষ্ট হবে।

শারীরিক সৌন্দর্য্য ও সুস্থতার জন্য—শরীরকে সুস্থ আর বলিষ্ঠ রাখবার জন্যে প্রাতে ও শয়নের পূর্ব্বে এক গেলাস জল পান কর্‌লে শরীর খুবই সুস্থ থাকে। যাদের অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, তাঁদের এবং দোষযুক্ত যকৃত রোগীদের এভাবে জলপান কর্‌লে মহৎ উপকার হয়।

প্রতিদিন ভোজনের প্রথমে গাওয়া ঘি, আর তার পর শুক্তো খেলে সহজে ডাক্তার ডাকতে হয় না। ঘৃতকুমারীর মূল দুধের সঙ্গে প্রত্যহ একত্র করে খেলে বলবৃদ্ধি, শরীরের পোষণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।

তোব্‌ড়া গালে—বয়স হোলেই গাল তুব্‌ড়ে মুখশ্রী নষ্ট করে। একটি সহজ উপায়ে এই রকম তোব্‌ড়া গাল আবার যৌবনের মত নিটোল ও সুগোল করা যেতে পারে। রোজ ঠাণ্ডা জলে মুখখানাকে ভিজিয়ে টার্কিস তোয়ালে দিয়ে (যার সুতোগুলি কুঁক্‌ড়ে থাকে তাকে টার্কিস তোয়ালে বলে) মুখের যেখানে যেখানে ভাঁজ পড়েছে বা তুব্‌ড়ে গেছে, সেই সব জায়গায় একটু গভীর ভাবে চেপে চেপে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ ঘর্ষণ কর্‌তে হবে, তা হোলেই সেই সব জায়গায় মাংসপেশীতে রক্ত চলাচল হয়ে স্থানটা আবার পুষ্ট হয়ে উঠ্‌বে।

উত্তম দৃষ্টি লাভে—যে পর্য্যন্ত চোখ থেকে জল না পড়ে সে পর্য্যন্ত চোখের পলক না ফেলে ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মধ্যস্থলের মত সূক্ষ্মবস্তুর দিকে চেয়ে থাক্‌তে হবে। এরই নাম তাটক যোগ। এই যোগ অভ্যাস কর্‌লে চোখের অসুখ হবে না, আর উত্তম দৃষ্টিলাভ হবে।

শ্লেষ্মা জ্বরে—গরুর দুধ চিনির সঙ্গে খেলে শ্লেষ্মা জ্বরে উপকার হয়।

মেদ প্রতীকার—ক্ষিরাইয়ের মূল বেটে আদার সঙ্গে নিত্য খেলে মেদ বৃদ্ধি রোগ সেরে যায়। যে সব নারীর শরীরে প্রচুর চর্ব্বি হয়েছে তাঁদের পক্ষে এটা ব্যবহার করা দরকার।

বায়ু বৃদ্ধিতে—চাউলের জল চিনির সঙ্গে পান কর্‌লে বাই হওয়া দূর হয়।

উন্মাদ প্রতীকার—শুঁঠ, পিপুল ও দেবদারু চূর্ণ করে গরম জলের সঙ্গে খাওয়ালে পাগল ভালো হয়ে যায়।

চীন দেশের রান্না

মিষ্টি ও টক্ মুরগী

উপকরণ—মুরগীর মাংস ১ সের, ঘি বড় চামচের ৩ চামচ, ছোট চামচের ১ চামচ করে নুন ও মরিচ, ২টি পেঁয়াজ, গাজর ২টি, রশুন ১টি, বড় চামচের ২ চামচ পার্স্‌লি পাতা কুঁচনো, (অথবা ধোনে পাতাও ব্যবহার করতে পারেন), টোমাটো কেচাপ (Tomato Ketchup), ১ কাপ অথবা টোমাটো সস্, জল ১ কাপ বা আরও বেশী, বড় চামচের ১ চামচ ভিনিগার, ছোটো চামচের ২ চামচ চিনি ও ২টি তেজপাতা।

প্রণালী—মুরগীর মাংস বেশ পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন্। ঘি গরম করে, তাতে মাংস, নুন আর মরিচ দিয়ে ভাজতে

থাকুন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাদামী রঙ হয়।` এখন মাংস-গুলি তুলে নিয়ে অন্য পাত্রে রাখুন। সেই একই ঘিয়ে, ফালি করে কাটা পেঁয়াজ, গাজরের টুকরো, পার্স্‌লি পাতা কুঁচনো আর রশুনের টুকরো দিয়ে ভাজতে থাকুন্। পেঁয়াজগুলি ভাল করে ভাজা হলে তাতে টেমোটো কেচাপ বা সস্, ভিনিগার, জল, তেজপাতা, অল্প পরিমাণে নুন আর চিনি দিয়ে বেশ করে নাড়তে থাকুন। এবার মাংস দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন্। পরিমাণ মত জল দিয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাংসগুলি ভালভাবে রান্না হয়।

এই রান্নাটির স্বাদ অনেকটা কোরমার মত। পাঁউরুটি দিয়ে পরিবেশন করলে ভাল হয়। মুরগীর বদলে মাট্‌ন্ বা চিংড়ি মাছও ব্যবহার করতে পারেন।

চিংড়ি মাছের চাউ

উপকরণ—১ প্যাকেট চাউ, চিংড়ি ১ পোয়া, নুন্ ছোটো চামচের এক চামচ্, গাজর ১টি, শসা ১টি, Spring onion অথবা কোচি পেঁয়াজ কলি ২টি, ঘি বড় চামচের ১½ চামচ্, কাঁচা লঙ্কা ১টি, কিছু ফ্রেঞ্চ বীন্ আর কড়াইশুটি (সেদ্ধ করা), আর ১টি পেঁয়াজ।

প্রণালী—একটি ডেক্‌চিতে জল গরম করে তাতে চাউ দিয়ে দিন। তখুনি চাউ আবার জল থেকে তুলে নিয়ে, জল ঝরিয়ে, একটি পরিষ্কার কাপড়েতে বিছিয়ে শুকোতে দিন। এবার ঘি গরম করে তাতে চাউ দিয়ে কয়েকমিনিট উল্টে পাল্টে ভেজে নামিয়ে রাখুন। এখন গাজরের টুকরো, শসার টুকরো, গোল ভাবে কাটা পেঁয়াজ, কড়াইশুটি, ফ্রেঞ্চ বীনের টুকরো আর পেঁয়াজ-কলির টুকরো ভাল করে ঘিয়ে ভাজুন্। অল্প পরিমাণ নুন্ দিন। একটি প্লেটে এগুলি সাজিয়ে রাখুন। ভাজা চাউ এর ধারে সাজান। চিংড়ি মাছগুলির খোলা আর মাথা বাদ দিয়ে, অল্প নুন্ মাখিয়ে ভাজুন্। এবার এই চিংড়িগুলি প্লেটে সব্জির ওপরে রাখুন্। গরম গরম পরিবেশন করবেন। ইচ্ছা করলে কাঁচা লঙ্কার টুকরো দিতে পারেন।

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

শীত আসে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

শীত আসে : উত্তরে হাওয়ায়
বিষণ্ণ এ আয়ুষ্কাল, অন্ধকার রাতের ছায়ায়
কোণ নেয় যৌবনের রক্তিম আকাশ
ঝরা দিন, রুক্ষ গাছ, বিবর্ণ নিশ্বাস।
গেরুয়া ধানের ক্ষেত, ধানকাটা শেষ
এ-শীতের জরাজীর্ণ ঠক্‌ঠকে কাঁপনের রেশ :
তবু তো আশ্বাস জাগে হৃৎপিণ্ড তাই গরীয়ান্
ক্ষুধা শীর্ণ জঠরের মহামূল্য এ-শীতের ধান।
শীত আসে : জন্ম থেকে জরার আশ্রয়
যতদূর চোখ যায় ঋতু চক্র নির্বিকার অদৃষ্ট রেখায়
জন্ম আর মৃত্যু ঘিরে কঠিন জিজ্ঞাসা :
ছানি পড়া চোখে দেখি কিসের প্রত্যাশা ?
মৃত্যু বুঝি শেষ নয় ; তাই বুঝিঃনেড়া গাছটায়
ছিঁটে ফোঁটা রঙ্ লাগে, থেন্তের দিন দেখা যায়।

ইন্দোরে কংগ্রেস—

জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ইন্দোরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সারা ভারতে যখন সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন, তাহার এত নিকটে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ায় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আড়ম্বর ও লোকসমাগম হয় নাই। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত ইউ-এন-ঢেবর কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন এবং ভারতের প্রধানতম পরিচালক ও নেতা শ্রীজহরলাল নেহরু তথায় উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বর্ত্তমানে সকলের মন বিব্রত করিতেছে, কাজেই সে পরিস্থিতিতে ভারতের কর্ত্তব্যের কথাই কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। নির্ব্বাচনী ইস্তাহার প্রণয়ন ও অনুমোদন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কার্য্য হইয়াছে। দেশকে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের দিকে আগাইয়া দেওয়াই যে বর্ত্তমান কংগ্রেস ও দেশবাসীর একমাত্র কাম্য—সে কথা নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভারত আজ তাহার নানাবিধ সমস্যা লইয়া বিব্রত—দেশোন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি যাহাতে ঠিক ভাবে সম্পাদিত হয়, দেশবাসী সকলকে সে বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানানো হইয়াছে। পাকিস্তান-ভারত-সমস্যার আজও কোন মীমাংসা হয় নাই। কাশ্মীর সমস্যার কথা সে জন্য কংগ্রেসে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা হইয়াছিল। দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে ধীর থাকিয়া কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইতেই আহ্বান করা কংগ্রেসের প্রধান কার্য্য ছিল।

ভারতে চীনের প্রধান মন্ত্রী—

চীন ভারতবর্ষের সন্নিহিত বিরাট দেশ। ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা ৪০ কোটি ও চীনের অধিবাসীর সংখ্যা ৬০ কোটি। চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি সম্প্রতি অল্পকালের মধ্যে দুইবার ভারতে আসিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠতম নেতা শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত দুইবার সাক্ষাৎ করিয়া বিশ্ব-পরিস্থিতি ও নিজ নিজ দেশের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সোভিয়েট রাসিয়া ও পাকিস্তানে যাইয়া সেখানকার রাষ্ট্রনায়কদের সহিতও আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। চৌ-এন-লাই আবার শীঘ্র ভারতে আসিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলালের সহিত মিলিত হইবেন। সমগ্র বিশ্বে কি ভাবে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং কি ভাবে সকল অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে সমবেত চেষ্টা করাই নেহরু-লাই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। ভারত ও চীন উভয় দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ কম—উভয়দেশ সেই উৎপাদন বিষয়ে পরস্পরকে শিল্পাদি বিনিময়ের ব্যবস্থা করিলে দুই দেশের মানুষগুলিরই অভাব অভিযোগ দূর করা যাইবে। চীন-ভারতের এই মিলন সে বিষয়ে উভয় দেশের কল্যাণ-প্রদ হউক—উভয় দেশের লোকই সে জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

শ্রীনেহরুর আমেরিকা ভ্রমণ—

শ্রীজহরলাল নেহরু ডিসেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে এক পক্ষ কালের জন্য আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটি দেশভ্রমণ করিয়া সে সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সহিত ভারতের তথা পৃথিবীর শান্তিরক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। মার্কিণ রাষ্ট্রনায়ক আইসেনহাওয়ার বর্ত্তমানে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ—মার্কিণ দেশ ধনে ও জনে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে—একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া, অন্য দিকে আমেরিকা পৃথিবীর সকল জাতিকে আকর্ষণ করিতেছে। কি ভাবে এই দুই বিরোধী শক্তিকে মিলিত করিয়া জগতের কল্যাণ-জনক কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, শ্রীজহরলাল তাহার ব্যবস্থার চেষ্টায় আইসেন হাওয়ারের সহিত কয়েক দিন মিলিত হইয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। চীনের মত

একটি বিরাট দেশকে এখনও জাতিসঙ্ঘে গ্রহণ করা হয় নাই—চীনের সহিত নানা কারণে আমেরিকার মতভেদ বর্ত্তমান—সে জন্য আমেরিকা যাইবার পূর্বে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাইএর সহিত কয়েকদিন ধরিয়া চীন-আমেরিকা সমস্যার কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছিলেন। মিশর ও হাঙ্গেরীর সমস্যাও সমগ্র জগতকে চিন্তান্বিত করিয়াছে—সে সকল সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীজহরলাল আইসেন-হাওয়ারের সহিত সরাসরি আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি আশান্বিত হইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছেন—আমাদের বিশ্বাস তাঁহার এই আলোচনার ফলে জগতে সত্বর যুদ্ধারম্ভের সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। তিনি কানাডার প্রধান মন্ত্রী ও লণ্ডনের প্রধান মন্ত্রীর সহিতও ফিরিবার পথে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীজহরলালের এই ভ্রমণ শুধু ভারতের নহে, জগতের পক্ষে কল্যাণকর হউক, সকলেই এইরূপ আশা করিতেছেন। তখন পৃথিবীর কোন দেশে যুদ্ধ বাধিলে সমগ্র বিশ্ব তাহাতে জড়াইয়া পড়িবে ও বিপন্ন হইবে—বিশেষ করিয়া ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কাজ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারত আজও উপযুক্ত শক্তি অর্জন করিতে পারে নাই—তাহার দেশবাসীর সমস্যাগুলির পূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা সম্পাদিত হয় নাই—পাছে সে কাজে বাধা পড়ে, সেজন্য শ্রীজহরলাল সর্বদা চিন্তিত। তিনি নিজের কার্য্যের দ্বারা সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন—সে জন্য নিজেকে জগতে শান্তিরক্ষার কার্য্যে সদা নিযুক্ত রাখিতে আগ্রহশীল।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

খ্যাতনামা শিল্পপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ১৯৫৭ সালের জন্য কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আর্য্যা-স্থান ইন্সিওরেন্সের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্ণধার। তিনি খ্যাতিমান অর্থ-নীতিবিদ ও সুপণ্ডিত। বীমা ব্যবসায়ে এক সময়ে তিনি কলিকাতার সর্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী—

প্রজা সোসালিষ্টদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মকর্ত্রী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী ঐ দল ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে পুনরায় যোগদান করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি কংগ্রেসদলের হইয়া আগামী নির্বাচনে লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থী হইবেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনী পূর্বে নিখিল ভারত কংগ্রেসকমিটী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা ছিলেন।

প্রতিমা সেন—

ভূতপূর্ব চীপ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র কন্যা ও শ্রীসুবর্ণকুমার সেনের পত্নী প্রতিমা দেবী সুদীর্ঘকাল রোগভোগের পর সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রতিমা দেবী জীবিতাবস্থায় আতুরের সেবা ও গরীবের দুঃখ-মোচনে বিশেষ যত্নবতী

প্রতিমা দেবী

ছিলেন। সমাজকল্যাণকর বহুরূপ দান তিনি জীবনে করিয়াছিলেন। এই সেবাব্রতচারিণী নারীর জীবনের আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ইঁহার সমস্ত সম্পত্তি—কলিকাতাস্থ বাটী ও প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালে দান করা হইয়াছে। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই মহীয়সী মহিলার আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু—

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু গত ৮ই জানুয়ারী মধ্যপ্রদেশ বিধান সভার কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর

গুরুর পরলোকগমনে তিনিই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবেন। তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার কাটজুর কর্মশক্তি অসাধারণ।

সংগীতে সম্মান লাভ—

এ বৎসর নিখিলভারত সংগীত প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদ গানে কুমারী প্রীতিলতা মিত্র স্ত্রী-পুরুষ সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন। ইনি বিখ্যাত সংগীত-

কুমারী প্রীতিলতা মিত্র

শিল্পী শ্রীমহাদেব আঢ্যের ছাত্রী। আমরা কুমারী প্রীতির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

উদ্বাস্তুদের জন্য যক্ষ্মা হাসপাতাল—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্ত যক্ষ্মারোগীদের জন্য বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বরে একটি ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করিতেছেন। ভারত সরকারের অর্থসাহায্যে তথায় ১১১ একর জমী ও বাড়ী ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে এই ভাবে নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলে লোক উপকৃত হইবে।

খড়্গপুরে সঙ্গীতানুষ্ঠান—

খড়্গপুরে ৩০শে নভেম্বর—'সুরসন্ধানী'র উদ্যোগে নর্থ ইনষ্টিটিউটে এক সঙ্গীত সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। গোপেশ্বরবাবুর পত্নী শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠা কন্যা স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদ গান করেন। মনোহরপুরের রাজা বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে মুগ্ধ হইয়া একটি স্বর্ণপদক দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীধ্রুবময় নামে একটি ছেলে ঐ আসরে ধ্রুপদ গায়। তিজলীতে ১লা ডিসেম্বর—সুগায়ক নন্দলাল গোস্বামীর উদ্যোগে আর একটি জলসা

খড়্গপুর সংগীত সম্মেলনে সংগীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীস্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধ্রুবময় পাত্র প্রভৃতি

অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা বহু ব্যক্তি যোগদান করেন। প্রথম শ্রীনন্দলালবাবু ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাত্র ও তাঁর পত্নী তানমালা দেবী গান করেন। পরে শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় তাঁর সুললিত কণ্ঠে ধ্রুপদ ও খেয়ালে সমবেত ভদ্রমহোদয়কে মুগ্ধ করেন। গোপেশ্বরবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীস্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় খেয়াল ও ধ্রুপদ গান করেন। শ্রোতাদের অনুরোধে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় ঠুংরী গানও করেন। শেষে গোপেশ্বরবাবু ও তাঁর পত্নী দ্বৈতকণ্ঠে খেয়াল গান করেন।

বৃটেনে প্রধান মন্ত্রী পরিবর্তন—

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সার এণ্টনী ইডেন গত ৯ই জানুয়ারী সহসা পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে ১০ই জানুয়ারী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলন নূতন প্রধান মন্ত্রী হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ ম্যাকমিলানের বয়স ৬২ বৎসর—তিনি সার এণ্টনী ইডেনের মন্ত্রিসভার সহিত যুক্ত ছিলেন। মিশর সমস্যা প্রভৃতি লইয়া বৃটেনে জনমতের ফলে সার এণ্টনীকে পদত্যাগ করিতে হইল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ—

পশ্চিমবঙ্গে গত অক্টোবর মাসে যে ভীষণ বন্যা ও অতি-বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে বিপন্ন জনগণের উদ্ধারের ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ করা যায় নাই। আবার গত পৌষ মাসের শেষ কয়দিন ভীষণ শিলাবৃষ্টি ও ঘুর্ণিবাত্যার ফলে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার কিয়দংশ বিপন্ন হইয়াছে। গত অতিবৃষ্টির সময় প্রচুর সরকারী অর্থব্যয় করিয়া বিপন্ন জনগণকে সাহায্য করা হইলেও মানুষের কষ্টের শেষ ছিল না। এবার পাকা ধান মাঠে নষ্ট হইয়া গেল—বহু প্রকার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইল, ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বহু লোক গৃহহীন হইল। সাধারণ দুঃখদুর্দ্দশার উপর এই সকল দুঃখের বোঝা বাড়িল। ভগবানের অভিশাপ আরও কতদিন চলিবে কে জানে ?

পঞ্জিকা সংস্কার—

বহুদিন হইতে পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় কিভাবে পঞ্জিকা সংস্কার করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার এক কমিটী গঠন করিয়াছেন—কমিটীর সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে এবং ভারত সরকার নূতন পঞ্জিকা ১৯৫৭ সালের ২২শে মার্চ হইতে সমগ্র ভারতে চালু করিবেন। সমগ্র ভারতে ঐ একই পঞ্জিকা চলিবে। সে বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই সকল প্রাদেশিক ভাষায় ও সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কার্য্যে ঐ পঞ্জিকা চলিবে বটে, কিন্তু ধর্মীয় কার্য্যে জনগণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে অন্য পঞ্জিকা ব্যবহারের স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নিয়োগীর কন্যা কুমারী স্মিতা নিয়োগী এই বৎসর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রে এম, এসসি পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান এবং এম-এ, এম-এস-সি, এম-কম্ প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া ৩টী স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি বি, এস-সি অনার্স পরীক্ষাতেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের

কুমারী স্মিতা নিয়োগী

ছাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশ ইণ্টারবোর্ডে ও আই-এ, আই-এস-সি, পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান। কুমারী স্মিতার পিতামহ ৺গতিকৃষ্ণ নিয়োগী (তৎকালীন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা) এবং মাতামহ ৺নরেন্দ্রকুমার মজুমদার—(ভূতপূর্ব রেজিষ্টার, বঙ্গীয়—যৌথ কোম্পানী সমূহ) উভয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ তে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। আমরা কুমারী স্মিতার সর্ব্বাঙ্গীণ, সাফল্য কামনা করি।

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৫শে ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টায় তাঁহার কলিকাতা মতিলাল নেহরু রোডস্থ বাসভবনে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার ৪ পুত্র ও ১ কন্যা বর্তমান। ভারতীয় হিসাবে তিনিই প্রথম ইংরাজি

অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২৪ পরগণা জেলার হালিসহরে তিনি ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা রিভিউ পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র শচীন্দ্রনাথ পশ্চিম বঙ্গের সেচ বিভাগের চিফ এঞ্জিনিয়ার ও অপরপুত্র সুধীন্দ্রনাথ খ্যাতনামা চিকিৎসক।

অনুপম ঘটক—

বিখ্যাত চিত্রসঙ্গীত পরিচালক অনুপম ঘটক গত ১২ই ডিসেম্বর বুধবার সকালে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বালীগঞ্জের বাড়ীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯৩৪ সাল হইতে তিনি সিনেমার সঙ্গীত পরিচালকরূপে কাজ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি একটি সঙ্গীত শিক্ষালয়ের সহিতও সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সঙ্গীত জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

রাধেশচন্দ্র রায়—

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় মহাশয়ের অনুজ সাহিত্যানুরাগী রাধেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও সম্প্রতি কলিকাতায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।
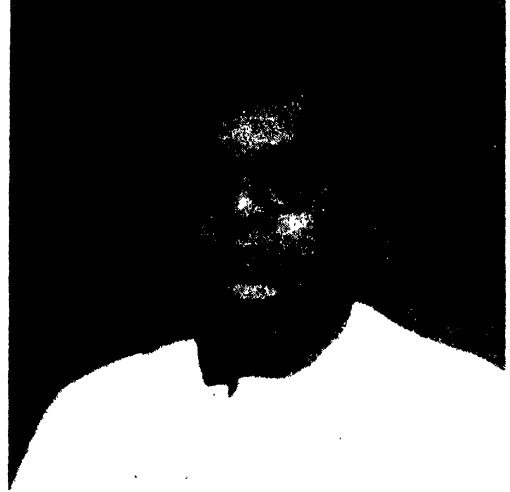
রাধেশচন্দ্র রায়

তাঁহার গৃহে বহু বৎসর ধরিয়া প্রতি সপ্তাহে একদিন বাংলার সাহিত্যিকগণের মিলন সভা বসিত। তিনি বর্তমান যুগের বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের দরদী বন্ধু ও উৎসাহ দাতা ছিলেন।

বাঙ্গালার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের (ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল) রজত জয়ন্তী বৎসর উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত খেলোয়াড় পুষ্ট বৈদেশিক ক্রিকেট দল (Silver Jubilee overseas cricket XI) বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একাদশ দলের সঙ্গে এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় যোগদান করে। ডাঃ রায়ের একাদশ দলের অধিনায়কত্ব করেন (১৯৫২) এই ট্রুম্যান ছিলেন ভারতীয় দলের ভীতির কারণ। ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলায় এলেক বেডসার যুদ্ধ পরবর্ত্তীকালের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বোলার হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। ১৯৫৩ সালের টেষ্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের মূলে ছিলেন বেডসার। সব দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে এই বৈদেশিক ক্রিকেট দলটি বেশ শক্তিশালী ছিল বলা চলে।
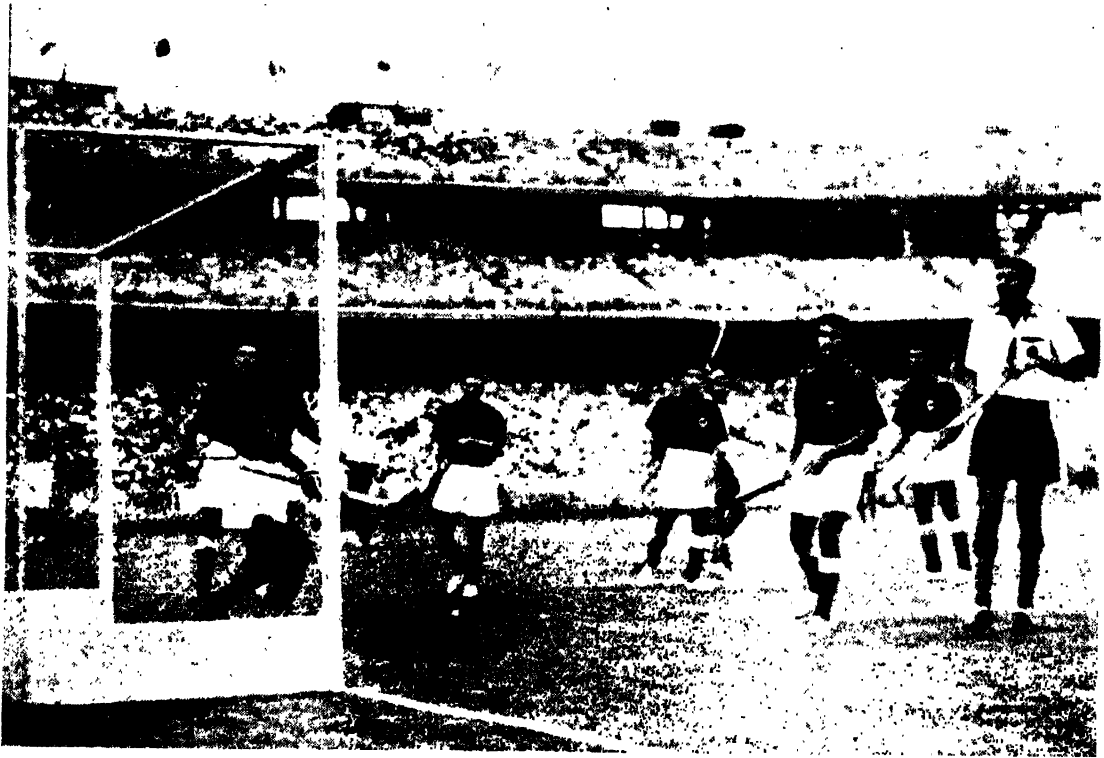
অলিম্পিক হকি ফাইনালে পাকিস্তান গোলমুখে ভারতবর্ষের আক্রমণের দৃশ্য

লালা অমরনাথ এবং জয়ন্তী ক্রিকেট দলের করেন ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলোয়াড় ডবলউ জে এডরিচ। বৈদেশিক দলে অষ্ট্রেলিয়ার এই তিনজন খেলেছিলেন ট্রাইব, ডুল্যাণ্ড এবং লিভিংষ্টোন। বাকি ৮ জন ইংলণ্ডের—এডরিচ, ওয়াটসন হোয়ার্টন, গ্রেভনী, সিমসন, ট্রুম্যান, বেডসার এবং মস্। আধুনিককালে ট্রুম্যান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। গত ইংলণ্ড সফরে

চারদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ডাঃ রায়ের একাদশ দল ১৪২ রানে বৈদেশিক ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে। দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড় নরি কণ্ট্রাক্টর। সোয়া ছয়ঘণ্টা উইকেটে খেলে তিনি ১৫৭ রান করেন, বাউণ্ডারী করেন ১৭টা। তাঁর সহজ ক্রীড়াভঙ্গী এবং নিপুণ হাতের ব্যাট চালনা দর্শকদের বহুকাল স্মরণ থাকবে।

এর পরই ভারতীয় টেষ্ট খেলা থেকে অবসরপ্রাপ্ত বিজয় হাজারের খেলা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তিনি ৬০ রান করেন। টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় এখনও যে তিনি স্থান লাভের যোগ্যতা রাখেন তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। মুস্তাক আলী বেশী রান করতে সক্ষম হননি বটে কিন্তু তাঁর বিগত দিনের খেলার জৌলুষ দেখিয়েছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন এখনও তিনি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা রাখেন। এর পর লালা অমরনাথের খেলা। অমরনাথ ৫৯ রান করে নট আউট থাকেন। হাজারে, অমরনাথ এবং মুস্তাক—এই তিনজন অবসরপ্রাপ্ত টেষ্ট খেলোয়াড় প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন, আধুনিক কালের ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড়দের থেকে বহুগুণে তাঁরা যোগ্যপাত্র।

রজত জয়ন্তী দল: ডব্লিউ এডরিচ (অধিনায়ক), ওয়াটসন, হোয়ার্টন, টম গ্রেভনী, এল লিভিংষ্টোন, জর্জ্জ-ট্রাইব, রেগ সিমসন, ব্রুস ডুল্যাণ্ড, ফ্রেড ট্রুম্যান, এলেক বেডসার এবং এ মস।

ডাঃ রায়ের দল: লালা অমরনাথ (অধিনায়ক), পঙ্কজ রায়, নরি কণ্ট্রাক্টর, মুস্তাক আলী, বিজয় হাজারে, ভিনু মানকড়, রামচাঁদ, সি ডি গোপীনাথ, পি সেন, গোলাম আমেদ এবং সুভাষ গুপ্ত।

টেবল টেনিস ঃ

১৯৪৬ সালের আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বোম্বাই পুরুষ বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে বার্ণাবেলাক কাপ জয়ী হয়েছে। এই নিয়ে বোম্বাই উপর্য্যুপরি চারবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। তা ছাড়া বোম্বাই মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে জয়লক্ষীকাপ পেয়েছে। জুনিয়ার বিভাগের ফাইনালে দিল্লী জয়ী হয়ে রামানুজম ট্রফি পেয়েছে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে জয় লাভ করেন—পুরুষদের সিঙ্গলসে জি আর দিওয়ান (বোম্বাই), মহিলাদের সিঙ্গলসে মীনা পারাণ্ডে (মহারাষ্ট্র), পুরুষদের ডবলসে আর ভাণ্ডারী এবং কল্যাণ জয়ন্ত (বাংলা), মহিলাদের ডবলসে মীনা পারাণ্ডে (মহারাষ্ট্র) এবং পি হুনেস (বোম্বাই), মিক্সড ডবলসে ডি পি সম্পৎ এবং পি হুনেস (বোম্বাই) এবং জুনিয়ার সিঙ্গলসে জে সি ভোরা (বোম্বাই)।

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন ঃ

১৯৫৬ সালের আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে উপর্য্যুপরি ৯ বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব অর্জ্জন করেছে। ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে জয়লাভ করেছেন পুরুষদের সিঙ্গলসে ত্রিলোকনাথ শেঠ (ইউ পি), মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস তারা ডাণ্ডিগে (বোম্বাই), পুরুষদের ডবলসে নান্দু নাটেকার এবং ভীমওয়ালা (বোম্বাই), মহিলাদের ডবলসে যশবীর কাউর (পাঞ্জাব) এবং মীনা সাহা (ইউ পি); মিক্সড ডবলসে ধোন্ধাদে এবং মিস মালতী গোখলে (বোম্বাই)।

অলিম্পিক হকি বিজয়ী ভারতীয় খেলোয়াড়বৃন্দ। বিজয় স্তম্ভে দণ্ডায়মান দলের অধিনায়ক

প্রদর্শনী ফুটবল ঃ

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় গত তিনবারের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার রাণার্স-আপ

যুগোস্লাভিয়া ৩-০ গোলে আই এফ এ একাদশ দলকে পরাজিত করে। প্রথমার্দ্ধে কোন পক্ষেই গোল হয়নি।

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৫৬ সালের ডেভিসকাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে আমেরিকা ৪-১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। ভারতবর্ষ মাত্র একটি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়।

রামনাথন কৃষ্ণান ৭-৫, ৬--৪, ৬-৩ গেমে আমেরিকার মিকি গ্রীনকে পরাজিত করেন। বাকি ৩টি সিঙ্গলস এবং ৩১টি ডবলস খেলায় আমেরিকা জয়ী হয়। ভারতবর্ষের খেলায় যোগদান করেন রামনাথন কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় গতবছরের ডেভিসকাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়া ৫-০ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া ১৭ বার ডেভিস কাপ পেল। এ পর্য্যন্ত মাত্র চারটি দেশ ডেভিস কাপ পেয়েছে—আমেরিকা ১৮ বার, অষ্ট্রেলিয়া ১৪ বার, গ্রেট বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। গত ১৩ বছর ধরে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া—এই দুই দেশ ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলছে। অষ্ট্রেলিয়া এই সময়ের মধ্যে ৭ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে এবং আমেরিকা পেয়েছে ৬ বার।

ডুরাণ্ড কাপ ঃ

১৯৫৬ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে হায়দ্রাবাদ পুলিশদলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তিনবার ডুরাণ্ডকাপ জয়ী হ'ল। ইতিপূর্ব্বে তারা আরও দু'বার ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছে ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালে। মোহনবাগান ক্লাব প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রথম খেলাতেই আম্বালা হিরোজ দলের কাছে ০-২ গোলে পরাজিত হয়। ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে মোগল ক্লাবকে, ০-০, ১-০ গোলে ক্যালটেক্সকে এবং সেমি-ফাইনালে ০-০, ০-০, ২-০ গোলে গতবছরের ডুরাণ্ড কাপ জয়ী মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

রোভার্স কাপ ঃ

১৯৫৬ সালের রোভার্স কাপ ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-১ গোলে ১৯৫৫ সালের রোভার্স বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত করে। মোহনবাগান প্রথমার্দ্ধের খেলায় ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। ১৯৫৫ সালের ফাইনালে এই দুই দলই খেলেছিল।

ইংলণ্ড-দঃ আফ্রিকা টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ১৩১ রানে জয়ী হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ইংলণ্ড : ২৬৮ (রিচার্ডসন ১১৭) ও ১৫০।

দক্ষিণ আফ্রিকা : ২১৫ (গডার্ড ৪৯) ও ৭২ (বেলী ২০ রানে ৫ এবং ষ্ট্যাথাম ২২ রানে ২ উইকেট)

কেপটাউনে অনুষ্ঠিত ২য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৩১২ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে পরাজিত করে।

ইংলণ্ড : ৩৬৯ (কাউড্রি ১০১) ও ২২০ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

দক্ষিণ আফ্রিকা : ২০৫ ও ৭২ (ওয়ার্ডল ৩৬ রানে ৭ উইকেট)

জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৬ সালের জাতীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে যাঁরা জয়লাভ করেন--পুরুষদের সিঙ্গলসে রামনাথন কৃষ্ণান, মহিলাদের সিঙ্গলসে শ্রীমতী কে সিংহ, পুরুষদের ডবলসে রামনাথন কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার, মহিলাদের ডবলসে শ্রীমতী এস আর মোদী এবং শ্রীমতী জে বি সিংহ এবং মিক্সড ডবলসে নরেশকুমার এবং শ্রীমতী কে সিংহ।

জাতীয় কবাডী প্রতিযোগিতা ঃ

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই পশ্চিমবাংলাকে পরাজিত করে। মহিলা বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই কোলাপুরকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি তিনবছর ফাইনাল বিজয়ের গৌরব লাভ করে।

ফটো ঃ ছবিগুলি ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দিব্যদৃষ্টি : শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলা ভার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের কার্যকারণসূত্রে তাকে গ্রন্থন করাও যায় না। কিন্তু বস্তুজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতর জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলেছিলেন :

"তাই যা দেখিছ তারে ঘিরিছে নিবিড়,
যাহা দেখিছ না তাহাদেরি ভীড়।"—

দেখার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে বহু অদেখা, প্রত্যক্ষতার অন্তরালে রয়েছে এক অপ্রত্যক্ষ জগতের বাতাবরণ। পূর্বে এ সব বিষয় ছিল ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির অন্তর্ভূত। ক্রমাগত বিষয়টি দার্শনিক উপলব্ধি ও কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত হ'য়ে উঠেছে। এই অতি-প্রাকৃত সত্যটি সাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর কাব্য-কবিতা, নাটক ও কথা-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হ'য়ে উঠেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এই অতি-প্রাকৃত সত্যটি প্রথমত স্থূল রোমান্সের বহুবর্ণরঞ্জিত পটভূমিকা রচনার জন্যই প্রযুক্ত হ'ত। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্রম-প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অতি-প্রাকৃত সংস্থান ও পরিবেশ এক নিগূঢ় অর্থ-দ্যোতনায় শিল্পিত হ'য়েছে। স্থূল ভৌতিকরূপ পরিহার ক'রে বিশ্ব-প্রসারী কবিকল্পনা (Cosmic imagination), মনোবিকলন (Psycho-Analysis) ও অর্থবহ অন্তর্ভেদী সংকেতে (Symbolism) পরিণত হ'য়েছে।

'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থটি অতিপ্রাকৃত বিষয়ক সাতটি গল্পের সঙ্কলন। লেখক শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত ইতিপূর্বেই এই জাতীয় গল্প রচনায় খ্যাতিলাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত 'ভূতুড়ে গল্প' বা 'আষাঢ়ে' গল্পের অভাব নেই। কিন্তু এই শ্রেণীর অধিকাংশ গল্পেই গল্পাংশের স্থূল দিকটিকেই বড় ক'রে তোলা হয়েছে। 'দিব্যদৃষ্টি' সঙ্কলনটি নিঃসন্দেহে এর একটি ব্যাতিক্রম। ভৌতিক কাহিনীর স্থূল অংশটিকেই লেখক এখানে বড় ক'রে তোলেন নি, তিনি মানুষের মনস্তত্ত্ব ও ঘটনার আলো-ছায়া-দীর্ণ সাঙ্কেতিকতার সাহায্য নিয়ে কাহিনী বয়ন ক'রেছেন। অতীতে যে ঘটনা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে তার ছায়া এখানে এক সময় আমাদের নিগূঢ় অন্তস্তলে অর্থগূঢ় হয়ে ওঠে। মনলোকের এই রহস্যময় সত্যটির সঙ্গে মনস্তত্ত্ব ও সাংকেতিকতা যোগ করে তিনি গল্পগুলি রচনা ক'রেছেন।

লেখক তাঁর প্রথম গল্প 'দিব্যদৃষ্টি'র প্রথমেই এই বিশেষ ধরণের মানসিকতার বর্ণনা দিয়েছেন : "মাঝে মাঝে অলৌকিক ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করি একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে—স্বেচ্ছায় নয়, কে যেন জোর ক'রে আমায় টেনে নিয়ে যায় অশরীরীর রাজ্যে। প্রেত লোকের সঙ্গে যেন কী এক নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে আমার। অশান্তি ব্যাকুল কায়াহীনের দল যেন তাদের রহস্যদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতে চায় আমার কাছে। প্রেততত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা বলেন, আমি নাকি ক্লেয়ার-ভয়েন্ট—আমি যে মাঝে মাঝে অতি-প্রাকৃত ঘটনা প্রত্যক্ষ করি সে আমার সহজাত দিব্যদৃষ্টির বলে।"—লেখকের এই মন্তব্যটি শুধু একটি গল্প সম্পর্কেই নয়, প্রায় প্রতিটি গল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য। প্রথম গল্প 'দিব্যদৃষ্টি' রাঁচী মোরাবাদি পাহাড়ের ধারে এক রহস্যময় হত্যাকাণ্ড অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে। ধনাঢ্য তরুণ জমিদার ইস্‌মাইলের হত্যাকাণ্ডের যে সমাধান গোয়েন্দা-পুলিশ পর্যন্তও ক'রে উঠতে পারেন নি, তা একজন ক্লেয়ারভয়েন্টের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে। তাঁর চোখের সামনে রুমেলা-ইসমাইলের জীবন নাট্যের সবচেয়ে রহস্যময় অংশটি উদ্ভাসিত হয়েছে। মোরাবাদি পাহাড়ের জনশূন্য পরিবেশের প্রেতায়িত মহিমা সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে সুন্দর ফুটে উঠেছে। রুমেলা-ইস্‌মাইল কাহিনীটির এমন কোন নূতনত্ব নেই। রুমেলার রহস্যময় ব্যক্তিত্ব ও অপরাধ প্রবণতার মধ্যে রোমান্সের রহস্য আছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতের আলো-ছায়ার লীলা এই অতি সাধারণ হত্যা কাহিনীর মধ্যে নূতনত্বের সৃষ্টি ক'রেছে।

'নিরুদ্দিষ্ট' গল্পটির জটিলতা ও বয়ন-কৌশল দুই-ই অবিস্মরণীয়। প্রথম গল্পটির মতো এ গল্পের 'দিব্যদৃষ্টি'ই সুব্রত রায়ের রহস্যময় অন্তর্ধানের ওপর আলোকপাত ক'রেছে। একমাত্র সিগারেট কেস ছাড়া ঘটনাটির মধ্যে কোন বাস্তবভিত্তি নেই—অথচ সুনীল মিত্র যা স্বচক্ষে দেখেছে তার চেয়ে বাস্তব আর কি হ'তে পারে? স্পষ্টত হত্যাকাণ্ড না দেখলেও যতটুকু তার চোখে পড়েছে, সেইটুকুই ঘটনার পক্ষে যথেষ্ট। সুন্দর সিং-এর অপরাধ-দুর্বল মনের ওপর এই ঘটনাংশটুকুর প্রতিক্রিয়ার ওপরেই কাহিনীটি গ'ড়ে উঠেছে। 'মাকড়সা' গল্পটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। মনস্তত্ত্ব ও সাংকেতিকতার বিচিত্র উপাদান গল্পটিকে উপভোগ্য ক'রে তুলেছে। লাহোর ইডেন হোটেলের সাত নম্বর কামরায় একই ধরণের আত্মহত্যা ঘটনার রহস্যময়তাকে গভীরতর ক'রে তুলেছে। পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু অপরিচিত সন্দেহজনক সূত্র নেই—আমাদের সাধারণ বাস্তব-পরিবেশই গল্পটির 'সেটিং'। শঙ্করলালের ডায়েরীর শেষাংশটুকুই গল্পটির উল্লেখযোগ্য অংশ। গল্পের মধ্যে সোফিয়ার ব্যক্তিত্ব অস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন। ইংরেজীতে 'উইল ফোর্স' বা ইচ্ছাশক্তি যাকে বলে—তা-ই শঙ্করলালকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ক'রেছে। সোফিয়ার প্রবল ইচ্ছাশক্তি শঙ্করলালকে প্রভাবিত ক'রেছে; কাহিনীর শেষ দিকে সে বুঝতেও পেরেছিল যে তার

সাম্প্রতিক কার্যকলাপ সোফিয়ারই কাজের অনুকরণমাত্র, তথাপি এক দুর্নিবার ও দুর্জ্ঞেয় অনুভূতি তাকে অন্তহীন অতলের দিকে টেনে নিয়েছে। শঙ্করলালের পরাভূত ইচ্ছাশক্তি, তার দোলাচল চিত্তবৃত্তির সংগ্রাম, সোফিয়ার রহস্যময় ব্যক্তিত্ব স্বল্পরেখায় সুন্দর ফুটেছে। মাকড়সার ব্যাপারটি একটি 'কোয়েনসিডেন্স' মাত্র, কিন্তু এই স্বল্পপরিসর ব্যাপারটি কাহিনীর পরিণতিকে ইঙ্গিতময় ক'রে তুলেছে। নিয়তিরূপিনী সোফিয়ার কোন বাস্তব পরিচয় মেলে নি। গল্পটির পরিকল্পনা ও রহস্যসূত্রের গ্রন্থন প্রশংসনীয়।

'কৃতান্তের স্বর্গ' ও 'প্রত্নতাত্ত্বিকের বিপদ' গল্প দু'টির মধ্যে মিল আছে। প্রাকৃতিক শক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন কৃতান্ত চৌধুরী, আর মেডুসার মাথার সাহায্যে শিল্প জগৎকে স্তম্ভিত করে দিতে চেয়েছিলেন ভাস্কর বজ্রপাণি রায়। দু'জনই অতি-মানবিক শক্তির প্রলোভনে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু 'কৃতান্তের স্বর্গ' গল্পটি জটিলতর। বালক শঙ্করের চেতনালোকে আকস্মিকভাবে কৃতান্ত চৌধুরীর সমস্ত রহস্য ধরা পড়েছিল। কৃতান্ত চৌধুরীর প্রেতায়িত পরিবেশ বর্ণনায় ও শঙ্করের অবচেতন মনের বর্ণনায় লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'মৃতের প্রতিশোধ' গল্পটিতেও ফরিদার দিব্যদৃষ্টির ব্যাপারটির সঙ্গে মূর্তির প্রতিশোধ গ্রহণের কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত হ'য়েছে। সোরাবজীর অন্তর্ধানের অন্য কোন সাক্ষী নেই। একমাত্র ফরিদার দৃষ্টির সম্মুখেই মুহূর্তের জন্য ঘটনাটি ফুটে উঠেছিল। এইটুকু এর বৈজ্ঞানিক অংশ। মৃতের প্রতিশোধ ব্যাপারটি অতি-প্রাকৃত। তাকে বাস্তব ক'রে তুলতে গিয়ে ফরিদার দিব্যদৃষ্টি ও সপুরজীর অদ্ভুত ধরণের অপরাধী চেতনাকে রূপ দিতে হ'য়েছে। অতি-প্রাকৃতকে সত্য ক'রে তোলার এই কৌশলটি চমৎকার ফুটেছে। সপুরজীর চরিত্র অবদমিত প্রেম, ঈর্ষা ও অপরাধ-চেতনার জটিল মিশ্রণে অপূর্ব। 'আগন্তুক' গল্পটি একটু স্বতন্ত্র রসের। গল্পটি পরিবেশ-প্রধান। পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ী, নির্জন পরিবেশ, বর্ষামুখর দুর্যোগরাত্রি—সব কিছু মিলে এক প্রেতায়িত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আভাস ইঙ্গিতের মধ্যে এক অজানা আতঙ্কের শিহরণ জেগেছে। গল্পটি আগাগোড়া একটি 'আনক্যানি ফিলিং'-এর ওপর নির্ভর ক'রে পল্লবিত হ'য়েছে।

বাংলাসাহিত্যে এই ধরণের গল্প প্রায়ই কলাকৌশল-বর্জিত নেহাৎ 'ভুতুড়ে গল্প' হ'য়ে ওঠে। কিন্তু শ্রীযুক্ত গুপ্ত মনস্তত্ত্ব ও সাঙ্কেতিকতার নিপুণ প্রয়োগে গল্পগুলিকে রসোত্তীর্ণ ক'রেছেন। গ্রন্থটি বাংলাসাহিত্যের অতি-প্রাকৃত গল্পসংগ্রহের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ছাপা, ও বাঁধাই প্রকাশকের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬। মূল্য ২॥০]

রথীন্দ্রনাথ রায়

চার্ব্বাকের উক্তি : শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য গ্রন্থে বারোটি কবিতা আছে। এগুলি সাম্প্রতিক গদ্য কবিতার ছাঁচে রচিত হয়েছে—দুরূহতা নেই। কতকগুলির ভেতর রোমান্টিক আমেজ আছে, কয়েকটি কবিতায় কবি মনের বিক্ষোভের অভিব্যক্তি দেখা গেল। আবার দুয়েকটীর ভিতর বক্রোক্তি লক্ষ্য করা গেছে। কবির অস্থির অশান্ত মন বাঁধাধরা পথ মেনে চল্‌তে চায় না, অবিকল্প ভঙ্গী ও প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা গেল।

এঁ'র প্রাক্তন প্রকাশভঙ্গী আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া গেল না। কবিতাগুলির ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর আছে সংশয়ী অতৃপ্তি, আত্মজিজ্ঞাসা, অসহনীয়তা আর আধুনিক অন্তর্দৃষ্টি। বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য আছে, ভাব সম্প্রসারণে বৈশিষ্ট্যও আছে। জন্মদিন, সন্ধ্যামণি, রূপ ও রস, মহানগরী—বেশ উপভোগ্য হয়েছে। গদ্য কবিতা যাঁদের কাছে ভালো লাগে তাঁরা গ্রন্থখানি পড়ে আনন্দ পাবেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

[প্রকাশক—অধ্যাপক শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪০সি, চক্রবেড়িয়া রোড, নর্থ কলিকাতা—২০। মূল্য ১॥০।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

দি ডেথ্ অব আইভান্ ইলিচ্ : লিও টলষ্টয় :

অনুবাদক মনোজ ভট্টাচার্য

বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের দৈন্য সুবিদিত। তাই পাশ্চাত্য কথা সাহিত্যের দিক্‌পাল যাঁরা তাঁদের রচনার অনুবাদ প্রকাশে যাঁরা আগ্রহশীল তাঁরা সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ। আলোচ্য গ্রন্থখানি লিও টলষ্টয় রচিত উপন্যাস "দি ডেথ অব আইভান ইলিচ"-এর বঙ্গানুবাদ। টলষ্টয়ের নাম এদেশের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। টলষ্টয় একাধারে উপন্যাসিক, দার্শনিক ও রাজনীতিক। তাঁর লেখা 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা' বিশ্বসাহিত্যে উচ্চ আসন দাবী করতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসখানি অনুরূপ খ্যাতি না পেলেও টলষ্টয়ের রচনাবলীর মধ্যে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। টলষ্টয়ের সুগভীর সমাজ সচেতনতা ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পুরামাত্রায় বিদ্যমান। আখ্যান বস্তুও হৃদয়গ্রাহী। সমসাময়িক রুশ সমাজের, বিশেষ করে পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের জীবনযাত্রার তিনি যে সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন তা পাঠকের মনকে আগাগোড়া আবিষ্ট করে রাখে। অনুবাদকের ভাষা স্বচ্ছ, হৃদ্য ও প্রাঞ্জল—কোথাও অস্পষ্টতা বা আড়ষ্টতা নেই। গ্রন্থের পুরোভাগে সংযুক্ত টলষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা টলষ্টয়ের জীবনদর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পাঠককে সাহায্য করবে। আমরা এই গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর কামনা করি।

[প্রকাশক : গ্রন্থজগৎ, ৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। মূল্য ২৲]

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিষকন্যা" (৪র্থ সং)—৩৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "মেবার পতন" (১৮শ সং)—২৲
জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থ "হাত-দেখা" (৪র্থ সং)—৪৲
শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মৌন রেখা"—৩৲
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নারীর স্বর্গ"—২৲
সব্যসাচী প্রণীত "টারজান ইন্ দি জাঙ্গল"—১৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী | বিদুর-গৃহে শ্রীকৃষ্ণ | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
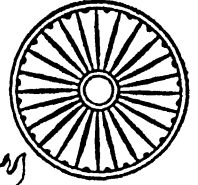
ফাল্গুন—১৩৬৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ব্রহ্মবিদ্যা

শ্রীগিরীশচন্দ্র সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

কাল ও কালী

কাল পুরুষ। তাঁহার আদি অন্ত নাই। তিনি স্থির; রুদ্র বা শিব। তিনি সবচেয়ে বলবান, সব কিছু তাঁহা হইতে উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। যথা :—

অনাদি নিধনঃ কালোরুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং কালো হি বলবত্তরঃ॥

তিনি অনন্ত। তাঁহার সংখ্যা করা যায় না। কালের সংখ্যা করিতেছি আমি। আমার জন্মকাল হইতে উদ্ভূত হইয়া গতিবিশিষ্ট হইয়াছি। তাই আমি পেছনে অতীত এবং সম্মুখে ভবিষ্যৎ দেখিতেছি। বর্ত্তমানস্থ একচুল পরিমাণও নাই। কাল হইতে গতির উদ্ভব হইয়া সেই গতির প্রভাবে আমরা অত্যন্ত গতিশীল হইয়াছি। এতই গতিশীল হইয়াছি যে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই গতিটী ২১,৬০০ বার ঊর্দ্ধাধ গমন করিতেছে।

ত্রিভুবন ঘুরিয়ে পেলুম, সাধনের ধন ভগবান্।
ও সে আরাধ্যধন, পরশ রতন, ভালবাসার বস্তু প্রাণ॥
ও সে আসে যায় বারে বারে, একুশ হাজার ছয় শ বারে।
একবার ফিরে চাওনা তাঁরে, খুলে যাবে দিব্য জ্ঞান॥
হঁয়েরে করহ হংস, হংস তোমার মহা অংশ।
তবে সে পাইবে তুমি অমূল্য পরম স্থান॥

যোগ সঙ্গীত।

এই যে গতি, ইহার দ্বারা আমি ধৃত রহিয়াছি। ইহাই শক্তি বা বল। এই জগৎ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই গতির দ্বারা চলিতেছে এবং ধৃত রহিয়াছে। আমি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব কিছুই ইঁহার দ্বারা ধৃত বলিয়া ইনি ধর্ম্মও বটেন। ইঁহার দুইটী চরণ বা পদ। একটী পূরক। অপরটি রেচক। এই গতি অত্যন্ত চরণশীল বলিয়া ইঁহার নাম চরণ। চরণ=চর্ ধাতু অনট্। চর ধাতুর অর্থ চরণ বা নড়াচড়া করা। ইহা প্রাণ; অন্য নাম হংস বা পদ বা চরণ। যথা :—

প্রাণ বৈ হংসঃ। পদং হংস মুদাহৃতম্।
ইতি বেদ।

প্রাণের নাম হংস, পদ বা চরণ। বেদেতে ইহা লিখিত আছে। একটী চরণ যাহা উত্তর বা বামচরণ; তাহা মহাকাল শিবকে আশ্রয় করিয়া আছেন। অন্য চরণটী ক্ষেপণ করিতেছেন। যে চরণটী ক্ষেপণ করিতেছেন ইহা দক্ষিণ চরণ। এই হেতু কালীর একটী নাম দক্ষিণা-কালী। অন্য কথায় একটী নিঃশ্বাস এবং অন্যটী প্রশ্বাস। সঃ কারের দ্বারা প্রাণ বায়ু বাহিরে যায়, তাহা রেচক এবং হংকারের দ্বারা প্রাণবায়ু শরীরে পুনঃ প্রবেশ করে তাহার নাম পূরক। ইহার নাম অজপা গায়ত্রী। ইহা জীব সর্ব্বদাই জপ করেন। যথা :—

সঃ কারেণ বহির্যাতি হংকারেন বিশেৎ পুনঃ।
অজপা নাম গায়ত্রী জীবো জপতি সর্ব্বদা :

এই গতিই আদ্যাশক্তি ভবানী বা কালী। যথা :—

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥

এই গতি একবার উঠিতেছে ও একবার চলিয়া যাইতেছে বলিয়া ইহার গণনা বা সংখ্যা হইতেছে। এই গতিযুক্ত কালকে যদি স্থির করিতে পারি, কালকে যাইতে না দিই, তাহা হইলে বর্ত্তমানত্ব বর্দ্ধিত হয়। এই বর্ত্তমান কালই স্থির কাল। ইহাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠাও বলে। প্রতিষ্ঠা=প্র-স্থা ধাতু ড। স্থা-ধাতুর অর্থ স্থির বা স্থাপন। ওঁ আং ক্রীং ক্রোং যং রং, লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ মন্ত্র দ্বারা পূজাকালে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা শুধু শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন তদ্দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা; প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া বা যৌগিক কর্ম্ম। তাহা উক্ত মন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রথমে পুরোহিতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন। জল শব্দ উচ্চারণে জলের পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। জল বলিলে নদী বা সমুদ্রে যে জল থাকে, সেই জল বা বস্তুকে বুঝায়। উহা আনিয়া জলপান ক্রিয়া করিলে তবে পিপাসার নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠার বীজ মন্ত্রের ক্রিয়া করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিলে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। যদি প্রাণের প্রতিষ্ঠা বা প্রাণের স্থির হয়, তাহা হইলে অমরত্ব লাভ হয়। কালই মৃত্যুপতি বা যম। কালের শরণাপন্ন হইলে জীবের মৃত্যু হয় না। মৃত্যুঞ্জয় হইয়া স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় হইয়া যায়। ইহাই অমরত্ব। কালসর্প অর্থাৎ কালই সর্প লক্ষীন্দরকে দংশন করিয়া যাইবার সময় সেই কালসর্পের লেজটুকু কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। এই লেজটুকুকে যাইতে না দিয়া কাটিয়া রাখিয়া দেওয়ার দরুণ লক্ষীন্দরকে সঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "To catch the forclock of the time," ইহা কোন মহাজনের বাক্য। আমাদিগকেও কালসর্প দংশন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। মৃত্যু অনিবার্য্য। কালসর্পের যে লেজটুকু গমন করিবার বাকী আছে অর্থাৎ আয়ুর পুঁজি যেইটুকু খরচ হইয়া যাইবার বাকী আছে, তাহাকে যদি আর যাইতে না দিই, ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে রক্ষা; নতুবা মৃত্যু অনিবার্য্য। শাস্ত্রে আয়ুকে কি বলিতেছেন। যথা :—

বায়ুরায়ুর্বলং বায়ুর্ধাতা শরীরিণম্।
বায়ু সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ুঃ প্রত্যক্ষ দেবতা॥

স্থির কালের নাম বর্ত্তমানকাল। স্থির কালই একমাত্র সত্য। গতিযুক্ত কাল মিথ্যা বা মায়া। অষ্ট প্রকৃতি যুক্ত অপরা প্রকৃতি দ্বারা নির্ম্মিত দেহ-ঘটে পরা প্রকৃতি, প্রাণ শক্তি, কালী বা জগদ্ধাত্রী (মহাশক্তি) অবস্থান করিতেছেন। এই পরা প্রকৃতি, মহাশক্তি, প্রাণ শক্তি বা জীবনী শক্তি অবস্থান করার দরুণ নির্জ্জীব অষ্ট প্রকৃতি দ্বারা বিস্মিত দেহকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। যথা :—

ভূমিরাপো, নল বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধি রেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

অপরেয়মিত স্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। -
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
গীতা ৭ম অধ্যায় ৪।৫ শ্লোক।

ভগবানের দুইটী প্রকৃতি; একটী অপরা; অন্যটী পরা। অপরা প্রকৃতি আটটী যথা:—ভূমি, আপ, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার। ইহারা নির্জ্জীব। তাই ইহারা অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা। এতদ্ভিন্ন একটী উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছেন, উহা গতি শক্তি বা জীবের জীবনী শক্তি বা চৈতন্যময়ী শক্তি। সেই শক্তি, এই আটটী নিকৃষ্টা প্রকৃতি দ্বারা নির্ম্মিত জীব শরীরকে সঞ্জীবিত করিয়া ধারণ করিয়া আছেন। তিনি জীবের প্রাণ শক্তি, জীবনী শক্তি, জগদ্ধাত্রী বা কালী। এই শক্তির পরই তিনি স্বয়ং ভগবান্ বা শিব। কাজেই এই শক্তি তাঁহাকে বামচরণ তারা আশ্রয় করিয়া আছেন॥ যোগীবর রামপ্রসাদ সেন বলেন:—

কে জানে গো কালী কেমন,
ষড় দর্শনে যার না পায় দরশন।
কালী পদ্ম বনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ,
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে হংস শব্দের অর্থ প্রাণ। ইহা স্থির প্রাণ বা পরমাত্মা বা শিব। তাঁহাকে আশ্রয় করে যে ঊর্দ্ধাধ গতিবিশিষ্টা গত্যাত্মক প্রাণশক্তি রহিয়াছেন; তাহাই হংসী বা কালী। মানবদেহের মেরুদণ্ড মধ্যে যে ষট্‌চক্র রহিয়াছে। ঐ ছয়চক্রে ছয়টী পদ্ম আছে। এই মেরুদণ্ড মধ্যস্থ ষট্‌চক্র পদ্ম মধ্য দিয়াই প্রাণশক্তি হংসী বা কালী, মহাকাল শিবের সঙ্গে (হংসের সঙ্গে) বরাবরই ঊর্দ্ধাধ গতিতে গমন ও রমণ করিতেছেন।

তিনি সতী, পতি-সোহাগিনী, চঞ্চলা পরাপ্রকৃতি, স্থির বা শিবের আশ্রয় ব্যতীত তাঁহার বা গতির আশ্রয়ের অন্য স্থান নাই।

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মোটামুটি দুইটী জিনিষই আমাদের দৃষ্ট ও অনুভূত হয়। একটা জড় বা স্থূলজগৎ। অপরটি চৈতন্য শক্তি। এই দুইয়ের সমবায়ে এই ব্রহ্মাণ্ড। জড় ক্রমশঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বায়বীয় আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। অপরন্তু শক্তি রূপান্তরিত হইয়া জড়পদার্থে লীন বা পরিণতি লাভ করিতেছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে এই সমাপ্তি-বিহীন খেলা বা অফুরন্ত লীলা চলিতেছে। জড় চঞ্চল হইয়া চেতনায় সত্ত্বা হারাইতেছে। আবার চৈতন্য ব্যাকুল হইয়া জড়ের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিতেছে। উভয়ের বিরাম বিহীন লীলা বা ক্রিয়ার পশ্চাতে এক অখণ্ড স্থির বা ব্রহ্ম বর্ত্তমান। উহাতে সৃষ্টি তরঙ্গের স্পন্দন বা চিহ্ন নাই। এই স্থির পদই শিব বা শিবাত্মা। এই অখণ্ড স্থির কালের উপর শক্তি, গতি, কালী, প্রাণশক্তি বা জীবের জীবনীশক্তি তাঁর ক্রম স্পন্দনের দ্বারা সমুদয় ভৌতিক পদার্থগুলিকে অর্থাৎ আকাশ, অগ্নি, জল এবং ক্ষিতিকে আবৃত করিয়া আছেন। ক্ষিতিকে জল, জলকে অগ্নি, অগ্নিকে বায়ু, বায়ুকে আকাশ এবং আকাশকে সেই মহাশক্তি বা গতি আবৃত করিয়া আছেন। তাঁহার কোন আবরণ নাই। তিনি নিরাবরণ। এই জন্য তাঁহাকে ন্যাংটা (উলঙ্গ) দেখান হইয়াছে। তিনি এবং বায়ুর মধ্যে যে আকাশ বিরাজমান, এই আকাশে দর্শন করিতে হয় বলিয়া আকাশের একটি নাম অন্তরীক্ষ। অন্তর+ইক্ষ অর্থাৎ ভিতর দেখ।

সেই মহাশক্তিকে পূর্ব্বোক্ত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ক্ষিতি হইতে নিষ্কাসিত করিয়া পঞ্চভূতের উপরে স্থাপন করার নাম ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধির মন্ত্র আওড়াইলে ভূতশুদ্ধি হয় না এবং ভূতশুদ্ধি করিতে না পারিলে পূজার অধিকারী হয় না। সুতরাং প্রাণের সাধনা বা যোগ-কর্ম্মের নিতান্ত প্রয়োজন। ষষ্ঠতত্ত্বের নাম মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বে প্রাণশক্তি বা গতির স্থিতি হইলে শক্তি প্রবুদ্ধ বা জাগরিত হন। তৎপরেই অর্থাৎ সপ্তমতত্ত্ব হইতে বা সপ্তমী তিথি হইতে নবমী তিথি পর্য্যন্ত দেহদুর্গেস্থিত মহাশক্তি দুর্গাদেবীর পূজা এবং অমাবস্যায় তাঁহার পূজা হয়। এই জন্যই শক্তি পূজায় ষষ্ঠী তিথিতে বোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাণশক্তির অবস্থানের স্থানভেদে শক্তির আকার প্রকার বিভিন্ন হইয়াছে।

প্রাণ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে বলেন:—

প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণু পিতামহ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ তস্মাৎ প্রাণময়ং জগৎ॥

শ্রুতিতে বলেন :—

প্রাণঃ হবৈ মাতা, প্রাণঃ হবৈ পিতা, প্রাণঃ হবৈ আচার্য্যঃ।

চণ্ডীতে বলেন :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

দেবী = গতি বা শক্তি। মাতৃরূপেণ = প্রাণরূপেণ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

বুদ্ধি = শক্তি। প্রাণে অধিষ্ঠিতা বলিয়া প্রাণেরই অবস্থা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, শান্তি, ক্লান্তি, ছায়া, শক্তি, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, ভ্রান্তি ইত্যাদি সমস্তই প্রাণের মধ্যে অধিষ্ঠিতা প্রাণেরই অবস্থা। সবগুলি জীবদেহে প্রাণের সত্তার মধ্যে থাকে বলিয়া সবগুলিই দেবীশক্তি।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য—শক্তি কে? কাহাকে বলে? মেধস ঋষিকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি জীবের প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তিকেই শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এক প্রাণের সত্ত্বাতে সবগুলিই শক্তিরূপে বর্ত্তমান।

তিনি দেহদুর্গে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁর আর একটি নাম দুর্গা। তিনি জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, এই জন্য তাঁর আর একটি নাম ধরিত্রী বা জগদ্ধাত্রী। তিনি পরম মঙ্গলময়ী বলিয়া তাঁর একটি নাম মঙ্গলা। যথা :—

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী স্বধা স্বাহা নমস্ততে॥

তাঁর আর একটি নাম স্বস্তিকা। যথা :—

মহাভয়ানকা দেবী ভবদুঃখ বিনাশিনী।
চণ্ডিকা শক্তিহস্তা চ কৌমারী সর্ব্বকামদা॥

স্থির পুরুষ বা শিব আছেন জীবের মস্তকে আজ্ঞাচক্রে। সেই স্থিরের উপর তাঁর উত্তর বা বাম চরণ লাগা আছে এবং দক্ষিণ চরণটী দক্ষিণমুখী ক্ষেপণ করিতেছেন। এই যে স্থিরের উপর গতি শক্তি ক্রীড়া করিতেছেন, এই গতি শক্তিই কালী এবং স্থিরটি শিব বা ব্রহ্ম। স্থির ব্রহ্ম হইতে গতি শক্তির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া তাঁর আর একটি নাম ব্রহ্মময়ী। এই গতিই ক্রিয়াশীল কর্ম্ম। এই মুখ্য কর্ম্ম হইতে বহু প্রকার কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া অসংখ্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে। বহুপ্রকার কর্ম্মের ফেরে পড়িয়া জীব আসল কর্ম্ম করিতে ও বুঝিতে অপারগ হইয়াছে। যথা :—

গহণা কর্ম্মণোগতিঃ। ইতি গীতা

কর্ম্মের গতি দুজ্ঞের্য়। যেই কর্ম্মটী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যেইটী যজ্ঞ নিমিত্ত কর্ম্ম সেইটীই কর্ম্ম—এতদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মে সংসারে বন্ধন হয়। যথা :—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরং সমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
যজ্ঞার্থাং কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ :
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচর॥

অতএব মুক্তির নিমিত্ত, মুক্তির আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুসরণ ও অনুষ্ঠান করিলে ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা লাভ করিয়া ভগবৎ চরণে সকলেই উপনীত হইতে পারেন।

এই কর্ম্ম প্রত্যেকেরই জীবিতাবস্থায় করিতে হয়, মৃত্যু হইলে অন্য দ্বারা যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মে কিছুই হয় না। সুধু করা মাত্র। এই প্রাণ কর্ম্মকে কর্ম্ম দ্বারা নিষ্কর্ম্ম বা স্থির করা প্রয়োজন। স্থিরই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে। দুঃখের অবসান হইবে। যথা :—

ন কর্ম্মণামবারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্য, পুরুষোঽশ্নুতে। গীতা

এই গতি বা কর্ম্ম প্রবাহটী দক্ষিণমুখী বা জগতের অভিমুখী হইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুর প্রতি একটির না একটির উপর মন লাগিয়া রহিয়াছে। তাই জীবের জগৎকে ছেড়ে যাওয়ার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন সুখে আছি। তা হলেও বাহ্যের পীড়া, প্রস্রাবের পীড়া, ক্ষুধার পীড়া, তৃষ্ণার পীড়া, নিদ্রার পীড়া, ভয়ের পীড়া ইত্যাদি কত যে পীড়া আছে, তাহা অবর্ণনীয়। অতএব এই সমস্ত জাগতিক পীড়া বা দুঃখ হইতে শান্তি সুখ পাওয়ার জন্য গতির প্রতিকূলে গমন করিতে হইবে। এই গতির প্রবাহটি উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখী যতদূর আসিয়াছে, এখন ইহার দক্ষিণান্ত করিয়া এই গতিকে উত্তরমুখী বা উত্তর বাহিনী করিতে হইবে, তাহা হইলে দুঃখের অবসান

হইবে। কর্ম্মকে দক্ষিণান্ত করিলেই কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বা স্থির হয়। সত্যকে পাওয়া যায়। এইজন্য প্রত্যেক কর্ম্মের দক্ষিণার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃতৈতৎ অমুক কর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং দদে। দক্ষিণা পূজার পারিশ্রমিক নহে। ইহা কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বা সমাপ্তি। ইহা হইতেই বাহ্য পূজায় দক্ষিণার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

রুদ্রই প্রাণ বা শিব এবং গত্যাত্মক প্রাণ কালী। গলায় মুণ্ডমালা। তাহা প্রাণের মালা তিনি প্রাণময়ী দেবতা। সমস্ত জগতের জীব এই প্রাণসূত্রে গাঁথা।

যথা :—মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মযি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

হাতে চক্ষুবিশিষ্ট একখানা অসি। তাহা জ্ঞানচক্ষু ও জ্ঞান অসি। তাহা দ্বারা মানব স্বশরীরস্থ আসুরিক বৃত্তিগুলিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন। হাতে একটি মুণ্ড শূন্যে ঝুলান অবস্থায় রাখা হইয়াছে। এই মুণ্ডটি জীবের নিজের মুণ্ড। মুণ্ডকে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিবার অভ্যাসে আসুরিক ভাবের উদ্ভব এবং পীড়ন হইতে রক্ষা পায়। আর একটি লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া রাখা দেখা যায়। যাঁহারা যোগকর্ম্ম করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ জিহ্বাকে লম্বা করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়া মস্তকে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রাখেন। তাহাতে রক্তবীজের মত দুর্দ্দান্ত অপরিতৃপ্ত কামনা বা ইচ্ছাশক্তির জয় হয়।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।

গান:—

বাহিরে শিব, ভিতর কালী, মহাকাশ জীব রয়েছে।
মুণ্ডমালা প্রাণের খেলা, রূপের ভাঁটা খেলাইছে॥
উদয় হলে হৃৎকমলে অহং দৈত্য বিনাশিলে,
নিজের মুণ্ড স্বর্গে ঝোলে, সাধ্‌তে সাধ্‌তে এই হয়েছে॥
বরাভয় জ্ঞান অসী, পরাশক্তি পরকাশি, সকল খেলে
সর্ব্বনাশী, বলতে কি আর বাকি আছে।
পরা প্রকৃতির এ আচ্ছা লীলা, সদ্‌গুরুর এ মজার খেলা,
সে অবস্থা যায় না বলা তোমা ইসারা করিছে।

যোগ সঙ্গীত।

সন্তান যখন গর্ভে থাকে, তখন যোগী অবস্থায় থাকে। তখন তাহাদের জিহ্বা ঊর্দ্ধমুখী মস্তকের ভিতর থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সূতিবায়ুর প্রেরণায় মস্তক হইতে নিম্নমুখী জিহ্বাটী পড়িয়া যায় এবং ৭।৮ বছরের মধ্যেই জিহ্বার নিম্ন দিকে একটি গ্রন্থি হইয়া জিহ্বাটি নিম্নমুখী হইয়া যায়। ইহাকে জিহ্বা গ্রন্থি বলে। এই জিহ্বা গ্রন্থি দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়। এইজন্য ৯ বৎসর হইতে ১৬শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ ঐ বয়সে জিহ্বা গ্রন্থি তত শক্ত হয় না। জিহ্বা ক্রিয়া দ্বারা জিহ্বা গ্রন্থি খুলিয়া গেলে জীব তাহাদের স্বীয় জিহ্বাকে ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়া মস্তকে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রাখেন, তাহাতে রক্তবীজ সদৃশ কামনার জয় হয়। কামনার জয় হইলে গায়ত্রীর উপাসনা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের রাস্তা সুগম হয়।

গর্ভে কোনও ভ্রূণের বিপৎপাত হইলে, ঐ সব ভ্রূণ যাহা ডাক্তারেরা স্পিরিট দিয়া রাখেন, সেই সমস্ত ভ্রূণের জিহ্বা ঊর্দ্ধমুখী থাকা দেখা যায়। কালীর জিহ্বাকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া রাখা হইলে তাহা দেখা যাইবে না বলিয়া জিহ্বাকে নিম্নমুখী ঝুলাইয়া রাখিয়া দেখান হইয়াছে।

জিহ্বাকে ঊর্দ্ধমুখী ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়া ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রাখিলে তাহাকে খেচরী মুদ্রা বলে। এইরূপ খেচরী মুদ্রা যাঁহারা করেন, তাঁহারা সব সময়েই শুচি অবস্থায় থাকেন। যথা :—অপবিত্রঃপবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।

খেচরী যস্য সিদ্ধাতু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ॥

কালীর প্রতিমূর্ত্তির প্রত্যেক অবয়বই প্রকৃতি পুরুষের লীলা-রহস্য এবং যোগ কর্ম্মের অবস্থার নির্দ্দেশক।

রাতজাগা

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

রাতের দেউলে তারার মতো রাতজাগা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

তিরিশ বছর আগেকার কথা। প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে ইউরোপে, কিন্তু আমাদের দেশে পড়েনি তার কালোছায়া। গ্রামের মাইনর ইস্কুলে সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়ি। একদিন সকালে মহা হইচই। এখানে ওখানে জটলা। মাতব্বরদের কপালে চিন্তার রেখা। মহিলাদের চুপি চুপি কথা—জিনিসপত্র, গহনা গাঁটি, বাসন কোসন, বাক্স পেটরা, কাপড় জামা, সোনার ঠাকুর, রুপোর সিংহাসন, তামার কোশাকুশি আরও কত কি। শুনতে পাই ডাকাতের চিঠি পাওয়া গিয়েছে। এক জায়গায় নয়, বহু জায়গায়। হাটতলার হেলে-পড়া খেজুর গাছ, পশ্চিম পাড়ার পাঠক বাড়ির পাঁচিলে, মল্লিকদের সদর দরজার পাশে মরচেধরা ডাকবাক্সে, মাইনর ইস্কুলের বনলতাঘেরা বাঁশের বেড়ায়, আর কালীতলার ভেঙে-পড়া ভোগের ঘরের দেয়ালে। সব চিঠির ভাষা একই :—

* * * * *

এই পত্র দ্বারা মাঝের গ্রামের সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী পক্ষকালের মধ্যে তাঁহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হইবে। তাঁহারা যেন নিজ নিজ ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্ম প্রস্তুত থাকেন। রক্তপাত বা প্রাণহানি আমাদের কাম্য নহে। উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা হইলে দৈহিক নির্যাতন বা জীবননাশের আশংকা নাই। জয় মা কালী।

হ য ব র ল

* * * * *

বেনামী চিঠি দিয়ে ডাকাতি এ অঞ্চলে নতুন নয়। আগেও হয়েছে। কখনও কখনও ডাকাতের দল গ্রামবাসীর কাছ থেকে মোটা রকম টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে। আবার কোন সময়ে মারপিট খুনজখমও করেছে। কাজেই সারা গ্রামে আতংক খুবই স্বাভাবিক। গোল দরজায় প্রবীণদের প্রাতঃকালীন অধিবেশন সত্যিই অভিনব। জরুরী অবস্থায় কিনা সম্ভব! ত্রিলোচন বাঁড়ুজ্যে মলিন মুখে বলেন—তাইতো হে, বিপদের কথা।

হারাধন চাটুজ্যে মাথা চুলকে বলেন—বিপদ ব'লে বিপদ, মহা বিপদ। রঘুরাম থাকলে খানিকটা সাহস পেতাম। সে ছিল আমাদের মস্ত ভরসা। বাঁড়ুজ্যে খুড়ো, রঘুরামকে একঘ'রে করা ঠিক হয়নি।

ত্রিলোচন টিকি বাঁধতে বাঁধতে উত্তর দেন—ভুল করেছি হয়ত, ভুল করেছি। ও যে একেবারে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে তা ভাবিনি। মনে করেছিলাম হাতে পায়ে ধ'রে একটা মিটমাট ক'রে নেবে। একেই বলে বুনোর গোঁ।

সাতকড়ি মিত্তির ঢোক গিলে বলেন—কালু শেখ বেঁচে থাকলে কিছুই ভাবতাম না। শক্তিধর বটে। কুলে পোঁড়ার জংগল থেকে একটা মস্ত চিতে বাঘ মেরে এনেছিল। তার মারমুখো মূর্তি দেখে জানোয়াররাও ভয় পেত। একা দশজনের মহড়া নিতে পারত। তাহা অকালে চলে গেল।

বঙ্কু চক্রবর্তীর তিরিক্ষি-মেজাজ। তিনি স্থির থাকতে না পেরে বলেন—ও সব বাজে কথায় লাভ কি? রঘুরামও ফিরবেনা আর কালু মিয়াও কবর ছেড়ে উঠে আসবে না। ব'সে ব'সে শুধু দুঃখ করলেই কি সমস্যার সমাধান হবে না ডাকাতের লাঠি রেহাই দেবে? ঝটপট কর্তব্য স্থির করুন। গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করুন। তারা যেন মনোবল না হারায়।

অপ্রস্তুত হয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বলেন—কাজের কথা বলেছে বঙ্কু। গতস্য শোচনা নাস্তি। আর সময় নষ্ট করা

উচিত নয়। অলংকার ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে ফেল। ছেলেরা রাতে পাহারা দিক। আমরাও সজাগ থাকি; আত্মরক্ষার যথাসম্ভব ব্যবস্থা চাই। শেষ নির্ভর ভগবান। তিনিই দুর্দিনের সহায়! ভয় পেলে বিপদ বাড়ে বই কমে না।

বিজ্ঞদের বৈঠক শেষ হয় অনেক বেলায়। দুপুরে শুরু হয় প্রস্তুতি পর্ব। অভাবনীয় ক্ষিপ্রতা। অবিস্মরণীয় দৃশ্য। আশু মজুমদারের শরণাপন্ন হল অবস্থাপন্নেরা। তাঁর বাড়িতে আছে বিরাট গুপ্ত কক্ষ আর মজবুত লোহার সিন্দুক। তাই সেখানে ভিড় জমে গহনার বাক্সের। যাদের বাস মাটির ঘরে তারা মেঝে খুঁড়ে জিনিস বোঝাই তোরংগ পুঁতে ফেলে। কেউ কেউ পেতলের ডেক ভরতি ক'রে উঠনের কোনে বেগুন গাছের আড়ালে মাটি চাপা দিয়ে রেখে আসে। কোন কোন গৃহস্থ আবার খিড়কির কলাবাগানের অন্ধকারে ভারি ভারি মাটির হাঁড়ি মুখ বন্ধ ক'রে ইতস্তত বসিয়ে রাখে। মাজা ভাঙা বিন্দু বোষ্টমী লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির। হাতে একটা ছোট বালিশ। ঠাকুরমাকে বলে—গিন্নী মা, দয়া ক'রে আপনাদের চোর কুঠরিতে আমার এই বালিশটা রাখুন। এর মধ্যে চল্লিশটি টাকা আছে। অনেক কষ্টে জমিয়ে রেখেছি মরলে যাতে গংগা পাই। বরাবর মাইপোশে রাখতাম, এখন সাহস হয় না। পাড়ার কেউ আমাকে দেখতে পারেনা। কোন্ শত্তুর ডাকাতদের কানে কানে ব'লে দেবে কে জানে!

পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ বিশেষ বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্রের ঘাঁটি। বাঁশ লাঠি, কোদাল কুড়ুল, বর্শা বল্লম, দা ছোরা, তরোয়াল বলিদানের খাঁড়া—সব জিনিস থরে থরে সাজানো। প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ রামপ্রাণ মুখুজ্যে ও জমিদার নবীনমাধব সার্বভৌম গাদা বন্দুকের নল পরিষ্কার ক'রে ঠেসে বারুদ ভরেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ভয়ে বুক টিপ টিপ করলেও মুখে তাঁদের তাচ্ছিল্যের হাসি। ভাবটা এই—কোন ভাবনা নেই, আমাদের দুই বীরের বন্দুকের সামনে ডাকাতের দল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

আমরা ছাত্র। আমাদের ভিতর খেলা করে তারুণ্যের তড়িৎ। চুপ ক'রে থাকি কেমন ক'রে? তিনটি কাজের ভার নিই—রাতজাগা, সংকেতধ্বনি ক'রে সকলকে জাগানো, প্রথম প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। মটুর ও মহাদেব শতরঞ্জি, বালিশ, হারিকেন, দেশলাই, খাবার জলের কলসি ও গেলাস এনে হাজির করে আমাদের পুজো বাড়ির ছাদের ঘরে। হাঁদার নাদুস নুদুস চেহারা। নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। কিন্তু সেও হাতপাখা নিয়ে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। আমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে কয়েকটা শাঁক যোগাড় করি। ভূতনাথ, বিরিঞ্চি, নিরঞ্জন, প্রভাত রাশি রাশি ইঁটপাটকেল জড়ো করে ছাদের ওপর। সন্ধ্যার আগেই আয়োজন সম্পূর্ণ।

দশটাতেই নিষুতি রাত। সারাদিনের পরিশ্রমে ও চিন্তায় ক্লান্ত ক্লিষ্ট পল্লীবাসী নিদ্রিত। গ্রামের উচ্চতম গৃহশিখরে আমরা আটজন কিশোর প্রহরী। সম্মুখে প্রহরণের পাহাড়। মাথার উপরে নক্ষত্রপুঞ্জ। ভাবি এরা যুগ যুগ ধ'রে জাগছে, আমরা কিছুদিনের জন্য পারব নিশ্চয়ই। মনের জোর বাড়ে। সোৎসাহে গল্প আরম্ভ করি। প্রভাত বলে মামার বাড়ির ইতিহাস। বিরিঞ্চি শোনায় বানের সময় মাছধরার কাহিনী। মটুর মেটিরির মেলার কথা তোলে। রাত গভীর হয়। একে একে সবাই শুয়ে পড়ে। আমার ঘুম আসেনা। নস্যির নতুন নেশা। বেশীক্ষণ একা ব'সে থাকতে ভালো লাগেনা। থমথমে আকাশের নিচে গা ছমছম করে। ঘরে গিয়ে হাঁদার পিঠে হেলান দিয়ে বসি। ভয় হয় এখনই বুঝি ডাকাতের হুঙ্কার শোনা যাবে। ছেলেবেলায় পড়া গায়ে কাঁটা দেওয়া ছড়াগুলো বার বার মনে আসে। তন্দ্রালু চোখের সামনে আনাগোনা করে 'একানোড়ে', 'কানকাটার মা', 'জুজুমানা', 'কটকটে', 'বাঁশতলার বুড়ী', 'ফটিংটিং', 'হুম্হুম্, মুম্হুম্'। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি জানতে পারিনে।

প্রথম রাতটা এক রকম কাটে। কিন্তু এভাবে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে তো মুশকিল। দ্বিতীয় রাতটা যাতে সহজে জানা যায় সে জন্য দিনের বেলায় খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। তাছাড়া নানা রকম ঘুম তাড়ানো উপায় অবলম্বন করি। প্রথমে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা। প্রভাত ব'লে—দেখি কার কেমন মনে আছে। 'অজগর আসছে তেড়ে' থেকে 'চন্দ্রবিন্দুর মাথা হেঁট' পর্যন্ত মুখস্ত বলতো।

'ঔ' অবধি বলার পর মহাদেবের বাধে। নিরঞ্জন 'ন'

পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ভূতনাথ একটু ব'লেই একেবারে চুপ। বিরিঞ্চি কেবল মাথা নাড়ে, আর সায় দেয়, কাজের বেলায় কিছুই উদ্ধার করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হাঁদার জয়জয়কার। সে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে 'চন্দ্রবিন্দু'তে এসে পৌছায়। ভারি মজা। অনেকটা সময় কাটে। তারপর শব্দগঠনের পরীক্ষা। আমি বলি 'সৌ' মটুর বলে 'র', বিরিঞ্চি বলে 'ক', হাঁদা বলে 'রো', প্রভাত বলে 'জ্জ', ভূতনাথ বলে 'ল'। পণ্ডিত মশায়ের প্রেরণায় বাংলা ভাষায় দখল আমাদের মন্দ নয়। শব্দ সম্পদও বেশ। 'সৌরকরোজ্জ্বল', 'অস্তাচলচূড়াবলম্বী', 'জলধরপটল সংযোগে', 'মন্দমারুতান্দোলিত ইত্যাদি ভারি ভারি শব্দ যোজনার ভিতর দিয়ে দেখতে দেখতে প্রহর পেরিয়ে যায়। দুটো বাজে। বিন্তি খেলার প্রস্তাব সমর্থিত হয় না। তখন চারিপাশে হাই-উঠছে। ডাকাতদের আবির্ভাবের কোন লক্ষণ নেই। গ্রাম নীরব নিঝুম। কাঠ-ঠোকরা ঠক ঠক করে। হুতোম প্যাঁচা উড়ে যায়। চৌকিদার হাঁক পাড়ে। তার ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে। তারপর বিশ্বগ্রাসী বিজনতা।

তৃতীয় রাত্রে গোলোকধাম খেলা বেশ লাগে—সংসারে পতন, কৈলাসে গমন। বেশ লাগে চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক। লোকে লোকান্তরে যাতায়াত ক'রে খেলুড়েরা শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা চায় বিশ্রাম, যায় তন্দ্রালোকে —নিদ্রালোকে—সুষুপ্তিলোকে। জাগ্রত জগতে আমি একা। মহাদেব রাত জেগে যাত্রা শুনতে ওস্তাদ। কিন্তু এখন সে কুম্ভকর্ণ। চিমটি কেটেও ঘুম ভাঙানো যায় না। 'হুঁ হুঁ' করে, আর পাশ ফিরে শোয়। নিরঞ্জনের নাক ডাকে সে থেকে থেকে চমকে ওঠে। বিরিঞ্চি একেবারে বেহুঁশ শুধু শোনা যায় তার নিশ্বাসের আওয়াজ। হাঁদা ঘুমে কাদা—বকবক ক'রে বকে, না হয় ফিক ফিক ক'রে হাসে—হয়তো স্বপ্ন দেখে ফুটবল ম্যাচ, নয়তো পুঁতুল নাচ। বাকী তিনজন সজাগ—ডাকলে সাড়া দেয়, ওঠে, ব'সে ব'সে ঢোলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। চেষ্টার ত্রুটি নেই। নিবিড় অন্ধকারে চোখ বুঁজে থাকি। চোখ খুললে মনে হয় যেন গ্রামের মরা মানুষগুলো চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থাঁদা-নাক কার্ত্তিক কাঁসারী, টেকো মাথা বেন্দা বৈরাগী, লম্বা দাড়ি সামসুদ্দী সাপুড়ে, ছিঁচ কাঁদুনী ডিমি ডাইনী। এদের যেন অন্য কাজ নেই, একটুও মায়া মমতা নেই ছেলেমানুষদের ওপর। সাধে কি আর লোকে বলে ভূত! ভয়ে ও অনিদ্রায় মাথা ঝিম ঝিম করে। ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় সুস্থবোধ করি।

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। বুড়োদের বাহবা, বুড়িদের আহামরি। ক্রমে সক্রিয় সহানুভূতি পাওয়া যায় একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। সরসী বৌদি বলেন—রাত জাগার সবচেয়ে ভালো উপায় ভালো বই পড়া। প্রসন্ন জ্যাঠার বইয়ের অভাব নেই। তাঁর কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলি চেয়ে আন। সকলে মিলে পড়া যাবে।

মালতীদি সরসী বৌদির চেয়ে বয়সে ছোট। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব কিন্তু গাঢ়। মালতীদি বলেন—বৌদির কথা ঠিক। বঙ্কিমবাবুর বই আমি দু একখানা পড়েছি। চমৎকার। আমিও রাতজাগব তোমাদের সংগে।

সরসী বৌদির সংসারে সুখ নেই। সন্তান হয়নি ব'লে শাশুড়ী যখন তখন ভয় দেখান ছেলের আবার বিয়ে দেবেন। লেখাপড়া জানা শহুরে মেয়ে। সাধারণের কাজে নিজেকে নিযুক্ত ক'রে জীবনের শূন্যতাকে ভুলতে চেষ্টা করেন। মালতীদির কাহিনী আরও করুণ। মাতাল স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। নিরুপায় হয়ে চোখের জলে ফিরে এসেছেন বাপের আশ্রয়ে। গ্রামের মংগলের জন্য ইস্কুলের ছেলেদের প্রাণপণ প্রয়াস মহিলা দুজনের স্নেহসিক্ত হৃদয়কে স্পর্শ করে গভীর ভাবে। আমাদের সংগে কী আন্তরিক সহযোগিতা! আমাদের কষ্ট কমানোর জন্য কত আগ্রহ।

সরসী বৌদি উপন্যাস পাঠ করেন। সকলে মন দিয়ে শোনে। তিনি যখন ক্লান্তি বোধ করেন আমি তখন পড়ি। আঁধার সরে, আলো ফোটে। ঝিঁঝির একঘেয়ে ডাক আসে, পাখীর বিচিত্র কলরব জাগে। কখন যে পটপরিবর্ত্তন হয় কিছুই বুঝতে পারিনে। একঘণ্টা পাঠের পর আধঘণ্টা বিরতি। মালতী দি চা তৈরি করেন। দাদা চা বাগানের কর্মচারী—অফুরন্ত চায়ের ভাণ্ডার। ছাদের একধারে উহুন। নিরন্ত কাঠের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চোখ রাঙা। ভ্রূক্ষেপ নেই মালতীদির। সকলকে খাইয়েই তাঁর তৃপ্তি। সরসী বৌদি চা পান শেষ ক'রে

পানের কৌটটা এগিয়ে দিয়ে বলেন—একটা খাও ভাই, অনেক খেটেছ।

এ দ্রব্যের বিনিময় নয়, অন্তরের বিনিময়। নারী শক্তির উৎস। পুরুষের কর্মের প্রেরণা তারই দান। তাই ধরণী কোনদিনই ধৈর্যহারা হয়নি, মানুষের খেলাঘর এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে; হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে সৃষ্টির অবিরাম লীলা চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে।

আসর জমজমাট। কোথায় লাগে বাসর জাগা! পাঠচক্র সৃষ্টি করে নতুন জগৎ। সেখানকার সুখ দুঃখে জড়িয়ে পড়ি। ডাকাতের হানা, শাঁক বাজানো, ইঁট ছোড়া—সব কথাই ভুলে যাই। 'দেবী চৌধুরাণী', 'কপাল কুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'চন্দ্রশেখর' সমাপ্ত। যেদিন আরম্ভ হবে 'আনন্দমঠ' সেদিন অপরাহ্নে আনন্দ সংবাদ নিয়ে আসে চরণ চৌকিদার। সংবাদের সার মর্ম এই :—

* * *

কাল দুপুর রাতে চার ক্রোশ দূরে নিশ্চিন্দিপুরের ধনী ব্যবসায়ী গণপতি গড়াইয়ের গদিতে ডাকাত পড়ে। নিশ্চিন্দিপুরের লোকেরা নিশ্চিন্ত ছিল না। আমাদের গাঁয়ের উড়ো চিঠির কথা শুনে তারা রীতিমতো তৈরি হয়েছিল। গোয়ালার গাঁ—ঘরে ঘরে জোয়ান মদ্দ। শুম্ভনিশুম্ভ দুই ভাই এমন লাঠি চালায় যে ডাকাতের সর্দার আহত হয়ে প'ড়ে যায়। চেলাদের গোয়ালারা তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খড়িমাঠের জোলের মধ্যে ধ'রে ফেলে। আজ সকালে নাকাশিপাড়ার দারোগা এসেছেন, কাল কৃষ্ণনগরের পুলিশ সাহেব আসছেন।

* * *

ডাকাতের দলের ধরা পড়ার খবরটা যেমন গ্রামময় রটা, অমনি গোল দরজায় রথের ভিড়। হুঁকো হাতে কাসতে কাসতে বাঁড়ুজ্যে মশাই ছুটে আসেন। মুখভংগি ক'রে ঝংকার দিয়ে ওঠেন—আমাদের এখানে এলেও বাছাধনদের বুঝিয়ে দিতাম। আমরাও কম প্রস্তুত ছিলাম না। যাক, ফাঁড়া কেটে গেল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। রাত জেগে জেগে ছেলেগুলোর চেহারা হয়েছে দেখ না—যেন গাজনের সন্ন্যাসী। ওরাও ঘুমিয়ে বাঁচবে।

কালীতলার গৌরাংগ ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেন—আমি কিন্তু ঘাবড়াইনি বাঁড়ুজ্যে মশাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই পীঠস্থানে কখনও ডাকাতের অত্যাচার হবে না।

সরাসরি জবাব দেন বাঁড়ুজ্যে মশাই—ওটা কোন কাজের কথা নয় হে। ডাকাতরাও কালী সাধনা করে, আর দেবীর প্রসাদও পায়। চৌধুরী নগরের 'ডাকাতে কালী'র কথা শোননি? ঠাকুরদার মুখে শুনেছি ডাকাতির পয়সাতেই চৌধুরীরা জমিদারি কেনে।

পশ্চিম দিগবধূর সীমান্তে সিঁদুর পরিয়ে সূর্য লুকিয়ে পড়ে অস্তাচলের অন্তরালে। শান্তির বারি বর্ষণ করে সন্ধ্যাতারা অসীমের আনন্দ থেকে।

মাঝের গ্রামের অধিবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ঘরে ঘরে ফিরে আসে স্বাভাবিক সংসারযাত্রা। ভৈরবী সুরে বাজে জীবনের বীণা। রাত জাগার রংগমঞ্চে আকস্মিক যবনিকা পতনে আমরা মনমরা হই। আবার সেই শান্তি-পল্লীর মন্থর কার্যক্রম। সেই উদ্‌বেগহীন, উত্তেজনাহীন পোষমানাদিনের পালা। সেই অবসাদ—বিষাদ—কোমল গান্ধার।

শ্রীশ্রীললিতাম্বিকার নামরহস্য

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীললিতাসহস্রনাম স্তোত্র একটি অপূর্ব গ্রন্থ। এই অংশটি পুরাণের উত্তরভাগে গ্রথিত হয়েছে। ভগবান্ হয়গ্রীব কর্তৃক এই সহস্র নাম স্তব শ্রীবিদ্যার উপাসক মহামুনি অগস্ত্যের প্রতি উপদিষ্ট হ'য়েছে। মহাভারতের যেমন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, মার্কণ্ডেয়পুরাণের যেমন দেবীমাহাত্ম্য, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ও তেমনি ললিতা সহস্র নাম স্তব হিন্দুর শাস্ত্রসমুদ্রের অন্যতম রত্নরূপে বিরাজমান। এর উদ্ভব সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত রয়েছে, তা'তে জানা যায়, পুরাকালে শ্রীবিদ্যার পরম উপাসক মহামুনি অগস্ত্য শ্রীমদ্ হয়গ্রীব ভগবৎ-সমীপে ললিতাম্বিকার মন্ত্র-জপ-ন্যাস-পূজা-পুরশ্চরণ-হোম-রহস্য-স্তোত্র প্রভৃতি যাবতীয় শ্রীতত্ত্ব অবগত হয়েও তপোবলে জানতে পারেন, এতদধিক আরো এক পরম রহস্য নাম সহস্ররূপে অবশিষ্ট রয়েছে, ভগবান্ যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দেখান নি। তখন অগস্ত্য ভগবৎ-সমীপে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করাতে ভগবান্ জিজ্ঞাসু অগস্ত্যকে প্রকৃত ভক্ত বলে পরিচয় পেয়ে এই উপদেশ দান করেন। অগস্ত্য বলেছিলেন—

"অশ্বানন মহাবুদ্ধে সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
কথিতং ললিতাদেব্যাশ্চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥
নতু শ্রীললিতাদেব্যাঃ প্রোক্তং নাম সহস্রকম্।
তত্র মে সংশয়ো জাতো হয়গ্রীব দয়ানিধে॥
কিংবা ত্বয়া বিস্মৃতং তজ্জ্ঞাত্বা বা সমুপেক্ষিতম্।
মম বা যোগ্যতা নাস্তি শ্রোতুং নাম সহস্রকম্॥"

অগস্ত্যের এই কাতরতায় ভগবান্ তুষ্ট হয়ে অগস্ত্যের প্রকৃত মনোভাব অর্থাৎ ভক্তিভাব বা আগ্রহ জানতে পেরে এই রহস্য-শাস্ত্র উপদেশ করেন, কারণ অভক্তকে কখনো রহস্য সন্ধান দেওয়া যেতে পারে না। ভগবান্ তাই বললেন—

"রহস্যমিতি মত্বাঽহং নোক্তবাংস্তে ন চান্যথা।
পুনশ্চ পৃচ্ছসে ভক্ত্যা তস্মাত্তত্তে বদাম্যহম্॥"

এই নামসহস্র যে অতিশয় গুহ্যতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ হয়গ্রীব মহামুনি অগস্ত্যকে উপসংহারাধ্যায়ে স্পষ্ট বলেছেন :—

"ইত্যেবং নামসহস্রং কথিতং তে ঘটোদ্ভব।
রহস্যানাং রহস্যং চ ললিতাপ্রীতিদায়কম্॥
অনেন সদৃশং স্তোত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ যে অতি প্রাচীন তা'তে ঐতিহাসিক বিচারেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উত্তর-গীতাটিও নানা-তথ্যের সম্ভারে পরিপুষ্ট একটি রত্নস্বরূপ। এই উত্তর গীতার একটি ভাষ্য রচনা করেছেন শুকদেবশিষ্য-আচার্য গৌড়পাদ। এ ছাড়া পরবর্ত্তিকালে গৌড়পাদাচার্যের প্রশিষ্য শঙ্করাচার্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ললিতাত্রিশতীরও ভাষ্য রচনা করেছেন।

বিষ্ণুসহস্র নাম, শিবসহস্র নাম প্রভৃতি সহস্র নাম বিষয়ক আরো নানাবিধ গ্রন্থ সত্ত্বেও ললিতাসহস্র নামস্তোত্র গ্রন্থখানির একটা বিশেষত্ব রয়েছে ; অন্যান্য সহস্র নামে একই কথার পুনরাবৃত্তিতে দ্বিরুক্তি, ত্রিরুক্তি প্রভৃতি বাক্যদোষ লক্ষিত হয়, এই গ্রন্থখানিতে সে দোষ দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও তন্ত্রবিদ্ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতরাজ ভাস্কর রায় ভারতী যে অপূর্ব ভাষ্য রচনা করেছেন, তা'তে এই নামসহস্রের সর্ব রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। ভাষ্যকার এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-সংহিতা আগম নিগম-কোষ-ছন্দ-জ্যোতিষ-দর্শন-সাহিত্য প্রভৃতি অজস্র গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন, তন্মধ্যে কেবল তন্ত্রগ্রন্থের সাহায্যই নিয়েছেন ৩৫খানার। তার মধ্যে কালিকাতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, তন্ত্ররাজ, তন্ত্রসার, নীলাতন্ত্র, ভক্তিতন্ত্র, মৈরালতন্ত্র, স্বতন্ত্রতন্ত্র, স্বচ্ছন্দতন্ত্র, লক্ষ্মীতন্ত্র, রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সমুদয় তন্ত্র ও অন্যান্য সংহিতার সাহায্যে গ্রন্থকার নামরহস্য অতিসুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তা'তে দেখা যায়, চক্ররহস্যের উদ্ধারক্রমে যে সমুদয় নাম নির্ণয় এই স্তোত্রে রয়েছে, তা চিত্তে গভীর বিস্ময় উৎপাদন করে। ভাষ্যকার আচার্য ভাস্কর ভারতী অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে সকল রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেও অনেকক্ষেত্রেই 'এ তত্ত্ব গুরুমুখাধিগম্য—এ তত্ত্ব গুরুপরম্পরাজ্ঞেয়' ইত্যাদি উক্তিদ্বারা রহস্যজালগত অধিকতর জটিলতার সন্ধানই যেন দিয়ে গেছেন।

এর তত্ত্ব যে একান্ত রহস্যপূর্ণ একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, এবং প্রকৃত ভক্ত সাধক ভিন্ন যে অন্যকেও এ তত্ত্ব শোনবারও অধিকার পেতে পারেন না, এ ইঙ্গিতও ভগবান্ হয়গ্রীব মুনিবর অগস্ত্যকে বলেছিলেন। এই দুর্জ্ঞেয়তার আবরণজনিত এর প্রকৃততত্ত্ব বা তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্তি আসা অস্বাভাবিক নয়, এজন্য ভগবান্ হয়গ্রীব ললিতাম্বিকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে এঁর পরিচয়ে বলেছেন—

"পুরাণাং শ্রীপুরমিব শক্তীনাং ললিতা যথা।
শ্রীবিদ্যোপাসকানাঞ্চ যথা দেবো বরঃ শিবঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা বা শ্রীশক্তি উপাসকদের যেমন পরমশিব, সমুদয় শক্তির মধ্যে এই ললিতাদেবী তেমনি পরম শিবসদৃশী, মাতৃকারূপা পরাশক্তি যে পরমেরই অভিন্নরূপা তা' অন্যান্য শাস্ত্র থেকেও জানা যায়।

...র বিবৃতিতে বলা হ'য়েছে—"স্বাভাসা মাতৃকা জ্ঞেয়া ক্রিয়াশক্তিঃ ...ঃ পরা।"

পুরাণ তন্ত্রাদিতে এই শ্রীবিদ্যারূপা পরাশক্তিকে ললিতাদেবী নামেই ...া দেওয়া হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেছেন—"শ্রীর্দেবী ললিতাম্বিকা" (...লিতা ত্রিশতী) ঐ পুরাণের অন্যত্রও বলা হ'য়েছে—

"শ্রীবিদ্যৈব তু মন্ত্রাণাং তত্র কাদির্যথা পরা।
শ্রীমাতুঃ প্রীতয়ে তস্মাদনিশং কীর্ত্তয়েদিদম্ ॥"—ইত্যাদি।

...' হলে মন্ত্র হ'বে "শ্রীমাত্রে নমঃ"। নাম নির্ণয় প্রারম্ভেও এতে বলা ...য়েছে "শ্রীমাতা শ্রীমহারাজ্ঞী শ্রীমৎসিংহাসনেশ্বরী" ইত্যাদি।

শ্রীবিদ্যাকে 'ললিতা' বলবার কারণ হ'ল ত্রিলোকে তিনিই কান্তি-...। চণ্ডীতে রয়েছে "যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা"। 'ললিতা' শব্দটি কান্তি বা সুন্দরার্থক। "ললিতা ত্রিশতী"র শঙ্করভাষ্যে বলা হ'য়েছে—"ললিতং ত্রিষু সুন্দরম্"। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণও কমনীয়া কলাবতীরূপেই নাম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—

"ককাররূপা কল্যাণী কল্যাণগুণশালিনী।
কল্যাণশৈলনিলয়া কমনীয়া কলাবতী ॥"

এভাবে দেখা যায় এই শ্রীবিদ্যা বা ললিতাম্বিকা মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের মহামায়া বা যোগমায়া বিষ্ণুশক্তিরূপেই পরিচিত হয়ে ...ছেন। এই "শ্রী" শব্দ যে সাধারণতঃ বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীবাচক ...কথা সর্বশাস্ত্রসিদ্ধ। এই শ্রীশক্তি সম্বন্ধে হয়গ্রীবশীর্ষ-পঞ্চরাত্র ...লেন—

"পরমাত্মা হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥"

...দেখা যাচ্ছে, 'শ্রী' হলেন তা' হলে ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্ম পুরুষোত্তম ...—সুতরাং তাঁরই শক্তি শ্রী অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি। বিষ্ণুশক্তিই ...মায়া। আর ললিতাম্বিকাকে আমরা এখানে যোগমায়ার অভিন্ন-...পেলাম। এ তথ্যটি আমাদের দেবী মাহাত্ম্যের বিষ্ণুশক্তি যোগমায়ার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ব্রহ্মশক্তি যে আবার ব্রহ্মময়ী মহামায়া এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। শক্তি আর শক্তিমান্ যে অভিন্ন, অগ্নি আর অগ্নি-প্রভার ন্যায় উভয়ে অভেদ এ তত্ত্ব আমাদের দর্শনশাস্ত্র সিদ্ধ কথা। তা হ'লে ফলতঃ দাঁড়াল, এই মাতৃকাশক্তি শ্রীললিতাদেবী আর ভগবান্ বিষ্ণু অভিন্ন তত্ত্ব।

বস্তুতঃ অন্যান্য পুরাণ থেকেও তথ্যমূল এ তত্ত্ব আমরা লাভ করতে পারি। এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলেছেন—কৃষ্ণ নিজেই ললিতাদেবী, যা রাধিকা বলে গীত হয়ে থাকে। এবং কৃষ্ণ স্বয়ং যোষিৎস্বরূপও; সনাতনী যোষিদ্রূপা ললিতাদেবীই পুরুষরূপে শ্রীকৃষ্ণ। ললিতাদেবী আর শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই।—

"অহং চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ গীয়তে।
... ...
সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী।
অহং চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥"

(পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড)

এক্ষণে তাৎপর্যটি সুব্যক্ত হয়ে উঠেছে যে, কৃষ্ণাভিন্ন এতাদৃশ ললিতাদেবীর তত্ত্বোপলব্ধিতে একান্তই ভক্তিমান্ পুরুষ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অনধিকারী। এজন্যেই ভগবান্ হয়গ্রীব প্রথমতঃ মহামুনি অগস্ত্যকেও এ তত্ত্ব দানে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। মনে হয়, ভগবান্ ভক্তির অপরূপ মাহাত্ম্য প্রকাশ করবার অভিপ্রায়েই এই নাম রহস্যের অপার মহিমা প্রকাশ করে বলেছেন—একবারে এই নাম যত শক্তি ধরে, জীবের কি সাধ্য হয় তত পাপ করে—

"বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণু ত্বং কলশীসুত।
অত্রৈকনাম্নো যা শক্তিঃ পাতকানাং নিবর্ত্তনে।
তন্নিবর্ত্ত্যমঘং কর্ত্তুং নালং লোকাশ্চতুর্দশ ॥"

মরণ-কালে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

প্রবচন আছে—জপ তপ কর কি, মরতে জানলে হয়। মৃত্যু ভয় সনাতন। জনমের সাথী মরণ—এ সত্য সবাই জানে। সাধনা যার নাই, দুঃখকে নিরোধ করবার শক্তি যেথা স্বল্প, দুঃখের প্রাবল্য তথায় অধিক। কিন্তু আত্ম-রক্ষার সংস্কার জীবনের আদিম বৃত্তি, বিশাল জীবজগতে। জন্মিলে মরিতে হয়—এ চেতনা মানব-চিত্তের পটভূমিতে বিগুমান। আর কবে হবে জীবনান্ত—তার বাঁধাধরা নিয়ম নাই সংসারে। শিশু পলায় দেহ ছেড়ে জননীকে ভাসায়ে অশ্রুজলে। আবার দুর্বিবহ জীবন আঁকড়ে থাকে দেহকে দিনের পর দিন স্থবির শয্যাশায়ী বৃদ্ধের।

জীবন সম্বন্ধে মানুষ বিরক্তির উক্তি যা কিছু করে তার মূলে থাকে বেদনার উপদ্রব। তাই তার অন্তরাত্মা চায় জীবনকে সচল রাখতে। মানুষ যোদ্ধা। সে যুঝতে চায় দুঃখের অভিযানের সাথে। তাই সময় চায় বিজয়ের আশায়। অন্তরাত্মা জানে মৃত্যু নিশ্চিত—জগতের সকল অনিশ্চিত ঘটনা দুর্ঘটনার মাঝে।

এক শ্রেণীর ভাবুক আছে চিরদিন তারা স্বীকার করতে চায় না—পরজন্ম। মৃত্যুর সাথে সকল শেষ। কেহ তো দেখেনি পূর্ব্বজন্ম, কে সাক্ষ্য দিয়েছে পরজন্মের। কী রূপ তার আকৃতি? তাই তারা ভাবে এ জনমের সুখ দুঃখই প্রকৃত। বৃথা কল্পনা। অকেজো চিন্তা কেন অনন্ত জীবনের। পান ভোজনে দেহের সুখ। তাতে দুঃখ যাবে পালিয়ে। কিন্তু দুঃখ কি ছাড়ে সে পথের যাত্রীকে? জগত চলে নিজের ছন্দে, যার সুর তাল নিয়ন্ত্রণ করে অসংখ্য কারণ।

মানুষ যখন ধীর হ'য়ে ভাবে জীবন রহস্য, তখন উপলব্ধি আপনা হ'তে ভাসে—এসেছি এক দেশ থেকে, চলে যাব অন্য দেশে। এ পৃথিবীতে জীবমাত্রেই প্রবাসী। এ চিন্তা বিভিন্ন রূপ নেয়। কেহ জানে এর পর মাত্র একটা অনন্ত জীবন আছে। কেহ জানে বহু জন্ম পার হ'য়ে এসেছি। আরও বহু জন্মজন্মান্তর এ অফুরন্ত কাল সংসারে ঘুরতে হ'বে—অনন্ত জীবন পাবার সন্ধানে এবং প্রচেষ্টায়।

যে পরজন্ম মানে সে জানে যে পরজন্মের সুখ শান্তির, বিধিব্যবস্থার অবকাশ এই জীবন। য়িহুদী, খৃষ্টীয়, মুস্লিম প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় পুনর্জ্জন্মবাদ মানে না। যদি প্রফেট বা পয়গম্বরের নির্দিষ্ট পথে ধর্ম্ম আচরণ করে জীব, ভবিষ্যতে লাভ হ'বে তার অনন্ত সুখময় জীবন। যদি সে অধর্ম্ম আচরণ করে মাত্র এ জীবনে, মানুষকে চিরদিন দহিতে হবে অনন্ত নরকে। ধর্ম্মপথ সেই পথ, যা' তাদের শিক্ষা দিয়েছেন পরমেশ্বরের দূত। তারা পুনর্জ্জন্ম মানে না। কিন্তু মরণের পর জীবন আছে এ সত্য মানে।

ভারতের ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছে—শুদ্ধির পর শুদ্ধি জন্ম-জন্মান্তরে নির্ম্মূল করতে পারে দুঃখালয় শাশ্বত জীবনের অভিনয়। ভগবান বুদ্ধ সে শুদ্ধ অবস্থার নাম দিয়েছেন—নির্ব্বাণ। অন্য অবতার, মহা-মানব, মহা-পুরুষ বলেছেন মোক্ষের পথ এই জীবন পথ যদি মানুষ মোহময় এই অখিল হ'তে আত্মার মায়ার আবরণ উন্মোচন করতে পারে।

পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস যাহাই হ'ক, প্রত্যেক বিজ্ঞ মানব এ কথা স্বীকার করেছেন যে—মৃত্যুভয় অলীক তার পক্ষে যে জীবনে নীতির পথ অনুসরণ করে। ভক্ত সে পথকে জানে ধর্ম্মের পথ—যে পথের কথা তার সম্প্রদায়ের গুরুমুখে ব্যক্ত। যে ঈশ্বর মানে না তারও নীতির পথে পরের উৎসাদন বা পীড়ন নাই, অকারণ নির্দ্দয়তা নাই।

রবীন্দ্রনাথ ভক্ত। সকল সুরে ভগবানের উদার সুরের ঝঙ্কার শুনতেন। মৃত্যুভয় সকল ভয়ের মত বিশ্বাস হীনতার পরিণাম। তাই তিনি বলেছেন—

> তুমি সর্ব্বাশ্রয় এ কি শুধু পূণ্য কথা?
> ভয় শুধু তোমা 'পরে বিশ্বাস হীনতা
> হে রাজন!……

মৃত্যুভয়

> কী লাগিয়া হে অমৃত? দুদিনের প্রাণ
> লুপ্ত হ'ল তখনি কি ফুরাইল দান,
> এত প্রাণ দৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব?
> সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?

সত্যই তো এ জীবন যে ব্যক্তমধ্য সে ধারণা প্রকৃতিগত। সামান্য চিন্তাতে উপলব্ধি করা যায় সে সত্য। কেন এত পার্থক্য জীবে জীবে? রবীন্দ্রনাথ কি মাত্র এক জন্মের সাধনার ফল? ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, তিনি জন্মজন্মান্তর শুদ্ধ হ'য়ে তবে শুদ্ধ বুদ্ধ অর্হত হ'য়েছেন। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার কি আকস্মিক কৃতিত্ব? এদেশের কৃষ্টি বলে নিউটন বা আয়েনষ্টিন, জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্র পুনর্জ্জন্মের কৃতিত্বের ফলে প্রকৃতির গোপন শক্তির সন্ধান লাভ করেছিলেন।

মৃত্যুভয়ের প্রতিরোধ ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত অপূর্ব্ব ভক্তিতে বিবৃত করেছেন। শেষ সিদ্ধান্ত—

ওমিতেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্। ৮।১৩

একাক্ষর ব্রহ্ম ওম্ শব্দ উচ্চারণ ক'রে এবং আমাকে স্মরণ করে যে দেহ ত্যাগ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এ চরম নির্দ্দেশ সহজে পালন করা অসম্ভব। মনের বিক্ষেপ সাধারণ সুস্থ অবস্থায় প্রচুর। ধান ভানতে মন গায় শিবের গীত। শ্মশানবাসী শিবের পায়ে বিল্বপত্র অর্ঘ্য দেবার সময় মন দেখে কুবেরের ধনাগারের স্বপ্ন। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন বলেছিলেন—চঞ্চল মন হে কৃষ্ণ। তিনি এ কথা সমর্থন করেছিলেন। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মনে বিভিন্ন ভাব হয় বিকশিত। তাদের মধ্যে বিষয়ের বিভিন্নতা উন্মাদক। পূজার সময় শত্রুর রক্তপাতের চিন্তা আসে, আবার দ্বন্দ্বের সময় আসে পরোপকারের পবিত্র বাসনা। সুতরাং মৃত্যুকালে শরীরের যন্ত্রণা, মায়া মমতার বাঁধন টান যখন মনকে টেনে রাখে তখন সহসা মন ও জিহ্বা একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র ওঙ্কার ধ্বনিতে নিবদ্ধ হবে, এ সিদ্ধান্ত মনে হয় স্তোক বাক্য।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার উপায় বলেছেন। সে উপায়ও আয়ত্ত করা অসম্ভব বলে মনে হয়, বিশেষ ভাবে না বুঝলে। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করবার যে সব নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে গীতায় সে কথা পরে বলব। আপাততঃ বোঝবার চেষ্টা করব ঐ শেষ উপদেশের পূর্ব্বের শ্লোক। তিনি বলেছেন—ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বারকে সংযত ক'রে, মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করে, প্রাণকে শুদ্ধদেশে স্থাপন করে আত্ম-সমাধি আশ্রয়ে * ওম্ শব্দ উচ্চারণের আবশ্যক।

তাহ'লে সম্পূর্ণ উপায় মাত্র ওম্ উচ্চারণ করা নয়। সে কার্য্য সম্ভবপর নয়—মৃত্যু-যন্ত্রণা, রোগের উৎপীড়ন, বিরহের মর্ম্মন্তুদ বেদনা এবং অপরিচিত দেশে যাত্রার বিভীষিকার মাঝে। তাই ওম্ উচ্চারণ সম্ভব তার পক্ষে, যে মুমূর্ষু পারে মরণকালে একাগ্রচিত্ত হ'তে ঐ চেতনায়।

মরণকালে সকল সম্প্রদায় ব্যবস্থা করেছে ঈশ্বরের নাম ও প্রার্থনা করতে রোগীকে ঘিরে—অবশ্য জগতের সেই সব সম্প্রদায় যারা ঈশ্বর এবং পরজন্ম মানে। হিন্দুর কানে হরিনাম রামনাম তারানাম দেবার ব্যবস্থা বিদিত প্রত্যেক গৃহস্থ।

কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সহজ? চিরদিনের উপাস্ত ধন, রত্ন, যশ, মান, স্ত্রীপুত্রের নিরাময়তা—এসব চিন্তাকে দূরে রেখে অকস্মাৎ মরণকালে ওম্ বা হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, বা ওঃ গড্ বলা মোটেই সুলভ নয়। তাই গীতার সমস্ত নির্দেশটি একত্র করে বুঝলে বোঝা যায়—মাত্র পরমগতি তারই যে পারে যোগের দ্বারা সকল অবস্থায় মনস্থির করতে—সেই স্থির মনে স্মরণ করতে পরব্রহ্মকে। পরব্রহ্মের ধারণাকে সে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত করতে পেরেছে নাদ বিন্দুর সাথে। ওম্ শব্দ উচ্চারণ করলেই পূর্ণ জ্যোতিতে যার প্রাণ উজ্জ্বল হয়, ঘরে, বনে, লোকালয়ে নিভৃতে, মাত্র তার পক্ষেই সুলভ মরণকালের ভীষণ পরিবেশের মাঝে ওমিতেকাক্ষরং ব্রহ্ম স্মরণ করা।

এ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝলে আবার গীতার পূর্বাপর শিক্ষার সঙ্গতি উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণ শিখিয়েছেন যে এই জীবন মাত্র একটা টুকরো বিকাশ অনন্ত জীবনের। এ জীবনে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। জীবনের কর্ম্ম দিনে দিনে সম্পন্ন করতে হবে নিষ্কাম ভাবে। ফলের সাফল্যে বা বিফলতায় বিজয়-উন্মাদনা বা দীর্ঘশ্বাসের কবল হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে হবে প্রত্যেক জীবকে। স্থিত প্রজ্ঞার শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ শুনেছেন শিষ্য—সখা অর্জ্জুন। ভক্তির নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে চিত্তাকর্ষক ভাষায়। পরে যোগের শিক্ষা

* গীতা ৮।১২

দিয়েছেন তিনি—কেমন করে সহস্র ভাবের অভিযান প্রতিরোধ ক'রে মানুষ পারে একাগ্র চিত্ত হ'তে। সেই একাগ্রতা আয়ত্ত করলে মানুষের পক্ষে সম্ভব মৃত্যুকালে সকল চিন্তাকে দূরে রেখে মনকে নিরুদ্ধ করে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ ক'রে অন্তরাত্মাকে তমসাপরম্ যিনি, তাঁর অখণ্ড জ্যোতিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে নাদ বিন্দু উচ্চারণ করতে করতে পরমধামে মহাপ্রয়াণ।

তাই জপ তপ মনের চাঞ্চল্য নিরোধের উপায়। এবং তারা মাত্র দেহের ও মুখের ব্যায়াম নয়। জপের মাঝে উপলব্ধি আপনি আসে তাঁর—যাঁর নামের জপ। তপস্যায় সাধতে হবে সেই শক্তি—যে বাহিরের শক্তির অভিযান প্রতিহত করতে হবে সমর্থ। ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত ও আত্মরতি অপ্রতিহত রাখ্‌তে পারবে মায়াময় অখিলে আপাতরম্য অভিযানের কবল হতে।

বলাবাহুল্য এ অবস্থা আয়ত্ব করবার নানা উপায় শিক্ষা দিয়েছেন নানা প্রফেট, পয়গম্বর, সাধু এবং মহাপুরুষ। রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—

অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি।
সারাৎসার তারা-নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে যাত্রা করে বসে আছি।

সেই গীতারই কথা অন্য ভঙ্গী। দুর্গা-নাম, ওঙ্কার ধ্বনি তাঁর।

অপর সাধক শিখিয়েছেন সকল বাসনা কামনা পুড়িয়ে চিতাভস্মে পরিণত করতে, তাহলে প্রচ্ছন্ন ভগবানের শক্তি বিকসিত হবে। তিনি গেয়েছেন—

শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি—

মৃত্যুর ভয় থাকবে না—মরণ কালেও তো হৃদয় শ্মশানে জেগে থাকবেন নৃত্যময়ী মা—ওম্।

আবার অন্য ভক্ত শ্মশান-কালীকে ভয়ের চক্ষে দেখার ভ্রান্তিটুকু অপসরণের জন্য গাহিলেন—

শ্মশান কালীর নাম শুনেরে ভয় কে পায়।
মা যে আমার শবের মাঝে শিব জাগায়।

সত্য যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে জগদীশ্বরী শক্তিতে, সে অভ্যাস মৃত্যুকালে মানুষকে ত্যাগ করতে পারে না। যুক্ত আপনি হবে জীব-শক্তি পরমাশক্তির সাথে। শিশির বিন্দু মিশবে সাগরজলে! তখন মৃত্যু ভয় দূরে পালাবে। অথচ মৃত্যু ভয় সনাতন। সেই মায়াকে স্তব্ধ ক'রে মনে বল পাবার জন্য রামপ্রসাদের সাথে সুর মিলায়ে গাহিতে হবে প্রাণভরে—

কালী নামের গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শোনরে শমন তোরে কই আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে?
এতো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে খাবি হুম্‌কি দিয়ে,
রামপ্রসাদ কয়, যেন শ্যামগুণ গেয়ে
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাই চক্ষে ধুলো দিয়ে।

তাই সাধকেরা অভ্যাস করতে শিখিয়েছেন দিনরাত তাঁর নাম তাঁর ধ্যান। শ্যামাগানে সদা গাহিতে অভ্যস্থ হ'লে মরণকালে প্রাণ হ'তে ঝঙ্কার উঠবে সে সুরের।

কিয়ে মানুষ পশু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ
করম-বিপাকে গতাগতি পুনপুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরাইতে ইহ ভবসিন্ধু
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীনবন্ধু।

বলাবাহুল্য মৃত্যুভয়ের একমাত্র পরম ঔষধ ভগবানের নাম জপ। সকল ভয় কাটে তাঁর স্মরণে। গুরুনানকের দোঁহা মনে পড়ে—

ঠাকুর তব পরণাই আয়ো।
উতর গয়া মেরা মনকা সংশা জব তব দরশন পায়ো।
বাঁহ পকড় কর লীনে আপনে গিয়া অনধ কূপতে মায়ে
কহ নানক গুরু বন্ধন কাটে বিছরত আন মিলায়ো।

একথা সবাই উপলব্ধি করে। অন্ধকূপের মধ্যে যখন মানুষ পড়ে থাকে তখন তার বাহু ধরলে প্রভু, দৃঢ় বন্ধন কাটে।

বাইবেলের ১১৬ শাম (Psalms) ভজনগীতি এ সত্য বিবৃত করেছে।—"আমি প্রভুকে ভালবাসি কারণ তিনি শুনেছেন আমার কণ্ঠস্বর এবং আমার মিনতিগুলি।··· মৃত্যুর-বেদনা আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং নরকের

যন্ত্রণা আমাকে অধিকার করেছিল। আমি পেয়েছিলাম কষ্ট ও দুঃখ।...সরলকে রক্ষা করেন প্রভু। আমি পড়েছিলাম অতি নিম্নে এবং তিনি আমার সহায়তা করলেন।"

তাই দেখি ভগবদ্গীতা অতি স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়েছে কিরূপে অভ্যাসের ফলে মরণ কালে ওম্ শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব। কেবল উচ্চারণ নয়, ওম্ শব্দের সাথে অনন্তের ধারণা। মনপ্রাণ কেমন করে সে চেতনায় লুপ্ত হ'তে পারে তার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এই বিশ্লিষ্ট ভাবগুলিকে সংশ্লিষ্ট করলে ধারণা স্পষ্ট হয়, বিস্তৃত হয় জ্ঞান। প্রাণে যদি থাকে ভক্তি—তাহলে কর্মের দ্বারা, অভ্যাসের সহযোগে সম্ভবপর আত্মোন্নতি।

প্রথমে বিষয় এবং তাঁর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করলেন শ্রীভগবান। তিনি বল্লেন—

মৃত্যুকালে আমাকেই চিন্তা করে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রয়াণ করে সে আমার স্বরূপ লাভ করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। *

কী তাঁর স্বরূপ? পূর্ব্বের শ্লোকে তিনি বল্লেন—অধিযজ্ঞ অহমেবাত্রদেহে। দেহের মধ্যে আমি অধিযজ্ঞ। দেহের মধ্যে পরব্রহ্মের সে সূত্র আছে—যে সূত্র ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অতীত সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ অধিযজ্ঞ। সকল জীবের পরস্পরের সম্পর্ক এবং সম্বন্ধের চেতনা বুদ্ধিগম্য নয়। কারণ এ চেতনা বুদ্ধির অতীত। সে জ্ঞান সাধনা-সাপেক্ষ—প্রকৃত যজ্ঞের দ্বারা বৃত্তি নিরোধের ফলে প্রাপ্য। সে ভাবে সমাহিত হ'লে অনন্তের উপলব্ধি হয়—কিন্তু মন বা বাক্য সেথায় পৌছতে পারে না। চিত্ত-বৃত্তি নিরোধে সে ভাবের হয় আবির্ভাব। সুতরাং অন্তকালে যিনি সেই ভাবে ভাবান্বিত হতে পারেন, তাঁরই লভ্য বিষ্ণুত্ব।

এর কারণ বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেন—হে কৌন্তেয় জীব মরণকালে যে যে ভাব স্মরণ ক'রে দেহ ত্যাগ করে, সদা সেই ভাব চিন্তাপরায়ণ জীব সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

এখানে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন ভগবান যে মানুষ সদা-সর্ব্বদা যে ভাব চিন্তা করে, মৃত্যুকালে তার প্রাণে জাগে সেই ভাব। আর মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ ক'রে মানুষ দেহত্যাগ করে, সেই ভাবের অনুরূপ গতি হয় তার। সারা জীবন যে যশের পিছনে ছুটেছে আর যে তাকে ধরা দিয়ে আবার অন্যরূপ ধরেছে, সে মানুষের প্রাণে সেই আরো-বেশী আরো-বেশী যশের চিন্তা সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে বসে থাকে। আশার ছলনে ভুলে সে আশাকে আঁকড়ে থাকে। তাই তার সিদ্ধির সামগ্রী যশ। তার মানস দেবতা, অন্তর দেবতা, অধিযজ্ঞ দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ভাণ্ডারে কাম্য সম্পত্তি উত্তরোত্তর যশ। সুতরাং সদা যশের ভাবে ভাবিত একক্ষেত্রে তদ্ভাবভাবিত। তেমন মানুষ পরজন্মে যশস্বী হয়। সেই তার সিদ্ধি।

এ নির্দ্দেশের কার্য্যকারিতার সন্ধান পাই আমরা এই জীবনে। নিত্য দেখি—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যার যেমন ভাবনা তার সিদ্ধি তদনুরূপ। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজে তৈছে—এ বাণী মহাপ্রভুর। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তেস্তাং তথৈব ভজাম্যহং।

নিরাশ না হয়ে মানুষ যেন সব কোলাহলে সারা দিনমান শোনে অনাদি অনন্ত গান। এই বোধের জন্য স্বল্প ফল-প্রসূ কাজের পরিবর্ত্তে মানবের কর্ত্তব্য মহত্বপূর্ণ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া। সেই শিক্ষার জন্য বল্লেন—মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশ—"হে পার্থ সকল কাজে মানুষ আসারি পথ অনুসরণ করছে। ভ্রান্তি ও হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রকৃতি মায়ের এক উপাধি।

সকল কর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরের ভাবনকে জাগিয়া রাখবার উপায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতে বড় মনোরম ভাবে প্রকট করেছেন।

হৃদয় দেবতা রহেছ প্রাণে মন যেন তাহা নিয়ত জানে
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে।
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি অনন্ত গান
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।

এই অভ্যাসই প্রকৃত উপায়, যার ফলে চরম মুহূর্ত্তে পরম কান্তি তাঁর ভেসে উঠবে হৃদয়ের পটে। অভ্যস্ত কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হবে ওঙ্কার ধ্বনি যখন সমন এসে ধরবে কেশে। তাই ভারতের কৃষ্টি গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেত।

* গীতা—৮।৫

অন্য চিন্তা ফেলে রাখা চলে। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তই মরণকাল এই ভেবে ধর্মাচরণ করতে হবে।

প্রভু যীশু বলেছেন—ওয়ার্ক ইজ প্রেয়ার। কাজই প্রার্থনা। এ কথা স্মরণ পথে রাখলে মানুষ অন্যায় আচরণ অবলম্বন করতে পারবে না।

তাই দেখি সদা তদ্ভাবভাবিত শব্দে শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন—যা ইচ্ছা ভাব। কিন্তু সাবধান। যে ভাব ভাববে সেই ভাবেই তুমি হবে অনুপ্রেরিত। টাকা টাকা ভেবে টাকা পাবে। কিন্তু মুদ্রা স্তূপীকরণে কোন সুখ নাই। তাই সদা চিন্তার বিষয় কর—ভগবান। সেই অভ্যাসে মৃত্যুকালেও ভাব আসবে ভগবানের। সেই ভাব নিয়ে দেহত্যাগের ফলে পাবে অনন্ত জীবন অধিযজ্ঞ বাসুদেব।

একথা স্পষ্ট করে বল্লেন তিনি—অতএব সকল সময়ে আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমাতে মন, বুদ্ধি অর্পণ করলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।*

অর্জ্জুন যুদ্ধরত। আমরা সবাই যুদ্ধরত জীবন সংগ্রামে। কর্ম কর্তব্য। কাজ ছাড়া জীব পারে না বাঁচতে। হাতেতে কার্য্য কর, মুখেতে হরি বল। বাংলায় হয়েছে প্রবচন এ মহা বাণী। নিষ্কাম কর্ম করলেও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। অর্জ্জুন মহাপ্রাণ, দেহভৃতদের বরণীয়। সে যদি রাজ্যপাবার সঙ্কল্প এবং ক্ষত্রিয়-যশের প্রার্থী হয় মৃত্যুকালে সে হবে সেই ভাবে ভাবিত। সুতরাং স্পষ্ট ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন তাঁকে যে কর্ত্তব্য বোধে ধর্ম্মযুদ্ধ কর। কিন্তু ভাবনা থাকে যেন বিষ্ণুত্ব লাভ তা' হলে পাবে আমাকে।

বলাবাহুল্য সংসারীর পক্ষে এ শিক্ষা অমোঘ।

সংশয় উঠতে পারে অর্জ্জুনের মত ভক্তেরও প্রাণে, সাধারণ গৃহস্থ ভক্তের তো কথাই নাই। তাই অন্তর্য্যামী নারায়ণ মনের গভীরে সংশয়াত্মক প্রশ্নের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেলেন। তিনি বল্লেন—বলেছি তো সদা তদ্ভাব-ভাবিত হওয়া উচিত। তদ্‌ভাবকে আমার ভাব করলে আমাতেই অর্পিত হবে মন এবং বুদ্ধি। আবশ্যক অভ্যাস। নিত্য তো দেখে জীব যে ভাব যে ভাষা, কর্ম্মের যে ধারায় সে থাকে অভ্যস্ত, সেইটা হয় তার প্রকৃতি। সুতরাং তদ্ভাবভাবিত হয়ে মন ও বুদ্ধিকে অর্পণ করবার জন্য আবশ্যক অভ্যাস। অভ্যস্ত হ'লে জীবনে মরণে, স্বপ্নে ও জাগরণে ঈশ্বরের চিন্তাই বিরাজ করবে মনের নিভৃত নিরালায়। কাজের ভাবনা হবে ও পরমের ভাবনা। অবকাশ পেলেই সেই অন্তরতম ভাব জাগবে।

তিনি বল্লেন—হে পার্থ অভ্যাসযোগ অনন্যগামী মনের দ্বারা চিন্তা করে পরম দিব্য-পুরুষকে পাওয়া যায়।*

এবার কাকে ভাবা অভ্যাস করতে হবে, সে কথা তিনি বোঝালেন। যাঁকে ভাববে পাবে তাঁকে। কে তিনি? পরমং পুরুষং দিব্যং—দিব্য পরম পুরুষ।

শিষ্যের অন্তরাত্মা বল্লে—মোটামুটি বুঝলাম। আরও বিষদ ভাবে বুঝিয়ে বলুন—কার ভাবনা অভ্যাস করতে হবে।

প্রভু বল্লেন—যিনি অণু হতেও সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা যিনি অচিন্ত্যরূপ যিনি আদিত্যের মত স্বপ্রকাশ। প্রকৃতির অতীত এখন পুরুষকে অনুস্মরণ করেন যিনি।†

কী ভাবে তিনি চিন্তনীয় সে কথার বিবৃতি দিলেন গুরু। পরে বলেছেন ওম্ শব্দ ভাবতে হবে। ওম্ শব্দের সঙ্গে যদি এই ভাবগুলাকে ওতপ্রোত ভাবে যোগ করা যায়, তা'হলে ওম্ উচ্চারণ হলে এই সব ভাবগুলি উদ্ভূত হবে চিত্তে। যেমন লেখনী বল্লেই বোঝা যায় সেই যন্ত্র যে রেখা সম্পাত করে পত্রে হাতের দ্বারা চালিত হয়ে। হাত অনুগমন করে ভাবকে সে জাগে মনে—ইত্যাদি। তেমনি ওম্ শব্দ বোঝায় ব্রহ্ম। তিনি কে? মোটামুটি কী তাঁর উপাধি? কোন্ কোন্ ভাবের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট ভাব জড়ানো?

স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের সার। এ সব ভাব ঋষিভির্বহুধা গীতম। সেই সবের সংগ্রহ এই বিবরণে।

তিনি কবি—ক্রান্তদর্শী সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সর্ব্ববিদ্যার মূল কারণ তিনি সকল ভাবের স্রষ্টা। ভূত ভবিষ্যৎ ও

* গীতা—৭।৮

* গীতা—৮।৮

† কবিং পুরাণমনুশাসিতার
মনোরণীয়ং সসনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপ
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। ৮।৯

বর্তমান—কিছু তো অবিদিত নয় তাঁর দৃষ্টিতে। কারণ সবই তো তাঁর সৃষ্টি, তাঁর লীলা।

তিনি পুরাণ—অনাদি। তাঁর আদি ও নাই অন্ত ও নাই। তিনি অনাদি সিদ্ধ।

তিনি অনুশাসিত—সমস্ত জগৎ তো তাঁরই নিয়ন্ত্রিত। কার শাসনে চলে চন্দ্র, সূর্য্য, জলের বেগ, বায়ুর হিল্লোল? মানুষের চিন্তানুরূপ শুভাশুভ ফলের নিয়ন্তা তো তিনিই। তাই তিনি শাসনকর্ত্তা।

তিনি অণু হ'তেও সূক্ষ্ম। তিনি অতি সূক্ষ্ম। তাঁর স্থূল সৃষ্টির সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তেজের (radiation) লক্ষণ ধরেছে বিজ্ঞান। মহা-পণ্ডিত নর সন্ধান পেয়েছে এ তেজ-তত্ত্বের সার ঘনীভূত রূপ এই পরিদৃশ্যমান জগত। কিন্তু তারও অন্তরে সূক্ষ্মতা আছে—যা স্থূলেরও বাহিরে। স্থূল তাঁর প্রকাশ! সে অণু হতে অণুর সন্ধান লাভ করে যোগী।

ভারত সংস্কৃতি বহু যুগ পূর্ব্বে তাঁকে বর্ণনা করেছিল —অনোরণীয়ান্ মহতোর্মহীয়ান। স্থূল জগতে তাঁর সূক্ষ্মত্ব মানুষ আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে উপলব্ধি করছে, যেমন উপলব্ধি করছে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলনে বিশ্বের অফুরন্ত বিশাল রূপ। তার অন্তরে আছে সৃষ্টির মাধুরী ও চেতনা। সে চেতনা উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হয় সূর্য্যের আলোর মত।

তাই তিনি বিধাতা এবং

আদিত্য-বর্ণ। কিন্তু

অচিন্ত্য। চিন্তা সীমাবদ্ধ। যিনি অসীম অনন্ত সসীম মন কি পাবে তাঁকে পূর্ণভাবে ধরতে। তাঁর আভাস ও উপলব্ধি সম্ভবপর। তাই উপনিষদের ঋষি বলেছেন—তৈত্তিরীয় উপনিষদে—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।২।৪

বাক্য মনের সহিত যাঁকে না পেয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হ'লেই কোনো ভয় থাকে না।

তিনি তমসঃ পর—অজ্ঞান প্রকৃতি মোহের তিনি বাহিরে। সূক্ষ্মজ্ঞানে তাঁর আভাসমাত্র লাভ হয়—আনন্দের বোধ। কিন্তু তামস ভাবে কোথায় তাঁর বিদ্যমানতা?

এই সব গুণ বর্ণনা করেছেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। তিনি পুরুষ মহান্ তিনি আদিত্য বর্ণ তমসের পর।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ!
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।৩।৮

সূর্য্য স্বরূপ প্রকাশমান এবং (তামস) অজ্ঞানের অতীত সেই বিরাট পুরুষকে আমি জানি। একমাত্র তাঁকে জেনেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। এতদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের কোনো উপায় বিদ্যমান নাই।

তিনি

অণোরণীয়ান মহতোর্মহীয়ান আত্মা গুহায়াং
নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।

সূক্ষ্ম হ'তেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হ'তেও মহত্তর পরমাত্মা—এই জীবগণের অন্তরে বিদ্যমান।

তাঁর এই সব উপাধি একাগ্রভাবে অনুশীলন করলে মনের সকল ভাবনা চলবে তাঁকে ঘিরে। কিন্তু মনকে একাগ্র করবার কুশলতাও আয়ত্ত হবে অভ্যাসে। সেই অভ্যাসের ফলে চিত্ত হ'তে সকল ভাব দূরীভূত করে তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হবার উপায় হবে আয়ত্ত। মৃত্যুকালে সেই চির-অভ্যস্থ উপায় আপনি করবে চিত্তকে সংযত।

শ্রীকৃষ্ণ সে উপায় বর্ণনা করলেন—

যে মরণকালে নিশ্চল মনের দ্বারা ভক্তিসহকারে এবং যোগের দ্বারা যুক্ত হ'য়ে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে সম্যকরূপে স্থাপন করে সে পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।*

যোগের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি ষষ্ঠ অধ্যায়ে। মোট কথা অভ্যাসের দ্বারা মানুষ হ'তে পারে একাগ্র-চিত্ত। সেই একাগ্র চিত্তে ভগবানের চিন্তায় যুক্ত হ'তে পারে তাঁর সাথে। এ কর্ম অভ্যস্থ থাকলে সহজ হবে মৃত্যুকালে একান্ত মনে ওঙ্কার উচ্চারণ করা।

পরমহংসদেব বলেছেন—ব্যাকুলতা আবশ্যক। ব্যাকুল হ'য়ে ধ্যান করলে তিনিই পথ দেখিয়ে দেবেন তাঁর চরণে মন অর্পণ করবার। সে অভ্যাসের ফলে আপনি উঠবে হৃদিপদ্ম ফুটে—যার মাঝে বিরাজ করবেন কবি পুরাণ পরব্রহ্ম।

আবার স্পষ্ট করে বোঝালেন ভগবান—

* গীতা ৮।১০

"যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে স্মরণ করে, সেই সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ।"

তাই মানুষ শয়নে, স্বপনে, জাগরণে যদি আয়ত্ত করে ভগবানের চিন্তা তা'হলে তার থাকবে না মৃত্যুভয়। অভ্যাস বশে তার চিরদিনের অর্জ্জিত ভক্তি তাকে যুক্তকরে দেবে ভগবানের প্রতীক ওঙ্কার শব্দে।

এই চিরদিনের অভ্যাসের পথ তিনি স্পষ্ট বুঝিয়েছেন পরে—

মৎকর্ম্মকৃত মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ সঃ মামেতি পাণ্ডব।

যে সকল কর্ম্ম তাঁরি কর্ম্ম ভাবে, যে জানে তিনিই পরম, যে ভক্ত নিষ্কামভাবে সংসারের কর্ত্তব্য পালন করে, যে সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর, সেই জ্ঞানী ভক্ত কর্ম্মী ভগবানকে পায়।

চিরদিন তাঁর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হ'লে, মরণকালে সে করুণার আধারের স্মৃতি আপনি জ্বলে ওঠে মুমূর্ষুর প্রাণে।

অনুন্নতদেশের অর্থনীতিতে বেকার সমস্যার বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

অনুন্নতদেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্য্যায়ে কর্ম্ম-সংস্থান বৃদ্ধির দিকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেননা এই কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থার প্রশ্নের সাথে শিল্পোন্নয়ন ও কৃষিউন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামো তৈয়ারীর প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সকল দেশের পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্যই থাকে প্রচলিত মূলধন সমন্বয় ও বিনিয়োগকে সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে অধিকতর কর্ম্ম-সংস্থান সৃষ্টি করা—যাতে বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পায় এবং effectie demand বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পবিকাশের কাজ সহজতর হয়। এই সকল দেশে যে পাহাড় প্রমাণ বেকার সমস্যা রহিয়াছে, তাহাই এই সকল দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির পক্ষে অন্যতম প্রতিবন্ধক। এই সকল অনুন্নত দেশগুলিতে প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষি-অর্থনীতির প্রাধান্য হেতু এবং প্রয়োজনানুরূপ শিল্প বিকাশের অভাব হেতু যে অসংখ্য বেকার সংখ্যা বাড়িয়াছে তাহাতে দেশের আয় মাথা পিছু যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা নগণ্য। এই অতি স্বল্প আয়ের ফলে এই সকল দেশে propensity to consume অত্যন্ত বেশী। আর সেই কারণে এই সকল দেশে সঞ্চয় নাই বলিলেও চলে। উন্নত অর্থনীতিতে Full employment অবস্থায় তাহার পূর্ব্বাবস্থার যে Propensity to consume বৃদ্ধি পায় তাহাতে marginal efficiency of Capital বাড়িয়া চলে—ইহাতে দেশের আয় ও সঞ্চয় বাড়িয়া চলে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনুন্নত দেশে এই অবস্থা কল্পনা করা যায় না। বরং এই সকল দেশে Propensity to consume অত্যধিক বলিয়া যখন ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে পরিকল্পনার খরচ যোগাইবার চেষ্টা চলে, তখন বাজারে যে অধিকতর অর্থের প্রচলন ঘটে :তাহাতে মূলধন-যন্ত্রপাতির অভাব হেতু এবং অনুন্নত অর্থনীতি বলিয়া মূলধনের প্রান্তিক ক্ষমতা (marginal efficiency) বৃদ্ধি করাতো দূরের কথা, মুদ্রা স্ফীতিই ঘটিয়া থাকে। প্রধানতঃ এই কারণেই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়াতেই deficit financing এবং নোট ছাপাইবার ফলে যখন বাজারে দাম চড়িতে সুরু করিয়াছে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নূতন credit control নীতি গ্রহণ করিয়াছে। আবার এই কারণেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেমন ভারী শিল্পের বিকাশের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার ফলে consumption expenditure অর্থাৎ ভোগ্য দ্রব্যের জন্য খরচা বাড়িয়া গিয়া মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিতে পারে—সেই সম্ভাবনাকে রহিত করিবার জন্যই পরিকল্পনায় ভোগ্য দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

আরও একটি কথা আছে। দেশে যে আয় তাহা যত অধিক-সংখ্যক লোকের মধ্যে বণ্টিত হইবে ততই তাহা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে মঙ্গলজনক। অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে ইহা একটি বিরাট সমস্যা। এই সকল দেশের সামান্য জাতীয় আয়ের বৃহদংশ খুবই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বাকী ক্ষুদ্রাংশ একটি বিরাট জনসংখ্যার মধ্যে বণ্টিত। ইহার কারণ এই সকল দেশের বিলম্বিত শিল্প-বিকাশ, যাহার ফলে একমাত্র জীবিকা কৃষির উপরে জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধি ঘটে। আর যেহেতু এই সকল দেশে কৃষি কাজেই কৃষক ও ক্ষেত মজুর হিসাবে দেশের শতকরা প্রায় ৭০% ভাগ নিযুক্ত থাকে এবং যেহেতু কৃষিকার্য্যও অসংগঠিত এবং প্রাচীন অনুন্নত-পদ্ধতিতে পরিচালিত—সেই হেতু এই ৭০% ভাগের আবার ৭৫% ভাগেরও অধিক-সংখ্যক লোক under-employed এবং disguised unemployedএর পর্য্যায়ে রহিয়াছে। সহর এলাকায় শিক্ষিতদের মধ্যে পূর্ণ বেকার ও অর্দ্ধ বেকারের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন বৃত্তিতে যাহারা নিযুক্ত আছে মূলধন সংগঠন তুলনায় এই সকল বৃত্তি

তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে প্রতি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য অথবা নগণ্য।

অধ্যাপক Lewis এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, These are generally known as disguised unemplyment in the agricultural sector demonstrating in each case that the family-holding is so small that if some members of the family obtained other employment the remaining members could not cultivate the holding just as well. আর একজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন—Many of the underdeveloped areas of the world have large agrarian population in which there is persistent open unemployment or in which marginal product of the working force is so low that it is commonly believed of a sizable fraction would not significantly affect output.

এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য খুবই প্রযোজ্য। শুধু গ্রাম এলেকায় ক্ষেতমজুর, কৃষক, তাঁতী, ছুতার, কামার, নাপিত, মুচি প্রভৃতি self-employedদের মধ্যেই নয়, সহর-নগর এলাকাতেও এই ধরণের disguised unemployedদের ডক-কুলি, গৃহ-ভৃত্য, পাচক এবং ছোটখাট মুদির দোকানদার—ফেরিওলা প্রকারদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এই সকল বৃত্তিতে যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন তার অনেক গুণ বেশী লোক এই সকল বৃত্তিতে ভীড় জমায়—প্রত্যেকেরই কিছুনা কিছু উপার্জ্জন হয়—কিন্তু তাহা অতি সামান্য। আর যে কোন সময়েই এই ভীড়ের সংখ্যা অর্দ্ধেক করিলেও এই সকল বৃত্তির উৎপাদন মোটেই ব্যাহত হইবে না। কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য বড় বড় সহরে জনসংখ্যার দিকে সাথে সাথে ব্যাঙের ছাতার মত ছোট-খাট মুদির দোকান, পথের ধারে কাটাকাপড়, মনোহারী পণ্যের দোকান হইতে সুরু করিয়া মাটির ভাঁড়ের চায়ের দোকান ও হিন্দু ডিমের দোকানে ছাইয়া গিয়াছে। অর্থনীতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন ব্যক্তি, কলকাতার পথে পথে এই ধরণের দোকান দেখিলেই ভারতের অর্থনীতির অনগ্রসরতা সম্পর্কে খুব সহজেই ধারণা করিতে পারিবেন। অধ্যাপক এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—"Petty retail trading is exactly of this type; it is enormously expanded in overpopulated economics; each trader makes a few sales; markets are crowded with stalls and if the number of these stalls are reduced, the consumers would not be effectual—They might even be better off, since retail margins might fall, [illegible] সাধারণতঃ সহরের পল্লী এলাকার স্ব স্ব মালিকানায় (self-employed) পরিচালিত বৃত্তিগুলিতে ঘটিয়া থাকে। অনুন্নতদেশের সাধারণ মানুষের এই সামান্য মূলধন অসমর-গঠিতভাবে বিনিয়োগের ফলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাও (marginal of efficiency capital) বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যমে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে, এই সামান্য মূলধনগুলিকে উন্নততর উপায়ে বিনিয়োগ করা চলে। এই যে স্ব স্ব মালিকানায় পরিচালিত বিভিন্ন বৃত্তিতে যাহারা নিযুক্ত আছে তাহারা এককই তাহাদের বর্ত্তমান বৃত্তিতে সন্তুষ্ট নয়—কেননা ইহা তাহাদের অভাব মিটাইতে পারে না—এই কারণে তাহারা সকল সময়েই মাসিক বেতনের চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়।

গৃহ-ভৃত্য, পাচক, মালি প্রভৃতি যাহারা মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত তাহারাও তাহাদের মালিকের কাজ হইতে তাহাদের প্রান্তিক ক্ষমতানুযায়ী বেতন পায় না। ফলে কারখানায় কাজ করিলে তাহারা অনেক বেশী বেতন পাইতে পারে। তাই কলকারখানা এলাকায় চাকর, মালি পাচকদের শ্রমিক হিসাবে তুলনায় মজুরী খুবই বেশী এবং যোগানও কম। কিন্তু এই ধরণের সুযোগ অনুন্নতদেশে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। ইহারাও disguised unemployedদের দলেই পড়ে। ইহাদের মধ্যে গৃহভৃত্যরাই অন্যতম। এই সকল অনুন্নতদেশে মধ্যযুগীয় সামাজিক ধারণা ও জীবনযাত্রার দরুণ প্রয়োজনীয়বোধে গৃহভৃত্য, পাচক মালি নিযুক্ত হয়। ইহা ছাড়াও Lines between the employers and the dependents are very thinly drawn in these pattern ফলে ইহারা যে মজুরী পায় তাহা কোন রকমে জীবন-ধরণের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নয়।

Under-employed বা অর্দ্ধবেকার আমরা মোটামুটিভাবে তাহাদের বলিতে পারি যাহারা তাহাদের গুণও দক্ষতার মান অনুযায়ী বৃত্তিতে নিযুক্ত নাই—উহা হইতে নিকৃষ্ট ধরণের বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়া, আরও একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা বর্ত্তমানে যে পরিমাণ সময় বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে তাহা প্রচলিত সময়ের মান হইতে কম এবং তাহারা আরও অধিক সময় কাজ করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম। অথচ সেই কাজ তাহারা পায় নাই। আবার ইহারাও অর্দ্ধ বেকারদের পর্য্যায়ে—কর্ম্মের প্রচলিত সময় অনুযায়ী কাজ করিয়াও যাহারা জীবিকা উপযোগী যথেষ্ট বেতন পায় না তাহারাও এই অর্দ্ধ বেকারদের মধ্যেই পড়ে। এই ধরণের অর্দ্ধ বেকারদের ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনুন্নতদেশের অর্থনীতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। গৃহ শিক্ষার, ডাকঘর ও অন্যান্য সরকারী অফিসে কর্ম্মতে form ও দরখাস্ত লেখক প্রভৃতিরাও এই পর্য্যায়ে পড়েন। আবার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসে সুদক্ষ ও উচ্চ-গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা কেরানীর কাজ সুরু করিয়া অন্যান্য ছোট খাট কাজে সুযোগের অভাবে নিযুক্ত আছে তাহারাও এই পর্য্যায়ভুক্ত। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহারাও বেতনের দিক দিয়া বিচার করিলে, অর্দ্ধ বেকার পর্য্যায়ভুক্ত।

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্মুখে ধরিয়া I. L. O. হইতে এশিয়ার বেকার সমস্যার বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি I. L. O.র Asian advisory Committeeতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অর্দ্ধ-বেকার

সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনায় বলা হইয়াছে— Firstly it is said that a certain amount of labour can be released without reducing out put and without any change in the methods of production. In the terminology adjoined this is visible unemployment ইহাকে পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, disguised unemployment. কিন্তু that is there in name! সমস্যাটি এক। দ্বিতীয়তঃ a further amount of labour can be released without affecting out by introducing simple and already known change, in the methods of production which do not require much Capital. এই শ্রেণীকে। I.L.O. নাম দিলেন। disguised under-employment. তৃতীয়তঃ further labour can be released only by introducing more requireb substantial capital investment I.L.O. অবস্থাকে বলিলেন, Postential under-employment. অনুন্নতদেশগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ রাখিয়া শিল্পকরণনীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। উহা আরেক সমস্যার ইতিহাস।

বুদ্ধের বাণী

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

('ধম্মপদ' হইতে রমেশ দত্ত কৃত ইংরাজী পদ্যানুবাদ হইতে)

(১)

ঘৃণা কর যদি ঘৃণা করে তোমা যা'রা
বিরোধ ক্রমশঃ হইবে গভীরতর
ভালবাস যদি, ঢালো করুণার ধারা,
দ্বেষ হ'বে দূর, জীবন মধুরতর।

(২)

ধর্ম্ম-উপদেশ, মিষ্টভাষী প্রচারক,
জীবনে যদি না দাও তা'র পরিচয় ;
বৃথা হ'য়ে, যথা স্বর্ণ-পুষ্প-কোরক
গন্ধহীন, হৃদে সুখ নাহি উপজয়।

(৩)

মরণ-যাতনা হ'তে তুমি কর ভয় ?
জনম-অবধি ভালবাস নিজ প্রাণ ?
সেই মত ভাবে সর্ব্বজীব ধরাময়
হিংসা ত্যজি' সবে দয়া কর তবে দান।

(৪)

হিংসা করে যা'রা তুমি তাদের প্রতি
সদা প্রেমপূর্ণ কর মিষ্ট ব্যবহার,
তোমা প্রতি যারা হেয় রোষান্বিত অতি,
অচঞ্চল, নম্র, হ'য়ে রবে কাছে তা'র।

(৫)

র'বে চিরদিন পুণ্যকীর্ত্তি কর যত,
স্বরগে পুণ্যাত্মা পাবে পুনঃ দরশন,
প্রবাস হইতে নিজগৃহে প্রত্যাগত
হেরে যথা সুখে তার আত্মীয়স্বজন।

(৬)

ক্রোধান্বিতদের কর জয় প্রেম দ্বারা,
পুণ্যকার্য্যে কর অকল্যাণ বিদূরিত,
দান দ্বারা জিনি লও কৃপণ যাহারা
সত্য দ্বারা কর অসত্যেরে পরাজিত।

(৭)

অপরের দোষ কর সদা অন্বেষণ,
দেখনা চাহিয়া পাপ করিয়াছ যাহা,
অপরের ত্রুটী তুমি খোঁজ অনুক্ষণ,
ঢাকিয়া রাখিছ নিজ দোষ যত তাহা !

(৮)

বয়সেতে বৃদ্ধ যা'রা তাহারাই সবে
জেনো নহে জ্ঞানী, তারা নহেকো গুণিন্।
সত্য, ধর্ম্ম-আবরণ, প্রেম, দয়া, ভবে
করে নরে জ্ঞানবান্ গুণী ও প্রবীণ।

কৃষ্ণকলি

শ্রীশীতল সেন

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান মিষ্টার র‍্যামান চ্যাটার্জী ওরফে রমেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর হলঘর—আধুনিক আসবাবে সুসজ্জিত। এ বাড়ীর সকলেই অগ্র প্রগতিপন্থী ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের লোক—তাহার চিহ্ন বাড়ীর সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। হলঘরের একপাশ দিয়া উপরতালার সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। তার একপাশে একখানি ঘরের দরজায় সুদৃশ্য পর্দ্দা ঝুলিতেছে। সিঁড়ির নীচে রহিয়াছে একটি পিয়ানো। তখন সন্ধ্যা।

মিষ্টার চ্যাটার্জীর একমাত্র কন্যা মিস্ লালী চ্যাটার্জী পিয়ানো বাজাইতেছে। অতি-আধুনিক বেশভূষার চাকচিক্যে ও মেক্-আপের ঔজ্জ্বল্যে তাহার প্রকৃত বয়স বোঝা না গেলেও অনুমানে মনে হয়, তাহার বয়স কুড়ির কম নয়। লরেটোতে পড়া মেয়ে—আদব-কায়দায় দুরস্ত। শুধু স্টাইলেই নয়, নাচে-গানে-অভিনয়ে—খেলা-ধূলায়-সাঁতারে-মোটর-চালানোতে—সবেতেই চৌকশ্। এক কথায়, আল্ট্রামডার্ণ সোসাইটীর মক্ষিরাণী—মিস্ লালী চ্যাটার্জি।

পিয়ানোর দুইপাশে দাঁড়াইয়া আছে মিস্ লালী চ্যাটার্জীর দুইজন স্তাবক-প্রণয়ী —পুলকেশ পাকড়াশী ও সুকল্যাণ সেন। উভয়েই যুবক। পুলকেশের নাটক-কবিতা-গান লেখার বাতিক আছে—মেয়েলী ঢঙে কথা কহিতে ভালবাসে। তাহার দেহের শুধু দৈর্ঘ্যই আছে, প্রস্থ নাই বলিলেই চলে। সুকল্যাণ উদীয়মান চিত্র-পরিচালক—স্বাস্থ্যবান—ইউরোপীয় স্টাইলে কেতাদুরস্ত।

উঁহাদের সম্মুখে মিস্ রীণা রায় নাচিতেছে ও মিস্ আইভি আইচ গাহিতেছে। ইহারা দুইজনেই লালীর সমবয়সী ও সমগোত্রী বান্ধবী।

সুকল্যাণ॥ (নাচগান শেষ হইলে) 'ওয়াণ্ডারফুল'! 'ওয়াণ্ডারফুল'!! চমৎকার গান!

লালী॥ (উঠিয়া আসিয়া) গানখানা লিখেছে—আমাদের এই পুলকেশ পাকড়াশী। ও শুধু নাট্যকারই নয়, কবিও বটে।

পুলকেশ॥ গানখানা আমি শুধু রচনাই করেছি, কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনায় ওর প্রাণদান করেছে—আমাদের এই লালিমা দেবী।

লালী॥ আঃ। লালিমা নয়—লালী।

পুলকেশ॥ তোমার রূপের কাছে ওই "লালী" নামটাকে বড় ম্লান মনে হয়। শুধু লালের চেয়ে লালিমার সৌন্দর্য্য অনেক—অনেক বেশী। তাতে আছে কতো মোহ—কতো মাদকতা—কতো মিষ্টতা।

সুকল্যাণ॥ বাঃ! আপনার কথাগুলোওতো বেশ মিষ্টি।

লালী॥ কবি কিনা, ভাই ওর সব কথাই একটু কাব্যময়। আসুন মিষ্টার সেইন্, আমার বান্ধবীদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। পুলকেশের পরিচয়তো আগেই পেলেন। (আগাইয়া আসিয়া) এর নাম মিস্ আইভি আইচ্, আর এর নাম মিস্ রীণা রয়। (সুকল্যাণকে দেখাইয়া) আর ইনিই হলেন ভারত-বিখ্যাত 'ফিল্ম-ডিরেক্টার' মিষ্টার সিকুলিস্ সেইন—মানে, সুকল্যাণ সেন—হলিউডে অনেকদিন ছিলেন। এরকম গুণী লোক এদেশে খুব কমই আছেন।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় হইল

সুকল্যাণ॥ আমার সম্বন্ধে আপনি বেশ কিছু বাড়িয়ে বললেন মিস্ চ্যাটার্জী—'ইউ হ্যাভ্ স্পোক্‌ন্ টু হাইলি অফ্ মি!'

লালী॥ এদের সঙ্গে আলাপ হলো, এরা দুদিনেই টের পাবে—আমি আপনার সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেছি কি কমিয়ে বলেছি। (আইভিকে) আইভি, মিষ্টার সেইনকে আমাদের ক্লাবের 'পেট্রন' করে নিতে চাই।

আইভি॥ খুব ভালো কথা।

রীণা॥ 'এ গুড্ প্রোপোজাল'!

পুলকেশ॥ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। মিষ্টার সেইনের মতো কলারসিককে যদি আমরা আমাদের মধ্যে পাই, তাহ'লে আমাদের কৃষ্টি সংঘে দেখা দেবে নব নব উদ্যম—নব নব প্রেরণা!

লালী॥ হ্যাঁ, আমিও সেই বলছিলাম। আর সেই জন্যেই মিষ্টার সেইন্‌কে আমাদের ক্লাবের 'পেট্রন্' হ'তে

বলছিলাম। ক্লাবে নিয়ে যাবার আগে আমাদের নেক্সট্ ফাংসানের দু'একটা 'আইটেম্' মিষ্টার সেইন্‌কে দেখাবার জন্যেই রীণা আর আইভিকে আমার বাড়ীতে ডেকে এনেছিলাম। ওদের নাচ-গান যদি ভালো লাগে—

সুকল্যাণ॥ যদি ভালো লাগে মানে? শুধু ভালো লেগেছে? 'আই হ্যাভ্ বীন রিয়ালি মুভ্‌ড্—সিম্‌প্লি চার্মড। সো সুইট্ এ সঙ্—'

লালী॥ আইভির নাচটা কেমন লাগলো মিষ্টার সেইন্?

সুকল্যাণ॥ 'এ ডিভাইন্ ড্যান্স্!'...অপূর্ব্ব—স্বর্গীয়।

পুলকেশ॥ আপনি শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন মিষ্টার সেইন্,—ওই নাচখানারও পরিকল্পনা করেছেন—আমাদের এই শ্রীমতী—

লালী॥ আঃ। আবার ওই 'ন্যাষ্টি' শ্রীমতী। কেন,—'মিস্' বলতে পারো না পুলকেশ?

পুলকেশ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস্ লালী দেবী—

লালী॥ নাঃ! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না, পুলকেশ। আবার ওই দেবী! 'হেভেন্‌স্‌সেক্' পুলকেশ, তোমার ওই ঠাকুরমার আমলের 'শ্রীমতী', 'দেবী' কথাগুলো ছাড়ো দেখি—'প্লীজ্'! ওই বিশ্রী কথাগুলো শুনলে—'বিলিভ্ মী, আই ফীল্ নসিয়া'—আমার গা-টা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে।

পুলকেশ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, তাই না হয় হলো। হ্যাঁ, বলছিলাম কী মিষ্টার সেইন্, ও নাচের রূপদান করেছেন শ্রীমতী—(লালীর কটাক্ষে থতমত খাইয়া) মানে—এই আমাদের মিস্ লালী—চ্যাটার্জ্জী।

সুকল্যাণ॥ 'বাই জোভ্। মিস লালী ইজ্ এ জিনিয়াস্, আই সী।' নাচে গানে—

রীণা॥ শুধু নাচে-গানেই নয় মিষ্টার সেইন্, লালীর অভিনয় যদি দেখতেন—

সুকল্যাণ॥ তাহ'লেতো বলতে হয়, রূপে-গুণে—মিস্ লালী ইজ্ দি ইণ্ডিয়ান্ রীটা হাওয়ার্থ'!

আইভি॥ সত্যিই তাই। চলুন না আজ আমাদের ক্লাবে। ওর রিহার্সাল্ দেখলেই বুঝবেন।

রীণা॥ আমাদের ক্লাবে এখন যেতে নিশ্চয়ই আপনার কোন আপত্তি নেই, মিষ্টার সেইন্?

সুকল্যাণ॥ 'নো, নো, নো, নাথিং অফ্ দি কাইণ্ড্—নাথিং অফ্ দি কাইণ্ড্। আই উইল্ বি সো গ্ল্যাড্—'

লালী॥ আসুন তাহ'লে মিষ্টার সেইন্—

লালী হাত বাড়াইয়া দিল

সুকল্যাণ। (হাতে হাত রাখিয়া) চলুন মিস্ লালী—

উভয়ে অগ্রসর হইল

পুলকেশ॥ সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্!!

রীণা ও আইভি পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিয়া মৃদু হাস্য করিল। সকলে লালী ও সুকল্যাণকে অনুসরণ করিল।

হলঘর হইতে সকলে বাহির হইয়া যাইবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই "লালী—লালী" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে উপরতালার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল মিষ্টার র‍্যামান চ্যাটার্জ্জী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। অনেক দিন ধরিয়া বাতে ভুগিতেছেন।

রমেন॥ লালী—লালী—

পাশের ঘর হইতে পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল মিসেস্ এলা চ্যাটার্জ্জী—বাহিরে যাইবার জন্য উদ্যোগী। বয়স কবে চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে, তবুও সাজগোজ ও মেক্-আপের আড়ালে প্রকৃত বয়সটা লুকাইবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস বেশ পরিস্ফুট। কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে ভ্যানিটী কেস্ খুলিয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া পাউডার-পাফ্‌টি একবার বুলাইয়া লওয়া—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর একটা অভ্যাস। একটুতেই নাসিকা কুঞ্চিত করাও তাহার আর এক অভ্যাস।

এলা॥ আঃ! অমন চীৎকার করছো কেন? একটু আস্তে কথা বলতে পারো না? আশে-পাশের লোকজন শুনলে কী ভাববে বলতো? আমি যতো চাই বাড়ীতে একটা 'কাম্ য়্যাণ্ড্ কোয়ায়েট্ য়্যাট্‌মস্‌ফিয়ার'—

রমেন॥ বাড়ীতে তোমার ওই একটিমাত্র মেয়ে—'আইমীন্'—ওই শুধু লালী আছে বলেই তুমি আজ চাইছো বাড়ীতে একটা 'কাম্ য়্যাণ্ড্ কোয়ায়েট্ য়্যাট্‌মস্‌ফিয়ার'। কিন্তু ধর, আজ যদি তোমার হতো—'এ গ্যালারী অফ্ চিল্‌ড্রেন্'—?

এলা॥ 'গ্যালারী অফ্ চিলড্রেন্'। সে আবার কী?

রমেন॥ হ্যাঁ, 'গ্যালারী অফ্ চিলড্রেন্'—'আই মীন্'—(হাত দিয়া দেখাইয়া) 'গ্যালারী' সাজানোর মতো পর পর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে যদি তোমার আজ হতো—

এলা॥ হতো। হতো বললেই হতো কিনা! আমি যা' চাই না—যা' পছন্দ করি না, তা' হবেই বা কেন?

বকু, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'আর্গুমেণ্ট' করবার আমার 'টাইম্' নেই। আমাকে আবার এখনি একবার বেরোতে হ'বে। তা' লালী—লালী বলে অমন চীৎকার করছিলে কেন ?

রমেন॥ না, না, চীৎকার নয়—'আই মীন্'—লালীকে খুঁজছিলাম। গেল কোথায় সে ?

এলা॥ এইতো একটু আগে এই ঘরে নাচ-গান করছিল বন্ধুদের নিয়ে। ওরা বোধ হয় সবাই ক্লাবে গেছে।

রমেন॥ ক্লাবে গেছে ? 'আই মীন্'—লালী এখন ক্লাবে গেছে ?

এলা॥ তা ছাড়া করে কী বল ? ক্লাব-হোটেল, পার্টি পিক্‌নিক্, বন্ধু-বান্ধব—এই সব নিয়েই তো মেয়েটা আছে। বয়স হচ্ছে—সময় কাটানো চাইতো। মেয়ের বাপই শুধু হয়েছো, মেয়ের বিয়ে দেবার তোমার না আছে চেষ্টা—না আছে খেয়াল—'নাথিং অফ দি সর্ট'।

রমেন॥ না, না, এলা, সে কী কথা ! খেয়াল আমার খুবই আছে, তবে চেষ্টা আমি কী করে করি বল ? 'আই মীন্'—দেখছোতো, বাতের জন্যে কোথাও তো আর যেতে পারি না। তা' তুমি তো এখানে-সেখানে যাও—'আই মীন্'—তুমিও তো লালীর জন্যে একটা ভালো ছেলের সন্ধান করতে পারো।

এলা॥ ভালো ছেলের সন্ধান তো একটা নিয়ে এলাম—তোমার তো আবার সে ছেলে পছন্দ হলো না।

রমেন॥ ও—সেই তপন তলাপাত্রের কথা বলছো ? 'আই মীন্—দ্যাট ব্রীফলেশ ব্যারিষ্টার !' তার ওপর তা' কাপ্তেন শুনেছি, তাতে বাপের রেখে যাওয়া সম্পত্তি দুদিনেই উড়িয়ে ফেলবে—'আই মীন্'—তলাপাত্রের তখন আর তলানীটুকুও থাকবে না। তার চেয়ে সেই পলাশ-ডাঙার জমিদারের ছেলেটা অনেক ভালো ছিল।

এলা॥ তা' বৈকি ! ওতো একটা গেঁয়ো ভূত—না জানে 'ম্যানার্স,' না জানে 'এটিকেট'—শুধু পয়সাই আছে।

রমেন॥ কিন্তু আমার মনে হয় এলা, ওখানে বিয়ে হলে লালী সুখীই হ'তো—'আই মীন্'—

এলা॥ ছাই হতো। মেয়েকে লরেটোতে পড়িয়ে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ' পাশ করিয়েছো—মোটর ড্রাইভিং, সাইক্লিং, সুইমিং শিখিয়েছো—নাচ-গান শিখিয়েছো—সে কী ওই রকম একটা জংলীর হাতে তুলে দেবার জন্যে ? তার চেয়ে মেয়ে আমার আইবুড়ো থাকবে, সেও ভালো।

রাগিয়া চলিয়া যাইতেছিল, রমেনের ডাক শুনিয়া দাঁড়াইল

রমেন॥ আরে, আরে, চললে কোথায় ? 'আই মীন্'—

এলা॥ 'মার্কেটিং'-এ।

রমেন॥ সে কী কথা ! লীলা নেই, তুমিও থাকবে না—আর এধারে অনিমেষ একটা ভালো ছেলে নিয়ে এখনি আসবে বলেছিল। শুনলাম, বেশ ভালো ছেলে '—আই মীন্'—

এলা॥ কী রকম ভালো শুনি।

রমেন॥ শুনলাম, ছেলেটি এবার 'আই, এ, এস্' পরীক্ষায় পাস করে সবে হাকিম হয়েছে। টাকা-কড়ি খুব না থাকলেও মন্দ নেই। স্বভাব-চরিত্র খুব ভালো—'আই মীন্—আইডিয়াল্' বলা চলে নাকি। তা ছাড়া, মাথার ওপর অভিভাবক বলতে কেউ নেই—তোমার মেয়ের সুবিধেই হ'বে—'আই মীন্'—তুমি যা' চাও ঠিক তেমনি।

এলা॥ বিলেতে গিয়েছিল ?

রমেন॥ না।

এলা॥ য়্যামেরিকায় ?

রমেন॥ না। তা' কোথাও যায়নি বটে, তবে অনিমেষ বলছিল, ছেলেটি নাকি খুবই ভালো।

এলা॥ ছাই ভাল ! বিলেতে যায়নি, য়্যামেরিকায় যায়নি—সে আবার কী এমন ভালো ছেলে ! 'নো ম্যাচ ফর্ মাই লালী'—লালীর স্বামী হ'বার তার যোগ্যতাই নেই।

রমেন॥ না, না, তুমি আর বাধা দিও না এলা—তুমি আর বাধা দিও না। 'আই মীন্'—তুমি একবার ভেবেই দেখনা—'আই, সি, এসে'র মেয়ের স্বামী হ'বে 'আই, এ, এস্'—হাকিম-গিন্নীর মেয়েও হ'বে হাকিম-গিন্নী ! এ বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়—'আই মীন্'—একে একটা বিরাট যোগাযোগ বলা যেতে পারে।

অনিমেষও তাই বলছিল,—ওই যে, নাম করতে করতেই এসে পড়েছে,—'হ্যাল্লো মাই বয়'—(সানন্দে আগাইতে গিয়া) উহু—উহু—

রজতকে সঙ্গে লইয়া অনিমেষ আসিল। অনিমেষ রজতের সহপাঠী ও সমবয়সী

অনিমেষ॥ (ছুটিয়া আসিয়া রমেনকে ধরিয়া) কী হলো—কী হলো মামাবাবু ?

রমেন॥ আর কী হ'বে! সেই পুরোনো বাত—'আই মীন্,—ত্তাট ট্রেচারাস্ গাউট'—আবার চেপে ধরেছে। আমি—এই মিষ্টার র‍্যামান ট্যাটার্জী, আই, সি, এস্—সেকালের বাংলার বড় বড় জেলাগুলোকে যে একদিন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করে এসেছিল—বুঝলে অনিমেষ, তাকেই কিনা আজ বাত কাবু করে দিয়েছে—'আই মীন্'—

অনিমেষ॥ (রজতকে দেখাইয়া) এরই কথা আপনাকে কাল বলছিলাম মামাবাবু। এরই নাম রজত বোস, আই, এ, এস্। কলেজে আমরা এক সঙ্গেই বরাবর পড়েছি। 'এ ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টার্ অফ্ দি ইউনিভার্সিটী! (রজতকে) আর রজত, ইনিই হলেন আমার মামাবাবু—যাঁর কথা তোমায় আগেই বলেছি। আর ইনি হলেন আমার মামীমা।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় হইল

বুঝলে রজত, এঁরাই হলেন বর্ত্তমান সমাজের মধ্যমণি—'ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টার্স অফ্ দি সোসাইটী।'

রমেন॥ 'ষ্টার'! তা' হ্যাঁ, 'ষ্টারই' বলতে পারো তুমি অনিমেষ, কিন্তু—'আই মীন্'—(এলাকে ও নিজেকে দেখাইয়া) 'উই আর নাউ ফলিং ষ্টার্স'—হাঃ হাঃ হাঃ! হ্যাঁ,—'রাইজিং ষ্টার্' যদি বলতে চাও, তাহ'লে বলতে পারো আমার মেয়েকে—'আই মীন্'—মিস্ লালী চ্যাটার্জীকে। 'সি ইজ এ রাইজিং ষ্টার—এ ড্যাজলিং ষ্টার্!'···এই এখনি এসে পড়বে সে। তাকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন মিষ্টার বাসু।

রজত। আমায় আর মিষ্টার বাসু বলে ডেকে লজ্জা দেবেন না। আমায় শুধু রজত বলেই ডাকবেন। আমি আপনাদের ছেলের মতোন।

রমেন। বাঃ, বাঃ! খাসা বলেছোতো! ছেলে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—ছেলে বৈকি!···অনিমেষ, তুমি রজতকে নিয়ে আমার ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসো। আমি এখনি যাচ্ছি—

অনিমেষ। এসো রজত—

রজতকে সঙ্গে লইয়া অনিমেষ ভিতরে চলিয়া গেল

রমেশ। (সানন্দে) দেখেছো—দেখেছো এলা, কেমন খাসা ছেলে দেখেছো—'এ নাইস্ চ্যাপ্'—আই মীন্'—বিয়ে হ'তে না হ'তেই বাপ-ছেলে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললে—দেখলে তো ?

রজত ও অনিমেষ চলিয়া যাইবার পর এলা ভ্যানিটী কেস্ খুলিয়া মুখে এতোক্ষণ পাউডার-পাফ্ বুলাইতেছিল

এলা॥ (গম্ভীর ভাবে) হুঁ, দেখলাম।

রমেন॥ ঠিক এমনটিই আমি চেয়েছিলাম, এলা—আমাদের ছেলের অভাব পূরণ করতে পারবে 'গ্র্যাণ্ড' রজত ইজ এ গ্র্যাণ্ড্ সিলেক্সান্ ফর্ ত্তাট!' 'হি ইজ এ জুয়েল্—হি ইজ এ ব্রিলিয়াণ্ট বয়'—

আবেগভরে শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে রমেন ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল, এলা তাহার হাত ধরিয়া টানিল

রমেন॥ উহু—হু—বাত—বাত—

এলা। ছাই ভালো ছেলে। বিলেতেও যায়নি, য়্যামেরিকায় যায়নি—ও ছেলে ছেলেই নয়—

সদর্পে এলা বাহির হইয়া গেল। রমেন সবিস্ময়ে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল

চতুর্থ দৃশ্য

নীলকণ্ঠ মিত্রের পূর্ব্ব-বর্ণিত শয়ন-কক্ষ। তখন সন্ধ্যা। নীলকণ্ঠ অফিস হইতে ফিরিয়া একখানি জীর্ণ ইজিচেয়ারে শুইয়া চোখ বুজিয়া আরামে গড়গড়া টানিতেছিল। বাড়ীর ভিতর হইতে মহামায়া আসিয়া উপস্থিত হইল

মহামায়া॥ বসে বসে গড়গড়া টানছো ?

নীলকণ্ঠ॥ বসে বসে গড়গড়া টানবো নাতো কি গড়িয়ে গড়িয়ে গড়গড়া টানবো ?

মহামায়া॥ তোমার কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।···আবার হাসছো ? হাসতেও তোমার লজ্জা করে

না ? সেদিন থেকে আমার তো খালি কান্নাই পাচ্ছে। রজত যে এই ভাবে আমাদের পথে বসিয়ে দেবে—

নীলকণ্ঠ॥ সত্যি গিন্নী, এতোটুকু বেলা থেকে রজতকে মানুষ করলাম—নিজের ছেলের মতোই মানুষ করলাম। ওর ওপর অনেকখানি আশা-ভরসা করেছিলাম। কৃষ্ণা-মার বিয়ের সম্বন্ধে আমি নির্ভাবনাতেই ছিলাম।

মহামায়া॥ আমিও কী কম নির্ভাবনায় ছিলাম। রজতের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ে হবে—এতো জানা কথাই ছিল। জ্ঞাতি-কুটুম, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শী—সবাই সে কথা জানে। রজতের হাকিম হওয়ার খবর তোমার কাছ থেকে পেয়ে আমিতো পাড়ার সবাইকে বেশ গর্ব্ব করেই বলে এলুম,—"আমাদের জামাই আজ হাকিম হয়েছে।"

নীলকণ্ঠ॥ তুমি তো শুধু জানিয়েই এসেছিলে, আর আমি—রজতের টেলিগ্রামটা পেয়েই অফিসের দরোয়ানের কাছ থেকে টাকা ধার করে অফিসের সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিলাম। কিন্তু রজত যেভাবে সেদিন সাফ জবাব দিয়ে গেল, এর পরে কারোর কাছে আমার আর মুখ দেখাবার জো নেই।

মহামায়া॥ মুখ দেখাবার জো নেই বলে হাত-পা ছেড়ে দিব্বি আরামে বসে বসে গড়গড়া টানলেই তো আর চলবে না। মেয়েটার বিয়েতো দিতে হ'বে। শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে—আঠারো পেরিয়ে উনিশে এবার পা দেবে। সেদিকে খেয়াল আছে ?

নীলকণ্ঠ॥ খুব খেয়াল আছে। মেয়ে হ'য়ে ও যখন জন্মেছে, বিয়ে ওর দিতেই হবে। কিন্তু মুস্কিল কী হয়েছে জানো গিন্নী ?

মহামায়া॥ মুস্কিল আবার কিসের ?

নীলকণ্ঠ॥ মানে—কালো মেয়ে শুনলেই সবাই যে পিছিয়ে যায়।

মহামায়া॥ কেন ? কালো মেয়ে কী আর মেয়ে নয় ? তাদের কী আর বিয়ে হয় না ? দুনিয়ায় যতো কালো মেয়ে আছে, সবাই বুঝি আইবুড়ো হ'য়েই রয়েছে।

নীলকণ্ঠ॥ নাঃ। তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না গিন্নী। এই সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারলে না ? কালো মেয়ের বিয়ে হ'বে না কেন ? মূল্যের গুণানি— উপযুক্ত মূল্য ধরে দিলেই সব দোষ খণ্ডিয়ে যায়। চকচকে চাঁদির জোরে কালো রঙও গোরা হ'য়ে যায়।

মহামায়া॥ কালো রঙ গোরা হয়ে যায় ?

নীলকণ্ঠ॥ হ্যাঁ। তার মানে—শুধু টাকার জোরেই কালোমেয়ের বিয়ে হয়। এই ধরনা কেন—আমার কৃষ্ণা-মা দেখতে কালো হ'লেও—আমি যদি ওই কালো রূপের জন্য পাঁচ-দশ হাজার টাকা বেশী পণ দিতে পারি, তাহ'লেই মেয়ে আমার এখনি পার হ'য়ে যায়। কিন্তু তুমি তো জানো গিন্নী, আর সব কেরাণীর মতোই আমাকেও প্রতি মাসে ধার-দেনা করে কোনরকমে সংসার চালাতে হয়। পাঁচ-দশ হাজার টাকা আমি পণ দেবো কী করে ?

মহামায়া॥ ওর চেয়ে কম পণে কী আর মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না ? ইচ্ছে থাকলেই সব হয়।

নীলকণ্ঠ॥ তুমি বল কী গিন্নী ? মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার নেই ?

মহামায়া॥ ইচ্ছে যদি সত্যিই তোমার থাকতো, তাহ'লে তুমি আর গোঁ ধরে বসে থাকতে না—কুলীনের ঘরে ছাড়া মেয়ের বিয়ে তুমি দেবে না।

নীলকণ্ঠ॥ কিন্তু বেণেটোলার মিত্তির বাড়ীর মেয়ে—

মহামায়া॥ থাক্। বেণেটোলার মিত্তির—বেণেটোলার মিত্তির—শুনে শুনে কান আমার ঝালাপালা হ'য়ে গেল। মেয়ের বিয়ে দেবার যাদের সামর্থ্য নেই, তাদের আবার অতো বংশের দেমাক কিসের ? নিজের জাতে না পারো, অন্য জাতের ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দাও।

নীলকণ্ঠ॥ কী বললে—কী বললে গিন্নী ? অন্য জাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে ? মানে—অসবর্ণ বিয়ে ?

মহামায়া॥ হ্যাঁ। মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্যের অভাবে আজকাল কতো অমন অসবর্ণ বিয়ে হচ্ছে।

নীলকণ্ঠ॥ কিন্তু তাই বলে আমি আমার মেয়ের অসবর্ণ বিয়ে দোবো ? তুমি বল কী গিন্নী ? বেণেটোলার মিত্তির বাড়ীর মান-ইজ্জৎ—

মহামায়া॥ মেয়েকে আইবুড়ো করে ঘরে পুষে রাখো, আর তোমার ওই ঘুণধরা মান-ইজ্জৎ ধুয়ে ধুয়ে খাও।

নীলকণ্ঠ॥ আহা, চটো কেন গিন্নী,—চটো কেন ?

কৃষ্ণা-মার জন্তে ভালো পাত্রের সন্ধান আমি কী কম করছি? বেশতো, তুমিও চেষ্টা করে দেখো না। তুমিও তো মেয়ের মা।

মহামায়া॥ মেয়ের মা বলেই তো—আমার হয়েছে অতো জ্বালা—আমার হয়েছে অতো জ্বালা—

মহামায়ার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল। মহামায়া দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করিল

নীলকণ্ঠ॥ (ম্লান হাসিয়া, খানিকটা আপন মনে) আর আমি মেয়ের বাপ হয়েছি বলেই—আমার যেন আর কোন জ্বালাই নেই—দিব্বি আরামে আছি।

নীলকণ্ঠ পুনরায় চোখ বুজিয়া গড়গড়া টানিতে শুরু করিল। অল্প কিছুক্ষণ পরেই একটি ডিসে কয়েকটি পান লইয়া কৃষ্ণা ঘরে আসিল

কৃষ্ণা॥ বাবা! তোমার পান।

নীলকণ্ঠ॥ (চোখ বুজিয়া) রেখে যা'।

পানের ডিস্‌টি কৃষ্ণা নীলকণ্ঠের কাছে রাখিয়া দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নীলকণ্ঠ পূর্ব্ববৎ চোখ বুজিয়া গড়গড়া টানিয়া যাইতে লাগিল। কিছুপরে—

কৃষ্ণা॥ বাবা!

নীলকণ্ঠ॥ (পূর্ব্ববৎ) কী মা?

কাছেই একটি ছোট টুল ছিল, তাহা টানিয়া লইয়া কৃষ্ণা পিতার পাশে বসিল

কৃষ্ণা॥ একটা কথা বলবে বাবা?

নীলকণ্ঠ এবার গড়গড়ার নল রাখিয়া দিয়া কৃষ্ণার মুখের পানে চাহিল

নীলকণ্ঠ॥ কী কথা মা?

কৃষ্ণা॥ আমায় তুমি আজকাল এড়িয়ে চল কেন বাবা?

নীলকণ্ঠ॥ (হাসিয়া) না, না, মা—সে কী কথা! তোকে আমি এড়িয়ে চলবো কেন মা?

কৃষ্ণা॥ ও কথা বলে আমায় তুমি ভোলাতে পারবে না বাবা। তুমি কী মনে কর, আমি কিছুই বুঝি না? আগে তোমার যখন যে জিনিসের দরকার হতো—ডাক পড়তো আমার। আর আজকাল—দিনান্তে একবারও তুমি আমায় ডাকো না। সামনাসামনি দেখা হ'লে কেমন যেন হ'য়ে যাও। কেন বাবা? তোমায় বলতেই হ'বে।

নীলকণ্ঠ॥ (বিষণ্ণকণ্ঠে) কেন? (দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে) এতোদিন ধরে তোকে আর রজতকে একসঙ্গে এমনভাবে কল্পনা করে এসেছি মা যে, তোকে দেখলেই রজতের কথা আমার মনে পড়ে যায়।

কৃষ্ণা আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। পিতার কাঁধে অশ্রুজলে ভাঙিয়া পড়িল

কৃষ্ণা॥ বাবা।

নীলকণ্ঠ॥ (কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে) ওঠ্ মা, ওঠ্—কাঁদিস্‌নে। রজত আমাদের যে আঘাত দিয়েছে, তার চেয়ে কম আঘাত তোকে সে দেয় নি—তা' আমি বুঝিরে,—তা' আমি বুঝি। কিন্তু এখনও আমার মন কী বলে জানিস্ মা?

কৃষ্ণা॥ কী বাবা?

নীলকণ্ঠ॥ আমার মন কিন্তু এখনও বলে মা, রজত ফিরে আসবেই। ভুল তার একদিন সে বুঝতে পারবেই।

কৃষ্ণা॥ কিন্তু সেদিন তো স্পষ্টই বলে গেল—

নীলকণ্ঠ॥ সেদিনের কথা আর বলিস্‌নে মা—সেদিনের কথা আর বলিস্‌নে। তোর মাকে ভয়ে বলতে পারি না—শুনলেই তেড়ে আসবে। তোকে বলি শোন্। সেদিন রজত সবে হাকিম হ'য়ে এসেছে—একেবারে টাটকা আন্‌কোরা হাকিম—সারা গায়ের রক্ত তখনও টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। হাকিমী মেজাজ। তোর মাকে কতো বললুম—"বিয়ের কথাটা আজ আর তুলো না।" আমাকে দশ কথা শুনিয়ে দিলে তোর মা। সবুর সইলো না,—নিজেই কথাটা তাড়াতাড়ি পেড়ে বসলো। চালে ভুল করে ফেললো।

কৃষ্ণা॥ কিন্তু আমার মনে হয়,—

নীলকণ্ঠ॥ না, না, মা, তুই দেখে নিস্—রজত তেমন ছেলেই নয়। ওকে কী আর আমি কম চিনিরে। ওর মতো হীরের টুকরো ছেলে খুব কমই আছে। দেখছিস্ না,—কথাটা সেদিন হঠাৎ হাকিমী মেজাজে বলে ফেলে লজ্জায় আর এ বাড়ীতে আসতে পারছে না। কিছুদিন

যাক,—মেজাজটা ঠাণ্ডা হোক্, তখন দেখবি—ওই রজত মাথা নীচু করে এসে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইবে। ওরে, রজতের সঙ্গে তোর বিয়ে, এ হলো বিধাতার লিখন। এ বিয়ে হ'তেই হ'বে—হ'তেই হ'বে।

একখানি 'ইলাষ্ট্রেটেড্ উইক্‌লী' পত্রিকা হাতে কণক বাহির হইতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল

কণক ॥ বাবা! বাবা!…'ব্রাদার-ইন্-ল ইজ্ নাউ ব্রাদার-আউট-ল'! হাকিমের শালা হওয়াও গেল না—ভালো চাকরীও আর জুটলো না।

নীলকণ্ঠ ॥ কী হয়েছে রে কণক? ব্যাপার কী?

কণক ॥ ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। এই—রজতের কথা বলছিলুম আর কি।

নীলকণ্ঠ ॥ রজত। (উঠিয়া পড়িল)

কৃষ্ণা ॥ রজতদার কোন খবর পেয়েছো নাকি বড়দা?

সাগ্রহে কৃষ্ণা আগাইয়া আসিল

কণক ॥ হ্যাঁ, বেশ ভাল খবরই পেয়েছি। এই ত্যাখ্ না, খবরের কাগজে রজতের ছবি বেরিয়েছে।

পত্রিকাখানির পাতা খুলিয়া আগাইয়া দিল।

নীলকণ্ঠ ॥ (অধীর আগ্রহে) কই, দেখি—দেখি—

পত্রিকাটি লইল

কণক ॥ শুধু একা রজতের ছবিই নয়, তার পাশেই রয়েছে—

নীলকণ্ঠ ॥ (পত্রিকা পাঠ) 'মিষ্টার রজত কে বাসু, আই, এ, এস্ য়্যাণ্ড্ হিজ্ ব্রাইড্'—

হাত হইতে পত্রিকাটি পড়িয়া গেল

নীলকণ্ঠ ॥ রজত—রজত—বিয়ে করেছে!

কণক ॥ বারে! বিয়ে করবে না! এতো লেখাপড়া শিখে কষ্ট করে হাকিম হলো, সে কী সন্ন্যাসী হ'বার জন্যে? আর জানো বাবা, যাকে-তাকে রজত বিয়ে করেনি। বিয়ে করেছে—মিষ্টার র‍্যামান চ্যাটার্জী, আই, সি, এস্, রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ য়্যাণ্ড্ কালেক্টারের মেয়েকে। বড়লোকের সঙ্গে বড়লোকের একটা রক্তের টান আছে—এতো জানা কথাই। আমাদের মতো গরীব লোক সেখানে থৈ পাবে কেন? বড়গাছে কি আর ছোট নৌকো বাঁধা যায়?

নীলকণ্ঠ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরাই ভুল করেছিলাম। আমরা বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম—বামন হ'য়ে আমরা চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম—

উদ্‌ভ্রান্তের মতো নীলকণ্ঠ বাহির হইয়া গেল। পাষাণ-প্রতিমার মতো কৃষ্ণা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—নীরব…নিশ্চল। কণক আগাইয়া আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিল।

কণক ॥ তোর কিন্তু এতে এতোটুকু দুঃখ করার কিছু নেই, কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা ॥ (ম্লান হাসিয়া) না, না, আমি দুঃখ করতে যাবো কেন? ও বিয়ে করছে—ভালোই করেছে।

কণক ॥ তাই বলে—(কৃষ্ণাকে দেখাইয়া) আমাবস্যের চাঁদকে বিয়ে করবার মতো ওর যদি তেমন ক্ষুদ্র বুদ্ধি হতো, তাহ'লে কখনই ও আর হাকিম হ'তে পারতো না। হ্যাঁ, রজতের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়—ছোঁড়াটার 'চয়েস্' আছে বলতে হবে। মিস্ লালী চ্যাটার্জী—'দি মোষ্ট্ কভেটেড গার্ল অফ দি সোসাইটী'—

কৃষ্ণা ॥ তুমি তাকে দেখেছো নাকি দাদা?

কণক ॥ কতোবার দেখেছি। রাস্তায় মোটর 'ড্রাইভ' করে যেতে দেখেছি—নিউ এম্পায়ারে ওর 'প্লে' দেখেছি—ময়দানে ওর টেনিস্ খেলাও দেখেছি। একেবারে চৌকশ মেয়ে। তার ওপর দেখতেও যা'—

কৃষ্ণা ॥ খুব সুন্দর বুঝি?

কণক ॥ শুধু সুন্দর? দেখতে একেবারে পূর্ণিমার চাঁদ—যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ। যাই, মাকে সু-খবরটা দিয়ে আসি।

কণক ভিতরে চলিয়া গেল। কৃষ্ণা ধীরে ধীরে পত্রিকাখানি কুড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত পাতাটি কম্পিতহস্তে খুলিয়া রজত ও তাহার নবপরিণীতা বধূর ছবিটির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দুই চোখ দিয়া তাহার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল—হাত কাঁপিতে লাগিল।

কৃষ্ণা ॥ (অশ্রুসজল মুখখানি তুলিয়া) রঙাণ গোলাপ তুমি বুকে তুলে নিয়েছো—তুমি সুখী হও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সেই গোলাপের কাঁটা যেন তোমার বুকে না বেঁধে—গোলাপের কাঁটা যেন তোমার বুকে না বেঁধে।

পত্রিকাখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে ভাঙিয়া পড়িল

(ক্রমশ)

সাহিত্যে রূপকল্পনা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

সাহিত্যে ভাবও আছে, রূপও আছে,—যেমন আছে ফুলের বৃন্ত ও পাপড়ি। বৃন্ত যেমন পাপড়িকে ধ'রে রাখে, ভাব তেমনি ফুটিয়ে তোলে রূপকে। ফুলের রসমধু থাকে মর্মকোষে—আর ভাব ও রূপের সুসমন্বয়ে যে-রসসত্য, তার আনন্দভূমি সাহিত্যে। সাহিত্য মানব-জীবনের বিভিন্ন ভাবের রূপকল্পনার আনন্দলোক।

জীবনের গভীর অনুভবের দ্বারা আনন্দ ও শাশ্বততত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলার রূপ-সাধনা—যখন ফুটে ওঠে, তখনই তা' রূপ—অন্তর্লোকের আনন্দ ভাবনার বহিঃসৌন্দর্য, প্রকাশ ও সৃষ্টির উর্ধ্বায়িত পরিব্যাপ্তি! আর এই রূপকে একটি সামগ্রিক রসসত্যে যা' অভিষিক্ত করে, তাই রূপকল্পনা।

কল্পনার মধ্যে একটি সমগ্রতাবোধ সঞ্চার করার শক্তি আছে—আর আছে একনিষ্ঠ গভীর দর্শনশক্তি। যেখানে যা-কিছু খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়িয়ে আছে—ছিন্নমালার ফুলগুলির মতো এদিকে সেদিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে, সেগুলিকে একটি অখণ্ড দ্যোতনায় সাজিয়ে দেওয়ার শক্তি একমাত্র কবি-কল্পনারই আছে। কল্পনা তাই অখণ্ডবোধের একরূপ প্রকাশধ্বনি, —সৌন্দর্য ও সত্যের সমন্বয়কারিণী! এই কল্পনাকেই কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া চলে; রূপকল্পনা তারই একদিক।

রূপকল্পনার পেছনে থাকে একটি রূপচেতনা। কবি-মানসের বিশেষ পিপাসা নিয়ে এই চেতনাটি গ'ড়ে ওঠে। দিগন্তকোণের আলোক রশ্মিকে সারাটি আকাশ যখন তার বিশাল বুকে মেলে নেয়, তখনই সেখানে ফুটে ওঠে পূর্ণ সুষমার অপরূপত্ব! কবি-মানসের নিভৃতির যে-রূপচেতনা, তা যখন রূপসৃষ্টির শিল্পায়নে প্রদীপ-শিখার মধুর আলোটির মতো পূর্ণায়ত একটি রূপলাভ করে, তখন তাও তেমনি অপরূপ। শিল্পী-হৃদয়ের রস-আনন্দের স্পর্শে রূপ লাভ ক'রে বিশ্ব-হৃদয়কে রসস্নিগ্ধ করার বিপুল আবেগ তখন তার মধ্যে। সৌন্দর্যের আবেদনকে চিরকালের মাধুরী দিয়ে অনন্ত ক'রে রাখবার জন্ম তার ব্যাকুলতার সীমা নেই! এ সম্ভব হয় শুধু কেবল কবির গভীর রসনাভূতির দ্বারাই। তাই রূপকল্পনার পেছনে আছে ভাবকল্পনার আনন্দময় উপলব্ধি; আর আছে কবির আত্ম-চেতনাময় ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা। নিজের ব্যক্তিমনের বিশেষ চেতনা দিয়ে উপলব্ধির গাঢ়তা দিয়ে অভিজ্ঞতার অনুরঞ্জনে কবি বা সাহিত্যিক নিজের মনের আদর্শকে, অসীম সৌন্দর্যের নিগূঢ় কল্পনাকে রূপময় ক'রে তোলেন। মনের ভাবনাকে একটি রূপের মধ্যে দেখতে না পেলে কিছুতেই যেন শান্তি নেই! শুধু অনুভূতির উপরে যে-কথাগুলি পদচারণা ক'রে গেল, সেগুলিকে স্থির সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠা দিতে না পারলে কোন দিক দিয়েই তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাই কবি বা সাহিত্যিকের সাধনা রূপসৃষ্টির সাধনা, এবং তাঁরা মূলগত ভাবেই রূপকার!

এই রূপকল্পনার মধ্যেই রসকল্পনা সঞ্চারিত হ'য়ে একটি লোকাতীত আনন্দের আবেশ জাগায় কবির মনে। আনন্দের নিবিড় অনুভূতিতে যে-কল্পনা জেগে ওঠে, তাই তো রসকল্পনা! কল্পনায় যে-রূপলোকটিকে কবি সৃষ্টি করেন, সেখানেই নিখিলের সৌন্দর্য লক্ষ্মীকে কবি তাঁর অনুভবের জগৎ হ'তে এনে পরিপূর্ণভাবে দেখতে চান, আবার সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অরূপ সৌন্দর্যের লাবণ্যলীলায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে ভাবোদ্বেল কণ্ঠে বল্‌তে পারবেন—

> বক্ষ হ'তে লহ টানি
> অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি
> শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহ অপসরি'
> উন্মুক্ত অলক। কোন মর্ত্য দেখে নাই
> যে-দিব্যমূরতি, আমারে দেখাও তাই
> এ-বিশুদ্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।
> (জ্যোৎস্নারাত্রে—রবীন্দ্রনাথ)

সৌন্দর্যের রূপ-ভাবনায় এখানে কবি-কল্পনা বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে। নীরব উপলব্ধির মধ্যে ডুবে-থাকা একটি মানস-জীবন যেন হঠাৎ জেগে উঠে', একটি বিশেষ দৃশ্যবস্তুর জগতে অলক্ষ্য এক রূপ দেখার আগ্রহকে নিভৃত রজনীর জ্যোৎস্নাধারার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গোপন মনের স্বপ্নচারিণীকে একটি সৌন্দর্যের রূপসত্তায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে তৃপ্তি লাভ করছে।

এইখানেই রূপকল্পনার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হৃদয়ের ভাবরসে সিক্ত হয়ে ওঠে যখন মানসিকতা, তখনই ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে কবি-মানসের সৌন্দর্যবোধ। নীরব এক প্রেম-চেতনার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ চিরদিন জড়িত। প্রেমে আছে আত্মশীলতার অলক্ষ্য পরিতৃপ্তি, সৌন্দর্যবোধে আবেশ-মুগ্ধতার স্বপ্নসঞ্চার। এই স্বপ্ন-শিহরণের মধ্যেই কবি যাকে দেখেন, তার রূপের আর সীমা থাকেনা। যা-কিছু আঁকেন অনুভবের সত্য দিয়ে রূপময় করেই আঁকেন—আর আমাদের মনও সেই রূপের মধ্য চিরদিনই বাঁধা থাকে। মহাকবি কালিদাসের তুলিতে আঁকা 'নিয়মক্ষমমুখী ধৃতৈকবেণিঃ' শকুন্তলাকে আমরা যখন দেখি, তখন মনে হয়, সে যেন চরিত্র সম্পদের এক শুদ্ধশীলা দেবীমূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ছবি মানস স্বপ্নকে জড়িয়ে ধরে, যা' হৃদয়কে নিয়ে যায় সেইখানে, যেখানে আছে গ্লানিহীন সৌন্দর্য ও প্রেমের অপূর্বতা। কবি তাঁর অনুভূতির আনন্দময়তা ও সত্যবোধের নিষ্ঠা দিয়ে বিরহের ব্রতচারিণী শকুন্তলাকে যে-রূপে এঁকেছেন, সেই রূপেই যেমন আমরা তাঁকে একান্ত আপনার ক'রে গ্রহণ করি, ঠিক তেমনি নূতন এক শুচিময়তার ভাবদৃষ্টিতে কবির সঙ্গে তাঁকে দেখতেও শিখি। মাধুর্যের এক স্নিগ্ধতা ভরা আবেশ নিবিড় হয়ে ওঠে আমাদের চেতনার গভীরে। সুদূর অতীত যুগের শকুন্তলা কবির রস-তুলিকার পথটি ধ'রে আমাদের অন্তরকে ডাক

নিয়ে নিয়ে যায় তাঁর প্রেমের শুচিতা ভরা পুষ্পিত জীবনের তাবগহনে, তার শুচি সৌন্দর্যের একটি কলহর্ষের ধ্বনি শুনতে পাই আমাদের মর্ত্যালোকের তপোবনটাতে। কাব্যলোকে শকুন্তলা যে-রূপ পেয়েছে, সেই রূপেই আমাদের হৃদয়ের জগতে সে চিরদিনকার শকুন্তলা। কারণ তার রূপের ভাবে ভাবিত হ'য়ে আমাদের অন্তরের নূতন করে জাগরণ ঘটে।

এই রূপকল্পনাই সাহিত্যের ভাববস্তুর রূপবৈচিত্র্যের হেতু। কবির মননক্ষেত্রে ভাবকল্পনার জাগরণ ও আবেদনের মধ্যেই ভাববস্তুর প্রথম আশ্রয়। এই আশ্রয়টিকে অবলম্বন করেই ভাববস্তু একটি রূপ গ্রহণ করতে চায়। কারণ, রূপ দেওয়ার পেছনে সব সময়েই একটি কল্পনার প্রয়োজন। এই ভাববস্তুটির মধ্যে আবেগের ভাগ বেশি ; তাই নিগূঢ় একটি ভাবকল্পনা যখন কবির মনন-আবেগের সঙ্গে মিশে একান্ত ভাবেই অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে, তখনই হয় সার্থক রূপকল্পনার সৃষ্টি। তখন একবার কবির 'মানসী' হয় 'কবিতা কল্পনালতা' একবার হয় 'অন্তরতম জীবন দেবতা' আর একবার দেখা দেয় 'লীলাসঙ্গিনী' রূপে। দুয়ারের বাইরে কবি তাকিয়ে যাকে দেখেন, তাকে—'মনে হয় চিনি চিনি।' চাঁদের শাশ্বত শুভ্র রূপের মধ্যেও যে-রূপ কবি দেখেন, সে রূপ—

Liquid as lime-tree blossom soft as brilliant
water or rain.
She shines. (A white blossom Lawrence)

সুন্দরতর এমনি রূপায়ণের মধ্যে মনের কল্পনাকে ঠাঁই দিলে একটি সীমাহীনতার আবক্ষকে কবি জাগিয়ে দেন। কল্পনার রূপ-নির্ভরতা আছে, কিন্তু সে যদি রূপসৃষ্টির সীমিত আয়তনের মধ্যে সমস্ত ব্যঞ্জনাকেই হারিয়ে ফেলে, তবে আর তার কোন সার্থকতা থাকে না। রূপের নীড়ে স্থান লাভ ক'রে কল্পনার এইখানেই কৃতিত্ব আর সিদ্ধি।

যে-রূপ দেখার জন্য প্রাণে আকুলতার সীমা নেই, চিরপ্রার্থিত প্রিয়ার জন্য আত্মহারা মনের অরূপ অনুভূতির শেষ নেই,—তাকে একবার মাত্র দেখলেই কি সব শেষ হয়ে যাবে? অন্তরের রোমাঞ্চ আরও না-পাওয়ার বেদনায় মুখর হ'য়ে উঠবে না? বৈষ্ণব কবির লীলা-সজ্জায় অন্তরের প্রেমানুভূতির সে-রূপাকুলতা ফুটে উঠেছে, তাতে—

তুয়া অপরূপ রূপ দেখি দুয় সঙ্গে
লোচন মন দুহু ধাব।
পরশক লাগি, জাগি' তনু অন্তর
জীবন রহ কিয়ে যাব॥ (গোবিন্দদাস)

যে সে অপরূপ রূপের সঙ্গে লোচন মন ধাবিত হয়, এর নেপথ্যে আছে চিরদিনকার রূপসাধনা। সে-প্রেম অন্তরের চেতনাতলে অনেকদিনের সঞ্চিত মুহূর্তের ব্যাকুলতাকে নিয়ে দানা বেঁধেছে, সেই প্রেম একটি অপরূপ রূপের আয়তনে প্রিয়াকে না দেখলে কিছুতেই সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। অন্তরের মানুষটির গোপন রূপকল্পনা মনকে অধীর করেই তোলে। জীবনের প্রত্যাশাগুলি রূপ দেখে খুশী হওয়ার অবকাশ খোঁজে। তাই—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥ (জ্ঞানদাস)

শুধু তাই নয়—

রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে॥ (ঐ)

রূপ দেখেই মনের কথা যেন সীমাহীনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের প্রেমের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সে-অশেষের ভাব আছে, মনের কথার ভাবেরও অসীম হওয়ার সেই আগ্রহ। ভাব যখন যেয়ে রূপকে পায়, তখন সেই রূপ যেই দেখে, তার প্রাণে বহুদিনের বহু কথা নানা আকারে দেখা দেয়। নিজের মনের পুলক-শিহরণের ভিতরে অজানা বেদনার অশ্রুর ঐশ্বর্যও লুকিয়ে থাকে,—সুনিবিড় বনদেহে জ্যোৎস্নাঝরানো শুভ্রতার সঙ্গে ছায়ার মৃদু প্রলেপটির মত।

রূপ দেখে হৃদয়ের সব অনুভব যেমন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তেমনি রূপকল্পনাকে ধরে রাখা মনগুলি অনুভূতিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে সেই রূপকে ফিরে ফিরে দেখে। তখন সেই সুন্দর রূপমূর্তি—

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ॥ (বিদ্যাপতি)

সেই বিদ্যুৎ-ঝলকিত রূপটির দিকে চেয়ে আমাদেরও তৃষ্ণা মেটে না,—পিপাসার অন্তর দিয়ে বারবার কেবল দেখতেই ইচ্ছে করে। সুদূর আকাশের নীল নির্মল স্নিগ্ধতার পরিমণ্ডলে যেমন অজস্র তারকার সমারোহ, ঠিক তেমনি সাহিত্যের রূপকল্পনায় একটি হৃদয়ের আবেগ মুক্তির মধ্যেই বিশ্বহৃদয়ের গীতধ্বনি!

এই রূপসাধনাই বৈষ্ণব কবি ও শাক্ত কবিদের রূপকল্পনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। শাক্ত পদাবলীর কুঞ্জবনেও মাতৃ আরাধনার আরতি-দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে কল্পনা করেছেন বিশ্বের শক্তিরূপিণীকে,—মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন কন্যারূপে ও মাতৃরূপে দেখে। বাৎসল্যরসের এক স্বপ্নসৌন্দর্য সেখানে যেন রূপ ধ'রে জেগে আছে।

ঋষি বঙ্কিমের দেশপ্রেমও এই রূপসাধনাকে আশ্রয় করেই দেশ মাতার রূপকল্পনা করেছে। যে কল্পনায় মাতা 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রূপে জেগে উঠেছেন, আর অভয় দিয়েছেন 'বহুবলধারিণী রিপুদল বারিণী' রূপ,—সে কল্পনাকে আমরা প্রাণের ঘরে ঠাঁই দিয়ে দেশমাতৃকার রূপের কাছে মাথা নত করি। কবিদৃষ্টির প্রদীপ-শিখাটির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিকে মিলিয়ে দিয়ে সেই অপূর্ব রূপকল্পনাকে অভিনন্দিত করি প্রতি যুগে।

অন্তরের ভাবময় তত্ত্বকে অপরূপ ক'রে তুলেই রূপকল্পনার সার্থকতা। এখানে রূপকল্পনা সাহিত্যে রূপক হ'য়ে দেখা দেয়। রূপকের আশ্রয় এখানে তার অনিবার্য। রূপহীন ভাবকল্পনার মধ্যে সন্ধানের যে অপরিসীম ব্যাকুলতা, তা' প্রত্যক্ষ একটি প্রকাশরূপের মধ্যে বেঁধে না দিলে কিছুতেই যেন কবি-মানসটির তৃপ্তি নেই। প্রকাশের মাধ্যম অবলম্বন করেই সৃষ্টির রূপবিকাশ। সাহিত্যের প্রকাশরূপ ভাষায়, সৃষ্টি রূপ রসে। রসের জোগান দেওয়া হয় কখনো কখনো তাই রূপকের আশ্রয়ে। রূপক তখন নূতন ভাবকল্পনার সৃষ্টিরূপ হ'য়ে দেখা দেয়।

তাই, যে-বিশ্বরাজ শান্তির আধার, স্নিগ্ধতা এবং মধুরতা যাঁর ধ্যানে, সমস্ত রসসৌন্দর্যের উৎসমূল যার নাম, সমস্ত শ্রেয় এবং প্রেয়ের কেন্দ্রমূল যাঁর বক্ষোভূমি, কবি তাঁকে রূপময় করতে চেয়েছেন দীঘিরূপে। তিনিও দীঘির মতোই অতল গভীর! তাঁরই বুকে সকল ডুবিয়ে দিয়ে একবার ঝাঁপিয়ে পড়লে, সমস্ত ব্যথা-বেদনা, সমস্ত শ্রান্তি ও ক্লান্তি, একটি নিমেষেই কোথায় যেন চলে যায়। জীবনের সাধনায় আসে এক পরিপূর্ণতা এবং সিদ্ধি! কবির রূপকল্পনা 'দীঘি'র মধ্যেই যখন অখিল রসামৃত মূর্তিকে দেখেছে, তখনই কবিকণ্ঠের ছন্দরাগিনীতে গভীর অনুরাগের পরিতৃপ্তি বেজে উঠেছে এই ভাবে—

> তীরের কর্ম সেরে আমি গায়ের ধুলো নিয়ে
> নামি তোমার মাঝে;
> এ-কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছল্ ছলিয়ে উঠে
> কানের কাছে বাজে। (দীঘি—রবীন্দ্রনাথ)

কবি হৃদয়ের আত্মসমর্পণের সকরুণ আবেদন এমনি করেই রূপ লাভ করেছে।

বিশ্ব মানবের সঙ্গে সেই পরম সুন্দরের যে একটি বিচ্ছেদহীন প্রেম সম্পর্ক আছে, তাই রবীন্দ্র-রূপকল্পনার মাধ্যমে রূপময় হয়েছে 'রাজা' নাটকে। সুদর্শন রাজাকে প্রশ্ন করেছিল, রাজা কি তাকে দেখতে পান? কি দেখেন? রাজা উত্তর দিয়েছিলেন—'দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।' চিরপ্রিয়ের বিশ্বব্যাপী-আনন্দরূপের সঙ্গে অন্তরের মিলন-কামনাকে মিশিয়ে দিয়ে জীবাত্মারূপিনী সুদর্শনা সাধনার যে-স্তরগুলি অতিক্রম করেছে, সেই তাৎপর্যের ব্যাপকতাকে একটি রূপকল্পের মধ্যে না আনলে, এতটা রস-মধুর হ'য়ে উঠতো না। পরম সাধনার পথে গভীর আকুলতার একটি জীবন চির উপাস্য প্রিয়ের সঙ্গে এমনি ক'রে যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে, তাকে কথা দিয়ে, আবেগ দিয়ে এমন ক'রে চোখের সামনে তুলে না ধরলে সার্থক হতো কি ক'রে? অন্তরের নিরুচ্চার অশ্রুবিন্দুগুলিকে সংগীতের সুরময়রূপে প্রকাশ করলেই আমাদের জিজ্ঞাসু চেতনা তৃপ্তিলাভ করে।

সাহিত্যের রূপকল্পনা তাই অন্তর্লীন গভীরের মর্মধ্বনিকে বাইরের রূপলোকে এনে দিয়ে আমাদের হৃদয়কে জাগিয়ে দেয় নূতন আস্বাদের অমৃতলোকে। সেখানে ভাবতত্ত্বের উপলব্ধিতে গভীর আনন্দ, রূপের সুবলয়িত ঐশ্বর্যে মধুরতা।

বন্ধুর তারিফ

বেতালভট্ট

কি আর লিখেছ ভাই যা না আমি জানি
এর তরে চাও নাকি সাধুবাদ বাণী?
আমিও লিখিতে পারি, লিখিনাক তাই
তোমরা লেখার এত করিছ বড়াই।
তেরশো তিরিশ সালে বৈশাখে আশ্বিনে
লিখেছিনু দুটি গল্প স্কুল ম্যাগাজিনে।
তখন বয়স ষোলো, বিবাহের পদ্য লিখিলাম,
পড়ে সবে হেসে খুন, কবি ব'লে হয়ে গেল নাম।
লিখে কত পাও তুমি? আদালতে আমি বারোমাসই
পকেট করিয়া ভর্ত্তি দুঘণ্টায়, বাড়ী ফিরে আসি।

কবি টবি হলে হ'ত দুর্গতি চরম
লেখক হইনি ভাগ্যে, এ ভাগ্য পরম।
একটুকু চিন্তা আর একটুকু শ্রম,
একটুকু অবসর, একটু উদ্যম,
সামান্য দুচারখানা বই পড়ে দেখা
তা হলেই হ'য়ে যায় এর চেয়ে ঢের ভালো লেখা।
ষ্টাইলের কথা যদি বলো তবে তা সে
অভ্যাস করিলে হাতে আপনিই আসে।
মিথ্যা তব দাবি
তুমিও যা ভাবো ঠিক আমিও তা ভাবি।

আমি লিখিনাক আর তুমি লেখ তফাৎ থোরাই,
লেখক বলিয়া ভাই বৃথাই বড়াই।
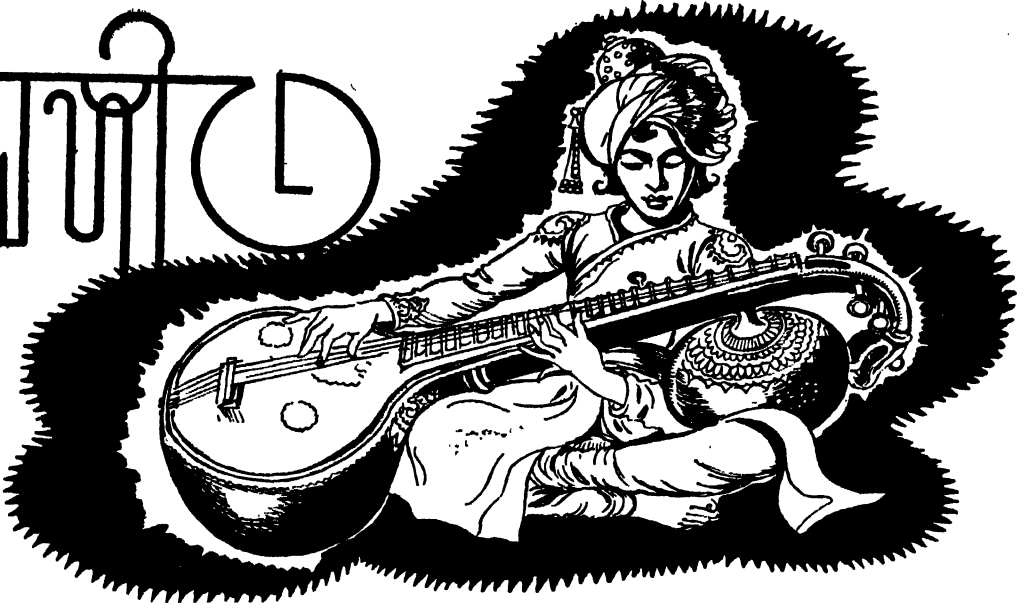
জন্মদিনের দেবালয়

দেহ বলে দেবি ! মাটিতে যে'দিন তোমার জন্ম হয়,
সেই দিন হ'তে আমি জগতের জীবন্ত-দেবালয় ।
প্রাণ বলে, মোর নন্দিত নিশ্বাসে
তব অনাহত-প্রাণের পবন আসে ;
মন বলে, মোর বিকাশে তোমার অসীম সুষমা রয় ।
দেহ বলে, দেবি ! মাটিতে যে'দিন তোমার জন্ম হয়,
সেই দিন হ'তে আমি জগতের জীবন্ত-দেবালয় ॥

নারীর জীবনে মহেশ্বরীর স্বরূপ সমুজ্জ্বল !
ঐ-দিবা ঐ মহাবিভাময়ী মায়ের উদয়াচল ।
মরণে মলিন মানবতা হল ধনী
লভিয়া স্বর্গদীপন-সঞ্জীবনী ;
তম-সুপ্তির কালো রসাতল জাগিয়া জ্যোতির্ময় ।
দেহ বলে, দেবি ! মাটিতে যে'দিন তোমার জন্ম হয়,
সেই দিন হ'তে আমি জগতের জীবন্ত-দেবালয় ॥

ঐ দিবসের বিভা-চন্দনে রঞ্জিত করি' ভাল,
পুরোহিত হ'য়ে মৃন্ময়ী-পূজা সাধিয়াছে মহাকাল ।
হেরি' পাবনীর অবতরণের ধারা,
নব গতি লভে গগনের গ্রহতারা ;
বলে ত্রিভুবন, জয় ধরণীর চিরন্তনীর জয় ।
দেহ বলে, দেবি ! মাটিতে যে'দিন তোমার জন্ম হয়,
সেই দিন হ'তে আমি জগতের জীবন্ত-দেবালয় ॥

কথা ঃ নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী) — সুর ও স্বরলিপি ঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II ন্া ন্া দ্া | ন্া -া | ন্া -সা I সা -া -া | -া -া | -া -া I
দে হ ব লে ০ দে • বি • ০ • ০ • •

I দ্া ন্া ন্া | সা -া | সা -ন্া I সা জ্ঞা -া | জ্ঞঋা -জ্ঞা | জ্ঞঋা -া I
মা টি তে যে • দি ন্ তো মা র্ জ০ ন্ ম ০

I সা -া -া | -া -া | -া -া I ন্া দ্া দ্া | -ন্া -সা | সা সা I
হ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ সে ই দি ০ ন্ হ তে

I সা সা -জ্ঞা | ঋা জ্ঞঋা | সা ন্া I সা মজ্ঞা -া | ক্ষা -া | পা দা I
আ মি ০ জ গ তে র্ জী ব ন্ ত ০ দে বা

I পা -া -া | -ক্ষা -জ্ঞা | -ঋা -সা I "মাটিতে..........................হয়" I
ল ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I সা -া সা | সা -ন্া | না -া I সা -জ্ঞা জ্ঞা | ক্ষা -া | পদা - দপা I
প্রা ণ্ ব লে ০ মো য়্ ন ম দি ত ০ নি০ ০

I ক্ষা পা -া | -া -া | -া -া I ক্ষা ক্ষা জ্ঞা | ক্ষা -পা | পা পা I
খা সে ০ ০ ০ ০ ০ ত ব অ না ০ হ ত

I ক্ষা পা না | দা -া | পা পা I ক্ষা -পদা - দপা | ক্ষা -া | জ্ঞা -া I
প্রা ণে র প ০ ব ন আ ০০ ঃ০ সে ০ ০ ০

I জ্ঞা -দা দা | দা -া | পা -া I ক্ষা জ্ঞঋা জ্ঞা | জ্ঞঋা -া | সা ন্া I
ম ন্ ব লে ০ মো য়্ বি কা০ শে তো ০ মা য়্

I সা জ্ঞা জ্ঞা | ক্ষা -া | পা দা I পা -া -া | -ক্ষা -জ্ঞা | -ঋা -সা I
অ সী ম সু ০ ষ মা র ০ ০ ০ ০ ০ য়্

"মাটিতে............হয়" II

উল্লিখিত স্বরলিপি যে সুরে গীত হইবে সেই সুরের উদারার কোমল ধৈবত (দ্া)কে সুর করিয়া নিম্নলিখিত স্বরলিপি গীত হইবে।

তালফেরতা—দাদ্‌রা

II { সা গা -া | গা গা গা I গা মা -পা | গমা গা -মা I
না রী র্ জী ব নে ম হে ০ শ্ব রী র্

I পা র্সা র্সনা | পা মপা - গমা I গা -া -া | -া -া -া I
স্ব রূ প স মু০ ০ জ্ব ০ ০ ০ ০ ল্

I গা পা পা | -মা গা মা I পা না না | র্সা র্সা না I
সে ই দি ন্ হ তে আ মি জ গ তে র

I র্সা র্সা -র্গা | র্রা না রা I র্সা -া -া | -া -া -া I
জী ব ন্ ত দে বা ল ০ ০ ০ ০ য়্

I সা গা গা | গা গা -া I গা পা -া | পমা -পা পমা I
মা টি তে যে দি ন্ তো মা র্ জ০ ন্ ম

I গা -া -া | -া -া -া II
হ ০ ০ ০ ০ য়্

তালফের—ভেওরা (ঈষৎ দ্রুতলয়ে)

II { সা -মা মা | মা -া | মা মা I মা পা -ণণা | মা -পা | মা জ্ঞা I
ঐ ০ দি ব ০ সে র বি ভা ০০ চ ন্ দ নে

I মা -ণা ধা | ণা -পা | ধা মা I পা -া -া | -া -া | -া -া I
র ন্ জি ত ০ ক রি ভা ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I পা ধপা ধা | ণা -া | র্সা র্রা I র্সনা -র্সা ধা | ণা -া | পা মা I
পু রো০ হি ত ০ হ য়ে মৃ০ ন্ ম য়ী ০ পূ জা

[ণা -পমা | পা র্রা I র্রা -র্সা -া | -া -া | -া -া]

I পা র্সা ধা | ণা -পা | মধা ধপা I মা -জ্ঞা -া | -া -া | -া -া } I
সা ধি য়া ছে ০ ম০ হা কা ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I মা পা পা | র্সর্সা -া | সা -া I সা র্সা র্সা | র্সা -া | ণদা ণদা I
হে রি পা ব০ ০ নী য়্ অ ব ত র ০ ণে০ র০

I ণা র্সা -া | -া -া | -া -া I ণা র্সা র্রা | র্রা -র্জ্ঞা | র্সা র্সা I
ধা রা ০ ০ ০ ০ ০ ন ব গ তি ০ ল ভে

I ণা র্সা র্সা | র্সা- পণা | র্রা র্সর্সা I ণদা দা -ণা | -পা -া | -া -া I
গ গ নে র ০ গ্র হ তা রা ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা ণা র্সা | র্রা -া | র্র্সা র্রা I র্জ্রা -া র্মা | র্রা -া | র্সা র্সা I
ব লে ত্রি ভু ০ ০ ন জ য়্ ধ র ০ ণী র

I পা পা -মা | পা -া | I র্সা -া -া | -া -া | -া -া I
চি র ন্ ত ০ জ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I সা মা মা | মা -া | মা মা I মা প্া পাধ | মা -পা | মা -জ্ঞা I
দে হ ব লে ০ দে বি মা টি তে যে ০ দি ন্

I জ্ঞা জ্ঞা -মা | রা -া | রা -া I সা -া -া | -া -া | -া -া I
তো মা য়্ জ ন্ ম ০ হ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I সা মা মা | -া -া | মা মা I মা মা -পা | পা পা | পা পা I
সে ই দি ০ ন্ হ তে আ মি ০ জ গ তে র

পা ধা -পা | ধা -া | ণা র্রা I র্রা -র্সা -া | -া -া | -া -া II II
জী ব ন্ ত ০ দে বা ল ০ ০ ০ ০ ০ য়্

ইতিহাসের স্বপ্ন

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

... আছেন অতিবৃদ্ধ, স্তব্ধ অনাদি অতীত, অনাগতের দিকে চেয়ে। ...চক্রে আদিম রহস্যের ইঙ্গিত। সীমাহীন শূন্য। জাগে স্পন্দন, আসে ... ছোটে অনুপরমাণু, গগনে গগনে নীহারিকার দল। সেই মন্থনে ... ওঠে সবিতা, তারি সঙ্গে অগ্নিবন্ধনে পৃথিবী। যুগ যুগ যায়— ...ীর কোলে জন্ম নেয় ভারতলতিকা, ধূমজ্যোতিসলিল মরুতের জটা- ... ছিঁড়ে এক যৌবনধন্যা কন্যা—সূর্য্যের কিরণ, বিদ্যুতের ঝিলিক, ...র সুষমা ও অগ্নির তেজ নিয়ে। আস্তে আস্তে জড় ও জীবের সীমানা ...া ঘুচে, চেতনার বহ্নিতে মুছে।

(২)

প্রকৃতির বিবর্ত্তনে সময়ের সীমানায় ভারতমাতা জাগলেন তাঁর ...লিক বৈভব নিয়ে। তিনি রূপরম্যা, তিনি সৌম্যাতিসৌম্যা। তিনি ...রী, তিনি ভীষণা, তিনি দয়িত তরে চিরবিরহিণী, কন্যাকুমারী, প্রতীক্ষারত। বহু যুগ পরে তাঁর কোলে আবির্ভাব হোল মানুষের, কৃষ্ণাকাবেরী গোদাবরীর তীরে, সিন্ধু গঙ্গা যমুনাপুলিনে, ব্রহ্মপুত্রের তটে। অরণ্যের বন্দন মর্মর মায়াতে, গুহাগুহ্বার ছায়াতে মাতা সেদিন থেকে অন্নপূর্ণা।

(৩)

গঙ্গভারতীর রথ চড়ে কল্পলক্ষ্মী চলেছেন ইতিহাসের কঙ্করময় পথে। যিনি ছিলেন মহাঅতীতের সাথে ধ্যান নিমগ্ন, তিনিই আজ মহাভবিষ্যতের জন্য উঠেছেন জেগে। আসছে দলে দলে কতো লোক, কতো জাতি তাঁর আশ্রয়ে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। আরণ্য যুগের তামস তিথি হতে তিনি যে অতিথিবৎসলা, প্রেমবিহ্বলা। লাখ লাখ যুগ চলে যায়, তাঁর হিয়ার জুড়ন না হয়।

(৪)

জবাকুসুম সঙ্কাশ আকাশের পারে ইতিহাসের হংসবলাকার ছবি বারে

বারে ফুটে ওঠে। সৈন্ধবী সপ্তসিন্ধুতে তার প্রথম উন্মীলন—মহেঞ্জদড়ো, হরপ্পায়—বৈদিক যুগে, ঋক্ যজু সাম আর্থবনের স্বপ্ন নিয়ে। হারিয়ে গেছে আজ শুধু বেদনিবিদনর, দিবোদাস সুদাসের স্মৃতি ও সরস্বতী দৃশদ্বতীতীরে শতভস্তগীতি। জীবন ছন্দে সেই অপূর্ব সত্যই প্রকাশিত হলো—মৃত্যুও নেই, অমৃতও নয়।

(৫)

কথা কইছে, মহাঅতীত, ঝঙ্কার দিচ্ছে ব্রহ্মবাদিনীর কণ্ঠ—যেনাহংনা-মৃতা স্যাম তেনাহং কিমকুর্যাম। ধন নয়, মান নয়—আমি অমৃতের ভিখারী। এসে গেছেন গার্গী মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক আরুণি, নচীকেতা ভৃগুবারুণী সাবিত্রী উঠেছেন জেগে—সেই পরমা রমা। কুরুক্ষেত্র হয়েছে ধর্মক্ষেত্র।

(৬)

একী শুনি, বোধিবৃক্ষপরিক্রমায় কার পদধ্বনি, কে মহামানব আসে। শুদ্ধ, বুদ্ধ সম্যগ্ সংকল্প শুদ্ধ, স্মরজিৎ, মারজিৎ। মন বলে—শরণ লও, শরণ লও, মৈত্রী ভাবনার পটভূমিকায়। হও অপ্রমাদী, গাও পঞ্চশীলের জয়। ভগবান আছেন কি নেই কি হবে তা জানে। মানবের বিরাট্ সম্ভাবনাকে প্রদীপের মতো তুলে ধরো—আত্মদীপ হও।

(৭)

মহানির্বাণে পরিবৃত হয়েছেন মহাকারুণিকো নাথ। শিষ্য প্রশিষ্যেরা তাঁর বাণী ছড়াচ্ছে বিনয়ে, অভিধর্মে সূত্রে। কতো বাদ, কত তর্ক, কতো জ্ঞান, কতো আলো। এরি মধ্যে এলো বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার। কৌটিল্যের কূটনীতিতে নন্দবংশ হলো, ধ্বংস। চণ্ডাশোক অশোক অদণ্ডের দ্বারা জয় করলেন, ধর্মচক্রের হলো প্রবর্তন। গড়ে উঠলো সামাজিক পরিবেশে এক অত্যাশ্চর্য্য বিপ্লব, একটি কেন্দ্রাভিমুখী সংঘটন, একটি জনসমন্বয়ী ব্যবস্থার বিবর্তন, নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবনবেদ।

(৮)

দূরে দক্ষিণে তমালতালীবনরাজীনীলা দ্রাবিড়ের বেলাভূমিতে উত্তর ভারতের তরঙ্গ গিয়ে লাগে। চলেছেন তামিরমুনি অগস্ত্য। বিন্ধ্য আজও শুয়ে। সঙ্গম কাব্য হলো গাওয়া। কবি পরিষদের সভাপতি স্বয়ং শিব। জাগছেন অষ্টাদশ লীলামূর্তিতে নটরাজ—পার্বতীর মুখে ফুটছে হাসি। রঙ্গে রঙ্গে মহাবিষ্ণু হলেন, রঙ্গনাথন, পরমদৈবত থিরুমল। চলেছেন নায়নাররা, চলেছেন আড়বাররা, আচার্যের দল, সিদ্ধান্তীরা। সোমতেশ্বর ও গৌতম বসেছেন পাশাপাশি। চের চোল পাণ্ড্য, পল্লব, নায়ক বিজয়নগরের মিছিল চলেছে। দেবদাসীরা নৃত্য করছে নটেশের প্রাঙ্গণে। তরঙ্গ লাগছে গোপুরের শীর্ষে, মীনাক্ষীর মীন নয়নে, সুন্দরেশের বন্দনায় আজীবকের গুহায় অজন্তায়. ইলোরায়, পদ্মপাণির তানে, রাষ্ট্রকূট পল্লবী শাতকর্ণিদের দানে।

(৯)

সেই যাত্রায় যোগ দিয়েছে জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানীর দল, রাজা প্রজা, পুরুষ নারী, সন্ন্যাসী, গৃহী, কবি শিল্পী, বিদ্বান বিদুষী, নাবিক বণিক ভবঘুরে গৃহহীন। তাদের রক্তে বিচিত্রের ধারা, তাদের মননে মহাভারতের স্বপন। সেই তীর্থঙ্কর দীপঙ্কররা চলেছেন প্রদীপ হাতে—কৈবল্যপিয়াসীর দল—কেউ বা শ্বেতাম্বর, কেউ বা দিগম্বর—কেউ বা আশ্রয় করেছেন অবলোকিতেশ্বরকে, মহেশ্বর কাহাকেও দিচ্ছেন সদাচারী বিদ্যা। হীনযান, মহাযান, বৈভাসিক, সৌতান্ত্রিক, মহাসাংঘিক, মাধ্যমিক যোগাচারী, বীরাচারী, কতো পন্থী।

(১০)

বিরাম নেই সেই মিছিলের—অন্তহীন পথ, অনন্ত তাদের আশা। ত্যাগীভোগীর দল—অন্তরঙ্গ সনে যাঁরা রস আস্বাদন করেন, বহিরঙ্গে যাঁরা বিচার করেন, আলোবাতাসের স্পর্শদীক্ষা যাঁরা পেয়েছেন—প্রকাশপিয়াসী ধরিত্রীর সৃষ্টির আরম্ভবীজ যাঁরা খুঁজচেন। আর যাঁরা, সংশয়ীর দল তাঁরাও। নানা মত নানা পথ—আদর্শ ও উদ্দেশ্য হয়তো ভিন্ন তবু সমন্বয়ের সুর বাজে। সবাই চলেছে ভারতকল্পলতিকার পথ চিহ্ন ধরে। পড়েছে সবার পদ চিহ্ন সেই যাওয়া আসা চাওয়া পাওয়া, দেওয়া নেওয়ার পথে। যোগ দর্শন আর প্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গমে দেবী অপরাজিতা দাঁড়িয়ে—মেধাঙ্গী, অঘোরা, শ্যামাপ্রকৃতির প্রতীকা।

(১১)

ভারত মহাঅঙ্গনে যোগ দিয়েছে মৌর্য্য সুঙ্গ গুপ্ত মৌখরী পাল সেনেরা, গৌড়মালব খশ হুন কুলিক কর্ণাটলাটরা, চালুক্য পুলকেশী—কলিঙ্গগঙ্গরা কনিষ্ক হুষ্ক সমুদ্রগুপ্তরা। পরিহাসকেশবের মন্দির তরঙ্গিত হয়েছে রাজতরঙ্গিনীতে। মাৎস্য স্যায় করেছেন দূরীভূত সকলোত্তর পথ নাথরা। এসেছে গল্প, এসেছে গান, এসেছে কাব্য, ছন্দ, রূপ, রস ধ্যান। তোলকপ্পীয়, পানিনি, কাত্যায়ণ, ভাস্করাচার্য, পিঙ্গল, থেরী ইসিদাসী বীণবাসী সুলভা, ভদ্রবাহু, ভাস্করাচার্য্য আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত,লালিত্যলীলাবতী চলেছেন সেই মিছিলে। ভাসের নাটকে আটক পড়েছে স্বপনের বাসবদত্তা। যৌগান্ধরায়ণের প্রতিজ্ঞা সফল। বসন্তশোভার মতই বসন্তসেনা শোভা পাচ্ছে। কালিদাস পড়েছেন কবিতা নবরত্নের সভায়, জগতের পিতামাতাকে বন্দনা করে, তন্বী শ্যামা নিম্ননাভি বিরহিনীকে স্মরণ করে। রাজধারিনী ভূর্জ্জপত্রে লিপি পাঠাচ্ছেন, মহাশ্বেতার বীণা ঝঙ্কার দিচ্ছে, স্পর্শে স্পর্শে ভবভূতি হচ্ছেন পরিস্ফুটান্দ্রিয়। কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে রসময় বঙ্গাল বাণীতে সদুক্তি কর্ণামৃতে মন চঞ্চল। দক্ষিণ হতে উত্তরে ভেসে আসে চিদানন্দময়ের বাণী। শিব মন্ত্র গান আপনি শঙ্কর। দামোদর দামোদর, সুত্রীত পীতাম্বরের কথা গান আর এক কবি।

(১২)

ইতিহাসের রথ এগিয়ে চলেছে—দেশে-বিদেশে তুষারতীর্থে মরুকান্তারে। তার মন্ত্র,—নাম, তার শরণ—প্রেম, তার দান, জ্ঞান বিজ্ঞান। ব্রহ্মে সিংহলে শ্যামে কাম্বোজে, হরিভূঞ্জীর মন্দিরে, চম্পায় আঙ্করে, শ্রীবিজয়ের রাজ্যে, গান্ধারে তিব্বতে চীনে যবদ্বীপে দিকে দিগন্তরে ভারতের এই নূতনবাণী ছড়িয়ে পড়ে—ভাষায় ভাষায় গিঁট বাঁধে। দীপময় ভারতের অন্তরে হৃদয় কন্দরে তীর্থ কথা মেতে ওঠে বন্দরে বন্দরে।

(১৩)

এসে গেছে ইসলাম। তার অভ্যাগমে ভারত ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় সুরু হয়। মসজিদে মিনারে মুয়েজ্জীনের কণ্ঠে নব আলিম্পন গান ওঠে। বিশ্বাসীর দল মত্তচঞ্চল ঝড়ের বেগে কৃপাণ হাতে এগিয়ে চলে। সেই সেবার প্রাণশক্তির কাছে সজোরে ধাক্কা খেয়ে মহাভারতী নতুন সমন্বয়ের পথ খোঁজেন—নব গঙ্গোত্রীর ধারা—যে ভাঙাগড়ার মাঝে ভারত হৃদয়পুর আবার আত্মস্থ হয়ে ওঠে। দেখি পরমপুরুষবাচক গ্রন্থ সাহেব হাতে নানককে, কবীরকে, সাধু সন্তদের, রামনামের মনি দীপ জ্বালিয়ে তুলসী-দাসকে, গোবিন্দের গীতকণ্ঠে লাবণ্যামৃতধারায় স্নাত প্রেম ঘন রসমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে শঙ্করদেব মাধবদেবকে, অষ্টছাপের কবিদের, বল্লভাচার্য্য, রামানুজ, যামুন, মধ্বকে। প্রাণমঞ্জরী, তিরুমলম্বা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রঘুনন্দন, রায় রামানন্দ, শীলাভট্টারিকা, তুকারাম, চলেন এগিয়ে। অসিতাঙ্গ ক্ষেত্রপাল ভৈরবরা যোগ দেয়, কলমঞ্জীররঞ্জিনী কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারে জাগরিত। আসেন মনসা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী, সহজিয়া, সুফী, দরবেশ, শৈবমঙ্গলকাব্য, সত্যপীরের কথা। ধর্ম হন যবনরূপী, শিবপরেন কানুটুপী, বিষ্ণু হন পয়গম্বর দিগম্বরের সাথে। একই মাটি হতে একই সঙ্গে তারা তিলক পরেন।

(১৪)

ফিরে চাইলেন ভারতলতিকা। মরু বেদুইনের দুর্ধর্ষ প্রাণ নিয়ে এসে গেছে ইসলামের বর্ত্তিকা। এসেছিল সম্রাট মামুদ গজনী যার সভা হতে ফিরদৌশী গিয়েছিল ফিরে, চোখের জলে শাহনামাকে ঘিরে, যার কথা লিখেছেন তুরকী মনস্বী আবুরীহান অলবেরুনী। সোমনাথ লুট হয়েছিল, স্ফটিক স্তম্ভ গিয়েছিল ফেটে, অঙ্গহীন হয়েছিলেন অর্দ্ধ অগ্নিশ্বরলিঙ্গ। 'শাহান সুজ' ঘোরীরা গিয়েছিল ফিরে, চেঙ্গিজ তৈমুর তাতারের দল। কিন্তু যায়নি কুতুবশাহী মিনার, ইলতুতমিশ রাজিয়ার স্বপ্ন, জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজ, হাম্বির, চণ্ড বাপ্পা, সংযুক্তার গল্প, চারণ চারণীর গান, চিতনন্দন চিতচোর নাগর গিরিধারীর জন্য বিরহিণীর ব্যথা, বৈজুবাওরার তান, লাজহরণ শহর কথা।

হোরি হায়, ফাগুনমে হোরি মচাও, রক্ত আসরে বাসর সাজাও।

(১৫)

ভস্মভূষণ ভক্ত লাগি রক্তলোচন উৎসব চলে। জয়নুল কাশ্মীরে, হুসেন শাহ বাংলায়, দক্ষিণে জগদগুরু আদিল ভারতের চিরন্তন স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে পঞ্চ-সুলতানরা, ভিট্টল স্বামীর মন্দিরে কৃষ্ণ রায় অমুক্ত মলয়দ ... যায়, বিদ্যারণ্য সায়নের আশীর্বাণী ঝরে। স্বপ্ন দেখে বাবর, ... সাদ, মীর সৈয়দ আলির তুলি, নিজামীর কাব্য সাদীর গুলিস্তান। জ্যাতি আকবরের ইবাদতখানায় তারই সন্ধান চলে। হামজানামায়, ... নালাস, আইন্-ই-আকবরীতে মীঁয়াকী মলহারের তানে, আবুল ফজল ... ময়মল বদৌনীর কাহিনীতে তারই বিস্তার। পড়ে থাকে পিছনে ... মহলের উদ্ধতশোক, নবী আলমগীরের দারু-ল-ইসলাম, জাহানারার কাহিনী। শুধু একটুকরো সবুজ ঘাস প্রাণ হিল্লোলে দুলে বলে ... হনৌজ দূর অস্ত।"

(১৬)

কিন্তু দিল্লী রইলোনা বহুৎ দূর। বন্ধ্যাদিনের শেষে সন্ধ্যা নেমে আসে দিল্লীর প্রাসাদকূটে দেওয়ানী আমে দেওয়ানী খাসে। রংমহল শীষমহলে রংবেরংএর ঝাড়ে রোশনাই জমেনা, দূরে ঝড়ের গর্জন বাড়ে। আবার ইতিহাসের বোঝাপড়া আরম্ভ হয়। নাদির শাহ আহমদ শাহেরা ধাক্কা দিয়ে যায় তাসের প্রাসাদকে। লালাকেল্লায় মারাঠাদের নজরবন্দী বাদশাহ নিজের গালেই চড় মারে। নকীব হেঁকে যায়— দিল্লীশ্বরো বা, জগদীশ্বর হাসেন।

(১৭)

আবার মোড় নেয় ইতিহাস। রঙ্গমঞ্চে নতুন আগন্তুকের হয় উদয়। শিবাজীর স্বপ্ন যাচ্ছে ভেঙে—হর হর মহাদেও রব। ইতিহাস-লক্ষ্মীর নিশানা এবার ভাগীরথী মোহানা, নীলাম্বরী-পরা নীলার সীমানা। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসেছে বণিকের দল—পর্টুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী ইংরাজ। হটে যায় সবাই, কিন্তু থেকে যায় ইংরাজ। শর্বরী পোহাতে দেখা যায় তার মানদণ্ড হয়ে উঠেছে রাজদণ্ড। সভ্যতার অজার থেকে তারা ভোগবতীর ভৃঙ্গার ভরতে জানে।

(১৮)

ভারতলক্ষ্মী কম্পিত হস্তে ইংরাজকেই বরণ করে নিলেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় শিহরণ জাগে—দীর্ঘশ্বাস হয়ে ওঠে গভীর, নিবিড়, সমন্বয়-সন্ধানী। বাদাবনের মাঝে গড়ে ওঠে রঙ্গেন্দ্ররা বঙ্গদেশে নতুন অর্থ, নতুন অনর্থ। কলকলিতা হয়ে ওঠে কলিকাতা—জব চার্ণকের সহর।

গড়ে ওঠে নতুন অর্থ আভিজাত্য রাজ্য সাম্রাজ্য। জাহাজের পর জাহাজ ভর্ত্তি হয়ে চলে যায় দ্রব্যসম্ভার বিদেশে। সাগর পারে নবাবের দল বাড়ে। বাদশার দেওয়া দেওয়ানী নিয়ে জাঁকিয়ে বসে কোম্পানীর চেলারা। ধীরে ধীরে তারা তুলে নেয় রাজ্যভার। নতুন করে সুরু হয় ইতিহাসের শিকস্ত-পয়স্ত, নতুন করে বোঝাপড়া।

(১৯)

ভারত কথায় উনবিংশ শতাব্দী সক্রিয় হয়ে ওঠে। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে নতুন ইঙ্গিত দেয়। বাংলাতেই এর গোড়াপত্তন। বাংলার শিল্পী, কবি দেশনায়ক কর্মীরা, ইতিহাসের পুরোগামিনী গতিতে এক যজ্ঞসম্ভব মূর্তি গড়ে তোলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন রাষ্ট্রবোধের চেতনায় পশ্চিমের রসবস্তু আহরিত হয়ে পূর্বের সূর্যকরোজ্জ্বলা দীপ্তিতে বিধৃত হয়। এর পথিকৃৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ রামমোহন।

(২০)

এরি মধ্যে উত্তরাপথের পথে পথে একদিন রুদ্রের বিষাণ বেজে ওঠে—গণচিত্ত হয় আলোড়িত। একে কী বলবো—বিপ্লব, বিদ্রোহ না গণরুদ্রের দ্রোহ। হয়তো এটা সামন্তযুগের অসন্তুষ্ট শেষনাগের অন্তিম আন্দোলন যার সঙ্গে মিশেছিল নানাধরণের জনবিক্ষোভ।

(২১)

সৃষ্টির বন্যা নামে—নূতন করে দেখবার চোখ, নূতন করে মিলিয়ে নেবার সিদ্ধি। মধ্যবিত্ত কৃষ্টি গড়ে ওঠে, এক মহা আলোড়নের সুরু হয়।

ভগীরথের দল এগিয়ে আসে নূতন ভাবগঙ্গা নিয়ে—যাদের জীবনে লভিয়া জীবন সকল দেশ জাগে। মাতৃবন্দনার ছন্দ বেজে ওঠে দিকে দিকে—মা যা ছিলেন আর মা যা হবেন। দেশের মানস বিদ্রোহ রূপ নিতে চায়। সাহিত্যিক দেন মন্ত্র, সাধক আনেন অমর্ত্তলোকের ইঙ্গিত, কবি দেন শিক্ষা, ঋষি দেখেন স্বপ্ন—স্বর্গ নামবে মাটি মায়ের কোলে।

(২২)

হিংসা-কণ্টকিত পৃথিবীতে, ধাপ্পাবাজীর কলরব মুখরিত ধরিত্রীতে প্রেমের, অহিংসার, মৈত্রীর করুণার মন্ত্র পড়লেন এক মহান আত্মা, রথযাত্রা হলো রসাভিসার যাত্রা। তার রোমাঞ্চিত অগ্রগতি শ্বাপদ চীৎকারে ব্যাহত হোল না। নতুন ভাষা পেলে দেশের সত্তা, ভাষ্য পেলে, নতুন পথ গেলো দেখা। বিয়াল্লিশে চঞ্চল জনগণেশ বলে করেঙ্গ ইয়ে মরেঙ্গে। আনবিক দানবিতায় উন্মত্ত হয় পৃথিবী। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ভেঙে পড়ে রাজ্যসাম্রাজ্য, চলে যায় শাসকের দল অখণ্ডকে খণ্ড করে। ভ্রাতৃবিরোধের বিস্ফোরিত সঞ্চয় থাকে পড়ে। এদিকে দেশ হয় পিতৃহন্তা।

(২৩)

ইতিহাসের এই যুগসান্ধক্ষণে পাবকময়া ভারত হিরন্ময়ী দাঁড়িয়ে। তিনি শুধু প্রণাম চান না—চান অনললাঞ্ছিত নাম—জীবনের শ্রদ্ধার যৌবনের দাম। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ আরো বড়ো, কেন না সে নিয়ে আসে নূতনকে, প্রকাশ করে অনাগতকে, সরিয়ে দেয় বাধাকে, শ্রান্তিকে ক্লান্তিকে। গণদেব গণেশ ত শ্রেণী বিশেষের নন—তিনি যে সকলের, সর্বজননীর পুত্র।

(২৪)

প্রশ্ন জাগে—ধ্বংসের হোমেই কি মহাকালের শেষ আহুতি। ইতিহাসের নির্দেশ কি শুধু আর্থিক শক্তির বিবর্তনে। বিত্ত সাম্যই কি এনে দেয় চিত্তগত মৈত্রী। জয় করবে কে মনের হিংস্রনগ্ন বর্বরতাকে, অন্তরের মহাপ্রকৃতিকে।

(২৫)

আজ তাই চলেছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা অপেক্ষা সারা বিশ্ব জুড়ে। এই পরিবেশে ইতিহাসের অমোঘ দৃষ্টি দিয়ে, সংকীর্ণ স্বার্থের নর্তন থেকে, গোষ্ঠীর স্বৈরাচার থেকে সমষ্টির আবিল দৃষ্টি থেকে সমাজদেহের রোমকূপ হতে নিবীর্যের বিষকে নিষ্কাশিত করে পশ্বাচার দূর করে ভারত ইতিহাসকে নূতন করে আবিষ্কার করবে কে—নূতন তীর্থে, সত্যের স্বরূপ দীপ্তিতে ভাস্বর।

(২৬)

আজ আমাদের আশার অন্ত নেই, কল্পনার বিরাম নেই। গড়ে উঠবে নতুন সমাজ রাষ্ট্রধর্ম—সাধক শিল্পীর গোষ্ঠী, ত্যাগীভোগীর দল—অব্যভিচারিণীরা সকল। আজ আমরা সন্ধান করবো সাময়িক উত্তেজনার উর্দ্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নীতি, ক্ষুধার নির্মমতা থেকে, চিন্তার আবিলতা থেকে মুক্তি। আলোক পিয়াসী মানুষ খুঁজবে একটি রসবদ্ধ অমৃতভাণ্ডকে, যা মণ্ডিত করবে জীবনকাণ্ডকে নূতন সংহিতায়, অতন্দ্র গীতায়, ধ্যানের নৈঃশব্দে, বিজ্ঞানীর বীক্ষণে, চাষীর মাঠে, গণচিত্তের ঈক্ষণে, প্রেমের রসতীর্থে, কর্মের বন্যায়।

কোথায় সে ক্ষেমঙ্কর দক্ষিণপাণি, উত্তর সাধক কবি যে আঁকবে এই ক্রান্তদর্শী ছবি।

(২৮)

সকল জাগ্রত মানুষের কাছে ইতিহাস লক্ষ্মী চোখের জলে এই নিবেদনই জানাচ্ছেন—কেন আজ দেশের যৌবন সফল হবেনা, কেন ব্যষ্টি ও সমষ্টির মন হবে বিকল। তাঁর মর্মভেদী কান্না, তাঁর বেদনারুদ্ধ বেদনা শুনিতে কি পাওনা। কেন দূর হবে না রিক্ততার নিঃস্ব নিঃশ্বাস, বঞ্চনা বেদনার ইতিহাস। তিনি ডাকছেন অনাগত যুগের পাথেয় সংগ্রহে। একতার মন্ত্র নিয়ে নব জাগ্রত জনতা চলবে শিব দেবতার রসায়ন যজ্ঞে। সেই মধুপাতা মধুগাতা মধু দেবতার চলার পথে উঠবেন জ্যোতির্ময় তিমির হরণ। এই মহাস্বপনকে ব্যর্থ হতে দেবার অধিকার কার।

হোয়ান রামন হিমানেৎ ও স্প্যানিশ সাহিত্য

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

আমাদের দেশের খুব অল্প সংখ্যক লোক স্প্যানিশ কবিতার সঙ্গে পরিচিত। তবে যাঁরা এই কবিতার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা হোয়ান রামন হিমানেৎ এর অবদানের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারবেন না। এঁর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্প্যানিশ কবিতায় যে আদর্শ অনুসৃত হয়ে এসেছে এবং যে রুচির পরিচয় পাওয়া গেছে হোয়ান রামন হিমানেৎ সে আদর্শ এবং রুচি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে চাইলেন, কারণ তিনি যুগ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে এ দুটোর সামঞ্জস্য খুঁজে পাননি। তাই তাঁর লেখার মধ্যে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া গেছে। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, তাঁর প্রচেষ্টায় গোটা স্প্যানিশ কবিতার ধারা অনেকখানি বদলে গেছে।

অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে, হোয়ান রামন হিমানেৎ এর আগে স্প্যানিশ কবিতার ধারা পরিবর্তিত করার কোন প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা কিম্বা হলে কতখানি সাফল্য অর্জ্জিত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁরা কখনও দারিও কিম্বা উনামুনোর প্রচেষ্টার কথা ভুলতে পারবেন না। যদিও এদের প্রচেষ্টা ততটা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি, তথাপি একথা অনস্বীকার্য্য যে, এরা আন্তরিকভাবে স্প্যানিশ কবিতার আদর্শ পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন এবং আধুনিক ধারার সাথে স্প্যানিশ কবিতার গতির সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য এঁরা চেষ্টার ক্রটী করেননি। হিমানেৎ এর রচিত কবিতাগুলো অধ্যয়ন করলে মনে হ

একগুলো স্তরের ভিতর দিয়ে তাঁর কবিতার ক্রমবিকাশ হয়েছে। বর্তমানে তিনি যেভাবে সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করছেন সেভাবে উপলব্ধি করতে তাঁকে তাঁর কবি জীবনের গোড়ার দিকে দেখা যায়নি। তখন প্রকৃতির আসল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফলে প্রকৃতির বাইরের সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে থাকতেন। তাছাড়া যখন তাঁর কবি-জীবন প্রথম সুরু হল তখন তাঁর প্রায় বেশীর ভাগ লেখার মধ্যে অলঙ্কার বাহুল্য ছিল এবং লেখার গতিও ছিল মন্থর। কিন্তু যতই তাঁর অভিজ্ঞতা বেড়ে যেতে লাগল ততই একদিকে যে রকম তাঁর লেখা প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল সে রকম অন্যদিকে তিনি এমন ক্ষমতা অর্জ্জন করতে লাগলেন যার ফলে তাঁর সৌন্দর্য্যানুভূতি গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল। বর্ত্তমানে তাঁর সাফল্য সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর কাব্যপ্রতিভা আন্তর্জ্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করেছে।

বাল্যকাল থেকে হোয়ান রামন হিমানেৎ রোগাক্রান্ত। তাঁর এই শারীরিক অসুস্থতার প্রভাব থেকে তাঁর কবি মনও নিষ্কৃতি পায়নি। প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য তাঁকে প্রথম দিকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি, কারণ হিমানেৎএর কবি-মন সর্ব্বদা স্থির সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করেছে। শুধু তাই নয়, চঞ্চল জীবন-ধারার যে সৌন্দর্য্যে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে সে সৌন্দর্য্যও তাঁর মনে সাড়া জাগাতে পারেনি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সুন্দরের পূজারী। কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন একটা জিনিষ ঢেলেছেন যেটা স্থির এবং যার মধ্যে চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ তিনি কখনও এড়াতে পারেননি। তবে তাঁর সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ভাবপ্রবণতার বশে তিনি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যুগে যুগে সৌন্দর্য্যের আরাধনায় বহু কবি জীবন উৎসর্গ করেছেন। কাজেই হিমানেৎএর সৌন্দর্য্যানুভূতি নূতন কিছুই নয়। তবে তিনি কখনও ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেননি এবং যে আদর্শকে তিনি জীবনের ধ্রুবতারা বলে জেনেছেন সে আদর্শকে তিনি আঁকড়ে ধরে চলেছেন। তাই তাঁর কবিতায় দেখা যায়, এমন কোন শব্দ কিম্বা এমন উপমা ব্যবহৃত হয়নি যেটার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা তিনি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেননি।

স্পেনের সাহিত্যে গঙ্গোরার নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি বিগত ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্রায় ৬৬ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। অর্থাৎ বিগত ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। সমালোচকদের মতানুসারে তিনি খুব প্রতিভাবান কবি ছিলেন। শুধু তাই নয়। অনেকের মতানুযায়ী হিমানেৎএর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁর মত গুণী প্রতিভা নাকি কোন স্প্যানিশ কবির মধ্যে দেখা যায়নি। আমরা আগেই বলেছি, হিমানেৎএর হাতে স্প্যানিশ কবিতার ধারা, রূপ, আদর্শ এবং রুচির উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, স্পেনে কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সঙ্গীত। কিন্তু কবিতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হিমানেৎএর ধারণা হচ্ছে ভিন্ন রকমের। তিনি মনে করেন, কেবলমাত্র সঙ্গীত কবিতার উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাঁর মতানুসারে কবিতার উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক এবং বিরাট। তাই তাঁকে আমরা আজ স্প্যানিশ সাহিত্যে গদ্য কবিতার প্রবর্ত্তক হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। যেভাবে তিনি স্প্যানিশ কবিতার রূপ বদলে দিয়ে গেলেন সেভাবে এর আগে কোন সার্থক প্রচেষ্টা হয়েছে বলে জানা নেই। আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে যাঁরা স্পেনে আধুনিক কবি বলে খ্যাত তাঁদের লেখাকে হিমানেৎএর অবদান বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া তিনি আজ যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন সে পুরস্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্পেনের সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করার পিছনে তাঁর যে অবদান রয়েছে সে অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। যদিও বিশ্বের জনসাধারণ তাঁর প্রতিভার পরিচয় লাভ করার তেমন সুযোগ পাননি এবং অন্যান্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মত তিনি অতটা প্রখ্যাত নন। তাছাড়া এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্পেনের আধুনিক কবিদের মধ্যে হিমানেৎএর স্থান সকলের উপর। তবে গোটা স্প্যানিশ সাহিত্যে তিনি বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের অধিকারী কিনা সেটা জোর করে বলা কষ্টকর এমন কি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিও যদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয়ে থাকে তাহলেও হিমানেৎকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে, কারণ এর আগে দুজন স্প্যানিশ নাট্যকার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং স্প্যানিশ কবিতার ক্ষেত্রে হিমানেৎএর অবদানের যে গুরুত্ব রয়েছে সে গুরুত্বের চাইতে নাটকের ক্ষেত্রে এদের দুজনের অবদানের গুরুত্ব কম না।

আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে অর্থাৎ বিগত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হিমানেৎ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্মস্থান হল আন্দালিশিয়া। মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে তিনি লেখাপড়া করেছেন। তাই বলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হননি। তাঁর জীবনে সেভিল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, পাঠ্যজীবনে তাঁর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। বারে বারে রোগাক্রান্ত হবার ফলে তাঁর পক্ষে নিয়মিতভাবে লেখাপড়া করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিমানেৎএর জীবনী পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর স্বাস্থ্য এত ভেঙে পড়েছিল যার ফলে তাঁর পক্ষে বছর দশেক স্বাস্থ্যনিবাসে থেকে লেখাপড়া করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আন্দালিশিয়ার অন্তর্গত যে ক্ষুদ্র সহরটিতে হিমানেৎ জন্মগ্রহণ করেছেন উনিশ বছর পর্য্যন্ত তিনি সে সহর ছেড়ে কোথাও যাননি। কিন্তু এর পর যখন অবস্থার চাপে তাঁকে বাইরে যেতে হল তখন তিনি ক্রমশঃ ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে পরিচিত হতে লাগলেন। দিনের পর দিন ইউরোপীয় কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি তাঁর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফ্রান্স এবং সুইজারল্যাণ্ডে যাবার পর তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে পরিচিত হবার প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন। যাঁদের লেখা তাঁর মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছে তাঁদের মধ্যে সেক্সপীয়র, শেলি, কীটস্, ব্রাউনিং ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিমানেৎ এখন ওয়াশিংটনে আছেন। জানা গিয়েছে, তিনি সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন বলে স্থির করেছেন। ওয়াশিংটনে তিনি এসেছেন কিউবা থেকে। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে অর্থাৎ বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্পেন ছেড়ে কিউবাতে গিয়েছিলেন। কিজন্য তিনি স্পেন ছেড়েছিলেন এবং কি জন্যই বা তিনি ওয়াশিংটনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন বলে স্থির করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর জীবনীতে উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য চোখে পড়েনি। তবে এইটুকু বুঝতে পাচ্ছি, ওয়াশিংটন তাঁর ভাল লেগেছে, কারণ তা নাহলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রশ্ন উঠত না।
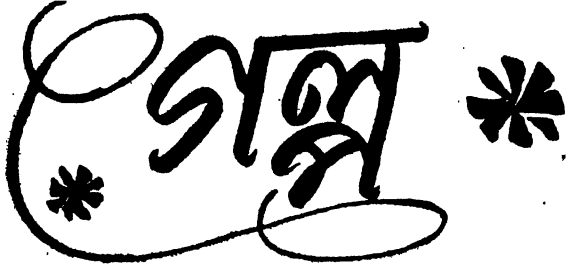
অভিশাপ

অমলেন্দু মিত্র

সঙ্গীত আসরে গিয়েছিলাম সুবিমলের সঙ্গে। ওর স্ত্রী বিনীতা গাইবে। ভারী চমৎকার গায়। অথচ কোন সভা সমিতি বা রেডিয়ো রেকর্ডে যেতে চায় না! সুবিমল বলেছিল; বাড়ীতে দু পাঁচজনার সামনে গায় ঠিকই, কিন্তু আসল জায়গায় কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ে। শেষে শুধু লোক হাসানো। কিছুতেই নামতে চায় না আসরে। আপনি দেখুন বুঝিয়ে সুঝিয়ে!

বুঝিয়ে বললাম বিনীতাকে; সামনের জনতাকে মনে করতে হবে সব পাথরের স্তূপ বসে আছে। আপনি গাইছেন তা আপনি ছাড়া আর কেউ শুনছে না।

না···না···তা নয়; সলজ্জ হেসে বলল বিনীতা, জনতাকে মোটেই ভয় পাইনে আমি! কিন্তু কেমন না জানি মাঝ পথে এসে সব মাটি হয়ে যায়···!

ভেবেছিলাম লজ্জা! অমন সব গায়কই বলে থাকে, গলা ভাল নেই। কিচ্ছু জানি নে···এসমস্ত কথা। যাক্ নিতান্ত আমারই অনুরোধে আসরে নামতে রাজী হয়েছিল বিনীতা। জানতাম, সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও পাবেই।

সুবিমল কেমন যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে স্ত্রীকে আসরে বস্তে দেখে। দু'একবার স্বগতোক্তিও করে উঠল; শুধু, শুধু গাইতে আসা! মুখে চুণকালি পড়ল বলে!

হাত ধরে টানলাম; অমন করছেন কেন সুবিমলবাবু, ওঁকে গাইতে দিন না! ঠিক গেয়ে যাবেন। দেখুন তো কেমন সুন্দর সুরু করেছেন!

না···না···আপনি জানেন না, তাল কাটল বলে!

তাল কাটবে কেন হঠাৎ? কি আপনার অদ্ভুত ধারণা!

জানলে অদ্ভুত বলতেন না, গলাখানা অস্বাভাবিক রকম উঁচু করে 'ডায়াসে'র পানে স্থির দৃষ্টে চেয়ে বলে ফেলল সুবিমল; অভিশাপ!

অভিশাপ! কি বলছেন মশাই?

সন্দেহ হ'ল এরা দুজনেই নিউরোসিসে ভুগছে।

কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল একটু পরই। হঠাৎ দেখি কেমন যেন এলোমেলো করে ফেলছে বিনীতা। তাড়াতাড়ি শোধরাতে গিয়ে আরও গুলিয়ে ফেলে। সভার লোকজন চঞ্চল। মৃদু গুঞ্জন। পিছন থেকে দু'চারটে দুয়ো দুয়ো ধ্বনি। বিনীতার গান থেমে গেল মধ্যপথে আর দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালাল।

সংজ্ঞাহীনা বিনীতাকে আমরা বহু কষ্টে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। সুবিমল বললে; দেখলেন তো! শুধু শুধু লোক হাসানো। যতবার গেছে, ততবারই এই···।

নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। ইচ্ছা যেখানে নেই, মনের জোর হারিয়ে গেছে, সেখানে এমন ভাবে অনুরোধ করে অপদস্থ না করলেই হোত। সুবিমল বলেছিল, বিংশশতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়ে অভিশাপে বিশ্বাস আপনি কেন, কেউ করবে না জানি। কিন্তু আমি করি। বিনীতা তো করেই।

অভিশাপ, না মানসিক অনুতাপ গ্লানির ফলে বিনীতার এই অবস্থা, তার বিচার মনোবিজ্ঞানীরা করবেন, আমি শুধু ওদের নেপথ্যের ইতিহাসটুকু শুনিয়ে দিচ্ছি—যার ফলে শান্তি নেই বিনীতার মনে; সুবিমল পায়নি স্বস্তি!

রঙ্গলালবাবুর গানের মাস্টার বলে বেশ খ্যাতি। বিদ্যানিকেতনের প্রবীণ শিক্ষক। কত ছাত্রছাত্রী তাঁর হাতে গড়ে উঠেছে। রেডিয়ো ফিল্মে গান গেয়ে প্রচুর সুনাম ও অর্থ উপার্জন করছে। কিন্তু রঙ্গলালবাবু নিজে জীবনে কোন প্রতিষ্ঠাই চাননি। বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে তিনি আছেন। তাঁকে নৈলে চলে না।

সঙ্গীতের এমন বিভাগ নেই, যা তিনি জানেন না। লোকে তাঁকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করতে পেলে বর্তে যান। ভদ্রলোক চিরকুমার। যৌবনকালের একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস তাঁর কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ করছে আজও।

রঙ্গলালবাবু প্রথম জীবনে ছাত্রীরূপে পেয়েছিলেন একটি মেয়েকে। বিচিত্রা তার নাম। কী অদ্ভুত কণ্ঠস্বর ছিল ওর। সঙ্গীতে আসক্তিও প্রচুর। রঙ্গলাল তাকে ভালবেসেছিলেন। বিচিত্রাও। রঙ্গলালবাবু জানতেন, উপযুক্ত শিক্ষিতা করে তুলতে পারলে, এ প্রতিভার তুলনা হবে না দেশে। নিজের সর্বস্ব দান করে বিচিত্রাকে গড়তে লাগলেন। কিন্তু দুর্দৈব। কঠিন একটা গৎ গাইতে গাইতে গলা চিরে রক্ত উঠে এল একঝলক বিচিত্রার। ডাক্তার নিষেধ করলেন, শুধু গান করতে নয় কথা কইতে পর্যন্ত। কিন্তু তবু যদি শেষ তক্ সেরে উঠত বিচিত্রা! সেরে উঠল না। শেষ দিনের আকুতি মনে পড়ে রঙ্গলালবাবুর; মাস্টার মশাই। আমি গান শিখব! আমাকে গান শেখান···।

একটি প্রতিভা অকালে ঝরে গেল। রঙ্গলালবাবু সে বেদনা মন থেকে আজও মুছে ফেলতে পারেন নি। নূতন ছাত্রী ভর্তি হলেই সাগ্রহে শেখান কিছুদিন। তার পশ্চাতে পেতে চান বিচিত্রার প্রতিভাকে। মেলে না। একটা কণ্ঠও তার সমতুল্য নয়।

অনেকটা বছর গড়িয়ে গেছে। রঙ্গলালবাবুর দেহে প্রৌঢ়ত্ব নেমে এসেছে মহাসমারোহে। চুল শুভ্র হয়ে এসেছে। তবু বিপুল উদ্যম তাঁর। বিচিত্রার সাধনাকে মূর্ত করে তুলতে হবে।

নূতন একটি ছাত্রী জুটেছে রঙ্গলালের। বছর ১৩।১৪ বয়স মাত্র। কিন্তু ভারী উৎসাহী। যদিও গলা তেমন নয়। রঙ্গলালবাবু জানেন, হাজার চেষ্টা করলেও বড় শিল্পী হতে পারবে না বিনীতা। জাত-শিল্পীর লক্ষণ তার মধ্যে নেই। তবে শিখতে পারবে সব কিছু। কাজ চলা গোছের বিদ্যা তার হবে।

বিনীতাকে সাথে নিয়ে এসেছিল ওর মা। রঙ্গলালবাবুকে বললেন; মাস্টার মশাই, আপনার হাতেই দিলাম। ওর বাবার সখ ছিল, গান শেখান মেয়েকে। তা তো আর পারলেন না। আপনার হাতেই দিতে বলে গেছেন। যেভাবে হোক ওকে মানুষ করে দিন। বিনীতা আমার একমাত্র সন্তান।

বিনীতার বাপ রঙ্গলালবাবুর সহপাঠী ছিলেন একদা। অতীত বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে তাঁর স্ত্রী অনীতাদেবীকে অমর্যাদা করতে পারেন নি। বিচিত্রার সঙ্গে কেমন একটু মিলও খুঁজে পেলেন; শুধু নামে নয়, আচার আচরণে, চেহারায়। তাই আত্মীয়ার মত গ্রহণ করেছিলেন বিনীতাকে। ক্লাসের রুটিন বাঁধা সময়টুকু ছাড়াও বাড়ীতে গিয়ে প্রায়ই শিখিয়ে আসতে সুরু করলেন। বিনীতা কেবল বন্ধুরই মেয়ে নয়, ওর আচার আচরণ বা কথাবার্তায় ঢঙে সেই বিচিত্রা জেগে ওঠে বারবার। প্রথম যখন বিচিত্রার সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর, ঠিক অতটুকুই ছিল সে। অমনি ভাবেই হেসে উঠত। কথা বলার ভঙ্গীও ছিল এমনি ধরণের। হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিটুকু, ওর পরশে জেগে উঠত সহসা। নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন রঙ্গলালবাবু। অধিকতর আগ্রহে শেখাতে সুরু করতেন বিনীতাকে। যদিও বিচিত্রার অদ্ভুত কণ্ঠের অধিকারিণী বিনীতা নয়। কোনদিন হয়ত হবেও না।

কয়টা বছর বিনীতা রঙ্গলালবাবুর কাছে মনোযোগ আর আগ্রহ দিয়ে শিখল গান-বাজনা। আশাতীত রকম উন্নতি দেখে মুগ্ধ হলেন শিক্ষক। গান ছাড়া কোন কথা নেই, গান ছাড়া কোন কর্ম নাই। ঠিক এমনি ছাত্র-ছাত্রীই চান রঙ্গলালবাবু। নিষ্ঠা আর সাধনা নিয়ে কর্মের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধি আসে না।

বার্ষিক পরীক্ষা আসছে। থিয়োরীটায় এখনো কাঁচা রয়ে গেছে বিনীতা। ভাবলেন, যে ধরণের অধ্যবসায়ী মেয়ে, তাতে রপ্ত হতে বেশী সময় লাগবে না।

কিন্তু ঠিক সময়টাতেই বিনীতা একটু দুর্বিনীত হয়ে উঠল যেন। বাড়ীতে এসে ফিরে যান রঙ্গলাল। বিনীতা নেই। বলে গেছে; আজ সময় হবে না।

প্রত্যেকদিনই ঐ এক কথা। ক্লাসেও কম পাওয়া যায়। রঙ্গলালবাবু ডেকে মৃদুস্বরে ধমক দিলেন। বিনীতা বলল; আর আপনার কষ্ট করে যাবার প্রয়োজন নেই মাস্টার মশাই। এতদিন খেটেখুটে যা শেখালেন তাই ঢের। দরকার হলে আমি নিজেই আসব।

কিছু বললেন না রঙ্গলাল। মনখানা ঈষৎ বেদনায়

ভারী হয়ে উঠল। মৌখিক স্বীকৃতিটুকুর মধ্যে উদারতা থাকলেও আন্তরিকতা নেই। পুনরায় যেন স্বপ্ন টুটে আসে। না, কেউ এল না। বিচিত্রার স্থান পূরণ করতে কেউ এল না।

লক্ষ্য করে দেখ্‌লেন ক'দিন রঙ্গলাল, তাঁর ক্লাসেরই একটি ছাত্র সুবিমলের সঙ্গে একত্র আসা, যাওয়া, ওঠা বসা বিনীতার। উভয়েরই মনোযোগ নেই গান বাজনায়। নামমাত্র সাহচর্যের লোভেই যেন এসে হাজির হয়। চর্চাটা গৌণ। মুখ্য হল, হাসাহাসি আর সঙ্গীতে যন্ত্রে কসরৎ দেখিয়ে তামাসা করা। কদিন ধরে লক্ষ্য করলেন। পথে ঘাটে, সিনেমায় রিক্সায় দেখা যায় উভয়কে। গান কি ছেড়ে দেবে ও? পরলোকগত বন্ধুর স্ত্রী অনীতা দেবী দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে; উচিত নয় কি তাঁর শাসন করা!

অনীতা দেবী অনুযোগ করলেন রঙ্গলাল গিয়ে পৌঁছতেই; মাস্টারমশাই, আপনি কি বিনীকে আর দেখ্‌ছেন না?

দেখতেই তো আসি। কিন্তু ওই তো বারণ করেছে!

বারণ করেছে?···আশ্চর্যান্বিত হলেন অনীতা দেবী; সে কি মাস্টারমশাই, পরীক্ষা আস্‌ছে যে! আজকাল গলা সাধেও না। কি যে হয়েছে মেয়ের, সকাল দুপুর, বিকাল, দিনরাত শুধু, সাজের ঘটা, আর বাইরে উড়ে বেড়ানো।

রঙ্গলালবাবু, জানেন সবই। কি বলবেন! অনীতা দেবীকে কথাটা বলা উচিত হবে না হয়ত। আঘাত পাবেন। ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। না বললেও চলে না হিতৈষীর ভূমিকায় নেমে। একটু, দোমনা ভাব। তারপর বললেন, সুবিমল বলে একটি ছেলের সঙ্গে ওকে প্রায়ই দেখি···!

: সুবিমল? ভারী ভাল ছেলে মাস্টারমশাই!

: তা কি জানিনে! আমারই ছাত্র যে। কিন্তু···

: বিনীতা ওর কাছে রোজ গীটার শিখ্‌তে যায়।

: গীটার শিখ্‌তে যায়! কৈ, সুবিমল গীটার বাজাতে জানে শুনিনি তো কখনো! আর এক সঙ্গে সব কিছু কি শেখা যায়। যেগুলো হচ্ছে সেগুলোই আগে শেষ করুক।

: তা তো ঠিকই বলেছেন মাস্টারমশাই! বিনীতা কি আজকাল ক্লাসে কিছু শিখ্‌ছে না?

: না। আজকাল ক্লাসে যায় না সে!

: ওমা তাই নাকি?···গালে হাত দিলেন অনীতা দেবী; তাহলে ক্লাসে যাচ্ছি নাম করে কোথায় যায় দু'বেলা?

: সে আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করবেন!

এমন সময় বিনীতা সুবিমলের সঙ্গে দমকা বাতাসের মত উড়ে এসে পড়ল। রঙ্গলালবাবুকে সামনে আচম্‌কা দেখে থমকে গেল উভয়েই। তারপর বিনীতা মুখে একটু হাসি টেনে এনে বলে; এই যে মাস্টারমশাই! কতক্ষণ এসেছেন?

চেয়ে দেখ্‌লেন রঙ্গলালবাবু বিনীতা আর সেই ছোটটি নেই। বিশেষ একটি রাগের রূপকে পূর্ণাঙ্গ দান করবার জন্য তার দেহ উন্মুখ হয়ে উঠেছে। ছলা, কলা, অভিনয় দক্ষতা, সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তনী প্রকৃতি তাকে ভরিয়ে দিয়েছে। ওর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না রঙ্গলালবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন সুবিমলকে; তুমি নাকি গীটার বাজাতে জান?

সুবিমল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিনীতা সুবিমলের অবস্থা দেখে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টিত হয়; জানেনই তো, জানেন না সুবিমলদা? আপনার মামা একজন ভাল গীটার বাজিয়ে না?

অনিতা দেবী কঠিন কণ্ঠে বললেন; সুবিমল তুমি আজকার মত এসো!

সুবিমল পালাতে পারলে বাঁচে। ত্রস্তে পলায়ন করে! দৃষ্টি পথ হতে মিলিয়ে যাবার পর রঙ্গলালবাবু ছাত্রীকে বললেন; হারমোনিয়ামটা নিয়ে এসো তো বিনীতা।

বিনীতা হয়ত প্রতিবাদ করত কিন্তু মায়ের কঠোর মূর্তির পানে চেয়ে কিছু বলার সাহস তার থাকে না। নীরবে নতমুখে নিয়ে এল হারমোনিয়াম। রঙ্গলালবাবু বললেন; গলাটা কেমন রেখেছো শুনি একটু।

গাইল বিনীতা বাধ্য হয়ে। বিস্মিত হলেন অনীতা দেবী, ততোধিক রঙ্গলালবাবু। প্রশ্ন করেন; গলা তো একেবারে গেছে। অপরিষ্কার কণ্ঠে গাইলে তো পাস করতে পারবে না। পরীক্ষা এলো যে!

অনীতা দেবী ধমকের সুরে বলেন ; যাবে না ! সাধে কি ? বড় বড় আর্টিস্টরা সাতদিন গলা না সাধলে সে গলায় গান গাইতে সাহস পাননে, আর উনি আজ দু'মাস হারমোনিয়াম-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছেন। বলি ক্লাস যাওয়ার নাম করে কোথায় যাওয়া হয় প্রত্যেকদিন শুনি।

বিনীতা মাথা নীচু করে রইল নিরুত্তরে।

: কাল থেকে নিয়মিত ক্লাসে না গেলে তোমার হাড়মাস আলাদা করে ছাড়ব লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! জানেন মাস্টারমশাই, শুধু বিদ্যানিকেতনে গান শেখাবার জন্যে আর আপনি রয়েছেন বলে কোলকাতা ছেড়ে এখানে বাসা ভাড়া নিয়ে রয়েছি। ওঁর লাইফ ইনসিওরেন্স আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের যা পেয়েছিলাম, তা তো শেষ হয়ে এল মেয়ের পিছনে। এখন আমি কোথায় দাঁড়াই বলুন তো ?

: ব্যস্ত হবেন না, ঠিক হয়ে যাবে। ক'দিন পরিশ্রম করলেই আবার পুরিয়ে নিতে পারবে। কি, পারবে না বিনীতা ?

বিনীতা ঘাড় গোঁজ করে বসে রইল তেমনিভাবে। অনীতা দেবী শাসন করতে লাগ্‌লেন মেয়েকে। এ উত্তাপ সহজে ঠাণ্ডা হবে না বুঝে বিদায় নিলেন রঙ্গলালবাবু।

পরদিন থেকে নিয়মিত ক্লাসে আসতে লাগল বিনীতা। বড় স্থির গম্ভীর হয়ে গেছে। আর সেই আবেগও নেই। উচ্ছ্বাসও না। অনুরাগহীন যন্ত্রের মত গান শেখে। চলে যায়। রঙ্গলালবাবু বাড়ীতে গিয়েছেন কিন্তু বিনীতার ভাবগতিক দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। যা করতে বলেন তাই করে। মুখে কথাটি নেই। নূতন কৌশল শিখতে চায় না। কোন প্রশ্নই যেন ওর মনে নেই। বন্ধ হয়ে গেছে। এমন নিস্পৃহ মূক শিক্ষার্থিনী নিয়ে ক · শিক্ষক কি সন্তুষ্ট হতে পারেন !

ঠিক ফেল করে গেল বিনীতা। সুবিমলও। ভবিষ্যতে যার সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা ছিল সে একেবারে ফেল করে বসবে ভাবতে পারেন নি রঙ্গলাল। থিয়োরীতে একেবারে শূন্য পেয়েছে।

ভয়ানক রাগ হ'ল রঙ্গলালবাবুর। প্রিন্সিপ্যালকে ওদের বিরুদ্ধে লিখে বের করে দিলেন শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে। আর বাড়ী গিয়ে ধমকালেন বিনীতাকে। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল বিনীতা।

অনীতা দেবীর টাকা নেই আর। পড়াবার সঙ্গতি ফুরিয়েছে। কি করবেন এবার। রঙ্গলালবাবু সত্যিই নিজের মেয়ের মত ভালবেসেছিলেন বিনীতাকে। বললেন অনীতা দেবীকে, রমেন আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তার মেয়ে আর আমার মেয়ে একই কথা। নিজের তো ওসব ঝঞ্ঝাট নেই। আপনি আমার হাতে একবছরের মত বিনীতাকে রেখে যান। বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দেবো। খরচ আমার।

অনীতা দেবী কৃতজ্ঞতায় গলে পড়লেন। বিনীতাও নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেছিল। তাই সেও রাজী হয়ে গেল। কঠোর নিষেধ জারী করে গেলেন অনীতা দেবী ; সুবিমলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নয়। ক'টা বছরের সাধনা, সুবিমলের জন্য উচ্ছন্নে চলে গেছে।

বিনীতার উদাস বৈরাগিণী মূর্তি দেখে বড় ব্যথা পেলেন রঙ্গলালবাবু। অনীতা দেবীর মত অত কঠোর হতে পারেন নি। অনুমতি দিয়েছিলেন মাসে একবার পত্রালাপ করবার। বিনীতা খুশী হয়েছিল খুব। রঙ্গলালবাবুর প্রতি শ্রদ্ধার শেষ ছিল না এ ব্যবস্থার পর। ধীরে ধীরে পূর্ব নিষ্ঠাভাব ফিরে এল। মনপ্রাণ ঢেলে লাগল সঙ্গীত-চর্চায়। শেষ দিকটায় সুবিমলকে চিঠি পর্যন্ত লিখত না। পাছে ফল খারাপ হয়ে যায়। পাছে চিত্তচাঞ্চল্যের দরুণ চর্চায় ব্যাঘাত ঘটে। রঙ্গলালবাবু জানতেন, এবার ওকে ঠেকাতে পারবে না কেউ। ভালভাবেই বেরিয়ে যাবে। বিদ্যানিকেতনে ওর মত ছাত্রী বর্তমানে একজনও নেই।

সত্যিই পরীক্ষায় ফার্স্ট হ'ল বিনীতা। সে তখন মা'র কাছে চলে গেছে সুবিমলের সাথে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে আর একবার আসতে হ'ল তাকে। ভেবেছিলেন রঙ্গলালবাবু, বিনীতা বুঝি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবে, প্রার্থনা করবে আশীর্বাদ। কিন্তু বিনীতাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দুর্বিনীত ভঙ্গীতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল কঠিন মুখ চোখের ভাব করে। এই ক'টা দিন বোর্ডিং ছেড়েছে, এর মধ্যেই এমন পরিবর্তন। লক্ষ্য করেও করলেন না রঙ্গলালবাবু। বিচিত্রার

সাধনাকে কতকাংশে সে মূর্ত করে তুলেছে, হাজার দোষ করলেও সে আদরের। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বিনীতার মাথায় হাত বুলিয়ে পিঠ চাপড়ে দিলেন; ভারী খুশী হয়েছি বিনীতা, তোমার রেজাল্ট দেখে।

বিনীতা যন্ত্রের মত একটি প্রণাম সেরে চলে গেল।

পরদিন রঙ্গলালবাবুকে ডেকে পাঠালেন প্রিন্সিপ্যাল। সেখানে গিয়ে যা শুনলেন, তাতে তাঁর আশ্চর্য হবারও উপায় রইলো না। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র সুবিমল অভিযোগ করেছে কড়া ভাষায়, ওর ভাবী স্ত্রী বিনীতার অঙ্গস্পর্শ করে আদর প্রকাশ করেছেন সর্বসমক্ষে। এতে যে শ্লীলতাহানি হয়েছে, তাতে সমগ্র শিক্ষাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে সে বাধ্য থাকবে।

অদ্ভুত মনোবৃত্তি! যে মেয়েটা রঙ্গলালবাবুর সন্তান-তুল্য তার মুখে একথা উচ্চারিত হয়েছে! সুবিমল তো প্রতিধ্বনি বিনীতার। এতদিন এত যত্ন ও শ্রম সহকারে নিজের রক্ত ব্যয় করে বিনীতাকে গড়ে তুললেন, এই তার প্রতিফল। অধোবদনে বসে রইলেন রঙ্গলাল। নাঃ দুর্নিয়াটাকে আজও চিনতে পারেন নি। শিল্পীর মনে তো কোন নীচতা থাকার কথা নয়। এ কেমন, ছাত্রী গড়লেন তিনি! জিজ্ঞাসা করলেন প্রিন্সিপ্যাল; ব্যাপারটা কি বলুন তো রঙ্গলালবাবু? এতদিন ধরে আপনি ছাত্রীদের শেখাচ্ছেন। কৈ এমন অভিযোগ তো কখনো শুনিনি। আর তাছাড়া আপনাকে আমি ভালভাবেই জানি।

রঙ্গলালবাবু সবিস্তারে বললেন সব কথা। প্রিন্সিপ্যাল বললেন; অভিজ্ঞতাটা আমারও অর্জন করা হ'ল। কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে পারব না কোনমতেই। বরং আপনিই পদত্যাগ করুন।

: আপনি না বললেও করতাম।

পদত্যাগ করে রঙ্গলালবাবু চলে গেলেন। সঙ্গীত-চর্চাই শুধু ছেড়ে দিলেন না; প্রচণ্ড অভিমানভরে হাতের আঙুল কেটে বাদ দিয়েছেন, বিকৃত করেছেন স্বরযন্ত্রকে—তারপর সেইরূপে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বিনীতার সামনে; মা! এবার ক্ষমা করবে তো, দেখ নিজের শাস্তি নিজেই নিয়েছি!

আর বললেন, সুবিমলকে, শিখে রাখো সুবিমল, পৃথিবীতে নারী পুরুষের একটি সম্পর্ক ছাড়াও বহু সম্পর্ক আছে!

বিনীতা সংজ্ঞা হারিয়েছিল, রঙ্গলালবাবুর মুখে 'মা' আহ্বান শুনে। অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিল সুবিমল, কিন্তু মার্জনা চাইবার অবকাশ মেলেনি। রঙ্গলালবাবুকে লোকালয়ে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি তারপর।

তাই তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েও সে শিক্ষা কাজে লাগাতে পারল না বিনীতা। অভিশপ্ত বিদ্যার জ্বালায় শান্তি নেই ওদের মনে।

লালন ফকিরের গান

শ্রীজয়দেব রায়

বাউল কবিদের মধ্যে লালন ফকির অগ্রগণ্য ছিলেন। বাউল সুরের মধ্যে তিনি একটি বিচিত্র গায়ন-ভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছিলেন। লালন-শাহী সুর নামে প্রসিদ্ধ।

পার্থিব জীবনে লালন ছিলেন একজন সংসারী সাধক। কথিত আছে, তাঁহার শিষ্যের সংখ্যাই ছিল কয়েক হাজার। ১৭৭৪ সালে কুষ্টিয়ার নিকট ভাঁড়রা নামক গ্রামে এক সম্পন্ন কায়স্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। সুকণ্ঠের জন্য বাল্যকাল হইতেই তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। যৌবনে জননী ও পত্নীকে গৃহে রাখিয়া বাউলদাস নামক জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে লালন বহরমপুরে গঙ্গাস্নান করিতে যান। গৃহে ফিরিবার সময়ে দুরারোগ্য বসন্ত রোগে তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়েন। বাউলদাস ও অন্যান্য সঙ্গীরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া গেল।

বাউলদাস তাঁহাকে এভাবে পরিত্যাগ করাতেই যেন তিনি পরবর্তী কালে সত্যসত্যই 'বাউলদাস' হইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন।

একজন মুসলমান রমণী নদীতে জল আনিতে আসিয়া তাঁহার দেহে প্রাণ আছে অনুমান করেন। তিনি তাঁহাকে সযত্নে গৃহে লইয়া গিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবায় লালন পুনর্জীবন লাভ করিলেন। কিন্তু সংসারে আর তিনি ফিরিতে পারিলেন না, হিন্দু সমাজে আর তাঁহার স্থান রহিল না।

যশোহর জেলার ফুলবাড়ি গ্রামের সিরাজ সাঁই নামক জনৈক

লালনকে বাউল ধর্মে দীক্ষা দিলেন। কথিত আছে, সিরাজ সাঁই একসময় পালকী বহিতেন। হিন্দু ও মুসলমান এই যুগ্ম সংস্কৃতির মিলিত ধারায় আপ্লুত লালন এক নতুন বাউলধর্ম প্রচার করিলেন—

জগৎ বেড়ে জেতের কথা লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন সে জেতের ফা-তা বিকিয়েছে সাত বাজারে॥

লালন ফকির বেশ সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৯০ সালে ১১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনাবসান হয়। কুষ্টিয়া ষ্টেশনের কাছে সেঁউরিয়া নামক গ্রামে তাঁহার আখড়া ছিল। পাঁচু শা, ভোলাই শা,' ভাঙ্গুরী ফকিরাণী প্রভৃতি ছিল তাঁহার ঘনিষ্ঠ পার্ষদ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহামান্য মনীষীরাও তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সেঁউরিয়া ছিল রবীন্দ্রনাথের জমিদারী শিলাইদহের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ সফর করিতে গিয়া বঙ্গের এই অখ্যাত বাউল রত্নটিকে প্রথম উদ্ধার করেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বাউল লালনের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

লালন ফকিরের গান ভক্তিরসে উচ্ছলা ভাগবতী গীতি। বৈষ্ণব কাব্য সাধনার সঙ্গে তাঁহার গানের মিল আছে। বৈষ্ণব কাব্যে ভগবানকে দেখা হইয়াছে সখারূপে, দয়িতরূপে, প্রিয়জনরূপে। বাউল সাধকেরা সে ধারায় অগ্রসর হন নাই; তাঁহাদের উপাস্য দেবতা সচ্চিদানন্দময় আত্মাপুরুষ। তাঁহারা এই ভাবে ভগবানকে নিজেরই 'মনের মানুষ' রূপে ভজনা করিয়াছেন। লালনের গানে আছে—

আমার এ ঘরখানায় বল কে বিরাজ করে ?
আমি জনমভরে খুঁজে পাইনে তারে॥

পতিত পাবনের কাছে ভবসিন্ধু তরণের জন্য আকুল প্রার্থনায় আত্মনিবেদন ফুটিয়াছে কীর্তনের প্রচলিত ভঙ্গীতে লালনের গানে—

কোথা রইলে হে, ও দয়াল কাণ্ডারী
এ ভব তরঙ্গে আমায় দেও হে চরণতরী॥

ধর্মসম্পর্কে লালনের মতামত উদার ছিল। নিজের ধর্মান্তর গ্রহণ বোধ হয় তাঁহাকে অহরহই পীড়া দিত, তাই একই অনুশোচনার কথা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বিভিন্ন গানের মধ্যে নানা ভাবেই তিনি বলিয়াছেন। সকল ধর্মের সারমর্ম যে এক, ঈশ্বরের নাম ভিন্ন হইলেও বিশ্ব জুড়িয়াই তাঁহার আসন একথা তিনি বহু গানে বলিয়াছেন—

যে যা ভাবে সেইরূপ সে হয়।
রামরহিম করিম কালা এক আল্লা জগৎময়॥

একমাত্র ভক্তিই হইল তাঁহার বন্ধন, এই ভক্তি থাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়; এ বিষয়ে বৈষ্ণব মতের সঙ্গে অনৈক্য নাই—

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন ব'লে তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই॥

তান্ত্রিক বাউলদের ন্যায় সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্রভেদ, চতুর্দল পদ্ম, ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, সপ্তভলভেদ প্রভৃতি বিবিধ তন্ত্রসম্মত সাধন পদ্ধতির ইঙ্গিতও আছে তাঁহার গানে। জ্ঞানের মণিকোঠার ঘরে একসঙ্গে চারটি চাঁদের দিব্যজ্যোতিঃ বিকশিত হইবে—

চেয়ে দেখ না রে মন! দিব্য নজরে
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে॥

তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবিত্বময় গানটিতেও আছে গভীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনবেড়ী দিতাম তাহার পায়॥
আট কুঠরী নয় দরজা-আঁটা, মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা,
তার উপর আছে সদর কোঠা আয়না মহল তায়॥
মন তুই রইলি খাঁচার আশে, খাঁচা যে তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে, লালন কয়,
খাঁচা খুলে সে পাখী কোনখানে পালায়॥

বৌদ্ধ চর্যাপদে ও তান্ত্রিক ধর্মসাহিত্যে গুরুর যে আসন, লালনের গানে সিরাজ সাঁই সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই গুরুবাদ তাঁহার তান্ত্রিক ভাবের বাউল গানগুলিরও বিষয় বস্তু—

গুরু সু-ভাব দেও আমার মনে।
তোমায় যেন ভুলিনে॥
গুরু তুমি নিদয় যার প্রতি,
ও তার সদাই ঘটে দুর্মতি॥

ইসলাম গ্রহণের পর লালন ইসলামী সাধন ও ভজন পদ্ধতি অধিগত করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু গানে ইসলামী ভাবের ইঙ্গিত আছে—

এমন দিন কি হবে আর।
খোদা সেই ক'রে গেল রছুল রূপে অবতার॥
আদমের রূহ সেই কেতাবে শুনিলাম তাই,
নিষ্ঠা যার হ'লরে ভাই, মানুষ মুরশিদ করলে সার
খোদা ছুরাতে পয়দা আদম, এও জানা যায় অতি মরম;
আকার নাই তার ছুরাত কেমন লোকে বলিবে তা-ও আবার।

লালন ফকির, তাঁহার শিষ্যদ্বয় হিরুশাহ ও পাঞ্জুশাহ এবং তাঁহাদের অনুরাগী ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া কুষ্টিয়া অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, এই সম্প্রদায়ের নাম 'নাড়ার দল'। এই দলের অধিকাংশই স্থানীয় পল্লীবাসী মুসলমান। সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাহাদের চালচলনের সাদৃশ্য থাকিলেও হিন্দু আচার ব্যবহারের সঙ্গেও তাহাদের কতকটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। লালনের গান ও তাহার সুর এই নাড়ার দলই এতদিন সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

লালন ছিলেন রামপ্রসাদের ন্যায় সমাজ সংসার ও বৈরাগ্যের মধ্যবর্তী সাধক। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে অবশ্য তাঁহার সাধনার তুলনা চলে না, কিন্তু প্রসাদের মতই সহজবোধ্য ঘরোয়া কথার মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁহার গানগুলিকে লোকোত্তরতা দান করিয়াছেন: যেমন—

আমার চরকা ভাঙা টেকো আড়ানে,
চিপে সুতো কাটব কত, আর ত প্রাণে বাঁচিনে॥

একটি আঁটি আরটি খসে, এ বেতো চরকা নিয়ে
যাব কোন দেশে ?
আমি আর কতকাল, ঘুরাবো এ হাল এ বেতো
চরকার গুণে ॥

প্রচলিত বিশ্বাস, ঘরোয়া কথাবার্তা, বিধিলিপির দোহাই প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত ফকিরের অনেক গান আছে। এই গানগুলির মধ্যে কারুণ্যের ফল্গুধারা গোপনে বহিয়া যাইতেছে—

যদি থাকে এই কপালে, রত্ন এনে দেয় গোপালে
কপালে যেমতি হ'লে ডুব্‌বো বনে বাঘে ধরে ॥
কেউ রাজা, কেউ হয় ভিখারী, কপালের ফল হয় সবারি
মনের ঘোরে বুঝতে নারি, খেটে মরি অকারণে ॥

মুসলমান কবি, কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দই সর্বত্র ব্যবহার করিতেন ইসলামী গানগুলি ছাড়া তাঁহার অন্যান্য গানে মুসলমানী শব্দ খুব অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ধারায় আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতের সঙ্গে লালনের গানের ভণিতাগুলি শাক্তকবিদের মতই—

অগতির না দিলে গতি, ও নামে রহিবে ক্ষতি
লালন কয় অধমের গতি কে বলবে তোমায় ॥

বাউলের পরিচয় সে ভবঘুরে, তাহাদের কাজ সারা দেশে টহল দিয়া বেড়ানো। লালনের গানে আছে ঢাকা হইতে দিল্লী পর্যন্ত সেই টহল দিবার সংকল্প,

সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি,
আমার কোলের ঘোর তো যায় না ॥

সংসারী সাধক হইলেও লালনের গানের মধ্যে বৈরাগ্যের নির্লিপ্ততার সুরই সর্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়াসক্ত মনকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিতেছেন—'ভূতের বোঝা ফেলে এবার চরণে শরণ নেরে'—

বিষয় বিষে চঞ্চল মন দিবা রজনী,
মন তো বুঝালে বোঝে না ধর্মকাহিনী ॥
আমি কি করি কি হই, ভূতের বোঝা-বই,
একদিনও ভাবলেম না শ্রীগুরুর বাণী ॥

সংসারের অসারতা জীবনের অনিশ্চয়তা যেদিন উপলব্ধি করা যায়, সেদিন অর্থের মোহ, খ্যাতির লিপ্সা সমস্তই সান্ধ্যগগনের রক্তরাগের ন্যায় মিলাইয়া যায়—

তুমি কার কে-বা তোমার এই সংসারে।
মিছে মায়ায় মজে কেন এমন করো রে ॥

চণ্ডীদাসের ন্যায় লালন ফকিরও বহুস্থলে বলিয়াছেন—'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। এ মানুষ অবশ্য সাধারণ মানুষ নয়, এ মানুষ 'মনের মানুষ'। মনের মানুষের সন্ধানই বাউলের ধর্ম, লালন সে ধর্মের গান গাহিয়াছেন—

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে,
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে ॥

বৈষ্ণব পরকীয়া প্রেমধর্মের অনুসরণে লালনও মনের মানুষের প্রেমে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন—

আমার মনের মানুষের সনে মিলন হবে কতদিনে।
চাতক প্রায় অহর্নিশি চেয়ে আছি কালোশশী,
হ'ব ব'লে চরণদাসী, তা হয় না কপাল গুণে ॥

মুন্সী মনসুরউদ্দীন এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"লালন বেশরা ফকির ছিলেন। এজন্য শরিয়তপন্থী আলেমদের সঙ্গে তাঁর বহুবার বাহাস হয়েছে। বেশরা মারফতী সাধনায় আল্লা তাল্লাকে ফকিরেরা মনের মানুষ ব'লে গ্রহণ করে।"

প্রচলিত হেঁয়ালী ভঙ্গীতে রচিত বাউল গানও তাঁহার বহু আছে। সহজ কথাটি এই সহজিয়া সাধকরা নানা আধ্যাত্মিক কূট ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া রূপকচ্ছলে বলিয়া থাকেন।

জীবন সায়াহ্নে নিজের কথা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়া কবি গাহিয়াছেন—

দিনে দিনে হ'ল আমার দিন আখেরি।
আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম সদাই ভেবে মরি ॥

মানুষের অন্তরেই তাহার ইষ্টসাধনার চরম সার্থকতা নিহিত আছে, বাহিরে দেশবিদেশে মন্দিরে মসজিদে পরমপুরুষকে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, তাঁহাকে মিলিবে অন্তরের শুচিতায়, জ্ঞানজ্যোতির উদ্‌ভাসনে এবং দিব্যানন্দের উপলব্ধিতে। বাহিরের সন্ধান ছাড়িয়া তিনি তাই অন্তরে সন্ধান করিয়াছেন—

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে ॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা, পরে ক'রে লেনাদেনা
আমি হলেম জন্মকানা না পাই দেখিতে ॥

এদেশের প্রেমভক্তির সাধনা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কেন্দ্র করিয়াই সারা দেশে বিকীর্ণ হইয়াছে। এদেশের অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'। বাউল সাধক এই প্রেমধর্মের জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বারবার স্মরণ করিয়াছেন—

জানাবো হে এই পাপী হইতে
যদি এস হে গৌর জীবকে তারিতে ॥
নদীয়া নগরে যতজন সবারে বিলালে প্রেমধন
আমি নর-অধম না জানি মরম,
চাইলে না হে গৌর আমা পানেতে ॥

লালন তাঁহার গানে গৌরের সঙ্গে তাঁহার দুই প্রধান সহচরের কথাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই—

তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে
তিন পাগলে হ'ল মেলা নদে এসে,
দেখতে যে যাবি পাগল সেই-ত হবি
পাগল বুঝবি শেষে।
ছেড়ে তার ঘরদুয়ার ফিরবি না সে!
পাগলের নামটি এমন শুনতে অধীর লালন হয় তরাসে
চৈতে, নিতে, অদ্বে পাগল নাম ধরেছে॥

কেবল গৌর নন, নিতাই ও অদ্বৈত সঙ্গে আছেন। বাঙলা দেশের প্রেমধর্মের প্রচারক ছিলেন নিত্যানন্দ-প্রভু আর অদ্বৈতের আহ্বানেই তো গৌর অবতার। নিত্যানন্দ ছিলেন এদেশের প্রেম তরণীর কর্ণধার, মহাপ্রভুর লীলা সংবরণ করার পরেও বহুদিন তাঁহার লীলা প্রকট ছিল; তিনি গৃহীভাবে ভজন সাধন-রীতির প্রচলন করেন—

দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে না।
চরণ ছেড়ো না রে ছেড়ো না॥
দৃঢ়বিশ্বাস করি এখন ধরো নিতাই চাঁদের চরণ
এবার পার হবি পার হবি তুফান
অপারে কেউ থাকবে না॥

ধর্মত্যাগ করিলেও লালন বহু যুগযুগান্তরের বঙ্গজ সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেন নাই। প্রেমরসে বিভোর কবি ব্রজের রসিক নাগরের প্রেম লীলাও গাহিয়াছেন। তাঁহার গানে গোপীভাবের সাধনার কথাও আছে—

সে ভাব সবাই কি জানে,
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে।
গোপী বিনা জানে কেবা শুদ্ধ রস অমৃত সেবা।
গোপীর পাপপুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণদরশনে॥

সাহিত্যে পাল ও সেন আমল

শ্রীসতীরঞ্জন রায়

'চর্চ্চা' শব্দটি সাহিত্যের আসরে অপ্রচলিত শব্দ নয়। এক কথায় চর্চ্চা সংস্কৃতির লক্ষ্য। চর্যা ও আচরণের দ্বারাও এই অর্থই প্রকাশ করে। মানুষ তার কল্পনা, ধ্যানধারণা-লব্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দর্যকে যুগসঞ্চিত সংস্কৃতির মাধ্যমে বিধৃত করে রাখে। সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ স্ফুরিত হ'তে দেখা যায় প্রতিদিনকার ঘটনাবহুল আচরণ সৌসাম্যের মধ্য দিয়ে। এই জীবন আচরণের সাহায্যেই প্রাচীন বাংলার মননশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মননশীল সাহিত্যগুলির মধ্যে 'স্মৃতি-সাহিত্য' প্রাকৃত পৈঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, রামচরিত ও পবনদূত, সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, চর্যাগীতিমালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল সাহিত্যের সৌন্দর্যের অন্তরালে বাংলা সমাজের চিত্র খুঁজিতে গেলে প্রাক্‌তুর্কী আমলের একটি চিত্রের অনুসন্ধান পাওয়া যায়।

সেন আমলের সাহিত্যে যে অসংযত বিলাসের ও চারিত্রিক অবনতির সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌ছিল, সেই কামনা বাসনা-রসপুষ্ট সুরধ্বনিকে প্রতিহত করবার জন্য ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য যেন উচ্চগ্রামে বাঁধা হ'লো। সেই সময়ের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি গ্রন্থাদিতে সমাজের নীতিগত উচ্চাদর্শের বিকাশের প্রতিবিম্ব লক্ষ্যণীয়। অসংযত সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়ালো ব্রাহ্মণ্য লেখকবর্গ। সমাজের দুর্নীতি ও সংযমহীন কামনা-বাসনার উন্মূলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সাহিত্যিকবৃন্দ সচেতন লেখনী নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তাঁদের আদর্শকে তুলে ধরার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর তৎকালীন লিপিমালাতেও ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। যে আদর্শ তাঁরা প্রতিবিম্বিত করেছেন, সে আদর্শ হচ্ছে পাতিব্রত্যের স্থৈর্য ও সংযমের শুভ্র কঠিন-শুচিতায়, শীলতা ও উদার্যের এবং দয়া, দান ও ক্ষমার।

ব্রাহ্মণ্য লেখকদের প্রচারিত আদর্শ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ঠ হ'য়ে বাংলার সমাজ জীবনকে করেছে প্রভাবান্বিত। ফলে পল্লীসমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা বাংলার সমাজ জীবনে অব্যবস্থার সৃষ্টি করেনি। আদর্শগুলো সমাজকে করেছে সুবিন্যস্ত। বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙালী সমাজের ভারসাম্য সেন আমলের অসংযমের তীব্রচাপ সত্ত্বেও নষ্ট হতে পারেনি। সেন আমলের বিলাস-বৈচিত্র্য বিশেষ করে সীমিত হ'য়েছিল নগরের সমাজ-জীবনে। নগর জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-শির তুলে দাঁড়ালো

পল্লীপতিগণ। এদের দৃষ্টি ছিল সজাগ ও প্রখর। এ প্রসঙ্গে কবি গোবর্ধনাচার্যের একটি শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক হবে না:—"সখী পা সোজা ফেলে অগ্রসর হও, নগরের আচার দূরে সরিয়ে রাখ। সামান্য ত্রুটি বা কটাক্ষপাত করলেই পল্লীপতিগণ তোমাকে 'ডাকিনী' বলে কঠোর দণ্ড দেবেন।"

প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজ সরল ও শান্ত জীবনাদর্শের প্রতিরূপের সন্ধান পাওয়া যায় শুভাঙ্ক রচিত একটি শ্লোকে। স্থানীয় শাসনকর্তা ছিল লোভহীন, ধেনু পরিচর্যায় গৃহ হতো পবিত্র, স্ব স্ব জমিতে চাষাবাদ নিয়েই কেটে যেতো দিন, অতিথির সেবায় গৃহিণীদের নিরহঙ্কার আনন্দ। প্রকৃতপক্ষে এই আদর্শ কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজকে নয়, সমস্ত বাঙ্গালী সমাজকেই প্রভাবান্বিত করেছিল। প্রকৃত পৈঙ্গলের দু'একটি শ্লোকেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।—"পুত্র হবে পবিত্রমনা। প্রচুর ধন, স্ত্রী ও কুটুম্বিনিগণ শুদ্ধচিত্তা—এই সব ফেলে কেহ কি স্বর্গে যেতে চায়?"

সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রাচীন শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ করলেই দশম ও একাদশ শতকের বাঙ্গালীসমাজের জীবনচিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরা যায়। আজো বর্ষার মেঘ-মেদুরতা কৃষক যুবকের স্বপ্নালীন ঔদাসীন্যের সুর প্রতিধ্বনিত করে তোলে, হেমন্তের হৈমন্তী সম্ভার বাংলা-দেশের অম্লানিত শোভা-সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণকে উজ্জ্বল করে দেয়, মধুর ভাষা, বঙ্গদেশের ধর্ম-কর্ম,সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি, অভাব-অনটন, শক্তি-শৌর্য, যশ-অপযশ—সব কিছু জড়িয়ে মিলিয়ে সেদিনও ছিল সাধারণ লোকের মনে। প্রাচীন পুঁথির পাতায় পাতায় ইতস্ততঃ গার্হস্থ্য-জীবনের এমন কত অপরূপ চিত্র প্রক্ষিপ্ত রয়েছে। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে এই সকল পুঁথির আবর্জনা ঘাটলে কিছু অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান মিলবে বলেই আশা করা যায়।

মিশরীয় কথা

চিত্রিতা দেবী

অন্ধকার সময়-সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেছি। দূরে পড়ে রইল বিদ্যুৎ-দীপখচিত ভারতের পশ্চিম তটপ্রান্ত; ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যেমন করে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রলেখা অস্তসাগরে যায় মিলে। কালো আকাশে তারারা উঠল জ্বলে। অজস্র, অগণ্য, অসংখ্য।—নীচে ধরিত্রী স্তব্ধ নীরব। তার নগরে জ্বলছে বাতি, আর গ্রামে দুলছে ছায়া। তার রমনীয় নিবিড় গহনে, সূর্য্যহীন মহাকাশের ঘন অন্ধকার। বন্ধ, পাহাড় নদী উপত্যকা, কত ক্ষুদ্র বৃহৎ বসতি, কত ফেন বিভজিত তরঙ্গোদ্বেল সমুদ্রের বঙ্কিম রেখা পার হয়ে উড়ে চলেছে যন্ত্রপাখী। আর সেই পক্ষী-গর্ভের নরম গরম আরামে ভ্রূণের মত স্থাণু হয়ে বসে আছি আমরা। বাইরে সগর্জনে বয়ে চলেছে কাল। নীচে নীরব অজানা পৃথিবীর রহস্য। উড়ে চলেছে পক্ষীযান—তার চলার বেগ দুলছে আমার রক্তে। প্রতি অঙ্গের প্রতি রক্তরোমে প্রাণবীজ আকুল হয়ে উঠে আমার সমগ্র চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মাথার মধ্যে কারা যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে। চোখের দৃষ্টি আসছে ঝাপসা হয়ে।

ওরা বল্লে—ও কিছুনা, তোমার বায়ুরোগ হয়েছে। শুয়ে পড়। হঠাৎ বায়ুরোগ কেন? বায়ুভেদ করে চলেছি বলে কি প্রাণবায়ু বিদ্রোহ জানাল নাকি? হাঁ, না, বিদ্রোহ ঠিক নয়। হঠাৎ নতুন অবস্থাকে মানিয়ে নিতে পারছে না তোমার শরীর।—তোমার দেহটা নেহাৎই মাটির। মহাকাশের হঠাৎ মুক্তিকে সইতে পারছে না সে।

তা বটে, মানুষ হয়ে জন্মেছি, ডানা দেননি বিধাতা। নাকি কোনদিন ছিল ডানা?—যেদিন মানুষে পরীতে ভেদ ছিল না। ফস্ করে মোটা ঘরকন্না থেকে রূপকথার রাজ্যে উড়ে যেতে বিশেষ কোন বাধা ছিল না মনের। মনে পড়ে, কবে যেন একদিন দুই পক্ষ বিস্তার করে উড়েছিলাম। এমন অন্ধকার রাতে নয়। সূর্য্যালোকে ঝলমল করা নীল আকাশের উপর দিয়ে। সে কবে? সে কি এই জীবনের কোন স্বপ্নে? কোন মোহময় কবিতার ছন্দে? না কি সে কোন্ জন্মজন্মান্তরের আপেক্ষিক সত্যে,—যখন পক্ষীবংশধারায় নিহিত ছিল মানবের মহান্তবিষ্বৎ।

কে জানে সে কবে? কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আমার দেহের আদিম রক্তকণাদের কাণে কে যেন চুপি চুপি সেই বিস্মৃত পুরাবৃত্তের কাহিনী বলে চলেছে। আর সে কথা শুনে তারা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তাল হয়ে ছুটে যেতে চাইছে। টুকরো টুকরো করে দেহের বন্ধন, উড়ে যেতে চাইছে মহাশূন্যে। ওরা বল্লে,—"বাজে কথা শোনার সময় নেই,—রাখো তোমার কবিত্ব। এবারে সোজা শুয়ে পড়।" ছোটো চেয়ার এক

করে ওয়া একটা ডিভানের মত করে দিল। নরম বালিশ মাথার নীচে দিয়ে কোমর বেঁধে দিল চামড়ার শিকলে।

আধ ঘুমে শেষ হয়ে এল রাত। তখন আধ অন্ধকারে ঘুমন্ত যাত্রীদের মধ্যে পথ করে কে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার মুখে। ভোরের আগেই ছোট লালীর ঘুম ভেঙে যায়। শব্দ না করেই আমরা দুজনে চুপি চুপি উঠে বসলাম। বন্ধ কাঁচের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম,—ফেলে আসা পূর্বদিকের আকাশ রাঙা করে ধীর পায়ে উঠে আসছেন দিনবধূ উষা। সকল দিকে বিকীর্ণ হচ্ছে তার ছটা।

দুলে দুলে হাওয়ার ধাকার টাল সামলে প্লেনটা এক সময় মাটিতে নেমে পড়ল। চামড়ার বন্ধনীটা খুলে ফেলে, দীর্ঘটানে দেহ বিস্তৃত করে উঠে দাঁড়াল সবাই। স্প্রীংএর দরজা খুলে দেখা দিল একটা সাদা ধাতুর সিঁড়ি। আফ্রিকার মরুতটপ্রান্তে নীলনদের মোহনায় বিংশশতাব্দীর যন্ত্রপাখী ডানা মেলে বসল। তার গর্ভ গৃহ থেকে বেরিয়ে এল জন কুড়ি যাত্রী।

সব দেশের মতই ঈজিপ্টের বিমান বন্দরটাও কায়মনোবাক্যে আধুনিক। তার গঠন, তার ব্যবস্থা, তার ঠাটঠমক সমস্তই সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত এই বিশেষ কালগত ফ্যাসানের অনুবর্তী। তেমনি পালিস করা টেবিল চেয়ার কৌচ। তেমনি লম্বা কাউণ্টার। আর তার উল্টো দিকে খট্ খটে অফিসাররা ঝক্‌ঝকে স্মার্ট পোষাক পরে ঘুরছে। ঘুরছে তো' ঘুরছেই। এটা করছে, ওটা দেখছে। এ ফাইলটা খুলছে, ও কাগজটা রাখছে। দু একটা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছে। ছাড়পত্রগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, মিলিয়ে নিচ্ছে চেহারা। ওদের কাজের ও আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা একই সঙ্গে চলেছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি কিউএর ল্যাজের শেষ দিকে। আকাশ যাত্রার বিধিসঙ্গত দায় কমাতে প্রত্যেকের কাঁধে অপর্যাপ্ত ঝোলাঝুলি।

অতি ধীরে একটি করে লোক কাউণ্টারের অপর পারে মিশরীয়, সীমানায় প্রবেশ করছে। উষার রঙ মুছে দিয়ে নূতন সূর্য্য জ্বলে উঠেছে অনেকক্ষণ। এপাশের বসার ঘরের গোল কাঁচের গবাক্ষ দিয়ে তার আলো তেরছা হয়ে এসে পড়েছে। সেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটা তরুণী মা তার গোলগাল ফরসা সুন্দর শিশুটাকে নানা রংএর নরম গরম পশমী কম্বল দিয়ে ঢেকে, বাইরে অপস্রিয়মান তার দূরগামী পিতাকে বিদায় জানাচ্ছে।—"বাই বাই, say bye bye derling.—আনমনা কৌতূহলে দেখে চলেছে চোখ।—কিউএর ল্যাজটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। চারিদিকে কতরকমের লোক, কত বিভিন্ন ঢং ঢাং পোষাক, —কত বিচিত্র ভাষার কলরব। ইংরেজ ফরাসী তো আছেই, তারোপরে আছে গ্রীক, ইটালিয়ান। ইরাকী, ইরানী—এবং আরবী। তারপরে আছে এদেশের আপন লোক ঈজীপ্সীয়। মিশরীয় অফিসারদের রক্তে এবং চেহারায় য়ুরোপীয় রক্তের মিশেল ভুল করবার যো নেই। এছাড়া দেখতে পাচ্ছি আরো একদল আছে যারা, আগুল্‌ফলম্বিত শাদা পাঞ্জাবীতে কোমর বন্ধ এঁটে, মাথায় উঁচু ফেজ ও কাঁধে রঙীন ঝাড়ন ফেলে চায়ের ট্রে নিয়ে ছুটোছুটি করছে। ওরা বোধহয় আরবী মুসলমান—হারুণ-উল রশিদের গল্পের পাতা থেকে উঠে এসেছে। দুজন মিশরী ওদিকের একটা কৌচে বসে খুব জোর কি একটা আলোচনা করছিলেন,—হয়ত তুলোর ব্যাপারী কিম্বা আতরের। এঁদের মাথায় লাল ফেজ, গায়ে গোড়ালি পর্য্যন্ত জমকালো আলখাল্লা, হাতে মিশরী কাজ করা চামড়ার পোর্টফলিও। ওরা কি ভাষায় কথা বলছিলেন কে জানে?—ইংরেজী বা ফরাসী তো নয়ই। কিন্তু মিশরী বলে কোন স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে কি এদেশে?—

স্ফিন্‌কস্‌

বোধহয় না। আজকের ঈজিপ্ট আরব সংস্কৃতির রসধারায় পুষ্ট। আরবী ভাষা ও সাহিত্য, আরবী সঙ্গীত ও ধর্ম, আরবী পোষাক পরিচ্ছদ, সমস্তই আধুনিক মিশরের জাতীয় সম্পদ।

এয়ার লাইনের বাসে উঠে বসেছি। নরম গদী আঁটা বাস। তাকের উপরে ঝোলাঝুলি তুলে রেখে, কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে মেলে দিলুম চোখ। চওড়া পরিপাটী পীচ ঢালাই রাস্তা। মাঝে মাঝে সাদা রেলিং ঘেরা বুলিভার্ডের টুকরো। চওড়া ফুটপাথের পরে ফুলের পাড় ঘেরা সবুজ ঘাসের গালিচা।—দুধারে বাগান ঘেরা নতুন ধাঁচের নতুন ঢংএর বাড়ী। প্রাচীন মিশরী কায়দা আধুনিক স্থাপত্যরীতিকে এক নূতন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। কোথাও কুটোটিও পড়ে নেই। ঝকঝকে রাস্তায় ঝলমলে সূর্য শুধু জ্বলছে।

শুনেছি ইয়োরোপীয় মানদণ্ডে ঈজিপ্ট এখনো তেমন করে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে নি। এখনো সে আমাদেরই মত প্রগতির

দূরে নীলিমার প্রান্তে শুভ্র নয়ন মেলে দিয়ে আধভাঙা ঘরের আধখোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে।

তবু ওই এরোড্রোম আর এই পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচিসুন্দর পথটী দেখে সেকথা মনে হচ্ছে না।

আমাদের কলকাতার এরোড্রোমটী যদিও আজকাল একটু মলিন হয়ে এসেছে, তবু এখনো ভারী সুন্দর; পৃথিবীর যে কোন দেশের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সেখান থেকে সহরে আসার পথটী তার একান্ত প্রতিবাদ। কলকাতা মহানগরীতে প্রবেশের প্রথম পথটীর দুধারে আজো খোলা ড্রেন। এবং দুর্গন্ধ ময়লার গাড়ী। আর অবিন্যস্ত বিপর্যস্ত ছড়ানো ছিটানো বিশৃঙ্খল ক্ষুদ্র বৃহৎ বসতি। যেহাৎই প্রয়োজনের খাতিরে গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনকে কমনীয়তায় নম্র করে, রুচির শৃঙ্খলে বদ্ধ করার কোন নিয়ম আমরা আজো শিখিনি।

পীরামিডের পথে

সহরে ঢোকার মুখে এই ৬।৭ মাইল লম্বা বৃক্ষবীথী শোভিত চমৎকার সুন্দর রাস্তাটী দেখে মনে হয়, প্রাচীন মিশর আজো মরেনি। তার শয়ন-পিপাসু চিত্ত ভূগর্ভনিহিত অন্ধকারে অপেক্ষা করেছিল, নূতন যুগের নূতন দেবতার যাদুস্পর্শে সে হয়ত আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। শোনা যায় এখানকার কোন এক কবর খুঁড়ে বার করে আনা বহু প্রাচীন যুগের মধ্যে থেকে একমুষ্টি শস্য নিয়ে কোন কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক মাটিতে রোপণ করেছিলেন। তা থেকে দু'হাজার বছর আগের প্রাণবীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল।

আমাদের পান্থনিবাসের নাম—হোটেল সেমিরামিস। প্রাচীন ব্যাবিলনের অসুর সম্রাজ্ঞী দিগ্‌বিজয়িনী সেমিরামিসের নামে এই হোটেল—সাজে সজ্জায় বিলাসে প্রাচুর্য্যে ঝলমল করছে। আধুনিক আরাম ব্যবস্থা ও বিলাসের সঙ্গে প্রাচীন মিশরী সজ্জার একটু আধটু অনুকরণ। লম্বা আরবী পোষাক পরা পরিচারক দল এখানে ওখানে ছড়ানো। তাদের সঙ্গে বোধ হয় মোগল হারেমের হাবসীদের মিল আছে। আগেকার দিনে যে আরাম বিলাস শুধু নবাব বাদশা আমীর ওমরাহদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, আজকের দিনে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি অনেক নীচে। সাধারণের নাগালের সীমানায়।

হোটেলের সামনে পিছনে বাগান। পাশের ঢাকা বারান্দার ছোট গেট খুলে একেবারে নেমে আসা যায় concreteএ গাঁথা নীল নদের তীরে। কত রকমের লোক,—শিশু, বৃদ্ধ যুবা। পিঠে খোলা চুল এলো করে, লাল রিবনের ফুল বাঁধা ফ্রকপরা তরুণী মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। পুরুষদের অনেকের সেকেলে আরবী ঢং আছে বটে পাজামার উপরে আলখাল্লা। কিন্তু মেয়েদের বেশভূষায় প্রাচীন রীতির চিহ্ন নেই। শুনলুম বেশ কিছুদিন হোল এঁদের মেয়েরা পোষাকটা বদলে ফেলেছেন। কিন্তু মনটা বোধ হয় বদলায়নি। য়ুরোপীয় পোষাকের অন্তরালে মেয়েলি বুদ্ধির আচার বিচারে, এখনো পুবদেশীয় এঁদেরই নিগূঢ় অধিকার।

নদীর তীরে পাথরে গাঁথা চওড়া নীচু রেলিংএর উপরে বসে আছি। শিশু-কালের স্বপ্ন কৌতূহলের কল্পলোকের রং মাখানো নীলনদের আশ্চর্য নাম, সাধারণ একটা খালের মত জলস্রোতের উপর দিয়ে যেন নিতান্ত তুচ্ছভাবে বয়ে চলেছে। আশেপাশে কৌতূহলী নারীজনতার সপ্রশ্ন দৃষ্টি। একজন বল্লে,—"তোমরা পাকিস্থান থেকে এসেছ ?"

—"না India থেকে"। ওঃ! ওরা চুপ করে গেল।

আমরা নদীতীর ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্লাম। আস্তে আস্তে ভীড় বিরল হয়ে এল। শীতের বেলার লেপের নীচে ঢোকবার সময় হয়ে এল বলে।

দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধচূড়া। তারো পরে আরো অনেক দূরে পিরামীডের রুক্ষ ত্রিকোণ ধূসর আকাশে গেছে মিলে। তারই প্রান্ত ঘেঁষে আকাশ ক্রমশ লাল হয়ে উঠল।

পশ্চিম দিকের সিংহদ্বার দিয়ে সূর্য প্রতিদিন অন্ধমৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করেন। তাই পিরামিড সহরের পশ্চিম দিকে। পূর্বদিকে জীবন আর সূর্যের অভ্যুদয়। পশ্চিমে মৃত্যু এবং সূর্যের প্রলয়। মাঝখানে সৃষ্টিবিধায়িনী উত্তরবাহিনী-নীল নদী। কে একে পুরুষরূপে কল্পনা করেছিলো কে জানে। এ যে শান্ত স্নিগ্ধ অন্তঃতোয়া। একে দেখে নারীমাধুরীকে মনে পড়েনি কেন মিশরবাসীর কে জানে।

মনে পড়ে, নীলনদের মূর্তি দেখেছিলাম vatican museum এ। নগ্নখলে মাংসল ভুঁড়িদার চেহারা। কুৎসিত বৃদ্ধ বামনের সঙ্গে ১৬টা গুণ্ডি গেণ্ডি সন্তান। এই নদীর সঙ্গে সেই শিশু পরিবৃত বৃদ্ধ বামনের রূপকের মিলটি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলাম। মরুভূমির দীপ্ত উজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশে অল্প একটু রঙের আভাস দিয়ে সূর্য চলে গেল পশ্চিমে,—মৃত্যুর দেশে।

মিশরের দুই প্রধান দেবতা,—সূর্য এবং নীলনদ। দুই পুরুষ দেবতার কন্যা মিশর। এদেশের প্রধান দেবতা যে সূর্য, এ বিষয়ে সন্দেহ করবে কোন সংশয়। মিশরের সূর্য্য মরুসূর্য্যের মতই তেজস্বী। মিশরের বাতাস মরুর মতই পবিত্র নির্মেঘ নির্মল উত্তপ্ত কঠিন। সূর্যতেজে দেহাবিধ্বংসী বীজাণুগুলি মরে যায়। বাতাসে জলস্পর্শ না থাকায় তারা বাঁচে না জন্মায়ও না। তাই 'মমি' না করলেও বালির নীচে মৃতদেহ আপনিই অবিকৃত থেকে যেত। মিশরের মরুবালু খুঁড়ে প্রথম মানুষের যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সে কবেকার কে জানে।

—ছয় হাজার বছর আগে যখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষকে পশুর মত অন্ধকার অরণ্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হোত, তখনই এদেশের মানুষ সভ্যতার পাথরে গাঁথা চুড়োর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে এসেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ মানুষ তারো অনেক। আগের বালিগর্ভের অনেক নীচে, কুঁকড়ে মুচড়ে হাঁটুর সঙ্গে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা ঐ কঙ্কাল যেন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ। আর তার আশে পাশে ছড়ানো জন্তুর হাড়। হিপো, হাতি মহিষ সিংহের। এসব দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ও মানুষ যবেকার, সাহারা তখনো সর্বহারা হয়নি। তখনো কালো অরণ্য ছড়িয়ে ছিল তার বুকে। তখন বর্ষার গোড়ায় আকাশে জমত ঘনকালো মেঘ। নববৃষ্টিধারায় জেগে উঠত বনস্থলী। নতুন পাতায় আর রঙীন ফুলে, সাজ করত শেষ। সেই বনে ঘুরে বেড়াত কত সিংহ মহিষ গণ্ডার। আর তাদের শিকার করে ছুটে বেড়াত বন্য উলঙ্গ যে মানুষ, ঐ তার কঙ্কাল। তার নিহত শিকার সঙ্গে একসঙ্গে মিলে বিশ্রাম করছে বালুগর্ভে। ক্রমে জঙ্গল এল ...রে। কোথা থেকে কেমন করে শুকনো বাতাস দিল কে জানে? গাছ মরে গেল, আর জাগল না তার বীজ। ক্রমে ঝোপঝাড় মরে গেল, কোন্ অন্তর্নিহিত কারণে। কোথায় ধরিত্রীর বুকের মাতৃস্নেহের রসধারায় ঘাটতি পড়ল কে জানে। দেখতে দেখতে বন্যা মরুভূমি গ্রাস করে নিল শস্যশ্যামল বনভূমিকে। কিন্তু এই মরুভূমিই শেষ নয়। এরো শেষে আছে আশা, আছে নদী। সাহারাকে দুই ভাগে ভাগ করে বয়ে যাচ্ছে নীলনদ। মরু তাকে গ্রাস করতে পারেনি। শুষে নিতে পারেনি তার প্রাণতোষিণী জলধারা। আকণ্ঠ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে হিংস্র লুব্ধ মৃত্যু বাসনায় বালুরাশি দুইদিকে বিস্তৃত করে সঙ্কোচে সে দূরে সরে আছে। তারি মাঝখান দিয়ে নির্ভীক সাহসে পথ করে বয়ে চলেছে নীল নদ। তার দুই তীর ভরে উঠছে অজস্র সবুজ প্রাণের সম্পদে।

কত কাল ধরে এমন হয়ে আসছে কে জানে? কবে কোন যুগে মাটির কোন গূঢ় যন্ত্রণার আলোড়নে অকস্মাৎ ভিক্টোরিয়া হ্রদের উৎসমুখ ভীমগর্জনে উদ্ঘাটিত করে এই বিপুল জলধারা এঁকে বেঁকে আপন পথ করে উত্তরবাহিনী হয়ে সুদানের ভিতর দিয়ে মিশরের নূতন দেশ সৃষ্টি করতে করতে ভূমধ্যসাগরে এসে মিশেছে। পথে কতবার কত বাধা ওর পথ আগলে ধরেছে। পাহাড়ের মত বাধার নীচে গভীর গহ্বর। গ্রাহ্য করে নি এই নদ; লাফিয়ে নেমেছে দুরন্ত বালকের মত পাহাড় থেকে খাদে। ছোট একটু বাঁধের সৃষ্টি করে আবার চলেছে ছুটে। তার দুই তীরে ঘন ঘাসের জঙ্গল। সেখানে কুমীর আসে জল খেতে। তার আশে পাশে নরম মাটির খাঁড়িতে বন্যায় জল ঢুকে আটকে রচনা করেছে ছোটো ছোটো জলা। তাতে পদ্মের বন। পদ্মের রং নীল। —কেন? —এইকি তবে নীল পদ্মের দেশ। এখান থেকেই কি শিবের প্রিয় নীলপদ্ম সংগ্রহ করে নিয়ে যেত শিবভক্ত? কায়রো মিউজিয়ামে বহু ছবিতে দেখেছি মিশরী তরুণীদের হাতে সবুজ ...
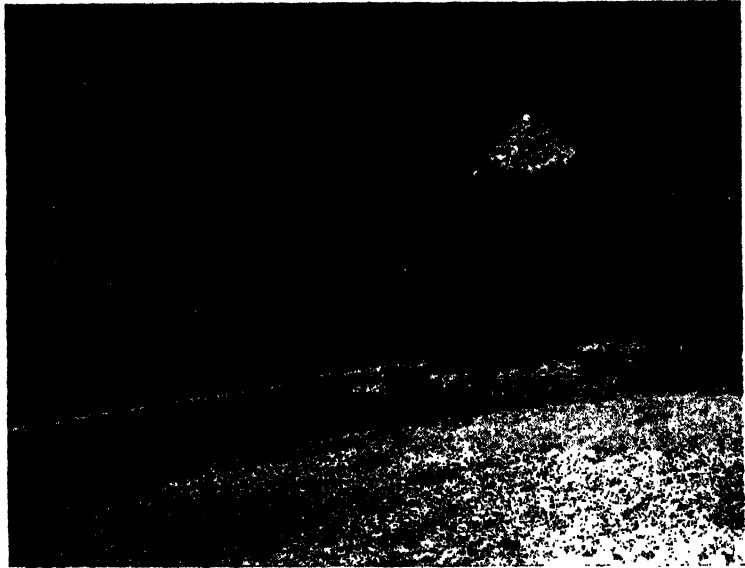
পীরামিদ্

মিশরের বিলাসীরাও অমনি হাতে পদ্ম নিয়ে ঘুরত। "হস্তে লীলাকমল-মলকে কলকুন্দানুবিদ্ধং। কিন্তু এদের অলকে কুঁদকুড়ির মালা দেখতে পেলুম না। কালো চুলে খোঁপা নেই। এলো করে ছাড়িয়ে দেওয়া কাঁধে। অথবা পিঠে। আর কপালে ঝুলছে চুলের ঝালর। কিন্তু নীলপদ্মের কথাটা মনের মধ্যে পদ্ম লোভা ভ্রমরের মতই বার বার ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। যে নীলপদ্ম আমাদের দেশে এত গান এত প্রেরণা দিয়েছে। সেই ফুলের কোন চিহ্ন নেই কেন আমাদের দেশে। তাছাড়া নীলপদ্মের সঙ্গে সর্বদাই যেন একটা দুরদর্শী অকথিত রূপকথা জড়িয়ে আছে। "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে, পদ্মবনে আমি যাব। আনিয়া নীলপদ্ম তোমার চরণপদ্মে দিব।" সেই নীলপদ্মের দেশ কি এই নীলনদের দেশ?—কে জানে।

White nile ও Blue nile এক হয়ে ইজিপ্টে ঢুকে প্রথম বাধা পেল আসোয়ানে। গ্রানাইট ও আসবেষ্টারের কঠিন পাথরে গাঁথা প্রকৃতির নিজের হাতে রচিত বাঁধ রুখে দাঁড়াল পথ। দুরন্ত আবেগে ঝাঁপ দিল নদী, বিশাল নদী, বিশাল জলাশয় তৈরী করে বয়ে চলল উত্তর পথে। ঐ জলাশয় থেকে খাল কেটে কেটে, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্রতর জলাশয় সৃষ্টি করে, আরো অনেক সরু নালায় জলধারা ভাগ করে। এখানে মানুষ বাস করতে সুরু করেছিল—খৃষ্ট জন্মের বহু সহস্র বছর আগে। আজকের মানুষ এখানে নূতন বাঁধ রচনা করে প্রকৃতির খেয়ালকে পাকা গাঁথুনিতে গেঁথেছে। সেখানে একদিকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। অন্যদিকে জল সেচনের ব্যবস্থা চলেছে। আধুনিক পন্থার অনুকরণে।

এইখানে নতুন একটি সর্বাধুনিক বাঁধ বাঁধার পরিকল্পনা করেছিল মিশর। তাতে অর্থ এবং সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আমেরিকা এই কিছুদিন আগে। কিন্তু কার্য্যকালে তা কেবল শ্রুতি হয়েই রইল। কাজে লাগল না। হঠাৎ দেখা গেল আমেরিকা তার কৃপণ মুষ্টি বন্ধ করেছেন। এই ব্যবহারের পিছনে ইংরেজের প্রচ্ছন্ন মায়া যথেষ্ট অস্পষ্ট নয়—বেশ বুঝতে পারা যায়। আজ যে একটা নূতন অসন্তোষ পশ্চিম দেশের আকাশে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠছে, তার মূল কারণ বোধ হয় এই ছোট ঘটনাটুকুর মধ্যেই নিহিত। সত্যভঙ্গের অপরাধ তুচ্ছ নয়। বিশেষ করে মিশরের গায়ে এ অপমান তীব্রভাবেই বেজেছিল। কারণ তার ঘরে টাকা থাকতেও যে তাকে ভিকিরি সাজতে হয়েছিল। মিশরের টাকা যথেষ্ট আছে কিন্তু তার অধিকাংশই পরহস্তগত। তাই আজ অন্য দেশের কাছে হাত পেতে তাকে সইতে হোল প্রত্যাখ্যানের লজ্জা।

সুয়েজ খালের মাধ্যমে ইয়োরোপের সঙ্গে এসিয়ার যোগ রেখেছে ইজিপ্ট। অবশ্য ফরাসী কারিগর খালটি কেটেছিল, এবং ইংরেজ কোম্পানী তৈরী করে সেই খালের মুখের কাছে বহুদিন ধরে ঘাঁটি আগলে বসে বসে খেয়া পারাপারের মাশুল বাবদ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার মুনাফা ধরে তুলছিল। সেই টাকা ন্যায়ত মিশরের প্রাপ্য। প্রতি বছর এত টাকা মিশরে উপার্জিত হয়ে বাইরে চলে যায়। আর নিজের প্রয়োজনে মিশরকে অন্য দেশের দ্বারস্থ হয়ে নতমুখে ফিরে আসতে হয়। তাই হঠাৎ একদিন ভোরবেলা সেই কোম্পানীর উপরে আধিপত্য বিস্তার করলে মিশর সরকার। একদা রাত্রি শেষে হঠাৎ দেখা গেল, কোম্পানীর আপিসে এবং খালের ধারে ধারে পুতুলের মত সৈন্য শ্রেণী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে অস্ত্র নিয়ে। জানা গেল সুয়েজ খালের সমস্ত দায়িত্ব মিশর সরকার নিজে গ্রহণ করেছেন। কাজেই লভ্যাংশ সবই পাবেন তিনি। এতদিন পরে প্রাপ্য ধন নিজের জোরে ফিরে নিল মিশর আর পৃথিবী জুড়ে ক্রুদ্ধ ভ্রমরের গুঞ্জন মুখর হয়ে উঠল। "মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের" মত সবাই ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। এতদিন ধরে পরের বাড়ির কার্ণিশে মৌচাক রচনা করেছিল যে মৌমাছিরা, তারা অধীর চঞ্চল দংশনোদ্যত হয়ে উঠল। যে পাঁঠা বলির জন্য রাখা আছে, তাকে হঠাৎ গুতোবার জন্যে রুখে দাঁড়াতে দেখে, সবাই ক্রোধে এবং বিস্ময়ে গর্জন করে উঠল। কিন্তু মিশর ভয় পেল না। দ্বিগুণ জোরে তুলে ধরল নিজের পতাকা। ন্যায় যার পক্ষে, রুখে দাঁড়াতে সে ভয় পাবে কেন? আর ভয় একবার পেতে সুরু করলে আর রক্ষে নেই; তখন বাঘের ভয় থেকে জুজুর ভয় পর্য্যন্ত সব কিছুই তেড়ে এসে চেপে ধরে। তাই হুমকীতে ভয় পেল না মিশর। নিজের জোরে কারিগর আনলো—মিশর জানে তুইয়ে বুইয়ে দেশরক্ষা হয় না। দেশের জন্যে দেশকে মরণ পণ করেই দাঁড়াতে হয়। তারপরে :হারি কিম্বা জিতি। দেশের যিনি দেবতা তিনিও বুদ্ধের মত শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দাবী করেন। তার জন্যে সর্বস্ব দিতেই প্রস্তুত হতে হবে। লুকিয়ে চুরিয়ে অর্দ্ধেক রেখে দেব আঁচলের তলায়, বাকি অর্দ্ধেকের একটু আধটু ছায়াছবির সঙ্গে বড় বড় তত্ত্বকথার রং ছড়িয়ে যারা পরের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের দেশকে বাঁচাতে চায়, তাদের ভুল ভাঙে অনেক দুঃখে। মিশর সে ভুল করে নি। জোরের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ওকে সত্যি সত্যি রুখে দাঁড়াতে দেখে সবাইকেই অবশেষে নিজের নিজের পথ দেখতে হোল। কারণ,—

যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায়
ভীরু তোমা চেয়ে।
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে, সঙ্কোচে
সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, জানে সে হীনতা
আপনার মনে মনে।

'আসোয়ান' থেকে সাতশ' মাইল লম্বা এই নদী প্রাচীন মেমফিস অথবা আধুনিক কায়রো নগরী অতিক্রম করে বহুধাবিভক্ত মোহানায় ভূমধ্যসাগরে এসে মিশেছে। নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছে সবুজ সুন্দর দেশ। আর তারপরেই পূবে পশ্চিমে যেদিকে তাকাও, শুষ্ক উষর মরুভূমি নিষ্ফল বন্ধ্যা—মাঝে মাঝে মরু সীমার ধারে ধারে, এখানে ওখানে ছড়ানো কিছু খেজুর গাছ। (ক্রমশ)

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অক্ষর ব্রহ্ম, প্রত্যক্ আত্মা (অধ্যাত্ম), স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তি (কর্ম্ম), সৃষ্ট যাবতীয় নশ্বর বস্তু, বিশ্বাত্মা এবং পুরুষোত্তম, ইহারা ব্যতীত বিশ্বেই হউক অথবা বিশ্বের বাহিরেই হউক অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ইহারা সকলেই পরমাত্মার বা পুরুষোত্তমের বিভিন্ন রূপ, পরমাত্মাই বিভিন্ন রূপে সর্বত্র প্রকাশিত। ইহা কেবল যুক্তির মীমাংসা নহে—সাধনার বিভিন্ন স্তরে ইহার অনুভূতি সাধক লাভ করেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই তত্ত্ব বিশদীকৃত হইয়াছে।

জীবের শরীর ক্ষেত্র এবং শরীরে অধিষ্ঠিত যে প্রত্যক্ আত্মা শরীরকে জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত। সকল ক্ষেত্রেই পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। পঞ্চভূত ও তৎসহ অহংকার, বুদ্ধি একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি—স্বগুণ কর্তৃক আচ্ছাদিত পরমেশ্বরের শক্তি)—সাংখ্যের এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি), এবং ধৃতি—এই সকল মিলিয়া ক্ষেত্র। অব্যক্তই তাহা হইতে উদ্ভূত যাবতীয় ভৌতিক ও মানসিক সমুৎপাদের নিম্নদেশে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াতীত নিশ্চল কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম, এবং যাবতীয় সমুৎপাদ পরমাত্মার সৃষ্টিপ্রেরণা হইতে উদ্ভূত। অব্যক্ত এবং তাহার উপরিভাগের সমস্ত সমুৎপাদ ক্ষেত্র এবং ইহাদের জ্ঞাতা পরমাত্মা এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রত্যেক জীবদেহই যে শুধু ক্ষেত্র তাহা নহে। সমগ্র বিশ্বই ক্ষেত্র। প্রত্যেক জীবদেহে অধিষ্ঠিত যে প্রত্যক্ আত্মা তিনি সমগ্র বিশ্বেরও আত্মা, এবং বিশ্বাত্মাই বিশ্ব-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু জীবে অধিষ্ঠিত আত্মা অজ্ঞানবশতঃ জানেন না যে তিনি ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে বদ্ধ নহেন, সমগ্র বিশ্বই তাঁহার ক্ষেত্র এবং তিনি সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি জ্ঞাতা এবং তিনি জ্ঞেয়, এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয় রূপ দ্বৈধের অতীত অবর্ণনীয় সত্তা—যাহা হইতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই উদ্ভূত। তিনি জীবদেহে অধিষ্ঠিত আত্মার আত্মা এবং প্রকৃতির প্রভু। প্রকৃতি তাঁহার শক্তিরই ক্রীড়া, যাবতীয় শক্তি তাঁহারই শক্তি। আবার প্রত্যেক জীবদেহে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে অবস্থিত—যাবতীয় জীবদেহে তিনিই এক ক্ষেত্রজ্ঞ। বিভিন্ন দেহে জগৎ তাঁহার নিকট বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, ইহা সত্য, কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি সমগ্র বিশ্ব আপনার মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পান। ভিতরে ও বাহিরে একই সত্তা, জীব ও প্রকৃতি এক, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। একই ব্রহ্ম এক দিকে পরিণামী, অপর দিকে অপরিণামী, তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত ও সর্ব্বাতিগ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের তিনি ভিত্তি। তিনি সৎ ও অসতের (ব্যক্ত ও অব্যক্তের) দ্বন্দ্বের অতীত। তিনি কালের অতীত। জীবাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা তাঁহার সনাতন সত্তার অন্তর্গত। ইন্দ্রিয় ও তাহাতে প্রকৃতির প্রতিফলন প্রকৃতির জ্ঞানলাভের জন্য পরমাত্মা কর্তৃক কল্পিত। কিন্তু তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা সীমিত নহে। তিনি অনিন্দ্রিয়, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় শক্তি তাহাতে বর্ত্তমান। তাঁহার পাণি, পাদ, অক্ষি, শির, মুখ, প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। চক্ষুরাদি বাহ্যইন্দ্রিয়ে এবং মন ও বুদ্ধিতে তিনি তাহাদের বিষয় রূপে প্রকাশিত হন। তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণের ভোক্তা। অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত রূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি—অনাদিকাল হইতে পরমাত্মা প্রকৃতি ও পুরুষরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। কার্য্য ও করণ (শরীর ও ইন্দ্রিয়) প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। তাহাদের দ্বারা পুরুষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণের হেতু গুণসঙ্গ, অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ শব্দও স্পর্শে সঙ্গ বা আসক্তি। স্থাবর বা জঙ্গম যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলেই উৎপন্ন হয়।

জগতে সকল কর্ম্ম প্রকৃতি বা ঈশ্বরশক্তি দ্বারাই কৃত হয়। আত্মা অকর্ত্তা বা নিষ্ক্রিয়।

ত্রিগুণ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের ব্যাখ্যা আছে। সাংখ্যমতে এই তিন গুণ হইতে সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। ইহাদের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, এবং সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হয়। গুণ শব্দের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ গুণ শব্দে বৈশেষিক গুণ, কেহ বা দ্রব্য বুঝিয়াছেন। সে যাহা হউক গীতাকার পরমাত্মার শক্তি হইতে ইহাদের উদ্ভব হয় বলিয়াছেন। তাঁহার অপরা প্রকৃতিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপে বিভিন্ন বস্তুতে প্রকাশিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরমাত্মার শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া। এই শক্তির অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাই সাংখ্যের প্রকৃতি। তাহাতেই সর্ব্বভূতের বীজ নিহিত। এই বীজ পরমাত্মার সংকল্প (Idea)। আকার বিশিষ্ট যাবতীয় বস্তু ইহার ফলেই তাঁহার অপরা-প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত হয়। এই সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত। প্রত্যেক গুণ কোনওটিতে কম, কোনটিতে অধিক। সত্ত্ব নির্ম্মল, প্রকাশ স্বভাব, চাঞ্চল্যরহিত ও শান্ত (নিরাময়)। রজঃ রাগাত্মক (অর্থাৎ বিষয়ের রাগে (রংএ) চিত্তকে রঞ্জিত করে), এবং বিষয়ে আসক্তি ও তৃষ্ণার জনক। তমঃ জ্ঞানের আবরক, ভ্রান্তির জনক ও অজ্ঞান, আলস্য ও নিদ্রার হেতু। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে এই তিন গুণই বর্ত্তমান, এবং ইহারা প্রত্যেকেই বন্ধের হেতু।

সত্ত্ব বন্ধের কারণ হয় সুখ ও জ্ঞানের প্রতি আসক্তির উৎপাদন দ্বারা। রজঃ তৃষ্ণার জনক বলিয়া তৃষ্ণার পরিতৃপ্তিকর কর্ম্মেরও জনক। কর্ম্ম দ্বারাই রজঃ বন্ধের হেতু হয়। প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা তমঃ বন্ধের কারণ হয়। প্রত্যেক বস্তুতে এই তিন গুণের একটির আধিক্য থাকে। যখন সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন রজঃ ও তমঃ শান্ত থাকে, সত্ত্ব তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া বিবৃদ্ধ হয়। যখন রজঃ প্রবৃদ্ধ হয়, তখন লোভ ও কর্ম্মের প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়। তমো গুণের বৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ (বিবেক ভ্রংশ), কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উদ্ভূত হয়। সাত্ত্বিক ভাবে যে কর্ম্মকৃত হয়, তাহার ফল হয় সত্ত্বপ্রধান নির্ম্মল সুখ, রাজসিক কর্ম্মেরফল দুঃখ এবং তামসিক কর্ম্মেরফল অজ্ঞান।

যাবতীয় কর্ম্ম এই গুণদিগের কর্ত্তৃকই কৃত হয়, অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তির ক্রিয়াই জাগতিক সকল ক্রিয়া। জীব যে কর্ম্ম করে, তাহাও এই শক্তিরই ক্রিয়া। আত্মা গুণাতীত ও নিষ্ক্রিয় কোনও কর্ম্ম করে না। যিনি ইহা জানেন তিনি পরমাত্মার ভাব (তদ্রূপতা,-সাধর্ম্য) প্রাপ্ত হন।

দেহে সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ—প্রকাশ, কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও মোহ (অজ্ঞান)—তিন গুণেরই প্রকাশ হয়। কিন্তু যিনি ইহাদের উৎপত্তি হইলে, দ্বেষ করেন না (বিরক্তিবোধ—করেন না), ইহাদের নিবৃত্তি হইলে ইহাদের কামনা করেন না, কিন্তু অবিচলিতভাবে উদাসীনের মত থাকেন, ইহাদের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, যাঁহার নিকট দুঃখ ও সুখ, প্রিয় ও অপ্রিয় নিন্দা ও স্তুতি, মিত্র ও অরি সমান, যিনি সর্ব্ব উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠ, তিনি গুণাতীত। যিনি একান্ত ভক্তির সহিত পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমের সেবা করেন তিনি গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়

মধুসূদন সরস্বতী তাহার গীতার টীকার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন "সহেতুক সংসারের অত্যন্ত উপরমই নিঃশ্রেয়স। পর নিঃশ্রেয়সই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন। বিষ্ণুর সৎচিদানন্দরূপ পরমপদই নিঃশ্রেয়স। তাহা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিন কাণ্ডযুক্ত বেদ সমারব্ধ। কর্ম্ম, উপাস্তি (উপাসনা) এবং জ্ঞান বেদের ভিন্ন কাণ্ড। অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত গীতাও তিন কাণ্ড-যুক্ত। প্রত্যেক কাণ্ডে ছয় অধ্যায়। প্রথম কাণ্ডে কর্ম্মনিষ্ঠা এবং শেষ কাণ্ডে জ্ঞাননিষ্ঠা কথিত হইয়াছে। জ্ঞানও কর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধবশতঃ তাহাদের সমুচ্চয় নাই। ভগবৎনিষ্ঠা মধ্যম কাণ্ডে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্ববিঘ্নাপনোদিনী ভগবৎনিষ্ঠা কর্ম্ম নিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়ের অনুগত। এই নিষ্ঠা ত্রিবিধ—কর্ম্মমিশ্রা, শুদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রা। প্রথম কাণ্ডে কর্ম্মও কর্ম্মত্যাগ বর্ণনা দ্বারা "ত্বং" রূপ বিশুদ্ধ আত্মা যুক্তির সহিত নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাণ্ডে ভগবদ্-ভক্তি-নিষ্ঠা বর্ণনা দ্বারা ভগবান্ পরমানন্দ রূপ "তৎ" পদার্থ অবধারিত হইয়াছে। তৃতীয় কাণ্ডে উভয়ের ঐক্য প্রস্ফুটিত করা হইয়াছে। এইরূপে তিন কাণ্ডের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে।"

গীতা মুখ্যতঃ চরিত্রনীতি শাস্ত্র। ইহাতে মানুষের কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার স্বরূপ ও তাহার সহিত সমাজের ও সমগ্র জগতের সম্বন্ধ কি তাহা জানার প্রয়োজন। তাই গীতায় গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সকলও আলোচিত হইয়াছে। এক পরমাত্মাই বিভিন্নরূপে জগতে প্রকাশিত। তাঁহারই শক্তি বাহ্য জগতে রূপগ্রহণ করিয়াছে। তিনিই প্রতি জীবে জীবভূত হইয়াছেন। স্বরূপতঃ জীব ও পরমাত্মা এক। ইহাই গীতার মীমাংসা। এই মীমাংসা গীতা মানুষের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে প্রয়োগ করিয়াছেন।

সৃষ্টির ব্যবস্থা অতিশয় জটিল। পরমাত্মার এক শক্তিই তিন বিভিন্ন গুণে প্রকাশিত। জীব স্বরূপে পরমাত্মার সদৃশ হইলেও, দৃশ্যতঃ এই তিন গুণের প্রভাবাধীন। এই গুণদিগের বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন জীবে অবস্থানের ফলে তাহাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। কিন্তু সকলেই রাগ ও দ্বেষের বশীভূত ; সকলেই বিভিন্ন প্রবৃত্তির অধীন। বিভিন্ন প্রবৃত্তির বশে জীব যে কর্ম্ম করে, তাহার ফল সুদূর প্রসারী। তাহার ফলে তাহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জীবনে সুখ যেমন আছে, দুঃখকষ্টও তেমনি প্রচুর পরিমাণে আছে। শ্রেয়ঃ কি, এই প্রশ্ন মানুষের মনে উঠে। যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই জীবনের লক্ষ্য, তাহাই পরমপুরুষার্থ। যাবতীয় কর্ম্ম শ্রেয়ের অভিমুখী করাই মানুষের কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা প্রেয়ের বিপরীত। যাহাকে আমরা সুখ বলি, তাহা অল্প হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা পুরুষার্থ নহে। যাহা ভূমা তাহাই সুখ। এই ভূমাপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ, তাহাই প্রত্যেক জীবের লক্ষ্য।

বেদে "ইষ্টাপূর্ত্তে"র ব্যবস্থা আছে। দেবোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগ যজ্ঞই ইষ্ট, এবং জীবের সাংসারিক মঙ্গলের জন্য বাপী, কূপ তড়াগাদি খননই "পূর্ত্ত।" ইষ্টা পূর্ত্তের ফলে স্বর্গবাস হয়। সুতরাং সংসারী জীবের তাহাই কর্ত্তব্য। ইহাই কর্ম্মমার্গ। উপনিষদে জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যাগ যজ্ঞ (দ্রব্য যজ্ঞ) বর্জ্জন করিতে বলা না হইলেও তাহাকে ধ্যান-যজ্ঞে পরিবর্ত্তন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।" ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান তপস্যা ও অনশন ব্রত দ্বারা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাকে জানিয়াই "মুনি" হয়। তাহাকে কামনা করিয়া সন্ন্যাসীগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। প্রাচীন কালের বিদ্বান্ গণ সন্তান কামনা করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন "আমরা যখন ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি তখন সন্তান দ্বারা কি করিব?" তাহারা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। (বৃহৎ আরণ্যক ৪।৪।২২)। "ব্রাহ্মণের এই মহিমা অবগত হইলে পুরুষ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না।" (৪।৪।২৩)। অক্ষরকে না জানিয়া যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে কৃপাপাত্র" (বৃ-আঃ ৩,৮।১০)। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে না জানিয়া, তাঁহাকে "না-নার মতো দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। "সর্ব্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম।" ইহাই পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানেই মুক্তি হয়। ইহাই জ্ঞানমার্গ।

উপনিষদে যে ভক্তির কথা একেবারে নাই তাহা নহে। কিন্তু সর্ব্ব উপনিষদে জ্ঞানের মহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় বলা হইয়াছে। গীতার রচনাকালে ঈশ্বর ভক্তির স্রোত এবং

.ক্তিদ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভ করা যায়, এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। .শ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। সেই আনুরক্তির ফলে তাহাতে আত্মসমর্পণ ও .রণাগতি। গীতায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধিত .হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গী বলেন কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী; এই জন্য কর্ম্ম বন্ধের কারণ। সুতরাং মুক্তি কামীর পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ অপরিহার্য্য। গীতা .লেন কর্ম্ম নিজে বন্ধের কারণ হয় না। কর্ম্মের সহিত যে আসক্তি .ক্ত থাকে, তাহা হইতেই বন্ধের উৎপত্তি। আসক্তি যদি না থাকে, কর্ম্মের ফল যদি কামনা না করা যায়, শুধু কর্ত্তব্যবোধে যদি কর্ম্ম .নুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্মের ভাবী কোনও ফল উৎপন্ন হয় .া, এবং তাহা বন্ধেরও কারণ হয় না। কর্ম্ম সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা সম্ভবপর .হে। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করিতে হয়। .র্ম্ম না করিলে দেহ রক্ষাও হইতে পারে না। আবার কর্ম্ম না .রিলেই যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা নহে। কর্ম্ম না করিয়া যে মনে .নে কর্ম্মজন্য বিষয়ের চিন্তা করে, সে মিথ্যাচারী। যিনি আত্মরতি, .াত্মতৃপ্ত, আপনাতে সন্তুষ্ট, তাহার কোনও কিছুরই প্রয়োজন নাই, .াের করণীয়ও কিছু নাই। কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্য তাহারও .র্ম্ম করা কর্ত্তব্য। শ্রেষ্ঠ লোকে যদি কর্ম্ম না করে, ইতর লোকেও করিবে .। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম কৃত হয় প্রকৃতির গুণাদিগের দ্বারা। জীব .কৃতির সঙ্গে (দেহের সঙ্গে) আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া আপনাকে .র্ম্মকর্ত্তা বলিয়া ভাবে। এই অহংকার, এই আমিত্ব যখন যায়, তখন .র্ত্তৃত্ব জ্ঞান থাকে না। নিষ্কাম হইয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করাই .র্ম্মের ফল হইতে মুক্ত হওয়ার কৌশল। কর্ম্ম—যাগ যজ্ঞ ও অন্য কর্ম্ম .্যাজ্য নয়, নিষ্কামভাবে করণীয়। কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম .াই কর্ম্মত্যাগ। অজ্ঞানী আসক্তির বশে যেভাবে কর্ম্ম করে, লোক .গ্রহের জন্য সেই ভাবে কর্ম্ম করিবে অনাসক্ত হইয়া। সকল কামনা .গ করিয়া যখন কেহ আপনাতে তুষ্ট থাকে, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ .। যাহার সকল কর্ম্ম কাম-সংকল্প-বর্জিত, জ্ঞানাগ্নি কর্ত্তৃক তাহার .কর্ম্ম দগ্ধ হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা বন্ধন হয় না। শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞান .সচেষ্ট জন জ্ঞানলাভ করিয়া সংশয়মুক্ত হয়। জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন-.প্রমাদহীন যিনি ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পন করেন, কর্ম্ম তাহাকে .করিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী তিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন .অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না।—লোষ্ট্র, প্রস্তর ও স্বর্ণ সর্ব্বত্রই .ব্রহ্মদর্শন করেন, বলিয়া সকলই তাহার নিকট সমান। নিন্দা ও .শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ তাহার নিকট সমান। তিনি কাম, .রহিত, তাহার চিত্ত সংযত। এতাদৃশ দ্বন্দ্বরহিত লোকের চতুর্দ্দিকেই .বর্ত্তমান—তিনি নির্ব্বাণের মধ্যে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বভূতের .র জন্য কর্ম্ম করেন। ইহাই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়।

.হার পরে ভক্তির কথা। জ্ঞানী নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া যদি .র্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভক্তির স্থান কোথায়? আর করিবই বা কাহাকে? কি জন্যই বা করিব?

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যিনি সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগম, অচিন্ত্য কুটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষরের উপাসনা করেন, তিনি অক্ষররূপী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। আর যে ভক্ত পরমাত্মায় মনস্থির রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত মঙ্কে তাহার উপাসনা করেন তিনিও পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা সহজ নহে, তাহা অধিকতর ক্লেশদায়ক, অতি কষ্টে অব্যক্ত অক্ষয়কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া অন্য অবলম্বনহীন হইয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, ঈশ্বর তাহাকে মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন। তিনি শরীরপাতের পরে ঈশ্বরের মধ্যে গমন করেন। ভক্তি দ্বারা মুক্তি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। সুতরাং সাধনায় ভক্তির স্থান আছে।

ভক্তি অক্ষরকে করা যায় না। কেননা অক্ষর অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য। যাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তাহাকে ভক্তি করা অসম্ভব। ভক্তির পাত্র পুরুষোত্তম পরমাত্মা—যিনি গীতার বক্তা। যাহারা সতত যুক্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করেন, তিনি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ (জ্ঞান) দান করেন, তিনি তাহাদের অজ্ঞান নাশ করেন। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য কাহারও ভজনা না করিয়া তাঁহার ভজনা করে, তাহা হইলে সে সাধু হয়, ধর্ম্মাত্মা হয়, শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার ভক্তের বিনাশ নাই। অনন্য হইয়া যে তাঁহার উপাসনা করে, তিনি তাহার যোগ ক্ষেম বহন করেন—অপ্রাপ্ত দ্রব্য দান করেন, এবং প্রাপ্ত দ্রব্য রক্ষা করেন। তিনি যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, তিনি সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্ব জীবের সুহৃদ। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে যাহাই দেওয়া যায়—পত্রপুষ্প ফল ও জল তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি জগতের পিতা, ধাতা ও পিতামহ। তিনি জীবের গতি, ভর্ত্তা প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ সুহৃদ্। এ বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই তিনি।

যিনি সকলের পিতা, যিনি সর্ব্বজীবের সুহৃদ, যিনি শরণ্যাগতের যোগ ক্ষেম বহন করেন, যিনি অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞানদান করেন, তাঁহার প্রতি ভক্তি স্বতঃই সঞ্জাত হয়। কিন্তু তাঁহাকে না জানিলে ভক্তি হয় না। সুতরাং ভক্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে তাঁহাকে ভক্তি করে সে তাঁহাকে সর্ব্বলোকের সুহৃদ জানিয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত হয়। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত ভক্তির বিরোধ নাই, বরং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

সাধারণ মানুষ পুরুষোত্তমের অংশ হইলেও প্রকৃতির অধীন এবং প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল সুখ, দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে। সে জানে না যে সে অব্যয়, অমৃত, শাশ্বত, ঐকান্তিক সুখের আধার পুরুষোত্তমের অংশ, এবং সে স্বকীয় চেষ্টায় ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তমের পরাশান্তি ও সুখলাভে সক্ষম। জ্ঞানলাভের পরে চিত্তসমাধান করিয়া সে প্রথমে ক্ষর পুরুষকে অতিক্রম করে এবং অক্ষর পুরুষের স্পর্শ লাভ করে। সংবিদের এই অবস্থায় সে পরিণামী জগতের অন্তরালে অবস্থিত পুরুষোত্তমের নিষ্ক্রিয় রূপের

সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সুখ দুঃখের অতীত এক শান্তি পূর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু পুরুষোত্তমের সে রূপ তাঁহার আনন্দময় রূপ নহে—সর্ব্বভূতের সুহৃদ প্রেমমূর্ত্তি নহে। তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্ব কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া এবং আপনাকে একান্তভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া মানুষ তাঁহার স্পর্শ লাভ করিতে পারে ও জন্মমৃত্যু মুক্ত হইয়া চিরকাল তাঁহার ক্রোড়ে বাস করিতে ও অক্ষয় সুখ ও শান্তির অধিকারী হইতে পারে। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ লইলে তিনি শরণাগতকে সর্ব্ব পাপ হইতে রক্ষা করেন। যে যে ভাবে তাঁহাকে পাইতে চায়। তিনি সেই ভাবেই তাঁহার কামনা পূর্ণ করেন। ইহাই গীতায় কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়।

গীতায় চরিত্রনীতি

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি মানব জীবনের তিনটি প্রধান ভাগ—জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের তিনটি উপায়। (কেহ জ্ঞান পথের পথিক হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য চেষ্টিত, কেহ কর্ম্মের পথে, কেহ ভক্তির পথে জীবনের পূর্ণতা সম্পাদনে সচেষ্ট। গীতা এই তিনপথের কোনটিকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন নাই। এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতা বলিয়াছেন গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে মানুষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান, বিজ্ঞান (কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদিকর্ম্মে কুশলতা, ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বের অনুভব), আস্তিক্য (পরলোকে বিশ্বাস) ইহাই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম শৌর্য্য, তেজঃ ধৃতি, (ধৈর্য্য), দাক্ষ্য (দক্ষের ভাব—কৌশল), যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বর ভাব (প্রভুশক্তি-প্রকটন)। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম। শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম অন্যের পরিচর্য্যা। প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্ম্মে রত থাকিয়াই সিদ্ধিলাভ করে। যাহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া লোকে সিদ্ধিলাভ করে। নিজের স্বাভাবিক কর্ম্ম যদি বিগুণও হয়, তাহা হইলেও অন্য বর্ণের কর্ম্ম অপেক্ষা তাহা শ্রেয়স্কর। কেন না স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম করিয়া কেহ পাপ অর্জ্জন করে না। স্বভাবজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। কিন্তু স্বভাবজকর্ম্ম কি, তাহা জানিবার উপায় কি? গীতার সময় বর্ণধর্ম্ম জাতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই যে যে জাতিতে জাত, সেই জাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই তাহার স্বভাবজ বলিয়া গণ্য হইতে। কিন্তু ব্যাধের বংশে যদি কেহ ব্রাহ্মণের গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাকেও কি ব্যাধের কর্ম্ম করিতে হইবে? এরূপ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে। তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য সম্মানও সর্ব্বকালেই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু স্ববর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনই সাধারণ নিয়ম ছিল। সমাজ স্থিতির জন্য গীতা তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

গীতায় দৈব ও আসুরী নামে দ্বিবিধ সম্পদের ব্যাখ্যা আছে। অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি (চিত্তের প্রসন্নতা) জ্ঞান-যোগে ব্যবস্থিতি (আত্মজ্ঞান লাভে পরিনিষ্ঠা) দান, দম (বাহ্যইন্দ্রিয়ের সংযম) যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ), তপ, আর্জ্জব (সরলতা), অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন (পরদোষ-প্রকাশ বর্জ্জন), ভূতে দয়া, অলোলুপ্ত (লোভের অভাব), মার্দব (অক্রূরতা, হ্রী (অকার্য্যে লজ্জা), অচাপল (অপ্রয়োজনে বাক্য ও ক্রিয়া বর্জ্জন), তেজঃ ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ (পরজিঘাংসা রাহিত্য)। নাতিমানিতা (অভিমানহীনতা) এই সকল দৈবী সম্পদ। দম্ভ (ধর্ম্মধ্বজিত্ব), দর্প (ধন ও স্বজনাদি নিমিত্ত আপনাকে বড় বলিয়া ধারণা,) অভিমান (আপনাতে পূজ্যত্বের আরোপ), ক্রোধ, পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা) ও অজ্ঞান আসুরী সম্পদ। দৈবীসম্পৎ হইতে মোক্ষ এবং আসুরী সম্পদ হইতে বন্ধ হয়। আসুর প্রকৃতি লোকের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি নাই। শৌচ, সদাচার ও সত্য তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ ও অনীশ্বর বলে। এবং প্রাণিদিগকে কামপ্রযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গের ফল বলিয়া মনে করে। দুষ্পূরণীয় কামনার পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা দম্ভ, মান ও মদের সহিত অশুভ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া অশুচি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা যাবজ্জীবন অপরিমেয় বিষয়ার্জ্জন ও রক্ষণ চিন্তায় বিব্রত থাকে এবং বিষয় ভোগকে পুরুষার্থ মনে করে। শত আশাপাশে বদ্ধ কাম ক্রোধপরায়ণ হইয়া কাম-ভোগের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার।

গীতা বলেন যে শাস্ত্রবিধি বর্জ্জন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় সে কখনই সিদ্ধি, সুখ ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে না। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। যাহারা শাস্ত্রীয় মার্গ বর্জ্জন করিয়া কাম-রাগ সমন্বিত এবং দম্ভ অহংকার-সংযুক্ত হইয়া ঘোর তপস্যা করে, এবং অতিশয় কঠোর আচরণ দ্বারা শরীরস্থ ভৌতিক পদার্থগুলিকে বিশুষ্ক করিয়া আত্মাকেও নিপীড়িত করে, তাহারা আসুরী নিষ্ঠাসম্পন্ন।

ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্যবোধে শাস্ত্রানুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক। ফলকামনা করিয়া কিম্বা যশোলোভে যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা রাজস। বিধিহীন, অন্নদানবিহীন দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ তামস।

শারীর বাঙ্ময় ও মানসভেদে তপ ত্রিবিধ। দেব-দ্বিজ-গুরু ও পণ্ডিতের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরতপ। অন্যের দুঃখের অনুৎপাদক সত্য, প্রিয় ও হিতবাক্য বেদভ্যাস বাঙ্ময়তপ। মনের প্রসাদ (বিষয়চিন্তা-ব্যাকুলতা শূন্যতা), সৌম্যত্ব (সর্ব্ব-লোকহিতৈষিতা), মৌন, আত্মনিগ্রহ (বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার) ও ভাব-সংশুদ্ধি (কাম-ক্রোধ-লোভাদি মল-নিবৃত্তি) মানসতপ। এই ত্রিবিধ তপস্যা যখন ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ও শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাহা সাত্ত্বিক। মূঢ়তার বশে পরের বিনাশের উদ্দেশ্যে শরীরের পীড়া জন্মাইয়া যে তপ কৃত হয় তাহা তামস। আর সৎকার, সম্মান ও পূজা লাভের জন্য যে তপ কৃত হয়, তাহা রাজস।

কর্ত্তব্যবোধে অনুপকারী লোককে উপযুক্ত কালে ও স্থানে যে দান করা যায় তাহা সাত্ত্বিক। প্রত্যুপকার কিংবা ফল কামনা করিয়া মনের কষ্টের সহিত যে দান করা হয়, তাহা রাজস, এবং দেশকাল বিবেচনা না করিয়া অপাত্রে অহংকার ও অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয়, তাহা তামস।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ জল-প্রপাত ফটো : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"আমার সেই সময়কার আরও কিছু কিছু কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে সন্তোষের মাকে, আমার সইমাকে। আমার শৈশবজীবনের প্রধান একটা অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে আমরা গল্প শুনিতে যাইতাম। সাধারণত দিদিমারাই নাতিদের গল্প বলেন, আমার দিদিমা কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া যাইতেন, মনে হইত তিনি বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। মা তাঁহাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া বিছানায় বসাইয়া দিতেন। তিনি বিছানায় বসিয়া আপন মনে নিজের সহিতই কথা কহিতেন। কি বলিতেন বুঝিতাম না, যাহাদের নাম করিতেন তাহাদেরও চিনিতাম না। অঘোর ঠাকুরপো, মহেশ মামা, মহেন্দ্রদাদা এমনি সব কত নাম। খেতু মামাকে একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম, "সন্ধ্যের সময় বৌদি অতীতে ফিরে যান"। হয়তো তাঁহার যৌবনের দিনগুলি মনে পড়িত। সেই সময় যাহারা তাঁহার প্রিয় ছিল, যাহারা বহুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় পাইয়া বসিত। তাহাদেরই সহিত তিনি গল্প করিতেন। আমরা কাছে গেলে বিরক্ত হইতেন। তাই আমরা সন্ধ্যার সময় সইমার কাছে গিয়া আশ্রয় লইতাম। তিনি আমাকে, সন্তোষকে এবং পাড়ার আরও দুই চারিজন ছেলেমেয়েকে রোজ গল্প বলিতেন। গ্রীষ্মকালে আমাদের আড্ডা বসিত রান্নাঘরের ছোট দাওয়াটিতে, শীতকালে রান্নাঘর সংলগ্ন ভাঁড়ার ঘরে। সইমা রাঁধিতে রাঁধিতে আমাদের গল্প বলিতেন। সে যে কত রকমের গল্প। পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, সুখুদুখুর গল্প। এসব ছাড়া গ্রামের অনেক পুরাতন সত্য গল্পও আমাদের বলিতেন তিনি। গল্প বলিবার চমৎকার একটি বিশেষত্ব ছিল তাঁহার। এমন ভাবে গল্প বলিতেন যেন সমস্ত ঘটনাটা আমাদের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিত। সিনেমা দেখিয়া ছেলেমেয়েরা আজকাল যে আনন্দ পায় আমরা তাহার চেয়েও বেশী আনন্দ পাইতাম, কারণ কল্পনার সিনেমায় আমরা মনে মনে যে ছবি সৃষ্টি করিতাম বাস্তবের সিনেমায় তাহা সম্ভবে না। একই গল্পকে কেন্দ্র করিয়া আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছবি দেখিতাম। সইমার গল্পস্রোত কখনও মন্থর গতিতে চলিত, কখনও দ্রুতগতিতে। কখনও জোরে জোরে বলিতেন, কখনও চুপি চুপি। গল্পের প্রতিটি চরিত্রের সহিত সইমা যেন একাত্ম হইয়া যাইতেন। রাক্ষসীর কথা যখন বলিতেন, তখন তিনিই যেন রাক্ষসী, পরীর কথা যখন বলিতেন তখন তিনিই যেন পরী। আমরা রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া শুনিতাম। মাঝে মাঝে আমাদের গল্প-শোনায় বাধা পড়িত। সই-মা মাঝে মাঝে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন। সই-মার রান্নার খুব সুখ্যাতি ছিল। তাই আশপাশের গ্রামে ভোজকাজের বাড়িতে সইমার ডাক পড়িত।

গরুর গাড়ি, কখনও কখনও বা পাল্‌কি পাঠাইয়া তাঁহাকে তাহারা লইয়া যাইত। কয়েকটি বিশেষ রান্নায় সইমার খুব নাম ছিল। লাউঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, সুক্তো, বড়ির ঝাল, বেগুনের টক প্রভৃতি কয়েকটি নিরামিষ রান্নায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজকাল উৎসবের বাড়িতে লোকে নামকরা গায়ক-গায়িকাকে যেমন সসম্মানে লইয়া

যায়, সেকালে সইমাকে ঠিক তেমনি সসম্মানে লোকে দুই একটা তরকারি রাঁধিবার জন্য লইয়া যাইত। গায়ক-গায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গান শুনাইবার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করেন, দক্ষিণার লোভেই অনেক সময় তাঁহারা আসেন কিন্তু সইমা যাইতেন স্নেহের আকর্ষণে, হয়তো প্রশংসার লোভ একটু থাকিত। আমি জানি পাঁচ ক্রোশ দূরের একটি গ্রামে একবার একজনের অসুখের পর অরুচি হইয়াছিল, কোন খাবারই তাহার মুখে রুচিত না। সইমার সহিত তাহাদের সামান্য একটু আত্মীয়তা ছিল। রোগীর মা স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'সন্তোষের মা, তুমি একবার চল। তোমার হাতের রান্না খেলে হয়তো অতুলের অরুচি ঘুচবে। কোবরেজ মশাই তরকারিতে মশলা দিতে বারণ করেছেন। তরকারিতে মশলা না দিয়ে তরকারির স্বাদ আমরা তো করতে পারি না। তুমি পার। বিনা মশলায় চমৎকার রাঁধ তুমি। তোমাকে যেতে হবে।' সইমা সত্যই তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন এবং তাহাদের বাড়িতে দশ-পনর দিন থাকিয়া অতুলের অরুচি সারাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সন্তোষও তাহার মায়ের সহিত গিয়াছিল, আমারও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার মা আমাকে যাইতে দেন নাই। সইমার তখনকার চেহারাটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি আমার মায়ের সমবয়সী ছিলেন। তাঁহার যেমন স্বাস্থ্য ছিল, তেমনি রং। আমার মা শ্যামবর্ণা ছিলেন। কিন্তু সইমা ছিলেন ধপধপে ফরসা। আগুনের তাত বা রোদের তাত লাগিলে মুখখানা সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিত। ছিপছিপে দোহারা গড়ন ছিল তাঁহার। কপালের ঠিক মাঝখানটিতে ছিল নীল রঙের ছোট্ট একটি উল্‌কি, মনে হইত টিপ পরিয়া আছেন। তখন সন্তোষ ছাড়া তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। আমরা শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহার উপর্য্যুপরি তিনটি কন্যা হয়—"

কুমারের এই অংশটুকু পড়িতে বড় ভাল লাগিতেছিল। দিদিমা যৌবনে যে এত রূপসী ছিলেন তাহা সে জানিত না। সে যখন দিদিমাকে দেখিয়াছিল তখন তিনি অতি-বৃদ্ধা, সোজা হইয়া হাঁটিতে পর্য্যন্ত পারিতেন না, কোমর ভাঙিয়া গিয়াছিল।···চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল কয়েকদিন পূর্ব্বে যে মহিষটা নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল সে না কি সমীপবর্ত্তী বাহী নদীর জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। কুমার উঠিয়া পড়িল এবং নদীতীরে গিয়া দেখিল সত্যই তাই। এটি মহিষ নয়, মহিষী। কিছুদিন পূর্ব্বে কুমার এটিকে কিনিয়াছিল। এখনও কিন্তু তেমন পোষ মানে নাই, সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে।

কুমার নদীতীরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—যমুনী, আয়, আয়, আঃ আঃ আঃ। কুমার প্রত্যাশা করে নাই যে যমুনী আসিবে, কিন্তু আসিল। নদীতে তেমন জল ছিল না, বেশীর ভাগই কাদা। সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া যমুনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কুমার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। একটা চাকর দড়ি লইয়া পিছন দিক হইতে তাহাকে বাঁধিবার জন্য গুঁড়ি মারিয়া আসিতেছিল। কুমার তাহাকে বারণ করিল।

"ওকে এখন বাঁধতে হবে না। এইখানেই চরুক—"

পাশেই একটা জমিতে প্রচুর গম আর যব হইয়াছিল। কুমারেরই জমি। যমুনী সেই ক্ষেতে ঢুকিয়া মনের আনন্দে খাইতে আরম্ভ করিল। কুমার বাধা দিল না। মহিষটা এমনভাবে ফসল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া চাকরগুলার বুক করকর করিতেছিল, কিন্তু মালিক যখন কিছু বলিতেছে না, তখন তাহারাও আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। কুমার পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া খাতায় মন দিল। দেখিল বাবা দিদিমার কথা আর লেখেন নাই, অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়াছেন।

"···সেই সময়ের আর একটি লোকের কথা মনে পড়িতেছে, গোলক পণ্ডিতকে, যিনি আমার এবং সন্তোষের হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন। গোলক পণ্ডিত কতদূর লেখা-পড়া জানিতেন জানি না, কিন্তু তিনি যে ভাল শিক্ষক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকও খুব ভাল ছিলেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সাধারণত যেরূপ উগ্র ও নিষ্ঠুর হইতেন (সাহেবগঞ্জের দীনু পণ্ডিত যেমন ছিলেন, পরে সাহেবগঞ্জে গিয়া এই লোকটির কবলে আমাকে পড়িতে হইয়াছিল) গোলক পণ্ডিত মোটেই সে রকম ছিলেন না। পাঠশালা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও তাহার ছিল না, ছাত্রসংখ্যাও যে খুব বেশী ছিল তাহা নয়। সন্তোষ, জীবু এবং আমি এই তিনজন মাত্র তাঁহার ছাত্র ছিলাম।

তাঁহার ছিল ছোট একটি মুদির দোকান। চাল, ডাল, নুন, মশলা প্রভৃতি তাহাতে থাকিত। দোকানের সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দায় আমরা তিনজন বসিয়া তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতাম। শিক্ষাপদ্ধতিটা এই প্রকার ছিল। আমাদের প্রথমেই গিয়া গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিতে হইত। তাহার পর আমরা চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইতাম। তিনি সরস্বতীর সংস্কৃত স্তবটি এক এক লাইন করিয়া বলিয়া যাইতেন, আমাদের তাহা আবৃত্তি করিতে হইত। ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতি শুভ্রকান্তিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতীর ধ্যান, প্রণামমন্ত্র, স্তোত্র সমস্তটা বলিবার পর পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া বারান্দার উপর খড়ি দিয়া অ আ বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিতেন। আমরা তাহার উপর খড়ি দিয়া দাগা বুলাইতাম। ক্রমশ অক্ষরগুলি স্থূলাকৃতি হইয়া উঠিত, আমাদের হাত মুখ জামা কাপড়ও খড়ির গুঁড়ায় শাদা হইয়া যাইত। তখন পণ্ডিত মহাশয় হুকুম দিতেন—"এইবার ডাল দিয়ে সাজাও—"

"কি ডাল দিয়ে সাজাব পণ্ডিত মশায়"

"মশুর ডাল দিয়ে সাজাও আজ"

আমরা তখন মশুর ডাল অক্ষরগুলির উপর নিপুণভাবে সাজাইতাম। দেখিতে দেখিতে মশুর-ডালে-লেখা 'অ' আ' হইয়া যাইত। নিজেদের কৃতিত্বে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। বৈচিত্র্য করিবার জন্য প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ডাল ব্যবহার করা হইত। ডাল আমরা কিনিতাম পণ্ডিত মহাশয়ের দোকান হইতেই। পাঁচটি ছোট ছোট মাটির-ভাঁড়ে পাঁচ রকম ডাল থাকিত। ইহার জন্য আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে সবসুদ্ধ চার পয়সা দিতাম। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে নূতনত্বের আমদানি করিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাদের আনন্দ ও বিস্ময় বৃদ্ধি করিতেন। ডালের বদলে কোনদিন তেঁতুল বিচি, কোনদিন বা তুলার বিচি আনিয়া দিতেন। এ সবের জন্য আলাদা পয়সা দিতে হইত না। একবার কোথা হইতে তিনি কুঁচফল আনিয়া আমাদের বলিলেন, "আজ এইগুলো দিয়ে সাজাও দিকি—"। সেদিনকার উত্তেজনা আজও যেন অনুভব করিতেছি। কুঁচফলের অ-আ-গুলি আজও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। লেখা হইয়া গেলে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের ধারাপাত ঘোষাইতেন। শতকিয়া হইতে শুরু হইত। দোকানের কাজ করিতে করিতেই পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়াইতেন। খরিদ্দার আসিলেও আমাদের পড়া বন্ধ হইত না। পড়াইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় কোন বেতন লইতেন না, আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে কেবল তাঁহার খাইবার নিমন্ত্রণ হইত। খাওয়ার খুব একটা বিশেষ ঘটা বা আয়োজন হইত তাহা নয়, সাধারণ ডাল-ভাত-তরকারিই হইত, বিশেষত্বের মধ্যে হইত কেবল পায়েস। আহারের শেষে খুব বড় একটি জামবাটি-পূর্ণ পায়েস পণ্ডিত মহাশয় পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করিতেন। সেদিন তিনি পানও খাইতেন। অন্যদিন তাঁহাকে পান খাইতে দেখিতাম না। ঠানদির বাড়িতে আহারাদির পর তাঁহাকে হরিতকির টুকরা মুখে দিতে দেখিয়াছি। এই ঠানদিও একটি চমৎকার চরিত্র। পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ির কাছেই ঠানদির বাড়ি ছিল, ঠানদির বাড়িতে দুইবেলা তাঁহার আহারাদি সম্পন্ন হইত। ঠানদির সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল জানি না, সম্ভবত রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। শুনিয়াছি গ্রামের কাহারও সহিত ঠানদির রক্তের সম্পর্ক ছিল না, অথচ তিনি গ্রামের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রামের একধারে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে একা তিনি বাস করিতেন। তাঁহার সেই কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে যে জমিটুকু ছিল তাহা নিজের হাতেই তিনি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে কত রকম তরিতরকারিই না হইত। লাউ কুমড়া ঝিঙ্গা ধুঁধুল, বেগুন, নানারকম শাক, লঙ্কা, পুদিনা সব ছিল। তাঁহার বাড়ির চটানের একধারে একটা পিয়ারা গাছ, আর একধারে একটা কুলগাছও ছিল। অজস্র ফলিত। কুলগাছে ঢিল মারিলে ঠানদি চটিয়া যাইতেন, লাঠি হাতে বাহির হইয়া আসিতেন—"কে রে মুখপোড়া, গাছে ঢিল মারছিস কে। তোদেরই তো দেব, তোদের গর্ভেই তো সব যাবে, ঢিল মেরে এখন থেকে কাঁচা কুলগুলোকে নষ্ট করছিস কেন। ওই কোষো কুল খেলে কি বাঁচবি, কেসে কেসে মরবি যে"। ঢিল-নিক্ষেপ-কারীকে কোনদিন তিনি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু গাছে ঢিল পড়িলেই লাঠিটি হাতে লইয়া তিনি বাহির হইতেন, উল্লিখিত উক্তিটি সক্রোধে উচ্চারণ করিতেন, এদিক-ওদিক চাহিয়া

মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহার পর মুচকি হাসিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। ওই মুচকি হাসিটি হইতে বোঝা যাইত যে তাঁহার রাগটা মেকি। দুষ্টু ছেলেরা যে তাঁহাকে ভয় করে, তাঁহার সাড়া পাইলেই যে ছুটিয়া পালায়, ইহাতেই তিনি খুশী। ইহা লইয়া তিনি গর্ব্বও করিতেন। তাঁহার কাছে কেহ যদি বলিত অমুক ছেলেটা এই বদমায়েসি করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সগর্ব্বে উত্তর দিতেন, 'কই, আমার সামনে করুক দিকি'। তাঁহার বদান্যতাও ছিল। নিজের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের খাওয়ার মতো তরি-তরকারি রাখিয়া বাকিটা তিনি সকলকে বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার বাগানের তরি-তরকারি খায় নাই এমন লোক শঙ্করা গ্রামে খুব কমই ছিল, যদিও শেষ পর্য্যন্ত শঙ্করা গ্রামের লোকেরা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই।

পণ্ডিত মহাশয় দুইবেলা তাঁহার বাড়িতে আহার করিতেন। তিনি রান্নাবাড়া সব করিতেন স্বহস্তে। ইহার জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে নগদ টাকা কড়ি কিছুই দিতে হইত না। তিনি তাঁহার দোকান হইতে চাল ডাল মশলা প্রভৃতি দিতেন, একটু বেশী বেশী করিয়া দিতেন যাহাতে ঠানদিরও কুলাইয়া যায়। ঠানদির চেহারা অদ্ভুত ছিল। মাথার চুল বেটাছেলের মতো করিয়া ছাঁটা। কাঁচা-পাকা চুল। মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি। ঠানদি একটু স্থূলকায়া ছিলেন, হাঁটিবার সময় লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটিতেন। গায়ে কিন্তু শক্তি ছিল। বাগানের কাজকর্ম্ম, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি নিজের হাতেই করিতেন তিনি। উঠানের একধারে ছোট একটি কূপ ছিল, সেই কূপ হইতে নিজের হাতেই তিনি জলও তুলিতেন। কখনও কাহারও পুকুরে জল আনিতে যাইতেন না। মাঝে মাঝে তাহার কূপটি ঝালাইবার জন্য গ্রামান্তর হইতে লোক আসিত। পণ্ডিত মহাশয় মজুরি স্বরূপ তাহাদের চার আনা পয়সা দিতেন, আর ঠানদি তাহাদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। এই লোকগুলি আমাদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তাহারা কুয়ার ভিতর দড়ি, ঝুড়ি বালতি প্রভৃতি নামাইয়া দিত, তাহার পর একজন নামিয়া যাইত, আর একজন উপর হইতে বালতি করিয়া জলকাদা প্রভৃতি তুলিতে থাকিত। একবার মনে আছে প্রকাণ্ড একটা ব্যাংও উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সেই লোকগুলি থাকিত আমরা পাড়ার ছেলেরা ভীড় করিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতাম। যে কুয়ার ভিতর জুজুবুড়ি আছে, কুয়ার পাড়ে ঝুঁকিয়া কুক্ করিয়া শব্দ করিলে যে জুজুবুড়ি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেয় আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, সেই জুজুবুড়িকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকগুলা কুয়ার ভিতর নামিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। সত্যই আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিত না। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মণডিহির নবরত্ন মন্দির

শ্রীউমাপদ রায়

বীরভূম জেলার, নানুর থানার অধীন, ব্রাহ্মণডিহি গ্রামখানি অতি প্রাচীন। এই গ্রামে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের একটী অতি প্রাচীন মন্দির আছে। এই ধরণের মন্দিরগুলির মধ্যে একমাত্র এই মন্দিরটিকে বীরভূমের জয়দেবের মন্দিরের সহিত তুলনা করা চলে। মধ্যযুগে স্থাপত্য বিভায় বাঙ্গালী কিরূপ উন্নতি লাভ কারয়াছিল তাহা আমাদের দেশের শিল্পী কর্ত্তৃক ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের নির্ম্মিত আগ্রার তাজমহল সহ কোনারকের সূর্য্যমন্দির, প্রভৃতি এই প্রকারের মন্দিরগুলি তাহার জলন্ত নিদর্শন। এই মন্দির ও প্রাসাদগুলি বাঙ্গালার স্থাপত্য প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাজেই স্থাপত্য শিল্পে বাঙ্গালীর দান যে কত বড় তাহা এই সমুদয় মন্দির দর্শনে সহজে উপলব্ধি হয়। ব্রাহ্মণডিহির এই অতি প্রাচীন মন্দির কত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার মৌখিক ইতিহাস ছাড়া লিখিত ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। মন্দিরের পাদমূলে যে সব তারিখ ইষ্টকের উপর লিখিত ছিল মজাফরপুরের ভূমিকম্পের বৎসর এই মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণের একটা চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাহাও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। তবে আরকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্ত্তৃক এই মন্দিরের ইষ্টক সুপরিক্ষিত হইবার পর মন্দিরটী চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নিণাত হইয়াছে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের মন্দির সংস্কার বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ এই মন্দির সংলগ্ন চারিটী শিবালয় ও একটী কালীমন্দির পরিদর্শন করিতে দুই তিনবার ব্রাহ্মণডিহি গ্রামে আসেন। গ

১১।৩।৫২ তারিখ আরকিওলজিকাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মাননীয় শ্রীযুক্ত টি, এন, রামচন্দ্রম্ এম, এ, ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ চাটার্জ্জি এ, এস, আই, ই, টি এই মন্দিরগুলির মধ্যে নবরত্ন মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হন এবং বাকী মন্দিরগুলি ত্যাগ করিয়া এই নবরত্ন মন্দিরটিকে সংরক্ষিত করিতে মনস্থ করেন। যাহাতে মন্দিরটি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হয় তন্নিমিত্ত আরকিওলজিকাল্ ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর্ বাহাদুরের নিকট তাঁহাদের মন্তব্য প্রেরণ করেন। মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে এই মন্দিরটী সংরক্ষিত করিবার যোগ্য বিবেচনায় মন্দিরের বর্ত্তমান সম অংশের মালিক শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়কে মন্দিরটী ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা উভয়ে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি না করিয়া মন্দিরটী ভারত-সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ সীমানায় নিকর জমির মালিক শ্রীউমাপদ রায় শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় শ্রীমুক্তিপদ রায় ও শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়কেও তাঁহারা এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দশ ফুট করিয়া জমি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। উপরি লিখিত ব্যক্তিগণ সানন্দে ঐ পরিমাণ জমি ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলে ইণ্ডিয়া গেজেটে তাহা প্রকাশিত হয়। অনন্তর গত ইং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে আরকিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টের ওভারশিয়ার শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেনগুপ্তকে ব্রাহ্মণডিহি গ্রামে পাঠাইয়া দেন এবং স্থানীয় রাজমিস্ত্রী ও মজুরগণের সাহায্যে ঐ মন্দিরের ভগ্ন চূড়াসহ অন্যান্য ভগ্ন অংশগুলির কতক অংশ মেরামত হয় ও একতলা হইতে তিনতলা পর্য্যন্ত সিঁড়িগুলি প্রস্তুত হয় এবং মন্দিরটী ঐ সময় হইতেই ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হয়। মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। নবাব আলিবর্দ্দির বহুপূর্ব্বে এই গ্রামে প্রতাপ নারায়ণ রায় ও রুদ্রনারায়ণ রায় বাস করিতেন। তাঁহারা তৎকালীন এই গ্রামের জায়গীরদার ছিলেন। তাঁহাদের অবস্থাও সেই সময়ে খুব ভাল ছিল। শুনা যায় এই গ্রামের আদায়ী কর রাজধানীতে পাঠাইবার জন্য তাঁহাদের দুইটী হাতী ছিল। একদিন মধ্যাহ্নকালে এক সন্ন্যাসী রুদ্র নারায়ণের গৃহে অতিথি হন। আহারের সময় ঐ সন্ন্যাসী রুদ্র নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমাকে যে অন্ন প্রদান করা হইতেছে তাহা ভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত কিনা?" ইহাতে রুদ্র নারায়ণ বলেন, "আমার বাড়ীতে নারায়ণ শিলা বা অন্য কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। আপনাকে অনিবেদিত অন্ন দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ঐ সন্ন্যাসী অন্নগ্রহণ না করিয়া চলিয়া যান। এই ঘটনায় রুদ্রনারায়ণ দারুণ মনোকষ্ট অনুভব করেন এবং বাড়ীতে লক্ষ্মী নারায়ণ শিলা, অন্নপূর্ণা, ও শ্রীধর প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে, অচিরে ব্রাহ্মণডিহি গ্রামে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী ত্রিতল নবরত্ন মন্দির, একটি শ্যামা মন্দির, একটী দুর্গামন্দির ও একটি দোল-মন্দির নির্ম্মিত হয়। উল্লিখিত মন্দিরগুলির মধ্যে ঐ নবরত্ন মন্দিরেই, লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীধর, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলাদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও একমাত্র দোলমন্দির ছাড়া অন্যান্য মন্দিরগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রতাপনারায়ণ রুদ্রনারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে শেষ বংশধর কেশবচন্দ্র রায় ও জগদীন্দু নারায়ণ রায়। ইহাদের মধ্যে প্রথমের কন্যা সন্তান থাকায় ও দ্বিতীয় নিঃ সন্তান থাকায় দৌহিত্র সূত্রে প্রাপ্ত শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় ও সেবাইত সূত্রে প্রাপ্ত, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় বর্ত্তমানে ঐ মন্দিরের বিগ্রহগুলির এবং কালী ও দুর্গা পূজার সেবাইত হইয়াছেন। তাঁহাদের অচলা ভক্তির গুণে ঐ সমস্ত বিগ্রহগুলির পূজা এবং শ্যামা পূজা ও দুর্গাপূজা আজিও যথারীতি হইয়া আসিতেছে। নবরত্ন মন্দিরটী ভগ্ন হওয়ায় ও মন্দির মধ্যস্থ লক্ষ্মীনারায়ণশীলা অপহৃত হওয়ায় লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ভিন্ন শ্রীধর, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি অন্যান্য বিগ্রহগুলি ব্রাহ্মণডিহি সরস্বতী চতুষ্পাটীর অধ্যাপক ও ইঁহাদের পুরোহিত শ্রীউমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কাব্যরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার বিষ্ণু মন্দিরে রক্ষিত হইয়া আজিও পূজা অর্চ্চনা পাইয়া আসিতেছেন। বাদশাহ আকবর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশ জয় করেন। তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব সচিব তোড়র মল্লের সহায়তায় সমগ্র বাঙ্গালা দেশ উনিশ সরকার
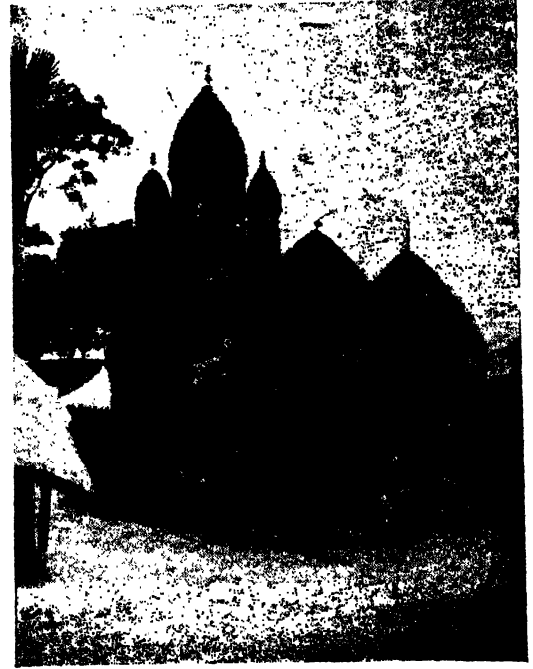
নবরত্ন মন্দির—ব্রাহ্মণডিহি

(ফটো—আরকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সৌজন্যে)

ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। ৬৮২ পরগণার মধ্যে ফতেসিং পরগণা অন্যতম। ব্রাহ্মণডিহি গ্রামখানি এই পরগণার অন্তর্গত। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে যে মতভেদ ছিল, তাহাও মন্দির সংরক্ষণ বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের ইষ্টক পরীক্ষার পর চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রকারে এই গ্রামের প্রাচীন নবরত্ন মন্দিরটীকে ভারত গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে সংরক্ষিত করিয়া ও প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, প্রাচীন নবরত্ন মন্দিরটী সম্পূর্ণরূপে মেরামত হইলে পর যাহাতে মন্দির মধ্যস্থ বিগ্রহগুলি ঐ মন্দিরে রক্ষিত হইয়া সেবা-পূজার অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা হইলে ঐ মন্দির-সংরক্ষণ সার্থক হইবে।

মোহিতলালের পত্র-সাহিত্য

আজহারউদ্দীন খান্

বাংলা-সাহিত্যের পাতায় গভীর পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ শক্তিশালী কবি সমালোচক মোহিতলালের নাম একটি উজ্জ্বল নাম হলেও প্রতিভার তুলনায় তিনি আশানুরূপ খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা আমাদের কাছ থেকে আজও পান নি। তিনি কবির চেয়ে একজন 'দুর্মুখ' প্রবন্ধকার হিসেবে আমাদের কাছে অধিক পরিচিত। তাঁর কবিখ্যাতি তাঁর সমালোচনা-প্রতিভার উজ্জ্বল প্রখরতার কাছে একটি জোনাকির ক্ষীণ আলোর মত স্পন্দমান। একেলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠার্থীদের কাছে মোহিতলালের সমালোচনা-সত্তার হয়ত একটু নাড়াচাড়া হয় তাও আবার সবার কাছে নয়, কেননা যাঁদের পাঠ্যের মধ্যে বাংলা থাকে তাঁরাই তাঁকে পরীক্ষা-পাশের জন্যে কিছু 'কোটেশন' হিসেবে ব্যবহার করেন, তার বেশী নয়। এঁদের সীমিত-গোষ্ঠী ছাড়াও যে আর একটি বৃহত্তর পাঠক-সমাজ আমাদের দেশে আছেন তাঁদের কাছে মোহিতলালের নাম একেবারে অজ্ঞাত বলেই মনে হয়। তবে তাঁর মৃত্যুর পর সাময়িক পত্রে তাঁর কবিত্ব ও সমালোচনা-প্রতিভা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে কিন্তু তাঁর যে আর একটি বড় দিক আজও অবহেলিত রয়ে গেছে সেই পত্র-সাহিত্যের প্রতি আমাদের সাধারণের কিংবা বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আজও আকৃষ্ট হয় নি—যার দ্বারা তাঁর সাহিত্যিক মানস-গঠন বোঝার সুবিধে হত—যা হারালে আর কোনদিনই মাথা খুঁড়লে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সাহিত্য যাঁরা রচনা করেন নিজস্ব ব্যক্তি-সীমা থেকে তাঁকে অনেকটা দূরে যেতে হয়, কেননা তখন তাঁর মানসলোকের সামনে ব্যক্তি থাকে না থাকে একটি সমাজ। কাছের লোকটিকে তখন বাধ্য হয়ে দূরে যেতে হয়, সমকালীনের মধ্যে ভাবীকালকে লক্ষ্য করে পাঠক সমাজের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রশ্ন যখন লেখকের মনে উঁকি মারে তখন তাঁর দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করতেই হয়—প্রত্যক্ষ-সত্তা স্বভাবধর্মেই তখন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, অনেক কিছু কথাই লিখতে তাঁর বাধবাধ ঠেকে। কিন্তু যখন সেই লেখকই চিঠি লিখতে বসেন তখন তিনি গ্রহণ করেন কাছের মানুষটিকে, তার ত্রিসীমানায় তখন সাধারণের প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। সাহিত্য লেখা হয় বহুজনহিতায়, চিঠি লেখা হয় একটি রসিক মনকে পরিতৃপ্ত করার নেশায়। এখানেই লেখক মন খুলে আলাপ করেন, তাঁর সব কথা অন্তরের রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এদিক থেকে তাঁর চিঠিপত্রই তাঁর সাহিত্য ও জীবন-বিচারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড—এরই পাদপীঠে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে দাঁড় করিয়ে তাঁর অন্তরলোকের সকল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নাই। এই চার পৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধ কখনোই তা পারে না। (ছিন্নপত্র) এজন্যেই পত্র-সাহিত্যকে মূল-সাহিত্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সাধারণের কাছে মনে হতে পারে চিঠি লেখার মত সোজা কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। একথা সত্যি,—আমাদের দেশের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকমাত্রেই দু'চার কলম চিঠি লিখে নিজের নিজের মনের কথা জানায়। কিন্তু চিঠি যখন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ঐ চিঠির কোন মূল্য থাকে না, তখন চিঠি লেখা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে চিঠিতে রসাত্মক করে লিখলে পত্রলেখকের রচনারীতি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও অন্তরঙ্গ উপস্থিতির গুণে তবেই সেটি সাহিত্যিক মর্যাদা ও কৌলিন্য অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস, সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা ক'জন লোকের দেখা যায়।...পৃথিবীতে যারা চিঠি লেখায় যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প।" (পথে ও পথের প্রান্তে) রবী-

লিগুও " English Essays" গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথাই লিখেছেন, "...It.is an indisputable fact that the greatest letter writer is rarer even then the great poet." এজন্তেই চিঠিকে ইংরাজীতে the gentlest art' (কোমলতম সুকুমার শিল্প) বলা হয়।

আমাদের দেশের বিশিষ্ট লিখিয়েদের পত্র-সাহিত্য বলতে তেমন কারুরই নেই। ইংরাজ-ফরাসী সাহিত্যে সার্থক চিঠি লিখিয়েদের একাধিক নামকরা উদাহরণ চট করে দেয়া যেতে পারে কিন্তু আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কারুর নাম পাঠকরা স্মরণে আনতে পারবেন না, তাঁদের চিঠি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়েছে বলে।

রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের আগে ষোল শতাব্দীর মনীষীদের চিঠি জীবন-চরিতে আহৃত হয়েছে কিন্তু জীবনী-রচনার কাজে মূল্যবান হলেও শুধু চিঠি হিসেবে সেগুলি সাহিত্য-রসে উপভোগ্য হয় নি। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই বলছি। চিঠি লেখা যে একটা বড় কলা-শিল্প, সামান্য কথা যে লেখার ভঙ্গীর পরিবর্তনে উপভোগ্যের জিনিষ হয়ে দাঁড়ায় তা তাঁদের অজানা ছিল। চিঠির পূর্ণাবয়ব রসমূল্য প্রথম ধরতে পেরেছিলেন মধুসূদন, বিষয়-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের প্রাত্যহিকতাকে রসশ্রীমণ্ডিত করেছেন তিনিই কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এঁর চিঠিপত্র সবই ইংরেজীতে লেখা। বাংলায় নবীন সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল চিঠি লিখেছেন সেগুলি কিছু কিছু সংগৃহীতও হয়েছে কিন্তু তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির তুলনায় তাঁদের চিঠিপত্র একটি বিশিষ্ট জাতের রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য নয়। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে স্বামীজীর পত্রাবলীতে গদ্যরীতির বলিষ্ঠতা আর প্রমথ চৌধুরীর পত্রগুচ্ছে তাঁর সুকর্ষিত মনের এক উৎকৃষ্ট সম্পদরূপে পরিগণিত। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রের অধিকাংশ তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণের স্বাভাবিকতা সম্পর্কে নানা তুচ্ছ ঘটনাকে রসিয়ে গ্রাহকের কাছে পরিবেশন করেছেন। তিনি যেন তার মুখোমুখি বসে আড্ডা জমিয়েছেন। ব্যক্তিগত তুচ্ছ কথা কতদূর রমণীয় হতে পারে সামান্য চিঠি যে এমন অপূর্ব সাহিত্যরূপ নিতে পারে রবীন্দ্রনাথের চিঠি তার প্রমাণ। যেমন—

: ইতিমধ্যে আমার শনিগ্রহ রাত্রি ছুটোর সময় আমাকে তলব করলেন। তখন বিছানায় শুয়েছিলুম। হঠাৎ একটা তীব্র শীতের হাওয়া হু হু করে এসে আমাকে চঞ্চল করে তুললে। শিওরের কাছের দরজাটা প্রবলবেগে বন্ধ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে দরজাটা আমার ডান হাতের মধ্য অঙ্গুলির ওপর পড়ে তাকে পেষণ করে ফেললে। ঐ মধ্য অঙ্গুলিটিই শিশুকাল থেকে হেঁট হয়ে আমার লেখনীর ভার বহন করে এসেছে। আমার সাহিত্য-ইন্দ্রের ছুটি বাহন একটি হচ্ছে বুড়ো আঙুল, সে হলো ঐরাবত; আরেকটি ঐ মধ্যমিকা তাকে বলা যায় উচ্চৈঃশ্রবা; সে খুবই জখম হয়েছে।

নখটা তাঁর কর্মে ইস্তাফা দিয়েও তবু নড়বড়ে অবস্থায় লেগে রইল। সে সম্পূর্ণ পদত্যাগ করলে আমি নিষ্কৃতি পাই; যাই হোক রচনার কাজটা এখন দুঃখসাধ্য। লেখার বিষয়টা যাই হোক তার লাইনে লাইনে আমার এই খোঁচা আঙুলটা করুণরস সঞ্চার করছে। (পথে ও পথের প্রান্তে : পত্র সংখ্যা ১১)

: কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা ঠেলে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে, মৌন মুখে, শান্ত পদে প্রদক্ষিণ ক'রে আসছে। (ছিন্নপত্র)

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত পত্রগুচ্ছই ভয়হীন হালকা রসে অভিসিঞ্চিত নয়। গুরু-গম্ভীর বিষয়ের ওপর চিঠি লেখা যায় না, গেলেও তা চিঠি হয় না, হয় ছদ্মবেশী প্রবন্ধ। কেননা যে সমস্ত চিঠি মূলত তত্ত্ববিচার, তথ্যপ্রচার বা মতবাদ বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ, যাতে বিতর্ক রূপে সেগুলো চিঠির আকারে লেখা হলেও সেগুলি খাঁটি জাতের পত্র বলে গণ্য নয়। রাশিয়ার চিঠি', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' খামে পত্র কিন্তু এক একটি বেনামী প্রবন্ধ। মোহিতলালের চিঠিপত্রেরও অনেকগুলি এক একটি ক্ষুদে প্রবন্ধ—প্রবন্ধ না হলেও প্রাবন্ধিক গুণ বর্তমান। গ্রাহকের মনের সঙ্গে যোগরক্ষা করার তেমন কোন চেষ্টা তাঁর আছে বলে মনে

হয় না—নিজের সঙ্গে নিজের যেন বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ রচনা করে চলেছেন।

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম, যার প্রধান রস তথ্য জগতের সংবাদ, দুই, মনোলোকের ভাব বিশ্লেষণ।

প্রথম শ্রেণীর চিঠিপত্রের উদাহরণ—

: আমার সাংসারিক দৈন্য চিরদিন আছে—তাতে আমি কষ্ট পাই কিন্তু বিচলিত হই না। আমার মত মানুষ দরিদ্র না হয়ে পারে না। কিন্তু যিনি আমার জীবনকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি চিরদিনই আমার প্রাণধারণের ব্যবস্থাও করেছেন—সে ভাবনা আমাকে করতে দেননি, কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা বা বৈষয়িক উন্নতি আমার জন্যে তিনি ব্যবস্থা করেন নি—আমি চিরদিনই লক্ষ্মীছাড়া হয়েই রইলাম। যখন ১০০৲ টাকা মাসিক উপার্জন ছিল তখনও যে অবস্থায় ছিলাম আজ ৪০০৲ টাকা মাইনে পেয়েও সে অবস্থা ঘুচেনি। কেবল এখন একটু ভাবনা হয়—স্বাস্থ্য ভেঙ্গেছে, বয়স বাড়ছে—অনেকগুলি নাবালক ছেলে মানুষ করতে হবে। তাই, ভাবনা হয়েছে। কিন্তু অন্তরের অন্তরে ভাবনা নেই—কারণ আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি। আমার বিশ্বাস আমার ভাবনা তিনি ভাববেন।—

এবারে দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রের নমুনা তুলে দেবার আগে একটি কথা বলি। কবিগুরু যেমন মনের দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন, চিন্তা করতে করতে কথা বলেছেন তেমনি মোহিতলালও চিঠির এই শ্রেণীতে প্রজ্ঞাশীল আত্মকেন্দ্রিক ভঙ্গীতে মনের জাল দিয়ে বক্তব্যকে ধরেছেন। এই শ্রেণীর চিঠির নিদর্শন দিয়ে দিলাম—

: কাব্যরস একা ভোগ করিবার নয়; মন বাহিরের দিকে মুক্ত এবং অপর সহৃদয় রসিক মনের সহিত যুক্ত না হইলে রসজীবন পুষ্ট হয় না। নিঃসঙ্গ জীবন যোগসাধনার অনুকূল, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, রসের রসায়নে প্রাণের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয় না।…আমার বিশ্বাস, খুব শক্তিমান্ লেখক যাঁহাদিগকে শুধুই জীবন শিল্পী নয়, জীবন দ্রষ্টা বলা যায়—তাঁহাদের সংলাপ কোন যুগেই বেশি নয়; কাব্য গল্প ও উপন্যাস আর্ট হিসাবে যতই বিচিত্র হউক, এবং সেই বৈচিত্র্যই রসপিপাসা উদ্রেকের কারণ হইলেও আত্মাকে গভীর ভাবে প্রবুদ্ধ করে রচনাবলীর বৈচিত্র্য নয়, লেখকের দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্য—জীবনকে দেখিবার সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গী—যাহা দ্বারা জীবনের একটা অপ্রকাশিত পূর্বদিক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ দ্রষ্টা বেশি নাই। কারণ, সে কেবল শিল্পীর সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়, খণ্ড ক্ষুদ্র তুচ্ছকে রসবৎ করিয়া তোলা নয়,—অসীম অকূলকে উদ্ভাসিত করা—যাহাকে Great Art নাম দেওয়া হইয়াছে। আমি চিরদিনই সেই তীর্থের পথিক। তাছাড়া আমি সাহিত্যকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ বা সাধনমার্গ বলিয়া মনে করি। মানুষের প্রাণ মন দেহ ও আত্মার যত কিছু উৎকণ্ঠা সকলই এই সারস্বত সাধনায় নিবৃত্তি লাভ করা চাই।

প্রসঙ্গক্রমে মোহিতলালের চিঠি পত্রের শ্রেণী বিভাগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠি পত্রের উল্লেখ করেছিলাম। তা বলে কেউ যেন মনে না করেন যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোহিতলালের মিল রয়েছে, বরং ঠিক তার উল্টো। মানস-প্রকৃতির দিক দিয়ে মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ চিঠির শুধু জাত নিয়ে নয়, চিঠির ভাষা নিয়ে, শুধু ভাষা নিয়ে নয়, মেজাজ নিয়ে। কবির মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লেখেন, চিঠিও রঙ ধরে কবিতার, কাজেই তাঁর হাতে যে কথা ছবি হয়ে ওঠে সেটি মোহিতলালের হাতে কথা হয়েই থাকে। কবিগুরুর চিঠি হল তাঁর মনোভূমির ভাবলীলা, তাঁর পত্রে যে ব্যক্তিপুরুষ রয়েছেন তিনি রসিক ও কবি; আর মোহিতলালের চিঠি হোল বস্তু সংসার ও তাঁর প্রাণলীলার রূপ, তাতে কল্পনা বা অলঙ্কারের বাষ্পও নেই, সেখানে তাঁর ব্যক্তিপুরুষ রসিকের চেয়ে সমালোচনার পক্ষপাতী। বক্তব্যকে ভাষার যাদুদণ্ডে না ছুঁইয়ে সোজাসুজি বলা তিনি পছন্দ করেন, তাঁর ভাষা রুক্ষ, সাদামাঠা গদ্য ধর্মী পৌরুষপূর্ণ ভাষা—সে যেন তার উপস্থিতি সরবে ঘোষণা করে 'আমি এসেছি'—শিক্ষকের ভঙ্গীতে গ্রাহকের মনকে শাসন করে। ফলে তাঁর পত্রে চিত্তের লঘুতা কিংবা লঘুজীবনের রস-স্পন্দন মিনমিনে ভাষায় প্রকাশ পায় নি।

মোহিতলালের চিঠিপত্র প্রয়োজননিবদ্ধ ভারী মেজাজের

স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে –
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
– এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

জন্য। প্রধানতঃ বস্তু-প্রধান ও সাহিত্য তত্ত্বমূলক বলে অনেকেই তাঁর চিঠিকে সাহিত্য পত্রের পর্যায়ে ফেলতে ইতস্তত করবেন; কারণ তুচ্ছ বিষয়ই পত্র সাহিত্যের জাতবিচারের মাপকাঠি, এরই উপর রসিক শিল্পীর চিত্ত খেয়াল খুশীর মালা গেঁথে চলে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে তাঁর পত্র 'সাহিত্য' নয়, চিঠির যে গুণের জন্যে কুপার, ভলটেয়ার, শেলী, কীটস, বায়রণ, ক্যাথারিণ, ম্যানসফিল্ড, চেষ্টারটন, লারেন্স, ব্রিজেস ও আমাদের রবীন্দ্রনাথ খ্যাতনামা হয়েছেন সে গুণের অভাব তাঁর পত্রে রয়েছে। তত্ত্বপ্রিয়তা ও তথ্যবিলাস অতিক্রম করে অপ্রয়োজনের আনন্দ তাঁর চিঠিতে অনুৎসারিত। তবে সাহিত্যের প্রতি পাঠককে উদ্বুদ্ধ করা গ্রাহকের মনকে সজাগ করা, প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে গুণ সেই মননিষ্ঠতা তাঁর পত্রের মধ্যেও অনুরণিত। তাই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জনকে যে-সব সাহিত্য বিষয়ক পত্র লিখেছিলেন ('সাহিত্য', সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের স্বরূপ' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত) তার পাশে মোহিতলালের সাহিত্য বিষয়ক পত্রকে রাখা চলে এবং পাশাপাশি রাখলেও কারুর বৈশিষ্ট্য কারুর প্রভাবে চাপা পড়ে না—উভয়ের পার্থক্য দুরাস্পর্শীর দরুণ স্পষ্টভাবেই দু'জনকেই চেনা যায়॥

ছা-পোষার হাল

শ্রীকালিদাস রায়

বাজারে যখন যাই দেখি এরা ছোট থলে হাতে
ছোট ছেলে সাথে,
কেনে একপোয়া আলু, আধপোয়া মাছ,
ঢেঁড়স, ডুমুর, থোর, মূলা, কচু, ডাঁটা দুইগাছ।
গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি পায়ে চটি,
বাম হাতে ঘটি—
যে তেল দোকানে থাকে টিনে
সেই তেল তাতে করে নিয়ে যায় কিনে।
ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে,
আপিসে, দোকানে, রেলে, স্কুলের কোটরে,
অল্প আয়ে এরা কাজ করে।
হাড়ভাঙ্গা এদের খাটুনি
ব্যথা পাই যত দেখি শুনি।
ভাবি, হায় ইহাদের কথা
নিয়ে কারো এদেশের আছে মাথাব্যথা?
ভালো কথা, ভুলে গেছি, কেনে এরা কিছু কলাপাত
ঝি-চাকর নেই মোটে, বাসনেরও নেইক উৎপাত।
দিন আনে দিন খায়
জমা কিছু থাকেনা হাঁড়ীতে।
কাপড় দেয়না এরা ধোবার বাড়ীতে।
কাপড় সেলাই ক'রে পরে
গোটা পরিবার মিলে থাকে একই ঘরে।
ইহাদের ছোট ছেলেমেয়ে
মিটায় দুধের তৃষ্ণা বার্লি জল খেয়ে।
ভাতের ফেলে না ফেন, ফেলেনাক আনাজের খোসা,
আম খাওয়া শুধু আঁটি চোষা।
ইহাদের ছেলে ফেল হ'লে
পড়িতে পায়না আর, মাহিনা যোগাতে নারে ব'লে।
এদের মেয়েরা কভু কলেজে না যায়,
সহজে হয়না বিয়ে, ছেলেরাও বিবাহ না চায়।
আয় নেই, ঘর নেই, ভগিনী অনূঢ়া
বিয়ে করা চলেনাক, বাপ এত বুড়া।
ভাবি হায় ইহাদের কথা
পায় কেহ ব্যথা?
অথচ পরিতে হয় ইহাদের সাফা জামাজুতা,
এদের পীড়ন করে নানাবিধ সামাজিক ছুতা।
ইস্কুলে পাঠাতে হয় ছেলে,
খরচ করিতে হয় প্রথামত অতিথিরা এলে।
খাবার কিনিয়া আনে ঠোঙাভ'রে ছোট ছেলেমেয়ে।
অতিথি সিঙাড়া খায়, দেখে চেয়ে চেয়ে।
শ্রমিক কৃষক নয়, রিক্সও না টানে,
পিওন পাইক নয়, এরা কিছু লেখাপড়া জানে।
রাজমিস্ত্রী ছুতোর কামার
দারোয়ান, দর্জি, ধোবা, দপ্তরী, চামার
এত দুঃখী তারা নয়, যত দীন হোক,
এদের থাকতে হয় সেজে 'ভদ্রলোক'।
হতভাগ্য ইহাদের তরে
এ হৃদয়হীন দেশে কেবা চিন্তা করে?

পরিচালক—উপানন্দ

তোমাদের কাছে আমার বক্তব্য

এককালে বাঙালী সমগ্র ভারতের চিন্তানায়ক ছিল। সে সময়ে তার কর্ম্ম ও চিন্তাধারাকে সমগ্র ভারত অনুকরণ করতো কিন্তু বর্ত্তমানে তার আর সে গৌরব নেই। জীবন সংগ্রামে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে এখন আমরা ঘুমন্তজাতি বল্লেও চলে। দিনরাত্রি সকাল সন্ধ্যা কোন বিচারই নেই, কাজ ও নেই, ব্যস্ততা ও নেই। কেবল আছে মুখরোচক গল্প, আর অলস জীবনযাপন করা। তাই আমরা সকলরকমে পিছিয়ে যাচ্ছি। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—'Idle Folks have least leisure, যারা অলস, তাদের অবসর কম, সারাদিনের মধ্যে তাদের কাজ ফুরোয় না, ফলে তারা আর বিশ্রামই করতে পারে না। আলস্য অভাবের জনক,—আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রকার অভাব দৈন্য ও দুর্দ্দশার কারণ এই ব্যাধিটা। এটা সংক্রামক ব্যাধি। ছেলেবেলা থেকেই এর কবল থেকে মুক্ত থাক্‌বার চেষ্টা করবে। আলস্যে জীবন অতিবাহিত করবার জন্মগত অধিকার কারো থাকা উচিত নয়, কেননা প্রত্যেকের সঙ্গেই দেশের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। অলস ব্যক্তিকে দেশ ও সমাজ ক্ষমা করতে পারে না। তাই তোমরা কর্ম্মী হও, পরিশ্রমী হও, অধ্যবসায়ী হও—জেনে রেখো সমস্ত কর্ম্মেরই ফল আছে, কখন কর্ম্ম বৃথা যায় না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগকেই বড় করে দেখিয়েছেন। আজ যদি তোমরা ছাত্রজীবনে অলস হয়ে বিভাভ্যাসের জন্য চেষ্টা না করো, তাহোলে এর পরিণাম অশুভ হবে। সে সময়ে অনুতপ্ত হয়েও তোমরা কোন প্রতীকার করতে পারবে না। যে সময়টী জ্যামুক্ত তীরের মতন অনন্তকালের পথে চলে যায়, সে আর ফিরে আসে না। অলস লোকে যে হতভাগ্য হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

তোমাদের আলস্যের জন্যে, তোমাদের মূর্খতার জন্যে আর তোমাদের কর্ত্তব্যবোধের অভাবের জন্যে তোমরাই শুধু সমগ্র জীবনব্যাপী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিড়ম্বিত হবে, বিপন্ন হবে। তোমরা সমাজ যন্ত্রের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ, কোন যন্ত্রের কোন অংশ অচল হলে সে যন্ত্র আর চলে কি?—তোমাদের সমাজ, তোমাদের জাতিও তোমাদের অভাবে অচল। কর্ম্মী হোতেই তোমরা বাধ্য। যে জাতির প্রত্যেক লোকই কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়, তারাই উঠতে পারে—যে জাতির কর্ত্তব্যের ঠিক নেই, তারা অবনত হবেই— এটাই স্বভাবের নিয়ম। এজন্যে আগে নিজে নিজের উন্নতির চেষ্টায় আবশ্যক। নিজে নিজের কর্ত্তব্য বিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অবাধ্যতার প্রতিফল শাস্তি, সমাজে তারও আবশ্যকতা আছে।

প্রত্যেক স্বাধীন জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে কর্ত্তব্যপরায়ণতার বহু জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের যখন লক্ষ্মীশ্রী ছিল, এই কর্ত্তব্য জ্ঞানই ছিল তখন প্রবল। যে জাতি উন্নত হোতে পেরেছে, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবে, কর্ত্তব্য জ্ঞানই তাদের ভিত্তি। বর্ত্তমানে সেগুণ এদেশে নেই বল্লেই চলে, তাই এত দুর্দ্দশা। চরিত্রগত দোষ না সংশোধিত হোলে, মানুষ হওয়া যায় না। মহামতি গ্লাডষ্টোন বলতেন—'Duty is a power which rises with us in the morning and goes to rest with us at night. It is the shadow which cleaves us to go where we will, and which only leaves us when we leave the light of life.' কর্ত্তব্যপরায়ণতা এমন একটি শক্তি, যা প্রভাতকালে আমাদের ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের ভেতর জেগে ওঠে আর রাতের বেলায় আমাদের সঙ্গে শুতে যাবার সাথী হয়। এটী ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে যাতায়াত করে আর আমরা যখন জীবনের মধ্যে উদ্দেশ্য বা গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করি, তখন সেও আমাদের পরিত্যাগ করে। গ্লাডষ্টোনের বাবা জন গ্লাডষ্টোন তাঁকে গণিতশাস্ত্রে সুদক্ষ করবার জন্যে প্রেরণা দিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠি পেয়ে তিনি অক্সফোর্ড বিভাভ্যাসের সময়ে গণিত শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন আর উত্তরকালে গণিতশাস্ত্রেও পণ্ডিত হ'য়েছিলেন। তাঁর বাবা লিখেছিলেন—'I do not think a man is a man unless he knew mathematics' মানুষ গণিতশাস্ত্রে দক্ষতা লাভ না করলে

'না না, তাঁরা অনেকক্ষণ উঠেছেন। ওঁদের চা খাওয়াও হয়ে গেছে। ঘণ্টা খানেক হলো একটু 'ম্যালে'র দিকে বেড়াতে গেছেন—আর অমনি ফেরার সময়ে কতকগুলি দরকারী জিনিষ কিনে –'

'না না—আমরা শুনবো না ! ··আমাদের ফেলে মা মণি বেড়াতে গেলেন বাবার সঙ্গে···?' চেঁচিয়ে উঠলো পিণ্টু, অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল এলো। রুণ্টুরও কান্না জড়ানো স্বর এসে মিশলো তাতে—হ্যাঁ ! নিজেরা একা একা বেড়াবেন···আবার বলা হতো আমাদের নিয়ে কতো ······ও বেড়াবেন···!'

'লক্ষী সোনারা ! অতো গোলমাল কোরতে নেই ছি !—মা যেতে চান নি—বাবু বললেন—ওরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েচে ভালো কোরে ঘুমোক !—চলো একটু ঘুরে আসি আর বাজারও কিছু কোরে আসা যাবে ! বেচারী কাঞ্চী দুরন্ত দুই ভাইবোনের দাপাদাপি সামলাতে অস্থির হয়ে পড়লো। ওদের শান্ত করতে সে বাগানে ওদের নিয়ে এসে গল্প করতে লাগলো—পাহাড়ে বৃষ্টি কেমন হয়—তুষার কেমন পড়ে··! এক সময় সে ওদের বললে—কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবে ?—সামান্য একটু দেখা যায় আমার ঘরের জানালা দিয়ে। রান্নাঘরের গায়ে কাঞ্চীর ঘরে ওরা গেলো জানালার কাছে। ঘরে চৌকিতে বিছানা পাতা আর কোণে ছোট টুলের ওপর নিভানো লণ্ঠন। কাঞ্চীর ঘরে ইলেকট্রিক নেই।

ওদের শান্ত হতে দেখে কাঞ্চী হেসে বললে—'তোমরা এইখানে বাগানে একটু খেলা করো—বাবা মা এই এলেন বলে—সাড়ে নটা বাজে ! আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে—ততোক্ষণ ঘরের কাজগুলি সব সেরে ফেলি – কেমন ?··· কোথাও যেন যেয়ো না—খবর্দার গেটের বাইরে পা দিয়ো না যেন লক্ষীরা।'

কাঞ্চী ঘরে যাবার একটু পরেই কিন্তু সাত বছরের রুণ্টু মুখভার করে ফোঁশ করে উঠলো—'ওঃ নিজেরা বেড়াতে গেলেন আমাদের ফেলে দিয়ে !'

'হ্যাঁ আমরা যেন দরোয়ান—বাড়ী পাহারা দেবো ! মুখ হাঁড়ি করে বললে পাঁচ বছরের পিণ্টু।

ওদের ঘিরে অপরূপ নতুন দেশের অপূর্ব সোনালী সকাল। ঝলসানো রোদ নিয়ে দূরে পাইন গাছগুলি ঝলমল করছে। ঠিক ওদের বাড়ীর গেটের সমুখ দিয়েই গেছে একটি পাহাড়ী রাস্তা—এঁকেবেঁকে ওপরের দিকে উঠে গেছে পাহাড়ের বাঁক জড়িয়ে। খানিক দূরে ওর থেকেই আবার একটা ফালি রাস্তা আবার নীচে নেমে মিশে গেছে পাহাড়ের সবুজ বুকে। দুধারে দেবদারু পাইনের সারি আর দূরে বনরাজি নীল পাহাড় আর মাঝে লাল লাল বাড়ী। এই উন্মুক্ত উদার বিশাল অচেনা অজানা প্রকৃতি যেন হাতছানি দিয়ে শহর ছাড়া দুটি দুরন্ত ছেলে মেয়ের প্রাণকে ডাক দিতে লাগলো। কখন রুণ্টুর পিণ্টুকে গল্প বলা থেমে গেছে আর হাত হ'তে রূপকথার বই পড়েছে খসে—আর কখন ভাই বোনে হাত ধরাধরি করে পায়ে পায়ে বিমুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি দিগন্তে মেলে গেটের বাইরে চলে এসেছে আর কখনই বা ওদের সমস্ত রাগ দুঃখ অভিমান যাযাবরের দুর্বার কৌতুহলে পরিণত হয়েছে—তা' ওরা জানে না। একটু পরেই দুটিতে এগিয়ে এগিয়ে যাবার নেশায় যেতে, দ্রুতপায়ে—প্রায় নাচতে নাচতেই হাত ধরাধরি করে ওপরে উঠতে লাগলো। খানিক পরে যেখানে রাস্তা দুভাগ হয়েছে সেইখানে দুটিতে ক্ষণেক দাঁড়ালো হতভম্বের মতো। রুণ্টু বললে, 'ভাইটি ! ওপরের দিকেই চল্ !' পিণ্টু মাথা নেড়ে বললে, 'না রে দিদি—ভাখ না দূরে ঐ যে নীচে কি চমৎকার একটা ঝরণা—ঠিক তুই যেমনটি গল্পের মধ্যে বলেছিলি।' এই না বলে পিণ্টু দিদিকে টানতে টানতে নীচের দিকের পথে দৌড়তে লাগলো। পায়ের তলে পাইনের পাতার নরম ছোঁয়ায় ভরে দিলো। পাহাড়ের স্বচ্ছ হাওয়ায় ওদের শিরায় শিরায় নতুন প্রাণ-স্রোত জেগে উঠলো। মাথার ওপরে নীলকান্ত মণির মতো ঝকঝকে আকাশ ওদের চেতনায় যেন মিশে গেলো। কি উজ্জ্বল চারিদিক। কি স্নিগ্ধ ! এঁকে বেঁকে ওরা রাস্তায় চললো। কেউ কোনোদিকে ছিলো না। ওরা একবার এধার থেকে ওধার আর একবার ওধার থেকে এধার হয়ে এঁকে বেঁকে নামতে লাগলো। অল্পক্ষণেই ওরা ঝরণার কাছে এসে আবার স্তম্ভিত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ওদের থেকে একটু দূরেই এক পাহাড়ের ধার থেকে একটি ছোট্ট ঝরণার স্রোত ছুটে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে হঠাৎ যেন লুকোচুরি খেলে আবার পলকে চোখের সামনে

এসে যেন বুড়ী ছুঁয়ে দিয়েই আবার ঘুরে ঝর্ঝর কলকল শব্দে সহস্র নূপুর বাজিয়ে নীচের দিকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। ওরা ঐ অফুরন্ত দুরন্ত জলের পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তারপর ওরা হাত ধরাধরি করে ধীরে ধীরে ঝরণার ধারে ধারে সরু পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো—যেন ঐ ঝরণা-ধারার সঙ্গে ওদের আগে থাকতেই এইরকম কোনো বোঝাপড়া ছিলো—আর ঝরণাও যেন এক পাহাড়ী নর্তকীর মতোই ওদের পথ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে চললো।

এ রকম কতোদূর ওরা গেছে ওদের হুঁশ নেই—হঠাৎ কেমন যেন চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসাতে ওদের চমক ভাঙলো। শন্ শন্ করে ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের কাঁপিয়ে তুললো। ঘর-পালানো দুষ্টু ভাইবোন দুটির তখন ভীষণ ভয়ে মুখ গেলো শুকিয়ে। ভাইটিকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে রুণ্টু ভীত মুখে কি করবে কোনদিকে যাবে ভাবতে না ভাবতেই চড়বড়িয়ে তুমুল বৃষ্টি নেমে এলো।—ওঃ কি জলের জোয়ার। লক্ষ তরঙ্গ আঁকা পাহাড়ের গা বেয়ে, অজস্র জলধারার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ জলবিন্দু ওদের ঘিরে উল্লাসে করতালি দিয়ে নাচতে লাগলো। শহর-জীবনের স্কুল ও বাড়ীর একঘেয়ে নৈমিত্তিক নিয়মের বাঁধন মুক্ত ছেলেমেয়ে দুটিকে উন্মুক্ত বিশ্ব প্রকৃতি যেন অবিরল ধারাগানে অভিনন্দিত করলো। দেখতে দেখতে দুটিতে অঝোরে নেয়ে গেলো! কোন রকমে একটা পাথর ধরে দাঁড়িয়ে দুজনে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো দাঁতে-দাঁত লেগে। পিণ্টুর চোখ হতে গড়িয়ে আসা জল বৃষ্টির জলে মিশতে লাগলো। রুণ্টুরও চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিলো তবু কোনোমতে সান্ত্বনার ছলে বললে, 'কাঁদিস্‌নে ভাই কাঁদিস্‌না। ভয় কি আমি আছি তো!' 'দিদি এখন কি করে বাড়ী ফিরবি?' ফুঁপিয়ে বলে পিণ্টু।

'আজ বাড়ী না ফিরলেই কি! একটা গুহা—টুহাতে থাকা যাবে—সেই যে গল্পটা তোকে বলেছিলুম তেমনি!' এব ভাবে রুণ্টু প্রবোধ দেয় ভাইকে। হঠাৎ পাশেই কার গলার সাড়া পেয়ে দুজনেই চমকে উঠে চেয়ে দেখে এক পাহাড়ি কাঠ-কুড়ানী বুড়ী ওদের দিকে গুটি গুটি আসছে! ওদের দিকে বার কতক মিটমিট করে তাকিয়েই বুড়ী সমস্ত ব্যাপারটাই ধরে ফেলেচে, পাহাড়ি আর বাংলার জগা-খিচুড়ী করে অনেক হাত-মুখ নেড়ে সে বললে—'বুঝেচি! পথ হারিয়েচ তোমরা বাঙালী? ভয় নেই—আমার ছেলেকে দিয়ে তোমাদের বাড়ী খোঁজ কোরে দোবো। আহা! কি ভিজেচ, চলো আমার বাড়ীতে!' বলে পিণ্টুর হাত ধরলে বুড়ী আর রুণ্টু রাখালকে পিঠেপুলি গাছ হ'তে ধরে নিয়ে গেছিলো যে-ডাইনী তার সঙ্গে বুড়ীর চেহারার মিল আছে কি না ভাবতে ভাবতে চললো ওদের সঙ্গে—কে জানে বুড়ীর জ্যাবড়া পোষাক নাড়া দিলে এখুনি দুই তিনটি খোকাখুকি বার হয়ে পড়বে কি না?

বৃষ্টি তখন ধরে গেছে। সরু পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটি কাঠের বাড়ীতে বুড়ী ওদের নিয়ে এলো। চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—এক কোনে আগুন জ্বলছিলো, এবার মস্ত কড়াই এনে ওদের কেটেকুটে রান্না চড়িয়ে দেবে না তো? বুড়ী কিন্তু ওদের ভারী আদর-যত্ন করতে লাগলো মিষ্টি হেসে। তাড়াতাড়ি ওদের ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে আগুন-ধারে চাদর মুড়ি দিয়ে বসিয়ে ভিজেগুলি শুকাতে দিলো। ছাগল দু'য়ে দুধ দিলে গরম-গরম—আর তার সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা মোটা চাপাটি। দুজনেরই ক্ষিদেয় পেট জ্বলছিলো—খেয়ে যেন প্রাণ বাঁচলো। ততোক্ষণে বাইরে আবার সোনা-ঝলকানো বিকেলের পড়ন্ত রোদ ঝকমকিয়ে উঠলো। বুড়ী বললে, 'ভাই, তোমরা একটু বিশ্রাম করো—আমি এই কাপড়গুলো কেচে আনি ঝরণা হ'তে—আমার ছেলে এখুনি আসবে—তোমাদের বাড়ী পৌছে দেবে—ততোক্ষণ আগুন পোয়াও কেমন?'

কিন্তু বুড়ী চলে যেতেই রুণ্টু পিণ্টুর কানে কানে তার সন্দেহের কথাটা বলতেই তো পিণ্টুর মুখ শুকিয়ে এইটুকু! রুণ্টু ওর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'ভয় পাস্‌নি ভাইটি—চল্ আমরা পালাই—!'

তারপর আবার এঁকাবেঁকা পথ ডাইনে বাঁয়ে। ওপরে নীচে ঘুরতে ঘুরতে ওরা কোনদিকে কোথায় যে যেতে লাগলো তা' কেই বা জানে! যখনি দু'তিনটে রাস্তার সামনে দাঁড়ায়—পিণ্টু বলে, 'দিদি এবার কোন দিকে রে?' দিদি একটু ভেবে নিয়েই বলে ওঠে—'এই দিকে রে—বুঝচিস্ না? আর একটু গেলেই বাড়ী পৌছে যাবো'খন!'

কোনও রাস্তাই কিন্তু ওদের বাড়ী পর্যন্ত পৌছে দিলো না। এখানে ওখানে পাহাড়িদের ছোট ছোট পল্লী নজরে পড়ে—দুএকটা পাহাড়ি কুকুর ছুটে আসে। বুড়ীর দেওয়া খাবার খেয়ে শরীর আবার বেশ চাঙ্গা লাগছিলো। আবার এই রকম ঘুরে বেড়ানোতে ভারী স্ফূর্তি উৎসাহ লাগছিলো দুজনের। এই রকম অভাবনীয় অভিযানে তাদের ভেতরকার দুরন্তপনাকে মুক্ত প্রকৃতি ডাক দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকার আঁচল ওদের ঘিরে গাঢ় হয়ে এলো, আর ঐ দুরন্ত দুটিরও যেন বুক ঠেলে কান্না আসতে লাগলো। ছেলে-ধরাদের কথা এবার ওদের মনে পড়ে গেলো। পাহাড়ে শীতে ওদের শরীর যেন জমে আসচে—সুতী জামা ভেদ করে আশ্বিনের তীক্ষ্ণ বরফ-হাওয়া লাগচে গায়ে—আর কি ক্ষিদে—কি ক্লান্তি! পা হয়েচে দশমণ পাথরের মতো ভারী! 'আর হাঁটতে পারি না রে—দিদি ভাই!' অবসন্ন পিণ্টু বসে পড়ে।

'আর একটু রে ভাই সোনা—এক্ষুণি বাড়ী পেয়ে যাবো!' রুণ্টু প্রায় বুকে ভাইকে জড়িয়ে নিয়ে ওপর দিকে এগোয়। পথ ছেড়ে গাছপালার মধ্যে দিয়ে খানিকটা চড়াই পার হয়ে গিয়ে সত্যিই একটা আলো দেখা গেলো। কিছুক্ষণ অন্ধকার হাতড়ে গিয়ে একটা বাড়ীর পেছন দিক চোখে পড়লো। বেড়া টপকে রুণ্টু পিণ্টুকে টেনে নিয়ে ঢুকলো। সব অন্ধকার—নিশুতি-পুরী! কেবল একটি ছোট্ট ঘরে টুলের ওপর এক কোনে ছোট্ট একটি লণ্ঠন জলছে। ঘরের দরজা খোলাই ছিলো—এক পাশে পাতা কাঠের চৌকীতে ক্লান্ত অবসন্ন ভাইবোন দুটি বসে দেখতে না দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো।

কতোক্ষণ ঘুমিয়েচে ওরা জানে না। অনেক রাত্রে হিমজমা শীতে আর পেটজ্বলা ক্ষিদেতে দুজনে উঠে বসে হতভম্ব হয়ে এ ওর দিকে চাইচে। একটু পরে রুণ্টুর সব মনে পড়ে গেলো—বললে, 'ভাইটি! আমরা যে হারিয়ে গিছি। কাঁদিস্‌নি—আগে দেখি এখানে কারা থাকে—আমাদের যদি একটু খেতে দেয়।' কিন্তু বাইরের দিকের নিশ্ছিদ্র জমাট কালো হিমভরা অন্ধকারে আর ওদের ঘুরে বাড়ীর সমুখদিকে যাবার সাহস হলো না। হঠাৎ রুণ্টুর চোখ পড়লো চৌকীর শিয়রের বন্ধ দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকিনী খুলে লণ্ঠন হাতে ভেতরে একবার উকী মেরেই রুণ্টু তো বিস্ময়ে থ'! তার পরেই দুজনে সে ঘরে ঢুকে পড়লো—বাড়ীর রান্নাঘর সেটা—দিব্যি গরম ঘরখানি—তার ওপর অবাক কাণ্ড! নিবন্ত উনুনের পাশে থরে থরে রান্নাকরা খাবার সাজানো—ঢাকা! ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে তখনও। ওই ভাই-বোনের তো পুলকে বিস্ময়ে চোখ এতো বড়ো বড়ো। পেটের ক্ষিদেও এই লোভন দৃশ্যে আগুনের মতো জলে উঠলো—দুজনে হামহাম শব্দে ভাজাভুজি, মাংস পায়েশ খেতে লাগলো একটাও কথা না বলে। ভীষণ রকম পেট ভরে গেলে দেখে চারটি গ্লাসে জলও রয়েচে ঢাকা। লণ্ঠন একটু উঁচু করে ধরতেই ওরা রান্নাঘর হ'তে বাড়ীর ভিতরে যাবার দরজাও পেয়ে গেলো। এটা তো চেয়ার টেবিলে সাজানো খাবার ঘর। ঐ পাশের খোলা দরজাটা কোন ঘরের? আরে এ যে একটা চমৎকার শোবার ঘর। আবার জোড়াখাটে তুলতুলে নরম বিছানায় মোটা লেপটি সাজানো। রুণ্টু লণ্ঠন রেখে ভীতভাবে মন্তব্য করলে—'এ বাড়ীতে সবই আছে—কিন্তু একটাও লোক নেই কেন রে? ভয় কোরচে একটু কিন্তু।'

'বুঝতে পারচিস না দিদি—এটা নিশ্চয় পরীদের বাড়ী। আমাদের জন্তই এসব কোরে রেখেচে পরীর রাণী—তোর সেই গল্পটার মতন—আয় শুই!' ঘুমজড়িত স্বরে বিজ্ঞও নিশ্চিন্ত সমাধান করলে পিণ্টু, আর দেখতে দেখতে দুটি ভাইবোন গলা জড়িয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো গভীর আরামে—লাল টুকটুকে লেপের ভেতর হ'তে ফুলের মতো দুটি মুখ ঈষৎ উকী দিতে লাগলো।

...তখন সবে ভোরের আভাস দিয়েছে—এমন সময়ে গেট ঠেলে বাড়ীতে ঢুকলেন বাবা ও মা—সঙ্গে কাকী। এই হতাশ অবসন্ন তিনটি মানুষের চোখে হারা-মাণিকদের সেই নিজেদেরই বিছানায় ঠিক নিত্যকার একই ভঙ্গীতে শুয়ে থাকা দেখে—সে যে কি হলো সে আবার আর এক বিরাট গল্প!

—

সিমলা শৈল

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

বাংলার সবুজ মাটী, বিহারের গৈরিক মাটী, যুক্তপ্রদেশের ধূলোট মাটী ছাড়িয়ে পাঞ্জাবের শ্যাম স্নিগ্ধ মাটী স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দুদিনের পথ শ্রান্তি মন থেকে অকস্মাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেল। দেখলুম বাংলারই মত কর্দমাক্ত মাটী পথের দুধারে কাশ ফুলের শুভ্র চামর দুলিয়ে আমাদের সাদর সম্প্রীতি জানাচ্ছে। বড় ভালো লাগল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের মানুষদেরও দেখতে পাই মাঠে মাঠে লাঙ্গল আর বলদ নিয়ে, হাতে দাঁতন আর ঘটী নিয়ে। মানুষ একই শুধু পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যে মনে হয় কত নতুন। এই নতুনের আকর্ষণ মানুষকে টেনে নিয়ে যায় দূর হতে দূরান্তরে।

বেলা প্রায় ৮টার সময় আমাদের দিল্লী কালকা মেল এসে থামল চণ্ডীগড় স্টেশনে। পূর্ব পাঞ্জাবের নব পরিকল্পিত রাজধানী চণ্ডীগড়ের কথা অনেকদিন থেকে শুনেছি। এখন তার মাটী স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। অতি সাধারণ খোয়া ঢালা প্ল্যাট-ফরমের উপর দাঁড়িয়ে যেদিকে দৃষ্টিপাত করো শুধু দেখা যাবে নতুন নতুন জনপদ আর ইমারত নির্মাণের ধ্বজা উড়ছে। পায়ের নীচে শুধু ধুলার ঘূর্ণী ওঠা ধূ ধূ মাটী আর মাথার উপর মহাশূন্যতায় ভরা নীল আকাশ। এরই মধ্যে মানুষ গড়ে তুলছে নতুন উপনিবেশ। স্টেশনে মোটর, বাস, ট্যাক্সি ও রিক্সার সমাবেশ দেখে বেশ বোঝা যায় ভিতরে সহর গড়ে উঠেছে। তখন বেলা বেশ হলেও মনে হচ্ছিল যেন সবে মাত্র ভোর হয়েছে। ওখানকার আবহাওয়া ঠিক শীতকালের মত। আর রৌদ্রও ভারী মিষ্টি। পথের দুধারের জঙ্গলের মধ্যে থেকে ভেসে আসছিল বন্য ফুলের মধুর সুগন্ধ। আর ঠিক বাংলাদেশের মত নানা জাতের পাখী কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছিল এগাছ থেকে ওগাছে। শালিখ আর ময়না সেই পরিচিত ভঙ্গীতে মাটীর থেকে খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছে। জীবনের একই ধারা গড়িয়ে চলেছে দেশ হতে দেশান্তরে। এ গাড়ীর অধিকাংশ যাত্রীর গন্তব্যস্থল সিমলা। যথাসময়ে চণ্ডীগড়কে পিছনে রেখে গাড়ী এগিয়ে চললো। বেলা প্রায় ১০টায় আমরা কালকায় এসে পৌঁছালুম। মনে পড়ে গেল দেরাদুনের কথা। কিন্তু এখানে এক মুহূর্ত দাঁড়াবার অবসর নেই। মালপত্র ওজন করে রসিদ নিয়ে ভ্যানে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। অপেক্ষমান যাত্রীরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বুকিং অফিসের সামনে।—অদূরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে—Narrow gauge গাড়ী। ঠিক মনে হয় দেশলাইয় বাক্সে তৈরী ছেলেদের খেলার গাড়ীর বড় সংস্করণ। দুর্গম পার্বত্যপথের যাত্রী বলে গাড়ীর এই সাবধানতা। এই কালকা সিমলা রেলপথে Narrw gauge গাড়ী ছাড়া Railway Omni ও চলে, তাছাড়া প্রাইভেট মোটর চলে। সুদীর্ঘ ৬২ মাইল পথের শেষে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তুষার কিরীটী সিমলা। হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে এক অজানা আনন্দে। এই বনপথের শোভা অবর্ণনীয়। সঘন ধূম্রজালে পর্বতপ্রান্ত আচ্ছন্ন করে ছোট গাড়ীটী অত্যন্ত মৃদু গতিতে উপরে উঠেছে। তার দুপাশের পর্বতরাজি—পাইন আর দেওদার বনে সমাচ্ছন্ন। কোথাও বা পাথরে ঘূর্ণী তুলে নেমে আসছে স্ফটিক ধারা ঝরণা। তার কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে বহুদূর থেকে। আমাদের গাড়ী পাহাড়ের গায়ে পাক খেয়ে ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতরো পথে আরোহণ করছে। কখনও পার্বত্য সুড়ঙ্গ পথের (ট্যানেল) মধ্যে দিয়ে কখনও বা সঘন দেওদার বনের মধ্যে দিয়ে। ছোট ছোট গ্রাম্য স্টেশন ঘরগুলি দেখে শ্রান্ত মনে সাধ জাগে, গাড়ী থেকে নেমে একটুখানির জন্য ওদের ঘরে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করতে। এই পথে ধরমপুর নামে একটী বেশ বড় স্টেশন আছে। আমাদের সঙ্গে অনেক যাত্রী এখানে নেমে গেল। এখান থেকে ২৩ মাইল দূরে, ৬৩২২ ফুট উপরে কসৌলী

সিমলা থেকে পার্ব্বত্য দৃশ্য

নামে একটী মনোরম স্থান আছে। এখানে Tuberculosis Association কর্ত্তৃক পরিচালিত Lady Linlithgow স্যানা-টোরিয়াম আছে। এই জায়গাটী সিমলার মতই স্বাস্থ্যকর নিসর্গ সুষমা-মণ্ডিত। সুদীর্ঘ কালকা সিমলা রোডে অনেক ছোট ছোট স্টেশান আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিলি সাবাথু, ডাকসাই, সোলেন ও ধরমপুর। তার মধ্যে সাবাথু ও ডাকসাইতে সৈন্যদের ছাউনী আছে। আর সালোনে বেশ বড় একটী মদের কারখানা আছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র এখান থেকে মদ চালান যায়।

ক্রমে বেলা অপরাহ্ণের কোলে ঢলে পড়ছে। ছন্দা পাপড়ী নোট বইতে টুকছে কটা ঝরণা আর কটা ট্যানেলের সঙ্গে তাদের পরিচয় হোল। পর্বত গাত্রে যেখানে যেখানে সুড়ঙ্গ পথ কাটা হয়েছে; সেখানে তার সংখ্যাও লেখা ছিল। এর মধ্যে কয়েকটী সুড়ঙ্গ বেশ প্রকাণ্ড এবং গভীর। অবশেষে হিমগিরির ১০৩টী সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে অপরাহ্ণ বেলায় আমরা সিমলার মাটি স্পর্শ করলুম। সিমলা স্টেশানে যাত্রীর চেয়ে কুলীর সংখ্যা বেশী। কাজেই একজন যাত্রীকে ১০ জন কুলী মাছির মত ছেঁকে

খরে। সকলেই হাতে একটা করে নম্বর লেখা পিতলের চাকতী নিয়ে বলে আমি মাল নোব। তার ফলে নিজেদের মধ্যে সুরু হয়ে যায় তুমুল কোলাহল, তারপর মারামারি। অবশেষে পুলিশ এসে সেই কুলিদের চক্রব্যূহ থেকে ভাদুড়ীকে মুক্তি দিল। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ এরা; কিন্তু যেমন সুন্দর গাত্রবর্ণ, তেমনি চোখ মুখের ছাঁদ ও বলিষ্ঠ গঠন। কিন্তু রুক্ষতায় ও শীর্ণতায় সে সৌন্দর্যকে কেমন যেন বেপরোয়া করে তুলেছে। ওদের দেখে আমার মনে হোল পাঞ্জাবপ্রদেশের সাধারণ মানুষের জীবন খুবই দারিদ্র্য পীড়িত। ঠিক বাংলাদেশের মত। বাংলার মানুষের শত্রু যেমন আলস্য; এদের সেই রকম শত্রু উচ্ছৃঙ্খলতা। এই শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি পেলেই এরা সুস্থ সুখী জীবনের অধিকারী হতে পারে।

এবার সুরু হোল পুরীর পাণ্ডার মত হোটেলের লোকের ভীড়। হাতে নিজ নিজ কার্ড গুঁজে দিয়ে সকলেই বলে আমার আস্তানায় চল। কালীবাড়ীর হোটেলে আমাদের স্থান সংরক্ষিত ছিল কাজেই তাদের নিরাশ করে আমরা আবার চড়াই পথে উঠতে সুরু করলুম।

ভারতবর্ষের সমস্ত শৈলনিবাসগুলির মধ্যে সিমলা সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সমন্বিত শৈলনিবাস। সমতলভূমি থেকে এর উচ্চতা
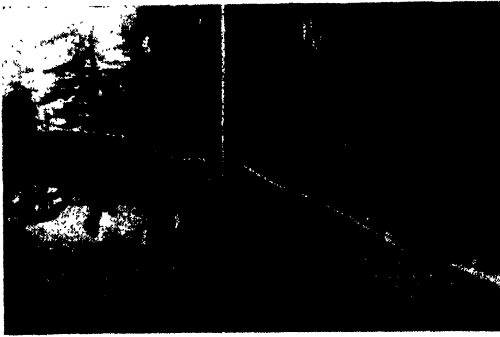
সিমলার একটি পথ

৭০০০ হাজার ফুট। আগে এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল প্রায় ছয়শোর মত। এখন সেখানে দাঁড়িয়েছে মাত্র শতখানেক। দেশ স্বাধীন হবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরখানা গ্রীষ্মাবকাশে সিমলায় স্থানান্তরিত হওয়ার প্রথা রহিত হওয়ার ফলেই এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে চলেছে। সিমলা এখন হিমাচল প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় সেখানকার সমস্ত কাজকর্ম এখানে সম্পন্ন হয়। পূর্ব পাঞ্জাব ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক জরুরী দপ্তরখানা এখানে আছে। এখানকার জনসমষ্টির দিকে তাকালে ভারতে সর্বজাতি সমন্বয়ের সত্য রূপ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। এখানে অনেকগুলি বেশ উন্নত ধরণের স্কুল ও কলেজ আছে। সিসিল, গ্র্যাণ্ড, এবং ক্লার্ক হোটেল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তারমধ্যে বাঙ্গালীদের কাছে কালীবাড়ীই সবচেয়ে আরামপ্রদ ও আকর্ষণীয় স্থান। এছাড়া ছোট বড় আরও অনেক হোটেল বোর্ডিং College ক্লাব ইত্যাদি আছে।

মধুর ঘণ্টাধ্বনিতে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যেতেই হাত মুখ ধুয়ে মন্দিরে চলে এলুম। কোথাও কারুর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নির্জন মন্দিরে মহাকালীর পাদ পীঠে বসে পূজা করছেন পূজারী। বড় ভালো লাগল আমার। দেবীকে প্রণাম করে মন্দির ভিতরে একটুক্ষণের জন্য উপবেশন করলুম। একটি দুটী করে মন্দিরে যাত্রী সমাগম হচ্ছে। তাদের কারো হাতে ফুল, কারো ফল মিষ্টি ইত্যাদি। পূজা পাঠে মন্দির কলমুখর হয়ে উঠেছে।

ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে সিমলায় বহুস্থানে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরখানা ছয় মাসের জন্য যখন সিমলায় স্থানান্তরিত হোত; তখন ভারতীয় কর্মচারীদের সিমলায় বাধ্য হয়ে বাস করতে হোত। তখন নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করার জন্য তৎকালীন বাঙ্গালী সম্প্রদায় এই কালীবাড়ী একটা ক্লাবের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। ক্রমে ক্রমে বহু ধনবান ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে মন্দির ও তৎসংলগ্ন যাত্রী নিবাস উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। তৎকালীন বাঙ্গালীদের এটা একটা বিশেষ মিলন ক্ষেত্র ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সিমলার রাজকীয় কৌলীন্য প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই কালীবাড়ী এখন একটা বিশিষ্ট যাত্রীনিবাসে ও জাগ্রত কালীমন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঘরে ফিরে দেখলুম ছন্দা পাপড়ী লেপের নীচে আরামে ঘুমাচ্ছে। আর ভাদুড়ী বসে বসে তাদের ডাকছেন। কাঁচের জানালার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে কুয়াশায় ঢাকা পৃথিবীকে যেন নিঃসাড় প্রাণহীন। প্রচণ্ড শীতে হাত পা অবশ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে আমরা যেন তুষার রাজ্যে বাস করছি। অবশেষে চা খেয়ে সকলে মিলে বেড়াতে বেরিয়ে পড়া হোল।

স্বর্ণঝরা সূর্যালোকে পৃথিবী থেকে ঘন কুজ্ঝটিজাল ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ের দেবদুর্লভ তাপস সৌন্দর্য প্রতিভাত হ'চ্ছে চতুষ্পার্শ্বের শৈলমালায় ও গিরি খাদের অরণ্য

এসেম্ব্লী হাউস্

ভূমিতে। ম্যালের কেন্দ্রস্থলে না গিয়ে Prospect Hill যাবার জন্য আমরা বায়লুগঞ্জের পথে রওয়ানা হলুম। এ পথে শুধু চড়াই আর চড়াই। হঠাৎ পাইন বনের ফাঁক দিয়ে এক অদ্ভুত

পূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। সূর্যোকরোজ্জল আকাশে সারি সারি তুষার মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ। যেন দেবরাজ ইন্দ্রের কোহিনুর প্রাসাদ মহাকালের পাদপীঠে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে। হিমগিরির এইরূপ পরিপূর্ণ রূপ দেখার জন্ত আমরা এখন উঠছি প্রসপেক্ট হিলে। আংশিক ভাবে এ দৃশ্য দেখে মন ভরে না।

এ পথ সে পথ ঘুরে নানা মানুষকে শুধিয়ে একসময়ে আমরা এসে দাঁড়ালুম—এক বিরাট প্রাসাদের সিংহদ্বারে। এইটেই হোল রাষ্ট্রপতি ভবন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। ময়দানে দাঁড়িয়ে শুধু পুষ্পোদ্যানের শোভা ও ইমারতের নির্মাণ কৌশল দেখ। ভাদুড়ীর প্রবল ইচ্ছে কিছু Snap নেওয়ার। কিন্তু এ প্রথাও এখানে নিষিদ্ধ। চতুর্দিকে সমস্ত প্রহরী ছবির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিমলা সহরের মধ্যে এই জায়গাটা সবচেয়ে উঁচু ও বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গগুলি এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।

"স্থলে শৈলে সূর্য কিরণ বিদ্ধ
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝাটি"

শ্রান্ত হয়ে আমরা যখন প্রসপেক্ট হিলে আরোহণ করলুম তখন চতুর্দিকের অরণ্য পর্বতের অভ্যন্তর দেশ থেকে কারা যেন গম্ভীর স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করছিল। সত্যি কোথায় গেল প্রত্যুষবেলার সেই দিগন্তাবৃত কুজ্ঝাটিকা? প্রসন্ন রৌদ্রে এখন সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি ঝলমল করছে। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। দেওদার বনের প্রশান্তিতে মনে হয় যেন কোনও তপোবন আশ্রমে এসেছি আমরা। এখান থেকে কিছুদূরে Chadwick নামে একটা খুব বড় জলপ্রপাত আছে। সে পথ নাকি ভীষণ অরণ্য সঙ্কুল ও দুর্গম। আমরা ভেবেছিলুম ঝরণা দেখতে যাবো কিন্তু স্থানীয় সকলেই নিষেধ করলেন ওপথে যেতে। কাজেই আমাদের ঝরণা দেখা আর হোলনা। দেওদার বনের ছায়ায় আমরা বসেছিলুম। বহুদূরে আকাশের বুকে ঝলমল করছে হিমালয়ের রজতশুভ্র তুষারকিরীটগুলি। সিমলার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই এই কাঞ্চনিভহিমচূড়াগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। যেদিকে তাকাও সুন্দর সুবিন্যস্ত অরণ্যরাজি, আর তরঙ্গায়িত শৈলমালা। তৃণাচ্ছাদিত বনতল নানা বর্ণের বন্যপুষ্পের সমারোহে সুন্দর হয়ে উঠেছে। সিমলা হিমালয়ের মধ্য শাখায় অবস্থিত। কিছুক্ষণ এই বনের মধ্যে অবসর যাপন করলে মনে হয় আমরা পরিচিত পৃথিবী থেকে যেন অনেক দূরে চলে এসেছি। বাতাসে ঘুরপাক খাওয়া পাইনের ঝরা পাতার সঙ্গে মনে ঘুরপাক খায় বনের রহস্যের কথা, শব্দাতীত সম্ভাবের কথা। গভীর অতল গিরিখাদের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে ছন্দা পাপড়ী ভাদুড়ীকে জিজ্ঞাস করে ওই বনের মধ্যে কি বাঘ ভল্লুক আছে? হোটেলে ওরা শুনেছে সিমলার আশে পাশের অরণ্যভূমিতে ও গিরিগহ্বরে অনেক প্রকার হিংস্র জন্তু আছে। তার মধ্যে বেশী দেখা যায়, চিতাবাঘ, কৃষ্ণ ভল্লুক, বন্য ছাগল ও কস্তুরী মৃগ। পাখীদের মধ্যে দেখা যায় বন্য মুরগী তিত্তির পাখী ও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম না জানা পাখী। শুনেছিলুম নিকটেই নাকি কমলাদেবীর মন্দির আছে। কিন্তু বেলা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের মন্দির দেখা আর হয়নি।

আর দুদিন পরে দুর্গাপূজার বোধন। এই সুদূর হিমালয়ের কোলেও শারদোৎসবের সাড়া জেগে উঠেছে। কালী বাড়ীর সমস্ত ও স্থানীয় বাঙ্গালী বাসিন্দারা সব কর্মব্যস্ত। হোটেলের দুতলার প্রশস্ত হলে দুর্গাপূজা, নাটকাভিনয়, শিল্প প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। একজন শিল্পী নিবিষ্ট মনে প্রতিমা নির্মাণ করছেন। ওদিকে আর একদল শিল্পী নাটকের পার্ট মুখস্থ করছেন। সকলেই কর্মচঞ্চল। সকলেই আমাদের এখানকার পূজা দেখে যাওয়ার জন্ত অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমাদের হবে না। কেন না ষষ্ঠীপূজার দিনই আমাদের দিল্লীর পথে রওনা হতে হবে। সিমলার বনময় পথে ঘুরে দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে গেল।

সেদিন সকাল বেলায় আমরা বেরিয়ে পড়লুম জাকুখিলের উদ্দেশে। জাকু পাহাড় ম্যাল থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে। সিমলার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ভ্রমণের যে মনোরম স্থানটী আছে তার নাম হাটুপিক। হাটুপিকের উচ্চতা ১০০০০ ফুট। সেখান থেকে আরও দুটী চমৎকার নৈসর্গীর সুষমার রাজ্যে যাওয়া যায়। বগি আর খাদরালা। বগি ৭ মাইল দূরে আর খাদরালা ৯ মাইল দূরে Clpper Tibbet Roadএ অবস্থিত ওখানে ভ্রমণকারীদের বিশ্রামের জন্ত বনবিভাগের রেস্ট হাউস, ডাকবাংলো ইত্যাদি আছে।

সিমলার একটি মজার দৃশ্য যে রাস্তাগুলি থাকে থাকে সাজানো নীচে থেকে উপরে পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে উঠেছে। প্রত্যেকটী পথের সঙ্গে প্রত্যেকটীর যোগাযোগ রয়েছে। উপরে দাঁড়িয়ে নীচের পথগুলি সুন্দর—ঠিক ছবির মত দেখায়। স্ক্যাণ্ডাল পইণ্ট, এখন তার নাম হয়েছে লাজপত রায় স্কোয়ার ঠিক ম্যালের মত আর একটী প্রশস্ত সমতল ভূমি। এখানে লালা লাজপাত রায়ের একটী মর্মর মূর্তি স্থাপিত আছে। এটা সহরের কেন্দ্র বিন্দু। এখানে সমস্ত প্রয়োজনীয় দোকান বাজার ইত্যাদি আছে। ম্যালের কাছেই লক্কর বাজার। রোজ বেড়াতে বেরিয়ে নীচে যখন

সিমলায় মল্

পা ক্রমে অবশ হয়ে যেতো তখন এখানে একটা চায়ের দোকানে বসে আমরা চা খেতুম। চাওয়ালা মানুষটার ব্যবহার ভারী অমায়িক। জলন্ত উনানের ধারে চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে আমরা বসতুম, আর সে কাজ করতে করতে বলতো তার দেশের গল্প। গিরিখাদের ধারে টিনের ছাউনী দেওয়া ছোট্ট দোকান ঘরটার মধ্যে বসে তার পঞ্চনদীর দেশের হৃদয়গ্রাহী গল্প শুনতে বড় ভালো লাগত। লক্কর বাজারের পর থেকে সুরু হয়েছে—টিবেট হিন্দুস্থান রোড। তিব্বত এই পথে মাত্র দুশো চল্লিশ মাইল দূরে। মনে অদ্ভুত শিহরণ জাগে। সেই বরফের দেশ লামার দেশ, সংস্কারের দেশ মানস সরোবরের দেশ তিব্বত ; সে তাহলে এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

এখান থেকে হিমালয়ের যে তুষার চূড়াগুলি দেখা যায়, সেগুলি কারাকোরাম রেঞ্জ। এই শৃঙ্গগুলি আকাশের উত্তর পূর্ব প্রান্ত বেষ্টন করে কোহিনূর মণির মত জ্বল জ্বল করছে। ম্যাল থেকে আকাশের রূপলোক পরিপূর্ণভাবে দেখা যায়।

জাকু পাহাড়ের পথটা সেই পাকদণ্ডীর মত ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। এই পথে একটি সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ আছে। একটানা পাহাড়ে ওঠা বড় কষ্টকর। ছন্দা পাপড়ী কাঠবিড়ালীদের লুকোচুরী খেলা দেখতে দেখতে আমাদের আগেই পথ অতিক্রম করছিল। মধ্যে মধ্যে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে একটু বিশ্রাম করে ক্রমশঃ আমরা হিমালয়ের নিবিড় সান্নিধ্যে উপনীত হতে লাগলুম। এই পথে ঘাসের রং ভারী সুন্দর। একেবারে সবুজ। মনে হয় কে যেন রং আলিম্পনা করে দিয়েছে। প্রায় অর্দ্ধেকটা অতিক্রম করার পর ক্রমশঃ পথ সঙ্কীর্ণ হতে সুরু করল। গহীন অরণ্য জালে চতুর্দিক অন্ধকার। মনে হোল এখানে কখনও সূর্যালোক প্রবেশ করে না। পায়ের নীচে প্রস্তরাকীর্ণ বন্ধুর পথ জলসিক্ত পিচ্ছল। তার একধারে পর্বতের প্রাচীর অপরধারে অতল অন্ধকার অরণ্যময় গিরিখাদ। সে দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। এক সময় দেখা পেল নিবিড় গভীর দেওদার ও কিলু বৃক্ষের বন। এদের গগনচুম্বী হিল্লোলিত শ্যামশোভা বনস্পতির অটল গাম্ভীর্যে সমাধিস্থ। শুধু বাতাসে থর থর করে কাঁপছে চিকন পত্রাবলী। বনের অভ্যন্তর থেকে ডাকছে পাপিয়া, বউ কথা কও সেই পরিচিত মিষ্ট সুরে। হিমস্নিগ্ধ বাতাসে দেহ মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। পল্লব মর্মরে অস্পষ্টে কারা যেন কাণে কাণে কথা বলে। মহাশূন্যে বিচরণশীল ইসারায় ডাকে "এস, এস আরও এগিয়ে এস," মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদা এই পথে ভ্রমণ করে আত্ম-সমাহিত হয়েছিলেন। তাঁর পদচিহ্ন এখনও যেনো মিলিয়ে আছে তৃণাচ্ছাদিত এই মৃত্তিকাগর্ভে। এ পথের এমনি মায়া, এমনি মাধুরী যে পথিকের সঙ্গী সাথী, এমন কি নিজের কথাও ভুলিয়ে দেয়। শুধু দুর্বার আকর্ষণে কাছে টানে। অসীম স্থৈর্যে মনকে স্তব্ধ করে দেয়। জেগে থাকে শুধু একটা রহস্যাকুল দুজ্ঞের্য়র ব্যাকুলতা।

এক সময়ে চোখে রশ্মি ঝলসিত হতে দেখা গেল আমরা পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছি। এখানে দুটী পথ দুইদিকে চলে গেছে। আমরা ভাবছি কোন্ পথে যাবো? এমন সময়ে সেখানে একটি ডাক-পিওনকে দেখে ভাদুড়ী জিগ্যেস করলেন পথের কথা। সে মন্দিরের পথ দেখিয়ে দিল। অদূরে একটা Radio অফিস আছে। জাকুর চূড়ায় উঠে আমরা অবসন্ন হয়ে বসে পড়লুম। এখানে হনুমানদের অবাধ রাজত্ব। একটি পাথরের মন্দিরে হনুমানের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মন্দির চত্বরের বেদীগুলিতে হনুসম্প্রদায় ঠিক মানুষ ভক্তর মত অবিচল নিষ্ঠায় স্থির হয়ে বসে রয়েছে। ঠিক মনে হয় যেন মন্দিরের প্রহরী। এদের দেখে মনে হয় সুদূর ভবিষ্যতে এরাও হয়ত মানুষে পরিণত হবে। কালান্তরে সভ্য মানুষে তখন হয়ত হাইড্রোজেন বোমার সার্থকতায় পৃথিবী থেকে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।

মন্দির দর্শন করে আমরা দেওদার বনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনেই নীল আকাশের উদার বিস্তৃতিতে বৈদূর্য মণিকার প্রাসাদের মত ঝলমল করছে কারাকোরাম পর্বতের হিমচূড়াগুলি। প্রভাত সূর্যের সুবর্ণাভাস অনবদ্য শোভা ধারণ করেছে। তারপর স্তরে স্তরে নেমে এসেছে অগণিত পর্বতমালা। নীল, সবুজ, ধূসর। মহাশূন্যের পাদপীঠ চক্রাকারে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে নানা বর্ণানুরঞ্জিত পর্বতের স্রোত। প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল প্রাণময়।

একটা গাছে দোলনা খাটানো ছিল। ছন্দা পাপড়ী তাইতে বসে দুলছে। হঠাৎ বনের কোন প্রান্ত থেকে টুংটাং বাজনার শব্দ ভেসে আসতে ভাদুড়ী বললেন, রেডিও অফিস দেখতে যাবো। সুতরাং আমাদের উঠতে হোল। আমাকেও প্রতি মুহূর্ত মাটী টানছে, পায়ের নীচের ঘাস ফুলের পাপড়ী নেড়ে, বলছে, না, না, যেওনা—আর একটু থাকো" নিরুপায় আমরা। ঘাসে মস্তক স্পর্শ করে সেখানে রেখে এলুম হিমালয়ের উদ্দেশে প্রাণের অনন্ত প্রণাম।

—

ড্রাগন রাজার মেয়ে

শ্রীননীগোপাল দত্ত

ই-ফেঙ্‌ যুগে লিউ-ই নামে একজন শিক্ষার্থী সরকারী পদ বিষয়ক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে অকৃতকার্য্য হয়েছিল। সিয়াং নদীর উপত্যকা ধরে ফিরবার পথে সে চি-ইয়াঙ্‌-বাসী একজন বন্ধুর নিকট বিদায় নিতে চলেছিল। দুমাইল চলার পর তার ঘোড়াটি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লিউ তাকিয়ে দেখল রাস্তার পাশে মেষপালপরিবৃতা একটি সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু তার পোষাকগুলো কাদায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তার মুখখানি খুবই করুণ দেখাচ্ছিল।

লিউ জিজ্ঞেস কর্‌ল, "তোমার এমন শোকাকুল অবস্থা কেন?"

মেয়েটি মৃদু হেসে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বল্‌ল, "আমি বড় দুঃখিনী। তুমি আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞেস করেছ, তোমার কাছে আর গোপন করে কি লাভ! তাঙ্‌তিঙ্‌ হ্রদের ড্রাগন রাজার ছোট মেয়ে আমি। আমার মা বাপ আমাকে চিঙ্‌ নদীর ড্রাগন রাজার মেজ ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমার স্বামী খুব উচ্ছৃঙ্খল ছিল। সে আমার সাথে খুব দুর্ব্যবহার করত এবং দিন দিন তা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি আমার শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে বিফল হয়েছিলাম। ক্রমাগত প্রতিবাদ জানাতে তারা রুষ্ট হয়ে আমাকে এখানে নির্বাসিত করেছে।" এই বলে মেয়েটি উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেংগে পড়ল।

খানিকবাদে মেয়েটি আবার বলল, "তাঙ্‌তিঙ্‌ হ্রদটা অনেক দূরে দিগন্তের পাশে। তাই আমি আপনজন কাউকে খবর দিতে পারছি না। তুমি হ্রদের পাশ দিয়েই যাবে, তাই তুমি যদি আমার একটি চিঠি নিয়ে যেতে?"

লিউ প্রত্যুত্তর করল, "তোমার দুঃখের কথা শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে পাখীর মত উড়ে যেয়ে সেখানে খবরটা দিয়ে আসি।

চোখমুছে মেয়েটি বলল, "তোমার দয়ার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। যদি কখনও আমি তাদের কাছ থেকে উত্তর পাই, তবে নিজ জীবনের বিনিময়েও তোমার দয়ার প্রতিদান আমি দেব।

লিউ এবার বলল, "কিন্তু হ্রদটা খুব গভীর। সেখানে কেমন করে আমি খবর নিয়ে যাব?"

মেয়েটি বলল, "হ্রদের দক্ষিণ তীরে একটি বড় কমলালেবু গাছ আছে। সেটি সেই গাঁয়ের খুব পবিত্র বস্তু। কটিবন্ধটি খুলে নিয়ে গাছের গুঁড়িতে তিনবার আঘাত করবে। তাহ'লে কেউ একজন তোমার কাছে আসবে। তাকে অনুসরণ করলেই তোমার আর কোন অসুবিধা হবে না। সরল হৃদয়ে বিশ্বাস করে তোমাকে চিঠিখানি দেব। যা কিছু দেখলে মা বাবার কাছে বলো। আর আমাকে কখনও ভুলে যেও না।"

লিউ শপথ করলে, মেয়েটি নিজের পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে লিউর হাতে দিয়ে নমস্কার জানাল। তারপর সর্বক্ষণ পুবদিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগল। তাতে লিউর মনটি আরও চঞ্চল হয়ে উঠল।

তারপর লিউ বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে পুবদিকে যাত্রা সুরু করল। সেদিন সন্ধ্যায় সহরে পৌঁছে বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে তাঙ্‌তিঙ্‌ হ্রদে যাত্রা করল। হ্রদের দক্ষিণ তীরে পৌঁছে সে একটি কমলালেবুর গাছ দেখতে পেল। কটিবন্ধটি দিয়ে তিনবার আঘাত করতেই জল থেকে একটি সৈনিক পুরুষ বেরিয়ে এল। লিউকে অভিবাদন করে সে জিজ্ঞেস করল, "হে সম্মানিত অতিথি, এখানে আপনার কি জন্য আগমন?"

তাকে অন্য কোন কথা না বলে লিউ শুধু বলল, "তোমাদের রাজার সাথে দেখা করতে চাই।"

তখন সৈনিকটি তরংগগুলি সরিয়ে পথ করে দিল আর নীচের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "আপনার চোখ বন্ধ করুন, আমরা এক্ষুনি সেখানে পৌছে যাব।"

শীঘ্রই তারা একটি বিরাট প্রাসাদে উপস্থিত হ'ল। সেখানে লিউ দেখল সারি সারি উচ্চ প্রাসাদ, লক্ষ লক্ষ ফটক, খিলান এবং পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষরাজি সব রয়েছে। সৈনিকটি তাকে নিয়ে একটি বিরাট কক্ষে এল। চারপাশে তাকিয়ে মহার্ঘ্য বস্তু পরিপূর্ণ দেখে লিউ বিস্মিত হ'ল। স্তম্ভগুলো ছিল শুভ্র প্রস্তর নির্মিত, সোপানরাজি ফিরোজ-মণির, পালংকগুলো প্রবাল এবং পর্দাগুলো স্ফটিক নির্মিত। মরকতমণি শোভিত চৌকাঠ স্ফটিক আর রামধনু বর্ণের কড়িকাঠগুলো সুগন্ধি রজন খচিত ছিল। সব কিছু মিলে একটি বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের এবং অতলস্পর্শী গভীরতার প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ড্রাগন রাজার আসতে দেরী আছে দেখে লিউ সৈনিকটিকে জিজ্ঞেস করল, "তাঙ্‌তিঙের সম্রাট কোথায়?"

সৈনিকটি বলল, "মহারাজ এখন "ডার্ক পার্ল" শিবিরে সূর্য্য পুরোহিতের সাথে অগ্নিশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করছেন।

লিউ জিজ্ঞেস করল, "অগ্নিশাস্ত্রটি কি?"

সৈনিক পুরুষ উত্তর করল, "আমাদের সম্রাট একজন ড্রাগন, তাঁর সামগ্রী জল। এক ফোঁটা জল দিয়ে তিনি বহু পর্ব্বত উত্যকা ভাসিয়ে দিতে পারেন। পুরোহিত একজন মানুষ, তাঁর সামগ্রী অগ্নি। একটি মশাল দিয়ে তিনি সমস্ত প্রাসাদ জ্বালিয়ে দিতে পারেন। উপকরণ সামগ্রীর বিভিন্নতার জন্য তাদের ফলও ভিন্ন প্রকার। সূর্য্য পুরোহিত মনুষ্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাই আমাদের সম্রাট তাঁকে আলোচনার জন্য ডেকেছেন।"

তার কথা শেষ হবামাত্র প্রাসাদের দরজা খুলে গেল। কুয়াশার মাঝে ফিরোজমণির তৈরী রাজদণ্ড হাতে রাজকীয় পরিচ্ছদ ভূষিত একব্যক্তি প্রবেশ করলেন। সৈনিকটি তাকে অভিবাদন করে লিউকে বলল, "ইনিই আমাদের সম্রাট।"

ড্রাগন রাজা লিউর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি পৃথিবীর লোক না?"

লিউ সম্মতি জানিয়ে অভিবাদন করল।

তারপর ড্রাগন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের জল-রাজ্য অন্ধকার এবং গভীর। আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি জন্য এতদূর এসেছ?"

লিউ বলল, "মহারাজ, কিছু পূর্ব্বে আমি একটি পদ বিষয়ক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে চিঙ্‌ নদীর উপত্যকা ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। উন্মুক্ত মাঠে আপনার মেয়েকে একাকী মেষপালবৃতা অবস্থায় দেখতে পেলাম। ঝড় আর বৃষ্টির মাঝে তার অবস্থা অতি শোচনীয় হয়েছিল। সে আমাকে বলল যে স্বামীর নির্দ্দয়তা আর শ্বশুর শাশুড়ীর অবহেলাতেই তার এ অবস্থা হয়েছে। তার করুণ ক্রন্দনে আমি ব্যথা পেয়েছিলাম। সে আমাকে এই চিঠিখানি দিয়েছে। এই বলে সে চিঠিখানি বের করে রাজার হাতে দিল।

চিঠিখানি পড়ে রাজা দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, "আমি পিতা হয়েও কানা আর অন্ধের মত অসতর্ক ছিলুম। তুমি অপরিচিত হয়েও তাকে রক্ষা করতে এসেছ। যতদিন আমি বাঁচবো তোমার দয়ার কথা ভুলবো না।"

প্রাসাদের একজন সংবাদবাহককে দিয়ে রাজা চিঠিটি অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। তখন অন্তঃপুর হ'তে ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল! রাজা ব্যস্ত হয়ে তার অনুচরদের আদেশ করলেন, "মেয়েদের অত গোলমাল করতে মানা কর। চিয়েনটাঙের রাজকুমার হয়তো শুনতে পাবে।"

লিউ জিজ্ঞেস করল, "রাজকুমারটি কে?"

ড্রাগণ রাজা বললেন, "আমার ছোট ভাই। সে চিয়েনটাঙ্‌ নদীর যুবরাজ ছিল, সম্প্রতি পদত্যাগ করেছে।"

"তার কাছে এ সংবাদ গোপন করতে চাইছেন কেন?"

"সে অতিশয় ক্রোধী। প্রাচীনকালে রাজর্ষি ইও সময় নয় বৎসর ব্যাপী যে প্লাবন হয়েছিল, সেটা এর ক্রোধের ফলে। অধুনা সে স্বর্গীয় দেবদূতদের সাথে কলহ করেছিল এবং পাঁচটী পর্ব্বত প্লাবিত করেছিল। আমি কিছু ভালো কাজ করেছিলাম বলে তার বিনিময়ে স্বর্গীয় রাজা আমার ভাইকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাকে এখানে আটকে থাকতে হয়েছে। চিয়েনটাঙের অধিবাসীরা এখনও তার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় রয়েছে।"
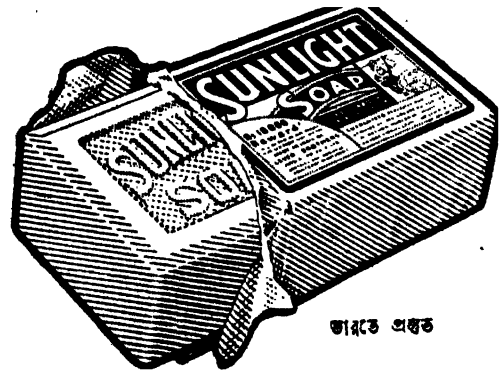
রাজা তাঁর কথা শেষ করবামাত্র একটা ভীষণ গর্জন শোনা গেল। সমস্ত প্রাসাদটি কেঁপে উঠল। হাজার ফুটের চাইতেও দীর্ঘ একটি রক্তবর্ণের ড্রাগণ বেরিয়ে এল। যে প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভটির সাথে স্বর্ণ শৃংখল দিয়ে ড্রাগণটির গলদেশ বাঁধা ছিল সেটি টেনে নিয়ে আসতে লাগল। আলোর মত এর চোখগুলো ছিল উজ্জ্বল, জিহ্বাটি ছিল রক্তের মত লাল, কেশরগুলো ছিল আগুনের মত তপ্ত। এর চতুষ্পার্শে বজ্রধ্বনিত হতে লাগল আর বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তারপর এটি নীল আকাশে উড়ে গেল।

আতংকগ্রস্ত লিউ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। এবার রাজা নিজে তাকে উঠতে সাহায্য করতে করতে বলল, "ভয় নেই, আমার ভাই ওভাবেই যায়, কিন্তু ফিরবার সময় ওভাবে আসেনা।"

রাজার আদেশে ভোজ্য ও পানীয় পরিবেশনা করা হল এবং তাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় করার জন্য তারা পানভোজন সুরু করল।

তারপর উড়ন্ত পতাকা আর বংশীধ্বনির মাঝে হাজার হাজার মেয়ে এল। তাদের ভিতর একটি সুন্দরী মেয়ে উজ্জ্বল অলংকারে সজ্জিতা এবং সূক্ষ্মরেশমীবস্ত্রে ভূষিতা ছিল। লিউ চিনতে পারল এই মেয়েটিই তাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল।

রাজা হেসে লিউকে বললেন, "চিঙ্ নদী থেকে বন্দিনী এসে পড়েছে।"

এর পরে রাজোচিত পোষাক পরিহিত একজন প্রবেশ করল। রাজা পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এই হচ্ছে চিয়েন-টাঙের যুবরাজ।"

লিউ তাকে অভিবাদন করল। যুবরাজ প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে বলল, "আমার দুঃখিনী ভাইঝি সেই বদমাশটার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল। আপনি সেই দুঃখের সংবাদটী বহন করে এনে খুবই ভাল কাজ করেছেন। তা নইলে তার দুঃখ দূর হ'ত না। আমাদের কৃতজ্ঞতা বলে প্রকাশ করতে পারছিনা।"

সেদিন সন্ধ্যায় লিউকে "ফ্রোজেন লাইট" কক্ষে একটি ভোজসভায় সমাদৃত করা হ'ল। পরদিন তাকে "এমারেল্ড প্যালেসে" আর একটি ভোজ দেওয়া হ'ল। রাজ-পরিবারের সবাই সেখানে সম্মিলিত হয়েছিল। সংগীতের সাথে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য এবং পানীয় পরিবেশনা করা হয়েছিল। দশ সহস্র সৈনিক পতাকা, তরবারি এবং কুঠার হস্তে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে এল। একজন এগিয়ে এসে ঘোষণা করল যে এটী চিয়েনটাঙের যুবরাজের বিজয়যাত্রা। এরপর এক সহস্র মেয়ে উজ্জ্বল সাজে সজ্জিতা হয়ে গান গাইতে গাইতে এল। একজন এগিয়ে এসে ঘোষণা করল যে এটী রাজকুমারীর প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে।

তারপর রাজা লিউকে একটি মহামূল্যবান প্রস্তর নির্ম্মিত আধার উপহার দিলেন। এর ভিতরে ছিল একটি গণ্ডারের শিং যা তরংগের ভিতর পথ নির্দ্দেশ করে। যুবরাজ একটি স্ফটিক নির্ম্মিত আধার উপহার দিলেন। এর ভিতরে ছিল একটি মূল্যবান সবুজ পাথর যা রাত্রে উজ্জ্বল আলো দেয়। তারপর প্রাসাদের অধি-বাসীরা রেশমীবস্ত্র এবং অলংকার রাশি এনে তার পাশে জড় করতে লাগল যে পর্য্যন্ত না সেগুলো স্তূপীকৃত হয়ে উঠল।

পরদিন তাকে আবার "লিম্পিড লাইট" শিবিরে ভোজ দেওয়া হ'ল। চিয়েনটাঙের যুবরাজ প্রচুর মদ্য পান করে উদ্ধত স্বরে লিউকে বললেন, "একটি কঠিন পাথরকে বলপূর্ব্বক চূর্ণ করা যেতে পারে, কিন্তু সেটিকে নমনীয় করা চলেনা। একটি সাহসী লোক মৃত্যুকে বরণ করতে পারে, কিন্তু অপমান স্বীকার করেনা। আমি তোমার কাছে এরকম কিছু প্রস্তাব করছি, যদি তুমি সম্মত হও তবে আমাদের উভয়েরই ভালো হবে। নচেৎ আমরা পরস্পরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হব। তুমি জানো আমাদের সম্রাট কন্যা অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। কিন্তু এখন সে সব দুর হয়েছে। আমরা তাকে তোমার হাতে সমর্পণ করতে চাই। তাহ'লে তোমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হবে। আর আমরা ভাবতে পারবো যে সে সৎপাত্রে পড়েছে। বল, তুমি কি রাজী ?"

লিউ মুহূর্ত্তের জন্য বিষণ্ণ হয়ে পরে হেসে বলল, "আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে চিয়েনটাঙের যুবরাজ এরূপ অসামঞ্জস্য উক্তি করবেন। আপনি মানবোচিত আকৃ

সম্পন্ন এবং মনুষ্যনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। তবু আনন্দমগ্ন অতিথি সমাকুল এই সংগীত সভায় আপনি বলপূর্ব্বক অসম্মানজনকভাবে আপনার ইচ্ছা পালন করবার জন্য আমায় বাধ্য করতে চাইছেন। যদিও আমি এত ছোট যে আপনার একটি আঁশের নীচে লুকিয়ে থাকতে পারি, তবু আমি আপনার ক্রোধে ভীত নই। আশা করি আপনি আপনার প্রস্তাব পুনর্ব্বিবেচনা করবেন।"

তখন যুবরাজ ক্ষমা চেয়ে বললেন, "রাজপ্রাসাদে মাতৃহীন স্নেহে বড় হয়ে আমার ভব্যতা শেখা হয়নি। আমি অন্যায় ভাবে কথা বলে আপনার মনে আঘাত দিয়েছি। কিন্তু আমি আশা করি এতে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবেনা।" সে-রাত্রে তারা একত্রে খুব অন্তরংগ ভাবে পানভোজন করল।

পরদিন লিউ যাবার জন্য অনুমতি চাইল। রাণী "হিডেন লাইট" কক্ষে আর একটি ভোজের ব্যবস্থা করল। ভোজের শেষে রাণী চোখমুছে বলল, "আমার মেয়ে তোমার কাছে যে ঋণী তা আমরা কখনও শোধ করতে পারবো না। তোমাকে বিদায় জানাতে আমাদের খুবই দুঃখ হচ্ছে।"

যুবরাজের প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে লিউ এবার মনে মনে অনুতপ্ত হ'ল।

লিউ যে-ভাবে এসেছিল, সে-ভাবেই হ্রদ ত্যাগ করল। কয়েকজন অনুচর তার ব্যাগগুলো বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিল।

লিউ ইয়াঙ্‌ চাও নগরে এক মণিকারের দোকানে কিছু অলংকার বিক্রয় করতে গেল। যদিও সে সমগ্র ধনরাশির এক শতাংশও বিক্রয় করে নি, তবু হুয়াই নদীর পশ্চিমের সকল ধনীর চাইতে সে বিত্তবান বলে পরিচিত হ'ল।

এর পর লিউ চ্যাং নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করল। কিন্তু শীঘ্রই মেয়েটি মারা গেল। তার পর সে হ্যান্‌ নামে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করল। কিন্তু কয়েক মাস পরে এ মেয়েটিও মারা গেল। তার পর লিউ নানকিংএ চলে গেল।

নিঃসংগতার জন্য সে আর একটি বিয়ের চেষ্টা করছিল। এ সময় একটি ঘটক এক সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী মেয়ের খবর দিল। এক শুভ দিনে লিউর সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। দুটী পরিবারই ধনী ছিল বলে তাদের উপহার সামগ্রী এবং সাজ-সজ্জার ছটায় নানকিংয়ের অধিবাসীরা মুগ্ধ হয়ে গেল।

কিছুদিন পর তাদের একটি সুন্দর সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। এর পর একদিন লিউর স্ত্রী সুন্দর সাজ পোষাক পরে সকল আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করল। সমবেত অতিথিদের সামনে মৃদু হেসে সে তার স্বামীকে বলল, "আমি ড্রাগন রাজার মেয়ে। পূর্ব্ব স্বামীর কাছে যন্ত্রণা পাওয়ার পর তুমি আমায় মুক্ত করেছিলে। আমি বলেছিলাম তোমার দয়ার প্রতিদান দেব। কিন্তু তুমি আমার কাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আমাদের পৃথক হবার পর আমরা দুটী বিভিন্ন মণ্ডলে বাস করেছি এবং তোমাকে খবর জানাবার আমার কোন উপায় ছিল না। তুমি চ্যাং এবং হ্যান্‌ পরিবারের দুটী মেয়েকে বিয়ে করেছিলে। কিন্তু আমাদের করার কিছুই ছিল না। ঐ মেয়ে দুটী মারা যাওয়ার পর তুমি এখানে বসবাস করতে এলে। আমার মা বাবা তখন আমাদের মিলনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি যে তোমার স্ত্রী হ'তে পারবো, এ রকম সাহস আমার ছিল না।"

খানিক চুপ করে সে আবার বলল, "আমার পরিচয় আগে প্রকাশ করি নি, কারণ তুমি আমার প্রতি আগ্রহশীল ছিলে না। এখন আমি বলতে পারছি, কারণ আমাদের সন্তানের সাথে সাথে ভালবাসাও গভীর হয়েছে।"

লিউ এবার বলল, "সবই ভাগ্যবলে ঘটে গেছে। যুবরাজ যখন আমাদের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন, তখন আমার মনে হ'ল তিনি আমাকে তর্জ্জন করছেন। কিন্তু বিদায়ের সময় আমার পূর্ব্ব উক্তিতে মর্ম্মাহত হয়েছিলাম। যাই হোক্‌, তুমি এখন স্যু পরিবারের স্ত্রী হয়েছ। তোমার প্রতি আমার আন্তরিকতা আরও বেড়ে গেছে।"

লিউর স্ত্রী মুগ্ধ হয়ে বলল, "কেবলমাত্র মানুষরাই যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা নয়, আমি তোমার দয়ার প্রতিদান দেব। ড্রাগনরা দশ হাজার বছর বাঁচে। আমার সমস্ত জীবন তোমার সাথে অর্দ্ধেক করে ভাগ করে নেব। আমরা মুক্ত ভাবে সমুদ্র ও পৃথিবীতে ভ্রমণ করব।"

তারা আবার হ্রদে যাওয়ার পর যে রাজকীয় অভ্যর্থনা পেল তা বর্ণনাতীত।

তারা নান্‌হাই সহরে ৪০ বছর বাস করার সময় তাদের প্রাসাদগৃহ, সাজ-সজ্জায় সেখানকার লোকেরা মুগ্ধ হয়েছিল। লিউর চিরস্থায়ী যৌবন সকলকে বিস্মিত করেছিল। কিন্তু কাইউয়ান যুগে রাজা দীর্ঘ জীবনের গোপনীয় তথ্য জানতে আগ্রহশীল হওয়ায় লিউ তার স্ত্রীকে নিয়ে হ্রদে ফিরে এল।

একবার লিউর খুড়তুতো ভাই স্যুয়েকে রাজধানীর শাসকের পদ হারিয়ে কর্মব্যপদেশে দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশে যেতে হয়েছিল। তাঙ্‌তিঙ্‌ হ্রদ অতিক্রম করার সময় পরিস্কার দিনের বেলা সে দেখতে পেল যেন একটা সবুজ পাহাড় তরংগের ভিতর হ'তে বেরিয়ে আসছে। মাঝিরা ভয়ে সংকুচিত হয়ে বলল, "এখানে কখনও পাহাড় ছিল না। এটা নিশ্চয়ই একটা বিরাট জলজন্তু।"

এ সময় একটি ছোট নৌকা তাদের দিকে এগিয়ে এল এবং স্যুয়ের নাম ধরে ডেকে বলতে লাগল, "প্রভু লিউ আপনাকে তাঁর অভিনন্দন পাঠিয়েছেন।" তখন স্যুয়ে সব বুঝতে পারল। তখন তাদের অনুসরণ করে একটি বিরাট জলপ্রাসাদে উপস্থিত হ'ল। সেখানে লিউ স্যুয়ের হাত ধরে অভিনন্দন জানাল। চারি পাশের সাজ-সজ্জায় স্যুয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

লিউ বলল, "আমরা খুব দীর্ঘকাল পৃথক হই নি, তবু এর মধ্যে তোমার চুল ধূসরবর্ণ হয়ে উঠেছে।"

স্যুয়ে হেসে প্রত্যুত্তর করল, "তুমি ভাগ্যবলে অমর হয়েছ, আর আমি শুষ্ক অস্থিখণ্ডে পরিণত হয়েছি।"

লিউ স্যুয়েকে ৫০টি বড়ি দিয়ে বলল, "এর প্রত্যেকটি বড়ি তোমাকে আরও অতিরিক্ত একটি বছর করে পরমায়ু দেবে। যখন এগুলো শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার ফিরে এস। পৃথিবীর সংসারে বেশী দিন থেকো না, সেখানে বড় ক্লেশ ভোগ করতে হয়।"

এর পর মহানন্দে পান ভোজন করার পর স্যুয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করল।

লিউকে আর দেখা যায় নি। স্যুয়েকে প্রায়ই লোকের কাছে এই গল্প বলতে শোনা যেত। ৫০ বছর পরে স্যুয়ে পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল।

[চৈনিক লেখক Li Chan-wei লিখিত The Dragon King's Daughter গল্প অবলম্বনে]

শীত

অমল মুখোপাধ্যায়

(শেলী হইতে)

(১)

শীতে শাখায়
বিরহী একটি পাখী
কাঁদিছে ব্যথায়
তাহার সাথীর লাগি,
আকুল হইল ডাকি'।

(২)

তুহিন শীতল
বাতাস ছুটিছে হায়,
পাহাড়ী ঝরণা
জমিল তাহারি বায়—
নিঠুর শীতল বায়!

(৩)

পত্রবিহীন
ধুসরিত বনভূমে
ফোটে না কুসুম
ভোরের আলোর ঘুম,
অচেতন হিম-ঘুমে।

(৪)

নিথর নিচুপ
সাড়া নেই কোনখানে,
হুতাস হাওয়ায়
ঝরাপাতা শোক গানে.
বিষাদে বেদনা হানে।

এশীয় লেখক সম্মেলন

বিভা সরকার

লোকপরম্পরায় খবর পেলুম শীঘ্রই দিল্লীতে লেখকদের এক মহাসম্মেলন আহুত হবে। এর কয়দিন পরই P. E. N. থেকে চিঠি এল ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর সপ্তাহব্যাপী এক এশীয় লেখক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। এ খবর পেয়েই আমি নরেনদার কাছে যাই, উদ্দেশ্য তাঁরাও যাচ্ছেন কিনা জানা এবং এ সম্বন্ধে আরও বিশদ সংবাদ সংগ্রহ। নরেনদা বললেন তাঁকে ওরা form পাঠিয়েই দিয়েছে আর বলেছে KotaHouseএ ওঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওঁরা যাচ্ছেন শুনে আমিও পত্রপাঠ চিঠি দিলুম convenor মুলক রাজ আনন্দের নামে Keeling Road, New Delhi স্থিত ওঁদের অফিসে পত্রের জবাবে মুলকরাজ আমায় একটি form পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে জানালেন—এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার থাকলে আমি যেন তারাশঙ্করবাবু বা শচীন সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করি। চলেছি নরেনদার সঙ্গে। জানবার আবার থাকবে কি? যাওয়ার আয়োজনে লেগে যাই। নরেনদাকে অনুরোধ করি তিনি যেখানেই উঠবেন আমিও আছি তাঁর সঙ্গে। তাঁর ঘরের পাশেই যেন আমার জন্যও একটা ঘর থাকে। ওঁদের কাছে এ বিষয়ে নিশ্চিত ভরসা পেয়ে ভাবনা মুক্ত হই।

যাওয়ার মাত্র আর দিন দুই বাকি। ওঁরা খবর দিলেন বিদেশীয় লেখক এত বেশী এসেছেন যে ভারতীয়দের কাউকেই কোটা হাউসে স্থান দেওয়া সম্ভব হল না। বিদেশীরা আপনাদের অতিথি। কাজেই আমরা যেন কিছু মনে না করি। নিরুপায় নরেনদা আমাদের তাগাদায় Reading Roadএর কালিবাড়ীর guest houseএর কর্তাকে আর Calcutta Chemicalএর শ্রী ডি. পি. সেনকে টেলিগ্রাম করলেন। ইতিমধ্যে আমরা শ্রীঅনিলচন্দ্রের কাছে চিঠি লিখি। ওঁরা আমাদের অনেকদিনের বন্ধু। আমরা ভেবেছিলুম ওঁরা ২২শের পর দিল্লী থেকে চলে আসছেন। কিন্তু, অপ্রত্যাশিতে রাণীদির (রাণীচন্দ) আমন্ত্রণ টেলিগ্রামে যেমন নিশ্চিন্ত হলুম আবার এক যাত্রায় পৃথক ফল,—মন সংকুচিত হল দ্বিধায়। রাধারাণীদিরাই ছিলেন এতদিন ভরসা, এখন কেমন করে একা একা রাণীদির ওখানে উঠি। কুণ্ঠিত হয়ে খবরটা দিলুম রাধারাণীদিকে। সোৎসাহে জবাব দিলেন তিনি "তুমি নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাবে জেনে আমরা খুসী। তোমার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হলুম।" তবুও কিন্তু মনের সংকোচ কাটল না—এরপর হৈ হৈ করতে করতে ২১শে আমরা সদলবলে দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছাই। শ্রী ডি. পি. সেন বড় মোটর নিয়ে আমাদের জন্য Stationএ উপস্থিত ছিলেন।

এশিয় লেখক সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলী

(বাঁমদিকে শ্রীকাকা কালেলকার ও মুলুক চাঁদ আনন্দ এবং মধ্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়)

* * * *

বহুদিন পর সেই একান্ত পরিচিত দিল্লীর মাটিতে পা দিয়ে মন যে ঠিক আনন্দ পেয়েছিল তা বল্লে মিথ্যা বলা হবে। বহু বিগত ঘটনা

…স্মৃতপ্রায় স্মৃতির টুকরো মনের মধ্যে কলরোল করে উঠেছিল। মানুষের জীবনে যা যায় তা আর বুঝি ফিরে পাওয়া যায় না। যে দিল্লীর মাটি …ঠিক ১৯৩৯ সালে পা তুলেছিলুম …দিল্লী আমার কাছে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে।

এই কয় বছরে দ্রুতগীতিতে ঘটে গেল কত ঘটনা। কত পরিবর্ত্তন। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ইংরেজ যাওয়ার আগে শেষ আঘাত নির্ম্মম ভাবেই দিয়ে গেল। ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত করে অজস্র রক্তপাত আর বহু মানুষের চরম ক্ষতির বিনিময়ে মঙ্গলদ্রষ্টা মহাত্মাজীর অমতে মেনে নেওয়া হোলো খণ্ডিত ভারত। ফলে, যে বিপর্য্যয় সেদিন থেকে জাতির জীবনে আরম্ভ হল ভারতবাসী আজও সে আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারল না। তাইত আজ দিল্লীর চতুর্দ্দিকে এত পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে। উদ্বাস্তু সমস্যা এক মহাসমস্যা, দেশে আজও তার প্রকৃত সমাধান হয়নি। নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় নরেনদা ও রাধারাণীদির সঙ্গে নূতন দিল্লীর সোনেরীবাগের দিকে এগিয়ে চললুম। সেই চিরচেনা পথঘাট কেমন যেন অচেনা হয়ে গেছে। কত নতুন নতুন ইমারত উঠেছে। মাঠ ঘাট আর আগের মত খোলা মেলা নেই। কেবলই মনে হতে লাগলো কে যেন অদৃশ্য … এর কণ্ঠ চেপে ধরতে চায়। … রকম নতুন যান চলতে … ম। আগে কিন্তু শুধু টঙ্গাই …। পথে ঘাটে সর্ব্বত্র এমন হল্লা ভাব ছিল না। সে শান্ত … ভাতালা গতিতে চলমান সহর কলরোলমুখর ও মহাকর্ম্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভালমন্দ বলতে চাই না। তবে স্বাধীনতার সঙ্গে এরও … হয়েছে মানতে হবে।

রাণীদির সাদর সম্ভাষণ পথশ্রম ভুলিয়ে দিল। বহুদিন পর ভাল গোলাপ দেখলুম। মনপ্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল—সুন্দরতমের এ সুন্দর প্রকাশে। এক ছবি কেন অন্য ছবি মনে আনে? এক ঘটনা কেন

এশিয় লেখক সম্মেলনের প্রতিনিধি মণ্ডলী—(বাঁমদিক থেকে সামনের সারিতে কুমারী নবনীতা, প্রবন্ধ লেখিকা, কবি দম্পতি রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব)

দিল্লী পৌরসভা কর্ত্তৃক এশিয়ার লেখকগণের সংবর্দ্ধনা। (পৌরপ্রধান অভিনন্দন পাঠ করছেন)

আর এক ঘটনা মনে করিয়ে দেয়? এরও কোনও সদুত্তর পাই না। এ গোলাপবীথি আমায় মনে করিয়ে দিলো এই দিল্লীরই সেই Civil lineএর ওদিকে Underline Roadএর বাড়ীটি। অল্প কয়া

গোলাপগাছ ছিল। কিন্তু, কি অজস্র ফুল যোগাতো তারা। দিল্লীতে পা দিয়ে অবধি সেই বাড়ীর মায়া যে আমার মনে মনে টানছে এ আমি অস্বীকার করি কেমন করে।

রাণীদি শিল্পী। তাঁর শিল্পীমন যেন সোনেরী বাগের এ বাড়ীর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেলুম। আসবার আগে একটু দ্বিধা একটু সঙ্কোচ হয়েছিল বৈকি। মন বলেছিলো চতুর্দ্দিকে এত পরিবর্ত্তন, আর রাণীদি কি পরিবর্ত্তন মুক্ত? কিন্তু, দেখলুম রাণীদি আমাদের চিরদিনের রাণীদিই আছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

* * * *

এশীয় লেখক সম্মেলন ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নানা সাহিত্য-বিষয়ক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে শেষ হল।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে এ থেকে আমরা কি পেলুম এবং এর প্রয়োজনই বা কি ছিল? একি শুধুই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখকের খেয়াল খুশীর বিলাস? কেমন করে বলি এ কথা? এ সম্বন্ধে সুসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় যা বলেছিলেন আমি তারই পুনরুল্লেখ মাত্র করব। শুধু তিনিই বা বলি কেমন করে? এ কথা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীহুমায়ুন কবিরও বারংবার উল্লেখ করতে ভোলেননি। এর উদ্দেশ্য এশিয়া মহাদেশের সুধীজনেরা একত্রিত হয়ে পরস্পরের শিল্প সাহিত্য কলার আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরকে ভাল করে জানবার সুযোগ লাভ।

এশীয় দেশবাসী বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক, কবি নাট্যকার, প্রভৃতি বিদগ্ধজন একত্রিত হয়েছিলেন এই সভায়। অনেকেরই মতে পৃথিবীতে বহুজাতীয় লেখকদের এই প্রথম বিশ্ব-সাহিত্য সম্মেলন। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েটনাম (উত্তর ও দক্ষিণ), মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, ইরাণ, সিরিয়া, কোরিয়া ও এশিয়ার অবস্থি[ত] সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী নয়টি দেশের লেখক প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এ সভায়। আর এশিয়ার বাইরে থেকে দর্শক হিসাবে এসেছিলেন আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, লাতিন-আমেরিকা, ফিনল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিবর্গ। ভারত সংবিধানে স্বীকৃ[ত] চোদ্দটি ভাষার প্রতিনিধি ছাড়াও রাজস্থানী ও সিন্ধী ভাষার দাবি নিয়ে তাঁদের লেখকেরাও উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রায় চারশো সদস্য সম্মিলিত হয়েছিলেন এ সভায়। আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা জীবনে প্রথম এতগুলি বিভিন্ন দেশবাসীর প্রতিনিধিদের একত্রিত দেখতে পাওয়ার ও তাঁদের বিভিন্ন ভাষার শব্দতরঙ্গ কানে শোনবার সৌভাগ্য পেলেন। অবশ্য ইংরাজীর মাধ্যমেই তাঁদের বক্তব্য শোনা হ'ল। এরও একটা সাহিত্যিক মূল্য আছে এ কথা মানতেই হবে। প্রত্যেক প্রতিনিধির সঙ্গেই প্রায় দোভাষী ছিলেন। তাঁরা সুবোধ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করে যাচ্ছিলেন। এশীয় বাসীদের সাহিত্য-আলোচনায় এখনও যে ইংরাজী ভাষা অপরিহার্য্য এই সত্য অত্যন্ত প্রকট হয়েছিলো এ সভায়। এ সভাটি আহুত হয় নিউ দিল্লীর নবনির্ম্মি[ত] বিজ্ঞান ভবনে। এত বড় এবং এত আধুনিক রুচি সম্মত সভাগৃহ ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। নরেনদা বললেন য়ুরোপেও নেই। প্রচুর অর্থব্যয়ে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমস্ত সুবিধাই নেওয়া হয়েছে এটি প্রস্তুত করতে। [এ] হলটাতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিলো—কে বলে আমরা নিঃস্ব? কে বলে আমাদের জনগণ বুভুক্ষিত, দুর্দ্দশা পীড়িত। এ ইন্দ্রপুরী আমায় সচকিত করেছিলো। দিল্লী মহানগরীর বহু পুরাতন ও নূতন রাজকীয় ভবনের মধ্যে এটি একটি নিদর্শনযোগ্য বটে। বিজ্ঞান ভবনের প্রধান হলটিতে হেডফো[ন] অ্যাশট্রে-সমন্বিত আসনগুলি দর্শকদের ত্রুটিহীন সাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেছে [বলা] যেতে পারে।

ভারতীয় লেখকগণের দ্বারা অভারতীয় লেখক সংবর্ধনা
(এর মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও জার্মাণ প্রতিনিধিদের দেখা যাচ্ছে)

* * * *

২২ ডিসেম্বর সকালে বিজ্ঞান ভবনে গিয়ে দেখি চারিদি[কে] কলগুঞ্জন, নানাজাতীয় মানুষের ব্যস্ত ত্রস্ত পাদক্ষেপে মুখরিত উঠেছে করিডোরগুলি। অফিস ঘরের সামনে প্রত্যেক প্রতিনি[ধিকে] সম্মেলনের ব্যাজ দেওয়া হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর, মনোজ

Rexona
BLENDED WITH CADYL
এখন
রেক্সোনা
আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!

গোপাল হালদার, অন্নদাশঙ্কর, ভবানী ভট্টাচার্য্য, বাণী রায় প্রভৃতি প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা এসেছেন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের আসর জমেছে Reeding Roadএর Guest houseএ। হাওয়া কিন্তু কেমন যেন উল্টো দিকে বইছে বলে মনে হল। Convenor মুলকরাজ আনন্দ এবং আরও ২২জন সমন্বিত তাঁর Steering committeeর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রভাষাভাষী কিছু লেখকদের অভিযোগ রয়েছে দেখা গেল। steering committee গঠন করেছেন কারা এবং কাদের মতে—এ প্রশ্ন তোলা হয়। প্রশ্নকারীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান ও দিল্লীর কিছু লেখকরা ছিলেন। আরও এক অভিযোগ শোনা গেল—সেটি হচ্ছে এ সম্মেলন পরিচালিত হচ্ছে কোনও এক বামপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রভাবে। যাঁদের সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম তাঁদের অবশ্য আমি দলাদলির ঊর্দ্ধে বলেই জানি।

আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন (সোভিয়েৎ কবি গান শোনাচ্ছেন)

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাদের যে যার আসনে গিয়ে বসার আহ্বান জানানো হল। কাকাকালেলকার প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন, ইংরাজী ভাষা বয়কট করতে চেষ্টা করলে এশীয় সম্মেলনের একতা ও শৃঙ্খলা সৃজনে বিশেষ অসুবিধা ঘটবে। এর পর Begum Quashida Zaida সমবেত প্রতিনিধি মণ্ডলিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। মুলকরাজ আনন্দ, কুমার শ্রীজৈনেন্দ্র প্রভৃতিরা একে একে মঞ্চে গিয়ে বসেন। বাংলার তরফে শ্রীতারাশঙ্কর ও শ্রীঅন্নদাশঙ্কর গেলেন। সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি হুমায়ুন কবির বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দিল্লীর বাইরে ছিলেন। তখনও এসে পৌছান নাই। খবর পাঠিয়েছেন তিনি by plain এসে পড়লেন বলে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর অস্থায়ী সভাপতিরূপে নির্বাচিত হ'য়ে ভাষণ দিতে উঠলেন। এশীয় শিক্ষা সভ্যতার চিরদিনের মিলনক্ষেত্র। এই ভারতবর্ষের মাটীতে যে এশীয় লেখক সম্মেলন প্রথম আহূত হয়েছে এর জন্য তিনি বিশেষ আনন্দিত। সমস্ত সাহিত্যিকদের তিনি মনোমালিন্য ও বিরোধ ভুলে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের এশীয়বাসীদের মধ্যে হাজার পার্থক্য থাকা সত্বেও যে একই ভাবধারা, একই কৃষ্টি ফল্গুধারার মত যুগ যুগ ধরে প্রবহমান—একটু ভাল করে দেখলেই এ আমরা দেখতে পাবো। এ জিনিষটা আমরা ভারতবর্ষে ঠিক ততটা অনুভব করিনা যতটা আমরা England, France প্রভৃতি বিদেশীয় আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লে বোধকরি।

উজ্‌বেগীস্তানের মহিলা কবি আবৃত্তি করছেন

একজন ভারতবাসী সেখানে সহজেই আর একজন ভারতবাসীর আ... হয়ে দাঁড়ান। তিনি যে ভারতবাসী এ কথা বলে দিতে হয় না। ভারতবাসীর কাছে আর একজন ভারতবাসীর পরিচয় সে নিজেই। দুঃখ করে বললেন, আমাদের মধ্যে হয়ত এমন কিছু লোক আছেন আপন মাতৃভাষা ছাড়াও দুই একটি বিদেশীয় ভাষা অর্থাৎ Engli... French ইত্যাদি ভালভাবেই জানেন—কিন্তু আমাদের মধ্যে ক... এমন আছেন যাঁরা একাধিক ভারতীয় বা এশীয় ভাষা জানেন? সংখ্যা নিতান্তই কম। এমন কি নেই বললেও অত্যুক্তি করা হবে না, এ... সকলেই মানবেন। এইটি যাতে প্রসার লাভ করে তার জন্ম আমা...

...ষ্ট হতে হবে। এই সম্মেলন তবেই সফল হবে যদি আমরা পরস্পরকে জানবার, পরস্পরের ভাষা শিখবার, পরস্পরের সাহিত্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হবার অবকাশ পাই। ইতিমধ্যে হুমায়ুন কবির এসে পড়লেন এবং তাঁর ভাষণ দিলেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে যে সকল প্রশ্ন নিয়ে কিছু মতান্তর সৃষ্টি হয়—তার আলোচনা মধ্যাহ্নভোজের পর হবে হুমায়ুন কবির এই ঘোষণা করার পর সকালের সভা সেদিনের মত শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সকলেই আমরা Commission Room-এ গিয়ে বসলুম। আরম্ভ হল প্রশ্নোত্তরের পালা—কিছু বাক-বিতণ্ডার পর সভাপতি হুমায়ুন কবির মহাশয়ের মধ্যস্থতায় সব গোলমালের সমাধান হয়। অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি সভা পরিচালনা করেন। অভিযোগ যে তাঁর বিরুদ্ধে নয় একথা সকলেই স্বীকার করে জানালেন অভিযোগ তাঁদের Stereing Committee নিয়ে। মোটামাট সেদিনের পর আর কোন মনমালিন্য প্রকাশ পায়নি। বাংলার তরফে শ্রীতারাশঙ্কর লীডার ও শ্রীগোপাল হালদার সম্পাদক নির্বাচিত হন। হিন্দীর তরফে নেতা হন শ্রীজৈনেন্দ্রকুমার। এর পর, প্রত্যহ সকাল, দুপুর ও বিকাল, এই তিনটি করে scssion বসে। ২৩শে ডিসেম্বর সভারম্ভে মুলুকরাজ বিভিন্ন দেশবাসীদের কাছ থেকে এই সম্মেলনের শুভ-কামনা জানিয়ে যে সমাচার আসে সেগুলির ঘোষণা করেন—এঁরা হলেন আমেরিকান লেখক রিচার্ড রাইট, ইংরাজ লেখক জ্যাক লিন্ড্‌সে, চিলিদেশীয় কবি প্যাবলো নেরুদা, পূর্ব জর্মান লেখিকা আনা সাগেরস, এছাড়া Asia, Europe ও America নানাদেশের P. E. N. সভার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এসেছে। শ্রীজৈনেন্দ্রকুমারকে।

পাকিস্তানের কবি আবৃত্তি করছেন

ভারতীয় লেখকদের নেতা নির্ব্বাচন নিয়ে আবার কিছু বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। মুলকরাজ জানান, সমস্ত গোলমাল তাঁরই জন্য হয়েছে। তিনি দোষ মেনে নিচ্ছেন। তিনি মনে করেছিলেন ভারতের পাঁচটি Zone থেকে পাঁচটি নেতা নির্ব্বাচিত হলেই সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যাবে, কিন্তু প্রতিনিধিরা যদি এতে অসুবিধা বোধ করেন এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হোক। তিনি প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন তাঁরা যেন প্রতিটি বিষয়ে কোনও অভিসন্ধিমূলক ব্যাপার আছে এ কথা না মনে করেন। এই সভার কার্যনির্ব্বাহক কমিটিকে যে কতরকম অসুবিধা ও পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে এ যেন তাঁরা অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন। এর পর শ্রীহুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেন, রবিবার তিনি নিজে রাষ্ট্রপতির কাছে জানতে গিয়েছিলেন সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে তার সত্যতা সম্বন্ধে। রাষ্ট্রপতি তাঁকে জানিয়েছেন যে কোনও কোনও সংবাদ পত্রে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি এই সম্মেলন উদ্বোধনে অস্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে রাষ্ট্রপতি এ সংবাদে বিস্মিত হয়েছেন। কেননা, তাঁকে এ সম্বন্ধে কোনও অনুরোধই করা হয়নি।

এর পর শ্রীহুমায়ুন কবীর বলেন—পৃথিবীতে শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও শুভেচ্ছা যেমন লেখকরা পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন এমন আর কেউ নয়। বিভিন্ন ভাষাকে আমাদের পরস্পরের মিলনের বাধা স্বরূপ মনে করা অনুচিত। প্রতিটি ভাষাই সেই জাতির বংশানুক্রমিক অমূল্য সম্পদ। এরই মাধ্যমে তাঁদের বিদগ্ধ মনীষীরা তাদের অমূল্য সাধনার ফল বংশধরদের দিয়ে গেছেন। লেখকের ব্যক্তিগত, বংশগত বা জাতীয় যতই গোপন বেদনা থাকুক না কেন তিনিই একমাত্র শূন্যতার মধ্যেও পূর্ণতার সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর সৃজনি প্রতিভার গুণে এতে যে আনন্দ বা আত্মসন্তোষ সেটা একান্ত তাঁরই। লেখক ছাড়া অন্য কোনও কর্ম্মক্ষেত্রের মানুষই এ সম্পদ পেতে পারেন না—এইখানেই সে একক ভাগ্যবান।

এর পর ভারতীয় সভ্যতার একীকরণ ও ঔপনিবেশিক এশীয়ার সংহতি সম্বন্ধে বিভিন্ন এশীয় দেশবাসী নেতা ও প্রতিনিধিরা তাঁদের ভাষণ দেন বা প্রবন্ধ পাঠ করেন। সন্ধ্যায় দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র এবং সম্মেলনের স্বাগত কমিটির সভাপতি শ্রীঅগ্রওয়াল প্রতিনিধিদের মিউনিসিপ্যাল দরবার-হলে আপ্যায়ন করেন। ২৪শে ডিসেম্বর রাজাজীর উপস্থিতিতে সভার রূপ বদলে যায়। তিনি তাঁর চিরদিনের অভ্যাসগত তীক্ষ্ণ রসিকতার বাণে সকলকেই সচেতন করেন। তিনি লেখকদের রাজনৈতিক Coldwar থেকে মুক্ত

থাকতে বলেন। বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে স্থান কাল পাত্রের প্রভেদ আছে—যাঁরা লেখক, যাঁরা সৃষ্টি-ধর্মী শিল্পী তাঁদের সম্মেলন যেন Trade Union-এ পর্য্যবসিত না হয়। তিনি কাউকেই রাজনীতি করতে বারণ করছেন না। তবে, তার স্থান যেন লেখক সম্মেলন কদাচ না হয়। লেখক সম্মেলন বিবাদের স্থান নয়—এ সম্মেলনে আমরা ভাবের আদান প্রদান করতেই এসেছি। সাহিত্যের মাধ্যমে পরস্পরকে জানতে ও পরস্পরের সঙ্গে মিলতে এসেছি। তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের যে ঐতিহ্য, যে মান—আধুনিক সৃষ্টি তার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট, আমাদের সাহিত্যের মানদণ্ড বাড়াতে হবে—চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা হৃতগৌরব না হই। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পশ্চিমের প্রাচীন সাহিত্যের চেয়ে তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য আজ পশ্চিমের আধুনিক সাহিত্যের বহু পশ্চাতে।

পাঞ্জাবের মহিলা কবি অমৃত পিতম্ আবৃত্তি করছেন

বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্বউপাধ্যক্ষ শ্রীসি, পি, রামস্বামীআয়ার বলেন—লেখক সর্ব্বকালীন এবং সারা বিশ্বের। সত্যকার লেখক কোনও সীমায় গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তিনি কালজয়ী। তিনি আশা করেন লেখকদের চেষ্টায় ও আগ্রহে মানসিক ও আধ্যাত্মিক একতা ও ভাবধারা সারা এশিয়ায় তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্বের লেখকেরা যদি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধা না পড়েন বিশ্ব-একতা আসবে কোন উপায়ে? তিনিও রাজাজীর মত প্রাচীন সাহিত্যের গুণকীর্ত্তন করেন। লেখককে সর্ব্ববিষয়ে সত্যনিষ্ঠ, দলাদলি মুক্ত থাকতে হবে। তাঁর মতে লেখকদের সম্মেলনের বড় একটা প্রয়োজনীয়তা নেই। লেখক সৃষ্টি ধর্মী। আপন মানসলোকেই সে তার সৃষ্টির খোরাক পায়। তবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবারও প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় ভাবধারার সাধকদের মধ্যে অর্থের কৌলিন্য কোনও দিনই ছিল না—আমাদের ধন-দেবতা কুবের একজন অপ্রধান দেবতা মাত্র। ভারতীয় ভাবধারার সাধকেরা চিরদিনই আদর্শের পূজারী, বিদ্যার পূজারী, গুণাবলীর উপাসক। তিনি বলেন, ভারতে শিক্ষার ধারা চিরকালই শ্রুতির মাধ্যমে চলে আসছে—আমাদের দেশের যাত্রা, কথকতা, কবি গান, চারণ গান ইত্যাদিই ছিল শিক্ষা ও সভ্যতার বাহক ও ধারক। এইখানেই মধ্যাহ্নের সভাশেষ।

সকালের অধিবেশনে কিছু অপঠিত প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীহুমায়ুন কবীর জানান—রাষ্ট্রপতি ২৭শে ডিসেম্বর প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রপতি ভবনে অভ্যর্থনা জানাবেন। শ্রীযুক্ত কবীরকে বিশেষ জরুরী কাজে দিল্লীর বাইরে যেতে হবে এবং তাঁর জায়গায় সভাপতিত্ব করবেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলের অধিবেশনে চারটি বিষয়ের আলোচনা হয়। বিষয়গুলি (১) স্বাধীনতা ও লেখক, (২) লেখক ও তাঁহার ব্যবসায়, (৩) এশিয়ার ঐতিহ্য—বিশেষভাবে এশিয়ার নবজাগরণজাত সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা (৪) সংস্কৃতির বিনিময়। লেখকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কর বলেন—কি লিখবে এবং কেমন করে লিখবে এ কথা লেখককে কেউ বলে দিতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। লেখক এবং পাঠকের মাঝখানে কোনও অন্তরায় থাকা উচিত নয়। তাঁদের সম্বন্ধ বৈষয়িক নয় ব্যক্তিগত। জনগণ যদি কোনও লেখা পছন্দ না করেন বা সে লেখা যদি কালোপযোগী না হয়, লেখক লিখে আপন ডেস্কে ফেলে রেখে দিতে পারেন—তাঁর সে স্বাধীনতায় কারও হস্তক্ষেপ চলবে না। চীনদেশের লেখক প্রতিনিধিদের নেতা Mr Lau Sheh বলেন, বিভিন্ন মতাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের লেখককেই তাঁর ইচ্ছামত লেখার স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। বার্মীজদের লেখক প্রতিনিধিগণের নেতা Thein Pe Myint বলেন, লেখকের উদ্দেশ্যমূলক সুব্যবস্থিত রচনাই সৃষ্টি করা উচিত। স্বাধীনতা নিশ্চয় থাকবে কিন্তু সে স্বাধীনতা যেন জনগণের সেবার জন্যই ব্যবহৃত হয়, তাদের বিরুদ্ধে নয়। Mr Tu Mo ভিয়েৎনাম নেতা বলেন লেখকের স্বাধীনতা মানে এ নয় যে—সে যা খুশী তাই লিখবে। Mr Sofronov Analoli সাইবেরিয়ার রুশ লেখক বলেন আমরা সাহিত্য রচনায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করি। বহু লোকের মনে আমাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা আছে। তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

এইদিন পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের লেখক প্রতিনিধিদের ১নং সোমেরা

...স্থিত শ্রী ডি, এল মজুমদার ও শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করেন। সেখানে আমরা পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বাঙ্গালী সাহিত্যিকরাই মিলিত হই। তাছাড়া দিল্লীর আরও কয়জন প্রবাসীবাঙালী গুণী ছিলেন সে আসরে ছিলেন শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ, শ্রীরাণী ও শ্রীঅনিল চন্দ, শ্রীনীরোদ চৌধুরী প্রভৃতি কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। একান্ত ঘরোয়া এ সম্মেলনটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিলো। গোলাম মুস্তাফা সাহেবের সুযোগ্য পুত্র পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য সঙ্গীতে আমাদের বিশেষ আনন্দ দেন—এ ছাড়া শ্রীডি, এল মজুমদারের ভ্রাতৃ জায়া শ্রীপ্রতিমা মজুমদার রবীন্দ্র সঙ্গীতে এ আসরের শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সন্ধ্যায় পাঞ্জাবী কলাকেন্দ্র আমাদের Cultural show দেখান Chomsford club প্রাঙ্গণে। তাঁরা পাঞ্জাবের গ্রাম্য নৃত্য গীতসহ ভাঁগরা নাচ দেখান। সকলের কাছেই এটি উপভোগ্য হয়েছিল।

২৬শে ডিসেম্বর সকালে কয়েকজন লেখকের প্রবন্ধ পাঠ ও তারপর commission শুরু হয়। সন্ধ্যায় বিশ্ব-কবি-সম্মেলন হয়। নবনীতার অসুস্থতার দরুণ সেদিন নবনীতাও রাধারাণীদির আসা হয়নি। কবিতা পড়ার প্রথম আহ্বান হল নরেনদার। তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন রাধারাণীদির অনুপস্থিতির জন্য—প্রকাশ্যে তাঁহাকেই তাঁর চেয়ে বড় কবি মেনে নিয়ে রাধারাণীদিরই একটি কবিতা বাংলায় পড়লেন। এরপর একে একে বিভিন্ন দেশের প্রধান কবিরাই পড়লেন আপন আপন কবিতা। তাঁদের মাতৃভাষায়। কাব্যালোচনায় সন্ধ্যাটি বড়ই উপভোগ্য হয়েছিলো। এই দিনই দিল্লীতে প্রথম আনন্দময় সাহিত্যিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো। সভা ভঙ্গ হতে বেশ দেরী হল। এর পর ভিয়েৎনাম কনসাল জেনারেল আমাদের বিপুল অভ্যর্থনা জানালেন ৬২, গল্ফ লিংক, নিউ দিল্লীতে একটি film show হল ভিয়েৎনাম দেশ ও দেশবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে—আর কেমন করে অদ্ভুত সংগ্রাম ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের বিনিময়ে তারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে সেই বীরত্ব কাহিনী। আশ্চর্য্য মিল বাংলার সঙ্গে এদেশের। ভুল হয়ে যায় বুঝি বাংলারই কোনও পল্লীর ছবি দেখছি। তেমনি জলে ভরা খাল বিল পুকুর, শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, ঘাট, শস্যক্ষেত্র, নারকোল গাছের সারি—ঠিক তেমনি করেই নারকোল পাড়ছে। ফুলে ভরা পদ্মবন। বাংলারই মত দারিদ্র্যপীড়িত চাষা, জলে ডুবে গেল ধানক্ষেত। হাঁটু জল ভেঙ্গে চাষা ঠিক তেমনি করেই লাঙ্গল দেয়— সোনার বাংলার মত এদের মাটি মাও তেমনি করেই সোনা ফলান, দুহাত ভরে ফিরিয়ে দেন চাষার আশার ফল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখি মাঠের কোলে ভিয়েৎনামের বুকে তেমনি করেই সূর্য্য ডোবে—পুকুরের গভীর জলে নাচে তার কম্পমান ছায়া!

২৭শে ডিসেম্বর—সকালে Plenary Session বসে। তারপর Commission Reports ও statements দেওয়ার হয়। বিকেলে আমরা রাষ্ট্রপতিভবনে যাই—শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের চায়ে আপ্যায়ন করেন। এরপর সাহিত্য একাডেমি আমাদের স্বাগত জানান। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় চীনের Ambassador এক ভোজসভায় প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করেন, এইখানেই সেদিনের মত সভাভঙ্গ হয়।

২৮শে ডিসেম্বর বিশ্ব সাহিত্যিকগণের গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুজী বলেন—সাহিত্যিকরা যেন মানুষের চরিত্র গঠনে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন। ধ্বংসের বীজ মানুষের মনেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং UNESCO. ঠিকই বলেছেন যে যুদ্ধ মানুষের মনেই প্রথম জন্মলাভ করেছে। রাজনৈতিকরা যে মানুষের মন বিগড়েছে একথা খুবই সত্য। সাহিত্যিকদের প্রভাব শান্তিপ্রচারের সহায়ক Dr. Radhakrishnan বলেন আমাদের সকলকেই নিজেদের বিশ্বনাগরিক ভাববার সময় এসে গেছে। আজকের দিনে এর বাড়া প্রয়োজন আর নেই। নেহেরুজী বলেন—লেখকরাই তাদের দেশবাসীর চেতনা, আকাঙ্ক্ষা বিবেকের প্রতিনিধি। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ ও আকাঙ্খাকে তিনি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, সত্যনিষ্ঠাই সাহিত্যিকের বিশেষ ধর্ম্ম; তাঁহার মনে হয় লেখক ও শিল্পী জাতীয় আত্মা চেতনার স্বরূপ—তাই লেখককে সাধারণ মানবীয় দুর্ব্বলতার উর্দ্ধে উঠতে হবে—তাকে হতে হবে সত্যদ্রষ্টা, দূরদ্রষ্টা। রাধাকৃষ্ণণ বলেন—আমরা আমাদের বংশধরদের এ্যাটমবম্ব ও আণবিক অস্ত্রের আবিষ্কারক এবং ধ্বংসের প্রতিনিধি হিসাবে ইতিহাসে দেখতে চাই না। আমরা তাঁদের সৃষ্টির সহায়করূপে দেখতে চাই। তিনি বলেন লেখকরা যেন দলাদলির ও ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সার্ব্বজনীন স্রষ্টারূপে উদীয়মান হন। U. S. S. R.এর এশিয় প্রতিনিধিরা এর পরবর্তী Asian Writers conference যাহাতে Tashkendএ হয় তার আমন্ত্রণ জানান। Writers secretariat ইহা সাদরে গ্রহণ করেন। এইখানেই এই প্রথম এশীয় লেখক সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে এবারের মত সমাপ্তি টানা হয়।

চিঠি

শ্রীধীরা ঘোষ

স্বামী বেরিয়ে গেছেন অফিসে—ছেলেমেয়ে দুটোকেও স্কুলে পাঠিয়ে ঘরটাকে গুছোতে আরম্ভ করে সুলেখা। চারিদিকে কাপড় জামা ছড়িয়ে আছে—চিরুণীটা এক ধারে ফেলে গেছে গীতু—সুলেখার মেয়ে—কিন্তু সুলেখার মত কিছুই কি তার হতে নেই? সব কিছুই হয়েছে তার বাপের মতন—নিখিলেশের ধুতিটা ঘরের এমোড় থেকে ওমোড় পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে—এখানে চায়ের কাপ—ওখানে দুধের বাটী—নাঃ আর পেরে ওঠে না সুলেখা! একা মানুষ কত দিকেই বা পারে। একটার পর একটা তুলতে আরম্ভ করে। স্বামীর ধুতিটা সরাতে গিয়ে দেখে তার তলায় একটা ময়লা সার্টও রয়েছে পড়ে—কি অগোছালো লোক বাব্বাঃ! মনে মনে গজরায় সুলেখা। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আবার রান্নাঘরে ঢুকতে হবে—ছেলেমেয়ে দুটো এখুনি ফিরবে স্কুল থেকে—তাদের জলখাবার করা হয় নি—উনি অবশ্য দেরী করেই আস্‌বেন আজ—বলে গেছেন কোথায় যেন কাজ আছে। সার্টটা তুলে নেয় সুলেখা—আরে কি ব্যাপার—একটা যেন নীল রংএর খাম পড়ল মাটীতে—আর পড়ল ঐ সার্টটারই বুক-পকেট থেকে—চট্ করে খামটা মাটীর থেকে তোলে সুলেখা—"শ্রীনিখিলেশ সরকার—" পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলী হাতের লেখায় ওপরে নাম ঠিকানা লেখা। কিন্তু—কার চিঠি? কই নিখিলেশ ত তাকে এ বিষয় কিছুই বলেনি! কৌতূহল সামলাতে পারে না সুলেখা—চিঠিটা তাড়াতাড়ি খাম থেকে বার করে নিয়ে পড়তে সুরু করে—

"প্রিয় নিখিল—

আশা করি খুব ভাল আছ। তোমার সঙ্গে আমার কতদিন দেখা হয় না—মনে পড়ে তোমার? হয়ত দিনের হিসাব তোমার জানা নেই—আর প্রয়োজনও বোধ হয় ফুরিয়েছে জানবার, তাই না? আমি কিন্তু আজও আমাদের সেই ফেলে-আসা অতীতকে ভুলতে পারি নি—আমাদের দুজনের সেই ঝড়ের রাতে আমতলায় আম কুড়ানো—মজুমদারদের বাগানের পেয়ারা চুরী করা—কিছুই আমি ভুলতে পারি নি। আমরা কত কাছে ছিলাম সেদিন—আর আজ আমরা কত দূরে। ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে।

যাই হোক্ বহুদিন পরে আমি আবার কলকাতায় যাচ্ছি—তোমাকে দেখ্‌বার ইচ্ছা আর আগ্রহ আছে প্রচুর—আমার মামার বাড়ীর ঠিকানা নিশ্চয় তুমি ভুলে যাওনি। সামনের শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের ট্রেন ইন্ করছে হাওড়া stationএ। আমি জানি তুমি নিশ্চয় আসবে।

ভালবাসা নিও। ইতি

বিমলা—"

বিমলা! কে এই বিমলা? নিখিলেশের জীবনের যতটুকু ইতিহাস জানে সুলেখা—তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে কই বিমলার নাম ত কোথাও নেই? তবে কি—তবে কি নিখিলেশ তাকে লুকিয়েছে—গোপন করে গেছে তার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়? বোধ হয় সে তার প্রথম জীবনের সঙ্গিনীকে পরবর্ত্তী জীবনের প্রকাশ্য আলোতে আনতে চায় না। অন্তরের মণিকোঠায় লুকিয়ে রেখেছে তাকে—রূঢ় বাস্তব পৃথিবীর কোন আঘাত কোন মালিন্য যেন না লাগতে পারে সেখানে।

কিন্তু কেন? এ লুকোচুরি কেন নিখিলেশের? সুলেখার কাছে সে ত স্পষ্টই স্বীকার করতে পারত—একদিন বিমলা বলে একটি মেয়েকে সে ভালবাসত কৈশোরে সে ছিল তার খেলার সাথী—যৌবনের প্রথমে সে ছিল তার আকাঙ্ক্ষিতা প্রেয়সী। কিন্তু অদৃষ্টে
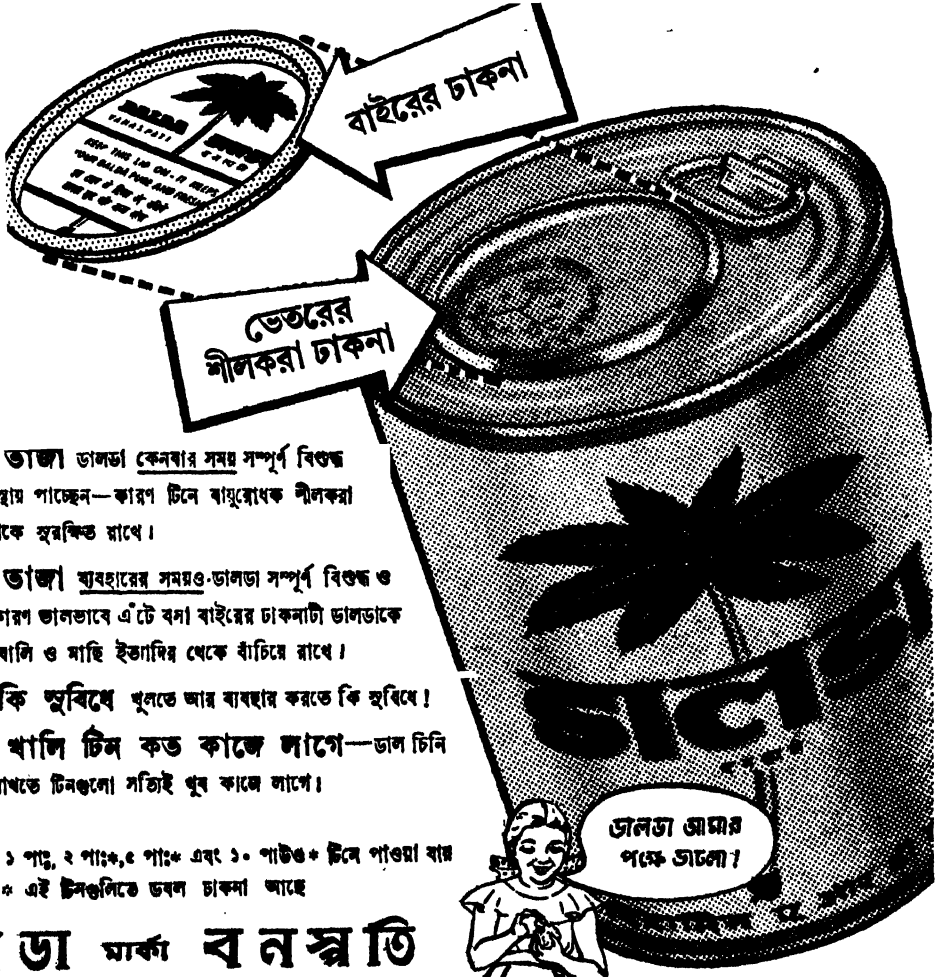
এসে গেছে
দেওয়া নতুন টিন
ডালডাকে সম্পূর্ণ খাঁটী
ও তাজা রাখে
বাইরের ঢাকনা
ভেতরের শীলকরা ঢাকনা
বিশুদ্ধ ও তাজা ডালডা কেনবার সময় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা অবস্থায় পাচ্ছেন—কারণ টিনে বায়ুরোধক শীলকরা ঢাকনা ডালডাকে সুরক্ষিত রাখে।
বিশুদ্ধ ও তাজা ব্যবহারের সময়ও ডালডা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা থাকে কারণ ভালভাবে এঁটে বসা বাইরের ঢাকনাটা ডালডাকে সর্বদাই ধুলোবালি ও মাছি ইত্যাদির থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
খুলতেও কি সুবিধে খুলতে আর ব্যবহার করতে কি সুবিধে!
পুরোনো খালি টিন কত কাজে লাগে—ডাল চিনি মশলাপাতি রাখতে টিনগুলো সত্যিই খুব কাজে লাগে।
ডালডা আমার পক্ষে ভালো!
ডালডা ১/২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ*, ৫ পাঃ* এবং ১০ পাউণ্ড* টিনে পাওয়া যায়
* এই টিনগুলিতে ডবল ঢাকনা আছে
ডালডা মার্কা বনস্পতি
VM. 257-X52 BG

নিষ্ঠুর আঘাতে তাদের কৈশোর আর যৌবনের সব স্বপ্নকে বিকল করে দিয়ে—সুলেখার আবির্ভাব তার জীবনের মধ্যম অঙ্কে—যে জীবনে ছিল না জোয়ার-ভাঁটার খেলা—ছিল না উদ্দামতা। তবে কি নিখিলেশ সুলেখাকে গ্রহণ করেছিল শুধু মাত্র তার সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন বোঝা সুলেখার ঘাড়ে চাপিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য? আর দীপু গীতুর মা হওয়ার জন্য? নিখিলেশের মনের নাগাল কোনদিনই পায় নি সুলেখা-আজ সে বুঝতে পারে। সব তার মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কবে কোনদিন নিখিলেশের কাছ থেকে সে পেয়েছে অবহেলা—কবে তাকে নীরবে উপেক্ষা করে নিখিলেশ সরে গেছে তার ব্যক্তিত্বের দাবী নিয়ে—

দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে সুলেখার—হঠাৎ সেই জলের স্পর্শে চমকে ওঠে সে—ছিঃ ছিঃ—একি ছেলেমানুষী করছে সে—এ ত তার সাজে না—আজন্ম ব্রহ্মচারী জ্যেঠামশাইএর কাছে মানুষ সে—তাঁর শিক্ষা ত তার ভুলে যাবার কথা নয়। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয় সুলেখার। নিখিলেশের জীবনে সে ছাড়া অন্য কেউ যদি শান্তি আনতে পারে তবে তাই হোক্। কোন বাধা সে দেবে না—নীরবে তার নিজের কাজ করে সে চলে যাবে। মুক্তি দেবে নিখিলেশকে। কিন্তু নিখিলেশ সুখী হ'ক্—শান্তি পাক্ সে।

চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায় সুলেখা। আস্তে আস্তে ঘর গোছানো শেষ করে।

কিন্তু বারবার চোখ কেন ঝাপসা হয়ে আসে?

রান্নাঘরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য জলখাবার তৈরী করে—দীপু গীতু ফিরলে তাদের যথানিয়মেই খেতে দেয়। আজ শনিবার নিখিলেশ অন্যবার সকাল করেই বাড়ী আসে—কিন্তু আজ বোধহয় সে stationএ যাবে। সুলেখা তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে উদাসভাবে। ধীরে ধীরে রাত্রি হয়ে আসে—দীপু গীতু ঘুমিয়ে পড়েছে—সুলেখা বসে আছে নিখিলেশ এখনও আসেনি—রাত্রি এগারোটায় ফেরে নিখিলেশ—সুলেখা তাকে খেতে দেয়-আর যা প্রয়োজনীয় সবই নীরবে এগিয়ে দেয়—কিন্তু কিছুতেই তার মুখের দিকে তাকাতে পারে না সুলেখা—নিজেকে বিশ্বাস নেই—যদি স্বামীর কাছে ধরা পড়ে যায় সুলেখা? নিখিলেশ খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বলে—"লেখা কাল একজন খাবে এখানে—রান্নার আয়োজন একটু ভাল করে করো। কি কি আনতে হবে আমাকে কাল সকালে বলে দিও—আমি সব এনে দোব। আজ বড্ড ক্লান্তি লাগছে—আজ আর পারছিনা"—বলেই নিখিলেশ হাত ধুতে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু শুনল সুলেখা—কোন জবাব দিল না। যখন সব কাজ সেরে সে শুতে গেল ঘরে—নিখিলেশের তখন প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি। কিন্তু ঘুম সুলেখার চোখে কই? কেন আসছে না? হয় ত আর কোনদিনই আসবে না—

পরদিন ভোরবেলায় উঠেই সুলেখা লেগে যায় রান্নার তদারকে জিনিষপত্রের একটা ফর্দ্দ করে দীপুর হাতে দিয়ে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। নিখিলেশ বাজার করে আনার পর বেরিয়ে যায় কি কাজে—জানিয়ে যায় একেবারে নিমন্ত্রিত অতিথিকে সঙ্গে করে ফিরবে—বেলা বারোটা নাগাদ। ছেলেমেয়েগুলো কোথায় যেন খেলা করছে। সুলেখা রান্না করছে একা বসে। কিন্তু চোখ দিয়ে এত জল পড়ে কেন তার? জ্যাঠামশাইএর শিক্ষা কি তবে মিথ্যা হয়ে যাবে? ছিঃ নিজেকে শক্ত করে সে।

বেলা প্রায় বারোটা বাজে—সমস্ত তৈরী করে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে সুলেখা। নিখিলেশের জুতোর শব্দ না? ছুটে রান্নাঘরে ঢুকে যায় সুলেখা—নিখিলেশের সঙ্গে আর কার যেন জুতোর শব্দ! চুপ করে ঠোঁট কামড়ে উনুনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। নিখিলেশের গলা শোনা যায়—

"লেখা—তোমার সব তৈরী ত? আমরা Ready—কাকে নিয়ে এসেছি দেখ—তোমার সঙ্গে ত' আলাপই হয়নি? এস বিমলা"—

মুহূর্ত্তের জন্য চোখদুটো বন্ধ করে সুলেখা—মাথার মধ্যে যেন কিসের বোঝা! দম বন্ধ হয়ে যাবে নাকি? না—যা হবার হোক্—স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচুক সে—হঠাৎ চোখদুটো খুলে ফেলে—ধীরে ধীরে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে। সুন্দর সুপুরুষ একটি যুবক দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে—

একি হ'ল? আবার চোখ বন্ধ করে সুলেখা—সে কি ভুল দেখছে নাকি? না নিখিলেশ রহস্য করছে তার সঙ্গে?

"এর নাম হচ্ছে শ্রীবিমলাপ্রসাদ রায়—আমাদের কাছে শুধু বিমলা—আমার বহুদিনের বন্ধু"—

নিখিলেশের গলায় চোখ খোলে সুলেখা—

"নমস্কার বৌদি"—

"নমস্কার—আপনি ঘরে বসুন আমি একটু আসছি"—

প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুলেখা—চোখদুটো তার চক্‌চক্ করছে। নিজেকে সামলে নিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে তার। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ওদের কথা কানে যায়—

কিন্তু তোর হাতের লেখাটা ওরকম হ'ল কবে থেকে? ঠিক যেন মেয়েদের লেখা—তোর লেখা ত ছিল না ওরকম?

হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে বিমলা, বলে—"মেয়ে নানা—ব্যাপারটা কি জানিস হাতের লেখাটি আদপেই আমার নয়—আমার স্ত্রীর"--

"স্ত্রীর—তার মানে?"

মানে হচ্ছে—কলকাতায় আসবার দুদিন আগে আমাদের চ্যারিটি ম্যাচ ছিল। সেইখানে খেলতে গিয়ে আমি খুব জোর পড়ে যাই—আর আমার শুধু ডান হাতটার ওপর সমস্ত দেহটার ভার পড়ে হাতটা ভীষণ ভাবে মুচড়ে যায়—এত ব্যথা হয়েছিল কিছুতেই নাড়তে পারি না—এদিকে তোকে তখন আমার চিঠি লিখতেই হবে—তাই আমার স্ত্রীকে আমি সেদিন আমার stenographer এর কাছে লাগিয়েছিলাম।

সুলেখার দুটো চোখে যে জলটা এতক্ষণ টল্‌-টল্ করছিল—সেটা সত্যিই এবারে গড়িয়ে পড়ল—আর মুখে ফুটে উঠল সুন্দর একটা হাসির রেখা। মনে হ'ল—পৃথিবীটা এত সুন্দর কি এর আগেও ছিল?

কল্‌হনের দেশে

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

(৩)

জম্মু

একটা বেজে গেছে, দুটোর কাছাকাছি সময়। বাস এসে দাঁড়ালো একটা দ্বিতল অট্টালিকার সুমুখে। সেকেলে সাহেবি স্থাপত্যের বাড়ী, যার বৃহত্তর সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল। সেই সিঁড়ির ধাপের মাথায় গোল গোল পলেস্তারা করা থাম, দোতলা ভেদ করে ছাদ অবধি চলে গেছে। সেই দোতলায় রেলিং করা বারান্দা। বাঁহাতে বেশ খানিকটা জমী ছেড়ে ইঁটের পয়েন্টিং করা রেলওয়ে ব্যারাকের কায়দায় আর একখানা দোতলা বাড়ী। পিছনের দিকে আরও বাড়ী তৈরী হচ্ছে।

কাশ্মীরে যাতায়াতের সুগম পথ তো দুর্গম করে রেখেছিলো আফ্রিদি আর গুজরদের নামে পাকিস্তানী-আক্রমণ। ঐই আফ্রিদিরা একটা বৈদিক উপজাতি। কালক্রমে এখন এদের প্রধান উপজীবিকা লুঠতরাজ। এদের সায়েস্তা রাখার জন্য ইংরাজদের নানা ফিকির বার করতে হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের শিরঃকণ্ডুয়নের কারণ হয়ে আজও এরা সদম্ভে জাগ্রত। গুজরদের প্রতাপ তো ভারতবর্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। স্কন্দ গুপ্তের আমলে হূনদের সঙ্গে হয়তো এরা ভারতে সূঁচ হয়ে ঢোকে। তারপর থেকে এদের যেখানে সেখানে দেখি। মহাকালের দণ্ড হেলনে আজ হয়তো এরা ছড়িয়ে পড়ে যাযাবর জীবন যাপন করছে, কিন্তু জাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এরা চিরকালের তিলক এঁকে দিয়েছে। বাংলায় গুর্জর রাজা মহেন্দ্র পাল, সঙ্গীতে গুর্জরী রাগ। গুর্জর জাত একটা প্রাচীন জাত। এ জাতের রুচি ছিল চমৎকার, শক্তি ছিল অপরিমেয়, ধর্মে অনুরাগ ছিল নিরাতঙ্ক। এদের মেয়েরা যে কতো রূপবতী ছিলেন সে সম্বন্ধে রোমান ইতিহাসকার খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে লিখে গেছেন যে গুর্জরী রমণীকে অঙ্কশায়িনী করার লোভ যেমনি ছিল রোমক সম্রাটের, তেমনি ছিল বাইজান্টাইন রাজার, আবার তেমনিই ছিল ভারতের রাজাদের।

গুর্জররা সারা জম্মুকাশ্মীরে জনসংখ্যার এক দশমাংশ। কাশ্মীরে সমগ্র গুজর জনসংখ্যা চার লক্ষের মতো। চিরকালের অবহেলিত; এদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার নেই বললেই চলে: অথচ এদের কোথাও স্থায়ী বাসস্থান দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা করাও দুরূহ প্রয়াস। বর্ত্তমান কাশ্মীর সরকার তাই এদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টায় বদ্ধপরিকর।

কবে এরা কাশ্মীরে প্রথম আসে একথা পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষে গুর্জরেরা প্রথমে হিন্দুই ছিলো। এদের অবয়বের সঙ্গে সুহৃদী অবয়বের এতো সৌসাদৃশ্য যে, এরা যে শুদ্ধ আর্য্যগোষ্ঠীভুক্ত জাতি তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এরা গুজরাতের কাছাকাছি বসবাস আরম্ভ করে। সিন্ধুর দক্ষিণে এবং কাম্বে উপসাগরের মধ্যেই এদের ঘাঁটি ছিলো। হর্ষের সময়ে এদের পাত্তা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ হর্ষের আওতায় থেকেও এরা তখন একটা সমৃদ্ধ রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন। এদের ওপর আরবরা অষ্টম শতাব্দীতে হানা দিয়ে কিছু করতে পারে নি। এ রাজ্য দুশো বছরের ক্ষমতার পর নষ্ট হয় প্রতিহারদের হাতে ৭৪০ খৃষ্টাব্দে। মামুদ গজনীর সময়েই এদের ভাঙ্গন ধরলো। রাজ্য ত্যাগ করে দু'দলে এরা পালালো। একটা আপেক্ষিক সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত দল, অন্যটা বাস্তুহারা, সর্বহারার দল। কাশ্মীরের গুর্জরেরা এই সর্বহারা দলের। প্রায় ন'শো বছর ধরে এরা কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে।

সম্ভ্রান্ত দলেরা পাঞ্জাবে গিয়ে আবার বসতি আরম্ভ করে। কাশ্মীরের রাজা শঙ্করবর্মণ যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেন তখন এই দল বিপর্যস্ত হয়। টিকা নামক পাঞ্জাবের একটা অংশ শঙ্করবর্মণকে দিয়ে এরা তখনকার মতো অব্যাহতি পায়। পাঞ্জাবের কোন অংশে এরা বসবাস করতো তার পরিচয় মানচিত্রে আজও আছে, এই নামগুলির স্বাক্ষরে—গুজরাত, গুজরাণওয়ালা, গুরুদাসপুর, (গুর্জরপুর), গুজরখান। শঙ্কর বর্মণের সময় পর্য্যন্ত এরা এদের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি বজায় রাখতে পেরেছে, পারলোনা মহানুভব সম্রাট আকবরের সময়। বারংবার নিগ্রহ ও অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় এরা ইস্‌লামী হয়ে গেলো। কিন্তু নিষ্কৃতি কই? ধর্ম দিয়েও নিষ্কৃতি নেই। নিদারুণ মহামারী চিতার মতো জ্বলে উঠলো রাজপুতানা, গুজরাত আর কাথিয়াওয়াড়ে। তখনই এরা দলে দলে চলে এলো কাশ্মীরে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দলের পর দল। 'হা হস্তে' হয়ে চলেছে বাদশাহী পথ বেয়ে; —সে পথ তখন গুজরাত, ভীম্বর, রাজৌরী, ব্রহ্মগল, শোপিঁয়া হয়ে কাশ্মীরে গেছে। এ পথে কাতার লেগেছে বুভুক্ষুর। ভীম্বরের লোকেরা আকবরকে নালিশ পর্য্যন্ত করলো বুভুক্ষু গুজরদের চুরি, বাটপাড়ির দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে। ন'শো বছর ধরে এরা কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা দল সেই গুজরাত কাথিয়াওয়াড় থেকে এসেছিল, একটা পাঞ্জাব থেকে। তারা এখনও নিজেদের দুটো বিভিন্ন দলই মনে করে এবং লোকাচার ও সামাজিকতায় বিভিন্নই। একটা দল কাশ্মীরে, জম্মুতে ঘোরাফেরা আজও করে। একটা আরও উত্তরে চলে গেল, সোয়াত, গিলগিত, লদাক। ঘুরছে আর ঘুরছে। অদ্ভুত জাত। এদের আচমকা দলে টেনে পাকিস্থান বিশ্বের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিলো কিন্তু ধাপ্পাবাজীর দ্বারা রাজনৈতিক বাজীও মাৎ করা দুরূহ।

ইসলামের সংস্পর্শে এসে এরা আর কি হারিয়েছে জানি না, রা

আজও হারায় নি। এখন এরা গরু মোষ চরায়, মেষ পালন করে, ১৭,০০০ ফুট থেকে ২০,০০০ ফুটের মাথায় এরা নেপাল, তিব্বত, কাশ্মীর, কাবুল পর্যন্ত তুষারে, হিমে, কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে। ঘোড়ার পিঠে জন্ম, ঘোড়ার পিঠে মৃত্যু। কতো গুজর-দলে দেখেছি ঘোড়ার পিঠে মালপত্রের সঙ্গে বাঁধা ফুট ফুটে চার বছরের শিশু, জরাজীর্ণ অশীতিপরা বৃদ্ধা। এদের বাসস্থান কয়েকখণ্ড কাপড়ের নীচে। এদের উপজীবিকা পশম, লবণ আর দুধ বিক্রয়। সময় মতো তাই এরা দস্যুদের দলে মিশে গিয়ে কিছু উপরি আয় করে নেয়। জানতে ইচ্ছে হয় মহু'ম গুজারীর খাতায় এরা কোন দেশের ভাগে পড়লো? এদের মাথা কি কোন খাতার নীচে ঝুঁকেছে?

পরে বাধ্য হয়ে কোণঠাসা হয়ে পাকীস্থানকে স্বীকার করতে হয়েছে যে কাশ্মীর আক্রমণ আফ্রিদি বা গুজর উপজাতি আক্রমণ ছিল না। সে যাহাই হোক, সে বিচারের স্থান এ নয়। কিন্তু বলতে চাই সেই আক্রমণের ভীষণ ফল প্রত্যক্ষ করেছি। আমি দেখেছি কাশ্মীরি জনসাধারণের চক্ষে ভীতি, আতঙ্ক। এই আক্রমণের ফলে কাশ্মীর রাজ্যের যা গেছে তা নিয়ে ওদের ভাবনা নেই। ওদের ভাবনা যে ...স্ত হয়ে কাশ্মীরে পর্য্যটক আসা ...ন হয়ে গিয়েছে। আমরা গিয়েছি ...৯৫৪র জুনে। ১৯৫৩র সীজনে প্রথম পর্যাটকরা আবার গিয়েছিল ...র "হাঙ্গামার" পর। সারা ...শ্মীর এই খণ্ডপ্রলয়টাকে ...ঙ্গামা" বলে অভিহিত করেছে। ...শ্মীরে হাঙ্গামা হওয়ার ফলে তারা ত ছিল কড়াকড়িভাবে ...ন্ত্রিত। নিরাপত্তা ছিল শঙ্কিত। কাজেই সাধারণতঃ দুঃস্থ কাশ্মীরীরা ...কথারে পরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল।

তখন কাশ্মীর যাবার পথ ছিল অনেকগুলো। সাধারণতঃ লোক ...তো রাওলপিণ্ডি মূরী হয়ে বারামুলা দিয়ে। ভারী মালের পথ ছিল। ...লে গুজরাতে থেকে ভীমর দিয়ে পীরপাঞ্জাল গিরিবর্ত্ম পার হয়ে। এ ছাড়া তৃতীয় পথ ঝিলম শহরে নেমে পুঁছ দিয়ে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় পথে মোটর চলতো না। দৃশ্য দেখার পক্ষে ঘোড়ায় চড়ে আসার পথ হিসেবে এ দুটো পথের খাতির ছিল। চতুর্থ পথ হসানাবাদ—এবটাবাদ মোটর ব্যবহারের উপযুক্ত। কিন্তু এই চারটে পথই এখন পাকিস্থানের মধ্যে। তাই যদিও কাশ্মীর ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধানে আছে, কাশ্মীরে
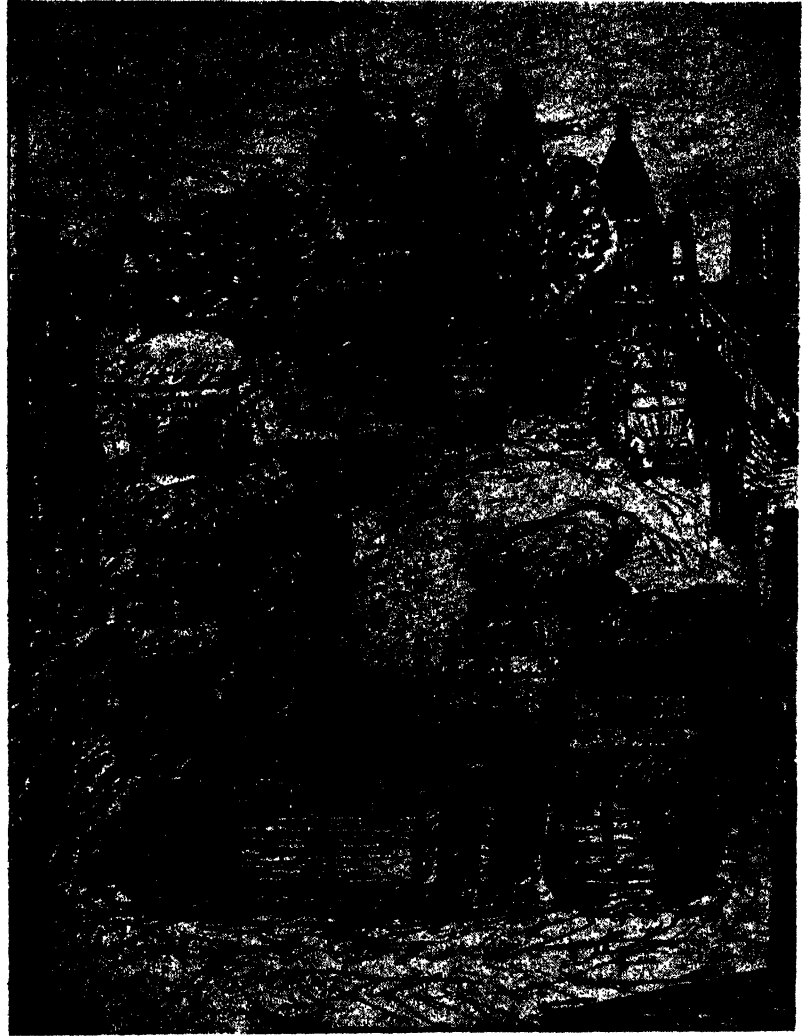
জম্মু রেষ্ট হাউসের সামনে আমাদের বাসের সার

যাবার পথ আছে পাকিস্থানের কাছে। তাই পঞ্চম ও সর্বাধিক দুর্গম পথকে ভারত আজ প্রশস্ত করে নিতে বাধ্য হয়েছে। সে পথ পাঠানকোট—জম্মু—তাওই হয়ে বানিহাল গিরিপথ। এ যে কেমন পথ বোঝানো সহজ নয়। সম্পত্তি ভাগ হোলো। একখানা বাড়ী দু-ভাগে ভাগ হোলো। বাড়ীর ওপরতলা বড়র, নীচের তলা ছোটোর। অথচ বড়র

ছোটর ভাগে। বড় যদিও ওপরতলা পেলো, ওপর তলায় ওঠার পথ তার নেই। অবশেষে মধ্যস্থ কেউ এসে বল্লেন—"কাজিয়া করো কেন? এই তো একখানা বাঁশ রেখে দিচ্ছি, দিব্যি বেয়ে উঠে যাও!" বানিহাল কাশ্মীরে ওঠার এমনি একটা বাঁশ।

এখন বানিহাল দিয়ে লোকজন যাচ্ছে। গত বৎসর বহু জনাগম হয়েছিল। এ বছর আরও বেশী হবে। যাত্রী তো নয়, কাশ্মীরের দৌলত, পায়ে হেঁটে যায়। তাই তাদের থাকার জন্য এই ডাক বাংলা যথেষ্ট হচ্ছে না। আরও বাড়ী তৈরী হচ্ছে।

ডাক বাংলায় একটি হোটেল, বিদেশীয় ব্যবস্থায় দেশীয় কর্তা চালান। এই হোটেল প্রাঙ্গণে মস্ত জায়গা জুড়ে শামিয়ানা খাটানো। তার তলায় লম্বা দুসার টেবিল পাতা। তার ওপর ঝকঝকে তকতকে চীনামাটীর বাসন থরে থরে রাখা। মাঝখানে আলুর দম চাটনী আর

য়ুহুদী না গুজর

পুরীর স্তূপ। আমরা কজন মাষ্টার মিলে—অর্থাৎ অসিত, মনোরমা, বেণু আর জগজীবন—তাড়াতাড়ি বাসন নিয়ে নিজের নিজের মতো নিয়ে খেতে বসে গেলাম।

অসিত জুয়লজিষ্ট আবার বোটানিষ্টও বটে। জগজীবনও নিটুপিটে ফিটফাট্। ওর চিন্তা ওর চমৎকার টাকটাকে নিয়ে। "মশায় বলা নেই কওয়া নেই, যেন থিয়েটারের পর পরচুলো খুলে নেবার মতো ঝুপঝাপ চুলগুলো খসে পড়লো!"

আমি বলি, "পড়লো তো পড়লো, চিন্তা কি? মনস্বী, যশস্বী মাত্রেই তো সটাক্!"

অসিত আর বেণু হাসে। "বলো কি দাদা, জগজীবনের যে বিবাহ হয়নি!!"

"সর্বনাশ! তাই নাকি? ম্যাকাসার অয়েল লাগাও।"

জগজীবনের গলায় যেন আলুর দম আটকে গেল। "সে কি জিনিষ স্যার?" এমন অনুসন্ধিৎসা ফুটে উঠলো ওর কণ্ঠে যে মনোরমা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো। ও চেহারার মেয়ে টাল খেলেই গড়ায়।

রসিকতায় যোগ দিতে পারছে না অসিত। ছুঁক ছুঁক করছে।

"কি ব্যাপার? অস্বস্তি কিসের?"

ভীরু নম্রতার সঙ্গে অসিত সসঙ্কোচে তার হাইজিনিক বাণী দিলো—"বলছিলাম কি দাদা, সোজা খেতে বসলেন, হাত মুখটা ধুয়ে পরিষ্কার করে এলে..."

"আর ততক্ষণে গোটা চার পাঁচ বাস আরও এসে পড়ুক আর টেবিল পরিষ্কার হয়ে যাক, এমন খোয়া মোছা প্লেটগুলো দালদা-হলুদ মেখে মেখে উঠুক!"

বাক্যান্তর না করে অসিত অবিলম্বে খাদ্যে মনঃসংযোগ করলো।

কিন্তু জগজীবন না-ছোড়-বান্দা। "কি অয়েল বল্লেন দাদা; আর গুণ কি? পাওয়া যায় কোথায়?"

আমার বিশিষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বেণু পরিচিত। সেই গাম্ভার্য্য লক্ষ্য করে বেণু অসিতকে টিপে দিলে। মনোরমা খাদ্য পেয়েছে। এখন স্বয়ং কন্দর্প যদি কার্ত্তিকেয়-বাটা গায়ে মেখে আসে তবু ওর যোগানন্দকে বিযুক্ত করতে পারবে না।

আমি বলতে লাগলাম—"ম্যাকাসার? ম্যাকাসার জান না? ম্যাকাসার প্রণালী? বেবাক জল নানা রকম জলজ উদ্ভিদে ভর্ত্তি। ইকোয়েটোরিয়ল ফরেষ্ট জানো? এ তেমনি ইকোয়েটোরিয়ল সমুদ্র। যা ফেলছো গজাচ্ছে আর গজাচ্ছে। সেই সব উদ্ভিদ থেকে নির্য্যাস বার করে তেল। হাতে করে মাখা নিষেধ। কারণ কিছুদিন হাতে ঘষে মাখলে হাতের তেলোতে চুলের আভাস দেখা যায়। একজন এক্স্পেরিমেণ্ট করেছিলো, তার হাতে চুল বেরোয়। পরে আমাদের ভৃঙ্গরাজ মেখে সে রোগ সারলো।"

বেণু যোগ দিলে—"আর সিমলার সেই এ্যাক্সিডেণ্টটা?"

আমি চোখ মটকে বললাম—"বাঃ, সে ওরা বিশ্বাস করবে কেন? জাতে জৈন। কখনও রক্ত মাংস ছোঁয় না, ঘাঁটে না, খায় না;—ওদের হৃদয় শশকবৎ। অতো বিশ্বাস থাকবে কি করে?"

জগজীবন দুটো বিষয়ে এম, এ, তার ওপর এল্, এল্, বি। কিন্তু কথা হচ্ছে তার নিজের ইন্দ্রলুপ্ত নিয়ে, যার ফলে ওর এখন প্রজাপতি লুপ্ত হবার উপক্রম। ওর ভবিষ্যৎ পিছলে পড়ে যেতে পারে ঐ টাকে হোঁচটে। তাই ও উৎকর্ণ হয়ে গিলছিলো কথা। "বলুন, বলুন—বিশ্বাস হবে।"

"আমার সামনে এই যে বেণুকে দেখছো টাইফয়েডে এর সব চুল উঠে গিয়ে শেষ অবধি একটা কালো কাপড়ে ঢাকা গম্বুজ দেখে যায়। একজন ভাল 'কেরিয়ার'—বুঝলে না? পশুর লোম, চামড়া ইত্যাদির ব্যবসা যারা করে সে একদিন পরামর্শ দিলে এই ম্যাকাসার তেল

কথা। বললে—"বাবুজী গুণের কথা কি বলবো,—এই যে শেয়ালের চামড়াখানা দেখছেন এ মাত্র একটা ছুঁচোশেয়ালীর ছাল। জাল পেতে ধরে খুব ম্যাকাসার ম্যাসাজ করাই। ছ'মাস পরে ছাল ছাড়িয়েছি, দেখুন!!" এমনি নাকি সে বাড়ীর বেড়ালের চামড়া কাবলী বেড়ালের চামড়া বলে বেচেছে, বড় মেঠো ইঁদুরের চামড়া সীলের বাচ্চার চামড়া বলে চালিয়েছে। আমি ভাবলাম গল্প। যাক্‌, বোতল কিনে বেণু ব্যবহার করেছে, দেখো ওর চুল।"

উদগ্রীব হয়ে জগজীবন বল্লে—"এ্যাক্সিডেণ্ট কি হোলো?"

"তাও শুনবে? সিমলা থেকে সে কালে ছ'মাসের জন্ত নেমে আসতে হোতো তো। একবার সেই ছ'মাস পরে ফিরে গিয়ে বেণু দেখলে তার ড্রেসিং টেবিলে জায়গায় জায়গায় ছাতা পড়ে আছে কিন্তু উঠছে না। আমায় দেখালো। আমি বল্লাম—হয়েছে! ম্যাকাসার অয়েলের ছোপ লেগেছিলো, তাই চুল গজিয়েছে!"

লাফিয়ে উঠলো জগজীবন,—"টেবিলের চুল গজিয়েছে?"

"হ্যাঁ, গো হ্যাঁ। বিয়ে তো কর নি। করলে বুঝবে সিক্রেট্‌স্ অব্‌ ড্রেসিং টেব্‌ল্‌। যত চুল মাথায় মাথায় দেখো তার কতখানি সত্যি, আর কতখানি ড্রেসিং টেবিলে গজানো তখন বুঝবে!"

অসিত মৌকা পেয়ে বলে উঠলো—"টেবিলে না গজাবে কেন? টেবিল তো কাঠ? উপযুক্ত খাদ্য পেলে ফাঙ্গাস্ হয় যখন, তখন ম্যাকাসার অয়েলের মতো সাবমেরিণ প্লাণ্ট্‌সের নির্য্যাস পেলে কাঠের ইন্‌গ্রেডিয়েণ্টগুলো ...টেমাইজড্‌ হতে পারে এবং যাকে আমরা চুল বলি সে রকম গ্রোথ ...ত পারে। অসম্ভব নয়।"

মনোরমা দুষ্টুমি করে জিজ্ঞাসা করলো—টেবিলটা সাফ্‌ হোলো ... করে?"

একটা আলুর দম মুখে ফেলে বল্লাম—"খানিকটা জবাকুসুম না কেশকুসুম ছিল—দিন কতক লাগাতেই আবার যে টেবিল, সেই ...বিল।"

"তবে আপনি বলেন ম্যাকাসার লাগাতে?"

আমি বল্লাম—"ওঠো, বেশীক্ষণ ধরে খেলে ওধারে বাসমেন্ন অভাব হবে।"

মুখ হাত ধুয়ে একটু বসবো। সমস্ত সিঁড়িগুলোতে ছেলেরা দলে দলে বসেছে। সাহস করে হোটেলটার লাউঞ্জে ঢুকে পড়লাম। খান-দশ বারো ইজিচেয়ার বিছানো আছে। অনেকগুলো দেশী বিদেশী সচিত্র সাপ্তাহিক। এ অবস্থায় ইজিচেয়ারে শুয়ে একখানার ওপর চোখ বুলাতে মন্দ লাগে না। আমি একখানা অধিকার করে বসেছি। অমনি অসিত একখানার, বেণু অন্যটায়।

গুর্জর পরিবার

হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি এক অভিনব দৃশ্য। একটি কোণে একটি ভারতীয় মহিলা একখানা চেয়ারে বসে বর্ণাঢ্য নখরবিশিষ্ট শ্রীহস্তের শীর্ণ অঙ্গুলী পেষণে একটি অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট খণ্ড ধূমায়িতরূপে ধারণ করে। তাঁর অপর হস্ত টেবিলের উপর উঠে আসছে। আসছে একটা গেলাসের বেষ্টনে। তার পাশে অর্দ্ধসমাপ্ত একটি বোতল। সুরাপান প্রায় শেষ করে এনেছেন।

প্রকাণ্ড দিবালোকে শত শত দৃষ্টির সম্মুখে একা একা একজন ভারতীয় মহিলাকে এই অবস্থায় দেখে আমার মন খানিকটা ধাক্কা খেলো।

অসিতের চকিত চাহনি তার দাদার এই অবস্থা ধরতে পারলো বোধ হয়। সে ফিস্‌ফিসিয়ে বল্লে—"আমাদেরই দলের।"

আমি শাসনরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম—"থাঃ"

ও নিথর শীতলতার সঙ্গে যোগ করলো—"এবং একজন শিক্ষয়িত্রী। সঙ্গে ছয়জন ছাত্রীও এনেছেন।"

বাস এসে গেছে। আমরা জম্মু দেখবো ফেরার পথে। এখন সন্ধ্যার আগে কুর্দে পৌঁছতে হবে।

কূর্দ

(৪)

পথ বৈচিত্র্যহীন। আমার কাছে বৈচিত্র্যহীন বলেই সবার কাছে তাই হবে তা কে বলে। বাসের যাত্রীরা নয়ন মেলে দেখছে। এদের

বিষ্ণো দেবী গুহা

দেখা দেখতে বেশ লাগে। পথের আর কে কি দেখে! দেখে তো মন, মনের মধ্যে হাল্কা-পাখার ভর করা যে প্রজাপতিটি বাস করে তার পালকের পরাগে রঞ্জিত হয় আনন্দ, আর কবি গান গায় "আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।" বৈচিত্র্য থাকে না কোথাও বাসা বেঁধে। দেখতে জানতে হয়। একেবারে নিষ্পাদপ স্থান। রূঢ়, কর্কশ, পাহাড়ের ইঙ্গিত আছে। সিমলা—নারকাণ্ডা—বাগী—তিব্বত পথের পাহাড় দেখলে মনে হয় এর ভেতরে আর্দ্রতা আছে। মহাযৌবন নেই কেবল, কোথায় যেন পাথর চাপা শ্যামল সজল অধ্যায় আছে একটু। এ পাহাড় সে পাহাড় নয়। রাজতরঙ্গিনীতে প্রায়ই পাওয়া যায় নাগেরা ক্রুদ্ধ হয়ে পাতাল থেকে বিষ নিঃশ্বাস, মৃত্যু বাষ্প, অগ্ন্যুৎপাত নিয়ে এসেছে কাশ্মীরী অরাজকতা, বৌদ্ধ অভিচার ধ্বংস করতে। যদি কখনও কোনও প্রলয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতে এই পাহাড়ের নাভিকেন্দ্র টলমল করে উঠে থাকে, এই পাহাড়গুলি সেই অগ্ন্যুৎপাতের শিলীভূত অস্তিত্ব। দার্ঢ্য আর স্থবিরতা এক সাথে। বিরাট বিরাট জমাট পাথরের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ। সর্পিল নয়, বক্র। খাড়াই সরাসরি নয়, বেশ তালে তাল রেখে ধীরে ধীরে। বাসের গিয়ারের ক্রন্দন ছাড়া বোঝা যায়না চড়াই পথ পার হচ্ছি।

এই জম্মুতে এককালে তন্ত্রোক্তপদ্ধতির চীনাচারের অনেক তাণ্ডব হয়ে গেছে। এখনও জম্মুর আসে পাশে তান্ত্রিক মঠ ইত্যাদি ছড়ানো। বাসওলা যেতে যেতে তার ভাষায় এই সব বিশিষ্ট মন্দিরের কথা বলতে লাগলো। কার্ত্তিকের প্রথমে কোন এক দুরারোহ পর্বত কোটরে এক তীর্থের লগ্ন আসে। সে গহ্বরে একেবারে বুকে হেঁটে ঢুকতে হয়। খানিক গিয়ে তারপর এক হাঁটু জল পেরুতে হয় গহ্বরের মধ্যেই। তার পরে প্রশস্ত গুহা। তার মধ্যে শ্রী বিগ্রহ, পীঠস্থান। এতো দুস্তর সে পীঠ যে পাণ্ডাদের ছাড়া সেখানে যাবার কল্পনাও বাতুলতা মাত্র।

জম্মুর কাছে ত্রিকূট পর্বত। সেখানে বিষ্ণোদেবী মন্দির। মন্দির আর কি, গুহার ভেতরে পীঠ। জলের ধারা বয়ে আসছে গুহা থেকে। পাহাড়ের নীচে কটরা সহর। এখন এটাকে একটা স্বাস্থ্যনিবাস করার চেষ্টা চলছে। এই ধারা কটরার পাশ দিয়ে গেছে। লোকে বিষ্ণোদেবীর গুহায় চড়ার আগে এই ধারায় স্নান সেরে নেয়। নাম বানগঙ্গা। সাত মাইল খাড়াই পথের মাঝামাঝি একটা বড় চটী। প্রায় পাহাড়ী সহর বলা চলে। দেখ্‌তে চমৎকার। নাম 'অর্দ্ধকুমারী' বা 'আদিকুমারী'; এখন বলে 'অদ্‌-কারী'। দৈত্যনাশের জন্ত ত্রিশক্তি মিলিতা বিষ্ণো দেবীর রূপমুগ্ধ দৈত্য ভৈরবরূপে দেবীকে বিবাহ করার জন্ত এখানে ধরে। মন্ত্রাদি পাঠ শুরু হয়ে যায়। অর্দ্ধ সমাপিত বিবাহমণ্ডপ থেকে দেবী অন্তর্হিতা হয়ে যান। ভৈরব অনুসন্ধানে গিয়ে প্রাণ হারায়। গুহার ভিতরে মুণ্ড। নাম ভৈরব ঘাটী। বিষ্ণো দেবীর মন্দির দর্শন করে এই গুহায় আসে তীর্থযাত্রী। পথ সুদুর্গম। আদি কুমারীতে কুড়ি ফুটের টানেল খানিক গিয়ে একেবারে খাড়াই। বুকের জোরে হামা দিয়ে যেয়ে উঠতে হয়। বিষ্ণো দেবীর গুহামুখেও হামাগুড়ি ছাড়া গত্যন্তর নেই। খানিকটা জলে হাঁটতে হয়। শরৎকালের নবরাত্রে মেলা আরম্ভ হয়ে তিন মাস থাকে। যাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ট্যাক্স জম্মু রাজ্যের অন্যতম প্রধান আয়।

বাসওলা নানা গল্প করে বিষ্ণো দেবীর মেলা নিয়ে। আসতে বলে শরৎকালে। ওদের কাছে এ মেলা একটা বিশেষ উৎসব। বিশেষ করে বলে ও বিষ্ণোদেবীর কুমারীদের কথা। পথের ধারে ধারে তরুণীরা নানা রকমের মিষ্টি গান গায়। শ্রান্ত পথচারী সেই গানে আর পাহাড়ে বনঘেরা আমেজে বুঝতে পারে না পথশ্রম।

বাসওলাটি পেয়েছিলাম চমৎকার লোক। প্রথম যখন পাঠানকোটে এই বাসটায় চড়ি তখন লোকটাকে দেখলাম বেজায় গম্ভীর আর চালিয়াৎ। ওর হাতে ষ্টিয়ারিং দুটো। একটা তো মোটরে আছেই; অন্যটা ভগবান ওর নাকের তলায় ফিট্‌ করে দিয়েছেন। ক্রমাগতঃ গোঁফজোড়া চুমড়ে চুমড়ে মেজাজটাকে ঠিক পথে রাখছে। পরে দেখলাম লোকটা খুব রসিক, এবং যাত্রীবাহী বাসের চালকদের মধ্যে সরকার থেকে প্রশং

ণী বলে নির্বাচিত। নাম রামসিং, জাতে রাওলপিণ্ডির হিন্দু। সঙ্গে চেলা আছে, নাম খেজুরা। কেমন বেকায়দায় খেজুরা বাসের নাসরোখা কাঁচখানা একটু চিড় খাইয়ে ফেলেছে,—তাকে যে ভাষায় ফুলো তার গঠন ও প্রয়োগ কৌশল যেন রামসিংয়ের ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে দলো। দেবে না কেন, ওর বাসখানি ঝকঝকে নতুন, সেই গর্বেই ওর গোঁফ অতো 'ঘানঘানিক চুমরাগ্নিত'।

বাসওলা পানে সিগারেটে মশগুল হয়ে গল্প করতে করতে চলেছে। বাইরে তখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। লোকালয় বহুক্ষণ পার হয়ে এসেছি। এখন একটু একটু করে সেই প্রচণ্ড-রুদ্র পর্বতগুলো যেন বড় হচ্ছে। বাতাস হাল্কা হচ্ছে। মনে হচ্ছে পাহাড়ে উঠছি। গাও শির্ শির্ করছে তখন। সমতলের ১১২ র সেই হাঁস ফাঁস নেই। বাতাসে ফাগুনের ছোঁয়া।

মাঝে এলো উধমপুর। এখানে পুলিশ ঘাঁটি আর ডাক বাংলা আছে। এখানে আমাদের থামা চলবে না। উধমপুর বেশ বড় একটা ব্যবসাকেন্দ্র। বানিহাল যাবার পথ একমুখো পথ। তার প্রস্তুতি এইখান থেকেই আরম্ভ বলতে পারা যায়। অর্থাৎ এক এক সময়ে এক সঙ্গে হাজার থেকে পনের শো ট্রাক আটক পড়ে একের পর এক দাঁড়িয়ে। যখন হুকুম পায় ছাড়ে। সেইজন্য উধমপুরে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য পাঞ্জাবী—শিখ হোটেল জাতীয় খাওশালা অনেকগুলো। এই উধমপুর পেরিয়ে গেলাম। বেশ চলতে লাগলাম।

"ঐ কুর্দ !" বলে উঠলো রামসিং। ওপর পানে খানিক দূরে চেয়ে দেখি ঝিকিমিকি আলো। বিজলী নয়। বিজন বনের অন্ধকারে যে আলো পথভ্রান্তের আশা সঞ্চার করে সেই আলো।

"এইখানেই আমাদের বড় মেহমানকে আমরা 'দামাদের খাতিরে রেখেছি—"বলে রামসিং। কে এই আদরণীয় অতিথি, রামসিং যাকে জামাতার আদরে রেখেছে ?

"কে ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

"শেখ সাহেব—শেখ আবদুল্লা, শের-এ-কাশ্মীর।······তাঁর স্থান তো কাশ্মীরে আর নেই। এই জম্মুর কিনারায়। যদি হঠাৎ মরে-টরে যায়, হিন্দুস্তানী দোস্তরা আর আক্রেদী সাঙ্গাৎরা তো বক্সী সাহেব আর ওঁকে এক হাড়কাঠে রেখে জোড়া পাঁঠা বলি দেবে কিনা। তাই কুর্দে রাখা। তবিয়ত আলা রাখতে কুর্দের মতো জায়গা নেই। ভালো জল বাতাস। অথচ বসতি অল্প। সেনা-পাহারা অল্প খরচ করলেই চলে।

অসিত রামসিংকে পান দিতেই বুঝলাম ও এখন রামসিংকে লুঠবে। "আচ্ছা ভাই শেখ সাহেব কেমন লোক ? কাশ্মীরীরা কি বলে ?"

"আরে বাসরে। আজ যদি শেখ সাহেব শ্রীনগরে ফেরেন লক্ষ লক্ষ লোক তার একরীর শুনতে আসবে ; আমিও বাদ যাবোনা ; বক্সী সাহেবও বাদ যাবেন না, এমন কি পণ্ডিতজীও থাকতে চাইবেন। কিন্তু হিম্মৎ অমন প্যার আর কার ? খোদাকে কসম দেখুন তো সাহেব এই দুই বছর না তিন বছর শেরের তাকৎ দিয়ে তো লড়ে এসেছেন আজাদীর লড়াই। ওই বক্সী সাহেবের চোখ উপড়ে নিলেও যা, শেখ সাহেবকে কেড়ে নেওয়াও তাই। তবু যে শেখ সাহেব যে জেলে—না, না, জেল নয় তো, তবু শেরের পক্ষে জেলই তো !"

অসিত বল্লে—"হ্যাঁ জেলই। লক্ষ্ণৌতে চিড়িয়াখানায় শের আছে খোলা ময়দানে একেবারে ছাড়া। তার ঘর আছে, পাহাড় আছে, আরাম আছে, ঘোরা-ফেরা আছে, নেই কেবল স্বাধীনতা !"

সিগারটা সামলে রামসিং সায় দিলে "ঠিক তাই। বিল্‌কুল তাই। এখনও বক্সী সাহেব কথায় কথায় শেখ সাহেবের কথা বলেন। ভারি কষ্ট হয় শুনলে।"

বেণু বললে, "এতো ঢং। বন্দী রেখে চোখের জল আর দোস্তনার তাজ। তবে বন্দী করেছে কেন ?"

"কুদরত ভগ্‌দীর যা বলো বিবিজী ? শেখ সাহেব হঠাৎ তাকত পেয়ে আর কী মতলবে ফেঁসে গেলো। ভাবলে রামচন্দ্র কাকের মতো স্বাধীন কাশ্মীর বানাবো। হুমকী লাগালেই ভারত কেঁদে ফেলবে। তারপর পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান দুজনাকেই বুঝে বুঝে হুমকী লাগিয়ে কাশ্মীরকে ঠেলে নিয়ে যাবো।"

অসিত বড় ডুবে গিয়েছিলো। জিজ্ঞাসা করলো, "ভালই তো হোতো তাতে। তোমাদের আপত্তি কি ?"

"বাঃ জী। হিন্দোস্তান যদি না ফৌজ দিত কোথায় থাকতো কাশ্মীর আর কোথায় থাকতো আজাদী ? দো পিঁয়াজী শাহান্ শাহীতে কাশ্মীরে কি হিন্দু থাকতো ? যে শের দুধে ভাতে ছিল তাকে আমরা বিশ্বাস করতাম। যে শের রক্ত খেয়েছে একবার তাকে ঐ লক্ষ্ণৌয়া স্বাধীনতা দিতেই হবে।'

আমি বললাম "অসিত এই অন্ধকার পথে বাস-চালকের সাথে রাজনীতি আলোচনা করে এতোগুলো মহাপ্রাণীকে কেন বিপন্ন করছো ?"

সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌করিজেব্‌ল্ রামসিং বলে উঠলো, "হোঃ এ আবার কথা নাকি। এ পথও যতবার চলেছি এ কথাও ততবার বগেছি। এতে ষ্টিয়ারিং খারাপ হলে আমার মগজের ষ্টিয়ারিংএ গোল আছে বুঝতে হবে।"

শেখ আবদুল্লা সেকালের বেক আর মরিসনের তা' দেওয়া আলিগড়ের ছাত্র। সাম্প্রদায়িকতায় ষোলো আনা সিক্ত, ওতপ্রোত। তারপরেই পেলো কাশ্মীরের ইংরাজ মন্ত্রী ওয়েকফিল্ডের ওস্কানি। মুস্লিম প্রধান কাশ্মীরের হিন্দু শাসন কেন ? ছুতো এলো ১৯৩১ সনে। এক মুস্লিম কনষ্টেবলকে যথার্থ অপরাধে সাজা দেন এক হিন্দু অফিসার। তাকেই কদর্থ করে শেখ আবদুল্লা ভীষণ দাঙ্গা বাধান। তিনি, সঙ্গে এক বাবুর্চি, ইংরেজের বাবুর্চি। পাঠান, নাম কাদের। কাদের কয়েদ হোলো দাঙ্গা-উস্কানী বক্তৃতার জন্য। তা থেকে মিছিল, গুলিবর্ষণ, মৃত্যু, শহীদীকরণ, পুনঃ মিছিল এই মালা তো ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবেই জানা। কিন্তু শ্রীমান ওয়েকফিল্ড তখন শ্রীনগরে নেই। তার পাত্তাই নেই। শ্রীনগরে আগুন, লুঠতরাজ। ওয়েকফিল্ড, অর্থাৎ রাজ্যের মন্ত্রীর কোনও পাত্তা নেই। মেত্তাজে

গেছেন। কোথায় কেউ মানে না!! যখন এলেম অবাক। রাজা নিজে আবদুল্লা আর সাঙ্গোপাঙ্গদের করেদ করেন। পরে বেগতিক বুঝে আবদুল্লা নেহরুর সঙ্গে মিত্রতা করেন। নেহরু অহিংস। মৈত্রী পেলেই মিত্র বলতে বাধেনি। সর্বদাই ভাই। আবদুল্লাও থেকে থেকে, দেখে দেখে, শিখে, শিখে, ন্যায় আর প্রেমের শক্তি বুঝলেন। বেশ কিছুদিন মাথা ঠাণ্ডা রেখে আবদুল্লা জনসেবা করলেন। লোকে জয়ধ্বনিও দিলো। কিন্তু কতোদিন। ক্ষমতা পাবার পর আবদুল্লা ভাবলো কাশ্মীরকে আলাদা রাজ্য করবো। হয়তো পাকিস্থানে যোগ দেবো। আমেরিকান কুটনীতিবিদরা শকুনির মতো উড়ে পড়লো আবদুল্লাকে উপদেশ দিতে। গরম গরম বক্তৃতা; হিন্দুদের জীবন অতিষ্ঠ করল, এসব চলতে লাগলো। কিন্তু কাশ্মীরকে শেষ অবধি কাশ্মীরীই যুগে যুগে রক্ষা করেছে। দিল্লীতে পাটেল-আজাদ-কিদওয়াই পরামর্শ করেন। বক্সী গোলাম আহমদ্ পরমসন্ধিক্ষণে কাশ্মীরের হাল ধরেন। আবাল্য বন্ধু আবদুল্লাকে কুর্ণে বন্দীভাবে রাখেন। আবাল্য বন্ধু সে, সত্যি। কিন্তু কাশ্মীর? ভারত কাশ্মীর সংস্কৃতি? ঐতিহ্য? এতো পিতৃপুরুষের দেওয়া সত্য। বন্ধুকে পীড়ন না করে মাত্র বন্দী রাখলেন রাজহালে! আর নিজে হলেন কাশ্মীরের দণ্ডধর।

এদিকে কুর্ণ পৌঁছে গেলাম।

এতক্ষণ প্রায় গায়ে ফুঁদিয়ে এসেছি। কোনও ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়নি। কুর্ণে এসে প্রথম ঝঞ্ঝাট পেলাম।

আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সঙ্গে সর্ত্ত অনুসারে তারা আমাদের সৎ ও পূর্ণ ভোজন তো দেবেই, তা ছাড়া আমাদের থাকার ব্যবস্থা, যানবাহনের ব্যবস্থা ও আমাদের যথাযথ খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থাও করবেন।

অবশ্য যানবাহন সরকার থেকে পেয়ে যাওয়ায় ঐ ব্যাপারটা আর ওদের তত্বাবধানে ছিল না।

কুর্ণে নেমে আবার একটী মহিলা দেখলাম, কুঞ্চিত একমাথা চুল ঘাড় অবধি ছাঁটাই করা। দুচোখ ভর্ত্তি সুরমা, পুরু করে দেওয়া। ঠোঁটভর্ত্তি জ্বলন্ত রং। ভুরু দিব্যি আঁকা। গলায় মোটা প্লাষ্টিকের মারবেলের হার। টিং টিংএ কব্জীতে এক হাত ঘড়ি, অন্য হাতে জগদ্দল এক প্লাষ্টিকের বালা। কানে বিরাটকায় দুটো ট্রাইকারের দুল দুলছে। পরণে একটা ভয়েলের শালওয়ার আর পাঞ্জাবী। বুকের ওপর কুঁচিয়ে দোলানো একটা চুন্নী। বুকে দোলানো চাকতিখানা আমাদের লাল চাকতি নয়। অন্য একটা কি। মিটমিটে আলোয় পড়তে পারলাম না। নাম পরে জেনেছিলাম কান্তা। কনট্রাক্টরের পার্টির সাহায্যকারিণী। প্রধানতঃ পরিবেশনের তদারক করার জন্য। মেয়ে "বয়" বলতে পারা যায়।

কুর্ণে ছোট একটা চটী। খান চারেক হালুয়াই চায়ের দোকান। দুখানা বড়ো,—হোটেলের মত। থাকতে দেয় না, খেতে দেয়, যদি এক সাথে একশো জন না গিয়ে পড়া যায়। কিন্তু আমরা ন'শো। কুর্ণে বড় বাড়ী ঘর বলতে একখানা। সেখানা একটা বিরাট দোকান ঘর। তাতে মোট তিনখানা গুদামঘর, সামনে দরজা দেওয়া একখানা বারান্দা। এরই ছাতে ভোজন এবং এর মধ্যে শয়ন। এখানে ব্যবস্থা হওয়া একেবারে অসম্ভব। এমন কি ৬৬খানা বাসই দাঁড়াতে পারবে না কুর্ণে। তখন বেজেছে ৭টা। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কাজেই আমার টান মায়া হোলো। বুদ্ধি নাকি এক মাথার চেয়ে চার মাথায় দৌড় মারে ভালো। ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো প্রশস্ত জায়গা না পেলে বুদ্ধির দৌড়ও নাকি খোলে না। রাষ্ট্রসভা, বিধানসভা, মায় U. N. O. জুড়ে এ সত্যের প্রমাণ।

খানিকটা ঘোরাঘুরি করেই মাথায় টুপীটা খুলে, প্রধান উদ্যোক্তা ভগবানদাসজীকে সামনে ধরে, টুপীর গর্ত্ত দেখিয়ে বলি, "আমি মশায় এতেই শোবো"

বৃদ্ধ, নমস্য ভগবানদাসজী। ত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে একই বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ হয়ে এখন অবসর গ্রহণের জন্য ব্যস্ত। তবু প্রাণের তাগিদে এই সব আয়োজন করে মাঝে মাঝে মৃতকল্প ছাত্র-শিক্ষক সমাজে একটা সাড়া তুলতে চান। এ হিসেবে ভগবানদাসজীকে আমি একটু সমীহই করতাম, যদিচ কথায় বার্ত্তায় একটু হাল্কা সুর রেখে আমি তাঁকে পিতামহের কোঠায় ঠেলায় তালে থাকতাম।

কাজেই আমার ওল্টানো টুপীতে আমি আমার শয়নের ব্যবস্থা করছি জানতে পেরে ভদ্রলোক দস্তুর একটা ছিঁচকে পোড়া হাসি সেরে বললেন,—"হ্যাঃ হ্যাঃ—টুপীতে শোবেন! সেকি একটা কথা হোলো!"

"কেন, বিস্মিত হবার কি আছে? কুর্ণে ন'শো জনের শোবার ব্যবস্থা করে.দেবার চেয়ে ঢের সহজ ব্যবস্থা। এরিয়া মেপে বিয়েকালি কাঠাকালি করে দেখুন। টুপী ইঞ্চটু আমি বোধহয় একটু বেশীই হবে।"

মিটিংয়ে স্বর্ণদত্ত, পতিরাম, লালসিং, ওমপ্রকাশ, ভগবানদাসজী ও আমি। এদের মধ্যে পতিরাম এবং লালসিং দুজনেই দুটী বড় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং আমার অন্তরঙ্গ মিত্র, এদেশী ভাষায় দোস্ত। এক ভগবানদাসই আমার সম্মানার্হ। তা, তিনিও আমায় একটু ক্ষেমা-ঘেন্নার চোখে দেখতেন। বলতেন, "ঠোঁট কাটা বটে, তবে কি জানো ছোকরা—হেঃ হেঃ হেঃ...ইত্যাদি"

পতিরাম সারা ক্যাম্পের তদারক প্রধান। লালসিং ক্যাম্পবাহিনীর তত্বাবধারক ও ক্যাম্প শৃঙ্খলার ধারক। পতিরাম বলে উঠলো, "তো[illegible] কি রসিকতা করবার সময় অসময় নেই। কিছু করতে পারিস কর, নৈলে যা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে লেকচার দিগে। বাঙ্গালীর ঘরে একটা জন্ম জন্মেছে!' পাতিরাম আড়ালে এই জাতীয় ভাষা প্রয়োগ ক[illegible] শিক্ষকতা-কালীন মার্জিত ভাষা প্রয়োগের বেদনা অপসারিত কর[illegible] একরকমের সখ, নেশা।

লালসিং বললে,—"পরামর্শ দিতে না পারুক জন্য ও'তোর পতিরা[illegible] সাবধান।"

পতিরাম ডাকসাইটে পহেলবান্। অদ্ভুত শারীরিক বল এবং দ[illegible] বুকের পাটা। গ্রামের লোক, গ্রামের বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা ক[illegible]

বিত্তালয়। কাজেই কথায় কথায় লাগতো ওতে আমাতে সেই ...মুখিক আর নাগরিক মুষিকের মতো।

লালসিংকে বাধা দিয়ে ভগবানদাসজী বললেন, "বলুন কি করা যায়?"

আমি বললাম—তাস খেলায় একটা আইন আছে যখন আরও কিছু ...লার নেই তখন রং খেল। আমি জীবনেও দেখেছি যখন কিছু ...রার থাকে না তখন আরও কিছু করা লাভজনক। রুশদের দেখুন—...ন লড়ায়ে হেরে যায় তখন পালায়। আর এমনি পালায় যে পালাতে ...লাতেই জিতে যায়।"

পতিরাম আর সহ্য করতে না পেরে তার দৃঢ়হস্তের বন্ধনে আমায় ...পে ধরে বললেন—"কেবল বক্তৃতা। অন্না, কি বলবি বলনা। কি ...লবি?"

লালসিং বললে,—"মরে গেলে বলবে 'রাম' 'রাম' আর কি? ছেড়ে ...। আমি বলছি। ও বলছে এগিয়ে যেতে। তাই না?"

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ভগবানদাসজী বললে—"না, না, রাত্রিকাল। এখন এগিয়ে যাওয়া—তাছাড়া খাবারের ব্যবস্থা যে এখানে।"

আমি বলি,—"তা হোক। এখান থেকে প্রায় এগার মাইল দূরে বাভোত বলে একটা চটী আছে। সেখানে মেয়েদের দল পাঠিয়ে দিন। একদল একটা গাড়ীতে কিছু আগে চলে যাক, থাকার ব্যবস্থা করুক। বাকী সব মেয়েদের এখানে খাইয়ে দিই। এরা যাবার সময় প্রথম দলের খাবার নিয়ে যাবে।"

শেষ অবধি এই যুক্তিই সবাই গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করলেন। আমরা পুরুষরা কূর্মে রয়ে গেলাম। মেয়েরা বেশীরভাগ গেলো বাভোতে। শেষ গাড়ীতে জন কুড়ির খাবার আমরা পাঠিয়ে দিলাম।

রাতে কোনও মতে একটা কোণে জড়সড় হয়ে আমি আর অসিত শুয়ে পড়লাম। হাল্কা হাওয়া দিচ্ছে। বাইরে বন থেকে শব্দ আসছে ঝিঁঝিঁঝিঁ।

ক্রমশঃ

মেয়েদের কথা

সেকালের পর্দা-প্রথা

শ্রীসবিতা চৌধুরী

পশ্চিমের কোনও এক বিশিষ্ট সহরে যাচ্ছিলাম। পথে নানাধরণের যাত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ হল। মেয়েদের কামরার দুয়োর ঘিরে উঠে এল কালো পোষাকে আপাদ-মস্তক ঢাকা তিনটি মূর্ত্তি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন যাত্রীর আসরে 'মৃত্যু' বা 'মৃত আত্মার আবির্ভাব! সেই মূর্ত্তি তিনটি যে নারীর, তা' একটু পরই বোঝা গেল। তা'দের মধ্যে দুজন সেই অদ্ভুত পোষাকগুলো খুলে রাখল —একজন কেবল তা'র মুখের ওপরের আবিরণটুকু সরিয়ে বসল। ঐ দু'জন যদিও কুরূপার পর্য্যায়েই পড়ে—কিন্তু তৃতীয় জনের দিকে চোখ চাইলে আর চোখ ফিরানো যায় না। এত সুন্দরী। সুন্দর টানা টানা চোখে সুর্ম্মা আঁকা। অন্য প্রসাধন বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। কিন্তু ভীতা হরিণীর মত সে চোখের চাহনি, সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত —মনের ভেতর জাগিয়ে তোলে করুণ অনুকম্পা। দু' একটি কথাবার্ত্তার পর জানা গেল মেয়েটি অল্পদিন হ'ল বিবাহিতা। সঙ্গের মেয়ে দু'টির মধ্যে একজন ননদিনী, অন্যটি দাসী। অথচ, একধরণের আবরণে যখন তা'রা ঢাকা পড়ে, তা'দের বয়স, রূপ বা সম্বন্ধের পার্থক্য কিছুই বোঝা যায় না।

এই বিচিত্র পোষাকটির নাম 'বোর্‌খা'। শুধু চোখ দুটো দিয়ে পথ দেখার মত সামান্য জালি করে পথ আছে দুই চোখের সমুখে। বলা বাহুল্য সেই চোখ কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পোষাক দেখলেই তো আমাদের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়, অথচ আমাদের মতই কত মেয়েরা পথে-ঘাটে কী শীত কী গ্রীষ্ম এই পোষাকে কাল কাটায়।

যতদূর জানা যায় এই পর্দ্দা-প্রথা প্রাচীনকালে ছিল না। রামায়ণ মহাভারতের যুগে আমরা দেখতে পাই নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে যুদ্ধ ক'রতে। সুতরাং সে সময় মেয়েদের জন্য এতটা কঠোরতা ছিল ব'লে মনে হয় না। অনেকে বলেন এই প্রথার প্রথম প্রয়োজন এবং প্রচলন হয় মোগল যুগে। মোগলদের অত্যাচারের হাত থেকে করার উদ্দেশ্যেই এই প্রথার প্রচলন হয় মেয়েদের জন্য।

৫০।৬০ বছর আগে পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের পথে বের হ'তে হ'লে কী ভীষণ কষ্ট সহ্য ক'রতে হ'ত, ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। এক গ্রাম হ'তে অন্য গ্রামে এমন কি এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যেতে হ'লে পাল্কী বা গোরুর গাড়ীতে যেতে হ'ত। সেই পাল্কী এবং গোরুর গাড়ীর সব দিক ভালভাবে ঢাকা এবং বন্ধ থাকত। এই আবরণের কঠোরতা তত বেশী হ'ত, যার অবস্থা যত বেশী স্বচ্ছল। অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ট্রেনে চড়ে কোথাও যেতে হ'লে প্রথমে বাড়ীর গাড়ীতে সুরক্ষিত এবং সুদৃশ্য আবরণে ঢাকা থেকে ষ্টেশনে এসে গাড়ীর দুয়োরের সঙ্গে সংলগ্ন ক'রে রাখা পাল্কীতে উঠে (বলা বাহুল্য ঘেরাটোপ দিয়ে সে পাল্কীও ঢাকা) সেই পাল্কীকে ট্রেনের কামরার দরজার সঙ্গে এমন ভাবে ধরা হ'ত যাতে সেই পাল্কীর আরোহিনীকে হামা দিয়ে ট্রেনের কামরায় প্রবেশ ক'রতে হ'ত। কামরার জানালা আগে থেকেই বন্ধ করা থাকত এবং সে কামরা 'রিজার্ভ' থাকায় আর অন্য লোকের সেখানে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকত না। ট্রেন থেকে নামার সময়ও ঠিক ঐ ব্যাপার চলত।

এই অভিজাত পরিবারের মহিলাদের গঙ্গাস্নান ব্যাপারটি ছিল আরও মারাত্মক। পাল্কীর ভেতরে হয়ত একজন বা দুইজন আরোহিনী থাকতেন। পাল্কীর দরজা বন্ধ এবং সুদৃশ্য ঘেরাটোপে ঢাকা। সেই অবস্থায় বেহারারা নদীর জলে পাল্কী কাঁধে নিয়ে নেমে যেত যেখানে গভীর

জল সেইখানে। পাল্কীকে তিন চারবার সেই জলের ভেতর নামিয়ে ডুবিয়ে তুলত। পাল্কীর ভেতরের মহিলাদের তখন 'নাকানি-চোবানি'। এই ভাবে গঙ্গাস্নান সেরে তাঁরা বাড়ী ফিরতেন নির্ব্বিঘ্নে।

স্বাধীনতার মুক্ত আলোবাতাসে লালিত আমরা আজকাল যে স্বাচ্ছন্দ্যে পথ চলি, সেকালের ঐ সব মহিলাদের পক্ষে পরবর্ত্তীকালেও পাওয়া সম্ভব হয় নি সে স্বাচ্ছন্দ্য। কারণ, দীর্ঘকাল ঐ ভাবে চলাফেরাতে তাঁরা অল্প বয়সেই পঙ্গুর মত হ'য়ে পড়েছেন এবং দীর্ঘদিন পর স্ত্রী-স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদ যখন তাঁরা লাভ ক'রলেন তখন তাঁদের অবস্থা—দীর্ঘকালব্যাপী বন্দী খাঁচার পাখীর মুক্ত-দশার মতই !

এঁচোড়ের চপ্

উপকরণ :—এক ফালি এঁচোড়, চারটি বড় নৈনীতাল আলু, ছোলার ছাতু, মুড়ি গুঁড়া, ময়দা, একপোয়া আন্দাজ সরিষার তেল, চা-চামচের এক চামচ চিনি, কিছু ধনে, জিরে, কালো জিরে, আদা, দারুচিনি, তিন-চারটি ছোট এলাচ, চার-পাঁচটি শুক্‌নো লংকা এবং আন্দাজমত লবণ।

প্রস্তুত প্রণালী :—ছোট এলাচ-দারুচিনি গুঁড়ো করিয়া রাখুন। আর ধনে-জিরে-লংকা-কালোজিরে গরম করিয়া গুঁড়ো করিয়া রাখুন। আর, এঁচোড়ের মাঝের অংশ ও খোসা ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করুন, ও আলুগুলি গোটা খোসা-সমেত সিদ্ধ করুন।

তারপর এঁচোড়ের টুকরাগুলি ভাল করিয়া চট্‌কাইয়া পরিমাণ মত লবণ-চিনি ও পূর্বে গুঁড়া করা মসলাগুলি তাহাতে মিশাইয়া ফেলুন। ইহার পর উহুনে কড়াই চাপাইয়া কড়ায় একটু তেল দিন। তেল পাকিয়া যাইলে তাহাতে ঐ এঁচোড় দিয়া একটু ভাজা ভাজা করিয়া নামাইয়া ফেলুন।

তারপর পূর্বে সিদ্ধ করিয়া রাখা আলুগুলির খোসা ছাড়াইয়া তাহা চট্‌কাইয়া তাহাতে আন্দাজমত লবণ ও ছোলার ছাতু মিশাইয়া (সিদ্ধ আলুতে চিট্ ধরিবার পক্ষে যতখানি ছাতু মিশান প্রয়োজন ততখানি মিশাইবেন) তাহা দ্বারা বাটি তৈয়ারী করুন। ইহার পর পূর্বে তৈয়ারী করিয়া রাখা এঁচোড়ের পুর তাহাতে দিয়া বাটির মুখ বন্ধ করিয়া চপের আকারে গড়ুন।

তারপর ময়দায় পরিমাণমত জল মিশাইয়া (ময়দাগোলা এমন ঘন করিবেন যেন চপের গায়ে তাহার একটি আবরণ ধরিয়া যায়) ঐ গোলা ময়দায় চপ্‌গুলি একের পর এক ডুবাইয়া লইয়া তাহার উপর মুড়ি গুঁড়া মাখাইয়া রাখিয়া দিন। সবগুলি তৈয়ারী হইয়া যাইবার পর কড়াই-এ তেল দিন। তেল তৈয়ারী হইয়া যাইলে তাহাতে ঐ চপ্‌গুলি একখানি একখানি করিয়া ভাজিয়া ফেলুন। চপ্‌গুলির রং বাদামী হইলে বুঝিবেন যে তাহা ঠিক তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। এইবার গরম গরম পরিবেশন করুন।

অবশেষে আর একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি। যাঁহারা ডিম খান তাঁহারা ময়দাগোলার পরিবর্তে ডিম ভাঙিয়া তাহা ফেনাইয়া তাহাতে চপ্‌গুলি ডুবাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে চপ্‌গুলি খাইতে আরও সুস্বাদু হয়।

মুলার ডালনা

উপকরণ :—কচি কচি মোটা মূলা আধসের, আলু একপোয়া, কিছু মটর কলাইয়ের শুঁটি, পরিমাণমত ধনে, জিরে, গোলমরিচ, লংকা, হলুদবাটা। দুটি বড় তেজপাতা, তিন-চারটি শুক্‌না লংকা অল্প জিরে, চা-চামচের দু'চামচ ময়দা গুঁড়া। অল্প গরমমসলা বাটা অর্থাৎ তিনটি ছোট এলাচ, চারটি লবংগ, কিছু দারুচিনি বাটা। আর আন্দাজ মত লবণ, তেল এবং চা-চামচের দু'চামচ ঘি ও চা-চামচের এক চামচ চিনি।

প্রস্তুত প্রণালী :—মূলার খোসা-পাতা পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া দিন্। তারপর চুলের মত সরু সরু করিয়া মূলাগুলি কুচাইয়া ফেলুন। কুচি মোটা হইলে খাইতে

ভাল হয় না। সবগুলি মূলা কুচাইয়া লইয়া তাহা ভাল করিয়া ধুইয়া চুপড়িতে রাখিয়া সব জল ঝরাইয়া ফেলুন।

আলুর খোসা ছাড়াইয়া ডালনার আলুর মত চৌকা করিয়া কাটুন। মটরশুঁটি ছাড়াইয়া দানাগুলি বাহির করুন।

ইহার পর আলুর টুকরাগুলি বেশ লালচে লালচে করিয়া ছাঁকা তেলে ভাজিয়া তুলিয়া রাখুন। মূলোর কুচিগুলি বেশ সুন্দর করিয়া ভাজিয়া লউন। মূলো ভাজা হইয়া যাইলে তাহাতে ধনে-জিরে-হলুদ-মরিচ-লংকা বাটা জল দিয়া গুলিয়া সাধারণ ডালনার মতই দিয়া দিন। জলটি একটু গরম হইয়া যাইলে তাহাতে পূর্বে ভাজিয়া রাখা আলুর টুকরো ছাড়াইয়া কড়াইশুঁটি, চিনি আর আন্দাজমত লবণ দিন।

আলু-মূলা সিদ্ধ হইয়া যাইলে তাহা নামাইয়া একটি পাত্রে ঢালিয়া রাখিয়া কড়াইতে একটু তেল দিয়া তাহাতে তেজপাতা জিরে লংকা দিয়া তরকারীটি সঁতলাইয়া ফেলুন। এই সময়ে ইহাতে শুক্‌নো ময়দাটুকু আর ঘি এবং গরম-মসলা বাটা দিয়া তরকারীটি ভাল করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া পুনর্বার পাত্রে ঢালিয়া ফেলিয়া তাহাতে ঢাকা দিয়া রাখুন; নচেৎ ইহার সৌগন্ধ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

এই তরকারী ভাত-লুচি ইত্যাদি সকলের সহিতই খাওয়া চলে। ঠিকভাবে রাঁধা হইলে ইহা খাইতে অত্যন্ত চমৎকার হয়।

—আশালতা ঘোষ

আল্পনা—

উলের প্যাটার্ণ

লেবুর কোয়া
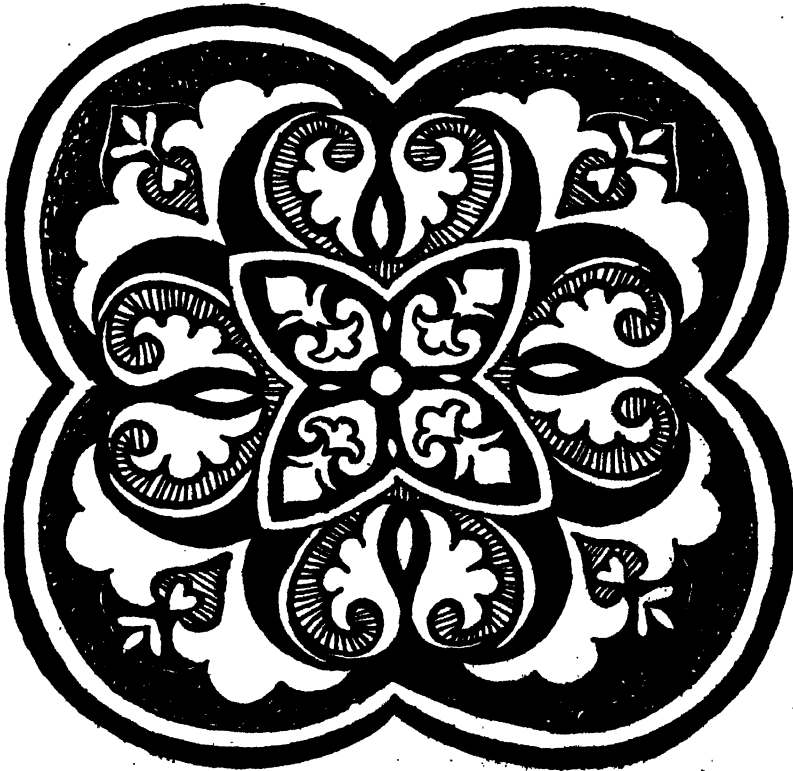
এই প্যাটার্ণটি বুনিতে ২০ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়।

১ম—সব সোজা।

২য়—সব উল্টা।

৩য়—সব সোজা।

৪র্থ—সব উল্টা।

৫ম—১ উল্টা ১ সোজা (সামনে সুতা ১ সোজা) ২ বার, ১৩ উল্টা ১ সোজা (সামনে সুতা ১ সোজা) ২ বার।

৬ষ্ঠ—৫ উল্টা ১৩ সোজা ৫ উল্টা ১ সোজা।

৭ম—১ উল্টা ২ সোজা সামনে সুতা ২ সোজা সামনে সুতা ১ সোজা ১৩ উল্টা ১ সোজা (সামনে সুতা ২ সোজা) ২ বার।

৮ম—৭ উল্টা ১৩ সোজা ৭ উল্টা ১ সোজা।

৯ম—১ উল্টা ৯ সোজা (১ সোজা কাঁটায় পশম ২ বার জড়িয়ে) ৯ বার, ৯ সোজা।

১০ম—৯ উল্টা কাঁটায় জড়ান পশম খুলিয়া ১টি বড় ঘর হইবে। ৯টি ঘর খুলিয়া লইয়া ৯টির ভিতর দিয়া ১ উল্টা বুনিতে হইবে। ১০ উল্টা।

—গীতারাণী মিত্র
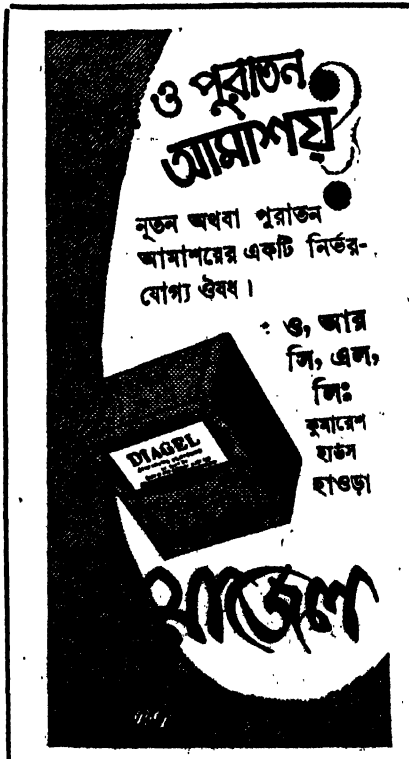
মৃত্যু-মহিমা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মৃত্যুর দুয়ার হতে আসিয়াছি ফিরে
দেখিয়াছি মৃত্যুর মহিমা।
গিয়াছিনু সেইখানে যেথা আছে ঘিরে
মহারাত্রি জীবনের সীমা।
সুখে-দুঃখে তরঙ্গিত জীবনের পারে
মৌন সেথা সর্ব অনুভব।
কর্ম্মমুখরতা অন্তে ধ্যান পারাবারে
সহসা নিস্তব্ধ কলরব।
পঙ্গু সেথা আস্ফালন, দম্ভ, অহঙ্কার,
নির্জীব ও বলহীন লোভ,
অভাব-দারিদ্র্য-জাত নাহি হাহাকার
না-পাওয়ার নাহি কোনো ক্ষোভ।
জন্ম মৃত্যু দুই তার জীবন-বীণায়;
—দিবা-রাত্রি আলো আর ছায়া
দেখিয়াছি দাঁড়াইয়া মহামোহানায়—
জীবন-মৃত্যুর ভেদ মিথ্যাময়ী মায়া।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

ইংরাজি নব-বর্ষের প্রথমে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের প্রত্যাশিত মধ্য প্রাচ্য পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়। পরিকল্পনাটি বর্তমানে মার্কিণ কংগ্রেসের বিবেচনাধীন। প্রধানতঃ তিনটি পর্য্যায়ে এই পরিকল্পনা বিভক্ত : প্রথম পর্য্যায়ে "স্বাধীনতা রক্ষায় প্রয়াসী" মধ্য প্রাচ্যের কোনও একটি রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্ম সাহায্য করা হইবে ; দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহকে তাহাদের আগ্রহে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সহিত সহযোগিতা করা হইবে ; তৃতীয় পর্য্যায়ে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত মধ্য প্রাচ্যের যে কোনও রাষ্ট্রের রাজ্যগত অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম তাহারসম্মতিতে মার্কিণ সৈন্ম ব্যবহৃত হইবে। মধ্য প্রাচ্যে আর্থিক সাহায্য দানের জন্ম আইসেনহাওয়ার অপাততঃ মোট ৪০ কোটী ডলার ব্যয়ের ক্ষমতা কংগ্রেসের নিকট চাহিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের ব্যাপারে কোনরূপ সর্ত্তের কথা বলা হয় নাই। তবে, "স্বাধীনতা রক্ষায় প্রয়াসী" কথাটি হয়ত অর্থপূর্ণ ; কোনও রাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট শিবির হইতে সাহায্য গ্রহণ করিলে সে রাষ্ট্র স্বাধীনতা রক্ষায় প্রয়াসী নহে বলিয়া হয়ত ব্যাখ্যা করা হইবে। মিশর ও সিরিয়া কম্যুনিষ্ট শিবির হইতে অস্ত্র ক্রয় করায় মার্কিণ মানদণ্ডে স্বাধীনতা রক্ষায় অনাগ্রহী বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভব।

মার্কিণ কংগ্রেসে আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা—

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার রিপাবলিক্যান্ দলের প্রার্থীরূপে সম্প্রতি দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু মার্কিণ কংগ্রেসে ডিমোক্রেটিক দলের সংখ্যাধিক্য। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্ব—বিশ্ব-শান্তি রক্ষার জন্ম সর্ব্বতোভাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সামরিক জোট গঠন, এবং কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ নিবারণের জন্ম অনুন্নত দেশগুলিকেসাহায্য অর্থনৈতিক প্রদান। এই মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমেরিকার দুইটি রাজনৈতিক দলে কোনরূপ মতবৈধ নাই। তবু, আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে ডিমোক্রেটিক দলে কিছু কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে। কোনও কোনও ডিমোক্রেটিক সদস্য মনে করেন যে, আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার কৌশলে তাঁহাদিগকে এক অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলা হইয়াছে ; প্রেসিডেণ্টকে প্রার্থিত ক্ষমতা প্রদানে অসম্মত হইলে ইহাই বুঝাইবে যে, মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সোভিয়েট রুশিয়ার অনুপ্রবেশ পরোক্ষে অনুমোদন করা হইয়াছে। ইতিপুর্ব্বে ফরমোজা অঞ্চলে মার্কিণ সৈন্ম নিয়োগের অবাধ ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টকে দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়া কোনও কোনও ডিমোক্রেটিক সদস্যের ধারণা। মধ্য প্রাচ্যে মার্কিণ সৈন্ম নিয়োগ সম্পর্কে সেইরূপ "ব্ল্যাঙ্ক চেক্" দেওয়ায় কি আমেরিকার জনসাধারণ, কি সম্ভাবিত শত্রুপক্ষ—কাহাকেও পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিবার ব্যবস্থা হইবে না বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আর একটি সমালোচনা—ডাণ্ডা তুলিয়া ধরিবার এই নীতিতে মধ্য প্রাচ্যের মূল দুইটি সমস্যার সমাধান হইবে না,—আরব-ইস্রাইল সংক্রান্ত সমস্যা ও সুয়েজ খাল সংক্রান্ত বিষয়টি অমীমাংসিতই থাকিয়া যাইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, উল্লিখিত দুইটি সমস্যার সহিত পরিকল্পনার কোনও সম্পর্ক নাই। যাহা হউক, এই সব বিরুদ্ধ সমালোচনা খুবই মৃদু ; ইহার ফলে পরিকল্পনার ভাষা কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—মূল বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইবে না।

আমেরিকার উদ্দেশ্য—

মধ্য প্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী অভিযানের সময় আমেরিকার অনুসৃত নীতি যে আশার সঞ্চার করিয়াছিল আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনায় তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। ঐ সময় আমেরিকা জাতি-সঙ্ঘের প্রতি অত্যধিক আনুগত্য দেখাইয়াছিল সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থে,—বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণায় নহে। এই কূটনৈতিক কৌশলে বৃটেন ও ফ্রান্সকে সে কোনঠাসা করিয়াছে। মধ্য প্রাচ্য হইতে বৃটেনের পাততাড়ি এখন একেবারেই উঠিয়াছে ; সেই শূন্ম স্থান জুড়িয়া বসিবার জন্ম আমেরিকা এখন নিজে আগাইয়া আসিতেছে। এবার আর জাতি-সঙ্ঘের দোহাই নাই ; এখন আমেরিকার মূর্ত্তি নগ্ন। মধ্য প্রাচ্যে মার্কিণ সৈন্ম নিয়োগের যে ব্যবস্থা হইয়াছে. সে সৈন্ম জাতি-সঙ্ঘের সেনাবাহিনীর অংশ নহে। অবশ্য, নিরাপত্তা পরিষদের চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্বাধীনে (Overriding authority of the Security Council) ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই কথার সঙ্গত অর্থ যাহাতে কেহ না করে, তদুদ্দেশ্যে, মার্কিণ কংগ্রেসে আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতা শেষ হইবার পরই পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্ত্তারা জানাইয়া দিয়াছেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ যদি আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় যথাযথ নিযুক্ত থাকে. একমাত্র তাহা হইলেই আমেরিকা উহার অধীনে কাজ করিবে ; নতুবা প্রেসিডেণ্ট সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। অর্থাৎ, আমেরিকার স্বার্থে ব্যবস্থা অবলম্বনের অবাধ ক্ষমতাই প্রেসিডেণ্ট লইতেছেন ; এই প্রসঙ্গে জাতি-সঙ্ঘের নাম করা হইয়াছে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় শুধু একটা চিনির প্রলেপ দিবার জন্ম। তাহার পর, অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের কথা। প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিই এখন ইহা স্বীকার করেন যে, সাহায্যপ্রাপ্ত দেশকে নিজ স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যদি না থাকে, "ঠাণ্ডা লড়াইয়ের" ঘুঁটি হিসাবে তাহাকে ব্যবহার করা যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে জাতি-সঙ্ঘের মাধ্যমেই আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সে নীতি অনুসরণ করিলেন না। মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকার বিপুল তৈল-স্বার্থ ও সামরিক স্বার্থের সহিত আর্থিক সাহায্য দানের এই পরিকল্পনাকে মিলাইয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হইয়া ওঠে যে, আমেরিকা নিষ্কামভাবে কাহাকেও আর্থিক সাহায্য দিবে না; আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাপারটা অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈয়ারী "কূটনৈতিক কীলকের সূক্ষ্ম প্রান্ত মাত্র।"

শক্তিদ্বন্দ্বের লীলাক্ষেত্র মধ্য প্রাচ্য—

আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনায় শূন্য স্থান (Vacuum) কথাটা ব্যবহার করা হয় নাই; কারণ কথাটায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের উৎকট গন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু বৃটেন এতদিন যে উদ্দেশ্যে এখানে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, আজ আমেরিকাও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে এখানে আসিতেছে: সেই তৈল-স্বার্থ, সেই রুশিয়ার অনুপ্রবেশ নিবারণ! জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলিকে আন্তর্জ্জাতিক শক্তিদ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ রাখিয়া এই অঞ্চলকে স্বাধীন ও সুসংহত হইবার সুযোগ সে দিল না। তৈল-স্বার্থের ক্ষেত্রে বৃটেনের সহিত আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুদিন হইতে চলিতেছে, এবং সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৃটেন পশ্চাদপসরণ করিয়াই আসিতেছে। "ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ কোম্পানীগুলি মধ্য প্রাচ্যের শতকরা ৫০ ভাগ তৈলে কর্তৃত্ব করিত; এখন বৃটিশের সেয়ার শতকরা ৩০ ভাগেরও কম; মার্কিণ কোম্পানীগুলির কর্তৃত্ব শতকরা ৬০ ভাগের উপর।" (ইউ, এস, নিউজ এণ্ড ওয়ার্লড্ রিপোর্ট ১২।১১।৫৬)। মধ্য প্রাচ্যে বৃটেনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্ব নিস্প্রভ হইবামাত্র পশ্চিমে লিবিয়া হইতে পূর্ব্বে পাকিস্থান এবং উত্তরে তুরস্ক হইতে দক্ষিণে সৌদী আরব (আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা প্রয়োগের ইহাই ভৌগোলিক এলেকা) পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকে নিজের পক্ষপুটে গ্রহণের যে নীতি আমেরিকা গ্রহণ করিল, তাহাতে তৈল-স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন স্বভাবতঃ আরও কাবেল হইবে। ইহা অবশ্য পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী শিবিরের ঘরোয়া বিবাদ। এই বিবাদের জয়-পরাজয়ের সহিত আরব জগতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কম। রাজনৈতিক ব্যাপারে এই অঞ্চল শক্তিদ্বন্দ্বের লীলাক্ষেত্র হইয়াই রহিল। এক হাতে ডলারের থলি এবং অন্য হাতে এটম্ বোমা লইয়া মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকার এই নূতন অভিযানে সোভিয়েট রুশিয়া নিশ্চয়ই উদাসীন থাকিবে না। বস্তুতঃ, সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট "চ্যালেঞ্জ" লইয়াই আমেরিকা মধ্য প্রাচ্যে আসিতেছে: এই অঞ্চলে কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধই তাহার বিঘোষিত উদ্দেশ্য; প্রথমে অর্থনৈতিক সাহায্য, তাহার পর সামরিক সাহায্য এবং শেষ পর্য্যন্ত মার্কিণ সৈন্য নিয়োগের এই আয়োজন সোভিয়েট রুশিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই। সাধারণভাবে সকল প্রকার আক্রমণ হইতে মধ্য প্রাচ্যকে রক্ষা করা আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নহে,—প্রতিরোধ করা হইবে শুধু কম্যুনিষ্ট আক্রমণ। অথচ, মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক আক্রমণের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই, তাহার কোনও আক্রমণমূলক অভিসন্ধিও প্রকাশ পায় নাই। সম্প্রতি আমেরিকার দুইটি "ন্যাটো" (উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা) দোস্তই মধ্য প্রাচ্যে প্রবল আক্রমণে লিপ্ত হইয়াছিল; এখনও ইস্রাইলে ফরাসী সমর-দপ্তরের নানাবিধ চক্রান্তের কথা শোনা যাইতেছে। এই পক্ষের পরবর্ত্তী কোনও আক্রমণ নিবারণের কথা আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনায় নাই। ইহা ছাড়া, আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনায় আরব-ইস্রাইল বিরোধ মীমাংসা করিবার প্রতিশ্রুতি নাই; সুয়েজ খালের কোনও প্রসঙ্গও নাই,—আছে শুধু কম্যুনিষ্ট-বিরোধী অর্থনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার প্রতিশ্রুতি। ইতিপূর্ব্বে এই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী তৎপরতা—যথা, মধ্য প্রাচ্য কম্যাণ্ড গঠনের আয়োজন, দূরপাল্লার বিমানঘাঁটী (সৌদী আরবের ধাহরাণে) স্থাপন, বাগদাদ চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি সোভিয়েট রুশিয়াকে মধ্য প্রাচ্যে অনুপ্রবেশে বিশেষভাবে প্ররোচিত করিয়াছে, এবং এই শক্তিদ্বন্দ্বের দ্বারা আরব রাষ্ট্রগুলির উপকৃত হইবার সুযোগও সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ, মধ্য প্রাচ্য শক্তিদ্বন্দ্বের লীলাক্ষেত্র হইবার জন্যই এই অঞ্চলের নিজস্ব সমস্যাগুলি এতদূর জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র মধ্য প্রাচ্যকে অসামরিক নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করিয়া স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানে সহায়তা করাই ছিল এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও প্রকৃত সমৃদ্ধি স্থাপনের উপায়। নূতন আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনায় ঠিক তাহার বিপরীত হইতেই যাইতেছে। তবে, আশার কথা এই—বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি ব্যতীত আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। মিশর, সীরিয়া, জর্ডান প্রভৃতি রাষ্ট্রের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ধারা খুবই প্রগতিশীল।

বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি স্বভাবতঃ আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনায় উৎফুল্ল হইয়াছে। আমেরিকাকে পুরাপুরি এই চুক্তির মধ্যে আনিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ প্রথম হইতেই। বাগদাদ চুক্তিতে আমেরিকা স্বাক্ষর করুক, আর না ই করুক, তাহাদের পাশে আমেরিকার খোলাখুলি দাঁড়াইবার প্রতিশ্রুতি এই পরিকল্পনায় রহিয়াছে। জানুয়ারী মাসে বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত চারিটি মুসলমান রাষ্ট্র আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনাকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানাইয়াছেন; আগামী মার্চ্চ মাসে বৃটেন আবার চুক্তির বৈঠকে যোগ দেবে।

এদিকে বাগদাদ্ চুক্তি-বিরোধী তিনটি রাষ্ট্র (মিশর, সীরিয়া ও সৌদী আরব) সম্প্রতি কায়রোয় মিলিত হইয়াছিল। তাহারা জর্ডনকে বৎসরে এক কোটী বিশ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। বৃটেনের নিকট হইতে জর্ডান্ এই অর্থ সাহায্য পাইত; এই সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত জর্ডানের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ইঙ্গ-জর্ডান্ চুক্তি বাতিল করিতে পারিতেছিলেন না, অথচ বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট এই চুক্তি বাতিল করিবার জন্য নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জর্ডান্ গভর্ণমেণ্ট এখন ইঙ্গ-জর্ডান চুক্তি বাতিল করিয়াছেন। জর্ডান্‌বাসী মনে করিত যে, এই চুক্তির বাৎসরিক এক কোটী বিশ লক্ষ পাউণ্ডই তাহাদিগকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রথের চাকায় শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিল। ইঙ্গ-জর্ডান্ চুক্তি বাতিল হওয়ায় আম্মান্ ও মাফ্রাকের ঘাঁটী হইতে বৃটেনের তল্পী উঠিল।

আমেরিকার বিষ নজর—

বলা বাহুল্য, বাগদাদ্ চুক্তি-বিরোধী তিনটি আরব রাষ্ট্রকে আমেরিকা সুনজরে দেখে না; এই জোট ভাঙিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টাই করিবে। ইতিমধ্যেই শোনা যাইতেছে যে, সীরিয়াকে কম্যুনিষ্ট জোটের আধা তাঁবেদার বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে; আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার অর্থ সাহায্য সে পাইবে না। মিশরে সম্প্রতি বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করায় আমেরিকা নাকি বড় চটিয়াছে; নাসের ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকা পর্য্যন্ত আমেরিকা মিশরকে কোনও সাহায্য দিবে না। সৌদী আরবের তৈল সম্পদে আমেরিকার একচেটিয়া কর্তৃত্ব; সুতরাং তাহার সম্পর্কে আমেরিকা স্বভাবতঃ সতর্ক। বিশেষতঃ, মুসলমান জগতে সৌদী আরবের মর্য্যাদাও বিপুল। বর্ত্তমানে সৌদী আরবের রাজা আমেরিকায় সফর করিতেছেন। তিনি যাহাতে কায়রো ও দামাস্কাসের "অপদার্থগুলির" দল ছাড়েন, তাহার জন্ম আমেরিকা নিশ্চয়ই তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইবে।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ—

জানুয়ারী মাসে পাকিস্থান কাশ্মীর প্রসঙ্গ জাতি-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করিয়াছিল। নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পাকিস্থান নির্দ্দেশ চাহিয়াছিল যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্ত অংশের গণ-পরিষদ কর্তৃক ঐ রাজ্যের ভারত-ভুক্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যেন চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত না হয়, এবং জাতি-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গণ-ভোটের দ্বারা কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের নীতি যেন অপরিবর্ত্তিত থাকে। এই সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তৃতা আরম্ভ হইবার দুইদিন পূর্ব্বেই "দুই পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া" পাকিস্থানের অনুকূলে প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল। বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কিউবা ও কলাম্বিয়া এই পাঁচটি শক্তির নামে প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হইলেও এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিল বৃটেন; বৃটিশ প্রতিনিধি পাক প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তাব রচনা করেন, এবং ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়। পরিষদের এগারটি সভ্যরাষ্ট্রের মধ্যে দশটি রাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করে; নিরপেক্ষ ছিল সোভিয়েট রুশিয়া—বিরুদ্ধ ভোট সে-ও দেয় নাই।

শক্তিদ্বন্দ্বের সহিত বিজড়িত কাশ্মীর—

পাকিস্থান এমন একটি সময়ে জাতি-সঙ্ঘে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিল, যখন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে "শীতল সংগ্রাম" নূতন করিয়া আরম্ভ হইতেছে। সামরিক জোটের (বাগদাদ্ চুক্তি ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার) অন্তর্ভুক্ত পাকিস্থানকে এখন কোনক্রমেই অসন্তুষ্ট করা চলে না। বিশেষতঃ, কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সমরায়োজনে কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক; এই রাজ্য পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবার অর্থই হইল ইহার ভৌগোলিক গুরুত্বকে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে ব্যবহারের অবাধ অধিকার লাভ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—আইসেন্‌হাওয়ার পরিকল্পনায় সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে (পাকিস্থানও ইহার অন্তর্ভুক্ত) বিপুল কম্যুনিষ্ট-বিরোধী আয়োজন আরম্ভ হইতেছে। এই আয়োজনের সময় সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন কাশ্মীর পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই রোধ করা চলে না। ইহা ছাড়া, আরব রাষ্ট্রগুলিকে আমেরিকার মিত্রতার গুরুত্ব বুঝাইবারও প্রয়োজন আছে: পাকিস্থান আমেরিকার সহিত সামরিক গাঁটছড়া বাঁধিয়াছে বলিয়াই না সে নিরাপত্তা পরিষদে তাহার মনোমত রায় পাইল। নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনে আমেরিকা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকার বর্ত্তমান নীতি ও মনোভাবই এই প্রস্তাবে শক্তি যোগাইয়াছে। বৃটেন্ এই প্রস্তাব রচনায় অগ্রণী হইয়াছিল: মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী অভিযানের সময় ভারত যে নীতি অনুসরণ করে, তাহাতে বৃটেন্ চটিয়াছিল; কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের বিরুদ্ধতা করিয়া সে গায়ের জ্বালা জুড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া, বাগদাদ্ চুক্তির ও "সিয়াটোর" সভ্য পাকিস্থানকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে কাহারও না কাহারও মদৎ করিতে আগাইয়া আসিবার প্রয়োজনও ছিল। অন্যপক্ষে সোভিয়েট রুশিয়াও কতকটা রাজনৈতিক কারণেই কাশ্মীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয় নাই। কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব সোভিয়েট রুশিয়া স্বীকার করিয়াছে; সুতরাং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই শীতল সংগ্রামের যুগে সে-ও ভারতের উপর কূটনৈতিক চাপ দিতে চাহিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ভারতের যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হইয়াছিল, হাঙ্গেরির ব্যাপারে তাহা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারত হাঙ্গেরিতে অনুসৃত সোভিয়েট নীতির বিরোধিতা করিয়াছিল। সোভিয়েট রুশিয়াও তাই কাশ্মীরের ব্যাপারে জানাইয়া দিল—যেহেতু ভারত পরিপূর্ণভাবে তাহার পক্ষে নহে, সে জন্য সে-ও সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতের পূর্ণ সমর্থক নয়। বস্তুতঃ, কাশ্মীর এখন আন্তর্জ্জাতিক শক্তি-দ্বন্দ্বের ঘুঁটিতে পরিণত হইয়াছে; সেই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াই কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হইয়াছে, এবং এই সম্পর্কে ভোটাভুটিও চলিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক শক্তিদ্বন্দ্বের সহিত বিজড়িত কাশ্মীর প্রশ্নে কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহা পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিতই ছিল।

ইডেনের পদত্যাগ—

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যর এন্থনী ইডেন্ পদত্যাগ করিয়াছেন। মুমূর্ষু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে প্রভুত্ব রক্ষার জন্য যে মরণ-কামড় দিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। এই অঞ্চলের রাজনীতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে বৃটিশ প্রভাব বিলুপ্তির নিদর্শনই হইল স্যর এন্থনী ইডেনের পদত্যাগ। অবশ্য, বৃটিশ রক্ষণশীল দলের ইডেন্-চক্রই এখনও বৃটেনে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অপ্রত্যাশিতভাবেই স্যর এন্থনীর বিশ্বস্ত সহচর মিঃ ম্যাক্‌মিলান্ নূতন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। ইডেনের মধ্যপ্রাচ্য নীতির উৎসাহী সমর্থক মিঃ সেল্‌উইন্ লয়েড্ই পররাষ্ট্র সচিব রহিয়াছেন।

চৌ এন্-লাইয়ের বিদেশ ভ্রমণ—

চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন্ লাই গত কিছু কাল বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। ইউরোপে তিনি সোভিয়েট রুশিয়ার এবং কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে গিয়াছিলেন। এশিয়ায় তিনি কাম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, ভারত, পাকিস্থান, আফগানিস্থান ও সিংহল ভ্রমণ করিয়াছেন। জানুয়ারী মাসে তিনি তৃতীয়বার ভারতে আসিয়াছিলেন।

রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি ষ্ট্যালিন্ নিন্দার নীতি গ্রহণ করায় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অপসারণ করাই চৌ এন্-লাইয়ের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। আর হাঙ্গেরির ব্যাপারে অ-কম্যুনিষ্ট নিরপেক্ষ দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট শিবির সম্পর্কে যে দ্বিধা ও সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তিনি দূর করিতে চাহিয়াছেন। ইহা ছাড়া, চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসা করা এবং চীন-নেপাল বাণিজ্য সম্পর্ক সুদৃঢ় করিয়া তোলাও তাঁহার বিদেশ ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

ছয়

বনশ্রীর বাবা জি-কে রায় এখন পেনশনের জীবন যাপন করছেন। তার অর্থ রাত তিনটের ঘুম ভেঙে যাওয়া বিছানায় এপাশ ওপাশ করা, সম্পূর্ণ অর্থহীন একটা বিদ্বেষে কাচের জানলার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখা : কেমন করে 'রাত্রির তমসা তরল হয়ে আসছে—ওপারের অবয়বহীন দেবদারু গাছটা একটা আকার নিচ্ছে ধীরে ধীরে। সাড়ে চারটা বাজতে না বাজতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া, হাত মুখ ধুয়ে হাফপ্যান্ট পরে একটা লাঠি হাতে নিয়ে—লেকের ধারে ঘাসে জুতো ভিজিয়ে ভিজিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানো। তারপর আকাশে সূর্যের রঙ ধরলে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে খানিকক্ষণ হাঁপানো। আর মনে মনে এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়া : ভাগ্যিস—ভোরে বেড়ানোর এই অভ্যাসটা এখনো রেখেছিলাম, তাই এই বাষট্টি বছরেও শরীরটা ভেঙে পড়েনি।

কিছুক্ষণের জন্যে একটা অদ্ভুত ভালো লাগায় সমস্ত মনটা ভরে ওঠে। কিছুক্ষণ ধরে ভাবতে ইচ্ছে করে—আঃ, ভারী চমৎকার এই ছুটী পাওয়া দিনগুলো—এমনি পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্তেই বুঝি সারা জীবন অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

সামনে লেকের জলে সোনার রোদ পড়ে—নারকেলের পাতা সোনাঝুরি হয়ে কাঁপতে থাকে। জি, কে, রায় সেদিকে তাকিয়ে বিশ্রামের শান্ত সমাধির মধ্যে তলিয়ে থাকেন। দূর থেকে হঠাৎ কারুর মনে হয় যেন ধ্যান করছেন তিনি। তারপরেই হয়তো আকস্মিকভাবে কোনো সঙ্গীর আবির্ভাব ঘটে সেখানে। আজও তাই হল।

—এই যে—কতক্ষণ ?

ড্রেসিং গাউনপরা চুরুটধারী ব্যানার্জি সাহেবের মূর্তি দেখা দিল সামনে। ইনিও পেনশনভোগী।

—রায় মশাই কখন এলেন ?

—এই তো কিছুক্ষণ হল।

—বেড়ালেন ?

— বেশি নয়, দুপা হেঁটে এলাম।

—আমাদের পক্ষে দু'পাই যথেষ্ট। তিন পা ফেলব সেই কেওড়াতলায় যাবার সময়।—বলে চুরুট থেকে এক-রাশ উগ্র দুর্গন্ধ প্রায় জি-কে রায়ের মুখের ওপরে ছড়িয়ে দিয়েই ধুপ করে পাশে বসে পড়লেন।

আর তখন মনে পড়ল। যে-ভাবনাটাকে সব সময়ে ভুলে থাকতে চান—সেইটেই হঠাৎ অত্যন্ত নিষ্ঠুর নগ্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত হল সামনে। সোনাঝুরি পাতার রঙ বদলে গেছে, লেকের জলে ঝকঝক করছে ধারালো রোদ। সামনের শিশু গাছটায় একপাল কাক চিৎকার জুড়ে দিয়েছে কর্কশ গলায়। জি-কে রায় চকিতের মধ্যে উপলব্ধি করছেন, এই শান্ত ভোরের আলোর ভেতরে ডুবে থাকবার সময় ফুরিয়ে গেছে তাঁর। সামনে একটা দীর্ঘ দিন—দীর্ঘতর রাত। এই দিন রাশি রাশি ভাঙা কাঁচের মতো বিরক্তি দিয়ে ছড়ানো—মুহূর্তে তারা আঘাত করবে, তারা রক্তাক্ত করতে থাকবে। আর চোখের ওপর ঘুমের একটা ক্ষীণ আবরণ নেমে না আসা পর্যন্ত রাত্রিটা দুর্ভাবনার শয্যা-কণ্টকীর মতো সারা গায়ে জ্বালা ধরাতে থাকবে। বাড়িটার বন্ধকী দশা, শোধ করবার যা উপায় নেই, সেই দেনার বিভীষিকা, হিতেন, রীতেন—

—কী ভাবছেন রায় মশাই? ব্যানার্জি সাহেবের প্রশ্ন।

—কী আর ভাবব?

ব্যানার্জি শীর্ণ আঙুলের টোকা দিয়ে চুরুট থেকে মোটা খানিক ছাই ঝেড়ে ফেললেন। দার্শনিক উদাস ভঙ্গিতে বললেন, তা বটে। এতদিন তো অনেক ভেবেছেন, দিন কয়েক নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিন।

এ-কথা ব্যানার্জি বলতে পারেন—বলবার জোর তাঁর আছে। তাঁর প্রত্যেকটি ছেলে কৃতী, মেয়েদের তিনি ভালো ঘরে বরে বিয়ে দিয়েছেন। চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন জীবনের বাকী দিনগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন তিনি। এখন মৃত্যুকেও প্রসন্ন মুখে স্বীকার করে নিতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই।

জি-কে রায় বিমর্ষ হাসি হাসলেন, নির্ভাবনায় থাকতে চেষ্টা তো করছিই। কিন্তু জানেনই তো, আমি ঠিক আপনার মতো ভাগ্যবান নই।

ব্যানার্জি সংকুচিত হলেন।

—তা বটে। হিতেন রীতেন—একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, হিতেনের নতুন খবর আছে কিছু?

—না। চিঠিপত্র সে আর লেখেনা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। জি-কে রায়ের মনের বিষণ্ণতা ব্যানার্জির মনেও ছায়া ফেলতে লাগল। তিন চারটি ছোট ছোট মাদ্রাজী ছেলেমেয়ে খানিক দূরে ছুটোছুটী আরম্ভ করেছিল, সেদিকে বিষাদ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দুজনেই। বোধ হয় একটা দুর্বোধ্য ঈর্ষ্যার ছোঁয়া এসে লেগেছিল কোথাও।

—আপনার মেয়েটি কিন্তু ভালো হয়েছে।—ব্যানার্জি সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

—হুঁ।

আবার চুপচাপ। আধপোড়া চুরুটটাকে বিশ্রী রকমের তেতো মনে হল ব্যানার্জির। ফেলে দিতে গিয়েও পারলেন না, বেঞ্চের গায়ে তার জ্বলন্ত মুখটাকে ঘষে নিভিয়ে নিয়ে ধরে রাখলেন হাতের মুঠোয়।

প্রসঙ্গ বদলে দিতে চেষ্টা করলেন ব্যানার্জি।

—এবার ইলেকশনের অবস্থা কেমন বুঝছেন?

জি-কে রায় একটু নড়ে উঠলেন—নিজের ভেতরে উত্তেজনা সঞ্চার করে নিতে চাইলেন খানিকটা। এই দুশ্চিন্তা আর কটু বিরক্তির ভাবটা তিনিও সইতে পারছিলেন না।

—এ সীটটা কংগ্রেস লুজ করবে।

—যা বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়।—ব্যানার্জি বললেন, আরে মশাই, শুধু কি আর প্ল্যানে কুলোবে? কয়েকটা প্ল্যান্ট্ আর প্রোজেক্টেই বা কতখানি এগোবে—বলুন? রিফিউজি প্রব্লেম রয়েছে, স্কার্সিটি চারদিকে—লেবার মুভমেণ্ট্ও থামছে না। লেফ্ট-ইউনিটি যদি তেমনভাবে হয়—

—হুঁঃ—লেফ্ট-ইউনিটি!—জি কে রায় মুখভঙ্গি করলেন: বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি! নিজেদের ভেতরে সীট্ নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা করবে না কন্‌টেস্ট্ করবে? ওদের কথা ছেড়ে দিন। এদের পলিসিও তো খুব খারাপ নয়। আমাদের এখানেও ঠিক জিতে যেত মশাই—তা নয়, বাজে একটা লোককে নমিনেশন দিয়ে বসল। কে চেনে বলুন তো আপনাদের ওই ঘোষ-মল্লিককে? সিপিং এজেন্টের কাজে দু-পয়সা করে নিয়েছে—বেশ কথা। কিন্তু পিপ্‌লের জন্যে কী করেছে? কেন লোকে ওকে ভোট দেবে?

—যা বলেছেন।—ব্যানার্জি সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন: ঘোষ-মল্লিককে নমিনেশন দেওয়া খুবই ভুল হয়েছে। মহা ঘুঘু লোক মশাই। মনে নেই সেবারে কর্পোরেশনের ব্যাপারটা? ওঃ—সে কি মেজাজী কথাবার্তা। তখনই বুঝেছিলুম, লোকটার আর মাথার ঠিক নেই। কর্তাদের নেকনজরে পড়বার পর থেকে—

আলোচনা এগিয়ে চলল। কর্পোরেশন থেকে এগোল ঘোষ-মল্লিকের ব্যক্তিচরিত্রের দিকে। সেখান থেকে আরো এগিয়ে এ-কালের দুর্গতি ও দুর্নীতি, আই-এ-এস্ পরীক্ষায় বাঙালি ছাত্রদের ব্যর্থতার মূল কারণ, এখনকার রেলে ফার্স্ট ক্লাশ কামরার দুর্গতি, গতবার পুজোর ছুটিতে ব্যানার্জি যখন হরিদ্বার যাচ্ছিলেন তখন পথে বৃষ্টি হয়ে ট্রেনের ছাত দিয়ে ঝাঁঝরির মতো জলপড়া, এবারের অকালবৃষ্টি, তারপর—

তারপর একসঙ্গেই চায়ের তৃষ্ণা। ডেক চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে খবরের কাগজ পড়বার প্রলোভন।

ব্যানার্জি বললেন, চলুন, ওঠা যাক।

জি-কে রায় উঠে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গেই। আলোচনায় সৎ দিয়ে যে তিক্ততাটাকে কাটিয়ে তুলতে চাইছিলেন, সেটা দ্বিগুণ হয়ে মনের ওপর চেপে বসেছে। একটা চাপা আক্রোশ ফুঁসে উঠছে ব্যানার্জির ওপর। অকারণে এতক্ষণ ধরে তাঁকে বকিয়েছে লোকটা। এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে এতক্ষণ তাঁর চেঁচামেচি করবার দরকার ছিলনা। অনেক বেশি ভাববার ছিল—অনেক কথা ভাববার ছিল।

অনেক কথা ভাববার আছে। মনের সেই বোঝাটা নিয়ে জি-কে রায় বাড়ির লনে পা দিতেই একটা হিংস্রতার খানিক উত্তপ্ত বাষ্প ফেটে পড়ল মাথার ভেতরে।

সামনে রীতেন। ভবিষ্যৎ 'গ্লোব-ট্রটার'দের একজন। সশব্দে তার মোটর-সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছে।

ছেলের মূর্তি দেখলেই তাঁর গা-জ্বালা করে। মুখের ওই অদ্ভুত দাড়িটা দেখলেই মনে হয়—ওটা ওর রূপসজ্জা নয়, সারা পৃথিবীর সঙ্গতি আর সৌন্দর্যবোধকে ভেংচি কেটে ঠাট্টা করার আয়োজন। গায়ে জিপ্-লাগানো জ্যাকেট—তার দু'পাশে কোমরের কাছে দুটো এভারব্রাইট স্টিলের টুকরো ঝিকমিক করছে। হিপ-পকেটওয়ালা ট্রাউজার আর ডোরাকাটা মোটা মোটা মোজা দুটো দেখলে একেবারে মার্কিনী ছবির নিখুঁত একটি গ্যাংস্টার বলে সন্দেহ হয়।

মোটর সাইকেলে স্টার্ট এবং মুখটাকে ছুঁচলো করে শিস দেওয়া একসঙ্গেই চলছিল রীতেনের। কাল রাত্রে একখানা দুর্ধর্ষ 'হিলারিয়াস্' ছবি দেখেছে রীতেন—মনের মধ্যে তারই গানের সুর গুন্‌গুন্ করছে। রীতেন যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে শিস্ দিচ্ছিল: "That lucky guy gave a lift—gave a lift to the blonde lassie—"

তারপরেই ঠিক যখন "Ola-la—" বলতে যাবে, তখনি গেটের সামনে জি-কে রায় এসে দাঁড়ালেন।

—হেলো পপ্!

রীতেন সুর থামিয়ে একগাল হেসে বাপকে অভ্যর্থনা করল। ঠিক মার্কিনী রীতিতে। জি-কে রায়ের আবার মনে হল, ওই বিশ্রী দাড়িগুলো আর আরো বিশ্রী হাসি দিয়ে রীতেন তাঁকে ভেংচি কাটছে।

জি-কে রায় রুক্ষ গলায় বললেন, চলেছিস কোথায়?

সব বেসুরো হয়ে গেল। রীতেনের তনুমন যখন সমস্বরে বলছিল, সে নিজেই একটি "lucky guy" এবং একটি 'হাইকার' "blonde lassie"কে মিচিগানের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে সাক্ষাৎ ড্যানি কে-র মতো অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে, তখন জি-কে রায়ের সম্ভাষণের ভঙ্গিটা তার অত্যন্ত খারাপ লাগল?

—এনিথিং রং—হে পপ্?

এই আমেরিকান ইংরেজী অত্যন্ত কদর্য মনে হয় জি-কে রায়ের। এমন সুন্দর, ভদ্র, জোরালো ভাষাটাকেই কুৎসিত আর কুশ্রাব্য করে তুলেছে। একালের অর্ধেক মার্কিন শব্দই তাঁর দুর্বোধ্য ঠেকে—একদা ইংরেজীর এম-এ জি-কে রায় ভাবেন একদল আউট্‌-ল আর র‍্যাঙ্কম্যানই এখন ওদেশের লেখক হয়ে বসেছে।

জি-কে রায় প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

—অমন গাড়োয়ানি ইংরেজি বলতে হবেনা—তুই বাঙালির ছেলে!

রীতেন বললে, golly!

—শাট্ আপ!—জি-কে রায় বললেন, একটা হনুমান হচ্ছিস দিনের পর দিন। কোথায় বেরুচ্ছিস এই সাত-সকালে অকর্মার ঢেঁকি কোথাকার?

রীতেন চোখ কপালে তুলে একবার সবিস্ময়ে বললে, My—! তোমার কী হল পপ্? সকালবেলাতেই যে রেগে একেবারে আগুন হয়ে রয়েছ!—মুখের দাড়ির ওপর একটা হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, তুমি কি জানোনা যে আজ আমার সাইকেল রেস আছে? অ্যাণ্ড্ আই হোপ টু গেট্ দি লরেল?

—সাইকেল রেস? খাসা আছিস—না? কিন্তু এই ফিরিঙ্গি বাবুয়ানি আর বাপের গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে খাওয়া আর বেশিদিন চলবেনা বলে দিচ্ছি। যদি রোজগার না করতে পারো, তা হলে এবাড়িতে আর থাকা চলবেনা তা পরিষ্কার জেনে রাখো। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্?

—ও কে—ও কে—অধৈর্যভাবে একবার হাত নাড়ল রীতেন। এসব কথা শুনে শুনে পুরোনো হয়ে গেছে—ও আর গায়ে বাজে না। আই নো মাই ওল্ড্ ম্যান—হি'জ্ লাইক দ্যাট্!—মোটর সাইকেল স্টার্ট নিলে, তারপর

জি-কে রায়ের মুখের ওপর একরাশ দুর্গন্ধ নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

জি-কে রায় বাংলা মতে বললেন, হতচ্ছাড়া ধর্মের ষাঁড় কোথাকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জি-কে রায় ভাবতে লাগলেন, সত্যিই তো—কী দোষ রীতেনের? দিনের পর দিন তিনিই তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন—যা খুশি করে বেড়িয়েছে, কখনো বাধা দেননি। বাঙালির স্কুলে ইংরেজি শিখতে পারবে না ভেবে কালিম্পঙের একটা স্কুলে রেখে পড়িয়েছেন, তখন একথা ভাবেন নি—চোখের বাইরে রেখে এবং প্রচুর টাকা হাত খরচ দিয়ে ও ভাবে পড়ালে ছেলে অন্য রকম ইংরেজিও শিখতে পারে। তাঁর সিগারেটের টিন থেকে রীতেন যখন তার মার্কিনী ইংরেজি নিয়মিত 'বাট্‌স্'. সরিয়েছে, তখন দেখেও দেখেন নি জি-কে রায়। মোটর সাইকেল কেনবার টাকাও তিনিই দিয়েছিলেন।

বসবার ঘরে ঢুকে সোফার ওপর নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন জি-কে রায়। চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এখন। এই বাড়ি করিয়েছিলেন। অনেক সখ করে—আজ দুটো মর্টগেজ পড়েছে। ছাড়াবার কোনো আশা নেই। পেন্‌শনের টাকার অর্ধেক আজকাল যায় দেনা শোধ করতে। শুধু বনশ্রী শ' দুই টাকা মাইনে পায় বলে কোনোমতে চলছে। না হলে—

পেন্‌শন নেবার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই সারা পৃথিবীর চেহারাটা এমন করে বদলে যাবে—একথা কি কখনো কল্পনাও করেছিলেন জি-কে রায়। নিজেকে তাঁর হাউইয়ের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয় এখন। কিছুদিন আগেও আকাশ আলো করে জ্বলছিলেন, মুঠো মুঠো ছাইয়ের মতো ঝরে পড়ছেন এখন।

বনশ্রী এল।

—বাবা, চা—

—তুই কেন? অযোধ্যা কোথায়?

চা-রুটি টেবিলে রেখে বনশ্রী বললে, অযোধ্যা বাজারে গেছে।

—আবার অযোধ্যা কেন? আমিও একবার ঘুরে আসতাম।

—রোজ রোজ তুমি আর কেন যাবে বাজারের গণ্ডগোলের মধ্যে? একটু বিশ্রাম নাও।

বিশ্রাম! সবাই-ই ওকথা বলে জি-কে রায়কে—সবাই বলে, এখন আপনার বিশ্রাম নেওয়া দরকার। তাই বটে। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিতে নিতে জি-কে রায় ভাবলেন: ওটা শুধু ভদ্রতা করে জানিয়ে দেওয়া সংসারে তাঁকে দিয়ে আর কারো কোনো প্রয়োজন নেই—তিনি ফুরিয়ে গেছেন।

বাজার তিনি বরাবর নিজের হাতেই করেছেন। ওটা তাঁর বিলাস ছিল। তখন অফিসের আর্দালী যেত সঙ্গে সঙ্গে (আজ অবশ্য পুরোনো অফিসে ফিরে গেলে সে আর্দালী তাঁকে দেখে টুল ছেড়েও দাঁড়াবে কিনা সন্দেহ)। বনশ্রী জানে, বাজারে যেতে তাঁর কষ্ট হয় না, আজও তাঁর তা ভালো লাগে। তবু সে অযোধ্যাকেই পাঠায়। কেন পাঠায়? জি-কে রায় বাজারে গেলে যে খরচ করে আসবেন, সে খরচের সামর্থ এ পরিবারের আর নেই। বনশ্রীকে অনেক সাবধানে সংসার চালাতে হয়।

শুধু যা কিছু অপব্যয় রীতেনের জন্যে। ওইখানেই বনশ্রীর মুঠো একটু শিথিল। সবচেয়ে ছোট ভাই। হিতেনকে হারানোর পর একটা অপরিসীম ভয়ে রীতেনকে আগলে রেখেছে বনশ্রী। সে জানে, হিতেনকে হারিয়ে বুকের ভেতর একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন জি-কে রায়। রীতেন চলে গেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

জি-কে রায় গালাগালি করতে যাচ্ছিলেন রীতেনকে। বনশ্রীর চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন।

—কী হয়েছে তোর? চোখ অমন কেন?

—রাতে ভালো ঘুম হয়নি বাবা।

চায়ের পেয়ালা মুখ থেকে নামিয়ে জি-কে রায় বললেন, তার পরে রাত জেগে আবার ওই সব নোট বই লিখেছিস? বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করলে তোর ঘুম হয় না—তবুও কেন করিস ও-সব?

কেন করতে হয়, সে-কথার জবাব বনশ্রী দিল না। জি-কে রায় নিজেও জানেন। কিন্তু যে-জ্বালা থেকে বনশ্রী বাবাকে বাজারে যেতে দেয় না, সেই একই যন্ত্রণায় তাকে রাত জেগে ফর্মার পর ফর্মা নোট লিখতে হয়।

…নাগুনো ছলনার আড়াল ভেদ করেও মধ্যে মধ্যে সে …টা ফুটে বেরিয়ে আসে।

বনশ্রী জবাব দিল না। জানলা দিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। ট্রামের তারে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি দুলছে॥ তার ওপারে তেতলা বাড়িটার মাথায় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে—আজ বিয়ে আছে ওখানে। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল বনশ্রী। দিনগুলো একটার পর একটা শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ছে। কালকের বনশ্রী আজ আর একদিনের পুরোনো হয়ে গেল, ফুবিয়ে গেল আরো খানিকটা।

কাল রাতে নোট লিখতে বসেছিল বনশ্রী। বেশিদূর লিখতে পারেনি। খালি মনে পড়েছে সত্যজিৎকে। সামনের বাড়িটার শানাইয়ের সুর উঠছিল। অকারণে চোখে জল আসছিল তার।

আজো চোখে তারই রেশ জড়িয়ে আছে। অনিদ্রার নয়—কান্নার।

সামিয়ানাটা থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে বনশ্রী।

আর তখন অযোধ্যা এল বাজার থেকে। বাজারের ঝুড়ি নিচে নামিয়ে ওপরে এসে খবর দিলে, হীরেনবাবু দেখা করতে এসেছেন।

ক্রমশঃ

রাজ্যপাল ও যশোদাসের ভাতুরিয়া শিলালিপি

অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী এম্-এ, বি-টি

রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার অন্তর্গত ভাতুরিয়া গ্রামে অবস্থিত মসজিদে এই শিলালিপিটি পাওয়া যায়। প্রস্তর-লিপিটির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে অজ্ঞ গ্রামবাসীরা। নিকটবর্তী ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ইহাকে মসজিদে স্থাপন করিয়া অজু করিবার কার্যে ব্যবহার করিতেছিল। রাজশাহীর তদানীন্তন পুলিশ সুপার মিঃ মির্জা মোথ্‌তার উদ্দীন আহ্‌মদ এম-এ ইহা উদ্ধার করিয়া ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২য়া আগষ্ট তারিখে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে দান করেন। ইহা বর্তমানে সমিতির যাদুঘরে (Museumএ) রক্ষিত আছে।

শিলালিপিটি চমৎকার অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। স্থানে স্থানে কয়েকটি বর্ণ ঈষৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সেগুলিকে বুঝিতে অসুবিধা হয় না। শিল্পী অতি সাবধানে, সযত্নে এবং সুন্দরভাবে এই লিপি-কার্যটি করিয়াছেন। সামান্য কয়েকটি স্থানে আঘাত লাগিয়া দুই-চারিটি বর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে এবং কালের আঘাতে কিছুটা স্থান ঈষৎ মসৃণ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অক্ষরগুলি কোন স্থানেই অবোধ্য হয় নাই।

প্রস্তরটি আয়তনে প্রায় ১ ফুট ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১১½ ইঞ্চি প্রস্থবিশিষ্ট। অধিকাংশ অক্ষরই আয়তনে ½ ইঞ্চি।

'ওঁ স্বস্তি' এই দুশব্দ দুইটি বাদে আগাগোড়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই লিপিটির সম্পূর্ণটাই শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে ২০টি পংক্তি আছে: প্রথম উনিশটি পংক্তি (line) দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান; বিংশ পংক্তি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ফুট। শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ প্রশংসনীয়। উভয় পার্শ্ব হইতে সমান অংশ বাদ দিয়া শেষ পংক্তিটি অতি সুন্দরভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

২০টি পংক্তিতে পনরটি শ্লোক আছে। স্রগ্ধরা, অনুষ্টুভ, শার্দূল বিক্রড়িত, মন্দাক্রান্তা, হরিণী, বসন্ততিলক, উপজাতি—শ্লোকগুলিতে এই কয়টি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্লোক-রচয়িতার কবিত্ব-শক্তি যে খুব নিম্ন স্তরের ছিল না, তার যথেষ্ট পরিচয় প্রশস্তিটির সর্বত্র এবং বিশেষতঃ প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, দশম ও ত্রয়োদশ শ্লোকে পরিস্ফুট।

নবম শতাব্দীর শেষে ও দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর পূর্ব ভারতে প্রচলিত দেবনাগরী লিপিতে আলোচ্য শিলালিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

'ওঁ স্বস্তি'—এই মঙ্গলাচরণ দিয়া প্রশস্তিটি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর প্রথম শ্লোকে মহাদেবের নৃত্যের স্তুতি করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে বৃহদ্ধট্টা * নামক স্থানের অন্তর্গত অট্টাবুল দাসজাতির বাসভূমি ছিল। এই স্থানগুলি ঠিক কোথায় ছিল, বর্তমানে তাহা বলা দুঃসাধ্য। তবে সেগুলি যে উত্তর বঙ্গের মধ্যে প্রশস্তিটির প্রাপ্তিস্থানের নিকটবর্তী কোথাও অবস্থিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

দাসবংশের মন্থদাস, শূরদাস, শঙ্খদাস, ও যশোদাসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মন্থদাস এই বংশের প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র শূরদাস ও শঙ্খদাস ঐশ্বর্যে ও বীরত্বে বিখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সঙ্খদাস সূর্যকুণ্ড এবং দূর্বারীর সরস্বতীর মত বিদুষী কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সঙ্খদাসকে শিবের সঙ্গে এবং সূর্যকুণ্ড ও দূর্বারীকে হিমালয় ও মেনকার সঙ্গে তুলনা

---

* বৃহদ্ধট্টা (ভাহুরিআ (?)) ভাতুরিয়া

করা হইয়াছে। সত্যদাসের পুত্র যশোদাসের যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যশোদাসের পিতা ও পিতামহের সম্মান ও প্রতিপত্তি এবং তাঁহার নিজের গুণাবলি তাঁহাকে পালবংশের রাজা রাজ্যপালদেবের (প্রধান) মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবার সহায়ক হইয়াছিল।

এই প্রশস্তি হইতেই আমরা প্রথম জানিতে পারি যে, রাজ্যপাল প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের মত নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। মদগর্বিত হস্তী, বিশালবক্ষ ভূমিজ চাষী, শস্যসমৃদ্ধ ক্ষেত্র এবং বহুদিন ধরিয়া সঞ্চিত স্বর্ণরাশির সাহায্যে রাজ্যপালের বিজয় অভিযান চলিয়াছিল। যশোদাসের গৌরবের বিষয় এই যে, তিনি মন্ত্রীর পদে থাকাকালেই এই অভিযান চালান হইয়াছিল। এই অভিযানের ফলে ম্লেচ্ছগণ উৎসাদিত হইয়াছিল, অঙ্গ কলিঙ্গ বঙ্গ উৎকল পাণ্ড্য কর্ণাট লাট সুহ্ম গুর্জরের রাজারা কেহ বা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল কেহ বা ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এবং সকলেই রাজ্যপালের আজ্ঞা অবনতমস্তকে বহন করিয়াছিল।

রাজ্যপালের অভিযান সম্বন্ধে এই শিলালিপিই প্রথম আলোকপাত করিল। এই দিক দিয়া প্রশস্তিটির মূল্য অনস্বীকার্য। অন্য কয়েকটি দিক হইতেও ইহা প্রচুর ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে।

বাদাল স্তম্ভলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রাহ্মণবংশীয় গর্গ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ধর্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া নারায়ণপাল পর্যন্ত পালরাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রীর নাম ছিল গুরবমিশ্র। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনেও পালরাজাদের ব্রাহ্মণজাতীয় প্রধান মন্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন যোগদেব, রামপালের বোধিদেব এবং কুমারপালের বৈদ্যদেব। যোগদেবের পিতার উল্লেখ না থাকাতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যোগদেবের পূর্বপুরুষদের কেহ এইরূপ কোন পদ অলঙ্কৃত করেন নাই। নারায়ণপাল এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের মধ্যবর্তী কালে কোন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল ইহা আমাদের অজ্ঞাত।

নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরব মিশ্র এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী যোগদেবের মধ্যের শূন্য স্থান যশোদাস এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা পূর্ণ করিয়াছিলেন। যশোদাস সম্ভবত ভূমিজ কৈবর্ত * চাষীদের প্রধান ছিলেন। যশোদাসকে (প্রধান) মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করায় রাজ্যপালের পক্ষে কৈবর্তদের সাহায্য লাভ করা সহজ হইয়াছিল। প্রথম বিগ্রহপাল এবং নারায়ণপালের দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। গুরব মিশ্রের উপযুক্ত পুত্রের অভাবের জন্যই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, তাঁহার বংশের আর কেহ মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

এদিকে ধ্বংসোন্মুখ পাল সাম্রাজ্যের জন্য বিজয় অভিযান করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাখার আর যুক্তিযুক্ততা ছিল না। অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম প্রভৃতি পাল সাম্রাজ্যের [illegible] প্রদেশগুলিতে নূতন স্বাধীন রাজাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। উৎকল প্রদেশে করবংশ সম্পূর্ণরূপে উৎখাত ও ধ্বংস করিয়া, দেবপাল ইহাকে পাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু করবংশের স্থানে শৈলোদ্ভব বংশের উদ্ভব হইয়াছিল; উৎকল স্বাধীন হইয়াছে। তৃতীয় সৈন্যভীত মাধববর্মা শ্রীনিবাস এবং তাঁহার বংশধরেরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া উৎকলে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছেন। প্রথম বিগ্রহপাল এবং নারায়ণপাল নিঃশব্দে শৈলোদ্ভব বংশের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন।

দেবপালের সময় পাণ্ড্যরাজ অবনতমস্তকে পরাজয় বরণ করিয়াছিল। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমার শ্রীবল্লভের উত্তরাধিকারীরা গা ঝাড়া দিয়া ফণা তুলিয়াছেন। কল্যাণের চালুক্যগণ কর্ণাটে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। লাটরাজ্যে চালুক্যগণ তখনও রাজত্ব করিতেছেন।

দেবপাল গুর্জরাধিপতি প্রতীহারবংশীয় মিহিরভোজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।** কিন্তু প্রতীহারগণ দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। এদিকে আরবের মুসলিম অভিযাত্রীরা পাঞ্জাবে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। পালিমপুর তাম্রশাসনে ধর্মপাল কোন একজন আরবীয় শাসনকর্তাকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু সে বহুদিনের কথা। বিগ্রহপাল এবং নারায়ণপালের নিশ্চেষ্টতার ফলে এবং অন্যান্য কারণে আরবীয় মুসলমানগণ ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন।

চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত ক্ষয়িষ্ণু পাল-সাম্রাজ্যের কর্ণাধার রূপে রাজ্যপাল যখন উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে অতি দুরূহ কাম। এই দুর্দিনে মন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার কোন সমরকুশলী ব্যক্তির স্কন্ধে প্রদান করা একান্তভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই যশোদাসকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে স্থাপন করা হইল। যশোদাস নিজেকে এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যপাল ধর্মপাল ও দেবপালের মত দিগ্বিজয়ে বাহির হন এবং পাল-সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। এই জয়যাত্রায় বাহির হইবার পূর্বে বিরাট আয়োজন করিতে হইয়াছিল। মদগর্বিত হস্তী-গুলিকে সজ্জিত করা হইয়াছিল, ভূমিজ কৈবর্ত চাষীদের লইয়া [illegible] সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইয়াছিল, ভাণ্ডার শস্যে পূর্ণ করিয়া [illegible] সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এবং বহুদিন ধরিয়া স্বর্ণরাশি সঞ্চয় করা হইয়াছিল। [আলোচ্য শিলালিপির সপ্তম শ্লোক দ্রষ্টব্য]। বলা বাহুল্য, আয়োজনের অনুরূপ ফলও পাওয়া গিয়াছিল।

মনে হয়, ক্রম-ক্ষীয়মান পাল সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য কৈবর্ত ভূমিজ চাষীদের নেতা যশোদাসকে (প্রধান) মন্ত্রিত্ব দেওয়া হইয়াছিল। যশোদাস এবং তাঁহার বংশীয়দের [illegible] রাজ্যপালের সময় হইতে দ্বিতীয় মহীপালের সময় পর্যন্ত পাল [illegible] (প্রধান) মন্ত্রী অথবা মন্ত্রীর সমপর্যায়ভুক্ত পদ দেওয়া হইয়াছিল।

---

* 'অথর সৈত্যু মিত্রৈ"—মূল প্রশস্তির অষ্টম পংক্তির এই পদগুলির দ্বারা বুঝা যায় যে, ভূমিজ চাষীদের সাহায্যেই সম্ভবত রাজ্যপাল যুদ্ধ জয় [illegible]লেন।

** বাদাল স্তম্ভলিপি দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে দিব্য ওরফে দিবোক, দিব্বোক এতই উচ্চপদস্থ ছিলেন যে, "রামচরিত" গ্রন্থে * তাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর অংশ ভোগকারী বলা হইয়াছে। এই দিব্বোক এবং রুদোক ও ভীম ছিলেন তথাকথিত 'কৈবর্ত বিদ্রোহে'র নায়ক। দ্বিতীয় মহীপালকে দিব্বোক হত্যা করিয়াছিলেন, এমন কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সামন্ত-বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মহীপাল অল্প সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন। মহীপালের ভ্রাতা রামপাল এবং শূরপালকে সিংহাসন না দিয়া স্বয়ং আত্মসাৎ করার ফলে "রামচরিতে" দিব্বোককে 'দস্যু' এবং 'উপধিব্রতী' বলা হইয়াছে; দিব্বোক মহীপালকে বধ করিয়াছেন, এমন কল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব। **

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, দিব্বোক হঠাৎ এত শক্তিশালী হইলেন কিরূপে যে, তিনি রাজলক্ষ্মীর অংশ ভোগ করিতে লাগিলেন এবং পরবর্তীকালে সিংহাসন অধিকার করিলেও কেহ তাঁহার বিরোধিতা করিতে সাহস পাইল না? দিব্বোক হঠাৎ একদিনে বড় হন নাই। সম্ভবত তিনি যশোদাসের বংশধর এবং যশোদাসের মতই তিনি প্রধান মন্ত্রীর মত কোন উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছিলেন। ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপাল এবং ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই ১৬২ বৎসর ধরিয়া যশোদাস এবং সম্ভবত তাঁহার বংশধরগণ (প্রধান) মন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন কোন পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। মনে হয়, ইহার ফলেই দিব্বোকের সিংহাসন গ্রহণে কোন আপত্তি উপস্থিত

শিলালিপির একাংশ

হয় নাই। অবশ্য, দিব্য যে যশোদাসবংশীয় ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিবার জন্য আরও প্রচুর নথিপত্রের প্রয়োজন। তবে যশোদাসের (প্রধান) মন্ত্রিত্ব এবং দিব্বোকের উচ্চপদ ও নিরুপদ্রব সিংহাসনে আরোহণ হইতে অনুমান করা যায় যে, তিনি তথা রুদোক এবং ভীম ও যশোদাসের বংশধর ছিলেন।
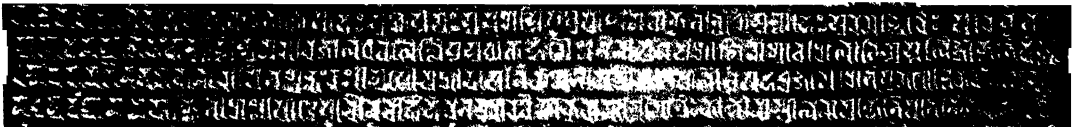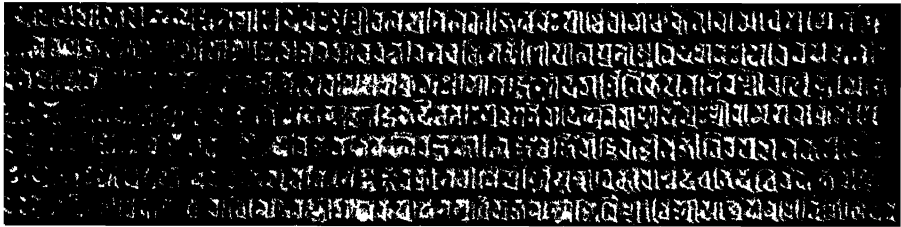
* "রামচরিত" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৩৮নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

** মহীপালের ভ্রাতা রামপাল ও শূরপাল তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। মহীপাল নিহত এবং তাঁহার ভ্রাতারা কারারুদ্ধ ও পরে বিশৃঙ্খলার সুযোগে পলাতক। এই অবস্থার সদ্ব্যবহার না করাটা দিব্বোক [illegible] দ্বিতীয় কার্য মনে করিয়াছিলেন; তিনি অরক্ষিত সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ' নামক কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। অপর পক্ষে মহীপালের বধের জন্য দিব্বোককে দায়ী করা চলে, এমন কোন কথা কোথাও পাওয়া যায় না। 'History of Bengal'-এর প্রথম খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠাতে অনুমান করা হইয়াছে যে, দিব্বোক তাঁহার প্রভু মহীপালকে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রমাণ হিসেবে "রামচরিত" গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের ১২, ২৪, ২৭ এবং ৩৮নং শ্লোকের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকগুলিতে বা এই শ্লোকগুলির টীকাতে কোথাও এই ধরণের কথা নাই; তবে দিব্বোককে 'দস্যু' 'উপধিব্রতী', 'কুৎসিত' ইনঃ কৈবর্তনৃপঃ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। রামপালের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহার চরিতাকারের এই ধরণের শব্দ ব্যবহারে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

আলোচ্য শিলালিপির উপসংহারে আমরা দেখি : সরোবর, মন্দির, বিহার, প্রাসাদ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া যশোদাস বহু পুণ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আটটি মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বিরাট মন্দিরে যশোদাস শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মহাদেবকে রাজ্যপাল নিষ্কর মধুস্রব গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি রক্ষার জন্য সজ্জনদের নিকট একটি সুন্দর আবেদন করিয়া লিপিটি শেষ করা হইয়াছে। শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শিল্পী শ্রীনিধান অতিনির্মল ইন্দ্রনীল শিলাপটে প্রশস্তিটি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

মূললিপি

[১] ... ... ওঁ ১ স্বস্তি।
বেলদ্দোর্দণ্ড বেগানিল বিহত মহাম্ভোধরোত্তুঙ্গ শৃঙ্গ
গ্রাব ভ্রংশোপজাত ধ্বনি চকিত চলদ্দিগজোম্মুক্তনাদম্।
পাদন্যাস।

[২] ... ... ন্নিমজ্জদ্ধরণিতল ভয়াভুগ্ন ভোগীন্দ্রভোগ
বৃত্তং বঃ পাতু শম্ভোর্মুকুট শশিকলা লিঙ্গিত ব্যোমচন্দ্রম্। [1]
অট্টা ২ মূলমিতি স্থানম্ ৩হদ্ধ ট্টা

[৩] ... ... বিনির্গতম্।
শুচীনাং ধর্মশীলানাং দাসানামস্তি জন্মভূঃ॥ [2]
বংশেঽস্মিন্ পয়সাং নিধাবিব শশী শ্রীমন্মদাসো ভব-
খ্যাতস্তত্তনয়েঽপি শৌয

[৪] ... ... নিলয়ঃ শ্রীশূরদাসঃ কৃতী।
তৎসূনুশ্চ সমস্তনন্দিতসুহৃৎ সম্মানিতাভ্যাগতঃ
সেব্যো রোহণ-ভূধর-প্রতিসমঃ শ্রীসজ্জদাসোঽর্থিনাম্॥ [3]

[৫] ... ... উপযেমে সুতাং সোঽপি দূর্বাগ্নী সূর্যকুণ্ডয়োঃ।
সরস্বতীপ্রমাং শম্ভুর্মেনা হিমবতোরিব॥ [4]
জাতস্তাভ্যাং জগতি মহিতো জন্মভূঃ সদ্গুণানাম্

[৬] ...খ্যাতঃ কীর্ত্ত্যা দিশি দিশি যশোদাস ইত্যুদ্ধতশ্রীঃ।
দেবঃ পৃথ্বী-বলয়-তিলকো জিত্বরঃ পার্থিবানাক্রে
বাচামধিপমিব যং

[৭] ... ... মন্ত্রিণং রাজ্যপালঃ॥ [5]
লবণ জলধি শ্যামোপান্তাদ্দিগন্তর গোচর
ত্বরিত চকিত ক্ষোণীপাল প্রতিষ্ঠনিদেশনঃ।
সচিব পদবীং

[৮] ... ... যস্মিন্ ভাসয়ত্যখণ্ডিতশাসনো
ব্যথিত বসুধামেকচ্ছত্রাং স রাম পরাক্রমঃ॥ [6]
মাতঙ্গৈর্মদগর্ব্বিতৈরপনতৈরশ্বৈর্গে র্দুমিজৈ

[৯] ... রর্ব্ব্যা শস্ত (৪) সমৃদ্ধয়া ৫বহুতিথৈ র্হেমাক্ষৈরর্জিতৈঃ।
সম্পক্কা দ্বিজদেবতাঃ সুরপতেরাখিৎসুনেবাম্পদং
যঃ শ্রীরাম পরাক্রমেণ

[১০] ... ... জয়িনা তত্রাধিকারী কৃতঃ॥ [7]
য়েড্রেরুড্ডীনজীবৈরপ্যাতকপটৈঃ
ম্লেচ্ছৈরুচ্ছ্রকৈঃ পরিজনবিকলৈরঙ্গ কালিঙ্গ বঙ্গৈ

[১১] ... ... পাণ্ড্য কর্ণাট লাটৈঃ।
সুক্ষৈঃ সোপপ্রদানৈরসিভয় চকিতৈ গুর্জ্জর কৃতচাপে
র্যস্মিঁস্তুত্রাসিকারং বিদধতি দধিরে ভর্ত্তুরাজ্ঞা

[১২] ... ... শিখায়োভিঃ॥ [8]
তোয়াধারৈরমৃত শিশিরৈ রাজ্যধারা বিনিদ্রৈ
রথ্যাগারৈ রুপহিতসুখৈ র্যজ্ঞনাম্নন্দিরৈশ্চ।
বিজ্ঞা-সত্রৈ র্ঘনশিতিশিলৈ র্দেব

[১৩] ... ... গেহৈ র্মঠৈর্ব্বা
নৈকদ্বারা দিশি গুণৈ র্যস্য জাগর্ত্তি কীর্ত্তিঃ॥ [9]
আরাম পূর্ত্তং মঠ মণ্ডপ সত্র দান
প্রাসাদ সংক্রম জলাশয়

[১৪] ... ... সন্নিবেশৈঃ
তৈরেভিরাত্মচরিতোক্তিপদৈঃ প্রশস্তৈ
র্যঃ স্বপ্রশাস্তি পৃথু পীঠমিবাকৃতোর্ব্বীম্॥ [10]
অষ্টাভিঃ সুর মন্দিরৈঃ পরিবৃতং

[১৫] ... ... প্রাসাদমভ্রংলিহং
সম্পাদ্যেন্দু মরীচিজাল ধবলৈ র্লিপ্তং সুধাকর্দমৈঃ।
তেনায়ং নয়শালিনা শুচিশিলা বিন্যস্ত লিঙ্গাকৃতি
র্ভক্ত্যা

---

১ চিহ্ন দ্বারা 'ওঁ' অক্ষরটি সূচিত হইয়াছে।
(২) অট্টা V হট্টা V হাট; অথবা 'অট্টা' শব্দের অর্থ অট্টালিকা।
(৩) মূলে অন্তঃস্থ ব আছে।
[1] স্রগ্ধরা ছন্দ।
[2] অনুষ্টুভ্ ছন্দ।
[3] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ
[4] অনুষ্টুভ্ ছন্দ
[5] মন্দাক্রান্তা ছন্দ।
(৪) মূলে 'সস্ত' আছে।
(৫) মূলে 'সত' আছে।
[6] হরিণী ছন্দ।
[7] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।
[8] স্রগ্ধরা ছন্দ।
[9] মন্দাক্রান্তা ছন্দ।
[10] বসন্ততিলক ছন্দ।

[১৬]   …   ধর্মপরায়ণেন ভগবানারোপিতশঙ্করঃ ॥ [11]
অস্মৈ যশোদাস নিবেশিতায় শ্রীরাজ্যপালো বৃষভধ্বজায় ।
শতং পুরাণাম্নিকরং[৬] নিয়ম্য

[১৭]   …   …   মধুস্রবং গ্রামমদাৎ ক্ষিতীশঃ ॥ [12]
পাণ্ডু প্রাচীনবর্হি র্ভরত দশরথেক্ষ্বাকু রামাগ্নিমিত্রৈঃ
কীর্ত্তীনাং পালনায় ক্ষিতিপতি-তিলকৈঃ প্রার্থি

[১৮]   …   …   তং যত্র ভূতঃ
তত্র ক্রমো ণ তাবদ্বয়মতিলঘবো যাতু কিং প্রার্থনাভি
র্বগ্যাদ্বিষোপকার প্রণিহিতমনসঃ পালয়ন্ত্যের সন্তঃ ॥ [13]
অন্তেদমা—

[১৯]   …   …   রতনমাহৃতহারিশোভং
সঙ্কল্পসিদ্ধমিব নির্মিতমিন্দুমৌলেঃ ।
এতত্তু তাবদিহ তিষ্ঠতু শৈলসিন্ধু—
সংস্থান সুস্থমবনিস্তলমাস্তি যাবৎ[৭] ॥ [14]

[২০]   ইন্দ্রনীলমান স্নিগ্ধে শিলাপট্টেতিনির্মলে ।
প্রশস্তিরিয়মুৎকীর্ণা শ্রীনিধানেন শিল্পিনা ॥ [15]

বঙ্গানুবাদ

ওঁ স্বস্তি

প্রথম শ্লোক—মহাদেবের যে নৃত্যে তাঁহার কম্পিত বাহুদণ্ডের বেগে উৎপন্ন বায়ুর দ্বারা আহত বিরাট পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গের প্রস্তর ভ্রংশ হইতে উৎপন্ন ধ্বনি চমকিত চঞ্চল দিক্‌হস্তীদিগকে গর্জন করাইয়াছিল ; (যে নৃত্যে) পদস্থাপনার ফলে নিমগ্ন পৃথিবীর ভারে নাগরাজ (শেষের) ফণা সম্পূর্ণরূপে অবনমিত হইয়াছিল ; (যে নৃত্যে) শম্ভুর মুকুটস্থিত চন্দ্রকলার দ্বারা আকাশের চন্দ্র চিহ্নিত (শোভিত) হইয়াছিল, মহাদেবের সেই নৃত্য আপনাদের রক্ষা করুক ।

দ্বিতীয় শ্লোক—বৃহদ্ধট্টার অন্তর্গত অট্টাবুল নামক স্থানে পবিত্র, ধর্মপরায়ণ দাসজাতির জন্মভূমি ছিল ।

তৃতীয় শ্লোক—সমুদ্রে চন্দ্রের মত এই বংশে ভুবনবিখ্যাত শ্রীমন্তদাস জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পুত্র শ্রীশূরদাসও কৃতী ও বীর্যবান্ ছিলেন । তাঁহার পুত্র শ্রীসত্মদাস সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, অভ্যাগতদের সম্মান করিয়াছিলেন, প্রার্থীদের দ্বারা সেবিত হইতেন এবং সুমেরু পর্বতের সমান ছিলেন ।

চতুর্থ শ্লোক—মেনকা ও হিমালয়ের কন্যাকে শম্ভু যেরূপ বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি (শ্রীসত্মদাস) সেইরূপ দুর্বারী ও সূর্যকুণ্ডের সরস্বতীর তুল্য কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।

পঞ্চম শ্লোক—তাঁহাদের (সত্মদাস ও তাঁহার পত্নী) হইতে উৎপন্ন, জগতে পূজিত, সদ্‌গুণের জন্মভূমি, চতুর্দিকে কীর্তি দ্বারা বিখ্যাত, বৃহস্পতি স্বরূপ শ্রীসম্পন্ন যশোদাকে পৃথিবীর ভূষণ, রাজগণের জ্যেষ্ঠ, দেব রাজ্যপাল মন্ত্রী করিয়াছিলেন ।

ষষ্ঠ শ্লোক—মন্ত্রিত্ব পদ তাঁহাতে (যশোদাসে) প্রকাশিত থাকা-কালীন রামের মত পরাক্রমশালী, ধরণীকে একচ্ছত্র তলে বন্ধনকারী, অখণ্ড শাসন তাঁহার (রাজ্যপালের) আদেশ সমুদ্রের শ্যামল প্রান্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত চকিত-চমকিত রাজগণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।

সপ্তম শ্লোক—রামের মত পরাক্রমশালী, বিজয়ী তিনি (রাজ্যপাল) মদগর্বিত হস্তীসমূহ, বিশালবক্ষ ভূমিজ কৈবর্ত, শস্যসমৃদ্ধ ক্ষেত্র৷ বহুদিবস-ব্যাপী সঞ্চিত সুবর্ণরাশির দ্বারা এবং দেব-ব্রাহ্মণ সহায় হইয়া ইন্দ্রপদ লাভ করিবার জন্য (যশোদাসের) মন্ত্রীর পদ দিয়াছিলেন ।

অষ্টম শ্লোক—যাঁহার (যশোদাসের) মন্ত্রিত্বকালে উৎপাদিতপ্রায় ম্লেচ্ছগণ ; যাহাদের আত্মীয়-স্বজন বিকলপ্রাপ্ত হইয়াছিল সেই অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ ; জীবন যাহাদের উড়িয়া গিয়াছিল সেই উৎকলবাসীরা ; কপটতা যাহাদের দূরীভূত হইয়াছিল সেই পাণ্ড্য কর্ণাট ও লাটগণ ; তরবারির ভয়ে চকিত সুহ্মগণ ; ধনুকের দ্বারা বিজিত গুর্জরগণ উপহার প্রদান করিয়া প্রভুর আজ্ঞা মস্তকে বহন করিয়াছিল ।

নবম শ্লোক—অমৃতময় ও শীতল জলাশয়, অবিরাম ঘৃতধারায় পূর্ণ ও অমৃতসঞ্চিত অগ্নিগৃহ, পূজা, মন্দির, বিদ্যা, যজ্ঞ, মেঘের মত কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত দেবগৃহ, মঠ (প্রতিষ্ঠা) এবং অন্য বহুবিধ গুণের দ্বারা তাঁহার কীর্তি দিকে দিকে জাগরিত আছে ।

দশম শ্লোক—উদ্যান, পুণ্য কার্য, মঠ, মণ্ডপ, যজ্ঞ, দান, প্রাসাদ, সেতু, জলাশয় প্রভৃতি দ্বারা আত্মচরিত প্রকাশকে প্রশংসিত পদের দ্বারা তিনি পৃথিবীকেই যেন স্বীয় প্রশস্তির বিশাল পীঠ করিয়াছিলেন—

একাদশ শ্লোক—আটটি দেবমন্দিরের দ্বারা বেষ্টিত চন্দ্রকিরণসমূহের ন্যায় শুভ্র সুধাকর্দমের (চূণের) দ্বারা লিপ্ত গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া রাজনীতিজ্ঞ ধর্মপরায়ণ তিনি (যশোদাস) ভক্তির সহিত পবিত্র শিলাতে ভগবান্ শঙ্করের লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ।

দ্বাদশ শ্লোক—শত শত নগর সংযত করিয়া রাজা রাজ্যপাল যশোদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃষভধ্বজ মহাদেবকে মধুস্রব নামক নিষ্কর গ্রামখানি দান করিয়াছিলেন ।

ত্রয়োদশ শ্লোক—পাণ্ডু, প্রাচীনবর্হিঃ, ভরত, দশরথ, ইক্ষ্বাকু, রাম, অগ্নিমিত্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজারা কীর্তি রক্ষার জন্য যেখানে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছেন, সেখানে আমাদের মত অতি সামান্য ব্যক্তিগণ আর কি প্রার্থনা করিয়া বলিবে ? কারণ বিশ্বজিতে নিবিষ্টচিত্ত সজ্জনগণ (প্রার্থনা না করিলেও কীর্তি) রক্ষা করিয়াই থাকেন ।

চতুর্দশ শ্লোক—সমুদ্র এ পর্বতের অবস্থানের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত পৃথিবী যতকাল থাকে, মনোহর শোভাযুক্ত, অভীষ্টসিদ্ধি স্বরূপ নির্মিত চন্দ্রশেখরের (শিবির] এই মন্দির ততকালে অবস্থান করুক ।

পঞ্চদশ শ্লোক—অতি নির্মল, ইন্দ্রনীল মণির দ্বারা স্নিগ্ধ প্রস্তরফলকে শ্রীনিধান নামক শিল্পীর দ্বারা এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইল ।

---

(৬) সম্ভবত 'নিকরং' হইবে ।
(৭) 'ৎ' একটি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে ।
[11] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ
[12] উপজাতি ছন্দ
[13] স্রগ্ধরা ছন্দ
[14] বসন্ততিলক ছন্দ
[15] অনুষ্টুভ্ ছন্দ

মাধ্যমিক দফা শিক্ষার প্রস্তুতি—

মাধ্যামিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দশ শ্রেণীর হাই ইস্কুল এবং এগারো শ্রেণীর হাই ইস্কুল এক সঙ্গে চলিত করার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহা অস্বীকার করা যায় না। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় রায় এক বৈঠকে এই বিষয়টি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আশা করি তা শিক্ষা-বিধাতাদের নজর এড়াইবে না। দুই পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষার দুই প্রকার পাঠক্রম প্রবর্তন করিয়া একই ইস্কুল ফাইনালের দুইটি জাতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবং পরবর্তী কলেজী শিক্ষায় প্রবেশের পথে দুই দলের জন্য দুইরূপ অসুবিধার বিধি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে দশ শ্রেণীর হাই ইস্কুল যখন আর থাকিবে না, তখন যে সব ইস্কুল এগারো শ্রেণীর সিনিয়র হাই ইস্কুল হইতে পারিবে না, তাহারা আট শ্রেণীর জুনিয়ার হাই ইস্কুলে নামিয়া আসিবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়টির সংখ্যাই যে বেশি হইবে ইহা সুনিশ্চিত। ফলে অনিবার্যভাবেই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যে উচ্চ শিক্ষালাভ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আমাদের সরকারী নীতি হয়তো তাই। উচ্চ শিক্ষিতদের বেকার দশা রদ করার জন্য তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং বহু শিক্ষককে বেকার করার জন্য যেন বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। ভারতবর্ষের মতো স্বল্পশিক্ষিতের দেশে এইভাবে শিক্ষা সংহার কি অভিপ্রেত? ইহাতে কি দেশের শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার হইবে মনে হয়?

জনাব সুরাবর্দী—

পূর্ববঙ্গের আওয়ামী লীগের সমর্থনে পুষ্ট হইয়াই জনাব সুরাবর্দী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর গদী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের আওয়ামী লীগের বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট মৌলানা ভাসানী জনাব সুরাবর্দীর পররাষ্ট্র নীতির বিরোধী। মৌলনা ভাসানীর স্বগ্রাম কাগমারীতে আওয়ামী লীগের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে জনাব সুরাবর্দীও যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অতি সাধের বাগদাদ্ প্যাক্ট ও তাঁহার বৈদেশিক নীতির সমর্থন লাভের জন্য তাঁহার যাবতীয় যুক্তি, মায় কাশ্মীর সমস্যার অবতারণা প্রভৃতি কিছুই মৌলনা সাহেবের মন টলাইতে পারে নাই। সামরিক প্যাক্টের নিন্দাসূচক আওয়ামী লীগের পূর্বেকার প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। মৌলনা ভাসানীর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের নিকটে জনাব সুরাবর্দীর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব ম্লান হইয়া গিয়াছে। তিনি ক্ষুণ্ণ মনেই করাচী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অবশ্য আপাততঃ মৌলানা সাহেব আওয়ামী লীগকে পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে মন্ত্রিত্বে পদত্যাগ করিতে বলিতেছেন না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে ইহা বলিবার ক্ষমতা একমাত্র মৌলনা সাহেবেরই আছে। কাগমারীতে প্রকৃত প্রস্তাবে মৌলনা ভাসানীরই জয় ঘোষিত হইয়াছে।

ত্রিদিব চৌধুরী—

ইহা ভারতবাসীর পক্ষে আনন্দের সংবাদ যে, দীর্ঘকাল পরে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ গোয়ার কারাগারে আবদ্ধ ৩২ জন ভারতীয় সত্যাগ্রহীকে মুক্তি দান করিয়াছেন। এই মুক্ত বন্দীগণের মধ্যে শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, শ্রীএন, জি, গোরে, শ্রীমধু লিমায়ে ও শ্রীজগন্নাথরাও যোশী আছেন। ভারতের এইসব জনপ্রিয় রাজনীতিক নেতাগণের মুক্তিলাভ নিশ্চয়ই সুসংবাদ। কিন্তু এই সঙ্গে যে সকল ভারতীয় নারী সত্যাগ্রহী গোয়ায় বন্দী হইয়াছিলেন, তাহাদের মুক্তি-সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আমরা আশা করি এই ৩২ জনের সঙ্গে তাঁহারাও আছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত যোশী লোকসভার সদস্য পদের জন্য এবং শ্রীযুক্ত লিমায়ে বোম্বায়ের বিধান সভার সদস্যপদের জন্য আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন। ইঁহারা দেশের জন্য যে স্বার্থত্যাগ এবং পর্তুগীজ কারাগারে যে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তাহার জন্য ইঁহারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইবার যোগ্য। কংগ্রেস শ্রীচৌধুরীর বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী না দিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। অপর দুইজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়াছেন কিনা প্রকাশ পায় নাই। যদি কেহ দাঁড়াইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের এখন উচিত এই দেশভক্ত আত্মত্যাগী জননেতাদের নির্বাচনের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি না করা। পর্তুগীজ সরকার ইতিপূর্বে সত্যাগ্রহীদের সম্বন্ধে যে কঠোর অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাহার পরিবর্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল অনেকের নিকট ইহা কৌতূহলের বিষয়। ততে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত রহস্যই প্রকাশিত হইবে।

কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীরের ভারতভুক্তি উপলক্ষ করিয়া বৃটেনের সংবাদ পত্র সমূহে পণ্ডিত নেহরু এবং ভারত গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কিরূপ নির্জলা মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইতেছে তাহা

সাম্প্রতিক নমুনা দিয়াছে লণ্ডনের পাকিস্তান সমর্থক 'নিউজ ক্রনিকল' এবং 'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রিকা। প্রথমোক্ত পত্রিকায় একদিন এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, ৫০০০ কাশ্মীরী উদ্বাস্ত লণ্ডনের রাজপথে শোভাযাত্রা বাহির করিয়া ভারত কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাশ্মীর দখল করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবে। 'ডেলি এক্সপ্রেস' আবার ক্রিনকেলকেও ছড়াইয়া গেল। উহাতে বড় বড় অক্ষরে এই সংবাদ প্রকাশ হইল যে, বৃটেনের ৫০ হাজার কাশ্মীরী নেহরুর দ্বারা কাশ্মীর অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য একদিন তাহাদের দৈনিক কাজ-কর্ম বন্ধ রাখিবে। মিথ্যা প্রচারের অপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা! কিন্তু লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার এই মিথ্যার হাঁড়ি হাটের মধ্যে' ভাঙিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বৃটেনে অবস্থিত কাশ্মীরবাসীর সংখ্যা ৫০ কিংবা ৫ হাজার নয়, মাত্র ৬০ জন। আবার ঐ ষাটজনের অধিকাংশই ভারতের সহিত সংযুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র, একজনও উদ্বাস্ত নয়। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে উদ্বাস্তর প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বৃটেনের জনসাধারণ ক্রমাগত ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর সংবাদ তাঁহাদের দেশের পত্রিকাগুলিতে দেখিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাহাদের মনে ভারতের বিরুদ্ধে যে ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে তাহার সংশোধন সহজ নয় কিন্তু প্রয়োজন। আমরা আশা করি লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনরের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যাঁহারা নিরপেক্ষ ও সত্য সংবাদ জানিতে চাহেন তাহারা অন্ততঃ কাশ্মীর সম্বন্ধীয় একটি বিষয়ে নিজেদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

কাশ্মীর সমস্যার আপস মীমাংসা—

সম্প্রতি সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ সোলেমন বন্দর-নায়েক কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে একটা আপস মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের কাছে এক আবেদন করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ব্যবস্থা করিতে অন্যান্য বান্দুং শক্তিবর্গের কাছেও পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টার আশু সাফল্য কামনা করি। কিন্তু এখানে একটি বক্তব্য আছে। আপস মীমাংসা বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চাহেন? পাকিস্তান ভারতের ন্যায় সঙ্গত দাবী মানিয়া লউক, অথবা ভারত পাকিস্তানের অন্যায় আবদার মিটাইয়া দিয়া সমস্যার সমাধান করুক? আশা করি তিনি কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ইহা বিবেচনা করিয়াই আপস-মীমাংসার প্রশ্নে আসিয়াছেন?

রামপদ সংবর্ধনা—

গত ২০শে জানুয়ারী রবিবার হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রখ্যাত কথাশিল্পীও এই পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই উৎসবের পৌরোহিত্য করেন সুপরিচিত ও সুখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামপদ-সাহিত্য প্রতিভা প্রসঙ্গে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, প্রবাসী সহঃ সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, শ্রীমণিশংকর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক

রামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, সহাধ্যক্ষ শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কুড়ি-সাহিত্য আসরের সম্পাদক, প্রমুখ। সঙ্গীতে, শ্রীরেবা বসু, স্বপ্না সেনগুপ্তা, উৎপল মুখোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। সংবর্ধনা লিপি পাঠ করেন শ্রীপ্রফুল্ল রায়। শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রতিভাষণে তাঁহার সাহিত্য জীবনের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং সংবর্ধনার জন্য প্রত্যেককে শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রামপদবাবুর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য বিবৃত করেন এবং হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদের এই প্রশংসনীয় উদ্যোমের জন্য পরিষদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেনিস ঃ

মাদ্রাজ ৩-১ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার সোহনলাল ডগরা কাপ জয়ী হ'ল।

সর্টপুটে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্রষ্টা পেরী ও'ব্রেন (আমেরিকা)

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ঃ

বরোদায় অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ১১৬ রানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে। খেলাটির জয়-পরাজয়ে মীমাংসা হয় ফাইনালের ৮ম দিনে। বোম্বাই দলের জ লাভের প্রধান খুঁটি ছিলেন বালু গুপ্তে; এক ইনিং
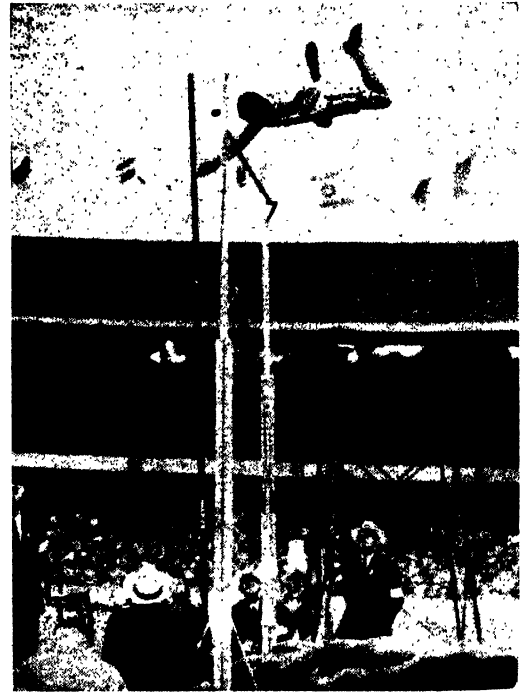
পোলভল্টে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্রষ্টা বব্ রিচার্ডস (আমেরিকা)

১১৬ ওভার বল দিয়ে তিনি রেকর্ড করেন। তিনি দু ইনিংসে ১৫টা উইকেট পান ৩০২ রানে।

বোম্বাই ঃ ৩৪৩ ও ৬২৫ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড

দিল্লী ঃ ২৪১ ও ৬১১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

পুরুষদের বিভাগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৫৩½ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছে রেঞ্জার্স, ৫৮ পয়েন্ট পেয়ে।

আন্তঃকলেজ এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ঐ কলেজেরই ছাত্র এফ. ক্যাণ্টি ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে।

জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

মহম্মদ লফির (সিংহল) জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ান-

মেলবোর্ণ অলিম্পিকে আমেরিকার চার জন স্বর্ণপদকধারী (বামদিক থেকে—ডেভিস (৪০০ মিটার হার্ডলস), বেল (লংজাম্প), চার্লস ডুমাস (হাই জাম্প) এবং কনোলী (হ্যামার থ্রো)

ব্যক্তিগতভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কোলেন বিংহাম (সেণ্ট টমাস স্কুলের ছাত্রী), এই তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করে—৮০ মিটার হার্ডল, হাইজাম্প এবং জ্যাভেলিন থ্রোতে। তা ছাড়া ৪×১০০ মিটার রীলে রেসে প্রথম স্থান অধিকারী রেঞ্জার্স দলের পক্ষে তিনি দৌড়েছিলেন।

সীপের ফাইনালে চন্দ্র হীরজিকে (বাংলা) পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বছর খেতাব লাভের গৌরবলাভ করেছেন।

জাতীয় বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

উইলসন জোন্স (বোম্বাই) ১৯৫৭ সালের জাতীয় বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলার

চন্দ্র হীরজিকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ছ'বার খেতাব লাভের গৌরব লাভ করেছেন।

এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (বরদা কাপ): ভিয়েৎনাম বরদা কাপ জয়লাভ করেছে।

মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (কমলা রামানুজন কাপ): ফাইনালে তাইওয়ান ৩-১ খেলায় কোরিয়াকে পরাজিত করে কাপ পেয়েছে। চূড়ান্ত ফলাফল: ১ম তাইওয়ান, ২য় কোরিয়া, ৩য় হংকং, ৪র্থ ভিয়েৎনাম এবং ৫ম ফিলিপাইন।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস: লাউ শেক ফং (হংকং) পরাজিত করেন সু লং সাংকে (তাইওয়ান)।

মহিলাদের সিঙ্গলস: চো কাং জা (কোরিয়া) পরাজিত করেন উ স্যাং সুককে (কোরিয়া)।

পুরুষদের ডবলস: মাই ভান হো এবং ত্রাণ চ্যান ডুওক (ভিয়েৎনাম) পরাজিত করেন ভিয়েৎনামেরই জুটি এন কিম হাং এবং ত্রাণ ভ্যান লিউকে।

মহিলাদের ডবলস: চিং পাউ পো এবং শি চ্যাং চাই ওয়াং (তাইওয়ান) পরাজিত করেন ওয়াই লিলিয়াম এবং ওয়াই চুকে (তাইওয়ান)।

১১০ মিটার অলিম্পিক হার্ডলস বিজয়ী

লী কলহন (আমেরিকা)

এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় দেশ এবং খেলোয়াড়দের সাফল্য বিচার ক'রে নামের যে ক্রমপর্যায় তালিকা তৈরী হয়েছে, ভারতবর্ষ পুরুষদের দলগত বিভাগে ভিয়েৎনামের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছে এবং পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে সুধীর থ্যাকার্সি

ংকংয়ের ল্যান শেক ফ্যাং-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান পেয়েছেন।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

জোড়হাটে অনুষ্ঠিত রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার খেলায় বাংলা এক ইনিংস এবং ২০৬ রানে আসামকে পরাজিত করে। আসামের ১ম ইনিংসের খেলায় পি চ্যাটার্জি ২০ রানে ১০টা উইকেট লাভ ক'রে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বাংলা ঃ ৫০৫ (ফাদকার ৫১, পি সেন ৮৩, এস সোম ১২২)

আসাম ঃ ৫৪ ও ২৪৫ (ফাদকার ৬৭ রানে ৭ উইকেট)

অলিম্পিক ডেকাথলন বিজয়ী এইচ ক্যাম্বেল (আমেরিকা)

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে বাংলা এক ইনিংসে এবং ১৪৯ রানে বিহারকে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

বাংলা ঃ ৩৫৬ (শিবাজী বসু ৮৫, পি সেন ৮১)

বিহার ঃ ১২৪ (ফাদকার ৩৭ রানে ৭ উইকেট) এবং ৮৩ (ফাদকার ৪২ রানে ৩ এবং পি চ্যাটার্জি ২০ রানে ৩ উইকেট পান)

আন্তঃরেলওয়ে হকি ঃ

আন্তঃরেলওয়ে হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ১-০ গোলে নর্দার্ণ রেলদলকে পরাজিত করেছে।

জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ১৯৫৭ সালের (দ্বাবিংশতম) জাতীয় এ্যাথ্‌লেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল বিপুল পয়েণ্ট অর্জ্জন ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেছে। ২৪টি অনুষ্ঠানের মধ্যে সার্ভিসেস দল ১৯টিতে প্রথম, ১৬টিতে ২য় এবং ৬টি অনুষ্ঠানে ৩য় স্থান লাভ করে। তিন দিনের প্রতিযোগিতায় মোট সাতটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়।

বিশ্বের টেবল টেনিস ঃ

ইণ্টার ন্যাশানাল টেবল টেনিস ফেডারেশন বিশ্বের টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের নামের যে ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রকাশ করেছে, তার পুরুষ এবং মহিলাদের নামের তালিকায় জাপান প্রথম স্থান লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে প্রথম দু'টি স্থান পেয়েছেন জাপানের আই ওগিমুরা এবং টোসিয়াকা টানাকা। মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন টোমী ওকাওয়া।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ক'লকাতায় রঞ্জি ষ্টেডিয়ামের ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ইস্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলস : টি জো হক্‌ (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-২, ১৫-৭ পয়েণ্টে অমৃত দেওয়ানকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে : অমৃত দেওয়ান এবং পি এস ছাওলা ১০-১৫, ১৫-১০, ১৫-১০ পয়েণ্টে বিশ্বখ্যাত ওং পোহ্‌ লীম এবং ইস্‌মাইল বিন মার্জোনকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

ফটো ঃ ইউনাইটেড ষ্টেটস ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস।

সাহিত্য সংবাদ

পূর্ব্বাপর : অনুরূপা দেবী

আলোচ্য উপন্যাসখানি গ্রন্থকর্ত্রীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান, আর হৃদয়াবেগে রসঘন। এর পশ্চাতে আছে সুন্দর পটভূমিকা। সর্ব্বাণী উপন্যাসের যে প্রথমাংশ উহ্য রেখে ওর শেষ অংশ বিবৃত করা হয়েছিল, সেইটা পূর্ব্বাপর নাটকরূপে আবির্ভূত হয়। সেই পূর্ব্বাংশকে উপন্যাসাকারে সর্ব্বাণীর সঙ্গে একত্র সংযুক্ত করে পূর্ব্বাপর উপভোগ্য হয়েছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় পুষ্ট প্রগতিশীল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জেলার শাসনকর্ত্তা সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গের কৌতূহলপ্রদ কাহিনী আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। আমাদের সমাজের উপর তলার লোকের পারিবারিক জীবন বহু সময়েই ঘটনাচক্রে বিধ্বস্ত হয়ে যায় আর মনের পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তিগুলির অবিশ্রান্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে নানা নিষ্ঠুর করুণ কাহিনীর সূত্রপাত হয়, তা কারো অবিদিত নয়। প্রখ্যাতা জীবন-শিল্পী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'পূর্ব্বাপর'-এ উপর তলার মানুষের সুখদুঃখের কথা শুন্‌তে পাওয়া গেছে, তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অভাবনীয় অন্তর্গূঢ় রহস্য ধরা পড়েছে।

নিজের অধ্যবসায় বলে বাল্যে পিতৃমাতৃহীন সুরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভালো ভাবে পাশ করে যে সময়ে মহকুমা শাসকের পদে নিযুক্ত হোলেন, সে সময় থেকে কাহিনীর অবতারণা। তাঁর কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভ থেকে অবসরপ্রাপ্ত জীবনের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই কাহিনীর ব্যাপ্তি ঘটেছে। যদি সুরঞ্জন কয়েকদিনের ছুটিতে কল্‌কাতায় এসে কলেজের সহপাঠী প্রিয়ব্রত ঘোষালের জন্যে কনে না দেখ্‌তে আস্‌তেন, তা হোলে পূর্ব্বাপরের ইতিহাস থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম।

সেই সহপাঠী প্রিয়ব্রত ঘোষালের বান্ধবতা শত্রুতায় পরিণত হোলো—তাঁর সাধের সংসারে সে আগুন ধরিয়ে দিল, নিজেও মনের দুঃখে আত্মহত্যা করলো। পরমা সুন্দরী প্রগতিশীলা সুরশিল্পী গ্রাজুয়েট মেয়ে বিদ্যুৎপ্রভা কোনমতেই ধনী জমিদার গ্রাজুয়েট প্রিয়ব্রতকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হোলোনা, সুদর্শন সুরঞ্জনের রূপজ মোহে আবিষ্ট হয়ে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করলো। পিতৃমাতৃহীনা হোলেও মাতুল ও মাতুলানীর স্নেহ-সৌভাগ্যে সে সবিশেষ সৌভাগ্যবতী। অভিভাবক মাতুলের কোন যুক্তি এই একগুঁয়ে মেয়েটীর মনে ধরলো, ফলে জমিদার তনয় প্রিয়ব্রত ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত রইলো যাতে করে চট্টোপাধ্যায়-দম্পতীর মধ্যে চিরবিচ্ছিন্নতা আসে। ক্রমে জটিল জাল বিস্তার হোতে থাকে।

বিদ্যুৎ প্রভার দাম্পত্য জীবনের প্রথম অধ্যায় রোমাণ্টিক ভরা ভাব-প্রবণতায় আতিশর্য্যপূর্ণ এজন্য স্ত্রীর পাশ্চাত্যগন্ধী হাবভাব চালচলনও পক্ষী মিথুনের মত অলস অবসর বিনোদনের জন্য উদগ্র ব্যাকুলতা অনুযায়ী নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কর্ম্মব্যস্ত সুরঞ্জনের পক্ষে তোষণনীতি অবলম্বন দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। ফলে বিদ্যুৎপ্রভা যখনই স্বামীকে চায়, তখনই পূর্ণভাবে পায় না—আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ র'য়ে যায়—এমন কি তার রচিত সাধের নাটক শুনবারও অবকাশ সুরঞ্জনের না থাকায় সে মর্ম্মাহত, অথচ লক্ষ্য করে, দুঃস্থ বিধবা মেয়ে স্কুলের থার্ড টিচার মিসেস সেনকে স্বামী সকলরকমে সাহায্য করে, এমন কি তার পুত্রের অসুখের সময় সিভিল সার্জ্জন এনে যথাবিহিত ব্যবস্থা করার অবকাশ পায়—এই শিক্ষয়িত্রীর ফাইফরমাস খাটে।

অভিমানিনী নারীর অন্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতের সুযোগ নিয়ে সত্যব্রত ঘোষাল তার হৃদয়ে প্রবেশ করলো আর সঙ্গ সাহচর্য্যের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রভা তার প্রতি আকৃষ্ট হোলো। অবাধ মেলামেশার বিষময় পরিণতি লেখিকার নিপুণ হস্তে অঙ্কিত হয়ে আমাদের মনে রেখা-পাত করলো। বেড়াবার ছল করে সত্যব্রত বিদ্যুৎপ্রভাকে সুরঞ্জনের সংসার থেকে বের করে নিয়ে গেল। সুরার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এতই সাংঘাতিক যে বিদ্যুৎপ্রভার কোন হুঁসই রইলো না। দার্জ্জিলিং হোটেলে উভয়ের একত্র অবস্থান বিদ্যুৎপ্রভার বিবেক বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অসহায়া নারীর নিষ্ফল আক্রোশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রতীকার হয় না। বিদ্যুৎপ্রভা মরণের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এখানেই শীর্ষ বিন্দুতে এসে দাঁড়ালো।

সুরঞ্জনের অসীম ধৈর্য্য—নিজের মর্য্যাদা রক্ষায় উদ্দেশ্যে নীরব অথচ অন্তরে অন্তর্দাহ চলেছে। অপূর্ব্ব-সংযম—হ্যাঁ, আদর্শ চরিত্র বটে। দৈনিকপত্রে বিঘোষিত সংবাদ পেয়ে তিনি দার্জ্জিলিং হাসপাতালের ভিজিটিং ঘরে ঘোড়োহাওয়ার মত এলেন, ডাক্তারের কাছ থেকে পেলেন বিদ্যুৎপ্রভার জীবনের সম্বন্ধে নৈরাশ্যজনক উক্তি। হতাশায় বেরিয়ে পড়্‌লেন প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে।

প্রবীণ চিকিৎসকের মনে উঠ্‌লো……মেয়েটি কি সত্যি পাগল ছিল? মিঃ ঘোষাল তবে কি ওঁর স্বামী নন?—তারপর সংবাদপত্রের মারফৎ উনি জান্‌লেন প্রিয়ব্রত ঘোষাল তার কল্‌কাতার ক্যামাক ষ্ট্রীটের ও চৌরঙ্গী রোডের বাড়ী, দেশের যাবতীয় সম্পত্তি সমস্তই চ্যারিটির জন্যে ট্রাষ্ট করে পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে।

লেখিকা দেখিয়েছেন বিদ্যুৎপ্রভার মধ্য দিয়ে নারীর ভিতর ছিন্নমস্তার রূপ। এরপর ছোট মেয়ে ক্ষণপ্রভাকে আমরা দেখতে পাই। মা-

হারানো মেয়ে পিতাকে পেলো জীবনের একমাত্র অবলম্বন, ছায়ার মত পিতার অনুগামিনী হয়ে রইলো। তারপর তাকে দেখা গেল উচ্চ শিক্ষিতা গ্রাজুয়েট সুন্দরী তরুণী। সে হয়ে উঠ্‌লো বলিষ্ঠ উন্নত আদর্শের পূজারিণী। যাকে বর হবার জন্তে বেছে নিলে, ভাগ্যচক্রে তার বিয়ের রাতে বরের বাবা কটূক্তি করে বিয়ের আয়োজন পণ্ড করতে উদ্যত হোলেন। আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে ক্ষণপ্রভা লুকিয়ে রইলো বাড়ীর ভেতর, বর পিতা ও বরযাত্রীদের চোখে ধুলো দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হোলো। ক্ষণপ্রভার নাম সে সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়ে সর্ব্বাণী হয়েছিল। শিবেশ্বর ও মণিকার ঘট্‌কালি ছিল এই বিয়ের ব্যাপারে। তারা নীরব হয়ে গেল। এরপর সর্ব্বাণী ও সুরঞ্জনের প্রাত্যহিক জীবনের আকাশ পথে ঘনিয়ে থাকে মেঘ, সূর্য্যোদয় বড় একটা দেখা যায় না। সর্ব্বাণী বিবাহে অনিচ্ছুক—তার মতে পুনর্বিবাহে তার দ্বিচারিণী হবার আশঙ্কা আছে। চারিদিক বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে এইরূপ যৌবনস্ফীতা তরুণীর পরম লক্ষ্য।

তিন বছর পরে বিলাত থেকে গৌরীপতি শিক্ষালাভ করে ফিরে এলো—কপর্দ্দকশূন্ত অবস্থায় কিভাবে বিলাতে গিয়ে সে শিক্ষালাভ করেছিল, তা অজ্ঞাত রহস্তময়। প্রত্যাবর্ত্তনের পরও খুঁজেছে সর্ব্বাণীকে, চিঠিও দিয়েছে ওর বাবাকে—ঘোরাঘুরিও করেছে বাগ্‌দত্তাকে পেতে। শেষে নৈরাশ্তের অবসাদে ওর দৈনন্দিন পথ চলা সুরু হোলো। মণিকার সেজ-ঠাকুরপো সে—বউদিকে খুলে পত্র লিখ্‌লো।

এদিকে সর্ব্বাণীর পিস্‌তুতো বোন ডালির সঙ্গে গৌরীপতির বিয়ের কথাবার্ত্তা অনেকদূর এগিয়ে এসেছে, এ পরিবারে গৌরীপতির চলেছে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা। অবসরপ্রাপ্ত হাকিম পিতাকে নিয়ে সর্ব্বাণী এলো পিসিমার বাড়ী। পিসতুতো ভাই সুকুমার পরিচয় করিয়ে দিল গৌরী পতিকে সর্ব্বাণীর সঙ্গে মিষ্টার জি, পি, বাণার্জ্জি আই-এক-এস বলে—ডালির রোমান্টিক পরিবেশ নিবিড় হয়ে ওঠে—তারপর ডালির সঙ্গে বিয়ে না হয়ে সর্ব্বাণীর সঙ্গে কেমন করে হোলো রহস্তের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করে, তারই চিত্রগুলি ফুটিয়ে পূর্ব্বাপরের সমাপ্তির রেখা টানা হয়েছে।

এর মধ্যে দার্জ্জিলিংএর ছিন্ন সূত্র অবলম্বন করে একটি হারিয়ে যাওয়া ঘটনার বিদ্যুৎ খেলে গেল হিমালয়ের শৈল শৃঙ্গে, তারপর মিলিয়ে গেল চিরদিনের মত। হরিদ্বারের মহাকুম্ভ মেলা উপলক্ষ করে পিসিমার পরিবারবর্গের সঙ্গে সর্ব্বাণী ও তার বাবা বেড়াতে এসেছিল। পাহাড়ের ওপর উঠে ঘুরতে ঘুরতে মাতাজীর আশ্রমে এসে সর্ব্বাণীর মাকে পাওয়া গেল। তিনি তখন সন্ন্যাসিনী ভৈরবী ও সিদ্ধ সাধিকা। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া জীবনের টুক্‌রো পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে স্বামী স্ত্রী আর মা ও মেয়ের মধ্যে ক্ষণ মিলন হোলো মাত্র।

পড়্‌তে পড়্‌তে গ্রন্থখানি এত ভালো লেগেছে যে সময়ের পদধ্বনি শুনবারও অবকাশ পাইনি। চরিত্র চিত্রণে, ঘটনার সমাবেশে, সুনিপুণ বিশ্লেষণ শক্তিতে, সহজ ধারার সংলাপের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিকতার স্নিগ্ধ রস পরিবেশনে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যে উন্নত আদর্শ আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তা যুগোপযোগী হয়েছে। তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি অনন্ত সাধারণ। তাঁর সম্বন্ধে নতুন কিছু বল্‌বার আবশ্তক হয় না, তবে তাঁর লেখনী যে ক্লান্ত নয়, পূর্ব্বাপর তারই সাক্ষ দিচ্ছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির কোনটী আমাদের মন থেকে সরে যেতে পারেনি, প্রত্যেককেই যেন জীবন্ত ভাবে প্রত্যক্ষ করা গেছে। প্রগতিশীল পাশ্চাত্য আবহাওয়া পুষ্ট আমাদের উপর তলার বাঙালী সমাজের ওপর লেখিকা নূতন আলোক সম্পাত করেছেন, এজন্তে তিনি ধন্তবাদার্হ। বইখানির প্রচ্ছদপট বিশেষ আকর্ষণীয়। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৪৲ টাকা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বনমল্লিকা: নলিনীকুমার ভদ্র

ইতিপূর্ব্বে ভারতের পূর্ব্বসীমান্তস্থিত আদিবাসীদের নিয়ে শ্রীযুত ভদ্র অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের প্রশংসা লাভ করেছে। 'বনমল্লিকা' আদিবাসীদের প্রেম-কাহিনী সমন্বয়। এই নামগুলির পটভূমি আসাম অঞ্চলের লুসাই খাসিয়া, জৈন্তী পাহাড় ও চীন ব্রহ্মসীমান্তের অরণ্যভূমি। পাত্র পাত্রী খাসিয়া, টুটিয়া, লাসের, নাগা প্রভৃতি জাতি। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় গল্প-সঙ্কলন বাংলা কথা-সাহিত্যে এই প্রথম। শ্রীযুত ভদ্র এ বিষয়ে পথিকৃৎ।

আদিবাসীদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কিছু প্রবন্ধ ও গল্প যে ইতিপূর্ব্বে লেখা হয়নি, তা নয়। সেই আদিবাসীরা সমতল ভূমির অধিবাসী আমাদের নিকট প্রতিবেশী এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহুদিন আগে কোল মুণ্ডা ওঁরাও প্রভৃতি ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের নিয়ে 'প্রবাসীতে' অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন শরচ্চন্দ্র রায়, এবং সাঁওতাল কুলি কামিনদের নিয়ে গল্প লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। স্ব স্ব ক্ষেত্রে আদিবাসী নরনারীর সমাজ ও লোকযাত্রার চিত্র উদ্ঘাটনে তাঁদের কৃতিত্বও অসামান্ত—এঁরাও পথিকৃত। কিন্তু দুর্গম আসাম অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিদের কথা নলিনীবাবুই প্রবন্ধে ও গল্পে প্রায় প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করলেন।

...কয়েকটি কারণে বনমল্লিকার গল্পগুলি বাংলা কথা-সাহিত্যের সম্পদ। বিদেশী জাতিতত্ত্ববিদ মিলস, গর্ডন, ব্যারণ হাইমেনডর্ফ প্রভৃতি লেখকরা ইংরেজি ভাষায় এই সীমান্ত অঞ্চল সম্বন্ধে যে সকল তথ্য ও কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন নলিনীবাবু সেগুলি অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও প্রশংসার কথা হল—নলিনীবাবু এই সব পার্ব্বত্য প্রদেশে অরণ্যে গুহায় আদিবাসীদের সঙ্গে বসবাস করে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এক আধ দিন বা দুই এক মাস নয়—দীর্ঘ একটি যুগ—দশ বারো বছর এদের মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি। এদের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার প্রথা চাষ আবাদ প্রেম পরিণাম—সমাজবন্ধন, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ধারা—সুখ দুঃখ প্রভৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটেছে

লেখকের। এই দুর্বোধ্যতার স্বাক্ষর রয়েছে প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে। ভূমিকায় ডঃ কালিদাস নাগ যথার্থই বলেছেন, এর বেশির ভাগ কাহিনীই নিছক খাঁটি অনার্য্য ভাব ও পরিবেশের প্রতীক—ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হলেও সেগুলিতে এক আদিম রসলোকের সন্ধান মেলে।

অবশ্য কাহিনীগুলি নূতন রূপে অভিনব আঙ্গিকে পরিবেশন করার কৃতিত্ব লেখকের। সেজন্য তাঁকে বহুস্থানে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। বহিরঙ্গের পরিবর্তনে গল্পের অন্তর-সত্তা যে রূপবদল করেনি তা ডঃ নাগের মন্তব্যে জানা যায়।

চমৎকার বেগবান ভাষা—স্বচ্ছ প্রকাশ ভঙ্গি। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই বিয়োগান্ত কাহিনীগুলি কোন্ আদিকালে রচিত হয়েও আধুনিক শিক্ষিত সংস্কৃতি পরায়ণ মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার কথা ছেড়ে দিলেও ধর্ম্ম কর্ম্ম, দেবদেবী পূজা, লোকগীতি, কিম্বদন্তী, কথা ও কাহিনী নিয়ে আর একটি সম্প্রদায় যে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছে—তার পরিচয়ও আমাদের কম মুগ্ধ করে না। অতঃপর এই দুরধিগম্য দেশ ও দুর্জ্ঞেয় নরনারীরা বাংলা কথা-সাহিত্যে বৈচিত্র্যে ও প্রসারে সমৃদ্ধ করবে তার সঙ্কেত বনমল্লিকার কাহিনীগুলিতে রয়েছে।

[প্রকাশক : বাসন্তী বুকস্টল। কলিকাতা—৬। দাম—২৲ টাকা।]

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মৌন রেখা : কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

বইখানি একটু অসাধারণ। এ উপন্যাসও নয়, নাটকও নয়, শুধু ছোট গল্প প্রবন্ধ বা কবিতার বইও নয়। একে একটি রচনা সংকলন বলা যেতে পারে। স্বর্গতা লেখিকা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় আপন মনের তাগিদে, সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন হয়ে যে অনাবিল সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁর জীবিতাবস্থায়, এ গ্রন্থ-কলেবর লাভ করেছে তারই সংকলনে। এতে আছে বারোটি ছোট গল্প, একুশটি বেতার ভাষণ, উনিশটি কবিতা। সম্পাদনা করেছেন ডক্টর অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী।

সমালোচনার জন্য এই বিচিত্রধরণের বইখানি হাতে আসতে একটু যেন বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়েই পাতা ওল্টাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য হলাম প্রথম গল্পের কয়েক লাইন মাত্র পাঠ করেই। কী অপূর্ব রচনা! ভাষার লালিত্য, বর্ণনার মাধুর্য, আঙ্গিক সমস্ত মিলিয়ে সত্যিই অপূর্ব। ২০০ পাতার বইখানি পাঠ করতে কোথাও ঠেক খেতে হয় না। সচ্ছন্দ গতিতে যেন একটি ধারা বয়ে গেছে। গল্পগুলি পড়লে প্রথমেই মনে হয়—এর চরিত্রগুলি বিশেষ পরিচিত। যেন এদের সঙ্গে বহুবার আলাপ হয়েছে। 'পঞ্চশরে'র ভজহরিকে যেন কতবার দেখেছি।' 'গৌরীদান' গল্পটি অন্তর স্পর্শ করে। 'একটি দিন' ও 'স্মৃতি' চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়। এর কবিতাগুলিও প্রাণস্পর্শী এবং প্রবন্ধগুলি শিক্ষাপ্রদ। মোট কথা প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে লেখিকার সাধনার অমৃতসিদ্ধি বর্তমান। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস বইখানি প্রত্যেকেরই ভালো লাগবে।

ছাপা চমৎকার। প্রচ্ছদ আড়ম্বরহীন সুন্দর।

[প্রকাশক : শ্রীলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়। ১, কুইন্স পার্ক, কলিকাতা—১৯। দাম—৩৲ টাকা]

বি. না. চ.

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীপঞ্চানন রায় | সুরের পরশ | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

চৈত্র—১৩৬৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

যুগধর্ম

শ্রীগুণমণি দাস

আমরা ভগবানকে লাভ করিতে চাই। আমরা রূঢ় দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতকে পাইতে ইচ্ছা করি। আমরা মরণশীল জগতে অমৃতপান করিতে বাসনা করি। আমরা শোকাকুল সংসার সাগরের উত্তরণ কামনা করি।

ইহা কি আমাদের ব্যর্থ কামনা? যুগে যুগে মনীষীরা ভগবৎ-প্রাপ্তির বা কৈবল্যলাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সব উপায় বড় নীরস, বড় শুষ্ক, বড় কষ্টসাধ্য! তাই, ভগবদালোচনা করিয়া কোনো ফল নাই কি?

শাস্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির চারিটি উপায় দেওয়া হইয়াছে। যথা:—জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তি।

জ্ঞানের দ্বারা নিত্যানিত্য বিবেক জন্মাইলেই চিত্তের মলিনতা নষ্ট হইয়া যাইবে ও জীবের মোক্ষ হইবে। এই মোক্ষ পরম আনন্দময় অবস্থা।

যোগ পদ্ধতি দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই পরম কৈবল্যময় অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইবে। ইহাই জীবের স্বরূপ, ইহাই দুঃখহীন, শোকহীন অবস্থা।

নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের চিত্ত শরতের মেঘহীন, সুনীল আকাশের মত উদার মহৎ ও বৃহৎ

হইয়া যায়। কোনো সার্থ-কামনাময় মেঘ থাকে না বলিয়া অসীমের স্বপ্রকাশ আলো সীমার সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে বাধা পায় না।

অবতার বিশেষের লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনের ভক্তির দ্বারাও ভক্তের চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা ভগবানের সালোক্যলাভ রূপ চরম ফল লব্ধ হয়।

কিন্তু আমাদের মত বহির্মুখ সাংসারিক জীবের পক্ষে উক্ত চতুর্বিধ উপায়ই নিরর্থক হইয়াছে। আমরা হরিনাম সংকীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখিতে ছুটিয়া যাই। আমরা শ্রীশ্রীগীতা ফেলিয়া "চরিত্রহীন" পড়িতে ভালবাসি। আমরা আরও কত কি করিয়া থাকি, যাহা নিতান্তই অপ্রকাশ্য। তবে কি আমাদের কোনই আশা ভরসা নাই ?

আছে, আশা আছে, ভরসা আছে, সবই আছে; নাই শুধু দার্শনিকতা।

দ্রষ্টব্য যে, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তি এই চতুর্বিধ উপায়েই চিত্তকে নির্ম্মল করিবার কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। চিত্তকে দুই প্রকারে নির্ম্মল করা যায়। প্রথম, চেষ্টা দ্বারা। দ্বিতীয় চেষ্টা না করিয়া। চেষ্টা না করিয়াও কিন্তু স্বভাবতঃ নির্ম্মল হয় বলিয়াই আমরা বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দই স্ফুলিঙ্গাকারে পাইয়া থাকি।

না জানিয়া ভিটামিন সেবন করিলেও যেমন ভিটামিনের কার্য্যকারিতা বিনষ্ট হয় না, তেমনি বিষয়ানন্দে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে সমৃদ্ধ হইতে থাকি ও বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। বিষয় ব্যবহারের দ্বারাই যদি আমরা বিনা চেষ্টায় ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাই, তাহা হইলে কেন কষ্টসাধ্য উপায় অবলম্বন করিতে যাইব ?

বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের অংশ কিনা, তাহাও বিচার্য্য। আনন্দ দুই প্রকার হয় না। তবে আলো যেমন নির্ম্মল ও ঘোলা দুই প্রকার হয়, তেমনি আনন্দেরও হইতে পারে।

চিত্ত যেন আকাশের মত। সেখানে নিয়ত অলস মেঘাবরণ হেতু সীমাতে নির্ম্মল আলো আসিয়া পড়িতেছে না। একটা ঘোলাটে আলো মাঝে মাঝে আমাদের সীমাকে পুলকিত করে। চিত্তবৃত্তিগুলি যেন মেঘের মত সর্ব্বদা সীমাকে অসীমের স্বপ্রকাশ আলো হইতে বঞ্চিত করিয়া আছে।

কখনও কখনও ঐ বৃত্তিমেঘগুলি চঞ্চলতা লাভ করে ও পরস্পর সংঘাত প্রাপ্ত হয়। চিত্তাকাশ জুড়িয়া বৃত্তিমেঘগুলি অবস্থান করিতেছে, চাঞ্চল্যবশতঃ উহারা একপাশে সরিয়া গেলে অন্য পাশটা নির্ম্মল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সম্যক্ ভাবে আলো পাওয়া যায় না। বিষয়ানন্দে আমরা যে আনন্দালোক পাইয়া থাকি তাহা সাধারণতঃ ঐ প্রকারে।

কিন্তু বিষয়ানন্দে আর একপ্রকারেও চিত্ত নির্মেঘ হইয়া যায়। এই উপায়টি দ্বারা চিত্তের সমস্ত মেঘাড়ম্বর যুগপৎ নষ্ট হইয়া মহাকাশের সঙ্গে সীমাবদ্ধ আকাশের একতা ঘটায়।

ঐ উপায়টি বলা যাইতেছে। চিত্তের বৃত্তিগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মী। অভিজ্ঞেরা জানেন যে, চিত্তে যতগুলি ধনাত্মক বৃত্তি আছে, ঠিক ততগুলিই ঋণাত্মক বৃত্তি আছে। যে সব বিষয় ব্যবহারে বিরুদ্ধ বৃত্তির সংঘাত হয়, সেখানে ধনে ঋণে মিলিয়া উভয়েই শূণ্যতায় পর্য্যবসিত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হয়। যদি এমন কোনো বৈষয়িক ব্যবহার থাকে যাহাতে যুগপৎ ভয় ও সাহস, লালসা ও সংযম, দৈন্য ও গর্ব্ব, আলস্য ও উৎসাহ, ক্রোধ ও ক্ষমা, বাসনা ও উদাসীনতা, কান্না ও হাসি, লজ্জা ও গাম্ভীর্য্য—প্রভৃতি বৃত্তিদ্বন্দ্ব যুগপৎ চিত্তে সংঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মিত্ব হেতু উহারা গাণিতিক নিয়মে, পরস্পরকে নিরুদ্ধ করিয়া শূণ্যতায় পর্য্যবসিত হইবেই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তিনিরোধজ কৈবল্যও আস্বাদিত হইবে। যে "ভাবের বায়ু" দ্বারা ঐ প্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মী বৃত্তিদের সংঘাত সম্ভবপর হয় সেই বায়ুকে অবিরত চিত্তে বহাইতে পারিলে চিত্তবৃত্তিনিরোধজ কৈবল্যানন্দও সদা দুর্লভ হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্মকে লীলা, খেলা বা ক্রীড়া বলে। বল-খেলা একটি লীলা বিশেষ। উহাতে বিরুদ্ধবৃত্তি দ্ব- সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া পরস্পরকে নিরোধ করে। সর্ব্বচিত্তে আন্তরিক ঐক্যতাবশতঃ দর্শনেন্দ্রিয় সংযোগ দ্বারাই লীলা- বৃত্তিদ্বন্দ্ব প্রতি চিত্তে-চিত্তে প্রমরূপ ফল দিতে থাকে। হারিবার লজ্জা ও জিতিবার গৌরব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু ক্রোধ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা হেতু ক্ষমা—প্রভৃতি বৃত্তিদ্বন্দ্ব প্র-

খেলোয়াড়ের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ক্রীড়াকালে কৈবল্যানন্দে রাখিয়া দেয়। দর্শকেরাও প্রতিফলিত আনন্দ লাভ করে। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী যে উচ্চ ফলভোগী হয় প্রকৃত খেলোয়াড়ও সেই ফল লাভ করে। তাই প্রকৃত খেলোয়াড়গণ স্বভাবতঃ উজ্জ্বলপ্রকৃতির হয়।

ঔপপত্য বা পরকীয়া একটি ভাব। এই 'ভাবে' আটটি মনোবৃত্তির যুগপৎ সংঘাত হয়। ভয় ও সাহস, দৈন্য ও গর্ব্ব, আকাঙ্ক্ষা ও সংযম, কান্না ও হাসি— এই মনোবৃত্তিগুলি উক্তভাবে অনবরত সমুত্থিত হইয়া পরস্পরকে নিরোধ করে, তাহাতে চিত্তবৃত্তি নিরোধজ স্বরূপানুভূতি হইয়া থাকে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে অত্যন্তভাবে পরকীয়াভাব বা উপপতিভাবের বর্ণনা আছে। সেইজন্য উহা পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চিত্তবৃত্তিনিরোধজ স্বরূপানুভব হইতে থাকে।

যদৃচ্ছা চিত্তবৃত্তি নিরোধের যত প্রকার সহজ বৈষয়িক উপায় আছে তাহার মধ্যে পরকীয়া বা উপপতিভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যদি সদাসর্ব্বদাই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধাবস্থায় থাকিতে পারা সম্ভবপর হয়, তবে কেননা জীবন্মুক্তি সহজলভ্য হইবে?

তাই সর্ব্বদা পরকীয়া বা উপপতিভাবে বর্ত্তমান থাকাই শ্রেয়স্কর।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বদাই পরকীয়াভাবে বা রাধাভাবে ডুবিয়া থাকিতেন, তাই তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণব্রহ্মত্বে অবস্থান করিতেন। তিনি স্বমুখেই বলিয়া গিয়াছেন যে, "পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।"

কামগন্ধহীনা উপপত্নীকে পরকীয়া বলে, এবং কামনা-হীন পতিকে উপপতি বলে।

এই মহান জীবনাদর্শকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া-ছিলেন চণ্ডিদাস ও রামী। কারণ, চণ্ডিদাস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, রজকিনী প্রেম নিকষিতহেম কামগন্ধ নাহি তায়।

পরকীয়াভাব বা উপপত্যভাব দুই প্রকারে জীবনে জাগরিত করিতে পারা যায়। প্রথম, নিরন্তর শ্রবণ, মনন স্মৃতি দ্বারা। দ্বিতীয়, নিজে অনুষ্ঠান দ্বারা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিরন্তর শ্রবণ মনন দ্বারাই ঐ ভাবকে সদা জাগরিত করিয়া চিত্তবৃত্তি-নিরোধজ স্বারূপ্যানুভূতিতে অবস্থান করিতেন।

চণ্ডিদাস ও রামী বাহিরে অনুষ্ঠান দ্বারা ঐভাবের আস্বাদ করিয়া রূঢ় দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতকে লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা শোকময় সংসারে অমৃতময় পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

চণ্ডিদাস ও রামী তাঁহাদের জীবনে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই মনুষ্যজীবনের চিরাকাঙ্ক্ষিত রহস্যাদর্শ। এই জীবনাদর্শকে আবাহন করিবার জন্য মনুষ্য-সমাজ নিজের অজ্ঞাতসারে নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া চলিতেছে। কারণ, মনুষ্য-সমাজ এখনও ঐ মহান্ আদর্শকে গ্রহণ করিবার মত উদারতা ও ক্ষমতা লাভ করে নাই।

নরনারীময় সংসারে এমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে যে, মনুষ্য জীবন তাহাতে সার্থক হইবে। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা বলিতে স্বরূপানুভূতি বা ভগবৎ প্রাপ্তিকেই বুঝায়।

বাঙ্গালী রামী ও চণ্ডিদাসই সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্য-জীবনের চরম আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যে শেলী প্রভৃতি মহান কবিরা সেই আদর্শের কিছু কিছু আভাস পাইয়াছিলেন। বার্ণাডশ' Supermenএর আবির্ভাবের জন্য নানা প্রকার সংস্কারের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু Superman কেমনটি হইবে তাহা বলিতে পারেন নাই, Supermanএর আদর্শ তিনি দিতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দও অতিমানবের অভ্যর্থনার জন্য মনুষ্য সমাজকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশিত অতিমানব কি প্রকার হইবে, তাহা অজ্ঞাত।

নরনারীর মধ্যে অবাধ কামগন্ধহীন সাহচর্য্যই মানুষকে দেবত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

কামগন্ধহীন সাহচর্য্যদ্বারা জীব সৃষ্টির ধারা লোপ পাইবার ভয়ে অনেক মনীষী ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু ভয়ের কারণ নাই। কারণ, জীবনে একজন মাত্র গম্যা আর সকলেই অগম্যা। অগম্যার অসংখ্যত্ব দ্বারাই নিষ্কাম সাহচর্য্য সুলভ হইবে।

নিষ্কাম সাহচর্য্যে একটি অপূর্ব্ব বস্তু জাগিয়া উঠে। তাহাকে বলে লীলা। যেখানে বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির সংঘাত হয় তাহাকে লীলা বলে। অতএব লীলায় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া ভগবদনুভূতি আনয়ন করে।

লীলাময় জীবন যাপন সম্ভবপর হইলে লীলাময় ভগবানের স্বারূপ্য লাভ হয়।

এই লীলাময় জীবনের আদর্শের বীজ বাঙ্গালীর ঘরে লুকানো আছে। বাঙ্গালী ভবিষ্যৎ দর্শন দ্বারা সেই বীজ লাভ করিয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই বাঙ্গালী সেই বীজ বপন করিবে। সেই বীজ সম্ভূত মহীরুহের ছায়ায় জগৎপথের ক্লান্ত পথিক শ্রান্তি দূর করিবে। সেই মহান্ বৃক্ষের সুরসাল ফলে মানুষের দেহ মনের সকল ক্ষুধা তৃষ্ণাই দুরীভূত হইবে। মহাকবির উক্তি মিথ্যা নয় যে,

"মণি অতুলন আছে সে গোপন
সৃজনের শতদলে,
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ
আমাদেরি করতলে।"

জহুরী

শ্রীসুধীররঞ্জন

অনেকদিন পর কাঞ্চনের মা'র কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল অনিল। বিশেষ জরুরী কথার জন্যে দেখা করতে লিখেছে। না গেলেই নয়।

অনিলের বাল্যবন্ধু কাঞ্চন। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে লেখাপড়া ক'রেছে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর কাঞ্চন কলেজ মুখো হ'তে না পেরে এক ব্যবসায়ীকে পেয়েছে নূতন বন্ধু রূপে। হ'য়েছে মণিকাঞ্চন যোগ। সে-ব্যবসায়ীই আজ শহরের সবচেয়ে বড় মণিকার। কাঞ্চনের বন্ধুত্বে আর সততায় খুশী হ'য়ে সে দোকানের একটা অংশও লিখে দিয়েছে কাঞ্চনকে।

কর্ম জীবনে দু'জনে দু'পথের পথিক হ'লেও বন্ধুত্বের সূত্র ছিন্ন হয়নি ওদের। সময় পেলে কাঞ্চন যায় তাদের বাসায়। অনিলও মাঝে মধ্যে দোকানে গিয়ে দেখা করে কাঞ্চনের সঙ্গে।

ওটা সোনার দোকান। দাবী করে গিনি সোনার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে। খদ্দেরের খুশীতে সে-দাবী হ'য়েছে সমর্থিত। বাজারে চল্‌ছে দোকানের যেম্‌নি নাম তেম্‌নি কাম। খদ্দেরও ভিড় জমায় ওখানে। কারিগরের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় যে-গয়না ওঠে গড়ে তা' পূরণ করে খদ্দেরের সবটুকু গয়না পরার সখ। এ সব-কিছুর জন্যেই কৃতিত্ব কাঞ্চনের। তা'ছাড়া দোকান ঘরখানিকে করে রাখা হ'য়েছে একেবারে নব-যৌবনা। ক'রেছে রাস্তার চারমাথা আলো। ভেতরের দেয়ালে দেয়ালে স্বচ্ছ বেল-জিয়াম কাচ। কাচের আলমারীর পেটে পেটে হীরা মুক্তার প্রাণখোলা হাসি। মেঝেতে পাতা দামী কাশ্মিরী কার্পেট। সারি সারি নূতন ডিজাইনের চেয়ার। মাঝে মাঝে শ্বেত-পাথরের টেব্‌লের ওপর নানা রকম পাতাবাহারের পাতা আর ফুলের ঝাড়। ধূপদানী যে কোথায় তা' নজরে পড়ে না কারোর। কিন্তু কস্তুরার সুবাস মন মাতায় সকলের।

একদিন তাই ঠাট্টা করে অনিল বলেছিল কাঞ্চনকে, তোদের এটাকে দোকান না বলে একখানা জীবন্ত কাব্যই বলা উচিত।

শুনে পরিতৃপ্তির হাসিতে মুখখানা ভরে উঠেছিল কাঞ্চনের। বলেছিল, আমার দোকান সাজান তবে সার্থক। এতোদিনে তোর চোখে ধরা পড়েছে ঠিক।

তা' আর পড়বে না কেন? কিন্তু তুই কি তোর কাব্যের নায়িকাকে ধরতে পেরেছিস?—না শুধু বাসর জাগিয়েই রয়েছিস্?

হাসিকে আরো ঘন করে' জানাল কাঞ্চন, কাব্যের নায়িকা আড়ালে থাকাই ভালো, তা'তে কাজে অনেক এনারজি বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানস-সুন্দরীকে বাস্তবে পাননি বলেই সৃষ্টি করে গেছেন কাব্যের পর কাব্য। আর জীবনানন্দও নিশ্চয়ই পাননি তা'র বনলতা সেনকে!

সত্যি যথেষ্ট এনারজি আছে কাঞ্চনের। পরিশ্রমই এর কাছে বিশ্রাম। কাজ করে সকাল থেকে রাত দশটা অবধি। সপ্তাহে যে দেড়দিন ছুটী তা'তে থাকে ওর আরো বেশী কাজ। এন্‌গেজ্‌মেণ্ট অনুসারে যেতে হয় বাড়ী বাড়ী। তারপরে আছে টেলিফোন। আগের দিনের টেলিফোনের উত্তর দিতে হয় পরের দিন সকালে ক্যাটালগ্‌ নিয়ে গিয়ে। কাজেই সকালের দিকে কোনদিন দোকানে বসতে পারে না কাঞ্চন। বিকালে আবার তা' হবার উপায় নেই। 'রেডিমেড্‌' গয়না কিনতে বিকালের দিকেই দোকানে ভিড় হয় বেশী। সে-সময় কাঞ্চনের উপস্থিতি চাই-ই। যেখানে গয়নার একটু ত্রুটীর জন্যে মন ওঠে না খদ্দেরের, সেখানেই দরকার হয় কাঞ্চনের হাসির আর কথার। ওর কথাতেই ফল হয় অমোঘ ওষুধের। মন গ'লে খদ্দেরের—রাজী হয় গয়না কিনতে।

* * * * *

সেদিন রবিবার। চায়ের সকাল পার ক'রে অনিল বের হ'ল বাকী সকালকে দুপুরের কোঠায় টেনে নিতে। পথে কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নয়। নামের সঙ্গে চেহারার বেশ সাদৃশ্য আছে কাঞ্চনের। উত্তপ্ত কাঞ্চন যেন! তার ওপরে দীর্ঘ দেহে বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য। পোষাকেও সুরুচির সাক্ষ্য। যে-পথ দিয়ে যায় সে, যায় সে-পথ আলো ক'রে। পথ চল্‌তি অগণিত লোকের মাঝেও দূর দিকেই প্রথম নজর পড়ে সকলের। অনিলেরও পড়ল। জিজ্ঞেস্ করল সে, কোথায় চলেছিস্ কাঞ্চন?

এই মোড়ের মাথায়, এক রায়বাহাদুরের বাড়ী। তাঁ'র নাত্‌নীর বিয়ে।

ওরা বুঝি দোকানে যায় না?

অনেকে যায়, অনেকে যায় না। তবে বাড়ী থেকে অর্ডার আনলে আমাদের লাভ একটু বেশী থাকে।

লাভ? কোনদিকে?—অঙ্কে না অন্তরে?

অন্তর উপবাসীই।

একদম?

তা' বলতে পারো। অঙ্কের সঙ্গে একটু-আধটু ফাউ ওটা হিসেবেও আসে না।

যেমন?

বলার মতো তেমন কিছু নয়। আয়নায় যেমন ছবি দেখা যায় ধরা যায় না।

পূর্বরাগ! তবুও বল না?

ধরো গয়না যদি পছন্দ মতো তৈরী হয় তবে একটু হাসিমাখা কথা: বেশ হ'য়েছে, ধন্যবাদ।

ঐ হাসিতেই তোর অন্তর-যমুনায় খুশীর জোয়ার? না আরো কিছু?

আর কিছু নয়। দোকানদারের পক্ষে এর চেয়ে বেশী আশা করা···বলেই হেসেছিল কাঞ্চন।

সে-হাসিতে অনিলও যোগ দিয়ে বলল, মানুষের মন! মন যে সোনার ঝিলিকের মতো মনের একটু অসতর্ক মুহূর্তে ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে তা' কি কেউ বলতে পারে? তাছাড়া যারা তোদের বাঁধা খদ্দের তা'দের সঙ্গে অনেক-দিনের লেনদেনের আড়ালে ফল্গুধারার মতো একটু মন দেওয়া নেওয়া কি অসম্ভব?

—না হে না!

মিথ্যে বলছিস্! একদিন তো আমিই দেখলাম তুই তখন ভেতরে ছিলি; একটা মেয়ে এসে বল্‌ল, কাঞ্চনবাবু কোথায়? তাঁ'কেই ডাকুন।

তুই সেদিন ছিলি বুঝি! যেন বন্ধুর চোখে প্রেম ধরা পড়ায় একটু চাপা হাসিতে মুখখানি প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল কাঞ্চনের। তারপরেই একটু ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বিয়ে হ'য়ে গেছে সে-মেয়েটীর। লেখা-পড়া জানা মেয়ে বরও তেমনি পেয়েছে প্রফেসর।

—অনেকদিনের···ঐ যে কোন্ এক রায়বাহাদুরের নাত্‌নী সকালের দিকে তোকে বাসায় যেতে বলেছিল গয়নার অর্ডার আনতে,—সঙ্গে করেছিল চায়ের নিমন্ত্রণ?

সে-বাড়ীতেই তো যাচ্ছি।

তা' বেশ! মুখ টিপে একটু হাসল অনিল। পকেট থেকে তখন কাঞ্চনের মার চিঠিখানি বের করে দেখাল কাঞ্চনকে।—ব্যাপার কি! এমন জরুরী করে মাসীমা লিখেছে কেন?

মা-ই জানে। গিয়ে শোন একদিন।

কথা শেষ হ'লে কাঞ্চন পা' বাড়াল তা'র পথে। সেখান থেকে রায়বাহাদুরের বাড়ী দেখা যায়। কিন্তু মনের গতিতে কাছের পথ হ'ল দূরের। অনিলের কোন্ কথায় যেন তা'র মনে ছোঁয়া লেগেছে কিসের। তা' নিয়েই সে ভাবল অনেক। তা'র জহুরী জীবনের অনেক স্মৃতি জড়ো হ'ল তখন মনের আসরে। টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনার ছেঁড়া ছেঁড়া পাতা। তবুও তা' যেন বসন্ত-বাতাসে উড়ে আনমনা করল তা'কে: কবে কে তা'দের দোকানের বড় আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে নেক্‌লেস্ পরে আয়নার ভেতর দিয়েই তাকিয়েছিল তা'র দিকে। তা'র সেই চোরা-চোখে তা'র চোখ পড়তে মেয়েটীর মুখখানা হ'য়েছিল একটা গোলাপ। অনেকদিন পরে তা'র মানস-পটে স্মৃতি হ'য়ে ভেসে উঠল সেই মুখ-গোলাপ। আরেকদিন কে একজন গয়না পরে বলেছিল, দেখুন তো কেমন মানিয়েছে?···কে একজন ক্যাটলগের সব ক'খানা পাতা উল্টে-পাল্টে অনুরোধ জানিয়েছিল তা'কে, আপনিই মন থেকে একটা ডিজাইন নিয়ে বুঝিয়ে দিন কারিগরকে।

তা' কি আপনার পছন্দ হ'বে?—জিজ্ঞেস্ করেছিল কাঞ্চন।

নিশ্চয়ই হবে। এ-ব্যবসায়ে যে যতো বড় শিল্পী তা'র দোকানের ততো সুনাম। আপনার দোকানের সুনাম শহরময়! সুতরাং—বাকীটুকু আর কথায় না বলে সে শেষ করেছিল তা'র হাসিতে।

এরা সবাই খদ্দের। অর্ডার দিতে একদিন, গয়না ডেলিভারী নিতে আরেকদিন। দু'দিনের এই দেখাশুনা; দোকানদার আর ক্রেতার আলাপ। এমন চলছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। ক্রেতার-ধারা! তবুও বেশ লাগে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। সোনার দোকানের ক্রেতা। দামী ভিড়! সবই তো বড় ঘরের। কারোর কারোর রূপ আর লাবণ্য হার মানায় তা'দের সোনার দোকানকেও। তা'দের সকলের নাম আর ঠিকানা অবশ্য লেখা থাকে তা'দের অর্ডার-বুকে। কিন্তু তা' দেখবার বা বিশেষ ক'রে কারোর নাম-ঠিকানা মনে লিখে রাখবার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি কাঞ্চন। তবুও অনিল যে কোন ফাল্গুনের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে গেল তার মনে, ছড়িয়ে দিল ফাগুনের আগুন!

* * * *

বিকালের দিকেই কাঞ্চনের মা আশা করেছিল অনিলকে। পূর্ণ হ'ল তার আশা। অনিলকে দেখে খুশী হ'য়ে বলল, কাঞ্চনকে আর তোকে আমি একই চোখে দেখি। তোরা আমার ছেলে হ'য়ে কি আমার মনের দুঃখ দূর করবিনে?

চেষ্টার কোন ত্রুটী করব না মাসীমা। ব্যাপারটী অনেকটা আঁচ করে নিয়েও জিজ্ঞেস করল অনিল, কি করতে হবে বলুন তো?

মা না হলে নারীর জীবন বৃথা। ছেলের মা হ'য়ে যদি আবার পুত্রবধূর মুখ না দেখে তা'র জ্বালাও যে কতো তা' আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি। কথাগুলো বলতে বলতে কাঞ্চনের মা'র চোখের কোণ আসছিল ভিজে।

বাধা দিয়ে পরিবেশটীকে একটু হাল্কা করতে অনিল বলল, এই কথা! আপনি ভাববেন না মাসীমা। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সেজন্যেই তো তোকে ডেকেছি। জানি, তুই ছাড়া হবে না। ভগবানের ইচ্ছায় পয়সা তো আর কম আয় করছে না! কতো ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছে। বড় ঘরের, পরমাসুন্দরী মেয়ে। যা'রা গিয়ে প্রথম দেখে এসেছে তা'রা প্রশংসা ক'রেছে শতমুখে। কিন্তু ও-ই নিজে বাধিয়েছে গোল। মেয়ে দেখে এসে মুখ বিকৃত করে বলেছে,—দূর দূর! এই নাকি তোমাদের সুন্দরী! এমন করেই সব সম্বন্ধ ভেঙেছে নিজের হাতে। তাই নিরুপায় হয়ে তোকে ডেকেছি। আচ্ছা! কাঞ্চনের মা একটু ঘন হ'য়ে বসল অনিলের কাছে। ঘরে কেউ নেই তবুও সুর নীচু করে বলল, ওর যদি কোন মেয়েকে পছন্দ হ'য়ে থাকে তবে তাকেই বিয়ে করুক,—আমার কোন আপত্তি নেই। আমার পছন্দ মতো ওকে বিয়ে করতে হবে, ওর পছন্দ মতো চলবে না—মা হ'য়েছি 'বলেই এমন কোন জিদ্ আমার নেই। আমি চাই শুধু ওর বৌয়ের মুখ দেখ্‌তে।

তেমন কিছু কি বলেছে কাঞ্চন?

তাও তো কিছু বলছে না। তাতেই হ'য়েছে আরো মুস্কিল।

একদিন একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলুন না ও-কথা।

বলব ভাবি। কিন্তু বলা আর হ'য়ে উঠ্‌ছে না।—কখনই বা বলি! ভোরেই বেরিয়ে যায়। দুপুরে ফেরার ঠিক নেই। যদিও-বা ফিরল, কোন রকমে দু'টো নাকে-মুখে গুঁজে বেরিয়ে যায় আবার। অনেক রাতে ফেরে। তখন ওর ক্লান্ত অবস্থায় ও-নিয়ে আর তর্কের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করে না!

তা' হ'লে আমাকেই বলতে বলছেন?

কাঞ্চনের মা তখন কাতর-চোখে অনিলের দিকে তাকিয়ে তার একখানি হাত ধরে বলল, আমার দ্বারা তো হচ্ছে না। তুই যদি কিছু করতে পারিস।

দেখব চেষ্টা করে।

চেষ্টা নয়। তোকেই করতে হবে। এ-সব সমস্যার সমাধান বন্ধু-বান্ধব দিয়েই সম্ভব হয়। তোর কাছেই মন খুলবে।

সেদিন কাঞ্চনের মা'র কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকে অনিল শুধু ভাবছিল কাঞ্চন আর তা'র মা'র

কথা। ছোট্ট সংসার। অভাবের ছোঁয়া নেই তাতে। একখানা কাজ করেও খেতে হয় না কাঞ্চনের মাকে। ঝি আর চাকর তারই আদেশের অপেক্ষায় থাকে দাঁড়িয়ে। সেটা বাহ্যিক আরাম আর স্বাচ্ছন্দ। মাতৃহৃদয়ের যে চিরন্তন পিপাসা তা' তাতে দূর হচ্ছে না। তাই পুত্রবধূর মুখ দেখ্‌বার জন্যে কাঞ্চনের মা'র মনে আশা অতৃপ্ত, বুকে তৃষ্ণা। এ-তৃষ্ণায় জল দিচ্ছে না কেন কাঞ্চন? বিশেষ ক'রে বিয়ের ব্যাপারে যখন তা'র রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, তখন মাকে সুখী না করাকে কাঞ্চনের অপরাধও বলা যেতে পারে। কিন্তু কাঞ্চনকে সে ধরে কোথায়? পরিবেশ তো চাই। সকালের দিকে গোটা শহর থাকে তা'র পায়ের তলায়। বিকালেও দোকানে খদ্দেরের পর খদ্দের। খদ্দের ওদের লক্ষ্মী। তা'দের ফেলে তা'র সঙ্গে কথা বলার সময় না করতে পেরে হয়তো তা'কে শুধু বলবে,—আর একটু বোস!—এক মিনিট!—দেখছিস্ তো!! এমন করেই মৌখিক সে-এক মিনিটে তার ঘড়ি থেকে দু'টো ঘণ্টাকে কেড়ে নেবে বৃথা।

তা' নিক্। ঠিক করল অনিল, দু'ঘণ্টা কেন, দু'দিন বৃথা গিয়েও যদি কাঞ্চনের মা'র সজল চোখে এনে দিতে পারে হাসি তারই তো দাম অনেক।

সামনেই ছিল একদিন ছুটী। সেদিনটাকে অনিল পুরো ধরে নিল কাঞ্চনের জন্যে। প্রথম টিপ্। হয় যাবে বৃথা নয় হবে মূল্যবান। প্রথম ট্রামের যাত্রী হ'য়ে ধরল কাঞ্চনকে।

অনিলকে দেখে কাঞ্চন অবাক! জিজ্ঞেস্ করল, এতো সকালে!

মাসীমা যে জরুরী চিঠি লিখেছিল তারই জের।

হুঁ।—খুব হেসে উঠল কাঞ্চন। জানলাগুলো খুলে দিতে দিতে বলল, বোস্।

সকালের সোনালী আলো তখন এসে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। মোজাইককরা মেঝেতে বিছান হ'ল সোনার পাত। একটু বাঁকা চোখে অনিলের দিকে তাকিয়ে কাঞ্চন আবার বলল, তোর কাঁধেও দেখ্‌ছি ভূত চেপেছে।

তুই তবে ওঝা হ'য়ে নাবিয়ে দে।

সে-কথার উত্তর না-দিয়ে হাসিমুখে কাঞ্চন চলল চায়ের কথা বলতে। বলে গেল, চা খেতে খেতে আসর জমবে ভালো!

চায়ের সঙ্গে এলো সুস্বাদু খাবার। দু'জনে তখন মুখোমুখি। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল অনিল, ভেবেছিস্ কি তুই? এমনি করেই উদাসী পথিক হ'য়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিবি নাকি?

যদি কেটে যায় মন্দ কি!

ফুলে ফুলে মধু খেতে তো ভালোই লাগে! সেটা তোর দিক থেকে কাম্য হ'তে পারে কিন্তু মাসীমার দিক থেকে?

মা তাই বলছিল বুঝি?

মা হ'য়ে তা' বলতে পারে না বলেই বলেনি। বলেছে, কতো সম্বন্ধ এলো তোর একটাও পছন্দ হ'ল না।

পছন্দ না হ'লে কি করব! যাকে নিয়ে ঘর বাঁধব সে যদি না হয় মনোমত, তবে কি সে-ঘর হাওয়ায় টেকে?

স্বর্গের অপ্সরা চাস্ নাকি? আচ্ছা! একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি,—সত্যি করে বলবি তো?

বলব।

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস্?

কথা উড়ানো হাসি দিয়ে কাঞ্চন বলল, কি যে বলিস্!

বলি ঠিকই। যদি ভালোবেসে থাকিস্ তাকেই তবে বিয়ে কর। তাতেও তো মাসীমার আপত্তি নেই।

কাপে তখন দু'এক চুমুক চা ছিল। ভাবল অনিল, ওটুকু শেষ করেই হয়তো তা'র কথার জবাব দেবে কাঞ্চন। তাও দিল না। ঘাড় বাঁকা ক'রে চোখ দু'টীকে বাতায়ন পথে দূরে ছুটিয়ে দিয়ে সে শুধু হাসতে লাগল মুচ্‌কি হাসি।

লজ্জা লুকানোর হাসি হাস্‌ছিস্ যে! বলে ফেল,—শুনে কান জুড়োই। ঘটকের তো আর দরকার নেই, দরকার একখানা পাঁজির।

মুখের হাসি নিয়ে তখনও নীরব কাঞ্চন।

কাঞ্চনের নীরবতা আর মুচ্‌কি হাসি দেখে অনিলের হিসেব হ'ল পাকা,—নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবেসে তা'কেই বসিয়ে রেখেছে মনের মন্দিরে। মন্দিরের সেই

অধিষ্ঠাত্রী দেবীই অপছন্দ করিয়েছে অন্য সকলকে। তবুও ওর মুখ থেকে তা'র হিসেবের সমর্থন পেতে আবার বলল অনিল, চুপ ক'রে থেকে আমার সঙ্গেও তুই লুকোচুরি খেলছিস্?

মাত্র দু'একটী কথায় কাঞ্চন স-রব হ'ল, না-না তুই আমার বাল্যবন্ধু! তোর সঙ্গে লুকোচুরি খেল্ছি না। বলেই কাঞ্চন চুপ করল আবার। দূরের পানে চোখ মেলেই সে যেন তখন দেখতে চাইছিল তা'র মনোময়ীকে। কোথায় সে! কি নাম তা'র? দেখেও যেন পারছে না দেখতে। পলকে যা' ধরা দেয় একটু আভাসে, পায় না যেন তা'কে ভালো করে দেখতে। এমনই একটা দেখতে পারা আর না-পারার আলো ছায়ায়—চোখ দু'টী তা'র ক্লান্ত। শেষে চোখের দৃষ্টি গুটিয়ে এনে ফেল্ল অনিলের মুখের ওপর – বলল, বিশ্বাস কর, কাউকে ভালোবাসিনি।

অবিশ্বাসে যেন চম্‌কে উঠল অনিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাবে গোধূলীর ম্লান ছায়া এনে সে বল্ল, ওটা তোর একান্তই ব্যক্তিগত। তা' জেনেও যে জিজ্ঞেস ক'রেছি শুধু মাসীমার জন্যে। যেভাবে আমাকে ধরেছে।

তুই আমার ওপর বৃথাই অভিমান করছিস। অনিলের একখানা হাত ধরে বলল কাঞ্চন। তোকে ছুঁয়েই প্রতিজ্ঞা করছি, কাউকে আমি ভালোবাসিনি। যে-সন্দেহ তুই বা অন্য কেউ করছে তা' সত্যি অমূলক। এটা তো বুঝিস্, তেমন হ'লে তা'কে বিয়ে করার স্বাধীনতা তো আমার রয়েছেই।

পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সাময়িকভাবে অনেক সময় সত্যকে মনে হয় মিথ্যা বলে, মিথ্যাকে মনে হয় সত্য বলে। কাঞ্চনও তখন পড়ল তেমন অবস্থায়। যা' তা'র কাছে একান্তই সত্য তা' বলেও সে পারল না অনিলকে বিশ্বাস করাতে। উভয় সঙ্কট তা'র। মায়ের মনোবেদনা বা অনিলের অভিমান তার প্রাণে লাগছে। আবার তা'র গোপন মনের যা' চাহিদা তা' কল্পনায় উড়ছে পাখা মেলে। সে-যে তখনও মানসী। সে-মানসীই তো ছড়িয়ে রয়েছে শহরের কোণে কোণে, কোন বাতায়নে, কোন ড্রয়িংরুমে। ছড়িয়ে রয়েছে রায় বাহাদুরের নাত্নীর স্বপ্নাঞ্জনমাখা চোখে, জজ সাহেবের মেয়ের রং-এ, শ্যামলীর তনুতলায়, রেবা ঘোষের মুখের কাটিংএ আর ডলি সেনের লীলাচপল ভাবে। তা'দের সব জড়ো করে রূপ দেওয়া যায় শুধু কল্পনায়, বাস্তবে কি তেমনটী মেলে?

সুকবি গোবিন্দচন্দ্র (১২৬১—১৩২৫)

তপোবিজয় ঘোষ

গোবিন্দচন্দ্র দাস বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এক বিস্মৃত প্রায় কবি। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর কবি কর্ম আজও অপরিচিত রয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্য-রসিক ছাড়া তাঁর কাব্য আর কারো দ্বারা আস্বাদিত হয়েছে বলে মনে হয় না। ভাগ্যহীন এই কবির মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন :

> এই দুনিয়ার একটি কোনে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে
> ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে
> পাতায়-চাপা গন্ধটুকুন পুবে হাওয়ায় বেরুলো নীড় ত্যেজে,
> পাথর-চাপা রইল কপাল, বাদলা করে রইল চোখের জলে।

কবি গোবিন্দ দাস পাথর চাপা কপাল নিয়েই বাংলা সাহিত্যের আসরে এসেছিলেন। আজ তার স্মৃতিও তাই প্রায় পাথর-চাপা পড়বার উপক্রম হয়েছে। জীবিতকালে দেশ এবং দেশবাসীর কাছ থেকে উপযুক্ত মর্যাদা কবি লাভ করেন নি। দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়ে শুধু মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কবিকে ভিক্ষুকের মত এক দরজা থেকে আরেক দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। রাষ্ট্রে ও সমাজে, ঘরে ও বাইরে এতটুকু সহানুভূতি কবি কোনদিন কারো কাছ থেকে লাভ করেন নি! কবির মৃত্যুর পর "ভারতবর্ষ" যথার্থ ই লিখেছিলেন :

"বাঙ্গালীর খাঁটি কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মরিয়াছেন,—না, না, মরিয়া বাঁচিয়াছেন। নানা কষ্ট সহ্য করিয়া অর্দ্ধাশনে অনশনে সুদীর্ঘকাল কাটাইয়া আমাদের চির দরিদ্র পল্লী-কবি গোবিন্দ দাস মরিয়া গিয়াছেন. এখন তোমরা সভা কর, বক্তৃতা কর, তাঁহার 'চিতায় মঠ' দেও। সুজলা সুফলা, মলয় শীতলা, শস্য শ্যামলা, বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়া যে এ

কষ্ট পাইয়া মরিয়াছেন, সাবধান! তাঁহার জন্য কেহই শোকপ্রকাশ করিও না, সে অধিকার আমাদের নাই।"—(অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩২৫)

কবি গোবিন্দচন্দ্রের জন্ম ১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল-জয়দেব পুরে। ভাওয়ালের তৎকালীন রাজা কালীনারায়ণ গোবিন্দ দাসকে একটু স্নেহের চোখে দেখতেন। পরবর্তী রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণের আমলে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গোবিন্দ দাস তখন রাজ দরবারে চাকুরী করতেন। যুবক রাজেন্দ্রনারায়ণ কর্তব্য জ্ঞানহীন বিলাস প্রিয় রাজা ছিলেন। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে গোবিন্দদাস এ বিষয়ে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু এই অনুযোগের ফল তাঁর পক্ষে শুভ হয় নাই।

সাহিত্য-সাধক কালিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ও তখন ভাওয়াল রাজ দরবারে চাকুরী করতেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন—প্রকৃতপক্ষে রাজ্য পরিচালনা করতেন কালিপ্রসন্ন। গোবিন্দ দাসের সঙ্গে রাজ্য-পরিচালনা বিষয়ে তাঁর তখন তীব্র মনোমালিন্য!

রাজ্যে দুর্ভিক্ষ চলা কালে আরো একটি দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজার কয়েকজন আত্মীয় এবং একজন খানসামা জয়দেব পুর গ্রামের এক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ি আক্রমণ করে। মালিক বেচু শিকদার তখন বাড়িতে ছিল না। তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করাই দুবৃত্তদের উদ্দেশ্য ছিল। গোবিন্দ দাস এই বেচুর পক্ষ নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রজাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। এই সময় একখানি পত্রে কবি "গোবিন্দ দাস—" জীবনী প্রণেতা শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে লিখেছিলেন:

……আমি জয়দেব পুরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ধোপা নাপিত চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ও সর্বশ্রেণীর লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলাম, আজ বেচুর বাড়ী যে ঘটনা হইয়াছে অপরাধীরা যদি তাহার জন্য উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত না হয়, তবে কাল তোমাদের বাড়িতে যে সেই কাণ্ড করিবে না তাহার বিশ্বাস কি?……" (১)

কবি সভা সমিতি করে জয়দেব পুরবাসী সকল প্রজা সাধারণের নিকট রাজশক্তির এই অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিবিধানের জন্য আবেদন জানান।

অবশেষে সম্মিলিত প্রজা-শক্তির নিকট রাজ-শক্তি আংশিক ভাবে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। রাজ সভায় অপরাধীদের বিচার-সভা বসে! কিন্তু বিচারের নামে এই অন্যায় অত্যাচারের একটা প্রহসন হওয়ায় গোবিন্দ দাস ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন।

"……নির্ভীক-হৃদয়, দেশভক্ত তেজস্বী কবি গুরুতররূপে অপমানিত একজন প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। অপরাধী-গণের যথোপযুক্ত শাস্তি হইল না এই বিশ্বাস গোবিন্দ দাসের মনে লাগিয়া রহিল।……

সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মসম্মানে তীব্র আঘাত লাগিয়াছিল।" (২)

ফলে ভগ্ন-হৃদয় কবি গোবিন্দদাস সেই মুহূর্তে উক্ত বিচার সভায় দাঁড়িয়ে রাজ-গোলামীর কাজে ইস্তফা দেন। এরপর তাঁকে বাধ্য হয়ে ভাওয়াল পরিত্যাগ করতে হয়। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করবার মত প্রজাশক্তি তখনও সম্পূর্ণরূপ সচেতন হয়ে উঠে নি। কবিকে আংশিক সমর্থন তাঁরা জানিয়েছিল সত্য—কিন্তু সম্মিলিত প্রজাপুঞ্জের পূর্ণ সচেতন সমর্থন তিনি পান নি। সে যুগে তা সম্ভবও ছিল না।

গোবিন্দদাসের নিজের একটি কবিতায় এই জননী জন্মভূমি ছাড়ার আক্ষেপ তীব্র ভাবে ফুটে উঠেছে:

যাই তবে জননী গো বিদায় এখন,
যাই হে স্বদেশ বাসি! মনে রে'খ ভাই,
তোমাদেরি তরে সহি এত নির্য্যাতন
বিড়ম্বিত হইলাম বর্বরের ঠাঁই!

অতঃপর জীবনের অবশিষ্ট কালটুকু কবি কোথাও সুস্থির হয়ে কাটাতে পারেন নি। অভাবের তাড়নায় আশ্রয়ের দুরাশা নিয়ে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারে জর্জরিত এই কবি এক সহর থেকে আর এক সহরে ঘুরে বেরিয়েছেন। কখনও ময়মনসিংহ কখনও মুক্তাগাছা আবার কখনও বা কলকাতায়। এই সময় তাঁর প্রথমা পত্নী এবং এক ভ্রাতা মারা যান। গোবিন্দদাসের অধিকাংশ কবিতা জীবনের এই অনিশ্চয়তা এবং শোক-তাপ-হতাশার মধ্যে লিখিত। তাই গোবিন্দদাসের কাব্যে এমন একটি যন্ত্রণার সুর শুনতে পাওয়া যায় যা উনবিংশ শতাব্দীর অনেক কবির মধ্যেই অনুপস্থিত। পত্নী সারদার মৃত্যুর পর কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন তার মধ্যে কবিহৃদয়ের মর্মান্তিক যন্ত্রণার স্পষ্ট একটি রূপ দেখা যায়। কবিতাটি আরো একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। কবি তাঁর পত্নীকে ভালবাসতেন। কিন্তু সে ভালবাসায় ভোগে অনাসক্তির সুর বাজে নি। দেহ ছেড়ে দেহাতীত কোন অরূপের সন্ধানেও কবি-হৃদয় ধাবিত হয় নি। বস্তুজগতের মাটি-ফুল-জলের মতই কবি পত্নীকে ভালবাসতেন। পরবর্তীকালের অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-নজরুলের মত তিনিও ভোগাসক্তির মাঝে ভালবাসার চরমতম সার্থকতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে কবির আধুনিকতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না:

আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ
অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ!
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম কথা
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ!

কিন্তু কবির সেই প্রিয়তমা পত্নী আজ আর ইহলোকে নাই। কবি তাই—

আজো সে ভস্ম ছাই
বুকে রেখে চুমা খাই,
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ!

তীব্র একটি প্রেমাবেগের দ্বারা কবিতাটি মণ্ডিত। কবির আন্তরিকতার স্পর্শে "কস্তুরীর" অন্যান্য কবিতাগুলোর মত এই "আমার ভালবাসা" কবিতাটিও অনবদ্য আত্মসম্মানত্ব লাভ করেছে।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর কবি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু সারদাকে তিনি তিলার্দ্ধের জন্যও বিস্মৃত হতে পারেন নি। কবি হৃদয়ের হাহাকারের সঙ্গে তাঁর তীব্র প্রেমাবেগ বা প্যাশন একত্রিত হয়ে এই প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলিকে অনন্য করে তুলেছে। কবি গোবিন্দদাস এই প্রেমের কবি হিসাবেই চরম সার্থকতা লাভ করেছেন।

বুঝিলাম আজি ওই দেবতার প্রাণ
প্রেমের অনন্ত উৎস—নহে ও পাষাণ
প্রত্যেক আঘাতে বুকে এক গঙ্গা শত মুখে
ছুটিছে অনন্ত বেগে বহে না উজান!
বুঝিলাম আজি ওই দেবতার প্রাণ।
আজি বুঝিয়াছি হায় ওই ফল্গু গঙ্গা ধায়,
হৃদয়ে অনন্ত স্রোত সদা বেগবান,
প্রেমের অনন্ত উৎস নহে ও পাষাণ।

প্রেমের এই অনন্ত উৎসে কবি অবগাহন করেছিলেন। কবির কাব্যে এই প্রেমেরই "অনন্ত স্রোত সদা বেগবান।" এই সুরই তাঁহার পীযূষবর্ষী কাব্যগ্রন্থে অপূর্ব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সুর মনের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে। বর্তমান যুগের দুর্বোধ্য কবিতার ন্যায়, তাঁহার কবিতায় পাঠকগণকে ঘর্মাক্ত-কলেবর হইতে হয় না।" (৩)

কবি গোবিন্দদাসের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইতিহাসে এই যুগটি রেণেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ বলে চিহ্নিত। চিত্তের মুক্তিতে—হৃদয়ের দ্বন্দ্বে এবং সংস্কারের বন্ধন বিলুপ্ত করার উদগ্র কামনায় অস্থির-চঞ্চল উনিশ শতকের বাঙ্গালা। এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ অন্ধকারের সঙ্গে আলোকের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে নবোদ্বোধিত পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের। বাঙ্গালার গণ-মানসে তখন পরিবর্তনের স্রোত উত্তাল হয়ে উঠেছে। নিয়ত একটা অস্থিরতা এবং উন্মাদনা চঞ্চল করে তুলেছে বাঙ্গালী জীবনকে। সেই সঙ্গে পাশ্চত্ত্যের শোষকশ্রেণীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষও দানা বাঁধতে সুরু করেছে মুক্তিকামী মানুষের মনে। চতুর্দিকে তখন জ্বালাময়ী বিদ্রোহের নিঃশব্দ বিস্তার চলছে দেশ জুড়ে। সাঁওতাল বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রচণ্ড বিদ্রোহ এই যুগের নবজাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে বিধৃত। গোবিন্দদাসের জন্মের বছর দুয়েক পরেই ইতিহাস বিখ্যাত সিপাহী-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে! রাজশক্তি এই বিদ্রোহকে দমন করলেও—সমগ্র ভারতবাসী বহুদিন পর্যন্ত তার জের টেনে চলেছে। গোবিন্দদাসের বাল্যকাল কেটেছে এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণের অস্থিরতা উন্মাদনার মধ্যে!

পরবর্তী জীবনে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবিকে যে একাধিক বার বিদ্রোহ করতে হয়েছে তার মূল বীজটি কি এই অস্থিরতার সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল? তাঁর কাব্যে তাই কি এত স্ফুলিঙ্গ? এত উন্মাদনা? স্বদেশের কথা বলতে গিয়ে—অত্যাচারীর বিপক্ষাচরণ করতে গিয়ে কবির কণ্ঠ তাই কি এমন শাণিত এবং বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল?

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ' কারে? এ দেশ তোমার নয়—
এই যমুনা গঙ্গা নদী তোমার ইহা হ'ত যদি—
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
* * * *
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ' কারে এদেশ তোমার নয়
এই যে জাহাজ এই যে গাড়ি এই যে পেলেস এই যে বাড়ি
এই যে থানা জেহেল খানা—এই বিচারালয়,
লাট বড়লাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট তারাই হবে
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি খানসামা আয়া মেথর মহাশয়—!

অথবা জনসাধারণের হয়ে জনসাধারণের দরবারে এমন অকুণ্ঠ আবেদন:

তোমরা বিচার কর জনসাধারণ
এ নহে সামান্য শাস্তি
এ ভাই যৎপরোনাস্তি
ফাঁসির পরে এই নির্বাসন।
এই ষোল কোটি হাতে
বল নাই একটাতে;
নাই কি অভয় দান আর্তের রক্ষণ?

কবির এই স্বদেশ-প্রেম এবং গণ চেতনার মূলে সে যুগের পরিবেশ কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ভেবে দেখবার বিষয়। গোবিন্দদাসের পূর্বে আর কোন কবি বাঙ্গালার নিম্নতম অপাঙক্তেয় মানুষ 'বাবুর্চি খানসামা আয়া অথবা মেথর'দের পক্ষাবলম্বন করে এমন দীপ্ত কণ্ঠে কোন কবিতা-উচ্চারণ করেছিলেন বলে আমার জানা নেই। জন-সাধারণের দরবারে এমন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়শীল আবেদনও উপস্থিত করেছেন কিনা জানি না!

কবির মৃত্যুর পর গোবিন্দদাসের এই তীব্র তীক্ষ্ণ স্বদেশ প্রেমের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন:

ক্ষুধার চোটে নিত্য তাঁহার বইতো বুকে বাণ
সহ্য নাহি করতো তবু আত্মার অপমান!
মনুষ্যত্বের করতো পূজা, শক্ত বুকের ছাতি।
কলুষ হৃদয় লাখ্ পতিদের মাথায় মারতো লাথি।
নেহাৎ গরীব কবি কিন্তু বীর্যের অবতার—
একটি নিখুঁত মানুষ গেল আসবে না সে আর!

গোবিন্দদাস রবীন্দ্রনাথের সম সাময়িক কবি ছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেন কবির কিছু কিছু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা লিখেছেন। (৪) কিন্তু তার রচনায় ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাবই বেশী দেখা যায়। উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যে যে মার্জিত ভাবনা ও মননশীলতায় আধুনিকতা সুস্পষ্ট—ঈশ্বরগুপ্ত এবং গোবিন্দদাস উভয়ের কাব্যেই তা উপস্থিত নেই।

উভয়েই কাব্যরচনা কালে পরিমিতি বোধ হারিয়ে তীব্র ভাবাকুল হয়ে উঠেছেন। ঈশ্বরগুপ্তের বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলোর সাথে গোবিন্দদাসের ওই পর্য্যায়ের কবিতাগুলোর বিশেষ সাদৃশ্যও দেখা যায়।

কিন্তু একথা সত্য যে গোবিন্দদাসের কাব্যে তেমন কোন মহৎ কালজয়ী সুরের অনুরণন নাই। এর কারণ কবির পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্য জাতির মতই অপরিসীম বিরাগ প্রবণতা। কবি উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না। দারিদ্র্যের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর বেশীদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় নি, বিদেশী সাহিত্যের রসগ্রহণের পক্ষে এও একটি প্রধান অন্তরায় ছিল।

সব চেয়ে বড় কথা কবি উনিশশতকীয় রেনেস াঁসের প্রাণ কেন্দ্র কোলকাতা থেকে অনেক দূরে জীবন কাটিয়েছেন। ভাওয়ালে অথবা পূর্ববঙ্গে তার অধিকাংশ জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে। পরিবেশ মানুষের প্রতিভা উন্মেষের সহায়তা করে এবং তাকে কালোপযোগী করে তোলে। কিন্তু গোবিন্দদাসের কবি-প্রতিভা উনিশ-শতকীয় অস্থিরতা-টুকুকে আয়ত্ত করলেও মার্জিত এবং সুশৃঙ্খলিত কোন পরিবেশের সন্ধান পায় নি। পেলে তিনি কালজয়ী কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারতেন কিনা তা অবশ্যই বিতর্কের বস্তু—কিন্তু তাঁর ভাষা-ছন্দ এবং প্রকাশভঙ্গি আরো সংযত ও সুন্দর এবং আধুনিক যে হয়ে উঠত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবেই গোবিন্দদাসের অনেক কবিতা গতানুগতিক এবং বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়েছে। কবি অনেক জায়গায় তীব্র অমার্জিত একটা প্যাশানের দ্বারা পরিচালিত হতে গিয়ে অসংযমী হয়ে পড়েছেন। ভাব এবং ভাষার লালিত্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উচ্ছ্বাসের গভীরে চাপা পড়ে গেছে! এই পরিমিতি বোধের অভাবে তার অনেক কবিতাই স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে কাব্য-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

কিন্তু কবি-সম্বন্ধে এই মন্তব্য করার পূর্বে আমাদের আরো একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে কেবল শিক্ষা নয় অন্নচিন্তায় কবিকে অহরহই একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কোথাও একদণ্ড তিনি সুস্থির হয়ে কাটাতে পারেন নি। দারিদ্র্যের অসহ জ্বালায় তার অন্তর নিরন্তর দগ্ধ। মনের এই অবস্থায় মহৎ কিছু সৃষ্টি করা অলৌকিক প্রতিভাবান না হলে সম্ভব নয়। কবি নিজেই বলেছেন:

হৃদয়ে দারিদ্র্য দুঃখ শক্তি শেলাঘাত
করিতেছে প্রবাহিত রক্ত শতধার
নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন
নীরবে অলক্ষ্যে এই হয় অশ্রুপাত,
নীরবে মরম মূল করি বিধুনন
নীরবে নিঃশেষে এই প্রাণের প্রপাত!

হৃদয়ের এমন রক্তাক্ত অবস্থায় কবিকে কাব্য রচনা করতে হয়েছে। গোবিন্দদাস স্বভাবকবি ছিলেন বলেই এত ধৈর্য্য এত উৎসাহ তার ছিল!

এবং সেই জন্যই কবির কাব্যে এত হতাশার সুর। যন্ত্রণার আর কান্নার সুর। 'অতুল" কবিতাটিতে কবি-হৃদয়ের এই কান্না যেন সহস্রধা হয়ে ছড়িয়ে আছে।

বুঝি এই জন্যই শ্মশানের রূপ বর্ণনায় কবির এমন ভয়ঙ্কর উল্লাস:

নয়নে কালাগ্নি ঢালি উন্মত্তা শ্মশান কালী
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মূর্তি তাড়কার
উঠিছে মেঘের কোলে বলাকা-উপালা,
ভৈরবীর কাল-কণ্ঠে মহাশঙ্খ মালা!
* * *
* * হাসে খল খল
মড়ার মাথার খুলি, বিকশিয়া দন্তগুলি,
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল!

অথবা 'রোগে অনাহারে বা স্বল্পাহারে জীবন্মৃত' কবির সাস্রু-নয়নে করুন বিলাপ:

ও ভাই বঙ্গ বাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?
আজ যে আমি উপোস্ করি না খেয়ে শুকায়ে মরি;
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌;
ও ভাই বঙ্গ বাসী আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?

গোবিন্দদাসের কাব্য ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করা এক কবি হৃদয়ের মর্মান্তিক হাহাকার! এক স্বভাব-জাত প্রতিভার অশ্রুজলে আবৃত খণ্ডিত সিদ্ধি।

গোবিন্দদাসের জীবন এবং সাহিত্য একই সুরে বাঁধা। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্পূর্ণ। কবির কাব্যালোচনা করতে গেলে তাই তার জীবনীর পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গোবিন্দদাস তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয় বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন নিজের জীবন অথবা জীবনের পারিপার্শ্বিক থেকে। পূর্ব বাঙ্গালার মাঠ ঘাট নদী প্রকৃতি তাঁর কাব্যে বিধৃত। কবি-পত্নী সারদা এবং প্রেমদা যেমন কবির লেখনীস্পর্শে অমরতা লাভ করেছেন—পূর্ববাঙ্গালার সহজ সরল অথচ অপূর্ব শোভাময়ী প্রকৃতিও তেমনি গোবিন্দ-কাব্যে অমর হয়ে ফুটে আছে।

প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় কবি যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন নিম্নলিখিত পঙক্তি কটি পাঠ করলেই তা বোঝা যায়:

বর্ষাকালে 'বোলাই' বিলে
শাপলা শালুক সুন্দী মিলে
কমল-বনে ফুটে উঠে কমলার সে হাসি!
ভারতী কি স্নেহের ভরে
বীনা রেখে কবির করে
পদ্ম-সরে হয়ে আছেন পদ্মবন বাসী!

অথবা পদ্মা নদীর বর্ণনা:

আজি এই পদ্মাতীরে নিরজনে সন্ধ্যাবেলা
ঝরিতেছে নয়নের জল
* * * *
হেরিতেছি নদী বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা
অবিশ্রান্ত পড়ে আছাড়িয়া
যেন লক্ষ সর্প শিশু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফনা তুলি
খেলা করে দুলিয়া দুলিয়া !

অথবা 'শ্মশানে নিশান' কবিতায় শ্রাবণ-সন্ধ্যার বর্ণনা :

শ্রাবণের শেষ দিন মেঘে অন্ধকার
দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার
উলঙ্গ—এলায়ে চুল হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুংকার !

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রকৃতি-বর্ণনা করতে বসেও কবি হাহাকারে আচ্ছন্ন নৈরাশ্যবাদের হাত এড়াতে পারেন নি। উপরোক্ত কবিতাগুলোর সর্বত্রই কবি-হৃদয়ের সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণার সুরটি স্পষ্ট ভাবে ফুটে আছে !

বর্ষাকালের 'বোলাই' বিলের সৌন্দর্য বর্ণনায় অথবা শ্রাবণ-সন্ধ্যার সঙ্গীত রচনায় কবি যে সকল উপমা প্রয়োগ করেছেন তা কত সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর ! এই সহজ সরলতাটুকুই কবি গোবিন্দদাসকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

সমাজের নানা অবিচার—ব্যভিচারের প্রতি কটাক্ষ করে গোবিন্দ-দাস বহু কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে "মগের মুলুক" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উৎকট সাহেবিয়ানার প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের মত তিনিও কটাক্ষ করে লিখেছিলেন :

কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম ?
* * * *
তোমার সে দিন নাই, কপালে পড়েছে ছাই
কামিনী কৌতুকে পরে 'ক্যানেঙ্গা' কুসুম !
লেভেণ্ডার ম্যাকেসার, সুইটু ব্রায়ার ওয়াটার,
পাওডার এসেন্সের মহা মরশুম !

'মগের মুলুক' ভাওয়াল রাজদরবারের কলঙ্কময় কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লেখা কাব্য-ইতিহাস ! কবির অন্যান্য কাব্যগুলোর মধ্যে প্রেম ও ফুল (১২৯৪ সন) কস্তুরী (১৩০২ সন) চন্দন (১৩০৩) এবং ফুলরেণু (১৩০৩) ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। 'ফুলরেণু' সনেট কবিতার সমষ্টি। কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ আজকাল প্রায় দুষ্প্রাপ্য। কয়েক বৎসর হ'ল 'গোবিন্দ-চয়নিকা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় কাব্যামোদীদের কিছুটা সুবিধা হয়েছে। কিন্তু কবির অনেক কবিতা আজো অপ্রকাশিত অবস্থায় বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়ানো রয়েছে।

এগুলো সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। সর্বশেষে গোবিন্দ-কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর যথার্থ স্থান নির্দ্ধারণ করাও আবশ্যক।

বাংলা ১৩২৫ সনের ১৩ আশ্বিন কবির মৃত্যু হয়। দেশবাসী কর্তৃক অবহেলিত, সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারে জর্জরিত ভাগ্যহীন এই কবি শ্রীমধুসূদনের মতই কপর্দকশূন্য অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ! সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় :

"ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেমনি করে মরে গেল কবি
চলে গেল মানস যাত্রী, প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে
হাওয়া শুধু করল হাহা আনমনে হায় সেই সমাচার লভি
দূরে বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠল নিমেষ-তরে"।

* (১) (২) (৩)—স্বভাব কবি গোবিন্দদাস—হেমচন্দ্র চক্রবর্তী।
(৪)—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন। ২য় খণ্ড দ্র।

ব্যবধান

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

মৃত্তিকার বক্ষ ভেদি তরু জন্ম নিল,
মাটি তারে রূপ, রস, গন্ধ সব দিল।
মাটি জড়াইয়া শিশু আছে সর্বক্ষণ,
মাটির নিকটে তার সারা প্রাণমন।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু পায় নব বল,
ছড়াইয়া পড়ে তার পুত্র, পুট, দল।

ক্রমে তরু বড় হয়, চাহে উর্দ্ধপানে···
আকাশ-বাতাস তার ভরি উঠে গানে।
শূন্য আঁকড়িয়া তরু চাহে চারিভিতে—
শরৎ, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বরষা ও শীতে।
ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে মাটির মমতা,
বক্ষে তার পায় স্থান কত পক্ষী, লতা !

একদিন দৃষ্টি তার পড়ে পদতল,
দেখে দূরে—একা মাটি, আঁখি ছলছল !

প্রাচীন স্মৃতি (ডারহাম্)

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন)

বিংশ শতাব্দী বিশ্বের বুকে যান্ত্রিকতার এক সাড়া জাগিয়েছে। বিজ্ঞানের অভিযান যেন আজ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। কত নগরী, সৌধ, রাজপথ তড়িতের অভ্যুদয়, নব নব বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। তার মাঝখানে কিছুদিন বাস করার পর ইংল্যাণ্ডের একটি প্রাচীন নগরীতে আশ্রয় জুটলো। নগরীর নাম ডারহাম—ইংরাজীতে Durhum—কেউ কেউ উচ্চারণ করেন "দুরহাম"। সত্যিই এই নগরীর নামের মধ্যেই যেন এই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে—সে আধুনিক সভ্যতা থেকে এখনও দূরে—তাই "দুরহাম্"।

ইংলণ্ডের উত্তর পূর্ব্বে একদিকে টাইন নদী, অপর দিকে টি। এই দুই নদীর সাথে মিতালী বজায় রেখে নেমে এসেছে উইয়ার নদী (Sunderland) সুন্দরল্যাণ্ডের শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই প্রকৃতির রাজ্য ডারহাম। ·· প্রাচীন এই নগরী—প্রায় এক হাজার বছর আগে নাকি এর পত্তন। এই নগরীর পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক অতীত ইতিহাস। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে যখন অরাজকতার বিভীষিকা তখন স্কটদের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ প্রতিহত করে ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করবার জন্যে (উইলিয়াম দি কনক্যারার) এই নির্জ্জন স্থানে একটি ক্যাসল (castle) নির্ম্মিত হয়েছিল। তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উইলিয়াম্ দি কনক্যারার। তারই পাশে গড়ে উঠেছে একটি ঐতিহাসিক ক্যাথিড্রাল, একদিকে সমরায়োজন—আর একদিকে অহিংসার বেদীমূল—অর্চ্চনার ক্ষেত্র। কত শতাব্দী অতীত হয়ে গেছে—কত বিপ্লবের বন্যা বয়ে গেছে দেশের উপর দিয়ে। কিন্তু সেই ক্যাসল ও ক্যাথিড্রাল আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

স্থানটি যেন পাহাড় দিয়ে ঘেরা অনেকটা দার্জ্জিলিং-এর মত—আর তাকে মধ্যমণির মত ঘিরে রেখেছে উইয়ার নদী। সত্যিই এ যেন রত্নহারের মত—তাই এর নামও সার্থক।

নদীর দুধারে পাহাড়ের কোল বেয়ে ছায়া ঘেরা বন্ধুর পথ। মাঝে মাঝে নদী সরু হয়ে পাথরের মাঝখানে পথ করে নিয়েছে। তাই স্থানে স্থানে কলোচ্ছ্বাস বনভূমিকে মুখর করে তুলেছে। আর তার বুকে সারি সারি নৌকা ভাসিয়ে দেয় কত প্রেমিক প্রেমিকা—বিদেশী যাযাবর। সব থেকে মনকে অভিভূত করে নদীর নির্জ্জন তটভূমি ও তার শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। সত্যিই যেন ভারতের তপোভূমি। কোথাও ছোট ছোট পাহাড়—কিন্তু কেউ রিক্ত নয়। অসংখ্য পাইন জাতীয় গাছ এখানে দেখা যায়। মাঝে মাঝে আপেল, ন্যাসপাতি গাছেরও সারি চলেছে। আর কোথাও বা এত ঝোপ ও লতাগুল্ম যে সূর্য্যের আলো

ব্রাইটনের সমুদ্রতীর

পর্য্যন্ত দিনের বেলা সেখানে প্রবেশ করে না। নদীর দুধারেই শহর—একদিকে প্রাচীন গৌরব আর একদিকে আধুনিক সমারোহ। এই ছোট্ট নদীটিকে খণ্ডিত করেছে মানুষ কতকগুলো সেতু দিয়ে। একটা সেতুর পাহাড়ের বুকে লেখা আছে স্যার ওয়াল্টার স্কটের ডারহাম্ সম্পর্কে একটি সুন্দর ভাষাচিত্র :—

"Grey towers of Durhum,
Yet well I love thy mixed and massive piles
Half church of God, half castle against the scot
And long to roam the venerable aisle,
With records stared by deeds long
since forgot."
—Sir Walter Scot

এই সুন্দর পরিবেশকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ছোট নগরী। আধুনিকতার জোয়ারও যে এখানে এসে পৌছায়নি তা নয়—তবে তার মাঝখানে এখনও জেগে রয়েছে সেই প্রাচীন স্বপ্নবেরা কাহিনী। উইয়ার নদীর মৌন সঙ্গীত মাঝে মাঝে ভেসে আসে। আর তার সাথে এই প্রাচীন গির্জ্জা ও ক্যাথিড্রালের ঘণ্টাধ্বনি মনে জাগায় এক অদ্ভুত ভাবাবেশ। মনে হয় এই ঘণ্টা কতকাল ধরে একই ভাবে বেজে আসছে। আরও কতকাল বাজবে। সে যেন তার চিরন্তন সত্যকে চিরকাল ঘোষণা করে চলে কালের প্রহরী হয়ে।

এপিংফরেষ্ট

শ্যামলের সমারোহ—মাঝখানে ধূসর পিঙ্গল চূড়া যেন মহাশূন্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সৃষ্টি কর্ত্তার রহস্যময় বাণীকে প্রচার করে চলেছে।

ক্যাথিড্রালের ভিতরে প্রবেশ করে মনে হয় কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসে পড়েছি। কিন্তু তখনকার দিনের যে সব কারুশিল্পের নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া যায়, তাতে এই সব শিল্পের পেছনে মানুষের অন্তরের স্পর্শ ও একনিষ্ঠ সাধনার সন্ধান পাওয়া যায়। তা' না হ'লে কি করে এত বিরাট অথচ সুন্দর সৃষ্টি সম্ভব হ'ল। সাধারণত ছাদ সমস্ত কাঠের তৈরী—চমৎকার কারুকার্য্য তার উপরে। কেবল, ক্যাথিড্রালের মাঝখানে অদ্ভুত খিলানের উপর সুন্দর কারুকার্য্য মণ্ডিত পাথরের ছাদ। এই ক্যাথিড্রালের পশ্চিমদিকে জেগে আছে সেন্ট ক্যাথবার্টের পুণ্য স্মৃতি। আরও অনেকের সমাধিস্থল পরে এই সুন্দর পরিবেশে রঙ্গীন গবাক্ষ পথ দিয়ে রচিত হয়েছে। সন্ধ্যার রক্তিম আভা তাদের উপর নেমে পড়ে—আর গীর্জ্জার সান্ধ্য ঘণ্টা যেন সুপ্তির গান শোনায়। বিশপদের প্রার্থনার স্থান চিহ্নিত রয়েছে এর মধ্যে—কোথাও বা প্রস্তর ফলকের উপর তাদের নাম লেখা।

Cathedralএর যেদিকে এই সমাধিস্থান ও পূতস্মৃতি সে দিকে পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি আসবার অধিকার পায়নি। তাই নীলপাথরের একটি সীমাচিহ্ন দিয়ে তাদের জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে হলের মাঝখানে। অবশ্য সে নিয়ম শিথিল হয়ে গেছে আজ এই নারী স্বাতন্ত্র্যের যুগে।

ক্যাথিড্রালের প্রাঙ্গণটি আরও চমৎকার। চারিদিকে বারান্দা মাঝখানে তৃণাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। তার কেন্দ্রে আবার বিশপদের স্নান ক'রবার জন্যে একটা ফোয়ারার ব্যবস্থা ছিল বোঝা যায়।

হলের চারিদিকে অঙ্কিত রয়েছে নানা স্মৃতি জড়িত ছবি কোথাও বা প্রস্তর ফলকে—কোথাও বা কাঁচের জানালায়। এরি মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্কটদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানের পর তৃতীয় এডওয়ার্ডের গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি। আর একখানি প্রাণময় চিত্র হ'ল হেষ্টিংস-এর যিনি পোলাণ্ড থেকে রাজনৈতিক অপরাধের জন্যে বিতাড়িত হয়ে মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত ডারহামে শান্তিময় জীবন যাপন ক'রেছিলেন।

কিন্তু কৌতূহল জাগে তাঁর আকৃতির বিবরণ দেখে—মাত্র তিন ফুট তিন ইঞ্চি ছিল তাঁর উচ্চতা—কিন্তু অশেষ গুণ সঞ্চিত ছিল এই ক্ষুদ্রাকৃতি পুরুষের মধ্যে। এইরূপ নানা স্মৃতি বহন করেছে এই ক্যাথিড্রাল। সেক্সপীয়ারের বিখ্যাত অভিনেতা কেম্বেলের সমাধিস্মৃতিও আঁকা রয়েছে এইখানে। কত আত্মার আনন্দ বেদনার উচ্ছ্বাস ও দীর্ঘশ্বাস যেন এই প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে।

ক্যাথিড্রালের উত্তর দিকে রয়েছে স্কটদের বিরুদ্ধে বিরাট দুর্গ বা ক্যাসল্। কিন্তু আজ এই দুর্গে আর সৈন্য থাকে না। সেখানে স্থান পেয়েছে বাণীর অর্চ্চনা। তাই অধিকাংশ স্থান ও গৃহ জুড়ে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, ছাত্রবাস প্রভৃতি বিরাজ কর্চ্ছে। সত্যিই কালের কি বিচিত্র লীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠান্‌দির সহিত গ্রামের কাহারও রক্তের সম্পর্ক ছিল না, পণ্ডিত মহাশয়ের সহিতও না। সন্তোষের মা বলিতেন গ্রামে মধু চাটুজ্যে বলিয়া কে একজন ছিলেন তিনিই ঠানদিকে বহুকাল পূর্ব্বে বৃন্দাবন হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ঠানদি নাকি তাঁহার ধর্ম্ম-ভগ্নী ছিলেন। বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট তাঁহারা উভয়েই দীক্ষা লন। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যে মৃত্যুকালে তাঁহার কয়েক বিঘা ধানের জমি এবং গ্রামের প্রান্তে ওই জায়গাটুকু ঠানদিকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। চাটুজ্যে-পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ছিল, তাহা তিনি কাহাকেও দেন নাই। সেই জমির উপরেই পরে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ স্থাপিত হয়। মধু চাটুজ্যের তিনকুলে কেহ ছিল না। এটুকুও তিনি ঠানদিকে দিয়া যাইতে পারিতেন। দিয়া যান নাই তাহার কারণ তিনি সম্ভবত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে ঠানদি শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারিবেন না। পাড়ার লোকেরা এই অজ্ঞাতকুলশীলাকে সুচক্ষে দেখিবে না। বাহিরের একটি স্ত্রীলোক মধু চাটুজ্যের সমস্ত বিষয়টা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে ইহা সহ্য করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইবে। আর একটা কথাও তাঁহার বোধ হয় মনে হইয়াছিল। ঠানদি যদি বাস করিতে না পারিয়া ভিটাটুকু অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দেন এবং সে লোকটিও যদি পাড়ার অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেটাও ঠিক হইবে না। সম্ভবত এই সব ভাবিয়া পাড়ার পাঁচজনের বিচারবুদ্ধির উপরই তিনি ভিটাটুকুর ভার দিয়া গিয়াছিলেন। গোলক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ঠানদির ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল এক অদ্ভুত ঘটনার ফলে। গোলক পণ্ডিতের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও গ্রামে। শিবরাম গাঙ্গুলীর রাধাশ্যাম বিগ্রহের পূজারী হইয়া তিনি প্রথমে শঙ্করা গ্রামে আসেন। শিবরাম গাঙ্গুলীর বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্বশুরের অর্থে এবং আগ্রহেই তিনি রাধাশ্যাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনিই গোলক পণ্ডিতকে পূজারী নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শিবরাম এবং তৎপত্নী বিন্ধ্যবাসিনী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গোলক পণ্ডিতের পূজারীপদ অটল ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকমলের সহিত গোলক পণ্ডিতের খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। কৃষ্ণ-কমল অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং পঞ্জিকা মানিয়া চলিতেন। গ্রামের দলাদলি এবং ঘোঁটেরও প্রধান পাণ্ডা ছিলেন তিনি। তিনি যখন মালিক হইলেন তখনই ঠানদি মধু চাটুজ্যের বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া শঙ্করা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। শুরু করিবামাত্র অনেকেরই বিষ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তিনি, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণকমলের অভিসন্ধি ছিল যে নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যের বিষয়টি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনিই ক্রমশ হস্তগত করিয়া ফেলিবেন। অসম্ভবও হইত না, কারণ ঠিক তাঁহার জমির পাশেই মধু চাটুজ্যের জমি, আল ক্রমশ সরাইয়া লইলে কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু মধু চাটুজ্যের উইল বাহির হইতেই সব গোলমাল হইয়া গেল। ঠানদির উপর তিনি জাত-ক্রোধ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে ধমক দিয়া এবং ভয়

দেখাইয়া ঠানদিকে গ্রাম ছাড়া করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন ঠানদি অত সহজে হটিবার পাত্রী নন, বেশ প্রতাপশালিনী। আইনও তাঁহার স্বপক্ষে ছিল। তিনি একেবারে সোজা চলিয়া গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেটটি ছিলেন একটি সদ্য-পাশ-করা ছোকরা সাহেব। অবলাদের প্রতি সাহেবদের সৌজন্য সুবিদিত। তিনি নিজে আসিয়া সব অনুসন্ধান করিলেন এবং ঠানদিকে অভয় দিয়া গেলেন। কৃষ্ণকমলকে অনুভব করিতে হইল আইনের দিক দিয়া সুবিধা হইবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কোপদৃষ্টিতে পড়া সমীচীনও নয়। তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। গ্রামের দলাদলির দলপতি ছিলেন তিনি। তাঁহার প্ররোচনায় গ্রামের লোকেরা ঠানদিকে একঘরে করিল। সিদ্ধান্তটা গোপনই ছিল, ঠানদি প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে অবশ্য বেশী বিলম্ব হইল না। কিছুদিন পরেই যখন তিনি তাঁহার গুরুদেবের জন্মদিনে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া গ্রামের লোকজনদের নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন এক গোলক পণ্ডিত ছাড়া আর কেহ খাইতে আসিল না, তখন ঠানদি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কৃষ্ণকমল গোলক পণ্ডিতকেও যাইতে বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু গোলক পণ্ডিত তাঁহার বারণ শোনেন নাই। স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন তিনি। এইজন্য তাহার চাকুরিটি গেল। কৃষ্ণকমল তাঁহাকে পূজারীপদ হইতে অপসৃত করিয়া অন্য লোক বাহাল করিলেন। গোলক পণ্ডিত দেশেই ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু ঠানদি তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমি আমার বাড়ির পাশে তোমাকে একটুকরো জমি দিচ্ছি, তুমি তার উপর একটা দোকান কর, মাথা গোঁজবার জায়গাও কর একটা। মুখপোড়াদের হুমকিতে পালিয়ে যাবে কেন পুরুষ মানুষ হ'য়ে! এটা কি মগের মুলুক না কি। তুমি বিয়ে থা কর নি, সংসারের ঝঞ্ঝাট নেই, তোমার একটা পেট চলে' যাবেই। এখানেই থাক।" গোলক পণ্ডিত থাকিয়া গেলেন। গ্রামের লোকেরা ঠানদির পুকুরও বন্ধ করিয়াছিল। ঠানদি তাহাতেও দমেন নাই। তাঁহার কিছু গহনা ছিল, সেই গহনা বিক্রয় করিয়া তিনি নিজের উঠানে পাকা ইঁদারা করাইয়া লইলেন। যতদিন সে ইঁদারা না হইল ততদিন তিনি তিন-ক্রোশ-দূরবর্তী একটি নদী হইতে জল আনাইতেন, এজন্য তিনি একজন বাঁকী (যাহারা বাঁকে করিয়া জল বহন করে) মাহিনা দিয়া বাহাল করিয়াছিলেন। আমার জন্মের বহুপূর্ব্বে এসব ঘটনা ঘটিয়াছিল। অনেক বড় হইয়া আমি এসব কাহিনী শুনিয়াছি। আমার শৈশবে যখন আমি ঠানদি এবং গোলক পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলাম তখন তাঁহাদের সহিত গ্রামের লোকের যে এত বিরোধিতা আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিরোধিতার পরিবর্ত্তে হৃদ্যতাই বরং লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার জন্মের পূর্ব্বেই কৃষ্ণকমল মারা গিয়াছিলেন। এখন আমার মনে হয় তাঁহার বাগানের তরিতরকারির জোরেই ঠানদি সকলের সঙ্গে পুনরায় ভাব জমাইয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের তরিতরকারি যে সকলেই সানন্দে লইত ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। কৃষ্ণকমল বাঁচিয়া থাকিলে এটা সম্ভব হইত কি না জানি না। কিন্তু তিনি ঠানদির সম্বন্ধে যে অপপ্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ফল বীভৎসভাবে ফলিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর। আমি শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর ঠানদি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। গোলক পণ্ডিতও। আমি যখন ঠানদির মৃত্যুসংবাদ পাই তখন আমি কলিকাতায় পড়িতেছি। ভয়াবহ সে সংবাদ। গ্রামের একটি লোকও না কি ঠানদির মড়া তুলিতে আসে নাই। মড়া তিন দিন পড়িয়াছিল। গোকুল পণ্ডিত অনেকের পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়া অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আসে নাই। চতুর্থ দিনে দেখা গেল ঠানদির ঘরের চালে শকুনি বসিয়াছে। গোকুল পণ্ডিত তখন অগত্যা যাহা করিলেন তাহা খুবই দৃষ্টিকটু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। তিনি ঠানদির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া একাই তাহাকে টানিতে টানিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন। ঠানদির জমির এক ভাগীদার চাষী ছিল, বৃদ্ধ নিয়ামত আলী। সেই কেবল লাঠী উচাইয়া শকুনি এবং কুকুর তাড়াইতে তাড়াইতে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। নিয়ামত আলীর সহায়তায় গোকুল পণ্ডিত ঠানদিকে দাহ করেন। ঠানদি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গোকুল পণ্ডিতকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঠানদির মৃত্যুর পর গোকুল পণ্ডিত আর শঙ্করা গ্রামে থাকেন নাই। তিনি ঠানদির সমস্ত সম্পত্তি নিয়ামত

আলীকে দান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নিয়ামত আলীর সন্তান-সন্ততিরা কিছুদিন আসিয়া ঠানদির ভিটাতে বাসও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে নাই, ঠানদির প্রেতাত্মার ভয়ে শেষে তাহারা পলাইয়া গেল। রাত্রে তো বটেই, দিনে দুপুরেও তাহারা নাকি ঠানদিকে দেখিতে পাইত, বিশেষ করিয়া তাঁহার সেই কুল-গাছটার আশে-পাশে।"

কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। বাড়ির দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সমস্তটা তাহাদের। জমিতে অনেক ফসল ফলিয়াছে, চারিদিক সবুজে সবুজ। যমুনা মনের আনন্দে একটা ক্ষেতের যব গম নিঃশেষ করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার নাক হইতে ফোঁস ফোঁস করিয়া শব্দও বাহির হইতেছে, কিন্তু কুমারের এসব দিকে লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইতেছিল সত্যই কি ভূত আছে? মা কি কোথাও বাঁচিয়া আছেন? মুক্তি মোক্ষ এসব কি ধরণের অবস্থা! আমাদের কথা মায়ের কি আর একটুও মনে নাই? বাবার কথাও না? এ চিন্তা কিন্তু কুমারের মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। রাধানাথ গোপ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমি আমার ঘর থেকে মণ দুই চিঁড়ে আনতে বলে' দিয়েছিলাম। সেটা এসে পৌঁছেচে। কোথাও রাখিয়ে দাও। কত লোক আসবে তো, 'রেডিমেড' খাবার কিছু থাকা ভাল। রামধনিয়ার গোলাতে ভাল গুড় আছে, আনিয়ে রেখে দাও কিছু—"

দুইটি বস্তা মাথায় করিয়া দুইজন মজুরিনী আসিয়া পড়িল। একজন কুমারকে দেখিয়া মৃদু হাসিল। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহ উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। বহুদিন পূর্ব্বে তাহার স্বামী এখানে কাজ করিত। সে-ও জমিতে জন খাটিতে আসিত। তখন কুমার ছয় সাত বছরের শিশু, এখন কত বড়টি হইয়াছে। চলিত হিন্দীতে এই কথাগুলি বলিয়া সে উঠানের দিকে চলিয়া গেল। এ বাড়ির সব তাহার চেনা। দ্বিতীয় মজুরনীটি অনুসরণ করিল তাহার।

"ওগুলো রাখিয়ে দাও, তাহলে। আমি চললুম। দেখো যেন ড্যাম্প না লাগে"

রাধানাথ গোপ আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিলেন। কুমার ইতস্তত করিয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল অবশেষে। "ওর দামটা কি এখনিই দিয়ে দেব"

"ওর দাম অনেকদিন আগেই পেয়ে গেছি। তোমার বাবা দিয়েছেন। এইখানে জমা আছে"—বলিয়া তিনি বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন। তাহার পর ধমকের সুরে বলিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার হিসাব তুমি করতে যেও না। সে অঙ্ক তুমি কষতে পারবে না, যদিও তোমার ম্যাথামেটিক্‌সে অনার্স ছিল—"

খানিকক্ষণ কুমারের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। কুমারও ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটা চাকরকে ডাকিয়া চিঁড়ার বস্তা দুইটি ভাঁড়ার ঘরে মাচার উপর রাখিয়া দিতে বলিল।

···মজুরনীটি খিড়কির পাশে কুমারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কুমার কাছে আসিতেই তাহার মুখে মাথায় চিবুকে হাত বুলাইয়া আদর করিল। তাহার পর ডাক্তারবাবুর অসুখের কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভাই বোনদের খবর দেওয়া হইয়াছে কি না, কবে তাহারা আসিবে, সমস্ত জানিয়া লইল সে। তাহার পর ম্লান হাসিয়া যাহা বলিল, "তোদের দেখেই আমার আনন্দ। আমি নিজে তো হতভাগী, স্বামী নেই, একমাত্র ছেলে কয়লা সবে জোয়ান হয়ে উঠছিল, গতবার কলেরায় সে-ও গেল। রাধাবাবুর কাছে কিছু ধার আছে, খেটে খেটে সেইটেই উশুল করছি এখন—"

কুমার উর্ম্মিলাকে ডাকিয়া বলিল—"এদের কিছু খেতে দাও"

"আচ্ছা—"

মজুরনী দুইজন বারান্দায় উঠিয়া দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের ডাক্তারবাবুকে দেখিতে লাগিল। কয়লার মায়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কুমার আবার গিয়া ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়াছিল। ডায়েরিখানা আবার পড়িতে শুরু করিয়াছিল সে।

"···আজ শেষ বয়সে শঙ্করা গ্রামে অতিবাহিত আমার সেই শৈশব জীবনের কথা স্মরণ করিতে গিয়া আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে, সেটি গ্রামের পূজা

পার্ব্বণের কথা, সেই বারো মাসে তের পার্ব্বণের কথা। বৈশাখের নববর্ষ হইতে শুরু করিয়া অক্ষয় তৃতীয়া, গন্ধেশ্বরী পূজা, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ব্রত, জামাই ষষ্ঠী, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথ, নীলষষ্ঠী, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা দুর্গোৎসব, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, চড়ক প্রভৃতি বড় বড় উৎসব তো ছিলই তাছাড়া সীতানবমী, লুণ্ঠনষষ্ঠী, উমা চতুর্থী, নাগপঞ্চমী, দুর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, সত্যনারায়ণ পূজা, ললিতা সপ্তমী, পুণ্যিপুকুর প্রভৃতি ছোট ছোট উৎসবেও আমাদের বাল্যজীবন হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, মুসলমানদের উৎসবও, বিশেষ করিয়া মহরম। মহরমের সেই রঙীন পতাকার সারি, রঙীন কাগজ আর রাংতায় তৈরি মন্দিরের মতো একাণ্ড 'তাজিয়া', মনুষ্যবেশী ঘোড়ারা, তাহাদের লাঠি-খেলা, তরোয়াল-খেলা, তাহাদের হাসেন-হোসেন চীৎকারে আমাদের মনে এক অবর্ণনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। মহরমের মেলার ভীড়ে আমি তো একবার হারাইয়াই গিয়াছিলাম। ফরিদ নামে আমাদের এক প্রজা আমাকে রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরাইয়া আনে। মনে পড়িতেছে সে সমস্তক্ষণ আমাকে কাঁধে লইয়া লাঠি-খেলা প্রভৃতি দেখাইয়াছিল। রাত্রে সে যখন আমাকে লইয়া ফিরিল তখন বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। ··

ক্রমশঃ

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার

শ্রীজোতির্ম্ময় সেন এম-এসসি, এল-এল-বি

স্বাধীন মত প্রকাশ

ভারতীয় নাগরিকগণের স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের জন্যে অনেক রকম অধিকার আছে। ঐ সকল অধিকার মধ্যে কতকগুলি অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সংবিধানে যে সকল অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ঐ সকল অধিকারকে কোনও প্রকারে খর্ব্ব করার বা লোপ করার কোনও অধিকার সরকারের নাই। কোনও সরকারের কোনও আইন এই সকল অধিকারকে খর্ব্ব করিতে বা এই সকল অধিকারের উপর কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করিলে ঐ সকল বিধি বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা কাহারও প্রতি প্রযোজ্য বা বাধ্যকর হইবে না। মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতীয় নাগরিকগণের জন্য যে সকল অধিকার আছে ঐ সকল অধিকার সম্বন্ধে সরকার যে কোন প্রকার আইন করিতে পারেন ও সকল অধিকার খর্ব্ব করিতে পারেন, ঐ আইন বা সরকারের ঐরূপ আইন-সঙ্গতকার্য্য প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি বাধ্যকর হইবে।

ভারতীয় নাগরিকের স্বাধীনভাবে তাহার বক্তব্য বলার ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার অধিকার ভারতীয় সংবিধানের বর্ণিত একটি মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ১৯(১) ধারায় এই অধিকার একটি মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

বস্তুতঃ যে রাষ্ট্রের নাগরিকের স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার অধিকার নাই, ঐ রাষ্ট্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইতে পারে না এবং স্বাধীন জনমতের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা থাকে।

যাহা হউক, স্বাধীনভাবে বক্তব্য বলার ও মতামত প্রকাশ করার মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ এই মৌলিক অধিকার কেবল ভারতীয় নাগরিকগণের অধিকার। কোন বিদেশী নাগরিক এই অধিকার দাবী করিতে পারেন না অর্থাৎ কোন বিদেশী নাগরিকের মতামত ব্যক্ত সম্বন্ধে সরকার কোনও বিধি-নিষেধ আরোপিত করিয়া কোন আইন প্রণয়ন করিলে তদসম্বন্ধে কোন আপত্তি করা যাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ এই মৌলিক অধিকার ভারতের স্বাধীন নাগরিকগণই মাত্র দাবী করিতে পারেন। কোনও অপরাধের জন্য যাহার কারাদণ্ড হইয়াছে বা অন্য কারণে যাহাকে কারাবাস বা অন্তরীনবাস করিতে হইতেছে ঐরূপ ভারতীয় নাগরিক এই মৌলিক অধিকার দাবী করিতে পারেন না।

প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের যেরূপ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আছে ঐরূপ প্রত্যেক নাগরিকেরই অপর কতকগুলি অধিকার আছে। কোনও নাগরিক তাহার এই অধিকার প্রয়োগ করিতে যাইয়া অপর কোনও নাগরিকের স্বাধীন জীবন যাপনের অন্য কোনও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন নাগরিকের অধিকারের বিরোধ দূর করার জন্য ও এই সংঘর্ষের সামঞ্জস্য করার জন্য সংবিধানের ১৯(১) ধারায় স্বাধীনভাবে বক্তব্য বলার ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের যে মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে ১৯(২) ধারাতে উহার কিছু ব্যতিক্রম বিধিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ ১৯(২) ধারার লিখিত ক্ষেত্রে এবং ঐ ধারার লিখিত সর্ত্তাধীনে সরকার এই মৌলিক অধিকার খর্ব্ব করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারেন।

১৯(২) ধারায় সরকারকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অপর রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব, সাধারণের শৃঙ্খলা, শালীনতা রক্ষা, আদালতের অবমানা, মানহানি, ও কোনও অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দান প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অবাধ অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে সরকার কর্ত্তৃক আরোপিত কোন বাধা অযৌক্তিক হইলে তাহা বৈধ হইবে না। সরকার কর্ত্তৃক আরোপিত বাধা যৌক্তিক কিনা তাহা নিরূপণ করার ভার বিচারালয়ের উপর দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং সর্ব্বোপরি সুপ্রীমকোর্ট এইরূপে সরকার কর্ত্তৃক আরোপিত যে সকল বাধাকে অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিবেন,তাহা বিধিবহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯(২) ধারায় সরকারকে যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন দ্বারা স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকারকে যুক্তিযুক্ত ভাবে ক্ষুণ্ণ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ বিষয়েই আমাদের দেশে বিভিন্ন আইনে নানারূপ বিধান আছে। এই সকল বিধান মধ্যে কোন কোন বিধান হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্ট কর্ত্তৃক ১৯(১) ও (২) ধারায় মানদণ্ডে পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন বিধান সংবিধানের বিধিবহির্ভূত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, কোন কোন বিধান ঐ মানদণ্ডে বৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এখনও ঐরূপ অনেক বিধান ১৯ ধারার মানদণ্ডে পরীক্ষা করার সুযোগ হাইকোর্টের বা সুপ্রীমকোর্টের হয় নাই। এইভাবে পরীক্ষিত হইলে হয়ত সকল বিধান মধ্যেও অনেকগুলি বিধিবহির্ভূত বলিয়া ধার্য্য হইবে।

এ পর্য্যন্ত এইরূপ যে সকল বিধান ১৯ ধারার মানদণ্ডে পরীক্ষিত হইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া গেল।

অবাধে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি প্রধান অধিকার। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যতীত কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত বা পুষ্ট হইতে পারে না। কোন কোন দেশের সংবিধানে, যেমন আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড, জাপান চেকোশ্লোভাকিয়া, পশ্চিম জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের সংবিধানে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে এ বিষয়ে কোন পৃথক উল্লেখ নাই। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের যে অবাধ অধিকার আছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও ঐ স্বাধীনতার অন্তর্গত। যে সব কারণে ও যে সব অবস্থায় ও প্রয়োজনে ভারতের নাগরিকগণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার খর্ব্ব বা ক্ষুণ্ণ করা যায় ঠিক সেই সব কারণে ও প্রয়োজনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও খর্ব্ব করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের দুইটি বিচারের উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে বিষয়টি কতকটা পরিষ্কার হইবে।

১৯৪৯ সনের পূর্ব্ব পাঞ্জাব পাব্লিক সেফ্‌টি আইনের ৭ (১) গ ধারার ক্ষমতা বলে দিল্লীর চিফ কমিশনার বিগত ১৯৫০ সনের ২রা মার্চ্চ তারিখে দিল্লী হইতে প্রকাশিত "জনসঙ্ঘে"র মুখপত্র "অরগানাইজার"এর প্রকাশক ও সম্পাদকের উপর এক আদেশ জারী করেন যে উক্ত সংবাদপত্রে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে যে সকল সংবাদ বা অন্যান্য বিষয় বা পাকিস্তান সম্বন্ধে যে মত প্রকাশিত হইবে তাহা প্রকাশ করার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দিল্লীর প্রেস অফিসার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।

"অর্গানাইজার" এর প্রকাশক শ্রীব্রীজভূষণ ও সম্পাদক শ্রীকে, আর মালকানী যে আইনের বলে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১) ধারার বিধি বহির্ভূত বলিয়া আপত্তি করেন ও সুপ্রীম কোর্টে উক্ত আদেশ রহিত করার জন্য সংবিধানের ৩২ ধারার বিধান মত প্রার্থনা করেন। সুপ্রীমকোর্টের ছয়জন বিচারপতির নিকট এই আবেদনের বিচার হয়, তন্মধ্যে পাঁচ জন বিচারপতি সাব্যস্ত করেন যে, যে আইন বলে উক্ত আদেশ দেওয়া হইয়াছিল ঐ আইন সংবিধানের ১৯(১) ধারার বিধি বহির্ভূত এবং ১৯৫০ সনের ২৬শে মে তারিখে উক্ত আদেশ রহিত করিয়া দেন। একমাত্র বিচারপতি ফজল আলি উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় মোকদ্দমার বিচারও ঐ ছয়জন বিচারপতির নিকট হয় এবং তাহারাও ঐ ১৯৫০ সনের ২৬শে মে তারিখে তাহাদের রায় দেন, এ মোকদ্দমায়ও বিচারপতি ফজল আলি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন।

এই মোকদ্দমার প্রার্থী শ্রীরমেশ থাপার বোম্বাইতে "ক্রস্ রোডস্" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক। বিগত ১৯৫০ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে মাদ্রাজ সরকার ১৯৪৯ সনের Madras Maintenance of Public order আইনের ৯(১) এ ধারার ক্ষমতা বলে আদেশ দিয়া উক্ত সাপ্তাহিক পত্র "ক্রস্ রোডস্"এর মাদ্রাজ প্রদেশে প্রবেশ, বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীরমেশ থাপার সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন যে, যে আইন বলে ঐ আদেশ দেওয়া হইয়াছে ঐ আইন সংবিধানের ১৯(১) ধারার বিধি বহির্ভূত। ছয়জন বিচারপতি মধ্যে ৫ জন একমত হইয়া ঐ আইন সংবিধানের বিধিবহির্ভূত বলিয়া ধার্য্য করেন এবং মাদ্রাজ সরকারের ঐ আদেশ রহিত করিয়া দেন।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত হইবে, দেশে শান্তির সময় যে আইন অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তাহাই হয়ত যুদ্ধের সময় বা দেশের সঙ্কটজনক অবস্থায় যৌক্তিক বলিয়া আদালতের বিচারে ধার্য্য হইতে পারে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর সরকারের হস্তক্ষেপ করার আরেকটি উপায় ছিল মুদ্রালয়ের পরিচালকের নিকট জামিন তলব করা। ১৯৩১ সনের ভারতীয় প্রেস (এমার্জিন্সী ক্ষমতা) আইন অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫০ সনের ভারতীয় সংবিধান প্রচলিত হওয়ার পর ও কয়েক ক্ষেত্রে ১৯৩১ সনের আইন বলে মুদ্রালয়ের পরিচালকের নিকট জামিন তলব করা হয় কিন্তু বিভিন্ন হাইকোর্টের বিচারে ১৯৩১ সনের ঐ আইন বিধি বহির্ভূত বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী পুরুলিয়াতে "ভারতীপ্রেস" নামে একটি প্রেস পরিচালনা করেন। ঐ প্রেসে ১৯৪৯ সনে "সংগ্রাম" নামে একটি বাংলা পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। ১৯৪৯ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর মানভুম জেলার ডিপুটি কমিশনার শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর নিকট উক্ত পুস্তিকা মুদ্রণ করার

অপরাধে ১৯শে সেপ্টেম্বর মধ্যে ২০০০৲ জামিন তলব করেন। শ্রীমতী শৈলবালা দেবী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। পাটনা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি সরযু-প্রসাদ সিদ্ধান্ত করেন যে ১৯৫০ সনে ভারতীয় সংবিধান প্রচলিত হওয়ার পর ১৯৩১ সনের ভারতীয় প্রেস আইন বিধি বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিচারপতি মানভুমের ডিপুটী কমিশনারের উক্ত আদেশ রহিত করিয়া দেন।

শ্রীমতী পাটাম্মল আরতগুণম মাদ্রাস সহরের পেরাম্বুর অঞ্চলে ১২০নং পেপার মিলস্ রোডে "নেহরু প্রেস" নামে একটি প্রেসের পরিচালিকা হিসাবে মাদ্রাজের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে ১৯৫০ সনের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে এক বিবৃতি দাখিল করেন। বিগত ১৩।২।৫০ তারিখে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেসের উক্ত পরিচালিকাকে ১০ দিন মধ্যে ১০০০৲ টাকা জামিন দাখিল করার আদেশ দেন। শ্রীমতী আরতগুণম উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে এক আবেদন করেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজামানার ১৯৩১ সনের ভারতীয় প্রেস আইন বিধি বহির্ভূত ধার্য্য করেন এবং প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের জামিনের আদেশ রহিত করিয়া দেন।

অতঃপর ১৯৫১ সালে ১৯৩১ সনের ভারতীয় প্রেস আইন, আইন করিয়া বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৫১ সনের প্রেস আইন অনুসারে কোন প্রেসে কোন আপত্তিজনক বিষয় মুদ্রিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রেসের পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিতে পারেন এবং আদালতের বিচারক বিচারের পর উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিচালকের নিকট জামিন তলব করিতে পারেন। আদালতে জামিন তলবের আদেশের বিরুদ্ধে ১৯৫১ সনের আইনে হাইকোর্টে আপীল করার বিধান আছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিচার সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে ভারতীয় সংবিধানে স্বাধীন মত প্রকাশের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল নাগরিকের নিজের মত প্রকাশের অধিকারে সীমাবদ্ধ না প্রত্যেক নাগরিকের অপরের মতও বিনা বাধায় প্রকাশ করার অধিকার আছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টে শ্রীনিবাস ভাটের মোকদ্দমায় বিচারপতিগণ দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় সিদ্ধান্ত করেন যে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের যে অধিকার ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল তাহার নিজের মত প্রকাশের অধিকারে সীমাবদ্ধ নহে, প্রত্যেক নাগরিকেরই অপরের মতও স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করার অধিকার আছে।

বর্ত্তমান যুগে মত প্রকাশের একটি প্রধান অবলম্বন ছায়াচিত্র, ছায়াচিত্রে যাহাতে অবাঞ্ছিত চিত্র প্রদর্শিত না হইতে পারে তজ্জন্য ১৯৫২ সনে ভারতীয় ছায়াচিত্র আইন অনুসারে একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ড পরীক্ষা করিয়া ছায়াচিত্রটি ভারতে প্রদর্শনের যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট না দিলে ঐ ছায়াচিত্রটি ভারতে প্রদর্শিত হইতে পারে না। এই পরীক্ষা করার বিধান ভারতীয় সংবিধানের বিধিবহির্ভূত কিনা তাহা এখনও আদালতের মানদণ্ডে বিচারিত হয় নাই।

এই সম্পর্কে একটি অভিনব মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করা যায়। শ্রীযুত শেমাদ্রী তাঞ্জোর জিলার খিরুথুমাইপুডি নামক পল্লীতে শ্রীব্রহ্মযাকী টকিস্ নামে একটি সিনেমা হলের মালিক। তাহাকে এই সিনেমা হলের জন্য ১৯৫০ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১ বৎসর ম্যাদে ১৯১৮ সনের ছায়াচিত্র আইন অনুসারে তাঞ্জোরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে লাইসেন্স দেন তাহাতে একটি সর্ত্ত দেওয়া হয় যে ঐ সিনেমা হলে প্রতিটি প্রদর্শনীর প্রথমে অন্ততঃ ২০০০ ফুট পরিমিত সরকারের "অনুমোদিত" ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। শ্রীযুত শেমাদ্রী এই আদেশের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি আবেদন করিয়া আপত্তি করেন যে এই আদেশ ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারায় স্বাধীন মত প্রকাশের ও স্বাধীন ব্যবসা করার যে মৌলিক অধিকার প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে দেওয়া হইয়াছে তাহার বিরোধী হইয়াছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টে তাহার আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তাহার বিরুদ্ধে শ্রীযুত শেমাদ্রী সুপ্রীমকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি গোলাম হোসেন রায় দেন যে তাঞ্জোরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট লাইসেন্সে যে সর্ত্ত যোগ করিয়াছেন তাহা সংবিধানের ১৯ ধারার স্বাধীন ব্যবসা পরিচালনার মৌলিক অধিকারের বিরোধী এবং ঐ আদেশ সংবিধানের বিধিবহির্ভূত। এই আদেশ স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারেরও বিরোধী কিনা সে বিষয়ে বিচারপতি কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

ভারতীয় নাগরিকের স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার বলে, মত প্রকাশের যত প্রকারের উপায় আছে তাহার যে কোন উপায়ে এই মত প্রকাশের অধিকার ভারতীয় নাগরিকের আছে, সে কথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সংবাদপত্র যোগে বা ছায়াচিত্র যোগে মত প্রকাশিত হইলে যাহার ইচ্ছা হয় তিনি ঐ সংবাদপত্র পড়িবেন বা ঐ চিত্র দেখিবেন, যাহার ইচ্ছা না হয় তিনি ঐ সংবাদপত্র পড়িবেন না বা ঐ চিত্র দেখিবেন না এবং ঐ সংবাদপত্রে বা চিত্রে প্রকাশিত মত জ্ঞাত হইবেন না। কিন্তু মত প্রকাশের কোন কোন উপায় আছে যাহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও ঐ মত শুনিতে বা অবগত হইতে হয়। তাহাতে অপর নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ইচ্ছামত জীবন নির্ব্বাহের যে মৌলিক অধিকার আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয়। মৌলিক অধিকারের এই বিরোধ প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিচারপতির মীমাংসা করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে "লাউড স্পীকারের" কথা আলোচনা করা যায়। আধুনিক কালে লাউড স্পিকার যোগে মত প্রকাশ সামাজিক জীবনে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বক্তৃতার সময়, গীত বাদ্যাদির সময় সরকারী কার্য্যে সর্ব্বত্রই আজকাল লাউড স্পীকার ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুত একজন খ্যাতনামা আমেরিকান জজ বলিয়াছেন যে লাউড স্পীকার যোগে মত প্রকাশের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিলে নাগরিকের একটি মূল অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। যাহা হউক এ বিষয়ে আমাদের দেশে এখনও বিশদ বিবেচনা হয় নাই। কলিকাতা হাইকোর্টে সম্প্রতি একটি মোকদ্দমায় লাউড স্পীকার বিষয় কিছুটা আলোচিত হইয়াছে।

সেক মঃ আলম কলিকাতা ৩৮।এ ব্র্যাবোর্ণ রোডে যুগীহাটা মসজিদে দৈনিক নমাজ পড়েন। কলিকাতা নাখোদা মসজিদ ও কলুটোলা মসজিদে দৈনিক পাঁচ বার নমাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানাইয়া লাউড স্পীকার যোগে আজান দেওয়া হয়। মুর্গীহাটা মসজিদেও ঐরূপ লাউড স্পীকার যোগে দৈনিক পাঁচ বার আজান দেওয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহাতে কোন কোন স্থানীয় অধিবাসী আপত্তি করায় কলিকাতার পুলিশ কমিশনার থানার দারোগা যোগে লাউড স্পীকার দ্বারা আজান দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তৎপর ঐ মসজিদে নমাজ পড়েন এমন কয়েকজন মুসলমান মুর্গীহাটা মসজিদের মুতোয়ালী যোগেও পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর যোগে পুলিশ কমিশনার নিকট লাউড স্পীকার যোগে আজান দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু পুলিশ কমিশনার বিগত ১৯৫৩ সনের ১২ই নভেম্বর ঐ অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। পুলিশ কমিশনারের এই আদেশের বিরুদ্ধে সেক মঃ আলম কলিকাতা হাইকোর্টে এক আবেদন করেন, বিচারপতি বাছাউত এই আবেদন মূলে পুলিশ কমিশনার প্রতি কারণ দর্শানের এক নোটিশ দেন, পরে বিচারপতি সিংহের নিকট এই আবেদনের বিচার হয়! বিচারপতি সিংহ সিদ্ধান্ত করেন যে পুলিশ কমিশনারের এই আদেশ রদ করার কোন কারণ বা প্রয়োজন নাই। লাউড স্পীকার যোগে মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের সীমা কোথায় সে বিষয়ে এই মোকদ্দমায় বিচার হয় নাই, বস্তুত পুলিশ কর্তৃপক্ষের উপর এই সীমা নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া হইলে এই ক্ষমতার গুরুতর অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা নাই, একথা বলা যায় না। সুতরাং মনে হয় এ বিষয়ে এখনও বিচারালয়ের চূড়ান্ত মত পাওয়া যায় নাই।

ভারতীয় সংবিধানে বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের বিধান আছে। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল মৌলিক অধিকার মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন মৌলিক অধিকারটি ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে বলবৎ হইবে তাহা নির্দ্ধারণের ভার বিচারপতিগণের উপর ন্যস্ত আছে। এইরূপ দুইটি মোকদ্দমার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১৯৫০ সনে বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলের শ্রমিক ও মালিক মধ্যে ১৯৪৯ সনের জন্য দেয় বোনাস লইয়া এক বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ মীমাংসার ভার বোম্বাই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোর্টের নিকট দেওয়া হয়। ১৯৫০ সনের ৭ই জুলাই তারিখে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোর্ট বিরোধ মীমাংসার জন্য তাহাদের এওয়ার্ড দেন। মিল মালিক সমিতি এই এওয়ার্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫০ সনের ৯ই আগষ্ট তারিখে আপীল করেন। এই আপীল বিচারাধীন থাকা কালেই ১৯৫০ সনের ১৪ই আগষ্ট তারিখে মিলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করেন। এই ধর্ম্মঘটের সময় কতক ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিক মিলের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যে সকল শ্রমিক ধর্ম্মঘট সত্ত্বেও মিলে কাজ করিতে যাইতেছিল তাহাদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করিয়া ও মৌখিক যুক্তি দ্বারা তাহাদের মিলের কাজ হইতে বিরত করার চেষ্টা করে। এই কাজে তাহারা কোনও বল প্রয়োগ করে নাই। ১৬ই জুন তারিখে এইভাবে যাহারা শ্রমিকদিগকে মিলে যাইতে বাধা দিতেছিল তাহাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং বোম্বাই সহরের গীরগাঁওয়ের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের মধ্যে একজন শ্রীদামোদর গণেশকে ১৯৩২ সনের ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ৭ ধারা অনুসারে পিকেটিং করার অপরাধে ও মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০৲ জরিমানা আদায়ের আদেশ দেন। শ্রীদামোদর গনেশ ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে আপীল করেন এবং বলেন যে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) ধারা মতে তাহার প্রচার পত্র বিলি করার ও মৌখিক যুক্তি প্রকাশের অর্থাৎ স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার আছে। ১৯৩২ সনের সংশোধিত ফৌজদারী আইন ঐ মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করায় ঐ আইন বিধি বহির্ভূত। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি রায়ে বলেন যে শ্রমিকদের স্বাধীন মত প্রকাশের যেমন অধিকার আছে তেমনি মিল মালিকদের স্বাধীন ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার এবং অপর শ্রমিকদের স্বাধীন ভাবে কাজ করার অধিকার আছে। সুতরাং ধর্ম্মঘটি শ্রমিকগণ তাহাদের স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করিতে যাইয়া যদি অপর কাহারও কোন মৌলিক অধিকারের বিঘ্ন উপস্থিত করে, তবে ধর্ম্মঘটি শ্রমিকগণের কার্য্যের বাধা দেওয়ার ও এ জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার সরকারের আছে।

অপর মোকদ্দমাটি মাদ্রাজ হাইকোর্টের। কিষিনচাদ চেলারাম একজন উত্তর ভারতের অধিবাসী। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ সহরে তাহার একটি বড় দোকান আছে। মাদ্রাজ প্রদেশের "দ্রাবিড় কাজাগাম" নামে একটি রাজনৈতিক দল আছে। দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের লোকের প্রবেশের বা বাসের তাহারা বিরোধী। মাদ্রাজের এই দল ১৯৫১ সনে তাঞ্জোর জেলা হইতে লরী করিয়া মাদ্রাজ সহরে অনেক লোক আনয়ন করেন। ইহারা প্রতিবার দুইজন করিয়া পাতাকা, প্লাকার্ড ইত্যাদি লইয়া কিষিনচাদের দোকানের সম্মুখে চলাফেরা করিতে এবং যাহাতে কেহ ঐ দোকানে না যায় তাহার মৌখিক প্ররোচনা করিতে থাকে। তাহারা কাহার উপর কোন বলপ্রয়োগ করে নাই বা কাহাকেও ভীতিপ্রদর্শন করে নাই। কিন্তু ইহার ফলে কিষিনচাদের দোকানে খরিদ্দার কমিয়া গেল ও তাহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতে লাগিল। পুলিশ আসিয়া ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল ও মাদ্রাজের তৃতীয় ও সপ্তম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ইহাদের বিচার হইল। বিচারে প্রায় সকলেরই ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩২ সনের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারা অনুসারে পিকেটিং করার অপরাধে এই দণ্ড দেওয়া হয়।

এই দণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আপীলে বলা হয় যে সংবিধানের ১৮ (১) ধারায় প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে স্বাধীন মত প্রকাশের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সংশোধিত ফৌজদারী আইন ঐ মৌলিক অধিকারের বিরোধী। বিচারপতি ম্যাক তাহার রায়ে বলেন যে কিষিনচাদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভারতে যে কোন স্থানে অবাধে তাহার ব্যবসা পরিচালনা করার অধিকার আছে, সুতরাং অপরাধীগণ তাহার এই মৌলিক অধিকারে বিঘ্ন উপস্থিত করিলে তাহা নিবারণের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার সরকারের আছে এবং এই কারণে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে পিকেটিংএর জন্য যে দণ্ডের বিধান আছে তাহা সংবিধানের বিধিবহির্ভূত নহে। বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের এই বিরোধ মীমাংসা করা অতি জটিল ও কঠিন কাজ অথচ এই মীমাংসার উপর প্রত্যেক মৌলিক অধিকারের সীমা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

ধর্ম্ম এবং নৈষ্কর্ম্ম্য

ডাঃ রাধাগোবিন্দ দাস

প্রায়ই একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে ভারতবাসীর জীবন-ধর্ম্ম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক পণ্ডিত লোকেও এই ধরণের কথা বলিয়া থাকেন। এই কথা সত্য কি মিথ্যা সে কথা এখন থাক। ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, ভারতবাসীর সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক কতটুকু, ধর্ম্ম চর্চ্চায় কি কাজ হয়, সাত আট হাজার বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া ভারতবাসীরা কি পরিমাণ কাজ করিয়াছে। যাহারা ধর্ম্ম চর্চ্চা করে নাই তাহাদের কি পরিমাণ অবনতি হইয়াছে। সে সব কথাও এখন থাক। গাল-গল্প, হুল্লোড় এবং আলস্য—এই কয়টীর সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকে কিনা এই অপ্রিয় বিষয়টীই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচ্য।

কোন শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ ধর্ম্মপরায়ণ হয়, কাহারা সাধারণতঃ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া গলাবাজী করেন, কাহারা সাধারণতঃ ধর্ম্মের নামে বিগলিত হইয়া যান। তাঁহাদের কথা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞান হইবে, এবং কেন ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-চর্চ্চা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সে সম্বন্ধেও অনেক কিছু জ্ঞান হইবে।

হরিসভা, আশ্রম, দেবমন্দির প্রভৃতিগুলি সাধারণতঃ ধর্ম্ম-চর্চ্চার স্থান। যাঁহারা এই সব স্থানে যাতায়াত করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আড়ালে বেশ ভাল করিয়া খোঁজ-তল্লাস করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা প্রত্যেকেই অগাধ জলের মাছ—কেহ ভণ্ড, কেহ পাপিষ্ঠ, কেহ লম্পট, কেহ জালিয়াৎ, কেহ মাতাল, কেহ ডাকাত, কেহ চোরাকারবারী, কেহ ঘুঁষখোর, আবার কেহ বা বিকৃত মস্তিষ্ক। অবশ্য তাঁহাদের চেহারা বা বুলিতে ধরিবার কিছু নাই। কোন স্থানে হয়তো হরিনাম হইতেছে, বা ভাগবত পাঠ হইতেছে সেখানে একটু দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একজন মহা-অলস ব্যক্তি। যিনি অলস নহেন, তাঁহার সম্বন্ধে উপরোক্ত যে কোন একটী বিশেষ্য বা বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে।

আপনাদের গ্রামে কাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম চর্চ্চার বেশী বাতিক দেখিতে পাওয়া যায় লক্ষ্য করুন। দেখিবেন যাহারা সাধারণতঃ নিষ্কর্ম্মা, অকর্ম্মা, অলস, বিপত্নীক, ডেঙ্গো-ডাংলী। এইসব লোকেদের মধ্যেই ধর্ম্ম-চর্চ্চার বেশী বাতিক দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব লোক নিয়মিতভাবে অন্যায় কাজ করিতেছে ও পাপের কাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও ধর্ম্ম চর্চ্চার রেওয়াজ দেখিতে পাওয়া যায়।

একটী অত্যাশ্চর্য্য কথা যে সব লোক কর্ম্মী, বা সদা কর্ম্ম ব্যস্ত, বা বরাবর ন্যায়পথে আছেন তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-চর্চ্চার বাতিক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে সব লোকদিগকে আপনারা বাস্তবিক ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে গোপনে একটু সন্ধান করিলে দেখিবেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা অন্যায় কাজ করিতেছেন বা করিয়াছেন, বা করিয়াছিলেন। যদি সে রকম কিছু দেখিতে না পান তবে অন্ততঃপক্ষে ইহাও দেখিবেন কেহ হতাশ প্রেমিক, কেহ মায়ে-তাড়ানো, কেহ বাপে-খেদড়ানো, কেহ ডুবি যাওয়া, কেহ বা লাল-বাতি-জ্বালা।

যাঁহারা শিক্ষিত, ধর্ম্মপরায়ণ এবং খুব নিষ্ঠাবান, আহ্নিক বা ঠাকুর পূজা না করিয়া জল খান না, তাঁহারা যে সব কাজগুলি করেন সে সম্বন্ধে একটু খোঁজ করুন। দেখিবেন, কেহ দারোগা, কেহ উকিল, কেহ মোক্তার, কেহ ডাক্তার, কেহ বা সিভিল সাপ্লাই অফিসে সিমেণ্ট দাতা।

আপনারা সকলেই জানেন মালি-মামলা করিতে হইলে মিথ্যার আশ্রয় না লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, কাজেই উকিল বাবুদের আশ্রয় লইতে হয়। খুবই আনন্দের কথা প্রধান উকিল মাত্রেই আহ্নিক-প্রিয় এবং ঠাকুর প্রিয়।

মানুষের সেবা এবং মানুষের সহায় যে কি কাজ হয়, সে কথা কাহারও জানিতে বাকী নাই ; কিন্তু কেহ-ই তাহা করিতে চাহেন না। তাহার কারণ তাহাতে কোন মজা নাই এবং তাহাতে অনেক লোকসান। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতরা এই কথা জানিতেন, এইজন্যই তাঁহারা সংক্ষেপের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ; এবং এইজন্যই তাঁহারা নানা প্রকার গৃহাদি এবং অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এবং নানা প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের মধ্যে বাঙ্গালীদের মধ্যেই বোধ হয় ধর্ম্ম চর্চ্চার রেওয়াজ বেশী। কারণ সারকুড় পূজা, ষষ্ঠী পূজা, শিলা পূজা, ঘেঁটু পূজা, শনি পূজা, রবি পূজা, তারপর দুর্গাপূজা, কালীপূজা, গাজন প্রভৃতি অসংখ্য পূজা অনুষ্ঠান তাঁহাদের মধ্যে। এইগুলি সাধারণতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া পরিচিত। এইগুলির সহিত ধর্ম্মের কতটা সম্বন্ধ চিন্তা করিয়া দেখুন। এইগুলির সহিত হুল্লোড় এবং নৈষ্কর্ম্ম্যের কতটা সম্বন্ধ এবং এইগুলি না থাকিলে জাতির কতটা অবনতি হইয়া যাইত তাহাও চিন্তা করিয়া দেখুন। ধর্ম্মানুষ্ঠান বাবদ এক একটী গ্রামে বৎসরে বহু টাকা খরচ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু উদ্যম এবং বহু সময়েরও অপচয় হয়। এইবার গ্রামের চেহারাগুলি দেখুন। প্রত্যেকটীই বাসের অযোগ্য। রাস্তায় দুই ঝুড়ি মাটি দিবার বেলায় কেহ নাই। দুই ঝুড়ি পানা সাঁকের সময় কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। কোন দুঃস্থতম লোককে সাহায্যের বেলায় কেহ নাই। কোন লোক হয়তো বিনা চিকিৎসায় মরিল। তাহার সৎকারের সময় কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। কেহ বলিবে, 'আমার শরীর খারাপ। কেহ বলিবে, 'ছেলের অসুখ' ; কেহ বলিবে, 'আমাকে যেতে নাই, আমাদের বৌ অন্তর্বত্নী।

কেহ বলিবে, 'আমি ঠাকুরের কবচ নিয়েছি, আমাকে মড়া ছুঁতে নাই'। গঠনমূলক ব্যাপারে, ফাটাফাটির ব্যাপারে, চাষবাসের ব্যাপারে এবং পরহিতের ব্যাপারে কাহারও উৎসাহ দেখা যায় না। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে কচু, কলা, মূলা প্রভৃতির চালান আসে অন্য স্থান হইতে। অন্য স্থান হইতে আসিলে তবে তাহারা এই সব জিনিষ খাইতে পায়।

যতটুকু নিষ্কর্ম্ম থাকা যায় জীবনের খাতায় ততটুকু যে খরচ বাড়িয়া যায় এই কথা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। এই খরচের ফলে বাঙ্গালীর অবস্থাটা কি হইয়াছে চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহাদের দেশের যে অংশটা চলিয়া গিয়াছে, যেটা আছে সেটার কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। কলিকাতা ঘুরিয়া দেখুন, মনে হইবে এটা অবাঙ্গালীর রাজ্য। বাংলার অন্যান্য সহরগুলি দেখুন, সেখানেও অবাঙ্গালীর প্রাধান্য, সেখানে বড় বড় বাড়ীগুলির এবং বড় বড় ব্যবসাগুলির মালিক অবাঙ্গালী। প্রতি বৎসর বিদেশী কুলীরা লক্ষ লক্ষ টাকা এইদেশ হইতে লইয়া যায়, অথচ এই দেশে বেকার অনেক। বেকারদের কর্ম্মে কোন উৎসাহ নাই। কিন্তু ধর্ম্ম অর্থাৎ হরিনাম, হোলি খেলা, কীর্ত্তন, পাঁঠা-কাটা নৃত্য, দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা, প্রভৃতিতে বেকারদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং কর্ম্মব্যস্ততা দেখিবার মত।

বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, হনুমান গ্রামের মাধব জমিদার বহুদিন পূর্ব্বে একজন পশ্চিমা সিং আনিয়াছিল। তাহার মাহিনা ছিল মাসিক দশ টাকা। মাধব জমিদারের ভাইপোরা এখন সিংজীর কাছে চোটায় টাকা লইয়া কারবার করিতেছে। এই গ্রামে রামধন মিস্ত্রি শুধু হাতে আসিয়াছিল, সে এখন কাঠের কাজ করিয়া লক্ষপতি হইয়াছে, অথচ এই গ্রামের নীলুমিস্ত্রির পেটের ভাত হয় না; সে মিস্ত্রি ভাল, কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত আর ঠাকুর প্রণাম করিতেই তাহার সময় ফুরাইয়া যায় কাজ করিবার তাহার সময় নাই। এইবার বাংলা এবং বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎটা চিন্তা করিয়া দেখুন।

ভারতবর্ষে কেন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল সেটা সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখন ভারতবর্ষে নিষ্কর্ম্ম অবসরগুলির হিসাব রাখুন। পুরাকালে ইহার পরিমাণ কি বিরাট ছিল তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। পুরাকালে এ দেশের লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক কম ছিল; সে সময় সামান্য একটু পরিশ্রম করিলেই খাওয়া-পরা চলিয়া যাইত। সুতরাং সেকালের মানুষেরা পায়ের উপর পা দিয়া নিশ্চিন্তে, আলস্যে এবং নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যেই অধিকাংশ সময় কাটাইত; কাজেই ধর্ম্মের অভ্যুদয় কেন না হইবে? একটী কোদাল লইয়া মাটী কাটায়, বা কুড়ুল লইয়া কাঠ চেলানোতে বা রোদে জলে মাঠে কাজ করায় কত কষ্ট, আহারের পর একখানি রামকৃষ্ণ-কথামৃত লইয়া পাশ বালিশে পা রাখিয়া আত্মিক উন্নতি করায় নিশ্চয়ই তত কষ্ট নাই, বা গীতাপাঠে, চণ্ডীপাঠেও তত কষ্ট নাই, বা সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইবার ছড়িটা হাতে করিয়া কোন আশ্রমাদিতে যাইয়া তত্ত্বকথা ঝাড়িতেও তত কষ্ট নাই; এই জন্যই ভারতবর্ষে কর্ম্মচর্চ্চা কম হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই ধর্ম্মচর্চ্চার ফলটা কি হইয়াছে একবার দেখুন। এই দেশ যুগে যুগে যত বুট যত নাগড়াই লইয়াছে তত আর কোন দেশ লইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই দেশ যত তাহার মা-বোন, ভাই-ভগ্নী অন্যকে দিয়াছে অন্য দেশ তত দিয়াছে কিনা সন্দেহ।

স্বামিজী একস্থানে বলিয়াছেন The aim of religion is to rouse Kul-Kundolini power. এইবার বলুন আজ পর্য্যন্ত কয়জন ভারতবাসী এই রাস্তায় সফলকাম হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা কি কাজ হইয়াছে সেটাও বলুন। আমার বলা, যেটি হয় না, বা যেটা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা লইয়া ভণ্ডামি বা ন্যাকামী করার কোন মানে হয় না; বা মনের সুখে করা কৃতকর্ম্মগুলি ধর্ম্ম বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করারও কোন মানে হয় না। ধরুণ চেষ্টা-চরিত্র করিয়া, বা দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমার ব্রহ্ম লাভ হইল। আমার ঘন ঘন সমাধি হইতে লাগিল। আমার যদি ঘন ঘন এইরূপ হইতে থাকে, তবে আমার খাওয়ার ব্যবস্থাটা কি করিয়া হইবে মহাশয়? যদি কোন সুস্থ লোক দেহের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু ব্রহ্মের পিছনে পিছনে ছোটে তবে তাহার পটল তুলিতে কতক্ষণ? যদি কোন লোক দৈবক্রমে ব্রহ্মলাভ করে তবে তাহাতে আর পাঁচজনের কি কাজ হয় মহাশয়? কিন্তু যদি সে একটা যন্ত্র বা অস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে তবে তাহাতে দেশের কি কাজ হয় ভাবিয়া দেখুন। আগে দেহ, না সত্তা, আগে ইহলোক না পরলোক, সে বিষয়ে চিন্তা করিবার অনেক কিছু আছে, কিন্তু কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না।

অনেকে বলেন ভারতবাসীর দিবার অনেক কিছু আছে। কিন্তু সেই জিনিষগুলি পাইবার জন্য কয়জন অভারতীয় ভারতবর্ষে আসিতেছে? কিন্তু আমরা জানি যে প্রতি বৎসর হাজার হাজার ভারতবাসী বিদেশে শিক্ষার জন্য যাইতেছে। ভিখারী বলে, আমার শিক্ষা দিবার অনেক কিছু আছে? কেমন ভাবে ভিখারী হইতে হয় সে বিষয়ে আমি ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু কয়জন তাহার কাছে সে শিক্ষা লইতে যায়? তেমনি ভারতবাসীর শিক্ষা অভারতীয়ের কাছে নেহাৎই মূল্যহীন।

যদি ভারতবর্ষে ধর্ম্মচর্চ্চা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে আমার মনে হয় সাধারণের পাপক্ষয় করিবার প্রবৃত্তিটুকু বা ধর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিটুকু বর্ত্তমানে যে দিকে যাইতেছে সেই দিকে না যাইয়া দরিদ্রের সেবা এবং কল্যাণজনক কাজের দিকে ধাবিত হইত। তাহাতে দেশের ও দশের কাজ হইত, এবং তাহাতে দেশের আলস্য এবং নৈষ্কর্ম্ম্য অনেকটা কম হইত।

আমি জীবনে তিপান্ন জন ধর্ম্মপ্রাণ লোক দেখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন অলস এবং অসৎ প্রকৃতির লোক। একজন মাসে দুইশত টাকার মাহিনার চাকুরী করেন, কিন্তু মাসে দুই হাজার টাকা উপায় করেন। বলা বাহুল্য ঘুঁষ হইতেই তিনি এত টাকা উপায় করেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় হরিনাম করেন। হরিনামের সময় তাঁহার ভক্তি-অশ্রু দেখিবার মত। একজন লোক কনট্রাক্টর; তিনি সময়ে সময়ে পাঁচশত টাকা খরচ করিয়া এবং চারি-পাঁচশত টাকা ঘুঁষ দিয়া এক হাজার

টাকার বিল পাশ করাইয়া লন। তিনি বৎসরে দুই তিনটী পুজা আনেন এবং সেই সব পুজা উপলক্ষ্যে প্রীতিভোজ দেন। তাঁহার সকল কর্ম্ম নাকি মা তারার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয় এবং তিনি প্রতি পদে মা তারার নাম উচ্চারণ করেন। তাঁহার চণ্ডীপাঠ দেখিবার এবং শুনিবার মত। একজন ভেজাল ব্যবসায়ী ;—তিনি গঙ্গার ধারে একটী বেশ পাকাপোক্ত শ্মশানঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। একজন ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার দেখিয়াছি, তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ গীতাপাঠ হয়। গীতাপাঠের পর কোনটা কাহার নীলাম করিয়া লইতে হইবে, কাহার মেয়েটী ভাল, কাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, এই সব বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনজন প্রবীণ উকিল দেখিয়াছি। তাঁহারা খুব নামজাদা ; দোষীকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়া দিতে তাঁহাদের জুড়ি নাই—অর্থাৎ তাঁহাদের মিথ্যাকুশলতা অতুলনীয় এবং প্রশংসনীয়। তাঁহারা আহ্নিক না করিয়া এবং দেবমন্দিরে মাথা ঠেকাইয়া না আসিয়া জল স্পর্শ করেন না। পঞ্চাশজনের প্রত্যেকেই এইরূপ এক একটা অবতার। তিপান্নজনের বাকী তিনজনের মধ্যে দুইজন লোক মাথা-পাগলা, স্ত্রীবিয়োগের পর হইতেই তাঁহার এইরূপ হইয়াছে। একজনের সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই। তিনি খুব দাড়ি রাখিয়াছেন এবং দিনে রাতে তিন চার বার ধ্যানে বসেন। শুনিলাম তিনি বাল্যকালে প্রেমে পড়িয়াছিলেন এবং মানসীকে না পাওয়ার পর হইতেই তাঁহার এইরূপ অবস্থা এবং পরিবর্ত্তন।

রুদ্র দেবতা জাগ্রত

শ্রীনীলরতন দাশ

ঈশানের কোণে বিষাণের ধ্বনি উঠিছে প্রলয় ঝড়,
জাগায়ে শঙ্কা বাজিছে ডঙ্কা, কাঁপিতেছে অম্বর।
রুদ্র দেবতা জাগ্রত, তার নয়নে বহ্নি জ্বলে ;
হস্তে ত্রিশূল, ডম্বরু আর ক্রুদ্ধা ফণিনী গলে।
ধূমকেতু তার পুচ্ছ নাচায়, আকাশে গরজে বাজ,—
সৃষ্টি স্থিতি লুপ্ত করিতে উদ্যত নটরাজ।
আজিকে বিচার হবে সবাকার নিষ্ঠুর নির্ম্মম,
অপরাধীদের বক্ষে হানিবে ত্রিশূল বজ্রসম।

বিলাস-ব্যসন-লালসার পাশে আপনারে সদা ঘিরি,
যুগযুগান্ত করিল যাহারা রাজা ও উজীরগিরি,—
মিথ্যা শঠতা অবিচারে যারা শাসল করিল দেশ,
পদতলে দলি মানুষকে যারা ভাবিল অধম মেষ,—
রিক্তের হৃদ-রক্ত চুষিয়া হলো যারা স্ফীতোদর,
বিচারের দিনে আজি ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে তারা থর থর।

বিত্তের জোরে নিত্য যাহারা নিঃস্ব মানুষগুলি
পেষণচক্রে চূর্ণ করিয়া করেছে পথের ধূলি,...
দুঃস্থজনের অস্থিপাঁজর তিলে তিলে করি' গুঁড়া,
তুলিয়াছে যারা অভ্র ভেদিয়া শুভ্র সৌধ চূড়া,—
শাসনে শোষণে মানুষেরে যারা করিয়াছে কঙ্কাল—
তাদের সবার করিতে বিচার আসিতেছে মহাকাল।
হবে না আপোষ, রুদ্রের রোষ-বহ্নিতে আজ ভাই,
অন্যায়, মেকী, মিথ্যা ও ফাঁকি—সব পুড়ে হবে ছাই !

বুঝিবা হারায়

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

দক্ষিণের লোনা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে শেষ ফাল্গুনের হাওয়া
বৃষ্টিকণা ভাসা ভাসা, ক্লান্ত এক বিকেলের হিজলের ক্ষেতে
কোকিলের স্বর শুনি। সুরভিত মল্লিকার মিষ্টি ঘ্রাণ পাওয়া,
ছোঁয়াচ হাওয়ায় মন নেশালীন তৃপ্তি ঘুম চোখে চোখে পেতে
কাজলী আসনে বসে। যৌবনের তীর ছোঁয়া কামনা মুর্ছনা
আশা আলো একমুঠো ঝল্‌কানো ফুলঝুরি সুনীল সান্ত্বনা।
ঘুমচোর বৃষ্টি ভেজা চোখের পাতায় বোনে রাত্রি স্বপ্নজাল,
লবঙ্গ বনের দূরে আনে শুধু সে লবঙ্গ মঞ্জরীর ঘ্রাণ।
তৃপ্তির যে নেশা লাগে। নেশায় নিঝুম জানি সময়ের কাল,
দণ্ড পল সব শেষ, স্বপ্নিল আরবী শুধু সাগরের প্রাণ
উত্তাল উচ্ছল তবু আশাহত লোনা জল ছোঁয়া ছোঁয়া তীর
হলুদী বালুকা মনে বিরহ কাজল চুয়ে চোখের শিশির ;
একফোটা ঝিলিমিলি রাত্রের নীলাভ বঙে নিশাচর তারায়
ভয় শুধু রৌদ্র ত্যেজে মিষ্টি সেই ভালবাসা বুঝি বা হারায়।
তাই তৃপ্তি তীর খুঁজি হৃদয়ের রঙে রঙে রমণীয় প্রেমে
ঘুমের মহলে থেকে ঘাসের শিশির ভেজা হাঁটা পথে নেমে।
সরষে ক্ষেতের ছোঁয়া রাতের হাওয়ায় ভাসা হাল্‌কা যে মন
আল্‌তো আমেজে ভরা, অড়রের মাঠে মাঠে আলো জোনাকির
ভিড় জমে ঝিক্‌মিকে ; মনের আঁচলে ঢাকা দুরন্ত নয়ন
হারায় স্বপ্নালু চোখে আশার জেল্লায় বুনে তারা চুমকির।
তৃপ্তির ঠোটেই শুধু সুমিষ্টি কথার প্রেম হাজারো যে ভিড়
দিনের বেসাতি কাজে ভুলে যাওয়া শান্ত রাত্রি ফেননিভ তীর,
হাপর হাওয়ায় ক্ষোলা সকালের সূর্য-রোদে আলোক অঞ্চলে
ভয় হয় হারাবেই মনের কিনার ছোঁয়া হৃদয় গুঞ্জনে।
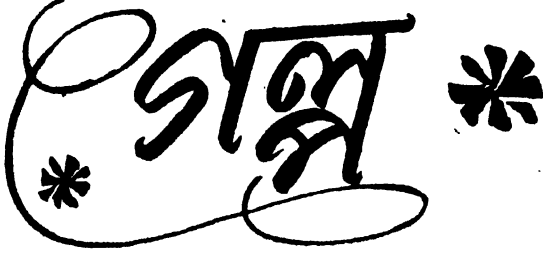
ছাপার অক্ষরে

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

শুধু একটা সম্মতি। একটা না-কে হ্যাঁ করার মধ্যেই সমস্ত বিস্ময়।

এক-আধটা দিন নয়, দুটো চারটে মাসও নয়; পুরোপুরি ছ-ছটা বৎসর। এই ছয় বৎসরে অনেক শুনেছে, অনেক জেনেছে সুপ্রকাশ কিন্তু আজ যেন নতুন করে জানল, নতুন করে চিনল রাধানাথকে। আশ্চর্য! রাধানাথ অবশেষে রাজী হয়েছে! এখন থেকে এবং আজ থেকেই আর কোন আপত্তি নেই তার। দীর্ঘকালের কঠিন প্রতিজ্ঞা আর সেই সঙ্গে সমস্ত ব্যথা-বেদনা মন থেকে মুছে ফেলেছে সে। রাজী হ'য়েছে। বিয়ের চিঠি-উপহার ছাপাতে আর কোন আপত্তি নেই রাধানাথের।

রাত্রিতে পার্ট-টাইম ছাপার কাজ করে হরেন্দ্র কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল। ঘড়ির কাঁটায় তখন পুরো সাতটা। ছটফট করছিল সুপ্রকাশ। অস্বস্তিতে ঘর-বার পায়চারি করছিল। ঠিক এমন সময় রাধানাথ এল আবার। বিকেল পাঁচটায় ডিউটি থেকে অফ হয়েছে সে। সুপ্রকাশ হদিশ করতে পারল না, খুঁজে পেল না রাধানাথের পুনরাগমনের কারণ।

বিশেষ কোন ভূমিকা নয়, রাধানাথ তার সম্মতি জানাল, বলল—"ছাপুম কত্তা, আইজ থনে বিয়্যার চিঠি আমি ছাপুম।"

এমনভাবে অবাক হয়েছিল সুপ্রকাশ যে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তার। তারপর সে বলল—"কিন্তু…"

আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে রাধানাথ উত্তর দিল—"হ, না ছাইপ্যা করুম কি? ঘ্যান, প্রুফটা ঘ্যান আর গ্যালীর নম্বরটা কন্।"

কারেকশন করা মেক-আপ প্রুফটার কোণায় লাল-পেন্সিল দিয়ে গ্যালীর নম্বরটা লিখে দিল সুপ্রকাশ, বলল—"কাগজটা খুবই পাতলা, ইম্প্রেশনটা একটু নরম রেখ।"

শুনে একটু হাসল রাধানাথ। হেসে হেসেই বলল—"হেইডা কি কইলেন কত্তা? মাথখমের নাহাল্ মোলাম ইম্প্রেশন দিয়া দিমু।" তারপর প্রুফটা নিয়ে কম্পোজ-ঘরের দিকে চলে গেল।

তখনও বিস্ময়ের ঘোরটা কাটেনি সুপ্রকাশের। একজোড়া চোখের অবাক-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। হাড়-পাঁজরের তলায় অনুসন্ধিৎসু মনটা সজাগ হয়ে উঠল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারল না, প্রশ্ন করতে মন সরল না,—কেন ছ' বৎসর পর আজ বিয়ের চিঠি ছাপতে রাজী হ'ল রাধানাথ।

খুবই কাজের লোক। চমৎকার ছাপার হাতে ওর জুড়ি আছে কিনা জানা নেই। শুধু যে ছাপা তা নয়, কিছু কিছু কম্পোজও জানে রাধানাথ। মুক্তোর মত ঝকঝকে ওর ছাপা। নির্ভুল। সুপ্রকাশ অবাক হয়ে দেখেছে। দেখেছে, রাধানাথ যখন ট্রেড্‌ল্ মেশিনটা চালিয়ে সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে ছাপতে থাকে, মনে হয় সে যেন অন্তর্জগতের মানুষ।

দিন তারিখ স্মরণ নেই। বছর ছয়েক আগে আজকের মত ঠিক এমনি ঘর-বার পায়চারি করছিল সুপ্রকাশ। নবজাত একটা পত্রিকার আত্মপ্রকাশের দিন মাথার উপরে। ফর্মাখানেক ছাপা এখনও বাকী। ঠিক এমন সময় মেশিনম্যান ভাগল। বিকেল পাঁচটায় একটি লোক এসে দাঁড়াল, বলল—"আপনের কাছেই আইলাম কত্তা।"

—"ছাপা-টাপার কিছু…"

—"আইজ্ঞা না। অর্ডার লইয়া আহি নাই। ছাপনের কাম করি আমি, মেশিনম্যান।"

—"ও" পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সুপ্রকাশ, বলল—"আগে কোথাও কাজ-টাজ করেছ?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল রাধানাথ। বলল সে অনেক প্রেসেই কাজ করেছে। সেই সঙ্গে খুলে বলল সুপ্রকাশের বর্তমান মেশিনম্যান হরেন্দ্রর কথা। হরেন্দ্রই বলেছে রাধানাথকে। বলেছে সে আর কাজ করবে না সুতরাং রাধানাথ কাজটা সহজেই পেতে পারে। বিশেষ করে ভাল মেশিনম্যান বলে তার যথেষ্ট খ্যাতি যখন রয়েছে।

কাথাবার্তা ঠিক হ'ল। ঠিক হ'ল কাজ দেখে বেতন ঠিক করা হবে। রাধানাথও রাজী হয়ে গেল, বলল—"হ কত্তা, আগে কাম গ্যাহেন পরে ব্যাতন। তবে একটা কথা কইচিলাম কি…"

—"কী?"

—"সব কামই করুম আমি।"

—"সে তো নিশ্চয়ই।" সুপ্রকাশ বলল।

—"খালি একটা কাম কইরবার পারুম না।"

—"কী কাজ?"

—"আইজ্ঞা," ঘাড় নিচু করে মাথা চুলকাতে লাগল রাধানাথ। মনে হ'ল হঠাৎ যেন তার মুখ থেকে উৎসাহের উজ্জ্বল্য দপ্ করে নিভে গেল।

—"বল," সুপ্রকাশ মুখের দিকে তাকাল রাধানাথের।

এবার চোখ তুলল রাধানাথ। মনে হ'ল কথাটা বলতে যেন তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। একটু বিরতি। তারপর রাধানাথ হঠাৎ কথাটা বলে বসল, বলল—"আইজ্ঞা, বিয়্যা-সাদির চিঠি-ছড়া আমি ছাপুম না।"

—"কেন?" অবাক হল সুপ্রকাশ।

—"মাপ কইরবেন কত্তা, অইডা পারুম না"

—"অসুবিধাটা কি তোমার?" একটু বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল সুপ্রকাশের কথায়।

সেটা লক্ষ্য করল রাধানাথ। কিন্তু আশ্চর্য! তাতে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। ঠিক আগের মতই, হয়তো বা তার চেয়েও একটু শক্ত গলায় বলল—"অসুবিধা নাই আইজ্ঞা। কথা অইল ছাপুম না আমি।"

আশ্চর্য! সব ছাপবে অথচ বিয়ের চিঠি উপহার ছাপবে না, এ আবার কি রকম কথা! বেশ খানিকট বিস্মিত হল সুপ্রকাশ। তাকিয়ে রইল রাধানাথের দিকে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাধানাথ, কিছুতেই মাথা তোলে না। আসল ব্যাপারটা জানবার জন্য ভয়ানক কৌতূহল হ'ল। কয়েকটা প্রশ্নও করল সুপ্রকাশ কিন্তু আর একটা কথারও উত্তর মিলল না। পিড়াপিড়ীতে একটু উত্যক্ত হয়েই রাধানাথ বলল—"তাইলে কত্তা কাম কইরবার পারুম না।"

আর ঘাঁটালো না সুপ্রকাশ, বল্ল—"ঠিক আছে, আজ কিছু ছেপে তোমার পরীক্ষাটা দিয়েই যাও না।"

রাজী হ'ল এবং ছাপ্‌লও।

অপূর্ব হাত রাধানাথের। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছাপা। অক্ষরগুলো যেন দ্যুতি ছড়িয়ে হাস্‌ছে। খুবই খুশি হল সুপ্রকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেতনের কথাটাও মিট্‌মাট হয়ে গেল। কথা হ'ল আগামী কাল থেকেই কাজে আসবে রাধানাথ। এক টাকার একটা নোট বাড়িয়ে ধরল সুপ্রকাশ, একটু হেসে বলল—"অনেক উপকার করলে তুমি।"

দ্বিরুক্তি না করে টাকাটা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজল সে, বলল—"উপকারের কথা কইলেন না কত্তা? উপকার আর কি কইরলাম। এইডা আমাগো কামই। কাম জানি কইরা দিলাম আপনেরে, ট্যাহাওতো দিলেন একটা, তা উপকার অইল কহানে?" তারপর কি একটু ভেবে কথাটা আবার তুলল—"অই যে বিয়্যার চিঠি ছাপুম না কইলাম, রাগ কইরলেন আইজ্ঞা?"

—"না, না রাগ করব কেন", সুপ্রকাশ বলল,—"তুমি ছাপাবে না যখন…"

—"হ, ছাপুম না। পারুম না, আইজ্ঞা," যেন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল রাধানাথ। সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল সে, দাঁড়াল না।

অনেকদিন কথাটা মনে হয়েছে। মনে মনে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছে সুপ্রকাশ—কেন? কেন বিয়ের চিঠি ছাপাবে না রাধানাথ? এই রহস্যটা দিনরাত অনুরণন তুলেছে কৌতূহলী মন জুড়ে। ভেবেছে এ রহস্যের সমাধান তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু

পারে নি। মনে হয়েছে কি দরকার সাধারণ একটা মেশিনম্যানের সঙ্গে অত অন্তরঙ্গতার? আসলে রাধানাথ তারই অধীনে চাকরী করে। পার্থক্যটা অনেক। কিন্তু কৌতূহলী মন তাতে শান্ত হয় নি। মনে হয়েছে এই বিয়ের চিঠি ছাপা নিয়ে হয়তো ওর মনে বিরাট একটা আঘাতের ইতিহাস রয়েছে। নানা রকম চিন্তায় কল্পনাও করেছে সুপ্রকাশ এই নিয়ে। কিন্তু কূল পায় নি। কিনারার সন্ধান মেলে নি।

কতদিন দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা মমতার সৃষ্টি হয়েছে মনে। ওই যে রাধানাথ, কত বাক্‌-সংযমী, কত ম্লান, কত দুঃখ বেদনাই না সঞ্চিত রয়েছে ওর মনে। তাই মাঝে মাঝে মনটা দ্রব হ'য়ে আসে, মনে হয়—রাধানাথও তো মানুষ। ওর ও তো সুখ দুঃখ রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে ওকেও তো ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। সেই সব ভেবেই, কথাটা তুলতে গিয়ে কোথায় যেন খচ্‌ করে কাঁটা ফুটেছে। তুলতে পারে নি, বলতে পারে নি সুপ্রকাশ।

আশ্চর্য একটা দরদী মন পেয়েছে রাধানাথ। নিজে বিয়ের চিঠি ছাপে না, যে কোন প্রেসের পক্ষে সেটা ক্ষতি, সুতরাং কয়েক দিনের মাথায় একজন লোক সঙ্গে করে নিয়ে এল সে, বলল—"অরে লইয়া আইলাম কত্তা। পার্ট-টাইম ছাইপ্যা দিয়া যাইব। ভাল ছাপে।"

সেই থেকে হরেন্দ্রই বিয়ের চিঠি, উপহার আর ছোটখাট কাজ করে দিয়ে যায়।

কিছুদিন এমনিই কাট্‌ল। ক্রমে সহজ হয়ে এল রাধানাথ। নিজের জীবনের দু একটা কথা বলতে লাগ্‌ল, আর তা থেকেই ক্রমে ক্রমে অনেক ঘটনা অনেক ইতিহাস।

কয়েকটা বড় বড় বিখ্যাত প্রেসেও কাজ করেছে রাধানাথ কিন্তু টিঁকে থাকতে পারে নি। আর তার মূলেও ওই বিয়ের চিঠি ছাপতে অমত। দুঃখ করত এই নিয়ে, বল্‌ত—"আগের থনে বইলা কইয়া কামে ঢুকি কিন্তু অই চিঠিই ছাপাইবার চায় আমারে দিয়া! কয়—'রাধানাথ, তোমার ছাপা ভাল—ছাইপ্যা দ্যাও, ভাল বক্‌শিশ পাইবা।' "বকশিশ্‌! বক্‌শিশ দিয়্যা কি করুম কত্তা? হাজার ট্যাহা বক্‌শিশ দিলেও ছাপুম না আমি, ছাপুম না।" অদ্ভুত ভাবে মাথা নাড়তে থাকে সে।

আশ্চর্য একটা মমতা। রাধানাথ যখন মেশিন চালিয়ে ছাপতে থাকে, নিজের অজান্তেই কখনও কখনও পাশে এসে দাঁড়ায় সুপ্রকাশ। দেখে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে একমনে ছেপে যাচ্ছে রাধানাথ। কোনদিকে খেয়াল নেই তার। ঋজু দেহটা তালে তালে দুল্‌তে থাকে আর সেই সঙ্গে মনে হয়, কাগজের শীটগুলো নিয়ে সে যেন লোফালুফি খেলছে। ক্ষিপ্রহাতে কাগজ তুলছে, দিচ্ছে আর নিচ্ছে।

অবসর সময় সংসার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে রাধানাথ। শৈশবে বাপ হারিয়ে মায়ের উপর নির্ভর করে বড় হয়েছে সে। বাড়ী বাড়ী ঘেটেঘুটে বিধবা মা মানুষ করেছিলেন। পড়াশুনা সপ্তমশ্রেণী পর্যন্ত। এর পর হঠাৎ একদিন মা-ও চলে গেলেন। একা রইল রাধানাথ। নিতান্ত একা। তারপর এই কলকাতা শহর। আর পড়াশুনা হল না। দুঃখ করে রাধানাথ, বলে—"ভাইগ্য কত্তা, ভাইগ্য। আমার মায়ার আমি পূজা কইরতাম, ভ্যাবতার নাহাল মনে কইরতাম। দুঃখ কষ্ট কইর‍্যা মানুষ বানাইল আমারে, কইরবার পারলাম না কিছু," ফস্‌ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—"সুখের মুখ দ্যাখাইবার পারলাম না মায়রে।"

—"বিয়ে থা—করনি?" আস্তে আস্তে সূত্রধরে এগুতে চায় সুপ্রকাশ।

—"বিয়্যা?" চুপ করে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর বলল—"বিয়্যা করচিলাম, টিক্‌ল না। একটা পোলা আর একটা মাইয়্যা আমার কান্ধে গছাইয়া দিয়া চইল্যা গেল। মরবার আগে কইল পোলাডারে মানুষ কইরো আর ভাল দেইখ্যা বিয়্যা দিও মাইয়্যার।" তারপর আর একটু বিরতির পর সুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকাল রাধানাথ, বলল—"পোলাডায় ইস্কুলে পড়ে। সেভেনে।"

—"আর তোমার মেয়ে?"

—অর কথা কইবেন না। শত্তুর, শত্তুর···ফস্‌ করে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে গেল রাধানাথ দাঁড়াল না।

কলকাতায় এসে কোন এক আপিসে বেয়ারার কাজ করত রাধানাথ। রাত্রিবেলা শিক্ষানবিশী হিসাবে কাজ

করত ছাপাখানায়। সময় সুযোগ বুঝে শেষের কাজটাকেই পেশা বলে গ্রহণ করল! তারপর কয়েক বছরের মাথায় বিয়ে।

আজকাল বয়স হয়েছে রাধানাথের। মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের ঘন-সন্নিবেশ। গোঁফ-দাড়িতেও পাক ধরেছে কিন্তু স্বাস্থ্যটা এখনও বেশ রয়েছে। পেশীবহুল দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা, ভারী চোয়াল। কেমন একটা রুক্ষ রুক্ষ ভাব, কিন্তু আশ্চর্য নরম মন। বড় সরল, সোজা মানুষ।

থেকে থেকেই রাধানাথ তার মা-র কথা বলে। বউ-ছেলের কথাও, কিন্তু মেয়ের কথা বলে না কখনও। কথা প্রসঙ্গে মেয়ের কথা উঠলে এড়িয়ে যায়। মায়ের ওপর অটুট শ্রদ্ধা ছিল রাধানাথের। কথা বলতে বসলে তার মায়ের গুণপনার ইতিহাস যেন ফুরতে চায় না।

বর্ষাকাল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে একটু হাওয়াও। কাজ শেষ করে সুপ্রকাশের টেবিলের সুমুখে মেঝের ওপর বসেছিল রাধানাথ। দেশের কথা বলছিল সে। কথা বলতে বলতেই হঠাৎ উঠে গেল। আচম্‌কা নেমে পড়ল বৃষ্টির মধ্যে। কিন্তু না, সে চলে যায় নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে যথাস্থানে বস্‌ল। বসে তাকিয়ে রইল বৃষ্টি ধোয়া রাস্তার দিকে। শ্রাবণের গুমোট আকাশের মতই মুখখানা থম্‌থমে গম্ভীর।

একটু অবাক হয়ে সুপ্রকাশ বলল—"কোথায় গিয়ে-ছিলে এই বৃষ্টির মধ্যে?"

—"রাস্তায়।"

—"কেন?"

—"এই দুইড্যা চক্ষের লাইগা কত্তা। খারাপ অইল কিনা কে কইব।"

—"সে কি! কই, ছাপার বেলায় তোমার কোন ভুল হয়না তো।"

—"হ। ছাপার ভুল অইব ক্যান?" একটু চুপ করে কি ভাবল রাধানাথ, তারপর বলল—"অই যে মাইয়্যাডা ছাত্তি মাথায় দিয়্যা গেল, অরে ভুল করছিলাম। আমার করুণার নাহাল্ যাইতাচিল কত্তা। ছাত্তি মাথায় দিয়্যা সে শতুরেও ইস্কুলে যাইত যে।"

সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দুটো ভিজে উঠল, কেঁদে ফেলল রাধানাথ। 'হায় হায়' বলে বার ছয়েক স্বগোতক্তি করে গালে হাত দিয়ে অপলকে তাকিয়ে রইল দরজার বাইরে। অনেকক্ষণ।

সেই দিনই তার মেয়ের কথা বলল। তার মেয়ে করুণার কথা বলল রাধানাথ—"কি কমু, আমার মায়ের লগে খাড়া করাইলে চিনবার পারবে কে? মা কইতাম অরে, খুশী হইত, কইত—বাবারে, আমি তর মা না? আমারে বিয়্যা দিলি, তুই থাকবি ক্যাম্‌নে। তার চাইয়া আমারে বিয়্যা দিস্ না। তরে ছাইড়্যা আমি থাকবার পারুম না বাবা। আমি কইতাম—নারে তরে আমি বিয়্যা দিমু না।"

মেয়ের মধ্যে মাকে দেখেছিল রাধানাথ। দারিদ্র্যের সংসারে যত্ন-আত্তির ত্রুটি হয়নি। ছোট থেকে বড় সব রকম বায়না মিটিয়েছে, কোলে পিঠে করে ঠিক মায়ের মত মানুষ করেছে। হেসেছে, খেলেছে আর মা-মা করে অস্থির হয়েছে রাধানাথ। মেয়েও ঠিক তেমনি। মা বললে খুশীর অন্ত নেই। মেয়ে পড়তে চায়, স্কুলে ভর্তি করা হল। বই-খাতা, কয়েক রকমের পোষাক আর সেই সঙ্গে চক্‌চকে রঙিন একটা ছাতা।

ক্রমে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরল মেয়ে। ডাগর হয়েছে করুণা। বয়স বেড়েছে। শৈশবের সেই চপলতা কোথায় হারিয়ে গেল। ছোটবেলার সেই কথা মনে করিয়ে দিলে লজ্জা পায় সে। কেমন ভারিক্কি ভারিক্কি দেখায় করুণাকে। তখনও বাপের কাছে বসে, গল্প করে। ওদের পড়াশুনার গল্প, স্কুলের গল্প। যতই দিন যেতে লাগল মেয়ে যেন সবে যেতে লাগল বাবার সহজ সান্নিধ্য থেকে দূরে। একটু একটু করে ব্যবধান গড়ে উঠতে লাগল দিনের পর দিন।

এর পর দেখতে দেখতে কয়েকটা বৎসর পার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল রাধানাথ, করুণা অনেক সৌম্য, শান্ত হয়েছে। কথা বলে কম, আর সেই সহজ সরল হাসি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। চুপ-চাপ বই নিয়ে বসে থাকে, কখনও বা তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবে। রাধানাথের ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা করে কিন্তু পারে না। কেন, সে নিজেই বুঝতে পারে না। সেই করুণা, নিজের মেয়ে, তাকে ভয়টা কিসের?

বিয়ের বয়স হ'ল মেয়ের। রাধানাথ পাত্র খুঁজতে লাগল। ভাল একটি ছেলে চাই। স্বর্গতা স্ত্রীর কথা মনে পড়ল।

সত্যিই তো, তার মেয়েকে ভাল ঘর-বর দেখেই বিয়ে দেবে রাধানাথ। একটি মাত্র মেয়ে, কোনদিকে যেন সে বঞ্চিত না হয়।

কিন্তু মনে করলেই তো কাজ হয়ে যায় না। ভাল সম্বন্ধের আনাগোনা হল। মেয়ে দেখল, ভুরিভোজন হ'ল, কিন্তু আসল সমস্যাটা সমস্যাই রয়ে গেল। কুলীন হয়ে যারা ছোট-খাট চাকরী করে তাদের ঘরে মেয়ে হওয়া অভিশাপ। তাই মেয়ে পছন্দ হ'ল সকলেরই, যাঁরা দয়া করে এসেছিলেন, বাপের ছোট কাজ দেখে যাঁরা নাক সিটকোন নি। কিন্তু রূপার ওজনে মিল হ'ল না। সামান্য একটা মেশিনম্যানের পক্ষে কত টাকা দেওয়া সম্ভব? তাই একে একে দেখল, দেখে দেখে নিরাশ হ'ল রাধানাথ। কিন্তু তাই বলে চেষ্টা ছাড়ল না, ভগবান যখন পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, প্রজাপতি নির্বন্ধও ঠিকই করে দিয়েছেন।

রাধানাথ বলল—"খুঁইজ্যা-পাইত্যা পাইলাম। গরীবের ঘরে যা জুটল তাই আমার অনেক। কিন্তু মাইয়্যার সেই যে কি অইল কে কইব। কথা কয় না, খাইবার চায় না, খালি ঘরের মধ্যে চুপ কইর‍্যা বইয়া থাহে।"

মেয়ের বিয়ের দিন এগিয়ে এল। রাধানাথ তার সঞ্চিত যা কিছু ছিল খরচ করল। কিন্তু টান পড়ল তাতেও। শেষকালে ঘরের এটা ওটা বিক্রী করতে হল। আর তা থেকে দামী দামী শাড়ি, দু' একখানা গহনা, ভাল দেখে ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ, বিছানা বাসন। আয়োজনের ত্রুটী নেই।

রাধানাথ বলল—"আমি ছাপনের কাম করি, আমার মাইয়্যার বিয়্যা, তাই ভাল কাগজ কিন্যা বিয়্যার ছড়া ছাপাইচিলাম, আর চিঠি। সোনালী কালি দিয়া ছবির নাহাল ছাপাইচিলাম। কত আশা, আমার হাতের কাম দিমু মাইয়্যার বিয়্যাতে। কিন্তু চিঠি দেইখ্যা মাইয়্যা কান্দে। খালি কান্দে। সেই করুণা কাছে আইল, কয়—'তুই না কইচিলি বাবা আমারে বিয়্যা দিবি না, তাইলে দিতাচস্ ক্যান্?' আমি তর করচি কি? আমি কইলাম, বড় অইচস্ বাপের কাম করুম না আমি? তা শুইন্যা আর কান্দে মাইয়্যা, কয়—আমারে না তুই মা কস বাবা, মায়ের আবার বিয়্যা হয় নাকি? বুঝছি, আমারে তুই তর মায়ের নাহাল বিসর্জন দিবার চাস।"

চোখের জল মুছল রাধানাথ, বলল—"কন কত্তা, ই কথার কি জবাব দিমু? মাইয়্যা তো মা-ই, তাই বইল্যা বিয়্যা দিমু না, বাপের কাম করুম না আমি? ঈশ্বরে যে কপালে লেইখ্যা দিচে পরের ঘর আল করবি তরা। মাইয়্যা অইয়া জন্মাইচস্ পরের ঘরে তো দিতেই অইবো।"

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝরঝর্ ক'রে চোখের জল ফেলছে শ্রাবণের আকাশ। ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে ওরা। সুপ্রকাশ আর রাধানাথ। এখানেও আর একটা কান্না গুমরাচ্ছে। দুটো নীল আকাশের কান্নায় ঘরের পরিধির মধ্যেও শ্রাবণের গুমোট। সে দুটো নীল আকাশ রাধানাথের দুটো চোখ।

অনেকক্ষণ পরে রাধানাথ কথা বলল, বলল—"পারলাম না আইজ্ঞা, পারলাম না। কাইন্দ্যা-কাইট্যা তিন দিনের মাথায় শত্তুরে আমার মাথায় বাড়ি দিয়্যা পলাইল। আমার কি দোষ কন তো? গরিব মানুষ আমি, মেশিন চালাইয়া খাই, অত ট্যাহা আমি পামু কোথায়? আর অতই যদি গোঁসা আচিল তর, কইলি না ক্যান? ক্যান কইলি না আমারে যে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়্যা বইবি না তুই। আমারই অপরাধ অইচিল, ট্যাহার জোগাড় অইল না তাই দ্বিতীয় পক্ষের লগে বিয়্যা দিতাচিলাম কিন্তু তুই যদি সত্যিই আমার মা অইয়া আইচিলি, পোলার দুঃখডা বুঝলি না শত্তুর?"

তারপর কি ভেবে আরও একটু এগিয়ে বসল রাধানাথ, চাপা গলায় বলল—"কি কমু কত্তা সেই দুঃখে গলায় দড়ি দিয়্যা শ্যাষ করল নিজেরে।" এমন ভাবে কথাগুলো বলছিল রাধানাথ যেন আর কেউ আশে পাশে কান পেতে আছে তার কথা শুনবার জন্যে এই তার বিশ্বাস। বলল —"মরবার আগের দিন আমারে কয়, 'বাবা আশীর্বাদ কর আমারে, পরের জন্মে আমি জানি তর মাইয়্যা না অই, তর মা অইয়া আমু আমি। ভুইল্যা গেলাম, জিগাইতে ভুইল্যা গেলাম—কবে আবি তুই আমার মা অইয়া, কবে?"

এতক্ষণ নীরবে চোখের জল ফেলছিল রাধানাথ, এবার জোরে কেঁদে উঠল, বলল—"সেই চিন্তায় চিঠি ছড়া দিয়্যা দিলাম, পুইড়্যা ছাই অইয়া গেল। একবারও যদি জানতে পারতাম, তাইলে কি অরে আমি যাইবার দেই। দিতাম না, না।"

সেই রাধানাথ দীর্ঘ ছ বৎসর পর বিয়ের উপহার ছাপছে। সমস্ত বাড়ীটাকে কাঁপিয়ে শব্দ তুলে চলছে ট্রেডল্ মেশিনটা। সবুজ, হলুদে কাগজের শীট্‌গুলো নিয়ে যেন লোফালুফি খেলছে সে। সুপ্রকাশ এসে দাঁড়াল। দেখল, সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা মেশিনের তালে তালে দুলছে।

এ একটা অবাক বিস্ময়। এত বড় ব্যথা, এত বড় সাংঘাতিক আঘাত ভুলে হঠাৎ রাধানাথ রাজী হ'ল কেন? কিসে এমন পরিবর্ত্তন হতে পারে! ছ বৎসর আগেকার সেই কৌতূহল নতুনরূপে, নতুনভাবে দেখা দিল আবার। কিন্তু না, দাঁড়াল না সুপ্রকাশ। সরে এসে বস্‌ল নিজের চেয়ারে।

ছাপা শেষ করে, কাগজ গুছিয়ে রাধানাথ এসে দাঁড়াল, বলল—"একটা কথা কমু কত্তা যদি আইজ্ঞা করেন।"

—"বল" সুপ্রকাশ তাকাল রাধানাথের দিকে।

—"আপনের প্রেসে একটা কাম কইরবার চাই।"

—"কি কাজ?"

প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করল রাধানাথ, তারপর বলল—"পোলাডায় পাশ কইর‍্যা ভাল চাকরী করতাচে। বিয়্যা দিমু অর।"

—"বেশ, বেশ···"

—"মাইয়্যা দেখচি আমি। আপনের প্রেসে বিয়্যার চিঠি ছাপামু তাই।"

—"ছাপ না, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করবে না?" হঠাৎ যেন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল সুপ্রকাশ।

—"সেইডা আপনের দয়া কত্তা। আমরা গরিব-ধরীর মানুষ ·"

—"মেয়ে দেখলে কেমন?"

—"মাইয়্যা ভালই। মুখখান আমার মায়ের নাহাল। মিলাইয়্যা দেখচি।" মেঝেতে বসল রাধানাথ, বলল—"বিয়্যা ঠিক কইরলাম, পোলায় কয়—চিঠি ছাপাইয়্যা কাম নাই। আমি কইলাম. ক্যান্ ছাপুম না, আমার হাতের কাম যদি তগো বিয়্যাতেই না দিলাম তবে দিমু কারে? কন দেহি, আপনেই কন তো কত্তা?"

—"নিশ্চয়ই ছাপবে", সায় দিল সুপ্রকাশ।

—"হ ছাপুম। ইবারে তো আর থ্যাদাইতাচি না, আমার মায়রে ঘরে আনুম আইজ্ঞা। আলতা পইর‍্যা ঘুঙুর বাজাইয়া ঘরে আইব আমার মায়, পোলা অইয়া ফুর্তি করুম না আমি? তাই কইলাম পোলাডারে। অই যে শত্তুরে কইয়া গেচিল? কয়, 'আমি ওর মা অইয়া আমু; উ আইলে ফুর্তি করুম না আমি? তাইলে করুম কি, করুম কি কন্ তো কত্তা?" পাতাভেজা চোখ দুটো তুলে সুপ্রকাশের দিকে তাকাল রাধানাথ।

ওই চোখ দুটোই ভেজা। সেদিন যেমন শ্রাবণের গুমোট ছিল আজ আর তার চিহ্নমাত্র নাই। আজ ঝল্-মলে শ্রাবণ। খুশি-খুশি। ভেজা চোখের পাতা বেয়ে সেই খুশি টপ টপ করে ঝরছে রাধানাথের।

দেবযানী

শ্রীবাসনা গোস্বামী

দূরে শুকতারা জাগিছে রজনী বেদনায় বুক ভরা।
দেবযানী লাগি ভোরের আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ ভাসে:
তুহিন শীতল মৃত্যুর ক্রোড়ে উন্মাদ দিশাহারা।

বাতাপী লেবুর বিভোল গন্ধ দেবযানী ভুলে যায়—
সম্মুখে তার অমানিশা রাত মৃত্যুর মত কালো;
স্বপ্নিল প্রাণে দিশাহারা আলো ছায়া শুধু ঘুরে যায়।

হাজার বছর পার হয়ে আসা যে কথা, নিমেষ তরে;
ভুল হয়ে যায় সে কথা সেদিন সঞ্জীবনীর লাগি,
কঠিন কচের পায়ের কাছে কে মাথা কুটে কেন মরে?

কচ চলে গেল স্বর্গের দেশে অমর্ত আহরণে;
পৃথিবীতে এক রয়ে গেল এক শত-খণ্ডিত প্রাণ:
দেবযানী বুক বেদনায় ভরা চিরসাথী সন্ধানে।

সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি

শ্রীসতীরঞ্জন রায়

ব্রাহ্মণ্যধর্মের অগ্রগতি ও তার বিস্তারের ব্যাপকতায় বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ দেবায়তনগুলি দিশেহারা হয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে পর্যন্ত ভুলতে সুরু করলো। অধিকাংশ বৌদ্ধ বিহারগুলোতে দেখা গেল শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি দেবদেবী বৌদ্ধ দেবদেবীর সঙ্গেই পুজো পেতে লাগলো। এ প্রসঙ্গে নালন্দার বৌদ্ধ বিহারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই হ'তে পারে যে এই মিলনের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ছিল কিনা? আমরা শুধু উভয় ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ ও বিসম্বাদই লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের আড়ালে এক অদৃশ্য শক্তি সমন্বয়ের জাল বুনে চলেছিল। আজ অবশ্য একথা বলা মুস্কিল যে সমন্বয়-সাধন-শক্তি সে সময়ে কতটা সক্রিয় ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আত্মসাৎ করে চলেছিল, ঠিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মও বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রাস করছিল। এবং ধীরে ধীরে বৌদ্ধ গৃহী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণেও সক্ষম হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোকায়তন চিরকালেই ছিল বিপুল সংখ্যায়। সুতরাং বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করবার মত শক্তি ও ক্ষমতা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অর্জন করেছিল। তাই বোধহয় স্বাঙ্গীকরণ শক্তির প্রাবাল্যে বুদ্ধদেবও বিষ্ণুর অনতম অবতার বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বেদবিরোধী ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কারণে কবি জয়দেব তাঁর দশাবতার স্তোত্রে নমস্কার জানিয়েছেন।

এদিকে পালরাজাদের বল-বীর্য স্তিমিত হয়ে এসেছিল। বৌদ্ধ ধর্মীয় সুর ধ্বনিত হতো বটে, কিন্তু প্রতিধ্বনিত আর হতো না। নালন্দা মহাবিহারের অবস্থাও চরম পর্যায়ে এসে উপনীত হলো। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হ'তে লাগলো। ফলে জনসাধারণের উচ্চ ও মধ্যস্তরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রভাব ক্রমে শিথিল হয়ে এলো। কালচক্র বিবর্তিত হলো। রাজানুরাগপুষ্ট বৌদ্ধধর্ম রাজ্য থেকে নির্বাসন দণ্ড নিয়ে পালিয়ে বাঁচবার পথ খুঁজতে লাগল। অনুরাগের ভাণ্ড নিয়ে রাজারা এলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারে। বিলুপ্তির পথে বৌদ্ধ ধর্মের মর্মমূলে চরম ও শেষ আঘাত হান্‌লো তুর্কী আক্রমণ। তুর্কী সেনাদের খরধার তরবারি ও তাঁদের উন্মাদ অশ্বখুর বৌদ্ধ বিহারগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিল। নষ্ট হলো বহুমূল্য সহস্র সহস্র পুঁথি। যে সকল শ্রমণ কোনরূপে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, একমাত্র তাঁরাই হয়তো কিছু কিছু পুঁথি দূরদেশান্তরে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে সকল পুঁথিগুলোকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করছে, সেগুলোই শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে আমাদের দ্বারে এসে পৌচেছে।

দেখা গিয়েছে, সেই আমলেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য। তা'ছাড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সম্প্রদায়গত বৈষম্যের বিষময় দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পুরোপুরি না হলেও আংশিকত বিরোধ হয়ত থাকতে পারে। বিশেষ কিছু ছিল না বলেই মনে হয়। লক্ষ্মণ সেন নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব। লক্ষ্মণ সেন নিজে, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন—এঁরা তাঁদের পত্র সুরু করতেন নারায়ণকে প্রণতি জানিয়ে! অথচ এঁদের শীল-মোহরগুলোতে সদাশিবের প্রতিকৃতি শোভা পেতো। লক্ষ্মণ সেনের পূর্বপুরুষ ছিলেন পরম শৈব। 'গীতগোবিন্দের কবি সর্বসাধারণ্যে বৈষ্ণব বলে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক। প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায়গত ধর্মের মধ্যে সুরের সমন্বয় সাধনই ছিল মূল কথা। এই দুই আমলের দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই সাহিত্যের নবরসায়ণ রসায়িত হয়ে ওঠবার স্বর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না।

মিশরীয় কথা

চিত্রিতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দূর থেকে এই শ্যামল সুন্দর খর্জ্জুরবেষ্টিত দেশটীকে দেখায় যেন গেরুয়ায়সমাবৃতা ধরিত্রীর বুকের কাছে সুরু একটা সবুজ পাড়।—ক্লান্ত পথিক উৎসুকে চেয়ে দেখে।—ওকি সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন।—ওকি সুখের মায়া।—ওকি আনন্দের মরীচিকা। কাছে এলে দেখে, মরীচিকা নয় মরুস্থান। ওই সাহারার চিরতৃষ্ণার মাঝখানে। বিধাতা এই শ্যামল সুন্দর চিরতৃপ্তির রসধারা মেলে রেখেছেন।

কে জানে প্রথম মানুষ কেমন করে কোথা থেকে এদেশে প্রবেশ করেছিল। আফ্রিকার ঘন অন্ধকার পটভূমির ওপার থেকে, নুবিয়ার গহন অরণ্যের ভিতর থেকে দক্ষিণ সুডানের জংলী জাতিরাই কি প্রথমে ঈজিপ্টে পদার্পণ করে? নাকি ওরা মধ্য এশিয়ার কোন রুক্ষ কঠিন পার্বত্য জনপদের মানুষ?—আবার মরুভূমি পার হয়ে, নীল সমুদ্রের ধার দিয়ে সাহারার ভিতর দিয়ে এই শান্ত স্নিগ্ধ অনতি-বিস্তৃত মরুকাননে এসে তাদের বোঝা নামিয়েছিল!—

নীলনদ

পণ্ডিতেরা বলেন ঈজিপ্টেই সব প্রথমে এশিয়া ও আফ্রিকার মিলন হয়েছে। উত্তরে এশিয়ার প্রভাব আর দক্ষিণে আফ্রিকার। আর উভয়কে পরিপ্লুত করে নীলনদের বৃহত্তর প্রভাব সমগ্র দেশটা ও তার অধিবাসীদের একটা বিশেষ জাতীয় ভাবে ঈজিপ্সীয় করে তুলেছে। এমন কি এসিয়া থেকে যে সব গরু আসত। কয়েক শতাব্দী পরে ধীরে ধীরে তাদের পিঠে দেখা দিত এক বিশেষ ধরণের ঈজিপ্সীয় কুঁজ।

সকাল হতেই সেমিরামিস হোটেল বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। দামী পোষাক পরা বিশিষ্ট লোকের আনা-গোনা, আলাপ আলোচনায় গম্ গম্ করতে থাকে। জমকালো প্রাচীন আরবী পোষাক পরা পুরুষ অনেক দেখলাম বটে, কিন্তু তেমন সাজের মেয়ে চোখে পড়ল না। জানা গেল, শুধু বিশিষ্ট এরিস্টোক্রেটিক ঘরেই নয়, আজ-কাল এদেশে প্রায় সব মেয়েই য়ুরোপীয় ফ্যাসানে গাউন পরতে ভালোবাসেন, কিন্তু য়ুরোপের মত পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বাইরের কাজ করে বেড়ানো তত পছন্দ করেন না। এ বিষয়ে আমাদের দেশে ঠিক উল্টো ব্যবহার। আমাদের মেয়েরা সাজেসজ্জায় আচারে-আচরণে দেশীই রয়েছে, শুধু আদর্শটা একটু বদলে নিয়েছে য়ুরোপীয় ফ্যাসানে। আমাদের মেয়েরা যেমন ধোয়া মিলের সাড়িতে ব্রোচ এঁটে, খোঁপায় লোহার কাঁটা গুজে, সস্তা একজোড়া চটি পায়ে ট্রামে বাসে ঘুরে আপিসে আপিসে কাজ করে বেড়ান, তেমনটা এদেশে দেখা যায় না।

এই প্রসঙ্গে মাদাম—'র কথা মনে পড়েছে;—মিশরের নারী-জাগরণের জনপ্রিয়া নেত্রী। যেমন তাঁর রূপ, তেমনি তাঁর রং, তেমনি তাঁর সাজসজ্জা। কিছুটা প্যারিসের, বাকীটা আমেরিকার। তিনি যখন আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে, দুদিনের জন্যে ভারত ভ্রমণে এসে-ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিলো। বহু অভ্যাগতের ভীড়ের মধ্যেও তার রূপের জৌলুস তার গলার হীরের মতই ঝল্‌মল্ করছিল। তার কাছে শোনা গেল, ঈজিপ্টের নারী-জাগরণের ইতিহাস।

তিনি বল্লেন,—পুরুষের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হলে, নারীকে যে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এ কথা প্রথম মনে হয়, যখন বয়সে আমি কিশোরী। আমার দাদু ছিলেন পলিগ্যামিস্ট, শুধু থিয়োরিতে নয় কাজেও। আমি ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করতাম। "আচ্ছা ঠাকুমা দাদু যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন, তখন তোমার নিশ্চয় খুব রাগ, আর দুঃখ হয়েছিল!" ঠাকুমা বল্লেন,—"নারে, আমার বেশ ভালোই লেগেছিলো? মনে হয়েছিলো, এতদিনে তবু

প্রাণের কথা বলার লোক হোল। বাড়ীতে কথা কইতে গেলে, ন ঐ লোকটি পুরুষ মানুষ। তার কাছে কি সব বলা যায়? ভেবেছিলাম, এ ভালোই হোল। দুটো সুখদুঃখের কথা বলে মনের বোঝা হালকা করে নেব।" আশ্চর্য্য! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে এ নিয়ে যত ভেবেছি, মনে হয়েছে, ঠাকুরমার এই কটি সহজ সত্য কথার মধ্যে দিয়ে। মানব হৃদয়ের একটি চিরন্তন প্রবণতা ও প্রয়োজন আত্মপ্রকাশ করেছে। ঈজিপ্টের নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারকে এখনো কাগজে কলমে অপিসে আদালতে ছাড়া মেনে নিতে পারে নি। বহু বিবাহ যদিও অনেক কমে গেছে। বাইরে বেরুতে গেলে, মেয়েদের পক্ষে স্বামীর অথবা শাশুড়ীর অনুমতিই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে একজন উপযুক্ত রক্ষী চাই। মাদাম—র বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে এখনো অধিকাংশই নিজের অবস্থার সম্বন্ধে সচেতন নয়। নিজেদের দুঃখের কথা তাদের জানাই নেই। যেখানে অভাব বোধই নেই সেখানে অভাব দূর করবে কি করে। মেয়েদের ভোটাধিকার নিয়ে রাজার কাছে লেখালেখি করেছিলাম অনেক। ফল হোল না কিছুই। তখন ঠিক করলাম, আমরা জোর করে এসেম্বলিতে ঢুকব। 'এসেম্বলী'র পাশেই একটা মস্ত মাঠ পড়ে ছিল। সেই মাঠে মেয়েদের এক বিরাট মীটিং ডাকলাম, সেশন্ সুরু হবার দিনে। দেড়মাস ধরে সব ব্যবস্থা করে মাঠ সাজানো গেল, দলে দলে দূর দূর থেকে মেয়েরা এল। এদিকে আমাদের চরেরা লক্ষ্য রাখছে assembly হলের উপর। দলে দলে হোমরা চোমরা assemblyর সভ্যরা বড় বড় গাড়ী করে ভিতরে ঢুকে গেল। তখন আমি উঠে ভাল করে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললাম। বল্লাম—আজ মিশরের ইতিহাসের এক স্মরণীয় মুহূর্ত। এস, আমরা সব বোনেরা মিলে একসঙ্গে যাত্রা করে ঐ শাসন গৃহে প্রবেশ করি। ওখানে গিয়ে হাতে হাতে আমাদের রাষ্ট্রের অধিকার নিই। আমাদের নাগরিক দাবী লড়াই করে জিতে নিই। তখন একটা মৃদু অজ্ঞাত আবেগ অধিকাংশ মেয়ের মনে দুলে উঠল।

আমরা মঞ্চ থেকে নেমে, ঘুরে গিয়ে এগিয়ে চল্লাম, এগিয়ে চল্লাম গৃহের দিকে। আমাদের পিছনে পিছনে, কাতারে কাতারে মেয়েরা চলল, কেউ বা অনাবৃত মুখে, কেউ বা ঘোমটা পরে। সে এক অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় দৃশ্য। ঈজিপ্টের জাতীয় ইতিহাসে এর আগে আর কখনো এমনটি ঘটে নি।

আমাদের দেখে রুখে দাঁড়াল রক্ষীরা—বল্লে,—হুকুম নেই। আমাদের মধ্যে শ দুই আড়াই মেয়ে ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। আমরাও তাই পাল্টা রুখে উঠলাম, বল্লাম,—খবরদার! আমরা হাজার মেয়ে আর তোমরা মাত্র দু'জন। যদি বাধা দিতে আস, তাহলে টুকরো টুকরো করে ফেলব। তারা ভয়ে ভয়ে চুপ করে গেল। আমরা ওদের বন্দুক আর বেয়নেট কেড়ে রেখে দিলাম। ভিতরে খবর পৌঁছে গেল। ওরা তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে, বন্ধ করে দিল হলের দরজা। ঘাস বিছানো মস্ত উঠোনে বসে রইলুম আমরা প্রায় শ' পাঁচেক মেয়ে। ক্রমে যখন বিকেল গড়িয়ে সাঁঝের দিকে চলে যায় যায়, তখন একজন এসে খবর দিলে। এসেম্বলীর কর্ত্তা-

নীল-শাসক আসোয়ান বাঁধ
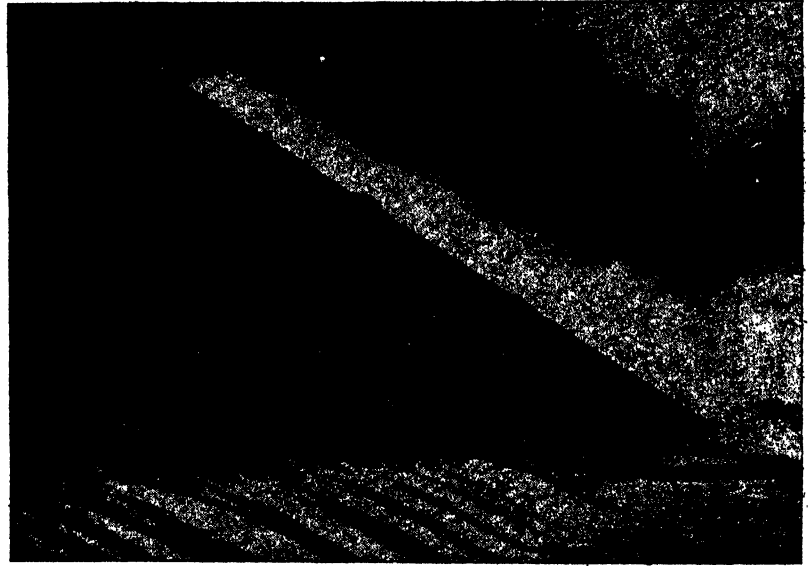
মশাই আমাদের দু'জন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে চান। আমরা দুজনে ভিতরে গেলাম। অনেক কথার পরে তারা রাজী হোল। বেশ, ভোটাধিকারের দাবী আমাদের মেনে নেবে তারা, যদি আমরা এই মুহূর্তে তাদের দাবী মেনে নিয়ে, শান্ত ভাবে, যে যার ঘরে চলে যাই। আমরা জয়োল্লাসে ফিরে এলাম ঘরে। বিদ্রূপ করে হেসে উঠল রক্ষীদল।

"তারপরে পেলে কি তোমাদের দাবীর স্বীকৃতি!" জিজ্ঞেস করলাম আমি। তিনি বল্লেন—"না পেলুম না।" ওরা সেদিন ভুলিয়েছিলো আমাদের। যেমন করে ঘরের মেয়েদের ভোলায় ওরা, বাজে স্তোকবাক্য দিয়ে।

তারপরে সে অনেক কাহিনী। আমরা জোর আন্দোলন চালালুম,

ইংলণ্ডের সাফ্রেজিষ্ট মুভমেণ্টের অনুকরণে। কিন্তু দেখলাম, লাভ কিছুই হচ্ছে না। আমরা যত হিংস্র হই,—প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসার শক্তি তত ভয়ানক হয়ে ওঠে। আমাদের জিভে ও দাঁতে যত জোর, ওদের হাতকড়ার জোর তার চেয়ে অনেক বেশী। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা পেল, তখন আর সব দেশের মতই আমাদের দৃষ্টিও ভারতের উপর পড়ল। দেখলুম কত সহজে, কী অনায়াসে ভারতের মেয়েরা তাদের রাষ্ট্রের অধিকার পেয়ে গেল। কি করে সম্ভব হোল? আমরা বইপত্তর যোগাড় করে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মোটামুটি ইতিহাসটা জানবার চেষ্টা করলুম। প্রথমেই হাতে পড়ল মহাত্মা গান্ধীর 'আত্মজীবনী।' ঐ একটা বই-ই বোধ হয় একটা গোটা জাতের পক্ষে যথেষ্ট। মহাত্মার অহিংস
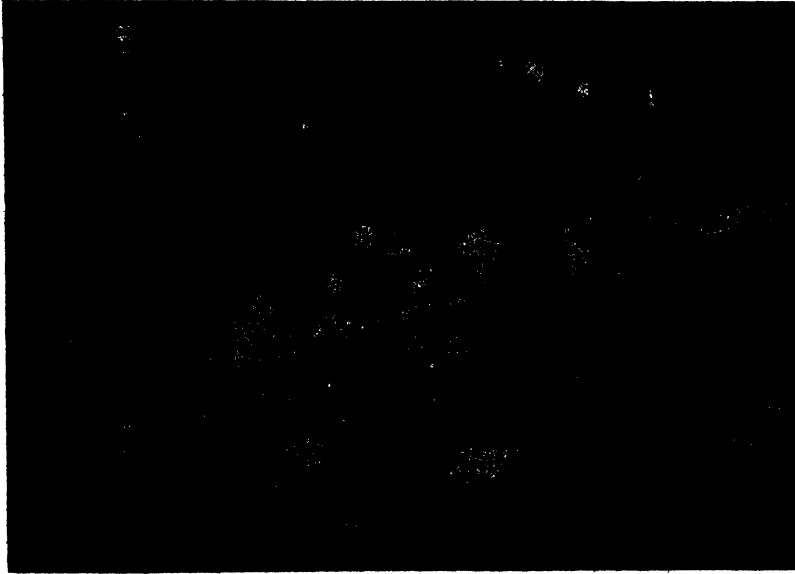
কায়রো নগরীর একটি আলোকোজ্জ্বল রাজপথ

অসহযোগের জাতীয় আন্দোলনের কথা আমাদের তেমন জানা ছিল না। বই পড়ে সব সরল হয়ে এল। বুঝতে পারলুম, দুর্বলের পক্ষে এমন অস্ত্র আর নেই। লোহার ছুরি দিয়ে কেবল ক্রোধকেই খুঁচিয়ে তোলা হয়। আর এই ছুরি দিয়ে ক্রোধ হয় ত জাগে,—কিন্তু সেই সঙ্গে সহানুভূতি জাগে। বুঝলাম, আমাদের যুদ্ধের ধারা বদলাতে হবে।

আবার আমাদের উদ্দীপনা বেড়ে গেল। বক্তৃতার সুর গেল বদলে। শেষে একদিন আমি মন্ত্রীমশাইকে নারী সভার পক্ষ থেকে একটা চরমপত্র দাখিল করে অনশন সুরু করে দিলাম। আমার স্বামী, আত্মীয়-স্বজন সবাই বারণ করল। ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। Assemblyর মেম্বাররা প্রায় সকলেই আমার স্বামীর বন্ধু। তাঁরা এসে অনুরোধ উপরোধ জানাতে লাগলেন। আমি টললুম না। শেষে যখন ডাক্তার বললে আর ২৪ ঘণ্টার বেশী জোর নেই, তখন মুখ চিন্তিত হল।

ভয় হোল, পাছে মরে গিয়ে শহীদ হয়ে ওঁদের পরে টেক্কা দিই। আমি মনে মনে হাসলাম, "মরিয়া হবে জয়ী, আমার পরে এমনি করিয়াছ পণ।" যা হোক, শেষে ফারুক প্রতিজ্ঞা করে চিঠি দিলেন—আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার তাঁরা মেনে নেবেন।

—সে ইলেক্শন কবে? জিজ্ঞাসা করলুম আমি।—"আর কবে?" একটু ম্লান ছায়া খেলে গেল তাঁর মুখে,—'ফারুকের পরে নাজির। নাজিরের পরে নাগীব।—কে জানে কবে হবে আবার ইলেক্শন।

—"আচ্ছা ফারুক কেমন রাজা ছিলেন? সত্যি বল!" একথায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন ক্লিওপেট্রার দেশের নারীনেত্রী, বল্লেন!—"আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না"।

—তবু অনেককেই আমি একথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কায়রোতে। সবাই বলেছিলো—সে আমার দুষমন, দরিদ্রের উৎপীড়ক, কামনার দাস। সে চলে যাওয়ায় সুন্দরী মিশরীভূমি নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। এইবারে সে আস্তে আস্তে জেগে উঠবে। দেখছ না, দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেছে। নূতন উৎসাহে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইছে সকলে। দেখো আর বেশীদিন নেই। ইজিপ্টের সমস্ত দুর্নাম আমরা দূর করব।—তার বন্দরে বন্দরে অর্থ-উপায়ের যত কুৎসিত পন্থা, তার দোকানে দোকানে চড়াদামের যত ভাঁড়ামি, যত জুয়াচুরি সব আমরা দূর করব। ছ'মাস পরে তুমি তো এই পথেই ফিরবে, তখন সৈয়দ বন্দরে তোমার নৌকো থামলে একবার নেমে দেখে যাচাই করে নিও আমাদের কথা। সত্যিই সেদিন দেখেছিলাম উৎসাহের দীপ্তি।—যেদিকে তাকাই সেদিকেই।—যারই সঙ্গে কথা বলি, তারই মুখের ভাষায় আশার আলোর ঝলকানি।—ওরা উঠবে, ওরা ছুটবে, ওরা বাঁচবে।—ওরা বাঁচতে চায়। নতুন প্রাণের আশায় ওরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চলেছে। কোথায় পেল ওরা এই প্রেরণা—ইসলামের গোড়াতেই বোধহয় আছে এই একতার প্রেরণা—ভ্রাতৃভাবের মূল সূত্র। যে ছিল দাস, ইসলামের অধীনে আসামাত্র সে হোল ভাই।—তার সঙ্গে খাওয়া বসা তো বটেই, এমন কি বোনের বিয়ে দিতেও আর বাধা রইল না। এমন কি সিংহাসনে বসে তার রাজা হবার দাবীকে কেউ জাতবিচারের দোহাই দিয়ে অগ্রাহ্য করবার উপায় রইল না।—পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ঐক্য বন্ধন, ... ভ্রাতৃত্বের চেয়ে অনেক দৃঢ়। ... প্রভৃতি ধর্ম

ধ'চারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে, সর্বধর্মসমন্বিত মানবমহামন্দিরের বেদীমূলে আপন চিত্তকে প্রসারিত করে তুলতে পারে, তবে সেদিন বিশ্বদেবতার পূজার আলোর যে অপূর্ব অর্ঘ্য নিবেদিত হবে, জগতে তার তুলনা বিরল।

একতার শক্তিই ইসলামের শক্তি।—তবু বলব। ঈজিপ্টের ঐক্যবোধ ইসলামের উপরেই নির্ভর করে নেই। সাদা জলে সূর্য্যের হাসি ঝিকমিকিয়ে তুলে নীলনদ বলে—"ঈজিপ্টের একতার মূলে যদি কেউ থাকে, তো আমি,—সে আমি, সে আর কেউ নয়।

নীলনদের দুইপাশ বেয়ে নেমে এসেছে উর্বরা দুই সরু জমির ফালি। যেন নীলফুলের এক গাছি মালা হাতে হাতে মিলিয়ে ধরে দুই তন্বীশ্যামা অপ্সরী নেমে আসছে। তার কোলে কোলে মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে। চাষ করেছে তার সবুজ আঁচলের ছায়ায়।—সো না র শ স্যে ভ রে উঠেছে দেশ।—নৌকো বোঝাই হয়ে গেছে, পৃথিবীর নানা দিকে,—মধ্য এশিয়ার পণ্যহাটে।—সেখান থেকে বোঝাই এসেছে ধন।—জমে উঠেছে মানুষের হাতের সৃষ্টিতে, মন্দিরের মূর্তিতে, আর কালজয়ী পিরামিডের চূড়ায়।—

ঈজিপ্টের মত এমন বিশাল মরুদ্যান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।—এমন ৭০০ মাইল লম্বা আর পনেরো থেকে ত্রিশ মাইল মাত্র চওড়া সরু লম্বা দেশও বোধহয় আর নেই।

নীলনদের দেবতার নাম হাপি। হাপির সন্তান ঈজিপ্ট। পিতার মতই স সন্তানের জন্যে প্রতিবৎসর যাচ্ছে তার আহরণ করে। প্রতিবছর বর্ষার শেষে বন্যা নামে নীলনদে। মরুভূমির প্রান্ত পর্য্যন্ত দুইতীর ডুবে জলের তলায় ডুবে যায়। তিনমাস পরে জল কমতে সুরু করে,—আস্তে নেমে যায় সাগরে। যাবার আগে রেখে যায় তার দান।—ফিরে যায় তার জমিতে, প্রতিকোণে থাকতরা এক থকথকে কালো মাটির চাদর। ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে যায় কাজে, প্রতিবছর নতুন মাটিতে করে চাষ। বছর ভোর জলসেচের ব্যবস্থা ওরা করে খালে এবং বাঁধে। ওদের সরু দেশের উর্বর জমির প্রতি ইঞ্চি ওরা সোনা ফলাতে চাইতো, তাই বাড়ীগুলিকে প্রায় ঠেলে নিয়ে মরুসীমার কাছাকাছি।—আর মেজভরে কাজ করত চাষী। এই নদীর মাটি আর ঐ হাপি আর জমিই ওদের প্রাণ—ওদের মান সর্বস্ব। ...

মধ্যে একান্ত সহযোগিতা। ঐ নদীর জল যদি কেউ দূষিত করে সমস্ত দেশের তৃষ্ণা হাহা করবে মরুর মত। ঐ খালগুলিতে যদি কেউ কখনো বাঁধ বেঁধে শুধু নিজের জমির ভোগে লাগায় তাহলে 'সেচ' ব্যবস্থা যাবে উল্টে। আসোয়ানের মুখ থেকে মোহানার মুখ পর্য্যন্ত এক একদিকে মাত্র সাত থেকে পনেরো মাইলের মধ্যে। কোন কোন যায়গায় তা এত সরু যে, যার তীরভূমি অতিক্রম করে দি বলেই হয়। এই জন্যেই এদেশে সহরের সংখ্যা খুব কম। কারণ সহরের বড় বড় রাস্তা প্রাসাদ ইত্যাদিতে জমি নষ্ট না করে, যতটা সম্ভব চাষে খাটানোই ওরা প্রয়োজন মনে করত। গ্রামে চাষীরা তাদের খেজুরগুড়ির ঠেকনা দেওয়া, ঘাসের ছাউনিমেলা খড়পাতার ঘরগুলি ঠেলে নিয়ে যেত মরুসীমার প্রান্তে। প্রতি চাষীর সঙ্গে অন্য চাষীর সম্পূর্ণ সহযোগিতা না থাকলে এই ক্ষীণদেহা লম্বা দেশকে এমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তোলা যায় না। অথচ সেই যুগে এখানেই মানুষের বসতি ছিল সবচেয়ে ঘন।

এই ঘনসন্নিবিষ্ট মানুষের দল নীলনদের আশীর্বাদ শিরোধার্য্য করে বাঁচতে চাইল এই দেশে। সেইযুগেই ওরা জানতে পেরেছিলো, যে, পরস্পরের সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা ছাড়া এদেশে বাঁচা সম্ভব নয়। নীলনদের দান ব্যর্থ হয়ে মিথ্যা হয়ে যাবে, যদি তারা সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, যদি না স্বীকার করে নেয়, বাঁচার প্রয়োজনেই একের সঙ্গে অন্যের অবিচ্ছেদ্য যোগ। একের সুবিধা অন্যের সঙ্গে অভিন্ন যোগসূত্রে গ্রথিত। তাই ওরা সঙ্ঘবদ্ধ হোল, ওরা বাঁচল। ওরা সেই আদিম যুগে এমন এক আশ্চর্য্য রাজশক্তির সৃষ্টি করল, যার অধীনে সমগ্র দেশ কর্মজোয়ারে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেগে উঠল। ওরা বাঁচল, শুধু ফসল ফলিয়ে নয়, ওদের কর্মধারা

রাজা ফারুকের প্রমোদতরণী অধুনা সেমিরামিস্ হোটেল রেষ্টুরেণ্ট

নদীতীরের খনি থেকে সোনা তুলেও নয়, ওরা বাঁচল মনুষ্যত্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষ এই মাটিতেই চলছে ফিরছে বটে, কিন্তু পশুর মত তার দৃষ্টিকে আটকে রাখেনি মাটিতে, তাকে মেলে দিয়েছে আকাশে। প্রয়োজনের সীমা থেকে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রয়োজনের উর্দ্ধে। এই প্রয়োজনাতীতের ক্ষেত্রেই মনুষ্যত্বের প্রথম বিকাশ, এইখানেই তার সভ্যতার আদি সোপান, তার আনন্দের উপলব্ধি।

কিন্তু মিশরের সভ্যতার সুরু বোধহয় প্রয়োজনের তাগিদেই প্রয়োজনাতীতের আহ্বানে নয়। এইখানেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন মিশরী সভ্যতার মূলগত অমিল। ভারতবর্ষ প্রয়োজনকে যেন আমলই দিল না।—বল্লে,—এই বাহু। আগে চল আর। বল্লে, ঐ

শেখেৎ-মন্দির
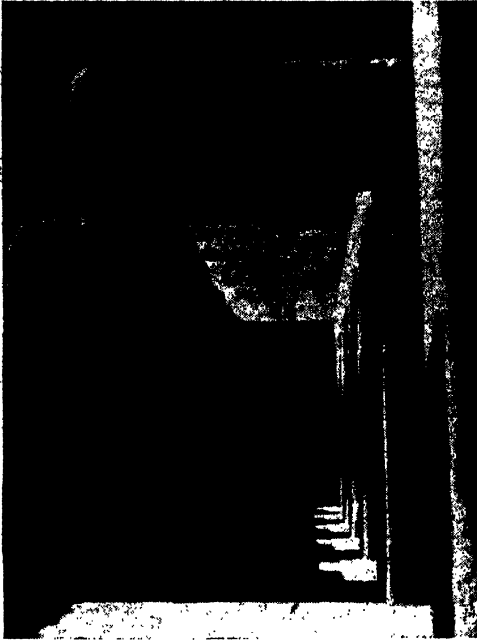
নিতান্ত বাইরের জিনিষটার দাবী বড় কম, সেটা যেমন তেমন করে মিটিয়ে দাও। ওকে অতিক্রম করে যে অদেহী আত্মার আনন্দ কচিৎ কখনো তোমার চিত্তকে দোলা দিয়ে যায়, তাকেই ধরবার চেষ্টা কর।—বল্লে, ঐ প্রয়োজনটার দাবী তো মাত্র এই দেহটার উপরেই। কিন্তু এই দেহটারই বা কতটুকু আয়ু? ফেলে দাও, পুড়িয়ে দাও ওকে নিঃশেষে ছাই করে। থেকো না ওর মায়ায় বদ্ধ হয়ে, ও শেষ হয়ে গেলেও আমি থাকব, থাকবে আনন্দ।

এরা বল্লে,—না না এই দেহটাই সবচেয়ে বড়, এরই মধ্যে দেবতার বাস।—যে দেবতা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত, যার নাম 'ক'। কাজেই এই দেহ পবিত্র। একে নষ্ট কোর না, একে ওষুধে ডুবিয়ে, আরক মাখিয়ে রেখে দাও, কাঠের বাক্স করে, যদি সাধ্য থাকে তার উপরে দাও মোটা সোনার পাত, তাতে চিত্র বিচিত্র কত কাহিনী খোদাই করে তুলি বুলিয়ে লিখে রেখে দাও। তার উপরে রচনা কর স্তূপ, উচ্চ তোল তার চূড়া। এত উঁচু যে কাল সমুদ্রের তরঙ্গ দোলা যেন লাগে না তার গায়ে।

আমরা বলেছিলুম দেহকে ভস্মীভূত করেও আমরা বাঁচব, ওরা বলেছিলো এই দেহকে নিয়েই আমরা বাঁচব। মরে গেলেও রেখে দেব এই দেহ, নীরব নির্জন পাষাণের কোলে চিরবিশ্রামের সুখশয্যায়। জীবনের সব সুখ সব ভোগের উপকরণ রেখে দেব তার কাছে।—রেখে দেব শস্য কণা থেকে সুরু করে মণিরত্নের আভারণ পর্য্যন্ত। কৌচ কেদারা গদী-পালঙ্কের বিলাস আয়োজন,—রেখে দেব অস্ত্রশস্ত্র রথ। আর তার গুহাশ্রমের দেয়ালে ছবি এঁকে লিখে রেখে দেব—তার কীর্তিকাহিনী তার নাম ধাম। তার 'ক' (আমাদের বুদ্ধিতে অনুবাদ করলে 'ক'কে প্রেত বলব না জীবসংস্কার বলব, ঠিক করা শক্ত) ভোগবিলাসে তৃপ্ত হয়ে থাকবে তার দেহের পাশে পাশে, ক্ষুধার তাড়নায়, ভোগের বাসনায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে না ঘর ছেড়ে।

ওরা যতদিন বেঁচে থাকে, প্রাণপণে কাজ করে, চাষ করে, তাঁত বোনে, আর পাথর ভেঙে মন্দির গাঁথে, কবর খোঁড়ে। ওদের পণ্ডিতের দল নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে রাতের পরে রাত, গোণে সূর্য্যের ঋতুবিবর্তনার দিনগুলি। জানতে চায় আবার কবে আসবে সেই বন্যা,—মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে যাবে কালো সোনার আঁচল। ওরা আশা করে বসে থাকে, পুজো দেয় অসিরিসের মন্দিরে।—পণ্ডিত পূজারী বলে,—ভেবো না, বসে থাক আশা করে, আর ভোগ দাও, নীলদেব তুষ্ট হয়ে দেবে আবার বর।—শুনে ওরা চুপ করে থাকে। পণ্ডিতের গণনা চলে নানাদিকে,—শেষে একদিন সে বলে দেয়, ঐ তারিখ নাগাদ নামবে ঢল।

প্রয়োজনের তাগিদেই অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিশাস্ত্র ধরা দিয়েছিল মিশরী পণ্ডিতের জ্ঞানের সীমানায়। ঋতুচক্রের কাল হিসেব করে ওরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে ভাগ করা কালখণ্ডকে বৎসররূপে কল্পনা করে নিল। আধুনিক জ্যোতি বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও, সে হিসেবের সঙ্গে দিনের মাত্র এক ষষ্ঠাংশ ভাগের হিসেবে গরমিল দেখা যাচ্ছে, যে ষষ্ঠভাগ চার বছর অন্তর লীপ্ ইয়ারের জন্ম দেয়।

ওরা পৃথিবীর আহ্নিক আত্মপ্রদক্ষিণ ও বাৎসরিক সূর্য্যপরিক্রমার দিনগুলি হিসেব করে, মাসে সপ্তম ভাগ করা যে ক্যালেণ্ডার সৃষ্টি করেছিল, আধুনিক ক্যালেণ্ডার তার চেয়ে খুব বেশী উন্নতি করতে পারে নি।

ক্যারাও বংশেতিহাসের আগেকার রচনা সোপানে গাঁথা পিরামিডের গর্ভে পাওয়া গেছে এই ক্যালেণ্ডার, আধুনিক বিজ্ঞানাধীন এই যুক্তির দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ কটাক্ষে যেন বলছে,—'রাখো তোমার বড়াই। ৬।৭ হাজার বছরের বিবর্তনার ফলে মানুষের বুদ্ধি কি খুব বেশী বেড়েছে।

যে যুগে চারিদিকে কেবল পাথর আর সাগর আর [illegible] যে যুগে

মানুষের বুদ্ধি সবে চেতনায় আলোর এসে পৌঁছেচে, এমন দিনে আমরা এই মরুবেষ্টিত ধরণীর ছোট্ট টুকরোয় বসে, আকাশ এবং পৃথিবীর মনমৰ্জির হিসেব করেছি, বলে দিয়েছি কবে নামবে বন্যা। বন্যার জল মাপবার উপায় উদ্ভাবন করেছি।—তোমাদের আধুনিক যন্ত্রের চেয়ে তার গুণ কম নয়। আমরা জানতাম কত উঁচু বন্যায় নামবে সুখসমৃদ্ধি, কিসেই বা হবে দুঃখ দুর্দশা। বন্যার জল যদি মাত্র ১২ এল বাড়ে, তবে দুঃখ ঘুচবে না, খিদে মিটবে না। ১৩ এলে তবু কিছু হবে, ১৪তে একটু হাসি ফুটি ফুটি করবে মানুষের মুখে, ১৫তে নিশ্চিন্ত হবে তারা, আর ১৬তে প্রাচুর্য্য ছড়িয়ে পড়বে দেশে, ঘরে ঘরে ভরে উঠবে তৃপ্তি—নৌকো বোঝাই হয়ে যাবে দূর দেশে। হে দেব, হে নীল, আমাদের জন্তে বয় এনো ১৬ এল জল—তোমার ষোলটি সন্তান তারা। বুড়ো নীলের ষোলোটি এঁড়ি গেঁড়ি সন্তান আর কিছু নয়, ষোলো এল জলের মাপের রূপকমিশান।

* * *

ভোর ফুটে সকাল হ'তে না হতেই হোটেলে এসে জুটেছে যত দালালের দল। কেউ নিয়ে যেতে চায় পিরামিডে, কেউ বলে, চলো আগে মিউজিয়ামটা দেখিয়ে আনি। কেউ লোভ দেখায়, একদিনেই লাক্সর ঘুরিয়ে আনবে ট্যাক্সি করে। যদি লাক্সরেই যাওয়া চলে তবে কেন উল্টো দিকেই বা চলবে না গাওয়া, কেনই বা যেতে পারব না,—আলেকজেণ্ডিয়া? "রাখো তোমাদের বড় কল্পনা,—ওসব কিছুই হবে না। এখন পর্য্যন্ত পিরামিড দেখা হয় কিনা সন্দেহ, অধীর হয়ে উঠছে খুকু, আর ট্যাক্সিদের সঙ্গে সমানে আমাদের দর কষাকষি চলেছে। এদিকে বেলা ক্রমশঃ গুটি গুটি পা পা করে এগিয়ে আসছে। সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন হোটেলের অফিসার, ফিটফাট একজন ফরাসী জু। এখানে এসে একটা জিনিষ ভারী আশ্চর্য্য লাগছে। ফরাসী আর ইটালীয়দের সঙ্গে মিশরীদের তেমন তফাৎ করা যায় না। দু তরফেরই ঠোঁটা লালচে। বোঝা যায় রক্তে রক্তে মেশামেশি অনেক হয়েছে। অনেকের আবার দেখি পুরু ঠোঁট আর কোঁকড়া চুল। ওদের রক্তে—আফ্রিকার ঘন জঙ্গলের ইসারা। কত সহস্র বছর ধরে, কত অজস্র দেশের লোক এখানে এসেছে আর মিশেছে আর পান করছে নীলনদের জল।

ফরাসী ইজিপ্সির বল্লেন,—দুপা এগোলেই ট্যুরিস্ট অপিস। সেখানে ঠকবার ভয় নেই, কারণ তার উপরে প্রতি মাসে সরকারী চেকিং হয়। বলে আমাদের জলকণ্ঠা নাচিয়ে উঠলেন। 'অ্যাপিস' এই কথাটির পরে তাঁর মোহ আছে। যেন আপিসে আর চুরি চলে না। চলে বই কি, অপিসী মানুষটি হেসে ওঠেন, তবে সে হোল গিয়ে অফিসিয়াল চুরি।

যাই হোক আমরা মিশরী সাহেবের কথা মত ঠিক যায়গায় এসে পৌঁছলাম। ছোট্ট একফালি ঘর, কিন্তু সাজানো গোছান চমৎকার।—লালটুকটুকে কার্পেটে পাতা, সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা কাঠের মাচা, পিতলের রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখানে বসে দুজন লোক কি যেন খুঁজছে, নীচের ঐ সরু ঘরে চার পাঁচজন হোমরা চোমরা ভদ্রলোক বসে আছেন,—তাদের গায়ে রেশমী আলখাল্লা, মাথায় মস্ত ল্যাজ দোলান ফেজ, আমাদের দেখে তাঁরা একটু চকিত হয়ে উঠলেন। উপরের লোক দুজনের কথাবার্তাও হঠাৎ যেন থমকে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই যেন হঠাৎ কি একটা চলতি জিনিষ চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। আমরা একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইলাম। হোমরা চোমরাদের মধ্যে এক

মন্দির দুয়ার

জন উঠে দাঁড়িয়ে ঝুকে পড়ে কুর্ণিশ করলে,—বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে, ঐ সরু ঘরে অতগুলি নাম না জানা লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার মনটা কেবলি দ্বিধা করতে লাগল। কিন্তু অজানা ট্যাক্সিতে চড়তে আরো ভয়; যদিও কবি বলেছেন, জয় অজানীর জয়, তবু আবার তিনিই স্বীকার করেছেন মনুষ্য চরিত্রের এই দুর্বলতা, এদিকে তোর ভয়। খুকু কেবলি অধীর হয়ে উঠছে, "যত সব বাজে ভয়। আমাদের সঙ্গে যখন একতিল গয়না নেই, তখন কে আর কি করবে—? ডাকাতের ট্যাক্সি হলেই বা ক্ষতি কী? কিন্তু পিরামিডের আশে পাশে, মামদোভূতের আড্ডাখানার ধারে ধারে জনশূন্য মরুভূমির শূন্যতায়, এই সুদূর প্রবাসে যদি কিছু হয়। রাখো তোমার মনকে কষে ধমক দিয়ে। দরদস্তুর ঠিক করে বেরিয়ে এলাম।

ওরা বল্লে,—"এখন ৯টা, সব দেখে শুনে লাঞ্চের মধ্যে ফিরে আসতে

পারবে কথা দিচ্ছি। বলে তারা বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির সঙ্গে বন্দোবস্ত করছে, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন, তাঁর মাথায় ফেজ আর গায়ে বিলিতী স্যুট। তাঁকে দেখে ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর কর্তামশাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বল্লেন,—"আর ভাবনা নেই,—প্রফেসর এসে গেছেন, এঁর সঙ্গে যেখানে খুশী যেতে পারেন।

প্রফেসরও মনের মত কাজ পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন,—ভাঙা ইংরেজীতে তাঁর মনের উৎসাহ জানা গেল। অনেক কম ভাড়ায় এক ছোট ট্যাক্সি ঠিক করে আনলেন। গাইড হিসাবে তাঁকে যা দিতে হবে, সব মিলিয়ে আমাদের আগের-দরের চেয়ে অবশ্য একটু বেশীই পড়ল,—কিন্তু সাইকোলজীর এমনই কারসাজী যে এবারে আর মন খারাপ হোল না। বরং প্রায় একটার দামে দুটো পেয়ে গেলাম, এই কথা ভেবে মন খুশী হয়ে উঠল, ট্যাক্সির দামে ট্যাক্সি এবং গাইড, আর যে সে গাইড নয়,

পীরামীদ থেকে ফেরার পথে

একেবারে প্রফেসর, আজে বাজে কলেজের প্রফেসর নয়, একেবারে ইউনিভারসিটীর। সত্যি, অবসর সময় গাইডের কাজ করে একসঙ্গে লোকের এবং নিজের উপকার করা,অর্থ এবং পুণ্য একই সঙ্গে অর্জন করা কম নয়। কিন্তু প্রফেসর মাথা নাড়লেন। না না, দুটো কাজ একসঙ্গে হয় না, তাই তিনি প্রফেসরী ছেড়ে দিয়েছেন। গাইডের কাজ আরও বেশী, মুক্তিও বেশী। রোজ রোজ একই কোর্স পড়াবার একঘেয়েমী থেকে মুক্তি। সাবাস্!—আমাদের দলকর্তা লাফিয়ে উঠলেন। অমনি বেপরোয়া যদি আমরা হতে পারতুম্।—কি করে হবে শুনি? এরা তো আর সেকালের চাষী মিশরী নয়। এদের রক্তে আরব বেদুইনের আগুন জ্বালা রক্তের ছোঁয়া—সেটা কেন ভুলে যাচ্ছ। বেপরোয়া হতে বাধা নেই। তা বলে পাকা প্রফেসারী ছেড়ে দিয়ে লোককে কবর দেখিয়ে বেড়ানো, এ শুধু বেদুইনী রক্তের বাঁজ নয়। আগে কিছু রহস্য আছে। কোথাও নিশ্চয় লুকানো আছে, বেপরোয়া মুক্তির উৎস মূল। হাঁ গো প্রফেসর মশাই, আপনি বিয়ে করেছেন? প্রফেসর সলজ্জে ঘাড় নাড়লেন। আঃ হায়, দলকর্তা লাফিয়ে উঠলেন। তাই জন্যই চাকরি ছাড়তে পেরেছেন, কারো নাকের নোলক গড়বার ফরমাস তো আর খাটতে হয় না। প্রফেসরও হাসলেন, কিন্তু গায়ে পেতে নিলেন না তাঁর ভবিষ্যত বধূর অপমান। বল্লেন, My fiance does not mind, আমার প্রিয়তমা কিছু মনে করেন না।

কেমন এইবার? আমি জোর পেলাম। আপনার প্রিয়ার সঙ্গে বিয়েটা কবে হবে? আমরা একটা ইজিপ্সীয় বিয়ের ভোজ খেতুম। সবই কপাল। প্রফেসর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্লেন। বিয়ে যে কবে জানি না।

কেন, কেন?

কারণ সেই সনাতন। সমস্ত এশিয়ায় এই একই কারণ। প্রাচীন ও আধুনিকের দ্বন্দ্ব। প্রফেসরের প্রিয়া হলেন আধুনিকা। তার ফ্রকের ঝুল হাঁটুর নীচে নামে না, তাঁর বব্ করা চুল, আর ঠোঁটে রাঙা রঙ। এদিকে প্রফেসরের মা প্রাচীনা। বাড়ির বাহিরে পা দিতে হলে, নিজেকে ঢেকে নেন বোরখায়। নখে মেহেদিপাতার রঙ থাকলেও, অধরে রক্তিমা স্পর্শ করাতে তাঁর ঘৃণা। একা একা খোলা পথে পা বাড়াতে তাঁর ভয়। এই ভয়ঙ্কর অমিল-যুগলের মিল করাতে প্রফেসারের আবার ভয় হয়। পাছে সব কিছু গরমিল হয়ে যায়। তাই প্রফেসর অপেক্ষা করে আছেন, যতদিন না উভয়ে উভয়ের কাছে এগিয়ে আসছে, স্নেহে এবং শ্রদ্ধায়। চেষ্টা করছে পরস্পরকে বুঝতে। ততদিন পর্য্যন্ত না হয় জীবন শূন্য হয়েই থাকে।

গাড়ী চলেছে গড়িয়ে, শহর শেষ হয়ে সহরতলীর পথ ধরেছি। চওড়া, কালো, পালিশ করা রাস্তা সোজা চলে গেছে। এ পাশে যেখানে আর একটু দূরেই, তরঙ্গায়িত বালির রেখায় সমুদ্রের পাড় গেছে কেটে। মাঝে মাঝে জলা, তাতে ঘাসের দিকে জঙ্গল। রাস্তার দুধারে পাম গাছের সারি, আর তার পরেই প্রাসাদ শ্রেণী। সব গুলিই ঝকঝক্ করছে। কে জানে কত ওদের বয়স? কিন্তু ওদের মধ্যে মিশরী চরিত্রের দৃঢ় কাঠিন্য। নষ্ট না করে উপায় নেই। ওদের গড়ন আধুনিক বটে কিন্তু ওদের ঢঙে ঢাঙে পিরামিডের বলিষ্ঠ দৃঢ়তা। আর ওদের চারপাশ ঘেরা বাগানের পাড়। এসব বাড়ী সব আমীর ওমরাহদের। ... ব্যবসায়ীদের ভাড়া বাটী। ... 'কিন্তু

…কসর বলেন,—"রাজত্বে পূর্ণ। রাজশক্তির অবসান তো হোল,—…খন কি এ বাড়ীগুলি সাধারণের কাজে লাগবে? এ প্রশ্নের জবাব …লে না। সাধারণ কারা? তারা কোথায় আছে,—এই সহরের …শাল প্রাসাদগুলির আনাচে কানাচে কোথায় তারা লুকিয়ে আছে …ক জানে! বাইরে থেকে কয়েকদিনের জন্তে এসে যারা অনেক-…দিনের খোরাক সংগ্রহ করে নিতে চায়, তাদের ঘুরে বেড়ানোর পথে …রা তো তেমন করে পড়ে না। ভিকিরিও তো দেখলুম বলে মনে …হল না। আছে নিশ্চয় লুকিয়ে ছাপিয়ে কোন কোন গূঢ় পাড়ার …লিগলির ছায়ায় ছায়ায় মিলিয়ে। আমাদের দেশের মত চোখের …মনে জল জল করে বেড়াচ্ছে না। কিন্তু নাঃ,—কোথাও তাদের …দেখতে পেলাম না। সেই যে রুক্ষবেশ উলঙ্গ প্রায় জীর্ণশীর্ণ প্রেতায়িত …মানব সন্তানের দল ভারতের তীর্থে তীর্থে, পথে পথে, প্রতি মন্দিরের …দ্বারে দ্বারে। পণ্যবিপণীর আশে পাশে হাত বাড়িয়ে পথিকের পিছন …পিছন ছুটতে থাকে। তারা কোথায়? এদেশে তো তাদের অস্তিত্ব …বেশী রকমই ছিল জানতাম। তবে কেন দেখতে পেলাম না। …জিগ্যেস করতে ভরসা পেলাম না। পাছে কস্ করে বলে বসে, …রাজশক্তির অবসানে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সেই বানিয়ে তোলা …মধ্যে দারিদ্র্যের হাত থেকে খানিকটা উদ্ধার করতে পেরেছে নিজেদের।

যাই হোক, এসব হোল আধুনিক ঈজিপ্টের কথা। আমি কিন্তু …দেখতে গিয়েছিলাম প্রাচীন ঈজিপ্টকে, যার ছবি আজো এদের সমাধি …মন্দিরের নানা উপকরণের গায়ে গায়ে নানা রঙের তুলির ফলকে লেখা আছে। মিউজিয়ামে রাখা ঐ চিত্রখণ্ডগুলি রুদ্ধকালের যবনিকা একটুখানি খুলে দিয়ে মানুষকে নিয়ে যায় সাত আট হাজার বছর আগের মানুষের জীবনে। ঐ যে নৌকো বোঝাই হয়ে পাজিয়াস চলেছে। তাঁত বুনছে তাঁতী, হিসেব লিখছে সরকার, গয়না গড়াচ্ছে স্তাকরা, আর বাটনা বাটছে ময়দা ঠাসছে দাসদাসী। ঐ যে সরু নৌকায় করে রাজা চলেছেন মৎস্তশিকারে পদ্মসরোবরে।—সঙ্গে চলেছে সখীরা। তাঁদের গায়ে সূক্ষ্ম সাদা আগুলফলম্বিত উড়নি দুই কাঁধে বেয়ে পিঠ ঢেকে ঝুলছে। তাদের কপালে চুলের টায়রা, চুলের বাবরী ঘাড়ের নীচে ঝালরের মত দুলছে, আর গলায় নীলাপ্রবালে গাঁথা চওড়া চিক্। কোথাও সূক্ষ্মবেশধারিণী বীণাবাদিনী গায়িকার দল। কোথাও মাননীয় অতিথির পরিচর্য্যা চলছে। দাসীরা বয়ে আনছে ভারে ভারে ফুল ফল। কোথাও পদ্মবনে হংসযুগল তাদের বিচিত্র রঙীন ডানা ঝাপটে বেড়াচ্ছে। ওদের ছবিতে যেমন সূক্ষ্ম কারু-কলা, টেম্পারার উজ্জ্বল বর্ণিকাভঙে বিচিত্র রূপের ছন্দ, ওদের ভাস্কর্য্য কঠিন গম্ভীর বর্ণহীন। ওদের স্থাপত্যের সেই রীতি। কী কঠিন ওই পিরামিড। ওই যে দেখা যাচ্ছে, অদূরে, বিরাট বালু সমুদ্রের মাঝখানে, ধূসর প্রহরীর মত, নীল আকাশের উধাও স্বপ্নের কাছে মূর্তিমান রসভঙ্গের মত দাঁড়িয়ে আছে, ওর মধ্যে না আছে রূপ, না আছে রঙ, না আছে কোন আনন্দ। শক্তির লীলা অথবা শক্তির দীপ্তি দেখতে পেলাম না। মনে হোল, ওই ত্রিকোণ পাষাণের উচ্চ চূড়ায় শুধু অন্ধশক্তির মূঢ় আবেগের অধিকার। ক্রমশঃ

শরৎ-সাহিত্যের স্বরূপ

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

(১)

…ন্তার বাহক গদ্য, অনুভূতির বাহক পদ্য। চিন্তা জাগায় স্বাতন্ত্র্যবোধ, …অনুভূতি দেয় ঐক্যবোধ। এযুগের গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষ ত্রিশঙ্কুর …মত সেই চিন্তা ও অনুভূতির মাঝামাঝি পথে দুলকী চালে অবস্থান …করছে। বর্তমান অর্থনীতির নিদারুণ ক্রান্তিতে রাষ্ট্র, মানব-জীবন আর …শিক্ষা-সংস্কৃতি—সর্বত্রই কেমন একটা বিচ্ছিন্নতা!

জীবন থেকেও প্রেমের নির্মোক হচ্ছে।

সে যুগে মহাকবি চণ্ডীদাস আয়ান-কুটিলা আর রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করে এবং রজকীনীর প্রেম-সান্তকে আশ্রয় করে অমর কাব্য রচনা করেছিলেন। কালিদাসের কালের রোম্যান্সে শকুন্তলা আলবালে জল সিঞ্চন করে রাজ-অন্তরের হৃদয় অপহরণ করেছিলেন এবং পরে আবার অঙ্গুরী দেখিয়ে ভুলে-থাকা পতির কাছ থেকে প্রেমও কুড়িয়েছিলেন। বর্তমানের সমস্যা বহুমুখী, কাব্য বিচ্ছিন্ন, প্রেম রেশনগ্রস্ত কঙ্করময়। আজ-কালের শকুন্তলারা লেকের জলে প্রেমকে অবগাহন করিয়ে আঁখির অঙ্গুরী দেখিয়ে প্রণয়ীকে উদ্‌ভ্রান্ত করেন। সেদিনের প্রেমসংহিতায় ছিলো ঝর্ণা বনানী ও শৈলশিলার নিমন্ত্রণ, আধুনিক প্রেমে এসেছে বিজ্ঞানের দুর্বার গতি, হাওয়া-গাড়ি আর এরোপ্লেনের বেগ। শুধু বনফল ও ঝর্ণার জলে প্রেমিক-প্রেমিকার আর তুষ্টি নেই। তাই এখন প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে কঠোর তপশ্চর্যার বদলে কঠিন প্রতিবিধান সৃষ্টি হয়েছে—প্রমোদোদ্যান পার্ক ও লেকে প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কথায় কথায় ইদানীং চপল ও চপেটাঘাত চলে, আর চলে সেই 'মকাই' প্রেমের ধূলোট উপ-সংহারে সজল চোখে মত্ত মুখে নীরব দু'চারটি কচি কচি দূর্বাঘাস চর্বণ। প্রেমের একেবারে সর্বাধুনিক বিবর্তন।

জীবনে ক্রমাগত নৈরাশ্য আর অশান্তি। সাহিত্য খণ্ডিত, ছিন্ন।

বিশ্বকে কেউ কেউ জঙ্গল ব'লে ভ্রম করছে। কিন্তু ধরিত্রীর উদ্যানে শুধু কাঁটা-গোলাপও ফোটে। দৃষ্টির ঝাপসায় ফুলে পৌঁছানোর সীমানা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না, ক্ষতবিক্ষত দেহ থেকে কারো বা নৈরাশ্যের শোণিত নিরন্তর ঝরতে থাকে। সংস্কৃতি ও সাহিত্যে তাই এখন অদ্ভুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আধুনিক লেখক ও পাঠক অধিকাংশই নিঃসঙ্গ।

(২)

শরৎ-সাহিত্য ছিলো এর ব্যতিক্রম। সহিত-এর সমন্বয়ে যে সাহিত্যের সংজ্ঞা—মনের সঙ্গে লোকের, মানুষের সঙ্গে সমাজের যে একত্র বসবাস, ভ্রান্তি আর সহানুভূতি যে জীবন পথের একই পথচারী—তা' শরৎ-সাহিত্যে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিলো। নিঃসঙ্গতার বদলে সেখানে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিলো অজান্তে অল্পদিনে অতি সহজে। শরৎ-সাহিত্যের মূল কথা ছিলো মানবিকতা বা মানব-প্রীতির জয়গান। নীতি ছিলো—শিল্পের জন্যই শিল্প নয়, মানবিকতাবাদ বা মনুষ্যত্ববোধের জন্য শিল্প-সৃষ্টি। 'শ্রীকান্ত'র মুখে ছিলো তারই প্রতিধ্বনি : 'মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না।' এই আর্তকণ্ঠ সমগ্র মানব-সমাজের, শ্রীকান্তের একার নয়। আর জীবনের সেই পুঞ্জীভূত হাহাকার ছিলো শিল্পী শরৎচন্দ্রের শিল্পী-সৃষ্টির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেল না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—' তাদেরই বেদনায় মুখর শিল্পী মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—'মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, কেবল তারি অন্যায়, তারি ভুল ভ্রান্তি দিয়ে মানুষের বিচার করব, আর যে দেবতা সব দুঃখ, সব ব্যথা, সব অপমান নিঃশব্দে বহন করেও আজ সস্মিতমুখে তারই ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন, তাঁকে বসতে দেবার জন্যে আসন কোথাও পেতে দেব না?

মানুষের সেই অন্তর-মথিত অশ্রুধারা শরৎ-রচনার ছত্রে ছত্রে ঝরেছিলো—ছিলো সেখানে চিরন্তনীর সুর, সত্য সুন্দরের প্রতিধ্বনি, রহস্যময় মানব মনের বিচিত্র প্রদর্শনী। জনপ্রিয়তার প্রধান সহায়ক ছিলো স্বচ্ছ অনন্যসাধারণ ভাষা—চরিত্র-চিত্রণ, বিন্যাসভঙ্গী ও সংলাপ-সৃষ্টিতে ভাষার সেই অভিনব জাদুকরণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে।' নরনারীর হৃদয়েই বুঝি কান পেতে দিয়ে তিনি সেই ধ্বনি ও ভাষা নিখুঁতভাবে আহরণ করেছিলেন। সাধু ও চলতি ভাষার সমতা রক্ষার যে সাধনা বঙ্কিমী ও রবৈবিক যুগে উত্তরোত্তর অগ্রসর হচ্ছিলো, শরৎচন্দ্রে এসে তা সিদ্ধিতে দাঁড়িয়েছে—এ ভাষা যেমনি শিষ্ট ও মার্জিত, তেমনি স্বাভাবিক ও সজীব। আশে-পাশের চেনা মানুষের ভিড় থেকে সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে গড়া বঙ্গ-সন্তানের পরিপূর্ণ জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে শরৎচন্দ্র তার থেকে আপন আপন সাহিত্যে এমন এক অপূর্ব রসোবীণা সৃষ্টি করেছেন, আর এক একটি তন্ত্রীর টানে আজকের এই বিষে-ভরা জগতে বাস করেও আমরা স্বতস্ফূর্তভাবে কখনো বা কাঁদি হাসি, কখনো বা কান্না-হাসির স্বরগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র মূর্ছনা অনুভব করি। বঞ্চিতের বেদনায় যেমন আমাদের মনটি রিণ্‌রিণ্‌ করে, জীবানন্দ-দেবদাস চন্দ্রনাথের জন্যেও তেমনি সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। এইখানে শিল্পীর সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

দিলীপকুমার রায় (পণ্ডিচেরী)-কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠির মধ্যে লেখা-নিপুণতার টেক্‌নিক সম্বন্ধে এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছেন।...বাঙলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা।" শরৎ-আকাশের সমস্ত গ্রহ-তারকা ছিলো এমনি সচল সজীব প্রোজ্জ্বল। এক ঝলক বর্ষণের পরে একমুঠো রোদের মতো মিষ্টি, অরুণের স্পর্শে উষার রক্তিমতার ন্যায় আকর্ষণীয়। শরৎ-সাহিত্যের পাত্র পাত্রীরা পাঠকসমাজকে শুধু শ্রদ্ধার বৈঠকখানায় বসিয়ে গড়গড়া টানিয়ে ক্ষান্ত হয় না, স্নেহের অন্তঃপুরে আসন দিয়ে প্রীতির আঁচলে বীজনও করে। সাহিত্যে সর্বজনীনতার মূল্য এইখানে। শুধু শহরে নয়—অখ্যাত পল্লীর কোনো এক চাকচিক্যহীন পর্ণকুটিরে গৃহস্থের যৎসামান্য সম্বলের মধ্যেও যেমন খুঁজে-পেতে একখানা রামায়ণ মহাভারতের জীর্ণপাতা সংগ্রহ করা যায়, তেমনি তাদের ধূলিমলিন উপাধানের একপাশে 'পল্লী-সমাজ মামলার ফল পণ্ডিতমশাই মহেশ রামের সুমতি' প্রভৃতি কোনো না কোনো কাহিনীর কয়েক টুক্‌রো অশ্রুসিক্ত ছিন্ন পাতাও নজরে পড়ে।

শরৎ-সাহিত্যের চরিত্রগুলির চিন্তাধারা ও চলাফেরায় বাংলাদেশের শ্যামল মাটির প্রকৃতিগত উপাদান প্রচুর। পঙ্ক ও পঙ্কজ, ম্যালেরিয়া ও কুইনিন, দলাদলি রেশারেশি কাটাকাটি আবার সেই সঙ্গে পণ্ডিত্‌ডোঙ্গা—রক্তমাংসে মিশ-খাওয়া বাংলার এই নিজস্ব গ্রামীন সংস্কৃতি সেখানে সমভাবে সমদৃষ্টিতে পক্ষপাতবিহীন ভাবে সন্নিবিষ্ট। কাউকে ছেড়ে কাউকে রেখে কেউই এখানে চলতে পারে না। রমেশের পাশে বেণী ঘোষাল, অক্ষয়ের পাশে আশুবদ্দি, রামলালের পাশে গোবিন্দ ও ডাক্তার, নারায়ণীর পাশে দিগম্বরী, সাবিত্রীর পাশে মোক্ষদা—সংসারে সবাই এরা দোষেগুণে জীবন্ত মানুষ। প্রধান দোষে দুষ্ট হয়েও সবাই এখানে শ্রেষ্ঠ। রসসৃষ্টির রসোত্তীর্ণতাই কাহিনীর উপজীব্য। প্রতিটি চরিত্রকে আমাদের বলে চিনতে একটুও তাই কষ্ট হয় না। শাসন করে দণ্ড দিয়ে ঝর ঝর করে চোখের জল ফেলতে শরৎ-সাহিত্যের চরিত্র ছাড়া আর বড় একটা কোথাও দেখা যায় না।

(৩)

নারী-জীবনের গভীর রহস্য নিয়ে সর্বদেশে সর্বকালে বহু অপূর্ব [illegible] সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু চরিত্র ঘটনা-বিন্যাস ও পারিপার্শ্বিকতায় বিভিন্নতা থাকলেও যৌবন-ধর্মের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত [illegible] জীবন

তার প্রভাব সম্বন্ধে অধিকাংশ দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের চিন্তাধারায় প্রায় একই সুরের সাদৃশ্য দেখা গিয়েছে। টলষ্টয়ের 'রিসরেকসন', ডলস্ হাউসের 'নোরা', জোলার 'নানা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' প্রভৃতিতে সে-দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য-পুরাণে রামায়ণ মহাভারতেও তেমনি চরিত্রের ভূরি ভূরি সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রীক-সাহিত্যের সঙ্গে কিছু তুলনামূলক চরিত্রও দেখা গিয়েছে।

দ্রৌপদীর প্রেমে ছিলো পক্ষপাতিত্ব অহঙ্কার ও ঘৃণা—হেলেনেরও তাই। কুন্তীর যৌবন-ধর্মের অপকীর্তি চাপা দিতে কর্ণ হয়েছেন ঘৃণিত সূতপুত্র, এ্যাণ্টিগোনাস হয়েছেন পদদলিত। তাই মাতৃ-পরিচিতির অভাবে মহাবীর কর্ণ বজ্রজ্বরভের মতো নিষ্ঠুর লাঞ্ছনায় ছটফট করেন, এ্যাণ্টিগোনাসও নিষ্ঠুর নিয়তির চাবুকে জারজ আখ্যা নিয়ে সেলুকসের সম্মুখে মাথা ঠুকতে থাকেন; কুন্তী রাজমাতা হয়েও অবজ্ঞাত প্রথম পুত্রের জন্য অজ্ঞাতে অশ্রু ফেলেন, এ্যাণ্টিগোনাস-জননী রাজপত্নী হয়েও ভিখারিনীর মতো চোখের জলে নিরন্তর ধুয়ে দেন গ্রীসের রাজপথ।

সে যুগের অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরীবাহিনী যৌবনধর্মের অস্বাভাবিক তাড়নায় উন্মার্গগামিনী হলেও ঋষি-লেখনীর সহানুভূতির খাতিরে যেমন প্রাতঃস্মরণীয়ার পঙ্‌ক্তির ভোজে একাসন পান, এদেশের বিদগ্ধ সমাজও তেমনি শৈবলিনী-অন্নদাদিদি-কিরণময়ীর জীবনের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতগুলো প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অশ্রুসজলচোখে স্মরণ করে থাকেন। অহল্যার প্রেমে পাষাণত্বের ইংগিত ছিলো—হীরা-কিরণময়ীর প্রেমে ছিলো বিষক্রিয়া, প্রতিহিংসা। হীরা বিফলমনোরথ হয়ে বিষ-প্রয়োগে দেবেন্দ্রের উপর প্রতিহিংসা নিয়েছিলো, কিরণময়ী তরুণ দিবাকরকে পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট করে প্রেমাস্পদ উপেন্দ্রের সুনামে কলঙ্ক ছড়িয়ে প্রেমের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলো। হীরা ও কিরণময়ী দুজনকেই শেষ বয়সে প্রণয়ীর সম্মুখে নিষ্ঠুরভাবে নিজ জীবন নিঃশেষ করতে দেখা গিয়েছে। সে যুগের কাব্যে যেমন উর্মিলা উপেক্ষিতা, এ যুগের উপন্যাসেও তেমনি সুরবালা। স্বামীপুত্রহারা মন্দোদরী অদৃষ্ট-বিপাকে বিভীষণের কণ্ঠলগ্না হয়েছেন, অন্নদাদিদি ভুলেছেন সাপুড়িয়ার প্রেমে। সমাজ-সংসারের বেড়া ডিঙিয়ে যুবতী কমল পতি-বদলের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—কমল কিন্তু ঘা খায় রাজেনের কাছে, সাবিত্রী দাবিয়ে রাখে দুরন্ত সতীশকে, শ্রীকান্ত অন্নদাদিদির দুঃখে চোখের জল ফেলে।

শরৎ-সাহিত্যে নারী ও পতিতা সাহিত্য-জগতে এক নূতন দিক-দর্শনী বলা যেতে পারে। কিন্তু 'রিসরেক্‌সন' প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তা সম্পূর্ণ বিদেশী প্রভাবমুক্ত ছিলো। ভাগলপুর দেবানন্দপুর ও বর্মার বহু বিচিত্র জীবন ও ঘটনা-সংঘাত সেখানে প্রভূত পরিমাণে ভিড় জমিয়েছে। জানবার আগ্রহ নিয়ে জীবনের একটা বৃহত্তর অংশ সেখানেই অতিবাহিত করেছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর নিজের কথায়—'আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬৭ শত বাঙালী কুলত্যাগিণীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম।' এছাড়া, তাঁর সাহিত্য-জীবনের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিঠিপত্র ও বক্তৃতাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায়—শৈশব থেকে বহুকাল পর্যন্ত একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা উপন্যাস ছাড়া আর বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো না। ছেলেবেলায় অবশ্য আরও কিছু রচনার সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছিলো—সেগুলি হচ্ছে, তাঁর পিতার লেখা অসমাপ্ত গল্প-উপন্যাস-নাটক, আর 'বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে···হরিদাসের গুপ্তকথা, ভবানী পাঠক—বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক।' কাশীনাথ-দেবদাস-চন্দ্রনাথ-অনুপমার প্রেম-বোঝা-শুভদা প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের সতের থেকে কুড়ি বছর বয়েসের লেখা রচনাগুলিতে ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রভাব ও দেবানন্দপুর-ভাগলপুরের তদানীন্তন সমাজ-জীবনের বহু আন্দোলনের কথা ও কাহিনী নানাভাবে ছায়া ফেলে গিয়েছে। পরবর্তী যোগাযোগ হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'চোখের বালি' তাঁর জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সর্বশেষে আসেন বঙ্কিম। পরিণত বয়সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রপ্রভাব বহুল পরিমাণে ধরা পড়ে এবং শরৎ-লেখনীর যাদুপ্রভাবে সেই সব সমস্যা ও চরিত্র নবরূপে নবীন মায়ায় অতুলনীয় অনন্যসাধারণ হয়ে দাঁড়ায় পাঠকের চক্ষে।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়, ঘরে বাইরে, নৌকাডুবি, চতুরঙ্গ, চোখের বালি' গ্রন্থগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তববাদ ও প্রেমের বিভিন্ন সমস্যার উপর লিখিত। 'ঘরে বাইরে'র সঙ্গে 'স্বামী' এবং 'নৌকাডুবি'র সঙ্গে 'গৃহদাহ'র যথেষ্ট মিল আছে। 'চোখের বালি'র বিধবা বিনোদিনী জীবন-ধর্মের দুরন্তটানে আপন সংসারেই সমাজ-বিগর্হিত কর্ম করতে বিরত হন নি, কিরণময়ীও তাই—অবশ্য ঠিক আপন অন্তঃপুরের মধ্যেই তার প্রেমলীলার নাট্য প্রক্ষেপিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক ও সামাজিক নানা প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নায়ক-নায়িকার নিষিদ্ধ প্রেম ও পরিণতির কথা লিখেছেন—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ গ্রন্থগুলি তারই সুস্পষ্ট রূপায়ণ। কল্যাণীর প্রতি ভবানন্দ, জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মেহের, জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা, হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর চরিত্রে সেই নিষিদ্ধ প্রেম ও পূর্বরাগের কাহিনী নানাভাবে পল্লবিত। কপালকুণ্ডলার লুৎফউন্নেসা, রাজসিংহের জেবউন্নেসা, বিষবৃক্ষের হীরা-য় পতিতা ও তাদের সমস্যা নিয়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের পূর্বসূরী, এবং বঙ্কিমী-সাহিত্য শরৎ-সাহিত্যে পতিতা-সমস্যার প্রেরণা বলা যেতে পারে। দুর্গেশ-নন্দিনীর বিমলার সঙ্গে চন্দ্রনাথের সরযূ এবং চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর সঙ্গে গৃহদাহের অচলাকে দুঃসাহসের প্রতীকরূপে তুলনা করা যায়।

বঙ্কিমী-সাহিত্য মানুষের আদর্শবাদের ক্ষুরধার গৌরবের উপর শেষ আবেদন জানায়, শরৎ-সাহিত্য দুর্বল মানুষের দোষ-ত্রুটি নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা ক'রে নিপীড়িত মানবাত্মার সঙ্গে সমভাবে চোখের জল ফেলে। বঙ্কিমী-সাহিত্য চিত্তশুদ্ধির মধ্যে মানুষের পাপ ক্ষালনের বিধান দেয়,

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই বিধান বৃহত্তর শক্তিকে প্রণামের মধ্যে, আর শরৎ-সাহিত্য দেয় ত্যাগের ইংগিত।

শরৎ-সাহিত্যে ব্যভিচারের প্রশ্রয় নেই। আছে নিষ্ঠুর সমাজ-শাসনকে দায়ী করা অবদমিত কামনা-বাসনার বিষময় পরিণতি। নারী সেখানে ভোগে কলঙ্কিতা নয়, ত্যাগে মহীয়সী। দুঃসহ দুঃখের অবসানে তাই সেখানে চরম ত্যাগের মধ্যেই ভোগের আস্বাদন। বৈষ্ণববাদের নিষ্কাম জীবন-দর্শনের সুর সেখানে করুণভাবে মূর্ত। পরম সুখের মুহূর্তটিতে পৌঁছে তাই সর্বস্বত্যাগ করে বৃন্দাবন ও কুসুমকে দেশান্তর যাত্রা করতে হয়েছে, রাজলক্ষ্মী রাজরাণীর বদলে আশ্রমচারিণী কমললতার শিষ্যত্ব নিয়েছে। মৃণাল বঞ্চিতা ব্যথিতারূপেই মহীয়সী। বিরাজ-বৌ সংসারে ফিরতে পারে নি, সন্ধ্যাকে অজ্ঞাত পথে যাত্রা করতে হয়েছে, রমা হয়েছে কাশীবাসিনী, চন্দ্রমুখীর বহুদিনের অভ্যস্ত জীবন পালটানো, পার্বতীর চিরবিরহ, গুণীর বৈরাগ্য গ্রহণ, কিরণময়ীর উন্মাদ জীবনযাপন সাবিত্রী আয়েষার মতো প্রেমের তর্জন-গর্জন শোনায় নি, কুন্দনন্দিনীর মতো প্রেমাস্পদের সংসার ভাঙে নি, বিনোদিনীর মতো প্রেমের উদ্দামতা দেখায় নি—দুঃখ বইবার দুরন্ত শক্তি নিয়ে সতীশের সমাজ-লৌকিকতা অটুট রাখার জন্যেই তারই কল্যাণ-কামনায় নীরবে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে।

নারীর ভালবাসার রূপটি শরৎ-সাহিত্যে মধুর হয়ে ফুটে উঠেছে। তার প্রেম, নিষ্ঠা, সেবাকুশলতা, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য প্রভৃতি যেমন একদিক দিয়ে মনোরম হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি বঞ্চিতা বিদ্রোহিনী পতিতা নারীর অন্তর উজাড় করা প্রেম ও সেবার রূপটি সমপরিমাণে বিনম্র মর্মস্পর্শী হয়েছে। শরৎ-সাহিত্যের মেয়েরা অত্যন্ত সেবাপরায়ণা, স্নেহ ভক্তি ও প্রেমভাজনকে নিজের হাতে সেবা করে ঠাঁই করে আসন পেতে আহার না করিয়ে তৃপ্তি পায় না, খাওয়ানোর মাঝ দিয়ে তারা জীবনের মাধুর্য উপভোগ করে। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় আত্মমর্যাদাশালিনী বিজয়াও নরেনকে খেতে দিয়ে পাখা হাতে তার সম্মুখে বসে, অভিমানিনী জেদী কুসুম বৃন্দাবনকে নিজ হাতে রান্না করে খাইয়ে স্বামীপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করে, ষোড়শী ভৈরবী জীবানন্দকে চণ্ডীর প্রসাদ খাইয়ে অন্তঃপুরের প্রেম অনুভব করে, নির্বাসিতা সরযূ চন্দ্রনাথকে ভাত খাইয়ে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, বিরাজ-বৌ মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর আহার দেখার শেষ সাধ জানায়। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে খাইয়ে তৃপ্তি পায়, 'আঁধারে আলো'র বিজলী বাঈজী সত্যেন্দ্রকে খাওয়ানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করে মনে মনে প্রেম অনুভব করে, 'শেষ প্রশ্ন'র অতি আধুনিকা কমলও অজিতকে খাওয়াতে ভালবাসে। এমন কি, বিপ্লবী ভারতী এবং সমাজ-ধর্ম বিদ্রোহিনী অভয়ার নারীসুলভ অন্তরটিও নিজেদের অজান্তে অপূর্ব ও রোহিনীর সেবা করার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে।

যে সমস্ত শিক্ষিতা মেয়ে সেবা-যত্নের অভাবে স্বামীকে আপনার করতে পারে নি, তারা শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি পায় নি। 'নব বিধান'এর সোমেনের মা, 'বিপ্রদাস'এর বন্দনা, 'দর্পচূর্ণ'র ইন্দু—তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য এখানে সুস্পষ্ট। আপন বাণীর স্পন্দনে মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করে নর-নারীর অন্তর্নিহিত বেদনা ও তাদের প্রেম-ভালবাসার সুরটি তিনি নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। পুরুষদের সম্বন্ধে তাই বুঝি তিনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছিলেন: 'কল্পনা কোনদিনই বাস্তব হয়ে দেখা দেয় না। দেয় না বলে তার প্রতি আমাদের লোভ এত বেশী, তার জন্য আমরা মরি-তবু তাকে জীবন থেকে বাদ দিতে পারিনে।...অপরিণত বয়সে নিজেকে বিসর্জন দেবার আকাঙ্ক্ষা অল্পবিস্তর সকল মানুষেরই থাকে, অসংযমী মনের উপর প্রভুত্ব করা বড় শক্ত। এমন কত পুরুষের মন কত নারীর মনকে গোপনে চেয়ে এসেছে তার সংখ্যা করা যায় না। মনের কোণে থাকে কলুষ-কামনা-ব্যাধি, সাধুতার অন্তস্থলে থাকে জমাট বাঁধা পশুত্ব, মানুষ তাহা সহজে টের পায় না, যখন টের পায় তখন তার সাধ্যের অতীত।'

এর পরে তিনি সমাজ ও মেয়েদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: 'মানুষের খাওয়া পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড সতর্ক নয়, শুধু এর নির্দয়মূর্তি দেখা দেয় নরনারীর ভালবাসার বেলায়; সামাজিক উৎপীড়ন মানুষকে সবচেয়ে বেশী সইতে হয় এইখানে—মানুষ একে ভয় করে। দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয় একদিন শেষে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়। এর থেকে সমাজ কাউকে রেহাই দেয় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই—তার ফাঁকি দেওয়ার অনেক রাস্তা খোলা আছে—কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে হচ্ছে এই হতভাগিনী নারী।'

এই হচ্ছে—স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যে দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রের মানব জীবনদর্শনের অভিনব প্রতিফলন—শরৎ-সাহিত্য ও তার পাত্রপাত্রীর গতি প্রকৃতির প্রকৃষ্ট স্বরূপ।

(৪)

সকল সমাজের অশিব বা ভণ্ডামীকে শরৎ-সাহিত্য কোনরকমে বরদাস্ত করতে পারে না। তাই কোথাও ব্রাহ্ম, কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও বা শূদ্রের উপর তাঁর বিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। 'ব্রাহ্মণের মেয়ে, পল্লী-সমাজ, একাদশী বৈরাগী, চন্দ্রনাথ, প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দুসমাজের বহুবিধ অনাচার ও ব্রাহ্মণ্য শাসনের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। 'মহেশ' গল্পে মুসলমান গফুরের প্রতি ছলছলিয়ে উঠেছে সমবেদনা। 'নববিধান, শেষ প্রশ্ন, অনুরাধা-'য় ইঙ্গ-বঙ্গসমাজের কৃত্রিমতায় চরম আঘাত। 'দত্তা'য় 'গোরার' রচনা-রীতি থাকলেও ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে জাতিগত বিরোধ ও তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্ফুট ভণ্ডামীর উপরে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মধর্মের উপর বিদ্বেষভাবটি ফুটে ওঠেনি। কারণ যে 'দত্তা'য় আছে কূটকৌশলী রাসবিহারী ও বিলাস, তারই আশপাশে আছে বিজয়া ও নলিনীর মতো মধুর চরিত্র ব্রাহ্ম-মহিলা। 'সতী' গল্পের লাবণ্য এবং পরিণীতা-র গিরীনও নিঃসন্দেহে মহৎ চরিত্র। তবুও সব কিছু মিলিয়ে শরৎ-সাহিত্যের বিচিত্ররূপটি নগর থেকে পল্লী পর্যন্ত মুখর হয়ে উঠেছে।

শরৎ-সাহিত্যের আরেকটি দিক অপেক্ষাকৃত একপেশে—সেটি হচ্ছে

পুরুষ চরিত্র। এরা অনেকাংশে বলিষ্ঠ নয়। তার উপর অধিকাংশই আবার ভবঘুরে। ভবঘুরেকে সহজে কেউ মেয়ে দিতে চায় না। অতএব তাদের রোগে-শোকে-সেবায় সর্বত্র কল্যাণী বধূর কোমল হস্তের স্পর্শ মেলে না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কৃপায় গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহের মতো অনেকেরই ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের 'মোর পুরাতন ভৃত্য'র ন্যায় এক একটি নির্ভরশীল সেবাপরায়ণ বিশ্বস্ত ভৃত্যও কোথা থেকে জুটে গিয়েচে। সেবা-কুশলা বধূর অভাবটি তারাই একরকম করে চালিয়ে দিয়েছে। সতীশের বেহারী, দেবদাসের ধর্মদাস, শ্রীকান্তের রতন—সেবক হিসাবে ভবঘুরেদের নিকট একান্ত বাঞ্ছিত। খেয়ালের বশে জীবানন্দকে শুধু বা একটি জুটিয়ে দিতে পারেননি শরৎচন্দ্র!

শরৎচন্দ্র মূলতঃ সমাজ বিপ্লবী ছিলেন। সমাজ-তান্ত্রিক বহু সমস্যা তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের সর্বহারাদের জন্য শরৎ-সাহিত্য ক্ষুব্ধ বিচলিত হয়েছে। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজের কল্যাণকর রূপটি নানাভাবে সেখানে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। 'পণ্ডিত মশাই' গ্রন্থে তাই বৃন্দাবনকে রাস্তাঘাট-সংস্কার, বনজঙ্গল পরিষ্কার, পানীয় জলের পুষ্করিণী স্থাপন, পাঠশালা প্রতিষ্ঠাদি জনহিতকর কার্য করতে গিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীন পাণ্ডাদের সঙ্গে অবিচলিতচিত্তে সংগ্রাম করতে দেখা গিয়েছে। আর সেই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থকাম হয়ে আপনপুত্রকে হারিয়েও সমাজের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কণ্ঠে তার আধুনিক সাহিত্যের অভিনব মর্মবাণী বড়ই মনোজ্ঞ হয়ে ফুটে উঠেছিলো: 'যারা আমাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন জোগায়—সেই হতভাগ্য দরিদ্রদের এই গ্রামেই বাস। তা' দিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁতলে আপনাদের ওপরে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি হয়েছে।' 'মহেশ' ও 'পল্লী সমাজ'-এ কিষাণ-চাষী বা গ্রাম্য সর্দারের যে আশা-আকাঙ্খার কথা মূর্ত হয়ে উঠেছিলো, তাতে সমাজের এই নিম্ন-স্তরের মানুষদের প্রতি শরৎ-সাহিত্যের সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গণসাহিত্যের সেই সার্থকরূপটি পরিস্ফুট হয়েছিলো 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস বা 'ষোড়শী' নাটকটিতে। দুর্দান্ত জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর বিরুদ্ধে সাগর সর্দার প্রভৃতি লাঠিয়াল ও চাষাদের সঙ্গে নিয়ে ষোড়শীর নেতৃত্বে যে সুসংহত শক্তিশালী চাষী আন্দোলনের ভূমিকা তৈরী হয়েছিলো—তা নিঃসন্দেহে শরৎ-সাহিত্যের প্রগতিশীলতার দ্যোতক। পরাজিত জীবানন্দকে শেষ পর্যন্ত চাষীদের হাতে জমি ফিরিয়ে দিতে হয়েছিলো। জমি যে চাষীর, ভূমিজ প্রজার—যা আজকের স্বাধীন ভারতে জমিদারী উচ্ছেদ প্রথায় স্বীকৃত হয়েছে—শরৎ-সাহিত্যে সেই গুরুতর সমস্যার সমাধান বহুপূর্বেই হয়ে গিয়েছিলো। 'বড়দিদি'-তেও সুরেন্দ্র নাথ জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করেছে: 'প্রজার রক্ত শুষে এমন জমিদারিতে কাজ কি?'

দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে 'পথের দাবী' একটি তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। সব্যসাচী জানতেন, সহিংস বিপ্লবের পথে অনেক বাধা—চাই অমিতশক্তি, অস্ত্র শস্ত্র, লোকবল, আদর্শে বিশ্বাস, উপরোক্ত রাষ্ট্রের প্রচারও প্রচণ্ড নিষ্পেষণ সহ্য করার মতো সীমাহীন ধৈর্য—তবুও পরাধীনতার জ্বালায় দেশের মুক্তি দ্রুততর করার জন্য এই বিষের পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে ভারতী এবং সব্যসাচীর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে, সব্যসাচী ভারতীর প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নি। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দলের পরাজয় আসন্ন বুঝতে পেরেই বুঝি তিনি বলেছিলেন: 'স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা?'

তবুও সেদিন এ আন্দোলনের প্রয়োজন ছিলো। অত্যাচারী রাজ-শক্তিকে জানিয়ে দেওয়ার দরকার ছিলো যে, পরাধীন হলেও পীড়নের ভয়ে দেশবাসী তা মুখ বুজে সহ্য করে না বা করতে পারে না। তা ছাড়া এমনি ধারা আন্দোলনের মধ্যে অজ্ঞ জনসাধারণকে তাদের স্বরূপ—কি ছিলো, কি হয়েছে, কি হতে চলেছে—তা' জানিয়ে দিয়ে তাদের সুপ্ত শক্তিকে দ্রুত জাগৃতি দিতে পারা যায়। 'পথের দাবী'-তে এ নীতি অক্ষুণ্ণ ছিলো। রাজনৈতিক বিদ্রোহের মধ্যেও সমাজ-বিপ্লবের পরিচিত সুরটি তাঁর গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিলো। বৃটিশ রাজশক্তি তার সর্বগ্রাসী শোষণে এদেশে সমাজের সর্বস্তরে কিভাবে মানুষকে তিলে তিলে অন্তঃসার শূন্য করে ফেলেছিলো, সে সম্বন্ধে সব্যসাচী ভারতীকে বুঝিয়ে বলছেন: 'এদেশের মালিক তারা—কত জাহাজ, কত কলকারখানা কত শত সহস্র ইমারত।…জানো এই বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাংলাদেশের মেয়ে বলছিলে না? বাংলার মাটী, বাংলার জল-বায়ু বাংলার মানুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয় না? এই বাংলার ১০ লক্ষ নরনারী প্রতি বৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল ১০ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মুছানো যায়। ভেবেছ কখনও একথা? দেখেছ কখন বুকের মধ্যে মায়ের মূর্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল, জ্ঞান—নদীর বুক বুজে মরভূমি হয়ে উঠেছে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে—দেশে জল নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে।'

এই শক্তি, এই আত্মসচেতন অটুট মনোবলের উদ্দীপক ছিলো 'পথের দাবী'।

এমনি বিভিন্ন স্তর-বিন্যাসের মাঝ দিয়ে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বা স্বরূপটি আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। সে রূপটি হচ্ছে—মানুষের কল্যাণ, মানবতার মিলন, সমাজবাদের নবজাগৃতি।

চুলোয় যাওয়া

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী

আমি আদর্শবাদী লোক। বর্তমান পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের কর্মের ক্ষেত্রভেদ দ্রুত লুপ্ত হতে চললেও আমি মুহূর্তের জন্যেও আমার আদর্শ বিস্মৃত হই না অর্থাৎ একথা ভুলে যাই না যে পুরুষের কাজ পুরুষ করবে এবং নারীর কাজ নারী। অবশ্য আমি উদারপন্থী। নারী যদি একে একে পুরুষের সব কাজগুলো অধিকার করে নেয় তবে তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু তার-প্রতিরোধ স্বরূপ নারীর কাজগুলো দখল ক'রে বসব এমন হীন আমি নই। আমার অফিসের কাজটা যদি কোনো নারী গিয়ে ক'রে দিয়ে আসেন তবে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব কিন্তু তাই ব'লে সেই নারীকে আফিসের রান্না করে দিতে কিংবা তিনি বেরিয়ে গেলে তার সন্তানদের পাহারা দিতে আমি নিতান্তই অক্ষম।

কোন কাজটা পৌরুষের এবং কোনটা নারীসুলভ সে সম্বন্ধে অতি শৈশব থেকেই আমি অতি সচেতন। ছেলেবেলায় বাজার থেকে কেউ কিছু আনতে দিলে থলের প্রয়োজন না থাকলেও থলেটা দোলাতে দোলাতে বীরদর্পে বাজারে গেছি, বাইরে থেকে আত্মীয়েরা এলে ক্ষমতা না থাকলেও কুলিদের হাত থেকে সুটকেসটা বেডিংটা ছিনিয়ে নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে করতে ওপরে তুলেছি আর তার পর সমস্ত পাড়ায় সেই গল্প করেছি। আবার একই সঙ্গে এই এতটুকু বয়েস হতে প্রসাদের থালা হাতে ক'রে রাস্তায় বেরুতে অস্বীকার করেছি এবং বাড়ির উল্টোদিকের দোকান থেকে দিদিদের ফরমায়েসি উল-কাঁটা-সুতো রঙচঙে ফিতে কেনার পর সন্দেহাতীত ভাবে প্যাক না ক'রে দিলে দোকানীকে দাম দিতে অস্বীকার করেছি। আর এখনও আমি প্রয়োজন হলে দেড়মনী ডেকচিটা মাথায় ক'রে পিকনিকের জায়গায় পৌছে দিতে প্রস্তুত কিন্তু বড়বাবুর বাড়িটা দু'মিনিটের রাস্তা হলেও পায়েসের বাটিখানা হাতে নিয়ে নিজের বাড়ির দোরগোড়াতেই হার্টফেল ক'রে ফেলি। অধিক কি, গোলদীঘির ধারে ব'সে যে বিশেষ ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে আধঘণ্টা গল্প করার মূল্যস্বরূপ ফেরার সময় তাঁর মার্কেটিঙের প্যাকেটগুলো বহন ক'রে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি সেই মহিলাটিরই সঙ্গসুখ উপভোগ করতে হলে আমাকে তাঁর বীণাখানি বহন করতে হবে আগে থেকে এ রকম আভাস পেলে আমি মেডিকেল সার্টিফিকেটের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তির মত আমারও জীবনটা ট্র্যাজেডিতে ভরা। জীবনের যে ক্ষেত্রেই আমি আমার নীতিতে দৃঢ় থাকতে চেয়েছি সেখানেই আমাকে বিচলিত হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। বিদ্রোহ করলেও প্রসাদের থালাটা আমাকেই নিয়ে বেরুতে হয়েছে। মার কাছে নালিশ পৌছবার ভয়ে কাগজে মুড়ে না দিলেও দোকান থেকে দিদিদের জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হয়েছে। আর এখন, এই বৃদ্ধ বয়সে দু'চারবার হার্টফেল ক'রে ফেললেও বড়বাবু-পুত্রের কচি মুখখানা স্মরণ করে শেষ পর্যন্ত বড়বাবুর বাড়িতে পৌছতে হয়, এবং বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, মেডিকেল সার্টিফিকেট জোগাড় করলেও প্রাণের দায়ে সেটা ছিঁড়ে ফেলতে হয়। এবং এই বিজ্ঞানের পরিণাম? সে অতি শোকাবহ ব্যাপার। প্রথমতঃ আদর্শচ্যুত হয়েছি ব'লে নিজেকে ধিক্কার দিই এবং দ্বিতীয়তঃ অতি কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করছি ব'লে পৃথিবীর যাবতীয় পুরুষ এই নরাধমকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু হায়, সবচেয়ে মারাত্মক ফল যেটা হাতে হাতে পাই সেটা অত্যন্ত স্থূল হলেও তার খোঁজ কেউ রাখে না এবং রাখে না বলেই এই কাহিনীর অবতারণা।

সকাল প্রায় দশটা। ঈজি চেয়ারে বসে কাগজটার

ওপর চোখ বোলাচ্ছি, মা ঘরে ঢুকে বললেন, "ওমা তুই এখানে। আমি ভাবছি ছেলে গেল কোথায়। ক'ঘণ্টা বাদে গাড়িতে উঠতে হবে আর এখনো তুই নিশ্চিন্দি হয়ে কাগজ পড়ছিস! নিজের জিনিসপত্রগুলো একটু দেখে শুনেও তো নিতে হয়।"

আমি একটা আড়মোড়া ভেঙে জবাব দিলুম, "সে জন্যে তো তোমরাই আছ মা।"

মা পাশের চেয়ারে ব'সে বললেন, "নাঃ তোকে নিয়ে আর পারলুম না বাবা। কিছুই বুঝতে চাইবি নে।"

চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ওখানে গিয়ে কিন্তু খুব সাবধানে থাকিস বাছা। দুপুরে রাস্তায় বেরুস নে, ভীষণ গরম। শরীরের দিকে খুব লক্ষ্য রাখিস।"

অসুস্থ না হলে মায়ের হাতের স্পর্শ খুব কমই পাই। চোখ বুঁজে প'ড়ে রইলুম। মা বাড়ীর সম্বন্ধে আরো উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময় ব'লে উঠলেন, "ঐ দেখ, তোকে কথাটা বলতেই ভুলে গেছি। তোর মাসি যে তোকে একটা জিনিস নিয়ে যেতে লিখেছে।"

মাসি মেসো দু'জনেই আমাকে খুব স্নেহ করেন, তাঁদের কোনো কাজে আসতে পারি জেনে পুলকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী মা?"

"উনুন।"

আমি খাবি খেতে খেতে বললুম, "উ-উ-উনুন? সত্যিকারের উনুন?"

হঠাৎ মার একটা জরুরী কথা মনে প'ড়ে গেল। বললেন, "ভাল কথা তোর বন্ধু অমল কেমন আছে রে? খুব ভুগছে বেচারা। জ্বর কমেছে?"

কাতর স্বরে জবাব দিলুম, "কমেছে। কিন্তু মা ও যদি শোনে আমি উনুন নিয়ে নাগপুর যাচ্ছি তাহলে আবার জ্বরে পড়বে। মাসিমা তো লিখেই খালাস কিন্তু ভেবে দেখো একটা মাটির উনুনকে কখনো রেলগাড়িতে ক'রে সাতশ' মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া যায়, না কেউ নিয়েছে কোনোদিন?"

মা জবাব দিলেন, "সেকি বলছিস! এই সেবারও যে বাণী একটা উনুন নিয়ে গিয়েছিল মনে নেই?"

আমি বিস্ময়ে হতবাক। উনুন তাহলে সত্যিই নিয়ে যাওয়া যায়? কিন্তু উনুনটা ওঠানো হয়েছিল কী ক'রে? জিনিসটা তো রান্নাঘরের সিমেণ্টের সঙ্গে আটকানো থাকে জানি, তুলতে গেলে তো ভেঙে যাবার কথা। তারপর যদিও বা তোলা হ'ল কোনোরকমে অতদূরে গেল কী ক'রে? তুলোয় মুড়ে প্যাকিং বাক্সয় ভ'রে আর ওপরে 'গ্লাস উইদ কেয়ার' লেবেল সেঁটে? কিন্তু অতবড় ভারি জিনিসটা?

আমার বৈজ্ঞানিক মন কোনো সঠিক সমাধান খুঁজে পেল না। মাকেও মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না, কী জানি তাতে আবার কোন্ ফ্যাসাদে পড়তে হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, "কিন্তু মা উনুনটা পাঠিয়ে দিলে আমাদের বাড়ির রান্না কী ক'রে চলবে?"

মা বললেন, "কেন, আমাদের রান্না বন্ধ হবে কেন?"

"স্টোভে রান্না করবে বুঝি? অবিশ্যি স্টোভ ছাড়া আর উপায়ই বা কী? নতুন উনুন পাততে সময় লাগবে, সেটা শুকুতে শুকুতেও তো সাতদিন।"

মা হেসে ফেললেন, "ওমা ছেলের কথা শোনো। আমি বুঝি রান্নাঘরের উনুন পাঠিয়ে দেবো ভেবেছিস?"

আমি উভয় কারণেই আশ্বস্ত হলাম। "ও তবে ঐ ইলেকট্রিক হীটারটা বুঝি?"

"ওমা হীটার কেন হবে? দোকানে উনুন কিনতে পাওয়া যায় না নাকি? ঐ যে বালতি কেটে বানানো হয়, আমাদেরও তো আছে একটা।"

বালতির উনুন? এতক্ষণে বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা। উৎফুল্ল হয়ে বললুম, "ওঃ তাই বলো। আমি এদিকে ভেবে মরছি। তা' জিনিসটা পোর্টেব্‌ল্, আমার বড় ট্রাঙ্কটার ভেতর অনায়াসে ধ'রে যাবে।"

মার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। বললেন, "বলিস কী! ট্রাঙ্কে ভ'রে উনুন নিয়ে যাবি? যত সব অনাচ্ছিষ্টি কথা।"

আমি আশ্চর্য হয়ে জবাব দিলুম, "তবে কী ক'রে নেবো? হাতে ক'রে? তাতে কি উনুনটার কিছু থাকবে?"

"কেন থাকবে না? তুই সঙ্গে যাচ্ছিস কা করতে?"

মা চলে গেলেন। আমি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লুম। শেষকালে একটা উনুন সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে আমাকে? আমার মত পুরুষকে? অথচ নাগপুরে না গিয়েও উপায় নেই, বিয়ের নেমন্তন্ন আছে। অনেক ভেবে ঠিক করলুম বড় ট্রাঙ্কে উপযুক্ত জায়গা রিজার্ভ রেখে দেবো, গাড়ি ছাড়ার পর উনুনটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া যাবে।

উনুনটাকে দেখার উদ্দেশ্যে ভেতরে গেলুম। সামনেই পড়ল ছোট বোনটা। চুপিচুপি বললুম, "হাঁরে ফস্তি উনুনটা একবার দেখাতে পারিস?"

ফস্তি বললে, "কোন্ উনুনটা বড়দা?"

"কোন্টা আবার? যেটা আমার সঙ্গে যাবে।"

ফস্তির মুখে হাসি দেখা দিলে। "তুমি সেই সুখেই থাকো। উনুন একটা কোথায়, উনুন তো চারটে। চারটেই যাবে তোমার সঙ্গে।"

আমি ধপাস ক'রে মাটিতে ব'সে পড়লুম। নাড়ীটা একবার দেখলুম। নাঃ এখনো বন্ধ হয় নি। বুকটা চেপে ধ'রে বললুম, "কী বললি? চচ্-চারটে উনুন?"

"হ্যাঁ চারটে। আর একটিন গঙ্গামাটি।"

"গঙ্গামাটি!"

"হ্যাঁ গঙ্গামাটি। উনুন লেপার জন্যে। ওদেশী মাটি দিয়ে ভাল উনুন লেপা যায় না।"

ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় লাগল। টলতে টলতে মার কাছে গিয়ে বললুম, "মা আমি উনুন নিয়ে যেতে গররাজী নই। কিন্তু তাই ব'লে চার-চারটে উনুন আর একটিন গঙ্গামাটি!"

মা বোধহয় আমার দুঃখটা উপলব্ধি করলেন। সহানুভূতির স্বরে বললেন, "কী করবি বল্। আপন লোক যাচ্ছে তাই বাণী নিয়ে যেতে লিখেছে। বললেই কি সবাই নেয়? দু' বছর ধ'রে চেষ্টা ক'রেও তো নিয়ে যাবার মত একটা লোক পাওয়া গেল না। ও-দেশের যা উনুন তাতে ওদেশী রান্নাই করা চলে, বাঙালীর রান্না হয় না।"

আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, "তা কেন হবে। এই ক'রে ক'রেই তো বাঙালী অধঃপাতে গেল। জিভটা পুরোপুরি আছে অথচ একটু কষ্ট কেউ করবে না। বাঙালী সংস্কৃতি বাঙালী সংস্কৃতি ব'লে যারা চেঁচায় সেই প্রবাসী বাঙালীদের উনুনের মত একটা তুচ্ছ বিষয়ের জন্যেও বাঙলাদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হয় এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কী আছে মা। অথচ নাগপুরে হাজার হাজার বাঙালী আছে, কেউ উনুনের ব্যবসা খুললে তো তার লাল হয়ে যাবার কথা। অথবা যদি বলো স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে এক জাতি এক প্রাণ এবং এক জিভ হয়ে মিশে যাওয়াটাই প্রবাসীদের একমাত্র কর্তব্য। তাহলেও বলতে হবে যে-দেশ তারা ছেড়ে গেছে সে-দেশের উনুনের প্রতি তাদের এই লুব্ধতা নিতান্তই অনুচিত এবং হতাশাজনক। তোমার বোনের মত প্রগতিশীলা এবং আধুনিকা মহিলারাও যদি এই সব দুর্বলতার প্রশ্রয় দেন তাহলে বাঙালী অথবা প্রবাসী বাঙালীর ভবিষ্যৎ কী হবে তা ভেবে দেখছ মা?"

বক্তৃতা দিয়ে হাঁপিয়ে পড়লুম। মা নীরব। বুঝতে পারলুম আমার যুক্তিকে অকাট্য মানলেও আমার আশা নেই। রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলুম মা ডাকলেন। বললেন, "চারটে উনুন নিয়ে যেতে তোমার অসুবিধে হবে জানি বাবা, কিন্তু উপায় কী! বাণী লিখেছে ছ'মাস ধ'রে রান্না করতে ওর কী যে অসুবিধে হচ্ছে বলার নয়। দু' বছর ধ'রে ব্যবহার করতে করতে সেই উনুনটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে, কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। মাটি লেপে লেপে উনুনের ভেতরটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, এই এতটুকু মাত্র কয়লা ধরে। আঁচ একটুও ওঠে না উঠলেও মিনিটে মিনিটে নিভে যায়। এসব প্র্যাকটিকাল কথা বাবা, তোমরা পুরুষমানুষরা ভাল বুঝবে না। যে ভুগেছে সে-ই জানে ভাল উনুন না হলে রান্না করতে কী দুর্ভোগ।"

অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বললুম, "কিন্তু একবার চেষ্টা ক'রে দেখলেও তো হ'ত একটা উনুন তৈরি করা যায় কিনা।"

মা একটু হাসলেন, "সে চেষ্টাও কি ওরা করে নি ভেবেছ? বালতির উনুন তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয়, অনেক অভ্যেস অনেক কেরামতির দরকার। তবুও বাণী চেষ্টার ত্রুটি করেনি। নিজে পারলে না দেখে ওদেশী এক উনুনউলীকে ডাকা হ'ল, সেও পারলে না। শিক লাগানোর জন্যে কামারকে দিয়ে বালতি ফুটো করানো

হ'ল কিন্তু হতভাগা কামার এমন ফুটোই ক'রে দিলে যে শিক এদিক দিয়ে কোনোমতে ঢোকে তো ওদিক দিয়ে বেরোয় না। যাই হ'ক সেটাও যখন কোনোরকমে ঠিক করা গেল দেখা গেল বালতির গায়ে কিছুতেই মাটি বসছে না। পাড়ার সমস্ত বাঙালা মিলে অনেক মাথা খাটিয়েও কিছু করতে পারলে না। বেপাড়ার লোকেরাও এল, তারাও কিছু পারলে না। তখন তোর মেসো ওর বন্ধু নাগপুরের চীফ ফারনেস ইন্সপেক্টারকে ডেকে নিয়ে এল। ভদ্রলোক আর তাঁর অ্যাসিস্টেন্টরা মিলে অনেক পরিশ্রম করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। হাল ছেড়ে দিয়ে তখন তাঁরা স্থির করলেন বাঙলাদেশের মাটিই নাকি বালতির গায়ে লাগতে পারে অন্য কোনো মাটি নয়। বাণী লিখেছিল এই নিয়ে নাকি এখন ওঁদের ল্যাবোরেটারিতে রিসার্চ চলছে।"

আমি রোমাঞ্চিত। চুলো তাহলে হেলাফেলার জিনিস নয়। শেষ চেষ্টা করার জন্য বললুম, "কিন্তু মা একটা কি বড় জোর দুটো নিয়ে গেলে চলত না? ভদ্রলোকের ছেলেকে চার-চারটে উনুন নিয়ে যেতে দেখলে কী ভাববে সবাই?"

"কিছু ভাববে না। ডাক্তার দে'র মত লোকের যদি চারটে উনুন আর গঙ্গামাটি নিয়ে যেতে আপত্তি না থাকে তবে তোর এত আপত্তি কিসের?"

ডাক্তার দে? অর্থাৎ অনিলবাবু? অনিলবাবু যে সুবোধ বালক সেবিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না কিন্তু সেই সুবোধত্বের পরিমাণ এত গভীর! তবে কি অন্য কোনো ডাক্তার দে?

নিঃসন্দেহ হবার জন্যে প্রশ্ন করলুম, "কে ডাক্তার দে মা?"

"কেন, নাগপুর ভেটারিনারি কলেজের প্রফেসার অনিল দে। চিনিস না নাকি?"

"ও মনে পড়েছে। কিন্তু উনিও চারটে উনুন নিয়ে গিয়েছিলেন নাকি? কই শুনিনি তো?"

"তুই শুনবি কা ক'রে, তখন তুই বহরমপুরে গিয়েছিলি। গরমের ছুটি ছিল দু'মাস। অনিল কলকাতায় এসেছিল ছুটি কাটাতে। বাণী ওকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল কলকাতা থেকে চারটে উনুন নিয়ে যেতে। অনিল উনুন চেনে না, আমাকে এসে সেকথা বলায় আমি মদনপুরীকে দিয়ে কিনিয়ে আনলুম। ঠিক হ'ল ও যেদিন চ'লে যাবে মদনপুরী হাওড়ায় গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে।...ওর মত লোক যদি উনুন নিয়ে যেতে রাজী থাকতে পারে তবে তুই পারনি না কেন?"

বলতে যাচ্ছিলুম যেহেতু আমি ভেটারিনারি ডাক্তার নই, কিন্তু চেপে গেলুম। অনিলবাবু শুধু মেসোরই নন, আমারও বন্ধু। একটা ঢোঁক গিলে বললুম, "তা উনুনগুলো শেষ পর্যন্ত আস্ত পৌঁছেছিল তো?"

মা দুঃখিত স্বরে বললেন, "বাণীর কপালটাই মন্দ, উনুন পৌঁছবে কী ক'রে? মদনপুরী উনুন আর গঙ্গামাটি নিয়ে স্টেশনে গিয়ে দেখলে অনিল দে'কে ইনভ্যালিড চেয়ারে ক'রে গাড়িতে তোলা হচ্ছে।"

*

একটা ঠেলাগাড়ি ক'রে স্টেশনে উপস্থিত হলাম। বখশিষের লোভে কুলিরা একটা ফাঁকা কামরাতে তুলে দিলে। নিজের মালপত্র ভাল ক'রে গুছিয়ে সবে হাত-পা ছড়িয়ে বসেছি, কলরব করতে করতে উঠে পড়ল জন পাঁচ ছয় বিরাটদেহী লালমুখো কাবুলিওয়ালা আর চোখের নিমেষে কামরাটা মালে বোঝাই হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বাদে উৎফুল্ল মনে সস্ত্রীক এক বাঙালী ভদ্রলোক উঠলেন কিন্তু একটু এদিক ওদিক তাকিয়েই নেমে গেলেন। তারপর সপরিবারে আর এক ভদ্রলোক এবং আরও একজন। মনটা একটু দমে গেল। কাবুল এবং কাবুলিওয়ালাদের সম্বন্ধে বহু সহৃদয় লেখা প'ড়েও ছেলেবেলার ভয়টা একেবারে দূর করতে পারি নি। বিশ্বাস কি, যদি ঘুমের ঘোরে সর্দারেরা হিং খেতে অনুরোধ করে? কথাটা মনে হতেই অবশ্য নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠলুম কিন্তু খুঁতখুঁতুনিটা একেবারে গেল না।

সঙ্গে হিং রয়েছে কিনা নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছে হ'ল। আমার ঠিক সামনেই ব'সে এক নওজোয়ান। সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "সর্দারজীরা বুঝি বোম্বাই থেকে কাবুলের জাহাজ ধরবেন?"

ছোকরা এতটুকু একটা আতরের শিশি খুলে গোঁফে আতর লাগাল। ধীরে সুস্থে জবাব দিলে, "নেই জী, হাম

কাবুলমেঁ নেহী জাতা হ্যায়, বিল্‌হাসপুরমেঁ জায়গা। ওহী হামলোগ রহ্‌তা হ্যায়।"

"বিল্‌হাসপুর? সেটা আবার কোথায়? ও বুঝেছি বিলাসপুর। কিন্তু বিলাসপুরে কিসের ব্যবসা করেন? তেজারতীর? না হিঙের?"

সর্দার হেসে বললে, "কোনোটারই না। সেখানে আমাদের আতরের ব্যবসা আছে।"

"আতর? আপনাদের দেশে আবার আতর জন্মাল কবে সায়েব? আজকাল হিং থেকে সিন্থেটিক আতর তৈরী হচ্ছে বুঝি?"

সর্দার কিছু জবাব দেবার আগেই একটা অঘটন ঘটে গেল। উনুনগুলোর ওপর একটা চাদর ঢাকা দিয়ে রেখেছিলুম, একটা দমকা বাতাসে কাপড়টা উড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সর্দার সিধে হয়ে ব'সে বললে, "আরে ইয়ে কেয়া?"

বললুম, "উন্নান হ্যায়। জিসমে রান্না হোতা হ্যায়।"

সর্দার বুঝতে পারলে না। উনুনগুলোকে ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে বললে, "আমি তো চার-চারটে মাটি মাখানো বালতি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু জিনিসগুলোর নিচের দিকে একটা ক'রে জানালা কেন? ভেতরে অতগুলো শিকই বা কেন? ওপর দিকে তো আবার তিনটে ক'রে শিঙের মত জিনিস রয়েছে দেখছি। বিলকুল চুল্‌হাকা মাফিক।"

চুলোর রাষ্ট্রীয় পরিভাষা পেয়ে আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম, "হাঁ হাঁ চুল্‌হা, চুল্‌হা।"

সর্দার পুলকিত হয়ে বললে, "বটে! পোর্টেবল্‌ চুলো! সত্যি বাঙালীদের মাথাই অদ্ভুত।" সবচেয়ে ছোট চুলোটা তুলে ধ'রে সে সঙ্গীদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালে। আমার পক্ষে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলাবলি করতে লাগল, তারপর অকস্মাৎ সবাই মিলে বিকট রবে হেসে উঠল। হাসি শুনে ওপাশ থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন আর আমার কাছে এসে শুধোলেন, "কী হয়েছে ভায়া?" কামরার আরো অনেকে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকাল।

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিলুম, "আজ্ঞে কিছু নয়। আমার চুলোগুলো দেখে ওনরা একটু ফুর্তি করছেন।"

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হলেন। জিজ্ঞেসা করলেন "মহাশয়ের কতদুর যাওয়া হচ্ছে?"

"নাগপুর।"

"সেখানে উনুনের ব্যবসা করেন বুঝি?"

"আজ্ঞে!"

রাত্রি বারোটা। বম্বে মেল ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। বিছানাটা কোনোমতে পেতেছি, একটা বালিশও রয়েছে কিন্তু চোখে ঘুম নেই। উনুনগুলো এখন পর্যন্ত অক্ষতই আছে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে এই বুঝি একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল। ভয়টা অমূলক নয়, এর মাঝে তিন তিন বার এক বুড়ো সর্দার ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরার সময় পা দু'খানা বেঞ্চির বাইরে, বোধহয় তাদের মালপত্রের ওপরেই স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিবারেই সেই ভীম পদযুগল এসে পড়েছিল ঠিক উনুনগুলোর ওপর। অবশ্য দোষটা আসলে আমারই। সর্দারের হাত-পা চালাবার মত উপযুক্ত জায়গা বাদ দিয়েই উনুনগুলো রাখা উচিত ছিল আমার কিন্তু সে রকম আদর্শ জায়গা আর কামরায় অবশিষ্ট ছিল না। বাঙ্কের ওপর জায়গা থাকলেও সেখানে তাদের অভিভাবকহীন ভাবে ছেড়ে দেবার সাহস আমার নেই, আর বেঞ্চির তলায় ঢুকতেও তারা অক্ষম, শিংগুলো আটকে যায়। কামরার অপর দিকে জায়গা কিছুটা আছে কিন্তু সেখানে রাখলে তাদের উপযুক্ত সুপারভাইজিং অসম্ভব। এদিকে মা আমাকে বার বার সতর্ক ক'রে দিয়েছেন—'দেখিস বাবা সাবধানে নিস।' অন্ততঃ এই রকম ক্ষেত্রে মাতৃআজ্ঞা যে সব কিছুর ওপর তা কে না জানে।

দুর্ভাবনার কারণ আরও একটা। মাসির ছেলে দুটির জন্যে মা বেশ বড় এক হাঁড়ি রসোগোল্লা সঙ্গে দিয়েছিলেন (হাঁড়ি বহনকে আমি বিশেষ পৌরুষের ব'লে মনে করি না তবে রসোগোল্লা থাকলে সেকথা আলাদা)। হাঁড়িটাকে বসিয়ে দিয়েছিলুম বড় উনুনটার ঠিক পাশেই। ভেবেছিলুম এটাই সবচেয়ে নিরাপদ—চোখে চোখে রাখতে পারব। কিন্তু সে ভরসা এখন আর একটুও নেই। সর্দারদের পদাঘাতে উনুন চতুষ্টয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটু আধটু স্থানচ্যুত হয়ে গেলেও হয়ত মাসি গঙ্গামাটির সাহায্যে

সেগুলো যথাস্থানে পুনঃ সংস্থাপন করতে পারবেন (মেসো সার্জন), কিন্তু রসগোল্লাগুলো বরবাদ হয়ে গেলে কপালে করাঘাত করা ছাড়া আর কোনো পথ রইবে না।

উনুনের মঙ্গলচিন্তা সত্ত্বেও কখন চোখদুটো একটু লেগে এসেছিল, ঝিমুতে ঝিমুতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি। দুটি হিন্দুস্থানী ছোকরা আমার উনুনগুলোর ওপর ঝুঁকে প'ড়ে তুমুল তর্ক লাগিয়ে দিয়েছে। একজনের কথার সারমর্ম হ'ল—এই বিশেষ ধরণের উনুনগুলো নিশ্চয়ই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় জনের বক্তব্য এগুলো বাড়ির উনুনেরই উন্নততর ও আধুনিকতম সংস্করণ। প্রথমজন যুক্তি দেখাচ্ছে যে বিশেষ প্রয়োজনে না এলে একমাত্র পাগল ছাড়া আর কেউ শুধু রান্নার জন্যে চার-চারটে উনুন সঙ্গে নিয়ে যায় না—সে যতই আধুনিক জিনিষ হ'ক না কেন। তাছাড়া একজন বাঙালী সজ্জন কখনই এ রকম বোকামি করবেন না। দ্বিতীয়জন যুক্তি দেখাচ্ছে বাঙালী ভদ্রলোক হয়ত কোনো এগজিবিশনে দেখাবার জন্যে উনুনগুলো নিয়ে যাচ্ছেন, অথবা এমনও হতে পারে তিনি হয়ত এই বিশেষ ধরণের উনুনের কারখানা খুলবেন ব'লে স্যাম্পেল নিয়ে যাচ্ছেন।

তর্ক ক্রমশঃই উত্তপ্ত হচ্ছে ; হঠাৎ একজন হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠল, 'কখনো নয়' আর সঙ্গে সঙ্গে আমি সিধে হয়ে বসলুম। ভাল ক'রে চোখ খুলতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম—অ্যাঁ ব্যাপারটা তাহলে স্বপ্ন নয়, সত্যি! ছেলে দুটি ততক্ষণে আস্তিন গুটিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তাদের হুটোপুটিতে হয়ত আপত্তি করতুম না কিন্তু পড়বি তো পড় দু'জনেই একেবারে আমার উনুনগুলোর ওপর এসে পড়ল। আমি কিছু চিন্তা না ক'রেই আন্তরিক প্রেরণার বশে সেই বুড়ো কাবুলিওয়ালার হাতটা প্রবল ভাবে ঝাঁঝিয়ে ব'লে উঠলুম, "গেল গেল সর্দারজী, সব গেল। মাসির এত সাধের উনুনগুলো সব গেল......"

সর্দার চোখের ফাঁক দিয়ে একটু দেখলে। কী বুঝলে সেই জানে। পরক্ষণেই পা'দুটো সামনের দিকে একবার ছুঁড়ে মারলে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না। ছেলেদুটি ফুটবলের মত ছিটকে পড়ল দরজার দিকে। গঙ্গামাটির টিনটার কথা এতক্ষণ বিস্মৃত হয়ে রয়েছিলুম, একজনের পায়ে লেগে টিনটা উল্টে গেল আর অর্ধতরল গঙ্গামাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেদুটি সিধে হয়ে উঠতে না উঠতেই পা পিছলে সশব্দে সেই মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

চোখের নিমেষে ব্যাপারটা ঘ'টে গেল। কামরাসুদ্ধু লোক হতভম্ব। এমন কি আমিও, আর সেই বুড়ো সর্দারও। ছেলে দুটি অবশেষে উঠে দাঁড়াল। গঙ্গামাটি তাদের সর্বাঙ্গে—জামায় কাপড়ে চোখে মুখে কানে হাতে পায়ে। প্রথম ছেলেটি কাতরস্বরে বললে, "ওঃ কোমরটা বোধহয় ভেঙে গেল রে।"

দ্বিতীয়জন ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "আমার মাথাটা কেমন কেমন করছে! চেন টেনে গাড়িটা থামাবি ভাই? গার্ডের কাছে ওষধপত্তর থাকতে পারে।"

আরোহীরা ততক্ষণে দৌড়োদৌড়ি ক'রে কাছে এসেছে। কেউ ছেলেদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কেউ হাত-পা ঝাঁঝিয়ে, কেউ পিঠে কাঁধে চাপড় দিয়ে ফার্স্ট এড দিচ্ছে। চোখ মুখ মুছে একজন ছোকরা বললে, "কিন্তু এমন জংলী কে রে! গাড়ির ভেতর কাদা যায়? তাও আবার ক্যানেস্তারায় ক'রে! ভয়ঙ্কর লোক তো সে! মানুষ খুন করতে পারে।"

এবার সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল: "ঠিক, ধরো তাকে। গাড়ির ভেতর কাদা নিয়ে যায় এ রকম তাজ্জব কথা তো কখনো শুনিনি। কোন্ আইনে বলে গাড়ির ভেতর কাদা নিয়ে যাবে? গাড়ি থামিয়ে গার্ডের হাতে ধরিয়ে দাও, শাস্তি হ'ক হতচ্ছাড়ার।"

একজন চেঁচিয়ে উঠল, "ভাল চাও তো শিগ্গির বলো কে এনেছে কাদা? কিসনে লায়া হ্যায় কী চড়?"

কর্কশ স্বরে সবাই প্রশ্ন করতে লাগল, "কিসনে লায়া হ্যায় কী চড়?" আমি সূর্যোদয়ে তন্ময় হয়ে গেছি। অন্ধকারের ভেতর থেকে কী চমৎকার ভাবে আলো বেরিয়ে আসছে। ঠিক যেন ধাত্রিঝির কোল থেকে বড়বাবুর ফর্সা ছেলেটা নেমে আসছে। আহা কী অপূর্ব দৃশ্য।

আরো দু'তিনবার সমবেতকণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—কিসনে

কীচড় লায়া হ্যায়? আমি আরো গভীর ভাবে প্রকৃতিতে ডুবে গেছি······আহা কী সুন্দর ভাবে লুকোচুরি খেলতে খেলতে গাছগুলো পেছন পানে ছুটে চলেছে······

ভিড়ের মাঝ থেকে একজন ব'লে উঠল, "দরকার নেই অত সাধাসাধি ক'রে। টিনটা বাইরে ফেলে দাও, অপরাধী আপনিই ধরা প'ড়ে যাবে। সলোমনের গল্প মনে নেই?"

সত্যিই তারা টিনটা জানালা দিয়ে ফেলে দেবার উপক্রম করলে। আমার হঠাৎ ঘুম ভাঙল। দু'চোখ কপালে তুলে বললুম, "আরে আরে করতা হ্যায় কেয়া? জানতা হ্যায় এ মাট্টি যেইসা তেইসা মাট্টি নেহি হ্যায়, একদম গঙ্গাজীকা মাট্টি হ্যায়? জলদি প্রণাম করিয়ে সব লোক, জলদি। নেহি তো ভয়ানক অনাচার হোগা, পাপ হোগা।"

সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললুম, "হাঁ করকে দেখতা হ্যায় কেয়া? সবলোক কপালমে মাট্টিকা ফোঁটা লাগাইয়ে আউর তিলক কাটিয়ে। জানতা হ্যায় কেতনা কষ্ট করকে এ পবিত্র মাট্টি নাগপুরমে :লে যাতা হ্যায়? তিলক কাটনেসে বহুত পুণ্য হোগা আউর সব পাপ কাট যায়েগা।"

তখনো সবাই চুপ। আমি মাটিতে আঙুল ডুবিয়ে বললুম, "আইয়ে ভাই সব এক এক করকে।" কেউ কিছু বলার আগেই আমি সবার কপালে ফোঁটা একে দিলুম। কিন্তু সেই ছেলেদুটির কাছে যেতেই একজন আমার হাতটা ঠেলে দিয়ে বললে, "ওতে ভবী ভুলবে না। আপনার গঙ্গাজীর মাটির জন্যে আমাদের হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে। ক্ষতিপূরণ আদায় ক'রে তবে আমরা ছাড়ব।"

হাসিমুখে বললুম, "বেশ তো ভাই, নিশ্চয়ই দেবো ক্ষতিপূরণ। তার আগে এসো আমরা সবাই মিলে মাটিটা টিনে ভ'রে ফেলি। আর রায়গড়ে গাড়ি থামলে ব'লো—মিঠাইওলাকে ডাকতে হবে।"

একখানা পাঁচটাকার নোট বের ক'রে আবার পকেটে রাখলুম।

বিলাসপুরে ছেলে দুটি আর সর্দারেরা নেমে গেল। উঠলেন এক বাঙালী দম্পতি। সঙ্গে একটি শিশু আর প্রচুর লটবহর। আলাপ হ'ল। বললেন তাঁরা ট্রেনে চড়েছেন আগের দিন সকালে আর গন্তব্যস্থলে পৌছবেন সেদিন গভীর রাত্রে। এই নিয়ে দু'বার ট্রেন বদলেছেন আরও একবার বদলাতে হবে গোণ্ডিয়া জংশনে। বেচারাদের অবস্থা দেখে সহানুভূতি হ'ল। দু'দিন ধরে স্নান হয়নি, হয়ত খাওয়াও তেমন হয়নি, তদুপরি গেছে থার্ড ক্লাসের ধস্তাধস্তি আর দুপুরের প্রচণ্ড গরম। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই যেন ঝলসে গেছেন আর শিশুটি যেন ধুঁকছে।

ছেলেটা এক সময় কাঁদতে আরম্ভ করলে। তার মা একখানা বিস্কুট বের ক'রে দিলেন। বিস্কুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটা আবার কাঁদতে লাগল। ভদ্রমহিলা একটা বোতল থেকে খানিকটা দুধ বাটিতে ঢেলে খেতে দিলেন। ছেলেটা বাটিটা ঠোঁটে ছুঁইয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। ভদ্রলোক বললেন, "গরম থাকলে হয়ত খেতে পারত।"

ভদ্রমহিলা হঠাৎ ফোঁস ক'রে উঠলেন: "সে কথা খেয়াল থাকলে আর স্পিরিট ল্যাম্পটা হারাতে না। চলতি গাড়ির ভেতর গরম করব কোত্থেকে খেয়াল আছে?"

ভদ্রলোক ম্রিয়মাণ হয়ে বললেন, "আচ্ছা রায়পুরে গাড়ি থামলে গরম ক'রে আনব'খন।"

"সে তো অনেক দেরি। এতক্ষণ ছেলে না খেয়ে থাকবে?" একথা ব'লে হঠাৎ ভদ্রমহিলা ডাকলেন, "শুনছেন।"

আমি ভয়ে ভয়ে ফিরে তাকালুম! ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে বললেন, "উনুনগুলো বোধহয় আপনার? এ উনুনগুলো সত্যিই খুব কাজ দেয়। সুবিধেও এর অনেক। আমাদের সঙ্গে মাসিক পত্রিকা রয়েছে, কিছু যদি মনে না করেন এই ছোট উনুনটাতে কাগজ জেলে দুধটা একটু গরম ক'রে নেবো?"

আমি আমতা আমতা ক'রে বললুম, "ইয়ে কী বলে, উনুনগুলো ঠিক আমার নয়, একজনকে দিতে হবে। গাড়ির এক কোণে কাগজ ধরিয়ে গরম করা যাবে না?"

এমনিতে কী ক'রে গরম হবে? বাটিটা ধরবই বা কী দিয়ে? তা ছাড়া ওভাবে গরম করতে গেলে দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয়ে যাবে আর গন্ধ হয়ে গেলে আমার ছেলে ছোঁবেই না।"

"সেটা অবিশ্যি খুবই সত্যি···কিন্তু উনুনটা যে ঠিক···"

ভদ্রমহিলা রুক্ষভাবে বললেন, "উনুনটা এমন কিছু সোনাদানা নয়, কাগজ ধরালে ক্ষয়ে যেত না।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন বোঝা গেল। লজ্জিত হয়ে বললেন, "এসব তুমি কী বলছ! রায়পুরে পৌছতে আর কতক্ষণই বা আছে। সেখানেই দুধটা গরম ক'রে আনব।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না। দু'দিনের ধকলে আমাদের মাথা-টাথা সব গোলমাল হয়ে গেছে। কখন যে কী ক'রে ফেলি ঠিক নেই।"

আমি মাথা নিচু ক'রে জবাব দিলুম, "আজ্ঞে উনি ঠিকই বলেছেন। আমি বোধহয় ব্যাপারটা আপনাদের ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারিনি। উনুনগুলো এক ভদ্রমহিলা আরেক ভদ্রমহিলাকে প্রেজেণ্ট পাঠাচ্ছেন। প্রেজেণ্ট জিনিষটা যতদূর সম্ভব নতুন থাকলেই ভাল হয়, মানে একবার ব্যবহার করলে সেটার মাধুর্য্য, ইয়ে কী বলে, মানে সেটার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য · অর্থাৎ সেটাকে আর..."

আর বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না।

রায়পুরে গাড়ি থামা মাত্র প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়লুম দুধের বোতলটা হাতে নিয়ে। ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হলুম ঈশ্বরদাস বল্লভদাসের খাবারের স্টলে। অনেক কাকুতি মিনতি করার পর দোকানী দুধটা একটা বড় মগে ঢেলে উনুনের ওপর চাপিয়ে দিলে। হঠাৎ আমার খেয়াল হ'ল দশটা বাজে এখন, এই বেলা কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। কিছু খাবার আর চায়ের অর্ডার দিলুম। সিঙাড়াগুলো সাইজে বেশ বড় দেখে লুব্ধভাবে যেই একটা মুখে দিয়েছি অমনি সমস্ত মুখের ভেতর দিয়ে যেন একটা লাভাস্রোত বয়ে গেল। অসহ্য ঝাল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাড়াতাড়ি চায়ের কাপে চুমুক দিলুম আর তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আর্তনাদ ক'রে উঠলুম। ঝালে মুখ জ্বলে গিয়েছিল, আগুনের মত গরম চা ডবল করে মুখটাকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। সব কিছু ঠেলে রেখে পরিশ্রান্ত কুকুরের মত জিভ বের ক'রে হাঁফাচ্ছি আর বিকারের রোগীর মত ভাবতে চেষ্টা করছি কতখানি লংকা দিলে এতটা ঝাল সম্ভব? এমন সময় ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি বোতলটা চেয়ে নিয়ে নিজের কামরার উদ্দেশ্যে দৌড়তে আরম্ভ করলুম, কিন্তু আশ্চর্য, কামরাটা কি কেটে রেখে দিয়েছে? হঠাৎ মনে হ'ল ভুল দিকে চ'লে আসিনি তো? ক্ষণকাল বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে উল্টো দিকে ছুটতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু ইঞ্জিন পর্যন্ত গিয়েও আমার কামরা খুঁজে পেলুম না। আবার ফিরলুম। গাড়ি ছেড়ে দিলে। হাতের কাছে যে কামরাটা পেলুম তাতেই উঠে পড়লুম।

মনের এবং দেহের উত্তেজনা একটু কমলে সমস্ত ব্যাপারটা স্থিরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলুম। রায়পুরে নামার সময় ভদ্রলোককে ব'লে এসেছিলুম আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুধটা গরম ক'রে আনছি, এর মধ্যে তাঁরা যেন অনুগ্রহ ক'রে হাঁড়ি থেকে রসোগোল্লা বের ক'রে কয়েকটা গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য রসগোল্লার প্রস্তাবটা ছেলেকে শান্ত করবার জন্যে নয়, ছেলের বাপ-মাকে শান্ত করবার জন্যে। উনুনটা ব্যবহার করতে না দেবার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু রসোগোল্লার সদ্ব্যবহার করতে দিয়ে নিজের অপরাধের বোঝা এবং তাঁদেরও ক্রোধের পরিমাণ কিছুটা লাঘব করানোর কথা অনেকক্ষণ থেকেই মনে জাগছিল কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাহস পাই নি। তাই গাড়ি থেকে নামার মুখে চট্ ক'রে কথাটা ব'লে ফেলেই নেমে পড়েছিলুম যাতে তা'রা মৌখিক প্রতিবাদ করার সুযোগ না পান। এখন ভাবতে লাগলুম রসোগোল্লা তো গেলই উপরন্তু মাসির উনুনগুলোও গেল। আমাকে ফিরতে না দেখে নিশ্চয়ই তাঁরা আর অপেক্ষা করবেন না, উনুনের ভেতরেই মাসিক পত্রিকা ধরিয়ে বাকি দুধটা গরম করবেন। যে জিনিসে কয়লা ধরানো হয় তাতে যে কিছুতেই কাগজ ধরানো যাবে না তা তাঁরা না জানলেও আমি তো জানি। লাভের মধ্যে একটা একটা ক'রে চারটে উনুনেই এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে চারটেরই তাঁরা দফা সারবেন। নাঃ এবারও মাসির কপালটা নেহাৎই মন্দ দেখতে পাচ্ছি। তা ভেবে আর কী হবে—সবই তো করুণাময়ীর ইচ্ছা।

পরের স্টেশনে নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে একটা মস্ত বড় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। আমার আশঙ্কা সত্য হয় নি—উনুনগুলো তাঁরা ব্যবহার করেন নি। আমি নেমে যাবার পরেই ছেলেটা এমন কান্না জুড়ে দিয়েছিল যে ভদ্রলোক আমার ফেরার অপেক্ষা না ক'রেই এক

ভেন্ডারের কাছ থেকে গরম দুধ কিনে দিয়েছিলেন। শুনে মনটা একেবারে হাল্কা হয়ে গেল। আর হ্যাঁ, রসোগোল্লাও তাঁরা নেন নি। মনের আনন্দে নিজেই কিছু রসোগোল্লা বিতরণ করলুম। তারপর গুন গুন ক'রে গান ধরলুম, 'সকলি তোমারি ইচ্ছা।'

কলকাতা থেকে রওনা হবার একুশ ঘণ্টা পরে বিকেল সওয়া চারটের সময় নাগপুর পৌছলুম। টাঙ্গায় আমার পাশে এসে বসল মাসির এক ছেলে। আট বছরের চোখ নিয়ে সে বার বার হাঁড়িটার দিকে তাকাতে লাগল আর উচ্ছ্বসিত হয়ে, কত কী ব'লে যেতে লাগল। আমি নীরব। একুশ ঘণ্টা উনুনগুলোর তদারকি ক'রে মাথার আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তার ওপর সকাল ন'টা থেকে মধ্য প্রদেশের প্রচণ্ড উষ্ণস্রোত সমস্ত দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এখনও তার জ্বালা অনুভব করছি। ক্লান্তিতে আমার সারা দেহমন একেবারে অবসন্ন।

মাসির দোরগোড়ায় পৌছতেই মাসি আমার মালপত্রের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে তুই যে সত্যিই উনুনগুলো নিয়ে এসেছিস দেখছি। আমি তো বিশ্বেসই করতে পারি নি এতগুলো উনুন নিয়ে তুই এতদূর আসবি এখনও যেন বিশ্বেস হচ্ছে না।"

খুশী মনে তিনি উনুনগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দে[খে] বললেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে তো জিনিসগুলো। এক[টা] ফেটে গেছে অবিশ্যি তাহলেও উনুনগুলো বেশ ভাল আর এই যে মাটিও এনেছিস দেখছি। সত্যিই তুই ব[ড়] লক্ষ্মী ছেলে।" তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফি[রে] বললেন, "দেখে যা একটা জিনিস। শিগ্‌গির।"

মাসি আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ভাঁড়া[র] ঘরে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা কোণের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ। এগুলো[ও] কলকাতা থেকে আনানো। মাস কয়েক আগে ওঁর এক বন্ধু নিয়ে এসেছেন।"

দেখলুম। একদিকে মেঝের ওপর একটা অল্প ব্যবহৃত বালতির উনুন প'ড়ে রয়েছে আর অন্য দিকে, একটা সিমেন্টের বেদীর ওপর চার-চারটে বিভিন্ন সাইজের নতুন বালতির উনুন সাজানো রয়েছে সুন্দর ভাবে।

আমি একবার চারদিকে হাতড়ালুম। শুধুই সর্ষে ফুল। ক্ষীণকণ্ঠে বললুম "একটু জ—

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম

ভৃগু যখন পিতার নিকট গিয়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন পিতা বরুণ বলিয়াছিলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্ ব্রহ্ম"। যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাহা দ্বারা জীব জন্মিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং অন্তিমে যাহাতে প্রবেশ করে, তাহাই ব্রহ্ম। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, ব্রহ্মের স্বরূপ কি? বরুণ তপস্যা দ্বারা তাহা জানিবার জন্য পুত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। ভৃগু তপস্যা করিয়া প্রথমে বুঝিলেন অন্নই ব্রহ্ম। পরে বুঝিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম; তাহার পরে মন ব্রহ্ম; তাহার পরে, বিজ্ঞান ব্রহ্ম। অবশেষে বুঝিলেন আনন্দই ব্রহ্ম। ইহাই ভার্গবী বারুণী বিদ্যা।

ভৃগু যে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা তপস্যালব্ধ। তপস্যা শব্দের অর্থ এখানে কৃচ্ছ্রসাধন (Penance) নহে, বাহ্যান্তঃকরণ সমাধান, মনের ও ইন্দ্রিয়দিগের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রীকরণ। প্রথম বারের মনঃসমাধানের ফলে তিনি যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বিশুদ্ধ জড়বাদ। জড়বাদে জড় (matter)-ই সর্ব্ববস্তুর মূল। জড় হইতেই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়। জড় হইতে উৎপন্ন অন্ন খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং অন্তিমে জড়েই পরিণত হয়। দ্বিতীয় বারে ভৃগু জড় হইতে শক্তিতে উপনীত হইলেন। প্রাণই শক্তি—সার্বিক শক্তি। এই শক্তি সূক্ষ্ম, ক্রিয়াপর, সর্ব্ববস্তুর অন্তর্বর্ত্তী ও সর্ব্বব্যাপী। শক্তির প্রত্যয় আমাদিগের দৃষ্টি পৃথিবীর বাহিরে অনন্ত বিশ্বের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। জড়ের স্থূলত্ব, এবং বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ও ইহা দ্বারা বিদূরিত হয়—এক সনাতন বিশ্বব্যাপী শক্তির প্রকাশরূপে সকল বস্তু পরিগণিত হয়। প্রাণই এই শক্তি। বিশ্বের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এক উৎস হইতে প্রাণের স্রোত চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত। পৃথিবীর প্রাণিগণ সেই প্রাণ হইতে উদ্ভূত এবং সেই কেন্দ্রীয় উৎস হইতে সেই প্রাণ-স্রোত

তাহাদিগের মধ্যে নিত্য প্রবাহিত বলিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকে, এবং অন্তিমে তাহাদের প্রাণ সেই কেন্দ্রীয় উৎসে ফিরিয়া যায়। সেই অসীম প্রাণই ব্রহ্ম। ইহাই ভৃগুর দ্বিতীয় মীমাংসা, কিন্তু শেষ মীমাংসা নহে। ইহার পরে তিনি প্রাপ্ত হইলেন "মনই ব্রহ্ম।" মন হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হয়, মন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং মনেই অন্তিমে প্রবেশ করে। মন ও আত্মা এক নহে। হিন্দুদর্শনে মন একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত—অন্তরিন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়ে সমস্ত সংবেদন (Senasations) উপস্থিত হইয়া জ্ঞানাকারে সজ্জিত হয়। জড় বিশ্বের বিশ্লেষণের ফলে ভৃগু জড়কে শক্তির প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যাহা জড়রূপে প্রতীত হয়, তাহা শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বুঝিলেন শক্তি সংবেদন মাত্র, শক্তির যে প্রত্যয় আমাদের মনে আছে, তাহা সংবেদনদিগের সংযোগের প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এবং যাহাকে মন বলা হয়, তাহাও সংবেদনদিগের সমবায় মাত্র। বিশ্ব যদি শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়, এবং শক্তি যদি সংবেদন হয়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব বিভিন্ন-জাতীয় সংবেদনের সমবায়, এবং এই সমবেত সংবেদনরাজিই মন। সুতরাং মন হইতেই ভূতগণ উৎপন্ন হয়, মন দ্বারা বাঁচিয়া থাকে এবং মনেই অন্তিমে লীন হয়।

পুনরায় তপস্যা করিয়া ভৃগু পাইলেন "বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।" ভৃগু প্রথমে বুঝিয়াছিলেন জীব-সমন্বিত এই বিশ্ব (মন যাহার অন্তর্ভুক্ত) জড় ভিন্ন কিছু নহে। পরমাণুর সমবায়ে যাবতীয় জড় বস্তু গঠিত, পরমাণু অচেতন জড়পদার্থ। তাহার পরে ভৃগু বুঝিয়াছিলেন যাহাকে অচেতন জড় বলা হয়, তাহা শক্তি—অচেতন শক্তি। কিন্তু শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বুঝিলেন শক্তি সংবেদন ব্যতীত কিছু নহে, এবং এই বিশ্ব সংবেদনের সমবায় মন, এবং মন স্বরূপে আত্মিকপদার্থ (Spiritual)। সুতরাং তথাকথিত জড় বিশ্ব মূলে পরস্পর সংবদ্ধ আত্মিক পদার্থসমূহের সংঘাত (organised system)। সংবেদন দ্বিবিধ—বাহ্য সমুৎপাদ এবং মানসিক সমুৎপাদ। কিন্তু উভয়ই এক আত্মিক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব এই দ্বিবিধ সমুৎপাদের (phenomena) সমবায়ে গঠিত, এবং দ্বিবিধ আত্মিক উপাদানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার উপর ইহার স্থিতি নির্ভরশীল। কিন্তু এই দ্বিবিধ সমুৎপাদ যে আত্মিক পদার্থের বিকার এবং যাহার মধ্যে উভয়বিধ সমুৎপাদের সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই আত্মিক পদার্থের স্বরূপ কি? সে পদার্থ বিজ্ঞান—প্রজ্ঞা (Reason)। বাহ্য জগৎ এই প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক পরিচালিত—তাহার সর্ব্বত্র প্রজ্ঞার শাসন বর্ত্তমান। অন্তর্জগৎ ও প্রজ্ঞার নিয়ম দ্বারা শাসিত। সুতরাং ভৃগু বুঝিলেন বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞা হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, প্রজ্ঞাদ্বারা বাঁচিয়া থাকে এই প্রজ্ঞাতেই বিলীন হয়। এই জগৎ প্রজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র নহে; ইহা, যে কেবল প্রজ্ঞার নিয়মানুসারে চালিত হয়, তাহা নহে। ইহা প্রজ্ঞাই; প্রজ্ঞাই ইহার উপাদান। যে প্রজ্ঞাকে আমাদের রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে আবদ্ধ মনে হয়, দিব্য দৃষ্টিতে তাহাই বিশ্বের চালকরূপে পরিদৃষ্ট হয়। তাহা দেশ ও কালের অতীত, তাহা আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অনুভূতি এবং প্রত্যেক চিকীর্ষায় অনুস্যূত। স্থূল জগৎ উর্ণনাভের জালের ন্যায় প্রজ্ঞা-বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু বরুণের নিকট এ মীমাংসাও বাহ্য বলিয়া প্রতীত হইল। শেষবারের ব্যাখ্যায় ভৃগু সত্যে উত্তীর্ণ হইলেন। "আনন্দ ব্রহ্ম" এই সত্য তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। কিন্তু এই মীমাংসা যুক্তি দ্বারা লভ্য নহে। ভৃগু যে আনন্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের অনুভূত সুখ নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ভূমার কথা আছে, সেই ভূমাই আনন্দ। "যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। "যো-বৈ ভূমা তৎ অমৃতং।" ভূমাই সব; তিনি ঊর্দ্ধে, অধঃ তে, দক্ষিণে, উত্তরে। ভূমা পূর্ণ, অনবদ্য, সীমাহীন নিস্তরঙ্গ। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যুক্তি বলে ভৃগু "বিজ্ঞান ব্রহ্ম" পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। তাহাই যুক্তির শেষ সীমা। তাহার পরে তিনি যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুভব সিদ্ধ।* ধ্যান বলেই তিনি সেই আনন্দ তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। "যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।" মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কখনও ভয় প্রাপ্ত হন না। এই ব্রহ্ম আত্মা—অপহতপাপা, বিজ্বর, বিমৃত্যু (ছান্দোগ্য)। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন "শরীর অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। দর্শন, আঘ্রাণ, স্পর্শন, মনন প্রভৃতি অশরীর আত্মাই করেন।" বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন" যাঁহার নিম্নে সংবৎসর দিনসকলের সহিত আবর্ত্তন করিতেছে (সংবৎসরঃ অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে) সেই জ্যোতির জ্যোতি আয়ুস্বরূপ অমৃতস্বরূপকে দেবগণ উপাসনা করেন। যাহাতে পঞ্চজন (চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়) ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আমি আত্মা বলিয়া জানি। তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন।"

জীব শরীরে অধিষ্ঠিত এই আত্মা সর্ব্বশরীরে জাগ্রৎ, স্বপ্নও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই বর্ত্তমান। এই আত্মাই সর্ব্ব শরীরে জ্ঞাতা—সার্বিক বিষয়ী (subject)। আবার ইনিই সার্বিক বিষয়; জ্ঞেয় সকল বিষয়ই এই আত্মা। এই সার্বিক আত্মাই দর্শন, শ্রবণ, মনন করিয়াও করেন না। তাহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য, মন্তব্য কিছুই নাই, এই জন্য তিনি দর্শন, শ্রবণ ও মনন করেন না।†

মানব শরীরে অধিষ্ঠিত অনন্ত আত্মার মধ্যে নাই এমন কিছুই বিশ্বে নাই। প্রকৃতির যাবতীয় ব্যাপার এবং অনুভূত সমস্ত বিষয় ইহার অন্তর্গত। জীবাত্মা ইহার অঙ্গীভূত হইলেও ইহা তাহার অতীত। জ্ঞানে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তারা এই পরমাত্মারই অসীম প্রকাশ। আমাদের সংবিদ ও তাহার সমস্ত অবস্থা, তাঁহার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে আমাদের মধ্যে আগত হয় (ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ)। দেশ ও কালে উদ্ভূত যাবতীয় সংবেদনার স্রোতের নিম্নদেশে অপরিণামী,

---

* অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের Intellectual Ideal—Lecture I. দ্রষ্টব্য।

† বৃ, আঃ—৪।৩

তিনি বর্ত্তমান। তিনি সংবিদে সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান, কিন্তু সংবিদের বিষয় কখনও হন না। প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়ায় তিনি বর্ত্তমান, কিন্তু কখনও জ্ঞানের মধ্যে থাকেন না। যাবতীয় অনুভবের বিষয়ী কখনও অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না। যদি তিনি অনুভবের বিষয় হইতেন, তাহা হইলে অনুভব করিত কে ?

মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মার চারিটি অবস্থার কথা আছে—জাগরিত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা সূক্ষ্মবিষয় ভোগ করেন, জাগ্রৎকালে অনুভূত বিষয় দ্বারা নূতন রূপজগতের সৃষ্টি করেন। সুষুপ্ত অবস্থায় স্বপ্ন থাকে না, কোনও কামনাও থাকে না, তখন জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়। তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান একীভূত ও ঘনীভূত হইয়া তাহাতে বর্ত্তমান থাকে। তখন তিনি আনন্দময় আনন্দভুক প্রাজ্ঞ। তখন বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ থাকে না। ইহার উপর তুরীয় (চতুর্থ) অবস্থা। সেই অবস্থায় বাহ্য ও আন্তর কোনও বিষয়ের জ্ঞান হয় না। তাহা প্রজ্ঞানঘন অবস্থা নহে, আবার দ্বৈতভাবযুক্ত জ্ঞানের অবস্থাও নহে, অপ্রজ্ঞ (অজ্ঞান) অবস্থাও নহে। তখন আত্মা একাত্মপ্রত্যয়সার—অর্থাৎ একমাত্র আত্ম-প্রত্যয়ই তখন তাহাতে বর্ত্তমান। প্রপঞ্চ তখন উপশান্ত, রাগদ্বেষাদিও শান্ত। তখন আত্মা শিব (মঙ্গল স্বরূপ) ও অদ্বৈত।

গৌড়পাদ বলেন "আদিতে যাহার অস্তিত্ব নাই, অন্তেও যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা অসৎ।" এই যুক্তিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাকে অসৎ বলা যায়। স্বপ্নাবস্থাকে অসৎ বলা হয়, কেননা জাগ্রত অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য-যুক্ত স্বপ্ন বিরল নহে। জাগ্রত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন বলিয়া যদি স্বপ্নাবস্থাকে অসৎ বলা যায়, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন জাগ্রত অবস্থাকেও অসৎ বলা যাইতে পারে। উভয়ই আত্মার বিভিন্ন অবস্থা। সুষুপ্তি তুরীয় অবস্থার নেতিবাচক অবস্থা। তখন আত্মার দুঃখ থাকে না। কিন্তু আত্মা কেবল দুঃখহীন নহেন, তিনি আনন্দময়। তুরীয় অবস্থা আত্মার স্বরূপ।

বৌদ্ধিক আত্ম-সংবিদে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের ভেদ থাকে। জ্ঞানে ও কর্ম্মেও এই ভেদ বর্ত্তমান। যাহাকে চিন্তা অথবা মনন (Thought) বলে, তাহাতে যেমন মন্তা (Thinker), তেমনি মননের বিষয় ও বর্ত্তমান। এই বিষয় মনন ক্রিয়া হইতে ভিন্ন—তাহার বাহিরে অবস্থিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু যাহা "সৎ" (Reality), তাহা চিন্তা বা মনন হইতে ভিন্ন। তুরীয় অবস্থায় সেই সৎই অধিগত হয়। অব্যবহিত ভাবে অধিগত হয়। তখন মননের মধ্যে যে দ্বৈত আছে, তাহার বিলোপ হয় এবং ব্যক্তি পরম সত্তার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। ইহা অনুভবের বিষয়, যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায় না। এই অবস্থাই আনন্দ। ইহা শূন্যে বিলীন হওয়ার অবস্থা নহে, কিন্তু সত্তার পূর্ণতম অবস্থা।

ব্রহ্ম কামনা করিলেন, 'ঈক্ষণ করিলেন প্রভৃতি বর্ণনা উপনিষদে আছে। অথচ ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না, একথাও আছে। যাহার মধ্যে কামনা আছে বলিয়া জানি, যিনি ঈক্ষণ করেন বলিয়া জানি, তাহাকে অজ্ঞেয় বলা যায় না। তিনি যখন কামনা করেন ও ঈক্ষণ করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা আছে, তাঁহার মন আছে, এবং তিনি জীবাত্মা হইতে স্বরূপে একান্ত ভিন্ন নহেন, ইহা উপনিষদের মত বলিতে হইবে। তিনিই যে প্রত্যগাত্মারূপে প্রতি জীবের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা তো বারংবার উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত, অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। আমাদের সর্ব্বকামনা, সর্ব্বোন্নত মন, ইচ্ছা ও শক্তি, সমস্তই তাঁহার জ্ঞান, বল ও স্বাভাবিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বল ও অনন্ত ক্রিয়া কিরূপ তাহা আমরা জানিনা। আমাদের মন তাহার ধারণা করিতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু একান্তভাবে তিনি আমাদের অজ্ঞাত নহেন। তিনি বিশ্বের সাত্ত্বিক তত্ত্ব, কিন্তু তিনি চিৎ-স্বরূপ পুরুষ। তাঁহার সাত্ত্বিকত্ব ও পুরুষত্ব, তাঁহার অনন্তত্ব ও ব্যক্তিত্বের (Personality) মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য হয়, তাহা একটি দুরূহ সমস্যা। মোক্ষ মুলার লিখিয়াছেন "The wise had perceived what was the bond between the visible and the invisible, between the phenomenal and the real, between the individual Gods worshiped by the multitude and that One Being, which was free from the character of a mere Deva, entirely free from mythology, from parentage and sex, and if endowed with personality at all, then so far only as personality was neccessary for will.--This was very different from the vulgar personality ascribed by the Greeks to their Zens or Aphrodite—nay even by many Jews and Christans to their Jehova or God. "(Six Systems of Indian Philosophy—P. 67). দৃশ্য ও অদৃশ্যের মধ্যে, সমুৎপাদ ও সত্তের মধ্যে ইতর জন—উপাসিত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন দেবতাগণ ও সেই "তদেকং এর মধ্যে—যোগসূত্র কি, তাহা জ্ঞানিগণ বুঝিয়াছিলেন। এই তদেকং দেবতার বিশেষত্ব হইতে মুক্ত। পুরাণে বর্ণিত দেবতাদের মতো তাঁহার পিতা ও মাতা নাই। তিনি পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন। যদিও তাঁহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপিত হইয়াছে, তথাপি "ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বের জন্য যতটুকুর প্রয়োজন, তাহার অধিক ব্যক্তিত্ব তাহাতে আরোপিত হয় নাই। গ্রীকগণ তাহাদের জিউস্ ও এফ্রোদিতেতে যে সাধারণ ব্যক্তিত্বের আরোপ করিয়াছিল, এমন কি অনেক ইহুদী ও খৃষ্টান তাহাদের জিহোবা ও ঈশ্বরে, যে ব্যক্তিত্বের আরোপ করেন, তাহা হইতে এই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ব্রহ্ম ও আত্মা

ইমানুয়েল ক্যাণ্ট্, বহির্জ্জগতের তলদেশে অবস্থিত অজ্ঞাত স্বগত বস্তুর (Thing-in itself এবং অন্তর্জ্জগতেও জ্ঞান, অনুভূতি ও

ভন্ত্রার তলদেশে অবস্থিত স্বগত বস্তুর কথা বলিয়াছিলেন। এই দুই স্বগত বস্তু যে এক ও অভিন্ন, তাঁহার দর্শনে তাহার ইঙ্গিত থাকিলেও তিনি স্পষ্ট করিয়া তাহা বলেন নাই। কিন্তু টে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন এবং এই অভিন্নতার উপর তাঁহার দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপনিষদের ব্রহ্ম বাহ্যজগতের সার্বিক তত্ত্ব, এবং আত্মা অন্তর্জ্জগতের তত্ত্ব, কিন্তু ব্রহ্ম ও আত্মা এক ও অভিন্ন। যিনি অন্তরে, তিনিই বাহিরে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "অন্তর্জ্জ্যোতি" ও "বহির্জ্যোতির" একত্ব বর্ণিত হইয়াছে। দ্যুলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের উপর, সমস্তের উপর অনুত্তম লোকে, উত্তমলোকে যে জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে,সেই জ্যোতি এবং এই পুরুষের অভ্যন্তরে যে জ্যোতি—এই উভয় জ্যোতি একই জ্যোতি। (৩।১৩।৭) "যিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, যিনি সমুদায় পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি বাকরহিত, তিনিই আমার আত্মা এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। তিনিই ব্রহ্ম।" (৩।১৪।৪)

জীবাত্মা ও ব্রহ্মের এই অভিন্নতা সম্বন্ধে ডয়সেন লিখিয়াছেন যে "সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এই জ্ঞানের মূল্য অপরিমেয়। আমাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানতৎপর মানবাত্মার ভাগ্যে কোন্ কোন্ সত্যের উদ্‌ঘাটন ও আবিষ্কার সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু একটি কথা আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি। তাহা এই, যে ভবিষ্যতের দর্শন যে নূতন ও অনভ্যস্ত পথের পথিক হউক না কেন, এই তত্ত্ব (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য) চিরকাল অবিচলিত থাকিবে, এবং ইহা হইতে কোনও প্রকার বিচ্যুতি সম্ভবপর নহে। বস্তুর স্বভাবের মধ্যে দার্শনিক যে মহাপ্রহেলিকার সম্মুখীন হন, আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যত স্পষ্টতর ভাবে তাহার সমাধান অধিগত হউক না কেন, প্রকৃতির রহস্য যেখানে আমাদের নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে, কেবল সেখানেই অর্থাৎ আমাদের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই সমাধানের "চাবি" মিলিতে পারে। মৌলিক চিন্তাশীল উপনিষদের ঋষিগণ যখন আমাদের আত্মাকে—আমাদের অন্তরতম ব্যক্তিগত সত্তাকে—বিশ্বপ্রকৃতি এবং তাহার যাবতীয় সমুৎপাদের অন্তরতম সত্তা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম সেই "চাবির" সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই অবিনশ্বর গৌরবময় কীর্ত্তি তাঁহাদেরই।"

বিষয়ী হইতে ভিন্নরূপেই বিষয় আমাদের সাধারণ জ্ঞানে প্রতীত হয়। বাহ্যজগৎ আমাদের দেহস্থ বিষয়ীর বিষয়। বাহ্য জগৎ যে চিন্তার বিষয় হইতে পারে, ইহাই উভয়ের মধ্যে সমতার প্রমাণ। বাহ্য জগৎ প্রজ্ঞার নিয়মে পরিচালিত। দেহের মধ্যে থাকিয়া যিনি বাহ্য-জগৎকে জানেন প্রজ্ঞাই তাহার স্বরূপ। সুতরাং বাহ্যজগৎ ও জীবাত্মা স্বরূপে যে এক জাতীয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু এই সজাতীয়ত্ব ও অভিন্নত্ব এক কিনা, তাহা লইয়া বেদান্তের ভাষ্যকার-দিগের মধ্যে মতভেদ আছে। তুরীয় অবস্থায় বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বিলুপ্ত হয়। এক সমগ্রের মধ্যে যাবতীয় বিভেদ বিলুপ্ত হয়। তখন জীবাত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের অবস্থা নহে। সে অবস্থা কি তাহার ধারণা আমাদের নাই। তবে তাহা অচেতন অবস্থা নহে।

ভৃগু বাহ্যজগতের বিশ্লেষণ করিয়া আনন্দময় ব্রহ্মের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই আনন্দময় ব্রহ্ম ও আত্মার তুরীয় অবস্থা অভিন্ন। এই অবস্থায় বিষয়ী ও বিষয় অভিন্ন। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় আত্ম-সংবিদ যুক্ত জীবে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ বর্ত্তমান। এই অবস্থায় ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন।

সে আস্‌বে

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য

নৃত্যের তালে তালে, ভাঙাবুক নেচে ওঠে—
আসবে, আসবে সে যে আসবে।
অরুণ চরণে তার সাজবে এ ঘর দ্বার—
আলোকে আকাশ মাটি হাসবে।
ভিজে ভিজে চোখ দুটি পদ্মের মত ফুটি—
আবার নয়ন-মন হরিবে
মুখের বাণীটি তার—বারবার অনিবার—
স্বরগের সুধা হ'য়ে ক্ষরিবে।

হাত রেখে কালো কেশে, বলে যাব ভালবেসে
মুখের হাসিটি হোক অক্ষয়
দয়া কর ভগবান, এইটুকু কর দান,—
দূর কর ওর যত দুখ ভয়।
কেবল একটি আশা বুকেতে বেঁধেছে বাসা
আসবে সে, একবার আসবে।
চরণ পরশে তার আমার এ ঘর দ্বার
হাসবে আবার, আহা হাসবে।
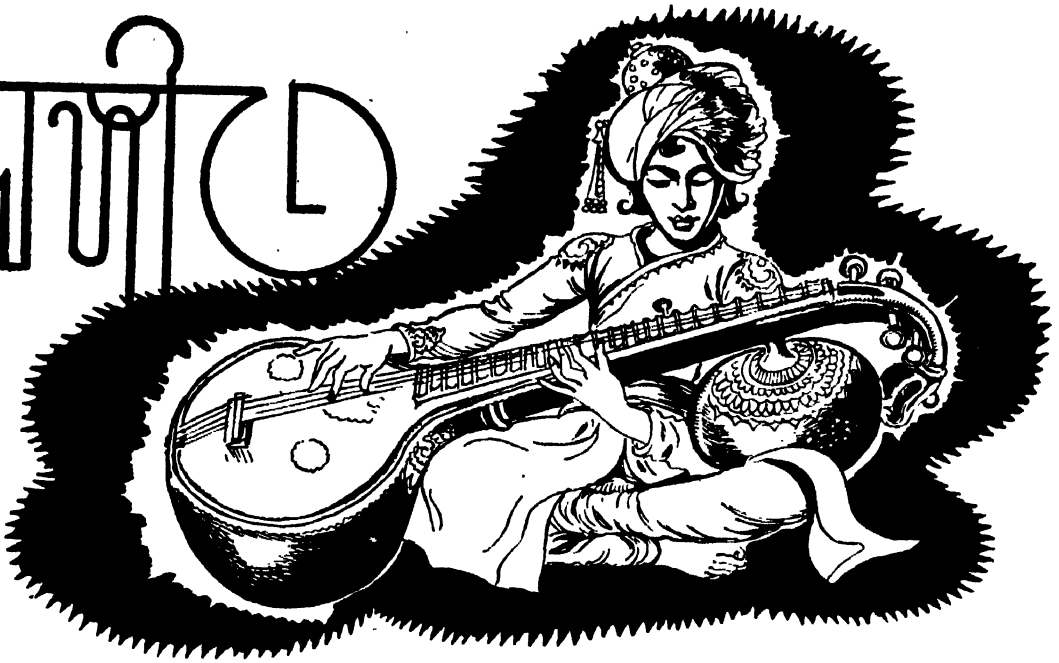
সাধন সঙ্গীত

হে অতীত মোর সকল প্রয়োজনের,
তব সুগভীর নিবিড় পরশনের
শান্তি এবার
বিছাও জীবন ভ'রে।

গভীর গহনে যা-কিছু আমার আছে,
লভুক সমাধি তোমারি পায়ের কাছে ;
আমার কামনা তোমারি কামনা মাঝে
মিলুক মধুর
মিলন-বাহুর ডোরে।

আমিরে দেবার মন্ত্র এবার আমি,
সাধিবো বসিয়া সকল দিবস-যামী,
মদির-মত্ত বাসনা-বেসুরগুলি,
তোমার সুরের
আলোকে পড়ুক ঝরে।

সে-মহা মিলনে মোর তরু পল্লবে,
কি রূপ মাধুরী বিকশি' কি কথা কবে ;—
সে জানি আমার মৃত্যুর উৎসবে,
তব বসন্তে
সাজাবে তুমি যে মোরে।

কথা ঃ—নৃপেন্দ্রনাথ রায়   সুর ও স্বরলিপি ঃ—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সা ধ্না II সা- গা -া | -া মগা- রগা I মা ধা ধপা | মা গরা মা I
হে অ তী ০ ০ ত্ মো০ র্ স ক ল প্র য়ো০ জ

I গা -া -া | -া গা মা | পা র্সা না | -া -া -া I
নে ০ ০ র্ ত ব সু গ ভী ০ ০ র্

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

I পা র্সা র্সনা | ধা পমা পা | গা -া -া | -া -া -মা I
নি বি ড় প রং শ নেং ০ ০ ০ ০ র্

I পা -র্সা না | ধপা পধা- ধণ ণধা I পমা গা -া | গা পা পমা I
শা ন্ তি এ বাং ০০ র্ বি ছা ও জী ব ন

I গা রসা -া | -া সা ধন্া II
ভ রে ০ ০ "হে অ"

-া -া II { সা গা গাম | রা গা -া I গা -মা পধা | -ধপা মা গমা I
০ ০ আ মি রে দে বা র্ ম ন্ ত্রং ০ এ বার্

I রা গা -া | -া -া -া I গা পা পা | ধা র্সা না I
আ মি ০ ০ ০ ০ সা ধি বো ব সি য়া

I পা ধা ধপা | মা গরা মা I মগা রা -া | (-রগা-গরা-সা) } I -সা -া -া I
স ক ল দি বং স যা মী ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা রা রা | রা -া গমা I রা গা মা | পা ধা ধর্স র্সণা I
ম দি র ম ০ ত্তং বা স না বে সু রং ০

I ধা পা -া | পা পা -া I ধা র্রা র্রা | র্সা র্সা র্রর্সনা I
গু লি ০ তো মা র্ সু রে্ র আ লো কেং০

I না র্সা ধা | -পা মধা- ধপা I গা -া -া | -া -া -মা I
প ড়ু ক ০ ঝং ০ রে ০ ০ ০ ০ ০
"শান্তি.................................. ভ'রে" II

-া -া II { সা মা -া | মা মা মা I মা পা মা | পা পা -র্সা I
০ ০ গ ভী র্ গ হ নে যা কি ছু আ মা র্

I র্সণা ণা -দা | -া -া -া I দা ণা দা | ণা র্সা র্সা I
আ ছে ০ ০ ০ ০ ল ভু ক স মা ধি

I পা পা পা | মা জ্ঞা পা I পা মা -া | (রমজ্ঞা-সরা-সা) } I -া -া -া I
তো মা রি পা য়ে র কা ছে ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা ণা -া | ণা ণা ণা I ণা র্সা র্সা | ণা র্সা র্জ্ঞা I
আ মা র্ কা ম না তো মা রি কা ম না

I ণর্সা ণা -া | -দা -া -া I {ণা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্রা র্গা I
মা ঝে ০ ০ ০ ০ মি লু ক ম ধু র

I র্গা র্মা র্মা | র্মা র্মা র্পর্মা I র্গা র্মা -া | (-র্জ্ঞা -র্রা -া)} I -া -া -া I
মি ল ন বা হু রং ডো রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্রা র্রা র্রা | র্জ্ঞা র্সা র্সা I র্সা -ণা ণা | র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞা -র্সা I
সে ম হা মি ল নে মো র্ ত রু প০ ল্

I ণর্সা ণা -দা | -া -া -া I দা দা ণা | ণা র্সা র্সা I
ল০ বে ০ ০ ০ ০ কি ন্ন প মা ধু রী

I পা পা পা | মা জ্ঞা পা I পা মা -া | -া -া সণ্া I
বি ক শি কি ক থা ক বে ০ ০ ০ সে০

I সা মা গা | মা -া -া I মা -া পা | মা পা র্সা I
জা নি আ মা ০ য় মৃ ০ ত্যু র উ ৎ

I র্সণা ণা -দা | -া দা ণা I {ণা র্সা -া | র্সা র্রা র্সণা I
স বে ০ ০ ত ব ব স ন্ তে সা জা০

I র্সা -া -া | (-ণা-ধা-ণা) I ধা ণা পা I মধা- ধপা গা | -া -া মা I
বে ০ ০ ০ ০ ০ তু মি যে মো০ ০ রে ০ ০ ০

"শান্তি………………… …………ভ'রে II II

সমুদ্রলীনা

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

এখানে রূপোলী ঢেউ। অন্যদিকে ধূ-ধূ রিক্ত-চর
মৃত্যু তার ছায়া ফেলে ঢেকে রাখে স্বপ্নের কফিন,
সারারাত কাঁদে কার তন্দ্রাহীন ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস,
অন্ধকারে কেঁপে ওঠে কার যেন হিমে-ভেজা স্বর।

বিষাক্ত লাইলাক হ'য়ে ফুল ফোটে আমার এ তীরে,
যে-প্রেম হারিয়ে গেছে লোনাগন্ধ সমুদ্র-সমীরে,
দুর্বল-করুণ গানে কেন তাকে জাগাব বল না,
ফসফরাসের মতো সে যে জ্বলে—হায় বুঝেছি ছলনা!

হরিণীর মত কবে মিলিয়ে গিয়েছে সে তিমিরে
সন্ধ্যে না হতেই সব পৃথিবীব অতন্দ্র শরীরে,
বংকিম হাতের তালু অঙ্গুলীন উষ্ণ স্পর্শ রেখে,
নেমে গেছে হীরাকষ-নীল এই সাগরেরই বুকে।

সারারাত কান্না তাই ক্ষীণ সুরে বেজেছে বাতাসে,
স্মৃতির সুগন্ধ ব'য়ে ঝরে গেছে ম্লান স্বর্ণকলি,
বৃষ্টির আড়াল থেকে কে যেন বলেছে বারবার,
ভুলেও পাবেনা তাকে এ-রাত্রির নিঃশব্দ নিঃশ্বাসে

ধূধূ কাঁপে হাওয়ারাতে সমুদ্রের সব ঘন ঢেউ,
এই দুপুরাতে যদি ধীরপায়ে নেমে আসে কেউ
ছিঁড়ে দেব তার সেই সুগোপন অভিসার-মোহ,
স্তব্ধ করে মুছে দেব রাত্রির নিবিড়ে তার দেহ।

প্রমথ চৌধুরীর সনেটের ধারা

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

বাংলা গদ্য রীতির বিবর্তনের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর পরিমিত বাক্, বুদ্ধিদীপ্ত বাচন-রীতি আজ সর্বজনস্বীকৃত। প্রবন্ধকার, গল্পরচয়িতা ও সনেট লেখক—এই ত্রিরূপের বিচিত্র মিশ্রণেই একটি গোটা প্রমথ চৌধুরী। এক হিসাবে তাঁর সনেটগুলো গদ্য রীতিরই কাব্যরূপায়ণ একথা বলা চলে।

"সনেট পঞ্চাশৎ"-এর সগোত্র সনেট-সংকলন বাংলা সাহিত্যে আর নেই, তার কারণ প্রথম চৌধুরী সনেট রচনার প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করে নূতন পথ ধরেছেন—ইতালী ও ইংলণ্ডের পথে না গিয়ে তিনি ফরাসী সনেট রচয়িতাদের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শুধু ফরাসী রীতি ও রূপরচনার আদর্শকেই গ্রহণ করেননি, ফরাসী লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত মননক্রিয়ারও পন্থানুসারী বাংলা সাহিত্যের এই সনেট রচয়িতা। প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন: "ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নাই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বেই বলেছি যে, ফরাসী সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স ও আর্ট দুইই আছে। ফরাসী মনের এই প্রসাদগুণ-প্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের মধ্যেও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসী লেখকরাই দিতে পারেন।—এই মন্তব্যটি প্রমথ চৌধুরীর গদ্য ও সনেট আলোচনার পক্ষে একটি মূল্যবান দিকদর্শন। ফরাসী সাহিত্যের প্রাণরস বাংলা সাহিত্যের মাটিতে নূতন ধরণের ফসল ফলিয়েছে। বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার প্রখর দীপ্তি, পরিমিতবাক্ পদবিন্যাস, শ্লেষাত্মক মন্তব্যের সুমার্জিত রীতি, আবেগ-বিরল তীক্ষ্ণধার জীবন সমালোচনা—ফরাসী চিন্তাজগতের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর কারণ জীবন দৃষ্টির মধ্যেই ফরাসী জাতির মৌলিক ও স্বতন্ত্রচারী আবেদন আছে: "The Frenchman sees life from an essentially realist and adult point of view, without illusion and without sentiment; This vision of life in the stuff of his literature, expressed in language neat, precise, lucid and economical."—জীবন দৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরী এই পথেরই পথিক।

পেত্রাক, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রসেটি প্রভৃতির সনেট রচনার পন্থা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে প্রমথ চৌধুরী শুধু ভাববিন্যাসেই নয়, রূপকর্মেও নূতনত্ব এনেছেন। সাধারণ সনেটের অষ্টক ও ষটকের বিন্যাসও এখানে রক্ষিত হয়নি। অষ্টক এখানে দুটি চতুষ্পদীর গ্রন্থন (ক-খ-খ-ক, ক-খ-খ-ক), কিন্তু আসল বৈচিত্র্য ষটকের বিন্যাসে—এখানে সেক্সপীরীয় সনেটের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সেক্সপীরীয় সনেটের ষটকে শেষের দুই চরণে সমস্ত সনেটের আবেগ-অনুভূতি কেন্দ্রায়িত হয়ে ওঠে। সমালোচকদের মতে শেষের চরণ দুটোই সেক্সপীরীয় সনেটের আসল বৈশিষ্ট্য। প্রমথ চৌধুরী শেষের পয়ারটিকে এনেছেন মাঝখানে এবং সনেট শেষ হয়েছে একটি সুগঠিত চতুষ্পদীতে। প্রমথ চৌধুরী নিজেই ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রিয়নাথ সেন রচিত 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে ফরাসী সনেট সম্পর্কে যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: "ফরাসী ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্রব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিল সাধন করা স্বাভাবিক নয়; সেইজন্য ফরাসী সনেটে ষট্‌কের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।"—সনেট কেন চতুর্দশপদী।

সনেটের মধ্যে যে ভাবগভীরতা, আবেগ ও আত্মরুদ্ধ একটি প্রবল ভাবানুভূতি থাকে, প্রমথ চৌধুরীর সনেটে সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। সেক্সপীয়রের সনেটের রোমান্টিক উন্মাদনা, মিল্টনের উদাত্ততা, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বিস্তার এখানে নেই। ভাবপ্রগাঢ়তার পরিবর্তে পরিহাস-রসিকতা ও শ্লেষাত্মকরীতি প্রমথ চৌধুরীর সনেটের বাহন। স্যাটায়ার, আয়রনি ও উইটের মাধ্যমে এই সনেটগুলি একটি পরিহাসরসিক মনের নিয়ত পরিবর্তনশীল বিচিত্রমুখী ভাবনাকে রূপ দিয়াছে। তর্ক-বিতর্ক, গালগল্প, অম্লমধুর মন্তব্য, কঠিন শ্লেষ ও নিটোল কৌতুক—সমস্ত কিছুই সনেটগুলোর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। প্রিয়নাথ সেন সত্যই বলেছেন: "তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয় সকলকে লঘুভাবে এবং লঘু বিষয় সকলকে গুরুভাবে দেখিয়েছেন এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু—তাঁহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দেশ-ভঙ্গী আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন কথাটিই বা অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন।"—বিষয়-নির্বাচনে ও ভাষাপ্রয়োগে তিনি চুটকির পক্ষপাতী:

> "তাই আজ ছাড়ি যত ধ্রুপদ আমার
> চুটকিতে রাখি যত আশা ভালবাসা।"

বিষয়বস্তু হিসাবে 'সনেট পঞ্চাশৎ'—এর সনেটগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) ফুল সম্বন্ধীয় সনেট, (খ) দেশী-বিদেশী কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কিত সনেট, (গ) প্রাচীন কাব্যের নায়িকা বিষয়ক সনেট (ঘ) প্রেম ও আদর্শের প্যারডি-বিষয়ক সনেট, (ঙ) জীবন-সমালোচনা সম্পর্কিত সনেট, (চ) কল্পনা সমৃদ্ধ সনেট, (ছ) আত্মপরিচয়মূলক সনেট।

প্রথম চৌধুরীর ফুল সম্পর্কিত কবিতাসমূহের বৈশিষ্ট্য আছে।

ইংরাজী সাহিত্যের রোম্যান্টিক কবিদের কাব্যে ফুল, কবিচিত্তের ভাব-বিহারের একটি বাহন হয়ে উঠেছিল। ফুল বস্তু-বৈচিত্র্য বিবর্জিত হয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় এক আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির বাহক হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের ফুলের কবিতাগুলোও কবিচিত্তের দূরায়মান সৌন্দর্য-পিপাসায় আতুর। অসাধারণ কল্পনা-ব্যাপ্তি ও কবিমনের ভাবচ্ছবির প্রতিফলনে রবীন্দ্রনাথের ফুলের কবিতা আত্মনিষ্ঠ। প্রমথ চৌধুরীর ফুলের কবিতায় ফুলের বহিরাবরণ বাদ পড়ে নি। কোন কোন স্থলে তাঁর গদ্যধর্মিতা ও কথ্যরীতি ফুলের অশরীরী লাবণ্যের বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেছে—কারণ প্রমথ চৌধুরীর মনই রোম্যান্টিকতার বিরোধী। 'কাঁঠালী চাঁপা' কবিতাটি অম্লমধুর?

দেবেন্দ্রনাথের 'চম্পক' ও সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতার সঙ্গে তুলনা করলেই প্রমথ চৌধুরীর এই জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের কবিতার বর্ণোচ্ছ্বাস ও গন্ধঘন sensuousness সত্যেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অপসর-লাস্যের যে চিত্র পাওয়া যায়, 'কাঁঠালী চাঁপা' কবিতায় তা অনুপস্থিত—কবি গভীর ভাবকে অনাবশ্যক ভাবেই লঘু করেছেন।

মধুসূদন তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে দেশী ও বিদেশী কবিদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁর চটুল শ্লেষোক্তির জন্য অনেক সময় লঘু স্পর্শ হয়ে উঠেছে। 'ভাস' কবিতাটি বিশেষত্ববিহীন—সম্ভবত "তোমার নাটকে তাই স্থলে পরিহাস।"—এই কারণেই 'সনেট পঞ্চাশৎ'—এক বিস্ময়বস্তু হয়ে উঠেছে। 'ভর্তৃহরি' কবিতায় প্রমথ চৌধুরীর মননশীলতা ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি এখানে প্রাচীন কবিমানসের স্বৈতচারণাকে নব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 'জয়দেব' ও 'চোরকবি' কবিতাদ্বয় অম্লমধুর রসাত্মক। জয়দেবের কাব্যের আদিরস ও তুর্কী আক্রমণের সম্পর্ক আবিষ্কার করে কবি যে বক্রোক্তির সৃষ্টি করেছেন তা অত্যন্ত উপভোগ্য। 'সনেট পঞ্চাশৎ'এর প্রাচীন নায়িকা সম্পর্কিত কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' জাতীয় সহানুভূতি সমুজ্জ্বল নবসৃষ্টি নয়, প্রমথ চৌধুরী এখানে নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা কাহিনী ও আঁকতে বসেন নি। 'বসন্তসেনা'ও 'পত্রলেখা' কবিতাদ্বয় Ode শ্রেণীর কবিতা—কবিতা হিসাবে তেমন সৃষ্টি সাফল্যও এখানে অনুপস্থিত। অতীতচারিণীদের নিয়ে যে রোম্যান্টিক ভাবনা এই জাতীয় কবিতার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ এখানে তা একেবারে বর্জিত হয়েছে।

প্রেম ও আদর্শের প্যারডি সম্পর্কিত সনেট ও আত্মপরিচয় সম্পর্কিত সনেটে হাস্যরসিক বীরবলের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, কান্তকবি প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিধর প্যারডি রচয়িতার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর প্রভেদ আছে। তিনি কোন বিখ্যাত কবিতার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে প্রবৃত্ত হন নি, ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতে তিনি আমাদের জীবনের অসংগতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাই 'বার্ণার্ড শ' নামক সনেটে তিনি বলেছেন:—"এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম-হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।"

'বালিকা বধূ' কবিতায় কবি বাল্যবিবাহের দিকে নির্মম কটাক্ষ করেছেন। প্রচলিত জীবন, প্রেম ও আদর্শ নিয়ে এমন অম্লমধুর রচনা বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। ভল্টেয়ার বলেছেন যে, সমকালীন জীবনই শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপমূলক কবিতার অবলম্বন হওয়া উচিত। প্রমথ চৌধুরী ভল্টেয়ারের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। বাঙালী জীবনের প্যাটার্ণ নিয়ে কবি চরম শ্লেষের তীর হেনেছেন:

—"চাটুপটু বক্তা নহি, বড় এজলাসে,
উদ্ধার করিনি দেশ, টানিয়া চরমে,
পুত্রকন্যা হয় নাই, বরষে বরষে,
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে।"

—'সনেট', 'উপদেশ', 'আত্মকথা'—এই সব সনেটে প্রমথ চৌধুরী তাঁর কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য ও আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন। নারী সম্পর্কেও কোন মোহমদির ধারণা নেই—নারীকে তিনি দেখেছেন নিতান্ত সাদা চোখে:

—"প্রিয়া মোর নারী শুধু থাকে না ঝুলিয়ে
স্বর্গ-মর্ত-পাতালের মত ত্রিশঙ্কুর।
নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন।"

'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর কয়েকটি সনেটে এই রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়—বীরবল এই সব স্থানে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে মানব অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করেছেন। 'মানব সমাজ' নামক সনেট এই জাতীয় কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ—কবি এখানে জন্ম-মৃত্যু-বিধৃত মানব জীবনকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। 'ধরণী' নামক সনেটটিতে এক রোম্যান্টিক জীবন পিপাসার সুর লক্ষ্য করা যায়। কীট্‌সের "The poetry of the earth is never dead," কবিতাটির সঙ্গে এই কবিতাটি একই সুরে বাঁধা। রাগ-রাগিনী সম্পর্কিত সনেট দুটিও এই শ্রেণীতে পড়ে। 'প্রিয়া' কবিতাটিতে পরিহাসনিপুণ কবি হৃদয়াবেগের কাছে ধরা দিয়েছেন।

'সনেট পঞ্চাশৎ'এর সবগুলো সনেট সমান নয়—সবগুলো রসোত্তীর্ণ কবিতাও নয়। কারণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে সনেটের যোগসূত্র খুব স্বাভাবিক নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় সনেট নূতন। সেক্সপীয়র, মিল্টন, মধুসূদনের সনেট পড়ে যাদের সনেট সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা অথবা সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের কাছে এই অভিনব সনেটের তেমন আস্বাদন নেই, কিন্তু নূতন বাক্‌রীতি, তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গী, প্রৌঢ় বক্রোক্তি ও সুডৌল ক্লাসিক্যাল রীতি এই সনেটগুলিকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে।

কৃষ্ণকলি

শ্রীশীতল সেন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রজতের ড্রয়িং রুম—আধুনিক আসবাবে সজ্জিত। অপরাহ্ন। পুলকেশ, সুকল্যাণ, রীণা ও আইভি বসিয়া আছে। তাহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া আছে লালী—রজতের নবপরিণীতা বধূ—মাথায় কাপড় দেওয়া রহিয়াছে। সকলের হাস্যধ্বনির মাঝে যবনিকা উঠিল

লালী॥ কী হলো? তোরা সব অমন করে হাস্‌ছিস্ কেন রে রীণা?

রীণা॥ তোকে দেখে।

লালী॥ কেন? আমার আবার কী হলো?

লালী নিজেকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল

আইভি॥ আমাদের সামনে তুই যখন এসে দাঁড়ালি, আমরাতো তোকে চিনতেই পারিনি, লালী।

লালী॥ চিনতে পারিস্‌নি? কেন?

সুকল্যাণ॥ 'এ উওম্যান্ ইন্ ভেল্'! কী করে চিনি বল?

লালী॥ ওহো! মাথায় কাপড় দিয়েছি বলে?

লালী মাথার কাপড় নামাইয়া দিল

রীণা॥ হ্যাঁ। তুই করেছিস কী লালী? মাথায় কাপড় দিয়েছিস? ঘোমটা?

সকলের অট্টহাসিতে লালী লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

আইভি॥ তোর মতো মেয়ে—

সুকল্যাণ॥ 'য়্যান্ আইডিয়াল অফ দি আল্ট্রা-মডার্ণ সোসাইটী'—

পুলকেশ॥ আধুনিক প্রগতিশীল আমাদের মক্ষিরাণী তুমি লালিমা দেবী—

লালী॥ আঃ! আবার লালিমা! লালী—লালী। লালী বলতে তোমার মুখে বাধে নাকি পুলকেশ?

পুলকেশ॥ বলেছিতো—শুধু লালের চেয়ে লালিমার মাধুর্য্য অনেক—অনেক বেশী। কিন্তু তোমার ওই অবগুণ্ঠনে সে মাধুর্য্য যেন ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে দেবী।

লালী॥ আঃ! আবার দেবী! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না পুলকেশ। যতো সব সেকেলে—

আইভি॥ তুই নিজেও তো সেকেলে গিন্নীদের মতো মাথায় ঘোমটা দিয়েছিস্। বিয়ে হ'তে না হ'তেই তোর এই অধঃপতন!

লালী॥ কিন্তু মিষ্টার বাসু বলেন, মাথায় কাপড় দিলে আমায় নাকি বেশ ভাল দেখায়।

সুকল্যাণ॥ আমি বলবো—'দ্যাটস্ য়্যান্ য়্যান্টিক টেষ্ট'।

রাণা॥ যাই বলিস্ ভাই লালী, তোর স্বামী হাকিমই হ'ন আর জজই হ'ন, আমরা বলবো—কেমন যেন একটু সেকেলে-সেকেলে—মানে, তেমন 'ফরওয়ার্ড' নন।

আইভি॥ হ্যাঁরে লালী, মিষ্টার বাসু গান জানেন তো?

লালী॥ গান উনি জানেন কিনা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে গাইতে আমি ওঁকে কোনদিন দেখিনি।

সুকল্যাণ॥ 'এক্সকিউজ মী' লালী—'দেন্ আই মাষ্ট সে উইথ ডীপ্ রিগ্রেট'—অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—'হি ইজ নো ম্যাচ্ ফর্ ইউ'—মানে, তোমার সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না।

সকলে॥ (এক সঙ্গে) আমরাও তাই বলি।

সুকল্যাণ॥ আমি তাই বলি—মিষ্টার বাসুর সঙ্গে তুলনা না হ'লেও মিসেস্ বাসু যেন আগের মতো অতুলনীয়া হ'য়েই থাকে—মিস্ লালী চ্যাটার্জীর মতো। প্রগতির উচ্চ সোপান থেকে তার যেন পদস্খলন না হয়।

পুলকেশ॥ নিশ্চয়ই। আমরা চাই, নাচে-গানে-অভিনয়ে তোমার প্রতিভা আরো বিকশিত হোক্—আরো উদ্ভাসিত হোক্, লালিমা দেবী।

লালী॥ আবার লালিমা দেবী! তোমার কি

কিছুতেই মনে থাকে না পুলকেশ, আমি লালিমা নই—আমি লালী—লালী।

রীণা॥ হ্যাঁ, আমরাও তাই চাই। বিয়ে করে লালী যেন লালিমা না হয়ে যায়।

সুকল্যাণ॥ আমাদের লালীকে আমরা কিছুতেই হারাতে চাই না।

লালী॥ (খানিকটা উত্তেজিতভাবে) না, না, না, আমি হারিয়ে যায়নি। বিয়ে হলেও আদর্শ আমার হারিয়ে যায়নি—আমার শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-সভ্যতাকে আমি জলাঞ্জলি দিইনি। আমি ভুলিনি—'রিটায়ার্ড সিভিলিয়ানের' মেয়ে আমি—মিস্ লালী চ্যাটার্জী।

সুকল্যাণ॥ 'হিয়ার ইউআর। হিয়ার ইউ আর'!

রীণা॥ তাহ'লে পুলকেশবাবুর সেই "মধুছন্দা" নাটকখানা এবার আমরা ধরতে পারি?

পুলকেশ॥ আর, আমার সেই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় আশা করতে পারি কি—আমাদের এই প্রতিভাময়ী—এই লাস্যময়ী—

লালী॥ খবরদার পুলকেশ! ভুলে আবার লালিমা বলে ফেলো না যেন।···হ্যাঁ, লালীকে তোমরা শুধু আশাই করতে পারো না, লালীর সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্তই থাকতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি।

আইভি॥ তাহ'লে আজ কখন যাচ্ছিস্ ক্লাবে?

লালী॥ মিষ্টার বাসু কোর্ট থেকে ফিরলেই ওঁর গাড়ীটা নিয়ে বেরুবো।

রীণা॥ কেন? তোর নিজের গাড়ী নেই?

লালী॥ (অপ্রস্তুত হইয়া) না—মানে, এই গিয়ে—আমার নতুন গাড়ীটা এখনও 'ডেলিভারী' দিয়ে যায়নি।

সুকল্যাণ॥ তাহ'লে ঐ কথাই রইলো, লালী এখন আমরা উঠি। 'বাই-বাই'—

লালী ব্যতীত সকলে বাহির হইয়া গেল। তাহাদের গমন-পথের দিকে লালী কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে কী যেন ভাবিল

লালী॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জার কথা! আমার নিজের একটা গাড়ী নেই! ওদের কাছে আজ আমার 'প্রেষ্টিজ' একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

লালী লজ্জায় মাথা অবনত করিয়া সোফায় বসিয়া পড়িল

ক্ষণকাল পরে কোর্ট ফেরৎ রজত আসিল।

রজত॥ কী ব্যাপার লালী? এখানে এইভাবে বসে যে?

লালী॥ (উঠিয়া) ছাখো, তুমি কোর্ট থেকে না ফিরলে আমি গাড়ী পাই না—কোথাও যেতে পারি না। আমার নিজের একটা গাড়ী নেই। এতে আমার শুধু অসুবিধেই হচ্ছে না—এতে আমার 'প্রেষ্টিজ'ও নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

রজত॥ (হাসিয়া) ওহো! এই কথা! তা' বেশতো, তোমার জন্যে একটা ছোট গাড়ী কিনে দিলেই হলোতো।

লালী॥ (সানন্দে) দেবে? সত্যিই দেবে? কবে দেবে বল না। (রজতের খুব নিকটে গিয়া) আমি কিন্তু নিজে পছন্দ করে কিনবো।

রজত॥ কেন? আমার পছন্দ বুঝি তোমার মনের মতো হ'বে না লালী?

লালী॥ বলা যায় না—তুমি হয়তো একটা 'ওল্ড মডেলে'র গাড়ী কিনে বসবে। যেরকম সেকেলে ধরণের মানুষ তুমি।

রজত॥ (হাসিয়া) আমি সেকেলে! তুমি বল কী লালী?

লালী॥ আমি কী আর বলি? বলে আমার বন্ধুরা। তারা বলে—তুমি তেমন 'ফরওয়ার্ড' নও—কেমন যেন সেকেলে-সেকেলে। জানো—এই নিয়ে ওরা আমাকে আজ যা' ঠাট্টা করে গেল।

রজত॥ কী জানো লালী—আমি আজ নিজে বড়ো হলেও, মধ্যবিত্ত সংসারে আমার জন্ম, অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজেই আমি মানুষ। (সোফায় বসিতে বসিতে) কাজেই, যে সমাজে আমার জন্ম—যে সমাজে আমি মানুষ, তাতে আমার পক্ষে তোমাদের মতো—মানে তোমার ওই বন্ধুদের মতো অতোটা 'ফরোয়ার্ড' সহজে হওয়া যায় না। হঠাৎ একেবারে অতোটা এগিয়ে যেতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে।

লালী॥ (রজতের সোফার হাতলের উপর বসিয়া) আচ্ছা, আমার বন্ধুরা জিজ্ঞেস্ করছিলো, তুমি গান জানো?

রজত॥ গান? হ্যাঁ—একটা গান জানি।

লালী॥ (খুসী হইয়া) জানো তাহ'লে গান? আমার বন্ধুদের তাহ'লে কালই ডেকে তোমার গান শুনিয়ে দেবো। আমাকে আজ বড়ো টিটকিরী দিয়ে গেছে। আচ্ছা, কই গাওনা শুনি—কেমন তুমি গাও। লক্ষ্মীটি গাওনা একবার 'প্লীজ'।

রজত॥ গান গাইতে আমি জানি না, তবে গান একটা আমি জানি।

লালী॥ বারে! তাও বুঝি আবার হয়?

রজত॥ সত্যি বলছি লালী—বিশ্বাস কর।

লালী॥ কী গান জানো শুনি।

রজত॥ "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,

কালো বলে তারে গাঁয়ের লোক।

কালো? তা' সে যতোই কালো হোক্,

দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ॥"

ঘৃণায় ও রাগে লীলা মুখ বেঁকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

লালী॥ 'রাবিশ্'! ও আবার একটা গান নাকি?

রজত॥ (অপ্রতিভ হইয়া) কেন? গানটা খারাপ কিসে? (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) রবিঠাকুরের লেখা—

লালী॥ রবিঠাকুরের তো অমন হাজার হাজার লেখা আছে।

"বৃষ্টি পড়ে ঠাপুর টুপুর

নদেয় এলো বান"—

সেও তো রবিঠাকুরের লেখা।

রজত॥ আমার কিন্তু ওই "কৃষ্ণকলি"র গানটা এতো ভালো লাগে যে, সে আর তোমায় কী বলবো লালী! তুমি জানো ওই গানটা? গাওনা লক্ষ্মীটি—

রজত লালীর কাঁধে হাত দিলে লালী ঘৃণায় ও বিরক্তিতে সরিয়া গেল

লালী॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী তোমার 'টেষ্ট্'!! কী তোমার 'চয়েস্'!!! সাধে কী আর আমার বন্ধুরা তোমায় সেকেলে বলে—তোমায় 'ব্যাক্ওয়ার্ড্' বলে? পছন্দ বলে কী তোমার কিছুই নেই?

রজত॥ পছন্দ? (হাসিয়া) পছন্দই যদি আমার না থাকবে লালী, তাহ'লে বেছে বেছে তোমাকে কী আর আমি ঘরে আনি? (আগাইয়া গিয়া) তুমি যে আমার সেরা পছন্দ—'মাই বেষ্ট চয়েস্'!

আদর করিয়া রজত লালীর চিবুকটি ধরিলে লালী এক ঝটকায় তাহার হাত সরাইয়া দিল

লালী॥ 'ছ্যাষ্টী।'

লালী দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেল। রজত তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলকণ্ঠ মিত্রের বাড়ীর একখানি ঘর—অতি সাধারণ ঘর—আসবাব-পত্র-বর্জ্জিত বলিলেই চলে। মেঝেতে একখানি সতরঞ্চি ঢালাও করিয়া পাতিয়া তাহার উপর একখানি সাদা চাদর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকটা ফরাসের মতো দেখাইতেছে। গোটা দুই তিন তাকিয়াও রহিয়াছে। মাঝখানে একটি পুরাতন 'য়্যাসট্রে'।

তখন সকালবেলা। সন্ত পাট-ভাঙা জামা কাপড় পরিয়া নীলকণ্ঠ হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। তাহার পিছনে আসিল মহামায়া

মহামায়া॥ হাসছো যে?

নীলকণ্ঠ॥ হাসির কথা শুনলে কে আর হাসি চেপে থাকতে পারে বল গিন্নী?

মহামায়া॥ হাসির কথা! আমি বুঝি হাসির কথা বললুম?

নীলকণ্ঠ॥ হাসির কথা নয়? পাত্রপক্ষ আসছে মেয়ে দেখতে, আর তুমি বলছো কিনা তাদের জলখাবার দিয়ে কাজ নেই।

মহামায়া॥ এতে হাসির কী আছে? আমি তো ঠিকই বলেছি।

নীলকণ্ঠ॥ তুমি বল কী গিন্নী! বেণেটোলার মিত্তির বাড়াতে মেয়ে দেখতে আসছে—আর তাদের মিষ্টিমুখ করাবো না? আমাদের অবস্থাই না হয় আজ পড়ে গেছে, তাই বলে এবাড়ীর উঁচু মানকে তো নীচু করা যায় না। আর, তাছাড়া জলখাবার না দিলে ওরাই বা ভাববে কী বল?

মহামায়া॥ ভাবলো তো বয়েই গেল। তাই বলে জলখাবার কিনে মিছিমিছি পয়সা খরচ করতে হ'বে না। এ পর্য্যন্ত কতোজনই তো মেয়ে দেখে গেল—জলখাবারও গিলে গেল—ব্যস্, তারপর আর সাড়াশব্দটি নেই।

নীলকণ্ঠ॥ সাড়াশব্দ আর দেবে কী বল? মেয়ে

দেখতে তো সবাই-ই আসে ছেলের বিয়ে দেবে বলে। কিন্তু মেয়ে দেখে যদি তাদের পছন্দ না হয়—

মহামায়া॥ পছন্দ হয়না-ই বা কেন? মেয়ের আমার রঙ্‌টাই না হয় একটু মলিন, কিন্তু দেখতে শুনতে তো সুশ্রী। কাণা-খোঁড়া নয়, খাঁদা-বোঁচা নয়,—পছন্দ অমনি হলো না বললেই হলো না?

নীলকণ্ঠ॥ নাঃ! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না গিন্নী। এতো তোমার আচ্ছা জুলুম দেখছি। যারা ঘরে বৌ নিয়ে যাবে, তাদের যদি কালো মেয়ে পছন্দ না হয়, তাতে তুমি-আমি কী করতে পারি বল?

মহামায়া॥ তাহ'লে বলতে চাও যে, কালো মেয়েগুলোর আর বিয়ে হবে না।

নীলকণ্ঠ॥ না হ'বারই মতো।

মহামায়া॥ কালো ছেলেগুলোর যদি বিয়ে হতে পারে, কালো মেয়েদেরই বা বিয়ে হ'বে না কেন?

নীলকণ্ঠ॥ ওইখানেতেই তোমার ভুল হচ্ছে গিন্নী—ওইখানেতেই তোমার ভুল হচ্ছে। এদেশে ছেলেরাই মেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করে। মেয়েরা যদি তা করতো—অন্ততঃপক্ষে বিয়ের ব্যাপারে যদি তাদের বলার কিছু থাকতো, তাহ'লে এদেশের কালো ছেলেদেরও বিয়ে হওয়া দায় হ'তো।

মহামায়া॥ তাহ'লে এদেশে যতো কালো মেয়ে আছে, তারা সবাই সন্ন্যাসী হয়ে থাক্ না কেন।

নীলকণ্ঠ॥ আহা, তা' নয় গিন্নী, তা নয়। কালো মেয়ের বিয়ে কী আর হয় না? না, হচ্ছে না? তোমায় তো বলেছি গিন্নী, এদেশে শুধু কালো কেন—কাণা, খোঁড়া, বোবা, কালা মেয়েরও বিয়ে হয়—কেবল চাঁদির জুতোর জোরে। কিন্তু তোমার মেয়ের বাপের সে জোর নেই বলেই তোমার মেয়ে আজও বিকোচ্ছে না।

মহামায়া॥ মেয়েটা এমন বরাত নিয়েও এসেছিল—

মহামায়ার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া গেল

নীলকণ্ঠ॥ না, না, গিন্নী, শুধু মেয়ের বরাতের দোষ দিওনা। মেয়ের বাপও এমন বরাত নিয়ে এসেছে যে, সে শুধু মেয়ের বাপই হয়েছে—মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্য তার নেই।

মহামায়া॥ সামর্থ্য নেই তো চুপচাপ করে ঘরে বসে থাকো। লোকজন ডেকে মেয়েকে দেখিয়ে ঘটা করে জলখাবার খাইয়ে অনর্থক আর পয়সা নষ্ট করতে হ'বে না। কালো মেয়ে যেন আর কারোর হয়নি—বিয়েও তাদের আর হয়নি।

রাগতভাবে মহামায়া দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করিল

নীলকণ্ঠ॥ এই দেখ—রাগ করে চলেই গেল। এধারে তাদের আসার সময় হ'য়ে এলো, জোগাড়-যন্তর এখনো কিছুই হলো না—জলখাবার-টাবার আনা হলো না—ও কনক—কনক—

কনক॥ (নেপথ্য হইতে) যাই বাবা।

নীলকণ্ঠ॥ এসো বাবা, একটু তাড়াতাড়ি এসো। নড়তে-চড়তেই এদের আঠারো ঘণ্টা।

কনক ভিতর হইতে আসিল

কনক॥ কী বাবা?

নীলকণ্ঠ॥ নাঃ! তোদের নিয়ে আর পারা গেল না। আমি একা মানুষ—কদিক সামলাবো বল্ দেখি। ভদ্রলোকদের এধারে আসার সময় হ'য়ে এলো—

কনক॥ তা' আমায় কী করতে হ'বে বল।

নীলকণ্ঠ॥ ওঁদের জন্যে জলখাবার-টাবার কিছু কিনে নিয়ে আয়।

কনক॥ বারে! মা যে এই বাড়ীর ভেতর গিয়ে বললে—জলখাবারের ব্যবস্থা কিছু করতে হ'বে না।

নীলকণ্ঠ॥ ভদ্রলোকরা আসছেন মেয়ে দেখতে—আর তাদের কিছু মিষ্টিমুখ করাতে হ'বে না? তোর মা বললো বলেই অমনি হ'য়ে গেল? বলি, বেনেটোলার মিত্তির বাড়ীর মান-মর্য্যাদা বজায় রাখতে হ'বে তো?

কনক॥ মা তো আর নেহাৎ মন্দ কথা বলেনি। মেয়ে দেখাতে এ পর্য্যন্ত এতো লোককে জলখাবার খাওয়ানো হ'য়েছে যে, সেই জলখাবারের টাকাগুলো থাকলে মেয়ের একটা ভালো গয়না হ'য়ে যেতো।

নীলকণ্ঠ॥ তা' হয়তো হ'তো। কিন্তু তাই বলে ভদ্রলোকদের তো আর জলযোগ না করিয়েই বিদায় দেওয়া যায় না। মেয়ে যদি তাদের পছন্দ না হয়—

কনক॥ বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্! কালো মেয়ের
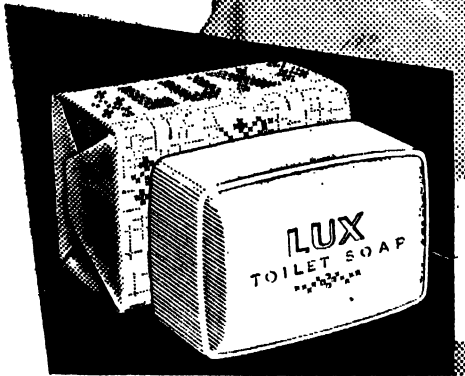
নমিতা সিন্‌হা
সর্ব্বদা ব্যবহার করেন

বিয়ে দিতে যতো বেগ পেতে হচ্ছে, অচল টাকা চালাতেও ততো বেগ পেতে হয় না।

নীলকণ্ঠ॥ হয়েছে—হয়েছে! তোকে আর 'লেক্‌চার্‌' দিতে হ'বে না। এখন যা' দেখি—চট্ করে কিছু মিষ্টি আর নোন্তা খাবার নিয়ে আয়। ওরা সব এসে পড়লো বলে।

কনক॥ তুমি তো বাবা 'অর্ডার' দিয়েই খালাস। কিন্তু এদিকে?

নীলকণ্ঠ॥ এদিকে আবার কী?

কনক॥ এদিকে মাসের শেষ। মা বলছিলো—জল-খাবার আনতে গেলে এ ক'টা দিনের বাজার-খরচ থেকেই আনতে হ'বে।

নীলকণ্ঠ॥ তাই নাকি! তা'হ'লে দোকান থেকে ধারেই খাবার নিয়ে আয়। মাস-কাবারে দিয়ে দিলেই হ'বে।

কনক॥ ধার! তুমি বলো কী বাবা? ধার করে খাবার কিনে লোককে খাইয়ে ভদ্রতা রক্ষা করতে হ'বে?

নীলকণ্ঠ। তা' করতে হ'বে বৈকি, একশোবার করতে হ'বে। বেনেটোলার মিত্তিররা আজ দীন হ'লেও—তারা হীন নয়। কলকাতার এককালের বনেদী বংশ—বেনে-টোলার এই মিত্তির বংশ। যেমন করে হোক্ সে বংশের মান-ইজ্জৎ রাখতে হ'বে বৈকি!

কনক॥ কিন্তু তাই বলে ধার-দেনা করে?

নীলকণ্ঠ॥ ওই ক'টা টাকা ধার করতে হ'বে শুনেই তুই চম্‌কে উঠছিস্? ধার-দেনার এখন হ'য়েছে কী? এইতো সবে সন্ধ্যে। ধার-দেনায় মেয়ের বাপের চুল বিকিয়ে না গেলে এ দেশে মেয়ের বিয়ে হয়না। যা'—যা' —আর দেরী করিসনে। ওদের আসার সময় হ'য়ে এলো।

নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে কনক ভিতরে চলিয়া গেল

নীলকণ্ঠ॥ (বাহিরের দিকে চাহিয়া) এই যে ঘটক মশাই! আসুন—আসুন—

বাহির হইতে ঘটক যুগল-মিলন ভট্টাচার্য্য আসিল

যুগল॥ বিশ্বাস করুন—প্রাতঃপ্রণাম মিত্তির মশায়।

নীলকণ্ঠ॥ প্রাতঃপ্রণাম! তা' আপনি একা এলেন যে? যাঁদের আসার কথা ছিল—

যুগল॥ বিশ্বাস করুন, বড়লোকের ছেলে—ঘুম ভাঙ্‌তেই আটটা। তার ওপর—বিশ্বাস করুন, সাজগোজ করতে এক ঘণ্টা। তাই আমায় এগিয়ে যেতে বললেন। বিশ্বাস করুন—ওঁরা সব আসছেন পেছনে।

নীলকণ্ঠ॥ ছেলে নিজেই আসছে নাকি মেয়ে দেখতে?

যুগল॥ বিশ্বাস করুন—বিয়ে যে করবে, সেই আসল লোকটিকেই তো সবার আগে মেয়ে দেখানো দরকার।

নীলকণ্ঠ॥ তা' বটে! তা' বটে।

যুগল॥ বিশ্বাস করুন—কাঁচা কাজ আমার কাছে পাবেন না মিত্তিরমশাই। আমার নাম যুগলমিলন ভট্‌চাজ্। বিশ্বাস করুন—যুগলমিলন ঘটাতে আমার মতো খুব কম ঘটকই পাবেন।

নীলকণ্ঠ॥ কিন্তু গ্যাদ্দিন ধরে এতো চেষ্টা করেও আমার মেয়ের বিয়েটাতো আর কিছুতেই লাগাতে পারছেন না।

যুগল॥ বিশ্বাস করুন—আমি যখন এ কেস্ হাতে নিয়েছি, ভাবনার আপনার কিচ্ছু নেই। আমার নাম যুগল-মিলন ভট্‌চাজ্। বিশ্বাস করুন—যুগলমিলন ঘটাতে আমি সিদ্ধহস্ত। আপনার মেয়ের বিয়ে আমি ঠিক করে দোবই—আর বিশ্বাস করুন—এই ছেলের সঙ্গেই। (হঠাৎ বাহিরের দিকে নজর পড়িতেই) এই যে—নাম করতে করতেই সব এসে পড়েছে। এসো—এসো—বাবা—

চঞ্চল চৌধুরী ও তাহার তিনজন বন্ধু বাহির হইতে আসিল। তিন জনেই কেতাদুরস্ত যুবক—দেখিলেই চ্যাংড়া ছোঁড়া বলিয়া বোঝা যায়। চঞ্চল সুসজ্জিত

যুগল॥ বিশ্বাস কর—এই ইনি হলেন কন্যার পিতা —শ্রীনীলকণ্ঠ মিত্তির। আর—বিশ্বাস করুন—এই ইনি হলেন পাত্র—শ্রীমান চঞ্চল চৌধুরী, আর এঁরা হলেন পাত্রের সব বন্ধু।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় হইল

নীলকণ্ঠ॥ বসুন—আপনারা সব বসুন।

সকলে ফরাসের উপর উপবেশন করিল। ১ম বন্ধুটি এতো… ঘরখানি নিরীক্ষণ করিতেছিল

১ম বন্ধু ॥ বাড়ীটা খুব পুরোনো দেখছি।

২য় বন্ধু ॥ লর্ড ক্লাইভের আমলের বাড়ী নাকি ?

নীলকণ্ঠ ॥ এ বাড়ীটা আমার প্রপিতামহ করেছিলেন। এর বর্তমান মালিক—এই আমি—'মার্চেন্ট্ অফিসে'র একজন অসামান্য কেরাণী। বুঝতেই পারছেন,—সারানো-সুরোনো আমার আমলে হ'য়েই ওঠে নি।

যুগল ॥ বিশ্বাস কর বাবাজী—বেনেটোলার এই মিত্তির বাড়ী—কলকাতার এক প্রাচীন বনেদী বাড়ী। এককালে খুব নাম-ডাক ছিল। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে, বাবাজী, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। (নীলকণ্ঠকে) বিশ্বাস করুন—এবার তাহ'লে মিত্তিরমশায়—

নীলকণ্ঠ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি এখনি মেয়ে নিয়ে আসি।

নীলকণ্ঠ ভিতরে চলিয়া গেলে অতিথিদের মধ্যে চাপা আলোচনা শুরু হইল

চঞ্চল ॥ ব্যাপার কী ঘটক ? এ যে গোড়াতেই বেসুরো গাইছে।

৩য় বন্ধু ॥ আরে, ছেড়ে দাও না ও সব বুজরুকী। সব মেয়ের বাপই গোড়াতে কাঁদুনী গেয়ে থাকে।

যুগল ॥ বিশ্বাস কর বাবাজী—বিয়েটা হ'য়ে যাক্, তারপর মোচড় দিলেই হ'বে।

চঞ্চল ॥ হুঁ! তবেই হয়েছে। গাঙ্ পেরিয়ে গেলে কুমীরকে সবাই কলা দেখায়।

১ম বন্ধু ॥ তা' যা' বলেছিস্ চঞ্চল। বিয়ে হ'য়ে গেলে—

যুগল ॥ বিশ্বাস কর বাবাজী—যা' যা' তুমি চেয়েছো, সেই আমি আদায় করে দোব। আগে ভালোয় ভালোয় বিয়েটো হ'য়ে যাক্—

যুগল-মিলন যতোক্ষণ কথা কহিতেছিল, ততোক্ষণ কথার মাঝে বার বার অন্দরের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। নীলকণ্ঠকে এখন আসিতে দেখিয়া সে কথার মোড় ঘুরাইয়া লইল

যুগল ॥ বিয়েটা হ'য়ে যাক্ আগে—বিশ্বাস কর বাবাজী—তখন দেখো, তোমাদের চেয়ে এঁরাও নেহাৎ কম বনেদী ঘর নয়।·· এসো এসো মা-লক্ষ্মী—

নীলকণ্ঠ ও কনক সুসজ্জিতা কৃষ্ণাকে লইয়া আসিল। কৃষ্ণা নতমুখে আসিয়া অতিথিদিগকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া ফরাসের উপর অতিথিদের সম্মুখে নতমুখেই বসিল। নীলকণ্ঠ ও কনক তাহার নিকটে বসিল। মহামায়া, কুন্তলা ও করবী দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা। অতিথিগণ কেমন যেন সচকিত হইয়া উঠিল

নীলকণ্ঠ ॥ (সকলকে নীরব দেখিয়া) আপনাদের কার কী জিজ্ঞেস করার আছে—জিজ্ঞেস্ করুন।

যুগল ॥ (চঞ্চলকে) বিশ্বাস কর বাবাজী—তোমার কী কী জিজ্ঞেস্ করবার আছে, জিজ্ঞেস্ কর।

চঞ্চল ॥ আমি আর কী জিজ্ঞাসা করবো। (বন্ধুদের দেখাইয়া) এরাই করুক না।

যুগল ॥ বিশ্বাস কর বাবাজী—তাও কী কখনো হয় ? তুমি করবে বিয়ে, আর, তোমার বন্ধুরা কী জিজ্ঞেস করবে ?

কনক ॥ তাতে কী হ'য়েছে ? ওঁরাই না হয় জিজ্ঞেস্ করুন না।

১ম বন্ধু ॥ (কৃষ্ণাকে) আপনার নাম ?

কৃষ্ণা ॥ (নতমুখে ও ধীরকণ্ঠে) কুমারী কৃষ্ণা মিত্র।

২য় বন্ধু ॥ পড়াশোনা কতো দূর করেছেন ?

কৃষ্ণা ॥ গত বছরে ম্যাট্রিক পাস করেছি।

১ম বন্ধু ॥ (কৃষ্ণাকে) গান জানেন ?

কৃষ্ণা ॥ অল্প-স্বল্প জানি।

যুগল ॥ বিশ্বাস কর বাবাজী—চমৎকার গলা—চমৎকার! একটা গান শুনেই দেখ না বাবাজী।

২য় বন্ধু ॥ (কৃষ্ণাকে) নাচতে পারেন আপনি ?

কৃষ্ণা নীরব

কনক ॥ আজ্ঞে না। নাচ-শেখার রেওয়াজ আমাদের বাড়ীতে নেই।

৩য় বন্ধু ॥ (কৃষ্ণাকে) অভিনয় করতে পারেন ? 'য়্যাক্টিং' ?

সকলেই নীরব

যুগল ॥ বিশ্বাস কর বাবাজী, তা' আর পারবে না কেন ? অভিনয়-করা কী আর এমন শক্ত কাজ ? অল্প-বিস্তর ও সকলেই পাবে—আর করেও থাকে সবাই।

১ম বন্ধু ॥ তা বটে।

চঞ্চল ॥ (কৃষ্ণাকে) আচ্ছা,—নার্গিসের অভিনয় আপনার বেশী ভালো লাগে, না মধুবালার ?

হঠাৎ কৃষ্ণা উঠিয়া মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরের সকলেই চমকাইয়া গেল

কৃষ্ণা ॥ বাবা !

নীলকণ্ঠ ॥ কী হ'লো মা ? কী হ'লো ?

কনক ॥ কী হ'লো কৃষ্ণা ?

নীলকণ্ঠ ও কনক কৃষ্ণার নিকটে আগাইয়া আসিল

কৃষ্ণা ॥ (কঠিন-কণ্ঠে) ওঁদের বলে দাও বাবা—ওঁদের এরকম জঘন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

নীলকণ্ঠ ॥ কৃষ্ণা।

চঞ্চল ॥ এ আপনি কী বলছেন ?

কৃষ্ণা ॥ হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। আপনারা তো আর মেয়ে দেখতে আসেন নি।

চঞ্চল ॥ তার মানে—তার মানে ?

১ম বন্ধু ॥ আমরা মেয়ে দেখতে আসিনি তো, তবে আমরা এখানে কী করতে এসেছি ?

২য় বন্ধু ॥ আমরা কী তবে ফাজলামী করতে এসেছি ?

৩য় বন্ধু ॥ ইয়ারকি করতে এসেছি ?

সকলে উঠিয়া পড়িল। যুগল-মিলন হতভম্বের মতো একবার ইহাদের দিকে, আর একবার কৃষ্ণার দিকে ব্যাকুলভাবে তাকাইতেছে

নীলকণ্ঠ ॥ উঠবেন না—উঠবেন না আপনারা।

কৃষ্ণা ॥ মেয়ে দেখতে যাঁরা সত্যিই আসেন, এ ধরণের প্রশ্ন তাঁরা কেউ কখনো করেন না।

নীলকণ্ঠ ॥ কৃষ্ণা, চুপ কর্ মা—চুপ কর্।

চঞ্চল ॥ যে মেয়েকে বিয়ে করবো, তাকে সব রকমে বাজিয়ে দেখে নেবো না ?

কৃষ্ণা ॥ কেন ? মেয়েরা কী আপনাদের কাছে মাটীর হাঁড়ি-কলসী, না বাঁয়া-তবলার সমান যে, তাদের বাজিয়ে দেখে নিতে হবে ?

যুগল ॥ বিশ্বাস কর মা—তা' নয়, তা' নয়। বিশ্বাস কর—বাজিয়ে মানে একটু পরখ করে—যাচাই করে।

কৃষ্ণা ॥ বিয়ে করে আমায় উদ্ধার করবেন বলে আমি তো আর কাঠগড়ার আসামী নই যে, ওঁদের যা'-তা' জেরার জবাব আমায় দিতে হবে ?

কনক ॥ কৃষ্ণা—কৃষ্ণা !

নীলকণ্ঠ ॥ এ সব তুই কী বলছিস্ কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা ॥ আমি ঠিকই বলছি। ওঁরা আমায় জিজ্ঞেস্ করছেন—নার্গিস্ আর মধুবালার তফাৎ কী ? আর আমিও তো জিজ্ঞেস্ করতে পারি—জহরলাল নেহেরু আর ষ্ট্যালিনের তফাৎ কী ? আমায় জিজ্ঞেস করছেন—নাচ-গান-অভিনয় আমি জানি কিনা ? আমিও তো জিজ্ঞেস্ করতে পারি—ছেলে সাঁতার জানেন কিনা ? ফুটবল খেলতে পারেন কিনা ?

কৃষ্ণার সারা অঙ্গ রাগে কাঁপিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহামায়া, কুন্তলা ও করবী ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণাকে দুই দিক হইতে ধরিল। উহারা চাপা কণ্ঠে কৃষ্ণাকে শান্ত করিতে লাগিল

মহামায়া ॥ কী যা-তা বলছিস্ মা ? কী যা-তা বলছিস্ ?

করবী ॥ তোর কী মাথা খারাপ হ'য়ে গেল কৃষ্ণা ?

কুন্তলা ॥ চুপ করে যাও না ঠাকুরঝি—চুপ করে যাও।

কৃষ্ণা ॥ দাঁড়াও বৌদি—ওঁদের আমি জানিয়ে দিতে চাই—বিয়ের আগে ছেলেদের যেমন মেয়েকে যাচাই করবার অধিকার আছে, মেয়েদেরও তেমনি ছেলেকে যাচাই করবার অধিকার আছে।

১ম বন্ধু ॥ এঃ ! তবু যদি গায়ের রঙ্‌টা একটু ফর্সা হতো !

২য় বন্ধু ॥ দেখতে তো ওই আমাবস্যের চাঁদ।

৩য় বন্ধু ॥ মা কালীর 'কার্বন কপি' !

কৃষ্ণা ॥ কেন ? কালো বলে কী আমি মেয়ে নই ?

চঞ্চল ॥ তাই বলে যে মেয়েকে ঘরের বৌ ক[illegible] নিয়ে যাবো—

কৃষ্ণা ॥ (দৃপ্ত কণ্ঠে) না। ঘরের বৌ পছন্দ কর[illegible] আপনারা আসেননি—আপনারা এসেছেন নায়ি[illegible] পছন্দ করতে।

চঞ্চল ॥ নায়িকা !

নীলকণ্ঠ ॥ আঃ, কৃষ্ণা। কী আবোল-তাবো[illegible] বকছিস্ !

করবী॥ থেমে যা কৃষ্ণা, থেমে যা।

কৃষ্ণা॥ হ্যাঁ, নায়িকা—মানে 'হিরোইন্'। 'হিরোইন' খুঁজতেই আপনারা এখানে এসেছেন। তা' না হ'লে কেউ কখনো ঘরের বৌকে জিজ্ঞেস্ করেন না—নাচ-গান-অভিনয় জানে কিনা। জিজ্ঞেস্ করেন না—নার্গিস্‌কে বেশী ভালো লাগে, না মধুবালাকে?

মহামায়া॥ চল্ মা, চল্—ভেতরে চল্।

কুন্তলা॥ চলে এসো ঠাকুরঝি—চলে এসো।

কুন্তলা কৃষ্ণাকে টানিতে লাগিল।

কৃষ্ণা॥ দাঁড়াও বৌদি। ওঁদের বলে যাই—'হিরোইনে'র সন্ধানে এ বাড়ীতে আসা ওঁদের ভুল হয়েছে। টালীগঞ্জে ষ্টুডিও পাড়াতেই ওঁদের যাওয়া উচিত।

চঞ্চল॥ কী এতো বড়ো অপমান! আমাদের বাড়ীতে ডেকে এইভাবে অপমান! আমরা এখনি চলে যাচ্ছি। এ রকম মেয়ে আমরা কখনো দেখিনি।

১ম বন্ধু॥ ও বাবা! কী মেয়েরে বাবা!

২য় বন্ধু॥ জাঁহাবাজ মেয়ে!

৩য় বন্ধু॥ মেয়েতো নয়—ছেলের বাবা।

সকলে যাইতে উদ্যত হইল

নীলকণ্ঠ॥ (কাতরভাবে) না, না, আপনারা মনে কিছু করবেন না। হঠাৎ কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। আপনারা রাগ করবেন না—অপরাধ নেবেন না।

চঞ্চল॥ থাক্ মশায়, থাক্! খুব হয়েছে। জুতো মেরে আর গরু দান করতে হ'বে না। (বন্ধুদের প্রতি) এসো হে, এসো।

চঞ্চল ও তাহার বন্ধুগণ চলিয়া গেল

নীলকণ্ঠ॥ আহা! সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছেন যে! আপনাদের জন্যে জলখাবার আনালুম—

যুগল॥ বিশ্বাস করুন—যা' হ'য়ে গেল, তারপরে আর না গিয়েই বা কী করে বলুন? বিশ্বাস করুন—মানে মানে এখন আমাকেও সরে পড়তে হচ্ছে!

যুগল-মিলনও চলিয়া গেল

নীলকণ্ঠ॥ এহে-হে। ছাখ্ দেখি মা—হঠাৎ কী একটা কাণ্ড করে বসলি। বেনেটোলার মিত্তির-বাড়ীর মান-ইজ্জৎ তুই আজ এমনিভাবে ডুবিয়ে দিলি!

কনক॥ ভদ্রলোকদের তুই এইভাবে অপমান করলি?

কৃষ্ণা॥ ঠিকই করেছি। যার যা' ন্যায্য পাওনা, তাকে দিয়েছি।

মহামায়া॥ (ঝঙ্কার দিয়া) থাক্! আর মুখ নাড়তে হ'বে না। অতোগুলো ভদ্রলোকের ছেলেকে তুই যা-নয়-তাই বলে দিলি? কালো মেয়ের আবার অতো মুখ কিসের?

কৃষ্ণা॥ কালো মেয়ে—কালো মেয়ে—কালো মেয়ে! কেন কালো মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি বলে কি আমার মনুষ্যত্ব নেই? আমার কোন মান-সম্মান নেই?

মহামায়া॥ তা' এখন আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে ওই মান-সম্মান ধুয়ে ধুয়ে খাও, আর বাপ-মাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারো।

মহামায়া রাগিয়া ভিতরে চলিয়া গেল

কুন্তলা॥ (যাইতে যাইতে মুখভঙ্গী করিয়া) এঃ! দেমাক দেখ না। গায়ের রঙ্‌টা তবু যদি কটা হ'তো!

কুন্তলাও চলিয়া গেল। করবী নীরবে তাহাদের অনুসরণ করিল

কনক॥ এতো চেষ্টা করেও একে তোর বিয়ে দিতে পারা যাচ্ছে না, তার ওপর—

কৃষ্ণা॥ না, না, না, বিয়ে আমি করতে চাই না—বিয়ে আমি করতে চাই না। বিয়ে আমার তোমাদের দিতে হ'বে না। দেবার চেষ্টাও করো না। আমার মাথার দিব্বি রইলো।

নীলকণ্ঠ॥ আঃ! কৃষ্ণা! মেয়ে হ'য়ে বাপকে তুই এমনিভাবে শাস্তি দিবি মা—এমনিভাবে শাস্তি দিবি?

নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল

কৃষ্ণা॥ (আর্দ্রকণ্ঠে) না, না, বাবা, আমায় তুমি ভুল বুঝো না। আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি—বিয়ে আমার দিতে হ'বে না—বিয়ে আমার দিতে হ'বে না—

পিতার পদতলে সাশ্রুনয়নে লুটাইয়া পড়িল

(ক্রমশঃ)

কলহংসের দেশে

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

কুদ-উধমপুর-বাতোত

(৫)

ভোরের আলো কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। যখন হাঙ্কা শব্দ শুনছি বাইরে তখন বেশ অন্ধকার। এক একটা বাস বা মোটর যাবার জন্য তৈরী। তারা অন্য যাত্রী।

ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ অবিশ্রাম একটা শব্দ হয়েই চলেছে। পাহাড়ী ঝরণার মুখ বেঁধে সিংহের মুখের মধ্য দিয়ে জলটা বার করে আনা হয়েছে। পড়ছে বড় একটা নীচু চৌবাচ্চাতে। চৌবাচ্চার মধ্যে অনবরত জল পড়ছে, তারই শব্দ।

ভোরে কেউ স্নান করে সংস্কৃত পদ আবৃত্তি করছে। সংস্কৃত পদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক। কান সজাগ হয়ে শোনে দেবভাষার ঝঙ্কার। কে যেন আবৃত্তি করছে—

> হরিস্তে সাহস্রং কমলবলি মাধায় পদয়োঃ।
> যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্র কমলম্॥
> গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতি মসৌ চক্রবপুষা।
> এয়াণাং রক্ষায়ৈঃ ত্রিপুর হর। জাগর্ত্তি জগতাম্॥

অসিত ঘুমুচ্ছে এ পাশে। অসিতের মুখ আগাগোড়া ঢাকা। আমি যেন ঘুমুতে পারি না।

রাতেও একবার ঘুম ভেঙ্গে গেছিলো। মহা হট্টগোলের ব্যাপার। গিয়ে গিয়েও সব মেয়েরা বাতোতে যেতে পারে নি। প্রায় আশীজন মেয়ে থেকে গিয়েছিলো। কোণের দিকের ঘরটায় ওরা ছিল। সামনে বারান্দার কোণে আমরা ছিলাম। বারান্দা ভরতি ছেলের দল। রাতে হঠাৎ হৈ হৈ বেঁধে গেছে।

মেয়েদের কিলিবিলি কোলাহল, চঞ্চল চপল উচ্ছলতা। মেয়েদের রক্ষয়িত্রীরা ফেটে পড়ছেন মর‍্যাল রেজের দাপটে। শুয়ে শুয়ে দেখছি আর শুনছি। 'রা' কাড়ছি না। কৌতুক লেগেছে মনে।

মনে লেগেছে দোল। এমনি কৈশোর আমার ছিল, ছিল এমনি তারুণ্য। হঠাৎ চমক লাগার বয়স। বুকের রক্ত চল্‌কে এসে লাগে চোখের কোণে, গালের আভায় যে আনন্দ, সেই আনন্দের বয়স।

তাদের ভুলে তো যাইনি। আজ নেই; কিন্তু হঠাৎ যখন দেখা মেলে এমনি অনায়াস-লব্ধ আকস্মিক মুহূর্ত্তে তাকে যে চিনতে পারি, সেদিনের জন বলে, পরিত্যক্ত পথের পাশে ফোটা ফুলের গন্ধের ইশারা বলে। আমার ফেলে আসা দিনের চাহনির মতো ঘটনাটা আমায় উৎসুক করে তুললো!

টাট্‌কা ফুলের মতো ছেলেটী, পাঞ্জাবী গঠন, বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। ধরা পড়ে গেছে। বারান্দা থেকে টর্চ ফেলছিলো ঘুমন্ত মেয়েদের মুখে। কবার ফেলেছে কে জানে। মেয়েরা মাঝে মাঝে জেগেছে, দেখেছে, খিল্ খিল্ করেছে, 'বেশ মজা, বেশ মজা। বাইরে বেরিয়ে এটুকু নইলে মজা কি! কিন্তু টর্চ পড়েছে এবার শিক্ষয়িত্রীর মুখে। আর যাবে কোথা। ডিসিপ্লিন ভঙ্গ, মেয়েদের মর্য্যাদার প্রতি মুষ্টিযোগ, কমিটি, শাসন,—হাজার হাজার হিটলারীয় ভক্তির বন্যা। বেচারি টর্চধারী তার বিছানাতেই বসে আছে। চার পাঁচজন শিক্ষয়িত্রী তাকে ঘিরে ধরেছে। এক একজন এক এক রকম ব্যাখ্যা, এক এক রকম সম্বোধন এবং এক এক রকম অনুশাসন ছাড়ছেন। দুই একটি মেয়েও যোগ দিয়েছে মজা দেখতে। ছেলের দল জেগে ঘুমিয়ে আছে। কেরোসিনের বাতির আলোয় দৃশ্যটী দূর থেকে দেখতে আমার ভালই লাগছিল।

জানি থেমে যাবে এই কোলাহল। আজকের অস্পৃশ্য তারুণ্যকে একদিন প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওরা অবলেহন করবে। স্বতস্ফূর্ত্ত চাঞ্চল্যের মৃত্যুর জন্য একদিন বিধবা যৌবন আর্ত্তনাদ করবে। কিন্তু অগভীর চিন্তা প্রসূত 'এই অল্পের ঝড় তুফান এখন শুধু কর্ত্তব্য বলেই বোধ হচ্ছে না, এটা করতেও পরম আত্মশ্লাঘা হচ্ছে।

উচ্ছ্বাস যেমন ভাল, তেমনি মন্দ। প্রভেদ শুধু স্থান-কাল-পাত্রে, আর একটি জিনিষ—মাত্রাজ্ঞানে। যে উচ্ছ্বাস মাত্রাজ্ঞান রেখে প্রকাশিত, সে কি উচ্ছ্বাস? আবার মাত্রাজ্ঞানবিবর্জিত উচ্ছ্বাস কি রম্য? এর কোথাও কোন সামঞ্জস্য আছে? শিক্ষা বিধান করতে এসে যাঁরা এই সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন, তাঁরাই ছাত্রমনের মাণিক্য; যাঁরা পেলেন না তাঁরা ছাত্রমনের দারিদ্র্য।

লক্ষ্য করার বস্তু, বারংবার শ্রীমতী শিক্ষয়িত্রী ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করছেন কোন্ স্কুলের ছাত্র তুমি? তোমাদের দলের শিক্ষক কই; এবং বারবার ও উত্তর করছে "এখন তো আমরা এই দলের; স্কুলের আবার কেন? আমি যদি দোষ করে থাকি সাজা দিন।"

আর লক্ষ্য করলাম কৌতুকভরা মেয়ের দল। এখনই যদি গণভোট নেওয়া যেতো, বোঝা যেতো যে শিক্ষয়িত্রীদের এই প্রতাপান্বিত নিষ্ঠার বদলে ওরা এই কৈশোর সুলভ লীলা চঞ্চল আনন্দকেই চায়। অথচ ছেলেটার সকরুণ লজ্জার দায়ে বিমর্ষ চেহারা দেখে ওরা বেশ একটু মজা

উপভোগও করছে। চাঁদনাতলায় গো-বেচারী বরের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখার আগ্রহে যাদের চোখ চক্ চক্ করতে থাকে তাদের কি আমরা নিষ্ঠুর বলবো ?

'তোমার নামে কালই বলবো। এই কুর্দ থেকেই ফিরে যেতে হবে তোমায়।'

এইখানে তাড়াতাড়ি একটা কথা বলে রাখি। ম্যাপে চোখ রেখে, টাইম টেবলে হিসেব কষে যাঁরা কাশ্মীর পরিক্রমায় রেস্ত ট্যাকে নিয়ে যাবেন তাঁরা দেখবেন ঝিলমে শিকারায় চড়ার পর ট্যাকের চেহারা কাশ্মীরের উপত্যকার মতো রমণীয় ফাঁকা। শ্রীনগর কাশ্মীরের হাইপোথেসিস্। শ্রীনগরকে মেনে নিলে তবে কাশ্মীরের চেহারা এক একদিকে একটু একটু গিয়ে গিয়ে, পরতে পরতে খুলতে থাকে। সমগ্র কাশ্মীর যেন একটা গোল ডিম। চারদিকে বেড়ে আছে পাহাড়। ডিমের ছুঁচলো দিকটা বারামুলা, পীরপঞ্জল। ডিমের মোটা দিকটায় সবার উঁচু পাহাড়ের দল পেরিয়ে নাঙ্গাপর্বত, লদ্দাক। দৈর্ঘ্যে ৭৫ মাইল। পাহাড়ের বলয়ের মধ্যে কাশ্মীরের আয়তন প্রায় ৩,৯০০ বর্গমাইল। এর সামান্য একটু অংশ শ্রীনগর। সত্য এর মধ্যে বড় বড় বাগান, দাল হ্রদ উলার হ্রদ আছে। কিন্তু পাহাড়শুদ্ধ কাশ্মীরের আয়তন ৮০,৯০০ বর্গ মাইল। কাশ্মীরের সমতলের উচ্চতা—অর্থাৎ শ্রীনগরের উচ্চতা ৬০০০ থেকে ৭০০০ ফুট। কাশ্মীর পাহাড়দের উচ্চতা ১০,০০০ থেকে ১৮০০০ ফুট। তাই কাশ্মীরের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে হলে দিকে দিকে বার বার ৬০০০ থেকে ১২।১৪ হাজার পর্য্যন্ত চড়তে হবে। পাহাড় থেকে পাহাড়ে তো যাওয়া যাবে না। তাই বারংবার এই শ্রীনগরে এসে দিক্ পরিবর্ত্তন করে অন্যদিকে যেতে হবে। রেল নাই, বাস খানিক খানিক আছে। বেশীটা পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ার পিঠে। কাজেই রেলভাড়ায় শ্রীনগর দেখা চলে, তার দশগুণ লাগে কাশ্মীর দেখতে। অবশ্য পায়ে হেঁটে যারা পারেন, লণ্ডন যেতেও তাঁদের পাঁচসিকা লাগার কথা। সে কথা বলছি না।

খানিক ধমক ধমকি দিয়ে বাকী রাতটুকু সৎকর্ম্মের আনন্দে মশগুল হয়ে শিক্ষয়ত্রীরা ঘুমুতে গেলেন।

আমি খানিকটা ঘটনাটা দেখে শুনে চোখ বুঁজলাম। তারপর দেখি ঘুম চটকে গেছে। দরজা একটু ফাঁক করে কম্বল জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। উঁচুর দিকে উঠে দেখতে লাগলাম একটি মাত্র বাড়ীতে বহুদূরে বাতি জ্বলছে। ঐটায় থাকেন শেখ আবদুল্লা। প্রকাণ্ড বাড়ী, যথেষ্ট আরাম। তবু বন্দী। সেদিনের শেখ আবদুল্লা, আজকের জেনেরাল নগীবের হাল। পারস্যের মন্ত্রী ডাক্তার মুসাদেক। বিচিত্র এই রাজনীতি।

তাই ভোরের দিকে ঝর্ণার জলের শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হওয়া সত্বেও আবার পড়ে আছি।

অসিত হাঁক পাড়ে—দাদা ওধারে বাস তৈরী—উঠুন, দেরী হয়ে যাবে।

বেণু বলে—"দাদা তাড়াতাড়ি উঠবে। তবেই হয়েছে। তার চেয়ে আমরা সেরে নিই। তারপর দাদা……"

কম্বলের ভেতর থেকেই বলি—"দেখলে অসিত! বাহিরের হাওয়া কী চিজ্! বেণু যে বেণু সেও বাঁশ হয়ে উঠলো। স্মার্ট হয়ে গেল হে মেয়েটা; এযে একেবারে মেটামরফসিস্।"

"অমন করে খেপাও তো তেল গামছা নিয়ে দাঁড়াবো না।"

"দে দে—রাগ করিস কেন? ছাগলকে পাগল বললে কি রাগ করে? তুই কোথায় চান করলি?"

তেল মাখছি ও কথা বলে চলেছে—"এই তো ঝর্ণার দেয়ালের এধারে তুমি নাইছো। ওপারটা মেয়েদের।"

চান করে বসে বসে চায়ের ফরমাস দিতেই অসিত চোটে লাল। "কেবল দেরী, কেবল দেরী। একি দিল্লীর স্কুল পেয়েছেন যে সন্ধ্যে ছটা পর্য্যন্ত টিফিনরুম কনট্রাকটারকে বসিয়ে রেখে দেবেন! চমৎকার ঝুড়ি ভাজা ছিল, দালমুট ছিল। যেন পঙ্গপাল পড়েছে। সব বিক্রি হয়ে গেছে। মায় পান। এখন গোটা ছয় ডিম রেখেছি আর একটা পাউরুটী। এগুলো শেষ করে তুলুন। চা এক পট এনেছি।"

"জয় হোক তোমার অসিত। পানওলার হাতের তেলো থেকে চামড়াখানা তুলে দুটো সুপুরি দিয়ে এনো। ওর হাতই পানের গন্ধ ভরা। পানের বদলি দিব্যি চলবে।"

অসিত অবিকল বলেছিলো পানওলাকে এবং ওর বিশাল বপু দিয়ে জোর গলায় বলেছিলো। ফলে বিস্মিত পানওলা গোটা আষ্টেক পান সেজে দিয়ে বললো—"আজ সারাদিন গিন্নির ঝাঁটা খেতে হবে। সেই সন্ধ্যায় আবার গাড়ী আসবে তখন পান পাবো।"

বাসে আমাদের দল। জগজীবন, মনোরমা, বিহারীলাল জী, রামদাস গুপ্তা, আর জৈন স্কুলের ছেলের দল। কুর্দ ছাড়লো বাস। চড়তে লাগলো। উঠছে উঠছে, পাহাড়ের ওপিঠে ঘনবনের ছায়া ভেদ করে উঠছে; সর্পিল বাঁকা পথ বেয়ে উঠছে; জীবনকে হস্তামলকবৎ মনে করে উঠছে। নীচে, নীচে আরও গভীর নীচে বনের পর বন পার হতে হবে। তারই প্রস্তুতি। পাহাড়ে চড়ছো মানেই নামতে হবে। সামনে আসছে চীনাব। চীনাব-চন্দ্রভাগা। এক শাখা চন্দ্র নদী অন্য শাখা ভাগা নদী। হিমালয়ের ওপরে কোথায় মিশে নেমেছে এই কাশ্মীরে। নাম চন্দ্রভাগা বেদোক্ত নদী। এরা জানে চীন থেকে এসেছে এ জল। তাই নাম দিয়েছে চীনাব।

হঠাৎ কোথায় থেমে গেল বাস। এ বাতোত।

বাতোতে একটা ডাক বাংলা আছে।

রাতে মেয়েদের দল এইখানেই ছিল। সকলেই চলে গেছে। তবু রেখে গেছে বিচিত্র কোলাহল।

জন ছয় মেয়ে রয়ে গেছে। কেন কে জানে। বাক্স ভর্ত্তি চেরী নিয়ে বসে আছে এক চতুরমুখ যুবক। চেরী কিনে খাচ্ছি। পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে ওধারের বনানীর শ্যামলশ্রী দেখছি।

মাদ্রাজী মেয়ে রুক্মিনী। ছবি আঁকে। অনর্গল কথা বলে যায় ইংরাজীতে; বিশ্রাম নেই। কেবল নালিশ আর নালিশ। কালো রং। ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে কজ্জল পরিপুরিত। মাথার চুল সপাট পাটে আঁচড়ানো।

ঘাড়ের দিকে ঝুলে পড়া বিরাট খোঁপা। তার মধ্যে গোঁজা পাইনের একটা ছোট্ট স্তবক, আর একটা নীল রংএর পাহাড়ী বুনো ফুল। খস্ খস্ ছবি আঁকছে। কথাও চলছে মুখে।

"···ফেলে গেলো···জানিনা বাবা কি সব ব্যবস্থা···আমি ঢের সব সাহেব দেখেছি। দেশী সাহেব মেমদের জ্বালায় গেলাম।···লিখতে হয় কাগজে···সমস্ত রাত্রি খাওয়া নেই···ঘুম নেই···আমরা নয় শিক্ষকতা করি—মানুষ নই···কিন্তু মেয়েগুলোর কি হবে বলতো······"

সেই তুঙ্গভদ্রা! সেই নামই দিলাম জম্মুর সেই বিয়ার পিয়াসিনী পাঞ্জাবী বধূটীর। তিনি তাঁর বাসে ভাড় হয়েছে বলে এই ছয়টী প্রাণীকে উঠতে না দিয়ে চলে গেলেন বাস নিয়ে। এরা তাই পড়ে আছে। তার চেয়েও বিভৎস কাণ্ড রাতে মেয়েরা খেতে পায়নি। কুদ´ থেকে খাদ্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো কিছু মেয়েদের জন্য—যারা না খেয়ে ব্যবস্থা করতে চলে এসেছিলো। খেয়ে আসার দলে ছিলেন তুঙ্গভদ্রা। এঁরা খাবার সঙ্গে আনলেন সত্য; কিন্তু অভুক্তাদের খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করার কষ্ট স্বীকার করেন নি। তাঁর ধারণা আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ভাল ঘর ও ভাল জায়গা বেছে অধিকার করে রেখে তাঁদের অধিকারচ্যুত করেছেন। এর সাজা হিসেবে খাবারের চুবড়ি তিনি শ্রেফ বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিয়ে পরদিন সকালে কেবল বলেছেন—সো-ও সরি।

এই "সো-সরি" তুঙ্গভদ্রা বাসে উঠেও বলেছিলেন। কী যে বিষ ঢেলে রসিয়ে রুক্মিনী তার কাহিনী বলে যেতে লাগলো, যেন সমুদ্রমন্থনজাত অমৃত-গরল এক সঙ্গে। ললনার রসনায় যখন শ্লেষ বিদ্রূপ—কটাক্ষ খই ফোটাতে থাকে তখন সাহিত্য যেন রসে টলমল করে ওঠে।

রুক্মিনী বলতে লাগলো: "বাসে সবাই চড়ার পর যখন আমরা দুজন পড়ে আছি—হঠাৎ বলে বসলো আর জায়গা নেই। আমরা জোর করতে আবার বললে 'সো সরি'—আর এই দেখনা মেম সাহেবের নিখরচার দুঃখ মেটাতে আমরা এখানে গড়াগড়ি!"

কিন্তু আশ্চর্য্য ছবি আঁকতে পারে মেয়েটা। কথা বলতে বলতে ছবি আঁকার ক্ষিপ্রতা এই প্রথম দেখলাম।

আমি বাধা দিয়ে বললাম,—"সে কি! বাসে তো সবার বাঁধা ধরা সীট্। গোলমাল হবার 'জো' কোথায়?"

হাত ঘুরিয়ে রুক্মিনী অনুকৃত কণ্ঠে বললো, "সো-সরি! 'জো' এর খবর দেবার মতো রাঙ্গা ঠোঁটও নেই আমার, তুলিতে আঁকা ভ্রূ ও নেই। এক ডার্ক ট্যান্ চামড়া আর স্যাভেজ চুলের রাশ নিয়ে বব্‌কাটা বিবির 'জো' এর ব্যাখ্যা করি কি করে! সো-সরি!!"

হেসে ফেলে বললাম—"এসো আমাদের গাড়ীতে।"

এবার রামসিং বেঁকে দাঁড়ালো। সরকারি বাস। সামনে চীনাবের পুল, জবর খবরদারি; তারপর বানিহালের নাজিহাল। একটী সীটও বেশী দিলে 'থসিট্'কে নিয়ে পুরবে জেলে। উনি ছবি আঁকছেন আঁকুন। পরে তো আরও বাস আসছে। খালি বাস দুটো একটা পাবেনই। তখন তাতে চড়বেন।"

জগজীবন সমর্থন করে বললো—"হ্যাঁ হ্যাঁ একখানা বাসে রসদ যাচ্ছে। কিছু সীট্ খালি পাবে।"

"তা হলে আমাদের হবে না?" বললে রুক্মিনী!

অসিত একগাল হেসে বললো—"সো সরি।"

রুক্মিনী আর রেণু একসঙ্গে হেসে উঠলো।

চীনাব

বাতোত পার হতেই নামা। তীব্র ঢাল পার হতে হচ্ছে দ্রুত বেগে এবং ব্রেক টিপে টিপে। পদে পদে আঁকা-বাঁকা ভঙ্গী। এখানে এই প্রথম সর্পিল পথ। গভীর ছায়া ঘেরা বন। ও ধারে উচু পাহাড়। বুঝতে পারছি ইংরাজীতে যাকে gorge বলে এ সেই গোর্জের বা গভীর নালার কিনারা ধরে নামা।

এই চিনাব নিয়ে এক সাহেব বিরাট বই লিখে গেছেন। এই চিনাবের তীরে তীরে তটে তটে ভারতের ইতিহাস, ভারতের অর্থনীতি কত কঠিন কত মর্মন্তুদ কাহিনী রচনা করেছে। দেশ দেখাটা কেবল বাহেন্দ্রিয় দ্বারাই হয় না, কেবল অর্থ, সামর্থ্য ও সময় দিয়েই হয় না। দেশ দেখাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেক কিছু জানা শোনা থাকলেই তবে অনেক কিছু জানতে চিনতে পারা যায়। এ যেন অপরিচিতার সঙ্গে স্বয়ম্বর সভা। সহচারিণী সখী বা ভাট কেউ স্তবগান না করলে বরমালা লাভই শুধু নয়, গ্রহণেও বাধা জন্মায়।

তখনও বাস নামছে। চীনাবের ধার পেয়ে যায় নি, কিন্তু গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে একটা নদী চলেছে। ওপারে ৫০ ডিগ্রির বেশী খাড়া পাহাড়। তার গা কুরে পায়ে হাঁটা সরু পথ বেরিয়ে গেছে এঁকে বেঁকে। পায়ে হাঁটা পথে যেন বেশী মমতা, বেশী দূরত্ব, বেশী রমণীয়তা মেশানো। পায়ে হাঁটা পথ যেন কেবল পাঠানকোট শ্রীনগরকে এক করে না, যেন কেবল লালমুসা রাওলপিণ্ডি, খাইবারের সঙ্গে কোহিমা, মণিপুর, আরাকানের মিল করায় না—সে যেন আরও দূরে নিয়ে যায়। তেপান্তরের মাঠে যাবার, কুঁচবরণ কন্যার দেশে যাবার, ঘুম-পরীর প্রাসাদে যাবার পথ যেন পায়ে হাঁটা পথ। ফিতের মতো সে পথ ঐ পার দিয়ে চলে যাচ্চে। এ পারে চলেছে রামসিং পরিচালিত এই বাস্।

এসে যাবে চীনাবের বাঁধ এবার। চীনাবের পুল খুব পলকা পুল। আগে পায়ে হেঁটে পার হতে হোতো। এখন সামরিক কর্তৃপক্ষ সুন্দর মজবুত, পুল করেছেন। গাড়ী এখন লোক শুদ্ধই পার হয়। এসব জায়গায় ফোটো নিতে দেয় না। কিন্তু কী অপূর্ব্ব দৃশ্য।

সামনে বাতালা, রামরাণ পাহাড় ৮০০০ থেকে ১৩০০০ পর্য্যন্ত উঠেছে। চম্বা থেকে কোহোল, পাঞ্জি, পাদার গিরিশ্রেণী পার হয়ে ঐ শৃঙ্খলটাই এখানে বেঁধে নিয়ে এসেছে চীনাবকে। সেই ১১ হাজার থেকে ১৩ হাজার মার্কা গিরিশ্রেণীর তলা দিয়ে চলেছে চীনাব, ঘুরে ঘুরে, পাকে পাকে। এপারে বাতোত ওপারে দোদা—সেখান থেকে নদীর ধারে ধারে নদীর পশ্চিম মুখে চলে রামবাণ সহর।

এতো রমণীয় দৃশ্য যে একটু বসে চেয়ে না দেখে থাকা না। রামসিং বাস্ থামালো। আমরা নেমে ছড়িয়ে পড়লাম। অসিত আনাচ কানাচ ঘুরতে লাগলো কোথা থেকে কয়েকটা ছবি নেওয়া যায়।

নদী গেছে এঁকে বেঁকে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে। প্রচণ্ড তার কলকল শব্দ। সফেন তার গতিবেগ। নদীর ডান ধারে একসার পাহাড় চীড় আর দেবদারুতে ঢাকা। বাঁ ধারে ধারে মোটর পথ। এর পরেই খাড়াই জঙ্গল ঢাকা পাহাড়। বাঁকে বাঁকে রমণীয় দৃশ্য, পাহাড়, আকাশ, নদী—সব জড়িয়ে। ছবি নিচ্ছে; ছবি সব ধরে রাখবে এই অশান্ত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির মধ্য হতে প্রবহমান পরমা-শান্তির কল্যাণ কামনা? কেমন করে এই অগোচর অধ্যায়টীকে কোনও প্রকারে, কোনও শিল্পে মানুষ এই ক্ষণিক থেকে চিরকালের হাতে পৌঁছে দেবে—পৌঁছে দেবে এই দেশ থেকে দেশান্তরে?

বাতোত

রাশি রাশি কাঠের টুকরো ভেসে আসছে। এরা ভাসতে ভাসতে চলে যাবে রামবাণ সহরে। সেখান থেকে যাবে আখনোর সহরে। আখনোরে খাড়া পাহাড়ের মাথায় আছে পাঞ্জাব-বিশ্রুত দুর্গ। রামবাণ আখনোরের মাঝে চীনাবে এসে মিশছে বানিহাল নদী। বানিহাল নদীর যে অববাহিকা সেই পথেই যেতে হবে বানিহাল গিরিপথে।

চিনাবের পুল

"কাঠগুলো কোথায় যাবে ভাইয়া?" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে মনোরমা।

"কোথায়? সহরে।"

"কি করে?"

"ভাসতে ভাসতে। জঙ্গলের গহ্বরে, কাঠ চিরে চিরে জলে ভাসিয়ে দেয়। প্রতিটি কাঠের 'বল্লী'র গায়ে চিহ্ন আছে। চিহ্ন দেখে মালিক কে টের পাওয়া যায়। রিয়াসী বলে কাছেই একটা সহর আছে, সেখান থেকে আরম্ভ করে রামবাণ' আখনোর পর্য্যন্ত এই কাঠ তুলে নেবার

সব লোক আছে। অদ্ভুত তাদের কৃতিত্ব, অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা, গল্প শুনবে? শোনো।...

ছেলের দল ঘিরে বসেছে।

...মশক দেখেছো তো? তেমনি মশকের মতো হাওয়া ভরা খলের পায়ের দিকে দুটো দড়ীর ফাঁস বাঁধে। আর হাতের দুদিকেও একটা দড়ি বাঁধে। হাতের দিকের দড়িটা গলায় দিয়ে পায়ের দিকে দুটো ফাঁসে দুটো পা ঢুকিয়ে দিয়ে এরা ঝপাঝপ্ জলে নেমে পড়ে। এই মশককে এরা বলে সর্ণা। সর্ণাটা বুকের কাছে খাড়া ভাবে পায়ের চাপে আটকে ভাসতে থাকে সমস্ত দেহটার ভার বহন করে। হাত দিয়ে এখন সে জল কাটে। সামনে মশকটা থাকার দরুণ ভাসমান কাঠের আঘাত বুকে লাগতে পায় না। একটা একটা করে কাঠ সংগ্রহ করে গোটা কয় কাঠ একসঙ্গে বেঁধে ফেলে একটা ভেলামতো করে। তার পর মস্ত একটা ভেলা হলে পর সেটাকে চালিয়ে নিয়ে তোলে আখনৌরে। সেখানে মহাজনদের গদি আছে। চিহ্ন মিলিয়ে মহাজনদের গদিতে মাল পৌঁছে দেয়। কাঠ মেপে তার ঘনত্বের মাপে ওদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।"

নদী গেছে খাদের মধ্যে দিয়ে

"এতে ওদের বিপদ হয় না?"

"হয়না আবার? ভীষণ বিপদ। একটু নীচে বিয়াসী। সেখানে নদী এতো পাক খেয়েছে যে একটা নির্মম ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। কখনও কখনও কাঠ নিয়ে ঘূর্ণিতে পড়লে দিনের পর দিন সেই ঘূর্ণিতে কেবল পাক খাও আর পাক খাও। পরে ক্লান্ত হয়ে, মাথা ঘুরে সলিল সমাধি। একবার দুই ভাই মিলে কয়েকটা কাঠ বেঁধে বিয়াসীর ঘূর্ণির পাকে পড়ে। পড়তো না; দুটো কাঠ খুলে যায়। এক ভাই তাড়া-হুড়ি জলে নেমে কাঠ দুটো এনে যেই লাগালো, ঐ যে একটু অসতর্ক ...ত হোলো, ঘূর্ণিতে পড়ে গেলো। একদিন একরাত, কেবল বন্ ...ন করে ঘুরছে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় একদল মজুর একটা ভেলা নিয়ে ...নছিল। তারা দেখতে পেলে একটা ভেলার ওপর একজন মড়ার ...া পড়ে আছে আর ভেলা ঘুরছে। অতিকষ্টে তারা ভেলাটাকে ...রের দিকে সেই ঘূর্ণির মুখ থেকে সরিয়ে রক্ষা করলো। কিন্তু তখন ...ভাই জলের তলায় চলে গেছে। এ কাহিনী রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল্ ...সাইটীর মেম্বর ফ্রেডারিক ড্রিউ সাহেবের গ্রন্থে আছে। এই ভীষণ ...বর্তকে শত্রুরা ভয় কা... বলেই এর পারে ধ্যানধড়, অনার্স আর সলাল নামে তিনটি দুর্গও আছে। আখনৌরের চার পাশে চীনাবের জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জলপথ ছাড়া আখনৌরের দুর্গে ঢোকার অন্য পথ নেই।"

"এখন তো চীনাবে বাঁধ পড়েছে।"

আমি বল্লাম—তবু চীনাব চীনাব। বর্ষার সময় চীনাব ভয়ঙ্করা ভীমা; বিশেষ করে খাঁড়ির মধ্যে।

সর্ণা-য় নদী পার

রামসিং হর্ণ দিলো। আবার বাস। ক্রমশঃ এসে থামলাম আবার একটা ব্যেরিয়ারে। এটা বানিহালে ওঠার ব্যেরিয়র।

জায়গাটার নাম দেওগোল।

চমৎকার একখানি ছোট্ট চায়ের দোকান। রামহাতে মিলিটারিদের একটা ট্রাফিক পোষ্ট, কয়েকটা অফিস আছে। এই দৌলতেই ছোট্ট

চায়ের দোকনটা চলে। নীচ দিয়ে বানিহাল নদী বয়ে গেছে। চা খেতে খেতে আলাপ জুড়লাম এক স্কটিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম বল্লেন—মিড্লোথিয়ান। স্কটের লেখা মিডলোথিয়নের গল্পের উল্লেখ করতেই মহাখুসী। "সেই বংশের আমি" বল্লেন এবং কেমন পায়ে হেঁটে নিরিবিলি কাশ্মীর ঘুরতে বেরিয়েছেন সেই গল্প হতে লাগলো।

পাহাড়ের দৃশ্যের বর্ণনা করা সুকঠিন। শেষ অবধি বলতে হয় "ছবির মতো।" ছবির মতো কথাটা বলার মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোনও একটা রূপ নেই। একটি ঝরঝরে প্রসন্নতা বোধ আছে। যদি চ আজকাল পিকাসোত্তর ফরাসীরীতিতে আঁকা ছবি প্রসন্নতার ধার ধারে না—যেমন ধারে না এলিয়টোত্তর বর্ত্তমান গাণ্ডিক কাব্যশ্রী। এদের কথা "জীবন নদী বয়ে যেতো মন্দ্রাক্রান্তা তালের" বিপক্ষে। জীবন যখন সংঘাত, রস যখন পরিমিত, তখন মিথ্যা-কাব্য মোহে জীবনকে নেশালু করে ঠকিয়ে নিয়ে যাওয়া ইমানদারী নয়। জীবনে যে সংঘাত আছে তাকে কাব্যে এনে ফেলা চাই! চালে যে কাঁকর আছে তা শুদ্ধুই ভাত সিদ্ধ করো। এমন কি কেউ যদি ঝরঝরে চারটী ভাত তোমায় বেড়ে দেয়, বলো "তুমি বেইমান্। কেননা তুমি সত্যকে লুকাচ্ছো। সত্যের খাতিরে ভাতে কাঁকর মেশাও আর খাও। "এটাই নাকি নব স্নায়ুশীলতার, মানবিকতার উপকরণ ও নিরীখ। তাই 'ছবির মতো' কথাটাও পুরোনো। বড় জোর এখনও ওর অর্থ একটা বাঁধাধরা পরিসরের মধ্যে অনেকখানি বলার ব্যাকুলতা। তবুও বলা চলে 'এই তো ছবির সবখানি নয়। তা যদি হোতো তবে ছবির পর ছবির জন্ম কেন হয়? আদর কেন হয়? আলেখ্য কেন অলেখ্য-সৌন্দর্য্য মাত্রেরই পূর্ণতর প্রকাশ? এরই বিচিত্রের চিত্র বারংবার হয় কেন?'

দেওসোল

তাই মাত্র 'ছবির মতো' বললে সেই বানিহাল যাবার পথের সৌন্দর্য্যের কিছুই বলা হবে না। বানিহাল নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে আসছে অনেকখানি ছড়িয়ে। গভীর নয় জল। গিয়ে মিশছে রামবালের তলায় চীনাবে। এই জল নামছে ঢালু দিয়ে রামসু আর দেওগোলের মাঝে। ঢালের মুখে বাঁধ দিয়ে জলটাকে আটকে ঘুরিয়ে আবার নদীতে মিশতে দেওয়ার ফলে থরে থরে ধাপের পর ধাপ ক্ষেতের সার। কচি কচি ধানের চারায় ভরতি, কেউ গাঢ় সবুজ, কেউ ধানী, কেউ আরও হাল্কা, কেই তামার রং, কেউ কচি আমারে পাতার মতো লালচে খয়ের। গালিচার মতো প্রায় সাত আট মাইল জুড়ে এই ক্ষেত। চীনাব ছেড়ে আমরা এখন বানিহালের গিরিপথের দিকে এগুচ্ছি। চীনাব পশ্চিম দিকে গেল। আমরা চলেছি উত্তরে। দামন্-ই-কোহ ছেড়ে এখন আসল কাশ্মীর বলয়কে আক্রমণ করেছি।

এ পথটা একেবারে আন্‌কোরা নতুন। আগে বানিহাল আসতে হোতো জম্মু দিয়ে পায়ে হেঁটে ১২ দিনের পথ শ্রীনগর। মোটামুটি হিসেব তার এই। জম্মু থেকে দংশল, দংশল থেকে কিরমচী-মীরলান্দর-বিলস্ত-রামবান-রামসু-দেওগোল-ভেরনাগ-হাসলামাবাদ-অবন্তীপুর-শ্রীনগর। এখন পায়ে হাঁটা পথ নেই। মোটর বাসের পথ। নিরপত্তার জন্য আবার সীমান্ত থেকে দূরে রাখতে হয়েছে। কাজেই পথের ধারা স্বতন্ত্র হয়েছে।

পথ হিসেবে বানিহালের খ্যাতি কোন কালেই ছিল না। কাশ্মীরে তো চাকা-ওলা গাড়ীই ছিল না। পীরপঞ্জলের পাহাড় পার করতে মানুষ জন্তু পিঠে বয়ে যা পারতো তাই। আওরঙ্গজেব তো কাশ্মীর যাবার পথ দেখে প্রতিজ্ঞাই করেন আর ও মুখো হবেন না। তাও ভাম্বর দিয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো পথটাই মোগলবাদশারা ব্যবহার করতেন। বানিহাল এই পাহাড়ে ৯২০০ ফুট বলে সব চেয়ে নীচু পথ। কিন্তু নীচু হলেকি হয় তা খাড়াই। হেঁটে যেতো লোকে « ঘণ্টায়। এখন বাস চলে ১২ ঘণ্টায়। ইংরাজরা রাওলপিণ্ডির সা‍ং কাশ্মীরের যোগাযোগ করে দেবার পরবানিহাল পড়ে রইলো অব্যবহৃত। পথতো নামমাত্র ছিলো। তাও গেল। ফলে পাঞ্জাবের সঙ্গে কাশ্মীরে ব্যবসা জমে উঠলেও,জম্মু আর কাশ্মীরে যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ হয়ে গেল।

কিন্তু ডাক্তার মিত্র বলে এক বাঙ্গালী মন্ত্রী কাশ্মীরের মহারাজকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই পথ নির্ম্মাণের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করেন এবং তাঁরই প্রথম যত্নে চেষ্টায় এ পথ তৈরী করা হয়েছে। প্রথম কিছুদিন এ পথ রাজার নিজস্ব পথ ছিলো, পরে ১৯২২ সাধারণের পথ বলে রাজা ঘোষণা করেন। নতুন বানিহাল সুড়ঙ্গ হচ্ছে ৭২০০ ফুটের মাথায়। আপাততঃ ১০ ফুটের পথ হচ্ছে। এপার-ওপার হয়ে গেলে পথ হবে ২২ ফুট চওড়া। পথ কমে যাবে ১৮ মাইল। বরফের দিনেও পথ ব্যবহার করা যাবে; লোকে ভয় দেখায় বানিহাল পাহাড়ের বুকে অজস্র উৎস জলের। খুঁড়লে বন্যায় সব ভাসিয়ে দেবে। এঞ্জিনিয়র বলছে, "দেখবো, যদি দরকার হয় জলও রুখবো।" ভরত সরকার কৃতসঙ্কল্প এ পথের দায় আরও লঘু করবেন। জম্মু আর পাঠানকোটকে রেলপথে বেঁধে দেবার কাজ সুরু হয়ে গেছে। তার চেয়েও বড় কাজ বানিহালে সুড়ঙ্গ করে এই মৃত্যুময় চড়াইয়ের পথকে সুগম করে দিতে হবে। আমরা বানিহাল চড়তে চড়তে দেখলাম সুড়ঙ্গের কাজ চলেছে।

বানিহাল সুড়ঙ্গ

কাশ্মীরে যাবার যতো পথ আছে বানিহালের মতো এমন কর্কশ, বন্ধুর, ভয়াল পথ আর নেই। পথ ছিল অতি সুন্দর বারামুলার পথ। সুপর, উলার দিয়ে সে পথের খ্যাতি ছিলো দেশ দেশান্তরে। ঝিলমের জলপ্রপাত, বারামুলার বাজার, সুপারের পণ্য বিপনী, উলারে নৌকায় চড়া, উলারের ঝড়, সব মিলে যাত্রাপথকে চমৎকার আর বিস্ময়ে ভরে রাখতো। কিন্তু এপথ যেন মহাকালের ত্রিশূল। রক্তাক্ত এর ইতিহাস, নীরস এর ব্যবহার, অবশ্য এর প্রয়োজনীয়তা, নিরলঙ্কার এর অবয়ব। ভয়ঙ্কর পথ। কোথাও কোনও রকম রমনীয়তা নেই। কেবল গভীর নীচে বানিহাল নদীর তীরে তীরে ছোটো ছোটো ধানক্ষেতের গালচেপাতা গ্রাম।

একী! শীত করতে লাগলো যে। বেলা দ্বিপ্রহর! রামসিং বললো "ন' হাজার দুশো ফুট চড়েছি। চার হাজার ফুট রামবু থেকে। এই পাঁচ হাজার ফুট চড়েছি তিন মাইলের দূরত্বের মধ্যে। পাক খাচ্ছি এই তিন মাইলের মধ্যেই।"

"বরফ বরফ" ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে। চেয়ে দেখি পাহাড়ের চূড়ায় সত্যি বরফ জমে আছে। আমরা একটু আগে একটা টানেল পার হলাম। বানিহালের উচ্চতম চূড়ার ঠিক নীচে দিয়ে টানেল করে বানিহালের এপারে অর্থাৎ উত্তর পারে এনে ফেলতেই দেখি একধারে রাশি রাশি বরফ জমে আছে।

রামসিং বাস থামালো। ছেলেরা বরফের ওপর ছুটোছুটী করতে লাগলো। সাধারণতঃ যাত্রীরা যে সময় আসে আমরা নাকি সেই নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু আগেই এসেছি বেড়াতে। নৈলে জুলাই আগষ্টে এখানে বরফ থাকে না।

বাস আবার ছাড়লো। খানিকটা নামতেই দেখি সামনে বিতস্তার সেই ভুবন বিদিত প্রসার—যার তুলনা ভূমণ্ডলে নেই। কাশ্মীর নাকি ভূস্বর্গ। একি সেই স্বর্গের প্রথম তোরণ? উর্ব্বশীর প্রথম চাহিনি?

দিগন্ত বিস্তীর্ণ বিরাট সমতল ঢেকে আছে সরু সরু পপ্‌লার আর এ্যাশ্‌ গাছে। কেয়ারির পর কেয়ারি সবুজ আর জল। তার অনেক দূরে নীল আকাশের গায়ে চক্‌ চক্‌ করে বরফের পাহাড়। বাস্‌ তো চলছে। থামবে না। "কোথায় থাববে রামসিং ?"

বানিহাল গিরিসংকট

রামসিং বললে, "ভেরনাগ।"

ভেরনাগ? ওরা বলে ভেরনাগ। আসলে নীল নাগ। ভের তো গাঁয়ের নাম।

নাগ মানে প্রস্রবণ। জলপ্রপাত নয়। কাশ্মীরের সব নদীই মাটী থেকে ভল্‌ ভল্‌ করে উঠছে। পাহাড় ভেঙ্গে ঝরছে না। গোমুখী নেই কাশ্মীরে। কাশ্মীরে নাগ।

"নাগ নাম কেন?" বলে বেণু।

"সে অনেক কথা। নাগ নামের সঙ্গে ভারতের গভীর সম্বন্ধ।

বানিহাল গিরিসংকটের আর একটি দৃশ্য

এখন শোনো ভের নাগের গল্প। ভারি সুন্দর গল্প। মনে হবে রূপ-কথা শুনছো, কিন্তু একেবারে ইতিহাস।"
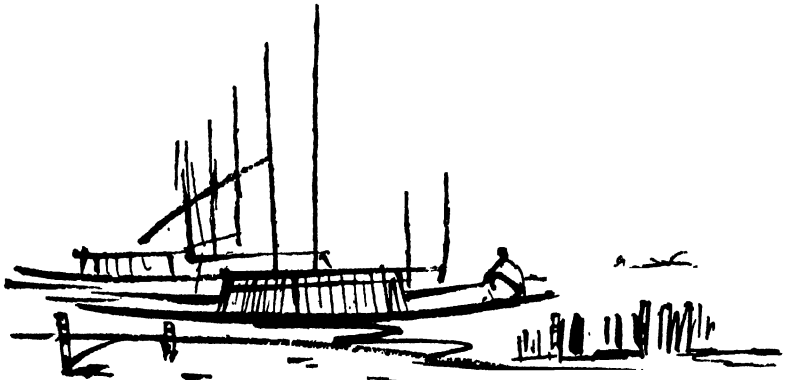
সেই সুন্দর ছবির বিয়োগান্ত কাহিনী

(এডগার এ্যালন পো)

অনুবাদক ঃ শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

সেই গেঁয়ো ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীতে আমাকে আহত অবস্থায় নিয়ে আমার একান্ত অনুগত বিশ্বাসী চাকর একরকম জোর করে প্রবেশ করেছিল। আমি আহত। নির্মল মুক্ত আকাশের নীচে রাতটা নির্বিঘ্নে কাটানো আমার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। সেই বাড়ীতে আলো আর ছায়ার রহস্যময়তা। পোড়ো বিরাট বাড়ীটার সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেরা রহস্যময়তার কথা বিশ্বাস করত।

বাড়ীটা পরিত্যক্ত অবস্থায় বহুদিন ধরে পড়ে আছে। আমরা একটা ঘরে আস্তানা গাড়লাম। ঘরে কোন রকম শিল্পকলার ছাপ আমি প্রথমে দেখতে পাইনে। বাড়ীর একবারে অন্দরমহলে এ-ঘরটা, তবে ঘরের অলংকরণ যে বেশ সুন্দর তা বোঝা যায়। ভাঙা জীর্ণ ঘরে ক্ষয়িষ্ণু সৌন্দর্য্য এখন রয়েছে—এর ছাপ দেওয়ালে রয়েছে। দেওয়ালে নানা রকমের জমকালো ছবি। নানা রকমের বিরাট চিত্রিত পর্দা এই ঘরে। ছবিগুলো সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন। ছবিগুলোও নানা রকমের—ছবিগুলোর আকারও বেশ বড়।

তা ছাড়া আধুনিক শিল্পাঙ্কনের ছাপ এতে রয়েছে। এই সব আঁকা ছবি দেওয়ালে শুধু খাড়া করে রাখা হয় নি— বা আঁকা হয় নি—বহু ছাপ প্রায় সারা বাড়ীটাতে ছড়িয়ে রয়েছে। তা ছাড়া পুরাণো স্থাপত্য শিল্পের প্রতীক হিসাবে এই গেঁয়ো বাড়ীটাকে অভিহিত করা যেতে পারে।

ছবিগুলো দেখলে আপনা থেকেই বেশ কৌতুহল জাগে। আমার মধ্যে কৌতূহল জাগাল। পেড্রোকে জানালা বন্ধ করে দিতে বললাম। বেশ রাত হয়েছে। তা ছাড়া সেই অন্ধকার ঘরের সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য— আলোর কিরণ যাতে বাইরে বার হয়ে না যায়, সেজন্য আমার মাথার কাছে রক্ষিত মোমবাতিটা জ্বালাতে বললাম। আমার ইচ্ছে চাকরটা আমার কথামত কাজ করুক। তা ছাড়া আমার আর একটা ইচ্ছে ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে আমি যদি পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে না পারি, তা হলে ঘরের ছবিগুলো দেখে নেব। তা ছাড়া বালিশের নীচে কতকগুলো ছবির বই পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলোর সমালোচনা করবার সময় বা অবকাশ আমার দুই-ই ছিল।

অনেক···অনেকদিন আগে···। বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে সুরু করলাম।

সময় কেটে যেতে লাগল। গভীর রাত। মোমবাতির আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়ে আসে—বিরক্তি অনুভব করলাম।

নিদ্রিত পার্শ্বচরকে না ডেকে আহত অবস্থায় আমি মোমবাতির শিখা উস্কিয়ে দেবার চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য নিষ্প্রভ আলোগুলো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে এবং আলোর কিরণ বই-এর পাতার উপর পড়বে। আমার সেই প্রচেষ্টা একটা অভাবিত ঘটনার গ্রন্থি উন্মোচন করল। অনেকগুলো মোমবাতি ছিল—আমি শিখা উস্কিয়ে দিতেই সেগুলো আলো ঝলমল বিচ্ছুরণে অন্ধকার গর্ভের যবনিকা সরিয়ে দিল। অন্ধকার দুর হতেই আমি আর একখানা ছবি দেখলাম। এ ছবিখানা আমি আগে দেখি নি।

ছবিটা একটা মেয়ের। বয়ঃসন্ধিকালে আঁকা ছবিটা।

চকিতে সেই ছবিটার দিকে তাকালাম। সেই আঁকা ছবি দেখে আমি চোখ মুদলাম। আমি নিজে যে কী করছি তা বুঝতে পারি না। চোখের পাতা মুদে আমি ভাবতে লাগলাম কেন আমি এই কাজ ক'রতে গেলাম। সেই মুহূর্ত্ত আমার কাছে চাঞ্চল্য এনে দিল—আমি ভাবতে লাগলাম ছবি দেখে আমি প্রতারিত হইনি ত'। ছবিটা ঠিকই ত'। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিই। কল্পনাপ্রবৃত্তি সংযত ক'রে ছবির দিকে আমি আবার তাকালাম।

আগেই বলেছি ছবিটা একটা মেয়ের—বয়ঃসন্ধিকালে আঁকা। ছবিটাতে মাথা আর কাঁধ আছে। ছবির ফ্রেমে নানা লতা-পাতা ও ফুলের নক্সা। প্রায় স্যালির মাথার মতন আঁকা। বাহু, স্তন এবং স্বর্ণাভ চুলের বিগলনীয় রূপের গাঢ় ছায়া পিছন পটভূমিকায় একটা সুন্দর পূর্ণরূপের বিস্তৃতি এনে দিয়েছে।

অনেকটা ডিম্বাকৃতি ছবির ফ্রেমটা পুঁতি বসানো আছে। সোনা ও রূপোর সূক্ষ্ম কারুকাজ রয়েছে এতে। ছবির রেখাঙ্কন শিল্পের একটা পূর্ণ বিকাশ—এর বেশী বিশ্লেষণ আমি আরোপ করতে পারব না। তবুও শিল্প-সামগ্রী হিসাবে অথবা সৃষ্টির আদি ধাতু হিসাবে সেই নারীর মুখের রূপজ সৌন্দর্য্য আমাকে মোটেই অভিভূত করে নি। আধো আধো ঘুমের মাঝে সেই ছবিটার মুখ আমার বেশ মনে আছে। আমার কাছে সেটা জীবন্ত মানুষীর প্রতিমূর্ত্তি বলে মনে হয়েছিল। বিশেষ ধরণের আকৃতি সেই ছবিটার। ছবিটার ফ্রেমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির নক্সা—এই সমস্ত কিছু আমাকে বেশ অভিভূত ক'রেছে—আমার মধ্যে আনন্দ জেগেছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল আমাকে কে যেন বাধা দিচ্ছে।

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করতে করতে আমি নিজের চিন্তাজাল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করি—কারণ দুর্বল আহত আমি। পুনরায় ছবিটার দিকে তাকালাম। সেই গুপ্ত সৌন্দর্য্য দেখে আমি শুয়ে পড়লাম। ছবিটার মধ্যে একটা সজীব জীবনের প্রকাশ আমি লক্ষ্য করলাম। প্রথম চমকে উঠি তারপর বিস্ময়ে থ' হয়ে যায়। তারপর আরও অভিভূত হই—তারপর ভাবি ছবিটা প্রশংসা পাবার যোগ্য।

একটা অজানা শিহরণ দেহে। মোমবাতির আলো-গুলো কমিয়ে দিলাম। আমার উত্তেজনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায়। নিজেকে সহজ করবার জন্য শিল্পরেখাঙ্কনের ইতিহাস ও সমালোচনার বইটীর মধ্যে আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম।

বহু পুরাতন ক্ষীণ রেখা আর ধুলোর ভিতর থেকে আমি বর্ণোদ্ধার করলাম,—

মহিলা ছিলেন খুব সুন্দরী। এ রকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, তার মধ্যে ছিল আনন্দের পূর্ণ বিকশিত রূপ, একটা অশুভক্ষণে সেই শিল্পীর সঙ্গে মেয়েটার দেখা হয়েছিল, এই শিল্পীকে মেয়েটী ভালবেসেছিল। তারপর বিয়ে করেছিল, অনুরাগী শিল্পী শিল্প চর্চা করত। সুন্দর সুঠাম শিল্পী এমন সুন্দর বধূ পেয়ে খুব উল্লসিত। এ রকম সুন্দরী বউ কজনের ভাগ্যে মেলে। কারণ নববধূ নিজেই হচ্ছে সুন্দরের পূর্ণ প্রকাশ। মেষ শাবকের মতন সেই কুমারী চঞ্চল। হাসিখুসীতে মেয়েটী ভরা। জীবন্ত উচ্ছ্বসিত প্রাণের, যৌবনের প্রতীক হচ্ছে মেয়েটী, মেয়েটী সব জিনিষ ভালবাসত, আনন্দ পেত সবেতেই। শুধু ভয় পেত শিল্পীর তুলি আর অন্যান্য রং ও শিল্পসামগ্রীর আঁকার উপকরণ দেখে, সেই শিল্পীর আনন্দভরা মুখ মেয়েটী কোনদিন দেখতে পায়নি—তাই শিল্পী যখন পত্নীর ছবি আঁকার প্রস্তাব করল তখন সেই মেয়েটী আঁতকিয়ে উঠল। কিন্তু সে খুব নম্র মেয়ে, স্বামীর প্রতি অনুগত, স্বামীর কথা রাখল। শান্ত ও স্থিরভাবে অন্ধকার উঁচু ঘরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেই মেয়েটী বসে থাকত। একটা ক্ষীণ আলো ফাঁক দিয়ে শুধু আসত। শিল্পী ছবি আঁকার কাজে ডুবে গেল, শিল্পীর খুব আনন্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ছবি আঁকায় শিল্পীর দিন কেটে যায়। শিল্পীর মধ্যে একটা সুপ্ত লিপ্সা ছিল। শিল্পী ছিল একটু খামখেয়ালী, ছবি আঁকবার সময় নিজের আঁকার মধ্যে সে ডুবে গেল, শিল্পী লক্ষ্য করেনি সেই নির্জন কক্ষে তার প্রিয়তমার স্বাস্থ্য এবং আনন্দ কত কমে যাচ্ছে, সদা চঞ্চল পত্নী নিশ্চল হয়ে বসে হাঁপিয়ে উঠছে, শুকিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটী সব বুঝেও চুপ করে থাকত কারণ শিল্পীকে সে খুব ভালবাসে। তবু সেই মেয়েটা হাসত। কোন অভিযোগ শিল্পীর পত্নীর ছিল না। কারণ সেই
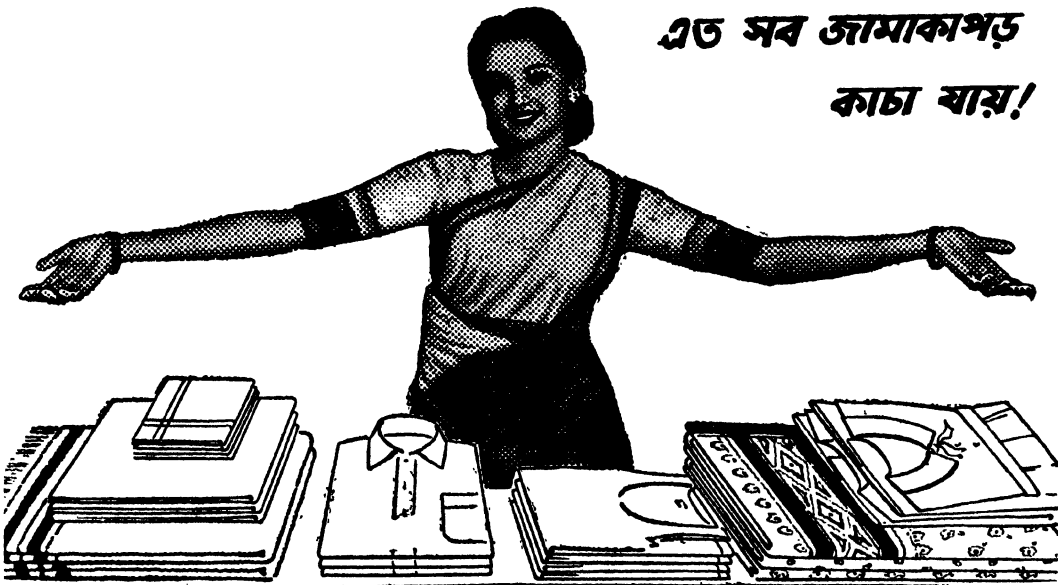
নামকরা শিল্পী আঁকার মধ্যে একটা দুর্বার আনন্দ পায়। তাই সে শিল্পী সারা দিনরাত ধরে ছবি আঁকে।

শিল্পীর পত্নী স্বামীকে খুব ভালবাসত। মুখে কোন কিছু সেই মহিলা প্রকাশ করে নি। শিল্পীর পত্নী ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে ক্রমশ—আনন্দ আর হাসি তার মুখে নাই। সেই ছবি দেখে ইতিমধ্যে জনকয়েক শিল্পীর বন্ধু মন্তব্য করেছিল যে ছবির সঙ্গে তার পত্নীর অদ্ভুত সামঞ্জস্য হয়েছে, শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে শিল্পীর শিল্পকে বন্ধুরা প্রশংসা করেছিল। ক্রমে ছবি আঁকা শেষ হয়ে আসে। সেই ঘরে এখন আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। নিজের কাজে শিল্পী ডুবে গেছে। এই আঁকার মধ্যে শিল্পী একটা অপূর্ব বন্য আনন্দ পাচ্ছে. ক্যানভাস থেকে শিল্পী আর চোখ সরায় না। এমন কী তার পত্নীর দিকেও আর তাকায় না। ক্যানভাসের ওপর আঁকা গণ্ডদেশের যে ছোপ বা লাবণি—যা তার পিছনে আসীন প্রিয়তমা পত্নার—সে দিকেও শিল্পী নজর নাই। অনেক সপ্তাহ কেটে যায়। সময় আর বেশী নাই। মুখের একটু অলংকরণ, ভ্রূ রেখার দু একটা টান দিতে যা বাকী। এই সময় শিল্পীর পত্নী নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতন শেষ বারের মতন জ্বলে উঠল। তারপর মুখের অলংকরণ করা হল। ভ্রূ রেখাও আঁকা হল শিল্পী নিজের আঁকা ছবির দিকে মূক হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকে।

তারপর সেই শিল্পী তাকাল—ভয় পেল। শঙ্কিত মন তার। ফ্যাকাশে হয়ে গেল শিল্পী, ভয়ে অভিভূত সে।

চীৎকার করে বলে। এই-ই জীবন।

তাকিয়ে দেখে তার প্রিয়তমা 'মরে পড়ে আছে'।

প্রেমের দর্শন

অনুবাদিকা—মঞ্জুশ্রী সিংহ বি-এ

নির্ঝর মিলিছে তটিনীর সনে
তটিনী পরম সুখে
মধুর লাস্যে কল্লোল-গানে
বাড়িছে সায়র বুকে।
মহাকাশ তলে কতনা পবন বহিতেছে ক্ষণে ক্ষণে
সবারই মিলন প্রতিপলে কোনও মধুর ভাবের সনে।
এ জগতে কেহ নাই সাথি হারা
বিধির বিধান বলে
তুমি আমি তবে কেন না মিলিব
এ মহা পৃথ্বী তলে॥

গিরিরাজ দেখ প্রণয়ে ব্যস্ত দয়িতা গগন সনে
উর্মিরা বাঁধা একে অপরের
নিবিড় আলিংগনে॥
সৌরকরের প্রোজ্জ্বল প্রেমে দীপ্তা ধরণী রাণী
চন্দ্রকিরণ সোহাগে চুমিছে সায়র আননখানি।
আমার কাছেতে শোন হে প্রেয়সী! তব চুম্বন বিনা
জগতের যত মধুর কর্ম সকলি অর্থহীনা॥*

য়ুচাংএর এক সন্ধ্যায়

অনুবাদক—জীবনকৃষ্ণ দাশ

এক খণ্ড মেঘ ভাসে—দূরে যায় দেখা
ইয়াংসীর অপর তীরে হ্যানাংশহর—
পুরা একদিনের পথ।
শান্ত নদী; আনে ঘুম,
আনে না আমার,
জেগে জেগে মাঝিদের আলোচনা শুনি:
নদীতে আসন্ন এক ভয়াল বানের।
তাকাই পিছন পানে জীবনের, যদি কিছু মেলে
বৃদ্ধ আমি শরতের পাকা পাতা।
আজ মনে পড়ে
হুনান নদীর সাথে কি নিবিড় ছিল পরিচয়!
চাঁদ ওঠে,
ভবঘুরে এ জীবনে বিতৃষ্ণা জাগায়,
হাতছানি ডাকে যেন ঘর।
যুদ্ধের কবলে গেছে কি পেয়েছি কিংবা কি পেতা[ম]
তবুও রেহাই নেই।
হায়! ওই ভেসে আছে ও পারের দামামা-নিনা[দ]
আর ভরে মন এক অস্থির হতাশে।*

Shelly'র অনুবাদ

* (Lulun থেকে)

পরিচালক—উপানন্দ

বর্ষবিদায়ের বাণী

বর্ষ-বিদায়ের সুর বেজে উঠ্‌ছে আর সুরু হচ্ছে বসন্তের উৎসব-সমারোহ। চলেছে প্রকৃতির বুকে রঙে রঙে দোলখেলা চির সুন্দর চির কিশোরের সঙ্গে। বিচিত্র রঙের লেগেছে ঢেউ লতায় পাতায়, তরু কিশলয়ে বন হোতে বনান্তরে। হৃদয়ের শাশ্বত আনন্দধামে বিরাজ করছেন নিখিলের রূপ ও রসের মূর্ত্তবিগ্রহ চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে নিয়েই বাসন্তী উৎসবে দোলখেলা। রাঙা আবিরে কুঙ্কুমে রঞ্জিত হয়ে উঠ্‌ছে মানুষের প্রাণ আর প্রকৃতির খেলাঘর।

আমাদের আনন্দপ্রবাহ আনে প্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতার ধারা, কেননা আমরা প্রকৃতির সন্তান, তার সঙ্গে আছে আমাদের নিবিড় যোগাযোগ, কিন্তু সে প্রবাহের ভেতর পূর্ণভাবে অবগাহন করতে আমরা বহুদিনই ভুলে গেছি। বহু ভালোবাসায় আমরা বাঁধ্‌তে চেয়েছি বসন্তকে—ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আমরা আমাদের ভাবজীবনকে হারিয়ে ফেলেছি। একদা আমাদের সমাজজীবনে যে উজ্জ্বল পুলক তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌তো দোলযাত্রায়, চড়ক পূজায়, বাসন্তী আর অন্নপূর্ণা পূজায়, আজ সে যেন ক্রমেই লোপ পেতে বসেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে, এর পশ্চাতে যে স্বদেশের আত্মঘাতী পটভূমিকা আছে, সেইদিকে তোমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে।

যেখানে শাখামৃগের মধ্যে পিষ্টক ভাগের প্রচেষ্টা হয়, সেখানে থাকে না কোন উৎসবেই আনন্দের সমারোহের বাণী—থাকে না ...নের আবির্ভাবের মাঙ্গলিকী—বর্ষ-বিদায়ের দিনে এই সব কথাই ... উঠেছে মুখর। আজ একটি আয়ুর পাতা বৃন্তচ্যুত হোলো ...ার কবরীচ্যুত কুসুমের মত আমাদের জীবনের মহীরুহ থেকে—...ন্তকালের তরঙ্গে যে পাতা ঝরে পড়্‌লো, কোথায় সে ভেসে ...লো—এইটাই চিরন্তন প্রশ্ন। এম্নি করেই বর্ষে বর্ষে আমরা একটি ...র পাতা হারাতে হারাতে চলেছি। তোমরা এনেছ নতুন সবুজ ...ার সমারোহ—তোমরা সবুজের অভিযান করো।

জাতির ঐতিহাসিক অগ্রগমনের মাঝে জীবনপ্রবাহ কতই না আবর্ত্তিত বিবর্ত্তিত হোলো—কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েই না চলেছে আমাদের দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এখনও পূর্ণতা লাভ করেনি আমাদের জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি। আজ যখন জীবন আচরণ ও চরিত্রে যুক্তিতত্ত্ববাদীদের জ্ঞান ও যুক্তির কথা শুনি, তখন দেখি, তারা সমস্ত ব্যাপার, সমস্ত কার্য্য ও চিন্তাপ্রণালী যেন মধ্যযুগের কোন্ প্রান্তে পিছিয়ে নিয়ে চলেছে।

এই সব যুক্তিবাদীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আজ যদি আমরা ধর্ম্ম বিশ্বাস হারাই আর জীবনপথে এগিয়ে চল্‌তে নীতির সাহায্য লঙ্ঘন করি, তা হোলে আমাদের জীবন কোনদিনই সুসঙ্গত হবে না—নিজেদের কাছেও নিজেরা খাঁটি থাক্‌তে পার্‌বো না। যুক্তিবাদীরা ঈশ্বরভীতির স্থানে বসাবার উপযুক্ত যুক্তি ভীতি গড়ে তুল্‌তে পারেনি, উপরন্তু আধুনিক জীবন তাদের প্রভাবে পিষ্ট হচ্ছে অযৌক্তিকতা, অসঙ্গতি দোষ, আদর্শ-বিহীনতার ও কপটতার চাপে—এ সম্বন্ধে ভেবে দেখ্‌বার সময় এসেছে।

আজ ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর দ্বন্দ্বে রত। ধর্ম্মকে উপহাস করছে যান্ত্রিক সভ্যতা। আদর্শকে হনন করছে চিন্তাধারার অপপ্রয়োগ। ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে হয়ে উঠ্‌ছে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, চলেছে ক্রমাগত দ্বন্দ্বসংঘর্ষ। সমান বিশ্বাস ও সমান কর্ম্মই মানুষকে একত্রিত করে, সে দিকে রয়েছে অভাব। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র-চিন্তা মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে, তাই আদর্শের মাধ্যমে জন-বিশ্বাসকে উদ্দীপিত কর্‌বার প্রয়োজন আছে।

আমাদের সম্মুখে রয়েছে বহু সমস্যা—নেই আর অভাবনীয় সম্পদের প্রাচুর্য্য। চতুর্দ্দিকে দৈন্যের আর অন্নের হাহাকার—লজ্জা নিবারণের উপযোগী বস্ত্র পরবার ক্রয়শক্তি পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষ হারিয়েছে, পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার পথে চল্‌তে পদে পদে

কণ্টকাবিদ্ধ হচ্ছি মুষ্টিমের সুবিধা ও সুযোগবাদী অর্থগৃধ্নু ব্যক্তির বহুধা বিস্তৃত অপকৌশলের প্রভাবে—এদের মধ্যে অধিকাংশই সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব করবার পেয়েছে সুযোগ, এরা হয়েছে প্রতিনিধি। এরা কোনদিন ভাব্‌লো না জনসাধারণের সুখ-দুঃখ আর অভাব অভিযোগের কথা, এরা কোন দিন রাখ্‌লো না জনসাধারণের মর্য্যাদা আর ইজ্জৎ।

যেখানে দেশ ও সমাজের প্রতিনিধি সামান্য তুচ্ছ লোভের জন্যে অর্থগৃধ্নুতার সুযোগ আহরণ করবার জন্যে সুযুক্তিকে বিসর্জ্জন দেয় আর নানাপ্রকার অতি স্থূল সমাজকল্যাণ-বিধ্বংসী পাপের আশ্রয়ে আত্মসর্ব্বস্ব-পরায়ণ হয়ে ভগ্ন কুটিরের ধূলিশয্যা থেকে বেরিয়ে এসে ঐশ্বর্য্যের আসনে বসে দুর্নীতির সাহায্যে, সেখানে জনসমাজের দৈনন্দিন সুস্থ জীবনযাত্রার পথ কণ্টকাকীর্ণ হোতে বাধ্য, আর তাই হয়েছে। জেনে রেখো, এরা দেশ ও সমাজের শত্রু।

আমাদের বিদায় গোধূলিতে জন্ম নিচ্ছে তোমাদের নবীন উষা। তোমরা রীতিমতভাবে সহস্র দুঃখ-কষ্ট বাধা-বিপত্তি ঠেলে দিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও আর আদর্শচরিত্র গঠন করো যাতে কোন প্রলোভনে তোমরা না আত্মবিক্রয় করে ফেলো। উন্মার্গগামী না হোয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে মানস আদর্শ ফুটিয়ে তোলো, আর দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করো। তোমরা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করছ আমাদের ভগ্নস্বাস্থ্য, আমাদের মুখে অভাব,দুঃখ, দৈন্য শতরকমের ব্যাধিও নিরানন্দের ছায়া গভীরভাবে রেখাপাত করছে।

সাধারণ বাঙালী বর্ত্তমানে হৃতসর্ব্বস্ব আর বাংলার গৌরব ধূলায় অবলুণ্ঠিত। বাঙালীর জীবনযাত্রার মান শোচনীয়। তোমরা খেতে পাও না পেট ভরে,—খাঁটি দুধ, ঘি, মাছ, শাকসব্জী যা বাঙালীর কোন দিন অভাব হয়নি তোমরা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছ। অনেকেই বিদ্যালয়ের বেতন ঠিকভাবে দিতে পারো না, সব বই কিনে পড়্‌তে পারো না—আর শিক্ষাপদ্ধতির জটিলতায় বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে সুস্থভাবে মস্তিষ্কচালনা করতে পারো না—এর চেয়ে গভীর দুঃখের বিষয় আর কি হোতে পারে!

হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা বিত্ত ও সম্পদের প্রতিষ্ঠা নিয়ে যারা অহংমত্ত-ভাবে জাতির ভাগ্য নিয়ে পাশা খেলছে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে ভেবে দেখো—তাদের জন্যে বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণসাধিত হচ্ছে না। বিলাতে ছেলেমেয়েরা বই খাতা পেন্সিল সঙ্গে ক'রে স্কুলে নিয়ে যায় না। এসবই স্কুল দেয়, এর জন্যে পয়সা দিতে হয় না, অবশ্য এসব বই খাতা বাড়ী নিয়ে আসতে পারে না কেউ। প্রত্যেকে ছোট ছোট বোতলে একপোয়া খাঁটি দুধ খেতে পায়, এরও দাম লাগে না। স্কুল থেকে খাওয়া দেয়, বাড়ী থেকে টিফিন এনে খাবার হুকুম নেই। কাউন্টি বা সরকারী স্কুলে এই সব ব্যবস্থা আছে। স্কুলে মাইনে লাগে না। যে সব স্কুলে মাইনে লাগে সেগুলোকে পাব্‌লিক স্কুল বলে। এই তো গেল প্রাথমিকভাবে খাদ্য ও শিক্ষার ব্যাপার, তারপরে আসছে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতার কথা।

স্কুলে ভর্ত্তি হ'বার পর ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা করে স্কুলের ডাক্তার; যদি কোন অসুখ দেখে অন্য বড় ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। দাঁত দেখার জন্যে একজন দন্ত চিকিৎসক থাকে। এসবের জন্যে পয়সা দিতে হয় না, এমন কি ছেলেমেয়েদের চশমা দরকার হোলে বিনা পয়সায় চশমা দেওয়া হয়। আর তোমরা?—সাধারণতঃ হাসপাতালের আউট ডোর বা ইনডোরে ভালো ব্যবহার পাও না—তোমাদের মা বোনেরাও পর্যন্ত পান না। এ দেশে পয়সা ফেল্‌লে বাঘের চোখ মেলে এমনই অর্থপিশাচ দেশ!

ভেবে দেখো একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী যারা সাম্রাজ্য হারিয়ে বসেছে, বারে বারে যুদ্ধে হয়েছে বিধ্বস্ত, যাদের মাসের বেশীর ভাগ দিনের আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করতে হয় দেশের বাইরে থেকে, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণের জন্যে বিদ্যালয়ে কি সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছে! —আর সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশের শিশুরা কি অবস্থায় আছে, ভাব্‌লে ও চোখে জল আসে!

ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার মনোভাব নেই বল্‌লেই চলে। তা না হোলে বিভিন্ন দেশের লোক এখানে স্বচ্ছন্দে বাস করে ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরি প্রভৃতি নিয়ে অন্ন সংস্থান করতে পারতো না। ব্যবসা ও খরিদ বিক্রয় সম্বন্ধে বাঙালী উদার; তার মধ্যে নেই কোন প্রাদেশিক মনোভাব। অন্য প্রদেশে বাঙ্গালী যে ব্যবহার পাচ্ছে, তা খুব সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাব প্রণোদিত নয়, তার পশ্চাতে যে মনস্তত্ত্ব আছে, সেটি তোমরা অনুসন্ধান করো—আজ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সাধারণ বাঙ্গালী জীবন ভারতের সর্ব্বক্ষেত্র থেকে হটে আসছে, ঘরেও পাচ্ছে না স্থান।

এ সমস্যার সমাধান করতে হবে তোমাদের, যারা বাংলা মায়ের স্নেহের দুলাল, যারা বাংলার আশা ভরসাস্থল। তোমরা প্রত্যেকে মন দিয়ে ইতিহাস পড়্‌বে—ইতিহাস থেকে সঞ্চয় করো তোমাদের শক্তি যাতে তোমরা এই হতভাগ্য দেশকে ভেঙ্গে চুরে ভবিষ্যতে সুন্দরভাবে গড়্‌তে পারো। তোমাদের সম্মুখে নেতাজীর আদর্শ, বিবেকানন্দের বাণী, পরমহংসদেবের কথামৃত, গীতার মন্ত্র, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বিদগ্ধতা, দেশবন্ধুর ত্যাগ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা, আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীলের সারস্বত সাধনা, প্রমথনাথ বসুর খনি আবিষ্কারের পন্থা, রাজা রামমোহনের চিন্তানায়কতা, স্যার আশুতোষের মনীষা ও জাতীয়তা, শ্যামাপ্রসাদের দেশাত্মবোধের চেতনা আর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাব-প্রবাহ তোমাদের মধ্যে জেগে উঠুক—যাতে করে তোমরা জাতির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণে সেগুলিকে নিয়োজিত করতে পারো।

তোমরা যদি মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠ তাহোলে কোন বাধা বিপত্তিই দেশকে সমুন্নত করবার পক্ষে অন্তরায় হবে না। আমাদের অসাধুতার ক্ষেত্রে তোমরা সাধু হও, আদর্শ মানুষ হও, উন্নতচরিত্র নিয়ে মাতৃভূমির গৌরব সাধন কর। তোমরা জাতির অগ্রনায়ক হও।

কবি সুনির্ম্মল !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আজ তুমি চলে গেলে, অকালে ঝরিয়া গেল আয়ুপত্র তব,
ফাল্গুনের কিশলয় পুষ্পবীথি ব্যথাতুর ! ছন্দে নব নব—
সাজায়েছ দিনে দিনে বঙ্গভারতীরে কবি ! ধ্যান মৌন হয়ে ;
বাণীর উৎসবে কত গেয়ে গেছ গান হৃদয়ের তন্ত্রী লয়ে
বর্ষে বর্ষে। বর্ণে বর্ণে এঁকে গেছ শিশুচিত্তে আলেখ্য সুন্দর,
উৎসারিত করে গেছ পাষাণের বক্ষ হ'তে আনন্দ নির্ঝর।
স্বদেশের ভাবী জনকের তরে তুমি ছিলে ভাব-জন্ম-দাতা,
তোমার বিহনে বন্ধু! কিশোর জগতে জাগে শোক দুঃখগাথা।

দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কবি ! সহস্র বেদনা হোতে পেলে পরিত্রাণ,
তোমার নয়ন পথে ধরিত্রীর রাত্রি দিন হোলো অবসান।
সংসারের দুঃখ সুখ আলোছায়া সমাচ্ছন্ন সর্ব্ব আবরণ
ছিন্ন করি চলিয়াছ নিরুদ্দেশে অমৃতের পরি' আভরণ।
আজ হোতে পৃথিবীর ঋতুদের আবর্ত্তনে পাব কি তোমারে ?
মোরা শুধু রহিলাম তোমার আসন বন্ধু! চিত্তে পাতিবারে।

সৌজন্যে শ্রদ্ধায় নিত্য মোদের করেছ ধন্য প্রীতি আলাপনে,
অন্তরের পরিচয় দিয়ে গেলে মোরে বন্ধু-মিলনের ক্ষণে ;
কত দিন কত বর্ষ চলে যাবে, স্মৃতি তব র'বে সমুজ্জ্বল,
গগনের তারাসম। জন্মমৃত্তিকার কোলে কবি সুনির্ম্মল !
রহিবে অম্লান অনাগত পূজারীর অর্চ্চনার অর্ঘ্য তরে,
মোর ভগ্ন বাতায়নে দিও দেখা কবিবর ! যদি মনে পড়ে !
কিশোর কিশোরী আর শিশুদের করে গেলে চিরঅসহায়,
অশ্রুবাদলের মেঘে মেঘে তোমারে দিলাম প্রদোষে বিদায়।

হরণ করেছে কাল মর্ত্ত্যকায়া তব, কালেরে হরিয়া কবি !
মহাকাল মন্দিরের স্থাপন করেছ বেদী রূপান্তর লভি।
চিন্ময় বন্ধনে চির বাঁধিলে যে মৃত্যুঞ্জয়ে,—আজ তুমি শিব,
বহ্নিতেজে অনির্ব্বাণ মায়াতীত যাত্রাপথে জ্বলে তব দীপ।
বসন্তের জাগরণে তুমি কি দিবে না সাড়া দক্ষিণা সমীরে,
শিশুরা তোমারে ডাকে, কিশোর-কিশোরী কাঁদে
সংসারের তীরে।

—

হরধনুভঙ্গ

শ্রীযামিনীমোহন কর

(স্ত্রী চরিত্র বর্জ্জিত শিশুদের অভিনয়োপযোগী নাটিকা)

চরিত্র

রাবণ	ব্রহ্মা
তিনজন মুনি বালক	মুনিগণ
রাক্ষসগণ	নারদ
নারায়ণ	বাল্মিকী
দশরথ	বশিষ্ঠ
প্রতিহারী	বিশ্বামিত্র
রাম	লক্ষ্মণ
ভরত	শত্রুঘ্ন
জনক	মন্ত্রী
প্রতিহারী	পরশুরাম
পাত্র অমাত্যগণ	

প্রস্তাবনা

মালকোশ—একতালা

যার মন মাঝে রামের আসন,
কি হবে তাহার সাধন ভজন।
সদা সাধু সঙ্গ করে যেই জন,
তীরথের নীরে কিবা প্রয়োজন॥
সব জীবে দয়া হৃদয়ে যাহার,
দান সাগরেতে কি কাজ তাহার।
রামরূপ যার ধেয়ান ধারণ,
রাম নিজে তার সাথী অনুগণ॥

ক্রোঞ্চাঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গোকর্ণাশ্রম

তপস্যারত রাবণ

রাবণ। ওঁ কারঃ পরমং ব্রহ্ম ওঁ কারঃ পরমং তপঃ
ওঁ কারঃ পরমং জ্ঞানং ওঁ কারঃ পরমং পদম্॥

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। হে রাবণ! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।

রাবণ। (প্রণাম করে) ভগবন্! মৃত্যুর সমান আর শত্রু নেই। অতএব আমি অমরত্ব বর প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মা। সকলের অমরত্ব নেই, সুতরাং এ বর দিতে আমি অক্ষম। অন্য বর চাও।

রাবণ। হে লোকপতে! আমি যেন যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং দেবগণের অবধ্য হই। মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণকে আমি গ্রাহ্য করি না।

ব্রহ্মা। তথাস্তু। হে রাক্ষস পুঙ্গব! তোমাকে আমি আরও এক দুর্লভ বর প্রদান করছি। তুমি মনে মনে যে রূপ ধারণ করতে অভিলাষ করবে, তখনই সেই রূপ প্রাপ্ত হবে। আর তোমার তপস্যার স্মৃতি স্বরূপ এই গোকর্ণাশ্রম পুণ্য তীর্থরূপে গণ্য হবে।

রাবণ। আমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের বর লাভের কথা চিন্তা করবেন প্রভু।

ব্রহ্মা আমি তাদেরও ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করব।

রাবণ। (প্রণাম করে) হে বিশ্বস্রষ্টা, অধীনের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ব্রহ্মা। মঙ্গল হোক।

ব্রহ্মার প্রস্থান

রাবণ। (অট্টহাস্য) হা, হা, হা—হে অগ্রজ কুবের, তুমিই আমার প্রথম লক্ষ্য হবে। তারপর এই ঘৃণিত রাক্ষস ত্রিভুবন পদানত করে অনার্যের প্রতি আর্যের অপমানের প্রতিশোধ নেবে। হা হা হা—

অট্টহাস্য করতে করতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনভূমি

ছুটতে ছুটতে মুনিগণ ও মুনি বালকদের প্রবেশ। পিছনে রাক্ষসগণ

প্রথম মুনি। কে আছ রক্ষা কর—

দ্বিতীয় মুনি। রাক্ষসেরা যজ্ঞ পণ্ড করে দিচ্ছে—

তৃতীয় মুনি। বালিকাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

চতুর্থ মুনি। বাধাদানকারীদের নৃশংস ভাবে হত্যা করছে—

রাক্ষসগণ। হা হা হা (অট্টহাস্য)

প্রথম মুনি। হে বিপদ ভঞ্জন, কোথায় তুমি—

দ্বিতীয় মুনি। হে আর্ত্তপালক, রক্ষা কর—

তৃতীয় মুনি। হে ভগবান্, অবতীর্ণ হও—

রাক্ষসগণ। হা হা হা—তোদের ভগবান আমাদের রাজা ত্রিভুবনজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণের কাছে বাঁধা। হা হা হা —

নেপথ্যে মুনিগণের বিলাপধ্বনি ও বালিকাদের ক্রন্দন

পটপরিবর্ত্তন

স্বর্গ

ব্রহ্মা ও নারদ

ব্রহ্মা। এ ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না। রক্ষকুল-পতি রাবণের অত্যাচার ক্রমেই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

নারদ। তুমি আর কথা কোয়ো না বুড়ো। তোমার জন্যই তো এই অবস্থা। তুমিই তো রাবণকে বর দিয়ে ত্রিভুবনজয়ী করেছ।

ব্রহ্মা। [illegible] কি নারদ? আমি যে ভক্তের অধীন।

নারদ। তারা ও তো তোমার অধীন।

ব্রহ্মা। সব সময় নয়। বরলাভের পূর্বে তারা অধীন, কারণ প্রার্থী; কিন্তু বরলাভের পরে তারা স্বাধীন, কারণ সিদ্ধকাম।

নারদ। তবে তো বিলক্ষণ ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছ। এখন সামলাও।

ব্রহ্মা। সামলাতে পারছি না বলেই তো নারায়ণের শরণাপন্ন হয়েছি।

নারদ। তা বেশ করেছ। তিনিও গোলের গুরু। ভক্তদের বড় ভালবাসেন। তবে সে ভালবাসা বোঝা দায়। হয়ত' সমস্ত জীবন কাঁদিয়েই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু শেষ সামলাতে জানেন। তোমার মত হাঙ্গামা বাধিয়ে হাত পা এলিয়ে বসে থাকেন না।

ব্রহ্মা। তাই তো তাঁর কাছে আসা। যদি কোন উপায় বলে দেন।

নারদ। তা বাতলে দিতে পারেন। কিন্তু আমার

মনে হয় তিনি কানে কম শোনেন। আর সব সময়ই তো ঘুমিয়ে কাটান। তাঁকে জাগাতে হবে, শোনাতে হবে। আকুল হয়ে না ডাকলে তিনি জাগেনও না, শোনেনও না।

ব্রহ্মা। তুমি ডাক। তোমার ডাকে তিনি জাগতে পারেন।

নারদ। শুধু আমি কেন, সবাইকে ডাকতে হবে। আর্ত্তের ব্যাকুল ক্রন্দনে তিনি সাড়া দেবেন।

গান

ইমন—একতালা

দীননাথ দুখ ভঞ্জন, ভক্তবৎসল জগত বন্ধো।
জগজ্জীবন জগৎ নাথ, কাটো দুঃখ ভাতি দ্বন্দ্ব॥
আকুলিত হয়ে ডাকে ধরাবাসী,
দাওগো অভয় তুমি নিজে আসি,
বিপদ বারণ হে মধুসূদন, দেখা দাও প্রভু মোরা যে অন্ধ॥

নারায়ণের আবির্ভাব

নারায়ণ। নাহি ভয়, মনস্কাম পূর্ণ হবে তব।

ব্রহ্মা। প্রভু, আমার বরে রাবণ অজেয়। কেবল নর বানরের হাতে তার মৃত্যু সম্ভব।

নারায়ণ। উত্তম।

দশরথ গৃহে আমি লইব জনম।
বানরীর গর্ভে জন্ম লহ দেবগণ॥
আমি নর হই, হও তোমরা বানর।
রাবণে মারিতে সবে হইও দোসর॥

তৃতীয় দৃশ্য

বাল্মিকীর আশ্রম

ধ্যানরত বাল্মিকী আসীন। একটা বাণবিদ্ধ পক্ষী তাঁর ক্রোড়ে এসে পড়ল। চমকে উঠে দূরে ব্যাধকে দেখে তিরস্কার করলেন—

বাল্মিকী। "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কামমোহিতং॥"

(বিস্মিত ভাবে) এ কি! মূর্খ বাল্মিকীর মুখে এ বাণী কে বলালে?

ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ

নারদ। যেই বলাক না কেন, বেশ তো বলেছ। সুন্দর শ্লোক, অপূর্ব্ব ছন্দ।

ব্রহ্মা। হে মুনিপ্রবর! তব কণ্ঠে সরস্বতী অধিষ্ঠিতা। তাঁরই প্রভাবে তুমি লিখবে রামের জীবনচরিত—রামায়ণ।

বাল্মিকী। রাম? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নারদ। ভুভার হরণার্থ প্রভু স্বয়ং ধরাধামে আবির্ভূত হবেন, চারি অংশে। আর শ্রীমতী আসবেন সীতা রূপে। তাঁদের কাহিনী তুমি লিখবে তোমার নবাবিষ্কৃত অপরূপ ছন্দে।

বাল্মিকী। কিন্তু তাঁদের কথা আমি জানব কি করে?

ব্রহ্মা। আমার বরে তোমার মনের মধ্যে। তুমি আজ থেকে দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হবে।

বিরাম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ

দশরথ ও বশিষ্ঠ

দশরথ। গুরুদেব! শ্রীভগবানের কৃপায় আমি আজ ধন্য। অপুত্রক দশরথ আজ চারি পুত্রের জনক। আপনি তাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

বশিষ্ঠ। রাজন্! আমি তাদের কি আশীর্ব্বাদ করব! শোনো মহারাজ, আমি তোমার কাছে এক গূঢ়রহস্য প্রকাশ করছি। আমি ধ্যানে জেনেছি যে, স্বয়ং নারায়ণ ভুভার হরণ এবং রাবণ নিধনের জন্য তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। হে রাজন্! তুমি ধন্য! তোমার এই চারি পুত্রের নামকরণের আদেশও আমি ধ্যানে পেয়েছি। রাজমহিষী কৌশল্যার পুত্রের নাম হবে রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত, আর সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। মহারাজ আজ বড় আনন্দের দিন।

দশরথ। হে ঋষিপ্রবর! আমি বিস্মিত হচ্ছি, আমার এই অপার সৌভাগ্যে। আনন্দ, মহানন্দ!

পটপরিবর্ত্তন

দেবগণের গীত

পিলু—ত্রিতাল

আজি, আনন্দে মগন হ'ল যে ত্রিভুবন
ভুভার হরণ তরে এসেছেন নারায়ণ॥

নব জলধর শ্যাম, কিবা অপরূপ,
নয়নাভিরাম, ঐ শ্যাম রূপ,
চারি অংশে প্রকাশিত হয়েছেন ভগবন্।
রামের জনম শুনি, নাচে সকল মুনি,
নাচিছে দেব দেবী, বাজিছে কিঙ্কিনী,
এসেছেন প্রভু এবে, বধিবারে দশানন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম

মুনি বালকগণ কথা কইছে

১ম। যা বললুম, শুনলি তো ?

২য়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। শুনলুম বই কি। (৩য়কে) কি বল্? সব বুঝেছিস্ তো ?

৩য়। সে আর বলতে। সব বুঝতে পেরেছি। একেবারে জলের মত পরিষ্কার।

১ম। বেশ, কি বুঝলি বল্ তো ?

২য়। এই যাঃ, এতক্ষণ বেশ বুঝতে পারছিলুম—

৩য়। ঠিকই তো। বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু এইবার যেন সব কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। (২য়কে) আচ্ছা, আমরা কি বুঝেছিলুম, বল্ তো ?

১ম। ছাই বুঝেছিলি।

২য়। এইবার ঠিক হয়েছে। ছাই বুঝেছিলুম।

৩য়। বটেই তো। ছাই, অঙ্গার আর ভস্ম।

১ম। আঃ, তোদের নিয়ে মুস্কিলে পড়া গেল। গুরুদেব যে বললে—

২য়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বললেন বই কি।

৩য়। নিশ্চয়ই বললেন। আমরা নিজের কানে শুনলুম। (২য়কে) আচ্ছা, কি বল্লেন বল্ তো ?

১ম। এই জন্যই গুরুদেব তোদের অপদার্থ বলেন।

২য়! (খুসী হয়ে) হা, হা, বলবেন বই কি। (তার পর মানে বুঝতে পেরে) অ্যাঁ, এই কথা বলেন নাকি ?

৩য়। আদর করে বলেন, কি বল্।

১ম। না, তোরা বোকা বলে রাগ করে বলেন। তিনি বললেন যে, তিনি ধ্যানে জানতে পেরেছেন—

২য় ও ৩য়। (একত্রে)—যে আমরা বোকা, অপদার্থ।

১ম। আরে না, না। তিনি ধ্যানে জেনেছেন যে স্বয়ং নারায়ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবার জন্তে।

২য়। কোথায় ?

৩য়। কবে ?

১ম। নরশ্রেষ্ঠ দশরথ রাজার গৃহে। কাল রাতে। মধু চৈত্র মাসে। শুক্লা নবমীতে।

২য়। তা হলে আর ভয় নেই, বলছিস্ ?

৩য়। মানে ঐসব বিরাটাকার রাক্ষসগুলো আর আসবে না ?

১ম। এ কথা তো কিছু বলেন নি। শুধু বলেছেন যে, এইবার রাক্ষসদের অত্যাচার বন্ধ হবে।

২য়। কে বন্ধ করবে ?

১ম। নাঃ, তোদের ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। শুনছিস্ নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেছেন—

৩য়। তা তো শুনছি। কিন্তু এই তো কাল জন্মালেন। তারপর বড় হবেন, হাঁটতে শিখবেন, ধনুর্বাণ চালাতে শিখবেন—

২য়। ওরে বাবাঃ! সে যে অনেকদিন!

৩য়। গায়ে জোর হবে, যুদ্ধ করবার মত শক্তি হবে, তবে তো।

১ম। তাই তো। এ যে অনেক দিনের ব্যাপার। এ কথা তো আমার মাথায় ঢোকেনি—

২য়। তবেই দ্যাখ্, তুই ও বোকা কিনা ?

৩য়। মানে, আমরা সবাই অপদার্থ। তাহলে এখন কি হবে ?

১ম! চল্, গুরুদেবকেই জিজ্ঞেস করা যাক—

২য় ৩য়। (একত্রে) সেই ভাল। চল, দেখি তিনি কি বলেন—

(ক্রমশঃ)

ছোটদের ম্যাজিক

যাদুকর রতনকুমার দাস

আমার ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুরা, আজ তোমাদের একটী খুব সহজ ম্যাজিকের খেলা শিখিয়ে দেবো। তবে আমি যে সব খেলা তোমাদের শেখাবো, সেই সব খেলায় কোন বড় বড় জিনিষের প্রয়োজন হবেনা। আর সহজেই

আয়ত্তে আনতে পারবে। আজ যে খেলাটি তোমাদের শেখাবো সেটি দিব্যদৃষ্টির খেলা। চোখ বেঁধে যে সব খেলা করা হয় সেই সব খেলা যাদুকরের কাছে একেবারেই সহজ। কিন্তু দর্শকের সামনে এক মহা সমস্যা হোয়ে দাঁড়ায়। থাক, আজ অনেক কথাই তোমাদের বলা হোল, এবার আসল কথায় আসা যাক, কি বল ?

এই খেলাটিতে যাদুকর পাঁচ রংয়ের পাঁচখানা কার্ড (৪" × ৬") দর্শকদের পরীক্ষা কোরতে দেন। পরীক্ষা হোয়ে গেলে একখানা রুমাল দর্শকদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আর একজন দর্শককে দিয়ে নিজের (যাদুকরের) চোখ ভালো ভাবে বাঁধিয়ে নিয়ে পরীক্ষা-করা কার্ডগুলোকে একটা ব্যাগে (থলে) ফেলে দিয়ে একজন দর্শকের হাতে ব্যাগটা ধরতে দিয়ে বলেন, "দর্শকগণ, আপনারা আমার এই কার্ডগুলোকে পরীক্ষা কোরে দেখেছেন—সে কার্ডগুলোতে কোনো রকম চালাকী করা নেই। কিন্তু কোনো রকম চালাকী করা না থাকলেও আপনারা আমায় যে রংয়ের কার্ড বের কোরতে বোলবেন, আমি চোখ বাঁধা অবস্থায় আমার ভৌতিক মন্ত্রের সাহায্যে সেই রংয়ের কার্ড বের কোরে দেবো"। দর্শকেরা যাদুকরের কথা শুনে তো একেবারেই 'থ'। লোকটা পাগল নাকি' আমরা কার্ডগুলোকে একেবারে নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা কোরে দিলাম। আচ্ছা দেখাই যাক না লোকটা সত্যি কথা বলছে কি মিথ্যে কথা বলছে। দর্শকেরা তখন যাদুকরকে লাল রংয়ের কার্ড বের কোরতে বললেন, যাদুকর দর্শকের নির্দ্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগে হাত দিয়ে বের কোরে দিলেন লাল রংয়ের কার্ড। এই ভাবে যতবারেই যে রংয়ের কার্ড যাদুকরকে দর্শকেরা বের কোরতে বলছেন, যাদুকর তা নিমেষের মধ্যে ব্যাগে হাত দিয়ে বের কোরে দিচ্ছেন।

এই খেলাটি অনেকে অনেক ভাবে দেখান। আর অনেক রকম কৌশলও আছে। তবে সেই সব কৌশলের চেয়ে আমার এই কৌশলটি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। আমার আসল কৌশল করা থাকে এ রং করা কার্ডগুলোতে। কার্ডগুলোকে প্রথমে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত কোরে নিতে হবে। আগে শোন—কি ভাবে কার্ডগুলো তৈরী করবে। পাঁচটা পাঁচ রংয়ের কার্ড নীল, লাল, হলদে, সবুজ ও সাদা, এক সাইজের তৈরী কর। এখন ঐ কার্ডগুলো যে চারটি কোণ আছে, ঐ কোণ চারটিকে এক, দুই, তিন, ও চার নম্বর দাও (কার্ডে কিন্তু লিখবে না মনে মনে ঠিক কোরবে)। এবার নীল কার্ডটির এক নম্বর কোণ, লাল কার্ডটির এক ও দুই নম্বর কোণ, হলদে কার্ডটির এক, দুই, তিন ও চার নম্বর কোণ, সাদা কার্ডটির এক, ও তিন নম্বর কোণ খুব সামান্য গোল কোরে দাও। তবে এমন ভাবে গোল কোরবে যাতে দর্শকেরা টের না পান। তাহলে কার্ড তৈরী করা হোল কেমন ? এবার শোন কি ভাবে দেখাবে। কার্ডগুলো যখন দর্শকদের কাছে পরীক্ষা কোরতে দেবে তখন কার্ডগুলো একজনের হাতে একটার বেশী দুটো যাতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। যদি একজনের হাতে একটার বেশী দুটো পড়ে তবে হয়ত মূল কৌশল ধরা পড়তে পারে। তোমায় দর্শকেরা যে কোন রংয়েরই কার্ড বের করতে বলুন না কেন, তুমি শুধু একবার চিন্তা কোরে দেখে নেবে যে দর্শকেরা যে রংটি বোলেছেন, সেই রংয়ের কার্ডটির কয়দিক গোল করা আছে। তারপর একেবারে সহজ।

নিশির ডাক

শ্রীহরিপদ গুহ

ভূত আছে কি নেই জানি না। কেউ বলেন—আছে, কেউ বলেন নেই। ওসব তর্কের কথা ছেড়ে দিয়ে আমার জীবনে একবার যে অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলুম তাই বলি শোনো :

অনেক দিনের পুরাণো কথা। মনের কোণে কিন্তু এখনো চির নূতন হয়েই আছে। বাড়ীর কড়া শাসনে আমি কখনো বাইরে ছেলেদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাইনি। দুপুরবেলা যখন অন্যান্য ছেলেরা বাইরে ছুটোপুটি করে বেড়াত, আমি তখন তেতালার ছাদের পাশের ঘরটিতে মার কোলের কাছে শুয়ে ছট্‌ফট্ করে কাটাতুম। আমার মন কিন্তু তখন পড়ে থাকতো বাইরে ছেলেদের গোলমালের মধ্যে।

কোনদিন মা 'পক্ষীরাজ ঘোড়া' 'তালপাতার খাঁড়া' 'তেপান্তরের মাঠ', 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী' প্রভৃতির গল্প বল্‌তেন, কোনদিন বা নানারকম ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতেন। দুপুরবেলা যখন চারদিক রৌদ্রে খাঁ খাঁ করত—অদূরে আশে-পাশের বাড়ীর ছাদে মেয়েরা কাপড় বা আচার প্রভৃতি শুকুতে দিতে আস্‌ত, তখন মা জান্‌লা দিয়ে তাদের দেখিয়ে বিকট মুখভঙ্গী করে বল্‌তেন—

ঠিক্ দুপুর বেলা,
ভূতে মারে ঢেলা,
ভূতের নাম রসি,
হাঁটু গেড়ে বসি।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাঁটু পেতে বস্‌তুম। তারপর জড়সড় হয়ে মাকে আঁক্‌ড়ে ধরে ভয়ে একেবারে ঘেমে উঠতুম। কিছুক্ষণ পরে গভীর ঘুমে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তুম।

এম্‌নি করেই ভূতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আর সেই যে বুকের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে, আজো তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাইনি। এখনও একা ঘরে শুতে ভয় পাই। আমার এ স্বীকারোক্তি শুনে তোমরা হয় তো মনে মনে হাস্‌ছ! সে সব কথা মনে হলে, মাঝে মাঝে এখন হাসিও পায়। দুটো বেড়ালে যখন ঝগড়া করতো, রাত্রে তাদের সেই বিশ্রী শব্দ শুনে ভূতের ভয়ে একেবারে আঁত্‌কে উঠতুম।

এই কল্পিত ভূতের আবিষ্কার করে মা হয়ত মনে মনে খুসী হয়েছিলেন—ছেলেকে ঘুম পাড়াবার এমন অমোঘ ওষুধ আবিষ্কার করে। আর তার জের আমি এখনো টেনে চলেছি।

রায়বাবুদের ছোট ছেলে হিরণ ছিল আমার সমবয়সী। জানি না কেন—আমাদের দু'জনের মধ্যে খুব গভীর ভালবাসা হয়েছিল। পাশাপাশিই দু' জনের বাড়ী। যখনই একটু সুযোগ পেতুম, তখনই আমি ওদের বাড়ী যেতুম; কখনো বা হিরণ আমাদের বাড়ী আস্‌ত!

সেটা কি মাস ঠিক মনে নেই, বোধ হয় কার্ত্তিক মাসের শেষ কিম্বা অগ্রহায়ণের প্রথম হবে। হঠাৎ একদিন হিরণের বাবা যোগেনবাবুর খুব অসুখ হলো, রোগ দিন দিনই বেড়ে যেতে লাগল। কিছুতেই কিছু হলো না। ডাক্তারেরা সব তো একে একে হাল ছাড়লেন। মা, মাসিমা খবর পেয়ে রোজ তাঁকে একবার করে দেখে আস্‌তে লাগলেন। আমি ছেলেমানুষ বলে তাঁরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিতেন না। বাড়ীতে এসে তাঁরা যোগেনবাবুকে নিয়েই আলোচনা কর্‌তেন—তাঁর জন্য দুঃখও কর্‌তেন।

মা আমাকে হিরণদের বাড়ী যেতে মানা করে দিয়েছিলেন; ভয়ে আমি আর তাঁদের বাড়ী যেতুম না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঠায় একদৃষ্টে তাঁদের বাড়ীর দিকে চেয়ে থাক্‌তুম—কিন্তু হিরণকে আর দেখতে পেতুম না। তার জন্যে আমার মনটা কি জানি কেমন কর্‌ত!

সেদিন হিরণকে দেখতে পেয়েই হাতছানি দিয়ে তাকে ডাক্‌লুম। সে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এসে জলভরা ছলছল চোখে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি তার হাত ধরে কাছে এনে প্রশ্ন কর্‌লুম—হ্যাঁ ভাই হিরণ, তুমি আর আমাদের বাড়ী আসো না কেন?

সে কাঁদ কাঁদ হয়ে জবাব দিলে—বাবার যে বড্ড অসুখ। হ্যাঁ ভাই, বাবা মরে গেলে কে আমাকে আদর কর্‌বে?

তার দুঃখে আমার অন্তর ছাপিয়ে কান্না এলো। কোন জবাবই তখন খুঁজে পেলুম না। পরে ধীরে ধীরে তাকে বল্‌লুম—ভাই, ভগবানকে ডাকো, তিনিই রক্ষা কর্‌বেন।

সেদিন ছোটমামা আমাকে কতকগুলি লজেন্স দিয়েছিলেন; তার কয়েকটা তখনো আমার পকেটে ছিল; তার হাতে তুলে দিয়ে বল্‌লুম—খা না ভাই।

সে নিলে না, ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—বাবা ভাল হলে নেবো, এখন খাবো না ভাই। তারপর সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে গেল।

আমি কাতর দৃষ্টিতে তার চলার পথের দিকে চেয়ে রইলুম।

সেদিন শনিবার।

সকাল থেকেই যোগেনবাবুর অবস্থা খুব খারাপ। সকলেই সশঙ্কিত চিত্তে সময় গুণতে লাগলেন। কি জানি, কখন কি হয়।

দুপুরের দিকে হিরণের ছোট কাকা যতীনবাবু কোথা থেকে একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে ধরে নিয়ে এলেন।

লাল রঙের কাপড় পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, শাদা দাড়ি, বড় বড় চোখ, কপালে সিদুঁরের ফোঁটা। দেখ্‌লেই তাঁকে ভক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করে। লাল টক্‌টকে চোখ, চোখের দিকে চাইলেই আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে। তিনি ভাল করে যোগেনবাবুকে দেখে গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—যদি দিনটা ভালয় ভালয় কেটে যায়, তবে নিশ্চয়ই এঁকে রোগমুক্ত কর্‌তে পার্‌বো!

বিকেলের দিকে পাড়াময় রটে গেল—সন্ন্যাসী একজন মহাগুণী তান্ত্রিক। তিনি ভূতসিদ্ধ এবং অনেক তুক্‌তাক জানেন। আজ নিশীথে তিনি নাকি যোগেনবাবুর প্রাণ সঞ্চার করবেন!

পাড়ার ক'টি ছেলে আমাদের রোয়াকে বসে গান কর্‌ছিল। আমি আমার জামার পকেটে হাত ভরে মন দিয়ে তাদের কথা শুন্‌ছিলুম।

মণ্টু বল্‌লে—খুব সাবধান! আজ রাত্রে যদি কেউ তোমাদের নাম ধরে ডাকে, খবরদার কক্‌খনো তাতে সাড়া দিবি না! নিশি ভূতের কাণ্ড, চালাকি নয় বাবা হুঁ!

নন্তু বল্‌লে—বাজে কথা, সাড়া দিলে ঘোড়ার ডিম্‌ হবে; আমি অত ভূতকে ভয় করি না। জানিস্‌ তো—

'ভূত আমার পুত,
শাঁকচুন্নী আমার ঝি,
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে
কর্‌বে আমার কি?'

মণ্টু রেগে গেল। বল্‌লে—যাও না, সাড়া দিয়ে একবার মজাটা টের পাও গিয়ে। দিদিমা আমাদের কত করে বারণ কর্‌লে! বল্‌লে—সন্ন্যাসী একটা ডাবের মুখ কেটে, সেই জলে মন্ত্র পড়ে, সেটা হাতে নিয়ে—দরজায় দরজায় ঘুরে নাম করে ডাক্‌তে থাকে, যেই কেউ সাড়া দেয়—অম্‌নি ডাবের সেই কাটা মুখটা বসিয়ে জোড়া দিয়ে দেয়। সে তক্ষুণি মরে যায়, আর যার জন্য করে, সে রোগ-মুক্ত হয়ে ওঠে!

দুলাল বল্‌লে—হ্যাঁ আমিও এ কথা শুনেছি। এ সব ভূতের কাণ্ড, ওরা লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে!

এই সব কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা তখন দুর দুর করে কেঁপে উঠল, মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

নন্তু আর কোন প্রতিবাদ কর্‌তে সাহস কর্‌লে না।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া আমাদের সেদিন খুব শীগ্‌গিরই হয়ে গেল। মা সকলকে সাবধান করে দিলেন—এক ডাকে যেন কেউ সাড়া না দেয়।

থমথমে রাত্রি, কোন সাড়াশব্দ নেই। সমস্ত পাড়াটাই একেবারে নিঃঝুম। মধ্যে মধ্যে শুধু হিরণদের বাড়ী থেকে শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

আমার ঘুম আসছিল না। ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা কেমন কর্‌ছিল। মাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে চুপটি করে পড়ে রইলুম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, বোধ হয় রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কান্না শোনা গেল।

মা মাসিমাকে ডেকে বল্‌লেন—দিদি, শুনছ? বুঝি যোগেনবাবুর হয়ে গেল!

মাসিমা বল্‌লেন—খুব সম্ভব।

সকালবেলা গয়লা বউ দুধ দিতে এসে বল্‌লে—হ্যাঁ গা, শুনেছ? নন্দ ঘোষের জলজ্যান্ত ছেলেটা মরে গেল। কি হয়েছিল—কে জানে। দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা ছেলে—তাও রইল' না গা!

এদিকে যোগেনবাবু দিন দিন ভালোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। সকলেই বল্‌তে লাগ্‌লে—এ সন্ন্যাসীর ভূতুড়ে কাণ্ড! নইলে একটা সুস্থ সবল ছেলে হঠাৎ মরে যায়, আর একটা মুমূর্ষু বেঁচে ওঠে কখনো? আমরা তখনই বলেছিলুম—খুব সাবধান—'নিশির ডাক।' কখন কাকে ডাকে কিছুই বলা যায় না।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

গত জানুয়ারী মাসে জাতি-সঙ্ঘের নিরপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার জের আপাততঃ মিটিয়াছে। জানুয়ারী মাসের প্রস্তাবে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে নীতি ঘোষিত হইয়াছিল; সেই নীতি অনুসারে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব লইয়া আলোচনা চলে ফেব্রুয়ারী মাসে। এই সম্পর্কে উত্থাপিত প্রথম প্রস্তাবে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল; রুশিয়ার "ভিটোয়" সে প্রস্তাব বাতিল হয়। অবশেষে, কতকটা আপোষমূলক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

জাতি-সঙ্ঘে কাশ্মীর—

ফেব্রুয়ারী মাসে নিরাপত্তা পরিষদে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কাশ্মীর সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘে গৃহীত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটি বিবেচনা করিবার জন্য সুইডেনের প্রতিনিধি মিঃ গানার জারিং ভারতীয় উপ-মহাদেশে গমন করিবেন এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। প্রস্তাবটি দৃশ্যতঃ নির্দ্দোষ; কিন্তু, জাতি-সঙ্ঘের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবগুলির উল্লেখ করিয়া মিঃ জারিংএর স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে; কাশ্মীরের ভারতভুক্তি যে আইনানুসারে সিদ্ধ এবং পাকিস্থান কাশ্মীরে আক্রমণকারী—এই দুইটি সুস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য জাতি-সঙ্ঘে গৃহীত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু সমস্যাটি বিবেচনা করিবার নির্দ্দেশ মিঃ জারিংকে দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই প্রস্তাবটি গৃহীত হইবামাত্র জাতি-সঙ্ঘের ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডলের নেতা মিঃ কৃষ্ণমেনন বলেন—যে সব প্রস্তাব ভারত মানিয়া লইয়াছে, কেবল সেই সব প্রস্তাব সম্পর্কেই তাহার বাধ্যবাধকতা থাকিবে। ইহার পূর্ব্বে কাশ্মীর সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটি সোভিয়েট রুশিয়ার "ভিটোয়" বাতিল হয়, তাহাতেও জারিং মিশন্ প্রেরণের কথাই ছিল; কিন্তু উহাতে বলা হয় যে, মিঃ জারিং কাশ্মীরকে বেসামরিক অঞ্চলে পরিণত করিবার কথা আলোচনা করিবেন, এবং পাকিস্থানের প্রস্তাব অনুযায়ী সেখানে জাতি-সঙ্ঘের বাহিনী প্রেরণের কথা বিবেচনা করিবেন। এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ভারতের পক্ষ হইতে দৃঢ়তার সহিত বলা হয় যে, ভারত-ভূমিতে বৈদেশিক সৈন্যের আগমন ভারত গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই সহ্য করিবেন না। শ্রীনেহরু এই প্রস্তাবকে সম্মিলিত আক্রমণের (Collective aggression) প্রস্তাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটি সোভিয়েট "ভিটোয়" বাতিল হইবামাত্র অনুরূপ আর এক প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা হয়; সোভিয়েট প্রতিনিধি উহারও বিরোধিতা করিবেন বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন। তাহার পর আপোষমূলক সর্ব্বশেষ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। জারিং কমিশন সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাবের উত্থাপক ছিল বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও কিউবা। সর্ব্বশেষ প্রস্তাব উত্থাপনে কিউবা অংশ গ্রহণ করে নাই।

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের প্রতি বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষপাতিত্বের কারণ ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পাকিস্থান সম্পর্কে বৃটেনের অত্যধিক আগ্রহের একটি বিশেষ কারণ—মধ্যপ্রাচ্যে তাহার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান, এবং তাহার প্রতি প্রধান আরব রাষ্ট্রগুলির (মিশর, সৌদী আরব, সিরিয়া ও জর্ডান্) বিরূপতা। ১৯৫১ সালে ডাঃ মোসাদ্দেক্ ইঙ্গ-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিলে বৃটেনের রক্ষণশীল মহলে এই বলিয়া হা-হুতাশ করা হইয়াছিল যে, ভারতীয় উপমহাদেশ হইতে বৃটিশ শক্তির অপসারণের জন্যই ইরাণের এই ঔদ্ধত্য সম্ভব হইয়াছে। ইহার পর ১৯৫৪ সালে বৃটেন সুয়েজ অঞ্চল হইতে তাহার সৈন্য অপসারণের চুক্তি করিতে বাধ্য হয়। সুয়েজের ঘাটি সাইপ্রাসে সরাইয়া আনিয়া মধ্য প্রাচ্যের স্বার্থ রক্ষা করা যাইবে বলিয়া বৃটেন্ আশা করিয়াছিল; কিন্তু সাম্প্রতিক সুয়েজ অভিযানের ব্যর্থতায় সাইপ্রাসের গুরুত্বহীনতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।...... "The Suez fiasco proved conclusively that the harbours of Cyprus could not be used for mounting even a modest sea-borne operation."—New Statesman and Nation. তাহার পর, ১৯৫৬ সালে জর্ডান হইতে বৃটেনের প্রভাব দূরীভূত হইয়াছে; গ্লাব পাশার পদচ্যুতির পর বৃটিশ প্রভাবের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, সম্প্রতি বৃটিশ জর্ডান চুক্তি বাতিল হওয়ায় তাহাও লোপ পাইয়াছে। ইরাক্ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও এখানকার আরব জনসাধারণ নূতন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইতেছে। সুতরাং ইরাকের মিত্রতা ও তত নির্ভরযোগ্য নহে। বস্তুতঃ, অবস্থা এখন এইরূপ যে, ভারতীয় উপমহাদেশ হইতে বৃটেনের অপসারণ যদি ইরাণের ঔদ্ধত্য সম্ভব হইবার কারণ হয়, তাহা হইলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থ এখন যে কোনও সময়ে বিপন্ন হইতে পারে। এই স্বার্থ রক্ষা করিবার উপযোগী বৃটিশের সামরিক প্রভাব এই অঞ্চলে আর নাই। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বৃটেন্ এখন তিনটি নীতি অবলম্বন করিয়াছে—প্রথমতঃ, মধ্যপ্রাচ্যে সে আর আমেরিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে না; "Macmillan Government's willingness to allow America to replace us as the 'protector' of the Middle East.—N. S. N. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের স্বতন্ত্র সামরিক কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই, আমেরিকার চাপ সত্বেও, ইডেন্ গভর্ণমেণ্ট সাইপ্রাসের জাতীয় দাবীর সহিত আপোষ করিতে চাহেন নাই।

এই নীতি এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মধ্য প্রাচ্যের প্রধান রক্ষক আমেরিকার সহিত সহযোগিতা করিয়া বৃটেন্ তাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে চাহে বলিয়াই আমেরিকার সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সহিত সে এখন ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাগদাদ্ চুক্তির সামরিক ধারায় আমেরিকা স্বাক্ষর না করিলেও এই চুক্তির প্রত্যেকটি শক্তির সহিত সে স্বতন্ত্রভাবে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। পাকিস্থানে প্রভাব বিস্তৃতির জন্য এখন আমেরিকার সহিত বৃটেনের আর প্রতিযোগিতা নাই। আমেরিকার সহযোগেই সে পাকিস্থান, ইরাণ, ইরাক ও তুরস্কের সাহায্যে তাহার মধ্যপ্রাচ্য-স্বার্থ রক্ষা করিতে চায়। ভারতীয় উপমহাদেশে পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুত্ব এখন আর সম্ভব নহে ; তবে, উহার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শক্তিকে তোষণ করিয়া ঐ অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই জন্যই পাকিস্থানের জন্য বৃটেনের দরদ এখন বড় বেশী ; ভারতের সৌহার্দ্য বিপন্ন করিয়াও সে পাকিস্থানকে তোষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মধ্য-প্রাচ্য সম্পর্কে বৃটেনের পরিবর্ত্তিত নীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সর্ব্বতোভাবে ইস্রাইলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। আরব রাষ্ট্রগুলির (এমন কি ইরাকেরও) মুখ চাহিয়া ইস্রাইলের বিরোধিতা সে আর করিবে না। এই নীতি অনুসারেই ইস্রাইলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে গ্যাজা ও আকাবা উপসাগর সম্পর্কে মার্কিণ নীতিকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা—

ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট রুশিয়া মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তাহার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছে। এই অঞ্চল হইতে বাহিরের সকল শক্তি অপসরণ করুক—ইহাই তাহার পরিকল্পনার মূল কথা। বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের নিকট পৃথক্‌ভাবে লিখিত লিপিতে সোভিয়েট রুশিয়া মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত মূলনীতি অনুসরণের প্রস্তাব করিয়াছে—(১) শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা সমস্ত বিতর্কমূলক প্রশ্নের মীমাংসা, (২) মধ্য ও নিকট-প্রাচ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ; (৩) ইহাদিগকে বৃহৎ শক্তিগুলির সহিত একত্রে সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা পরিহার ; (৪) মধ্য ও নিকটপ্রাচ্যে বৈদেশিক ঘাঁটিগুলির বিলোপ, এবং এই সব রাজ্য হইতে বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ ; (৫) মধ্য ও নিকটপ্রাচ্যের রাজ্যসমূহে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা ; (৬) কোনরূপ সামরিক বা রাজনৈতিক সর্ত্ত ব্যতিরেকে মধ্য ও নিকটপ্রাচ্যের রাজ্যসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানে সহযোগিতা। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রাক্তন্ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ শেপিলভ্ এই প্রস্তাব উত্থাপনের সময় বলেন যে, চারিটি প্রধান শক্তি ব্যতীতও অন্য যে কোনও রাষ্ট্র এইরূপ ঘোষণা করিতে পারিবে। শান্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ হইতে উত্থাপিত এই প্রস্তাব বৃটেন্, আমেরিকা ও ফ্রান্স সমর্থন করিবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বলা বাহুল্য, সোভিয়েট রুশিয়ার মূল বৈদেশিক নীতির সহিত মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে তাহার এই প্রস্তাব সঙ্গতিপূর্ণ। সাধারণভাবে সে নিরপেক্ষ অঞ্চলের প্রসার এবং সামরিক জোটের বিলোপ চায়। ইহা ছাড়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তাহার সংলগ্ন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি পার্শ্বে একটি নিরপেক্ষ বেল্ট রচনার জন্য সে আগ্রহী। মধ্যপ্রাচ্য হইতে সামরিক ঘাঁটিগুলির বিলোপ হইলে সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে ; এই বিশাল অঞ্চলে যদি সামরিক জোট ও ঘাঁটি না থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ একটি সীমান্ত সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দের পক্ষে সোভিয়েট রুশিয়ার এই প্রস্তাব মানিয়া লওয়া অথবা উহাকে আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা স্বাভাবিক নয়। "সোভিয়েট রুশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহিতেছে,"—এই মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতি রচিত হইয়াছে। সুতরাং, এখন সোভিয়েট রুশিয়ার সদিচ্ছায় বিশ্বাস করিয়া মধ্যপ্রাচ্য হইতে আমেরিকার অপসরণ এবং সেখানকার সামরিক জোট ও সামরিক ঘাঁটির বিলোপ সাধনের কথা চিন্তাই করা যায় না। ইহা ছাড়া, এই অঞ্চলের তৈল-স্বার্থে আমেরিকার প্রভুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান তৈল-স্বার্থকে শুধু নিয়ামিষ বাণিজ্য চুক্তির উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এই প্রস্তাব আলোচনার যোগ্য বিবেচিত হউক, আর না-ই হউক, ইহা উত্থাপনে সোভিয়েট রুশিয়ার একটা বড় রকমের কূটনৈতিক বিজয় হইল। সে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে তাহার কোনও কু-অভিসন্ধি নাই ; এই অঞ্চলের সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক জোটের ও সামরিক ঘাঁটিসমূহের যদি বিলোপ ঘটে, তাহা হইলে এখান হইতে সে সরিয়া যাইতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ, এই অঞ্চলকে নিরপেক্ষ ও অসামরিক ক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য অন্য তিনটি বৃহৎ শক্তির সহিত সহযোগিতা করিবার আগ্রহই সে প্রকাশ করিতেছে। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার এই নীতি নূতনও নহে। ইতিপূর্ব্বে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে সে চতুঃশক্তির নিরাপত্তা চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিল। মধ্য প্রাচ্যে সকল পক্ষের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার প্রস্তাবও সে তুলিয়াছিল। সুতরাং, বর্ত্তমানে হাঙ্গেরির ব্যাপারে হৃতমর্য্যাদা হইবার পর সোভিয়েট রুশিয়া মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে উদার প্রস্তাব করিতেছে, এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনাকে আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা উচিত। ইহার কিছু কিছু রদবদল করা প্রয়োজন হইতে পারে ; কিন্তু ইহাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা অন্যায় হইবে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শক্তিদ্বন্দ্বের লীলাক্ষেত্র হওয়াতেই যে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তিই সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন না। সোভিয়েট প্রস্তাবে এই অঞ্চলে শক্তিদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইবার কথা বলা হইয়াছে। আর ইহাও সত্য যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত কোনরূপ আপোষ না করিলে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা মিটিবে না। পাশ্চাত্য

দেশের উদারনৈতিক পত্রিকাগুলি এই কথা এখন খোলাখুলি বলিতেছে। কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ রোধের নামে এই অঞ্চলে সামরিক পাঁয়তাড়া যত বাড়িবে, কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাও তত বেশী বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য, মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাগুলি জীয়াইয়া রাখিয়া নিজ নিজ স্বার্থের সিদ্ধি যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; যেরূপ ব্যবস্থায় সমস্যার মূলে আঘাত লাগিতে পারে, তাহা স্বভাবতঃ তাহাদের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

ইস্রাইলের ঔদ্ধত্য—

গত নভেম্বর মাসে মিশরের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযানের জের এখনও মেটে নাই। মিশরের বিরুদ্ধে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বৃটেন্, ফ্রান্স ও ইস্রাইল। জাতি-সঙ্ঘের প্রস্তাবে তাহারা আক্রমণকারী বলিয়া নিন্দিত না হইলেও তাহারা যে বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ পরিচালনার অপরাধে অপরাধী, তাহা সর্ব্বজনস্বীকৃত। এই অপরাধ ক্ষালনের জন্য তাহাদের প্রতি জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশ—বিনা সর্ত্তে আক্রমণকারী সেনাবাহিনী অপসারণ করিতে হইবে। বৃটেন ও ফ্রান্স এই নির্দ্দেশ পালনে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইস্রাইল জাতি-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ কিছুতেই মানিতেছে না। ১৯৪৯ সালের যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার অপর পার্শ্বে সরিয়া যাইবার জন্য ইস্রাইলকে বারবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইস্রাইল তাহা বরাবর উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে; গ্যাজা ও আকাবা উপসাগরের মোহনা হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে ইস্রাইল কিছুতেই প্রস্তুত নয়।

সুয়েজ খালের পূর্ব্ব দিকে ত্রিকোণ ভূমিটি সিনাই উপদ্বীপ; ইহা মিশর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত গ্যাজা হইতে ইস্রাইলী সেনাবাহিনী এই অজুহাতে অপসারিত হইতেছে না যে, মিশরীয় হানাদার বাহিনী নাকি এই গ্যাজাকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিয়াই ইস্রাইলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ইস্রাইলের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, ইস্রাইলী সেনাবাহিনী গ্যাজা হইতে অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতি-সঙ্ঘের সেনাবাহিনী তথায় প্রবেশ করিয়া "বাফার" রচনা করিবে। কিন্তু তবুও ইস্রাইল তাহার জেদ ছাড়ে নাই। সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বে আকাবা উপসাগর। এই উপসাগরের মোহনা হইতেও ইস্রাইল সেনাবাহিনী অপসরণে রাজী নয়। ইস্রাইলের বক্তব্য, মিশর এই উপসাগরের মোহনায় কামান বসাইয়া ইস্রাইলী জাহাজের সুয়েজ খাল ব্যবহার বন্ধ করিতে পারিয়াছে; ইহার দ্বারা ১৮৮৮ সালের কনস্তান্তিনোপোল কনভেনশন্ সে লঙ্ঘন করিয়াছে; ...তে ইস্রাইলী জাহাজের অবাধে সুয়েজ খাল ব্যবহারের নিশ্চয়তা ...পাইলে ইস্রাইলী সৈন্য আকাবা উপসাগরের মোহনা ত্যাগ করিবে ... মিশর এই যুক্তিতে ইস্রাইলী জাহাজের সুয়েজ ব্যবহারে বাধা ...ছে যে, আরব রাষ্ট্রগুলির (বিশেষতঃ কনস্তান্তিনোপোল্ কনভেনশনের ...রকারী মিশরের) সহিত ইস্রাইল যুদ্ধরত। ইস্রাইলের সহিত যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি হইয়াছে বটে। কিন্তু সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৮৮৮ সালের কনস্তান্তিনোপোল্ কনভেনশন্ অনুসারে সকল দেশের জাহাজই সুয়েজ ব্যবহারের অধিকারী বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময় কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী শক্তিসমূহের শত্রুপক্ষের জাহাজকে সুয়েজ ব্যবহার করিতে না দিবার নজীর আছে: প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর ও তাহার সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের জাহাজগুলি সুয়েজ ব্যবহার করিতে পারে নাই। আকাবা অঞ্চলে ইস্রাইল সৈন্যের অবস্থিতি সম্পর্কে মিশরের বক্তব্য—ইস্রাইলী জাহাজের সুয়েজ ব্যবহারের অধিকার আছে কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র; নভেম্বর মাসের আক্রমণের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই; এই আক্রমণের সময় যে অঞ্চল ইস্রাইলের অধিকারে আসে, তাহা সে ত্যাগ করিতে বাধ্য।

ইস্রাইলের এই ঔদ্ধত্যে সমগ্র আরব জগৎ উত্তেজিত হইতেছে। নাসের শাসিত মিশরের প্রতি আমেরিকা প্রসন্ন না হইলেও সমগ্রভাবে আরব জগৎকে সে এখন প্রভাবিত করিতে চাহিতেছে। কাজেই ইস্রাইলকে গ্যাজা ও আকাবা ত্যাগ করাইতে বাধ্য করিবার জন্য আমেরিকা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল; ইস্রাইলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথাও উঠিয়াছিল। কিন্তু কানাডা, বৃটেন্ ও ফ্রান্স ইহার বিরোধিতা করিয়াছে। বিশেষতঃ, বৃটেন ও ফ্রান্স এখন আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ইস্রাইলের ঐকান্তিক সমর্থক। বর্ত্তমানে আমেরিকা ইস্রাইলের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা মীমাংসায় আসিবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে সিরিয়া, মিশর, জর্ডান ও সৌদী আরবের রাষ্ট্র-প্রধানগণ কায়রোয় এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, গ্যাজা ও আকাবা উপকূল হইতে ইস্রাইলী সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত সুয়েজ খাল বাধামুক্ত করিবার কাজ বন্ধ রাখা হইবে; গত নভেম্বর মাসে যুদ্ধের সময় সিরিয়ায় ইঙ্গ-ইরাক্ তৈল কোম্পানীর যে পাইপলাইনটি বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহারও সংস্কার হইবে না।

ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক অশান্তি—

ইন্দোনেশিয়ায় গত কিছুকাল রাজনৈতিক গোলোযোগ চলিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে কর্ণেল আহম্মদ্ হুসেন্ ঘোষণা করেন যে, অরাজকতা নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি মধ্য সুমাত্রার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। উত্তর সুমাত্রার অধিনায়ক কর্ণেল সিম্বলিন্ও এই পন্থা অনুসরণ করেন। এই সংবাদে রাজধানী জাকার্ত্তায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং সিম্বলিন্কে ক্ষমতাচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল গিণ্টিংকে সুমাত্রায় প্রেরণ করা হয়। তিনি সুমাত্রায় পৌঁছিলে সিম্বলিন্ তাঁহার অনুরক্ত কিছু সৈন্য সহ পলায়ন করেন। এদিকে দক্ষিণ সুমাত্রার গভর্ণর ঘোষণা করেন যে, বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ নিবারণের জন্য তিনি ঐ প্রদেশের রাজস্ব ও কর স্থানীয় উন্নয়নমূলক কার্য্যে ব্যয় করিবেন, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট উহা আর প্রেরণ করিবেন না। সুমাত্রায় এই বিদ্রোহের অজুহাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মাস্‌জুমি দলটি মন্ত্রিমণ্ডল ত্যাগ করে। ইন্দোনেশীয় পার্লামেণ্টে জাতীয়তাবাদী দল (প্রধান মন্ত্রী শস্ত্রমিদ্‌জোজো এই দলের নেতা) একক-সংখ্যাগরিষ্ঠ;

মাসজুমির স্থান দ্বিতীয়। মাসজুমি দল পদত্যাগ করায় অন্য তিনটি ক্ষুদ্র দলও শস্ত্রমিদ্‌জোজো মন্ত্রিমণ্ডলকে আর সমর্থন করিতেছে না। সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডল এখন কম্যুনিষ্টদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল; পার্লামেন্টে এই দলের স্থান চতুর্থ।

এই শাসনসঙ্কট অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকার্ণো আপাততঃ পার্লামেণ্ট স্থগিত রাখিয়া "জাতীয় কাউন্সিল" গঠনের এক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় একমাত্র কম্যুনিষ্ট দল ছাড়া দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের এবং সর্ব্ব শ্রেণীর প্রতিনিধি গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। ডাঃ সোয়েকার্ণোর নেতৃত্বে জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হইবে; মন্ত্রিমণ্ডল এই কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন। সোয়েকার্ণোর পরিকল্পনায় কম্যুনিষ্ট দলের প্রতিনিধিসহ দেশের সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক দল লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলা হইয়াছে। ডাঃ সোয়েকার্ণোর পরিকল্পনাটি এক সর্ব্ব-দল-সম্মেলনে উপস্থাপিত হইয়াছিল, এবং উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডল সানন্দে উহা সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর, কোনও কোনও সাম্প্রদায়িক দল হইতে ইহার বিরোধিতার কথা শোনা গিয়াছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে সকল দলের মনোভাব এখনও জানা যায় নাই।

১।৩।৫৭
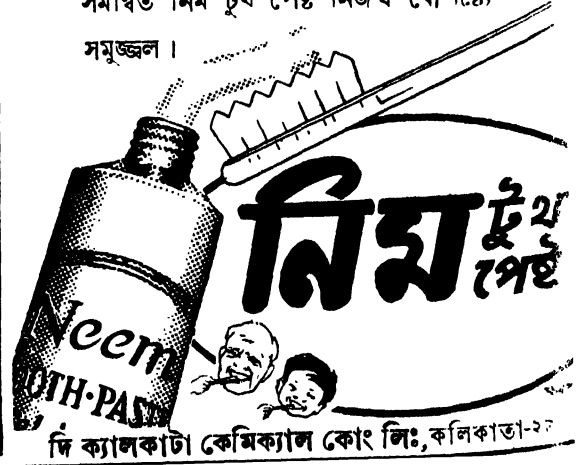
মনের মানসী চিন্ময়ী তুমি

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

জীবন-মানসী মম, চলে গেছ কতদিন,
কুসুম-সুবাস সম—নীরব হৃদয়-বীণ।
এসেছিলে তুমি লেগেছিল ভালো,
ধরণীর রূপ এত শোভা আলো,
আজ কাছে নাই, মনে পড়ে যায় অতীতের স্মৃতিখানি,
বেদনা-ব্যথায় এ জীবন মোর জানি আমি তাহা জানি।
শরৎ-আলোকে প্রভাতী বাতাস বয়ে যায় ধীরে ধীরে,
তব সাথে মোর হোল পরিচয় নীরব তটিনী-তীরে
তটিনী এখনও চলেছে বহিয়া,
কল্লোল সাথে এ কথা কহিয়া,
এসেছিলে তুমি জীবনে আমার সে এক সোনালী প্রাতে,
স্মৃতিখানি তা'র রয়েছে আজিও মুখরিত দিনেরাতে।
অন্তর-মাঝে তুমি আস যাও কল্পনা করি কত,
মনের মাঝারে শ্বেত শতদল—ভাঙি গড়ি অবিরত।
রূপের আলোকে কভু আস নামি,
মরম-বীণায় গীতি যায় থামি;
আর বার যাও চকিতে হাসিয়া দূর হতে বহুদূরে,
মনের মানসী চিন্ময়ী তুমি জীবনের সুরে সুরে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও শ্রীনেহেরু

শ্রীসমর দত্ত

অহিংসা ও সত্যের সোনার কাঠির স্পর্শে আপন অন্তর পরিশুদ্ধ করে এবং এক নূতনতর চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে যে মহাপুরুষ ভারতে মুক্তি সংগ্রামের পথে আজীবন এক তীর্থযাত্রীর মত চলেছিলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মাজীর জীবন বীণার বিভিন্ন তারে ঝঙ্কৃত অলোভ ও অমত্ততার এবং অহিংসা ও শান্তির সুর তাঁর মানস-পুত্র জওহরলালের মনে সৃষ্টি করেছিল এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া।

পৃথিবীতে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন স্বনামখ্যাত রাজনীতিবিদের অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা মানুষের চেয়ে বড় করে দেখেন নিজের দেশকে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং রাজ্য বিস্তারের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁদের কাছে এত বড় যে, আপন উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা অধর্ম, অসত্য, ছলনা-চাতুরী ও পাশবিকতার পাপময় আশ্রয় গ্রহণেও কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু গান্ধীজীর স্বাধীনতা ও সংগ্রামের পথ ছিল শান্তিপূর্ণ ও অহিংস। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংসার অস্ত্রে শত্রুকে আঘাত করে তার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাবো—এ ধরণের একটা মহান্ আদর্শ গান্ধীজী ব্যতীত জগতের কোন রাজনীতিবিদ মানবজাতির সম্মুখে তুলে ধরতে সক্ষম হন নি।

সত্যের শুচিসুন্দর পথের এই মহাপথিক আপন হাতে তাঁর প্রিয় শিষ্য জওহরলালের অন্তরে অহিংসার আকাশপ্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিলেন। সেই আলোতে শ্রীনেহরু চিনেছিলেন নিজেকে। তাঁর মনকে জড়িয়েছিল অহিংসা ও ভয়ের যে পুরু আবরণ, সে আবরণ বিলীন হয়ে গেল অহিংসার বহিঃপ্রকাশের ভাস্বর জ্যোতিতে।

গুরুর পদাঙ্ক-অনুসরণকারী জওহরলাল অহিংসা, সত্য ও শান্তির নির্ম্মল আদর্শের নামাবলীতে দেহ আচ্ছাদিত ক'রে চলেছেন রাজনীতির বন্ধুর পথে, এই মহান আদর্শকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তাঁর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে উত্তর আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন :—

The main objectives of that policy (Indian Foreign Policy) are the pursuit of peace, not through alignment with any major power or group of powers but through an independent approach to each controversial or disputed issue: the liberation of subject peoples: the maintenance of freedom, national and individual, the elimination of want, disease and ignorance which afflict the greater part of the world's population.

১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের অবসানে দেখা গেল একদিকে এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়েনিয়া, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে বসেছে সোভিয়েট রাশিয়া, অন্যদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীকে তাঁবেদার বানিয়ে নিয়েছে ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদ, পরাজিত জার্ম্মানীর এক টুক্‌রো কেড়ে নিল ষ্টালিন এবং আর এক টুক্‌রো বাগিয়ে নিল ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী বণিকতন্ত্রগুলির জোটবাঁধা শক্তি, পরস্পর-বিরোধী এই দুটি শক্তি তাদের মিলিটারী বুটের তলায় পৃথিবীর বুক চেপে ধরলো, দুজনের মুখেই ফুটে উঠলো দুনিয়া দখলের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা! দুটি শক্তিই তাদের পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে এক অপরকে দিচ্ছে যুদ্ধের হুমকী।

বিশ্বের এই বাস্তব অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে এবং মহাত্মাজী প্রদত্ত শিক্ষাস্মৃতির মঞ্জুষায় সযত্নে সংরক্ষণ করে তিনি তাঁর (ভারত সরকারের) পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ করলেন, ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে লোক সভাতে তাঁর সরকারের বৈদেশিক নীতির উপর বিতর্ককালে তিনি বলেছিলেন—

I am sure that people all over the world want peace and are anxious to avoid war. I am equally sure that every Government wants to avoid war. And yet we drift towards the very thing, we seek to avoid. Fear and suspicion have us in their grip; every step that one party takes, adds to the fear and suspicion of another and so catastrophe comes inevitably nearer as in a Greek tragedy. I do believe, however, that if the peoples or rather the governments of the world try hard enough, this catastrophe can be avoided, although it becomes increasingly difficult to do so.

এই কথাগুলির মাধ্যমে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার মর্ম্মার্থ এই যে জগতের বিভিন্ন জাতি ও সরকারের আন্তরিক চেষ্টায় যুদ্ধ রোধ করা সম্ভব, কারণ বিশ্ববাসী শান্তির জন্য উন্মুখ।

এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, হিংসোন্মত্ত পৃথিবীতে নিত্য নূতন দ্বন্দ্বের অবসান এনে সুমহান্ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল। কিন্তু কোন রাজনীতিবিদের কর্ম্ম তখনই হয় পঞ্চমুখে প্রশংসিত—যখন তাঁর অন্তরের কল্পনা বহির্জগতে বাস্তবের রূপ নিয়ে মানব কল্যাণে সহায়তা করে। নেহরুর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক ইচ্ছার বাস্তব রূপ দিল পঞ্চশীল।

পঞ্চশীল অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরু রচিত পৃথিবীতে সুখ-শান্তি স্থাপনের পাঁচটি নীতি, যথা—

Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. (বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সার্ব্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক সম্মান)

Non aggresion (অনাক্রমণ)।

Non interference in each other's internal affairs (অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা)

Equality and mutual benefit. (পারস্পরিক সমতা ও বুঝাপড়া)।

Peaceful Co-existence (শান্তি পূর্ণ সহ-অবস্থান)।

১৯৫৪ সালের ২৮শে জুন নয়াচীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরু দিল্লীতে এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে এই পঞ্চনীতির উপর তাঁদের পূর্ণ আস্থার কথা প্রচার করলেন। তারপর বর্ম্মা ও ইন্দোনেশিয়া পঞ্চশীলের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ঘোষণা কোরল। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার আরও ২৯টি রাষ্ট্র এই নীতি সশ্রদ্ধ মনে মেনে নিল। যুগোশ্লোভিয়া, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়া "পঞ্চশীল" সমর্থনকারী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম।

পঞ্চশীল অনুসৃত শান্তি-এলাকা বর্ত্তমানে নয়াচীন হ'তে আরবভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত, এমনকি ভূমধ্য সাগরের ওপারেও ইহা সমর্থিত। অবশ্য এ কথাও সত্য যে ভারত সরকারের এই পঞ্চনীতি পাশ্চাত্য জঙ্গীবাদ শক্তিগুলির কাছে এখনও পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করে নি। কিন্তু এই পরমাণু অস্ত্রের যুগে (মানুষের মনে যখন প্রশ্ন উঠেছে সহ-অবস্থান অথবা সহ-বিনাশ) পঞ্চশীল অনুসরণ ব্যতীত তাদের যে গত্যন্তর নেই, এ কথা তারা একদিন নিশ্চয় বুঝতে পারবে এবং সেই শুভবুদ্ধি জাগরণের অনাগত শুভদিন আর বেশী দূরবর্ত্তী নয়। দুইটি বিবদমান শক্তির মাঝে দণ্ডায়মান শান্তির দূত নেহরু অদম্য আত্ম-প্রত্যয় ও পৌরুষের আলোকবর্ত্তিকা হস্তে প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলিকে প্রেম ও মৈত্রীর পথে এক নূতন প্রেরণায় পরিচালিত করছেন। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষ. কিন্তু এই নিরপেক্ষতা ক্লীব নিবীর্য্যতার পরিচায়ক নহে। শ্রীনেহরু বলেছেন—"When peace is menaced, justice is threatened we cannot be neutral." ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় নিরপেক্ষ শান্তি নীতির তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা এই :—

"আমাদের কোন শিবিরে যোগ না দেওয়ার অর্থ নিষ্ক্রিয়তা নয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির পশ্চাতে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও গঠনমূলক উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য সর্ব্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং এই সর্ব্বজনীন শান্তির উপর ভিত্তি করেই যৌথ নিরাপত্তা গড়ে উঠা সম্ভব।"

অহিংসা, সত্য, শান্তি এবং নিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের বৈদেশিক নীতি কোরিয়া ও ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সংগ্রাম সুরু করার হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিল। ইন্দোচীনে বিরতি চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে কত টালবাহনাই না চ এমন কি জেনেভা বৈঠকও বানচাল হবার উপক্রম হয়েছিল, f ভারত সরকারের আপ্রাণ চেষ্টায় অবশেষে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পা হ'ল, আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এক বিশিষ্ট আসন ল হ'ল সমর্থ।

এরপর ভারতকে নিজদলে টানবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী শ জোট ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে সুরু হ'ল প্রতিযোগিতার টানাটানি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির উপর শ্রীনেহেরুর প্র সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ভারতবর্ষ দলে ভিড়লে দক্ষিণ- এশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রও সে সঙ্গে আসবে একথা তারা খুব ভাল ভা জানে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও মার্কিণ বেণে-রাজ ভারতকে ন্য (Nato), সিয়াটো (Seato) অথবা অন্য কোন সামরিক চুক্তি যোগ দেওয়াতে পারলো না। ভারত সরকারের মতে সামরিক জে বাঁধা অনর্থকর। এর দ্বারা যুদ্ধোত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সমস্ত সামি জোটই কোন বৃহৎ প্রবল রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়, অথবা এই জো পশ্চাতে থাকে কোন শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্র। প্রবলের স্বার্থের প্রতি রেখেই সামরিক জোট তৈরী হয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবলের সঙ্গে পাল্লা দে জন্য। তাই নেহেরু সরকার সমস্ত সামরিক জোটের প্রতি জানা অসমর্থন। মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজখাল জাতীয়করণের ঘোষণায় ইঙ্গ-ফরাসীশক্তি গত অক্টোবর মাসে মিশরে যখন বেপরোয়া বোমাব সুরু কোরল শ্রীনেহরু তখন সামরিক জোটের সর্ব্বনাশা শক্তির ব বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বল্লেন, "সমস্ত অনর্থের মূল ব বাগদাদ চুক্তি"। ম্যানিলা চুক্তি সম্বন্ধেও শ্রীনেহেরু মন্তব্য করেছেন "অনিচ্ছা সত্বেও দান গ্রহণে বাধ্য করা বন্ধুত্বের পরিচয় নয়"। চ এবং রুশ শ্রীনেহেরুকে অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর আসন দিয়েছে কিন্তু রাশি লালফৌজ হাঙ্গেরীবাসীর রক্তে সম্প্রতি এক হোলি উৎসব সুসম্পন্ন ক তথাকার মানুষের মনে যে মনুষ্যত্ব-অপহারী ত্রাসের সঞ্চার কোর পণ্ডিতজী সে সম্বন্ধে নীরব রইলেন না। হাঙ্গেরীতে লালফৌজ পাঠা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করলেন—

"I intensely dislike foreign forces functioni in this or any other way in any Country and hope this will not continue and that foreign tro will not remain in other Countries."

গত ১২ই ডিসেম্বর (১৯৫৬) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈ হাঙ্গেরীতে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কার্য্যাবলী সম্পর্কিত আলোচনায় f বলেন—"বলপ্রয়োগ, রক্তপাত কিংবা বৈদেশিক আক্রমণের মা কম্যুনিজম চাপিয়ে দেওয়া যায় না"।

একদা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জওহরলালের প্রশংসা করে ছিলেন—"সত্য যেখানে বিপজ্জনক সেখানে সত্যকে তিনি (শ্রীনে

ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি সহায় করেননি মিথ্যাকে"।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয়ের নেতৃত্বে সম্পাদিত সামরিক চুক্তিগুলির অভিপ্রায় যে অসৎ, কাশ্মীর আক্রমণকারী পাকিস্থানকে সমর্থন করা এবং আমেরিকা কর্তৃক তাকে সামরিক সাহায্য দেওয়া যে অন্যায়, মিশরে বোমা বর্ষণ করে সুয়েজ খালের উপর মিশরবাসীর সার্ব্বভৌম অধিকার হরণ করবার চেষ্টা যে সর্ব্বতোভাবে অবাঞ্ছনীয়, এই বিপজ্জনক সত্য কথাগুলি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নি, অপর পক্ষে রাশিয়ার অন্যায় কার্য্যাবলীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে কিছু সুবিধা আদায় করে নেবার মতলবে স্বার্থপরতার পঙ্কিল পথে অগ্রসর হবার কথা তাঁর মনে কখনও স্থান পায় নি। সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক মানুষ যে কখনও সুবিধাবাদী হয় না, শ্রীনেহেরু তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সহযোগিতার সক্রিয় হস্ত প্রসারিত করে এবং অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অপরিসীম শান্তির প্রতি উদগ্র প্রীতি নিয়ে তিনি কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হয়ে জটিলতম আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির আপোষ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে চলেছেন।

কোরিয়া ও ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে, ভারতস্থ ফরাসী উপনিবেশগুলি আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই হস্তান্তরিত হ'ল, চীনের সাথে তিব্বতীয় চুক্তি ও একটি পঞ্চবার্ষিক চুক্তি ভারতের শান্তি নীতির বিশেষ পরিচায়ক। ফরমোজাকে কেন্দ্র করে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যও শ্রীনেহেরু একটি উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট। কারণ তিনি জানেন, ফরমোজা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ব্যতীত স্থায়ী বিশ্বশান্তি অসম্ভব। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি। কালাআদমীদের প্রতি নিষ্ঠুর মালান-সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বিশ্বের দেড়শো কোটি দরিদ্র মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করেছেন।

কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ গোয়া, দমন ও দিউ এখনও পর্ত্তুগীজ পদানত। কোন বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র শক্তির ভারতবর্ষ অথবা অপর কোন দেশে কলোনী বিস্তার করার বিরুদ্ধে ভারত সরকার চিরদিনই সক্রিয় প্রতিবাদ করেছে। বৃটিশ সিংহ ভারতবর্ষ ছেড়ে সাগর পারে চলে গেল, কিন্তু দস্যু-পর্ত্তুগীজ ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী গোয়া, দমন, দিউ এই তিনটি দেশের উপর তাদের দাপট চালিয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘকাল পর্ত্তুগীজ শাসনে গোয়াবাসীদের দুঃখ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। গণতান্ত্রিক অধিকার হ'তে গোয়াবাসীরা বঞ্চিত। ধর্ম্মরক্ষার কোন সুব্যবস্থা নেই। শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গোয়াবাসীরা মরার চেয়েও মরে আছে। সাম্রাজ্যবাদী পর্ত্তুগাল সরকারের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য গোয়ার জনসাধারণ আজ অতিশয় ব্যগ্র। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে লোক সভার পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করলেন—"the Protuguese retention of Goa is a continuing interference with the political system established in India today." দৃপ্তকণ্ঠে তিনি জানিয়ে দিলেন যে ভারতের বুকে কোন বৈদেশিক শক্তির অবস্থান তিনি সহ্য করতে অক্ষম। স্বেচ্ছাচারী, নরপিশাচ পর্ত্তুগাল সরকারের নৃশংস অত্যাচারের জাঁতাকল মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলনকারী গোয়াবাসীর এবং গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বহু ভারতবাসীর জীবন পিষে মারলো। প্রশ্ন উঠে, ক্ষুদ্র পর্ত্তুগাল-সরকারের এই ভীষণ দাপটের ইন্ধন জোগাচ্ছে কে? ন্যাটো (Nato) চুক্তির কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চুক্তির পঞ্চম ধারায় (Article 5) বলা হয়েছে—

The parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered as an attack against them all and consequently they agree that if such an armed attack occurs, each of them in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by the article 51 of the Charter, the United Nations will assist the party or parties so attacked by taking forthwith individually and in concert with the other parties, such action as it deems necessary including the use of armed forces to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

কিন্তু এই চুক্তির ষষ্ঠ ধারা অনুধাবনে দেখা যায় যে ন্যাটো চুক্তির দ্বারা গোয়ার স্বার্থ সংরক্ষিত নয়। এই ধারা বলেছে—

"An armed attack on one or more of the Parties is deemed to include an armed attack on the territory of any of the parties in Europe or North America, on the Algerian departments of France, on the occupation forces of any party in Europe, on the islands under the jurisdiction of any party in the North Atlantic area of the Tropic of Cancer or on the vessels or aircraft in this area of any of the parties."

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখানে গোয়ার কথার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু পর্ত্তুগাল সরকারের দাবী এই যে ন্যাটো চুক্তি অনুসারে এই দেশের স্বার্থ সংরক্ষিত, যদি ভারতবর্ষ গোয়ায় পুলিশী অভিযান চালায় তাহলে ন্যাটো চুক্তিতে স্বাক্ষরিত শক্তিগুলি গোয়াকে সাহায্য করবে। যদিও শ্রীনেহরু এই জোটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু গোয়া সম্বন্ধে তাঁর বৈদেশিক নীতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ বৃটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে এরকম "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভারত কমনওয়েলথভুক্ত হওয়ার জন্য বৃটেনের বিরুদ্ধাচরণে অনিচ্ছুক। তিনি অস্ত্রের সাহায্যে রাজাকারদের অত্যাচার হতে হায়দ্রাবাদ উদ্ধার

করলেন, হানাদারদের মর্মন্তুদ আক্রমণ থেকে কাশ্মীর রক্ষা করলেন—দস্যু পর্তুগীজদের বুটের তলায় গোয়া, দমন, দিউয়ের মানুষ কেনই বা দলিত হবে? ভারতের সাথে মিলন ব্যতীত গোয়ার জনসাধারণের শিক্ষাসংস্কৃতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি কোন দিকেই জীবন বিকাশের অন্য কোন পথ উন্মুক্ত নেই, তাই গোয়া সম্বন্ধে ভারত সরকারের বলিষ্ঠতর নীতি গ্রহণ করা উচিত।

কোন দেশের আদর্শ ও ঐতিহ্য সেই দেশের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি রচনার বিশেষ সহায়ক। বিশ্ব মানবকে প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে বাঁধাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য; লোভ, ভয়, হিংসা ও বৈরীভাব দূর করে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলির পরস্পর মিলনের সমস্যা সমাধানে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হ'তে সচেষ্ট, বিভীষিকা ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশে আজ ভারতের বৈদেশিক নীতির নবারুণ নূতন আশা ও সম্ভাবনার অত্যুজ্জ্বল আলোকে প্রতিভাত, বহুদিনের লাঞ্ছিত, অবহেলিত জাতিগুলির জীবন মহীরুহ নব প্রেরণার কিশলয়ে মণ্ডিত, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির হিংসাত্মক নীতির প্রবাহিনী পৃথিবীতে বয়ে এনেছে ভাঙনের বন্যা, ভারতের বৈদেশিক নীতির মন্দাকিনী ধারা ধরিত্রীর বুকে ফেলেছে সৃষ্টির পলিমাটী, আর প্রবল রাষ্ট্রগুলি পররাজ্য আক্রমণের এবং দুর্ব্বল দেশগুলির স্বাধীনতা হরণের অন্যায় আচরণের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিলনের এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পথ সুগম হয়েছে শ্রীনেহরু ও ভারত সরকারের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে।

যা নশ্বর, তা একদিন ধূলায় মিশে যাবে। মহাকালের কোলে ভারত-ভাগ্য বিধাতা নেহরুকেও একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হ'বে। কিন্তু ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মনে এই মহাপুরুষের মহান্ অস্তিত্বের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন স্মরণ করিয়ে দেবে।

রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জোনাকির পক্ষে চাঁদের পরমায়ু নির্দ্ধারণ করিবার স্পর্দ্ধা যেরূপ হাস্যকর, আমাদের মত অতিসাধারণ লোকের পক্ষে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের অনুপম কবিকর্মের স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়া তোলাটাও অনুরূপ হাস্যকর? আমাদের মত মানুষ "ন জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ", কিন্তু পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"। হিমাচলসদৃশ এই পুরুষ-প্রধানের পদমূলে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া থাকিবার কালে যেন তাঁহার নিজেরই ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।" তখন সেই বিরাটের আয়ুষ্কাল নখাগ্রে গণনা করিয়া ফেলিবার স্পর্দ্ধিত আকাঙ্ক্ষাকে একটি শোচনীয় ব্যর্থতা বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্গে আরও মনে হয় যে, অণোরণীয়ান্ হইয়া সেই মহতো মহীয়ানের সামান্য মহিমাটুকুও যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি তবে তাহাই কি সামান্য লাভ! রবীন্দ্র কাব্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অশোভন চিন্তাহীন মতামত এক নিমেষের মধ্যে ব্যক্ত করিবার পূর্বে আমাদের ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? চাঁদের পরমায়ু অন্তত নিশাশেষ পর্য্যন্ত,—ক্ষিণ্ড জোনাকি? দুদণ্ড মিটমিট্ করিয়াই তাহার কীটলীলা সাঙ্গ? আজ যাহারা আমাদের সাহিত্যের আঙিনায় সবেমাত্র চলি-চলি পা-পা করিতে সুরু করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে তাক্‌লাগাইয়া দিবার জন্য যখন রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে চিন্তাহীন দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করিয়া বসে—তখন চাঁদ ও জোনাকির উপমাটাই মনে পড়ে। এ কথার মধ্যে কেহ অতিমাত্রায় রবীন্দ্র-ভক্তির গন্ধ পাইলেও ক্ষতি নাই। দল বাঁধিয়া অশ্রদ্ধা ও Cynicism প্রকাশ করিবার যে একটা অদ্ভুত কালচার ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে গজাইয়া উঠিতেছে, জীবনের যাহা কিছু রহস্যময়, সুন্দর ও মহান্ তাহাকেই তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিবার যে প্রবৃত্তি কাব্যের কল্পলোকেও হানা দিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রকৃতই শঙ্কিত হইতে হয়। রবীন্দ্রভক্তির আতিশয্য—Overdose আমাদিগকে অন্তত সেই ধৃষ্টতার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে! তাই বলিয়া এ কথা আদৌ বলা হইতেছে না যে, রবীন্দ্রকাব্য সর্ব সমালোচনার অতীত। শুধু ইহাই পরিতাপের বিষয় যে, রবীন্দ্রপদনখের ধূলিকণার যোগ্যতা যাহার নাই সেরূপ ব্যক্তিও 'যুগধর্ম' 'সমাজ চৈতন্য' 'বুর্জোয়া' প্রভৃতি গাল-ভরা Catch-wordএর গদার একটি আঘাতেই কবির অদ্বিতীয় কাব্যসৃষ্টিকে চুরমার করিয়া নূতন যুগের পয়গম্বর সাজিয়া বসে এবং বাণী প্রচার করিতে থাকে! তবে যদি ইহাই হয় যে—

> ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
>
> ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।—

তবে তাহাকে হীনমন্যতার লক্ষণ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে!

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টি এত বিশাল, ব্যাপক ও বিস্ময়জনক যে, তাহার স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো সুচিন্তিত মন্তব্য করিবার পূর্বেই সেই গহন অরণ্যের মধ্যে আমাদের পথ হারাইয়া যায়! রহস্যময়ী রবীন্দ্র কাব্য-সরস্বতীকে ধরি ধরি করিয়াও আমরা ধরিতে পারি না। আমাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দূরে পলাইয়া গিয়া সে যেন বলিতে থাকে "আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?" এক চিরপ্রগতিশীল অতল অনন্ত বৈচিত্র্যময় অলৌকিক কবিমানসের ছন্দোবদ্ধ বাঙ্ময় প্রকাশ এই রবীন্দ্র কাব্য! ইহা সর্বপ্রকার প্রগল্‌ভ সমালোচনার অসংযত কোলাহল স্তব্ধ করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর কবি নহেন যাহারা বিশেষ কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ কোনো পাঠকচক্রের প্রিয়। বিশ্বকবির বিচিত্র ভাব ও রসভূয়িষ্ঠ বাগ্‌বিভূতির পরাকাষ্ঠা কাব্য সৃষ্টির আবেদন—বিশ্বজনীন। অগাধ সাগরজলে ডুব দিয়া তাহার তলদেশ হইতে যেমন যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ মণি-মুক্তা আহরণ করিতে পারে, রবীন্দ্র কাব্যের রত্নাকরে ডুব দিয়া ভিন্ন রুচি বিশিষ্ট নানা শ্রেণীর পাঠক সেইরূপ অবাধে নানা বস্তু সংগ্রহ করিতে পারে। বারোয়ারিতলার ভোজে যেমন সকলেরই নিমন্ত্রণ, সকলেই "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে"—রবীন্দ্র কাব্যের আনন্দ সুধাও ঠিক সেইরূপ প্রেমিক, মুমুক্ষু, ত্যাগী, ভোগী, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, ভক্ত, ভাবুক, রসিক, দার্শনিক, মরমী সকলের জন্য। কোনো বিশেষ যুগচিহ্নিত নয়, কোনো দলীয় মতবাদ ও ফ্যাশানের খাতিরে সৃষ্ট নয় বলিয়াই এই কবিতা নিখিল চিত্তহারিণী। স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব নির্ণয় করিবার ভার মহাকালের উপর ন্যস্ত করিয়া অন্তত এ কথা দৃঢ় ভাবেই বলিতে পারা যায় যে, সর্বাঙ্গে coterie—cult এর ছাপ লাগাইয়া অধুনা কবিতা নামে যাহা বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে, রবীন্দ্রনাথের কবি-কর্ম তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দীর্ঘায়ু। প্রকৃতপক্ষে বিশাল ছায়াঘন বটবৃক্ষের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের একটি সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। বটবৃক্ষ যেরূপ অভ্রচুম্বী সেইরূপ দৃঢ় মূল,—স্বল্পায়ু লতাগুল্মের মত এত দুর্বল নয় যে একটি আঘাতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে!

আধুনিক যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। এখন তো ভোটাধিক্যই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি! সে দিক্ হইতে দেখিলেও রবীন্দ্র কাব্যের জয়! তাঁহার মত এত অফুরন্ত কবিতার উৎস কাহার? এত অধিকসংখ্যক মানুষকে এত অধিক পরিমাণে আনন্দ আর কে দিতে পারে? দিনের পর দিন অসংখ্য ব্যক্তিকে এই অশ্রান্ত আনন্দ পরিবেশন করিবার ক্ষমতা একটা অত্যন্ত সোজা ব্যাপার, এ কথা নিতান্ত বাতুল ছাড়া আর কেহই বলিবে না।

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কবির এই ক্ষোভ ও আত্মসমীক্ষা নিতান্ত অমূলক নয় বটে, কিন্তু তাঁহার তৃপ্তি ও সান্ত্বনার কারণও তো প্রচুর বিদ্যমান। এ যেন মেঠো ফুল হইয়া বনে-জঙ্গলে যেখানে সেখানে ফুটিতে পারিল না বলিয়া সৌখিন গোলাপের আত্মবিলাপ! সর্বত্রগামী হওয়াটা রবীন্দ্র কাব্যের ধাতুবিরুদ্ধ, কিন্তু বিচিত্র পথগামী হইতে পারাও তো মৃত্যুহীন সৃষ্টির লক্ষণ।—

Age cannot wither her,
Nor custom stale her infinite Variety.

শুনিতে পাই অনেকের এইরূপ ধারণা যে অদূর ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথ এ দেশের টেনিসনে পরিণত হইবেন। ভিক্টোরীয় যুগে কবি টেনিসনের যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল আজ তাহা লোপ পাইয়াছে ইহা সর্বজনবিদিত। এ যুগে টেনিসন পড়ে কয়জন? অবশ্য ইহাও সত্য যে, আমাদের এ যুগ Serious studyর যুগ নয়—পল্লবগ্রাহিতার; পাণ্ডিত্যের যুগ নয়—পণ্ডিতম্মন্যতার! সত্য কথা বলিতে কি, এখন সাময়িক পত্রিকার মালগাড়ী হইতে আমরা সাহিত্যচর্চার সস্তা রসদ সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত! যাহা হোক্, টেনিসন আজ পাঠকমহলে অনাদৃত এবং বিশ্ববন্দিত কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের পরিণামও তাহাই—এইরূপ একটা আশঙ্কা আজ অনেকের মনে দেখা দিয়াছে। ইংরেজীতে যাহাকে Fluctuating fashion বলা হয় সাহিত্যের ইতিহাস এক হিসাবে তাহারই ইতিহাস। ইহা চিন্তা করিলে এই আশঙ্কা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না বটে, কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে টেনিসন ও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একগোত্রের কবি নয়। গ্যয়টে, সেক্সপীয়র ও কালিদাসের সগোত্র রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্য, বিস্তৃতি এবং গভীরতায় টেনিসনের চেয়ে অনেক বড় কবি এ কথা খুলিয়া না বলিলেও চলিতে পারে। ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, টেনিসন Typical ইংরেজ, কিন্তু মহামানবের উপাসক রবীন্দ্রনাথকে Typical বাঙালী কে বলিবে?—"বিশ্বনিখিল আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর!" ইংরেজ রাজকবির স্বভাবসুলভ Insularity এবং রবীন্দ্রনাথের উদার বিশ্বাত্মবোধ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। টেনিসনের কবিতা ভিক্টোরীয় যুগের স্বপ্নসাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীমূর্তি। কথাটাকে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে বোধ হয় এইরূপ দাঁড়ায় যে, তাঁহার কাব্য সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে যুগের প্রয়োজনের তাগিদ। যুগধর্মকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়াই টেনিসন আজ নামসর্বস্ব কবি। উনবিংশ শতাব্দীর সমস্যাসমূহের সহিত বিংশ শতাব্দীর মানুষের প্রাণের যোগসূত্র কোথায়!—সুতরাং মেকী টাকার মতই সেগুলি এখন প্রায় অচল। ইহাই টেনিসনের ললিত কোমল কবিতার জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ। শত সমস্যা-কণ্টকিত আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার সুলভ আশাবাদ আজ নিতান্ত বালকোচিত বলিয়া মনে হয়। এইখানে তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রবীন্দ্র কাব্যসৃষ্টির মূলে যুগ-প্রেরণা কিছুটা থাকিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে, কবি তাঁহার যুগকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাদৃষ্টিসঞ্জাত বিশাল, বলিষ্ঠ, অচঞ্চল আশাবাদ ভিক্টোরীয় যুগের সুলভ আশাবাদের মত এত দুর্বল ও ভঙ্গুর নয়। সত্য কথা বলিতে গেলে, একমাত্র craftsmanship বাদ দিলে টেনিসনের কবিতায় যাহা থাকে তাহার মধ্যে মানুষের জীবন মনের চিরন্তন উপজীব্য কতটুকু? কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য?—তাহার কুহরে কুহরে নিখিলমানব-চিত্তের চিরন্তন রসায়ন! সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যের সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করিবার পূর্বে এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তবে যদি এরূপ কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি আমাদের পাইয়া বসে যে, আজ যাহাকে সোনার সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতেছি কাল তাহাকে অকারণে টানিয়া পথের ধুলায় নামাইতেই হইবে— সে কথা স্বতন্ত্র!

রবীন্দ্রকাব্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আজ যদি কাহারও মনে সংশয় জাগিয়া উঠে তবে তাহার মূলে আছে বর্তমান যুগের অস্থিরতা ও চঞ্চলতা—"Fret and fever of modern life." এই অস্থিরতা ও চঞ্চলতাই কি জীবনের সব চেয়ে বড় কথা? এ যুগের অবসানে ইহাও তো একদিন ইতিহাসের কাহিনীতে পরিণত হইবে। ইহার ঊর্ধ্বে যে শাশ্বত জীবন সত্য অম্লান ধ্রুবতারকার মত বিরাজমান, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই চিরন্তন জীবনসত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পসুষমাময় প্রকাশ। নিত্য নূতন, চমকপ্রদ মতবাদে যাহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, সাহিত্যজগতের False God চিনিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, একমাত্র তাহারা ছাড়া বোধ হয় কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি একথা মনে করিবে না যে, কালবায়ুর একটি ফুৎকারেই রবীন্দ্রকাব্য শিখা চিরতরে নির্বাপিত হইয়া যাইবে। "গুণ হ'য়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়"—আজ যদি অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়ায় অর্থাৎ রবীন্দ্রকাব্যের যাহা গুণ তাহা যদি আজ একটা মারাত্মক দোষ বলিয়া উগ্র প্রগতিবাদীর ভ্রম হয়—তবে তাহাই কি এই অদ্বিতীয় কাব্য-বিচারের শেষ কথা? ইহা কি সুস্থ মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণ? হঠাৎ যদি কেহ মণিকে কাঁচ বলিয়া মনে করিতে সুরু করে তবে কি সত্যই মণির মূল্য কমিয়া যায়? এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মানবীয় শিল্প-সৃষ্টি কখনও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বিশাল কাব্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় টি‘কিয়া থাকিবে একথা কেহই বলিবে না। বটবৃক্ষের অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে কোনটি যদি কালক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়ে তথাপি সেই মহামহীরুহ অচল অটল অবস্থায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে—ইহাই সান্ত্বনা। লোকোত্তর কবিপ্রতিভার অধিকারী হইলেও কবিগুরুর সমুদয় সৃষ্টি চিরস্থায়ী এরূপ বিশ্বাস ভিত্তিহীন। অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে যদি কিছু Ephemeral creation থাকে তাহা আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নয়। কিন্তু যেগুলি প্রথম শ্রেণীর এবং প্রকৃত রসোত্তীর্ণ সেগুলি কালজয়ী অক্ষয়, অমর এবং বাংলাভাষার "সাত রাজার ধন মাণিক।" যদি তাহা না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিমাত্রই বিরাট ব্যর্থতা!

অনেকের পক্ষেই অসহ্য! কিন্তু এই দেহসর্বস্ব জড়বাদ একটা সাময়িক বিকারমাত্র। সুতরাং ইহার কষ্টিপাথরে কবিও কাব্যকে যাচাই করিবার প্রচেষ্টা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রকাব্য বিচার প্রসঙ্গে 'বুর্জোয়া' বলিয়া কবিকে ব্যঙ্গ করিবার পূর্বে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোনো কবি 'বুর্জোয়া' কিংবা 'প্রোলেটারিয়েট' তাহার উপর তাঁহার রচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষ, স্থায়িত্ব-অস্থায়িত্ব কিছুই নির্ভর করে না। বিশেষতঃ মানব ও মানবতার শ্রেষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কতদূর সঙ্গত তাহাও বিতর্কের বিষয়। আসল কথা যে কবির কাব্যে মানবজীবনের উপজীব্য যত অধিক তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা তত বেশী। এই দিক্ হইতে দেখিলে রবীন্দ্রকাব্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইবার কারণ দেখি না। রবীন্দ্রনাথ ভঙ্গিসর্বস্ব কবি নহেন; বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তিনি 'সৌখিন মজদুরি' করিতে আসেন নাই। তাঁহার কবিতার রোমান্টিকধর্ম ফ্যাশানের খাতিরে অধুনা অচল মনে হইলেও তাহাই কবি ও কাব্যের স্বাভাবিক ধর্ম—ইহাই আশ্বাসের কথা।

গৌরীমা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গৌরীমায়ের সঙ্গে পরিচয়ের অনেক পূর্ব্বেই আমি তাঁর নাম শুনেছিলুম আমার দিদিমায়ের মুখ থেকে।

গৌরীমা ছিলেন শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা, তাঁর গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল মৃড়ানী, রুদ্রানী নামেও তিনি অভিহিতা হইতেন। পার্ব্বতীচরণ নিষ্ঠাবান, উদারচিত্ত ও সবিশেষরূপে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর পত্নী মৃড়ানী দেবীর গর্ভধারিণী ছিলেন একজন বিশিষ্টা সাধিকা, তাই এই ভক্তিমান পিতা ও ভক্তিমতী জননীর গৃহে রুদ্রাণী রূপিণী গৌরীমাতার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। "আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমনেঃ কুতঃ?" মহাকবি কালিদাসের এ মহাবাক্য ব্যর্থ নয়।

গিরিবালা দেবীর পিতা নন্দকুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষরূপই ধনীব্যক্তি ছিলেন। পুত্র সন্তান না থাকায় কন্যা গিরিবালাই তাঁর সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন, তাঁর ভগিনী বগলাদেবী পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রহণ করেন নি। তিনি মৃড়ানীর মাসীমা, এখানেও ত্যাগের দৃষ্টান্ত নেহাৎ সোজা নয়—এক বিঘা জমি নিয়ে যেথানে ভাইয়ে ভাইয়ে মাথা ফাটাফাটি হয়, মামলা চলে।

গিরিবালা দেবীর চরিত্র বহুগুণের সমষ্টিতে সংগঠিত ছিল। তিনি দীনদুঃখা আশ্রিতদের সেবায় নিজেকে যেন স'পে দিয়েছিলেন। যে কেহ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতো তিনি একান্ত সহানুভূতির সঙ্গেই তাদের প্রার্থনা পরিপূরণ করে নিজেকেই কৃতার্থ বোধ করতেন। অন্তরের মধ্য থেকেই তিনি ছিলেন জন্মগত মা। তিনি শুধু সাধিকাই নন, সুলেখিকাও ছিলেন।

শ্যামাসঙ্গীত এবং দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক কবিতা ও গান তিনি রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে তাঁর বিদ্যা, জ্ঞান ও কবিত্ব শক্তির যে একত্র সমাবেশ দেখা যায়, বড় বড় সাধক ও মহামহা ভক্ত ব্যতীত সাধারণ লেখক বিশেষ করে লেখিকাদের মধ্যে সে শক্তি কোথায়ও দেখা যায় না। এখানে মাত্র দু'চারটি ছত্র উদ্ধৃত করে তার যৎসামান্য নমুনা দিলাম, এই থেকে তাঁর লেখার উচ্চভাব, শব্দচয়নের আশ্চর্য্য নিপুণতা ও ভক্তি-ভাবের উৎকর্ষ সুস্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়।

গৌরীমা

(১)

শ্মশান শবচিতা মুণ্ড সাধনে কিবা প্রয়োজন,
কালী কালী কব আনন্দে বেড়াব কালীপ্রেমে হ'য়ে নিমগন,
অনিমা লঘিমা অষ্টসিদ্ধি তার, সাধনে নাহিক প্রয়োজন আর,
যে ধরে হৃদয়ে চরণ তোমার, করতলে তার এ তিন ভুবন॥

(২)

আমার দেহযন্ত্রে যন্ত্রী হয়ে ওরে প্রাণ.
অবিশ্রাম কর কালীর গুণ গান।
বাজায়ে দেহ-সেতারা, কর গান বলে তারা,
ভাব সদা ভবদারা, যদি ভবে চাহ প্রাণ॥

(৩)

তোর মুক্তি চাইনা মুক্তকেশী, ভক্তি অভিলাষী দাসী।
বিপদে সম্পদে পদে মন যেন রয় দিবানিশি॥

ইত্যাদি সঙ্গীতগুলির মধ্যেই তাঁর প্রগাঢ় ভক্তিভাবের সঙ্গে সুপ্রচুর বিদ্যাবত্তাও অনায়াস মাধুর্য্যে ফুটে উঠেছে।

এমন মায়ের গর্ভেই দেবী মৃড়ানীর আবির্ভাব ঘটে। আমার দিদিমায়ের সঙ্গে মৃড়ানী দেবীর পরিচয় ছিল। তাঁর কাছেই আমরা তাঁর অলৌকিক জীবনের প্রাথমিক কাহিনী যা সেদিনে নাট্যাভিনয়ের মতই চমকপ্রদ এবং অবিশ্বাস্য সে সব কথা শুনেছিলাম। তাঁর ছেলেবেলার কথা দুর্গামার লেখা জীবনরচিত থেকেও আমরা যা দেখতে পাই সেসব যেন গল্পের কথার মতই তাঁর রচনা থেকে সামান্য কিছু তুলে দিচ্ছি, তাতেই ঐ মহিমময়ী দেবীর ভবিষ্যতের স্বরূপটুকু আলোকচিত্রের মতই অলোকসামান্যরূপে ফুটে উঠবে, বহু ছন্দোবদ্ধ ভাষা দিয়েও তেমনটি দেখাতে পারা যাবে না।

"শিশুকাল হইতেই মৃড়ানীর আচরণে অসাধারণ ধর্ম্মভাব দেখা যায়। কখন কোন কারণে কাঁদিলে, ঠাকুর দেবতার নাম করিলেই বালিকা শান্ত হইতেন। খেলার ঠাকুরকে নিজেরভাবে পূজা করিতেন, ভোগ দিতেন এবং প্রাণের আনন্দে সাজাইতেন। দীনদুঃখী দেখিলে তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইত। ভিক্ষুককে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু ভিক্ষা দেওয়া না হইত, তিনি স্বস্তি অনুভব করিতেন না। কোন কিছুর জন্য আবদার বা যাচঞা তাঁহার ছিল না। খেলাধুলা, আহার বা বেশভূষায় তাঁহার কোনদিনই বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না।"

অতি শিশুকাল থেকেই তাঁর ভগবদভিমুখী মনোবৃত্তি অপ্রতিহতভাবে বিকাশ পেতে থাকে, তাঁর হাত দেখে জনৈক জ্যোতির্বিদ্যাপারদর্শী আত্মীয় 'তিনি যোগিনী হবেন' বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর তখনকার সেই কথায় যদিও তাঁর আত্মীয়বর্গ কেউই সুখী হননি, কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী, যা সত্য তাকে প্রতিহত করার মত ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই; গৌরীমাতার জীবনকে কোন এক অলক্ষ্য ঐশীশক্তি পূর্ণতার দিকে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল।

গৌরীমার পিতামাতা তাঁর শিক্ষার জন্য তৎকালীন সমাজে যতটা সম্ভব সুব্যবস্থা করেছিলেন। বিশপ রবার্ট মিলম্যান ও তাঁর ভগিনী মেরিয়া মিলম্যানের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন, কুমারী মিলম্যান মৃড়ানীর গুণে ও শিক্ষায় এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তাঁকে বিলাত পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম নিয়ে তাঁর সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তারপর তিনি আর কোনও বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নি। কিন্তু গৃহে নিজের চেষ্টায় ভবিষ্যতে তিনি অতুল জ্ঞানের অধিকারিণী হন। তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ এতই বিশুদ্ধ ছিল যে, যিনি একবার তা শ্রবণ করেছেন, তিনিই বিস্মিত হয়েছেন।

গৌরীমার মনের স্বাভাবিক গতি ছিল ভগবদভিমুখী। তাঁর মাতা ও মাতামহীর প্রভাব তাঁর এই মনোভাবের উত্তরোত্তর বিকাশের পথে সহায়ক হয়েছিল। তাঁদের অনুকরণে শিশুকাল থেকেই তিনি পূজা—অর্চ্চনায় অনেক সময় অতিবাহিত করতেন। মাতা মাতামহীর মত যেমন মা-কালীর প্রতি তাঁর বিশেষভক্তি ছিল, তেমনই ছিল তাঁর শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ। একই পরমেশ্বর যে বিচিত্ররূপে বিভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, এই সত্য বাল্যকালেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

দশ বছর বয়স থেকেই গৌরীমাকে সৎ পাত্রস্থ করার জন্য আত্মীয়-স্বজন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বিবাহ করতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না, বললেন, "তেমন বরকেই বিয়ে করবো যে কখনও মরে না।" একমাত্র ভগবান ব্যতীত কোন পুরুষকেই তিনি বিবাহ করবেন না। বিবাহে তাঁর এই আপত্তি সত্ত্বেও তাঁর আত্মীয়েরা তাঁর বিবাহ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তাঁরই ভগিনীপতি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হল, কিন্তু বিবাহের দিন রুদ্রাণী বিবাহে কিছুতেই সম্মত হলেন না। তাঁর মাতা গিরিবালা দেবীর সাহায্যে গোপনে তিনি বাড়ী থেকে পলায়ন করেন। তাঁর মাতা নির্দ্দিষ্ট লগ্নে জগৎ-স্বামীর হস্তে কন্যা সমর্পণ করলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে এই দুরন্ত সাহসিকতার কাজ গৌরীমার জননীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ গিরিবালা দেবী সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এত বড় দুনিয়াটা ঘুরে এলুম, কোথাও তো কথা কইতে ভাবতে হয়নি, কিন্তু দিদিমার কথার জবাব দিতে হিসেব ক'রে কথা কইতে হয়।" গিরিবালা দেবী যদি গৌরীমার বিবাহের দিন তাঁর কন্যার হৃদয়ে যে বৈরাগ্যের ফুল বিকশিত হ'য়েছিল, তা উপলব্ধি না করে তাঁর পলায়নের সহায়তা না করতেন, তাহলে হয়তো আজকের গৌরীমা সম্ভব হতেন না।

গৌরীমা শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে ভজনা করেছেন, তিনি তাঁর প্রিয় "দামোদরকে" বুকে ধরে সারা ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন, তাঁকেই সঙ্গী করে কঠোর তপশ্চরণ করেছেন। মা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই বেজে উঠেছে তাঁর বিজয়ডঙ্কা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বহস্তে তাঁর হাতে সন্ন্যাসের বস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই তাঁকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, সংসারের হিতার্থে, মানবের হিতার্থে আত্মনিয়োগ করতে। বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি গৌরীমাতা গুরুর নির্দ্দেশ আমরণ যত্নের মত পালন করেছেন, সুদীর্ঘকাল তিনি মাতৃজাতির সেবায় ও সমাজকল্যাণে অতিবাহিত করেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মন ভারতের অবজ্ঞাত অবহেলিত নারীজাতির ব্যথায় সর্ব্বদা ব্যাকুল হত।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর গৌরীমাকে বললেন, "ভাখ গৌরি, আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা।" তিনি বিস্মিত হয়ে গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাদা কোথায় যে চট্‌কাবো? সবই যে কাঁকর।" ঠাকুর হেসে বললেন, "আমি কি বললুম, তার তুই কি বুঝলি? এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু—তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" আরও বললেন, "সাধনভজন ঢের হ'য়েছে, এবার এ তপস্যাপূত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগবে। ওদের বড় কষ্ট।"

গুরু পরমহংসদেবের এই আদেশ তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে পালন করেছিলেন। তিনি নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় নারীর মর্ম্মবেদনা। তিনি জানতেন নারীর উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। নারী ভবিষ্যৎ জাতির জননী।

১৩০১ সালে গৌরীমা বারাকপুরে গঙ্গাতীরে যে আশ্রমের বীজ বপন করেন তাই ১৩৩১ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় "সারদেশ্বরী আশ্রম" রূপে পূর্ণতা লাভ করে। প্রাচীন ভারতের যে-সকল আচার নিয়ম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুকূল বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল তা অনেকাংশে গৌরীমা এই আশ্রমে প্রবর্ত্তন করেছিলেন। আবার আধুনিক যুগের মধ্যে যাহা তিনি কল্যাণকর বলে বুঝেছিলেন তাও গ্রহণ করেছেন। শত শত নারী এই আশ্রমে শিক্ষা লাভান্তে কল্যাণকর কাজে অগ্রসর হয়েছেন।

গৌরীমার জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি সংসারের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য চিরদিন কর্ম্ম করে গেছেন। কিন্তু তার কর্ম্ম ছিল গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম। ধন, খ্যাতি জীবনে প্রচুর এসেছে। কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলতেন "পরের সেবা করতে এসে যদি মনের কোণেও আত্মপ্রশংসার আকাঙ্ক্ষা জাগে, তবে সাধন জীবনে তা আত্মহত্যারই তুল্য জানবে।" তিনি নিজেকে ঈশ্বর ইচ্ছায় পরিচালিত যন্ত্র বলে মনে করতেন। জগৎস্বামীর ইচ্ছাই তাঁর কার্য্যের ভেতর দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করছে। এই ছিল তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। জন্মাবধি ঈশ্বরে অপার ভক্তি তাঁর জীবনকে এক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অনেক সময় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হ'য়েছে। কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁর মন তাঁর প্রিয় "দামোদরের" প্রেমে মগ্ন থাকতো। তাঁর এইভক্তি দেখে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মা বলতেন, "পাথরের একটা নুড়ি নিয়ে গৌরদাসী কি ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিলে।"

গৌরীমার অলোকসামান্য চরিত্র শুধু মাত্র কথা দিয়ে বোঝান সম্ভব নয়। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "গৌরীমার মনস্তত্ত্ব বলিতে হইলে, এই বলিতে হয় যে, তিনি অন্তরে পুরুষ বাহিরে প্রকৃতি অর্থাৎ চণ্ডীতে যাঁহাকে ("চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা") ভয়ঙ্করী ও ক্ষেমঙ্করী, রুদ্রাণী ও মৃড়ানী বলা হয়।......গৌরীমার ভিতর এই বিপরীত ভাবের সম্মিলনও আশ্চর্য্যভাব দেখিয়াছি।"

শ্মশানোৎসব

শ্রীকালিদাস রায়

চৈত্রমাসে বর্ষে বর্ষে বঙ্গভূমে এসেছে মড়ক
তাহারই শ্মশানকৃত্য গাজন চড়ক।
ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল,
তাহারে ডুবায়ে দিতে বাজে ঢাক ঢোল।
বৎসরেরও মহাযাত্রা। সেও হয় শ্মশানের শব
সে শবে ঘিরিয়া চলে বৎসরের অন্ত্যেষ্টি উৎসব।
মড়ার মাথায় যায় ভরিয়া শ্মশান,
চিতায় চিতায় জ্বলে বহ্নি লেলিহান।
শৃগাল কুকুর গৃধ্র চারিপাশে তুলে কলরোল,
তার সাথে আমাদের বাজে ঢাক ঢোল।

বৎসরান্তে শ্মশানের মহামহোৎসবে
আমরা প্রেতের সনে মাতি যে তাণ্ডবে,
সন্ন্যাসীর বেশে মহাসন্ন্যাসীর সহ
মুণ্ডের কন্দুকক্রীড়া করি ভয়াবহ।
মোরা নীলকণ্ঠের পূজারী—
কণ্ঠে ধরিয়াছি বিষ পান করি করোটি উজাড়ি।
উড়াইয়া গেরুয়া-নিশান
সারা বছরের দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ করেছি বিষাণ।

মৃত্যুরে করিনি ভয় হরিয়াছি তার বিভীষিকা,
মেতেছি তাহার সাথে। শোক তা'ত মায়ামরীচিকা,
উৎসবে দেয়নি বাধা, কালবৈশাখীর
শুষ্ক পত্র সনে তারে উড়ায়েছে ঝঙ্কার সমীর।
খেয়েছি চড়ক গাছে পিঠফুঁড়ি বেগে ঘুরপাক,
ডুবায়েছে আর্ত্তনাদ পালখে মণ্ডিত শত ঢাক।

সরকার ও সমবায় আন্দোলন

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম্-এ

যে সব বিষয়ের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত সে সব বিষয়ের মধ্যে সমবায় অন্যতম। কাজেই প্রশ্ন হতে পারে, সমবায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আসল মনোভাব কি। কৃষির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সমবায়ের ব্যাপারেও ঠিক সে ধরণের নীতি অনুসৃত হচ্ছে। মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সমবায় সম্পর্কীয় নীতিকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকার সমন্বয় সাধনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাচ্ছে, আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে এসেছেন। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকার সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সমিতির মারফৎ ঋণ দেবার জন্য বিগত কয়েক বছর ধরে যে আন্দোলন চল্‌ছে, সে আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত Rural credit committeeর পক্ষ থেকেও যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে, তা'তেও সমবায় আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে কোন আভাষ পাওয়া যাচ্ছে না। বরঞ্চ হতাশার ভাবই যেন committeeর অভিমতের ভিতর ফুটে উঠেছে। অবশ্য এর পিছনে কারণও আছে। আজও দেখা যাচ্ছে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে মোট ঋণের বেশীর ভাগ আসে অর্থলোভী মহাজনদের কাছ থেকে। অবশ্য সরকার এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে ঋণের পরিমাণ খুবই কম। যে ক্ষেত্রে গ্রামের মহাজনরা মোট ঋণের শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ সরবরাহ কচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে সরকার এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মোট ঋণের শতকরা আটভাগও পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকার প্রতিনিধি সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সে মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি বলেছেন—"The main problem that the Government may be faced with in relation to the Co-operative movement is not the extension of financial assistance. Such assistance is likely to be found on the required scale, especially when the activities of the State-Bank of India are in this regard intensified and sustained. The problem will be to see that loans and subsidies will not have the effect of deadening the movement's essential instinct of self-help and mutual help".

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতের জাতীয় আয়ের ব্যাপারে শিল্পের বিরাট অবদান রয়েছে। তবে শিল্প বলে যদি আমরা কেবলমাত্র বৃহৎ শিল্পই বুঝি তাহলে ভুল হবে। অবশ্য ভারতের গোষ্ঠী জাতীয় আয়ের ভিতর বৃহৎ শিল্প থেকে প্রায় পাঁচশত পঞ্চাশ কোটী টাকা পাওয়া যায়। কাজেই যে ধরণের শিল্প জাতীয় আয়ের পরিমাণ অতটা বাড়িয়ে দিচ্ছে অর্থ নীতির ক্ষেত্রে সে ধরণের শিল্পের গুরুত্ব অনেকখানি, তাই বলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। বরঞ্চ এগুলোর উন্নতির দিকে আরো বেশী লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ এগুলোর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশ এগুলো থেকেই আসছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, জাতীয় আয়ের ব্যাপারে ক্ষুদ্র শিল্পগুলো থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে তার পরিমাণ হল নয়শত দশ কোটি টাকা। অথচ বৃহৎ শিল্পগুলো থেকে আসছে পাঁচ শত পঞ্চাশ কোটি টাকা। কাজেই জাতীয় আয়ের দিক থেকে বৃহৎ শিল্পের চাইতে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব বেশী ছাড়া কম নয়। এটা সত্যি আনন্দের কথা যে, ভারতের দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনায় সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং কিভাবে এই আন্দোলনকে ব্যাপক এবং শক্তিশালী করা যেতে পারে সেজন্য পরিকল্পনার রচয়িতারা কতকগুলো মূল্যবান সুপারিশ করেছেন। সুপারিশগুলো বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, পরিকল্পনার রচয়িতারা প্রধানতঃ দুটো বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রথমতঃ কিভাবে চাষীর অবস্থার উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর সে সম্বন্ধে এঁরা চিন্তা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এঁরা চাষ এবং কৃষি সম্বন্ধীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে সুপারিশ করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনায় চাষী এবং কৃষির উন্নত সম্পর্কীয় সমস্যা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে কিনা। নিশ্চয় করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সমবায় গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা সমবায় শ্রমিক সমিতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি সে কথাটি হল এই যে, দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনায় চাষীর অবস্থা এবং কৃষি সম্পর্কীয় ব্যাপারের উপর যে ধরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ঠিক সে ধরণের গুরুত্ব সমবায় গৃহনির্ম্মাণ কিম্বা সমবায় শ্রমিক সমিতির উপর আরোপ করা হয় নি, যদিও এই শ্রেণীর সমিতির সমস্যাবলী সহানুভূতির সাথে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনায় চাষীর অবস্থা এবং কৃষি সম্পর্কীয় ব্যাপারের উপর অতটা জোর দেবার পিছনে সঙ্গত কারণ ও রয়েছে। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ভারতের অধিবাসীদের শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জনের পক্ষে চাষের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। তাই পরিকল্পনার রচয়িতারা কৃষি সম্পর্কীয় সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ভারতে বর্ত্তমানে যে সব সমবায় সমিতি

আছে সে সব সমিতির পাঁচভাগের তিনভাগ কৃষি-ঋণ দানের ব্যাপারে জড়িত। যদিও ঠিক ভাবে সংখ্যা নির্ণয় করা কষ্টকর তবুও মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে সব সমবায় সমিতির হাতে কেবলমাত্র কৃষি-ঋণ সম্পর্কীয় দায়িত্ব ন্যস্ত, সে সব সমিতির সংখ্যা এক লাখের অনেক উপর। সমিতিগুলোর কর্ত্তব্য হচ্ছে টাকা দাদন দেওয়া। তবে সমিতির সভ্য ছাড়া অন্য কোন লোক টাকা পাবার অধিকারী নন। হিসাব করে দেখা গেছে, এই ধরণের সমিতির মারফৎ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকার মধ্যে দাদন দেওয়া হয়ে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে, ঋণদানের ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলো কৃষির উপর কেন অতটা গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার, বর্তমানে ভারতের যা জাতীয় আয় একমাত্র কৃষি থেকে তার অর্দ্ধেক পাওয়া যায়।

ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দুটো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথম বছরে এগার কোটী টাকা নির্দ্ধারিত হয়েছে। প্রথমতঃ সমবায় সমিতির কর্জ্জ দাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে গুদাম তৈরী করা। এ ছাড়া আশা করা যাচ্ছে, সমবায় সমিতিগুলোকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে নূতন শাখা অফিস খুলতে এগিয়ে আসবেন। পঞ্চাশ বছরের কিছু আগে আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বিগত ১৯০৪ সালটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এঁরা বলেন, প্রকৃতপক্ষে এই সাল থেকেই ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু হয়েছে। বর্তমানে সমবায় সমিতির সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এই সংখ্যা দেড় লাখের অনেক উপর। এ ছাড়া সমিতিগুলোর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণও কম নয়। মোটামুটিভাবে হিসাব করে দেখা গিয়েছে, তিনশত পঞ্চাশ কোটি টাকার কাছাকাছি কার্য্যকরী মূলধন নিয়ে সমবায় সমিতিগুলো কাজ করে যাচ্ছেন। দিনের পর দিন এগুলোর কার্য্য-পরিধি বিস্তৃত হয়ে চলছে। ফলে সভ্যসংখ্যাও ক্রমাগত ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ভারতের সমবায় সমিতিগুলোর মোট সভ্যসংখ্যা এক কোটির অনেক বেশী। সমবায় সমিতির কর্জ্জদাদন এবং গুদাম তৈরী করা এই দুটো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতের দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছর থেকে প্রত্যেক বছর দশ কোটি টাকা খরচ হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনার প্রথম বছরে এগার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে আমরা আগেই বলেছি। জানা গেছে, এই ভাবে টাকা খরচ করার জন্য গোটা চারেক ফাণ্ড খোলার ব্যবস্থা হবে। ফাণ্ডগুলোকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা হবে বলে প্রচার করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগে দুটো করে ফাণ্ড থাকবে। প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত ফাণ্ড দুটোর কার্য্যাবলী কৃষিঋণদান সম্পর্কীয় ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত ফাণ্ড দুটোর কার্য্যপরিধি সীমাবদ্ধ থাকবে বিক্রয় সমিতি সম্পর্কীয় ব্যাপারের মধ্যে। তবে বর্তমান মুহূর্তে যে জিনিষটি খুব প্রয়োজনীয় সেটী জনৈক সাংবাদিক চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল "The need is probably greater for field-workers who can propagate the co-operative ideal with knowledge and understanding than for desk-workers who would do the existing work in co-operatives better."

সমাধান

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

জীবনাঙ্কের জটিল প্রশ্নটা ;
যুগ যুগ ধরে তার উত্তর মেলেনি,
মানুষ খুঁজে পায়নি সমাধানের প্রণালী,
সাংখ্যমানের দুরূহতার মাঝে, সে পায়নি পথ।
বীজগণিতের বীজমন্ত্রে—
কে যেন আবিষ্কার করলো প্রতীক চিহ্ন—"ভগবান"
অজানা মানের পরিবর্ত্তে।
সরলতর হলো সমস্যা,
সমাধানের পথ হ'লো সুগম,
জটিলতার জট ছাড়িয়ে উত্তর মিললো সহজেই—
"মা ফলেষু কদাচন"।

শ্রীবৃন্দাবনে নূতন মন্দির—

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড উদ্ধার করিয়াছিলেন—পরে শ্রীরূপ শ্রীসনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তগণ রাধাকুণ্ডে বাস করিয়া স্থানটিকে সর্বজনপরিচিত করিয়া দেন। যে তমাল বৃক্ষতলে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে একটি জীর্ণ মন্দিরে মহাপ্রভুর বিগ্রহের সেবা হইয়া থাকে। তাহার নিকট একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র ঘরে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের ২টি মনোহর বিগ্রহ আছে। সম্প্রতি ঐ জীর্ণ মন্দির সংস্কার করিয়া তথায় একটি ভক্ত-নিবাস প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছে। আসামের প্রাক্তন শিক্ষা-ডিরেক্টার ভক্তপ্রবর শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার থাকাকালীন এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন ও শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহান্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দাসকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন। বর্তমানে সতীশবাবু শ্রীহরিদাস নামানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া ১৩এ ডোভার রোড কলিকাতা-১৯ ঠিকানায় বাস করিতেছেন। ঐ কাজের জন্য মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। রাধাকুণ্ড তীরে নূতন মন্দির নির্মাণে ৩০ হাজার টাকা, পুরাতন মন্দির মেরামত ও কীর্তনভবন নির্মাণে ২০ হাজার টাকা ও ৪০ জন ভক্তের বাসের জন্য ভক্ত-নিবাস নির্মাণে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। সহৃদয় বৈষ্ণবগণ সাধ্যমত অর্থ উত্তরপ্রদেশ, জেলা মথুরা, পোষ্ট রাধাকুণ্ডের মহান্ত শ্রীগৌরাঙ্গদাসজীর নিকট প্রেরণ করিলে কার্য্য সুসম্পাদিত হইবে। শ্রীবৃন্দাবন বাঙ্গালীর প্রিয় ও পবিত্র তীর্থ। আমাদের বিশ্বাস এই সদনুষ্ঠানের জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

মিথিলায় বাংলা সাহিত্য সংস্থার অনুষ্ঠান—

গত ২০শে মাঘ (ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী) দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল কলেজের বাংলা সাহিত্য সংস্থা 'সন্ধ্যা মজলিসের' বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও রামপদ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন দার্শনিক রঙীন হালদার মহাশয়। মনোরম পরিবেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রারম্ভে মজলিশের স্থায়ী সভাপতি সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ অতিথিদের পরিচয় দেন। ছাত্র-সম্পাদক অমৃত আচারি কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। এঁদের প্রতিটি রচনাই সাহিত্য গুণান্বিত এবং আবৃত্তি সুললিত হওয়াতে সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। প্রবন্ধ ও গল্পের প্রথম স্থানাধিকারীরা পুরস্কৃত হন। প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় একটি নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ দেন; বাংলা ও মিথিলার প্রাচীন প্রীতিবন্ধনের ধারাটি প্রবাসী বাঙালী ছাত্রেরা এখনও এমনই একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে নিয়ে চলেছেন বলে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রদেশগত ভাষার প্রাচীর দিয়ে নিজেদের দূরে রাখার দিন আজ নাই, সাহিত্যের মাধ্যমে দেশে দেশে—জাতিতে জাতিতে আর্য্যমানবীয় ঐক্যের বন্ধন এখন সুদৃঢ় হচ্ছে; এই সাধনাই কালধর্ম্ম—তথা জীবনধর্ম্ম।

অতঃপর রবীন্দ্রকাব্যে মানবতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন বিশিষ্ট অতিথি রঙীন হালদার। সভাপতি মহাশয় দ্বারভাঙ্গার বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিচয় দেন সংক্ষেপে। ১৩৫৩ সাল থেকে প্রতি বৎসর মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের মিলিত উদ্যমে এই সাংস্কৃতিক মিলনোৎসব হয়ে আসছে। স্থানীয় ও প্রাচীন বাঙ্গালী ছাড়াও বঙ্গ-ভাষানুরাগী বহু মৈথিল সুধীও এই সভায় যোগদান করেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত জয়ন্তী—

কবি ঈশ্বর গুপ্ত ১২১৮ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার স্মৃতিতে

কবির জন্মস্থান ও পৈতৃক ভিটা (কল্যাণীর অন্তর্গত) নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লী গ্রামে (কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে নিকটে) তাঁহার জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ উৎসব কমিটীর মূল সভাপতি ও ২৪ পরগণা হালিসহর নিবাসী শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু সাধারণ সম্পাদক হইয়া একটি উৎসব কমিটী গঠিত হইয়াছে। কমিটী অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত কবির রচিত ও সম্পাদিত সকল গ্রন্থ ও পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবেন, কাঞ্চনপল্লীতে কবির নামে যে পাঠাগার আছে তাহাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিবেন ও কবির ভিটার সংস্কার করিয়া তাহাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া তথায় একটি স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপন করিবেন। গত ৯ই মার্চ উৎসব আরম্ভ হইয়াছে ও তাহা কিছুদিন ধরিয়া চলিবে। ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতি রক্ষায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর সহযোগিতা করা কর্তব্য।

পরলোকে সুনির্মল বসু—

সম্প্রতি বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসু ঢাকুরিয়া সেলিমপুর রোডে তাঁহার নিজ বাসভবনে করোনারী থ্রম্বসিস রোগে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছে। মৃত্যু-কালে তাহার বয়স আনুমানিক ৫৬ বৎসর ছিল। কিছুকাল যাবৎ তিনি নিম্ন রক্তচাপ রোগে ভুগিতেছিলেন এবং ৪ঠা মার্চ সকাল হইতে তাঁহার অসুস্থতা সহসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। স্বর্গত বসুর পূর্বনিবাস ঢাকা জেলার মালখানগরে। তাঁহার পিতা পশুপতি বসু বিখ্যাত অভ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি পিতার কর্মস্থল গিরিডিতেই বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার তিনি দৌহিত্র। গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ স্বর্গত বসু তাঁহার অজস্র সৃষ্টিতে বাংলা শিশুসাহিত্যিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ছোটদের গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, ছড়া প্রায় সকল বিষয়ে তিনি সমান দক্ষতা দেখান। তবে ছোটদের কবিতা ও ছড়ায় তাহার ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। তিনি প্রায় ২ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈ চৈ, হুলুস্থুল, কথা শেখা, পাততাড়ি, মরণের ডাক, ছন্দের টুংটাং প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখা বইয়ের জনপ্রিয়তা এত অধিক যে, কোনো কোনো বই নাকি মাসে প্রায় ১৭।১৫ হাজার করিয়া বিক্রয় হয়। তিনি ছোটদের চয়নিকা এবং ছোটদের "গল্প সঞ্চয়ন" নামক সংকলনগ্রন্থ দুইখানিও সম্পাদনা করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার আত্মা শান্তিলাভ করুক ইহাই সর্বান্তঃকরণে আমরা কামনা করি।

দশ দফা আদর্শ—

ভারত সেবক সমাজ ভারতের জনগণের আচরণ সম্পর্কে দশ দফা আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। ভারত সেবক সমাজের সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু এই আদর্শ অনুমোদন করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—(১) রাজনৈতিক বিরোধ সত্ত্বেও ভারতের জনগণকে দেশরক্ষার্থ ঐক্যবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং সবসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর কার্য্যসূচি একযোগে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। (২) বর্ণ, ধর্ম ও ভাষাগত বিরোধের উর্ধ্বে সকলকে উঠিতে হইবে এবং জাতিকে এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে (৩) অপরের স্বার্থের নিকট নিজের স্বার্থকে গৌণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং সকলকে সুনাগরিক হইতে হইবে (৪) হিংসা, ধর্মগত সংস্কার, উচ্চনীচ ভেদাভেদবাদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে হইবে (৫) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া উহার রূপায়ণে সহযোগিতা করিতে হইবে (৬) প্রত্যহ গঠনমূলক কার্য্যে অন্তত এক ঘণ্টা কায়িক শ্রম করিতে হইবে (৭) নিজের শরীর, গৃহ, রাস্তাঘাট, গ্রাম ও সহর পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে (৮) নারীকে মর্য্যাদা দান করিতে হইবে এবং শিশুদের ভালবাসিতে হইবে (৯) মদ্য ও মাদকদ্রব্য বর্জন, খাদি পরিধান ও কুটীর শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে (১০) খাদ্যদ্রব্যে ভেজালদান, উৎকোচ গ্রহণ ও স্বজনতোষণ পরিহার করিতে হইবে।

কর্পোরেশন প্রসূতি সদন—

গত ৩রা মার্চ রবিবার সকালে পূর্ব কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে ৫৯নং ক্রিষ্টোফর রোডে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একটি কর্পোরেশন প্রসূতি সদনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। স্থানীয় এম-এল-এ শ্রীপুলিন বিহারী খটিক প্রায় ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে তিন বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রসূতি সদনের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে দান করিয়াছেন। ঐ জমীর উপর ৪ লক্ষ

টাকা ব্যয়ে ত্রিতল বাড়ী নির্মিত হইবে– তথায় ৬৫টি শয্যার ব্যবস্থা হইবে। কলিকাতা সহরের সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। স্থায়ী অধিবাসীদের সকল অভাব অভিযোগ দুর করা ছাড়া ও প্রত্যহ কলিকাতায় সকালে যে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া সন্ধ্যায় চলিয়া যায়, তাহাদের অভাব অভিযোগের কথাও সরকারকে চিন্তা করিতে হয়, চিকিৎসার জন্য ও প্রত্যহ হাজার হাজার লোক সহরতলী হইতে কলিকাতায় আসিয়া থাকে। সরকার ক্রমে ক্রমে সব সমস্যার সমাধান করিবেন। শ্রীখটিক জমী দান করিয়া যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন সহরের সকল ধনী অধিবাসী তাহার অনুকরণ করিলে সরকারের পক্ষে সমস্যাগুলির সমাধান সহজ হইবে।

কোন্নগরে নূতন কলেজ—

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রবিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় হুগলী জেলার কোন্নগরের নিকটস্থ নবগ্রাম নামক সমবায় উপনিবেশে হীরালাল পাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত থাকেন। শ্রীহীরালাল পাল নামক এক ধনীর দানে প্রধানত এই কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। নূতন উপনিবেশে জনগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ঐ অঞ্চলের একটি বড় অভাব দূর করিতে সমর্থ হইল। ঐ অঞ্চলে লোকসংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে— কাজেই চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া কলেজে ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান হয় না। নবগ্রামের অধিবাসীদের এই উদ্যম ও চেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়।

দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য ভবন—

স্বর্গত দুর্গাদাস শীলের দেবোত্তর ও দাতব্য সম্পত্তির ট্রাষ্টি ও সেবায়েৎগণের উদ্যোগে কলিকাতা মদন দত্ত লেনে "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীউ ছাত্র সেবাভবন" এর উদ্বোধন গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন হইয়াছে। তথায় দুঃস্থ ও দরিদ্র ছাত্রগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ উৎসবে বর্দ্ধমানের মহারাণী অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, বিচারপতি শ্রীএচ-কে-বসু সভাপতিত্ব করেন ও অধ্যাপক ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রধান অতিথি ছিলেন। কলিকাতা সহরে এইরূপ জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান যত অধিক হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

পরলোকে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—

বহু শিশুপাঠ্য গ্রন্থের লেখক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য গত ৪ঠা মার্চ সকালে ৭১ বৎসর বয়সে কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অধুনালুপ্ত ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স পুস্তক-প্রকাশ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক ছিলেন এবং পরে আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ ও ভারত পত্রের সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেল—

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলের উন্নতিতে কি ভাবে সাহায্য করা হইবে, সে বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের টেকনিকাল মিশনের পক্ষ হইতে ৪ জন সদস্য গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রেলওয়ে বোর্ডের রেল চলাচলের ডাইরেক্টার শ্রী বি-সি মল্লিক ও পোর্ট কমিশনার্সের সভাপতি শ্রী আর-কে মিত্রকে লইয়া কলিকাতা ও সহরতলী প্রভৃতির রেল ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন ও তাহার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। ভারতের রেল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে সেজন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া গেলে সত্বর পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করা যাইবে। প্রতিনিধিরা ধানবাদ, আসানসোল, বোকারো, সিন্ধ্রি ও চিত্তরঞ্জন দেখিবার পর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এ অঞ্চলের রেলের সর্বপ্রকার উন্নতি বিধানের কথাই তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন।

যাদুকর এ-সি-সরকার—

সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'পি-ই-এন'এর এক বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সম্প্রতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাদুকর শ্রী এ-সি-সরকার তাঁর বিশ্ববিখ্যাত যাদুর খেলাগুলির কয়েকটি প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত অভ্যাগতদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দন ও প্রশংসা লাভ করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁহার সাম্প্রতিক ইয়োরোপ সফরকালে বিদেশ হইতে সংগৃহীত দুই একটি খেলাও প্রদর্শন করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠ-গীটারের সুর মূর্চ্ছনার দ্বারাও তিনি দর্শকমণ্ডলীর চিত্তজয় করেন।

কলিকাতায় নূতন আদালত—

২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সকালে কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী কলিকাতার নূতন সংস্কার-করা টাউন-হল ভবনে 'নগর দেওয়ানী' ও 'নগর দায়রা' আদালতের উদ্বোধন করেন। এই দুইটি নূতন আদালত প্রতিষ্ঠার ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিচার-পরিচালনার ব্যাপারে সমতা স্থাপনে সাহায্য করিবে বলিয়া সকলে আশা করেন। উৎসবে বিচার-মন্ত্রী শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ঐ ২টি আদালতের জন্য হাইকোর্টের উত্তরদিকে নূতন বিরাট গৃহ নির্মিত হইতেছে। বিচারে বিলম্ব দূর নূতন আদালত প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য।

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা ও জীবিকার সমস্যা—

বঙ্গীয় মূক-বধির সঙ্ঘের এক অধিবেশনে মূক-বধির-দিগের শিক্ষা ও জীবিকার সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, পশ্চিম-বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ মহাশয়। জনসাধারণ, সরকার ও কর্পোরেশন যাহাতে বাংলার মূক-বধিরদিগের জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করেন সেজন্য তিনি আবেদন জানান। শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীনলিনী-মোহন মজুমদার সাঙ্কেতিক ভাষায় শ্রীঘোষের বক্তৃতার সারাংশ উপস্থিত মূক-বধিরগণকে বুঝাইয়া দেন। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার নন্দী সঙ্ঘের সদস্যগণের সহিত শ্রীঅতুল্য ঘোষের পরিচয় করাইয়া দেন।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ শিশুশিল্প প্রদর্শনী—

লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনসটিট্যুটে বর্তমানে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয় ও হংকংয়ের শিশুদের অংকিত কতকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র ও ড্রয়িং দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইনসটিট্যুটের আর্ট গ্যালারীতে কমনওয়েলথের ২০টি বিভিন্ন দেশের শিশুদের রচিত দুই শতাধিক শিল্প নিদর্শনের সমাবেশ করা হইয়াছে। আলোচ্য প্রদর্শনীতে বিশ্বের বহু দেশ ও জাতির শিশুদের শিল্পকর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়। শিশুশিল্পীদের বয়স ৭ হইতে ১৭-র মধ্যে। ব্রিটিশ কাউনসিল এবং শিল্পের-মাধ্যমে-শিক্ষা-সমিতির সহায়তায় উদ্যোক্তারা উক্ত শিল্পবস্তুসমূহ সংগ্রহ করেন।

বাঙ্গালীর সম্মান লাভ—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীঅমলকুমার সরকার গত ৪ঠা মার্চ নয়াদিল্লীতে সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হইয়া শপথগ্রহণ করিয়াছেন। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত আছেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ। বাঙ্গালী শ্রীসরকারের এই সম্মানলাভে বাঙ্গালার গৌরব বর্দ্ধিত হইল।
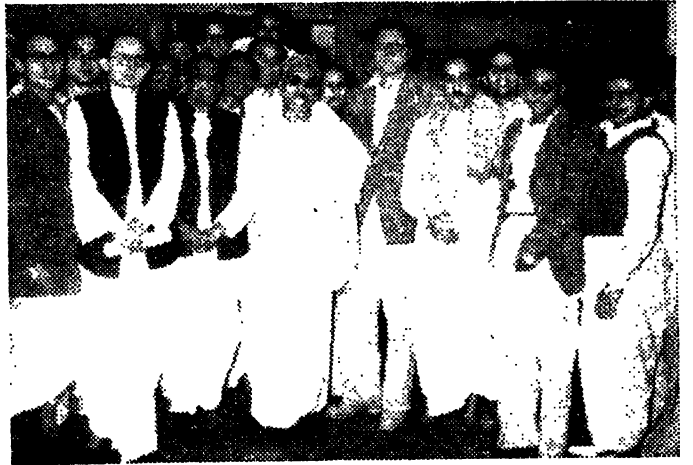
বঙ্গীয় মূক-বধির সংঘের অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ

পরলোকে বি-জি-খের—

বোম্বায়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার (লণ্ডন), প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা বি-জি-খের গত ৮ই মার্চ সকালে পুনায় ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৫৪ সালে তাঁহার পত্নী পরলোকগমন করেন। তাঁহার ৫ পুত্র বর্তমান, তিনি ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রথমে উকীল পরে ১৯১৮ সালে সলিসিটার হন। ১৯২০ সালে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে

প্রবেশ করেন ও বারদৌলী সত্যাগ্রহ তদন্ত কমিটীর সদস্য হন ও দলের নেতা হইয়া মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকিয়া পরে রাজ্যসভার সদস্য হন ও লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। তিনি ভাষা কমিশন ও গান্ধী স্মারকনিধি কমিটীর সভাপতি ছিলেন।

সংগীত-শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২৩ রাজা সন্তোষ রোড, আলিপুরের সুরম্য ভবনে কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানি ভারতখ্যাত গায়ক ও সুরকার হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানান। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, ঈ, জর্জ এই উপলক্ষে হেমন্তকুমারকে একটি ব্রোঞ্জের সরস্বতী মূর্তি উপহার দেন। মূর্তিটি বিশেষভাবে নির্মাণ করেন স্বনামধন্য শিল্পী কুমার রবীন রায়। রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রী পি, কে, সেন তাঁহার ভাষণে বিদেশেও হেমন্তকুমারের খ্যাতির উল্লেখ করেন। তিনি হেমন্তকুমারের চারিত্রিক মহত্ব ও নিরভিমান ব্যবহারের বিশেষ প্রশংসা করেন। শিল্পীদের পক্ষ হইতে শ্যামল মিত্র হেমন্তকুমারকে অভিনন্দন জানান। হেমন্তকুমার প্রতিভাষণে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় বহু শিল্পী, সঙ্গীত-পরিচালক, চিত্রপরিচালক সহ হেমন্তকুমারের পিতামাতা ভ্রাতা ও পত্নী প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ একজন বাঙ্গালী গুণী গায়কের সর্বভারতীয় সম্মানলাভে বাঙ্গালীমাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা

শ্রীনির্মলকুমার সেন—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের ডেপুটী লিগাল রিমেমব্রান্সার শ্রীনির্মলকুমার সেন গত ৭ই মার্চ রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীসেন এম-এ, এল-এল-বি।

পরলোকে হানা সেন—

নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের প্রাক্তন সভানেত্রী প্রসিদ্ধ সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী হানা সেন গত ৩রা মার্চ শেষ রাত্রে ৬২ বৎসর বয়সে নয়াদিল্লীতে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সারা জীবন নারীজাতির উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড, কেন্দ্রীয় মাতা ও শিশুকল্যাণ সংস্থা প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, জাতীয় সঞ্চয় অভিযান প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কাজ করিতেন।

বনগাঁতে নূতন হাসপাতাল—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল দূরে বনগাঁতে চাঁপাপাড়া ময়দানে নবনির্মিত একটি ৫৮টি শয্যাবিশিষ্ট মহকুমা হাসপাতালের উদ্বোধন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রায় জানাইয়াছেন যে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩১টি মহকুমা হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটির কাজ শেষ হইয়াছে ও

বাকীগুলি নির্মিত হইতেছে। জেলা হাসপাতালগুলিকেও বড় করা হইতেছে। দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের আয়োজন সম্পূর্ণপ্রায়। প্রতি ইউনিয়নে পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও তাহার উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই চিকিৎসক —কাজেই চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে তিনি সর্বদা অবহিত।

তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

২৬শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় নদীয়ার সর্বজনপ্রিয় নেতা তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪ বৎসর বয়সে ফুলিয়ার নিকট মোটর দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি, নদীয়া জেলা বোর্ডের সভাপতি, নদীয়া জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি, নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সকাল ৭টায় তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া রাণাঘাটের দিকে যাইতেছিলেন—পথে জিপ-গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ায় ঘটনার ১০ মিনিটের মধ্যে তিনি মারা যান। ১৯১৭ সালে রাজনীতিতে যোগদান করিয়া তিনি সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন —এই বয়সেও তিনি সর্বক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। এই ধরণের নিস্বার্থ কর্মী দেশে অতি বিরল।

পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য—

করাচীর মার্কিন রাষ্ট্রদূত কার্য্যালয়ের অর্থনীতিক উপদেষ্টা মিঃ হুইটম্যান গত ৫ই মার্চ ঢাকায় যাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে আমেরিকা ১৯৫২ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে পাকিস্তানকে ১৯৬ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্য প্রদান করিয়াছে। ১৯৫৭ সালে আরও ৭৮ কোটি টাকা প্রদান করিবে স্থির করিয়াছে। স্বাধীন পাকিস্তানকে সর্ব বিষয়ে উন্নত করাই আমেরিকার এই দানের উদ্দেশ্য। কম্যুনিষ্ট প্রভাব হইতে মুক্ত রাখার জন্য আমেরিকা যে সকল দেশকে অর্থদান করিতেছে, পাকিস্তান তাহাদের মধ্যে চতুর্থ। অপর তিনটি দেশের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক টাকা পাইয়াছে। পৃথিবীতে ২টি দল নিজ প্রভাব বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত—এক সোভিয়েট রাশিয়া ও অপর আমেরিকা। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা কোথায় গিয়া শেষ হইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক খ্যাতনামা পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য গত ২৪শে জানুয়ারী ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা হাতিবাগানের বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২৪পরগণা হরিনাভির প্রসিদ্ধ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৩ সালে এম-এ পাশ করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন—পর বৎসর তিনি 'বিদ্যারত্ন' উপাধিও লাভ করেন। দীর্ঘকাল বেসরকারী ও সরকারী কলেজে কাজ করার পর ১৯৩০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপনা কাজে ৫ খানি ও অবসর গ্রহণের পর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াও তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত-প্রধান স্থানে ও পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বংশের ও দেশের সুনাম সম্পূর্ণ ভাবে বজায় রাখিয়া গিয়াছেন—ইহাই দেশের পক্ষে সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

সিমেণ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি—

ভারতবর্ষে সিমেণ্টের কারখানাগুলিতে বর্তমানে বৎসরে মাত্র ৬০ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এদেশে বার্ষিক সিমেণ্ট উৎপাদন আরও এক কোটি টন বাড়িবে। ৫ বৎসরের শেষে বার্ষিক ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। এখন ভারতে ২৮টি সিমেণ্ট উৎপাদন কারখানা আছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৪টি হইবে। ৩১টি নূতন কারখানা ও কয়েকটি কারখানার সম্প্রসারণের ফলে অধিক সিমেণ্ট উৎপন্ন হইবে। বর্তমানে সিমেণ্ট শিল্পে ৪০ কোটি টাকা খাটিতেছে ও প্রায় ৩০ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। আরও ৬০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়া নূতন ব্যবস্থায় আরও ৫৫ হাজার শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান হইবে। এই ভাবে ভারতে সকল প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্পর্কে ভারতবাসীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

দশমিক মুদ্রা—

আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৫৭) হইতে ভারতের সকল ট্রেজারী, সাব-ট্রেজারী, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সকল আফিস, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সকল শাখা, স্টেট ব্যাঙ্ক হায়দরাবাদ ও ব্যাঙ্ক অব মহীশূরে প্রচলিত পয়সার পরিবর্তে দশমিক মুদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। বর্তমানে এক পয়সা, দুই পয়সা, এক আনা ও দুই আনার যে মুদ্রাগুলি বাজারে চলে সেগুলি আগামী তিন বৎসর পর্যন্ত চালু থাকিবে। প্রচলিত মুদ্রাগুলি পরিবর্তন করিয়া লইবার জন্য ট্রেজারীতে বেশি ভিড় করিবার প্রয়োজন নাই, কিংবা কোনো ট্রেজারীতে ব্যাঙ্কে দশমিক মুদ্রার অভাব দেখিলে হতাশ হইবার কোনো হেতু নাই। টাকার মূল্য বর্তমানের অনুরূপ থাকিবে, কিন্তু এক টাকার ৬৪ পয়সা বা ১৯২ পাই না হইয়া ১০০ নয়া পয়সা হইবে। আধুলি ও সিকি অর্ধ টাকা এবং সিকি-টাকা বলিয়া চলিবে, আর সেগুলির পরিবর্তে ৫০ ও ২৫ নয়া পয়সা পাওয়া যাইবে।

বাঙালী শিক্ষাব্রতীর কৃতিত্ব—

ডাঃ তপনকুমার রায়চৌধুরী এম. এ., ডি. ফিল (কলি) সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বি[ষয়] হইল—মুসলমান আমলে বাংলার আর্থিক ও সামাজি[ক] অবস্থা। তাঁহার "থিসিস্" বিশেষভাবে প্রশংশিত হইয়া[ছে] এবং প্রকাশ যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় উহা পুস্তকাকা[রে] প্রকাশ করিবেন। ডাঃ রায়চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল[য়ে] লেকচারার হিসাবে কাজ করিতে থাকার সময় তি[নি] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যান।

মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই কলিকাতা ইডেন গার্ডে[নে] মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। পূর্বেই কলিকাতা সহরে কোন প্রকাশ্য স্থানে গান্ধীজি[র] মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। মূর্তিটি ইডে[ন] গার্ডেনে না বসাইয়া কোন বড় পার্কে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হইলে ভাল হয়।

— সাত —

ডাক্তারেরা বললেন, ফার্স্ট স্ট্রোক। কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে এর পর থেকে।

আরক্তিম চোখ দুটোকে আরো রক্তাভ করে শিবশঙ্কর কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এখনো চৈতন্যের স্বাভাবিক সীমায় উত্তীর্ণ হননি। আশ-পাশের সমস্ত মুখ-গুলো তখনো ছায়া-ছায়া ঠেকছে তাঁর কাছে।

প্রীতি ডাকল, বাবা?

আস্তে পাশ ফিরে শিবশঙ্কর বললেন—আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।

সেই ভালো। আজ ওঁকে বিরক্ত করে দরকার নেই।

সত্যজিৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাসপাতাল। বাতাসে য়্যান্টিসেপটিকের গন্ধ। নার্সদের সতর্ক চলাফেরা —ডাক্তারের ভারী জুতোর শব্দ। য়্যাম্বুলেন্সের গাড়ি থেকে নামিয়ে একজনকে স্ট্রেচারে করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রুগ্ন কালো একখানা হাত ঝুলে পড়েছে স্ট্রেচার থেকে—দুলতে দুলতে চলেছে সেটা। সামনের পথ দিয়ে একজন জমাদার একটা বালতি নিয়ে চলেছে—সেদিকে চোখ পড়তেই সত্যজিৎ চমকে উঠল। বাল্তি-ভরা লাল রঙের কী ও? রক্ত? অত রক্ত?

একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো সত্যজিৎ। হাস-পাতাল। সমস্ত জীবনটাই হাসপাতাল। প্রত্যেকেই প্রকৃত ব্যাধির শিকার। ইন্দ্রজিৎ—শিবশঙ্কর—প্রীতি—পূর্বশ্রী—সে নিজে। মৃত্যু আর ওষুধের গন্ধভরা একটা প্রকাণ্ড ঠাণ্ডা হলঘরে পাশাপাশি খাটে তারা প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে। তাদের প্রত্যেকের চোখের তারা স্থির হয়ে আছে ওই হলঘরের একধারে একটা কালো দরজার দিকে। সেই দরজার ওপাশে মর্গ। সেখানে আরো গভীর ছায়া—আরো কঠিন শীতলতার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছে তারা। তারা প্রত্যেকেই।

সত্যজিৎ শিউরে উঠল একবার। দাঁতে দাঁতে ঠক-ঠক করে বাজল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা। 'ওগো মরণ হে মোর মরণ।' না—তা নয়। জীবনানন্দ দাসের 'লাশ-কাটা ঘর।'

প্রাণবন্ত এক ঝলক উচ্ছ্বসিত হাসি। খানিকটা উত্তপ্ত আলো যেন তীরের মতো এসে বিদ্ধ করল লাশকাটা ঘরের মৃত্যুশীতল অন্ধকারকে। দুটি নার্স। তাদের একজন খুশির হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। মেয়েটির বয়েস অল্প, মুখখানি সুন্দর, হাসিটি আরো সুন্দর।

সত্যজিতের পূরবীকে মনে পড়ল।

আর পূরবীর মনে পড়ল 'দি ইনভিটেশন।' সত্যজিৎ পড়াচ্ছিল।

"Away, away from men and towns,
To the wild wood and the downs—
To the silent wilderness—"

Silent wilderness! কোথায় সে? গলির ভেতরে এই দোতলা বাড়িটার ঘরে ঘরে ভাড়াটে। সামনেই বারান্দায় পাশের ঘরে দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মুড়ির বাটি সামনে নিয়ে সমানে চিৎকার করছে—কলতলায় ঝনঝন করে বাসন আছড়াতে আছড়াতে তাদের মা গর্জন

করছে : খা—খা— এধারে আমাকে খা। চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন পুলিশ কোর্টের মোক্তার খগেশবাবু। দোতলার বারান্দা থেকে রগচটা ভদ্রমহিলা সমানে গাল দিচ্ছেন কয়লাওলাকে—কয়লা দেয়নি, কতগুলো পাথর দিয়ে গেছে। যার গলায় কোনোদিন গান নেই, তেমনি একটি মেয়ে তীক্ষ্ণস্বরের হার্মোনিয়াম বাজিয়ে আধুনিক গান অভ্যাস করছে।

Silent wilderness। বইয়ের দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসে রইল পূরবী। কোথাও সে নেই—তবু পূরবী তাকে অনুভব করে। মনে পড়ে যায়— ক্লাশে পড়াচ্ছে সত্যজিৎ। সমস্ত ক্লাশ ঘরটা এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেছে। মাথার ওপর পাখা ঘোরার শব্দ নেই—তার দু-পাশে বসে দ্রুত হাতে কেউ নোট নিচ্ছে না, পড়াতে পড়াতে বাঁ-হাতের রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলছেনা সত্যজিৎ। শুধু নীল সমুদ্রের ধারে থরে থরে লাল বালিয়াড়ী দাঁড়িয়ে আছে —শীতের বর্ষণে ভরে ওঠা ছোট ছোট জলাধারের মধ্যে সবুজ পাতার ছায়া দুলছে, ভায়োলেটের বর্ণলীলায় দিক হারিয়েছে অরণ্য, আর সব কিছুর ভেতর দিয়ে একটানা একটা সুরের মতো সত্যজিতের গলা ভেসে আসছে : "Away, away from men and towns—

সত্যজিৎকে সে ভালোবাসে।

বাবা ওদের চিনতেন। চিনতেন অনেক দিন থেকে। তখন বাবার ব্যবসার অবস্থা ভালো ছিল, শেয়ার মার্কেটে বড়লোক হতে গিয়ে তখনো তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান নি। শিবশঙ্কর মুখুজ্জের সঙ্গে তখন থেকে তাঁর পরিচয়। তাঁকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ছেলেমেয়েদের তখন থেকেই তিনি চিনতেন।

তার পরে অনেক জল গড়িয়ে গেল। শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটিয়ে সেই লোকসানের ফলে বাবা ব্যবসা নষ্ট করে ফেললেন। প্রায় পথে দাঁড়াতে হল। মুখুজ্জে পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের সুতোটা গেল কেটে। ব্রোকারির কয়েকটা কাঠকুটো আশ্রয় করে সেই থেকে আজও বাঁচবার চেষ্টা করেছেন বাবা—বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন তাদের সবাইকে। এরই মধ্যে স্কুল ফাইন্যাল্ পাস করে বসল পূরবী। ফার্স্ট ডিভিশনে।

মা বললেন, মেয়েটাকে কলেজে পড়ালে হয় না।

দাদা অনেক কষ্টে সেবার একটা বড় জুতোর দোকানে সেল্‌সম্যান হয়েছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, থাক অত সখে আর কাজ নেই। আমরা মুখে রক্ত তুলে টাকা আনব, আর উনি বিনুনি দুলিয়ে কলেজে যাবেন কর্পোরেশনের স্কুলে একটু চেষ্টা করে দেখুক না—ওরা তো প্রায়ই মাস্টারণী নেয়।

পূরবী কেঁদে ফেলেছিল।

বাবা দাদাকে ধমক দিয়ে বললেন, যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন অন্তত তোমায় মুরুব্বিয়ানা করতে হবে না আমি মরবার পরে যা খুশি কোরো। ও কলেজে পড়বে কি পড়বে না সে আমি বুঝব—তুমি নও।

দাদা গজ গজ করতে করতে বললে, তা হলে আমাকে কেন কলেজে ভর্তি না করে লোকের পায়ে জুতো পরানো চাকরীতে ভর্তি করে দিলে।

বাবা বললেন, লজ্জা করে না? দু'বার ফেল করে থার্ড ডিভিসনে পাস করেছিলি তুই। কলেজে ভর্তি হলে বছর বছর তোমার ফেলের খরচ জোগাত কে?

দাদা গজ গজ করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার পূরবীর দিকে তাকিয়ে বাবা কটুকণ্ঠে আর একটা ধমক দিয়ে উঠলেন।

—পনেরো ষোলো বছরের ধাড়ী মেয়ে—ভ্যান ভ্যান করে কাঁদতে লজ্জা করে না? যা—এক পেয়ালা চা করে নিয়ে আয়। আমি দেখছি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

সেইদিনই খোঁজ করলেন বাবা। সোজা চলে গেলেন সত্যজিতের কলেজে। কলেজ ছুটি হওয়া পর্যন্ত বসে থেকে বিকেল পাঁচটায় ধরে নিয়ে এলেন সত্যজিৎকে বাড়িতে পা দিয়ে বিজয়গর্বে ঘোষণা করলেন, এই ছাখো! কা'কে নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে।

মা একটা ছেঁড়া শাড়ী পরে কলতলায় বাসন মাজছিলেন। দাদা হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল বুঝলে—সেল্‌স্‌ম্যানের কাজ অত সহজ নয়। সব সময় মুখে হাসিটি বজায় রাখা চাই, আর মেজাজ একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। একটু বিরক্তি ধরেছে কি—হয়ে গেল! ধর—মেয়েরা কেউ জুতো কিনতে এসেছে!

কুড়ি জোড়া নামিয়ে সাজিয়ে দিলাম, কিছুতেই আর পছন্দ হয়না। 'এটার স্ট্র্যাপ ভালো—কিন্তু হিলটা একটু ছোট মনে হচ্ছে। এটার হিল ঠিক আছে, কিন্তু চামড়াটা—' উঃ, মেয়েদের জুতো বিক্রী করার চাইতে কুকুরের ল্যাজ সোজা করতে যাওয়াও ভালো। খুন চেপে যায়—বুঝলে ? বলতে ইচ্ছে হবে—দোহাই ঠাকরুণ, মুচিকে ফরমাস দাও—আমাদের আর জ্বালিয়ো না। কিন্তু সেল্‌স্‌ম্যানের কাজ, মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে—

ঠিক এই সময় সত্যজিৎকে সঙ্গে নিয়ে বাবা নাটকীয়-ভাবে বাড়িতে এসে ঢুকলেন।

দাদার বক্তৃতা মাঝপথে থেমে গেল। মা ছেঁড়া শাড়ী সামলাতে পথ পান না।

—আরে আরে, লজ্জা কী ? এ আমাদের শিবশঙ্কর মুখুজ্জের ছোট ছেলে—সতু। আমি যখন দেখেছি তখন স্কুলে পড়ত। আজ না হয় একটা ভারভাত্তিক প্রফেসারই হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে এখনো ও সতুই আছে—হা-হা-হা !……

·· পূরবী বইয়ের দিকে তাকালো। 'দি ইনভিটেশন।' 'Away, away from'—

একটা কথাও সে ভোলেনি সেদিনকার—সব স্পষ্ট মনে আছে। দাদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গলির মোড়ের দোকান থেকে সিঙাড়া আর রসগোল্লা আনতে গেল। মা চায়ের জল চাপালেন উনুনে কাঠ দিয়ে। তারই ধোঁয়ায় ভরা ছোট ঘরটার ভেতরে ময়লা চেয়ারে বসে একটানা ঘামতে লাগল সত্যজিৎ—ফর্সা মুখের ওপর দিয়ে ঘামের বিন্দু গড়িয়ে নামতে লাগল।

বাবা বললেন, পাখা নেই—তাই কষ্ট হচ্ছে। যা তো টুনু—একখানা হাত পাখা নিয়ে এসে ওকে বাতাস কর।

টুনু পূরবীর ডাক নাম।

সত্যজিৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না-না, পাখার দরকার নেই, আমি বেশ আছি।

পূরবী তবু বেরিয়ে যাচ্ছিল। সত্যজিৎ আবার ডাক দিয়ে বললে, দেখুন—আপনাকে পাখা আনতে হবে না—আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

পূরবী দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবা বললেন, ওকে আবার আপনি কেন ? তোমার চাইতে ও যে সাত আট বছরের ছোট। ওর জন্যেই তো তোমাকে ডেকে নিয়ে এলাম।

সত্যজিৎ সমস্ত মুখে রুমাল বুলিয়ে নিয়ে বললেন আমি কী করতে পারি বলুন।

—ও এবার ফার্ষ্ট ডিভিশনে স্কুল-ফাইন্যাল পাস করেছে বৌবাজার গার্লস স্কুল থেকে।

—বাঃ, ভারী খুসি হলাম।—সত্যজিতের প্রসন্ন দৃষ্টি একবার পূরবীর মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল পূরবী।

—ওকে কলেজে পড়াতে চাই।

—পড়ানোই তো উচিত।

—কিন্তু—একটা বিড়ি ধরিয়ে বাবা সতর্ক ভঙ্গিতে সত্যজিতের দিকে তাকালেন: কিন্তু আমার অবস্থা তো এখন দেখতেই পাচ্ছ। আগেকার সে সব দিন তো আর নেই যে—একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে বললেন, সে কথা থাক। এখন তুমি যদি একটু সাহায্য করো তা হলে মেয়েটার পড়া হয় !

—বলুন।

—তোমাদের কলেজে ভর্তি করা যায় না ?

—বেশ তো, দিন ভর্তি করে।—ঘরের মধ্যে কাঠের ধোঁয়া আসছিল, সত্যজিতের অবস্থা দেখে করুণা হচ্ছিল পূরবীর। মনে হচ্ছিল, এ কথাগুলো বলবার জন্যে এই বাড়িতে ওকে টেনে এনে বাবা এমনভাবে কষ্ট না দিলেও পারতেন।

—ভর্তি করলেই তো হয়না বাবা। মাইনের ব্যাপারে—

সত্যজিৎ মৃদু হাসল: বুঝেছি। সেজন্যে ভাববেন না। ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে—এম্‌নিতেই একটা ফ্রী-স্টুডেন্টসিপ হয়ে যাবে। তা ছাড়া একটা স্টাইপেণ্ডের চেষ্টাও করে দেখতে পারি।

পূরবীর চোখে জল এল।

সত্যজিৎ আবার বললে, আর্টস্ পড়বে তো ?

—হাঁ—হাঁ, আর্টস্ পড়বে বই কি। জানো, সংস্কৃতে একটা লেটার ও পাবে। তা ছাড়া ইংরেজি, বাংলা—সবেতেই—

একগলা ঘোমটা টেনে মা চা আর খাবার নিয়ে এলেন।

—আরে ওর সামনে অত লজ্জা কিসের? ও তো ঘরের ছেলে। অত বড় ঘোমটা দিয়েছ কাকে দেখে?

সত্যজিৎ বললে, তা বটে। আমার সামনে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু এত খাবার কেন? খেতে পারব না।

মা ফিসফিস করে বললেন, এত কোথায়? দুটো মিষ্টি আর দুটো সিঙাড়া দিয়েছি কেবল।

বাবা বললেন, হাঁ, হাঁ—খেয়ে নাও। কলেজ থেকে টেনে আনলাম—বাড়িতে গিয়ে তো নিশ্চয়ই খেতে।

—তা হোক—এত চলবে না।—চামচে করে একটা রসগোল্লা তুলে পূরবীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সত্যজিৎ বললে, তুমি নাও একটা।

—না—না—পূরবী ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে! ··

'Away, away form men and towns'—

সেই আরম্ভ। তারপর কেমন করে পরিচয় হয়েছে—কেমন করে দিনের পর দিন এ বাড়িতে এসেছে সত্যজিৎ, আশ্চর্য গভীর চোখ তুলে পূরবীর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যে দেখেছে অনেকক্ষণ ধরে—সে সব এখন আর ভালো করে ভাবতেও পারে না। সব যেন এক মুঠো আলো—এক রাশ রঙের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

শুধু একটা কথা মনে হয় বার বার। কাছের মানুষ সত্যজিৎ ক্লাশ রুমে এত দূরে সরে যায় কী করে? কেন মনে হয়—পড়াতে পড়াতে সত্যজিৎ এমন একটা জায়গায় চলে গেছে—যেখানে সে তাকে ভালো করে দেখতেও পায় না? বহু দূরের একটা পাহাড়ের চূড়ো থেকে অশরীরী কণ্ঠস্বরের মতো তার গলা ভেসে আসে: To the wild wood and the downs—"

কে এই সত্যজিৎ? এই অদৃশ্য মূর্তি—এই সুরের তরঙ্গ? পাহাড়ের ওই উঁচু চূড়োটার উপরে কোনো দিন কি পৌছুতে পারে পূরবী—ওই জ্যোতির্ময় সুর তরঙ্গকে কোনোদিন কি সে ধরতে পারে মুঠোর মধ্যে?

পূরবী চমকে উঠল। পাশের ঘরে বচসা শুরু হয়েছে।

দাদা তীব্র গলায় বললে, স্ট্রাইক নোটীশ দিয়েছি—হাঙ্গার স্ট্রাইক করব।

—মারা যাবি—মারা যাবি হারামজাদা।—পৈশাচিক গলায় বাবা বললেন, পিঁপড়ের পাখা উঠেছে—মরবার জন্যে—না?

—মরি তো মরব। তাই বলে এই অন্যায় জুলুম কিছুতেই সইব না।

—চোপরাও শূয়োর।—বাবার হুঙ্কারটা আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এল।

বুকের ভেতরে ধ্বক্ করে উঠল পূরবীর। একটা লোহার হাতুড়ির মতো কিসের নির্মম নিষ্ঠুর আঘাতে "Silent wilderness" চারদিকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ

স্বপ্নের আকাশ

শ্রীকৃতী সোম

বিক্ষুব্ধ উত্তল প্রাণ আজো বাঁধে আকাংখার নীড়।
ভুলে গিয়ে প্রাত্যহিক ব্যর্থতার আছাড়-যন্ত্রণা
বন্ধ্যাভাগ্য প্রহরের ধূলিম্লান বেদনার ভীড়
একটি অলীক স্বপ্নে ঘুরে মরে খেয়ালী কল্পনা।
আলোর ইশারা পাই মৃত্যুকালো অন্ধকার রাতে
অথচ শিকারম্লিপ্ত বুভুক্ষিত বাস্তব-হাঙ্গর,

অপ্রাপ্তির স্রোত শুধু বয়ে যায় সময়ের খাতে
অদৃশ্য ইমন শুনি—অর্থহীন মোহনীয়া ঝড়।
ঝুমকোলতার মত দুরু দুরু কাঁপা ভীরু বুকে
জীবিকার অন্বেষায় ছুটে চলি কর্মের পসারী,
মানস-সারস তবু বুঁদ হায় নেশা-ভুলচুকে
অক্টোপাশ-বন্দী হয়ে তবু আমি মুক্তির দিশারী

ব্যথাদীর্ণ জীবনেতে খেয়ালের খুঁজি অবকাশ,
একরাশ সুখ নয়—একমুঠো স্বপ্নের আকাশ।

মেয়েদের কথা

আদর্শ, আধুনিক ও নারীধর্ম

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

নারীধর্ম, আদর্শ ও আধুনিকতা—প্রথম দৃষ্টিতে এই তিনটি শব্দ পরস্পরের কাছে নিরর্থক মনে হ'তে পারে এবং সত্যই বিশ্ব-নারী-সমাজে এই তিনটি শব্দের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

আদর্শ কি যুগে-যুগে কালে কালে পরিবর্তনশীল? আধুনিকতা কি আদর্শের পরিপন্থী? নারীধর্ম কি আধুনিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করতে অক্ষম? এই প্রশ্নগুলিই আজ কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য—বিশ্ব-নারী সমাজেই বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে।

আদর্শ সম্বন্ধে বিশ্লেষণে দেখা যায়—সেই আদিম প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা হ'তে আজকের অবস্থায় মানুষ যে এসে পৌছেচে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্প-কর্মে সভ্যতায় এর পেছনে আদর্শের তাগিদ—ধর্ম-অর্থ-কামনা-মোক্ষের চতুর্বিধ আদর্শ-লাভের প্রেরণা। আদর্শ ব্যক্তি-বিশেষের সংকীর্ণ জগতে হীন ও বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হ'তে পারে—কিন্তু আদর্শের সর্বজনীন মূলগত অর্থের আবেদন অপরিবর্তনীয় ও অসামান্য। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হ'তে সমগ্র জীবনই ছুটে চলতে চায় আদর্শের পেছনে। আদর্শের তিনটি শাশ্বত বাণী 'সত্য, শিব ও সুন্দর' মানব জীবনের লক্ষ্য-স্বরূপ। সুতরাং নারী সমাজেও আদর্শের গৌরব অক্ষুণ্ণ বলেই ধরা যায়। প্রথমতঃ ঘরকন্নার ব্যাপারেই ধরা যাক—শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা, ধনী দরিদ্র-ঘরণী নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই ঘরকন্না সুষ্ঠুভাবে চালানো, স্বামী ছেলে-মেয়েদের ভালোভাবে দেখাশোনা, আত্মীয়-বন্ধুর পরিচর্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু না কিছু আদর্শ আছেই ব্যক্তিগত রুচি, নীতি ও জ্ঞান-বিবেচনা অনুসারে। ঘরকন্নার উঁচু আদর্শের সঙ্গে নিঃস্বার্থ কর্তব্য-জ্ঞান ও দায়িত্ব-জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এর অভাব হলে গৃহস্থালীর যথার্থ শ্রী ফোটানো কখনওই সম্ভব নয়।

জগজ্জননীর বিচিত্র সৃষ্টিতে নর ও নারী জীবনের দুই বিভিন্ন দিক সুসম্পূর্ণ করেছে। নর বাহির, আর নারী অন্তর। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সৃষ্টি-লীলা চলেছে স্বাভাবিক ভাবে। বিধাতার এই অভিপ্রেত অনুসারে নর ও নারীর অন্তর ও বাইরের জগতে কিছুটা বিভেদ থাকবেই। অন্তর ও বাহিরের প্রকৃত আদর্শটি জাগ্রত হলেই আলো দেখা দেবে আধুনিকতার এই অন্ধ প্রগতিতে। বাইরের জগৎ সংঘাতে সংগ্রামে পরিপূর্ণ—পুরুষের তাই পদে-পদে আদর্শ-চ্যুতি ঘটে। তবু প্রকৃতিগতভাবে পুরুষ দেহে-মনে দৃঢ়তর হওয়ায় সে আদর্শকে জীবন উৎসর্গও করতে পারে সহজে। নারী-প্রকৃতি অন্তর্মুখী এবং এ যেন জগজ্জননীরই বিধান যে নারী যেন তাঁরই আলেখ্যরূপে এ জগৎ ও জীবনে সত্য, শিব ও সুন্দরের মহিমা এঁকে দেয়। নারীর অপূর্ব জননী, জায়া ও কন্যা-মূর্তির কাছে সংসার নিয়তই শিক্ষা চাইছে আত্মত্যাগ, কর্তব্য-জ্ঞান, ধ্রুবতারার মতো অচঞ্চল স্নেহ প্রেম করুণার আলো। নারী-ধর্মের আদর্শ তাই চিরদিনই সীতা, সাবিত্রী, লোপামুদ্রা। নারী ও নারীধর্ম আলাদা নয়। অতি-আধুনিকা বা উগ্র আধুনিকাও নারী। গৃহস্থালীর স্নেহ-করুণ প্রাঙ্গণে শিশুর কলধ্বনির অভাবে পুরুষের জীবন প্রত্যহ দিবাবসানে অর্থহীন আঁধারে ঢেকে ফেলে—তবু তার দৃঢ়তর মানসিকতার বলে কোনও কাজে আত্মভোলা হয়ে থাকা সহজ। কিন্তু যে নারী তা সে যতোবড়ো আধুনিকাই হোক—পেলো না স্বামী-সংসার-শিশু-জীবনের সূর্য ঢলে-পড়া ম্লান আলোয় সেই ব্যর্থ জীবনের বোঝার ভার তোলা নারীর পক্ষে সহজ নয়। ব্যর্থ নারীত্বের একমাত্র সান্ত্বনা নারীধর্মের আদর্শে। কিন্তু আধুনিকাদের অভিধানে নারীধর্মের বিরাট পরিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক অংশমাত্র স্থান পেয়েছে ভ্যানিটি-ব্যাগে। ঠোঁট-রাঙানো, গাল

রাঙানো আর চোখে কাজল আঁকার সেই অতি তুচ্ছ নারী-প্রকৃতির মনোরঞ্জনী-কলার মাত্র স্থান আজ আধুনিকার অন্তরে। হাবভাবে, কথাবার্তায় অপরিণত চপলতা আর পুতুলের মতো বাহারে সাজ ঐ ব্যাগের সঙ্গে বেমানান হয় না। নারীর নায়িকা ভাব ছাড়া আর সকল ভাবই আজ জগৎ-সংসার ভুলতে বসেছে। কথায় কথায় ভাব-ভঙ্গিমার বিন্যাস দিয়ে নারী-প্রকৃতির রূপ-প্রকাশের ব্যর্থ বিকৃত প্রয়াস মাত্রেই পর্যবসিত হচ্ছে। নারীধর্মের মহান্ আদর্শ—ত্যাগ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, প্রেম-সেবার স্থান কি নেবে তৃতীয় শ্রেণীর নায়িকার বিলাস ব্যসন ?

আধুনিকতার উত্তাল ঢেউতে আজ পাশ্চাত্য নারী সমাজ হ'তে বিশ্বনারী সমাজ তরঙ্গায়িত। ভারতের নারী সমাজও বাদ যাননি। এই সময়ই সাবধান হতে হবে—ভারতের আধুনিকা যেন নীর ফেলে ক্ষীরই গ্রহণ করেন। তাঁরা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, রাজনীতিতে সর্বত্র দ্রুত চলুন পাশ্চাত্য নারীর প্রগতির তালে তাল রেখে। কিন্তু ভারতের তথা বাংলার মেয়ের নারীধর্মের অন্তর ঐশ্বর্যে ভরা বিরাট আদর্শ যেন তলিয়ে না যায় এই প্রগতির বন্যায়। এই বাণ-ডাকা প্রলয়োচ্ছ্বাস যখন ফিরে যাবে, তখন সেই ক্লান্ত বিশ্বনারীকে ভারতের মেয়েই পথ দেখাবে সত্য শিব ও সুন্দরের। আধুনিকতা হবে আদর্শ এবং নারীধর্মের অনুগামী। সেই হবে যথার্থ প্রগতি।

হিন্দু কোড্ বিল্ ও পারিবারিক শান্তি-প্রসঙ্গ

শ্রীমতী মমতাময়ী দেবী

গত ভাদ্র সংখ্যায় ভারতবর্ষে হিন্দু কোড্ বিল্ ও পারিবারিক শান্তি শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িলাম এবং তাহার সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিবার জন্য আগ্রহ বোধ করিতেছি; এই বিষয়ে ব্যর্থকাম হইব বা সফলকাম হইব তাহা জানি না, তবে মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সত্যের খাতিরে ইহার সামান্য কিছু আলোচনা করিতেছি।

শ্রীমতী প্রভাবতী ভট্টাচার্য্য হিন্দু নারীদের প্রতি পুরুষের অত্যাচারের কাহিনী এবং নারীজাতির প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাকে সর্ব্ববাদীসম্মত মতরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না—কারণ যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর সমগ্র দেশে নারীর উপর অত্যাচার এবং পীড়ন চলিয়াছিল এইরূপ অভিযোগ মনে হয় আমি প্রথমত তাঁহার কাছেই শুনিলাম। পাশ্চাত্য জগতের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশে নারী-জাতিকে সর্ব্বদাই শক্তিরূপিণী মায়ের রূপে সকলেই দেখিয়া আসিয়াছে। নারীকে কখনই অমর্য্যাদাকর আসনে আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধে মনে হয় শ্রীজহরলাল নেহরু কর্তৃক হিন্দু কোড বিল লোকসভায় গৃহীত হইবার পর হইতেই যেন ভারতবর্ষে নারীজাতির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদিগকে সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই বুঝি ভারতে সর্ব্ব-প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার আগে ভারতে নারী বুঝি পুরুষের চরম ভোগ্যের ও বিলাস সামগ্রীর মত এক বস্তুবিশেষ ছিল। তিনি এমন কি নারীজাতির প্রতি নির্য্যাতনের জন্য পুরুষ শাস্ত্রকারদের কটাক্ষ করিয়াছেন; এই নির্য্যাতনের মূলে তাঁহারাই দায়ী এইরূপ মতামতও প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে এমন কোথাও নির্দ্দেশ বা বিধি নাই যাহাতে করিয়া বলিয়াছে যে নারীকে নির্য্যাতন করিতে হইবে; বরং তাঁহারা নারী-জাতির সম্মান রক্ষার্থে বরাবর পুরুষকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং পুরুষই হইতেছে আমাদের মাতৃরূপিণী নারীদের অস্তিত্বের, মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষার জন্য সদা জাগ্রত প্রহরী স্বরূপ। অবশ্য কাহারো ব্যক্তিগত জীবনের স্বামী কর্তৃক পীড়ন এবং অত্যাচারের কাহিনী এখানে অনুল্লেখযোগ্য।

নারীজাতিকে যদি অবলা বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারেরা বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহাতে দুঃখের বা লজ্জার কি আছে? কারণ শারীরিক গঠনের দিক দিয়া নারীজাতি যে পুরুষের অপেক্ষা বহুলাংশে দুর্ব্বল তাহা আশা করি এখানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা না করিলেও চলিবে। ইহার পর বিবাহ-বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে আলোচনা তিনি করিয়াছেন তাহা একাধিক

কারণে সমালোচনার যোগ্য। কারণ নারীকে ইতিপূর্ব্বে তাহার জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কোনদিন রাজপথে চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইতে হইবে বা তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হইতে হইবে ইহা আমাদের শাস্ত্রকারেরা কথনই কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সংসার কার্য্যে নারীকে সুগৃহিণীরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; অবশ্য বালবিধবা ও দুশ্চরিত্র স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রীকে কথনই আমাদের শাস্ত্রকারেরা পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। তাহা না হইলে এই সাধারণ প্রবাদ বাক্যের—"বাপের বোন পিসি, ভাত কাপড় দিয়া পুসি"—প্রচলন হইত না।

দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করিবার বিধান শাস্ত্রকারেরা আমাদের নারীসমাজকে দিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার হিসাবে মর্য্যাদা বা স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীকে সমান অংশিদার হিসাবে ক্ষমতা দানকে আপাততঃ মধুর বলিয়া মনে হইলেও পরিণামে মহা অশান্তিজনক হইবে—কারণ ইহাই আমাদের দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ও প্রখ্যাত আইনবিদদের অভিমত। ইহাতে সাংসারিক জীবনে অশান্তি বাড়িবে এবং হিন্দুজাতির সংহতি নষ্ট হইয়া যাইবে।

তিনি বাল-বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের কুমারী কন্যার বিবাহ বিষয় একবার চিন্তা করিলে আশা করি এই প্রসঙ্গে তিনি বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতেন না। বলা বাহুল্য সম্পত্তিলাভের মোহ বরং ধনবানের কন্যার বিবাহকে সহজসাধ্য করিয়া তুলিবে, কিন্তু দরিদ্রের কথা আজ কে চিন্তা করিতেছে? সুতরাং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি না করিয়া যাহাতে নারী তাঁহার মর্য্যাদাকর আসনেই প্রতিষ্ঠিতা থাকেন তাহারই চেষ্টা করা উচিত। ইহার জন্য উভয় পক্ষকেই সহনশীলতার মনোভাব লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে।—কবে সতীদাহ হইত বা পুরুষ কৌলিন্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থে পীড়ন বা বহু বিবাহ করিয়াছে তাহার উল্লেখ আজ শুধু অপ্রাসঙ্গিক নহে যথেষ্ট ক্ষতিকারকও বটে, কারণ ইহাতে তিক্ততার সৃষ্টি করিবে কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। উপনিষদে দেখিতে পাই যে নারীও বহু-পুরুষগামিনী ছিল। "শ্বেতকেতু উপাখ্যান" এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে যখন নারী দেখিল নারীত্বের পূর্ণ-বিকাশ হইবে না সে তখন ক্রমশ উপলব্ধি করিয়া একান্ত-বর্ত্তিনী হইয়া নারী জীবনের চরম সার্থকতাকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিল। তখনই সে গৃহলক্ষ্মীরূপে সংসার পাতিল।

সতীদাহ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন কালেই শাস্ত্রসম্মত নহে। ইহা নারীজাতির সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত সহমরণ ছিল; তাই আমরা মহামায়াকে পতি-নিন্দায় সতীরূপে দেহত্যাগ করিতে দেখি; ইহাকে স্বামীর প্রতি পরম অনুরাগের চরম নিদর্শনের পরাকাষ্ঠা বলা যাইতে পারে। স্বামীগতপ্রাণ ইহাই নারীজাতির মূলমন্ত্র ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য পতিগত-প্রাণা গান্ধারীকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্ধত্ব বরণ করিয়া লইতে। গৌরীদান প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও একাধিক কারণে সমালোচনার যোগ্য। কারণ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মেয়েরা সাধারণত ১২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের ভিতর ঋতুমতী হইয়া থাকে। সুতরাং পাছে আমাদের সমাজজীবনের ভিতর কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে তাহার জন্যই শাস্ত্রকারেরা গৌরীদানপ্রথার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। গৌরীদানপ্রথা মানে ইহা নহে যে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত ছয় মাসের কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্র খুবই বিজ্ঞানসম্মত। ইহাতে কোনরূপ মাদকতা নাই বা কৃত্রিমতা নাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজ নারীজাতিকে যথাযথ সম্মান দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই যে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ তাহাতে এই হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের সমগ্র অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। কারণ নারী হইল আমাদের সমগ্র সমাজ জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহিণী, লক্ষ্মী।

বলা বাহুল্য যে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাহার মাতৃত্বে—নারীত্বে নহে। আজ যখন পাশ্চাত্যজগতের সকল মনীষি তাঁহাদের দেশে প্রচলিত বিবাহবিচ্ছেদের প্রতিকূলে জনমত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় নিমগ্ন, তখনই দেখি নবীন ভারতের প্রবীণ কর্ণধারগণকে এই ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের নারী সমাজকে উপহার দিতে। কিন্তু আমাদের

ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের আদর্শ কুন্তী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী। আমাদের বৈশিষ্ট্য ত্যাগেরই উপর, সেইজন্য স্বামিজী বলিয়া গিয়াছেন—"আমরা জন্মাবধি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"। ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য।

—

আলুর মুড়িঘণ্ট

উপকরণ—এক সের আলু, রুই মাছের মাথা এক সের, লঙ্কা, আদা, গোলমরিচ, ধনে, জিরে বাটা, লবণ, হলুদ, গরম মসলা পরিমাণ মত ও ঘি এক ছটাক।

প্রথমে আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এদিকে মাছের মাথা বেশ করে ভেজে তুলে রাখুন। এবার কড়াই উনুনে বসিয়ে দুই সের মত জল দিয়ে গরম করুন। এখন আলু বেশ করে চটকিয়ে জলে গুলে দিন। এবার মাছের মাথা ভাজা এবং (গরম মসলা বাদে) সব মশলা দিয়ে দিন, পরিমাণ মত লবণ হলুদ দিন, এখন দেখুন মাছের কাঁটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। যদি সেদ্ধ হয় তবে নামিয়ে নিন। কড়াই উনুনে দিয়ে ঘি দিয়ে লবঙ্গ ও তেজপাতা দিয়ে সম্বার দিয়ে, গরম মসলা দিন। ঠিক ঠিক মত রাঁধতে পারলে দেখবেন এর স্বাদ কি চমৎকার হয়। আশা করি পাঠিকা-বোনদের মনোনীত হবে। প্রত্যেক ঘরেই চেষ্টা করলে অল্প খরচে সুন্দর সুন্দর রান্না করা যায়—করতেও ভাল লাগে, খেতেও ভাল লাগে। শুধু একটু বুদ্ধি খরচ করা।

কুয়াশ ডালনা

প্রথমে কুয়াশ আলু নারকোল ডুমো ডুমো করে কেটে নিন, আর মটরশুটি ছাড়িয়ে নিয়ে বেশ করে ধুয়ে নিন, এবার কড়াই উনুনে বসিয়ে ঘি দিয়ে জিরে ফোড়ন্ দিন। জিরে ফুটে গেলে তরকারিগুলি দিয়ে নাড়তে থাকুন। এবার ধনে, জিরে বাটা, তেজপাতা, লবণ, হলুদ, চিনি দিয়ে ঢেকে দিন। এবার ঢাকা তুলে দেখুন—সেদ্ধ হয়েছে কিনা যদি সেদ্ধ হয়ে থাকে তবে একটু দুধ, ঘি ও গরম মশলা দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

—মিনতি বসু

আল্পনা—

—ইন্দিরা রায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বাংলা বনাম সার্ভিসেস দলের সেমি-ফাইনাল খেলাটির চূড়ান্ত মীমাংসা 'টসের' সাহায্যে করা হয়েছে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলার ফলাফল ধরে এই অবস্থা দাঁড়ায়, সার্ভিসেস দলের প্রথম ইনিংসের ৩৯৯ রানের থেকে বাংলার প্রথম ইনিংসে ৯৭ রান কম এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় বাংলার ৪টে উইকেট পড়ে ৩০২ রান অর্থাৎ হাতে ৬টা উইকেট জমা। এক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অনুযায়ী 'টসের' সাহায্য নিতে হয়েছিল। বৃষ্টিপাতের দরুণ মোট খেলার সময়ের মধ্যে ৬৩৪ মিনিট খেলা হয়নি। ৩য় দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। সার্ভিসেস দল টসে জয়ী হয়ে ব্যাটিং আরম্ভ করে। প্রথম দিনের খেলায় সার্ভিসেস দল ৫ উইকেট খুঁইয়ে ২৪৫ রান করে। আত্মা সিং ১০৬ রান ক'রে অপরাজেয় থাকেন। অধিনায়ক হেমু অধিকারী ৭৪ রান করেন। আত্মা সিং এবং অধিকারীর ৩য় উইকেটের জুটিতে ১৮৭ রান ওঠে।

২য় দিনে ৩৯৯ রানে সার্ভিসেস দলের ১ম ইনিংস শেষ হয়। আত্মা সিং ১২৬, অধিনায়ক হেমু অধিকারী ৭৮, মহীন্দর সিং নট আউট ৫১ রান করেন। পি চ্যাটার্জি ১৪১ রানে ৪ উইকেট পান।

বাংলা ১৩৫ মিনিটের খেলায় ১ উইকেট দিয়ে ১০৯ রান করে। পি রায় (৫৪) এবং বি চন্দ (২৮) নট-আউট থাকেন।

বৃষ্টিপাতের দরুণ ৩য় দিন মাত্র ৯০ মিনিট খেলা হয়। সার্ভিসেস দলের স্পিন বোলাররা রায় এবং চন্দের জুটি ভাঙ্গতে অক্ষম হ'ন। রান দাঁড়ায় ১ উইকেটে ১৬১, রায় ৮৩ এবং চন্দ ৫১। ৪র্থ দিন খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ৫ম দিনে বাংলার তিনটে উইকেট পড়ে। রান দাঁড়ায় ৪ উইকেট গিয়ে ৩০২। পি রায় (১৫৯) এবং এস ঘোষাল (২) নট আউট থাকেন। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সার্ভিসেস দল এই প্রথম ফাইনাল খেলার অধিকার লাভ করলো।

ডেভিস কাপ ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের খেলায় ভারতবর্ষ ৫-০ খেলায় মালয়কে পরাজিত ক'রেছে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারতবর্ষ ফিলিপাইনের সঙ্গে খেলবে। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিলেন রামকৃষ্ণ কৃষ্ণান, নরেশকুমার এবং উদয়কুমার।

আইস হকি ঃ

মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব এবং ইউরোপীয় আইস হকি প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় সুইডেন ৪-৪ গোলে রাশিয়ার সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে বিশ্ব এবং ইউরোপীয় খেতাব লাভ করেছে। গত বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছিল রাশিয়া।

উবের কাপ ঃ

মহিলাদের 'উবের কাপ' আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় আমেরিকান জোন ফাইনালে আমেরিকা ৭-০ খেলায় কানাডাকে পরাজিত করেছে। আমেরিকা সেমি-ফাইনালে এশিয়ান জোন বিজয়ী ভারতবর্ষকে ৭-০ খেলায় পরাজিত করে।

অষ্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ৪

অষ্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম এবং দ্বিতীয় বে-সরকারী টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। আর একটি খেলা বাকি।

১ম টেষ্ট খেলার ফলাফল

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২১৬ ও ২৮৪ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; ক্রেগ ১২৩, হার্ভে ৮৪)

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ২৬৮ ও ১১২ (২ উইকেটে)

হাতে মাত্র ১৩৮ মিনিট খেলার সময় পেয়ে নিউজিল্যাণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে; নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্যে ২৩৩ রান প্রয়োজন ছিল।

ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা টেষ্ট ক্রিকেট ৪

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৮ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত দুই দলের আলোচ্য টেষ্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে যায়।

টেষ্ট খেলার ফলাফল—ইংলণ্ডের জয় ২, দক্ষিণ আফ্রিকার ২ এবং খেলা ড্র ১।

ইংলণ্ডের বোলার টি ই বেলী ৫ম টেষ্টে ১৩ রান করলে সরকারী টেষ্ট খেলায় তিনি তাঁর ২০০০ রান পূর্ণ করেন। ৪র্থ টেষ্টের খেলায় বেলী তাঁর ১০০তম টেষ্ট উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। সরকারী টেষ্ট খেলার বিশ্ব-ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত বেলীকে নিয়ে মাত্র চারজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ভাবে ২০০০ রান এবং ১০০ উইকেট লাভ করেছেন। অপরতিনজন হচ্ছেন, উইলফ্রেড রোডস (ইংলণ্ড), কিথ মিলার (অষ্ট্রেলিয়া) এবং ভিনু মানকড় (ভারতবর্ষ)।

দক্ষিণ আফ্রিকার টেফিল্ড আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের (মোট ৫টি খেলা) খেলায় মোট ৩৭টি উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে টেষ্টের এক সিরিজে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেছেন। তাঁর এভারেজ দাঁড়িয়েছে ১৭.১৮।

পঞ্চম টেষ্টের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ১৬৪ (এনডেন ৭০, লোডার ৩৫ রানে ৩ এবং বেলী ২৩ রানে ৩ উইকেট) ও ১৩৪ (টাইসন ৩১ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ১১০ (বেলী ৪১, এড্‌কক্‌ ২০ রানে ৪ এবং হাইন ২২ রানে ৪ উইকেট) ও ১৩০ (টেফিল্ড ৭৮ রানে ৬ উইকেট)

৪র্থ টেষ্ট ৪

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ৪র্থ টেষ্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। দঃ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত গত ২৬ বছরের টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের বিপক্ষে দঃ আফ্রিকার এই প্রথম জয়লাভ। দঃ আফ্রিকার বোলার টেফিল্ডকে নিঃসন্দেহে এই জয়লাভের প্রধান নায়ক বলা যায়। ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসে টেফিল্ড ১১৩ রানে ৯টা উইকেট পান। খেলার ৩য় দিনে খেলা ভাঙ্গার শেষ মুখে দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে; ঐ দিন কোন রান হয় নি এবং কোন উইকেটও পড়ে নি। ৪র্থ দিনে খেলা ভাঙ্গার ৪৫ মিনিট পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংস ১৪২ রানে শেষ হয়। লাঞ্চের পরই দক্ষিণ আফ্রিকার এই বিপর্য্যয় ঘটে—৭৭ রানে ১০টা উইকেট পড়ে। ওপনিং জুটি ৬২ রান করে। ইংলণ্ড ৪র্থ দিনের খেলায় ২য় ইনিংসে ১৯ রান করে ১ উইকেট হারিয়ে। ইংলণ্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্য তখন ২১৩ প্রয়োজন, হাতে ৯টা উইকেট। ৫ম দিনে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ২১৪ রানে শেষ হ'লে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭ রানে জয়লাভ করে। ইংলণ্ডের বেলী এই টেষ্ট খেলায় তাঁর ১০০তম টেষ্ট উইকেট লাভের কৃতিত্ব লাভ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৩৪০ (ম্যাক্‌লীন ৯৩, গডার্ড ৬৭, ওয়েট ৬১ ; বেলী ৫৪ রানে ৪ উইকেট) ও ১৪২ (গডার্ড ৪৯ ; ষ্ট্যাথাম ৩৭ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ২৫১ (মে ৬১, ইন্‌সোল ৪৭, কম্পটন ৪২ ; টেফিল্ড ৭৯ রানে ৪ উইকেট) ও ২১৪ (ইন্‌সোল ৬৮, কাউড্রে ৫৫, টেফিল্ড ১১৩ রানে ৯ উইকেট)

রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ৪

ফাইনাল খেলার ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলস ঃ মনোজ গুহ ১৫-৫, ১৫-১০ পয়েণ্টে দীপু ঘোষকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস ঃ মনোজ গুহ ও দীপু ঘোষ ১৫-৮, ১৫-১২ পয়েণ্টে প্রণব বসু ও এইচ গুহকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার বিভাগের সিঙ্গলসে গোরা ঘোষ এবং ডবলসে গোরা ঘোষ ও রমেন ঘোষ জয়লাভ করেন।

এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় ঈজিপ্টের খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ভূতপূর্ব্ব উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান জরোশ্লাভ ড্রবনি তিনটি বিভাগে জয়লাভের কৃতিত্ব লাভ করেন।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : জরোশ্লাভ ড্রবনি ৬-১, ৬-২, ৬-৪ সেটে অষ্ট্রেলিয়ার ডবলউ উডকক্‌কে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : গতবারের বিজয়িনী মিস্ এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-০, ১৩-১১ সেটে মিস প্যাট ওয়ার্ডকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : জরোশ্লাভ ড্রবনি (ঈজিপ্ট) ও এ্যালফ্রেড হুবার (অষ্ট্রেলিয়া) ফিলিপাইনের জুটি এ্যাম্পন ও ডেরোকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস : মিস প্যাট ওয়ার্ড (বৃটেন) ও মিসেস কে সিংহ (ভারতবর্ষ) ৬-৪, ৭-৫ সেটে মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) এবং সি ফোনসেকাকে (সিংহল) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : জরোশ্লাভ ড্রবনি (ঈজিপ্ট) ও মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৭-৫, ৬-২ সেটে মিস প্যাট ওয়ার্ড এবং মাইকেল ডেভিসকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৭ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে জাপান দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ১৯৫৪ সালের প্রতিযোগিতায় জাপান অনুরূপ সাফল্য লাভ করেছিল।

সোয়াথেলিং কাপ (পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ) প্রতিযোগিতায় এ বছর ৩৫টি দেশ যোগদান করেছিল। চারটি বিভাগে এই দেশগুলি বিভক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। লীগপ্রথায় খেলা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগের চ্যাম্পিয়ান দেশ প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। সোয়াথলিং কাপের সেমি-ফাইনালে উঠেছিল, এই চারটি দেশ—জাপান, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরী।

জাপান ৫-১ খেলায় চীনকে এবং হাঙ্গেরী ৫-০ খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে।

কর্বিলোন কাপ (মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ) প্রতিযোগিতায় এ বছর ২৬টি দেশ যোগদান করে এবং তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে লীগপ্রথায় খেলে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়ে কর্বিলোন কাপের সেমি-ফাইনালে খেলেছিল জাপান, চীন এবং রুমানিয়া।

সেমি-ফাইনালে জাপান ৫-০ খেলায় চীনকে এবং গতবারের বিজয়ী রুমানিয়া ৩-২ খেলায় চীনকে পরাজিত করে।

ফাইনাল : সোয়াথলিং কাপের ফাইনালে জাপান (গত বছরের বিজয়ী) ৫-২ খেলায় হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে সোয়াথলিং কাপ জয়লাভ করে।

কর্বিলোন কাপের ফাইনালে জাপান ৩-০ খেলায় গত বছরের বিজয়ী রুমানিয়াকে পরাজিত করে।

মাত্র ১৯৫২ সাল থেকে জাপান বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করছে। রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৩ সালে জাপান প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে নবাগত দেশ জাপানের বিস্ময়কর সাফল্য নীচে দেওয়া হ'ল—

১৯৫২ কর্বিলোন কাপ জয়।
১৯৫৩ যোগদান থেকে বিরত থাকে।
১৯৫৪ সোয়াথলিং কাপ এবং কর্বিলোন কাপ জয়।
১৯৫৫ সোয়াথলিং কাপ জয়।
১৯৫৬ সোয়াথলিং কাপ জয়।
১৯৫৭ সোয়াথলিং কাপ এবং কর্বিলোন কাপ জয়।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : তোশিয়াকি তানাকা (জাপান) ২১-১১, ২১-১৮ ও ২১-১৯ পয়েণ্টে ইচিরো ওগিমুরাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : এফ এগুচি (জাপান) ২১-১৪, ২৪-২২, ১৯-২১, ২১-২৩ ও ২১-১৯ পয়েণ্টে এ্যান্ হেডনকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : আইভ্যান অ্যানড্রিয়াডিজ এবং ল্যাডিস্লাভ স্টিপেক (চেক) ২১-১৩, ১৮-২১, ২১-১৯ ও ২১-১৭ পয়েণ্টে ইচিরো ওগিমুরা ও তোশিয়াকা তানাকাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : লিভিয়া মসকজি এবং এ সাইমন (হাঙ্গেরী) ১৭-২১, ২৩-২১, ২১-১৮, ১৮-২১ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে ডায়না রো ও এ্যান হেডনকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : ইচিরো ওগিমুরা ও ফুজি এগুচি (জাপান) ২১-১৬, ১৯-২১, ২১-১৮, ১০-২১ ও ২১-১৯ পয়েণ্টে আইভ্যান আনড্রিয়াডিজ (চেক) ও এ্যান হেডনকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

বহ্নি-পতঙ্গ : শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি একাধারে শুধু মননশীল কথাশিল্পীই নহেন, ভাষার যাদুকর এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিপুণ বৈজ্ঞানিক। শুদ্ধ সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত গল্প-উপন্যাসে যে মর্যাদাশীল শিল্পীর পরিচয় তিনি দিয়াছেন, 'ব্যোমকেশের ডায়েরী, সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় তাহা অপেক্ষা কম নয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার 'ব্যোমকেশ' সিরিজেরই দুইটি গোয়েন্দা কাহিনীর সংকলন : বহ্নি-পতঙ্গ ও রক্তের দাগ। দুইটি কাহিনীই সমান চিত্তাকর্ষক। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের রহস্যগতি পাঠককে উৎসুক করিয়া তোলে তাঁহার পরিণতির প্রতীক্ষায়। নর্মদাশঙ্কর, শকুন্তলা, দেবনারায়ণ, চাঁদমণি, রতিকান্ত, শীতাংশু, উমাপতি প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রই নিখুঁত ভাবে ফুটিয়াছে। বইখানি শুধু সময়ক্ষেপের অবলম্বনই নয়, মনের খোরাকও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ আছে। এই শ্রেণীর গোয়েন্দা কাহিনী বাংলা সাহিত্যে বিরল।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬ দাম—৩।০

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রাগে আর অনুরাগে : শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

'রাগে ও অনুরাগে' এই পদসমষ্টি গ্রন্থের একাধিক জায়গায় দেখা যায়। বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াই এই গল্প-সংগ্রহের নামকরণ হইয়াছে 'রাগে আর অনুরাগে'। কিন্তু আমার মতে এই নামকরণ সার্থক হয় নাই, কারণ ইহার মধ্যে গল্পগুলির বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে না। এখানে রাগ ও অনুরাগের অভাব নাই, কিন্তু অধিকাংশ গল্পই তো রাগ ও অনুরাগকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। অথচ এই গল্পগুলির মধ্যে এমন একটা সুর বাজিয়া উঠিয়াছে যাহা মামুলি ধরণের নয়, যাহা স্বকীয়তায় দেদীপ্যমান। গ্রন্থকার বিভিন্ন গল্পগুলির নাম দিয়াছেন রাগ-রাগিণীর অনুসরণ করিয়া—আশাবরী, টোরি, ইমনকল্যাণ, মেঘমল্লার, বেহাগ, পূরবী প্রভৃতি। বেহাগ গল্পটিতে তো রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে নরনারীর প্রণয়-কাহিনীর মধ্য দিয়া নূতন দ্যোতনায় মণ্ডিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যবিন্দুতে রহিয়াছে—মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজের দিয়ো কঠিন পরিচয়', আর ইহার সগৌরব পরিসমাপ্তি আনিয়াছে—নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান তার ক্ষয় নাই—তার ক্ষয় নাই। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর প্রত্যেকটির এমন কোন অর্থ আছে কিনা যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় সেই প্রশ্ন বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কারণ গ্রন্থকার নিশ্চয়ই এই দাবী করেন না যে তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যেই বিচিত্র রাগ-রাগিণীর সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিহিত আছে। কিন্তু তবু সঙ্গীতের নিগূঢ় রসের সঙ্গে তাঁহার গল্প-গুলির দ্যোতনার' সংযোগ আছে। দার্শনিক ও শিল্প-সমালোচকেরা বলেন যে সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ শিল্প এবং অন্য সকল শিল্পই সঙ্গীতাভিমুখী। অন্যান্য শিল্পে ভাব ও রূপের মধ্যে পার্থক্য করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে ভাব রূপের মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে ; এইখানে রূপ হইতে বিষয়-বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। তাই সঙ্গীতের মধ্যে যে তীব্রতা ও এককেন্দ্রিকতার আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা অপর শিল্পের দুরধিগম্য। এই গল্পগুলির আবেদনের মধ্যে সেই সঙ্গীতসুলভ নিবিড়তা ও তীব্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের 'বিনা টিকেটে' নামক গল্প-সমষ্টিতে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের সুর ধ্বনিত হইয়াছিল ; তাহার অনেকগুলি গল্পই নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জীবন হইতে আহৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গল্প-সঞ্চয়ের মধ্যেও ব্যর্থতা ও বঞ্চনার আভাস যে একেবারে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেই আভাস ইহাদের ব্যঞ্জনার বিষয় নহে। নরনারীর আটপৌরে জীবনের মধ্যে এমন কোন অভিজ্ঞতা আসে, যাহার কাছে অন্য সব কিছুই তুচ্ছ হইয়া যায়। এই অভিজ্ঞতা অতর্কিত, ইহাকে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করা যায় না, সাধারণ প্রয়োজনের তুলাদণ্ডে ইহাকে মাপা যায় না, ইহা সব কিছুর অতীত, কিন্তু সব কিছুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কিষাণ তারু এই সর্ব্বগ্রাসী অথচ সর্ব্বাতিশায়ী অভিজ্ঞতার সন্ধান পাইয়াছিল বন্যপ্রকৃতির মধ্যে, স্বাতী, সুমনা ও নিমি ইহার আস্বাদ পাইয়াছে শান্তমুর সংস্পর্শে, মলয়া বিরাজবাবুকে দেখিয়াছে দূরে অতিদূরে, হিমালয়ের তুষার উষ্ণীষ তাঁহার মাথায়, শ্বেত চন্দনের ছাপ তাঁহার কপালে আর তাঁহার গলায় বেলফুলের মালা—কিন্তু তিনি মলয়ার জীবনকে অপরূপ মাধুর্য্যে ভরিয়া রাখিয়াছেন। এই সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আশাবরী অথবা চায়ানটের আঙ্গিকের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা সেই প্রশ্ন গৌণ। প্রধান কথা এই যে ইহাদের মধ্যে সেই রসঘন নিবিড়তা আছে যাহার আস্বাদ শুধু সঙ্গীতের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গীত যেমন শিল্পের অন্যান্য উপাদানকে নিঃশেষে জীর্ণ করিয়া স্বয়ম্প্রকাশতা লাভ করে এই গল্পগুলির মধ্যেও সেইরূপ এমন একটি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যাহার কাছে জীবনের

অল্প পরিচয় ছায়াবাজির মত অস্পষ্ট ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ইহাই এই গল্প-সমষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং ইহারই জন্য এই গল্পগুলি অনন্যসাধারণত্ব দাবী করিতে পারে।

[প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স॥ ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৩৲ টাকা]

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

শিশুতরু : কল্যাণী প্রামাণিক

আলোচ্যগ্রন্থে পঁচিশটী কবিতা আছে। কবিতার ক্ষেত্রে রস ও ভাবের বিস্তৃতি ও উপলব্ধির পক্ষে পটভূমিকাই বিশেষ সাহায্য করে। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন, চিত্তশুদ্ধি বিধান। কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা। কবিতার আয়তনে পাঠক মুখ্য আর কাব্য গৌণ উপকরণ। রস ভাব ও ব্যঞ্জনা সমন্বিত প্রকৃষ্ট চিন্তাধারায় বহমান হয়ে শব্দ সংযোজনার সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যপ্রকাশ যথাযথ ভাবে হোলেই তা কাব্য পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পটভূমিকাগুলি সুন্দর ভাবে আলিম্পিত হয়েছে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তর্প্রকৃতির নিগূঢ় যোগাযোগ রেখে শিশুতরুর গ্রন্থকর্ত্রী প্রথমেই আমাদের মন ভিজিয়ে দিয়েছেন। এঁর রচনার সঙ্গে পূর্ব্বপরিচয় হয়েছে বলে মনে হয় না, কিন্তু গ্রন্থখানি পড়্‌তে পড়্‌তে ভাবাবিষ্ট হওয়া গেল—অনাড়ম্বর ভাব সুষমায়, মধুর কল্পনায়, শব্দ সংযোজনার বৈশিষ্ট্যে, রোমাণ্টিক পরিবেশে, গীতি-কবিতার মাধুর্য্যসম্পদে আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। আশা করা যায় কাব্যামোদিগণ এই গ্রন্থ পড়ে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করবেন। প্রচ্ছদপট, ছাপা, বাঁধাই যুগোপযোগী হয়েছে।

[প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা—১২। দাম ২৲ টাকা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সুখী রাজপুত্র / স্বার্থপর দৈত্য : বুদ্ধদেব বসু

শিশু-সাহিত্য রচনায় বুদ্ধদেব বসু যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন একথা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ও গল্প বলার বিশিষ্ট রীতি তাঁর এই অসামান্য সাফল্যের কারণ। আলোচ্য বই দুটি ছোটদের উপযোগী কয়েকটি গল্পের সংকলন। প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে গল্প, তার মধ্যে দুটি অস্কার ওয়াইলড্‌-এর লেখা গল্পের অনুবাদ। প্রত্যেকটি গল্পই সুলিখিত। শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, পরিণতবয়স্করাও এ গল্পগুলি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। কয়েকখানি সুন্দর চিত্র সংযোজন করে প্রকাশক মহাশয় গল্পগুলির আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছেন। ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। উৎসবের দিনে এ বই উপহার পেলে ছেলেমেয়েরা যে খুশি হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

[প্রকাশক : শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শরৎ সাহিত্য-ভবন, ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪। প্রতিটির মূল্য ১৷৹]

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

কন্যা ও কুমার : কল্যাণী কার্লেকার

উনবিংশ শতকের একটি কাল্পনিক রাজপরিবারের কলংক নিয়ে রচিত হয়েছে এর অভ্যন্তরের রহস্যজাল।

পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থ সমাপ্তি পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে পড়বেন।

[প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা—২৯। মূল্য ১৷৶৹ আনা]

সপ্তপদী : কালীকিংকর সেনগুপ্ত

এ যুগের যে সকল কবির কবিতা আধুনিকতার উগ্র-অগ্রগতিতে দুর্বোধ্য হয়ে উঠে নি কবি কালীকিংকর তাঁদের অন্যতম। তাঁর কবিতার ছন্দে তাল আছে, ঢেউ আছে, নাচন আছে, ভাষায় মাধুর্য আছে, ভাবে গাম্ভীর্য আছে। সপ্তপদীর কবিতাগুলি তার নিঃসংশয় প্রমাণ।

[শ্রীকিংকর মাধব সেনগুপ্ত কর্তৃক ৪৫।১ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত, মূল্য—৪৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

করে দেখ ২য় খণ্ড : শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সভ্যতার আদি যুগ থেকে অনুসন্ধিৎসু মানুষ চেয়েছে সত্যকে ও জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে। এই অনুসন্ধানের দুর্ব্বার প্রয়াস তাকে নিয়ে গেছে আগ্নেয় গিরির গহ্বরে—গভীর জলধিতলে। মরণপণে মানুষ জ্ঞানলাভ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছে, আর সেই লব্ধ-জ্ঞান জগতের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের জ্ঞান-তৃষা মেটাতে চেষ্টা করেছে। তবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানদানের সার্থকতা নির্ভর করে কুশলী বৈজ্ঞানিকের সুষ্ঠু পরিবেশনের উপর।

"করে দেখ" পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করে বুঝলাম লেখক কুশলী বৈজ্ঞানিক বটে। কিশোর মনের উপযোগী করে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আর তার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সহজবোধ্য করা বড় কম কুশলীর কর্ম্ম নয়। পুস্তকখান যদিও কিশোর কিশোরীদের লক্ষ্য করে লেখা হ'য়েছে, তাদের নূতন আগ্রহের সৃষ্টি করে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করা বা অনুসন্ধিৎসু মনের সহজপাঠ্য খোরাক জোটাতে—কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, পুস্তক-খানি পাঠ করে প্রবীণ পাঠকেরও বড় কম লাভ হয় নি। কিন্তু

একটি বিষয়ে মনে বড় ধাঁধাঁ লেগেছে সেটি হ'চ্ছে এই যে পটাসিয়াম সায়ানাইডের মত তীব্র বিষ এবং দুষ্প্রাপ্য পদার্থ কি কিশোর কিশোরীদের ব্যবহারের উপযোগী হবে। তাতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নাই কি?

যাই হ'ক মোটের ওপর পুস্তকখানি গোপালবাবুর কিশোর জগতে অমূল্য দান। এই পুস্তক পাঠে জ্ঞানপিপাসার সঙ্গে আসবে জীবনে সার্থকতা লাভের উপায়।

[প্রকাশক :—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১. সারকুলার রোড। কলিকাতা—৯। দাম ১৷৹।]

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বহ্নি-পতঙ্গ"—৩৷৹
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "বিবর্তন" (২য় সং)—৪৲
শ্রীসনৎকুমার ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "উত্তরাধিকারী"—৩৷৹
জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র' (৩য় সং)—৪৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "দুর্গাদাস" (১৩শ সং)—২৷৹
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "স্বামী" (৩০শ সং)—১৷৹

নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়ার কয়েকখানি রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82727—শ্যামল মিত্রের গাওয়া দু'খানি মনোরম আধুনিক গান—"তুমি আর আমি শুধু" ও "এতো আলো আর এতো হাসি গান।"

N 82729—সুধীর সেন "মনের আকাশ জুড়ে" ও "যার আলো নিভে গেছে" শিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠের স্বাক্ষর দীপ্ত দু'খানি আধুনিক গান।

N 82730—নবাগতা শিল্পী কুমারী পূরবী সরকারের গাওয়া "চৈতালী চম্পাবনে" ও "সে তো জানো তুমি' শ্রোতাদের মুগ্ধ করবে।

N 82731—শ্রীমতী গীতা দত্ত (রায়)এর কণ্ঠে "ঝম ঝুম ঝরণায়" এবং "তোমায় দেখেছি"—দু'খানি আধুনিক বাংলা গান, প্রত্যেকের কাছে সমাদর লাভ করবে।

কলম্বিয়া

GE 24820 22 পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ অভিনীত ও গীত রেকর্ড নাটিকা "অন্নপূর্ণার আসন"। রচনা: শ্রীনৃসিংহ কুমার, অধিনায়ক শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক। এ ছাড়া লোকরঞ্জন শাখার "যুগবন্দনা" ধারায় GE 24823, GE 24824, GE 24828 এবং পল্লীগীতিতে GE 24825, GE 24826, GE 24827 রেকর্ডে যে নতুন ধারা প্রচারিত হয়েছে তা সুন্দর। সকলগুলিতেই সুর দিয়েছেন বাংলার প্রিয় শিল্পী ও সুরকার—পঙ্কজকুমার।

GE 24816—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান "তুমি এলে তাই" ও "আর জনমে হয় যেন গো"—দরদী কণ্ঠের বিরহ মিলনের সার্থক অনুভূতি।

GE 24817—কুমারী গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে "আয় পরী আয় পরী" নতুনত্বে ভরা আধুনিক গান।

GE 24818—কুমারী ইলা চক্রবর্তীর কণ্ঠমাধুর্যে প্রচারিত "জ্বল জ্বল শুকতারা" ও "উন্মন মন আমার"—মনোরম।

GE 24819—কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ দীর্ঘদিন পরে গাইলেন "মনে লয় মোর" এবং "সুরধনির তীরে"—পল্লীগীতি দুটি জনপ্রিয় হবে।

"নবজন্ম" বাণীচিত্রের দু'খানি জনপ্রিয় গান "আমি আঙুল কাটিয়া" ও "ওরে মন মাঝি" গেয়েছেন যথাক্রমে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়" GE 30348 রেকর্ডে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় | খাণ্ডব দাহন | ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
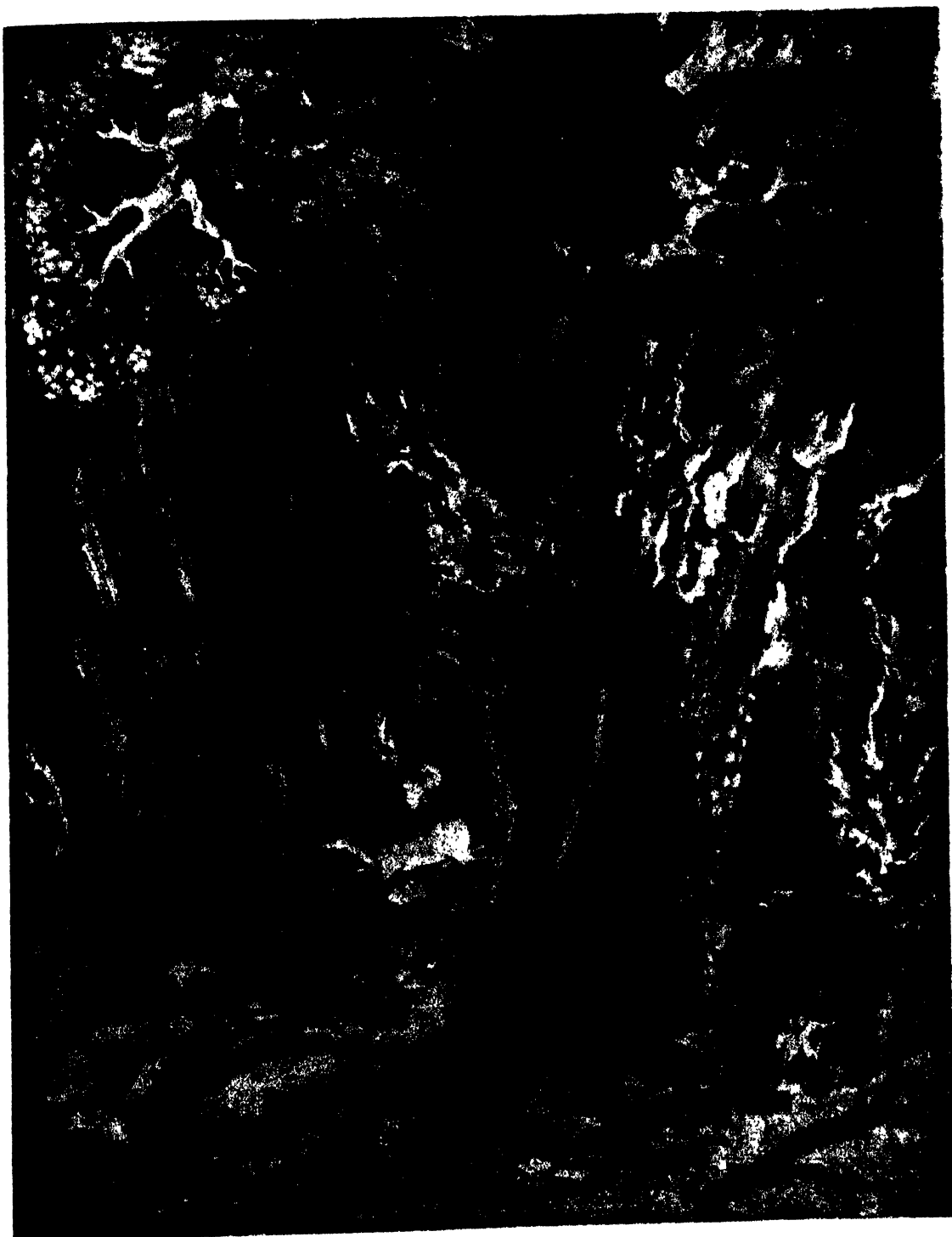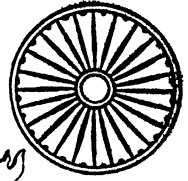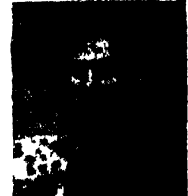
বৈশাখ—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

যুক্তি ও বিশ্বাস

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

"পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এটা একটা যুক্তি। 'Ram is mortal' 'All men are mortal' so 'Ram is a man' আর একটা যুক্তি।

আগুন যেখানে থাকে ধূয়া সেখানে থাকে। দূরে ধূয়া দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সেখানে আগুন আছে। এতে কোন সন্দেহের বা অবিশ্বাসের কারণ থাকে না। Logic হোল বিজ্ঞানের ভিত্তি। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্য প্রয়োজন এই যুক্তির। যুক্তি বা বিচারের ফলে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি, সে জ্ঞান বিশুদ্ধ, ভ্রান্তির কালিমা তা'তে থাকে না।

ভুল আমাদের হতে পারে অনেক ভাবে।

মায়ের আদেশ, শিক্ষকের ও সংসর্গের শিক্ষা, সমাজের ও পরিবারের বিশেষ বিশেষ প্রথা, আচার বা সংস্কার, পুরোহিতের দীক্ষা বা ধর্মের অনুশাসন—এ সবই—Bacon যাদের বলেছিলেন idols—আমাদের মনের উপর কিছু না কিছু ছাপ দিয়ে যায় যা' আমাদের জ্ঞানকে প্রভাবান্বিত করে। বিদ্যার্থী জ্ঞান অর্জনের সময় মনকে সব সংস্কার-মুক্ত করবেন, তারপর তা' যুক্তির বা বিশ্বাসের আলোতে আলোকিত ক'রে অগ্রসর হবেন সত্যের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। যুক্তি যা' সত্য বলে সামনে তুলে ধ'রবে তা' গ্রহণ

ক'রে সব মিথ্যা বর্জন ক'রবেন। কত fallacies কত অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত সত্য প্রতিভাত হবে। স্বার্থ ও সংস্কার-বশতঃ সে সব সত্য বলে গ্রহণ করবার প্রলোভন হবে। সত্যের মুখোস প'রে মিথ্যা দাঁড়াবে, তখন যুক্তির সাহায্যে সে মুখোস টেনে ফেলে দিতে হবে। দুর্বলতা বা লোক-লজ্জা এসে বাধা দেবে। সমাজ, পৌরোহিত্য, পারিবারিক বন্ধন, জ্ঞানের শিখাকে নিভিয়ে ফেলতে চাইবে, কিন্তু তখন দৃঢ় হ'তে হবে। সে দৃঢ়তা musclesএর নয়, মনের। মনের দৃঢ়তা আসে সত্যের আলোতে বিশ্বাসের থেকে, আর সে বিশ্বাস স্থাপিত হয় যুক্তির উপর। পাশ্চাত্যে ন্যায়শাস্ত্রে এটা বলা হ'য়েছে যে, যুক্তি যেখানে সম্ভব নয় সেখানে Hypothesis, Analogy বা Probability দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ ক'রতে হয়। যুক্তিতে কতটুকু সত্য ধরা পড়ে যা' প্রামাণ্যয় মেনে নিতে হয় অনেককিছু, নইলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জাহাজের কাপ্তেন বিশ্বাস করেন আকাশের ও সমুদ্রের অবস্থা স্বাভাবিকই থাকবে—তাই তিনি এগিয়ে চলেন। লুকানো কোন মেঘ সহসা আকাশ ছেয়ে ফেলবে, ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ ক'রবে তাঁর জাহাজকে, এ সব সম্ভাবনা বা ভীতি তাঁর মনের কোণে স্থান পায়না। মেঘমুক্ত আকাশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হবে তারপর সমুদ্রযাত্রায় বেরুব, এমন ভাবলে জাহাজ বন্দরেই আটকে থাকে। আমাদের জীবনও একটা বিরাট সম্ভাবনা মাত্র। এ কোন Logic বা Scientific প্রণালীতে চলেনা। ন্যায়শাস্ত্রের বিচার বা বিজ্ঞানের আবিষ্কার আগে পাছে রেখে চলে না। কত আলো, ছায়া, আশা, নিরাশার ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। কত নৌকাডুবি, ঝড়ঝঞ্ঝা আসে আমাদের পথে ও আমাদের সব গণনা ভ্রান্ত প্রমাণ করে। পরাস্ত হ'য়েও কি আমরা নিরস্ত হই। আমাদের মধ্যাহ্ন সূর্য্য ডুবে যেতে পারে, আমাদের হাসি অশ্রুতে পরিণত হ'তে পারে—তবুও হাল ধ'রে থাকি শক্ত হাতে—ভয় কি? এর কারণ আমরা বিশ্বাস করি "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা, ভাতিবে আবার ললাটে তোর"—এই বিশ্বাস ছাপিয়ে ওঠে সব যুক্তি, আর হয় আমাদের চলার পথের শ্রেষ্ঠ-সম্বল। বিশ্বাসই তো জীবন। যে প্রতি পদক্ষেপে সন্দিগ্ধ চিত্তে এদিক ওদিক চায় সে কি চলতে পারে? অবিশ্বাস যে মৃত্যু। মেঘের ভিতর দিয়েই চলতে হবে—আলো কতটুকু থাকে আমাদের পথে? মনের আলো জ্বালিয়ে চলতে হয়। আশার আলো ও বিশ্বাসের আলো জ্ঞানের আলোকে যদি প্রদীপ্ত না করে তবে মাঝপথে আমরা যাই থেমে—সীমাহীন অন্ধকারে।

যুক্তি ও গণনা জীবনের একভাগ বিশ্বাস ও আশা নয় ভাগ। এ না হ'লে আমরা হ'য়ে পড়ি চলৎ-শক্তিরহিত।

যুক্তির স্থান নিকৃষ্ট মোটেই নয়। তবে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রতে গিয়ে যেন আমরা বিশ্বাস ও আশার আলো না হারাই। বৈজ্ঞানিক রীতিতে আমরা খাদ্য প্রস্তুত ক'রব বৈকি—কিন্তু খাবার সময় বিশ্বাস ক'রব যে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত নেই। রাজার Chemist থাকেন খাদ্য পরীক্ষার জন্য। কিন্তু এভাবে বিশ্বাস হারিয়ে চলতে গেলে জীবনের প্রতিপদে সন্দেহ আমাদের অবশ ক'রে ফেলে—জীবনের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। Science যে জীবনের প্রতিপদ নিয়ন্ত্রিত করে সে জীবনের সৌন্দর্য্য বা চরিতার্থতা কোথায়?

রাজা তাঁর নিজের রাজপথে চলেন—সঙ্গে কোতোয়াল—প্রহরী—জীবনরক্ষী কত কিছু। এর পিছনে যুক্তি হোল—কোন অদৃশ্য আততায়ী যদি লুকিয়ে থাকে কোথাও। কিন্তু জীবনের অবাধ গতির আনন্দ ও পরমার্থ এখানে কোথায়? সে বিশ্বাস কোথায় যে সবাই আমার মিত্র—সবাই ভাই? কিন্তু যে রাজা তাঁর নিজ জীবনটাকে যুক্তির কোঠা থেকে ছিন্ন ক'রে মিশিয়ে দেন অযুক্তির ও বিশ্বাসের মহাজীবনে, তিনিই জানেন জীবন কি—বোঝেন জীবনের মহিমা। আততায়ীর অস্ত্র হয়তো তাঁকে বিদ্ধ ক'রবে। জীবন তো মরণেই হবে শেষ। কিন্তু এই মৃত্যুর কালো অন্ধকার—রাজার হৃদয়ের বিরাটত্বের ও আনন্দের জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যায়। খাঁচায় রক্ষিত জীবনের নিরাপত্তা, যুক্তিজাত সন্দেহের ভীতিতে শুষ্ক-জর্জরিত। বিশ্বাসের অরুণোদয়ে সে সন্দেহের ছায়া দূর হয় আর মুক্তির আনন্দে জোয়ার ডাকে প্রাণের কূলে কূলে। তবেই তো আসে বাঁচার সার্থকতা। আমরা দেখতে পাই যুক্তির অপূর্ণতা, আর বিশ্বাসের পূর্ণত্ব ও আনন্দ। যুক্তি আনে নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ, বিশ্বাস আনে প্রাণ ও স্পন্দন।

বিশ্বাসহীন যুক্তি আনে শূন্যতা, যুক্তিবিহীন বিশ্বাস আনে অন্ধতা। জীবনের গতি ঠিক ক'রবে যুক্তি, চলার শক্তি দেবে বিশ্বাস। সম্মুখে চল, এগিয়ে চল, উর্দ্ধে ওঠ আরও উর্দ্ধে। এ হোল বিশ্বাসের কথা; বিশ্বাস দেয় সাহস ও উদ্যম—জ্ঞান ও যুক্তি দেয় দৃষ্টি। বিশ্বাস তো বৈজ্ঞানিকেরই সম্পদ, অজ্ঞ জ্ঞানহীনের বিশ্বাস তো শুধুই একটা অন্ধ গতানুগতিকতা। যে সত্যান্বেষী বিশ্বাস ক'রে চলে যুক্তির পথে, যে পথ তাকে দেখিয়েছে জ্ঞানের আলো, সে-ই তো লাভ করে সত্য। বিশ্বাসহীন হ'লে তো সে আজ এক পথ ছেড়ে কাল অন্য পথে, তারপর সে পথ হ'তে অন্য পথে চলবে বিভ্রান্ত হ'য়ে। যে তত্ত্বান্বেষী অন্ধ-সংস্কারকে বিশ্বাস ব'লে ভুল করেন তিনি তত্ত্বের কোন আলোই দেখতে পান না—অথচ বিশ্বাসই যে তাঁর বর্ম—যে বর্মে ভ্রান্তির ও সংস্কারের, রীতির ও আচারের নিন্দার ও গ্লানির নানাবিধ আক্রমণ এসে আঘাত ক'রে তাকে লক্ষ্যচ্যুত ক'রতে চায়। কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তা তাকে দেয় সাহস—যুক্তির আলো দেখায় তাকে পথ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে যুক্তি ও বিশ্বাসের এই সম্মিলন মানব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এ উদাহরণ দুর্বলকে দেবে সাহস, অন্ধকে দেবে আলো। সংস্কারক্লিষ্ট অর্জুন যখন নিজকর্তব্য বিস্মৃত হচ্ছিলেন, তাঁর যুক্তির আলোতে দৃষ্টিপাত ক'রেও পথ পাচ্ছিলেন না—তাঁর গাণ্ডীব যখন শ্লথ হ'য়ে পড়েছিল তখন শ্রীকৃষ্ণের বজ্রনির্ঘোষ "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" দিয়েছিল তাঁকে সাহস ও সম্যক দৃষ্টি।

গুরুদেবের উপর বিশ্বাসই তাঁর হৃদয়ে এই বাণীকে দিয়েছিল তার মর্ম ও তার প্রাণ। স্বামী বিবেকানন্দ যখন যুক্তির আলোতে পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না, বিভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মুক্তিলাভের উন্মাদ ব্যাকুলতায় ছুটে গেলেন তিনি সেই 'অজ্ঞ' ঠাকুরটির কাছে। যাঁর কাছে অবনত হ'য়েছিল তাঁর বিজ্ঞ শির। তাঁর যুক্তির সঙ্গে এসে মিশল বিশ্বাস। তিনি পেলেন প্রাণ, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর উদ্যম।

তিনি দেখছিলেন যুক্তির আলোতে—কিন্তু এগুতে পারেন নি। বিশ্বাস এসে দিল তাঁকে স্পর্শ, প্রাণ ও পাথেয়। তখনই পেলেন তিনি তাঁর চিরবাঞ্ছিতকে, দেখলেন সেই 'অরূপম'কে, শুনলেন সেই 'অশব্দম'কে—আস্বাদ পেলেন 'অরসে'র। তারপর কি হোল আমরা সবাই জানি। যুক্তির আলো শতগুণে বর্ধিত হ'য়ে জ্বলে উঠ্‌ল বিশ্বাসের প্রাণস্পর্শে, আর সে আলো রেখে গেল জগতে তার জ্যোতি—যে জ্যোতির কাছে সূর্য্য হারায় তার আলো, চন্দ্র তার রশ্মি, নক্ষত্র তার দৃষ্টি।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমাঃ বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাস সর্বমিদং বিভাতি।

প্রশ্ন

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মানুষের হৃদয়ের সুকোমল মর্মর-মন্দির
ভাঙে যারা হাতে নিয়ে বুদ্ধির হাতুড়ি
আর স্বার্থের শাবল,
যত চোর, যত খুনী সেজে মুনি কিংবা সেজে বীর,
ধেই ধেই নৃত্য করে, নাই ভালোবাসার আগল,
লাঠি হাতে নেচে বলে, "চুপচাপ থাকাতেই রাজি"
খঞ্জনী বাজায় শান্তিস্থাপনের, যে সব বাবাজি,
দয়া মায়া মমতায় কাপুরুষ বৃত্তি বলে যারা,
তারা যদি দৈত্য নয়, দৈত্য তবে বল আর কারা?
বিজ্ঞান-ব্রহ্মার বর পেয়ে নাকি তারা শক্তিমান
হিরণ্যকশিপুসম দর্পে তুচ্ছ করে ভগবান।
গায়ে যদি এত জোর মুখে কেন মুখোস লাগায়?
সিঁদকাঠি হাতে যদি, কেন তবে খঞ্জনী বাজায়?
হাতে আনবিক অস্ত্র, তবে কেন "শান্তি শান্তি" করে?

পঙ্গু

মানবেন্দ্র পাল

পড়ে গিয়েছে শিপ্রা সরকার।

নতুন কিছু নয়; তাই হতাশ হয়ে ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল।

শিপ্রা সরকার পড়ে গিয়েছিল একটু বেকায়দায়। বইগুলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। স্লিপারের ষ্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গিয়েছে।

একটি ছেলে এগিয়ে গিয়ে বইগুলো কুড়িয়ে দিলে। শিপ্রা সরকার তাকিয়ে একটু হাসল—ধন্যবাদ!

ছেলেটি আর দাঁড়ালো না। একবার এদিক ওদিক তাকিয়েই নিঃশব্দে চলে গেল। শিপ্রা সরকারের সঙ্গে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলাও বিপদ। কে কোথায় দেখে ফেলবে। আর ওমনি চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

শিপ্রা এবার তাকালো শাড়িটার দিকে। না, এটা পরে আর যাওয়া যাবে না। অগত্যা আবার বাড়ি ফিরতে হল।

ছোটোবেলা থেকেই অনেক চিকিৎসা করানো হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত কোনো এক বড়ো ডাক্তারের পরামর্শে অপারেশনও করা হল। তাতে ফল হল খাটো পাটা জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেল।

এই একটিমাত্র ত্রুটি না থাকলে শিপ্রা সরকার নিঃসন্দেহে সুন্দরীর পর্যায়ে পৌছতে পারত।

তবু হঠাৎ এক নজরে শিপ্রাকে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

পাতলা মুখের ডোলের ওপর একটা তীব্র চমক আছে। ঘনকালো চোখের পাতার নীচে দুটি উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি সবসময়েই চঞ্চল। প্রতি কথাতেই হাসি। সে হাসির ভেতর নির্বোধের সরলতা নেই। মদের ফেনার মতো সে হাসি লোভাতুরের চোখে কেবল নেশা ধরায়। মনে হয়, ঐ হাসিটুকুর খাতিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিপ্রা সরকারের মন যুগিয়ে চলা যায়।

বি এ পাস এই মিস সরকারটিকে নিয়ে তাই আফিসে নিত্য আলোচনা।

মা-বাপের চোখে ঘুম নেই। এ মেয়েকে কে নেবে? ছোটোবেলা থেকেই বিয়ের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু খোঁড়া শুনে কেউ আর দেখতেও এল না।

মা কাঁদেন, ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা খোঁড়েন। আর বাবা?

তিনি বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে একটার পর একটা দিন কাটিয়ে যান।

কিন্তু যার জন্যে এত ভাবনা, তার যেন কোনো দুঃখই নেই। ছোটোবেলা থেকে দুরন্তপনা করে বেড়িয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। লোকে বিরক্ত হয়ে গালমন্দ দিয়েছে। বলেছে, খোঁড়া পাতেই এতো। পা ঠিক থাকলে না জানি কী করত!

এই মেয়েই যখন বড়ো হল তখন আবার তার অত্যাচারটা দাঁড়ালো অন্যভাবে। যে বাড়িতে ছেলে থাকত, বেছে বেছে সেইসব বাড়িতে গিয়ে হানা দিত শিপ্রা। তখন ওর বয়েস ষোলো সতেরো। সর্বাঙ্গে তখন ওর যৌবনের ঢল নেমেছে। চোখের চাউনিতে তখন সবে ঘোর লেগেছে।

এক একদিন এক এক বাড়িতে এক এক বিকেলে বেড়াতে যেত। ওকে দেখেই বাড়ির মেয়েদের মুখ ভারী হয়ে উঠত। মনে মনে বলত—ঐ এল সব্বনাশী!

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলা যেত না। শিপ্রার চোখে এমন একটা চাহনী ছিল যে সেদিকে তাকালে মাথা নিচু হয়ে আসত। ওর রূপের গৌরবের কাছে অন্যের রূপের

দৈন্যটা বুঝি লজ্জা পেত। তা ছাড়া পড়াশোনার অহংকারটাও লোকের চোখে ঠেকত বৈকি।

—মাসীমা—! বলেই হয়তো শিপ্রা ঘরে ঢুকত। কী আর বলেন মাসীমা, নিঃশব্দেই একটা আসন পেতে দিতেন। কিন্তু শিপ্রা বসত না। একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে জিগেস করত—বাদল কোথায় মাসীমা?

মাসীমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন না। শিপ্রা আবার জিগেস করলে একটু বেজার হয়ে বলতেন—কী জানি বাপু, বোধ হয় ওপরে পড়াশোনা করছে।

আর কালবিলম্ব নয়, খোঁড়াতে খোঁড়াতে শিপ্রা ওপরে চলে যেত। গিয়েই পেছন থেকে বাদলকে জড়িয়ে ধরে চোখ টিপে ধরত।

ধস্তাধস্তি ঠেলাঠেলি যে একটু না হত তা নয়, শেষ পর্যন্ত নিজের সুবুদ্ধির তাগিদে ইচ্ছে করেই বাদলকে হার মানতে হত।

শিপ্রা চঞ্চল দৃষ্টিতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলত—এই, আমার উলের কাঁটা কোথায় রেখেছ শিগ্‌গির বলো।

বাদল তবু চুপ করে থাকে।

শিপ্রা বলে—এখনো বলো, নইলে আমি সত্যি উঠব না এখান থেকে। আর তোমাকেও যেতে দেব না।

পাড়ায় কারও বাড়ি বিয়ের খবর পেলে নেমন্তন্নের অপেক্ষা না করে সর্বাগ্রে গিয়ে হাজির হত শিপ্রা। ভারী ভালো লাগত তার দেখতে। কেমন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে মেয়ে—কনে-সাজে কেমন সুন্দর মানায়। সবচেয়ে ভালো লাগত, যখন কারও বাড়ি পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে আসত। সে-মুহূর্তে কুণ্ঠিতা, ভীতা, ভাবী বালিকা-বধূর আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা কল্পনা করে সে যেন কেমন একটা নির্মম কৌতুক উপভোগ করত।

শুধু যে শিপ্রাই বাড়ি বাড়ি আসে তা নয়, বাড়ি বাড়ির ছেলেরা নিয়মিত আড্ডা দেয় শিপ্রার বাড়ি। আর সে আড্ডা কেবলমাত্র গল্পগুজব নয়—রীতিমতো খুনসুটি, ঠেলাঠেলি, ছুটোছুটি। কেউ নেয় উলের কাঁটা, কেউবা মাথার কাঁটা। কুমকুমের শিশিটা যে বেমালুম কতবার অদৃশ্য হয়েছে টেবিল থেকে তার ইয়ত্তা নেই।

তবু শিপ্রা আন্তরিকভাবে কোনোদিন এসবের প্রতিবাদ করেনি। মনে মনে যেন এই-ই চায়। চায় একটু অত্যাচার। যে ছেলে তাকে কাঁদাতে পারে তাকেই যেন মনে ধরে। আর যারা পারে না তাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে।

কিন্তু কাঁদাতে পারে এমন ছেলে কই? শিপ্রা আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করতে পারে এমন ছেলে বহু আছে। যারা নিত্য আসে তারা শুধু শিপ্রার ঐটুকু স্পর্শেই খুশি। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, সোজা এসে শিপ্রার হাতটা মুচড়ে ধরে—এমন ছেলে তো আজও মিলল না।

— উঃ লাগছে, ছাড়ো।

কিন্তু তবু ছাড়বে না। দুই কঠিন হাতে শিপ্রার দুটি নরম হাত মুচড়ে ধ'রে আস্তে আস্তে ঠেলতে ঠেলতে দেওয়াল পর্যন্ত নিয়ে যাবে—ঘরের মধ্যে কেউ থাকবে না, সেই দস্যি ছেলেটা শুধু স্থির দৃষ্টি নিয়ে ধীরে ধীরে ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়বে—নিচু ভরাগলায় বলবে—'কেমন জব্দ?' শিপ্রা তার উত্তর দিতে পারবে না। শুধু ব্যথায় পুলকে অভিমানে আনন্দে তার দুই চোখ জলে ভরে আসবে। তবে না হার মানা?

কিন্তু এমন ছেলে কই?

শিপ্রা নিজে খোঁড়া; কিন্তু তার যেন কিছু মনেই হয় না। সে খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে ঠেকে না। মাঝে মাঝে প্রায়ই পড়ে যায় এই যা। তাতে তার লজ্জা নেই। তবু ও ভাবে, এই খোঁড়া পা নিয়েই সে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু তেমন সঙ্গী কই?

শিপ্রা সরকার তার সেই সর্বজননিন্দিত স্বভাব এবং সর্বদুঃখবহ সেই খোঁড়া পা'টি নিয়ে একদিন বি-এ পাস করল এবং বিবাহের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে স্বচ্ছন্দে নিজের দেশের স্কুলেই একটি চাকরী জুটিয়ে নিল।

শিপ্রা শিক্ষিতাও হল, শিক্ষিকাও হল—কিন্তু বদলালো না তার স্বভাব। এখনো সেই চঞ্চলতা—সেই মাদকতা ছড়ানো হাসি; পথের মাঝে হঠাৎ চেনা ছেলে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজেই হেসে এগিয়ে এসে কথা বলে—কোথায় চলেছ?

ছেলেরা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। ভয় পায়। বদনামের ভয়। শিপ্রার সঙ্গে রাস্তায় হাসাহাসি করেছে শুনলে বাড়িতে তাদের লাঞ্ছনার শেষ থাকে না।

কিন্তু শিপ্রা তা বোঝে না। একদিন তাই নিজের স্কুলেই করে ফেললে একটা মস্ত বড়ো অপরাধ।

স্কুলে প্রাইজ হচ্ছে। শিপ্রার ওপর ভার পড়েছে মেয়েদের গান আবৃত্তি শেখানো। খুব ব্যস্ত সেদিন। হঠাৎ তারই মাঝে দর্শকদের মধ্যে কাকে যেন লক্ষ্যে পড়ল। অমনি খুশিতে ওর মুখ ঝলমল্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি গ্রীণরুম ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে এল স্টেজে। ভুলে গেল সে এখানে শিক্ষিকা—ভুলে গেল উচ্ছ্বাস এখানে দমন করে চলতে হয়। কোথাও কিছু নেই—হাত নেড়ে হাসিমুখে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল ছেলেটির। কী আর করে, বাধ্য হয়ে অবশেষে ছেলেটিকে স্টেজেই উঠে আসতে হল। অমনি শিপ্রা খপ্ করে ধরল ওর হাত। তারপর সেই হাত ধরে খুশিভরে টানতে টানতে নিয়ে চলল গ্রীণরুমে।

তার এই অসতর্ক মুহূর্তে পিঠের প্রান্ত থেকে আঁচল খসে পড়েছিল কিনা কে জানে, কে জানে সেই মুহূর্তে তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল কিনা কোনো বে-আদপি ভাব, স্কুল-কর্তৃপক্ষ পরের দিনই শিপ্রাকে ডেকে সাবধান করে দিলেন। বললেন—এটা অশোভন।

শিপ্রা সরকার তার কোনো জবাব দেয় নি। রক্তবর্ণ মুখখানি নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ পদপিষ্ট নাগিনীর মতো রুদ্ধ ক্রোধে চলে গেল।

সেই যে গেল আর ও স্কুলমুখো হল না।

এ নিয়ে যে বাড়িতে তার কিছু অশান্তি হই নি তা নয়; কিন্তু শিপ্রা কোনো কথাই বলে নি। উল আর কাঁটা নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে সেই যে খিল দিল, সারাদিন আর খুলল না।

চুপচাপ দিন কেটে যায়। এখন আর বাড়িতে তেমন কেউ আসে না। তেমন করে কোনো ছেলে এসে আর তাকে ঠাট্টা করে না। মাথা থেকে কাঁটা তুলে নেয় না। প্রাণখুলে হাসবার মতো পরিবেশ নেই। ওর স্কুল ছাড়ার ব্যাপারটা যে নানা রঙে বিচিত্রিত হয়ে ছড়িয়েছে শহরে।

তবু শিপ্রা সরকার চুপচাপ জানলায় বসে চেয়ে থাকে পথের পানে। কত পরিচিত ছেলে যায়, কিন্তু ফিরে তাকায় না কেউ। যদি কেউ ভুলে তাকায়, অমনি শিপ্রা হেসে ডাকে—এই শোনো, শোনো—

ছেলেটি তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে নি[illegible] কোনো রকমে বলে—পরে আসব, এখন একটু কা[illegible] আছে।

এই বলে দ্বিগুণ জোরে পা চালিয়ে চলে যায়।

চলে যায়, কিন্তু পরে আর আসে না।

এমনি করে দিন কাটে। তারপর হঠাৎ একদিন এক[illegible] সুখবর। সুখবর বিয়ের নয়। বিয়ের কল্পনা তা[illegible] কোনোদিনই আসে নি। এ সুখবর অন্য। কলকাতার একটা বড়ো অফিসে তার চাকরী ঠিক হয়েছে।

শিপ্রা সরকার এই দীর্ঘ তেইশ বছরের মধ্যে বোধ হয় এত আনন্দ আর কোনোদিন পায় নি। ভাবতে পারে নি, এমন সুনিশ্চিত স্বাধীনতার সুযোগ তার জীবনে কোনোদিন আসবে।

চাকরী মিলল। মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শিপ্রা চলে গেল কলকাতায়। সেখানে গিয়ে উঠল এক বৌদির বাড়ি। দূরসম্পর্কের দাদা। অতি নিরীহ ভালো মানুষ। তার ওপর অর্থের সংস্থান নেই। শিপ্রাকে পেয়ে তাঁরা খুশিই হলেন। অন্তত শিপ্রা যে টাকাটা দেবে সেটা মোটামুটি ভালোই।

প্রথম প্রথম শিপ্রার মা বাবার ভাবনা হয়েছিল খুব। তাঁদের ভয় ছিল, এই খোঁড়া পা নিয়ে কলকাতায় চলাফেরা করবে কী করে?

কিন্তু শিপ্রার তো সে ভয় ছিল না। সে যে এই খোঁড়া পা নিয়েই সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে পারে।

তবু প্রথম প্রথম প্রতি সপ্তাহে বাবাকে চিঠি লিখতে হবে—ভালো আছি।

শুধু চিঠি লেখাই নয়। পনেরো দিন অন্তর তাকে বাড়ি আসতেও হত।

কিন্তু বাড়ি এলে শিপ্রার তেমন ভালো লাগত না। ঐ যতটুকু মা বাবার সঙ্গে গল্প হত ততটুকুই। তার পর সমস্ত ছুটির দিনটা খাঁ খাঁ করত। সেই নির্জন মুহূর্তে শিপ্রা সরকারের চোখের সামনে ভেসে উঠত অনেক অনেক দিন আগের কত বিস্মৃত কাহিনীর স্মৃতি।

এমনি ছুটির দিন তো আগেও ছিল। সে-সব দিন কেটেছে কত আনন্দে। কিন্তু সে চঞ্চল আনন্দ আজ কই?

তারা কেউ আর আসে না। সে বাদলরা এখন মস্ত বড়ো যুবক হয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে। এমন কি পাড়ার যে মেয়েরা ছিল তার সমবয়সী, তারাও আজ নেই। বিয়ে হয়ে চলে গিয়েছে কোন্ নাম-না-জানা গ্রামে।

এই সব নির্জন দুপুরে নিজের সেই ঘরটির মধ্যে বসে দক্ষিণ দিকের ছায়াঢাকা সরু জনবিরল পথটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিপ্রার মনটা কেমন করে ওঠে। সমস্ত বুক জুড়ে যেন একটা ভারী পাথর চেপে বসে। শিপ্রা ছট্‌ফট্ করে। মনের মধ্যে শুরু হয় যুদ্ধ। না, কিছুতেই না। হার মানবে না, মনে করবে না সে দুঃখী। সে চিরসুখী। এ জগতে এমন কেউ নেই যে তাকে আঘাত করতে পারে—আহত করতে পারে।

শিপ্রা নিঃশব্দ বেদনায় যত নিজেকে সংযত করতে চায় তত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তার হৃদয়। লাল রক্ত। সেই রক্তে তার হৃৎকমল পলাশের রঙে রঙীন হয়ে ওঠে।

ঠোঁট কেঁপে ওঠে থরথর করে। শক্ত করে ধরে জানলার গরাদ। মনে মনে ভয় পায়—এতদিন পর আজ আবার নতুন করে এ অভিসার কেন?

ঐ যে লাল বাড়ি—এখন অবশ্য ভালো দেখা যায় না, এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে এ দুই বাড়ির মধ্যে আরও অনেক কোঠা মাথা তুলেছে যে।

তবু দেখা যায় কিছুটা, এক টুকরো স্মৃতির মতো আংশিক। ঐ বাড়িরই ছেলে পলাশ। ফর্সা ধবধবে রং, একমাথা কোঁকড়ানো চুল। পদ্মপাতায় ঢালা তাজা রক্তের মতো টল্‌মল্ করত তার যৌবন।

তখন শিপ্রার সবে আঠারো বছর বয়েস। তমলুক থেকে বদলি হয়ে নতুন সাব-ডেপুটি এসেছে। বড়ো লোক। সেটা অবশ্য বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা সাবডেপুটির স্ত্রীটি বড়ো সুন্দরী আর মিশুক। এবং তার চেয়েও বড়ো কথা তাঁর একটি সুন্দর ভাগ্নে আছে।

শিপ্রা যথারীতি একদিন সে-বাড়ি আক্রমণ করল। ঘনিষ্ঠ হতে দেরি হল না। সাব-ডেপুটির স্ত্রীর খুব ভালো লাগল মেয়েটিকে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রায়-সমবয়সী ভাগ্নেটিকে ডেকে শিপ্রার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

আলাপ তখনো শুরু হয় নি, সাব-ডেপুটিগিন্নি হঠাৎ একটা কাজের ছুতো করে দরোজা ঠেসিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

শিপ্রা এর আগে অনেক ছেলের সঙ্গে মিশেছে, নিজেই এগিয়ে গিয়ে গায়ে পড়ে আলাপ করেছে, কিন্তু এ ধরণের অপ্রত্যাশিত পরিবেশের সঙ্গে কোনোদিনই পরিচয় ছিল না।

সেই নির্জন প্রায়ান্ধকার ঘরে শুধু দুজনে মুখোমুখী বসে। মুহূর্তের জন্য একবার তাকালো শিপ্রা—ভয়বিহ্বল সকরুণ দুটি চোখ।—না, সত্যিই সুন্দর দেখতে। কেমন একরকম ভাবে ও-ও তাকিয়ে ছিল। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে কোনো ত্রয়োদশোত্তর মেয়েরই দেরি হয় না।

বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল শিপ্রার—যেন কেমন ভয় করেছিল।

শিপ্রা সেদিন আর সেখানে থাকে নি। হঠাৎ উঠে চলে আসছিল, পলাশ বললে—এ কী, উঠলেন!

—হ্যাঁ, বাড়িতে কাজ আছে। কোনো রকমে এইটুকু বলেই তর্ তর্ করে নীচে নেমে এসেছিল শিপ্রা।

সাব-ডেপুটিগিন্নি শিপ্রাকে নেমে আসতে দেখে হেসে বললেন—এ কী ভাই, এখুনি চলে এলে! তোমাদের জন্যে যে চা নিয়ে যাচ্ছিলাম।

তখনো শিপ্রার বুকের কাঁপন থামে নি। বললে—আজ থাক, আর একদিন আসব।

যদিও শিপ্রা সেদিন রাস্তায় নেমেই মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনো ও-বাড়ি যাবে না; তবু কী জানি এক সপ্তাহ পরেই ঐ বাড়ি থেকে অদৃশ্য কী এক শক্তি যেন তাকে বারে বারে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল।

ইতিমধ্যে পলাশও বার দুই শিপ্রাদের বাড়ি এসে আলাপ জমিয়ে গেছে। ভারী আশ্চর্য লেগেছে শিপ্রার এই মানুষটিকে। যেমন ভাগ্নেটি তেমনই মামীটি। সব সময়েই দুষ্টুমি বুদ্ধি।

তা ছাড়া সেদিনের সেই নির্জন ঘরে অপরিচিত ঐ দুষ্টুস্বভাব তরুণের সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকার স্মৃতিটুকুও যেন কেমন রোমাঞ্চ জাগায়।

মনে মনে শিপ্রা ভেবেছে কতবার, ছিঃ সেদিন কী অন্যায় ভাবেই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। পরক্ষণেই ভেবেছে, আর কোনোদিন যদি অমন সুযোগ পায় তাহলে সেদিনের ভুল পূর্ণমাত্রায় সংশোধন করে নেবে।

এবং মনে মনে শিপ্রা সেদিন সত্যিই কামনা করেছিল যে, অন্তত মাত্র আর একটা দিন ঐভাবে দেখা করার সুযোগ যেন পায়।

সুযোগ তারপর সত্যিই এসেছিল। একবার নয় বহুবার এবং কোনোবারই শিপ্রা মনে মনে শত চেষ্টা করেও সেই ঘরে প্রবেশ করার লোভ সামলে উঠতে পারেনি।

দোষ একা শিপ্রার নয়। এ আকর্ষণ উপেক্ষা করার শক্তির অভাবকে যদি দোষ বলা যায়, তাহলে অধিকাংশ মেয়েকেই এ দোষের ভাগী হতে হয়। বেশির ভাগ মেয়েই বেশির ভাগ সময়ে ভালো; কিন্তু ভালো-মন্দর পরীক্ষার ভার নিয়ে পলাশের মতো স্বভাবচটুল ছেলেরা যখন এগিয়ে আসে তখন ঢিমে-মেজাজের নীলবাতি জ্বালা নির্জন ঘরের মধ্যে অতিবড়ো চরিত্রবতী মৃদু-স্বভাবা কন্যারও চিত্ত বিভ্রম ঘটে—বিশেষ যদি সেখানে আবার বিয়ের প্রলোভন থাকে।

শিপ্রা ঘরে আসত, কিন্তু ধরা দিত না। চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে থাকত।

পলাশের রাগ হত। বিরক্ত হয়ে বলত—এসো না!

সে আহ্বানে শিপ্রার বুকটা কেঁপে উঠত শুধু, কিন্তু খোঁড়া পা এতটুকু নড়ত না।

মূর্খ পলাশ জানত না, ডাকলেই সব মেয়ে এগিয়ে আসে না। তাকে হাত ধরে টেনে আনতে হয়।

এ ব্যাপারটা কিন্তু ক্রমশঃ বাড়াবাড়ি হতে লাগল। ঝিয়েরা হাসত মুখ টিপে। সাব-ডেপুটি এত খবর হয়তো রাখতেন না। তিনি ব্যস্ত থাকতেন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে। কিন্তু নিঃসন্তান চটুলস্বভাবা সাবডেপুটি-গিন্নি এই মিলননাট্যের লীলা দেখে এক বিচিত্র আনন্দ লাভ করতেন।

এ গোপন ব্যাপারটা কেমন করে বুঝি শিপ্রার বাবার কানেও এল। তিনি মেয়েকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন—ওদের সঙ্গে এত মেলামেশাটা তিনি ভালো মনে করছেন না।

কয়েকদিন আর শিপ্রা গেল না ওদের বাড়ি। ভাবল, সত্যিই এটা বড়ো অন্যায় হচ্ছে।

কেন?

শিপ্রা বুঝতে পারছিল, কৌমার্যের যে স্বভাবসুন্দর তেজ, তা যেন তার দিনে দিনে ফুরিয়ে আসছিল। এখন আর একলা দাঁড়াতে পারে না, কেবলই অবলম্বন প্রত্যাশা করে।

এমনি সময়ে একদিন এল পলাশ। দেখা করল শিপ্রার সঙ্গে।

—যাও না যে আর আমাদের বাড়ি?

শিপ্রা মাথা নিচু করে রইল।

—ভয় পেয়েছ বুঝি?

শিপ্রা এবারও কোনো কথা বলল না। শুধু খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে এনে দিল।

পলাশ ব্যস্ত হয়ে বললে—না, আজ আর বসব না। শুধু একটা সুখবর দিতে এলাম। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মামা আসবেন কাল।

—বিয়ে! আশ্চর্য পুলকে শিপ্রা চমকে উঠেছিল।

—কার বিয়ে?

পলাশ বললে—তোমার বাবার কাছে মামা আসবেন।

সে মুহূর্তের কথা আজ আর শিপ্রার যেন মনে পড়ে না। সে যেন ভাবতেই পারেনি, এ সম্ভব কী করে? পাত্রর জন্যে সাধ্যসাধনা নেই, কুষ্টি-ঠিকুজির বিচার নেই, দেনা-পাওনার প্রশ্ন নেই;—এক দর্শনে মনে-মনে-বরণ-করা সেই রাজপুত্রটি হবে তার স্বামী!

সেই বিকেলেই শিপ্রা স্বেচ্ছায় এবং সর্বান্তঃকরণে আবার একবার পলাশের সঙ্গে দেখা করেছিল।

কিন্তু—

শিপ্রা আজ দীর্ঘদিন পর হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

দুপুর চলে গিয়েছে। কলে জল এসে গিয়েছে। এক্ষণ কোন্ দুরন্তময় অতীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল!

পলাশ এখন সত্যই অতীত।

ভালোই হয়েছিল, ওরা তাড়াতাড়ি বদলি হয়ে গিয়েছিল, নইলে—নইলে কী হত বলা যায় না।

বিয়ে ?

বিয়ে কখনোই করত না পলাশ। শুধু আরও কিছুকাল তার সামনে মশালের আলো জ্বেলে অন্ধকারেই তাকে ঘুরপাক খাওয়াতো।

সেই থেকে জন্মের মতো শিপ্রা বিয়ের আশা ত্যাগ করেছে। আশা বোধ হয় কোনোদিনই করেনি, শুধু মাঝে একবার কী যেন তার চোখের সামনে ঝল্‌মল্‌ করে উঠেছিল। সে মুহূর্তেও শিপ্রা নিজেকে বধূ বলে কল্পনা করেনি, কল্পনা করেছিল পলাশকে। ভেবেছিল, ওর কাছে বন্দী হওয়ার পালা ফুরবে না কোনোদিন।

একটা আলিস্যি ভেঙে শিপ্রা উঠল।

নাঃ এখানে আর ভালো লাগে না। এদেশটায় কিছু নেই। এর চেয়ে ঢের ভালো তার কলকাতা। সেখানে প্রাণ আছে, আনন্দ আছে, দীপেন্দু লাহিড়ী আছে, উমেশ সরকার আছে, আর আছে, সমরেশ চৌধুরীর মরিসটা। এরা কেউ কখনো ছলনা করে না, মিথ্যে বলে না, বঞ্চনা করে না, বিয়ের কথা তোলে না।

শিপ্রাও বিয়ে চায় না। ও ব্যাপারে তার চিরদিনের বিদ্বেষ—চিরদিনের ঘৃণা।

•

শিপ্রা ফিরে গেল কলকাতায়।

কিন্তু শিপ্রার বাবা-মায়ের চোখে ঘুম নেই। কলকাতায় বাস শিপ্রার অনেকদিন হল। এখন আর দুর্ঘটনার জন্যে ভাবনা হয়না। এখন ভাবনা হয় অন্যরকম। সেও দুর্ঘটনা বৈকি।

শিপ্রার সম্বন্ধে নানা কথা এখানেও এসে পৌছয়। বড্ড পুরুষদের সঙ্গে মেশে। হৈ হুল্লোড় করে। পুরুষদের সঙ্গে আগে যে মিশত না তা নয়, কিন্তু তখন যেটা ছিল সেটা ছেলেমানুষী। তার একটা ক্ষমা আছে। যেমন ক্ষমা থাকে ষোড়শী বালিকার প্রথম প্রণয়ের। কিন্তু আজ শিপ্রার এ ধরণের প্রশ্রয় দেওয়াটার ক্ষমা নেই। এ যেন একটা মস্ত বড়ো অপরাধ।

মা আর বাবা ভেবে আকুল। এ মেয়ের যদি অবিলম্বে কোথাও বিয়ে না হয় তাহলে ভেসে যাবে যে!

কিন্তু—

কিন্তু বিয়ের কথা তুলতেই শিপ্রা যেন জ্বলে ওঠে। বলে—ওসব কথা কোনোদিন আমার কাছে বলবে না।

অবশ্য বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যে সত্যিসত্যিই কেউ আসছে তা নয়, তবু মেয়ের মন বোঝবার জন্যে মাঝে মাঝে মা বিয়ের কথা তুলতেন। তারপর মেয়ের কাছ থেকে জবাব পেয়ে ফিরে যেতেন নিজের ঘরে। চোখের জলে ভাসতেন আর বলতেন, ঠাকুর, মেয়েকে আমার রক্ষা কোরো।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিয়ের ভালো সম্বন্ধ এলও একটা। একেবারে অযাচিতভাবেই এল।

সুমথবাবু মেয়ের ফোটো দেখালেন। সে-ফোটো দেখে ছেলের বাবা মুগ্ধ হলেন।

তখন সুমথবাবু সব কথাই খুলে বললেন—এমন কি পায়ের ওপর অপারেশনের দুর্ঘটনা পর্যন্ত।

ভদ্রলোকের তবু আগ্রহের অভাব নেই। দেখতে চাইলেন। দিনস্থিরও হয়ে গেল।

সুমথবাবু যদিও জানতেন খোঁড়া মেয়েকে তাঁর কেউ নেবে না, তবু আশায় আনন্দে চঞ্চল হয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে সব কথা বললেন।

মতান্তর হল স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে।

স্বামী বললেন—বৃথা ওকে আসতে লেখা। ও আসবে না।

স্ত্রী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—ওকে সব কথা খুলে লেখো তো। নিশ্চয়ই আসবে।

অগত্যা নির্ধারিত দিনের কথা উল্লেখ করে সুমথবাবু নিজেই মেয়েকে পত্র লিখলেন এবং যথাদিনে সকালবেলায় দেখা গেল ছোট্ট একটা এটাচি হাতে শিপ্রা নামছে রিক্সা থেকে।

সুমথবাবু একটি মুহূর্তের জন্যেও কল্পনা করতে পারেননি, তাঁর মেয়ে সত্যিই আসবে। শুধু যে আসাটাই আশ্চর্যের তা নয়, এমনভাবে আসাটাও তিনি কখনো দেখেননি। কোথায় গেল সেই দুরন্ত চঞ্চল মেয়েটি!

এ যেন সে মেয়েই নয়। আলজ্জিত কন্যাটি তাঁর ব্রীড়াবনত দুটি আঁখি নিয়ে ধীরে ধীরে এসে প্রণাম করলে।

সুমথবাবু দুহাত দিয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অলক্ষ্যে পর্দার অন্তরালে আর দুটি অশ্রু-ছল-ছল আঁখি এতক্ষণ বুঝি শিপ্রারই পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিল। এবার সত্যি সত্যি শিপ্রাকে আসতে দেখে অলক্ষ্যেই অন্দরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেইদিন বিকেলে পাত্রপক্ষ এলেন।

আজ আর শিপ্রার সে চঞ্চলতা নেই। মুখরতা তার অনাগত ভবিষ্যতের কল্পনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আজ আর শিপ্রা নীচে নামছে না। অথবা জানলা খুলে পথের দিকে তাকিয়ে চেনামুখ খুঁজছে না। বিছানার ওপর আলতা-পরা পা দুখানি তুলে নতমুখী হয়ে বসে কী যেন ভাবছে।

যথাসময়ে ডাক এল। দুরু দুরু বক্ষে শিপ্রা উঠে দাঁড়ালো। পা-টা যেন আজ বেশি কাঁপছে। চলতে যাবার আগেই তাড়াতাড়ি দেওয়ালটা ধরে ফেলল।

বাবা চমকে উঠলেন—কী রে!

শিপ্রা বললে—না, কিছু নয়।

ধীর শ্লথগতিতে শিপ্রা নীচে নেমে এল। ঐ যে বাতাসে পর্দা দুলছে। ঐ ঘরেই আছেন পাত্রপক্ষ। শিপ্রা ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করল।

ভদ্রলোক প্রথমে তাকালেন পায়ের দিকে, তারপর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আজ সত্যিই বড়ো অপূর্ব লাগছিল শিপ্রাকে। সে দিকে তাকিয়ে আর যেন চোখ ফেরানো যায় না।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন—এসো, মা এসো।

সেই উদাত্ত আহ্বানে কী মন্ত্রগুণ ছিল কে জানে, শিপ্রা যেন চমকে উঠল। নারী হৃদয়ের গোপন গহ্বরে শাশ্বতকালের লজ্জারুণ বধূটি সহসা যেন সে আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে আজ ব্যাকুল হয়ে উঠল। শিপ্রার অনভ্যস্ত শ্লথগতি চঞ্চল হল এবং সমস্ত মনপ্রাণ একত্রে নতমস্তকে তাঁর চরণে সমর্পণ করবার পূর্বমুহূর্তে সহসা শিপ্রার পা-টা আবার কেঁপে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

ঘরসুদ্ধু সকলেই 'আহা' করে উঠল। অতিথি ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন সাহায্যের জন্যে।

সাহায্যের দরকার ছিল না। ততক্ষণে শিপ্রা নিজেই উঠে পড়েছে। কিন্তু অন্যবারের মতো এবার আর সলাজ হাসিটি মুখের ওপর ফুটে উঠল না। লজ্জিত অপমানিত বিষণ্ণ বেদনায় নিজের অবিশ্বস্ত পা দুখানার ওপর মনে মনে তীব্র অভিশাপ দিয়ে শিপ্রা ভেতরে ফিরে গেল।

অতবড়ো মেয়েকে অমন করে কাঁদতে সুমথবাবু আর কোনোদিন দেখেন নি।

দুজনে চলে গেল দুদিকে।

একজন গেল আজিমগঞ্জে, আর একজন কলকাতায়।

সুমথবাবু আজিমগঞ্জের ভদ্রলোককে গাড়িতে তুলে দিতে গিয়ে যখন নিরিবিলিতে কাতর করজোড়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রের মতোই এ ভদ্রলোকও মিষ্টি হেসে বললেন—বাড়ি গিয়ে আলোচনা করে চিঠি দিয়ে জানাবেন।

ক্ষীণ আশা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন সুমথবাবু। তারপর চলল প্রতীক্ষা।

কিন্তু চিঠি আর আসেনা। উচিত সময় কেটে গেলেও যখন তাঁদের কাছে কোনো চিঠি এসে পৌঁছল না তখন একদিন রুদ্ধ অভিমানে সুমথবাবু স্ত্রীকে বললেন—বড়ো ভুল হল।

শিপ্রার মা অন্যদিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। বললেন—কেন?

সুমথবাবু বললেন—এতদিন মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়নি, এমন ঘটা করে কেউ দেখতে আসেনি—সে যে বরং ছিল ভালো। কিন্তু 'পছন্দ হলনা' এতবড়ো অপমান মেয়ে সইবে কী করে?

শিপ্রার মা নিরুপায় হয়ে যখন এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন তখন নীচ থেকে শোনা গেল পিওনের কণ্ঠস্বর—চিঠি আছে।

চিঠি!

দুরু দুরু বক্ষে শিপ্রার মা তখনি ছুটে গেলেন নীচে।

হ্যাঁ চিঠি আছে। খামে ভরা চিঠি।

কিন্তু এযে তাঁরই নামে!

তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেললেন খামখানা। শিপ্রা লিখছে—

মাগো,

বিয়ের ইচ্ছে আমার কোনোদিনই ছিল না। আজও তেমন নেই। এককালে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কত মেয়ের দেখতে-আসার পরীক্ষা, কত আশীর্বাদের ঘটা, কত বিয়ের মন্ত্রপাঠ দেখলাম। আমার এত বছর বয়সেও সে সুযোগ কোনোদিন আসেনি, আসবেওনা জানি; তার জন্যে আমার কোনো আক্ষেপও নেই। তবু বাবার সেদিনের চিঠিখানা পেয়ে আমার যেন কেমন কৌতূহল হল। ছোটোবেলায় কোনো একসময়ে অজ্ঞাতে হয়তো অমনি একটু কল্পনা ছিল। সেই মুমূর্ষু কল্পনাটুকুর সাধ মিটোবার জন্যেই আমি সেদিন গিয়েছিলাম। আর কোনো কারণে নয়। আমি নিশ্চয়ই জানি মা, তিনি আমায় পছন্দ করেন নি। এর জন্যে তোমরা একটুও দুঃখ পেওনা। তোমরা যদি দুঃখ পাও তাহলে বুঝব, আমি তোমাদের জীবনে বোঝা। আমি ভালো আছি, সুখে আছি, শান্তিতে আছি। তোমাদের আশীর্বাদ আমায় রক্ষাকবচের মতো ঘিরে রেখেছে যে!

প্রেম, মহুয়া ও রবীন্দ্রনাথ

রত্না রায়

"বিরস দিন বিরল কাজ প্রবল বিদ্রোহে
এসেছো প্রেম এসেছো আজ কী মহাসমারোহে।"

এই বিশ্ববিজয়া প্রেমের অভিযান যে চারণ-কবির কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ প্রতিধ্বনিত করে ত্রিভুবন আলোকিত করে দুর্দম বন্যার বেগে নেমে এসেছিলো তারি নাম রবীন্দ্রনাথ—আর এই দিগ্বিজয়ী প্রেমের বীর্য্যাবেশ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছিলো যে কাব্যগাথায় তারি নাম "মহুয়া"।

মহুয়া রচনার প্রাক্কালে কবির মনে একটা সাড়া উঠেছিলো নাড়া জাগিয়ে, বিস্মৃত বন্দী যৌবনের আবদ্ধ ডানার ঝটপটানিতে হঠাৎ চকিত অভাবনীয়ের কচিত কিরণে দীপ্ত মুক্তির উচ্ছলতা। মুক্তির দীপ্ত আনন্দে বন্দী মনের প্রেম মিশে যে সুর সৃষ্টি করেছিলো তারি অগ্রদূত মহুয়া নিয়ে এলো পরবর্ত্তী 'তপতী'র সূচনা। মহুয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য-গ্রন্থগুলিতে প্রেম এবং সৌন্দর্য্য উভয়ের পূজারীরূপে স্বীকৃত হয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু মহুয়াতে পাওয়া গেলো সেই পূজারীর চারণ রূপের পরিচিতি, তাঁর রুদ্রবীণায় পূজারীর ভক্তিনম্র বিমুগ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্ত্তে বীর বন্দনার উদাত্ত উচ্ছ্বাস চারণের জয়গাথার মতো। সবল সরল ঋজু প্রেমের সহজ মর্য্যাদা বীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তির মতো বন্দিত হয়েছে মহুয়ার নূতন সুরে। তপতী ও মহুয়ার একই সুরে একই কথা নিঃশঙ্কে উচ্চারিত হয়েছে, "দূর করো মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র।" অথবা, "যাহা রূঢ় যাহা মূঢ় তব, যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্যনব।" তাই এর মূল কবিতা, প্রথম ভূমিকার নাম কি? উজ্জীবন। নতুন করে জাগানো নব জীবনের গান। মালিন্যমুক্ত উদার উদাত্ত এক বলিষ্ঠ জীবনের সুন্দর স্বপ্ন, সর্ব্ব আবিলতা মুক্ত। মহুয়া রচনার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার রূপটি কয়েকটি কথায় প্রকাশ পেয়েছে—"একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে নাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বইয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপন লঘুত্বের আনন্দে ছুটে বেড়াতুম—কিন্তু আমি বেদুইন নই, বাঙালী। আমি কোণে বসে খুঁৎ খুঁৎ করবো, তর্ক করবো, মনটাকে নিয়ে একবার ওলটাবো, একবার পাল্টাবো।" তাঁর ছিন্নপত্রেও তিনি এ কথার আলোচনা করেছেন, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব হয়ে ওঠা অর্থাৎ এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত হয়ে সেই ব্রহ্ম মাঝে আবার বিলীয়মান হয়ে যাওয়ার মধ্যবর্ত্তী যে জীবনকালটুকু সেটি চারিদিক দিয়ে পূর্ণ করে পূর্ণতরতার দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে, একথা দ্বৈত অদ্বৈত সকল মতেই নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের গভীর দর্শন জঙ্গমের কথা চিন্তা করে চায় শুধু চলনশীলতা, ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়ে চলার আনন্দে তার রক্ত নাচে, পূর্ণতার দিকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। আমাদের মতো বিয়ের কাঠির মাপামাপি প্রেমে ঘরের সীমানাটুকু নির্দ্দেশ করে দেওয়া নেই, বন্ধনের বেশি যা তাকে ওরা করে না অস্বীকার। এই পারস্পরিক তুলনাটার কৌতূহলও কতকটা মহুয়া রচনার মূল বলে নির্দ্দেশ করলে হয়তো বা খুব বেশি ভুল বলা হবে না। যে কারণেই হোক, রুদ্র দেবতাকে আহ্বান করেই 'তপতী' আরম্ভ হয়েছে, আর মদনের রুদ্র জয়যাত্রার সামনে দীন ভঙ্গুর পঙ্গুতাকে নিঃশেষে বলি দিয়ে বিলীন করে তার জয়যাত্রার পথপ্রশস্তি সূচনা করেছে "মহুয়া"র। একথা সত্য। মহুয়ার মধ্যেই যা আছে তা হলো পতিরাগের গান। পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি। চরৈবেতি,

চরৈবেতি, কিন্তু দেখো, পথের বাঁধনেও যেন শক্ত গিঁঠ না পড়ে, যেন হেলায় খুলে ফেলার সময় বাধা না পাও। সর্ব্বভারমুক্ত সর্ব্বদায়মুক্ত সম্বন্ধটুকুর যতোখানি শক্তি তার চেয়ে বেশি স্বীকার করতে যেয়ো না। এ প্রেমের "ভার তার না রহিবে দায়।" শুধু পথের আনন্দে ছুটে চলা, গতির নেশায় উন্মত্ত। তাই মহুয়ার প্রিয়া প্রিয়ের "দায়মোচন" করে বলতে দ্বিধা করে না, "আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার, যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই, আবার আসিতে হয় এসো।" প্রিয় ও প্রিয়া পরস্পরের যাত্রাপথের সহায়ক, সহচর যেন হয়, ভার হয়ে না দাঁড়ায়, পরস্পরের বন্ধু হতে পারে, কিন্তু অধিকার না করে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অভীষ্টের স্থান। "আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি, ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী···যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন—যা পাইনি বড়ো তাই নয়।"

শুধু তোমার যাত্রা-সহচরী আমি, পাশাপাশি হাত ধরে চলেছি, আমি পড়ে যাই তুমি ধরে তুলে নেবে, তুমি পড়ে গেলে আমি। পথের সান্ত্বনা আমি তোমার, দুঃখের শান্তি তুমি আমার।

"উড়াও উর্দ্ধে প্রেমের নিশান দুর্গম পথমাঝে দুর্দ্দমবেগে দুঃসহতমকাজে,
···ছুটিনি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে ভুলাইনি সব সত্যেরে করি মিছে,
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতোদিন দোঁহে বাঁচি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছো আমি আছি।"

মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে মানভঞ্জনের পালায় এই মদনরতি শয্যালীন হয়ে থাকে না, এরা উচ্চারণ করে চরৈবেতির মন্ত্র,

"কলি কোথায়? যে রয় শুয়ে আছে তারই কাছে,
যে জেগেছে জীবনে তার দ্বাপর জাগে হাসি,
যে উঠেছে সে চলেছে ত্রেতাযুগের পাছে,

যে চলে সে সত্যযুগে, বাজাও চলার বাঁশী।"

এদের "বিঘ্ন ভাঙ্গা যৌবনের ভাষা, অসীম তার আশা, বিপুল তার বল।" এরা পারে "কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে পুচ্ছ নাচাতে।" এই নবীন যৌবনের যাত্রীদের অধিষ্ঠাতা দেবতা পুষ্পধনুকে বন্দনা করে উজ্জীবিত করে কবি আরম্ভ করেছেন মহুয়ার গাথা। প্রকৃতি, পৃথিবী ও মানবিক সত্ত্বায় মদনের মোহপ্রভাবকে সর্ব্বত্র অকুণ্ঠিত আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোধন করেছেন।

"ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু, হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।" দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ সে দুর্গমে প্রেমের জয়রথকে আহ্বান করে কবি বললেন,

"যাহা মরণীয় যাক মরে, জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি ধরে,
যাহা মূঢ় যাহা রূঢ় তব
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্যনব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।"

"এসো পুষ্পধনু তোমাকে নমস্কার। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে তোমার প্রভাবে, অন্ধ ফিরে পায় তার দৃষ্টি, ধনীকে করো দরিদ্র, দরিদ্র ধনী হয় তোমার কৃপায়। জানি আমাদের প্রত্যাশার বাঁধা পথ দিয়ে চলে না তোমার অনুশাসন, তবু তুমি আমাদের সার্থক করো, হে অপরাজেয় পুষ্পধনু, তোমাকে নমস্কার।" (অন্নদাশঙ্কর রায়)। সেই অপরাজেয় পুষ্পধনুকে আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করলেন—"মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোর না।" তোমার উপযুক্ত উচ্চসুরে বেঁধে দাও আমার বীণা, দাও তোমার প্রেমের শক্তির অনুপ্রেরণা, যে প্রেমে "আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা।"

এইটি মহুয়ার মূল কথা। এই প্রেমকেই কবি বন্দনা করেছেন, যার মধ্যে আঘাত আছে, "নাইকো অবহেলা।" আঘাত তো থাকবেই রুদ্র বিজয়া বিরাট প্রেমের. এবার তো সে আসে নি বাসর শয়নে পুষ্পাস্তীর্ণ পথে লীলাকমলের কমল দল মাড়িয়ে, এবার স্বল্পমুখরিত বায়ুবেগে তার রথ ছুটে এসেছে দিক্‌দিকে তার পায়ের সাড়া পরিব্যাপ্ত করে, রুদ্রবহ্নি হতে জলদচ্ছি তরুণীর আস্তে অতনু বীরের তনুতে তনু পরিগ্রহ করে।

"বাঁধন ছেঁড়া সাধন তাহার সৃষ্টি তাহার খেলা,
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা,

অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায় মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়
···লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি
নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে ফিরে জয় করে নিতে।

(বোধন—মহুয়া)

কে সেই লক্ষ্মী, কে এই দিগ্বিজয়ীর বিজয়লক্ষ্মী অপেক্ষা করে আছে বরণমালা নিয়ে? তাকেও যে অনুরূপ যোগ্য সহচরী করে সৃষ্টি করতে হবে, তাই পুষ্পধনুর সঙ্গে সঙ্গে রতিরও আজ পুনরুজ্জীবন। নবীন যাত্রীদের অধিষ্ঠাতার বাম পার্শ্বে চলবার উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী। তাই "প্রতীক্ষা"য় তারো উজ্জীবনমন্ত্র উচ্চারিত হলো—

"অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা, হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
হে কল্যাণী, সেবাকক্ষে করি না আহ্বান, শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য্য ফিরে অবাঞ্ছিত
চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্ম্মম লাঞ্ছিত।
···তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস।
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে উর্দ্ধশিখা বিপুল বিশ্বাস।
···হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী, অবসাদ হতে লহো জিনি,
স্পর্দ্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী আনো তাহার নিঃশঙ্ক প্রতিবাদ।"

(প্রতীক্ষা—মহুয়া)

সে নারীও অপেক্ষা করে জেগেছিলো ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে

—"আছ চেয়ে, আসবে সে কোন দুঃসাহসী বিজয় পন্থা বেয়ে,
বক্ষ তোমার দোলে, রক্ত নাচে ত্রাসের উতরোলে।"

(প্রচ্ছন্না—মহুয়া)

সেই মানসী বলতে পারে,

"যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী,
বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন···
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে,,
তরঙ্গ গর্জ্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয় ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার। (সবলা—মহুয়া)

সেই মানসী ক্লান্তধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের জন্য পথের ধুলোয় আসন পাতেনি, সন্ধানের রথ ছুটিয়ে দিয়েছে "দুর্দ্দম অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা পাশে।" দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন সে হরণ করে আনবে এমন নারীই তো দুঃখেসুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ, যেই পথে বীর পথিকের পাশে চলার সঙ্গিনী। তারি অকুণ্ঠিত প্রেমের পরিচয় মহুয়া কবিতার ছত্রে ছত্রে। এমন মেয়ের জন্য "পরিচয়"এর কবি আনে নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল যার "কাজল প্রহরে রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে," কদম্ব বাদলের শত আঘাতেও অটল থাকে "বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান." তেমনি সুদৃঢ় প্রেমের সুগন্ধ নিদর্শন নিয়ে এসেছে সেই চিরন্তন পুরুষ তার চিরন্তনী শিপ্রার জন্য। বিনিময়ে নারী তাকে কী উপহার দিলো? একটি কেতকী। কেয়াকদম দুইটিই বর্ষাকালের ফুল, কিন্তু নারীর কোমল হাতে কবি তুলে দিয়েছেন গন্ধভরা অথচ কণ্টকে আবৃত কেয়াকেই। "অন্তরে ঐশ্বর্য্য রাশি আচ্ছাদনে কঠোর বেদন" বহন করে এনেছে কেতকী, অসহজ সাধনার দুর্লভ পুরস্কার সেই কেতকীকে স্পর্শ করে চমকিত প্রিয় জেনেছে কঠিন দুঃখের পানে পেতে হবে প্রিয়ার প্রেমকে। অপরাঙ্মুখ সে দুঃখজয়ী প্রেম তপস্যার কৃচ্ছতায় জয় করে নেবে প্রেয়সীকে, ধ্যানের পুরস্কার হবে আরাধ্য, "নারী সেযে মহেন্দ্রের দান এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে স'পিতে সম্মান।"

এই প্রিয় আর ওই প্রিয়া, এরাই মহুয়ার পথের পান্থদের আদর্শ মদনরতি! এরা eternal love নাম দিয়ে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি, "আমরা দুজনা ভাসিয়া এসে'ছ যুগলপ্রেমের স্রোতে অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে," একথা বলেনি। বরং বন্ধনের বাইরে যে অবাধ মুক্তি তার মধ্যে প্রেমকে সন্ধান করতে গিয়ে বলেছে, "মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই, শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই। মোর লাগি করিয়োনা শোক, আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক।" বলেছে, "মোর প্রেম সেতো স্বপ্ন নয়, সবচেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয়···অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে। পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে।" জীবনের পথে ক্ষণিক ছায়াপাতকে কবি স্বীকার করে নিয়েছেন, এ ঘটনাকে সত্য বলেছেন, বলেছেন মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু ক্ষণিক ছায়াপাতটিকে মন্ত্রের বন্ধনে বেঁধে চিরকাল ধরে রাখতে হবে ইচ্ছা অনিচ্ছা না মেনে এইটিই অবাস্তব। বার বার ফিরে চেয়ে দেখে নেবেন চোখের জলটি, কিন্তু বাঁধনে ধরা দিয়ে প্রেমকে কলুষিত করবেন না। চির অ-ধরা হয়ে থাক্ সেই অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য," ভার যার না রহিবে না রহিবে দায়, বহু তপস্যালব্ধ দুর্লভ ক্ষণটিকে ফুল মালিন্যের মাঝখানে ধুলায় না টেনে এনে বৃন্তের উপর যেমন আছে তেমনি ফুটে থাকতেই দিয়ো ও সে অতনুর প্রেম, তনুহীন নিবেদনের উচ্ছল প্রাণস্পর্শী আবেগ, স্পর্শবন্ধনের অতীতলোকে তার অন্তহীন যাত্রা চলেছে, চলেছে, চলেছে। "মুক্তির নৈবেদ্য" হয়ে শুভ্র শুচি প্রসূন ফুটে থাক, ছিঁড়ে হাতে এনে গন্ধ নিয়ে তাকে কোর না কলুষিত। "পুরানো বলিয়া চেয়ো না তাহারে; আধেক আঁখির কোণে অলস অন্য মনে।" মনের মণিকোঠায় অম্লান, চির নূতন হয়ে সে থাক, যখন অতনুর আবির্ভাবের রথচক্রনির্ঘোষ বাতাসে উঠবে বেজে, তখন, তার দ্বার আপনি খুলে যাবে। সে তো যায় নি, সে যায়নি।

"যায় নাই, যায় নাই, নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে

(বাসর ঘর)

পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।"

(অন্তর্দ্ধান—মহুয়া)

"রাত্রি যবে সাঙ্গ হলো, দূরে চলিবারে দাঁড়াইলে দ্বারে,
আমার কণ্ঠের যতো গান করিলাম দান,
তুমি হাসি মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি,"
"তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান,
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়,"
"তার পরদিন হতে বসন্তে শরতে আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ॥"

(বিচ্ছেদ ও বিদায়—মহুয়া)

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতির ধারা

শ্রীসুনীলকুমার দাস

ইউরোপের নানান দেশের রাষ্ট্রীয় জগতে কত বিভিন্ন পন্থায় রাজনীতি-কার্যের বৈপ্লবিক ধারায় পরিবর্তন ঘটিতেছে বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার মতো। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মনীতে, রাশিয়ায় দিকে দিকে সমাজের মূল হইতে এক একটা নুতন নুতন রাষ্ট্রনীতির নবপত্তনিতে কেমন করিয়া সমাজের ছোট বড়ো সর্বস্তরের আশেপাশে, সন্ধিস্থলে, মর্মদেশে, কেমন ভয়াবহ আক্রমণ দিগ্বিদিক বিক্ষুব্ধ করিয়া ভ্রান্ত-বিমূঢ় পথে সবলে চালনা করায় যে প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিয়াছে—সে ত এক নবযুগ সৃষ্টির বৈপ্লবিক কাহিনীর অভিনব ইতিহাস। এই সব চমকপ্রদ কাহিনীর সত্যকার ইতিহাস-রচনায় জটিলতায় গ্রথিত কত মর্মভেদী হতাশ্বাস আর্তনাদের একদিকে যেমন সুতীব্র প্রকাশ, তেমনি আবার নব-আনন্দময়, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষামণ্ডিত প্রভাতসূর্যের মতো র [illegible] স্বপ্নপূর্ণ বাণীর ঘোষণাও উহার আর একদিকের সুমধুর বৈশিষ্ট্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ব্যক্তিত্বমতবাদের সমগ্র প্রভাবটুকু ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রকে বিপুলভাবে আচ্ছন্ন করিতে করিতে ব্যক্তি-সমষ্টির একটা সংহত শক্তির স্ফূর্তিকে গ্রাস করিয়াই কেবল ক্ষান্ত হয় নাই, উপরন্তু ব্যক্তিত্ববিকাশের এই মতটিকে সকলের উপরে স্থান দিবার একটা জোরালো কারণ বলায় সময় শুধুমাত্র এই ইঙ্গিতটুকুই পাওয়া যায় যে দেশের সামগ্রিক মঙ্গলসাধন একমাত্র ব্যক্তি-প্রতিভার জোরেই নিশ্চিত সম্পন্ন হওয়াটি একেবারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে সত্য। এই নীতিতে অকুণ্ঠ বিশ্বাস ইংলণ্ডের আপামর জনসাধারণের মনেপ্রাণে গ্রহণ করার ফলেই ইংলণ্ডীয় রাজনীতিধারা পুরোপুরি ব্যক্তিত্বমতবাদ প্রভাবি[illegible] হয়।

ইংলণ্ডের এই ব্যক্তিত্বমতবাদ নীতিটির নির্বিরোধে অর্ধশতাব্দীর কিছুটা উপর সমানভাবেই স্বকীয় প্রভাবের অক্ষুণ্ণতা বেশ বজায় ছিল, কিন্তু এ মতের এই স্থায়িত্বটুকুর শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত আর বর্তমান থাকার মতো আপনার শক্তির দৃঢ়তা অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক নীতির এক আঘাতেই অনেকখানি ধ্বসিয়া যায়। এই শতাব্দীর প্রায় শেষ প্রান্তসীমায় বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনকল্পে দেশীয় সাধারণের একটা দুর্বার বৈপ্লবিক শক্তির আকস্মিক অভ্যুদয় হয়। এ আন্দোলনের তীব্রতায়, ক্ষিপ্রতায়, প্রচণ্ড আক্রমণের স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজশাসনের দীর্ঘসঞ্চিত নির্মম উচ্ছৃঙ্খলতার সহসা অন্তিম অবসান ঘটে।

আসলে এই ফরাসী বিপ্লববহ্নির প্রকাশের মূলে প্রধানত রুসো, ভল্‌টেয়ারের মত অসীম প্রতিভাবান মনীষীর লেখনীনিঃসৃত অগ্নিময় বাণীর স্পর্শ সমগ্র ফ্রান্সের সাধারণ জনগণকে যেন এক মুহূর্তের অবারিত প্রেরণায় যখন উন্মত্তবৎ অমিত তেজে অগ্রসর করায় দায়িত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; সেই ভয়াবহ দিনের রাজরক্তপ্লাবিত প্রাসাদের অনুপম কক্ষে, সহরের, এমন কি নগণ্য পল্লীর স্থানে স্থানে অভিজাতশ্রেণীর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের কুৎসিত বীভৎসতায় এমন সমস্ত মানুষের ইতিহাসে অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বর্তমান জগতের যে কোনো নিষ্ঠুর দৃশ্যমান ক্রিয়াকাণ্ডকেও অবহেলে ছাড়াইয়া যাইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। এই বিপ্লবের বাণী (সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা) নির্যাতীত মানুষকে পথে, ঘাটে, যেখানে সেখানে ক্রুর উল্লাসে মন্ত্রপূত করায় দুরূহ ভারটি যেমন অসামান্য যোগ্যতার সঙ্গে চালিত করিতে সামান্যমাত্রও দুর্বলতার পরিচয়টুকু দেয় নাই, তেমনি আবার একই মন্ত্রে দীক্ষিত হাজার হাজার মানুষের একত্রিত অপরাজেয় শক্তির কাছে পরাভূত রাজশক্তির নতমুখ দেখিয়া আতঙ্ক-বিহ্বলতায় সম্বিৎহারা নবযুগস্পৃষ্ট সেদিনের সারা ইউরোপের চমকে বাস্তবিক অনেকখানি আড়ষ্টতার আভাস অক্লেশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংসকর প্রতিভাশক্তির উচ্ছ্বসিত উন্মাদনায় প্রতিবেশী জার্মাণরাষ্ট্র পণ্ডিত ইমানুয়েল ক্যাণ্ট অসম্ভব প্রভাবিত হইয়াই রুসোর সমগ্র মতবাদের অনুসরণে রচিত একটি সমষ্টিবাচক আদর্শের স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতির মূলে কিন্তু রুসোর মতই সাধারণ মানুষের মিলিত শক্তিকে সকলের মঙ্গল সাধনে ব্যবহার করারই একটা সুস্পষ্ট নির্দেশের সম্মতি আছে। তাঁহার এক বিখ্যাত শিষ্য ফিক্‌টেও এই নব চিন্তাপ্রবাহের পূর্ণ সমর্থকরূপেই গোড়ার দিকে রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কাজ সুরু করেন এবং ঐ সঙ্গেই বিপ্লবী ফ্রান্সের রাজনীতিক্ষেত্রের প্রতিটি নতুন জীবনধারায় অভিনব গতিতে যে সব রোমাঞ্চকর বাস্তবতায় আবির্ভাব হয়, সেগুলির সতর্ক দৃষ্টিতে অনুধাবন আর বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রতি তিনি যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খণ্ড খণ্ড জার্মান রাষ্ট্রের ফরাসী-সম্রাট নেপোলিয়নের কাছে পর পর পরাজয়গুলির কারণ অনুসন্ধানে তিনি একটি নুতন তথ্যের আভাস পাইবামাত্র পূর্বপোষিত নীতিটির ধারায় অনেকখানি পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাঁহার সংশোধিত মতের প্রধান ধারায় এই কথাটুকু এমনভাবে সাধারণের মনের ভিতরে বাহিরে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল যে একমাত্র সংহত জাতির রাষ্ট্রই প্রতিটি মানুষের মঙ্গলকামী হিসাবে দেশের সমগ্র মানব গোষ্ঠীর স্বতস্ফূর্ত ভাবকে সঞ্জীবিত করার ওষধিরূপে সমাজের সর্বস্তরের কল্যাণনিয়ামক। এরূপ বিধিবদ্ধ প্রবল আদর্শের অকুণ্ঠ সমর্থনে প্রত্যেকটি খণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মানরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ বিসমার্কের নেতৃত্বে ক্রমে ক্রমে একত্রিত এবং পরিশেষে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এমন একটি

সুসংহত শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তনি কার্যত সম্ভবপর হয়—যাহার ভবিষ্যৎ সংগঠিত একতায় বিশ্বইতিহাসের একাংশ আজ চিরখ্যাত।

দার্শনিক ফিক্‌টের জার্মানরাজ্যগুলির একীকরণের সদ্য-আবিষ্কৃত এই উদার মন্ত্রে আবার খানিকটা প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিস্বাধীনতা—বিসর্জনেরও উল্লেখ আছে। যে হেতু সমষ্টির কল্যাণে সমস্ত মানবের চরম পূর্ণতার এবং অনায়াস ব্যাপ্তির বিকাশ নিহিত এবং এই অখণ্ড কল্যাণই রাষ্ট্রীয়ের একমাত্র প্রচণ্ড শক্তি বলিয়াই সর্বত্র সুপরিচিত।

এইভাবে জার্মান ছোট ছোট পৃথক রাষ্ট্রে এই নীতিটির নব নব আঘাতের অতর্কিত বিস্তার কেমন যেন সহজে অবহেলে সাধারণ মানুষের মনটিকে প্রায় অভিভূত করে; তেমনি সময়ে হেগেল নামে আর একজন জার্মান বিখ্যাত আদর্শবাদী দার্শনিকের আবির্ভাবে এবং তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মতবাদপ্রচারে গোটা জার্মান রাজ্যের মধ্যে এমনি একটা তুমুল আলোড়নের অপ্রত্যাশিত সাড়া দিকে দিকে জাগিয়া ওঠে—যাহার অপ্রতিহত প্রভাব সত্যসত্যই এই রাজ্যসীমা নিরুদ্বেগে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডের মতো রক্ষণশীল রাষ্ট্রের মূলে সামগ্রিকভাবে ওলটপালট করার মত একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

হেগেলের মতবাদের মূলধারাটির বেশির ভাগ প্রধানত আত্মিক সাধনার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের প্রচারে শুধু রাষ্ট্রকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াই এক একটা বাস্তবজগতের উন্নতি-উৎকর্ষের প্রয়োজনীয় কথাগুলিতে বেশ জোরের সঙ্গে বলার একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস অনুভব করা যায়। তাহাতে প্রত্যক্ষ অবধারিত এই ফলটি দাঁড়ায় যে প্রচলিত রাজতন্ত্রের শক্তির সঙ্গে এই নবপ্রবর্তিত বিপ্লবীভাবের একটা সরাসরি বিরোধের অনিবার্য সংঘাত আসিয়া পড়ে। রাজায় প্রজায় আর পূর্বেকার সহজ সদ্ভাব তেমন বিশ্বস্তভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকার সামান্য সুযোগটুকু পর্যন্ত যেন অক্লেশে হারাইয়া ফেলে। এই অনতিক্রম্য দ্বন্দ্বে, ভীষণ রক্তারক্তির মধ্যে, অসম্ভব কল্পনাতীত উৎকট পৈশাচিকতায় যে বিপ্লবের দাবাগ্নির আহুতি পর্যবসিত হয়, তাহাতে কেবলই মহাকালের নির্মমহস্তে রাজরক্তের চিরনির্বাসনের কথাই শুধু শুধু লিখিত হয় না, একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জীবনের ধারার শত সহস্র উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শাখাপ্রশাখাসমন্বিত অপূর্ব আলেখ্য সঙ্গে সঙ্গে কে যেন রচনা করিয়া যায়।

হেগেলের কিন্তু এই জাতীয় বিপ্লবের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে যথেষ্ট মিল আছে বটে, কিন্তু তাঁহার সব নীতিটুকুর আসল প্রবাহটি একটি নব আধ্যাত্মিকতার নির্দিষ্ট প্রসর আলোকময় ক্ষেত্রে সতত বিচরণশীল। তাঁহার এই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ রাজনীতিক জগতে সমস্ত মানবীয় বিরোধী ভাবসমূহের রীতিমত একটা সুসমঞ্জস ব্যবস্থা বিধি আছে। এ ভাবের ব্যবস্থার প্রয়োজনায় কেমন একটা সুন্দর জনগণের ইচ্ছায় পূর্ণ বিকশিত সঙ্কল্প দৃঢ়রূপে অভিব্যক্ত করার পন্থায় নিবিড় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। এই নীতির সুপ্রকাশে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা স্বাভাবিকরূপে স্ফূর্তি পাওয়ার যে নিশ্চয়তাটুকু ব্যক্ত করে, তাহার ফলে সমগ্র সাধারণ মানুষ একযোগে একসঙ্গে সজীব জাগরণের অবাধ অধিকার পায়।

বিষয়টি আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলাটা আপাতত দরকার মনে হয়। অনেক প্রকারের স্থিরতায় বা চাঞ্চল্যে ভরা পৃথক পৃথক সত্তাবিশিষ্ট প্রতিটি মানুষের পরস্পরবিরোধী ভাবগুলির ক্রমাগত সংঘর্ষে উদ্ভূত যে অবারিত বিপ্লবের সূচনা দেখা যায়, তাহাকে এমন একটি সমঞ্জস সমতাপূর্ণ আদর্শনীতির কাঠামোয় গড়িয়া তোলায় যদি কিছু-মাত্র চেষ্টার অভাব না ঘটে, তবেই প্রতিটি মানুষ বা জনসমষ্টির ইচ্ছার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সম্ভব। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ বা বৃহৎশক্তির চরম পরিণতি এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে লাভ করা যায় না। মানুষের ব্যক্তিগত শক্তিস্ফুরণেরও ইহাই একমাত্র প্রশস্ত রাস্তা। হেগেলের এই নব রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাব সাধারণের মর্মে গিয়া পৌঁছিতে যেমন ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিয়াছে, অমনি কিন্তু ত্বরিতগতিতে ইংলণ্ডের মতো ব্যক্তিত্ববাদী রাষ্ট্রের মধ্যে গিয়া পড়িয়া এই বিপ্লবাত্মক স্বাধীন আদর্শভাব আপন অপরাজেয় শক্তির দৃঢ়তায় ইংলণ্ডবাসীকে পর্যন্ত বিস্ময় বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে।

এই নীতির আসল বক্তব্যটুকুকে সম্পূর্ণ মুক্তিযুক্ত দৃঢ়শক্তির বিকাশ বলিলেই কথাটা অর্থপূর্ণ সুসংগত হয় এবং ইহার অন্তরস্থিত শক্তির প্রকাশ শুদ্ধমাত্র আত্মিক জগতের কেন্দ্রীভূত পরম সত্যময় বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এই সময়েই কিন্তু ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজনীতিক পূর্ণ স্বাধীনতার একটা অসম প্রতিক্রিয়ার অন্তর-বিপ্লবের যুগ সমাগতপ্রায়। গ্রীন এবং বোসাংকোয়েট নামে দুইজন মনীষী দার্শনিক হেগেলের এই শক্তিপূর্ণ মতবাদের ধারাসমষ্টের বিপুল কার্যকারিতার গতিবৈচিত্র্যে তখন মুগ্ধবৎ এবং অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই এই নীতির সমর্থকরূপে অনুসরণরত। তাঁহাদের লিখিত প্রচার-বাণীর প্রচণ্ডতার দাপটে এবং আবেগময় ভাষার তপ্তস্পর্শে যে চেতনাময় জীবনী-শক্তি সঞ্চারের লক্ষণ স্ফূর্তি পায়, তাহাকে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিতে যথাসম্ভব সঞ্জীবিত করানর উদ্দেশ্যেই এই নূতন নীতির প্রবর্তনার চেষ্টা।

এই নীতির মূলকথার মর্মটুকু এই যে রাষ্ট্র শব্দহীন চেতনাহীন কোনো জড় পদার্থের নির্জীব পিণ্ড নয়। ইহার মধ্যে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সমষ্টিগত চেতনায় মণ্ডিত একটি পূর্ণ সজীব চিত্রের বৈচিত্র্যময় জীবন-সমুদয়ের অভিব্যক্তি নিহিত। কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট স্ফুরণ একমাত্র এই রাষ্ট্রেই সম্ভব। এজন্য রাষ্ট্রের নির্দেশিত পথের অনুসরণই প্রতিটি কল্যাণকামী মানবের প্রধানতম কর্তব্য।

রাষ্ট্রের সুসংহত শক্তির সামগ্রিকতায় যদি কোনো ক্ষতির একটুমাত্রও সম্ভাবনা থাকে, তখনই কিন্তু রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা অপরিহার্য হইয়া ওঠে। ইহারও গাঢ় কারণটুকুতে এই বলিয়া বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা আছে যে রাষ্ট্রের শক্তির যেন কোনো মতে এতটুকুও অপচয় না ঘটে; এবং এইজন্য এই শক্তিপ্রয়োগে ঐ বাধা তখনই দূরীকরণের বিধিমত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। তাই মনুষ্য-চিত্তের দ্বন্দ্বপরায়ণ ভাবরাশির চাঞ্চল্যের দরুণ অনেক সময় হয়ত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সরাসরি সংঘাত সৃষ্টি হওয়াটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়; এরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে পরোক্ষভাবে এড়ানোর আছিলায় কোনো একটা সুমীমাংসিত বিধির অমনি সাহায্যের একান্তপক্ষেই দরকার। সঙ্ঘবদ্ধ মনুষ্য-শক্তির প্রভাবের কল্পিত রাষ্ট্রে সাময়িক যে কোনো ধরণের নিরাকরণোপযোগী আইনমতো কিছু একটা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহাতে একীভূত শক্তির মূলে একটু আঁচড় পযন্তও লাগিবে না। বোসাংকোয়েটপ্রমুখ রাষ্ট্রধুরন্ধরদের এই জাতীয় বলিষ্ঠ নীতি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জগতের দুর্বলস্থানে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। ইহার ঐতিহাসিক পরিণতি দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের দিকে।

ইউরোপীয় রাজনীতি ধারায় এরূপ উৎকট আন্দোলন বিশেষভাবে জার্মানীতেই অত্যন্ত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নীটসে এবং ট্রাইটস্কে নামে আরো দুইজন জাতীয়তাবাদী দার্শনিকের বিপ্লবধর্মী উগ্র-নীতিতে ঠিক এই মুহূর্তেই আবার এমন একটি দেশজ স্বার্থগন্ধী প্রচারের তীব্র ইঙ্গিত ছিল—যাহার অব্যাহত প্রভাবে মগ্ন সারা দেশবাসী আপন দেশ-জাতির স্বার্থে, উদগ্র কল্যাণের তাড়নায় নিজস্ব প্রিয়তম জীবনদানে যেন সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের বিষময় বীজ এই নীতির বাস্তব পরোক্ষ ফলেরই প্রতিক্রিয়ামাত্র। এই তীব্র আপোষহীন মতবাদে যে জার্মানজাতিকে শুধু জগৎশ্রেষ্ঠ প্রতাপান্বিত করার প্রকাণ্ড আয়োজন ছিল এবং দুনিয়ার অপরাপর জাতির সত্তা, মর্যাদা পদানত করার হীন প্রয়াস গভীর প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার একদিন আকস্মিক সর্বসমক্ষে প্রকাশ বড়ো মর্মবেদনার সঙ্গে আজো প্রত্যেক জাতির অবিস্মৃত অন্তরে সকরুণ গ্রথিত।

(পূর্বানুবৃত্তি)

কুমার আবার পড়িতেছিল।

"সমস্ত উৎসবের সেরা উৎসব ছিল অবশ্য দুর্গোৎসব। সমস্ত গ্রাম যেন মাতিয়া উঠিত। আমার মামার বাড়িতেই দুর্গোৎসব হইত। সে কি সমারোহ! পঞ্চানন যেদিন হইতে প্রতিমা গড়িতে শুরু করিত সেইদিন হইতেই উৎসবের আরম্ভ। আমরা, পাড়ার ছেলেরা, সর্ব্বক্ষণ তাহার নিকটই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তাহার ফরমাস খাটিতাম। বাহিরের প্রতিমা পঞ্চানন গড়িত, মনের প্রতিমা আমরা গড়িতাম। সে যে কি আনন্দ তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত। ষষ্ঠীর দিন হইতে শুরু করিয়া বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত কাহারও বাড়িতে রান্না হইত না। বাড়ির মেয়েরা পূজার আয়োজন করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। কেহ ভোগ রাঁধিতেন, কেহ পূজার জোগাড় দিতেন, কেহ বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের একধারে বসাইয়া তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনের দিকে গোটা দুই ঘর ছিল, তাহাতে কচি ছেলে-মেয়েদের শোয়ার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত থাকিত। যাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া পূজার উৎসবে যোগ দিতে পারে। উৎসবের বিবিধ আয়োজন করিতেন কর্ম্মকর্ত্তারা। যাত্রা, ঢপ, কীর্ত্তন, কথকতা, কবির লড়াই সেই সময়েই দেখিয়াছি, আজকাল আর ওসবের আর তত রেওয়াজ নাই। খাদ্যদ্রব্যের কোনও অভাব ছিল না। মায়ের ভোগ দিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ি হইতে এত ফল ও মিষ্টান্ন আসিত যে বিতরণ করিয়াও অনেক বাঁচিয়া যাইত। দ্বিপ্রহরে পংক্তি-ভোজনে বসিয়াও আমরা ভুরি-ভোজন করিতাম। খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় চপ কাটলেট পুডিং জাতীয় আধুনিক খাদ্য থাকিত না, থাকিত ভালো সুগন্ধ আলো চালের ভাত, মুগের ডাল, পাঁচ ছয় রকম নিরামিষ তরকারি, একটা ভালো চাটনি, দুই তিন রকম মিষ্টান্ন, দই এবং পায়েস। মায়ের সম্মুখে একটি ছাগ-শিশুকে বলিদান দেওয়া হইত, তাহা রান্নাও হইত, সকলকে তাহা দেওয়াও হইত কিন্তু তাহার আমিষত্বের প্রমাণ বড় একটা পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুই চারি টুকরা আলু, দুই চারিটা ছোলার দানা এবং একটু ঝোলই অধিকাংশের ভাগ্যে জুটিত। একবার বোধহয় একটুকরা মেটে পাইয়াছিলাম। নিরামিষ রান্নাগুলি কিন্তু অপর্য্যাপ্ত এবং অপূর্ব্ব হইত। ওরূপ সুমিষ্ট নিরামিষ রান্না আজকাল বড় একটা হয় না। সন্তোষের মা নিজের হাতেই দুই তিনটা তরকারি রাঁধিতেন, রন্ধন-গৃহের প্রধান পরিচালিকাও তিনি ছিলেন। রন্ধন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠিলে কর্ত্তাব্যক্তিরা বলিতেন—আমরা কিছু জানি না, সোনোর মায়ের কাছে যাও। সোনো মানে সন্তোষ। ছেলেবেলায় পূজার সময় চার পাঁচদিন যেরূপ দীয়তাং ভুজ্যতাং দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি আজও মনে অক্ষয় হইয়া আছে। ইহার জন্য খুব যে বেশী একটা খরচ হইত তাহাও নয়। চাটুজ্যে-বাড়ির পাঁচ শরিক ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর পূজা করিতেন। প্রত্যেক শরিকের উপর এক একদিনের পূজার ভার থাকিত। ভার খুব গুরুভার ছিল না। পূর্ব্বপুরুষেরা এজন্য প্রচুর জমি দিয়া গিয়াছিলেন। নগদ পয়সা খুব বেশী খরচ হইত না। ভোগের চাল ডাল তরি-তরকারি জমি হইতে আসিত, গোয়ালাদের নামে জমি দেওয়া ছিল তাহারা বিনামূল্যে পূজার সময় যত দুধ দই লাগিত তাহা সরবরাহ করিত।

পঞ্চানন প্রতিমা গড়িত, বাজনাদার বাজনা বাজাইত বিনা-মূল্যে, তাহাদেরও জমি দেওয়া ছিল, পুরোহিতেরও জমি ছিল। দুলেরা বিনামূল্যে পূজার বলির জন্য ছাগ-শিশু সরবরাহ করিত, পূজার কয়দিন ফাইফরমাস খাটিত, শম্ভু ময়রা ভিয়ান বসাইয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। সকলকেই জমি দেওয়া ছিল, কেহই পারিশ্রমিক চাহিত না, চাহিবার উপায় ছিল না, কারণ চার-পাঁচদিন বা বড় জোর এক সপ্তাহের পরিশ্রমের জন্য তাহারা কেহ দুই বিঘা, কেহ পাঁচ বিঘা জমির উপসত্ত্ব ভোগ করিত। প্রতি শরিক পূজা-বাবদ দশ-পনর টাকা খরচ করিতে পারিলেই মহা সমারোহে মায়ের পূজা সম্পন্ন হইয়া যাইত। যে সব শরিকের অবস্থা ভালো তাঁহারা বাহির হইতে যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি আনাইতেন। চাটুজ্যেদের প্রকাণ্ড অতিথিশালা ছিল, যাত্রার দল বা কীর্তনীয়ারা সেখানেই থাকিত। মনে আছে কলিকাতা হইতে একবার একজন যাদুকর আসিয়া-ছিলেন, খুব একটা মজা হইয়াছিল সেবার। তিনি কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। নিষ্ঠাবান পুরোহিত মহাশয়ের চাদরের ভিতর হইতে মুরগীর ডিম বাহির করিয়া তিনি তুমুল হাসির তুফান তুলিয়া ফেলিলেন। পুরোহিত রাধু ভট্‌চাজ কিন্তু ব্যাপারটাকে নিছক প্রমোদ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, চটিয়া গেলেন। এত চটিয়া গেলেন যে মুক্তকচ্ছ হইয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। যাদুকর অবশেষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করেন!

আমার মনে এই ধরণের বহু স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। সব স্পষ্টভাবে মনে নাই, যতটুকু আছে তাহারও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করি একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যাইবে। তবে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

প্রথম ঘটনাটি খিতু-মামাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছিল। খিতু-মামা আমার মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। মামার জমি পুকুর বাগান মামা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। খিতু-মামা পরের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে বড় ভালবাসিতেন। পরের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তি সব মানুষেরই অল্প-বিস্তর থাকে, পরের বিষয় তত্ত্বাবধান করিবার সুযোগে খিতুমামা এই প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করিতেন, খুব আন্তরিকতার সহিত হাঁক-ডাক করিয়াই করিতেন। শুধু মামার নয়, বিদেশবাসী আরও অনেকের বিষয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বন্ধু মামা, মামার আর এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা কলিকাতায় ব্যাঙ্কে কাজ করিতেন। তাঁহার বিষয়-আশয়েরও ভার ছিল খিতু-মামার উপর। গ্রামের আরও অনেকের বিষয়ের দেখা-শোনাও করিতেন তিনি। তাঁহার নিজের জমিজমা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু পরের বিষয়ের খবরদারি করিতেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার প্রতাপ খুব ছিল। তিনি এমন-ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন যেন তিনিই গ্রামের রক্ষক। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত—"এই খিতু চাটুজ্যে আছে বলেই পুকুরে মাছ, গাছে ফল-পাকড়, জমিতে ধান দেখতে পাচ্ছ। বাবুরা তো যে যার বউ নিয়ে শহরে গিয়ে মজা ওড়াচ্ছেন, আমি না থাকলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খেত সব। ঘরের চালে খড় পর্য্যন্ত থাকত না। ওই যে বিনোদ চৌধুরি, নামেই গ্রামের জমিদার তিনি, কলিকাতা, মাদ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর, কাশী, কাশ্মীর করে' বেড়াচ্ছেন, তাঁর জমিদারি চালাচ্ছে কে—এই খিতু চাটুজ্যে। ওই বৈকুণ্ঠ নামেই ম্যানেজার, কিন্তু আসলে ও আস্ত একটি জরদ্গব, ওর উপর নির্ভর করলে কি বিনোদ চৌধুরীর জমিদারি থাকত? থাকত না। জমিদারি আছে তার কারণ হালটি ধরে' বসে' আছে এই খিতু চাটুজ্যে!" খিতু-মামাকে প্রায়ই সদরে যাইতে হইত মকোর্দ্দমার তদ্বির করিবার জন্য। নিজের মকোর্দ্দমা নয়, পরের মকোর্দ্দমা। একদিন কিন্তু একটা চাঞ্চল্যজনক ঘটনা ঘটিল। গ্রামের জমিদার বিনোদ চৌধুরীর সহিত খিতু-মামার আন্তরিক সম্পর্ক কতটা ছিল তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু আইনত কোন সম্পর্ক যে ছিল না তাহা আদালতে প্রমাণিত হইয়া গেল।

ঘটনাটা এই। ঘোষাল পাড়ার বখাটে ছেলে বিশ্বেশ্বর খিতু-মামার দৃষ্টি এড়াইয়া সকলের বাগান হইতে ফল এবং সকলের পুকুর হইতে মাছ নিয়মিতভাবে চুরি করিত। এ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিল সে। একদিন কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়া উঠিল, খিতু-মামা তাহাকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিলেন। দিবা-দ্বিপ্রহরে সে বিনোদ চৌধুরিদের বাগানে ঢুকিয়া ডাব পাড়িতেছিল।

খিতু-মামা বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন—বাজার করিতে যাইতেছিলেন—হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল নারিকেল গাছে কেহ চড়িয়াছে। মাথার পাগড়ি এবং গায়ের ফতুয়া দেখিয়া মনে হয় কমল পাশি। সেই সাধারণত সকলের ডাব পাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে তো তাঁহার নিকট অনুমতি লয় নাই। বিনা অনুমতিতে সে ডাব পাড়িবে কেন।

খিতু-মামা হাঁক দিলেন—"ডাব পাড়ে কে—"

"আমি কমল"

"কার হুকুমে ডাব পাড়ছ"

"কমলবাবুর হুকুমে"

খেতুমামা একথা শুনিয়া একটু থমমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু হটিবার পাত্র নন তিনি। বাগানে ঢুকিয়া নারিকেল গাছের নীচে উর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর ঘোষাল বিপদে পড়িল। সে কমল পার্শির পাগড়ি এবং ফতুয়া পরিয়াই ডাব চুরি করিতে আসিয়াছিল, এই কৌশলে সে ইতিপূর্ব্বে বহুবার ডাব পাড়িয়াছে, কমল পার্শির সহিত তাহার ষড় ছিল। খেতুমামা যে এমনভাবে নারিকেল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবেন তাহা সে কল্পনা করে নাই। গাছের উপর সে যতটা পারিল দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু খেতুমামা অনড়। অবশেষে নামিতে হইল তাহাকে। খেতুমামা দুর্ম্মুখ ছিলেন। বিশুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শালা তুই। কমল পাশি সেজে এসেছিস। তোর বাপও পার্শি না কি"

বিশুর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল, সে কিন্তু কিছু বলিল না।

খেতুমামা মুখ ভ্যাংচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "নারকোল গাছে উঠেছিলি কেন—অ্যাঁ—"

"আমার খুশী"

"তোমার খুশী ?"

খেতুমামা তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া দিলেন।

এইবার বিশুর মুখ ছুটিল।

"আপনি মারবার কে। আপনার বাপের গাছ ?"

এইবার খেতুমামার অদৃশ্য পুচ্ছটিতে পা পড়িল। তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন। তাঁহার হাতে একটি বেঁটে লাঠি সর্ব্বদা থাকিত, সেইটি তিনি সজোরে বিশুর মাথায় বসাইয়া দিলেন। মাথা ফাটিয়া রক্তারক্তি হইয়া গেল। ··

খানিকক্ষণ পরে ফুল-মামী (খেতুমামার স্ত্রীর) কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়িতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, খেতু মামাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

"উনুন ধরিয়ে বসে আছি, বাজার করে' আনবেন তবে রান্না করব, একি কাণ্ড মা—"

খেতু মামা জামিনে খালাস পাইলেন না। মকোর্দ্দমা হইল। আদালতে চৌধুরিদের ম্যানেজার বৈকুণ্ঠ তরফদার হলপ করিয়া বলিয়া আসিলেন যে তিনি বিশু ঘোষালকে ডাব পাড়িবার অনুমতি দিয়াছিলেন। বিনোদ চৌধুরী স্বয়ং সাক্ষী দিয়া বলিয়া গেলেন যে তিনি খেতু মামাকে তাঁহার বাগানের বা বিষয়ের রক্ষক নিযুক্ত করেন নাই। খেতু মামার দুইমাস জেল হইয়া গেল। বিনোদ চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে ইহাতে খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরিষদ মহলে নাকি বলিয়াছিলেন—সম্ভব হইলে তিনি খেতু-মামার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, কিন্তু তাহা সম্ভব ছিল না। ঘোষাল পরিবারের বিশু ছেলেটা বখাটে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশুর দাদা একজন রায় বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আজ না হয় খুলনায় আছে কাল যদি এখানে আসে ? কুম্ভীরের সহিত ঝগড়া করিয়া জলে বাস করা যায় না। এই কারণে অত বড় একজন গভর্ণমেণ্ট অফিসারের কোপদৃষ্টিতে পড়িতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

খেতু মামার জেল হওয়াতে শুধু ফুল মামী নয়, আমরাও অসহায় হইয়া পড়িলাম। খেতু মামা সত্যই গ্রামের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে গ্রামে চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। দিদিমা ফুল-মামীকে আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় দিলেন। তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা লইয়া আমাদের বাড়িতেই আহার এবং শয়ন করিতে লাগিলেন। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে ডাকাইয়া অনুরোধ করিলেন—"খেতুর জেল হওয়াতে আমরা সবাই সশঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তুমি বাবা রাত্তিরে এখানে এসে শুয়ো। যদি অসুবিধে না হয় এখানেই রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়াও কোরো—"।

গোলক পণ্ডিত যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "শোব, নিশ্চয়ই শোব।

খাওয়ার হাঙ্গামা আর করবেন না। আমি খেয়ে-দেয়েই আসব, নিশ্চয় আসব"

দিদিমা বলিলেন, "খাওয়ার আর হাঙ্গামা কি। আমাদের এত লোকের রান্না তো হবেই—"

গোলক পণ্ডিত কুণ্ঠিত মুখে বলিলেন, "না, না, সে থাক। ঠানদি আবার কি মনে করবেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে শোব এসে এখানে"

গোলক পণ্ডিত চলিয়া গেলেন।

ফুল-মামী দিদিমার পাশে এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া যাইবার পর অসঙ্কোচে মন্তব্য করিলেন, "মাগী পণ্ডিতকে গুণ করেছে। হরিদাস বলছিল মাগী সন্ধ্যের পর যখন রান্নাবান্না করে তখন পণ্ডিত না কি রান্নাঘরের বারান্দায় বসে ভাগবত শোনায় ওকে। না রে হরিদাস ?"

হরিদাস খেতুমামার বড় ছেলে। বয়স বারো তেরো। সে উঠানে বসিয়া ধনুক করিবার জন্য বাঁখারি চাঁছিতেছিল। সে আরও নূতন খবর দিল। বলিল, "পণ্ডিত মশায় ঠানদির উনুন ধরিয়ে দেয়, কুয়া থেকে জল তুলে দেয়। একদিন দেখলাম মশলাও বাটছে"

ফুলমামী নাক কুঁচকাইয়া বলিলেন, "মরণ আর কি! কালে কালে কতই যে দেখব!"

ফুলমামীর রাগের কারণ ছিল। গোলক পণ্ডিত হরিদাসকে নিজের পাঠশালায় পড়াইতে রাজি হন নাই। তিনি তিন চারিটি ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াইতেন এবং সেগুলিকে নিজে নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। হরিদাসকে তিনি নির্ব্বাচন করেন নাই।

দিদিমা ফুলমামীর সহিত একমত হইলেন না।

বলিলেন, "গোলক যা-ই করুক, লোকটি অতি সজ্জন। তা না হলে ওকে রাত্রে এখানে শুতে ডাকতাম না"

ফুলমামী ইহার উত্তরে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করিলেন।

ক্রমশঃ

কবিতার জন্ম

শ্রীউজ্জ্বল মজুমদার

কবিতা লেখে কি করে? তার জন্ম কোথা থেকে হয়? কি ভাবে হয়? এই সব প্রশ্ন কবিদের যতটা না পীড়িত করে, তার চেয়ে বেশি করে অকবিদের। যুগে যুগে এই অকবির দলই কবিদের প্রশ্ন করে ব্যথিত করেছে।

যেই কবি পুরোনো ঢঙ ছাড়েন, ছন্দ বদলান, ভাষা বদলান—অমনি অকবির দল বলেন, কৈফিয়ৎ চাই। যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন হচ্ছে। তার কৈফিয়ৎও দিতে হচ্ছে। অথচ পরিবর্তনটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

যাই হোক্, কবিত্বের পোষাকটা পরিবর্তিত হবেই। তা নিয়ে আলোচনা আমি করছি না। কাব্যের বহিরঙ্গ নিয়ে যতই কবি-সমালোচকের বিতণ্ডা চলুক না কেন, আসল কথা হোল রসপ্রাপ্তি। ভাবকে তিনি যথাযথ ভাষার অঞ্জলিতে ধরে পাঠককে নিবেদন করতে পারছেন কিনা—সেইটাই আসল কথা।

কাব্য সৃষ্টির মূলে যে এক অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে, তাকে মেনে নিয়েই কবিরা অগ্রসর হয়েছেন। বাগানের মধ্যে যে শক্তি গোপাল হয়ে ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হয়ে প্রকাশ পায় এ কথা কবিরাই বলেছেন। আর একজন আধুনিক কালের সচেতন কবির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি:

> A common phrase among poets is, 'It came
> To me.' So backueyed has this become that
> One learns to suppress the expresaion with'
> Care, but really it is the best description
> I know of the conscious arrival of a poem.
>
> (A my Lowell)

কবিতার জন্ম এক অচিন্ত্য শক্তির বলে। এ কথাকে কোন দেশের কোন সমালোচকই অস্বীকার করতে পারেন না। কবিকে এদিক থেকে divinityর মর্যাদা দিতেই হয়।

কিন্তু প্রতিভার নৈসর্গিক দিক ছাড়া একটা লৌকিক দিকও মানতে হবে। প্রেরণা পাবার পরেই মানুষের স্বাধিকারের রাজ্য। কিন্তু সেখানে প্রমত্ত হলে চলবে না। কবিকে আত্মস্থ হতে হবে। সমগ্র divinityকে ভাষার সাহায্যে 'human' করে তুলতে হবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে হবে মুহূর্তেই। কিন্তু যদি না হয় তখন বড় কঠিন সংগ্রাম।

তখন মনে হবে শব্দের শক্তি বড় ক্ষীণ। এত পরিশ্রম করেও যা বলবার তা যেন বলা হোল না। তেমন সুরকণ্ঠ শব্দ যেন হাতের কাছে জুটলো না!

তখনই কাব্য-লেখক বুঝতে পারে নিজের ক্ষমতার সীমা। জীবনের অন্য সব ব্যাপারে আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি। কিন্তু কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবির সমস্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সেই অচিন্ত্য শক্তির দ্বন্দ্ব বাধে। তবে এ দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য কোন পক্ষের জয় পরাজয় নয়। উভয়-পক্ষের হরগৌরী মিলন অথবা অহি-নকুল সম্পর্কের বিচ্ছেদ।

কবিতার প্রকাশক্ষেত্রে কবিকে অনেক সময় এই রকম সংগ্রাম করতে হয় বলে অনেকের প্রতিভার divinity সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি,প্রতিভার দুটি দিক আছে—একটা divinityর দিক, আর একটি মানবিক দিক। ওই divinity হোল প্রেরণা যা মানুষকে ভাষার সৌধ গেঁথে তুলে ভাবকে যথাযথ রূপময় করতে সাহায্যে করে। প্রেরণা পেয়ে ভাষার সৌধ গেঁথে তোলবার পর তাকে আর নির্মাণ বলা যায় না। তা রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়। প্রেরণা হোল কাব্যের সেই কমল হীরা যার স্পর্শে নির্মাণের ক্লান্তিটুকু মুছে গিয়ে তা স্বয়ম্ভু রসরূপ বলে মনে হয়। কাব্যে divinityর মূল্য যে কতখানি তার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন Stephen Spender :

Inspiration is the beginning of a poem and it is also its final goal. It is the first idea which drops into the poets mind and it is the final idea which he at last achieves in words. In between this start and this winning post there is the hard race, the sweet and tail.

অর্থাৎ একটি দৌড়ের বিজয়ী প্রতিযোগীর সঙ্গে সার্থক কবির তুলনা চলতে পারে। প্রেরণা বা inspiration হোল সেই প্রারম্ভিক বন্দুকের শব্দের মতো যা প্রতিবেশীর দৌড় আরম্ভের মতো কবিকেও রূপদক্ষতার কাজে লাগিয়ে দেয়। তারপর সেই প্রেরণাই গন্তব্যস্থল রসলোকের দ্বারে ফিতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কবিও আপ্রাণ চেষ্টায় সেই ফিতা ছুঁয়ে তাঁর সকল পরিশ্রম সার্থক করেন। যে ভাব বা আইডিয়া কবিকে প্রেরণা দিচ্ছে তাকেই রূপদেবার জন্য কবি সাধনা করে চলেছেন। কাজেই যা প্রেরণা তাই লক্ষ্য। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, প্রেরণা থেকে লক্ষ্যে পৌঁছিতে মুহূর্তকাল ব্যয় হয়। সেটা সৌভাগ্যের কথা। মাঝে ওই রূপদক্ষতা অর্জনের প্রযত্ন না যদি থাকে আর একেবারেই যদি ভাব ভাষায় যথার্থ রূপ নেয় তাহলে প্রতিভায় divinityর ভাগটাই বেশি মানতে হয়। মোজার্টের প্রতিভা ছিল এই রকমের। সৃষ্টির প্রেরণা তৎক্ষণাৎ তাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিত। মোজার্ট মনে মনেই সিম্ফনি বা অপেরার কোন কোন দৃশ্য ভেবে রাখতেন। তারপর কাগজে কলমে একেবারেই তাদের পূর্ণ রূপ দিতেন।

বেশির ভাগই দেখা যায়, কবিরা নানাভাবে স্কেচ্‌ ড্রাফ্‌ট্‌ করতে করতে তবে প্রেরণামূলক ভাবকে ভাষায় অঞ্জলিতে ধরতে পেরেছেন। বিঠোফেন এই দলে। রবীন্দ্রনাথ এই দলে। অধিকাংশ কবিই এই দলে। রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতার পাঠান্তর, অংশত বর্জন, নতুন স্তবক যোজনা ইত্যাদি দেখা যায়। পৃথিবীতে যত কবি জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে খুব কমই মোজার্টের মতো বিদ্যুৎ-সঞ্চারী প্রতিভার অধিকারী। প্রতিভার ওই শক্তি মুহূর্তেই অবচেতন মনের আর্তিটুকু ভাষায় ধরতে পারে। অন্য-প্রকারের যে কবি প্রতিভার কথা বলা হোল, তা নানা পথ পরিবর্তনের পরে তবে ঐ আর্তিটুকু ভাষায় ধরতে পারে। অবশ্য এই ধরণের প্রতিভা অনেক সময় বিদ্যুৎ-সঞ্চারী হয়ে পড়ে। কোলরিজের 'Kublakhan' কবিতাটি মোজার্টীয় প্রতিভার বলে লেখা। সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা Prefatory Note to Kublakhan এ লিপিবদ্ধ আছে।

সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কবিতা রচনা করলে তা কবিত্বের স্তরে ওঠে কিনা এ প্রশ্ন অনেক সময় আমাদের মনে জাগে। এটা ঠিক যে, কোন অভিজ্ঞতা মানুষের অবচেতনস্তরে না পৌঁছলে তাতে অনুভূতির রঙ লাগে না। চেতন স্তরে নানা অন্য বস্তুর অনুষঙ্গ চিন্তা-বিচিন্তা যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। আর এটাও ঠিক যে, কোন অভিজ্ঞতাকে বিস্মিৃত না করলে তা দিয়ে গভীর কোন অনুভূতির ভাষা গড়ে তোলা শক্ত।

মানুষের কল্পনা তো অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে অবলম্বন করেই পক্ষ-বিস্তার করে। অভিজ্ঞতা তেমন ভাবে নাড়া দিলে তা মানুষের অবচেতন মনে বাসা বাঁধে। তারপর স্মৃতি তাকে নিঃসঙ্গ মহিমা দেয়। তারপর কল্পনা সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে অবলম্বন করে কথায় জাল বুনে বুনে সেই স্মৃতিকেই আবার স্মরণীয় করে তোলে। নিজের কাছে তো বটেই পরের কাছেও।

কিন্তু এই যে চেতন থেকে অবচেতনলোকে প্রয়াণ, সেখানে স্মৃতিতে তার নিঃসঙ্গ গুরুত্বলাভ, তারপর কল্পনার রঙে রঙীন কথামালার সৃষ্টি —অভিজ্ঞতার এই অভিযাত্রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময় সাপেক্ষ। অনেক সময় বহুদিন তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষকে যতটা নাড়া দেয়, কবিদের তার চেয়ে ঢের বেশি নাড়া দেয়। গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে। অনেক কবিকেই দেখা গেছে শৈশবের অভিজ্ঞতাকে আজীবন প্রেরণা হিসেবে ধরে রেখেছেন। Dante ন বছর বয়সে Beatrice এর সঙ্গে পরিচিত হন। সেই পরিচয়কে কেন্দ্র করে তাঁর পরবর্তী জীবনের Divine Comedy রচিত হয়েছিল। ছোট বেলাকার প্রকৃতি প্রীতিকে কেন্দ্র করেই wordsworth পরবর্তী জীবনে প্রকৃতির প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে কাব্য রচনা করেন। এবং তাঁর Sense-apparatusএ ছোটবেলাকার প্রকৃতির প্রসন্ন সান্নিধ্য এমনই গেঁথে গিয়েছিল যে পরবর্তী জীবনে সেই শৈশব-স্মৃতি-জড়ানো Lake district এ ফিরে এসে জীবন কাটিয়েছিলেন। যে কপোতাক্ষনদ মধুসূদনের শৈশবের লীলাস্থল ছিল, পরবর্তীকালে ভারসেল্‌স্‌ এ বসে তিনি কপোতাক্ষনদকে নিয়ে সনেট লিখেছেন। অভিজ্ঞতা যে কবে কাব্যরূপ নেবে তা বলা যায় না। কিছুটা সময় না পেলে তা স্মৃতিতে পর্যবসিত হতে পারে না এটাও ঠিক।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অভিজ্ঞতার রসপ্রাপ্তিতে বেশি দেরি

হয় নি। কেননা অভিজ্ঞতার যদি গতিবেগ (emotion) প্রচণ্ড হয় তবে তা অল্প সময়ের মধ্যে অবচেতন লোক, স্মৃতি ও কল্পনাকে আশ্রয় করে কথায় ছন্দে মুখর হয়ে উঠতে পারে। তাহলে সে ক্ষেত্রে সমসাময়িক অভিজ্ঞতার রসপরিণতি ঘটতে বেশি দেরি লাগে না। সচেতন মনের সঙ্গে স্মৃতির যে ব্যবধানটুকু কাব্য প্রকাশের সহায়ক—সে ব্যবধানটুকু রচনা করা প্রচণ্ড emotion এর দ্বারাই সম্ভব। সমসাময়িক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে কবির কাব্য রচনা রসোত্তীর্ণ হলে বুঝতে হবে কবির emotion এর গতিবেগ প্রচণ্ড। Abraham Lincoln মারা যাবার পরদিনই হুইটম্যান লিখেছিলেন 'O Captain my captain। ও কবিতা একবার পড়লে আর ভুলবার সম্ভাবনা কম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'স্মরণ' যার রসোত্তীর্ণতা সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই। যুদ্ধের বিভীষিকা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য বেদনাময় রূপ নিয়েছে wilfred owen এর কবিতায়।

প্রেরণার যে দুটি প্রকার ভেদের কথা আগে বলেছি তার প্রথমটিতে অমানুষিকতার পরিচয় বেশি বলে তা নিয়ে আলোচনা চলে না। তার বিচিত্র রূপ দেখেই আমরা মুগ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে মানুষিকতার পরিচয় অনেকটা পাওয়া যায়। তাতে প্রতিভা স্বাভাবিক মানুষিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই অমানুষিকতা লাভ করে। তাই যে কবিতা immediate concentration এর ফলে—এক কথায় মোজার্টের প্রতিভায় রচিত নয়, তাতে প্রতিভার মানুষিরূপ অনেকটা পরিস্ফুট। আইডিয়াকে স্বরূপ ভাষায় রূপবার কাতরতা আমাদের কাছে সেখানে পরম বিস্ময়ের। মোজার্টের প্রতিভায় এই বিস্ময়ের চেয়ে চমকের ভাগটাই বেশি। যাই হোক কবিতার শেষ নয়, বিচার হবে তাকে end in itself হিসেবে দেখে।

কবিতা রচনার means বিচিত্র। সেটা কবিদের ব্যক্তিগত স্বভাবের ওপর নির্ভরশীল। সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে কবিতা রচনার মূল সুরগুলির মোটামুটি ইঙ্গিত দেওয়া গেল। তবে এ আলোচনাও অনুমানমূলক।

কর্ম না সন্ন্যাস

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কর্ম অপরিত্যজ্য জীবের পক্ষে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম কর্মের কৌশল। যা অবশ্য কর্তব্য, প্রাণধারণের জন্য সে কর্ম অপরিহার্য্য। মানুষ কর্মের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে ফলের মাত্র আকাঙ্ক্ষায় নয়, কর্মের দারুণ আসক্তিতে। সাফল্যে ক্ষণিক সুখ, বিফলতায় ক্ষণিক দুঃখ কৃতকর্মের পরিণাম ফলে। নূতন তরঙ্গ আসে তাতে দুঃখী হয় সুখী, সুখী হয় দুঃখী। এমন জোয়ার ভাঁটার তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসা গ্লানিকর। অথচ সংসারের এটা ধারা।

নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা দিয়ে ভগবান সখা অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন জ্ঞানযোগ। সে শিক্ষার শেষে বললেন—হে ভারত, অতএব জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা নিজের অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থিত এই সংশয়কে ছেদন ক'রে যোগকে আশ্রয় কর এবং ওঠ।* কারণ যিনি যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম অর্পণ করেছেন ভগবানে এবং জ্ঞান যার সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছে এমন আত্মবন্তকে কর্ম্ম বন্ধন করে না।

ওঠ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কী বিপরীত কথা। জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে ছেদন কর। কেটে ফেল কাজের ফাঁস। জ্ঞানী হও—তত্ত্বজ্ঞানী। স্পষ্ট বোঝ কাজে কিছু নাই। যিনি যোগের দ্বারা ভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পণ করেছেন তিনি আত্মস্থ আত্মবিদ—তিনি বোঝেন জীবনের রহস্য। এ পৃথিবী মায়াময় অনিত্য, ছায়া-আলোকের খেলা।

সত্যই সংশয়ের কথা। কারণ "উত্তিষ্ঠ" এ-কথা বলবার ঠিক্ পূর্বেই বাসুদেব বলেছেন—হে ধনঞ্জয় যিনি যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেছেন, জ্ঞানের দ্বারা যাঁর সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়েছে সেই আত্মবন্তকে কর্মরাশি আবদ্ধ করতে পারে না।*

কর্মের বাঁধন তাঁর নাই যিনি আত্মবস্ত, আত্মজ্ঞ। এমন সাধক বুঝেছেন নিষ্কাম কর্ম এবং কর্ম-সন্ন্যাস মানুষকে কল্যাণের পথে চালিত করতে পারে কিন্তু চরম

* তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ।৪।৪২

* যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।৪।৪১

লক্ষ্য না থাকলে কর্ম বা জ্ঞান জীবকে তো পরম স্বাধীনতার মুক্ত কূলে পৌঁছে দিতে পারে না। পরকে আপনার মত ভেবে পরের উৎসাদন চিন্তা বন্ধ ক'রে পরহিতার্থ কৃত কর্ম চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না। মাত্র কর্তব্য করছে দেহ, এ চিন্তা জড়াতে পারে না কাকেও কর্মের মোহ বাঁধনে। কিন্তু তাতে জীবনে রসানুভূতি হয় না।

তাই ভগবান পরামর্শ দিলেন—নিষ্কাম কর্ম কর। আপনাকে যোগ করে দাও ভক্তিতে তাঁর সঙ্গে যিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আমিই সেই অবতার। মন্ময় হও, একাগ্রচিত্ত হয়ে আমাকে ভজনা কর। আমাতে আশ্রয় নিলে জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায়। তা হলে আমার স্বরূপ লাভ হয়। এ ভক্তিযোগ।

জ্ঞান যোগ শিক্ষা দিয়ে তাই ভগবান বল্লেন—যোগ-সংন্যস্ত কর সকল কর্ম। সকল কর্ম জুড়ে দাও আমাতে আরাধনার দ্বারা। আমার আরাধনা কর, আমাতেই সব কাজ অর্পণ কর।

তা হলে তো কর্মের মধ্যে রহিল এক কর্ম—আরাধনা। তার ফলও মাত্র এক। যে তাঁকে যেমন ভাবে উপাসনা করে, তার ফলও হয় তেমনি। তিনি বলেছেন—যে যেরূপ ফল প্রত্যাশী হয়ে আমাকে আরাধনা করে আমি তাকে সেই ফল দান করে অনুগৃহীত করি।*

ভগবানের জ্ঞানই তো প্রকৃত জ্ঞান। সে জ্ঞান উপজিলে আর সংশয় থাকে না। পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ বড়, না ধনকুবেরের অবস্থা উচ্চে অথবা যশের শিখরে উঠে লোকের পূজা গ্রহণ করায় আনন্দ—সে চিন্তা থাকে না।

ধীরভাবে আমরা যদি আলোচনা করি কর্মযোগ হিতকর, না কর্ম্ম-সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মের প্রেরণাকে দমন করা কল্যাণকর, আমরা বুঝি যে এ দুই উপদেশের মাঝে পরস্পর-বিরোধী কোনো সংকেত নাই। মানুষকে কাজ করতেই হবে। সে কাজ করতে পারা যায় যদি তার পরিণামে সুখ-দুঃখের অভিঘান হতে চিত্ত হয় মুক্ত। কর্ম হয় শুদ্ধ। কিন্তু সে হয় না সরস মনের পটভূমিতে ভক্তি না থাকলে।

* গীতা—৪।১১

তার পর ওঠে কর্ম-সন্ন্যাসের সূচনা। যদি ভক্তিভরে সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করতে পারা যায়, হৃদয় জুড়ে থাকে তাঁর চিন্তা, তাঁর জ্যোতি, তাঁর আনন্দের স্ফুরণ। তখন মানুষ বোঝে তার প্রকৃত স্বরূপ। তাতে সে হয় অবহিত। এমন মানুষ হয় আত্মস্থ, আত্মবন্ত। তার আর তো কর্ম অবশিষ্ট থাকে না জগতে। সুতরাং তার সাংসারিক কর্মের স্রোত আপনি শুকিয়ে যাবে—প্রবল বন্যা আসবে জ্ঞানরাজ্যে যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সকল খণ্ড চিন্তা, খণ্ড কাজ, খণ্ড প্রেরণা। কর্ম-সন্ন্যাস হবে অনায়াস-লব্ধ সাধনা।

তাই মনে হয় যে নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা যে সোপানের সাধকের জন্য, কর্ম-সন্ন্যাসের উপদেশ তার জন্য নয়। জ্ঞানার্জনরূপ কর্ম যার পক্ষে উন্নতির সোপান, কর্ম-সন্ন্যাস তার পক্ষে শুভ নয়। তার জ্ঞানার্জন হবে বন্ধ। কিন্তু যার পূর্ণ হয়েছে জ্ঞান সে জ্ঞানে জ্ঞান সেই জানবার বিষয়ের সঙ্গে মিলন। যার বাহিরে জানবার কিছু নাই—তার তো কর্ম নাই জগতে সেই আনন্দ সাগরে ডুবে যাবার পর। তাই নিষ্কাম কর্ম এবং অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা ভক্ত যখন আরাধ্যের অনন্ত সত্তার সংকেত পায়, তার আর বাকী রহিল কোন্ কর্ম? তার পক্ষে উচিত কর্ম-সন্ন্যাস।

গীতার নির্দেশও তাই—সর্ব অখিল কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে। *

অর্জ্জুন যখন প্রশ্ন করলেন—হে কৃষ্ণ তুমি কর্মযোগ এবং কর্ম-সন্ন্যাস উভয়েরই ব্যাখ্যা করলে। কিন্তু এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়, তা তুমি আমাকে নিশ্চয় করে বল। †

উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—কর্ম-সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয় পথই মোক্ষের পথ। তবে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ পথ কর্ম-সন্ন্যাস হতে।

বলা বাহুল্য, কোনো উক্তির বিচার করতে হলে, যে প্রসঙ্গে উক্তি, সেই প্রসঙ্গ বুঝলে তবে কথার সার্থকতা বোঝা যায়। আত্মবন্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম-সন্ন্যাস প্রশস্ত। প্রশস্ত কেন স্বাভাবিক। জ্ঞান এবং পূর্ণ নির্ভরতার পরিণাম সাংসারিক কর্ম বন্ধ করে। সে সিদ্ধান্ত বিবৃত

* ৪।৩৪

† সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগ চ শংসসি
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মেব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ।৫।১।

ক'রেও ভগবান সখা-শিষ্যকে বল্লেন—কর্ম-সন্ন্যাস হতে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ পথ। জগতের ধারা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় সচল রাখবার। উত্তিষ্ঠ বল্লেন তিনি অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে। অর্জুন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। গুণকর্ম বিভাগ বশতঃ তাঁর কর্তব্য ধর্মযুদ্ধ॥ জীবনের এ কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করবার শিক্ষালাভ করলেন। আপাততঃ তিনি ধর্মযুদ্ধে নিযুক্ত। যুদ্ধ কর্ম। সে কর্মকে ভক্তির বাঁধন রজ্জুতে জ্ঞানের ফাঁসে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত চেতনায় যোগ করতে হবে। অথচ অভিপ্রেত জগতের কর্মধারা সংরক্ষণের উদ্দেশে যুদ্ধে প্রয়োগ করতে হবে অধর্মসংমূঢ়চিত্ত আত্মীয় বন্ধুর উপর অস্ত্র। তার ফলে দেহ যাবে—অমর আত্মার বেশ পরিবর্তন হবে মাত্র। অকস্মাৎ পূর্ণ জ্ঞান পাণ্ডবের কর্ম্ম-প্রেরণা শুদ্ধ করলে, অভিষ্ঠ সিদ্ধ হবে কেমন করে? তাই অর্জুনের পক্ষে কুরুক্ষেত্রের বিধান—কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ পথ। তাই তাঁর প্রতি আদেশ দেওয়া হল—উত্তিষ্ঠ।

এমনি সমস্যায় পড়েছিলেন অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে। সর্বস্থই তো অখণ্ড ব্রহ্ম। খণ্ড দেব-শক্তি তাঁর দেহে নিহিত। খণ্ড বিচারই তো মায়া। ঐ মায়াময় অখিল আর থাকে কোথা, পূর্ণতার জ্ঞান হলে। অথচ তাঁর কাজ রয়েছে কুরুক্ষেত্রে। তখন জ্ঞানের স্রোতকে বন্ধ করবার জন্য অর্জুনকে বলতে হয়েছিল—আপনার অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখে আমি ভয়বিহ্বল হয়েছি।

নিশ্চয়ই সে ভয় 'মৃত্যুভয় বা শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট পাবার ভয় নয়। এক তো অখণ্ড অনন্ত জ্ঞান লাভ করবার আধাররূপে পরিণত হয় নি সেদিন অর্জুনের মন। এবং দ্বিতীয়তঃ কর্তব্য কর্মে তার চিত্ত হয়েছে সমাহিত। সে ক্ষেত্রে খণ্ড-বিভূতির আধার শ্রীকৃষ্ণকে সে চায়—কর্মের ফলাফল নির্ভর করবার জন্য অথচ ক্ষাত্রধর্মের প্রেরণার জন্য। তাই তিনি বলেছিলেন—

আমি দেখতে ইচ্ছা করি তোমার সেই রূপ যা চতুর্ভুজ কিরীট গদা এবং চক্রধারী। ওগো সহস্রবাহু তুমি চতুর্ভুজ হও।*

গৃহীর পক্ষে কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হল। তার জ্ঞান পূর্ণ হ'লে, ধ্যানে মন একক্ষেত্র হলে, ভক্তিতে মন প্রাণ সরস হ'লে আপনি বন্ধ হবে কর্ম। কর্ম-সন্ন্যাস তখন হবে অবশ্যম্ভাবী।

শরীরের দ্বারা কর্ম করব না এই ধারণায় কর্ম-সন্ন্যাস কি সম্ভব? সম্যক জ্ঞানলাভ না ক'রে, কারণ না দেখিয়ে মনকে জোর করে অবদমনের ফলেও কি কর্ম-সন্ন্যাস সম্ভবপর। ধমক খেয়ে ভাব মনের নিভৃত কক্ষে লুকিয়ে থাকে, সুবিধা পেলে ভেসে ওঠে। কিন্তু জ্ঞানের উপলব্ধিতে কোনো ভাবকে যদি মন নির্ণয় করে অহিতকর, অশুভ, অকল্যাণের পথপ্রদর্শক, অবদমনে তখন সে ভাবের বিনাশ। কর্মযোগ জীবকে উদাসীন করে সুখদুঃখের পরিণামে। কাজেই সে যোগের ভিতর দিয়ে সুখদুঃখের বন্ধনরজ্জু ছেদন না করলে মানুষ সন্ন্যাসী হতে পারে না প্রকৃষ্টরূপে। সে অবস্থায় ধ্যান সম্ভব—যার ফলে হয় পরব্রহ্মের উপলব্ধি।

বলা বাহুল্য কর্মযোগী, কর্মসন্ন্যাসী, ধ্যানী, ভক্ত সবাই এক পথের যাত্রী। সবার চরমলক্ষ্য মুক্তি। জীবনের স্নেহের বাঁধন, প্রতিহিংসার উন্মাদনা, যশ মান সমৃদ্ধির মোহের আবরণ—কেহ তো শান্তি দিতে পারে না জীবকে। অথচ দারুণ সাংসারিক কর্মের মাঝেও দাতা গ্রহীতা পাপী ও পুণ্যবান সবারই মন কাঁদে শান্তির আশায়। লক্ষ্য যদি এক হয় তাহলে কর্মযোগ ও সাংখ্যের প্রভেদ থাকে না। কর্ম যুক্ত হলে আত্মাকে শুদ্ধ করে, অলীক লক্ষ্যের উন্মাদনাকে জয় করে, ইন্দ্রিয়ের উপর জয়ী হয়। সর্বভূতের তেমন যোগী জীবে জীবে প্রভেদ দেখার মোহ হতে মুক্ত হয়। আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করে। তখন সে কর্মের স্রোতে ভাসলেও কর্ম্ম-সিন্ধুতে হাবুডুবু খায় না। পৃথিবীর মাটি চট্‌কালে তার গায়ে লাগে না কাদা।

পরমহংসদেব বলেছিলেন—নদীর স্রোতে নৌকাচড়ে গেলে নদী পার হওয়া যায়। নৌকায় জল উঠ্‌তে দিও না সংসার নদীর জল। তাহ'লে ডুব্‌বে তরী।

কর্মের এক প্রকৃষ্ট উপায় পরকে আত্মীয়—আত্মার সম্বন্ধযুক্ত—ভাবা। তাহলে কর্মের গতি নিয়ে যায় মুক্তির পথে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর তেজী ভাষায় বলেছিলেন—"যদি ভাল চাও তো ঘণ্টা-ফণ্টাগুলোকে গঙ্গায় সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের মানব দেহধারী

* গীতা—১১।

হরেক মানুষের পূজা করগে। আমরা সন্ন্যাসী সকলের কল্যাণ করা আচণ্ডালের কল্যাণ করা এই আমাদের ব্রত"।

এ বাণীর তাৎপর্য বুঝলে উপলব্ধি হয় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—অজ্ঞানীই বলে সন্ন্যাস ও কর্মযোগ পৃথক। পণ্ডিতগণ তা বলেন না। একটির সম্যক অনুষ্ঠান করলে, উভয়ের ফল লাভ করা যায়।১

সে ফল নিঃশ্রেয়শ। যাঁর দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি নির্দ্বন্দ এবং স্বর্গাদি সুখ কামনা রহিত, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। তেমন পুরুষই অনায়াসে বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'তে পারেন।২

সত্যই তো কর্ম সুবিহিত হ'লে পরম পথে নিয়ে যেতে পারে জীবকে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—দেবতারা দেখিয়েছেন যে কর্ম একটা রসিকতা নয়।৩

কর্মযোগী শুদ্ধচিত্ত। ইন্দ্রিয়জয়ীর ভেদবুদ্ধি হয় অন্তর্হিত। সত্যই তো সে অবস্থায় আসে পূর্ণতা। অন্তর্দৃষ্টি বলে—জীব তো পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ নয়, একা নয়। সব কোলাহলে সারা দিনমান ঐ শোন অনাদি অনন্ত গান। সব সঙ্গে রাজে তাঁর সঙ্গ। সকল জীবই যে অমৃতের সন্তান। প্রত্যেকের নিজের কর্ম কল্যাণকর আনন্দময় করতে হ'লে পরের হিত কামনায় অর্পণ করতে হবে নিজের কর্ম। কারণ যিনি ভূমাসর্বশক্তিমান বিরাট পুরুষ—তিনিই সুখের আকর, বহুর কোন ক্ষুদ্র বস্তু প্রকৃত সুখময় নয়। যিনি ভূমা তিনি নিত্য অমৃত। যা পার্থিব তা মরণশীল।৪

কর্মবাদ না দিয়ে এই আদর্শে যদি কর্ম করা যায় তা হলে কর্ম-সন্ন্যাসের প্রয়োজন থাকে না কর্মীর পক্ষে। কারণ যোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগ দুঃখজনক। যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্মলাভ করে।৫

এই উপলব্ধিতে কর্ম প্রসার করে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে। সুতরাং কর্মযোগী বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়। সর্বভূতের আত্মায় নিজের আত্মভাবদশা ব্যক্তি কর্ম করেও লিপ্ত হন না।১

প্রকৃত কর্মযোগী সত্যই সন্ন্যাসী। যার বিবেক-বৈরাগ্য হয়নি তার পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ শুভ নয়। কাজের ভিতর দিয়ে আপনি আসে কাজের ক্ষয় যদি নিষ্কাম কর্মে নিয়োজিত করতে পারে আপনাকে কোনো মানব। সে যদি প্রকৃত যোগী হয়, সম্যকদৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তার লাভ, তা হলে সে নিশ্চয় বোঝে মাত্র ইন্দ্রিয়েরা ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবর্তিত হচ্ছে; আত্মা দর্শকমাত্র। আত্মা বিচলিত হয় না। তত্ত্ববিদ্ যুক্ত ব্যক্তি সুদৃশ্য কুদৃশ্য কোনো দর্শনেই বিচলিত হন না দেখেন বোঝেন—চক্ষু তার কাজ করছে মাত্র। বাহিরের সমাচার এনে দিচ্ছে মনের কাছে। শ্রবণ সম্বন্ধেও সেই ভাব—মধুর শব্দ বা কর্কশ ধ্বনি তাকে অভিভূত করে না তেমনি করে না বিভিন্ন স্পর্শ বা আঘ্রাণ। ভোজন করেন তত্ত্ববিদ্ প্রাণ ধারণের জন্য, ভ্রমণ করে তাঁর চরণ যুগল। নিঃশ্বাস গ্রহণ করা জীব-ধর্ম প্রাণ-ধর্ম তাই বহে শ্বাস। কথন স্বভাব। যোগী কহেন তত্ত্বকথা, ভক্তির কথা, অন্তরের আবেগের ধ্বনি। কিন্তু তাতে থাকে না কামনা। তাঁর ত্যাগ বা গ্রহণ, উন্মেষ বা নিঃশেষ ইন্দ্রিয়ের কর্মমাত্র। তিনি জ্ঞানী। তিনি ভক্ত। তাই এ-সব কর্ম নিরর্থক বা অশুভ নয়! যোগী তো গ্রাহ্য করে না পরিণাম ফল কারণ তার সকল কর্ম শ্রীভগবানে অর্পিত।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—জ্ঞান লাভ হ'লে পরাশান্তি অচিরে লাভ হয়।২

জনে জনে ভগবান। তাই জীবসেবায় নিহিত কর্মযোগীর কর্ম। তাঁর পক্ষে ফলত্যাগে কর্মত্যাগ। আর তা' হতে আসে সম্পূর্ন কর্মত্যাগ যখন ধ্যানাসীন হয়ে তাঁর আত্মা মিলে যায় পরমাত্মায়।

ব্রহ্মাণ্ডের হিতচিন্তা হতে মুক্ত হলে, কিম্বা জগতের হিতকর কর্মে উদাসীন হপে কর্মবদ্ধ ক'রে তো ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ হয় না। বুদ্ধদেব বর্ণিত নির্বাণ লাভেরও ঐ পথ—মৈত্রী করুণা অহিংসা পাথেয়। গীতা বল্লেন—

১ গীতা ৫।৪।

২ গীতা ৫।৩।

৩ The gods have shown that karma is not a jest.

৪ যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ছান্দোগ্য ৭।২৩।
যোবৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম। ৭।২৪।১

৫ গীতা ৫।৬।

১ যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে। গীতা ৫।৭।

২ জ্ঞানংলব্ধাপরাংশান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। ৪।৩৯

নিষ্পাপ সংশয়বর্জিত একাগ্রচিত্ত সর্বভূতহিতমানস সম্যগদশা ঋষিরা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।১

ব্রহ্মস্বরূপ হবার লক্ষণ প্রণিধান করলে বোঝা যায় সকল সত্যের সার। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখী, আত্মাতেই যাঁর প্রীতি যিনি অন্তরাত্মাতেই মুক্ত সেই যোগীই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে মোক্ষলাভ করেন।২

বৌদ্ধ ধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় মধ্যযান কি? ভগবান বুদ্ধ কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তির উপায় নির্দেশ করেন নি—ভোগসাধনেও নয়। সম্যক দৃষ্টিতে এবং সম্যক সঙ্কল্পে জীবনের কর্ম ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করবার উপদেশ দিয়েছেন বুদ্ধদেব। গীতার জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ বৌদ্ধনীতির সাথে মেলে। বৌদ্ধ দর্শনে ভগবানের সাথে ভক্তিযোগের কথা নাই। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কর্ম্মী ও প্রেমী, কারণ তাঁকে বৌদ্ধনীতি সুধা বিতরণ করতে হয় অহিংসা, মৈত্রী, করুণার প্রেরণায়। সেই কর্মই সন্ন্যাসের সঙ্কেত।

১ গীতা ৫।২৫।

২ গীতা ৫।২৪।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস।

সংসারীর পক্ষে কর্ম উত্তম। সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন—"গীতায় দেখনি? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়।—সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন সারসীর ঘরে কেউ আছে। ভিতর বার দুই দেখতে পায়।" *

রবীন্দ্রনাথ এ উপলব্ধি আমাদের শুনিয়েছেন বহু গানে। কর্ম তাঁর সেবা। তিনি বলেছেন—

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবার দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস সহিবারে দাও ভকতি।
যত দিতে চাও কাজ দিও যদি তোমারে না দাও ভুলিতে—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জাল জঞ্জাল গুলিতে।

তাই কাজই সংসারীর ধর্ম।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ২য় ভাগ ৩৪৩ পৃঃ।

বঙ্কিম মানসের একদিক ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাংশুমোহন্ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে পড়ে ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে সুর করে শোনা রামায়ণের একটুকরো ছড়া—আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজায়ে। অবোধ শিশুর মনে কত না কল্পনা সেদিন জাগতো—কে এই ভগীরথ, কতো বড় সে—কোথা থেকে এলো, কোন তুষারশুভ্র গিরিশৃঙ্গ হ'তে কল কল নাদে এই রস-সঞ্জীবনী প্রাণবন্যা, দুলে দুলে ফুলে ফুলে। বয়স বাড়ে—একটু একটু করে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, দৃষ্টি খোলে—রূপকথার জগত থেকে রসকথার আসরে। চোখের সামনে এগিয়ে আসে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জয়যাত্রার কাহিনী! হ্যাঁ এই ত সব ভগীরথের দল—কতদিকে কত শাখাপ্রশাখায় দুকুল প্লাবিয়ে আজ লুকুলো কোথায়—

বাঙালীর সাধনার এই একশো বছর এক রসঘন রসায়নের ইতিহাস। নাগার্জ্জুনের মত পেয়েছিল সে বর্ধাক্ষিণীর কাছে "দুর্লভং এষু লোকেষু রসবন্ধং পদত্রয়ে—দুর্লভ সে রসতো শুধু পারদের রস নয়, প্রাণময়, মনময়, চিন্ময় রসও। যে রসে মানুষকে রঙিয়ে রসিয়ে মাতিয়ে তোলা যায়, যে রসে 'রসোবৈসঃ' এর রাসলীলা হয়। বঙ্কিম-মানসের প্রকৃতির বীজ এইখানে। এর অনুকূল হাওয়া শুধু পূরবৈয়াই বহেনি, পশ্চিম থেকেও এসেছিল এক আগুনভরা আঁধি, ঝোড়ো হাওয়ার দৃপ্ত পদক্ষেপ। দুইয়ে মিশিয়ে সেই একশো বছর পেলে হাজার বছরের বিস্তৃতি, ত্রিলোকের ছাপ লাগলো তার সর্বাঙ্গে, অতীত বর্তমান অনাগত নিয়ে যে ত্রিকাল, তার আশা আকাঙ্ক্ষা কাম-কামনা উদার আতিথ্য ভবিষ্যতের অবদান নিয়ে যে বিপুল সম্ভাবনা। ভাবার ফ্রেম এঁটে ভাবজগতে যে ত্রয়ী তাকে সব চেয়ে বড় রূপ দিয়েছিলেন, বঙ্কিম রবীন্দ্র শরৎ—তাদেরই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের সশ্রদ্ধ উক্তি—achivement enough in century কিন্তু রামমোহন রামকৃষ্ণের আহ্বানে, বঙ্কিম বিবেকানন্দের চিন্তায়, রবীন্দ্র অরবিন্দের ধ্যানে যে ভাবমূর্তি রূপ নিয়েছে তার বৈশিষ্ট্য তার ব্যাপ্তিতে, তার অপ্রাদেশিকতায়, তার সমন্বয় সন্ধানী দৃষ্টিতে। এই যে ভারত পথ পথিকস্থ তারই মন্ত্র হচ্চে বন্দেমাতরম। ঋষি বলি কাকে—যিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, যিনি শুধু কবি নন—মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভু—যিনি বীজে শক্তি বপন করে যান—যার অনুশীলনে মন্ত্রশক্তি হয় চলৎশক্তিমতী, সিদ্ধিদাত্রী, ঋদ্ধিময়ী যার ক্রিয়াযোগ চলে অহরহ, রূপ নেয় জ্ঞানের তপস্যায়, জনসেবার আত্ম-

নিবেদনে। বঙ্কিমের মন্ত্র সেই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলাকে মৃণ্ময়ীরূপেই ডাকেনি, তাকে চিন্ময়ীত্বের আসনে বসিয়ে বিশ্বসভাতলে না হোক—ভারত পুণ্য অঙ্গনে চিরকালের জন্ত অক্ষয় করে দিয়ে গেছে, তাই তো ভারত ভাগ্যবিধাতা সেই মন্ত্রকেই পথ পরিচায়ক বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে উনবিংশ শতাব্দী তখন দিচ্ছে নূতন ইঙ্গিত—আসছে পশ্চিম থেকে তার জ্ঞান বিজ্ঞান, তার দর্শন ইতিহাস, রাষ্ট্রবোধের চেতনা—রামমোহনে যার সূচনা দেখেছি, মাইকেলে যার কিছুটা ঘনীভূতরূপ, বঙ্কিম মানসে তার পূর্ণ প্রস্তুতি দেখলাম; অর্থাৎ পশ্চিমের রসবস্তুকে বিচার পদ্ধতিকে আহরণ করে পূর্বের সূর্য্যকরোজ্জ্বলা দীপ্তি জেগে উঠছে—আমাদের পিতামহরা শুনছেন শুধু দুর্গেশনন্দিনী কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী মৃণালিনীর গল্প নয়, নূতন করে কর্মযোগের সন্ধান, নূতন করে অনুশীলনের ছন্দ, নূতন করে কৃষ্ণ চরিত্রের বাখ্যা। আফিমখোর কমলাকান্তের দপ্তর হচ্চে ভারী। ঘটিরামরা শুধু চৌবাচ্ছাতেই ঘটি ডোবাচ্ছেন মহাসাগর ছেড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—তখনকার প্রাচীনরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নি। বঙ্গভাষা বা সাহিত্যকে বঙ্কিম বাল্য থেকে যৌবনে নিয়ে গেলেন, তাতে শক্তি সঞ্চার করলেন, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিলেন, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ লিখে তার রসসাহিত্যকে নূতন করে গড়ে তুললেন, ভাষার নিপুণ কর্মকার তিনি, চরিত্র অঙ্কনে সুপটু, এ সবই তার কৃতিত্ব, তার চেয়েও বড় কৃতিত্ব হচ্চে যে তিনি নিজে এক ভাবের আন্দোলনের হোতা। শুধু তিনি রচনা করলেন না সম-আলোচনাও করলেন, শুধু ভাবগদগদ প্রীতি সম্বন্ধ হয়ে নয়, বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে, অনুশীলন করে, ইতিহাস বোধকে সন্মান দিয়ে বঙ্কিমের প্রতি ঋষিত্ব আরোপ করে স্থূল কৃতজ্ঞতায় ব্যাকুল হয়ে। আমরা একথা ভুলে যাই যে রামমোহনের পরে বঙ্কিম ও তার পরে বিবেকানন্দই আমাদের যুক্ত মনকে মুক্তবেণীর উদার আকাশে উড়িয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—বঙ্কিম ছিলেন সাহিত্যে কর্মযোগী। তাঁর কল্পনা ছিল, কিন্তু কাল্পনিকতা ছিল না। উদ্দাম ভাবের আবেগে কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ছুটে যায়নি।

আর একটা কথা আমরা আজকের দিনে ভুলে যাই। বঙ্কিম যখন বাংলায় লেখা আরম্ভ করেন তখন দেশে চলছে ইংরেজির প্রতি উৎকট পক্ষপাত। রবীন্দ্রনাথ তার অনুপম ভাষায় যে কথা বলেছেন সে কথারই উদ্ধৃতি করি—ইংরেজি ভাষাটা একে রাজার ঘরের মেয়ে তাহাতে আবার তিনি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার—তাঁহার আদর যে অত্যন্ত বেশী হইবে তাহাতে বৈচিত্র নাই। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য্য—আবার তাঁহার সম্পর্কে আমাদের রাজপুত্রদের ঘরেও কিঞ্চিৎ সম্মানের প্রত্যাশা রাখি। আর বাংলা ভাষা—সে দরিদ্রঘরের মেয়ে। তাহার বাপের রাজত্ব নাই। সে সম্মান দিতে পারে না, সে কেবলমাত্র ভালোবাসা দিতে পারে। তাহাকে যে ভালোবাসে তাহার পদবৃদ্ধি হয় না, তাহার বেতনের আশা থাকে না, রাজদ্বারে তাহার কোনো পরিচয় প্রতিপত্তি নাই। কেবল যে অনাথাকে সে ভালোবাসে সেই তাহাকে গোপনে ভালোবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়···এই দুয়োরাণীর ঘরেই আমাদের একমাত্র স্থায়ী গৌরব, দেশের সাহিত্য, জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই শিশুটিকে আমরা বড় একটা আদর করি না, ইহাকে প্রাঙ্গণের প্রান্তে উলঙ্গ ফেলিয়া রাখি···বলি—ছেলেটার শ্রীদেখো। ইহার না আছে বসন, না আছে ভূষণ। ইহার সর্বাঙ্গেই ধুলা। ভালো তাই মানিলাম, ইহার বসন নাই, ভূষণ নাই, কিন্তু ইহার জীবন আছে।

তেষট্টি বছর পূর্বে কবিগুরুর ঋষি দৃষ্টিতে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল আজ সেই কথা মনে হলে সেই দ্রষ্টাপুরুষকে বারে বারে প্রণাম জানাতে ইচ্ছে করে। সেদিন তিনি বলেছিলেন—একটুখানি অহংকার করতে দেবেন—বর্তমানের অহংকার নহে, ভবিষ্যতের অহংকার—আমাদের নিজের অহংকার নহে, সম্ভবত ভাবী ভারতবর্ষের অহংকার। তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর এখনকার দিনের উড্ডীয়মান বড়ো বড়ো জয়পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে। কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদকুণ্ডল উষ্ণীষে ভূষিত হয়ে সমস্ত জাতির হৃদয় সিংহাসনে রাজ মহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্য্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাল্য সুহৃদদিগের নাম তাহাদের মনে পড়িবে, এইং স্নেহের অহংকারটুকু আমাদের আছে।

বঙ্কিম সেই বাল্যসুহৃদদেরই প্রধান, আর রবীন্দ্রনাথ তার যৌবনের নায়ক। সেই যৌবন চিরস্থায়ী হোক—আমাদের আশার অন্ত নেই, তপস্যারও যেন শেষ না হয়—চোখ খুলসে উঠুক—মা যা হবেন—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিনী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—সবার উপরে বসে আছেন শিব, যিনি কল্যাণময় ময়োভব। এই তো বন্দেমাতরমের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি—ইনিই ত শক্তির আধার—সর্বভূতেস্থিতা। কবির ভাষায়—

এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্যনব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যতের পানে
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে
বঙ্কিম তোমারি নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।

মিশরীয় কথা

চিত্রিতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কায়রো থেকে "গীসের" এই পিরামিড মাত্র ৯ মাইল দূরে। পীচে বাঁধানো মোটরের সোজা সড়ক একেবারে মরুপ্রান্তে এসে থেমেছে। পুরাকালে এই সমস্ত জুড়েই মরুভূমি ধূ ধূ করত। মেম্‌ফিস্ নগরী ছিল অনেক দূরে, অন্তত মাইল কুড়ি তো হবেই। প্রাসাদে, মন্দিরে, বাগানে বাজারে, স্তম্ভে এবং সৌধে, আলোক মালায়, রূপে রঙে নৃত্যে গানে আমোদে বিলাসে বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় যে নগরী তিন হাজার বছর ধরে ঝলমল করতে করতে দপ্ করে নিভে গেছে, অদূরে দেখতে পেলাম তার ধ্বংসস্তূপের উপরে এক সারি খেজুর গাছের মালা। প্রফেসর হাত তুলে দেখালেন—ঐ দেখ পুরোণো সহর। কই কোথায়? ঐ যে বালিয়াড়ির উপরে খেজুর গাছের বীথিকা, বিধাতার আপন হাতের স্মারক চিহ্ন, যত্নে গাঁথা মালা। তার উপরে 'আতন্' দেবের তরোয়াল ঝলছে আকাশে ইস্পাতের মত।

ওই মেম্‌ফিস্ নগর থেকে হৃতপ্রাণদের নিয়ে আসা হোত এই পশ্চিম মরুপ্রান্তে—যে দিকে সূর্য্য নামে অস্তাচলে। বালির নীচে গর্ত খুঁড়ে, চামড়া অথবা মাদুরে মুড়ে শুইয়ে দিত তাদের। ঢেকে দিত বালি দিয়ে। কবে কেমন করে ওরা 'মমি' করতে শিখল কে জানে। আরবী ভাষায় 'মমি' অর্থ পীচ। আরবরা এদেশে এসে মৃত দেহগুলির গায়ে কালো রঙমাখা দেখে ভাবত, ওদের নাম দিয়েছিল 'মমি'—কিন্তু ওদের মৃতদেহ রক্ষার অসংখ্য বিচিত্র প্রক্রিয়ার প্রায় কোনটাই আমাদের জানা নেই—শুধু এইটুকু জানা যায় যে 'মমি' করার জন্ত বিশেষ শ্রেণীর লোক থাকত। তাদের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট করে দেহ দিয়ে দেয়া হোত। ৭০।৮০ দিন ধরে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহগুলি প্রস্তুত হোত। তখন মসলিনের মত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে ওষুধ আরকে ভিজিয়ে দেহের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধত। জানতে ইচ্ছে করে ঐ মসলিন কি বাংলা থেকে আমদানী হোত। ছয় হাজার বছর আগে কি বাংলার সঙ্গে মিশরের কোন যোগ ছিল? না কি—দুই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তুলার ফসলের সাদৃশ্য এনেছে তাদের তাঁতের কারিগরীতে মিল। কিন্তু এর মধ্যেও ভাববার কথা এই যে যদিও আজকের দিনে মিশরের প্রধান উৎপাদন তুলো,—সে যুগে মিশর ছিল শস্তের খনি।

—কে জানে কবে কোন রাজার প্রথম খেয়াল হোল তাঁর দেহের উপরে চিরস্থায়ী গৃহ রচনা করতে হবে কে জানে। খবর রটল দিকে দিকে—দক্ষিণের পার্বত্যঅঞ্চল আসায়ান থেকে দলে দলে লোক জুটল এসে। তাদের কোমরে জড়ানো সাদা কৌপীন, মাথার বাবরী চুলে সরু গামছা বাঁধা। তারা আশায় উৎসাহে ছুটে এল। জয়গান গাইলে রাজার জন্তে, যে রাজা দেবতার মতই মহীয়ান,—নীলনদের মত গরীব পরবর,—দয়ার সাগর। নদী খাবার দেয় বছরে ন'মাস,—বাকী তিন মাসের ভার নিলেন রাজা। এই তিন মাস যখন বানের জলে ঢাকা পড়ে থাকত তাদের চাষের জমি, তখন ভিক্ষা এবং উপবাস এবং মৃত্যুই ছিল তাদের একমাত্র গতি। ফ্যারাও দিলেন নূতন পথের ডাক, নূতন কর্মের আহ্বান। ওরা চাষী ছিল, হোল শ্রমিক, অন্তত তিন মাসের জন্তে। এই সময়টা প্রায় সমস্ত দেশের সমস্ত জনসাধারণ ফ্যারাওর স্বর্গবাসের গৃহরচনার কাজে লেগে গেল। তারপর যখন জল নেমে গেল, আর নূতন জমি নতুন মাটির ভিজে সুগন্ধে চাষীদের ডাক দিল ইশারায়, তখন দলে দলে লোক কুড়ুল ছেড়ে কোদাল নিয়ে লাফিয়ে পড়ল—খুড়ি কোদালও হয়ত নয়, নতুন জলে ধোয়া নতুন মাটির আলগা বাঁধনে কোদাল বসাবারও প্রয়োজন হোত না। বিনা লাঙলে
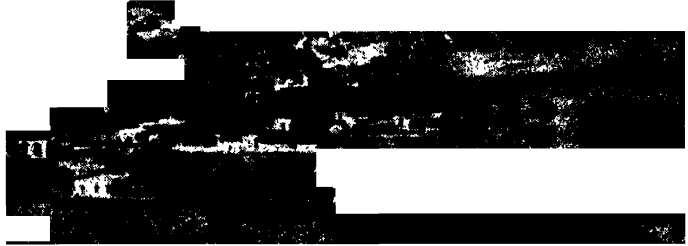
নীলনদ ও পীরামীড্

চাষ হোত। ওরা খোলা মাটিতে ছড়িয়ে দিত বীজকণা। দেখতে দেখতে সবুজ শস্যে ঝলমল করত ক্ষেত। হোরাসের মন্দিরে বলি হোত, ভোগ আসত ফলের এবং সুরার। মৃতমন্দির রচনায় ঘটত বিঘ্ন। কাজ গড়িয়ে চলত মন্থর গতিতে অতি ধীরে, শুধু দাসদের দ্বারা,—যারা নুবিয়া ও লিবিয়ার গহন অরণ্য থেকে হঠাৎ এসে পড়ত সভ্যতার বোঝা বইতে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন রাজা। কাজ চাই, কাজ—আরো আরো কাজ—ওই যারা ন্যুব্জপৃষ্ঠে কুব্জদেহে পাষাণের বোঝা নিয়ে মরুভূমির পথ বেয়ে সারি সারি আসছে,—দলে দলে হাজারে হাজার, ওদের দুর্বলতাকে ক্ষমা করেন না ফ্যারাও। ওরা অলস তাই অক্ষম,—তাই ওদের প্রতি ঘৃণার অন্ত নেই ফ্যারাও দেবের। বেতের পরে বেত পড়ে ওদের পিঠে, ওরা ধুকতে ধুকতে মরতে মরতে চলে, চলতে চলতে মরে। সেই মৃতের স্তূপের উপরে গড়ে ওঠে জীবিত রাজার ভাবী প্রেতের মন্দির।

—ঐ তো আজো দাঁড়িয়ে পূর্ণ করে বহু সহস্র বছর আগের মানুষের

বীরত্বের প্রতীক স্ফিনক্স

দুরাশা,—ঐ যে মস্ত একটা মত অভ্রংলিহ ধূসর চূড়ায় নীল আকাশকে ছুঁড়েছে।

পৌঁছে গেছি পিরামিডের কাছাকাছি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ সমাধি-মন্দিরের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম।

কুঁজের উপরে হাওদা চড়িয়ে বেদুইন সহিসদের লাগামবদ্ধ হয়ে উটেরা বেড়াচ্ছে ঘুরে। ওদের নিরীহ চোখে হাসির ঝিলিক,—দেখে মনে হয় যেন সব জানে সব বোঝে, শুধু রহস্য করে চুপ করে আছে। জেনেশুনে বোবা সেজে বসে আছে। যদি মুখে কথা ফুটত হয়ত হেসে উঠে বলত,—"উঃ কী বোকা!" সত্যি আমরা কিন্তু বোকার মতই দাঁড়িয়ে রইলাম, আর আমাদের ঘিরে চারিদিক থেকে উষ্ট্রপালকরা দর কষাকষি সুরু করে দিল।

—রক্ষে কর, এই রোদ্দুর মাথায় নিয়ে উটে চড়ার সখ নেই। অমনি একজন বলে উঠলেন,—কেন মা, উটে চড়লে কি রোদ বেশী লাগবে না কি? রোদ তো সব জায়গাতেই সমান। অল্পজনের এখনো অত যুক্তির ক্ষমতা নেই, সে শুধু লাফাতে লাগল, হ্যাঁ মা—উটে চড়ব। বোঝা গেল আমাদের সখে ভাঁটা পড়ে এসেছে বটে, অল্পপক্ষের সখের এই সবে সুরু। এতদূর মরুভূমিতে এসে ওদের উটে চড়ার সখের মর্য্যাদা না দিলে চলবে কেন।

—বেশ তবে তোরা উটের পিঠে আর, আমরা হেঁটে চলি। "বাঃ বয়স হওয়াটা এমন কি অপরাধ যার জন্যে উটে চড়ার ফাঁকি পড়তে হবে, দেখা গেল তথাকথিত বয়স্ক লোকটির চোখে ছেলেমানুষী সখের নেশা। "বেশ চড়।" তখন একটায় লালী আর তার বাবা, আর অন্যটায় খুকু রওনা দিল। আমি চললুম পায়ে হেঁটে।

ওরা এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ রোদের ঝলক সর্বাঙ্গ বিঁধিয়ে সবুজ চশমার ভিতর দিয়েও চোখে এসে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। ছোট্ট একটু অভিমানের ছায়া সেই রোদের উপরে কালো হয়ে পড়ল। বেড়াতে এসে এই রোদ্দুরে একা একা হাঁটার দুঃখ পায়ে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। কই কেউ তো আর দ্বিতীয়বার সাধল না। যে যার নিজেরবাহনে চড়ে চলে গেল। ইচ্ছে হোল চেঁচিয়ে বলি—আর একবার সাধিলেই উঠিব। কিন্তু কোথায় কে? ঐ দূরে ওরা চলেছে, আমার দৃষ্টি অতদূরে চলেছে বটে কিন্তু গলা পৌঁছবে না। আর একটা উটে চড়ে গেলে কেমন হয়—উল্টোদিক দিয়ে?

—খুঁজে পাবে না যখন, বেশ হয়ে তখন—ভাববে—এই পিরামিডের মৃত্যুগুহের দ্বারের কাছে কি হ'তে কি হোল কি জানি!

কিন্তু ওদের কাণ্ড দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। কেমন এগিয়ে চলেছে।—পিছন ফিরে একবার চাইলোও না! ঝুঁকে পড়ে আবার কি যেন বলাবলি হচ্ছে।—নাঃ যতটা হৃদয়হীন ভাবা গিয়েছিলো ততটা নয়।—ওরা উটের মুখ ফিরিয়েছে। আমাকে দেখতেও পেয়েছে এবং আমারই উপরে খুব রাগ দেখিয়ে কী যেন বলছে।—পিছিয়ে পড়েছি কেন এই বোধহয় অভিযোগ।—

ওরা বললে—'সখ মিটল তো? এখন ওঠো।—স্বর্গে পৌঁছতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতেই হবে।—একা বেড়ানোর সখে যদি অরুচি ধরে থাকে তো উটে চড়ার দুঃখও তোমাকে সইতেই হবে।—অগত্যা উটবাহিনী হতেই হোল। কিন্তু রাগ গেল না।—উপরন্তু ওর ঐ অজস্রা-

সুলভ নীরিহ শান্ত চোখকেও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার সেই কথা মনে হোল।—জেনে শুনে ন্যাকা সেজে আছে।—চেঁচিয়ে বল্লাম, খুকু এই উষ্ট্রই বেচারা কালিদাসকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল, আজ আমাদের রাবড়ি খাওয়াবে কিনা কে জানে।—

আমার কথায় কর্ণপাত না করে মরু সম্রাজ্ঞী দুলে দুলে পিরামিড প্রদক্ষিণ করতে সুরু করলেন। সর্বাঙ্গে মন্থিত হোল তপ্ত সূর্য্যের প্রবাহ।—

পিরামিডের একপাশে স্ফিঙ্কস। স্ফিঙ্কসের প্রভাব পিরামিডের চেয়ে কম নয়। সাদা বালির উপরে সাদাটে পাথরের এই বিশাল নরসিংহ মূর্তি হাজার কয়েক বছর ধরে পিরামিডকে পাহারা দিচ্ছেন। সমাধি মন্দিরের যোগ্যতম দ্বারী। কে জানে দু'হাজার বছর আগে এর রূপ কেমন ছিল।—পাথরের যন্ত্র দিয়ে পাথর ঘসে ঘসে সেই প্রস্তর যুগের শিল্পী তাঁর কল্পনার যে রূপ এই পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তুলে ছিলেন, আজ তার চিহ্ন নেই। কালের বাতাস মুহুর্মুহু ঘসে ঘসে তার নাকমুখ একাকার করে দিয়েছে। তবু সেই খণ্ডিত-নাশা মহাবীর বালির উপরে দুই থাবা বিস্তার করে, বহু সহস্র বছর ধরে এখানে বসে আছেন। স্ফিঙ্কসের কৃতিত্ব সম্রাট শেপ্রেনের।—সিংহের দুই থাবার মাঝখানে তাঁর একটা ছোট মূর্তি ছিল।—এখন সেই ছোট মূর্তিটির বদলে পাওয়া যায় একটা ছোট পাথরের লিখন—তাতে লেখা আছে এক কাহিনী।

স্ফিঙ্কস্ যিনি তৈরী করেছিলেন তিনি মারা যাবার পরে আরো হাজার দেড়েক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে কত রাজা এল গেল, মিশরের রাজনীতিচক্রে কত পালার বদল হোল।—কালের হাওয়া বালি উড়িয়ে বয়ে গেল এই স্ফিঙ্কসের উপর দিয়ে।—ক্রমে ঢেকে গেল তার দেহ।—আর তাকে চেনার উপায় রইল না।—মনে হোত, ও যেন পিরামিডের পায়ের কাছে উঁচু একটা বালিয়াড়ীর স্তূপ।—

একদিন লোকজন উট গরু সৈন্য সামন্ত নিয়ে উজীর চলেছেন। পথে আশ্রয় নিতে হোল এই পিরামিডের নীচে।—রাতে শুয়ে আছেন ঐ বালির ঢিপির উপরে, উটের চামড়ার শয্যা পেতে। নির্মেঘ আকাশে লক্ষ তারা ঝিকমিক্ করছে আর দিনের গরম বাতাস অন্ধকারের সমুদ্রে ডুব দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। মরুবক্ষের সেই ধূ ধূ শূন্যতার মধ্যে শুয়ে পড়ে শ্রান্ত পথিক ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এলেন স্ফিঙ্কস।—বললেন, —আমাকে এই অন্ধ বালির তলা থেকে উদ্ধার কর।—আমি তোমাকে রাজা করে দেব।—সমগ্র মিশরের ফ্যারাও।—

পূবদিক রাঙা করে সূর্য্য উঠল যখন, তখন উজীর প্রস্তুত হলেন তার স্বপ্ন সফল করতে।—খবর রটল চারিদিকে।—দাসেরা খাটো কাপড় আঁট করে কোমরে কষে, বাবরীচুলে ফেটি বেঁধে, তামার কোদাল আর পাপির ঘাসের ঝুড়ি করে বালি সরাবার কাজে লেগে গেল। দেখতে দেখতে মাথা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠলেন স্ফিঙ্কস। দেড়হাজার বছরের বালির আবরণ খসে গিয়ে বেরিয়ে এলেন এই নৃসিংহ রাজ।—তাঁর দুই থাবার মধ্যে—মধ্যে শেপ্রেনের মডেল।—এই মূর্তি নির্মাণের কৃতিত্ব যদি বা শেপ্রেনের হয়। একে আবিষ্কারের গৌরব তার।—তাই যখন স্ফিঙ্কসের বরে উজীর হলেন ফ্যারাও এবং নাম নিলেন দ্বিতীয় থুৎমোতিস তখন শেপ্রেনের মূর্তির বদলে একটা ছোট ফলকে লিখে রেখে গেলেন এই স্বপ্নপ্রাপ্ত কাহিনী।—
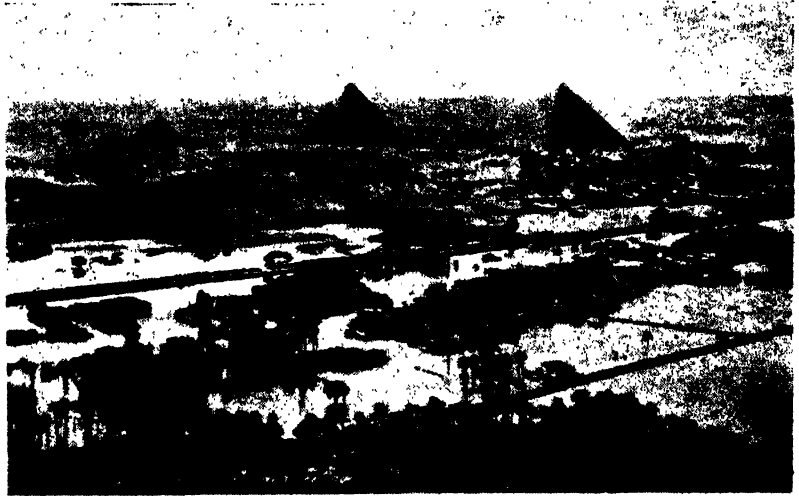
বিখ্যাত পীরামীড্

স্ফিঙ্কসের পায়ের কাছে পাথরে গাঁথা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম মন্দিরে, চৌকো পাথরের স্তম্ভ গুলিতে সেকেলে পালিসের আভাস এখানে ওখানে টুকরো টুকরো হয়ে মুছে মুছে আছে।—বাকি সব এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ।—

আমাদের গাইড প্রফেসর বল্লেন, আর এখানে সময় নষ্ট না করে চলুন পিরামিডের ভিতরে নামা যাক।—বেশ চল, কিন্তু তার আগে লালীর সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ শেষ করতে হবে। ওকে নিয়ে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে অত নীচে নামা হয়ত ঠিক হবে না।—কিন্তু ওই বা কেন থামাবে ওর জিদ্!—ও তো মনুবংশ সম্ভূতা,—মনুজাই বটে।—অনেক বকাবকি, অনেক ভূতের ভয়, অনেক খেলনার লোভ: দেখিয়ে ওর মর্য্যালটা ভাঙার চেষ্টা হোল। অবশেষে যখন প্রফেসর বল্লেন, যে তিনি ওর কাছে থেকে একটার পর একটা গল্প বলে যাবেন। তখন ও অনুমতি

দিলে;—আচ্ছা তোমরা যেতে পার।—প্রফেসর বল্লেন, সিঁড়ির মুখে পাওা গাইড পাবেন,—তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে দেখে আসুন,—আমি লালীর সঙ্গে গল্প করব।—

বেদুইন গাইডের সঙ্গে আমরা পিরামিডের ভিত্তির উপরে আরোহণ করলাম।—দূরে দাঁড়িয়ে লালী হাত নাড়ল।—অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে ও তখন ব্যস্ত।—জানে, যেতে যখন পাবেই না তখন যথালাভ ওই স্বল্পক্ষণের স্বাধীনতার মজা।

পিরামিডের উপরে যায়গায় যায়গায় এখনো প্রাচীন পলাস্তারার চিহ্ন আছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যজাতির মধ্যেই পাথরের উপরে কোনরকম পালিশ বা পলাস্তারা ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল, আধুনিক যুগ ভুলে গেছে যার ব্যবহার।—গ্রীসেও বহু পালিশকরা মূর্তি ও স্তম্ভ পাওয়া গেছে।—কিন্তু এ বিষয়ে অশোক স্তম্ভের খ্যাতি বোধহয় সবচেয়ে বেশী।—

পিরামিডের গা বেয়ে উপরে ওঠার অনেক সরু সিঁড়ি আছে।—সেই সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুদূর উঠলে একটা অপরিসর গুহার প্রবেশদ্বার।—সুড়ঙ্গমুখে অনেক লোকজন।—একদল যাচ্ছে তো আর একদল বেরুচ্ছে।—আমাদের মাত্র তিনজনের দল,—সঙ্গে বেদুইন গাইড।—গর্তের ভিতরে ঢুকতেই ভ্যাপসানি গন্ধের ঝাপটায় বোঝা গেল—পৃথিবীর ভিতর মহলের রাস্তায় এসে পৌঁছেছি। পিরামিডের গর্ভগৃহে রাজারাণীর মৃতদেহ রেখে ওরা সেখানে পৌঁছাবার জন্যে একটা রাস্তা তৈরী করত বটে।—কিন্তু পথটাকে একেবারে লুকিয়ে রাখতে হোত, কবর চোরদের ফাঁকি দেবার জন্যে।—নইলে চোরদের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারত-না যাদের বাঁচাতে চেয়েছিলো কালের হাত থেকে। চোর ভুলাবার জন্যে মন ধাঁধানো অনেক মিথ্যা পথ, অনেক বন্ধ অলিগলির সৃষ্টি করেছিলো ওরা।—পিরামিড রাজ্যের মৃত অধিবাসীরা সে যুগে চোরদস্যুদের হাতে বড়ই নাস্তানাবুদ হতেন। তাঁদের রক্ষণকারীরা তাই সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে চেষ্টা করেছে নানা—উপায়ে মৃত দেহ রক্ষার। প্রাচীনকাল থেকে মিশরে চোর ডাকাত,—বিশেষত কবর চোরের খুব প্রাদুর্ভাব।—সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পরে কিছু মুখে দিয়ে শীতে গ্রামে খোলা মাথায় কটিবাস মাত্র সম্বল করে যাদের দিনান্তে মুষ্ঠি পরের মৃতদেহের জন্যে সৌধরচনা করতে হোত, তাদের পক্ষে মৃত্যুকে ভয় অথবা মৃতকে সম্মান করা অর্থহীন। অপরিসীম দারিদ্র্যের চোখের সামনে অপর্য্যাপ্ত ধনদৌলত মাটির নীচের অন্ধকারে অনন্তকাল ধরে মৃতের তুষ্টির জন্যে ব্যর্থ হয়ে পড়ে থাকবে এই কল্পনায় সেদিনের মানুষ প্রেতলোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেও ভয় পায় নি। ক্ষুধাই যে চিরকাল মানুষের মধ্যে থেকে চোর ডাকাত সৃষ্টি করে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়।

ফসল সংগ্রহ

তাছাড়া ভূগর্ভে প্রোথিত এই অজস্র ধনদৌলতের খবর পৃথিবীর সর্বত্র রটেছিলো। মরুপ্রান্ত পার হয়ে মধ্যএশিয়ার সমৃদ্ধ দেশগুলি থেকেও আসত শিক্ষিত ডাকাতের দল,—লুটে নিয়ে যেত মৃতের সম্পদ। এমনি কতকাল ধরে এদের কবর চুরির ব্যবসা চলেছে কে জানে। আলেকজাণ্ডারের ঈজিপ্টজয়ের মধ্যেও এই উদ্দেশ্যের একটা ক্ষীণ আভাস ছিল কিনা কে বলতে পারে। তারপর কত যুগ কেটে গেল। গ্রীক ঈজিপ্টের মিশ্র সভ্যতা খৃষ্টধর্মের প্রবল বন্যার সবে ভেসেছে, এমন সময় ৭০০ খৃষ্টাব্দে,—আরব খলিফার সেনাপতি ওমর ওইরকম একদল ডাকাত সৈন্য নিয়ে লুটতে এল মিশরের কবর;—আর সেই সুযোগে ভগ্নরাজশক্তি গোটা মিশর দেশটাই লুটে নিল।

গিসের পিরামিড লুটতে এসে ওরা বাধা পেয়েছিল এই বিকল দেয়ালের অলিগলিতে। কিন্তু ওরা তো যে সে চোর নয়, ওরা রাজ-ডাকাতের দল, তাই মানল না বাধা। নতুন করে তৈরী করল সুড়ঙ্গ পথ। সেই পথ ধরেই আজকের টুরিষ্ট তার কৌতূহল মেটায়। পুরোণো পথ আজো কত অন্ধ পাথরের গহ্বর নিগূঢ়তায় বন্ধ হয়ে আছে, আজো জীবিত মানুষের চোখে তার সন্ধান মেলে নি। ডাকাতের পথও কিন্তু কিছুদূরে গিয়ে থেমে গিয়েছিল,—পারে নি ঈজিপ্তকে আবিষ্কার করতে। সেই বিপুল ধনসম্ভার তেমনি নিস্তব্ধকক্ষে চেয়ে বসেছিল, বিশে শতাব্দীর

মানুষের হাতের স্পর্শ পাবে বলে। ১৯২৫ সালে মানুষ প্রথম এই কবর ঘরে ঢুকল,—৬০০০ বছর পরে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরে কম শক্তির বিদ্যুৎ আলোর ব্যবস্থা। সেখান দিয়ে ঘুরে ঘুরে সরু সরু অনেক খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে নেমে আমরা রাণীর সমাধিঘরে এসে পৌঁছলাম। ছোট একটা ঘরের এক কোণায় একটুখানি পাথরের ফাঁক। সেখান থেকে এককালি সূর্য্যের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে শূন্য ঘরের মেঝেতে। ঐ ফাঁকটুকু নাকি ছিল রাণীর আত্মার বাইরে যাবার পথ। অন্ধভূমিগর্ভে মৃতদেহের বদ্ধ কারাগার ভেদ করে মহাশূন্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে আত্মীয়তা পাতিয়ে আসার ঐ একটীমাত্র পথ।

ঘরটার একেবারেই ঘরছাড়া ভাব। কোথায় বা তার দীপাবলী,—কোথায় বা তার আসবাবপত্র, সোনা রূপা হীরা মাণিক, যার জন্যে এত লোকের এত দিনের পরিশ্রম, ভাঁড়ার উজাড় করা যার প্রেতলোকের পাথেয়। আজ শূন্য ঘর হাঁ করে রয়েছে। না আছে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন,—না আছে সেই বিশ্বাস, যার জন্যে ওরা মৃত্যুর উদ্দেশে দান করে যেত চিরজীবনের পরিশ্রম। তবু কিছুই কি নেই? এমন কি সেই সেই আত্মারাও, আশ্রয়হীন, দেহহীন হয়েও যাদের অস্তিত্ব বাধা পায় না।

মনে মনে একটু ভয় পাবার চেষ্টা করলুম,—এমন অবস্থায় এমন পরিবেশে ভয় পাওয়া উচিত বই কী,—কিন্তু অনেক লোকের নানা ধরণের প্রশ্নোত্তরের হট্টগোলে ভয়েরা সব ভয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। শোনা গেল, এই কবর যখন প্রথম খোঁড়া হয়, তখন এর ভিতরে অতুল ধনভাণ্ডার দেখে মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হয়েছিলো, ভিতরে রাণীর দেহ নেই দেখে।—যার জন্যে এত বিলাস বৈভব, বৈতরণীপারের এত ভোগের আয়োজন, সেই রাণীর মৃতদেহই এখানে ছিল না কেন? কে বলতে পারে কেন?—কত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে, কত অত্যাচারে, কত সন্দেহে অবিশ্বাসে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল সে যুগের মৃত্যুও জীবন,—কে আর স্মরণ রেখেছে তার ইতিহাস? যদি কেউ রেখে থাকে তবে সে এই পিরামিড। আজ যদি পিরামিড ভাষা পেত, তবে তার বলার বেগে এই গুপ্ত গৃহ থর থর করে কেঁপে উঠত,—গম্ভীর গর্জনে ভূগর্ভ গুম্ গুম্ করে গলিত অগ্নির স্রোতে নীল নদ জ্বলে উঠত, আর তারি হাওয়া আকাশ বাতাস দগ্ধ করে সূচীতীক্ষ্ণ বালুর ঝড় উড়িয়ে হাহা করে ছুটত।—ওই তো শোনা যাচ্ছে গুরু গুরু আওয়াজ,—ওই তো চারপাশে কাদের অস্পষ্ট পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছি। পাঁচ হাজার বছরের আত্মারা আসছে,—পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে ওরা আসছে চুপি চুপি, চুরি করে শুনে নিতে নিজেদের ইতিহাস,—আর একবার ফিরে যেতে নিজেদের গত জীবনের মাঝখানে, যে জীবনের বোঝা তারা ফেলে গিয়েছিলো এইখানে, অনেক পরিশ্রমে অনেক বুদ্ধি খরচ করে, অনেক উপকরণের সাজ চড়িয়ে, নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রলেপ বুলিয়ে, ব্যর্থ অমরতার ভাণ করার চেষ্টা করেছিলো।—সেই বোঝাগুলি আজ মিউজিয়ামের কাচের আলমারীতে বন্ধ।

কতকাল হয়ে গেল,—কত মেঘ জমে জমে জল হয়ে ঝরে পড়ল। কিন্তু এদেশের আকাশে শুনি নাকি মেঘ জমে না, জল ঝরে না,—শুধু হাওয়ায় ওড়ে বালি,—শুকনো তপ্ত সূর্যদগ্ধ বালি,—কালে কালে উড়ে উড়ে মরুর সীমানা বাড়িয়ে নিয়ে চলল।—তবু ওদের আত্মারা কি শান্ত পেল না?—ওদের আত্মা,—ওদের "ক"—ওদের জড়জীবনের বাসনা সংস্কার কি এখনো এই পিরামিডের পাথরের খাঁজে খাঁজে নিষ্ফল মুক্তির আবেদনে মাথা কুটে মরছে। এখনো মরুভূমির নির্মেঘ কঠিন অনাবৃত পরিষ্কার দেবতার মত দ্যুতিমান গলিত সূর্যের দীপ্ত নীলিমায় বিলীন হয়ে যেতে পারে নি? ওই তো শুনতে পাচ্ছি, পদশব্দ, দ্রুততর হচ্ছে, নিঃশ্বাসপতন গভীরতর হচ্ছে, ওই যে চাপা ফিস ফিস, যেন কারা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে টেনে টেনে কথা কইতে কইতে আসছে—

—ও হো ওরা আর কেউ নয়, আমাদেরই মত আর একদল সাধারণ দর্শক, খাড়া সিঁড়ে বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে আর ফিস ফিস কথা কইছে। আহা এতক্ষণে একটু রোমান্সের গন্ধ পেলুম না। ভূত হলে ভয় ছিল যদিও, তবু নেহাৎ মন্দ হোত না, অন্তত লেখার খোরাক কিছু মিলত, কিন্তু ওরা নেহাৎই মানুষ। আমাদেরই মত ভূত নয়, ভূতের বাহন, অবশ্য আমাদের ভূতের কথা আলাদা, গরীব ফকিরের দেশের ভূতদেরও ফকিরিগীরির বেশি আর কিছু জুটবে না, তাদের জন্যে তাদের

মরুর অর্ঘ্য—অষ্ট্রিচের ডিম, খরগোস ও আইবেক্স হরিণ

মৃতদেহের উপরে কোনদিন পিরামিড রচিত হবে না, শুধু গঙ্গার জলে ভেসে যাবে কয়েক মুষ্টি ছাই। আবার কোন শস্যক্ষেত্রের পলিমাটিতে প্রাণের রস সঞ্চয় করে রাখবে কে জানে? কিন্তু কোথায় যাবে বাসনা, কোথায় যাবে সংস্কার, আর কোথায় যাবে আত্মা! দূর হোক যত মৃত-কল্প কল্পনা, ইংরাজীতে যার নাম মরবিডিটি। স্বীকার করছি দোষ, কিন্তু এই মাটির নীচে, পিরামিডের গর্ভলীন কবরের ভাপসা গন্ধে, ও ছায়ায় আর কি ভাব আসা উচিত? উচিত অনুচিতের তর্ক থাক, এখন বেরুনো যাক চল।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণকলি

শ্রীশীতল সেন

তৃতীয় দৃশ্য

রজতের ড্রয়িংরুম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভ্যানিটিব্যাগ দোলাইতে দোলাইতে ভিতর হইতে লালী আসিল—বাহিরে যাইবার সাজপোষাকে সুসজ্জিতা। বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অনিমেষকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল

লালী॥ 'হ্যাললো' অমুদা! আরে এসো—এসো—অনিমেষকে ধরিয়া ভিতরে লইয়া আসিল। ওঃ! কতোদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা বল দেখি! আমার বিয়ের পর থেকে তোমারতো আর দেখাই নেই। কোথায় ছিলে এতোদিন?

অনিমেষ॥ অফিসের কাজে এতোদিন বাইরে বাইরে ঘুরছিলাম। তারপর—আছো কেমন লালী?

লালী॥ ভালোই আছি।

অনিমেষ॥ রজত কোথায়?

লালী॥ আবার কোথায়! লাইব্রেরীতে বসে পড়ছেন। তোমার বন্ধুটিতো দুনিয়ায় দুটি জায়গা মাত্র চেনেন—কোর্ট আর লাইব্রেরী—লাইব্রেরী আর কোর্ট।

অনিমেষ॥ বরাবরই ওর পড়ার নেশা খুব। কলেজে ওকে আমরা সবাই বই-পোকা বলতাম।

লালী॥ আমি কিন্তু বলি—'মোষ্ট্ আন্‌সোশ্যাল'—'কোয়ায়েট্ আনফিট্ ফর্ য়্যান্ য়্যারিষ্টোক্র্যাট্ সোসাইটী! সমাজে মিশতে চায় না—মিশতে ভয় পায়। যাকে বলে—একেবারে সেকেলে—'ওল্ড য়্যাণ্ড য়্যান্টিক।'

অনিমেষ॥ না, না, রজত মোটেই সেকেলে নয়, অসামাজিকও নয়। একটু বেশী লাজুক। তা' তুমিতো খুব 'আল্‌ট্রা মডার্ণ' লালী—তুমিতো রজতকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করে নিতে পারো।

লালী॥ 'ফেড্ আপ্—ফেড্ আপ্' অমুদা—আমি 'ফেড্ আপ্' হ'য়ে গেছি। সঙ্গে করে ক্লাবে নিয়ে গেছি—পার্টিতে নিয়ে গেছি—বোবার মতো শুধু মুখ বুজে বসে থাকে। আমার বন্ধুরা আলাপ করতে এলে তাদের সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারে না—না পারে গাইতে—না পারে নাচতে—'সিম্‌প্লি হোপলেশ্।'

অনিমেষ॥ তোমার কী তাতে খুব অসুবিধে হচ্ছে লালী?

লালী॥ শুধু অসুবিধে? জানো অনিমেষদা, স্বামীর জন্তে 'সোসাইটী'তে আমি মুখ দেখাতে পারি না। আমার স্বামী ওই রকম 'ব্যাকওয়ার্ড' আর সেকেলে বলে বন্ধুরা আমায় ঠাট্টা করে—টিটকিরী দেয়। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। আমার যে সব বন্ধুরা বিয়ে করেছে, তারা কেমন তাদের স্বামীর হাতে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—ক্লাবে দু'জনে একসঙ্গে কেমন নাচে-গায়—ফূর্ত্তি করে—গর্ব্ব বোধ করে! আর—আর আমার আজ থেকেও কেউ নেই—আমার আজ থেকেও কেউ নেই।

শেষের দিকে লালীর গলা ধরিয়া আসিল। সোফায় বসিয়া পড়িল

অনিমেষ॥ আরে, আরে, হলো কী তোমার লালী? সত্য করে বল দেখি, তোমাদের দু'জনের কী হ'য়েছে। তোমাদের গতিকতো খুব ভালো ঠেকছে না। চল দেখি আমার সঙ্গে রজতের কাছে। দুজনের সামনাসামনি একটা বোঝাপড়া করে দিই।

লালী॥ তুমি একাই যাও অমুদা। আমায় এখনি বেরুতে হ'বে—একটা 'য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট' আছে।

অনিমেষ॥ আচ্ছা, আজ রজতের কথাটা শুনে নিই। তারপর কাল এসে এর একটা মীমাংসা করবো। কাল সকালেই আসছি—মনে থাকে যেন লালী।

অনিমেষ ভিতরে চলিয়া গেল

লালী॥ (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) মীমাংসা! আকাশ-পাতাল যার সঙ্গে তফাৎ, তার সঙ্গে আবার মীমাংসা!… সমস্ত জীবনটা আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেল—সমস্ত জীবনটা আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

এমন সময়ে বাহির হইতে সুকল্যাণ আসিল

সুকল্যাণ॥ ঠিক ধরেছি—ঘরের কোণটিতে বসে

আছো। 'লাইক্ হাস্‌ব্যাণ্ড, লাইক্ ওয়াইফ্'! যেমন দেব, তেমনি দেবী—দুই-ই ঘরকুনো।

লালী ॥ (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) না, না, সেইন্, ও কথা বলো না—'প্লীজ', ও কথা আমায় বলো না।

সুকল্যাণ ॥ সাধে কী আর বলি! অনেক কষ্টেই বলতে হয়। ঘরের কোণে তোমার মতো প্রতিভার অপমৃত্যু হ'তে দেখলে, না বলে যে পারিনা লালী। তোমার রূপ-গুণের পরিচয় পেয়ে কোথায় আজ সমস্ত জগৎ তাক্ লেগে যাবে, আর সেই তুমি কিনা ঘরের বৌটি হ'য়ে বসে রইলে আড়ালে মুখ লুকিয়ে!

লালী ॥ সমস্ত জগৎ তাক্ লেগে যাবে?

সুকল্যাণ ॥ শুধু তাক্ লেগে যাবে? হাজার হাজার—লাখ লাখ লোক ছুটে আসবে তোমায় অভিনন্দন জানাতে—'দি আন্‌ক্রাউণ্ড কুইন্ অফ্ দি ফিল্ম-ওয়ার্ল্ড'—চিত্র-জগতের সম্রাজ্ঞী।

লালী ॥ (সবিস্ময়ে) চিত্র-জগৎ—মানে, ফিল্ম!!

সুকল্যাণ ॥ হ্যাঁ—ফিল্ম। সিনেমার রূপোলী পর্দ্দায় ভেসে উঠবে তোমার ছবি। তোমার অপরূপ দেহ-সৌন্দর্য্য—তোমার অপূর্ব্ব নাচ-গান-অভিনয় দেখে সবাই শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে। তোমার কাছে কোথায় লাগবে 'আভা পার্ডনার'—কোথায় লাগবে 'ইন্‌গ্রিড্ বার্জম্যান্'—কোথায় লাগবে 'ডরোথি লামুর'। তোমায় পেলে হলিউড্ ধন্য হ'য়ে যাবে!

লালী ॥ (অধীরভাবে) তুমি—তুমি কী বলছো, সেইন্—তুমি কী বলছো!

সুকল্যাণ ॥ আমি ঠিকই বলছি, লালী। একথা আমি জোর গলাতেই বলছি—হলিউডের 'ষ্টার' হ'বার মতো যোগ্যতা সারা ভারতে কারোর যদি থাকে, সে শুধু তোমার—তোমার।

লালী ॥ (অভিভূতের মতো) আ-মা-র—!

সুকল্যাণ ॥ হ্যাঁ—তোমার। আর, এও তোমায় আমি বলে রাখছি লালী—হলিউড তোমায় পেলে লুফে নেবে। (অত্যধিক উৎসাহের সহিত) সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে তোমার ছবি···তোমার হ'বে জগৎ-জোড়া নাম—লাখো লাখো টাকা···দেশ-বিদেশ থেকে আসবে তোমার ডাক···

লালী ॥ (উত্তেজিতভাবে) না, না, আর বলো না, সেইন্। আমার মাথায় আগুন ধরে গেছে—আমার মাথায় আগুন ধরে গেছে—

সুকল্যাণ ॥ 'দেন্ লেট আস্ হ্যাভ সাম্ কোল্ড্ ড্রিংক্স্, মাই সুইট'—

লালীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল

লালী ॥ 'জাষ্ট্ এ মিনিট'—

ভ্যানিটী কেস্ খুলিয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া পাউডার-পাফ্‌টি মুখে বুলাইয়া লইল

লালী ॥ চল—

উভয়ে বাহির হইয়া গেল

*

অল্প কিছুক্ষণ পরেই ভিতর হইতে রজত ও অনিমেষ কথা কহিতে কহিতে আসিল

রজত ॥ আর মীমাংসা! মীমাংসা আর কার সঙ্গে করাবে অনিমেষ? তেলে-জলে কী কখনো মিশ্ খায়?

লালী ॥ মিশ্ খাবে নাই-বা কেন? তুমি স্বামী—লালী স্ত্রী—স্বামী-স্ত্রীর মিলন হ'বে না—এও কী কখনো হ'তে পারে?

রজত ॥ (ম্লান হাসিয়া) স্বামী-স্ত্রী! স্বামী-স্ত্রীর যাতে মিলন হয়—স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যাতে সুখী হয়—তারই জন্যে সমান সমান ঘরের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। আর আমাদের? আমি এক আবহাওয়া—এক পরিবেশের মধ্যে মানুষ···ও আর এক আবহাওয়া—অন্য এক পরিবেশের মধ্যে মানুষ। আমি মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের ছেলে···লালী ধনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মেয়ে। আমি হ'লাম সেকেলে—'ওল্ড য়্যাণ্ড য়্যান্টিক্,'···আর ও হ'লো অতি-আধুনিক প্রগতি-পন্থী—ও হ'লো 'আল্ট্রা মডার্ণ'। আমাদের ঘরের বৌয়েরা পুরুষের সামনে লজ্জায় ঘোমটা দেয়,···আর ওরা পুরুষদের সামনে ঘোমটা দিতে লজ্জা পায়—ওদের মাথা ধরে।

অনিমেষ ॥ তাই নাকি। সেইজন্যেই লালীর মাথায় কাপড় দেখলাম না। কিন্তু ওর সিঁথিতে সিঁদুর যেন দেখলাম বলে মনে হয়।

রজত॥ হ্যাঁ, সিঁদুর ওরা পরে—রূপসজ্জার অঙ্গ হিসেবে। ঠোঁটে-গালে রঙ্ লাগাবার মতোই ওরা সিঁথিতে রঙ্ লাগায়—ভালো দেখায় বলে। স্বামীর কল্যাণের জন্যে ওরা সিঁদুর পরে না।

অনিমেষ॥ তা'হ'লে তুমি কী বলতে চাও, লালীর মতো উগ্র আধুনিক মেয়েরা স্বামীর কল্যাণ কামনা করে না?

রজত॥ স্বামীর কল্যাণ! ওদের কাছে স্বামীর চেয়ে বড়ো হলো ক্লাব—স্বামীর চেয়েও আপনার জন হলো বন্ধু-বান্ধবী।...দিনান্তে কর্ম্মক্লান্ত শরীরে বাড়ী ফিরে সব স্বামীই চায়—সব স্বামীই পায় স্ত্রীর একটু সঙ্গ-লাভ—খানিকটা আদর—কিছুটা সোহাগ—দুটো মিষ্টিকথা। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা' কোনদিনই জোটেনি অনিমেষ—কোনদিনই জোটে না।

শেষের দিকে কণ্ঠস্বর ভারি শুনাইল

অনিমেষ॥ কেন তা' জোটে না রজত?

রজত॥ কোর্ট থেকে বাড়ী ফিরে রোজই শুনি লালী বেরিয়ে গেছে—হয় ক্লাবে, আর না হয় কোন বন্ধু-বান্ধবের পার্টিতে। ছুটীর দিনেও তার এতো 'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্' আর এতো 'য়্যাপয়ণ্ট্‌মেণ্ট্' যে, এতোটুকু অবসর পায় না আমার কাছে একটু বসবার।

অনিমেষ॥ তুমিও তো স্বচ্ছন্দে লালীর সঙ্গে ক্লাবে যেতে পারো—পার্টিতে যেতে পারো।

রজত॥ না। ওদের সমাজে মেশবার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমার মতো 'আন্‌কাল্‌চার্ড', সেকেলে লোককে স্বামী বলে পরিচয় দিতে লালীর লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

অনিমেষ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এতো লালীর খুব অন্যায়। তুমি ওকে শাসন করতে পারো না রজত?

রজত॥ শাসন? তোমার কাছে লজ্জা নেই, অনিমেষ—লালী শুধু আজ আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়—ক'দিন পরে ও আমার সন্তানের জননী হ'বে—তবুও ওকে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। আমি যেন ওর কেউ নই। তুমি বিশ্বাস কর অনিমেষ—আমার এই পদ-মর্য্যাদা—এতো সম্মান—এতো অর্থ—তবুও আজ আমি যেন নিঃস্ব—আমি যেন রিক্ত। সব থেকেও আজ আমা[র] কেউ নেই। তাই ভাবি অনিমেষ—এ বিয়ে করে আ[মি] খুব ভুলই করেছি।

অনিমেষ॥ না, না, রজত, তুমি অতোটা ভে[ঙে] পড়ো না। আমি কাল সকালে এসে সব ঠিক ক[রে] দেবো। আজ চলি।

রজত॥ সে কী! এরি মধ্যে? কতোদিন প[রে] এলে—

অনিমেষ॥ কাল সকালে এসে আগে তোমাদে[র] দু'জনের মিলন করিয়ে দিই, তারপর অন্য কথা। আ[জ] চলি ভাই—

অনিমেষ বাহির হইয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে রজ[ত] ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল

রজত॥ মিলন! (ম্লান হাসিয়া) মিলনের প[থ] কৃষ্ণার চোখের জলে পিছল হ'য়ে গেছে। (দীর্ঘনিঃশ্বা[স] ফেলিয়া) মিলনের আর কোন পথ নেই—আর কোন[ও] উপায়ও নেই—!

ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

কৃষ্ণার ঘর। অপরাহ্ণ। কৃষ্ণা বাহির হইতে ঘরে আসিয়[া] হস্তস্থিত বড় পামখানি বিরক্তিসহকারে বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়[া] দিল। তাহার পিছনে পিছনে আসিল করবী

করবী॥ কিরে কৃষ্ণা, সকাল সকাল ভাত খে[য়ে] বেরিয়েছিলি কোথায়?

কৃষ্ণা॥ চাকরীর সন্ধানে।

করবী॥ হলো?

কৃষ্ণা॥ না, হলো না।

করবী॥ তা' বাড়ীতে কাউকে না বলে ক'য়ে [হ]ঠাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে চাকরীর সন্ধান করছিস্ কে[ন]? তোর মতলবটা কী বলতো কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা॥ লুকিয়ে ছাড়া উপায় কী বল্? বেণেটোলা[র] মিত্তির বাড়ীর মেয়ে হ'য়ে আমি যাবো চাকরী করতে? এর চেয়ে অসম্মানের আর কিছু আছে নাকি? এ বংশের কে কবে ঘি খেয়েছিল, আজও সেই ঘিয়ের গন্ধ এদের মুখে লেগে রয়েছে।

করবী ॥ তা' না হ'য় বুঝলুম। তারপর চাকরী পেলে? তখন কী করবি?

কৃষ্ণা ॥ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো। সত্যি বলছি করবী, এ বাড়ীর গুমোট আবহাওয়া আমি আর সইতে পারছি না। কোনো রকমে নিজের পায়ে একটু দাঁড়াতে পারলেই আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো—কোনো হোষ্টেলে কিম্বা মেসে।

করবী ॥ সে কী কথারে কৃষ্ণা! বাড়ী ছেড়ে চলে যাবি কিরে!

কৃষ্ণা ॥ না গিয়েই বা করি কী বল্?—এ সংসারে গলগ্রহ হ'য়ে আমি আর থাকতে চাই না। আচ্ছা বলতে পারিস্ করবী—বিয়ে আমার হচ্ছে না—আমায় দেখে কারো পছন্দ হয় না—পছন্দ হয়তো পণ চায় বেশী—এ সবের জন্যে আমার কী অপরাধ?

করবী ॥ না, না, এর জন্যে তোর আর অপরাধ কিসের?

কৃষ্ণা ॥ অথচ এ বাড়ীতে আমি এমন ভাবে রয়েছি, —যেন আমিই একজন মস্ত বড় অপরাধী। আমার বিয়ে না হওয়ার জন্যে আমিই যেন সবচেয়ে বেশী দোষী।… বাবা আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন না—আমার মুখের দিকে তাকান না। আমার বিয়ের কথা ভেবে ভেবেই নাকি রোগে শয্যাশায়ী হয়েছেন।…মাতো সব সময়েই আমাকে বলেন—আমি হ'লাম এ বাড়ীর অলক্ষ্মী —অপয়া মেয়ে। আমি মরলেই নাকি বাড়ীর সকলের হাড়ে বাতাস লাগে।…দাদা আমার সঙ্গে আর কথাই বলেন না।…আর বৌদির লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় প্রাণতো অস্থির—উঠতে-বসতে খোঁটার পর খোঁটা। (একটু থামিয়া) এক এক সময়ে আমার কী মনে হয় জানিস্ করবী?

করবী ॥ কী মনে হয়?

কৃষ্ণা ॥ মনে হয়, আমি যেন এক মূর্ত্তিমতী দুঃখ। আমার নিজের জীবনই শুধু দুঃখময় নয়—বাপ-মা-ভাইকে দুঃখ দেওয়ার জন্যই আমার যেন জন্ম। তাই মাঝে মাঝে ভাবি—এ দুঃখের জীবন নিজের হাতেই শেষ করে দিই।

করবী ॥ (শিহরিয়া) য়্যাঁ! আত্মহত্যা! সর্ব্বনাশ। কী বলিস্ কী কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা ॥ আমি ঠিকই বলছি করবী। এ জগতে দুঃখের ভারী বোঝা হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যা করাই আমার ভালো।

করবী ॥ ছিঃ ছিঃ! ও কথা মুখে আনতে নেই ভাই। জানিস্তো—আত্মহত্যা মহাপাপ।

কৃষ্ণা ॥ তার চেয়েও পাপ—বাংলা দেশে মেয়ে হ'য়ে জন্মানো। আর, আমিতো মনে করি, গরীব বাঙালীর ঘরে কালো মেয়ে হ'য়ে জন্মানো—সবচেয়ে বড়ো পাপ।

করবী ॥ যাক্গে, ও সব কথা ছেড়ে দে' দেখি। নাইবা হ'লো তোর বিয়ে। বিয়ে না হলেই একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায় না। চাকরী করবি ঠিক করেছিস্—ভালোই করেছিস।

কৃষ্ণা ॥ কিন্তু চাকরীই বা পাচ্ছি কোথায়?

করবী ॥ তোর সেই রজতদা'কে বল্ না একটা ভালো চাকরী করে দিতে।

কৃষ্ণা ॥ রজতদা'?

করবী ॥ হ্যাঁ। সেতো খুব বড়ো চাকরী করে। হাকিম না কি—তুই-ই তো বলেছিলি।

কৃষ্ণা ॥ তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় না।

করবী ॥ সে কীরে! তোদের বাড়ীতে আগে অতো আসতো, থাকতো। আর এখন একেবারে দেখাই হয় না?

কৃষ্ণা ॥ হাকিম মানুষ—কতো কাজের চাপ। তার ওপর বিয়ে-থা' করে সংসারী হ'য়েছেন। আসবার তাই সময় পান না।

করবী ॥ তা' তুই ও তো একদিন তার বাড়ীতে গেলে পারিস্।

কৃষ্ণা ॥ যে বাড়ীতে থাকতেন, সেখান দিয়ে একদিন যেতে যেতে দেখলাম, অন্য লোকেরা সে বাড়ীতে আজকাল থাকে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ও বাড়ী ভাড়া দিয়ে ওঁরা অন্য কোথায় উঠে গেছেন।

করবী ॥ নতুন বাড়ীর ঠিকানা জানিস্ না?

কৃষ্ণা ॥ না। জানবার চেষ্টাও করিনি। জেনে লাভই-বা কি? (খানিকটা আপন মনে) সব সম্বন্ধই যখন চুকে গেছে—

নেপথ্যে মহামায়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল

মহামায়া॥ (নেপথ্য হইতে) কৃষ্ণা! কৃষ্ণা এসেছিস্?

করবী॥ ওই মাসীমা আসছেন! এতো দেরী করে বাড়ী ফেরার জন্যে তোর কপালে আজ খুব বকুনী আছে। আমি পালাই।

করবী দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেল। কৃষ্ণা বাড়ীর ভিতরে যাইবে, এমন সময়ে দ্বারপথে মহামায়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ

মহামায়া॥ এই যে কৃষ্ণা! এই বুঝি তোর ফেরবার সময় হ'লো? কোথায় গিয়েছিলি শুনি?

কৃষ্ণা॥ একটা কাজে গিয়েছিলাম মা।

মহামায়া॥ কী এমন রাজকার্য্য যে, সাত তাড়াতাড়ি সকাল ন'টায় বেরিয়ে আর এই বিকেলবেলায় বাড়ী ফেরা হলো? আমরা এধারে ভেবেই সারা। ওঁর একে অমন ভারী অসুখ, উনিও কৃষ্ণা-কৃষ্ণা করে অস্থির।

কৃষ্ণা॥ কলকাতা সহর—দিনের বেলা—এতো ভাবনারই বা কী আছে?

মহামায়া॥ তোকে যখন গর্ভে ধরেছি, ভাবনার কী আর অন্ত আছে? তোর জন্যে ভেবে ভেবেই ওঁকে আজ এই কঠিন অসুখে পড়তে হ'য়েছে···আমার বুকের ব্যামো দাঁড়িয়েছে—

কৃষ্ণা॥ তোমরা যদি অনর্থক ভাবনা-চিন্তা কর—

মহামায়া॥ অনর্থক ভাবনা-চিন্তা? তুই আমাদের গলার কাঁটা হ'য়ে রয়েছিস্,—এ কী আমাদের কম দুর্ভাবনা!

কৃষ্ণা॥ গলার কাঁটা!

মহামায়া॥ হ্যাঁ, গলার কাঁটা। গিলতেও পারছি না, বার করতেও পারছি না। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোর এতোটা বয়েস হ'লো, এখনো পর্য্যন্ত আইবুড়ী থুবড়ী হ'য়ে বাপ-মায়ের ঘাড়ে বসে রয়েছিস্।···একে তো দেখে কেউ পছন্দ করে না। তাও যদি বা চেষ্টা-চরিত্তির করে কোথাও একটা ঠিক করা যেতো, তা' তুই কিনা তেজ দেখিয়ে বললি—বিয়ে আমি করবো না। তার ওপর আবার মাথার দিব্বি দিয়ে বসলি।

কৃষ্ণা॥ কেন? মেয়ে হ'য়ে জন্মালে কি বিয়ে করতেই হ'বে?

মহামায়া॥ নিশ্চয়ই। বিয়ে ছাড়া মেয়েদের আর কোন গতি নেই।

কৃষ্ণা॥ আমি তা' মানি না।

মহামায়া॥ তা' মানবি কেন? দু'পাতা ইংরিজী পড়ে তোরা যে মেম-সায়েব হ'য়ে গেছিস্।

কৃষ্ণা॥ মেম-সায়েবের কথা নয় মা। (কিছুটা উত্তেজিত ভাবে) বাঙালীর ঘরে মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি বলে কি এতো বড়ো অপরাধ করে ফেলেছি যে, বিয়ে করতে হ'বে বলে যাকে-তাকে বিয়ে করলেই হলো? আমার নিজের কোন রুচি-পছন্দ থাকবে না—আমার নিজের কোন মতামত থাকবে না—

মহামায়া॥ মতামত! বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের আবার মতামত কিসের?

কৃষ্ণা॥ কেন? মেয়ে বলে তারা কী মানুষ নয়? মেয়েরা বুঝি হাবা-বোবা জন্তু-জানোয়ার? এক হাত থেকে আর এক হাতে চালান্ দিলেই হলো!

মহামায়া॥ বাপ-মা দেখে-শুনে যার হাতে তুলে দেবে—

কৃষ্ণা॥ দোহাই মা! কারো হাতে আমাকে তুলে দিতে হ'বে না। আমি তো বলেইছি, বিয়ে আমি করবো না।

মহামায়া॥ তা' করবি কেন? আইবুড়ী থুবড়ী হ'য়ে ধিঙ্গিপনা করে ঘুরে ঘুরে বেড়াবি—কোন্ দিন কী একটা কাণ্ড করে বাপ-মার মুখটা পোড়াবি—

কৃষ্ণা॥ (প্রায় চীৎকার করিয়া) মা! মা! তুমি কী বলছো মা?

নীলকণ্ঠ॥ (নেপথ্য হইতে) কে? কৃষ্ণা কথা কইছে না? কৃষ্ণা!

নীলকণ্ঠ ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার চেহারায় অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ বিদ্যমান

নীলকণ্ঠ॥ কৃষ্ণা ফিরেছিস্ মা?

মহামায়া॥ (শশব্যস্তে নীলকণ্ঠকে ধরিয়া) কী হলো! কী হলো!! তুমি আবার বিছানা ছেড়ে উঠে এলে কেন? ডাক্তারে বলে গেল না—'প্রেসার'টা আজ তোমার এতো বেড়েছে, ওঠা-নামা তো দূরের কথা, কথা কওয়াও একেবারে বারণ?

নীলকণ্ঠ ॥ নাঃ! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না গিন্নী। ডাক্তারে অমন অনেক কথাই বলে যায়। অতো বাধা-নিষেধ শুনতে গেলে আর সংসারে থাকা চলে না।

কথা কহিতে কহিতে বিছানায় গিয়া বসিল

মহামায়া ॥ (বিরক্তি সহকারে) যেমন বাপ, তেমনি তার মেয়ে! দুই-ই সমান। ওঁরা যা' বোঝেন, সেইটেই ভালো। আর অপরে যা' বলে, সবই মন্দ।

ঝঙ্কার দিয়া মহামায়া ভিতরে চলিয়া গেল।
কৃষ্ণা পিতার পাশে গিয়া বসিল

কৃষ্ণা ॥ অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি কেন উঠে এলে বাবা? আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

নীলকণ্ঠ ॥ কেন উঠে এলাম? শুনলাম, তুই সকালে বেরিয়েছিস্—এখনো বাড়ী ফিরিস্ নি। তোর ভাবনায় আমি কেমন অস্থির হ'য়ে উঠলাম। বিছানায় আর শুয়ে থাকতে পারলাম না।

কৃষ্ণা ॥ কেন তুমি আমার জন্যে অতো ভাবো বাবা?

নীলকণ্ঠ ॥ সাধে কী আর ভাবি মা—সাধে কী আর ভাবি! 'হাই ব্লাড্ প্রেসার্'—ডাক্তারে বলেছে—কখন আছি, কখন নেই। তাই ভাবি মা, যাবার আগে তোর যদি কিছু একটা করে যেতে পারতাম—তোর যদি কিছু একটা করে যেতে পারতাম—

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল

কৃষ্ণা ॥ বাবা!

নীলকণ্ঠ ॥ (সস্নেহে) মা কৃষ্ণা! লক্ষ্মীটি মা আমার! কথা দে' তুই। তুই একবারটি মত দে' মা। তোর মত পেলেই আমি তোর বিয়ে দোব—ভালো ছেলের সঙ্গেই তোর বিয়ে দোব। তাতে যতো টাকা লাগে, লাগুক্—যতো ধার-দেনাই করতে হয়, হোক্।

কৃষ্ণা ॥ ধার-দেনা করে নাই-বা দিলে আমার বিয়ে বাবা। মনে কর—মনে কর—(একটু থামিয়া) আমি তোমার—বিধবা মেয়ে।

কৃষ্ণা অশ্রুজলে পিতার কাঁধে ভাঙিয়া পড়িল

নীলকণ্ঠ ॥ না, না, ও কথা বলিস্ নে মা,—ও কথা বলিস্ নে। ও কথা মুখে আনতে নেই।

কৃষ্ণা ॥ (সজল নয়নে) আমি কী তোমাদের এতোই বোঝা হ'য়েছি বাবা যে, তোমরা আমায় দু' বেলা দু' মুঠো খেতে দিতেও পারবে না?

নীলকণ্ঠ ॥ কাঁদিস্ নে মা—কাঁদিস্ নে। গরীবের ঘরে মেয়ে হ'য়ে জন্মানো অভিশাপ—কালো মেয়ে হ'য়ে জন্মানো আরো বড়ো অভিশাপ। কিন্তু মেয়ের বাপ হওয়া গরীবদের যে কতো বড়ো অপরাধ—তা' তুই বুঝতে পারবি নে মা—তুই বুঝতে পারবি নে।

বাহিরের দিক হইতে ডাকিতে ডাকিতে কনক আসিল

কনক ॥ কৃষ্ণা—কৃষ্ণা—

কৃষ্ণা ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কী দাদা?

কনক ॥ 'ক্যালক্যাটা ব্যাঙ্কে' তুই আজ 'ইণ্টারভিউ' দিতে গিয়েছিলি কৃষ্ণা?

নীলকণ্ঠ ॥ (সাশ্চর্যে) কী বললি কনক? কে 'ইণ্টারভিউ' দিতে গিয়েছিল?

কনক ॥ কৃষ্ণা গিয়েছিল বাবা।

নীলকণ্ঠ ॥ (পরম আশ্চর্যে) কৃষ্ণা! আমাদের এই কৃষ্ণা গিয়েছিল 'ইণ্টারভিউ' দিতে?

কনক ॥ হ্যাঁ বাবা। আজ দুপুরে 'ক্যালক্যাটা ব্যাঙ্কে' একখানা চেক্ ভাঙাতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ম্যানেজারের ঘরের সামনে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে ভীড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওরা সবাই চাকরীর জন্যে 'ইণ্টারভিউ' দিতে এসেছে। তাদের মধ্যে আমাদের কৃষ্ণাকেও যেন দেখলাম বলে মনে হলো।

নীলকণ্ঠ ॥ (উঠিয়া পড়িয়া) খবরদার কনক! মুখ সামলে কথা বলিস্। বেণেটোলার মিত্তির-বাড়ীর আজও এতো অধঃপতন হয়নি যে, সে বাড়ীর মেয়ে যাবে চাকরী করতে। নীলকণ্ঠ মিত্তির আজও বেঁচে আছে। আমরা গরীব হ'তে পারি, কিন্তু তাই বলে মান-মর্য্যাদা খোয়াতে পারি না—বাপ-ঠাকুর্দ্দার নাম ডোবাতে পারি না।

রাগে চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল

কনক ॥ বেশ তো, সত্যি কি মিথ্যে কৃষ্ণাকেই জিজ্ঞেস্ করো না।

কৃষ্ণা নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নীলকণ্ঠের কঠিন
দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল

কনক ॥ কিরে কৃষ্ণা, চুপ করে রইলি কেন? তুই-ই বল্।

কৃষ্ণা তথাপি নীরব

নীলকণ্ঠ ॥ (কঠিন স্বরে) কৃষ্ণা—!

কৃষ্ণা ॥ (নত মুখে) দাদা সত্যি কথাই বলেছে বাবা।

নীলকণ্ঠ ॥ (ভীষণ উত্তেজিত ভাবে) কী বললি—কী বললি কৃষ্ণা? তুই চাকরীর জন্যে 'ইণ্টারভিউ' দিতে গিয়েছিলি? তুই চাকরী করবি? বেণেটোলার মিত্তির-বাড়ীর মেয়ে হ'য়ে তুই চাকরী করবি? বনেদী মিত্তির-কুলে তুই কালি দিবি? তুই চাকরী করবি? তুই চাকরী করবি?

দারুণ উত্তেজনায় ও ক্রোধে নীলকণ্ঠের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল

নীলকণ্ঠ ॥ না, না, তা' হ'তে পারে না—তা' হ'তে পারে না—কিছুতেই হ'তে পারে না—ওঃ—

বুক চাপিয়া নীলকণ্ঠ বিছানায় বসিয়া পড়িল। তাহার মাথাটি ঢলিয়া পড়িল

কৃষ্ণা ॥ বাবা—বাবা—

পিতাকে ধরিল

কনক ॥ বাবা—বাবা—

ছুটিয়া আসিল

কৃষ্ণা ॥ (কাঁদিয়া উঠিয়া) বাবা—!

নীলকণ্ঠের নিষ্প্রাণ দেহের উপর কৃষ্ণা লুটাইয়া পড়িল

(ক্রমশঃ)

বৃটেনের নারী

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

বৃটেনের নারী সম্পর্কে যে কৌতুহল একেবারেই ছিল না তা নয়। কথায় আছে 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং'।

সত্যই এদেশের নারীর আচরণে আছে বৈচিত্র্য। নারী যে লীলা-সঙ্গিনী একথা মনে পড়ে যায় এদের দেখেই। দ্বিধা নেই, জড়তা নেই, আছে প্রাণের উচ্ছল আবেগ, সহজ স্ফূর্ত্তি।

ছেলেবেলা থেকেই এদের রূপ চর্চ্চার কারণ সমাজে এদের স্বাধীনতা যেমন, দায়িত্বও তেমন। এমন কি জীবনসঙ্গী বেছে নেবার দায়িত্বও। তার জন্যে দেহ মনের প্রস্তুতির অন্ত নেই। অভিভাবকের কাছে তাই তারা Boy friend না জুটলে গঞ্জনা পায়, আর উৎসাহ পায় বন্ধু জোটাতে পারলে। তাঁরা মনে মনে তারিফ করতে থাকেন মেয়ের রূপ যৌবনের।

যৌবনের জয়গানে এদেশ মুখর। লাস্যময়ী, হাস্যময়ী নারীর আচরণ মুগ্ধ করে বিদেশী পথিককে। কৈশোর থেকে সুরু হয় প্রেমের অভিনয়। কত চাঁদ ওঠে, কত ফুল ফোটে, কিন্তু প্রেম আর পরিণয়ের দুই তীরে কেঁদে ফেরে বিরহী চকোর।

তাই এদেশের নারী জীবনের বিড়ম্বনাও কম নয়। এ যেন পার্ব্বতীর সাধনা চলতে থাকে বছরের পর বছর, কবে কামদেব ধনুতে শর যোজনা করবেন, কবে সেই মহালগ্ন ঘনিয়ে আসবে।

পিচ্ছল পথে চলে চলে পদক্ষেপ এদের ত্রস্ত হ'লেও অবিন্যস্ত নয়। দূর থেকে এদের মিষ্টি হাসি করুণ চাহনী দেখে পথিকের মন দুলে ওঠে। 'কিছু পলাশের নেশা' চোখে লাগে, 'রঙে রসে জাল বোনাও' সুরু হয়, কিন্তু 'হায় ওরে মানব হৃদয়'…!

এই ত সেদিন বিয়ে হ'ল শীলার মাইকেলের সাথে। Shiela Godwin সত্যিই ভালো মেয়ে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে love policy renewal এর পর তবে তা mature হয়েছে।

বিয়ের পর তারা মহাখুসী। বিয়ে হ'ল পল্লীর এক প্রাচীন গির্জ্জায় গিয়ে। খ্রীষ্টকে সাক্ষী রেখে দু'টি আত্মার মিলন হ'ল—বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র পড়লেন একজন প্রধান পাদ্রী সাহেব। কোথায় সানাই, কোথায় বা বাসর ঘর, আর কোথায় বা সেই উদাত্ত মন্ত্র 'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।'

সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নেই, আছে শুধু নীলার হাতে মাইকেলের দেওয়া একটি জ্বলজ্বলে আংটি। শীলার বুকের ধন এই মাণিকের আংটি। গর্বে তার বুক ভরে ওঠে যখন আংটির মাণিক থেকে আলো ঠিকরে পড়ে কত কটাক্ষ দৃষ্টিকে প্রতিহত করে।

শীলার আচরণে কোন সংকোচ নেই, কিন্তু চোখে আছে সরমভরা দৃষ্টি। বাঙালী বধূর কথা মনে পড়ে যায়।

ওদের Honey Moon হবে সিমিলির কোন নির্জ্জন পরিবেশে

আশায় দিন গুণতে থাকে দুটি তরুণ হৃদয়। বেশ কিছুদিন চলে এমনি ভাবে, আজ সাগরসৈকতে, কাল বনপ্রান্তে।

সংসারে নতুন অতিথি দেখা দেয় এক বছর পরে। শীলার স্বামী এখন চাকুরী নিয়েছে কোন এক ব্যাঙ্কে। সেই সকাল ন'টায় ব্রেকফাষ্ট মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ে ছেলেটির মাথায় একটি চুমু দিয়ে, আবার ফিরে আসে ছ'টায়। শীলা তখন সবেমাত্র চায়ের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম করছে। এই ত মাত্র আধঘণ্টা সে ফিরেছে। কাছাকাছি পোষ্ট অফিসে কেরাণীর কাজ নিয়েছে সে স্বামীর সংসারকে ভরে তোলবার জন্যে। সে এখন মা।

আমাকে একদিন তারা সান্ধ্য চায়ের টেবিলে নিমন্ত্রণ করে বসলো ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে। লণ্ডনের দক্ষিণপ্রান্তে টেমস পার হয়ে সারেতে তাদের বাড়ী, বিয়ে হ'বার ঠিক ছমাস আগে কিস্তিতে কিনেছে মাইকেল। গিয়ে দেখি আমিই সেখানে প্রধান অতিথি। আরও দু একটি পরিচিত চোখের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। বেশ ঘরোয়া ছিল এই উৎসবটি। সমারোহ ছিল না, কিন্তু ছিল একটি প্রাণের উত্তাপ।

উৎসবের পালা শেস করে যখন ফিরলাম তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা। Tube Stationএর শেস ট্রেন আসতে তখন মাত্র পাঁচ ছয় মিনিট বাকী। সেদিনকার উৎসবের স্মৃতি তখনও যেন উঁকি দিচ্ছিল। ভাবছিলাম এদের ঘর সংসারের মাঝে যেন শান্তি আছে, আছে স্বামীস্ত্রীর মাঝে প্রীতি। ভালোবাসা।

অনেকদিন দেখা নেই দুজনের কারো সাথে। একদিন হঠাৎ কাগজের পাতায় যা দেখলাম, তা দেখে বিশ্বাস হয় না। এত সাধের সংসার ভেঙে গেছে। কি করে এই বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হ'ল! আর বিচ্ছেদই যদি হ'বে তবে বিবাহেরই বা কি দরকার ছিল? মনের ভেতরটা বেশ নাড়া পেল। শীলার ব্যবহারের মধ্যে তো কোনদিনই এমন কোন ভাব প্রকাশ পায় নি।

পরে বুঝলাম বৃটেনের এটি একটি বিরাট সমস্যা। কোন স্বামীর মনেই স্ত্রীর ওপর চিরদিনের নির্ভর নেই। আছে কেবল বুকের কোলে শঙ্কা ও সংশয়। আভিজাত্যের আচরণের অন্তরালে ঘটে অনেক কিছুই। যাকে কোন সভ্যসমাজই গ্রহণ করতে পারে না। লজ্জা স্ত্রীর ভূষণ একথা বঙ্গবালার পক্ষেই প্রযোজ্য। কখনও অর্দ্ধাবৃত দেহ নিয়ে, কখনও বা আলু থালু বেশ নিয়ে স্বচ্ছন্দে এদের পদবিন্যাস দেখা যায় এদেশের জনমুখর পথে।

বসন্তের সমীরণের স্পর্শ পেলে তারা অঙ্গের অর্দ্ধেক আবরণ দেয় সরিয়ে, আর অর্দ্ধেক দেয় উড়িয়ে, এলিয়ে দেয় সারা অঙ্গ রৌদ্রোজ্জ্বল প্রান্তরে।

এদেশের নারী আজ জোর গলায় জানিয়ে দিতে চায় যে তারা সবদিক থেকেই পুরুষের সমান। কলে, কারখানায়, ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে, অফিসে, দপ্তরে সবখানেই আজ এঁদের আবির্ভাব। পুরুষের সাথে একতালে কাজ করে চলেছে। তাইত এদেশের মেয়ে রাতে গৃহসঙ্গিনী, আর দিনের বেলায় রণরঙ্গিনী, কখনও পুলিশ, কখনও বা পিওন।

লাল ঠোঁটের কোলে ক্ষণিক হাসি কখনও মিলিয়ে যায় রুক্ষ পমেটমের অন্তরালে। ঠোঁটের লালিমা কখন একটু ম্লান হ'ল এই হ'ল এদের চিন্তা। তাই সব সময়ই কাছে আছে লিপষ্টিক, একটি ছোট্ট আয়না, একটু অবসর পেলেই চোখের আড়ালে প্রসাধনের প্রয়াস।

অলঙ্কারের বহর না থাকলেও বেশভূষা সম্পর্কে প্রত্যেকেই সচেতন। আজকাল আবার এদের দৃষ্টি পড়েছে ভারতীয় সাড়ী চুড়ীর দিকে। তাই অনেকেই 'আজ গাউনের বদলে সাড়ী, ঘড়ীর বদলে চুড়ীর অর্ডার দেন।

এদের বাইরের আচরণ দেখে মনে প্রশ্ন জাগে—কি করে এদের দেশ থেকে সিষ্টার নিবেদিতার সন্ধান মিলল।

অনেককে প্রশ্ন করেছি এ নিয়ে। যাঁরা প্রাচীন তাঁরা দুঃখের সাথে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"এদেশের নারী হ'ল রাস্তার বাসের মত। একটি যায় আর একটি আসে।" হয়তো এর মধ্যে কিছু সত্য আছে। অনেক বৃদ্ধ পিতা দুঃখ করে বলেছেন 'পুত্রবধূর সংসারে তাঁদের ঠাঁই নেই।' তাই আজ ভারতের মহীয়সী নারীর প্রতি দৃষ্টি ফিরেছে পাশ্চাত্যের নর-নারীদের, জেগেছে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা ভারতের সংস্কৃতির প্রতি।

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

জীবনের পথে অশ্রু-পাথেয় যার,
জীবনেরে সেই ক'রে যেতে পারে হেলা,
বন্ধনে যারে বাঁধেনিকো সংসার—
সেই বুঝিয়াছে এত দুদিনের খেলা!
চিরদিন যারা রয়ে গেল, দূরে দূরে,
কাছে এসে কভু চাহিল না কোন কিছু,
অ-পাওয়া তাদের রহিল হৃদয় জুড়ে,
জীবনের পথে রয়ে গেল চির-পিছু।

ভাষারে ছাড়ায়ে ভাব হ'ল যার বড়,
কল্পনা যার ডিঙ্গাইল বাস্তবে,
সে শুধু বুঝিল কত আরো মনোহর,—
তাহার অজানা যাহা রয়ে গেল ভবে!
এ জ্ঞান যার কেটে গেল চেয়ে চেয়ে,
সব কিছু আশা তিলে তিলে হ'ল ক্ষয়—
অশ্রু-ব্যথায় শেষ গান গেল গেয়ে,—
ধূলির ধরণী বুঝি তার তরে নয়!!

ব্রহ্মপুরম্

সন্তোষকুমার অধিকারী

বিদেশী উচ্চারণের অক্ষম তাগিদে আমাদের অনেক শব্দ বিকৃত হ'য়ে গিয়েছে। এখন প্রকৃত শব্দগুলিকে খুঁজে পাওয়াও অনেক সময় কষ্টসাধ্য। অপটু এই উচ্চারণ পদ্ধতি আমরাও আশ্চর্য্য অনুকরণ-প্রবৃত্তি দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম। তার ফলে আমাদের বর্দ্ধমান হ'য়েছে বারডোয়ান, কলিকাতা ক্যালকাটা, বারাণসী বেনারস, বিশাখাপত্তম ভিজাগাপটম এবং ব্রহ্মপুরম বেরহামপুর।

বেরহামপুরের লোক এখানে অনুষ্ঠিত গত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম ব্রহ্মপুরম্ নামটিকে তুলে ধরে। কিম্বদন্তী: সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার একটি মন্দির ছিলো এখানে। এ মন্দিরের কোন চিহ্ন এখন নেই (ভারতের অন্যত্র কোথাও ব্রহ্মার মন্দির আছে বলে শুনি না) কিন্তু ব্রহ্মপুরমএর পথে ঘাটে মাঠে এমন কি পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় অজস্র মন্দির ছড়িয়ে আছে। এখানকার ঠাকুরাণীর মন্দির (৺শীতলা মন্দির) মাহাত্ম্যগুণে সর্ব্বাধিক বিখ্যাত; কিন্তু সত্যনারায়ণের মন্দিরটি দেখতে সুন্দর। তাছাড়া হনুমানের মন্দির ও গণেশ মন্দিরের অভাব নেই। কালীমন্দিরও পাওয়া যায়। তবে সংখ্যায় নিতান্ত কম।

ব্রহ্মপুরমে ঢুকবার আগে ট্রেণ চিল্কার নীল উদার বুক্ পার হ'য়ে এলো। ব্রহ্মপুরম্ উড়িষ্যার সর্ব্বশেষ রেল ষ্টেশন। তার পরেই মাত্র ১২ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ইছাপুরম্ অন্ধ্রের মধ্যে পড়ে। বস্তুতঃ কুড়ি বছর আগে ব্রহ্মপুরম্ মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এখনও এখানকার আবহাওয়ায় মাদ্রাজের প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে অন্ধ্রদেশীয় তেলেগুভাষীর সংখ্যাই অধিক। এখানে ব্যবসায়ী মহলে তেলেগুদের একচ্ছত্র প্রভাব। তারা শিক্ষিত ও কিছুটা মার্জ্জিত। কিন্তু তেলেগুদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা যায়। তাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা রয়েছে।

ব্রহ্মপুরম্ থেকে ইছাপুরম্ এই পথটা উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের যোগসেতু। রেলপথের এক পাশের সমুদ্রের ব্যাক্‌ওয়াটার হ্রদের মত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অন্য দিকে উঁচু নীচু ছোট ছোট পাহাড়। এই পাহাড়ের একটি শাখা ব্রহ্মপুরম্এর সমস্ত পশ্চিমটা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ব্রহ্মপুরম্এর রাজপথে দাঁড়িয়ে পাহাড়কে দেখ্‌লাম। দেখলাম সকালে পেঁজা তুলোর মত কুয়াশায় ঢাকা দেহ, মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোকে হলুদ হ'য়ে ঝলতে লাগ্‌লো। তারপর নীল হ'য়ে এলো অপরাহ্নে। জ্যোৎস্নার রাত্রে ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বর যেন।

শহর আর পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী প্রায় তিন মাইল ব্যাপী শস্যক্ষেত্র। পাহাড়ের গায়ে গায়ে গ্রাম। আলের পথে পথে সাইক্ল নিয়ে একদিন বেরিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই রোমাঞ্চ ভেঙ্গে গেল যেন। দেখি এটা খণ্ড খণ্ড অনেকগুলি পাহাড়ের টুকরো দেহ। মধ্যে মধ্যে সবুজ সানুদেশ। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি ভালো রাস্তা। সেই রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে আবার পশ্চিমে চাইলাম। এবার ধূমল দেহ বিরাট একটি পর্ব্বতের অস্তিত্ব গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এইটাই হ'চ্ছে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা।

সাইকেল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি বিরাট জলাশয়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। জলাশয়ের উত্তর দিকে জলের মধ্যে থেকেই অন্ততঃ সাত শো ফুট উঁচু একটি বিরাট পাথরের খয়েরি দেহ। একটা নয় এপাশে ওপাশে আরও কয়েকটি। অপূর্ব্ব গম্ভীর অথচ সুন্দর দৃশ্য। সমস্ত জলাশয়টা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। একদিকে কাঁটাতারের বন্ধনীর বাইরে মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। জলাশয়ের রক্ষক। শুনলাম এখান থেকে ব্রহ্মপুরম্ শহরে জলসরবরাহ হয়।

তখন সূর্য্য প্রায় অস্তমিত। তবে সামনে আস্কা বেরহামপুর রোড। পীচের রাস্তায় অনবরত ট্রাক্ ও গাড়ী চলছে। কাজেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে সাইক্ল ছেড়ে বসবার উপক্রম করলাম। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি না সুমতির উদয় হ'লো। জলাশয়ের রক্ষক লোকটিকে শুধালাম—ভয় নেই ত কোন?

ও হাস্‌লো—না বাবু, ডর নেই। তবে মাঝে মাঝে ভালুক এসে পড়ে দু চারটে। একটু লক্ষ্য রেখে বসা ভালো।

লোকটি বল্‌লো নির্ব্বিকার ভঙ্গীতে। কিন্তু এ'র পর পত্রপাঠ বিদায় নিতে আমার দেরী হ'লো না।

শহরের ভেতরে ভেতরে ঘুরে মন মুগ্ধ হ'য়েছিলো আগেই। প্রত্যেকটি পথই পীচ্ দেওয়া ও প্রশস্ত। একটি রোড গেছে কটক্, একটি মাদ্রাজ। ষ্টেশনের সামনেই হিল্ পাট্না। এটা নতুন গ'ড়ে ওঠা অংশ। হিলপাট্নার বাড়ীর গাঁথনিগুলি পাথর দিয়ে করা। মাঝে মাঝে বড় বড় কালো পাথরের স্তূপ। কোন জায়গায় পাথরের দেহ যেন পাহাড় হ'য়ে উঠ্‌তে চেয়েছে। অজস্র কৃষ্ণচূড়ার লালে মদির হ'য়ে উঠ্‌ছে মন। কিন্তু পথের দু' পাশ দিয়ে বেড়ার মত ঝোপ ঝোপ গাছ—কি গাছ ওগুলো?

বর্ষার জল পড়তেই গন্ধে ভরে উঠ্‌লো সারা শহর। ওগুলো যে কেয়ার ঝাড়।

একদিন সেই কেয়ার বেড়া দেওয়া প্রশস্ত পীচের রাস্তা দিয়ে ব্রহ্মপুর থেকে দক্ষিণ দিকে রওনা হলাম। গন্তব্যস্থল মাত্র আট মাইল দূরে। রাস্তা শেষ হলো ছোট্ট একটি নিরীহ গ্রামে। গ্রাম বটে তবে তার বাঁদিকে ডান দিকে বড় বড় কম্পাউণ্ড দেওয়া বাগানবাড়ী। ডান দিকে উঁচু টিলার মাথায় সাদা বাংলো। তার পরের অংশ বস্তি। কিন্তু

দীর্ঘ প্রশস্ত পথের বাধা নেই কোথাও। সে পথ শেষ করে এসে দাঁড়ালাম যেখানে, তার পর থেকে শুরু হ'য়েছে অনন্ত জলরাশি।

হঠাৎ স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। নীল দিগন্তে মিশেছে জলের নীল। আর পায়ের কাছে বালির তটভূমিতে সাপের সাদা ফণার মত মাথা আছড়ে ভেঙ্গে পড়ছে অনন্ত বিক্ষুব্ধ ঢেউ। এক মুহূর্তে পৃথিবীর আর সমস্ত ছবি মিলিয়ে গেল স্মরণ থেকে; সমস্ত শব্দ এক হ'য়ে গেলো একটি মাত্র সঙ্গীতে। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম গোপালপুরের সমুদ্রকে।

এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল একদিন। সাইক্‌ল্ নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। শহর থেকে দূরে রেল লাইনের সংলগ্ন একটি বাংলো। চারিদিকে ঘেরা কম্পাউণ্ড, ভেতরে অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন উদ্যান। বাইরের গেটে নাম লেখা—

T. Sarcar
Supdt. T, D. L. A.

ঢুকে পড়লাম ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে দু' তিনটি আরদালী ছুটে এলো। বললাম—সাব্ হ্যায়?

—জী।

কাডটা বার করে দিলাম। তারপর সাইক ধরে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম বাইরে।

মিনিটখানেক মাত্র। তার পরেই বেরিয়ে এলেন শ্রী সরকার। চেয়ে দেখলাম—আমারই মত দীর্ঘ কিন্তু রূপবান প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মুখ ভর্ত্তি হাসি নিয়ে বললেন—কি সৌভাগ্য. আপনি এসেছেন। আসুন ভেতরে।

ভেতরে গেলাম। তিনি প্রায় চিৎকার করে ডাক্‌লেন তাঁর স্ত্রীকে—ওগো মিঃ অধিকারী এসেছেন। এসো শীগ্‌গির।

আমার দুর্ভাগ্য এঁরা স্বামী-স্ত্রী বেরহামপুর ছেড়ে চলে গেছেন মাসখানেক আগে। গোটা শহরটায় বাঙালী আরও অনেক আছেন। তাঁদের অনেকেই বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত। কিন্তু তাঁরা বাঙালী দেখলেই এড়িয়ে চলেন। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ পোষণ করে উড়িয়ারা, এখানকার স্থায়ী (একদা) বাঙ্গালীরা নতুন বাঙ্গালীকে সেই চোখেই দেখ্‌তে চেষ্টা করেন।

এর পরে অবশ্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়েছে। গোপালপুর পামবীচ্ হোটেলে রোটারি ক্লাবের একটি পার্টিতে নিজেই এসে আলাপ করলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীহিমাংশু ঘোষ। কয়েকদিন আগে তাঁর পরিচয় দিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে চিঠি লিখেছেন শ্রীঅন্নদা-শঙ্কর রায়। আলাপ হ'য়েছে এখানকার বিশিষ্ট ডাক্তার ও রোটারি ক্লাবের সেক্রেটারী ডাঃ সুধাংশু পালিতের সঙ্গে। ডাঃ পালিতের একটি আশ্চর্য্য স্বভাব আছে। তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ত দিনগুলির মধ্যে তিনি রবিবার বিকেল থেকে নিয়মিত ভাবে অদৃশ্য হ'য়ে যান। ওই সময়টা তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় 'উদয়গিরি'র পথে। তাঁর ছোট্ট গাড়ীখানা আর রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন শিকার-এর চেষ্টায়।

কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকারের ব্যক্তিত্ব অপূর্ব্ব। তাঁর সহৃদয়তা প্রত্যেক অভ্যাগতকেই মুগ্ধ করেছে।

শ্রীযুক্ত সরকার বললেন—তপ্তপানি দেখে আসুন মিঃ অধিকারী। এখান থেকে ত্রিশ মাইল পথ। ওখানে জঙ্গলের মধ্যেও একটি সুন্দর ডাক্‌বাংলো আছে। সেখানে একরাত্রি বাস করলে অরণ্যের সৌন্দর্য্যকে মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে পারবেন।

এবারে যোগ দিলেন শ্রীযুক্তা সরকার। বললেন—আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা শুনবেন? আমরা গিয়ে উঠেছি সেই ডাক্‌বাংলোতে। মালি রাত্রে বোধহয় রান্নাঘরের দরজা লাগাতে ভুলে গিয়েছিলো। সকালে ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

—ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে মস্ত একটা বাঘ। তাড়াহুড়ো দিতে পালিয়ে গেল।

শ্রীযুক্ত সরকার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সুযোগ ঘটে গেলো। বার্মাশেলের ডিপো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ঘোষও আমার মত নবাগত। একদিন আমরা দুজনেই সস্ত্রীক একটি ষ্টেশন ওয়াগনে রওনা দিলাম।

ত্রিশ মাইল পথ পার হ'য়ে গাড়ী যেন দম নেওয়ার জন্যেই দাঁড়িয়ে পড়লো। আমরা সকলে একসঙ্গে নেমে পড়লাম। দুই-দিকেই ঝোপ-জঙ্গলে নিবিড় অন্ধকার। রাস্তার ঠিক পাশেই গড়িয়ে এসেছে একটি ক্ষীণ ঝর্ণাধারা। তার স্নিগ্ধ শীতল জলে পা ডুবিয়ে বসে পড়লাম।

কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরে আবার এগোতে সুরু করলাম। এবারে পথ ঘুরতে ঘুরতে চক্রাকারে ওপরের দিকে উঠ্‌তে লাগলো। কিছুটা উঠে একটি অত্যন্ত শান্ত ও ফাঁকা জায়গায় থাম্‌লো গাড়ী।

নেমে দেখি দীর্ঘ তালগাছের মত কয়েকটি তরু। তার নাম হরন্দ। গাছের ছায়ায় ঢাকা জায়গার মাঝখানে চৌবাচ্চার মত বাঁধানো জায়গা। তলায় একটি প্রস্রবণ রয়েছে। জল উঠ্‌ছে অনবরত। সে জল উত্তপ্ত গন্ধকের গন্ধে পূর্ণ। শুনলাম এরই নাম তপ্তপানি।

সামনে দুর্ভেদ্য অরণ্য। এ' অরণ্য গোটা পাহাড়টার গায়ে ছড়িয়ে আছে। অরণ্যের মধ্য থেকে ভেসে আসছে অশ্রান্ত কুলুকুলু ধ্বনি। এগিয়ে দেখি সেই স্নিগ্ধ ঝর্ণার ধারা। অরণ্যের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঝর্ণা অতিক্রম ক'রে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ একটি পথের রেখা খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু ঢুক্‌তে সাহস হ'লোনা। মোটরের ড্রাইভার সাবধান করে দিয়েছে। শীতকালে সাপের ভয়টা কম। তবে বাঘ ও ভালুক দুটোই পর্য্যাপ্ত। হঠাৎ বেরিয়ে পড়লে মুস্কিল।

ঘুরোনো রাস্তাটা গোল হ'য়ে ক্রমাগতঃ পাহাড়ের ওপরে এগিয়েছে। ঐ' পথের শেষে উদয়গিরি। সে নাকি অতি অপূর্ব্ব দৃশ্যময়। তার গায়ে গায়ে ময়ূর নাচে। উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় শম্বর। ঝোপের ছায়ায় ওঁৎপেতে থাকে পান্থার। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে জেগে থাকে তার অতি অদ্ভুত দৃশ্যময় ছবি। সে ছবি যদি দেখি, তবে লিখবো নিশ্চয়ই।

হঠাৎ যেন দ্রুমদ্রুম্ একটা মাদলের শব্দ ভেসে এলো। অবাক হ'য়ে চাইলাম। সঙ্গের গাইড্ বললো—ওই পাহাড়ের চুড়োর কাছে জঙ্গলের মধ্যে বাঘ আর ভালুকের সঙ্গে একত্রে বাস করে প্রায় নগ্ন কন্ধ-জাতি। ওরাই আদিবাসী এখানকার।

তখনও সূর্য্য মধ্যাহ্ন-আকাশে জ্বলছে। সূর্য্যালোক থাক্‌তে থাকতেই ছেড়ে যেতে হ'বে এই পাহাড়ী অঞ্চল। কিন্তু তার কিছুটা দেরী আছে এখনও। আমরা সেই শান্ত নির্জন হরন্দ গাছের তলায় বসে বসে শুনতে লাগলাম ঝর্ণার কুলুকুলু শব্দে চলা চরণের নূপুরনিক্কন।

যক্ষ্মা-সমাজ ও রাষ্ট্র

কুমারী অমিয়া পাল

পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রণালীর ইতিহাস আলোচনা করলে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই, তারা পর্ব্বতের গুহায়, গাছের কোঠরে বাস করতো। গভীর গহন অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বত হলো তাদের বাসস্থান। কালের বিবর্ত্তনে এলো সভ্যতা। এ সময়ে তারা তাদের তৈজসপত্র তুলে নিলে, কাঁধে তীর ধনুক আর হৃদয়ে অপরাজিত বিশ্বাস নিয়ে বিভিন্ন দিকে পরিক্রম করে বেড়াত খাদ্যের অন্বেষণে। যেমন পশু পক্ষী জীবজন্তু পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় খাদ্যের অন্বেষণে। কিন্তু যক্ষ্মা তখন তাদের বাস্তব জীবনে কোন সমস্যা ছিল না। যদি তাদের মধ্যে কখনও কিন্তু সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রমিত হত, সে আর অগ্রসর হতে পারত না। তাকে পিছনেই পড়ে থাকতে হ'ত, কারণ তাদের তখন পারিবারিক জীবন ছিল না। কিন্তু এ সমস্যাও ছিল অতি অগণ্য। তারা প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছিল অপার্থিব সম্পদ—দৈহিক বলিষ্ঠতা, শারীরিক পুষ্টতা।

কালের বিবর্ত্তনে গৃহ এলো, এলো শান্তি; এলো পারিবারিক জীবন, বুদ্ধি বিকাশের দ্বারা তারা বন্য লতা শোভিত সবুজ মাঠকে রূপ দিল ফসলের। এ সময়েও তাদের প্রকৃতি নির্দ্দয়—শীতল ঝটিকাময় বাত্যাকুল ও জীব জন্তুর সহিত অহরহ লড়াই চলছে। তখন তারা একে অন্যের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপকারিতা উপলব্ধি করে একত্রে বাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। গড়ে উঠল সমাজের ভিত্তি। আরম্ভ হল তাদের সামাজিক জীবন। সমাজ সৃষ্টির মূলে রয়েছে গৃহ। আর গৃহের সৃষ্টির মূলে রয়েছে—নারী, শান্তিতে বসবাস করার জন্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো। এরূপে সমাজ গড়ে উঠল, সমাজ থেকে গ্রামে রূপান্তরিত হল এবং মানব সভ্যতা সমাজ জীবনে এসে গেল। এ সময় যদি কেউ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হত, তার সেবা, যত্ন-শুশ্রূষা বাড়ীতে হত, কারণ তখন ছিল তাদের পারিবারিক জীবন। এরূপে গৃহেই প্রথম Infectionএর সূত্রপাত হল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহাই Tuberculosis রূপে সমাজে দেখা দিল। একটি প্রবাদ আছে যে Tuberculijection and civilisation go hand in hand. এই আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল অতি সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। মনে ছিল প্রকৃতির দেওয়া অপার্থিব সম্পদ—বনে বনে পত্র মর্ম্মর, পাখীর কূজন, আর ক্লান্তিহারা মৃদু মন্দ বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ তাদের চিত্তকে চরম কবিত্বে উচ্ছ্বসিত করে রেখেছিল, প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরে রেখেছিল।

কিন্তু কাল থেমে যাচ্ছে না। সে অনাদি কাল থেকে ভালো মন্দ আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব দোলায় দুলিয়ে জন্ম মৃত্যুর প্রলয় সৃজনের তরঙ্গের দোলায় দুলিয়ে বিশ্ব ছন্দে তালে ছুটে চলছে অনন্তের দিকে। কালের রথচক্রের আবর্ত্তনে মানব সমাজ-জীবনে পরিবর্ত্তন হলো। গড়ে উঠল নগর উপনগর, সহর আর কলকারখানা। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে রেলগাড়ী বাষ্প চালিত জাহাজ নির্ম্মিত হল। যা ছিল সুদূরে, যা ছিল আয়ত্তের বাইরে তা মানুষের নিকট সহজ হয়ে গেল। শিল্প গড়ে উঠল, গড়ে উঠল ব্যবসা-বাণিজ্য। শিল্প বিপ্লবের পর আরও বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ভাল ভাল রাস্তাঘাট, বাসোপযোগী বাসগৃহ, প্রচুরতর ও সুলভতর যানবাহন, নগর উপনগর, দেশ উন্নতির সকল কিছু প্রয়াস, সব কিছু বেশ দ্রুত গতিতে তৈরী হতে লাগল। ফল দাঁড়ালো লোক গ্রাম ছেড়ে দলে দলে সহরে এসে গেল এবং শিল্প প্রধান ক্ষেত্রগুলি জনাকীর্ণ হয়ে উঠল, Infection ও দ্রুত গতিতে বেড়ে চলল। বিজ্ঞানের প্রসারতায় যেমন প্রভূত উন্নতি হলো, কিন্তু গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পত্তি তেমনি নষ্ট হয়ে গেল এবং সমাজে এক শ্রেণীর ভূমিহীন লোকের উৎপত্তি হলো। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত হয়ে অন্ন সংস্থানের সঙ্কল্প নিয়ে পল্লী অঞ্চল থেকে লোক হাজারে হাজারে শিল্প অঞ্চলের দিকে চলে এলো। শিল্প অঞ্চলের ঘন বসতিপূর্ণ গমনস্থানের দূষিত আবহাওয়ায় যক্ষ্মা জীবাণু বিপুল গতিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। পূর্ব্বেই বলেছি Civilisation and Tuberculisation go hand in hand, দ্বিতীয়তঃ মজুর শ্রেণীর খাদ্যের পুষ্টতার অভাবে, মুক্ত আলো বাতাসের অভাবে, বিশুদ্ধ পানীয় অভাবে ময়লা জল নিষ্কাষণে অব্যবস্থার দরুণ দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে প্রতি নিয়ত—মারাত্মক ব্যাধি যক্ষ্মার কবলে পড়তে লাগলো। এরূপে যক্ষ্মা ব্যাধি রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনকে বিপদ-গ্রস্ত করে তুলল এবং ধাপে ধাপে এই ব্যাধি সহর থেকে পল্লী অঞ্চল, পল্লী অঞ্চল থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

দেশ বিভাগের পর এই মারাত্মক ব্যাধি মহামারীরূপে সমাজে আত্ম-প্রকাশ করলে এবং অন্য সমস্ত জটিল সমস্যার সহিত ইহা রাষ্ট্রকে বিপর্য্যস্ত করে তুলছে। ইহার মৃত্যুর করাল ছায়া বিভীষিকারূপে সমাজ জীবনকে শঙ্কিত করে। এই ব্যাধি মহামারীরূপে বেড়ে যাওয়ার অন্তরালে রয়েছে কয়েকটি কারণ। পশ্চিমবঙ্গে তখন গড়পড়তায় প্রতিবর্গ মাইলে ৭৯৯ জন মানুষের বাস, সহর অঞ্চলে লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সাথে রয়েছে অসন্তোষজনক বাস ব্যবস্থা। মুক্ত আলো হাওয়ার অভাব, খাদ্যে ভেজাল, দারিদ্র্য, জীবাণু মুক্ত পানীয়ের অভাব, ময়লা জল নিষ্কাষণের ভাল ব্যবস্থার অভাব, এ সমস্ত কিছুই যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দায়ী। আর যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে জনসাধারণের অশিক্ষা, অজ্ঞতা। যেখানেই, অশিক্ষা দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা, সেখানেই যক্ষ্মারোগের বিস্তার।

সমাজ জীবনে যক্ষ্মারোগ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই মারাত্মক ব্যাধিটীর প্রসারে মনুষ্য জীবন ধ্বংসের এক মর্ম্মান্তিক কাহিনী। গভর্ণ-

মেন্টের সাহায্য ব্যতীত কি ভাবে এই মারাত্মক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অভিযান চালানো যেতে পারে তাহাই বিবেচ্য। অভিযান চালানর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে বর্ত্তমান সমাজের সমস্যাকে এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সমস্যার সমাধান পর্য্যবেক্ষণ করে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করতে হবে। হ্যাঁ, তবে আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মান অন্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রের চাইতে খুবই নিচু। তাছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশই অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে জীবন যাপন করছে। যে কোন দেশের জনস্বাস্থ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিকের উপর নির্ভরশীল। যাহা হউক বে-সরকারীভাবে দেশকে এই ব্যাধির ধ্বংসলীলা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে কিনা তাহাই আলোচ্য। আমাদের ব্যাপক যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধের অভিযান চালাবার একটি বিঘ্ন আছে, আজও আমাদের সমাজের একশ্রেণী লোক আছে যাঁরা যক্ষ্মারোগীর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন। আমরা চাই আমাদের সমাজের সকল স্তরের লোকের সহযোগিতা ও সহানুভূতি। তাহা হলেই যক্ষ্মা দমনের অভিযান দুর্গম পথের পথজয়ী হবে। এই অভিযান যতই ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে ততই যক্ষ্মার প্রকোপ হ্রাস পাবে। বর্ত্তমান যুগ সমাজের সঞ্চয়ের এবং সংগ্রামের। সুতরাং এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কেউ এই সংক্রামক ব্যাধির সম্বন্ধে পরম নিশ্চিন্তে ও নির্লিপ্ত থাকবার সুযোগ নেই—কি সাহিত্যিক কি শিল্পী, কি ধনী; কি গরীব সবাইকে এই ব্যাধির প্রতিরোধ অভিযানের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে হবে। আজ যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ এই ব্যাধির দংশনে দংশিত হননি এবং যারা রোগীকে এড়িয়ে চলছেন কালের আবর্ত্তে তাদের এই ব্যাধি গ্রাস করতে পারে, তার সম্ভাবনা ও রয়েছে প্রচুর। রোগীকে এড়িয়ে চলা যায় বটে, কিন্তু রোগকে এড়িয়ে চলা যায় না। এই মারাত্মক ব্যাধিমাত্র ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই নির্ব্বিবাদে গ্রাস করছে। দীনের জীর্ণ কুটীর থেকে রাজার রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত ইহার গতি। আজ আমাদের এই অভ্যন্তরীন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, যাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হটিয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু যাহার প্রসার অতি বিপুল, এই দুরারোগ্য ব্যাধির নিষ্পেষণে ক্ষীণমান সমাজকে জাগিয়ে তুলবার গুরুভার আমাদের স্কন্ধে বহন করতে হবে। ইন্দ্রজালিকের যাদুমন্ত্রের স্পর্শে একদিনেই আমরা আমাদের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত বিন্দুটিতে পৌঁছিতে পারব না, তিলে তিলে জয় করে নিতে হবে অসীম ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, তবেই আসবে আমাদের সফলতা এবং সেইসা ফল্যের জন্য চাই আমাদের প্রত্যেকের আত্মনিয়োগ।

আজ সমাজের অধিকাংশ লোকই অনুভব করছেন, কি করে এই দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মনুষ্য সমাজ রক্ষা পাবে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি কি ভাবে ইহার বিরুদ্ধে অভিযান চলিয়েছে তাহা অনুধাবন করলে সর্ব্বাগ্রে ডেনমার্কের সফলতাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এক সময়ে ডেনমার্কে যক্ষ্মা ব্যাধি মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মৃত্যু সংখ্যা ছিল প্রতিপক্ষে ৩১০ জন বর্ত্তমানে সেখানে মৃত্যু সংখ্যার হার প্রতি লক্ষে ১১ জন। কিন্তু ভারতে মৃত্যু সংখ্যার হার প্রতি লক্ষে ২০০-৪০০ জন। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই চার লক্ষ যক্ষ্মা রোগী রয়েছে। অবস্থা অত্যন্তই শোচনীয়।

যক্ষ্মা ব্যাধি প্রতিরোধ অভিযানের পরিকল্পনাটিকে চার ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথমতঃ রোগ প্রতিরোধের অভিযান—রোগাক্রান্ত না হবার দিকেই বেশী জোর দেওয়া। আমাদের কার্য্যপরিক্রমা আরম্ভ হবে পল্লী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। পল্লী অঞ্চল থেকে মহকুমার সহরে। প্রতি মহকুমার পল্লী অঞ্চলগুলিকে রোগ প্রতিরোধের অভিযান চালিয়ে গিয়ে উপনীত হতে হবে জিলা সহরে এবং জিলা সহর থেকে বড় বড় সহরে। মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামগুলিকে আট-দশটি গ্রাম নিয়ে কতগুলি ইউনিটে ভাগ করা হবে। এক ইউনিটে রোগ প্রতিরোধের অভিযান চালিয়ে অন্য ইউনিটে গিয়ে উপনীত হতে হবে। এভাবে সমগ্র ইউনিটগুলির কার্য্যপরিক্রমা শেষ হবে। প্রতি জিলা সহরে একটি করে চেষ্ট ক্লিনিক স্থাপণ করা হবে। এই চেষ্ট ক্লিনিকের সরঞ্জামাদি যথা এক্সরে প্লেট, ল্যাবোরেটারির সরঞ্জাম, ঔষধপত্র, ডাক্তার-নার্স, সমাজ কল্যাণকামীরা থাকবে। আর বড় শহরে থকেবে কয়েকটি বেডযুক্ত একটি ছোট হাসপাতল, এই হাসপাতালের সরঞ্জামাদি যথা—এক্সরে প্লেট ল্যাবোরেটারির, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি এ, পি এবং পি, পি, দেওয়ার সরঞ্জাম, ওষুধপত্র ডাক্তার নার্স ইত্যাদি তাছাড়া থাকবে ভ্রাম্যমাণ ডাঃ এবং নার্স যারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে রোগীকে দেখবে এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং নার্সিং সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন।

প্রথমেই রেডিউগ্রাফিক পরীক্ষার দ্বারা প্রতি ঘরের পরিবারবর্গকে পরীক্ষা করান হবে। এই রিডিউগ্রাফিক পরীক্ষায় যারা রোগ লক্ষণ শূন্য বলে গণ্য হবে তাদের মধ্যে ২০ বৎসর অনধিক বয়স্কের বি, সি, জি টীকা দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে। বি, সি, জি টীকার দ্বারা কতগুলি কৃত্রিম জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এই যক্ষ্মা জীবাণুগুলি থাকে অত্যন্ত নিস্তেজ। মনুষ্যদেহে এই জীবাণুগুলির রোগ-উৎপাদক করবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায়। বি, সি, জি টীকা দেওয়ার পূর্ব্বে আর একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। ইহার নাম টিউবারকুলিশ চেষ্ট, এই ইনজেকশনটি চামড়ার মধ্যে দেওয়া হয়, কিন্তু কোন জ্বালা যন্ত্রনা হয় না। ইনজেকশনের জায়গাটিকে ২।৩ দিন পরে পরীক্ষা করে বুঝা যায়, ইহার শরীরে পূর্ব্বে কোন যক্ষ্মা জীবাণু প্রবেশ করেছে কিনা। যদি পরীক্ষা করে বুঝা যায় যে ইহার শরীরে যক্ষ্মা জীবাণুর অস্তিত্ব রয়েছে তাহা হলে আর বি-সি-জি টীকা দেওয়া হবে না, কারণ তাহার শরীরে রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি রয়েছে। আর যাদের টিউবারকুলিন টেস্টে নেগেটিভ হয়েছে, তাদের বি-সি-জি টীকার দ্বারা কতগুলি কৃত্রিম যক্ষ্মা জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াবার জন্য। বি-সি-জি টীকা প্রবর্তনের ফলে অনেকাংশেই সুফল পাওয়া গেছে। ১৯৫১ সাল থেকে এই টীকা দান কার্য্য আরম্ভ হয়েছে। গ্রামের অধিকাংশই নিরক্ষর ও অজ্ঞ। যক্ষ্মা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। যক্ষ্মা ব্যাধি যে সমাজের কত বড় শত্রু সে সম্বন্ধে তাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যাতে

গ্রামবাসীরা নিজেরাই বি-সি-জি টীকা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রথমেই আমরা প্রতি ঘরের পরিবারবর্গকে রেডিউগ্রাফিক পরীক্ষা কার্য্য চালিয়ে ২০ বৎসরের কম বয়স্কদের বি-সি-জি টীকা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করবো। রোগ প্রতিরোধের উপায় হিসাবে মনোট্যাক্স (Mantoux)-এর ব্যবহার ও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা চলে!

পরীক্ষায় যাদের রোগজীবাণু অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি, তাদের বি-সি-জি টীকা দিতে হবে। যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধের জন্য একসঙ্গে ১০।১২ বৎসর ব্যাপকভাবে অভিযান চালিয়ে গেলে রোগ বৃদ্ধির সংখ্যা বহুলাংশই হ্রাস পাবে। ইহা হল অভিযানের প্রথম পর্য্যায়।

দ্বিতীয়তঃ রোগের প্রথম অবস্থাতেই রোগ নির্ণয় রেডিউগ্রাফিক পরীক্ষা দ্বারা করা হবে।' কারো সম্বন্ধে যদি কোন সংশয় থাকে, তখন ফটোকে এনলার্জ করা হবে। রোগ যদি ধরা পড়ে, তখন ফটো পরীক্ষা করে দেখা হবে, রোগ কোন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। রোগীর থুথু, রক্ত পরীক্ষা করান হবে! রোগের সুরুতেই যদি রোগ ধরা পড়ে এবং থুথু নেগেটিভ থাকে তাহা হইলে তাকে বাড়ীতে রেখেই জিলা শহরে স্থাপিত চেস্ট ক্লিনিকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। যে সমস্ত রোগীর দ্বারা রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা নেই, তাদের যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্বলিত চেস্ট ক্লিনিকে চিকিৎসা চলে এবং সেই সঙ্গে বাড়ীতে সেবাযত্ন পায় তাহা হইলে রোগ নিরাময় সহজেই সম্ভব হয়ে উঠবে। বর্তমানে যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধক হিসাবে নানাপ্রকার ওষুধ বের হয়েছে, ষ্ট্রেপটোমাইসিন, পি-এ-এম, হাইড্রামাইড ইত্যাদি চেস্ট ক্লিনিকে ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা চলবে কিন্তু ভ্রাম্যমান ডাক্তার রোগীর দেখাশুনা করবেন এবং তার কর্তব্য হিসাবে রুটিং করে দিবেন—পূর্ণ বিশ্রাম, জ্বর নেওয়া, ওয়াকিং করা, থুথু কাস অন্য কোথাও না ফেলা, রৌদ্রে না যাওয়া ইত্যাদি। আর ভ্রাম্যমান নার্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সেবাকারীকে বুঝিয়ে দিবেন।

রোগীর রোগকে যেমন ভাবে জানতে হবে ঠিক তেমনি ভাবে রোগীর পারিবারিক জীবনের অর্থনীতিকেও বিশদভাবে জানতে হবে। আমাদের দেশ অতি দরিদ্রের দেশ। সুতরাং ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধপত্র, এক্সরে, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া সম্ভপোযোগী চিকিৎসার ব্যয় বহন করার রোগীর সামর্থ্য রয়েছে কিনা। যে সমস্ত ক্ষেত্রে রোগী ওষুধপত্র আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র ব্যয়ে অসমর্থ সেখানে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

তৃতীয়তঃ রেডিউগ্রাফিক পরীক্ষায় যে সমস্ত রোগীর রোগ নিরাময় হতে দীর্ঘদিন লাগবে এবং রোগীর রোগ দ্বারা সংক্রামণের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে; সে রোগীকে স্বতন্ত্রভাবে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে এই রোগীর দ্বারা পরিবারবর্গ সংক্রামিত না হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালের বেডে রাখবার ব্যবস্থা করা হবে। তারপরে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ হবে। এক্ষেত্রে রোগীর প্রকৃতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা না জানলে তার চিকিৎসা অসম্ভব। আর রোগীর সামর্থ্যানুযায়ী ব্যয়ের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা যদি না হয়, তাহা হইলে রোগীর চিকিৎসকের নির্দেশ মানাও অসম্ভব। সুতরাং রোগীর পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা জেনে আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের অধিকাংশই অশিক্ষা ও অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। যক্ষ্মা ব্যাধি যে সমাজ জীবনের কত বড় শত্রু এবং এই ব্যাধির জীবাণু কিরূপে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাহা আলোক চিত্রের প্রদর্শনের দ্বারা প্রচার কার্য্য চালাতে হবে। তাছাড়া গ্রামের খাল, নালা, ডোবা রাস্তায় ও পানীয়ের জল জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের কার্য্যপরিক্রমা এক ইউনিটে যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধের অভিযান চালিয়ে অন্য ইউনিটে অভিযান আরম্ভ হবে। প্রথমে রেডিউগ্রাফিক পরীক্ষা পরে বি-সি-জি টীকাদান। এভাবে স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে, মহকুমার শহর থেকে জিলা শহরে এবং জিলা শহর থেকে বড় বড় শহরে আমাদের অভিযানের পরিকল্পনাটির কার্য্যাবলী চলতে থাকবে। শুধু খালি পেটে রোগ প্রতিরোধের অভিযান চালালেই হবে না। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্যকে সুন্দর বলিষ্ঠ ও উন্নত করে গড়তে হবে। ভাল স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার ব্যবস্থা, বলকর খাদ্যের ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে আমোদপ্রমোদ দ্বারা দেহ মনকে রোগ ও মানবদেহের গ্লানি থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা ও করতে হবে!

এই মারাত্মক যক্ষ্মা ব্যাধি নিরাময় বহু ব্যয় সাপেক্ষ ও সময় সাপেক্ষ। যক্ষ্মা দমনে আমাদের নিজস্ব কোন অর্থভাণ্ডার নেই। কি করে আমরা আমাদের পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করব। এই যক্ষ্মারোগ দমনে আমাদের প্রয়োজন প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে কিছু কিছু অর্থসংগ্রহ করে যক্ষ্মারোগ দমনের অভিযানের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করা। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় স্কোয়াড বের করান হবে। যার যেমন সামর্থ্য সে সেভাবেই দান করবে। আমাদের দেশ দরিদ্রের দেশ, ধনীর সংখ্যা স্বল্প। কিন্তু অভাব অভিযোগ রয়েছে প্রচুর। সুতরাং আমাদের সকল স্তরের লোকের নিকট সাহায্যের আবেদন করতে হবে। যত অধিক সংখ্যক লোকের নিকট আমাদের আবেদন পৌঁছিবে ততই আমাদের মঙ্গল। অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে বাড়ী বাড়ী মুষ্টি চালের প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। প্রতি গৃহের রান্নার চাল থেকে দুবেলা দুমুঠো চাল উঠিয়ে রাখবে। প্রতি মাসে সেই চাল বিক্রয় করে আমরা সবার কাছ থেকেই কিছু না কিছু অর্থসংগ্রহে সমর্থ হব। অর্থসংগ্রহেও আমরা একদিনেই কোটি কোটি আদায় করতে পারব না। আমাদের তিল তিল করে অর্থভাণ্ডারকে পূর্ণ করতে হবে। যেমন বহু বর্ষ রোগে ভোগা জীর্ণ মানুষটিকে অভিজ্ঞ ডাক্তার বহু যত্নে, অতি আয়াসে অসীম ধৈর্য্যে চাঙ্গা করে তোলেন; আমাদের অর্থভাণ্ডারটিকে সমবেত চেষ্টা এবং পরিশ্রমের দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের আত্ম-নিয়োগের দ্বারা এই মারাত্মক ব্যাধি প্রতিরোধের অভিযান ১০।১৫

বৎসর চালিয়ে গেলেই নিশ্চই কিছু সফলতা লাভ হবে। পরিশ্রম বৃথা হয় না। সত্যমেব জয়তে।

অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে টি, বি শিল বিক্রয়ের অভিযান চালাতে হবে। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবস ২রা অক্টোবর থেকে মৃত্যু দিবস ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত টি. বি. শীল বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্ত্তন করেছেন। ডেনমার্কেই প্রথম টি, বি, শীল বিক্রয়ের প্রথা আরম্ভ হয়। টি, বি, শীল বিক্রয়ের প্রথা এমন এক পর্য্যায়ে, যে কোন মানুষ ইহা কিনিতে পারে। সুতরাং গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে টি, বি, শীল বিক্রয়ের অভিযান চালাতে হবে। জন সাধারণের সমাজ সচেতন ভাব জাগিয়ে তুলে টি, বি, শীল বিক্রয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে।

চতুর্থতঃ সক্ষমা রোগীর রুদ্ধগতি হওয়ার পরও আমাদের কাজ সেখানেই শেষ হয়ে যাবে না। যতদিন রোগী তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে না পায় ততদিন নিয়মিতই খবরাখবর নিতে হবে। কখনও যদি রোগী অসুস্থতা অনুভব করে তখনি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকাংশ রোগী রোগমুক্ত হওয়ার পর আর পূর্ব্ব কর্ম্মস্থানে নিযুক্ত হতে না পারলে, বা নূতন কোন কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে, নিজেকে তখন গলগ্রহ মনে করে এবং মানসিক অবসাদে তার জীবন আবার ক্ষয়ে পড়ে? এ সমস্ত রোগীদের জন্য নূতন কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের এমন একটি কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যাতে আরোগ্যপ্রাপ্ত যক্ষ্মারোগীরা তাদের নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী কাজ করতে পারে। রোগীরা যদি মাইনের টাকা দিয়ে ভালভাবে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারে, তাহা হইলে নিজেকে আর পরনির্ভরশীল ও গলগ্রহ মনে করবে না। নৈরাশ্যেও ভেঙ্গে পড়বে না।

যক্ষ্মারোগ মুক্ত ব্যাক্তির কর্ম সংস্থানের সমস্যা অন্যদেশ কোন পন্থা অবলম্বন করছে তাহা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে যক্ষ্মা রোগীদের অর্থ-নৈতিক পুনর্বাসনের Economic Rehabilitation জন্য স্বতন্ত্র ফাণ্ড (Special fund) রয়েছে। যে সমস্ত রোগীর ডাক্তার কর্তৃক পার্ট টাইম কাজ করার নির্দ্দেশ রয়েছে, তাদের স্বতন্ত্র ফাণ্ড (Special fund) থেকে কমপেনসেসন (Compensation) দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কতগুলি দেশে ইউনিয়ন অরগানিজেসন (Union Organisation) রোগীদের পুর্ণ বেতন ও কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থায় অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করে থাকে। সোভিয়েট ইউনিয়নেও যক্ষ্মা রোগীদের পুনর্বাসনের কাজে অগ্রসর হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের যক্ষ্মা রোগী স্যানাটেরিয়াম থেকে বের হলেই তার পূর্ব কর্মে নিযুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ডাক্তার কর্তৃক তার পূর্ব বিভাগ অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে, সেই প্রতিষ্ঠানেই রোগীর ক্ষমতা অনুযায়ী অন্য বিভাগে নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু রোগী ক ঘণ্টা কাজ করবে তাহা ডাক্তার কর্তৃকই নির্দ্দেশিত হবে এবং রোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানের 'সোস্যাল ইনসিয়ুরেন্স ফাণ্ড (Social Insurance fund) থেকে পুর্ণবেতনই পাবে। আমরাও আমাদের যক্ষ্মা রোগীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি পন্থাকেই বাস্তবে রূপায়িত করবো। শিল্পপতিদের নিকট আবেদন, তাঁরা যেন যক্ষ্মা রোগীর গুরুত্বটা উপলব্ধি করেন। মন থেকে অমূলক অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সরিয়ে দিয়ে যক্ষ্মা রোগীদের কর্ম সংস্থানের জন্য অন্যান্য দেশের পদ্ধতিতে অনুসরণ করেন।

অনেক সময় দেখা যায় যক্ষ্মা রোগী কাজে যোগদান করার কিছুদিন পরেই পুনর্বার রোগক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের সাহায্যার্থে আমাদের প্রয়োজন আরোগ্য নিকেতন (After care colony)। বৃটেনের আ্যাসওয়ার্থ কলোনীর অনুরূপ। যক্ষ্মা রোগীর রোগ রুদ্ধগতি হওয়ার পরেও আরও বিশ্রাম নিতে হয়। এই কলোনীতে রোগীদের মুদ্রণ, বই বাঁধা, নানা রকমের আসবাবপত্র সৌখিন দ্রব্য চামড়ার ব্যাগ সুটকেস ইত্যাদি তৈরীর কাজ শিখান হবে। কাজের জন্য রোগীদের ঘণ্টা হিসাবে মাইনে দেওয়া হবে। যাতে রোগীদের খুব পরিশ্রম না হয় সেদিকে খুব দৃষ্টি রাখা হবে। এখান থেকে রোগীরা স্বাস্থ্যবান হয়ে, তার পূর্ব্ব জীবন ফিরে পেয়ে বাহিরে চাকরীতে চলে যাবে। বর্ত্তমান ভারতে আরোগ্যনিকেতন তিনটি রয়েছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর পরিচালনাধীনে মেদিনীপুরে ডিগ্রী নামক স্থানে আর একটি আরোগ্যোত্তর নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এরূপ কলোনীর প্রয়োজন আমাদের প্রচুর।

সুতরাং আমাদের যক্ষ্মা দমনের অভিযানটিকে জয়যুক্ত করে তুলবার জন্য বিভিন্ন এসোসিয়েশন থেকে—ড্রামাটিও এসোসিয়েশন, স্পোর্টিং এসোসিয়েশন এবং অর্থশালী ব্যাক্তিরা এগিয়ে আসবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজো যারা অজ্ঞতায়, কুসংস্কারে, দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এগিয়ে আসুন। হাত প্রসারিত করুন দুর্ভাগ্য যক্ষ্মা রোগীদের প্রতি। মানব হিতৈষী অর্থশালীদের প্রতি আবেদন তাঁরা যেন মুক্ত হস্তে দান করেন। আমাদের সাফল্যের জন্য চাই প্রত্যেকের আত্মনিয়োগ। মনুষ্যত্বের মানবিকতা ব্যাধি বিপদের মধ্যেই বিকশিত হয়ে ওঠে। মনুষ্যত্ব নদীর মতন বাঁধা না পেলে তাহার ভৈরব মাতন শুনা যায় না। কুলে কুলে জল প্লাবিত হয় না। দুর্গম পথেই মানুষের অপরাজেয় গৌরব। মানুষ হিসাবে মানুষের কর্ত্তব্য করতে পারলে মানবতা বোধের গর্বে অন্তর পুলকিত হয়ে যাবে। আজ মানব সমাজ জীবন যুদ্ধের তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছে। দেশের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে দীনের জীর্ণ কুটীরে থেকে রাজার প্রাসাদও দেশকে ধ্বংসের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, যাহা কিছু তা অর্থ-নৈতিক ব্যাপার। গণতন্ত্র সম্মত রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে ভেদ অপরাধ। রোগ প্রতিরোধের অভিযানে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে মিলে যে সমাজ গড়ে উঠবে তাহাই হবে আমাদের সুস্থ বানিয়াদ।

আমাদের জীবনে "আর্টে"র স্থান

শ্রীবলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বিএস-সি, বি-টি

ছোট শিশু উলঙ্গ অবস্থায় বা বেশভূষার অপরিপাট্যের মধ্যেও মাতৃক্রোড়ে নির্বিকার থাকে—কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথেই তার স্বভাবের পরিবর্তন হয়! তখন সে উলঙ্গ থাকাতো দূরের কথা—সাজসজ্জার একটু এদিক ওদিক হ'লেও বিশেষ অতৃপ্তি অনুভব করে—চোখে মুখে তার বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। মানবসভ্যতার উচ্চ সোপান হ'তে অবতরণ ক'রতে ক'রতে আমরা সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছে সেখানেও ওই উলঙ্গ অবস্থা দেখতে পাবো। সেই অবস্থা থেকে ক্রমোন্নতি হ'তে হ'তে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যখন বেশ কিছুটা পাকা হ'য়ে উঠলো—তখন হ'তেই তার সভ্যতার সুরু। আর সত্যিকার সভ্যতা যেখানে, আর্ট সেখানে প্রাণবায়ু স্বরূপ। সভ্যতার সুরু হ'তেই তার সুরু এবং তাকে বাদ দিলে সভ্যতার কিছুই থাকে না।

মানুষ যখন পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রথম অবতীর্ণ হয় তখন তার অবস্থা ছিল বড় করুণ। তার তখন ভাব কিংবা ভাষা কোনটিই ছিল না। কোন রকমে পশুর মত দিনাতিপাত ক'রত সেই আদিম বর্বর যুগের মানবগোষ্ঠি। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে অস্ফুট এবং অনির্দিষ্ট শব্দসম্ভার ভাষার স্তরে উন্নীত হ'ল এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপুঞ্জ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখবার জন্য সৃষ্টি হ'ল বর্ণমালা। সেই বর্ণমালাকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে উঠল সাহিত্য, শব্দ রূপান্তরিত হল সংগীতে এবং নৃত্যকলা গতিশক্তিরই এক ছন্দোময় রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে দেখবার জন্য এবং একটা উচ্চাদর্শকে প্রতিষ্ঠা ক'রবার জন্যই কলা বা আর্টের সূচনা।

মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়। সেই বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রয়োজনে কলাও হ'য়েছে বহুমুখী। অত প্রাচীনকাল হ'তেই আমাদের দেশে বহুপ্রকার কলার সৃষ্টি হ'য়েছে। সেই সুপ্রাচীন কালে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টদশ কলা শিক্ষাদান করা হ'তো। যাই হোক মোটামুটি "কলা" বা "আর্টকে" ৪ ভাগে ভাগ করা যায়—সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য এবং চিত্রকলা। এদের প্রয়োজন আমাদের জীবনে অপরিসীম! সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তরের কথাকে প্রকাশ করে থাকি এবং একটা বস্তুকে লিপিবদ্ধ ক'রে সেটাকে অনন্ত বিস্মৃতির হাত হ'তে রক্ষা করে থাকি! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতার মর্মকথা, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যের মাধ্যমেই যুগে যুগে মানুষের হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছে। শুধু তাই নয়—সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্বস্বরূপ কিন্তু এই প্রতিবিম্ব ঠিক আয়নার প্রতিবিম্বগুলোর সমধর্মী নয়। জীবনে যা কিছু ঘটলো সেটাকে ঠিক কাঁচামালের মত প্রকাশ করা মানেই সাহিত্য নয়। তার উপরে অনেক রঙ চঙ চাপিয়ে ভাল মন্দ নির্দেশ ক'রে এবং একটা মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনযাপনের পন্থা নির্দেশ ক'রে দিয়ে তবেই সাহিত্যের সার্থকতা। জীবনে সাহিত্যের স্থান জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ঠিক ঠিক পথে পরিচালনার জন্য। তদ্রূপ সংগীতও মানুষের জীবনকে শব্দের দিক থেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ক'রে তোলে। আবার নৃত্যকলা আমাদের শিক্ষা দেয় গতিশক্তি নিয়ন্ত্রণ-কৌশল এবং তার মধ্য দিয়ে জীবনের একটা আনন্দময় ও সুষ্ঠু গতিপ্রবাহের পথ আবিষ্কার করতে চিত্রকলার মধ্য দিয়ে আমরা জীবনকে সুন্দর ক'রবার শিক্ষালাভ ক'রে থাকি। সাহিত্যে যদি কিছু অপ্রকাশিত থাকে তা প্রকাশিত হয় সংগীতে এবং সংগীতেও যদি কিছু বা অপরিস্ফুট থাকে তাকে রূপায়িত ক'রবার জন্য আছে নৃত্য এবং চিত্রকলা। এইরূপে জীবনকে রূপে, রসে, গন্ধে, গানে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে জানবার জন্যই আমাদের জীবনে "আর্টে"র প্রয়োজন রয়েছে।

সর্বপ্রকার "আর্টের" একটা প্রধান ধর্মই হ'ল আনন্দদান। কিন্তু নিছক আনন্দদানই তো তার উদ্দেশ্য নয়—একটা বিরাট আদর্শকে বা জীবন-দর্শনকে প্রকাশ ক'রবার জন্যই এর অস্তিত্ব। আর্ট আমাদের মহান্ চরিত্র গঠনের পথকে প্রশস্ত করে। ক্ষুদ্র হ'তে বৃহত্তের দিকে, নীচতা হ'তে উদারতার দিকে, ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টির দিকে, স্বার্থ হ'তে আত্মত্যাগের দিকে এবং সসীম হ'তে অসীমের দিকেই এর গতি।

সকলের দৃষ্টিতে কিন্তু "আর্ট" একই প্রকারের নয়। একদল ব'লে থাকেন—"Art for arts sake" তাঁদের মতে "আর্টের" মধ্যে আদর্শ যে থাকবেই এমন কোন কথা নেই। জীবনে যা কিছু ঘটছে তাকে হুবহু প্রকাশ ক'রতে হবে, কোথাও একটুকু পরিবর্তন চ'লবে না। এদের মতে শিল্পী তাঁর শিল্প সৃষ্টির পথে কোন বাধ্যবাধকতার বশীভূত হবেন না। আর একদল কিন্তু ঐ মতের বিরোধী। তাঁরা বলেন "আর্টে"র মধ্যে যদি একটা উচ্চাদর্শ না থাকে তবে তা নিরর্থক, তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রকৃত 'আর্টিষ্ট' হওয়া যেমন কঠিন, তদ্রূপ প্রকৃত "আর্ট"কে বোঝাও কঠিন। প্রকৃত "আর্ট" বাইরের কোন প্রকার সাজসজ্জা বা বাহাদুরী লাভের ধার ধারে না—"আর্টে"র ক্ষেত্রে নবদ্বীপের যে কৌলীন্য আছে কলকাতার তা নেই। তাই কবি গুরুর মতে কবি কঙ্কণের চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত বা মুরারি শীলের কৌলীন্যের কাছে ধনপতি হয়েও শ্রীমন্ত নিষ্প্রভ হয়ে আছে, বিষবৃক্ষের হীরার কৌলীন্য সূর্যমুখীকে ম্লানমুখী ক'রে রেখেছে। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সেই চিত্রই শ্রেষ্ঠ যার বর্ণবিন্যাসের মধ্যে থাকে সংযম! উচ্চশ্রেণীর আর্ট গায়ে পড়া সৌন্দর্যকে সব সময় এড়িয়ে চলে। সুশ্রী নরনারীর বর্ণচ্ছটাবহুল চিত্রকে যখন কেউ আদর করে—তখন তার সেই রুচিজ্ঞানের মূলে প্রকৃত "আর্টে"র প্রতি তার যে দরদ নেই তা সহজেই প্রমাণিত হয়। প্রকৃত

"আর্ট" বাহ্যিক নয়—তা আভ্যন্তরীয়। প্রকৃত "আর্ট" যুগে যুগে সক্রেটিস্‌কেই মর্যাদা দিয়ে এসেছে।

নাটক দেখতে গিয়েছি। তখন ধার্মিক ব্যক্তির জয়জয়কার এবং অধার্মিকের পরাজয় দেখলে যদি আমাদের মনে আনন্দ সঞ্চার হয়—তখন বুঝতে হবে যে, আমাদের সে আনন্দ "আর্টে"র আনন্দ। কিন্তু যখন কোন হিন্দী বইয়ে কামকেলির আড়ম্বর দেখে উল্লসিত হই—তার মূলে কোন "আর্ট" নেই।

চিত্রবিদ্যাকে উল্লেখ ক'রেই কবি "আর্ট" সম্বন্ধে বলেছেন—"চিত্রবিদ্যার মধ্যে একটা কঠোরতা চাই। পৌরুষ চাই। যথার্থ সৌন্দর্য জিনিষটা মোহ নয়, মায়া নয়, তা দশজনের চোখ ভোলাবার ফাঁদ নয়। সৌন্দর্য হ'চ্ছে সত্য। যতক্ষণ সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যের সেই স্বাভাবিক দৃঢ়তা, প্রশস্ততা, কঠোরতা পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারবে না।" তাছাড়া তাঁর মতে সম্পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির চাইতে বরং অপূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিই উৎকৃষ্টতর। কারণ শিল্পী যদি সবটুকু নিঃশেষে না দেন—কিছু বল্‌তে বাকী রাখেন তাহলে পাঠকের কল্পনাশক্তির বিকাশলাভ ক'রবে। কবির কাব্যে তাই কথিতের চেয়ে অকথিতের মূল্য অনেক বেশী। কথিত যা তা পরিমিত কিন্তু যা অকথিত তা পাঠকের মনে অনেক চিন্তা ও কল্পনাশক্তির উদ্বোধন করে—তা অপরিমেয়। কবির উত্তর জীবনের রচনাগুলি তাই বড় বেশী নিরাভরণ ও বহিঃসৌষ্ঠব বর্জিত। এগুলোকে অসম্পূর্ণ ব'লে প্রতীয়মান হ'লেও আসলে তা নয়—কবি এখানে "আর্টের" আভিজাত্য রক্ষার জন্য অকিঞ্চিৎকে বড় ক'রেছেন। তিনি তাঁর জীবনব্যাপী রস সাধনার লব্ধ বস্তুকে যথাযোগ্য মূল্য না দিয়ে কাউকে দিতে রাজী নন।

আদর্শহীন "আর্ট" এবং আদর্শযুক্ত "আর্ট"—এই দুটিকে নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নেই। একদল প্রথমটিকে, আর একদল দ্বিতীয়টিকে সমর্থন করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ দ্বিতীয় প্রকার "আর্টে"র প্রতি আস্থাশীল। আসলে কোন একটি ভাবধারার প্রতি পূর্ণ Dogmatism আজকালকার দিনে ভাল নয় বলে মনে হয়। কিন্তু "আর্টে" যে আদর্শ থাকবে না—একথা কি করে সহ্য করা যায়। "আর্টের" মধ্যে আভিজাত্য এবং আদর্শবাদ দুটোরই প্রয়োজন আছে। "আর্ট"কে নিতান্ত সহজলভ্য ক'রে ফেলেই আজ জাতি অনেকটা আদর্শচ্যুত এবং জীবনযুদ্ধে অসীম ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও বীর্যবত্তা প্রভৃতি হারিয়ে ফেলতে ব'সেছে।

আর্টকে ঠিকমত বুঝতে না পারলে আমাদের মুক্তি নেই। যাঁরা প্রকৃত আর্টিষ্ট তাঁরা যে শুধু উচ্চাদর্শের জন্যই মাথা ঘামান্ তা নয়, তারা দৈনন্দিন জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকেও মার্জিত করেন। সাহিত্য আমাদের লিখন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে, সৃজনী প্রতিভাকে নির্মল করে, সঙ্গীত বাক্যালাপকে মধুর ও ছন্দোময় করে, চিত্রকলা আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানকে বিকশিত করে আর নৃত্যকলায় বেড়ে যায় গতিভঙ্গির সৌন্দর্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা শিল্পবিষয়ক জ্ঞানকে আজও বিশেষ মর্যাদা দিতে শিখিনি।

শিল্পগুরু নন্দলাল তাই শিল্পকে বিদ্যালয়ের আবশ্যিক পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্তকরার পক্ষপাতী, কারণ তাঁর মতে—"সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা নয়, তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাবে যাঁরা বাড়ীর উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড়ো করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ করেন না, ঘরের দেয়ালে, পথে ঘাটে, রেলগাড়ীতে পানের পিক ও থুথু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয়—জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন। তাঁদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানারোগ সংক্রামিত হয় তেমনি তাঁদের কুৎসিত আচরণের কু-আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।"

যাঁরা প্রকৃত কলাবিশেষজ্ঞ তাঁরা অতীতের নানাবিধ কলাকে জেনে সে যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মান নিরূপণ ক'রতে পারেন এবং যেটুকু ভাল ছিল সেটুকু গ্রহণ ক'রে বিশ্ববাসীর অশেষ উপকার ক'রতে পারেন। "আর্টের" বা কলার মাধ্যমেই আমরা প্রাচীনকে জান্‌তে পারি এবং সেই জ্ঞান আমাদের নূতন সৃষ্টির পথকে প্রশস্ত করে।

আর্টের আভিজাত্য বজায় রেখেও তাকে বৈচিত্র্যকামী জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে আজ আর শুধু রাজদরবার বা রাজপ্রাসাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক'রলেই চলবে না। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গেও তার সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে হবে। তাছাড়া "আর্টকে" আমরা অবসর বিনোদনের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারি—তাতে ক'রে অবসর মুহূর্তগুলি সার্থক হ'য়ে উঠবে। ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন দক্ষতার ফলে আমাদের অবসর এখন অনেক বেশী। সেই অবসরকালকে ঠিক ঠিক পথে নিয়োজিত ক'রতে না পারলে আমাদের জাতীয় জীবনের বিরাট একটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ শ্রমিক ও কর্মীরা যাতে নানাপ্রকার কলার মাধ্যমে তাদের সৃজন ক্ষমতাকে চরিতার্থ ক'রতে পারে অথচ সেটা অবসর বিনোদনের ছলে আনন্দের মধ্যেই সম্পন্ন হয়—তার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপে যদি তারা অবসর সময়ের শিক্ষা না পায়, তাহ'লে কেবল একঘেঁয়েমির ফলে বহু চেষ্টায় গঠিত বর্ত্তমান সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'তে পারে।

জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে "কলার" স্থান সর্বাগ্রে। প্রকৃত কলাজ্ঞানের দ্বারা আমরা আমাদের জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আনন্দময় ক'রে তুলতে পারি—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ছন্দ ও সুষ্ঠুগতি এই কলার মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারে। পৃথিবীবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবে মিলিত হ'তে পারে একে অন্যের কলার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে এবং তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমের মাধ্যমে। প্রকৃত কলাজ্ঞানে যদি বিশ্ববাসী উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—তাহ'লে স্বস্তি পরিষদকে আর নিষ্কর্মা শান্তিদূতের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয় না। প্রকৃত কলা জ্ঞানের আলোক বিচ্ছুরণে আমাদের অন্তরের সৌন্দর্যসিন্ধু মৃদু মলয় হিল্লোলে দোদুল্যমান হ'য়ে ওঠে, তখন আমাদের হৃদয়ের সেই অকৃত্রিম সৌন্দর্যবোধ আমাদের আচরণের বহিঃপ্রকাশ কত মাধুর্যমণ্ডিত ক'রে তোলে—আমরা ভিতরে যা, বাইরে আমাদের তারই অভিব্যক্তি।
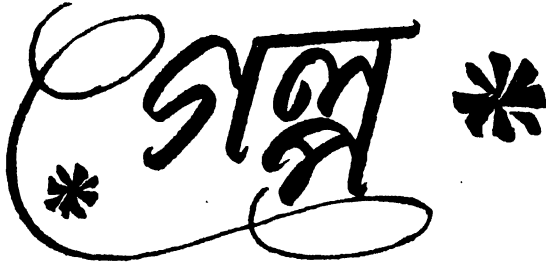
সেপাই পিসিমা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

১

চল্লিশ বছর আগের সেকাল। রাজস্থানের একটী সহর। সকাল বেলা। একটী বাড়ীর বাইরের আঙিনায় একটী পাথরের চৌকীর ওপর বসে গৃহস্বামী সেকালের মতই 'বারদুয়ারে' বসেই দাঁতন করছেন, একপাশে নাপিত বসে আছে কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে। দু' একজন ভৃত্য মুখ-ধোবার জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এবং সেকালের মতই আবেদন-নিবেদনের পসরা নিয়ে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন নিয়ে দু' চারজন দাঁড়িয়ে আছে। কারো নিজের চাকরী, কারো পদোন্নতি, কারুরবা কোনো-বিশেষ বক্তব্য আছে।

সহসা একটী নারী এসে নত হয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। কালো রং, মুখে বসন্তেরদাগ, সোজা শক্ত, লম্বা চোস্ত চেহারা, দেখলে মনে হয় যেন নারী নয়, একজন সেপাই। মাথায় পাগড়ী নেই, এবং ঘাগরা 'লুগ্ড়ী' (ওড়না) পরা তাই মেয়ে বলে স্বীকার করে নিতে হয়। হাতে, গলায়, কানে, নাকে, মাথায় কোনো গহনাও নেই। শুধু পায়ে রূপার মোটা কড়া (মল)—(পুরুষের মতই) আছে। মাথার চুলগুলিও সৈন্যদের মতই ছোট্ট করে ছাঁটা।

সঙ্গে একটী সুন্দর সুশ্রী দশ-বারো বছরের বালক। মস্ত পাগড়ী মাথায়—আর প্রায় নিজের মতই দীর্ঘ প্রকাণ্ড একটী খাপেভরা তরোয়াল হাতে নিয়ে বিনীত ভাবে দাঁড়াল।

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন। নারী আবার দীর্ঘ অভিবাদন করে দাঁড়াল এদিক ওদিক চেয়ে। যেন অতলোকের সামনে সে নিজের বক্তব্য বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে।

গৃহস্বামীর ইঙ্গিতে বাইরের 'যাচক'রা সরে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই তোমার ?

সে ছেলেটীর হাত ধরে এগিয়ে এলো, তারপর ছেলেটীর মাথার পাগড়ীটী মাথা থেকে নামিয়ে আর তরোয়ালখানির সঙ্গে গৃহকর্ত্তার সামনে রেখে বল্লে, 'আমি এদের নিয়ে আজ আপনার 'শরণ' নিলাম। এ আমার ভাইপো। আমার ভাজ ও তার আর দুটী ছেলেমেয়ে নিয়ে আপনার বাড়ীর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার ভাইয়ের তিন বছর হ'ল মৃত্যু হয়েছে। ভাজের বয়স খুব কম। আমাদের আর কোনো নিকট আপনার লোক নেই। ভাই—গ্রামের জমীদার ছিল। প্রায় তিনশো বিঘা ফসলের জমী ক্ষেত আটটা কুয়ো কিছু প্রজা আমাদের আছে। কিন্তু এখন ভাইয়ের অবর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞাতিরা প্রজাদের নিয়ে দলবেঁধে আমাদের পিছনে লেগেছে। ফাঁকি দিয়ে নাবালক ভাইপোদের আশপাশের জমী থেকে বঞ্চিত করার মতলবে আছে। আর…'।

তার সেপাইয়ের মত কঠিন চোখে এবারে জল এলো, একটু থেমে সামলে নিয়ে বল্লে, 'আর তাছাড়াও—ভাজের বয়স কম তার পিছনে দুষ্টু লোক লাগিয়েছে। আমার বাপের বংশের মান-ইজ্জত নষ্ট করার মতলবে। আমাদের গাঁ-দেশে তো মাটীর ঘর খড়ের চাল, দরজা বেড়াও শক্ত নয়—কোন্‌দিন আগুন লাগিয়ে দেবে কিম্বা অন্য কিছু গোলমাল করবে!

আমি কোনো উপায় না-পেয়ে আপনি বাঙালী সজ্জন আপনার কাছে এলাম্। আপনাদের ঘরে আমি ভাজকে দাসী রেখে গেলেও জান্‌ব, মান-ইজ্জত বজায় থাকবে। আমাদের ঠাকুর (জমীদার) লোকদের ঘরে আমি সে-ভরসা পাই না। আমি এই রাজপুতের পাগড়ী তরোয়াল রেখে তার ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে আপনার শরণ নিলাম। আমার দেশের বড়লোকদের ওপর আমার ভরসা নেই। শত্রুরা আমার বিপক্ষে বলে টাকা দিয়ে তাদের হাত

করবে। ওদের এখানে রেখে দিয়ে আমি মামলার ব্যবস্থা করব, আপনার পরামর্শ অনুসারে।' শান্তভাবে চোখ মুছে সে গৃহকর্ত্তার দিকে চেয়ে রইল, কি তিনি বলেন।

তাঁর বাড়ীতেও অনেক চাকর লোকজন, অন্তঃপুরেও তাদের যাতায়াত আছে। সেও জানে, গৃহস্বামীও জানেন।

সে আবার বল্লে, 'ওকে দাসী করে রাখুন। সব কাজই করবে, আটা পিষবে, আপনার ঘরে ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখবে, ঝাঁট মোছা ধোয়াও করতে পারবে, শুধু উচ্ছিষ্ট বাসন ধোবেনা। কারুর সামনে বেরুবে না, বাইরে বেরুবে না। আর পুরুষ চাকরদের সঙ্গে কথা কইবে না। একটী পৃথক ঘর ওদের থাকবার জন্যে দেবেন, আর রাত্রিদিন ঘরের লোকের মতই সবকাজ করিয়ে নেবেন। যদিও পরের বাড়ী চাকরী আমাদের বংশের কেউ করেনি···'।

সে আবার চোখ নিচু করে নিলে। তারপর বল্লে, 'তাদের এনে আপনাকে 'বন্দেগী' করিয়ে যাই ?'

গৃহস্বামী বল্লেন, 'আনো।'

বাড়ীর পিছন দিক থেকে সে তার ভাজ ও অন্য দুটী ছেলেমেয়েকে নিয়ে এলো।

২

আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনে আবৃত পরিষ্কার ঘোর রংঙের ঘাগরা ওড়না পরিধানে ও হাতে পায়ে পেঁছা কঙ্কন, তাবিজবাজু, রূপার ও সোনার পদক দেওয়া হার গলায়, কোমরে রূপার মেখলা—পায়ে তিনচার গাছা করে মোটা মলজাতীয় গহনা-পরা একটী তন্বীনারী একটী বছর তিনের মেয়ে কোলে আর একটী বালকের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে নমস্কার করে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। হাতে পায়ে সধবার চিহ্ন মেহেদী পরা নেই।

গৃহস্বামী বল্লেন, 'আচ্ছা থাকবে, তবে আমার বাড়ীর মেয়েদের দিকেই। কিন্তু মাহিনা কি নেবে যদি কাজ করতে দাও।'

ননদ অপ্রতিভ, বিব্রত মুখে বল্লে, 'যখন আপনার শরণাগত হয়েছি, দাসীত্ব স্বীকার করেছি, তখন আপনি যা বিবেচনা করবেন, হুকুম করবেন, তাই আমার তামিল করতে হবে, যতদিন আমার ভাইয়ের বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার না-হয়। চাকরী তো আমরা কখনো করিনি বাবুজী। আমাদেরই তো কতলোকজন ছিল। কিন্তু আমাদের ইজ্জত মানের দায়ে আমরা আপনার তাঁবেদার খিদমৎগার হয়ে থাকব চিরদিন।'

গৃহস্বামী তাদের এক ভৃত্য দিয়ে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজের পিছনের দিকের ঘরের জালির জানলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি কেউ এখানে আছ ?'

জানলার কাছে স্ত্রী কন্যারা কেউ না কেউ মাঝে মাঝে সকালে বসে সেলাই বা পড়া-শোনা করতেন।

কন্যা বল্লেন, 'আছি বাবা।'

পিতা বল্লেন, 'আচ্ছা এদের—ওই মেয়েটীকে ভিতরের দিকের আটা পেষার ঘরটার অন্য সব দিক—গরু ঘোড়ার দানার দিক—খালি করিয়ে দাও। ও আজ থেকে এখানে রইল। আমি চা খেতে গিয়ে সব কথা বলছি।'

সেকালের চা' খাওয়া। টেবিল চেয়ার বয় বাবুর্চ্চির যুগ তখনো চালু হয়নি। দালানে মাটীতে আসন পেতে বসে চায়ের ব্যাপার সমাধা হ'ত। চা পাঁউরুটী, কিম্বা চায়ের সঙ্গে লুচি তরকারী নিমকী মিষ্টি যাই হোক।

কর্ত্তা ভিতরে এলেন।

গৃহিণী একটী পিঁড়ি পেতে বসেছিলেন চায়ের দেশী আসরের সামনে। বিধবা কন্যা জলখাবার ও চায়ের কেতলী এনে রাখলেন। গৃহিণী চা পরিবেশন করলেন।

খেতে বসে কর্ত্তা বল্লেন মেয়েকে, 'মেয়েটী ভিতরে এসেছে ?'

মেয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ দানার কোঠ্যারে (ভাঁড়ার) বসতে বলেছি।'

গৃহস্বামী এবারে গৃহিণীর দিকে চেয়ে বল্লেন, 'একটী আশ্রিত তোমার হেপাজতে এলো! কাজকর্ম্ম কিছু কিছু করবে বলেছে। বাসনটা মাজবে না, বাইরে বেরুবে না, বাজার পাঠানো চলবে না, এঁটো ছোঁবে না, ছাড়া কাপড়ও কাচবে না···অনেকটা 'দেবীচৌধুরাণী'র গোবরার মার মত মনে হচ্ছে। কর্ত্তা ঈষৎ হেসে স্ত্রী ও কন্যার দিকে চাইলেন।

তার পর কন্যাকে বল্লেন—'তবে তোমার ছেলেমেয়েদের

দেখবে, রান্না ঘরটাও ধোবে, আর বাড়ীর সব আটা পিষবে। দেখো, যেন চাকররা কেউ ওর ঘরের দিকে না মাড়ায়। ওর ননদটী একেবারে সেপাই, কেউটে সাপও বলা যায়—ছোবলাবে তাহলে। তোমার ওপর ভার দিলাম ওর। গৃহিণীকে বল্লেন, 'দেখেছ নাকি সেপাইটীকে ?'

গৃহিণী বল্লেন, 'না, আমি ওদিকে ছিলাম, রমা বলছিল।' তা চাকরী করতে এসে অত পর্দ্দা করলে কি করে চলবে। চাকর-বাকর তো সব জায়গায় ঘুরচে।

কর্ত্তা একটু হাসলেন, 'বল্লেন, চাকরী ঠিক নয়— গহনা দেখলে না ? আর ঘোমটার বহর তো দেখলে, ও নিজেই নিজের পর্দ্দা রাখবে।' কর্ত্তার চা' পান হ'ল, উঠে গেলেন।

গৃহিণী কন্যার দিকে চেয়ে বল্লেন, 'গয়না তো এদেশে অমনি করেই সবাই পরে। ঝি চাকরাণী মেথরাণী সকলেরই গা-ভরা গহনা আছে! তা এত পর্দ্দা নিয়ে কি আর চাকরী করা চলে। রকম দেখ! সব বাড়াবাড়ি।'

কন্যা বল্লেন, 'আবার সব কাজও করবে না।

মোট কথা, একটা গোবরার মাকে রাখা তো হল, আবার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, চাকরদের চোখ থেকে। এটা ভাল লাগছিল না ওঁদের। সেপাই ননদটীও আছে মিলিটারী মেজাজ নিয়ে।

রমা দানার ভাঁড়ারে এসে দেখলেন, মেয়েটী মুখ খুলেছে, সুন্দর দেখতে এবং তার সেপাই ঠাকুর্ঝির হাত ধরে তার চোখ থেকে জল পড়ছে। ঘরে একটা টীনের বাক্স, এক ঝুড়ি বাসন, একটা চট মোড়া বিছানা খুলে রাখা রয়েছে। ছেলেমেয়েগুলি তাতে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তরোয়ালখানি একদিকে রেখেছে।

সেপাইয়েরও চোখ শুকনো নেই। সে বলছে 'তুই ভাবিসনি, বাবুজীর বাড়ীতে তোর কোনো ভাবনা ভয় নেই। আর আমি তো আসা যাওয়া করবই। এখন যাই, দুষমনদের হাত থেকে আপনাদের জমী ক্ষেত কোঠি (কুয়া) বাঁচাই। এখন তো আর তোদের জন্য ভাবনা রইল না।'

সেপাই পিসি গৃহস্বামীর মেয়েকে দেখে হাতযোড় করলে। তারপর ভাইপো ভাইঝিদের একটু আদর করে বল্লে, 'কাঁদিসনি 'বিন্না' (বাছা), আমি খুব আসব।'

ভাজ আবার তার হাত ধরে বল্লে 'খুব শীগগীরই এসো বাইজী (ঠাকুর্ঝি)। ননদকে 'বাইজী' বলা হয় রাজস্থানে।

৩

ভাজের চাকরী সুরু হ'ল। কি কি কাজ করতে হবে, কখন কখন করবে—তালিম চলল রমার সঙ্গে। কি কি করবে না—তাও সে বল্লে। চাকরদের দিয়ে কাজ শেখানো চলবে না, গৃহকর্ত্তার আদেশ আছে। গৃহস্বামীর মেয়েই সব কাজ শেখাবেন ও করাবেন। কাজ করাতে গেলে একটা নাম বলে ডাকা চাইতো। কন্যা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম তোমার ?'

গলা অবধি ঘোমটা একটু কমিয়ে কপাল অবধি তুলে সে রমার সঙ্গে ঘুরছিল।

'আমার নাম ? আমার নামে কি হবে ? আমাকে ধনজী—ধনপাল সিংয়ের মা বলে ডেকো।'

'কেন, তোমার নিজের নাম বল না' ? কন্যা বল্লেন। 'ও যে বড্ড বড় নাম হ'ল।'

সাধারণতঃ রাজপুতের মেয়ের নাম ধরে সবাই ডাকতে পারে না। বাপের বাড়ীতে বলবে 'বাইজী' (কন্যা), শ্বশুরবাড়ীতে বলবে ভাবী ভৌজী বিন্দনী (বউ), পরে বলবে সন্তানের নাম ধরে তার মা। নিজের নাম সে তো খারাপ মেয়েদের থাকে! নামডাক তো তাদেরই নিজের নামে হয়! ভদ্রগৃহস্থ ঘরে আবার মেয়েমানুষের নাম ধরে ডাকে নাকি ? এতখানি প্রথার খবর জানা ছিল না মেয়ের।

ধনজীর মা একটু চুপ করে থেকে বল্লে, আমার নাম কমলবাই। কিন্তু আমার নাম ধরে ডাকলে তোমাদের সব চাকর দাসী আমার নাম জানতে পারবে। আর তারা নাম ধরে ডাকে যদি সে বড় অপমান আমাদের বংশের। নাম ধরে ভদ্রলোকের মেয়েকে ডাকে না আমাদের।

ঝিয়ের নাম আবার বাই! কন্যা শুনলেন নতুন কথা। ভাবলেন তাতো ভালো, তা 'তুমি' 'তোমাদের' বলে কথা কও কেন ? আপনি বলে কথা কওয়া উচিত তো পিসি তো বেশ আদব কায়দা মত কথা কইল দেখলাম।

'আচ্ছা। এসো ধনজীর মা, গম ওজন করে নিয়ে যাও। বাড়ীর জন্য তিন সের গম দিন পিষবে, তিন সের যবও পিষবে চাকরদের রুটির ও কুকুরের রুটির জন্য। এই রান্না ঘরটা ধোবে, শোবার ঘরগুলো ঝাঁট দেবে, আর মুছবে ইত্যাদি।' ঘোমটা থেকে এক চোখ বার করে রাজপুতের মেয়েদের মতই সে এঘর ওঘর ঘুরে কাজ দেখতে লাগল। গায়ের গহনা ঝলমল করতে লাগল। যেন রাণী। যেন কেউ পরিদর্শিকা। যেন চাকরী করতে আসেনি, বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে।

রমার মনে যেমন বিরক্তি জাগে, তেমনি কৌতুক বোধ হয় ওর ধরণ রকমে। কিন্তু পিতার আদেশ, কাজ ওকেই দেখাতে হবে।

ঘরের পরিষ্কারের কাজ শেষ হলে ধনজীর মা দৈনিক পেষবার জন্য গম আর যব নিয়ে নিজের ঘরে এলো। ঘরের মস্ত ভারী যাঁতা বা 'চাক্কি'র পাশে সে সব নামাল। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি কোথায় রুটী করব, কখন করব? আমার ছেলেমেয়েরা কখন খাবে।'

রমা হেসে ফেল্ল, 'তুমি এইখানে রুটী করতে চাও, কোরো। না হয় রান্না ঘরের উনুন খালি হলে রুটী করে নিও। ওরা তখন খাবে। পাথর দিয়ে উনুন করে নাও না? আদেশ পালনে, দাসী বৃত্তিতে অনভ্যস্ত রাজপুতের মেয়ের মন যেন দাসীত্বের জীবন মানতে চায় না। হুকুম স্বীকার করতে রাজী নয়। কোঁচকানো ভ্রূর নীচে কালো চোখে আগুন না জল? ঝকঝক করে ওঠে। জল কি?

আহা! রমা কোমলভাবে বলে, আমি তোমায় তরকারী ডাল দিতে বলে যাচ্ছি। রুটী করো আগেই। আমাদের রান্না ঘরের তরকারী সবাই পায় তুমিও নিও। রুটী করে নাও, নিয়ে তারপর ওদের খাওয়া দাওয়া হলে আটা পিষো। আমাদের তো রাত্রে রুটীর দরকার।

কিন্তু এত গহনা পরে কাজ করবে কি করে, ভারী লাগবে না? ওগুলোর সব মিলিয়ে ওজন তো ৫।৭ সের হবে।'

এবারে গহনার কথায় নারী কোমল ভাবে বল্লে, 'বাইজী, অনেক গহনা গেছে—স্বামীর অসুখে নানা বিপদে। এখন তো মাত্র এই কটাই আছে। কোথায় রাখব, চোরে নেবে কি কে নেবে তাই ননদ বল্লে—পরেই থাক্। আজকে বাক্সতে তুলে রাখব।'

৪

কিন্তু ঝিকে দিয়ে কাজ করানো সোজা, ও যেন ঝি নয়—রাণী। রাণীর মত মেজাজওয়ালা কোনো ঘরের গৃহিণীকে দিয়ে কি কাজ করানো চলে।

তার পর্দ্দা চাই—তার ছেলেমেয়ের নিয়মমত—রক্ষণাবেক্ষণ চাই, খাদ্য চাই তাদের সুনিয়মে, তার বাড়ীর কর্ত্রী ভাবের ধরণটা যায় না। কিছু আদেশ করলেই ভ্রূ কুঁচকে আদেশকারিণীর দিকে চায়। তারপর আবার নরম হয়ে যায়। দ্বিধাদ্বন্দ্বের শেষ নেই তার মনেও, বাড়ীর লোকের মনেও। বেশ বিবেচনার বিষয় যেন। আর বিপদ আসে কোনো না কোনো পথে।

একদিন রাত্রে বাড়ীতে জল্পনা হ'ল বেশ রাত্রে সকলে ছেলেমেয়েরা মিলে কাছাকাছি এক আত্মীয়ের বাড়ী হেঁটে বেড়াতে যাওয়া হবে পিছনের গেট দিয়ে। কেন না সামনের দিকে গেটে বহু লোকজন, ঘোর পর্দ্দার দেশ, সকলে দেখতে পাবে। হাঁটা চলার প্রথা তখন এখনকার মত চল ছিল না।

কন্যা এলেন, ধন্‌জীর মার ঘরে। সে ছেলেমেয়েদের শুইয়ে কাঁথা সেলাই করছে তেলের কুপীটার পাশে বসে। আমাদের দেশের দিশী কাঁথা নয়—ও দেশী কাঁথা।

কন্যা বল্লেন, 'ধনজীর মা—আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি, আসতে রাত্রি ১১টা হবে, তুমি একটু আমার ছেলেমেয়েদের ঘরে বসবে? নাহলে কাঁদবে বা জাগলে মুস্কিল হবে।

ধনজীর মা আশ্চর্য্যভাবে মনিব দুহিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যাবে রাত্রে তার ঘর ছেড়ে! সন্তানদের ছেড়ে! মনিবের মেয়ের আক্কেলটা কি! এই যেন ভাবটা।

উত্তরের অপেক্ষায় রমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বল্লেন, 'তাহলে এসো, আমি যাচ্ছি কাপড় বদলাতে'।

সে বল্লে, 'আর আমার ছেলেমেয়েরা একলা থাকবে এখানে?'

বিব্রত রমা বললেন, 'ওরা তো ঘুমিয়েছে, এক আধবার না হয় দেখে যেও।'

সে বল্লে, 'তোমার ছেলেমেয়ে যদি একলা থাকতে না পারে, তাহলে আমার ছেলেমেয়েও পারবে না।'

একটী একটী করে সেকেণ্ড ও মিনিট তার হাতের কাঁথার ছুঁচের ফোঁড় বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কেটে যেতে লাগল। রমা দাঁড়িয়ে নীরবে চেয়ে আছেন, সেও নিঃশব্দে সেলাই করে চলেছে। বেশ বোঝা গেল সে উঠবে না। সেই মনিব কি বাড়ীর লোকেরা মনিব তার ব্যবহারে বোঝা গেল না।

পরদিন কন্যা পিতার আহারের সময় বল্লেন, ধনজীর মার উদ্ধত বাক্য ও স্পর্দ্ধিত মেজাজের কথা।

গৃহিণীও বিরক্ত ভাবে বল্লেন, 'যদি রাত বিরেতে দরকার পড়লে কোনো কাজে না লাগে, তাহলে ও নবাব-নন্দিনী ঝি রেখে আমাদের কি উপকার॥ কাজ করতে এসে অত রাণী গিরির মেজাজ দেখালে চলে না।'

কর্ত্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।—

তিনি একটু হাসলেন। 'কি বলেছে? তোমার ছেলেমেয়ে যদি একলা থাকতে না পারে, আমার ছেলেমেয়েও একলা থাকতে পারবে না? খাঁটী রাজপুতের ঘরের মেয়ে সিংহীর বাচ্চা যে। দারোগা নয়—(সঙ্কর) আসল সিংহীর রক্ত শরীরে রয়েছে।—সিংহীর বাচ্চার মতই কথা বল্‌চে তো। তোমরা রাগ করলে হবে কেন?

ওকি আর ঝিয়ের মত ভয় পাবে, না কথা শুনবে? এত রাত্রে ওর ছেলেমেয়েকে একলা রাখ্‌তে তাই চায় নি। কর্ত্তার কথায় গৃহিণী ও কন্যা আশ্চর্য্য হলেন। কিছু রহস্য আছে নাকি ভিতরে? মৃদু হেসে গৃহিণী বল্লেন, 'এ যে প্রায় পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের গল্প দেখছি।

তাহলে একটী—দ্রৌপদীর আগমন হয়েছে নাকি বাড়ীতে?'

কর্ত্তা অট্ট হেসে বল্লেন—'প্রায় তাই। কীচকবধ না হলেই ভালো। ভীম নেই বটে, পঞ্চপাণ্ডবও নেই। কিন্তু যে সেপাই ঠাকুর্ঝি আছে সে সব পারে।—ও তোমাদের সব হুকুম না মানলেও কিছু বোলো না।

আগেতো কখনো চাকরী করেনি, চাকরী ব্যাপারটা কি ভাল করে জানে না।—

৫

তবু ঘাত সংঘাতে দিন আসে যায়—।

সেপাই ঠাকুর্ঝি মাঝে মাঝে আসে ভাজের ভাইপোদের কাছে। ভাইপোটী আর একটী জায়গায় বালক ভৃত্যের কাজ করে।

বাড়ীর ভৃত্য দাসদাসীরাও তাঁর নাম দিয়েছে সিপাহী বাইজী। সকালে গৃহস্বামীর দাঁতনের মুখ ধোবার আসরে সে এসে নিজের মামলা বৈষয়িক ব্যাপারের কথা বলে যায়, জানিয়ে যায়—।

ধনজীর মার মেজাজ আর পর্দ্দা দুই একটু কমে গেছে। —বাঙালী বাড়ীর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। মান সম্ভ্রম যাবার ভয়, পুরুষকে ভয়-আতঙ্ক আর যেন নেই। চাকরী জীবনও কিছুটা আয়ত্ত করে নিয়েছে।

হেন কালে সহসা একদিন সকালবেলা গেটের বাইরে —কম্পাউণ্ড বা 'বাড়ীর' বাইরে—একটী পুরাতন রথ এলো। যেমন মহাভারতের রথের ছবি দেখা যায়—ঠিক তেমনি দেখতে—শুধু ঘোড়ায় টানা নয়—বলীবর্দ্দ বাহিত জীর্ণ বিবর্ণ ঘেরা টোপ ঢাকা একটী রথ এসে দাঁড়াল। এবং পিসি বা ঠাকুর্ঝি রথ থেকে নামল।—

দ্বারবান—ভৃত্যবর্গ আজ সহসা সেপাই ঠাকুরাণীকে ঘেরা টোপ পরা পর্দ্দানসীন রথ থেকে নামতে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এতদিন যাতায়াতে আর তাদের তাকে ভয় সমীহ ছিল না। দু-একজন এগিয়ে এল। কৌতুকভরে একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'বাইজী আজ একি ব্যাপার, পর্দ্দানসীন সেজেছ?'

সেপাই বাইজী শুধু হাসলে, কিছু বল্লে না।

তারপর—গৃহস্বামীর মুখ ধোবার প্রাঙ্গণের দিকে এলো। আজ আর হাতযোড় করে নমস্কার বা সেলাম 'বন্দেগী' নয়, মাথা মাটীতে ঠেকিয়ে 'ঢোক' (প্রণাম) জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন।

সে বল্লে, আপনার কৃপায় আজ আমার পিতৃবংশের সম্পত্তি ও সম্মান উদ্ধার করতে ও রাখতে পেরেছি। ভাইবৌকে আর তার কাছে রাখতাম? তার ইজ্জত মান কে রাখত আপনার বাড়ীর মত করে।—তাকে নিয়ে ঘুরলে আবার বিষয় উদ্ধারও হ'ত না। আজ আপনার

শরণ নিয়ে সব ফিরে পেয়েছে এরা। এখন তাদের নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার—হুকুম নিতে এসেছি। আপনার হুকুম হলে তাদের নিয়ে চলে যাই।'

সেপাই পিসিমার আর পুরুষোচিত সেই দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারা নেই, রোগা হয়ে গেছে অনেক। চেহারাও কোমল হয়ে গেছে। ফিরে পাওয়া সম্পদ ও সম্মান তার মনকেও নরম করে দিয়েছে যেন। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে এলো।

গৃহস্বামী খুশী মনে জিজ্ঞাসা করলেন 'সব ফিরে পেয়েছ? সম্পত্তি জমীজমা?'

নারী বল্লে—হাঁ প্রায় সবই পেয়েছি। তবে ক্ষেত-খামার গরু মহিষ খাইয়ে নষ্ট করে দিয়েছে অনেক। ঘাসের গুদামে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করেছে। তবু মামলায় তাদেরই হার হয়েছে। আমরা আমাদের 'বাপোতা' (রাজস্থানে পৈত্রিক বিষয়ের নাম) ফিরে পেয়েছি।

নারী ভিতরে এলো, গৃহিণীকেও আজ প্রণাম জানাল। বল্লে 'মাজী, আপনার বাড়ীতে এত পুরুষের মাঝেও আমার ভাইয়ের বৌয়ের জন্ত ভয় ছিল না।······অন্য জায়গায় আমি এত নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম না। আপনার কাছে ওরা সন্তানের মত ছিল। আজ—আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবার হুকুম দিন।'

ধনজীর মা—উঠান ধোবার ঝাঁটা ফেলে ননদকে জড়িয়ে ধরল। তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তারপর আবার ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘর ধুয়ে কাজ সেরে নিয়ে স্নান সেরে—রঙীণ নতুন ঘাগরা, জরী দেওয়া ওড়না, সূক্ষ্ম কাঁচুলীর উপর হাতওয়ালা জামা পরে ছেলেমেয়েদের জরীর জামা পাগড়ী পাজামা পরিয়ে সাজিয়ে এনে গৃহিণীকে প্রণাম করল। অন্য সকলকে নমস্কার করল। যে চাকরদের সঙ্গে কথা কইত না, রান্না ঘরের যে ব্রাহ্মণের কাছে ডাল তরকারী নিত, আজ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে সজল চোখে সকলের কাছেই বিদায় নিল করযোড়ে। কাপড় চোপড় গহনায় বিনীত নম্রতায় তাকে অভিজন-দুহিতা বধূর মতই মনে হচ্ছিল আজ। কুল:পরিচয় আজ তার, ঔদ্ধত্যের অর্থ বহন করে এনেছে।

অন্তঃপুরের ভৃত্য মহলে সাড়া পড়ে গেল ধনজীর মার জমীদারীর কথা, গহনার কথা, জমীদারীর আয়ের কথা। তার নিজের ঘরের রথ এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। সে পর্দ্দানসীন ঠক্‌রাণী ('ঠাকুরাণী' 'ঠাকুর' অর্থে জমীদার) ছিল, বিপদে পড়ে ঝাঁটা 'ন্যাতা' হাতে ধরেছে। চাকরী করে মাহিনা নিয়েছে একহাতে করে, চোখ মুচেছে অন্য হাতে।

জমীদারী? জমীদারীর আয়? মুখে মুখে প্রশ্নে উত্তরে জমীদারীর আয় সম্পদ সমারোহের কাহিনী শত থেকে সহস্রের অঙ্কে বেড়ে যেতে লাগল।

কেউ বলে ওদের জায়গীরের জমীদারীর আয় দু'হাজার। অন্যজন বলে পাঁচহাজার, কেউ বলে আরো বেশী।—সন্দিগ্ধ সঙ্কীর্ণমন লোকেরা চুপ করে থাকে, বিশ্বাস হয় না, তাদের ভালোও লাগে না। তারা বলে বাজে কথা, একেবারেই চাষা। জমীদার না আরো কিছু!

সে যতই হোক বা যাই হোক, ধনজীর মাতার সেপাই ঠাকুর্ঝি আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছেলের হাতে তরোয়ালখানি দিয়ে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে বাড়ীর বর্হিপ্রাঙ্গণের সীমানার বাইরের পথে গিয়ে পূর্ব্বপুরুষের রথের ওপর উঠে বসল। একদা মনিব—সেই মনিব বাড়ীতে রথে ওঠা তাঁদের অসম্মান প্রকাশ করে যদি।

গ্রামে যেতে বেলা অপরাহ্নে ঢলে পড়ল। রথ পিছনে জল্পনাপরায়ণ মানুষ রেখে আনন্দিত বালক শিশু, জননী—পিতৃস্বসাকে নিয়ে চলে। ক্রমে সহরের পথ ছেড়ে গ্রামের বালিভরা ধূসর পথ ধরল। আর খানিক দূরেই তাদের এলাকা সীমানা পড়চে। বাতাসে আন্দোলিত লীলায়িত ভুট্টা বাজরা যবের ক্ষেতের আভাস সীমানা যেন চোখের সামনে ভেসে আসছে ঐ দূর দিগন্তের ক্ষেত্র সীমান্তে?

রথের জালির জানলা দিয়ে ধনজীর মা ও পিসিমা পিতৃ পুরুষের পদধ্বনি পবিত্র স্মৃতিপূত গ্রামের ক্ষেত খামার দেখতে দেখতে চলে। নষ্ট করেছে ক্ষেত? ঘাসের গোলায় আগুন দিয়ে দিয়েছিল? ক্ষতি করেছে অনেক?

কিন্তু কই? সে ক্ষতির ক্ষত মনে আর দাগ কাটতে পারছে না। কোথায় ক্ষত? কোথায় ক্ষতি? তারা চিরকালের তাদের মাটীর, তাদের মৃন্ময়ী, জননীর কোলে ফিরে এসেছে। যেন মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছে—ফণী-মনসার বেড়া দেওয়া উঁচু মাটীর দেওয়াল বেষ্টিত তাদের মৃন্ময়ী অট্টালিকাখানি। কত যুগযুগান্তের জন্মমৃত্যু বিবাহ উৎসব শোকের স্মৃতি ভরা আছে যেখানে।

(৭)

ভেরনাগ

বলেছি বানিহালের কর্কশ বন্ধুরতার কথা, তার ভয়াবহতার কথা। কিন্তু সে ওপারে হিন্দুস্থানের পিঠে। এপারে একেবারে আলাদা ব্যাপার। নামার পথে দেখি অপূর্ব দৃশ্য। যেদিকে তাকাই মনে হয় কেয়ারি-করা বাগানের সার। বহু বহু নীচে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল এই চৌকো রমণীয় ক্ষেত। বানিহালের বন্ধুর কর্কশ ধূলিধূসর সর্পিল কুণ্ডলি থেকে পরিত্রাণ পেয়েই এই সজল সরস দৃশ্য যেন চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দেয়।

আর চারধারে গোল হয়ে আছে পাহাড়ের সারি। যেন কোন সব দিগ্‌বধূরা সবুজ ঘাঘরা পরে মাথায় দধিভাণ্ড নিয়ে অনাদি অনন্তকালের রাসনৃত্য করে চলেছে। উপমাটা আমার নয়। রাজতরঙ্গিনীর কথা :

ইত্থং বিলঙ্ঘিতাধ্বা সঃ লোলালোকহ শাদ্বলম্
মাঙ্গল্যদধিপাত্রাভং দদর্শাগ্রে হিমাচলং

গিরিপথ অতিক্রম করে (যখন সে শিখরে দাঁড়ালো) সামনে দেখলো হিমালয় তার মাথায় রাখা আছে মাঙ্গল্য দধিপাত্রগুলি (তুষারমণ্ডিত শিখরগুলি) আর শ্যামল পল্লবদল, মনোরম বাতাসে সেগুলো দুলছে। (যেন নতুন অতিথিকে স্বাগতাভিনন্দন জানাচ্ছে যেন বরণডালা সাজিয়ে আছে)।

ছেলেরা অস্থির "গল্প বলুন।"

ভের বলে ছোট একটা গ্রাম আছে শাহাবাদ পরগণায়। এ থেকে নাম হয়েছে ভেরনাগ। কিন্তু ভেরনাগ কতো প্রাচীন জানো, প্রায় ভগীরথের মতো প্রাচীন। জানো তো গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার গৌরব বাঙ্গালী ভগীরথের ?

"বাঙ্গালী ? ভগীরথ বাঙ্গালী কেন ?" সবাই চেঁচিয়ে ওঠে।

আমি হেসে বলি, ছিঃ ছিঃ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে কি এতোটা আত্মপ্রকাশ করতে আছে ? বাঙ্গালীর নামে তো প্রাদেশিকতার কলঙ্ক এপার ওপার ছোপ মারা। তোমরা তো বাঙ্গালী নও। ও কলঙ্ক তোমাদের সইবে না। তোমরা যে নিষ্কলঙ্ক চাঁদ। ভগীরথ নয় নাই হোলো, কিন্তু কে তিনি ? কোথাকার লোক ?"

"কেন ? হস্তিনাপুরের, ব্রহ্মাবর্ত্তের!!"

অর্থাৎ যে সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে সগর-তনয়রা প্রাণ দিলে সেই সগর রাজার একজনই স্ত্রী ছিলেন বা সব কজন স্ত্রীই একজায়গা থেকে এসেছিলেন, অর্থাৎ বভ্রুবাহন যদিও মণিপুর রাজকন্যার পুত্র, তবুও সে মণিপুরী নয়, ব্রহ্মাবর্ত্তের কোনও "সিংজী !"

"এর সঙ্গে আমাদের কথার সঙ্গতি কোথায় ?"

"স্পষ্ট ! সগর রাজার সূর্য্যবংশে দিলীপ রাজা। তাঁর স্ত্রী সুদক্ষিণার ছেলে রঘু। কিন্তু আরেক রাণীর ছেলে তো হ'তে পারে এই ভগীরথ ? তার মামারা আর্য্য নয়। গরুড়ের বংশের। মার কাছে শোনে পিতৃলোকের দুর্গতির কথা। এখনকার বাংলা দেশও ছিল না, বাঙ্গালীও ছিল না। ছিল বঙ্গোপসাগর। আর তার তটভূমি রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকার কথা। সুতরাং তখনকার বঙ্গে ভগীরথ থাকতেও পারতেন ! এই সগর রাজা থেকেই তো সাগরের নাম। এই সাগরতীরে ভগীরথের শৈশবকাল কাটে। তাঁর মাথায় আসে গঙ্গার উৎস সন্ধানের কথা, হিমালয়ে ঘুরে ঘুরে গোকর্ণ তীর্থে গিয়ে এর হদিস্ পেয়ে তিনি আবিষ্কার করেন গঙ্গার উৎপত্তি। যাক্ তিনি বাঙ্গালী কিনা ঝগড়া আর-আর পণ্ডিতরা করুন। এখন অন্য এক ঝগড়ার কথা পাড়ি।

"গঙ্গাকে তো জানো, পার্বতী চিরকাল সতীন বলে একটু ঈর্ষ্যা করেছেন। শিবেরও এ নিয়ে খোঁটা শোনার অন্ত নেই। পার্বতীর সখ হোলো তিনিও নদীরূপে ধরায় অবতীর্ণা হবেন, আর গঙ্গার মতো খ্যাতি লাভ করবেন। ফ্যাসাদে পড়লেন, ছুতো পান কি করে। তাছাড়া ঐ দিগম্বর ত্রিশূলধারীকে নৈলেও তো চলবে না। শিবের জটার ছোঁয়া পেয়েই তো গঙ্গার এতো কৌলীন্য। এ কৌলীন্য তিনিই বা পান কোথা থেকে।

"হঠাৎ শুনলেন মরীচির ছেলে কশ্যপ কোথায় গিয়ে এক অপ্সরার সঙ্গে কি এক গোল বাধিয়ে নীল নামক এক ছেলেকে পাহাড়ের এক গুহায় রেখে এসেছেন। কশ্যপের ছেলে যে সে লোক নয়। অনেক জাতি, যাকে আমরা অনার্য্য বা এবরিজিনীস্ বলি—এই শ্রীমান কশ্যপের গোলমালের ফল। এই নীলও এমনি একটা বংশের ছেলে বলে নাম করলেন, যার নাম হোল নাগবংশ। তক্ষক নাগের নাম শুনেছো তো ? অনেকে মনে করেন ওরা নাকি মধ্যএশিয়ার কোনও জাত। তক্ষশিলা এই তক্ষজাতির প্রতিষ্ঠিত কিনা কে জানে ? আবার কর্কোট নাগের বংশ কাশ্মীরে রাজত্ব করেছে। সে কথা পরে বলবো।

"এখন শোনো নীলনাগের কথা। বেচারী একটা গুহায় বসে জপতপ আরাধনা করছে। তার উদ্দেশ্য পার্বতীর দর্শন পাওয়া। এতো বড় একটা দেশ বিনা জলে মরে যাচ্ছে। নীল এখানে জল আনবেন। বংশের লোকের পরলোকের জন্য নয়, জগৎজনের ইহলোকের জন্য।

পার্বতী তো এইটাই চাইছিলেন। তিনি নদীরূপে নামার কথা শিবকে জানালেন। শিব তো শিব। পার্বতীর শ্রেয়নাপনা জানার তো বাকী নেই কিছু। মুচকী একটু হেসে বল্লেন, "আচ্ছা চলো এগিয়ে আমি আসছি।"

পার্বতী ভাবলেন—"ওঃ ডাকলাম বলে শুনোর। চল্লাম আমি একাই।"

এলেন তো কলকল শব্দ করতে করতে। কিন্তু পাহাড় আর ভেদ করতে পারেন না! নীলনাগ তখন শঙ্করের স্তুতি আরম্ভ করলেন। এখন তো আর হিংসুটে গিন্নীর কথা নয়; ভক্তের ডাক। গিরিশ এলেন ত্রিশূল নিয়ে। পাহাড়ে মারলেন একটা ত্রিশূলের খোঁচা। গল্ গল্ করে বেরিয়ে এলো জল। তীর্থ হয়ে গেল জায়গাটা। নাম দিল শূলঘাট। গুহ ছিল কার্তিকের এক নাম। গুহা থেকে জল পড়ছে। এই দুটো নামের সামঞ্জস্য দেখে কলহন পণ্ডিত চমৎকার একটা কথা বলেছেন। পার্বতী বিতস্তারূপে পৃথিবীতে এসেও তাঁর মাতৃভাবের কথা ভোলেন নি, তাই গুহামুখে স্তন্যদান করে অন্নমুখে বেরিয়ে এসেছেন অর্থাৎ গুহা থেকে বেরিয়ে শুঁড়ের মতো জলধারা নিঃসারিত করছেন।

বেনু বললে "শ্লোকটা বলুন না।"

"সংস্কৃত বুঝবে?"

গুপ্তাজী বললে, "বলুন না। ধ্বনি তো বুঝবো। আর গল্পটাকে ইতিহাস কেন বললেন বলুন।

"উদ্বৈতস্তনিষ্যন্দ দণ্ডকুণ্ডাতপত্রিণা
যৎসর্ব নাগাধীশেন নীলেন পরিপাল্যতে
গুহোম্মুখী নাগমুখা পীতভুরি পয়াকচিম্
গৌরী যত্র বিতস্তাত্বং যাতাপ্যুঝতি নোচিতাম্"

চমৎকার, গৌরী বিতস্তা রূপ ধারণ করা সত্ত্বেও মাতৃরূপ ত্যাগ করা উচিৎ মনে করেন নি। এ ধাক্কাটা মারা হোলো গঙ্গাকে। গঙ্গার সন্তান হোলো পৃথিবীতে এসে, মানুষের সহবাসে। ফলে নিজের দেবীত্ব রাখতে গিয়ে মাতৃত্ব ভুললেন। পুত্রহত্যা করলেন এবং পুত্রত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এতো কাণ্ড গঙ্গার। কিন্তু গৌরীর তা নয়। সে যেন চিরকালের মা। পরমাতৃকা।"

"ইতিহাস বলুন না শুনি!"

"তোমরা কেমন লোক বলতো? সোজা কথা বুঝতে চাওনা। নীল-পুরাণের গল্প। পুরাণগুলো ইতিহাসের আকর। যেন্না নিয়ে পড়লে পাবে সব তারিখের কচকচি। যেমন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। নীল নামক নাগ বংশের রাজা বল, নেতা বল, জলাভাব দূর করার জন্য কোথাও একটা 'Bore' করতে চান—জলের জন্য পাথর খুঁড়তে চান। ইঞ্জিনিয়র যা করে। বহুকাল জলের জন্য তপস্যা করেন এই ভাবে। অবশেষে এখানে এসে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেন। জলখোঁজার তপস্যা শেষ হোলো। এখন আরম্ভ হোলো ত্রিশূলের তপস্যা—অর্থাৎ শিবের তপস্যা। বুঝতেই পারছো এবার সত্যিকার boringএর কাজ আরম্ভ হোলো, পাহাড় ছেঁদা করে জলের উৎস বার করা। শুনেছি শূলঘাটের তীর্থ দেখলে এমনি একটা ছেদা করা গুহার কথা মনে হোতো যার মধ্য দিয়ে জল পড়ছে। পরে নীলের দেখা দেখি অনেক কাশ্মীরী বহুস্থানে পাহাড়ে ছ্যাঁদা করে জলের ধারা বার করেছে যার ফল নিশাতে, শালামারে, শাহিবাগে পাবে।"

"ভেরনাগ আর কত দেরী?"

বাস এবার ডানদিকে বেঁকলো। বাঁ ধারের পথ শ্রীনগর গেছে। যেখান থেকে বেঁকলো নাম মুণ্ডা, লোয়ার মুণ্ডা। খানিক ওপরে আপার মুণ্ডা পার হয়ে এসেছি। ডান ধারে মাইল সতেরো গেলে ভেরনাগ। ভেরনাগ থেকে শ্রীনগর পঞ্চাশ মাইল। বরাবর মোটর পথ, ডাকবাংলা রেষ্টহাউস আছে।

এসে বাস দাঁড়ালো ভাঙ্গাচোরা একটা দেয়ালের পাশে। লম্বা সেকেলে মুসলমানী দেয়াল।—মাটীতে নেমে শরীর যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এ সত্যি সত্যিই মাটী। দিল্লির মাটীও নয়, বানিহালের বা কুর্দের মাটীও নয়। নরম তুলোর মতো, মায়ের আদরের মতো, বাংলাদেশের মমতার মতো মাটী। এখানে নারকেল গাছ আর সুপুরি গাছ দেখলে বিস্মিত হতাম না। আর বাতাসের কি পালকবোলানো স্পর্শ। হিমালয়ের শিখরে পাইনের বাতাস কেমন যেন স্বাস্থ্য-ভরা বাতাসের পাবলিসিটি দিয়ে বইতো। এখানে এ বাতাস যেন আদরের, যত্নের, মমতার বাতাস। মৃদু উত্তাপ আছে।

আর আছে সরলদ্রুম—সরলগাছ—plane tree বা চিনার। চিনার না দেখলে চিনারের ছায়া বোঝা যায় না। ছাতিম গাছের ছায়ার মতো ঘন ছায়া, বটগাছের বেড়ের মতো বেড়, দেবদারু বা ইউকালিপটাসের খাড়াইয়ের মতো খাড়াই। ইংরাজীতে এ গাছকে stately বলা চলে।

কাশ্মীরের বিখ্যাত একটা মসজিদ বারবার নানাকারণে ভেঙ্গে গিয়েও বারবার তাকে গড়া হয়েছে। একবার আওরঙ্গজেবের সময় মসজিদটায় বাজ পড়ে ভেঙ্গে যায়। খবর যখন বাদশার কাছে গেল, আওরঙ্গজেব শুনেই বললেন,—"মসজিদটা ভেঙ্গেছে? আহা হা—চিনার গাছ দুটো আছে তো?"

মৌলবীর শ্রদ্ধা ছিল আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামীর ওপর। তার মুখে হেন কাফের সুলভ কথা শুনে মৌলবী তো চটে লাল! "আচ্ছা শাহানশা, মসজিদ গুঁড়িয়ে গেল শোক হোলোনা, আপনার আতঙ্ক হোলো দুটো গাছের জন্য?

আওরঙ্গজেব উত্তর দিলেন,—"দেখ বাপু মসজিদ ভেঙ্গে গেছে, একটা কেন দশটা গড়িয়ে দিচ্ছি, দিতে পারি। কিন্তু আমার সমগ্র রাজত্ব দিয়েও অমন বিরাট দুটো চিনার গাছ আমি গড়াতে পারি না। যাকে সম্মান দেওয়া উচিত তাকে সম্মান না দিতে পারলে মহৎ হৃদয় কষ্ট পায়।

দারার হত্যাকারীর মুখেও এ কথা শুনে মনে তৃপ্তি হয়। চীনার প্রীতি এমন প্রীতি, চীনার গাছ এমনি গাছ। এর গান আছে রাজ-তরঙ্গিনীতে: "সরলস্কন্দ সুভগাঃ।"

একটা চীনারের তলায় এসে দাঁড়ালাম। প্রকাণ্ড গাছ, বিরাট ছায়া। সঙ্গে সঙ্গে আলখাল্লা পরিহিত, মাথায় পাগ্‌ড়ী দুই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ

এসে হাজির ; মাথায় তিলক কাটা। "তীর্থস্থান এটা ; ব্রাহ্মণকে কিছু দিন !

আছে ; ধর্মের ব্যবসায়ও আছে ; ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য ও আছে ; ভিক্ষাও আছে। আর আছে এই জাতীয় উঞ্ছবৃত্তিদের অজ্ঞতা। অথচ এই কাশ্মীরে ব্রাহ্মণের কী প্রতাপই ছিল এককালে।

"কেন তীর্থস্থান ? কী তীর্থ ?" ইচ্ছা করে জিজ্ঞাসা করলাম।

"ভীরনাগ ! বিতস্তা তীর্থ।"

"মন্দির কই ? দেবতা কই ?"

ভেরনাগ—বিতস্তার উৎস

ভেরনাগ—স্বচ্ছ জল

এবার ওরা আমাদের নিয়ে গেল —কোন একটা সৌধের মতো—একটা বড় কুয়াকে মোটা দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখলে যেমন আকারের হয় তেমনি দেখতে। কুয়ার চারিধারে আট কোণ দেয়ালে ঘুপচি ঘুচি ঘর মতো। তাতে তাক আছে। বহু পুরাতন। সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। কুয়া, কুয়া বলছিলাম। এ কুয়ার জল গভীর নয়। কুয়ার জল কিনারা অবধি এলে যেমনটা দেখতে হয় তেমনি। আর স্থিরজল। কিন্তু অদ্ভুত এর রং। যেন তুঁতে গোলা চকচকে জল। নীচে মাছের দল ঘুরছে, দেখা যাচ্ছে। প্রথম প্রথম বিশ্বাস হচ্ছিল না সত্যি সত্যি জলেরই এই রং। কুয়ার দেয়ালে হয়তো রং করা তারই প্রতিচ্ছায়া। ইত্যাদি কতো থিয়োরী করি, একে একে সব ধূলিসাৎ হয়ে যায়। প্রমাণ হয় যে জলের রংটা স্বাভাবিক রং। ও রং থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

"……জাহাঙ্গীর……শাজ হা ন …ব্রহ্মা…শঙ্কর মহাদেব…বিতস্তার …ভাসাভাসি এমনি কথা কানে আসছে। পাণ্ডা বলে চলেছে। সেদিকে কোন মন নেই ! সমস্ত চিত্ত পড়ে আছে এই স্বচ্ছ, প্রেমের মতো স্বচ্ছ জলের দিকে।

কী আ শ্চ র্য ! এ তো শা ন্ত জলের রূপ। অথচ এই জল গল্‌গল্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছে যে নালীপথ দিয়ে সেই নালী পথে পা দিয়ে দাঁড়ায় কার সাধ,—
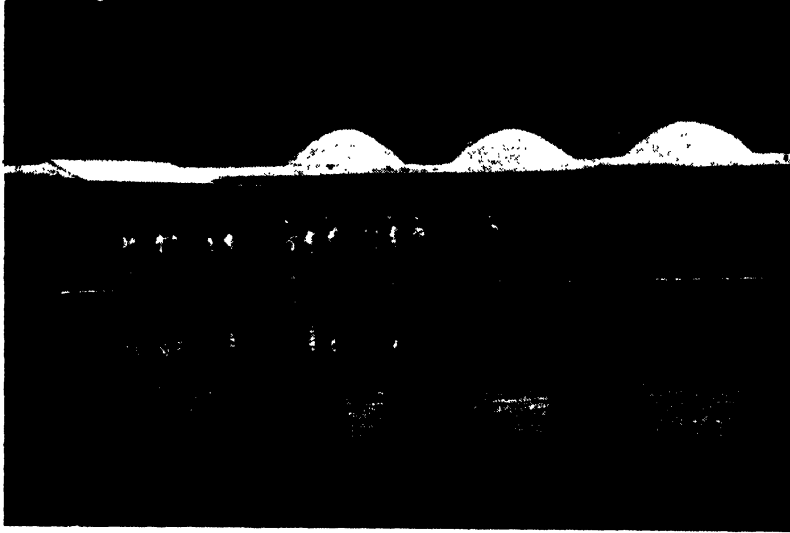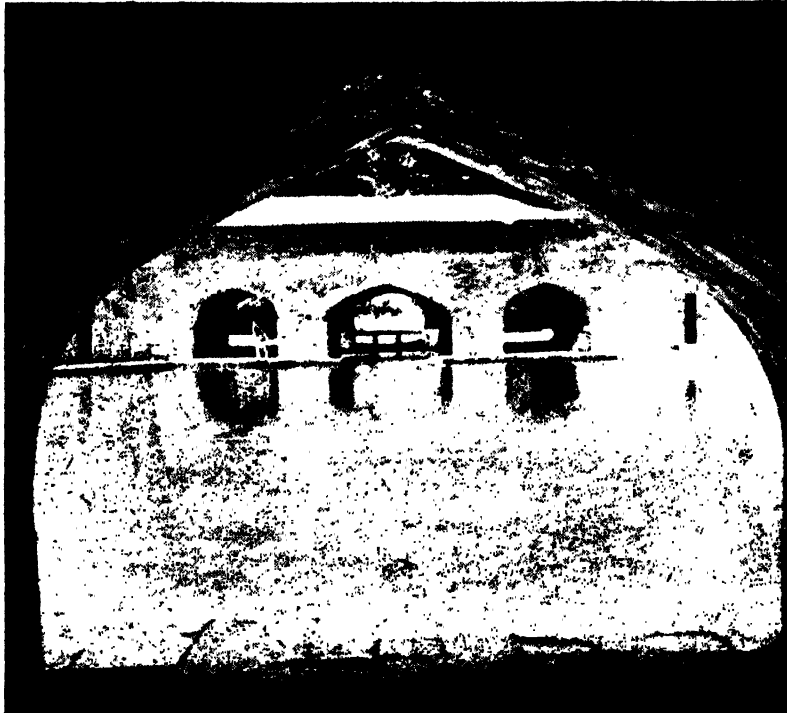
যদিচ সেই নালীতে জলের গভীরতা দুই থেকে আড়াইফুটের বেশী হবে না।

এই সব দেয়াল, এই ঘেরা জলের আধার—এতো জাহাঙ্গীরের করা। পরে শাজাহান একে পুরো করেন। বাইরে পাহাড়ের কোলে আছে চমৎকার মসজিদ। এই মসজিদ থেকে আরও কিছু দূরে গেলে গ্রামের মধ্যে এই ঝরণার মূল পাওয়া যাবে আর পাওয়া যাবে, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই মন্দিরের কাছে রাজা হর্ষকে হত্যা করা হয় তার ছেলের সঙ্গে। সেই হোলো শূলঘাট তীর্থ, পার্বতী যার দেবী, শঙ্কর যার দেবতা। এটা আসল নীলনাগ নয়, শূলঘাটও নয়, ঝিলমের উৎসও নয়। এটা মসজিদ সংলগ্ন পান্থশালা, 'বারদরি' বলা যায়। এই ইমারতের ছাদে জাহাঙ্গীরের কতো জলসা বসেছে, নূরজাহানের কতো বিলাস যামিনী কেটেছে। সামনে চমৎকার বাগান। ফলের বাগান, চেরীর বাগান। তার মধ্যে নহরের পর নহর। কেটে কেটে যেন কার্পেটের আঁচল করে রেখেছে। সবই মোগলদের বিলাসিতার দান।

"জানেন এ জল কত গভীর?" জিজ্ঞাসা করি পাণ্ডাকে।

অন্তহীন্! বল্লেন পাণ্ডা।

এমনই বলে নৈনীতালের হ্রদের গভীরতার কথা। ভেরনাগ সম্বন্ধেও এই প্রসিদ্ধি আছে। জাহাঙ্গীর কিন্তু বিশ্বাস করেননি। তিনি মুঠোয় করে পোস্তদানার একটা ধারা নামিয়ে দেন জলে। নীলের মধ্যে শাদার সেই ধারা নামতে লাগলো। জাহাঙ্গীর দেখতে লাগলেন। তলায় গিয়ে দানা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি দেখলেন। এতো পরিষ্কার জল। পরে পাথরের টুকরোয় সুতো বেঁধে তিনি মাপলেন দেড়মানুষ জল। জাহাঙ্গীর নামায় এসব ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

আমরা এসে একটা নহরের পাশে বসে আমাদের আনা খাবারের বস্তা খুললাম। যেন গলা দিয়ে নামতে চায়না এমন অদ্ভুত খাদ্য। অগত্যা চেরীর বাগানে ঢুকে পয়সা দিয়ে চেরী খাওয়া। আট আনা সের খাও বা আট আনা দিয়ে যত ইচ্ছে খাও। গাছ থেকে পাকা চেরী তুলে তুলে খাওয়ার আনন্দে সকলে আত্মহারা। জলের ধারা চিরে চিরে বাগান খানা পরিপাটি সাজানো।

মনোরমা আর বেণু এখন একধারে কেবল সরে যাচ্ছে। অসিত পেয়েছে পরহিতার ব্রত। দু চারটী মেয়ে জল পেরুতে পারছে না। জলের ওপর দিয়ে এক ফালি কাঠ এপার ওপার পাতা। ভরসা করে পার হতে পারছে না। অসিত তাদের হাত ধরে ধরে পার করে দিচ্ছে। আবার কেউ বলছে 'প্লী-ঈ-জ্—এই আমরা দাঁড়াচ্ছি; এই আমাদের ক্যামেরা! একটু দাঁড়িয়ে খুট করে একটা শট্ নিন্ না।' এই সব কাজের কাজেও ব্যস্ত। গুপ্তাজী, বিহারীলালজী আর আমি একধারে। জগজীবন কয়েকটী ছেলেকে নিয়ে চেরী বাগানের মালিকের সঙ্গে জলাভে বেচার অর্থনৈতিক উপকারিতা সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতে ব্যস্ত।

দু-তিনখানা বাস আরও এসে গেল। বিহারীলালজী বললেন "এতো দের সুন্দর পুরুষগুলো; অথচ কেমন একটা মেয়েলীভাব। আবার বা গাউনের মতো পোষাক পরে বাহার আরো খুলেছে।"

আগেকার কাশ্মীরীরা এ পোষাক পরতো না। তখন পরতো ধুতির ওপর কোমর অবধি বেঁধে পরার জামা, উষ্ণীষ এবং উত্তরীয়। শ্রমিকরা পরতো কোমর অবধি ঝোলানো জামার তলায় পায় জড়ানো ফিতের ওপর ফোলা ফোলা হাঁটু-অবধি পাজামা। আকবর এদের পৌরুষকে ব্যর্থ করার ফিকিরে এদের পরিয়ে দিলেন মেয়েলী পোষাক। কাশ্মীরের ছেলেমেয়ে একই পোষাক পরে প্রায়। এক কোপে তামাম কাশ্মীরী-মরদ হয়ে গেল আওরৎ। প্রথম পোষাকে, তারপর বহুশত বৎসরের দাসত্ব আর মনোভাবে, এখন বীর্য্যে এবং আচরণে। কাশ্মীরের মর্য্যাদা এখন আর এই সব ব্রাহ্মণদের ওপর নেই, আছে সত্যিকার কাশ্মীরীদের ওপর। তারা জাগছে।

শুনে ওরা জিজ্ঞাসা করে, আকবর? তিনি এমন করলেন কেন? তিনি তো খুব ভাল লোক ছিলেন বলেই শুনতে পাই।

"তা ভালো হলে কি রসিক হতে নেই? তাঁর হাতে কাশ্মীরের শাসন আসার কালে কাশ্মীরী সাধারণের চরিত্র মেয়েদের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেতো! এই বিবেচনা করে পোষাকও তিনি এক করে দিলেন। কাশ্মীরকে তিনি ভালবাসতে পারেন নি। কাশ্মীর ছিলো আকবরের চোখে মজার জায়গা। জাহাঙ্গীরের চোখে মৌজের জায়গা। জানেন তো ভেরনাগ থেকে লাহোর ফেরার পথে রাজপুরী—বর্ত্তমান রাজৌরীর নিকটে চিঙ্গস্ নামক এক গ্রামেই জাহাঙ্গীর মারা যান। মরবার সময়ে বলে যান যেন তাঁকে এই ভেরনাগে সমাহিত করা হয়।"

বিহারীলালজী বললেন "তবে জাহাঙ্গীরের সমাধি লাহোরে কেন?"

"তা জানেন না? নুরজাহান তো যে সে মহিলা ছিলেন না। মদ খেয়ে সোয়ামী তো পটল তুললেন। তখন খুররম আর মহাবৎ খাঁর তেল শুকায় নি। যদি লাহোর পৌঁছবার আগে প্রকাশ পেয়ে যায় যে জাহাঙ্গীর মরজগতে আর নেই, কাশ্মীর থেকে শ্রীমতীকে আর নামতে হবে না। কাজেই চেপে গেলেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যু। পথ দিয়ে বাদশার হাতী যায়; লোকে কুর্ণিশ করছে। প্রচার করা হোলো সম্রাট পীড়িত। তাই হাতী থেকে নামছেন না। হাওদায় বসে বসেই হাত তুলে তুলে সকলের অভিনন্দন নিচ্ছেন। ঝানু মেয়ে নুরজাহান হিটলারের অনেক আগে "ডবল্" রাখার উপকারিতা সম্বন্ধে টন্‌টনে জ্ঞান রাখতেন। একজন এমনি লোককে হাওদার মধ্যে লুকিয়ে রেখে তার হাত জাহাঙ্গীরের হাত বলে চালিয়ে কোনও মতে লাহোরে পৌঁছালেন। সেখানেও দু'একদিন রেখে তারপর যখন সবদিক সামলে নিলেন, তখন প্রচার করলেন যে তিনি মারা গেছেন। এ কয়দিনে দেহের অবস্থা যা হয়েছিল তাতে আবার ভেরনাগে নিয়ে যেতে হলে খালি হাড় কখানাই পৌঁছোতো। কাজেই মনের বাসনা মনে চেপে সতী-নুরজাহান স্বামীকে লাহোরেই সমাহিত করলেন। কিন্তু চলুন ফেরা যাক্।

হঠাৎ অসিত চেঁচিয়ে উঠেছে ইমারতের মধ্য থেকে। "দাদা লেখা, লেখা। প্রত্নতত্ত্ব ইন্স্ক্রিপ্শান—দেখবেন আসুন।"

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে যাই। ভেরনাগের মধ্যে জলের ধারে দেয়ালে পর পর দুটী শিলালিপি। ফার্সিতে লেখা—

"অজ জহাঁগীর শা ঈ অকবরশা
ইন্ বিনা সর কসিদা বর্ অফলাক্
বণি-এ-অকল্ য়্যাফ্ত তারিখাশ্
কসর্ অবদ্ ও চশ্মা-ই-ভরনাগ্।"

[দেখ দেখ, আকাশ লক্ষ্য করে এই অট্টালিকা উঠেছে আকবর পুত্র জহাঁগীরের অনুগ্রহে। লেখক বুদ্ধি বলে এর সনতারিখ লিখে গেল। ভেরনাগ প্রস্রবনের বাড়বাড়ন্ত হোক্।]

অন্যটায় লেখা :—

"হয়দর ব হুকুম শাহজহাঁ পাদশাহী দহর্
শুক্র এ খুদা কি সখত্ জুনিন্ অবসর্ জুই
ইন্ জুই দাদা অস্ত্ জী জুয়ে বহিস্তয়াদ্
জিন্ অবসর্ য়াফ্তা, কাশ্মীর অব্ রুই
তারীখ ই জুই গফ্ত বা গোশম্ সয়োষ ই গ্যয়ং
অজ্ চশ্মা ই বিহিস্ত বিরুন্ অমাদস্ত্ জুই॥"

[ভগবানের জয় হোক্, ধন্যবাদ তাঁকে। সামান্য হায়দার অসামান্য এই ঝর্ণা তৈরীর কাজে বাদশাহ সাজাহানের কথায় নিযুক্ত হোলো। স্বর্গের ঝর্ণার সমতুল এই ঝর্ণা যে শিল্প দিয়ে সাজানো হোলো, কাশ্মীরের পক্ষে হয়ে রইলো তা গৌরব। এই ঝর্ণা তৈরীর তারিখ বলে গেলো কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমার কাণে কাণে—'এই ঝর্ণা স্বর্গের জল বয়ে আনছে।"]

পড়লাম কবিতা দুটো। অর্থও বুঝে নিলাম ওখানকার মৌলবীটীকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু দ্বন্দ ঘুচলো না। তারিখ 'তারিখ, করে সব চেঁচালো, কৈ 'তারিখ' তো বললো না!

"কিছু বুঝলেন মশায়?" জিজ্ঞাসা করলাম বিহারীলালকে।

বিহারীলাল বললে—"হেঁয়ালী বোধ হচ্ছে। শিলালিপি, তারিখ নেই, অথচ বলছে তারিখ বলে গেছে কাণে কাণে। বুঝলাম না।"

যাক বাসে উঠে চললাম শ্রীনগর। আবার চলা, আবার চলা। পথের কথা এখন ওঠে না। এই পথেই আমরা এসেছি। চড়তে চড়তে সেই বানিহাল—শ্রীনগর পথে এলাম। এবার পথের পাশে পাশে গাছ আর গাছ। সবই পপ্লার। শাদা শাদা সরু সরু গাছ সোজা উঠে গেছে। ওপরের দিকে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতায় ভরতি গাছগুলো দুলছে। সাদা বাকলের গায়ে খয়েরি ডোরা ডোরা কাটা। ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে। বাঁ পাশ দিয়ে জলের ধারা বইছে।

মনে তখন ঐ তারিখের কথা। তপে অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম ফার্সী পদ্ধতিতে তারিখ লেখার এই কায়দাকে বলা হয় 'অবজদ্।' এই প্রথায় প্রতি অক্ষরে এক একটী গাণিতিক সংখ্যার পরিচায়ক। এখন এই সংখ্যা রচনার উপায়ে যদি কোনও কবি অর্থদ্যোতক কোনও পংক্তি রচনা করতে পারে, সে বড় কবি বলে পরিগণিত হবে। অবজদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় হুমায়ুনের মৃত্যুর তারিখ লেখায়। লেখা হোলো "হুমায়ুন অজবাম্ উফ্তাদ্' অর্থাৎ "হুমায়ুন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।"—এই ঐতিহাসিক সত্যটী লেখা হোলো এমন অক্ষর সমন্বয়ে যার ফলে হিজরি ৯৬২।৬৩ সনটী প্রকাশিত। হায়দার আলির কবরে প্রসিদ্ধ অব্জদ্ লেখা আছে—

কিহ ইন্ শাহ আশুদা রা চিস্ত্ নাম?
চিহ তারিখ্ রহ্লত্ নমুদা অস্ত উ?
য়কী জান্ মিঞা গুফ্ত্ তারীখ ওয়্হ্ নাম?
কীহ্ হয়দর আলি খাঁ বহাদুর বিগু।

[কোন মহিমময় সম্রাটের শোকে আজ এই বিলাপ? কবে মারা গেলেন তিনি? কে একজন ভীড়ের মধ্য থেকে উত্তর দিল একই সাথে নাম আর তারিখ—"হায়দার আলি খান্ বাহাদুর।"] অবজদের নিয়মে 'হয়দার আলিখান্ বাহাদুর' মানে হিসেবে দাঁড়ায় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ। এমনি সেই শিলালিপির সন ১৬২৬।২৭ খৃষ্টাব্দ।

এমনি মনের বোঝা। একটা বোঝা চাপলে অন্য কোনও কথা মনে থাকে না। এই দুর্লক্ষণ যখন পেয়ে বসে বেণু তখন হাসে। বিহারীলালজীকে বলে, "এখন আর আপনার কথায় মন নেই। দাদা ভাবছে ঐ তারিখ। শুনছো না বিহারীলালজী কি বলছেন?"

হেসে বলি, "কি?"

"এরপর কি আসছে?" কোনও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কিছু?

শ্রীনগরের পথে। সে আসবে এক অভিনব চমৎকার জিনিষ: এক অভিনব চমৎকার যুগের। যে যুগের কাশ্মীরের নামে উত্তরাপথে গান গাইতো লোকে "কাশ্মীরাগুরুবাসিতা ত্রিলহরী "এই যুগের কাশ্মীর। কিন্তু বাস্ তো সেখানে দাঁড়াবে না।

"না দাঁড়াক গল্প শুনবো।"

"শুধু গল্প কেন? যেতে যেতে কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেক বেশী দেখা যেতে পারবে মনে। অবন্তীপুরের কথা। যেখানে অবন্তীস্বামীর মন্দির। এই অবন্তীস্বামী বিশ্বের এক আশ্চর্য ছিল।"

"ধ্বংস করলো কে? মুসলমান না তিব্বতী?"

"ওরা কেউ নয়। সব অসৎ সন্দেহ ওদের প্রতি করাও আমাদের একটা বদ ধারণা।" একটা বিরাট মহৎ বীর জাতি যখন অধঃপতিত হয় তারা আপন ভাবেই আপনি নষ্ট হয়। পাপ ভরে ওঠে, অনাচার ভরে ওঠে। তাদের নারী হয় প্রথম নষ্ট, তারপর বংশ। বিরাট রোম সাম্রাজ্য এমনি পথেই গিয়েছে। এ মন্দিরও মুসলমান নয়, তীব্বতী নয়, হিন্দু কাশ্মীরী রাজা নিজে ধ্বংস করেছে। সে ইতিহাস করুণ, বিস্ময়কর।"

বাস্ চলতে লাগলো। জল, আকাশ, পপ্লার, এ্যাশ্, এল্ম্, চার্চ সারি সারি। নরম মাটীর ওপর দিয়ে পথ।

গান গাইতে গাইতে চলেছি—"নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে।"

কাজীগুন্দ্ পার হয়ে গেলাম।

ক্রমশঃ

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ্ ওয়ার্কস

শ্রীবলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু সাহিত্য-বিনোদ

সেদিন ছিল ২৭শে অক্টবর (৫৬)। আমরা দু'জন চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা দেখার জন্যে রওনা হ'লাম। রোদের মধ্যে বারো মাইল পথ পেরিয়ে বাঁদিকে হিন্দুস্থান কেবলস্ কারখানা দেখতে দেখতে আমরা চিত্তরঞ্জনের ৩নং গেটে এসে পৌঁছলাম। পূর্ব থেকে যোগাযোগ না করলে যে প্রবেশ করা যায় না তা আমার অজ্ঞাত ছিল। কেবলমাত্র ওখানকার একজন অফিসারের নামের চিঠি আমার কাছে ছিল—তাও আবার শোনা গেল যে তিনি বদ্‌লি হ'য়ে গেছেন। তখন আমি দ্বাররক্ষার ভারপ্রাপ্ত সান্ত্রীকে বললাম —দেখুন মশায়, অনেক কষ্ট ক'রে নবদ্বীপ থেকে এসেছি। আমি একজন শিক্ষক। এত পথ কষ্ট ক'রে এসে প্রবেশাধিকার না পেলে মনটা একেবারে ভেঙে যাবে। তখন "সিকিউরিটি অফিসে" ফোন ক'রে মৌখিক প্রবেশাধিকার লাভ করা গেল। জানা গেল ওয়ার্কসপে প্রবেশ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। অথচ ওয়ার্কসপ না দেখে কেবল চিত্তরঞ্জন শহরটা দেখার কোন মানে হয় না।

আমরা ৩নং গেটের সুদৃশ্য তোরণের মধ্য দিয়ে শহরে প্রবেশ ক'রে রূপনারায়ণপুর রোড ধরে এগিয়ে চল্‌লাম। সোজা কিছুক্ষণ এগিয়ে গিয়ে আর একটি মনোরম তোরণ পাওয়া গেল। তোরণের দুটি স্তম্ভ অশোকচক্রলাঞ্ছিত, আর বোধহয় দর্শকবৃন্দকে অভিনন্দিত করবার জন্যে "স্বাগতম্" লেখা আছে। তোরণ পেরিয়েই সামনে "চিল্‌ড্রেন্স পার্ক"। অতি সুন্দর এই পার্কটি। এটা আমলাদহি সার্কেলের মধ্যে অবস্থিত। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট মিহিজাম পাহাড়। তার উপরে দর্শনার্থীদের বাসোপযোগী সুন্দর সুন্দর ঘর রয়েছে। এরপরে আমরা সোজা য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ্ বিল্ডিংয়ে গিয়ে বহুকষ্টে ওয়ার্কসপের প্রবেশাধিকার লাভ করলাম শুধু গুডউইলের দ্বারা। য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ্ বিল্ডিংটা যেমন দেখতে সুন্দর, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দ্বিতলের সিঁড়ির পাশেই শোভা পাচ্ছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মর্মর মূর্তি। এখান থেকেই প্রত্যেক দর্শককে এক একখানি পুস্তিকা দেওয়া হল। তারপর আমরা দু'জন ওয়ার্কসপের প্রবেশ পথে এসে হাজির হ'লাম। এদিন ছিল শনিবার এবং পৌণে এগারোটা বেজে গিয়েছিল ব'লে কর্মীদের ছুটী হ'য়ে গেল। দেখলাম সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অগণিত জনস্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল কারখানা থেকে। বিরামবিহীন সে আসার যেন আর শেষ নেই। হাজার হাজার কর্মীকে সাইকেল ক'রে বেরুতে দেখলাম, বাদ বাকী সব পদাতিকের দল। শুন্‌লাম—সাত হাজার কমী কারখানায় কাজ করেন। কাজের সময় সকাল ৬½টা থেকে বেলা ১১½টা এবং ১২টা ৪৫ মিঃ থেকে বেলা ৪½টা পর্য্যন্ত। শনিবারে কাজের সময় সকাল ৬½টা থেকে বেলা ১০টা ৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত, আর রবিবারটা ছুটী।

আমরা কুড়ি একুশজন দর্শনার্থী বেলা ১২টার সময় ওয়ার্কসপে প্রবেশ ক'রলাম। আমাদের সঙ্গে দু'জন ব্যাখ্যাকারী ছিলেন। তাই ঠিক হ'ল গোটা দলটা দুইভাগে ভাগ হ'য়ে দু'জন ব্যাখ্যাকারীর সঙ্গে ওয়ার্কসপ দেখবেন। আমাদের দলে ব্যাখ্যাকারী বাদে দর্শক সংখ্যা ছিল আটজন, আমরা দিব্য আরামে ধীরে ধীরে সপগুলো দেখলাম। মোট আটটি ওয়ার্কসপের মধ্যে আমরা ৫।৬টি ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আরগুলো ছিল ষ্টোরসপ। সপগুলো দেখার সময় সিনেমায় প্রদর্শিত ছবিগুলোর কথা মনে পড়েছিল। একখানা ইঞ্জিনের মধ্যে যে ছোট বড় কত রকমের অংশ আছে তার আর ইয়ত্তা নেই। ওয়ার্কসপ দেখে মনে হ'ল বিশ্বকর্মার মহান্ কর্মশালা। ইঞ্জিনের প্রায় প্রতিটি অংশই এখানে ঢালাই করে তৈরী করা হয়। নানা বিভাগ র'য়েছে। কোথাও বড় বড়, আবার কোথাও ছোট ছোট জিনিষ তৈরী হ'চ্ছে। তন্মধ্যে বয়লার সিলিণ্ডার, টেণ্ডার, চাকা প্রভৃতি তৈরীর কৌশলগুলো দর্শনযোগ্য। ব্যাখ্যাকারী আমাদের ব'ললেন—কারখানায় কেবলমাত্র একটি জিনিষ তৈরী হয় না—সেটি হ'ল "চেসিস্"—অর্থাৎ যার উপর বয়লার ও টেণ্ডার প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। ওটা তৈরী করা কিছুই নয় —তবে এটাও শীঘ্র এখানে তৈরী হবে। যাই হোক এই সামান্য অভাবটার কথা বাদ দিলে চিত্তরঞ্জনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে।

ভারতে একটি রেলইঞ্জিন তৈরীর কারখানার প্রয়োজনীয়তার কথা বহুদিন থেকেই চিন্তা করা হ'চ্ছিল, কিন্তু নানাকারণে তা বহুদিন সম্ভব হয় নি। অবশেষে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন কারখানার বর্তমান স্থান নির্বাচিত হয়। এবং ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৫০ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে শ্রদ্ধেয় দেশবরেণ্য নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী কর্ম-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তার আগেই চিত্তরঞ্জন শহর ও কারখানা-গুলো নির্মিত হয়েছিল। কর্মীদের বাসের সুযোগ সুবিধার জন্যে পাঁচ হাজারের অধিক বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়। গ্রাম পরিবেষ্টিত সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে শহরটা দেখতে অতীব মনোরম। শহরটা ৭ বর্গমাইল স্থানজুড়ে গড়ে উঠেছে আর গড়তে খরচ প'ড়েছে ৬'৮ কোটি টাকা। এখানকার শ্রমিকের সংখ্যা ৭০০০ এবং মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫০০০ এর কম নয়। প্রত্যেকটা বাড়ীই বিদ্যুৎশক্তিযুক্ত, পরিস্রুত জল পাওয়া যায় তাছাড়া স্যানিটারী পায়খানা প্রভৃতি সর্বপ্রকার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুখসুবিধার ব্যবস্থা আছে। গোটা শহরটাকে কয়েকটি কলোনীতে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক কলোনীতেই ভিন্ন ভিন্ন বাজার, স্কুল, পার্ক, ডিসপেন্সারী, খেলার মাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে।

একজন বিশিষ্ট দর্শক যথার্থই শহরটিকে আখ্যা দিয়েছিলেন—"A poetry in cement and steel"।

চিত্তরঞ্জনের সব কিছু অত্যাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত হ'চ্ছে এবং প্রতিটি যন্ত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মোটরের ব্যবস্থা আছে। প্রথম প্রথম বছরে ১০০ কুড়িটা লোকোমোটিভও পঞ্চাশটা স্পেয়ার বয়লার উৎপাদন করার পরিকল্পনা গৃহীত হ'য়েছিল কিন্তু ক্রমেই তা বেড়ে চ'লেছে। একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, ১০০ খানি ডব্লিউ-জি-লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন তৈরী ক'রতে প্রায় ৭,৪০০টন ষ্টীল সেকশন, ২৩০০ টন ষ্টীল কাষ্টিং, ১৫০০ টন আইরণ কাষ্টিং ২৫০ টন বয়লার টিউব এবং ১৫০ টন ওজনের রবার, কাঠ প্রভৃতির ছোট বড় জিনিসের দরকার হয়। এছাড়া ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেণ্ট, রোলার বিয়ারিং, প্রসার ও ভ্যাকুয়াম গজ, য়্যাস্‌বেসটস্, ল্যাগিং, ফ্যাব্রিক লাইনিং প্রভৃতির কাজ র'য়েছে।

ডব্লিউ-জি শ্রেণীর ইঞ্জিনগুলোর খালি অবস্থায় ওজন ১২৩টন আর মালপূর্ণ অবস্থায় ওজন ১৭৩টন। এর মধ্যে অন্ততঃ ছোট বড় ৫৩৩৩টা অংশ আছে। এখানকার উৎপাদন শক্তি ক্রমেই বেড়ে চ'লেছে। প্রথম ইঞ্জিনখানির নির্মাণকার্য ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে সম্পূর্ণ হ'য়েছিল এবং সেটাকে আকারে বেশ বড় করা হ'য়েছিল। এই ইঞ্জিনখানি প্রদর্শনী ট্রেণের সঙ্গে নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রেছিল, কল্যাণী কংগ্রেসেও একে দেখা গিয়েছিল। এই ১লা নভেম্বর তারিখেই ইঞ্জিনখানি চালানো হ'য়েছিল এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই তারিখেই নামকরণ উৎসবের উদ্বোধন ক'রেছিলেন। এখানকার উৎপাদন শক্তি ক্রমবর্ধমান। উহা এইরূপ:—১৯৫০-৫১ সালে ৭টা, ১৯৫১-৫২ সালে ১৭টা ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৩টা, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬৪টা, ১৯৫৪-৫৫ সালে ৯৮টা অর্থাৎ উৎপাদন হার দ্রুত বেড়ে চ'লেছে। বর্তমানে মাসে ১৪টা অর্থাৎ বছরে ১৬৮টা ইঞ্জিন তৈরী হ'চ্ছে। আজ পর্যন্ত মোট ৪০০ খানি ইঞ্জিন লাইনে বের হ'য়ে গেছে। ওয়ার্কসপে নতুন কর্মীদের কাজের সুবিধার জন্যে এখানে ট্রেণিং সেণ্টার খোলা হয়েছে। যার ফলে কাজের খুব সুবিধা হ'চ্ছে এবং দিন দিন শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চ'লেছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫১ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখে শ্রী এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার মহোদয় য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মর্মর মূর্তির উদ্বোধন করেন এবং এখানে নির্মিত পঞ্চদশতম ইঞ্জিনখানি ১৯৫৩ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে রেলওয়ে শতবার্ষিকী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। ১৯৫৪ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে রেলওয়ে মন্ত্রী—শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী মহোদয় চিত্তরঞ্জনে নির্মিত শততম ইঞ্জিনখানিকে চালনা করেন। এর নামকরণ করা হয় "চিত্তরঞ্জন—১০০"। ১৯৫৫ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই কারখানায় তৈরী দ্বিশততম ইঞ্জিনখানি আনুষ্ঠানিক ভাবে চালনা করেন। চিত্তরঞ্জন থেকে প্রস্তুত ইঞ্জিনগুলো এ পর্যন্ত যে সমস্ত রেলপথসমূহে চালু হয়েছে সেখান থেকে ভাল ভাল মন্তব্যই করা হয়েছে।

এখানে তৈরী ইঞ্জিনগুলো ২-৮-২ চাকাব্যবস্থা সংযুক্ত এবং এগুলোতে অতি নিম্নস্তরের কয়লা পুড়িয়ে ভাল কাজ পাওয়া যায়। এই ইঞ্জিনগুলোর গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৫ মাইলের কম নয়। টেণ্ডারগুলোতে প্রচুর পরিমাণ কয়লা ও জল রাখার ব্যবস্থা থাকার ফলে অতি দূর পথে যাতায়াত করতেও কোন অসুবিধা হয় না। রোলার বিয়ারিং একশন বক্সগুলো ইঞ্জিন ও টেণ্ডারের ক্যারিং হুইলের সঙ্গে সংযুক্ত। তুলনামূলকভাবে সকল দিক বিবেচনা ক'রে দেখলে ইঞ্জিনগুলোর দামও খুব বেশী বলা যায় না। তবে ক্রমশঃই দাম কমে যাচ্ছে। কলোনীর সামাজিক জীবনের ক্রমোন্নতি হ'চ্ছে।

চিত্তরঞ্জন শহরের নক্‌সা

(১) ওয়ার্কসপ।
(২) য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিস।
(৩) কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতাল।
(৪) টেক্‌নিক্যাল স্কুল।
(৫) বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়।
(৬) বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়।
(৭) বাসন্তী ইন্‌স্‌টিটিউট।
(৮) ওভ্যাল প্লে গ্রাউণ্ড।
(৯) ফিণ্টার হাউস্।
(১০) মিহিজাম পাহাড়।
(১১) শ্রীলতা ইন্‌স্‌টিউট।
(১২) সিউয়েজ ডিস্‌পোজাল প্লাণ্ট।

দর্শকদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো হ'লো—(১) ওয়ার্কসপে সকাল ৬½টা থেকে বেলা ১১½টা এবং বেলা ১২টা ৪৫ মিঃ থেকে বিকেল ৪½টা পর্যন্ত কাজ চলে, শনিবার কাজের সময় সকাল ৬½টা থেকে বেলা ১০টা ৪৫ মিঃ পর্যন্ত আর রবিবারে থাকে বন্ধ। দর্শকসাধারণের জন্যে বৃহস্পতিবারটাই প্রশস্ত দিন—তবে মহিলা ও ১৮ বছরের কমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্যে রবিবার নির্ধারিত। (২) এখানে দুটি স্থানে থাকবার ব্যবস্থা আছে। শহর ও ওয়ার্কসপ দেখতে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। ট্রেণে সুবিধামত চিত্তরঞ্জন পৌঁছানোর সুব্যবস্থা আছে। (৩) চিত্তরঞ্জন একটি সংরক্ষিত স্থান। সেজন্যে এখানে প্রবেশ ক'রতে পূর্বথেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ না ক'রলে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। এখানে একটি পাবলিক বাস সার্ভিস আছে। রেলওয়ে স্টেশন থেকে কলোনীগুলোর মধ্যে সেটা যাতায়াত করে।

চিত্তরঞ্জন হাউস ও মিহিজাম হাউস নামে চিত্তরঞ্জনে দুটি বিরামকেন্দ্র আছে। চিত্তরঞ্জন হাউসটি মিহিজাম হাউস অপেক্ষা বড়। উভয় হাউসই রেল স্টেশনের নিকটবর্তী। পূর্ব থেকেও বিরামকেন্দ্রগুলোতে স্থান সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু তার জন্যে টাউন এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। দর্শনীয় বস্তুগুলোর মধ্যে গণপতি চালাঘর, কটি ওয়ার্কসপ, দুটি ইন্সটিটিউট, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, প্রশান্ত

প্যাভিলিয়ম, দেশবন্ধু বিদ্যালয়, লেক, সিউয়েজ ডিস্পোজাল প্ল্যান্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্কসপগুলো ৮,৮০,০৫০ বর্গফুট স্থানে ১.৮৩ কোটি টাকা খরচে গ'ড়ে উঠেছে। বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র প্রায় ৯৮৫ রকমের মেশিনারী ও প্ল্যান্ট আছে। প্রধান য়্যাসেম্বলী সপটাই সর্ববৃহৎ এবং সেটা এশিয়ার বৃহৎ সপগুলির মধ্যে অন্যতম। গণপতি চালাঘরটি প্রথম প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এম্ গণপতি মহোদয় নির্মিত প্রথম চালাঘর। দুটি ইন্সটিটিউটের মধ্যে একটির নাম বাসন্তী ইন্সটিটিউট এবং অপরটির নাম শ্রীলতা ইন্সটিটিউট। এই দুটি ইন্সটিটিউটই শহরের জনগণের বিরামকেন্দ্র। এখানে সুসজ্জিত পাঠাগার, পড়িবার ঘর, নানাবিধ খেলাধুলার ব্যবস্থা, সাঁতারের ব্যবস্থা, ব্যায়ামাগার, অডিটোরিয়াম, সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি সকলপ্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে। টেক্‌নিক্যাল স্কুলটিতে ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। মিহিজাম পাহাড়ের উপরের প্যাভিলিয়মটা প্রশান্ত প্যাভিলিয়ম নামে খ্যাত। দেশবন্ধু বিদ্যালয় ব'লতে দুটি উচ্চ বিদ্যালয়কে বুঝায়—একটি মেয়েদের, অপরটি ছেলেদের। ১০১ একর জায়গা জুড়ে এখানে একটি লেকও র'য়েছে। অন্যান্য আমোদপ্রমোদের কেন্দ্রগুলোর মধ্যে চিত্তরঞ্জন টেনিস ক্লাব, চিত্তরঞ্জন গোল্‌ফ ক্লাব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এখানকার টেলিফোন ব্যবস্থাও খুব সুন্দর। আভ্যন্তরীণ টেলিফোন ব্যবস্থা ছাড়াও স্থানীয় ডাকঘর থেকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনেরও ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য এখানে গ'ড়ে উঠেছে কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতাল এবং হাসপাতালটিকে অতি আধুনিকভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এখানকার বৈদ্যুতিকশক্তি সরবরাহ করছে দামোদর ভ্যালী করপোরেসন। যাই হোক্ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এখানে যে বিরাট কর্মকেন্দ্র দেখলাম তাতে আমার মন আশায় ভরপুর হ'য়ে গেল। আমাদের দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে রেল ইঞ্জিন তৈরী হ'চ্ছে আমাদেরই কর্মীদের দ্বারা—একথা চিন্তা ক'রে কি যে বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ লাভ ক'রলাম তা বর্ণনাতীত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিকে বহন ক'রে চ'লেছে যে চিত্তরঞ্জন তার গৌরবগাথা উত্তরোত্তর বর্ধিত হ'য়ে দেশবন্ধুর স্মৃতিকে করুক উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর—এই আমার কামনা।

হাটের রাজা—সেওড়াফুলি

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

হুগলীর এই গঙ্গার তীর জুড়িয়া বিগত শতাব্দীতে একটি বিশালকায় বন্দর ছিল। তাই গঙ্গার তীরে ইউরোপীয় বণিকদল বাণিজ্যের জন্য কুটীর স্থাপন করিয়াছিল। এই কুটীরের মাধ্যমে তাঁহারা এদেশ হইতে অর্থ সম্পদ নিজ নিজ দেশে পাঠাইতেন। ইংরাজের ভাগ্যের পরিবর্তন ভাগীরথীর এই কূলেই হইয়াছিল। গত দিনের বণিক সম্প্রদায়ের স্মৃতিচিহ্ন আজও চুচুড়া, হুগলী, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

সেওড়াফুলিও গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত একটি ছোট বন্দর বিশেষ, মহানগরী কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ১৪ মাইল। এ অংশে রেলপথ, গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডও গঙ্গার দূরত্ব অতি অল্প। এই কারণে সেওড়াফুলির হাট ব্যবসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে W. W. Hunter তাহার Imperial Gazetter of India পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—"Baidyabati Municipality and important market town on the Hughli river, Hughli District, Bengal and a station on the East Indian Railway, 15 miles from Calcutta, Lat, 2247, Lon. 88''22' 20'E Pop. (1872) 13,332, comprising 12,206 Hindus and 1126 Mohammadans. Municipal income in 1876-77. £681. Rate of municipal taxation 11½d per head of population within Municipal limits."

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদ্যবাটী ও সেওড়াফুলি নামক দুইটী পল্লীকে একত্র করিয়া বৈদ্যবাটী পৌরসভা গঠিত হইয়াছে, পৌর এলাকার মধ্যে দুইটি রেলষ্টেশন ও দুইটি পোষ্ট-অফিসও আছে। বৈদ্যবাটী পৌর-এলাকা চার ভাগে বিভক্ত; এক একটি ভাগকে বলা হয় ওয়ার্ড। সেওড়াফুলি হাটটি ২নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং উহাদের ট্যাক্স আদায়ের সুবিধার জন্য ২নং ওয়ার্ডের ২নংএ এবং ২নংবি' ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ২নং ওয়ার্ড হইতে পৌরসভা সর্বাপেক্ষা অধিক কর-আদায় করে। জনবসতির দিক হইতেও ২নং ওয়ার্ড বাকি তিন ওয়ার্ডকে হার মানায়। প্রাচীকালে বৈদ্যবাটীতে নিমাইতীর্থ ঘাটকে কেন্দ্র করিয়া হাট বসিত। এ অঞ্চলের উল্লেখ অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সেওড়াফুলির রাজবংশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেওড়াফুলি হাটের গৌরব বৃদ্ধি পায়। আর ভদ্রেশ্বরের গঞ্জ, বৈদ্যবাটীর হাটের গৌরব সূর্য্য অস্তমিত হয়। সেওড়াফুলি হাটের খ্যাতিকে ম্লান করিয়া দিবার জন্য একধারে হরগৌরীর হাট আর অন্যধারে ছাতুগঞ্জের হাট স্থাপিত হয়, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হরগৌরীর হাট ও ছাতুগঞ্জের হাট লোপ পায়। ছাতুগঞ্জের হাটের পক্ষে গোস্বামী বংশের স্বর্গীয় নন্দলাল গোস্বামী এবং সেওড়াফুলির রাজবংশের শেষ রাজা স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র রায়

মহাশয়ের মধ্যে হাটের ব্যাপার লইয়া বিবাদ দেখা দেয়। বিবাদে রাজা গিরীশচন্দ্র রায় জয়লাভ করেন, আর চাতুগঞ্জ হাটের খ্যাতি হারাইয়া সেওড়াফুলির হাটের পার্শ্বে ব্যাস-কাশীর মত ব্যথার দিন কাটাইতেছে।

ইহাই হইল সেওড়াফুলি হাটের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা। সেওড়াফুলির গঙ্গা তীরেই জীবন চাঞ্চল্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ণ রাস্তায় গো-গাড়ি, বিরাট বিরাট লরীর সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে মানুষ। পুলিশ এই গোলমালের মধ্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছে না—পল্লী অঞ্চলের নরনারীদের বিভ্রান্ত করিয়া দেয়, পাটের আড়তের সামনেও বেশ সরগরম—আড়তদারের গলা ভাসিয়া আসিতেছে—রামরাম অথবা চার বস্তা ৫ মণ দশ সের। অদূরে পাট-বাঁধনদারেরা পাট বাঁধিতে বাঁধিতে নিজেদের মধ্যে রসালাপ করিতেছে। বাতাসে পাটের ফেশো উড়িতেছে। সন্ধানী লোকাল সেলারেরা আড়তে আড়তে ঘুরিয়া

সপ্তাহে দুইদিন করিয়া হাট বসে—পাড়াগাঁ হইতে তরীতরকারী, কলা প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়া থাকে, আর কলিকাতাও অন্যান্য অঞ্চল হইতে ক্রয় করিবার জন্য বহু ক্রেতা আসিয়া থাকে। ক্রেতা-বিক্রেতা, দালাল, ফোড়ে প্রভৃতিদের কথা কাটাকাটিতে বাজার সরগরম থাকে। সেওড়াফুলি সব সময়ই গুলজার থাকে।

নিস্তারিণী কালী মন্দিরের নাট-মন্দির-এ (১২৩৪ সালে স্থাপিত) সপ্তাহে দুই দিন করিয়া পানের হাট বসিয়া থাকে। এই স্থান হইতে পান সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। লক্ষাধিক টাকার পান ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। পাঞ্জাব, উত্তর ভারত প্রভৃতি এলাকায় পান বিক্রয় হইত। পাকীস্থানের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পান বিক্রয়ের স্থান সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। সিকি মাইল জুড়িয়া সেওড়াফুলির হাতে কেবল পাটই কেনা বেচা হয় না—তারকেশ্বরের পল্লী অঞ্চল হইতে উৎপন্ন সমস্ত কৃষিজাত সম্পদ এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে। সারা সপ্তাহ ধরিয়া গরুর গাড়ী,

সেওড়াফুলি পাটের বাজারের একাংশ

ফটো—শ্রীরাধারমণ পাল

সেওড়াফুলি কলাহাটা

ফটো—শ্রীরাধারমণ পাল

বেড়াইতেছে। পল্লী অঞ্চল হইতে চাষীরা গরুর গাড়ী করিয়া পাট বিক্রয়ের জন্য আড়তে আনিতেছে। কোথাও বা দেখিবেন চাষীরা গোপনে অন্য আড়তে যাইতেছে। পথের মধ্যে হয়তো পূর্ব্বের আড়তদারের কোন কর্ম্মচারীর সহিত দেখা হইয়াছে। তারপরের ঘটনা—কথা কাটাকাটি হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাথা ফাটাফাটি এবং এর পর পুলিশ আদালতের শরণ লইতে হইবে, হুগলী, তারকেশ্বর, নদীয়া অঞ্চলের পাটের বাজারে বিশেষ চাহিদা আছে, তাই তাহার মূল্যও কিছু বেশী। মুর্শিদাবাদ, বনগাঁ, রাণাঘাট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পাট আসিয়া আড়তে জমিয়া থাকে, কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুর এবং সেওড়াফুলির পাটের গঞ্জের মত বড় পাটের ব্যবসায়-কেন্দ্র বাংলায় দুইটি নাই। লরীযোগে দালালেরা পাট এখান হইতে জুটমিলে প্রেরণ করে। পাটের ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও সেওড়াফুলির তরকারীর কারবার নেহাৎ তুচ্ছ নয়। আলুর আড়ত, পিঁয়াজের আড়ত, কলাহাটা, মুড়কী হাটা, মিছরীপটী, মেছোহাটা প্রভৃতিতেও প্রত্যহ হাজার হাজার টাকার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

বন্ধুর পথ ধরিয়া হাটে আসিয়া থাকে—হাটবারের পূর্ব্ব রাত্র হইতেই ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন—রামের সেনার আহারের ব্যবস্থা এখানে প্রচুর আছে।

নদীপথে পাট বোঝাই কিস্তি, অসংখ্য দেশী নৌকায় কুমড়া, পটল, তরমুজ, মূলা, উচ্ছে- কাঁকুড় প্রভৃতি আসিয়া থাকে। কলিকাতার রসিক মহলে কুমড়ার নাম হইয়াছে "বর্দ্ধিবাটী।" "বর্দ্ধিবাটীর" খ্যাতি কেবল-মাত্র কলিকাতায় সীমাবদ্ধ তাহা নয়, কলিকাতার বাহিরেও এর খ্যাতি আছে। এই সময়ে নদীর ঘাটের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মানুষ ভাবে বিভোর হয়। দূর দূরান্ত হইতে বহু মালবাহী নৌকা নানা বর্ণের পাল তুলিয়া নদী পথে যাতায়াত করে। দিনের শেষে চাষীরা তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায়।

হাটের আসে পাশে কাপড়ের দোকান, তেলের কল প্রভৃতি আছে। কাপড়ের বাজার কেনই বা বলি, সেওড়াফুলির হাটের অধিকাংশ ব্যবসাই অবাঙ্গালীদের হাতে। আপনার মনে হইবে এ স্থানটি যেন বাংলার

বাহিরের কোন অংশ। তীর্থ যাত্রীরা গঙ্গা স্নান করিতে আসিয়া থাকে এবং স্নানের শেষে তাহারা কালী মন্দিরে পূজা দিয়া মাটির পুতুল কিনিয়া বাড়ী যায়। আরও অনেক যাত্রী এখান হইতে হাঁটা পথে তারকেশ্বর যায়। চৈত্র মাসে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সারা বৎসর তাহারা কেবল ব্যবসাই করে না আমোদ-প্রমোদেও তাহারা সময় ব্যয় করে। কলাহাটা ও উপর হাটার মধ্যে প্রায়ই প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। ঈশ্বর বৃত্তির টাকা জমাইয়া তাহারা বাৎসরিক উৎসব করিয়া থাকে। যাত্রা, পুতুল নাচ, নহবৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে কলাহাটা অঞ্চলে, কিন্তু উপর হাটে কেবলমাত্রই যাত্রাগানের আয়োজন করা হয়। পূর্ব্বে প্রায়ই আগুন লাগিত। তাই অগ্নিদেবতার হাত হইতে হাটকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি বৎসর ব্রহ্মা পূজা হইয়া থাকে। উপর হাটে ও কলাহাটায় পৃথক পৃথকভাবে পূজা হইয়া থাকে।

হাটের সম্মুখভাগে মুটেরা মাথায় করিয়া এক গুদাম হইতে অন্য গুদামে মাল বহন করিতেছে

ফটো—শ্রীরাধারমণ পাল

ব্রহ্মাপূজা বিবরণ সেকালের সাময়িক-পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মাছের বাজার ও নেহাৎ ছোট নয়। ছাতুগঞ্জে আছে মাছের আড়তদারের বড় বড় আড়ত। শীতকালে নৌকা করিয়া যশোহর অঞ্চল হইতে জাওলা মাছ আসিত। পাকীস্থান সৃষ্টির সঙ্গে জাওলা মাছ, খেজুরে গুড় প্রভৃতি আর এদেশে আসে না। ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশের কেনা বেচা চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্মৃতির রোমন্থন ছাড়া আর ওসব জিনিষ পাওয়া যাইবে না।

জমিদারী প্রথা লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে হাটের পরিচালনার ভার লইয়াছে সরকার। সরকারী কর্ম্মচারীরা কর আদায় করিতেছে, কিন্তু হাটের কোন সংস্কার হইতেছে না। দীর্ঘ দিন অব্যবস্থার ফলে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা হইয়াছে সঙ্গীন। গ্রীষ্মকালে পথচারীদের ধূলায় আর বর্ষায় কাদায় কষ্টভোগ করিতে হয়। এর সঙ্গে গো-গাড়ী, লরী, রিক্সা, প্রভৃতিদের ভীড় এক বেদনাদায়ক অবস্থা ঘটায়।

তারকেশ্বর যাইবার পথ ভাল হওয়ায় পল্লী-অঞ্চল হইতে সরাসরি পাট, কলা ও শাকসব্জী লরী করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইন নির্ম্মাণের পর হইতেও অনেক মাল রেলপথে অন্যত্র চলিয়া যায়। তারপর পাকীস্থান হওয়ায় বহু জিনিষের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইভাবে ধীরে ধীরে সেওড়াফুলি হাটের গৌরব সূর্য্য অস্তাচলের পথে চলিতেছে। আশু সংস্কার না হইলে সেওড়াফুলির হাট হয়তো ভদ্রেশ্বর গঞ্জের দশা প্রাপ্ত হইবে।
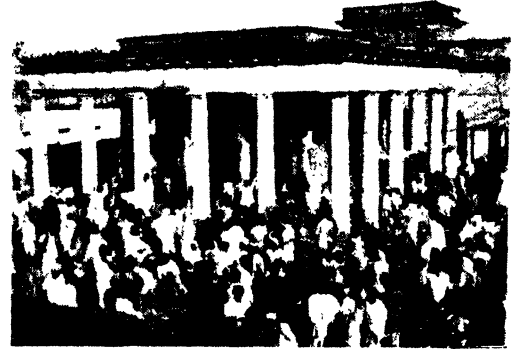
নিস্তারিণী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে পানের বাজার

ফটো—শ্রীরাধারমণ পাল

শোনা যাইতেছে, যে রাজ্য সরকার হাটের সংস্কার করিবেন।

জনপ্রবাদ হাটের পয়সা হাটেই রাখিয়া যাইতে হয়। পাটের আড়তদারেরা, দালাল প্রভৃতিরা যে পয়সা উপার্জ্জন করে, সে পয়সা পঞ্চমকারে—মানে সুরা ও নারীর পশ্চাতে ব্যয় করিয়া থাকে। হাটকে কেন্দ্র করিয়া রূপহারিণীদের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ এখানে ভি-ডি ক্লিনিক স্থাপিত হয় নাই।

সেওড়াফুলির হাটের ব্যবসায়ীরা জেলার সব সৎ কাজে অর্থ দান করিয়া থাকে কিন্তু হাটের উন্নয়নের জন্য তাহারা এক পয়সা ব্যয় করে না। ইহা অপেক্ষা বিচিত্র বিবরণ আর কি হইতে পারে?

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

সহযোগিতা

ফটো : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অতীত স্মৃতি

ফটো : শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
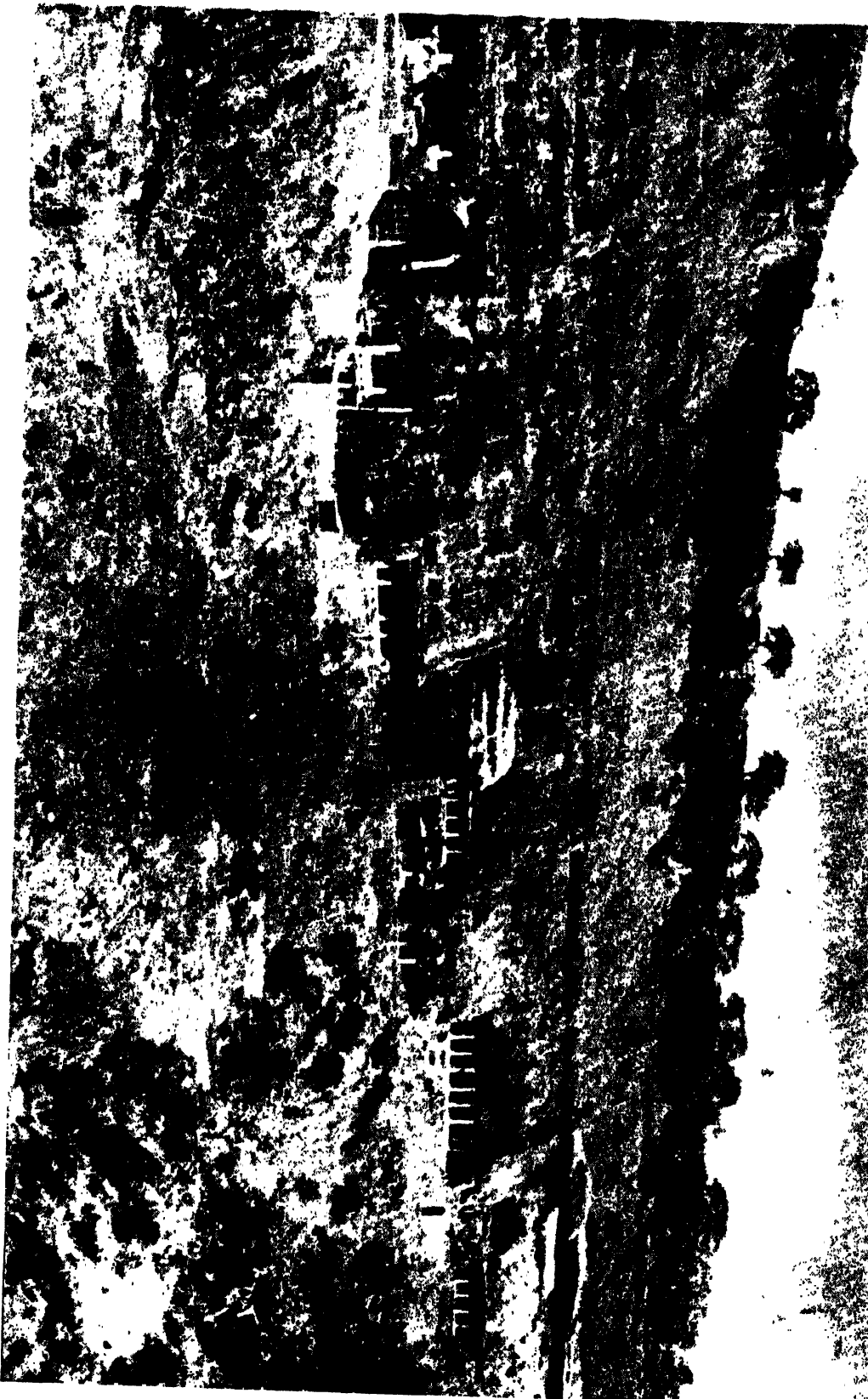
কুন্তীর উপাখ্যান

সুভাষ সমাজদার

কোনকালে হয়তো ও দেখতে বেশ সুন্দরীই ছিল। কিন্তু এখন ওর কুঞ্চিত মুখের রেখায় বার্দ্ধক্য তার স্বাক্ষর এঁকেছে। গলার কাছে চামড়াটা অতিকায় গিরগিটির মত থর থর করে কাঁপে। পিঁচুটিমাখানো চোখের খয়েরী রঙের তারাদুটো ধিকি ধিকি জ্বলে। বারাকপুর কোর্ট এলাকার সকলেই ওকে বলে নানীবুড়ি।

নিশিরাতের অন্ধকারে একটা প্রেতিনীর মত সে বারাকপুর কোর্টের উঠোনে পায়চারী করে বেড়ায়। হাতে বাঁশের লাঠি দিয়ে মাটিতে ঠুক ঠুক শব্দ তোলে। আর থেকে থেকে রাতের স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে ট্রেজারী গার্ডকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে ওঠে, জগমোহন ঘুমায়ে গিয়েছিস নাকী?

—না, নানী, হেসে বলে ট্রেজারীর নাইট গার্ড।

—বহুত আচ্ছা, জরাজীর্ণ দেহটাকে যেন অদ্ভুত একটা গর্ব্বে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে আবার সে লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে অন্ধকারে মিশে যায়। কোর্টের শেষপ্রান্তে আকাশ ছোঁয়া ঝাউগাছের মাথায় হয়তো খড়কুটোর বাসার ভেতরে কোন দাঁড়কাক ডানা ফরফর করে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নানীবুড়ি। ঝাউগাছের নীচে মদের ডিপোর বারান্দায় কাকে যেন দেখা যাচ্ছে! হেঁকে বলে ওঠে সে—কোন হ্যায় রে? থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসে অশরীরী ছায়াটার কাছে। এগিয়ে এসেই কিন্তু ফিক করে হেসে ওঠে—ধুর, এ তো আমার বানারসী কাপড়! ডিপোর বারান্দায় ঝুলছে একটা ছেঁড়া ময়লা সিল্কের নীল শাড়ি। নানীবুড়ির চোখের মণির মত ঐ কাপড়ের টুকরোটা। কাঁপা হাতে কাপড়টা টেনে তুলে কুঁচিয়ে রাখে বারান্দার এককোণে তার ছেঁড়া চট আর ময়লা কাঁথার বিছানার ওপরে। আকাশের অসংখ্য অপলক চোখের মত তারার দিকে তাকিয়ে হাতদুটো কপালে ঠেকিয়ে অস্ফুট গলায় বিড় বিড় করে বলে—ইস.ডি.ও সাহেবসে, আমি বিচার চাহি রামজী! লেটসাহেবকা টাকা লুঠ লিয়া? বেইমানীর বিচার ইস.ডি.ও সাহাব করবে, ইস লিয়ে হামি টেজারী আর ডিপো রাত ভর পাহারা দেতা হায়—তীব্র কোন ব্যথায় থর থর করে কাঁপে তার ফাটা ফাটা বেগুনী ঠোঁট দুটো। আবার হাত দুটো বুকের ওপরে চেপে ধরে চাপা আর্ত-গলায় বলে—আগুন কা মাফিক রঙ, হামার লেড়কা—লেটসাহাবকা লেড়কা কোন সে গিয়া—ঘোলাটে দুটো চোখের কোণায় কোণায় অশ্রুর বিন্দু চিক চিক করে।

দুপুরে কোর্টের বটগাছতলায় ব্যস্ত উকিল-মোক্তার-আমলাদের ভীড়ের ভেতরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে নানীবুড়ি। কেউ হয়তো কিছু দেয়, কেউ বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যদি কেউ দুটো পয়সা দেয় তাহলেই দপ করে জ্বলে ওঠে তার চোখ দুটো। উগ্র গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, ভিখ দেতা হায় হামকো? হামি একদিন এই দুটো হাতে হাজার হাজার রূপেয়া নেড়েছি। মেরা নাম ফুলমাতিয়া। দুনু বেলা মাংস পোলাও খেয়েছি। হামাকে দুটো পয়সা দেখাতে এসেছো? নিতান্ত তাচ্ছিল্যে দুটো পয়সা দাতারই গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায় নানীবুড়ি। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্বদীপ্ত দুটো চোখে আগুন ঝরিয়ে বলে, এই বারাকপুরে হামি কত ট্যাক্সি চেপে ঘুরেছি। হামি আর লেটসাহেব রাস্তায় বেরোলেই কত লোক হামাকে সালাম করতো জানো। লেটসাহেব একবার ছুটি থেকে আসলেই হয়, দেখিয়ে দিবো তোমাদের—কোর্টের জনতার ভেতরে গুঞ্জন ওঠে—এখনও লেটসাহেবের আশায় বসে আছে রে—

—এই কোর্টে কতদিন ধরে আছে?

অনেককাল থেকে ওই একই রকম দেখছি—প্রবীণ এক দলিল-লেখক বলল।

—কোথায় বাড়ী ওর ?

—কে জানে, কেউ বলে জগদ্দলে হিন্দুস্থানীদের বস্তিতে ওর বাড়ী। রামরোসা জুটমিলের পুরানো মালিক লেটসাহেবের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতো—

বিকেলের কোমল বিপন্ন ছায়া নেমেছে রিভার-সাইড রোডে। রাস্তার দুইপাশে নিবিড় ঝাউবনের নীচে ঝিলিমিলি রোদের সঙ্গে শান্ত একটা ছায়া কাঁপছে থর থর করে। স্কুলফেরত অনাথ আশ্রমের ছেলেরা চলেছে আশ্রমের দিকে। ফুলমতিয়ার ঘোলাটে দুটো চোখের তীব্র আকুল দৃষ্টি প্রতিটি ছেলের নাক, মুখ, চোখ, সমস্ত অবয়ব যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ঐ তো, ঐ ছেলেটার খাড়া নাক আর চওড়া কপালটা একেবারে ঠিক লেটসাহেবের মত! ছেলেটির ননীর মত কোমল দেহটা বুকে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় ওর গালটা ভরে দিতে ইচ্ছে করে নানীবুড়ির। অধীর আগ্রহে সে তার দিকে ছুটে যেতেই, ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে ছেলেটা, পাগলী—পাগলী আমাকে ধরতে আসছে, আমাকে মেরে ফেলল রে! মুহূর্ত্তে ছেলের দল রুখে দাঁড়ায়। রাস্তার খোয়া কুড়িয়ে নিয়ে সবাই একসঙ্গে তাকে ঢিল ছোঁড়ে। ককিয়ে আর্ত্তনাদ করে রাস্তার ধূলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে ফুলমতিয়া। রক্তাক্ত কপালটা টিপে ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করে, আর ডুকরে কেঁদে কেঁদে বলে—হা রামজী, হামার মরণ হয় না কেন, হামি কার কাছে কী পাপ কোঁরেছি—কেঁদে কেঁদে একসময় শান্ত আর নরম হয়ে যায় তার চোখের দৃষ্টি। তার চেতনার ভেতরে ঝলমল করে ওঠে কতগুলো রঙীণ ছবির মিছিল। এই তো ঝাউ আর পামগাছের মিষ্টি ছায়ায় সে আর লেটসাহেব জ্যোৎস্নার আলোয় ধোয়া কত রাত্রে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়িয়েছে। যেদিন লেটসাহেব তার কাছে বিদায় নিয়ে মাদ্রাজ চলে গিয়েছিল, সেদিন রাত্রেও এই রিভারসাইড রোডের ধারে ধোবীঘাটে সে এসেছিল। আলোয় ঝলমলে ষ্টীমলঞ্চের ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল লেটসাহেব। আবছায়া অন্ধকারমাখা গঙ্গার ওপরে অপস্রিয়মান ষ্টীমলঞ্চের দিকে তাকিয়ে চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তার দৃষ্টি। নিবিড় ভালবাসায় আর স্নেহে লেটসাহেব ভরে দিয়েছিল তার জীবন। কিন্তু—

কিন্তু সেদিন কি সে জানতো, লেট সাহেবের কুটিল বুদ্ধিতে তার এই ভুল ভালবাসার পরিণতি, একটা নিরপরাধ শিশুপ্রাণকে পৃথিবীর বিশাল জনারণ্যে হারিয়ে যেতে হবে? হঠাৎ যেন বহু বছরের ওপার থেকে একটা তীক্ষ্ণ মিষ্টি শিশু কণ্ঠের কান্না তার স্মৃতির নদী বেয়ে ঝরাফুলের পাঁপড়ির মত মনের ঘাটে এসে লাগে। না, খুঁজে বের করতেই হবে তার বুকের মাণিককে! বলিষ্ঠ এই বাসনাটা তার কান্না-থরো-থরো জীর্ণ দেহটাকে শক্ত একটা খুঁটির মত দাঁড় করিয়ে দিল। মমের মত সাদা চুলের গোছা খিমচে ধরে হিংস্র নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সদরবাজারের দিকে চলতে সুরু করে।

বারাকপুরের সদরবাজারের ভেতর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে নানীবুড়ি। হঠাৎ একটা খাবারের দোকানের সামনে আটকে গেল তার দৃষ্টি। উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মিল গিয়া—হামার লেড়কা—দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা আট দশ বছরের রোগা রোগা ফরসা চেহারার ছেলে পাঁউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। উসকো-খুসকো চুলগুলোয় ধুলো-বালিতে জট ধরেছে। কিন্তু মুখে হাসি হাসি ভাব। নানীবুড়ি হঠাৎ একটা বাজ পাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের ভেতরে টেনে নিল তাকে। ভয়ে আঁ আঁ করে চীৎকার করে উঠল ছেলেটা। বলল—আমি বরিশালিয়া পোলা। সেনহাটি আমাগো বাড়ী। আমার নাম গণশা। তোমার লেট সাহেবের পোলা হইতে যাইমু কোন দুঃখে? কিন্তু নানীবুড়ি তার শুকনো কঙ্কাল বুকের ভেতরে নরম ময়দার তালের মত তার দেহটা চেপে ধরে ঠেসে চটকে চুমোয় চুমোয় তাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলল। বুড়ী যেন স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করে বলতে থাকে—হ্যাঁ, ঠিক তেরা মাফিক দেখতে ছিল সে। জানি, হামি তোকে পাবোই—

আরে দেখ, দেখ—নানীবুড়ির কাণ্ড দেখ—সদরবাজারের দোকানীরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ফুলমতিয়ার। তার কোঁচকানো চোখ দুটো সন্ধ্যা-প্রদীপের মত উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। আদরভরা নরম গলায় তাকে বলল—চল হামারা সাথে—

—যাইতে পারি। খাওয়াইতে পারবা? আমার মা-বাপ দাঙ্গায় মরছে।

—হামিই তো তোর মা। হামি না খেয়েও তোকে খাওয়াবো—নিবিড় আদরে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নানী-বুড়ি। আহ্লাদে যেন সে ঢলে ঢলে পড়তে যায়।

রাত্রি নেমেছে গভীর হয়ে। বারাকপুরের মদের ডিপোর গায়ে ঝাউগাছের ঝিরি ঝিরি পাতায় চাঁদের আলো যেন গলে গলে পড়ছে। দূরে কোথায় কোন রাতজাগা পাখী ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায় দিগন্তে। ডিপোর বারান্দায় ছেঁড়া চট আর ময়লা কাঁথার বিছানার ওপরে বসে গণশাকে কোলের ভেতরে নিয়ে নানীবুড়ি বলে--তেরা পিতাজীকা চেহারা ছিল কেমন জানিস! ঐ থামটার মাফিক উঁচা আর মোটা। দুধগোলা গায়ের রঙ—

—কি যে কও, আমার বাপের গায়ের রঙ ছিলো একেরে হাঁড়ির কালির মত—

আঃ যা বলতেছি শোন না—উগ্র বিরক্তিতে জ্বলে ওঠে নানীবুড়ি বলে—দেখবি? দেখবি তোর পিতাজীকা চেহারা ছিল কেমন? পদ্মাপারের অসহায় বাস্তত্যাগী বালক উৎসুক হয়ে শোনে সাগর পারের কোন দূর দেশের তারই জন্মদাতার ইতিবৃত্ত। আশ্চর্য একটি বিস্ময়ের শিহরণ যেন তারই রক্তেরই ভেতর খেলা করে। আবছায়া টুকরো টুকরো ছবির মত তার চোখে ভেসে ওঠে সেনহাটির গহন গ্রামে তার দুস্থ দরিদ্র পিতামাতার উপোসী মুখ, ছোট ছোট ভাই-বোন—তাহলে কি তারা কেউ নয়? এই বুড়ীই তার মা! ডিপোর বারান্দার কার্ণিশে বুড়ীর শিরবেরকরা আঙুলগুলো আকুল হয়ে কি যেন খোঁজে পাগলের মত। চঞ্চল হয়ে উঠে গণশা বলে, —কি খুঁজতেছস তুই! কোন কথা বলে না নানীবুড়ি। একটু পরেই উল্লসিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল—মিল গিয়া! ছেঁড়া ময়লা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো একটা তোবড়ানো সিগারেটের কৌটা নামিয়ে নিয়ে আসে। শব্দ করে দিয়েশলাই জ্বালিয়ে কেরাসিনের ডিবেটা ধরিয়ে নেয়। কাঁপা হাতে কৌটোর ঢাকনীটা খুলে ফেলতেই, তার অন্ধকার কোটরে ঝকমক করে ওঠে অনেকগুলো খুচরো আনি দুয়ানী সিকি। ঝণাৎ করে মেঝের খুচরো পয়সাগুলো ছিটিয়ে দিতেই একটা পাসপোর্ট সাইজের বিবর্ণ ছবি গড়িয়ে পড়ল। ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত এক ভদ্রলোকের ছবি। কেরাসিনের ডিবেটা এগিয়ে নিয়ে এসে ম্লান ছায়া-কাঁপা আলোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল নানীবুড়ি। তার চোখের খয়েরী রঙের তারায় তারায় মিষ্টি একটা হাসির আলো জ্বলছে। জটপাকানো সুতোর দলার মত অজস্র রেখাটানা তার মুখখানা কী এক অসহ্য আবেগে থর থর করে কাঁপছে। লুব্ধ মত্ত একটা সাপের মত সির সির করে ছবিটার গায়ে তার কাঁপা হাতটা বুলিয়ে দিতে লাগল। ঝাউগাছের পাতায় পাতায় হু হু বাতাসের কান্না বাজছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বুড়ী মৃদু নরম গলায় বলল—এই দেখ লে, তেরা পিতাজী! নাক মুখ চোখ সবকুছ তেরা মাফিক্—কথা বলতে গিয়ে ছলছল করে ওঠে তার গলার স্বর। চোখ দুটো জলে ভরে আসে। আবার যেন বহুদূর থেকে বুড়ী বেদনা-ছোঁয়া গলায় বলে—কত রুপেয়া যে হামাকে পেয়ার করে দিয়েছিল। জিন্দগী ভোর এই পেয়ার—গণশা বুড়ীর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

—এই তো ধোবীঘাটে ভটভটিয়া নৌকায় চড়ে চলে যাওয়ার সময় তেরা পিতাজী হামাকে তিন হাজার রুপেয়ার নোটের গোছা দিয়ে বলল, মাদ্রাজ মে যাইতেছি। ফিন আসবো—একটু থেমে করুণ অসহায় গলায় থেমে থেমে বুড়ী আবার বলল—কত দিন, কত মাহিনা, কত বরিষ চলিয়ে গেল, লেটসাহেব আর না আইল। তার দেওয়া সব রুপেয়া হামার ভাই বিরাদরেরা ঠকিয়ে লিয়ে হামাকে গলা ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিল। সবাই বলল—হামি না কি রাণ্ডী! তীক্ষ্ণ একটা ব্যথায় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে তার বুকের ভেতরটা। চোখের তারা দুটো ধিকি ধিকি জ্বলে। গণশা বলল—চল না ক্যান, তুই আর আমি লেটসাহেবের কাছে মাদ্রাজে চইল্যা যাই গিয়া—

মাদ্রাজ! ফুলমতিয়ার বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে থাকে। হাড় বের করা মুখখানা গণশার গালে চেপে ধরে উত্তেজিত আনন্দে হাঁসফাঁস করতে করতে বলে—যাবি? সাচ বলছিস? হামার এই রুপেয়া দিয়ে মাদ্রাজ যাওয়া যাবে না?

—ধুর ওতে কি হইবো? এই রেজগীগুলোয় কত টাকা আর হইবো!

—তু আর হাম ভিক মাঙবো। একবেলা না খেয়ে পয়সা জমাবো—প্রচণ্ড একটা উৎসাহের আগুন জ্বলে নানীবুড়ীর মরা রক্তে। তার দুটো চোখ নিবিড় মধুর স্বপ্নে অগাধ হয়ে ওঠে। গণশার মাথাটার ওপরে চিবুক ঘসতে ঘসতে নানীবুড়ী বলে—তুঁ হামাকে ছেড়ে লেট-সাহেবের মত পালায়ে যাবি না তো? বোল—ঠিকসে বোল—

—যামু কোন দুঃখে? খাইতে পাইলেই থাকমু। খাইতে দিলে আমারে মাইরাও তাড়াইতে পারবা না—

—খাইতে পাবি বলেই বুঝি থাকবি। হামি যে তোর মা রে! হামারে ছেড়ে যাবি তু?

গণশার মাথার ওপরে বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে।

—হ, হ স্বীকার তো খাইছিই যে তুই আমার মা। আবার কাঁদস কোন কামে?

—সাচ বলছিস! তু হামাকে মা বলবি? অধীর লোলুপতায় আবার একটা চুমু এঁকে দেয় গণশার ধুলো-বালিমাখা ময়লা গালে।

শেষ রাতের প্রহর পার হয়ে যায়। পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়া চাঁদের ম্লান, বিষণ্ণ আলো এসে পড়ে ডিপোর বারান্দায়। ছেঁড়া চট আর ময়লা কাঁথার বিছানায় গণশাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে নিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যায় নানীবুড়ী। তার মুখের ওপরে পাণ্ডুর চাঁদের আলো খেলা করে। মধুর কোন স্বপ্নে উজ্জল হয়ে ওঠে তার মুখখানা। তার এই ছেলে অনেক—অনেক বড় হয়ে উঠেছে। পরম আদরে শ্রদ্ধায় তাকে একেবারে মাথায় করে রেখেছে। এই ছেলের হাত ধরে সে মাথা উঁচু করে গিয়ে দাঁড়াবে সেই বেইমান লোকটার সামনে।··· দুটো ঘুমন্ত চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তার শুকনো ফাটা ফাটা ঠোঁট দুটো কি একটা আবেগে থর থর করে কাঁপে। আরও নিবিড় করে ঘুমন্ত গণশাকে বুকের ভেতরে টেনে নেয়। বহুকাল পরে যেন তার খাঁ খাঁ করা বুকটা পরম শান্তিতে জুড়িয়ে গেছে।

ঝাউগাছের ডালে ভোরের পাখী ডেকে ওঠে। আকাশে রক্তপলাশের রঙ ধরে। ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে উঠেই নানীবুড়ী দেখল গণশা নেই। আর তার বুকের ভেতরের প্রাণের ধুকধুকির মত, সেই তোবড়ানো সিগারেটের কৌটাটাও নেই। দু হাতে বুক চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল নানীবুড়ী। কান্নার তীব্র আর্তস্বরে ভোরের বাতাস আড়ষ্ট ব্যথায় শিউরে উঠল। সেইদিন থেকে বারাকপুর কোর্ট এলাকার লোক নানীবুড়ীর মুখে আবার নতুন একটা বুলি শুনতে পেল—এই দুনিয়ামে সব লেটসাহেবকা মাফিক বেইমান। হামার সব কুছ লুঠ লিয়া!

জেগে ওঠ সুন্দর

আলোক মুখোপাধ্যায়

কালো রাত্রির তামস বক্ষ চিরে,
দেখা দাও সুন্দর!
ছেয়ে গেছে আজ নরঘাতকের ভিড়ে,
জীবনের বন্দর।

সামনে ওদের ফেনাইত জল লালে-লাল,
নিশ্চুপ হয়ে থাকবে গো আর কতকাল?
তুমি এসো,—
বুকে-বুকে তুমি ডেকে বলো—'ভালবেসো'।

—ওরা তো জানে না—যে সাগরে ওরা পাড়ি দেয়,
উপনিবেশের কূলে কূলে গিয়ে সারি নেয়,
সেই তীরে,—
তোমাকেই ওরা বিঁধেছে যে ফিরে-ফিরে।

ভুল ভেঙে দাও—আলোকেতে দাও ভরে,
হৃদয়ের কন্দর।
বিশ্ব মনের মহাচেতনার তীরে,
—জেগে ওঠ সুন্দর!

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ !

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটী সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল !

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিস্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 243-X52 BG
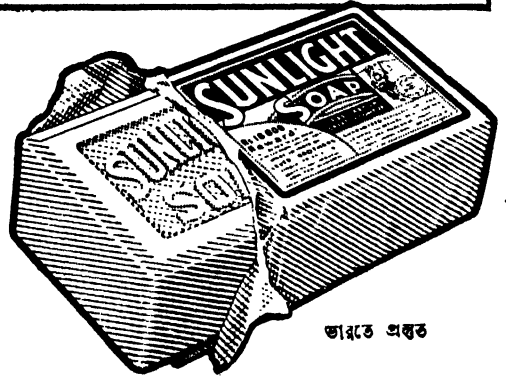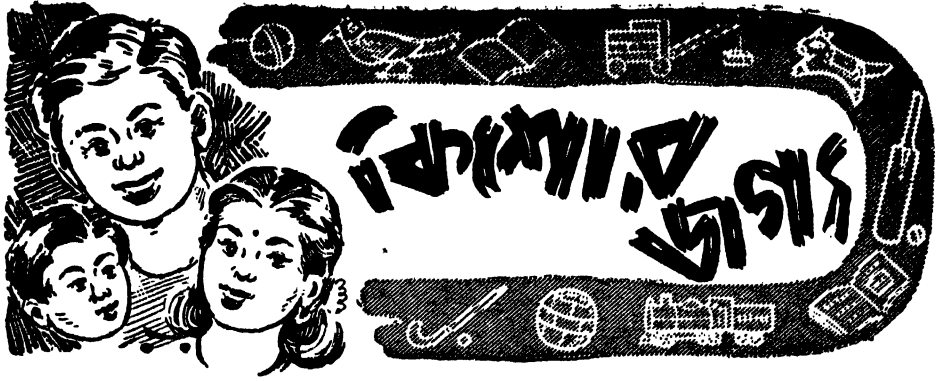
পরিচালক—উপানন্দ

নববর্ষে

সন্ধ্যার করবীচ্যুত আলোকের মত তেষট্টি সাল অনন্তকালের পথে ঝরে পড়্‌লো। ভারত সরকারের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে নূতন সর্ব্বভারতীয় বর্ষারম্ভ সুরু হয়েছে গত চব্বিশে মার্চ্চ। আমাদের বাংলা সনের আবির্ভাব চৌদ্দই এপ্রিল রবিবারে। দিন রথের আবর্ত্তনে এশিয়ার পূর্ব্বদিগন্তে দিল দেখা প্রথম বৈশাখ। যদিও ভাগ্যচক্রে ভারতে বিনা ভূমিকায় দীর্ঘ ইতিহাসের বন্ধুর পথ বেয়ে স্বাধীনতা এসেছে, তবুও আমরা দুরূহতম বাধা বিপত্তির সঙ্গে এখনো চলেছি আশা আকাঙ্ক্ষার আবছায়ার ভেতর দিয়ে আশ্বাসের আলো পাবার উদ্দেশ্যে। আজ আমাদের চিত্তভূমিতে ধ্বজারোপণের দিন এসেছে।

এশিয়ার আকাশের ওপর উঠ্‌বে কালো মেঘ—সেই আসন্ন মেঘাচ্ছন্ন দিনে তোমাদের জাতীয় পতাকা আর স্বাধীনতাকে সকল রকমে ঝড় ঝাপটের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত হবে। তোমরা শুধু জাতিকে শক্তি দেবে তা নয়, তোমাদের শক্তিরথের চক্রঘর্ঘরে পৃথ্বীকে কাঁপিয়ে তুল্‌বে—তোমাদের মহান্ আদর্শের কাছে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তার কাছে বিরাট অধ্যবসায় ও অক্ষুণ্ণ আশার কাছে হিমাদ্রির মত উত্তুঙ্গ দুরূহতম বাধা ও অপসারিত হয়ে যাবে। তোমাদের অমোঘ বিজয় বীর্য্যকে আমরা স্বাধীনতার সিংহ দ্বারে আবাহন করি নূতনবর্ষে—নূতন উদ্যমে তোমরা অগ্রসর হও গৌরব লাভের জন্যে—তোমাদের জীবনের জয়যাত্রার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—তোমরা অনুসন্ধান করো সেই সব পবিত্র বাণী আর মহান্ সভ্যতা, যা হাজার হাজার বছরের পথের ধুলায় আর আবর্জ্জনার মধ্যে সমাধিলাভ করেছে—রাখাল দাস ও ননী-গোপাল, ভাট ও দীক্ষিৎ, মার্শেল ও ম্যাকে, হাণ্টার ও হেরাসের মত তুলে ধরো আমাদের অতীতের ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলি যাতে আমরা সভ্যতার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করতে পারি।

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আর তিরিশে বৈশাখ বুদ্ধ পূর্ণিমায় বোধিসত্বের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণ তিথি। এই মাসেই জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য ভারতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরিজীর তিরোধান তোমরা এই সব মহামানবের উদ্দেশ্যে প্রণতি অর্ঘ্য দাও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাব জগতের রাজরাজেশ্বর। তিনি বলেছেন……এক সময়ে এশিয়াতে যে শিখা প্রজ্জ্বলিত ছিল, তার নির্ব্বাপণের দিন এলো, ক্রমে ঘনীভূত হয়ে এলো প্রদোষের অন্ধকার। তখন ভিতরের লজ্জা গোপন আর অন্তরের গৌরব রক্ষার জন্য আমরা বার বার নাম জপ করছিলুম, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুনের, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলুম বীর হামির, রাণাপ্রতাপ এমন কি বাংলা দেশের প্রতাপাদিত্য পর্য্যন্ত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বুঝতে পারি যে, অতীতের গৌরব ও বর্ত্তমানের তুচ্ছতা নিয়ে আমাদের মনের ভিতরে প্রবল বেদনা নিহিত ছিল। এই অতীতের দোহাই দেওয়া নিষ্ফলতা আঁকড়ে থাক্‌তে গিয়ে আমরা পদে পদে অপমানিত হয়েছি। এই সভ্যতার মূলে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং যে সংস্কৃতি গ্রামে গ্রামে প্রচারিত ও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সে সমস্তকে পশ্চিমের বন্যা এসে ডুবিয়ে একাকার করে দিয়েছে। ক্রমে বিদেশী স্কুল মাষ্টারদের হাতে আমাদের শিক্ষা যতই পাকা হ'য়েছে ততই ধারণা হোতে লাগল যে, অক্ষমতা আমাদের মজ্জাগত, অজ্ঞতা অন্তর্নিহিত, অন্ধসংস্কার ও মূঢ়তার বোঝা বয়ে পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে থাকবে চিরদিন। তখন আমরা স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য বলে ধ'রে নিলাম যে বিদেশী শাসন কর্ত্তাদের দ্বারা চালিত হওয়ার বাইরে আমাদের চলৎশক্তি নেই। এদের অনুগ্রহ-পক্ষপুটের জন্যে যুগান্তকাল পর্য্যন্ত অঞ্চলে পেতে থাকাই আমাদের ভাগ্যে নির্দ্দিষ্ট!…… নত মস্তকে মেনে নিয়েছি, পাশ্চাত্য চড়ে আছে দুর্গম উচ্চে, আর প্রাচ্য গড়াচ্ছে সর্ব্বজনের পদদলিত ধূলি শয্যায়। থেকে থেকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে শিবনেত্র হয়ে বলেছি আমরা আধ্যাত্মিক, আর যারা আমাদের কান মলে তারা বস্তুতান্ত্রিক—'

এ থেকে তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌বে তিনি স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর জন্যে কত ভাবতেন আর বাস্তব জীবনকে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে যে দরদ ও অনুভূতি দিয়ে কাব্যের সত্যদৃষ্টিকে বিশ্বের সাহিত্য জগতে

উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন, তা ব্যাস বাল্মিকীর পর আর কোন প্রতিভাধর পুরুষের পক্ষে এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব হয়নি। সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের সর্ব্বসমাজের বরেণ্য কবিকে প্রণাম করো—অনাগত কালের জন্যে যে সব ভাবধারা তিনি দিয়ে গেছেন, তাতে অবগাহন করো। তিনি বলে গেছেন—'শিক্ষা সরস্বতীকে সাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে—'এতেই বুঝা যায় আত্মবিস্মৃত জাতির লুপ্ত সম্বিৎ ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে কিভাবে চিন্তা করতেন।

ভারতের মহামানব সিদ্ধার্থের পবিত্র জীবনলীলার তিনটি মহা-সন্ধিক্ষণের সঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমা জড়িত। লুম্বিনী মহাকাননে এই দিনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, পঁয়ত্রিশবর্ষ পরে এই দিনে গয়ার বোধি-দ্রুমের মূলে মহাবোধি লাভ করেছিলেন, আর আশী বছর বয়সে রাজগৃহ থেকে শেষ যাত্রায় বেরিয়ে এই দিনেই মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন পাবানগরীতে কর্ম্মকার চন্দের দেওয়া শেষ অন্ন ভোজন করে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে সাম্য মৈত্রী করুণার জীবন্ত বিগ্রহ বুদ্ধদেব উত্তর-পূর্ব্বভারতে পদব্রজে ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন। রাজগৃহ, বৈশালী, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, সাকেত, কপিলাবস্তু, উরুবিল্ব প্রভৃতি জনপদকে কেন্দ্র করে তিনি এক বিশাল ধর্ম্মসমাজ গঠন করেছিলেন। স্থাপত্য, সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে তাঁর অমরবাণীকে বাঁচিয়ে রেখেছে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, তাতার, গান্ধার প্রভৃতি দেশ, আজও আবিষ্কৃত হচ্ছে কতনা কীর্ত্তিকাহিনী ভারতের গহন অরণ্যের পথে-প্রান্তরে আর শৈল শিখরে। তোমরা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মানুষকে ভালোবাস্‌তে শেখো।

আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ভারতীয় দার্শনিকতার ক্ষেত্রে—অনেকে তাঁকে শিবাবতার বলে থাকেন। ভারতের সুদূর দক্ষিণে পশ্চিম সমুদ্র তীরে কালাড়ি নামক গ্রামে নম্বুরী ব্রাহ্মণকুলে ৬০৮ শকে ১২ই বৈশাখ শুক্লা তিথিতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি আশৈশব অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন। পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হোলে তাঁর উপনয়ন হয় আর গুরুগৃহে ক্রমে অধ্যয়ন সুরু করেন। তিন বৎসরের মধ্যেই যাবতীয় শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করে তিনি গুরুর আদেশে ঘরে ফিরে আসেন। বয়স যখন তিন বৎসর তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। আট বৎসর বয়সে তিনি গোবিন্দপাদকে গুরু জ্ঞানে তাঁর কাছে যোগাভ্যাস ও বহু উপদেশ গ্রহণ করেন। তারপর গুরুর আদেশে তিনি সর্ব্বাগ্রে কাশীধামে এসে মহামুনি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। গুরুর আজ্ঞায় বিশ্বেশ্বরের অনুমতি অনুসারে ও ব্যাসের আদেশ পেয়ে শঙ্কর দিগ্বিজয় করে ধর্ম্মপ্রচার করেন। নব্য হিন্দু ধর্ম্মের তিনিই প্রবর্ত্তক। তিনি বিনয়ী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, উদার স্বভাব, পরোপকারী ও মাতৃভক্ত-ছিলেন। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে কোন বনমধ্যে যোগাভ্যাসকালে সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তিনি বলে গেছেন—

'দুর্লভং ত্রয় মে বৈতৎ দেবানুগ্রহ হেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ॥"

দেবতার অনুগ্রহ না থাকলে মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষত্ব (মুক্ত হবার ইচ্ছা) আর মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয় না। ধর্ম্ম ও দর্শন ভারতের প্রাণস্বরূপ—তিনি তারই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, জেনে রেখো। এঁরা ছিলেন সত্য শিব সুন্দরের উপাসক। এঁদের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা রেখে তোমাদের অন্তরের বৃত্তিগুলি উন্নত হোক—এঁরা মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে উর্দ্ধতর লোকে আন্‌বার জন্যে পৃথিবীতে এম্নি বৈশাখে অবতরণ করেছিলেন—আজ এঁদের বাণীর উপলব্ধির ভেতর দিয়ে কাণ পেতে শোনো এঁদের নিঃশব্দ মঙ্গলাচরণ তোমাদের নব যাত্রাপথের প্রারম্ভে—তোমরা কি চাও?—তোমরা চাও সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের আলো। এঁদের জন্ম তিথি উৎসবের দিনে নম্রনত হয়ে এঁদের অর্চনা করলেই এইগুলি লাভ হবে—তোমাদের মধ্যে মানবিকতার প্রতিষ্ঠা হবে। তোমরা দেশের ভূমিকে উর্ব্বর করো—এই আশীর্ব্বাদ করি।

শিশু-সাহিত্যসম্রাট শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের তিরোভাবে

বাংলার শিশু-সাহিত্য-জগতকে শোকার্ত্ত করে কিছুদিন পূর্ব্বে কবি সুনির্ম্মল বসু মহাপ্রস্থান করেছেন,—তাঁর পথে শেষ যাত্রা করলেন শিশু-সাহিত্যসম্রাট শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার গত ১৬ই চৈত্র অপরাহ্ণে তাঁর দক্ষিণ কলিকাতাস্থ বাসভবনে। তিনি ছিলেন রূপকথার যাদুকর, ছাত্রাবস্থা থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তাঁর সাহিত্য জীবন সুরু হয় 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ন্যায় যুগান্তকারী শিশু-মানবের আনন্দপ্রদ কথা সাহিত্য রচনার মাধ্যমে, আজ তিনি 'চিরদিনের রূপকথা' গ্রন্থ লিখে চিরবিদায় নিলেন। একমাত্র পুত্র ও পত্নীকে হারিয়েছেন আগেই, তাই তাঁর জীবনের দিনগুলি বেদনার ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেছেন দুই কন্যা রেখে, কিন্তু তাঁর তিরোভাবে শিশু সাহিত্য জগতের যে ক্ষতি হোলো তা আর কোনদিন পূরণ হবে না। দেশবাসীর কাছ থেকে তিনি জীবদ্দশায় নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন—দেশের সারস্বত সমাজ তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেছে। ১৩০৫ সালে ঢাকার বান্ধব সমাজ তাঁকে 'কাব্যানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ১৯৩১ সালে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে 'বাণী রঞ্জন' উপাধি দিয়ে সম্বর্দ্ধিত করেছেন। ১৩৫৭ সালে শিশু-সাহিত্য পরিষদ তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য স্রষ্টা হিসাবে 'ভুবনেশ্বরী পদক' প্রদান করে সম্মানিত করেছেন। লোক সংস্কৃতি পরিষদ, যুগান্তরের সব পেয়েছির আসর, নন্দন সাহিত্য তীর্থ প্রভৃতি সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে প্রদেশ কংগ্রেস গুণীজন সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীমিত্র মজুমদারকে সম্মানিত করে জাতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাঁর অমর রচনা 'ঠাকুরমার ঝুলির' মত গ্রন্থে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি ভূমিকা লিখে দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি বিশ্ব সমাজে তুলে ধরেছিলেন। তিনি লিখে রেখে গেছেন অসংখ্য পুস্তক—বহু পত্রিকারই ছিলেন নিয়মিত লেখক। তাঁর কুড়িখানি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে—ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, ঠান্‌দিদির থলে, চারু হারু, ফার্ষ্টবয়, লাষ্টবয়, বাংলার সোনার ছেলে, আর্য নারী, সরল চণ্ডী প্রভৃতি—তাঁর সর্ব্বশেষের দান 'চিরদিনের রূপকথা' তা ছাড়া তাঁর আরও অনেক লেখা অ-মুদ্রিত রয়েছে। তিনি ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অগ্রজ, পরম বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী। আজ তাঁর তিরোধানে কবিগুরুর ভাষায় বল্‌তে হয়—

"আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূর কালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্ত্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তা'র সন্ধান কোথায়।
কোথায় সান্ত্বনা?"

আমরা শিশুদের সেই স্বর্গত জীবন-পুরোহিতের উদ্দেশে আজ তর্পণ করি, আর প্রার্থনা করি শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি ও কল্যাণ।

দক্ষিণারঞ্জন বিয়োগে

—উপানন্দ

আজ তব শেষ যাত্রা ছিন্ন করি ধরণীর সর্ব্ব আবরণ,
মৃত্যুর অতীত কবি ! কল্পনার যাদুকর ! চলে গেলে দূরে।
তোমার ভাষাতে রূপ পেয়েছে যে শিশুদের প্রশ্নের স্পন্দন,
আনন্দ মাধুর্য্যপূর্ণ করে গেলে অন্তরের চির অন্তঃপুরে
কল্পনার নব নব সঞ্চয়ন। তুমি ছিলে শিশুদের সাথী
প্রতিদিবসের একান্ত আপন জন পথচলা অবসরে,
সংসারের পান্থশালা মাঝে সদা জ্বালায়েছ হৃদয়ের বাতি
অজানা লোকের বার্ত্তা শুনাতে পথিকে। হে অগ্রজ ! অশ্রুঝরে
তোমার বিহনে হেথা। রসের নৈপুণ্য লয়ে এসেছিলে তুমি
শিশু-ভারতীর রচিবারে পুণ্যপাদপীঠ নীহারিকা যুগে ;
তোমার সৃজন-শিল্প বিগ্রহ করেছি মোরা। এই জন্মভূমি
ধন্য হোলো তব আবির্ভাবে। দেশযাত্রী পাবে নিত্য দুঃখে সুখে
তোমারে তাহার গ্রন্থাগার মাঝে। মর্ত্ত্যকায়া রেখে গেলে কবি !
জন্ম মৃত্তিকার স্তরে বর্ষ বিদায়ের ক্ষণে। বকুল চম্পক
পড়ে ঝরে অশ্রু লয়ে, কাঁদে কিশলয়। জীবনের প্রতিচ্ছবি
রহিল যে চিরন্তন ফুটাইতে কৈশোরের কুসুম কোরক ;
যেথায় রহনা কেন, ভুলোনাক তাহাদের যারা অনুরাগে—
তোমারে বেসেছে ভালো, পেয়েছ প্রথম সাধনার পুরোভাগে।

রূপকথার রাজা

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

রূপকথা-যাদুকর দক্ষিণারঞ্জন,
তব যাদুস্পর্শে জাগে পুলকস্পন্দন
বাঙলার ঘরে ঘরে প্রতি শিশু মনে।
তব রাজকুমারের পক্ষীরাজ সনে,
তেপান্তর পাড়ি দিয়ে কত শিশু চলে
তের নদী পার হয়ে সপ্তসিন্ধু জলে।
তোমারি মোহন বাঁশী আজো শোনে তারা,
কল্পনা কুহক-জালে হয়ে দিশে-হারা।

হে রূপকথার রাজা যাওনিকো চলে,
তোমারি রাগিনী বাজে শিশু চিত্ত দলে।
'চারু-হারু' 'ফাষ্টবয়' 'লাষ্টবয়' সবে,
'ঠাকু-মার ঝুলি' মাঝে নিত্য রস লভে
তেপান্তরী মাঠে বাঁশী শুনে অনুক্ষণ,
শিশুচিত্তে প্রতিষ্ঠিত তব সিংহাসন।

বেরিয়ে পড়ো

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

কলকাতাশহর খুব সুন্দর, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এখানে অনেক আনন্দ, অনেক উৎসব। আর যাদের আত্মীয়স্বজন এ শহরে কম নয়, তাদের তো আরো ভালো লাগে এ শহরকে। কিন্তু দিনের পর দিন একটা বাড়ীর একটা ঘরে থাকা, একই রাস্তায় চলা, একই লোকজনের সঙ্গে দেখা কেমন-যেন একঘেয়ে লাগলো ? এ কথা বুঝতে পারা যায়, একবার বাইরে বেরোলে। হাওড়া কিংবা শেয়ালদা থেকে ট্রেন ছাড়বার পর যে আকাশ. যে মাঠ, যে ধুধু প্রান্তর দেখা যায়, শহর আর শহরতলী ছাড়াতে ছাড়াতেই কতক্ষণ লেগে যায়। তখনই বোঝা যায়, কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি।

কোথায় চলেছি বোঝা যায় আরো এগিয়ে গেলে। ধানের ক্ষেত, দূরগ্রামের খড়ের ঘর, রাঙামাটির রাস্তা শেষ হ'য়ে প্রথম যখন পাহাড় দেখা যায়, জমির রূপ বদলে যায়, মানুষের চেহারা, পোষাক, কথাবার্ত্তা বদলে যায়, তখন সমস্তই লাগে নতুন।

দার্জ্জিলিং, কালিম্পং, মুসৌরি, সিমলায় যাওয়ার পথই ত অন্য-রকম। গাছপালা অন্য রকম। স্থানীয় লোকেরাই অন্যরকম। অসংখ্য পাহাড়ের মাথা, কোথাও চিরতুষার, কোথাও ঝর্ণা, সে সব দেখে কলকাতার ঘর' যতই সাজানো হোক, কতখারাপ লাগে !

চক্রধরপুর থেকে রাঁচী, গৌহাটি থেকে শিলং, আবু রোড থেকে আবু পাহাড়, যেন ছবি। নীলগিরি উটাকামণ্ড ! যেন স্বপ্ন। শিলেট থেকে শিলং আর বদরপুর থেকে লামডিং হিল্‌সেক্‌শন এখন পাকিস্তানে প'ড়ে গেছে—সে পথের বর্ণনা করা যায় না। সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ, সেও পাকিস্তানে, একদিন পদ্মা আর মেঘনা দিয়ে সেখানে গিয়ে কত আনন্দই

পাওয়া গেছে! তারপর সমুদ্র, দীঘা থেকে সুরু ক'রে পুরী, গোপালপুর ওয়ালটেয়ার মাদ্রাজ, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, বম্বে, দ্বারকায় সমুদ্রের নিত্যনতুন রূপ। নদী, গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, সব নদীতে স্নান করলেই একরকম শরীর স্নিগ্ধ লাগে, সব জল একরকম মিষ্টি। কিন্তু কী নতুন নতুন রূপ নদীগুলির! হরিদ্বারের গঙ্গা আর কাশীর গঙ্গা একই গঙ্গা, দুই সুন্দর, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। না দেখলে, দু-ই বোঝানো যায় না।

তারপর শিল্প—মাদুরার মন্দির, আগ্রার তাজ, দিল্লীর দুর্গ, কোনার্ক, অজন্তা, ইলোরা, মানুষের কাজ ব'লে মনেই হবে না। মাউণ্ট আবুতে মার্ব্বেল পাথরের দিলওয়ারা টেম্পল্ বিশ্বাসই করতে পারবে না পাথর ব'লে। মনে হবে মাখন।

চোখ ভ'রে যাবে, মন ভ'রে যাবে। কত আনন্দ পাবে। পথের কষ্ট ব'লে মনেই হবে না। জব্বলপুরের মার্ব্বেল রক্, কুলু উপত্যকার আপেল, তোমার জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছে। কাশ্মীরের প্রকৃতি—তার শোভা, অধিবাসীরা—তাদের হাউসবোট আর শিল্প, তোমার জন্যেই সাজিয়ে রেখেছে। কবে যাবে?

তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে দেবতা রেখে সেকালের লোকেরা সারা ভারতবর্ষকে ডাক দিয়েছে—এসো এখানকার সৌন্দর্য্য দেখে যাও ব'লে। কেদারনাথ বদ্রীনাথও উপলক্ষ—লক্ষ্য তোমাকে দুর্গম পথে টানা অবর্ণনীয় সুষমা দেখাবার জন্যে, সুন্দর জলহাওয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কাশ্মীরেও অমরনাথের ডাক, নইলে শুধু কাশ্মীর দেখতে বিলাসী লোকেরা যাবে—যাত্রীরা নয়।

এই জন্যেই মহাবলীপুরম, সোমনাথের মন্দির উঠেছিলো সমুদ্রের তীরে, পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার মাথায় বালাজী তিরুপতি নাথ, আর বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, সেখানে সেখানেই তীর্থ সৃষ্টি হয়েছে। সুদূর কামাখ্যা থেকে বাড়ীর কাছে দেওঘর পর্য্যন্ত এমন কোনো তীর্থ নেই, যেখানে গেলে তোমার চোখ জুড়োবে না, মন ভুলবে না। গয়া, প্রয়াগ পুষ্কর ও এমনি তারো বেশী ওঁরা ব'লে গেছেন, শঙ্করাচার্য্যের চারধাম দেখো, হরিদ্বারের জল নিয়ে এসে রামেশ্বরের মাথায় ঢালো, যাতে আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য কোনোটাই বাদ না যায়।

কিন্তু সেকালের সঙ্গে একালের তফাৎ দেখো। একালে তোমরা পুরী এক্সপ্রেসে রাত্রে চ'ড়ে সকালে ট্রেণের জান্‌লা খুলে দেখলে জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে, কত সহজে দেখতে পেলে! আগের দিনে মানুষ যেত গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে গোরুর গাড়ীতে পায়ে হেঁটে দল বেঁধে, কত গাছতলায়, কত চটিতে বিশ্রাম করতে করতে, কত নদী নৌকোয় পার হ'য়ে, কত অরণ্য ভয়ে ভয়ে অতিক্রম ক'রে, কত দৃশ্য দেখে, কত লোককে জেনে, কত রাত কত দিন পরে—দেখতে পেতো তেপান্তরের মাঠের ওপারে দূরে—জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দেখা গেছে! আনন্দে তারা উচ্ছ্বসিত হ'ত, ভক্তিতে তারা প্রণাম করত জগবন্ধুর মন্দিরের উদ্দেশে। একরাত্রে নয়, ছ মাস পরে তারা শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছলো, কত পয়সা খরচ ক'রে, কত পরিশ্রমের পরে। তখন হোটেলে সিনেমায় বাজারে পুরী শহর গ'ড়ে ওঠেনি, তখন নীলাচলে শ্রীক্ষেত্র একটি ছোট গ্রাম মাত্র। সে দেখা আর এ দেখায় কত তফাৎ! কিন্তু সেদিন বিপদ ছিল কত বেশী, আজ কোনোই বিপদ নেই।

তবু অনেকে আছে, যারা ঘর ছেড়ে বেরোতে চায় না। তারা মনে করে, যারা পয়সা খরচ ক'রে বাইরে যায়, তাদের বোকামির অন্ত নেই। যদি শরীর সারাবার জন্যেও হয়, ট্রেণভাড়া বাড়ীভাড়া কুলী-ভাড়ার টাকাতেই খুব ঘি দুধ মাংস কলকাতায় ব'সে খাও, চেহারা ফিরে যাবে। কিন্তু প্রচুর অক্সিজেন আর ধাতুমিশ্রিত জল যে শরীরের কি উপকার করতে পারে, তাদের ধারণায় নেই। এমন অনেকে আছে, যারা বলে, আমি জীবনে সিনেমা দেখিনি। টকি কিরকম জানিনা। না দেখে তারা যে কতটা বঞ্চিত হল জান্‌লো না। বিজ্ঞানের উন্নতিও তো দেখবার জিনিস?

অনেকে আছে, যারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখা পাপ মনে করে। অভিনয়ের মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভা কত লোকের দেখা গেছে, সেটাও ত অস্বীকার করবার উপায় নেই!

তোমরা শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে যত নতুন নতুন সৃষ্টি হচ্ছে, সব দেখ্‌বে, নিজের দেশের সঙ্গে পরিচয় শেষ ক'রে পৃথিবী দেখতে বেরোবে। আজকের যুগে যাঁরাই বড়ো হয়েছেন, তাঁরা শুধু নিজের দেশ দেখা নয়, দুনিয়ার সকল দেশ দেখে এসেছেন, তাই তাঁরা যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলেছেন।

আমাদের দেশে এই জ্ঞান ভালো ক'রে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বকে তিনি চিন্‌তে বেরিয়েছিলেন, তাই বিশ্বের যত মনীষী ভারতবর্ষের আর কিছু না দেখুক, বিশ্বকবির শান্তিনিকেতন ঠিক দেখ্‌তে আসেন, অথচ এই কলকাতা শহরে আজো হাজার হাজার লোক আছে, যারা শান্তিনিকেতন দেখেওনি, দেখবার ইচ্ছাও পোষণ করে না।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একদিন ম্যাণ্ডালের জেলে বন্দী ছিলেন, কিন্তু মন তাঁর খোলা ছিল। তাই ট্রেণে, পদব্রজে, ঘোড়ায় চড়ে, জাহাজে, প্লেনে, সাবমেরিনে তিনি সারা পৃথিবী তোলপাড় ক'রে ফেল্‌লেন। ইংরেজের মত প্রথম শ্রেণীর শক্তিকে চতুর্থ শ্রেণীতে পরিণত ক'রে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এনে দিলেন, দিয়ে হলেন দুর্গম পথের যাত্রী, ঘরের কোণে চির বিলাসে চির আরামে যিনি অখ্যাত জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন।

ভারতের ভাগ্য-গগনে তখনো স্বাধীনতার সূর্যও উদিত হয়নি। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অজ্ঞানতায় গ্রামাঞ্চল তিমিরাচ্ছন্ন। মজাখাল, হাজা-বিল, পানা-পুকুর, সংস্কারহীন পাতকুয়োই গ্রামের জলাশয়। টিউবয়েল বসেনি। ডিডিটির নামও কেউ শোনেনি। ম্যালেরিয়ার দাপটে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে গাঁয়ের মানুষ। যারা আছে, যমরাজের রাজবাড়ী ছাড়া তাদের বোধহয় যাবার আর নিশ্চিন্ত কোনো স্থান নেই। যারা চ'লে গেছে, রেখে গেছে, বাগান, পুষ্করিণী, শূন্য বাড়ী। কোনো কোনো বাড়ীতে একটি বিধবা। প্রকৃতি তার আপন হাতের পরশ বুলিয়ে চলেছে নিয়মিত ভাবে। ঘরের দরজায় কাঁটালতা দুলছে। বাগানের ফল গাছতলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কুড়িয়ে খাওয়ার লোক নেই। সজনের ফুল ফুরিয়ে গেছে। পাতাহীন শাখায় ডাঁটা ঝুলছে গাছ ভ'রে। ডাল ভেঙে পেড়ে নিয়ে গঞ্জের হাটে ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার মত মানুষ কাল হরণ ক'রে নিয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের পলেস্তারাহীন নোনা-ধরা ইঁটগুলো বুড়ো রাক্ষসীর মত দাঁত বে'র ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীপতি সেইখানে মাথা নত ক'রে মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বাড়ী ঢুকে ডাকলেন: বৌদি!

রান্না ঘরের ভিতর থেকে উত্তর এলো: যাই ভাই। বারান্দায় বেরিয়ে এসে অনুপমা বললো: ডাক্তারের দেখা পেয়েছিলে তো?

বিষণ্ণ মুখে শ্রীপতি বল্লো: না। ডাক্তার কখন ফিরবেন সঠিক জানা গেল না। কম্পাউণ্ডারকে ব'লে ওষুধ নিয়ে এলাম। কাল সকালে প্রথমেই যা'তে আসেন তার জন্যে গাড়ীভাড়ার টাকাও দিয়ে এসেছি। শিবনিবাসে জীবন্ত শিবের যদিও দেখা পাওয়া যায়, ডাক্তারের দর্শনলাভ অতি সুদুর্লভ।

অনুপমা একটা আসন পেতে দিয়ে ব'ললে: বসো। একটু বিশ্রাম ক'রে হাত মুখ ধোও।

শ্রীপতি বললেন: জ্বর আর বাড়েনি তো?

জ্বর ও যন্ত্রণা কিছুই কমেনি। অনুপমা শ্রীপতির পথশ্রান্ত চেহারায় চোখ বুলিয়ে বললো: তুমি সেই কখন বেরিয়েছো, হাত পা ধুয়ে, কিছু খেয়ে ঠাকুরঝির ঘরে যেয়ো। আমি আস্‌ছি।

রাত আটটা বাজে। কোনো মানুষের কোনো সাড়া নেই। নিশুতি গাঁয়ের রাস্তা থেকে ভেসে আস্‌ছে শৃগালের কলরব। এলোমেলো ভাবতে ভাবতে শ্রীপতি দেখলেন: প্রদীপে বুকের সল্‌তেটা পুড়তে আরম্ভ ক'রেছে। তেল নেই। খুঁজে খুঁজে তেলের বোতল বের ক'রে নিভে-আসা দীপের বুকে তেল ঢেলে ক্ষীণ দীপশিখাকে প্রজ্বলিত ক'রতে লাগলেন।

সুপ্রভা ঘামছিল। তাড়াতাড়ি পাখা নিয়ে বাতাস করতে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ফেললেন শ্রীপতি।

সুপ্রভা তার বুকে জড়ানো শিশুটীকে আস্তে আস্তে একটু দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো। পারলো না।

শ্রীপতি সরিয়ে দিলেন।

সুপ্রভা বললে: তুমি এখনো জেগে বসে আছো? একটু গড়িয়ে নিলে পারতে।

রাত তো বেশী হয়নি! তা ছাড়া তোমার ওষুধ খাওয়া বাকী রয়েছে যে—

: আবার ওষুধ? আচ্ছা দাও—

ওষুধ খাওয়ার পর একটু জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে

নিয়ে সুপ্রভা বললে : ত্থাখো, তোমায় একটা কথা আজ সকাল থেকেই বলবো ভাবছিলাম।

: বলো।

আমি তো একটু ভালই আছি। তুমি কাল সকালে ডাক্তারবাবু দেখে যাওয়ার পর যে গাড়ী পাও তাতে নীলুকে ওর জেঠিমা কিংবা ন'মাসীর কাছে রেখে এসো।

: ও যে তোমায় এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারে না! তোমার অসুবিধা হবে না?

সুপ্রভা একটু চুপ ক'রে থেকে নিম্নস্বরে বললে : এ বাড়ীতে ওকে কেউ দুচোখে দেখে না।

শ্রীপতি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন : তাই কি হয়! তোমার দুর্বল শরীর অস্বাভাবিক চিন্তা করাচ্ছে। শ্রীপতি জানতেন, এই সন্তান জন্মের পর থেকেই রোগের সৃষ্টি হয়েছে। আর যে সুপ্রভা সেরে উঠবে সে আশা নেই। ডাক্তার ব'লেছেন: "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"—চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। শ্রীপতিকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে, সুপ্রভা বললে : আমার জ্বর যত বাড়ে ও ততই জড়িয়ে ধরে। কারো কাছে যেতে চায় না। ভাল ক'রে খায় না। কী রকম রোগা হয়ে গেছে দেখেছো! প্রথম হয়তো একটু কান্নাকাটি ক'রবে, তার পরে ভুলে যাবে। তুমি আর অমত ক'রোনা।

শ্রীপতি নিঃশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন : বেশ, তাই হবে।

: আসবার সময়ে অমিকে নিয়ে এসো। তা ছাড়া তাকে নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। এ বাড়ীর সবাই ভালোও বাসে।

শ্রীপতি বললে : তোমায় কিন্তু ডাক্তার বেশী কথা বলতে নিষেধ ক'রেছেন।

সুপ্রভা শুয়ে শুয়ে স্পস্ট হতে স্পস্টতর—যত দূরেই থাকুক—দেখতে লাগলো প্রথম সন্তান "অমি" তার অমিতাভকে।

ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। ফুলো ফুলো রক্তাভ গাল। তার লাল্‌চে চুল দেখে ছোটতে অনেকেই ভুল ক'রে বলতো সাহেব ছেলে। সে হাসতো ও মনে মনে তুলনা করতো ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোর সঙ্গে। বিছানায় শুয়ে অবধি তাকে দেখিনি। কেমন আছে, কি ভাবে রয়েছে, রোগের যন্ত্রণায় সে খবরও সে ভাল ক'রে নেয়নি।

পরদিন সকালে ডাক্তার দেখে যাওয়ার পর শ্রীপতি স্নান আহ্নিক সেরে, তাড়াতাড়ি দুটো ভাত মুখে দিয়ে রওনা হওয়ার জন্যে তৈরী হ'য়ে স্ত্রীর ঘরে ঢুকে দেখলেন : নীলুর বড় বড় কাজলমাখা চোখ দুটীর কাণায় কাণায় জল টলমল ক'রছে। মা'র বুকের উপরে শুধু মুখ রেখে সে শুয়ে আছে। মা তার সন্তানকে বোঝাচ্ছে : ন'মাসী কত খেলনা কিনে রেখেছে তোর জন্যে। মাসীমার বাড়ীটা কত বড় তোর মনে আছে? কত আদর করবে, ভালো ভালো খাবার খেতে দেবে। সেখানে একটীও শেয়াল নেই। তার পর জেঠিমা তো কোল থেকে নামাবেই না। তাঁর সঙ্গে কত জায়গায় বেড়াতে পাবে।

বাবাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবোধ শিশু জোর ক'রে মা'কে আরো জড়িয়ে ধরলো। শ্রীপতি ঘরের বাইরে চলে গেলেন। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ডাকলেন : বৌদি!

বৌদি উত্তর দিলেন : কাপড় ছেড়েই যাচ্ছি।

অনুপমাকে আসতে দেখে শ্রীপতি বললেন : আমি তো পারলাম না। তুমি চেষ্টা ক'রে ত্থাখো। আমি গাড়ীর কাছে দাঁড়াচ্ছি।

অনুপমা ঘরে ঢুকে মা ও ছেলের অবস্থা দেখে অশ্রু সম্বরণ করতে পারলে না। আড়ালে চোখ মুছে, কাছে এসে বললে : চলো আমরা মন্দিরে যাই। বুঝলে ছোট্‌দি! কালি ময়রা নাকি খুব বড় বড় রসগোল্লা তৈরী করেছে আজ—আমি নীলুকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার জন্যেও নিয়ে আস্‌বো। বলতে বলতে নীলুকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সুপ্রভার যে হাতটি ছেলের মাথার উপরে ছিল সেই হাতেই এক ফোঁটা চোখের জল পড়লো।

অনুপমা কালি ময়রার বাখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে নিম্নস্বরে ডাকলেন : কালি? কালি আছো?

কালি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললো : আমায় ডাকছো বৌমা!

তুমি সবচেয়ে যে বড় রসগোল্লা করেছো, নীলুর জন্যে নিয়ে এসো।

নীলুকে খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে বললে : তুমি আগে গাড়ীতে ওঠো। ছেলেকে বাপের কোলে বসিয়ে দিয়ে হরেন মালোকে অনুপমা বললো : তাড়াতাড়ি ক'রে যেয়ো। গাড়ীটা যেন ফেল না হয়।

হরেনমালো উত্তর দিল : না মা, তা হবে না।

ঠাকুরজামাইকে উদ্দেশ ক'রে অনুপমা বললে : তুমি যেন ওখানে দেরী ক'রো না। অমিকে নিয়েই চলে এসো। একজন না থাকলে ঠাকুরঝিও মন খারাপ ক'রে থাকবে। কালই রওনা হ'য়ো।

শ্রীপতি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে অনুপমা রাধাবল্লভের মন্দিরে গেল। রুদ্ধ দরজা খুলে দাঁড়ালো দেবতার সামনে। চাবি বাঁধা আঁচলটা গলায় জড়িয়ে আভূমি নত হ'য়ে প্রণতি জানিয়ে বললে : মায়ের বুক থেকে ছেলে তুলে নিয়ে এসেছি। মুখ রক্ষা ক'রো ঠাকুর! আবার যেন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে তুলে দিতে পারি।

বাবাকেই নীলু সব চেয়ে বেশী ভয় করতো। তাই চুপ ক'রে সে বাপের কোলে বসে আছে। কোথায় চলেছে, কেন চলেছে, কিছুই জানে না। অজানা পথের যাত্রীর মত সে নিঃশব্দ। গাল বেয়ে চোখের জল রসগোল্লার ঠোঙায় গড়িয়ে পড়ছে।

রাংচিতা ও বাতার বেড়ার পাশ দিয়ে, কলাবাগানের আড়াল দিয়ে, জিউলী আর হিজলবনের গা ঘেঁষে গরুর গাড়ীর চাকা দুটো কেঁদে-ককিয়ে ঘুরে ঘুরে দূরে চল্লো। পথের বাঁকে বাসন্তী রঙে রঙিন্ হ'য়ে দুলছে সোঁদাল ফুল। অদূরে দেখা যাচ্ছে ইছামতীর সোনালী থাল। (চল্‌বে)

সুনির্মলের মৃত্যুতে

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ফাগুন মাসের সুনীল আকাশ
উদার বাতাস আর
কুটিল-কালো হোলো হঠাৎ হায়,—
ঝরিয়ে দিলো অঝোর ধারা
কি জানি কার তরে—
জমলো ব্যথা মনের আঙিনায়।
এমন সময় শুনতে পেলাম
কবি সুনির্মল
মোদের ছেড়ে পালিয়ে গেছে দূরে—
চোখ হতে জল পড়ল ঝরে
সিক্ত হোলো বুক—
জমলো আঁধার সারা হৃদয় জুড়ে।
হালকা হাসির হর্‌রা নিয়ে
শব্দেরি ঝংকারে
দুঃখে যেজন করতো পরিহাস—
আপন ভোলা সেই কবিবর
আর ধরাতে নেই
কেমন করে করব গো বিশ্বাস ?

হরধনুভঙ্গ

শ্রীযামিনীমোহন কর

... অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যার প্রাসাদ

দশরথ ও বশিষ্ঠ

দশরথ। গুরুদেব, ধন্য অস্ত্রশিক্ষা তব। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, রাজকুমারেরা এত অল্প সময়ে এই প্রকার নৈপুণ্য লাভ করবে।

বশিষ্ঠ। এতে আমার বিশেষ কৃতিত্ব নেই। প্রকৃত প্রশংসার দাবী করতে পারে রাজকুমারেরা। তাদের শেখবার ক্ষমতা অসাধারণ। কোনও কথা একবারের বেশী দু'বার বলতে হয়না। ওদের জ্ঞানের পরিচয় তো পূর্ব্বেই পেয়েছেন—

দশরথ। হ্যাঁ গুরুদেব, পেয়েছি এবং চমৎকৃত হয়েছি।

বশিষ্ঠ। আজ দৈহিক শক্তি ও অস্ত্র শিক্ষারও পরিচয় পেলেন। মন এবং দেহ, দুই-ই সুস্থ এবং সবল হওয়া প্রয়োজন। তবেই সম্পূর্ণ শিক্ষা হয়। এখন বাকী রইল,

প্রয়োগ। যা শিখেছে তা কাজে লাগাতে হবে। তবেই শিক্ষা হবে সার্থক।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। (অভিবাদন করে) মহারাজ, আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আগমন করেছেন।

দশরথ। যাও, তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

অভিবাদন করে প্রতিহারীর প্রস্থান

দশরথ। গুরুদেব, হঠাৎ মহর্ষি এলেন কেন ?

বশিষ্ঠ। বোধহয় এবার শিক্ষার প্রয়োগ আরম্ভ হবে।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

দশরথ। স্বাগতম্‌ মহর্ষি। অধীনের প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণাম করলেন

বিশ্বামিত্র। জীবমস্তু। কল্যাণ হোক। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব, আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বীকার করুন।

বশিষ্ঠ। হে রাজর্ষি, আজ আপনি ব্রহ্মর্ষি। আপনার শ্রদ্ধা ত্রিভুবন খ্যাত। আপনার তপস্যা অদ্বিতীয়। নারায়ণ আপনার মঙ্গল করুন।

দশরথ। প্রভু, কি কারণে আগমন ? বলুন, কি সেবা আমি করতে পারি ? যজ্ঞস্থলে, আশ্রমে সব কুশল তো ?

বিশ্বামিত্র। না, কোথাও কুশল নেই। সর্বত্র অমঙ্গল। দুরাত্মা রাবণ ও তার রক্ষদল যজ্ঞে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করছে। আশ্রমের মুনিপত্নী ও বালিকাদের হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি তাড়কা নাম্নী এক ভীষণাকারা রাক্ষসী মুনিদের যজ্ঞ পণ্ড করে ভক্ষণ করছে। এর কি কোনও প্রতিকার হবে না রক্ষাকর্ত্তা দশরথ জীবিত থাকতে !

দশরথ। নিশ্চয়ই হবে। আমি আজই আপনার যজ্ঞস্থলে যাত্রা করব। সর্ব রকমে আশ্রমকে ভয় শূন্য করব।

বিশ্বামিত্র। আপনার নিজের যাবার প্রয়োজন নেই। উপযুক্ত পুত্রগণ থাকতে আপনি যাবেন কেন ?

দশরথ। কিন্তু মহর্ষি, ওরা যে এখনও বালক মাত্র।

বিশ্বামিত্র। বয়সে বালক হলেও গুণে প্রবীণ। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের শিষ্য সর্বত্র অপরাজেয়। হে মুনিবর ! রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা কি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি ?

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ, শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু প্রয়োগ করবার সুযোগ এখনও তারা পায়নি।

বিশ্বামিত্র। সে সুযোগ আমার আশ্রমে পাবে। হে রাজন্‌, দুরাত্মা রাক্ষসদের নিধনের জন্য আপনার সুপুত্র রাম এবং লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।

দশরথ। গুরুদেব—

বশিষ্ঠ। এ একটা অপূর্ব সুযোগ। মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ। রাজপুত্রদের শিক্ষক হিসেবে ক্ষাত্রধর্ম পালন করেছি। অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়, রাজা। নিজ তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছেন। প্রকৃত অস্ত্রশিক্ষা তিনিই দিতে পারেন। তাঁর শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস, ত্রিভুবন খ্যাত। তিনি সঙ্গে থাকতে রাজপুত্রদের কোনও অমঙ্গল ঘটবে না।

দশরথ। বেশ, আমি তাদের নিয়ে আসছি।

প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। হে বশিষ্ঠদেব, দশরথতনয়গণ স্বয়ং নারায়ণের চারি অংশ।

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ, আমিও ধ্যানযোগে তাই জেনেছি।

বিশ্বামিত্র। আমাদের আশ্রমে রাক্ষস-নিধন প্রকৃত কার্য্যের ক্রোড়াঙ্ক মাত্র। আসল কাজ রাবণ বধ ও রক্ষকুল ধ্বংস।

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ মহর্ষি, তাও আমি জেনেছি। আপনি বহু দৈব প্রদত্ত অস্ত্রের অধিকারী। রাম ও লক্ষ্মণকে—

বিশ্বামিত্র। সে কথা আর বলতে হবেনা। সেই জন্যই তো আমার এখানে আসা। ওদের দুই ভাইকে সকল রকম অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী করে দেওয়ার আদেশ আমি পেয়েছি। হে বশিষ্ঠদেব, আমাদের আকুল প্রার্থনা সার্থক হয়েছে।

বশিষ্ঠ। মানুষের আকুল প্রার্থনা কোনদিনই তো বিফল হয়না। ডাকার মত ডাকতে পারলে সাড়া মিলবেই। ভক্ত, আর্ত্তপ্রাণা, প্রত্যেকের ডাকেই তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

বিশ্বামিত্র। আনন্দে আমার শরীর শিহরিত হয়ে উঠছে—

ভরত ও শত্রুঘ্নসহ দশরথের প্রবেশ। বালকেরা মুনিদের প্রণাম করল

বিশ্বামিত্র। কল্যাণ হোক।

দশরথ। মুনিবর, আমার দুই পুত্র আপনার সম্মুখে উপস্থিত।

বিশ্বামিত্র। সুন্দর। অপূর্ব। ঠিক এমনটিই যেন দেখেছিলাম। আচ্ছা, রাজপুত্রগণ, বলতো রাক্ষসনিধনের প্রয়োজন আছে কিনা ?

ভরত। আছে বৈকি। তবে অনর্থক ঝগড়া করা ঠিক নয়।

বিশ্বামিত্র। কিন্তু যদি তারা ঋষিদের যজ্ঞ পণ্ড করে।

শত্রুঘ্ন। সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়াই ভাল। তবে যদি নেহাৎ নিরুপায়—

বিশ্বামিত্র। (ক্রোধসহ) রাজা দশরথ, আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা। এরা রাম লক্ষ্মণ নয়, যদিও একই আকার একই রূপ। এরা নিশ্চয়ই ভরত আর শত্রুঘ্ন।

দশরথ। হ্যাঁ, মানে, বুঝলেন কিনা—

বিশ্বামিত্র। কিছু বুঝতে চাইনা। জানলুম ইক্ষ্বাকু-বংশের সত্যনিষ্ঠা চলে গেছে। আমার আগমন বৃথা হয়েছে।

প্রস্থানোদ্যত। দশরথ জোড়হস্তে পথ আগলালেন

দশরথ। হে মহর্ষি ! আমি অপরাধী। দণ্ড দিন। চলে যাবেন না। আমি সত্যভঙ্গ করব না।

বশিষ্ঠ। রাজন্ ! আপনার এ ছলনা অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে। ভরত, শত্রুঘ্ন, তোমরা যাও। গিয়ে রাম লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে দাও।

প্রণামান্তে দু'জনের প্রস্থান

দশরথ। মুনিবর ! একটা প্রশ্ন করতে পারি কি ?

বিশ্বামিত্র। কি প্রশ্ন ? বলুন।

দশরথ। রাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্ন এই দুই যুগল প্রায় একই রকম দেখতে। সামান্য যা পার্থক্য আছে তা সকলের চোখে ধরা পড়বার নয়। আপনি কি করে বুঝলেন ?

বিশ্বামিত্র। প্রথমে এদের দেখে আমি বুঝতে পারিনি, রাম লক্ষ্মণই মনে করেছিলুম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর শুনে বুঝতে পারলুম এরা রাম লক্ষ্মণ নয়। অথচ একই আকৃতি। সুতরাং নিশ্চয়ই এরা ভরত ও শত্রুঘ্ন।

দশরথ। উত্তর শুনে বুঝলেন ?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ। আপনিও বুঝতে পারবেন।

রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ ও সকলকে প্রণাম

বিশ্বামিত্র। জীবমস্তু। হে রাজপুত্রদ্বয়, বল তো রাক্ষস নিধনের প্রয়োজন আছে কিনা ?

রাম। রাক্ষস কেন, যদি দেবতারাও কু-কাজ করেন তবে ধ্বংসের প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে সৎ, সে যে বংশেরই হোক, যে জাতেই জন্মগ্রহণ করে থাকুক, তাকে রক্ষা ও পালন করতে হবে।

বিশ্বামিত্র। উত্তম। আচ্ছা, যদি রাক্ষসেরা ঋষিদের যজ্ঞ পণ্ড করে—

লক্ষ্মণ। তবে অবশ্যই নিধন করতে হবে। প্রজা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের সর্বরকমে রক্ষা করা রাজ ধর্ম।

বিশ্বামিত্র। বেশ, বেশ। কিন্তু রাক্ষসেরা শক্তিশালী—

রাম। বশিষ্ঠদেবের শিষ্য ভয় জানে না।

বিশ্বামিত্র। পরাজয় স্বীকার করে নিলে তাদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পাবে—

লক্ষ্মণ। গুরুদেবের শিষ্য পরাজয় মানে না।

বিশ্বামিত্র। (সহাস্যে) এই তো চাই। মহারাজ, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ?

দশরথ। হ্যাঁ মহর্ষি। আমি ধন্য। আমার ভ্রান্তি দূর হয়েছে। আপনি এদের নিয়ে যান।

বশিষ্ঠ। আপনার হাতে এদের তুলে দিচ্ছি মহর্ষি বিশ্বামিত্র। বাকী শিক্ষা আপনিই পূর্ণ করে দেবেন। প্রকৃত বিপদ ছাড়া প্রয়োগ শেখা যায় না।

বিশ্বামিত্র। আমার যা করবার নিশ্চয়ই করব। কিন্তু এদের আমি কি শেখাব ? আপনি তো সবই জানেন। চল রাম, চল লক্ষ্মণ, আমার সঙ্গে আশ্রমে চল।

প্রণামান্তে বিশ্বামিত্রসহ রাম লক্ষ্মণের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিশ্বামিত্রের আশ্রম

মুনিবালকগণ

১ম। নাঃ, যজ্ঞ করতে দেবে না। চারিদিকে রক্ত-বৃষ্টি—

২য়। রাক্ষসদের উপদ্রবে। বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারে—

৩য়। শুধু কি তাই! মেরে খেয়ে ফেলে।

১ম। মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়—

২য়। এভাবে আর কতদিন চলবে?

৩য়। পরিত্রাতা ভগবান কবে আসবেন?

১ম। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলে গেছেন শীঘ্রই এর অবসান হবে। তিনি দশরথনন্দন রাম এবং লক্ষ্মণকে আনতে গেছেন।

২য়। রাজা দশরথ আসছেন না? এই বালকেরা কি রাক্ষসদের সঙ্গে পেরে উঠবে?

৩য়। বটেই তো। রাক্ষসরা তো ওদের গিলেই খেয়ে ফেলবে।

১ম। আরে না, না। গুরুদেব বলেছেন যে রাম-লক্ষ্মণরূপে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন রাক্ষসকুল ধ্বংস করে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করতে।

নেপথ্যে—"গুরুদেব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের" জয়ধ্বনি

২য়। ঐ গুরুদেব এসে পড়েছেন।

৩য়। (দেখে) হ্যাঁ, এই দিকেই তো আসছেন। সঙ্গে দু'টি বালক।

১ম। ওরাই রাম লক্ষ্মণ।

২য়। সুন্দর চেহারা। একজনের রং নবদূর্বাদলের মত—

৩য়। আর একজন হেমবর্ণ।

১ম। চল্, আমরা এগিয়ে গিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করি—

তিনজনের প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

আশ্রমের একাংশ

বিশ্বামিত্রের রাম লক্ষ্মণসহ প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। রাম, লক্ষ্মণ, এই আমাদের তপোবন।

রাম। সুন্দর জায়গা।

লক্ষ্মণ। সত্যই মনোরম।

বিশ্বামিত্র। তোমরা কি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

রাম। হ্যাঁ মহর্ষি। তবে কষ্ট হচ্ছে না।

বিশ্বামিত্র। (অস্ফুটস্বরে) কিন্তু ক্লান্ত হলে তো চলবে না। কত শ্রম, কত কষ্ট সহ্য করতে হবে। আহার নেই, নিদ্রা নেই—

লক্ষ্মণ। আপনি এসব কি বলছেন দেব?

বিশ্বামিত্র। (সম্বিৎ ফিরে পেয়ে) না, না, ও কিছু নয়। হ্যাঁ, এই আমাদের আশ্রম। আর ঐ যে নদী দেখা যাচ্ছে, ওর নাম সরযূ। তোমাদের সূর্য্যবংশে যত রাজা জন্মেছেন, সকলেই সরযূর পুণ্যতীরে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গবাসে গেছেন। এই পুণ্যতীর্থে স্নান করবে চল। আমি তোমাদের মন্ত্র দেব।

রাম। কি মন্ত্র প্রভু?

বিশ্বামিত্র। সুমন্ত্র দীক্ষা।

লক্ষ্মণ। এ মন্ত্রের কি ফল?

বিশ্বামিত্র। শোক দুঃখ কখনও না পাইবে অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে॥

তারপর তোমাদের দেব অস্ত্র শিক্ষা। বহুদিন তপস্যা করে যে সকল দৈব অস্ত্র লাভ করেছি, সবই তুলে দেব তোমাদের হাতে। তোমরা হবে অপরাজেয়। চল, আর দেরী কোরো না।

সকলের প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

আশ্রমে আরেক অংশ

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র। ঐ দেখ, মুনিরা সব পূজোয় বসেছেন।

রাম। কেমন শান্ত পবিত্র—

লক্ষ্মণ। আশ্রমে ছেয়ে রয়েছে একটা পুণ্যভাব।

বিশ্বামিত্র। কিন্তু এই অবস্থা তো থাকবে না। এখনই হয়ত' রাক্ষসরা এসে পড়বে। এই শান্ত আশ্রম তাণ্ডব রণক্ষেত্রে পরিণত হবে।

নেপথ্যে চীৎকার—"রাক্ষস রাক্ষস।"

বিশ্বামিত্র। ঐ রাক্ষসেরা আক্রমণ করেছে। যা ভয় করেছিলুম তাই হ'ল। রাম, লক্ষ্মণ, শীঘ্র চল। আশ্রম-বাসীদের রক্ষা কর। রাজপুত্রের কর্ত্তব্যপালন কর।

রাম। চলুন প্রভু।

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ, আর দেরী নয়। আমরা রাক্ষস নিধন করে আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করব।

পট পরিবর্ত্তন

আশ্রমের অপর এক অংশ

পটের বাইরে রাম লক্ষ্মণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। মুনিবালকরা দূর থেকে দেখছে

১ম। কি অপূর্ব রণকৌশল!

২য়। ছোট্ট দু'টি ছেলে, কিন্তু কি লড়ছে দেখেছিস্।

৩য়। যেন প্রত্যেকে একাই একশো।

১ম। ঐ দেখ, তাড়কা রাক্ষসী আসছে।

২য়। ওরে বাবা! হাতে কত বড় পাথর।

৩য়। ওরা তো পাথরের তলায় পিষে যাবে।

১ম। কায়দাটা দেখ। লক্ষ্মণ একা সমস্ত রাক্ষসদের সঙ্গে লড়ছে—

২য়। আর রাম তাড়কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩য়। ঐ ছাখ, তাড়কা পাথরটাকে মাথার ওপর তুলেছে। রামকে ছুড়ে মারবে।

১ম। নাঃ, আর দেখতে পারা যাচ্ছে না।

মুখ ঢাকল

২য়। ছাখ, ছাখ, কি আশ্চর্য্য! রামের বাণে তাড়কার দু'টো হাতই কেটে পড়ল।

৩য়। এ দিকে লক্ষ্মণের নিপুণ শরাঘাতে রাক্ষসদল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

১ম। ওরে, রাম নতুন শর যোজন করছে! বাণের মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে।

২য়। ঐ বাণ ছাড়লে। ওদিকে রাক্ষসী হাঁ করে রামকে গিলতে আসছে। কি ভয়ানক!

৩য়। অদ্ভুত ব্যাপার। পাহাড়ের মত বিরাটকায় রাক্ষসী ছিন্নমূল গাছের মত লুটিয়ে পড়ল।

১ম। আর ঐ ছাখ, লক্ষ্মণের বাণে মারীচাদি রাক্ষসকুল প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

২য়। কই, তাড়কা তো আর নড়ছে না—

৩য়। নিশ্চয়ই মরে গেছে।

১ম। জয়ধ্বনি কর। জয়, রাম লক্ষ্মণের জয়—

২য় ও ৩য়। (একসঙ্গে) জয়, রাম লক্ষ্মণের জয়।

২য়। চল্, আমরা এগিয়ে দেখে আসি—

৩য়। হ্যাঁ, চল্। রাক্ষস মরে কেমন দেখায় দেখা যাক্।

সকলের প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

আশ্রমের অন্য এক অংশ

রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। ধন্য রাম! ধন্য লক্ষ্মণ! তোমাদের অদ্ভুত বীরত্ব অপূর্ব রণকৌশল আমাদের মুগ্ধ করেছে।

রাম। মহর্ষি! সবই আপনার আশীর্বাদ।

লক্ষ্মণ। আপনারই প্রদত্ত বাণে আমরা জয়লাভ করেছি।

বিশ্বামিত্র। আমরাও ধন্য। আশ্রম আজ শান্তিলাভ করল। রাক্ষসদের হাত থেকে অব্যাহতি পেল! হ্যাঁ, রাম, লক্ষ্মণ, আমাদের আরও একটা কাজ বাকী আছে।

রাম। আজ্ঞা করুন দেব।

বিশ্বামিত্র। একবার জনক রাজার সভায় যেতে হবে।

লক্ষ্মণ। কেন প্রভু?

বিশ্বামিত্র। শিবপ্রদত্ত এক ধনু তাঁর কাছে আছে। শিবের শিষ্য পরশুরাম সেই ধনু জনক রাজার কাছে রেখে গেছেন। আর বলে গেছেন যে, এই ধনু তুলে যে গুণ পরাতে পারবে, তারই সঙ্গে যেন জনকদুহিতা সীতার বিবাহ হয়। পরশুরামের বিশ্বাস তিনি ছাড়া একাজ আর কেউ করতে পারবে না।

রাম। কেউ চেষ্টা করে দেখেছে কি?

বিশ্বামিত্র। অনেকে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউ পারে নি। এমন কি মহাবলী রাক্ষসরাজ রাবণ পর্যন্ত সে ধনু তুলতে পারে নি।

লক্ষ্মণ। পরশুরামের ইচ্ছাটা কি?

বিশ্বামিত্র। তিনি তপস্যা করতে গেছেন। ফেরবার সময় হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা, তিনি সেই ধনু তুলে গুণ পরাবেন, আর জনক রাজার প্রতিশ্রুতি মত তাঁর কন্যাকে বিবাহ করবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা, তোমরা পরশুরামের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্বেই গিয়ে জনক রাজকে প্রতিশ্রুতি পাশ থেকে মুক্ত কর। রাম, তোমায় আমি এই কাজের ভার দিলুম।

রাম। আমাকে আশীর্বাদ করুন প্রভু। (ক্রমশঃ)

বর্ষ বিদায়ের ক্ষণে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জীবনের সিন্ধুবক্ষে কল্পনার মানচিত্রখানি
দ্রাঘিমায় দ্রাঘিমায় বিস্তীর্ণ হয়েছে বহুদূর।
রাত্রির ছায়ায় নামে বর্ষ-বিদায়ের শেষ বাণী
আর ওঠে বেদনার সুর।
বসন্তের বর্ণ সমারোহে নব নব পুষ্প বুকে
গামারশ্মিরেখা রাজে ভাগ্যদিগন্তের চারিভিতে
সূর্য্যের মঞ্জরী হ'তে স্বপ্নালোক ঝরে কেন দুখে
নববর্ষ ভূমিকারে নিতে।

বিদ্যুৎ মন্থন দিল কালবৈশাখীর রুদ্র ঝড়ে
আসন্ন আবার। কামনার বাতিঘরে কাঁপে আলো,
বালুকার ঘূর্ণী হাওয়া বন-বাঙলার চরে চরে
পণ্যপ্রাণ করে কেন কালো?
অরণ্যের বক্ষ হোতে অবিচ্ছিন্ন আশা-বনস্পতি,
সমুদ্র তরঙ্গে যারা বেঁধেছিল নিত্য খেলাঘর,
তাদের সন্তান মোরা সহিতেছি সহস্র দুর্গতি।
ভ্রমিতেছে মরণের চর।

মেঘ-চুম্বী তরঙ্গের শীর্ষ বেয়ে আসে নেমে নব
ছায়াপুরুষেরা সিন্ধু ঘোটকের দৃঢ় বল্গা ধরে।
বৈপ্লবিক পরিবেশে বিক্ষোভের শুনি কলরব
পর্ণগেহে মৌন অশ্রুবরি'।
কারা যেন রাত্রি মাঝে প্রভাতের মত প্রতীক্ষায়
নববর্ষ বন্দনায় অনুকূল আবহাওয়া লয়ে'
প্রাণধর্ম্ম করিতে জাগ্রত আজ জন্ম-মৃত্তিকায়
দাঁড়ায়েছে পুলকিত হয়ে।

ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কাল কাঁদে নিপীড়িত ইতিহাস সনে
দানবীয় প্রতিরোধ লাগি দুরন্তবাহিনী আসে
তারুণ্যের জাগরণে; তবু নানা প্রশ্ন জাগে মনে
অন্তরের উদগ্র উচ্ছ্বাসে!
দেশাত্মার স্বরভঙ্গ হোলো যেথা শতাব্দীর মাঝে,
সেথা ক্লান্তি ব্যাধি আর বুভুক্ষার সদা আর্ত্তনাদ;
সেথা বসে একা আমি; তুমি রাণু! নাহি মোর কাছে
চক্রবালে হেলে পড়ে চাঁদ।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জীব ও ব্রহ্ম, প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মা

উপনিষদে জীব ও প্রত্যক্ আত্মা শব্দ শারীরী আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহের মধ্যে অবস্থিত যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের প্রতীপ বা বিপরীত ভাবে প্রকাশিত হন তিনি প্রত্যগাত্মা। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়; তাহাদিগের হইতে বিলক্ষণ দেহমধ্যবর্ত্তী চিৎ বস্তুই প্রত্যগাত্মা। তাঁহাকে অন্তরাত্মা শব্দেও বিশেষিত করা হইয়াছে। এই জীব বা প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা বা শারীর আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। কেননা ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখ, অন্তরের দিকে তাহাদের দৃষ্টি যায় না। কোনও কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি বহির্বিবর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্তরের মধ্যে এই প্রত্যগাত্মার দর্শন পাইয়াছেন। (কঠ ২।১) অন্তরাত্মা পুরুষ—অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। তিনি লোকের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি শরীর হইতে পৃথক। (কঠ—২।৩।১৬-১৭)। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন সকল ভূত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত থাকে এবং পরিণামে ব্রহ্মে লীন হয়। কিরূপে ব্রহ্ম হইতে জীবের উদ্ভব হয়, তাহা বুঝাইতে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সেইরূপ আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে সকল প্রাণ, সকল ভূত নিঃসৃত হইয়াছে, (২।১।২০)। মুণ্ডক বলেন (২।১।১) যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে তাহার স্বরূপ সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে জীবসকলের আবির্ভাব হয়। সুতরাং জীবাত্মা যে পরমাত্মার অংশ উপনিষৎ তাহাই বলেন, ইহা বলা যায়।

কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্কল, তাঁহার অংশ নাই এ কথাও উপনিষদে আছে। "তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় শান্ত" (শ্বেত-৬।১৯)। উভয় উক্তির মধ্যে অসংগতি স্পষ্ট। কিন্তু জীবাত্মা অংশরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা পরমাত্মাই, তাহা ব্রহ্মই। কিন্তু জীবাত্মার পরমাত্মার প্রকাশ সীমাবদ্ধ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম" বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক বলেন—এই বিজ্ঞানময় মহান অজ-আত্মা, যিনি প্রাণে বর্ত্তমান, তিনি জীবের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আত্মা তাহাতে অবস্থিত। (৪।৪।২২)। এই জন্য কঠ উপনিষদ পরমাত্মাকে "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" (২।১২) বলিয়াছেন।

ছান্দোগ্য বলেন, তিনিই অধোভাগে, তিনিই উর্দ্ধে। তিনিই পশ্চাতে তিনি সম্মুখে তিনি দক্ষিণে, তিনি বামে, তিনিই এসকল। (৭।২৫।২) শ্বেতাশ্বতর বলেন "তাহা হইতে পরতর অন্যতর কিছু নাই।" (৩.৯) উপনিষদে যে সৃষ্টির কথা আছে, যাহাতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অন্য বস্তুর—যেমন জীবের ও জড়ের সৃষ্টির কথা আছে, তাহা মন্দবুদ্ধি লোককে বুঝাইবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি দ্বৈত বা নানাত্বের উপদেশ করেন নাই। "উপদেশাৎ অয়ং বাদঃ জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে। উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তিভেদঃ কথঞ্চন" (মাণ্ডুক্যকারিকা)। দ্বৈত নাই, ভেদ নাই।

"অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম"। এই আত্মা (জীবাত্মা) ব্রহ্ম। "তৎত্বম অসি"—তুমিই সেই। ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। জড়জগৎ, ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম। দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই, উপনিষদের বহু স্থলে এই অদ্বৈতবাদ ধ্বনিত।

কিন্তু জীব যে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র; ব্রহ্মেও জীবে ভেদ আছে, একথাও বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে। "দুই পক্ষী এক বৃক্ষে বাস করে। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত ও সখ্যভাবাপন্ন। একজন মিষ্ট ফল ভোগ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।" (মুণ্ডক ৩।১) এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার জীবদেহে একত্র অবস্থানের কথা আছে। কঠোপনিষদে (১।৩।১) জীব ও ব্রহ্ম উভয়কে হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ, অজা হি একা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থযুক্তা"। জ্ঞ (ঈশ্বর), অজ্ঞ (জীব) দুইজন আছে। জ্ঞ ঈশ্বর, আর অজ্ঞ জীব। অজা (প্রকৃতি) ভোক্তার (জীবের) ভোগ্য বিষয় প্রদায়িনী। "ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ। ক্ষরাত্মানৌ ঈশতে দেব একঃ" (১।১০) প্রধান (প্রকৃতি) ক্ষর, হর অমৃত ও অক্ষর। এক দেব (হর, ঈশ্বর) ক্ষর ও আত্মাকে নিয়মিত করেন।

প্রশ্নোপনিষৎ বলেন—

> বিজ্ঞানাত্মা সহদেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
> প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
> তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
> স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেব আবিবেশেতি।৪।১১

যাহাতে বিজ্ঞানাত্মা (শারীর আত্মা) প্রাণসমূহও ভূতসমূহ সকল দেবতার সহিত (ইন্দ্রিয়দিগের সহিত) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

মুণ্ডকে আছে—

> যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
> অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
> তথা বিদ্বান্ নামরূপে বিহায়
> পরাৎপরং পুরুষং উপৈতি দিব্যং।৩।২।৮

নদী সকল যেমন নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনি বিদ্বান্ ব্যক্তিও নামরূপ বর্জ্জন করিয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন।

এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে মুক্তিতে যাহাই হউক না

কেন, মুক্তি পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। মুক্তিতে জীবাত্মার অস্তিত্বের লোপ হয় কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা প্রতিক্ষণ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অনুভব করি। বাহ্যজগতের জ্ঞাতা রূপে আমাদের নিজের অস্তিত্বও অনুভব করি। ইহা অস্বীকার করা যায় না। বিবর্ত্তবাদী বলেন এই অনুভব মিথ্যা—অর্থাৎ যাহা অনুভব করি বলিয়া মনে হয় তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। মরীচিকা যেমন আমরা দেখি, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব নাই। জলে সূর্য্যের ও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সেই প্রতিবিম্বের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট অস্তিত্ববান বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের মধ্যে জগতের জ্ঞাতারূপে যে সসীম আত্মার বোধ হয়, তাহারও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। এই উভয় অনুভূতির মূলে আছে অবিদ্যা, যাহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। একব্রহ্মই আছেন। তিনি দেশ ও কালের অতীত—নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল। তাহার কোনও পরিবর্ত্তন কখনও হয় না। দেশ ও কালে প্রকাশিত জড়জগৎ মিথ্যা এবং আমাদের মধ্যে সসীমরূপে প্রতীয়মান আত্মা ও বাস্তবিক অস্তিত্ব হীন। কিন্তু পরিণামবাদী ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করেন এবং বাহ্যজগৎ ও জীবাত্মা যে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মের মধ্যেও বর্ত্তমান, তাহা স্বীকার করেন। বেদান্ত দর্শনের আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব। উভয় মতের সমর্থক প্রমাণই উপনিষদে আছে।

উপনিষদে সৃষ্টি

ঋগ্বেদে নারদীয় সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার সুন্দর বর্ণনা আছে।

—না-সদ্ আসীৎ, নো-সদ্ আসীৎ তদানীং ;
নাসীদ্ রজো, নো ব্যোম পরো যৎ।
কিম্ আবরীবঃ, কুহকস্য শর্ম্মন্
অম্ভঃ কিম্ আসীদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যু রাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ্ অবাতং স্বধয়াতদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ নপরঃ কিঞ্চনাস।
তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে
অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্ব মা ইদম্।
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যৎ আসীৎ
সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।

১০।১২৯।১-৪

তখন অসৎ ও ছিল না, সৎ ও ছিল না। অন্তরিক্ষ ছিল না, ব্যোম ও ছিল না, কিসে আবৃত ছিল? কোথায় ছিল, কাহার আশ্রয়ে? ইহা কি গহন গভীর অম্ভের ("আপ") মধ্যে ছিল?

মৃত্যু ছিল না, অমৃত ও ছিল না। দিবা রাত্রির প্রভেদ ও ছিল না। কেবল তদেকং (সেই এক) নিজে বিনা বায়ুতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস করিতেন। তিনি ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না।

প্রথমে তমঃ তম দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এ সকলই অপ্রকেত সলিলমাত্র ছিল। অগ্রে কাম উদ্ভূত হইল। ইহাই মনের প্রথম রেতঃ (বীজ)। কবিগণ হৃদয়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া মনীষা দ্বারা অসতের মধ্যে সতের বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (সৎও অসতের মধ্যে সংযোগ সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

ব্রহ্ম সৎ ও অসতের অতীত। সৎ—প্রকাশিত অবস্থা। অসৎ॥ অপ্রকাশিত অবস্থা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

যদা তমস্তন্নদিবা ন রাত্রিঃ
ন সৎ ন চাসৎ শিব এ কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতু র্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।

(সৃষ্টির প্রাক্‌কালে যখন তমঃ বিদূরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল) তখন দিবা ও নহে, রাত্রিও নহে। সৎ ও ছিল না, অসৎ ও ছিল না, কেবল শিবই ছিলেন। তিনিই অক্ষর, সবিতার বরণ্যে। তাহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল।

উপনিষদে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। তাহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপনিষদে স্বীকৃত নহে। আরিষ্টটল রূপ ও উপাদান (From and matter) নামক দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণের নিকট এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব ছিল না। যাহা কিছু আছে, তাহা ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত—অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নিহিত হয়, অথবা উর্ণনাভের শরীর হইতে যেমন উর্ণা বাহির হয়। "নানা" নাই—যাহা আছে সকলই নিষ্কল ব্রহ্ম। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে নানারূপে প্রতীয়মান জড় ও জীব সমন্বিত জগতের উদ্ভবের বিভিন্ন বর্ণনা বিভিন্ন উপনিষদে আছে।

বৃহদারণ্যকে আছে ; এই জগৎ পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে বর্ত্তমান ছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি আছি"। ইহা হইতেই "অহং" নামের উৎপত্তি হইল। তিনি (একাকী ছিলেন বলিয়া) ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভাবিলেন "আমা হইতে ভিন্ন তো কিছুই নাই। তবে কেন ভীত হইব?" তখন ভয় চলিয়া গেল। কিন্তু তিনি আনন্দলাভ করিলেন না, দ্বিতীয় একজন কে পাইবার ইচ্ছা করিলেন, এবং স্বীয় দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী হইল। পতিও পত্নী হইতে মানবের উৎপত্তি হইল। পত্নী তখন গাভী হইলেন, পতি বৃষ হইলেন। তাহাদিগের হইতে গো জাতির উৎপত্তি হইল। পত্নী অশ্বী হইলেন, পতি অশ্ব হইলেন। তাহাদিগের হইতে অশ্ব জাতির উদ্ভব হইল। তখন সেই আত্মা চিন্তা করিলেন আমিই এই সৃষ্টি। তিনিই সৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

ঐতরেয় উপনিষদ বলেন—"আত্মা বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত। অম্ভঃ মরীচি, র্মর মাপঃ।" পূর্ব্বে এক আত্মামাত্র ছিল। নিমেষ ক্রিয়াবৎ আর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন—"আমি কি লোক সকল সৃষ্টি করিব ? তিনি অম্ভ, (যাহা অপ্‌কে ধারণ করে, দ্যুৎলোকের উপর) মরীচি (আন্তরিক্ষ) মর (পৃথিবী) ও অপ (পৃথিবীর নিম্নস্থ জল) সৃষ্টি করিলেন। ইহার পরে তিনি জল হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। তিনি সেই পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রশ্ন উপনিষদে আছে কত্য পুত্র কবন্ধী ঋষি পিপ্পলাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রাণিগণ কোথা হইতে আসে। পিপ্‌পলাদ কহিলেন প্রজাকাম প্রজাপতি তপস্যা (সংকল্প) করিলেন—এবং রয়ি ও প্রাণ এই মিথুনের সৃষ্টি করিলেন। রয়ি আদি ভূত। যাহা মূর্ত্ত, যাহা অমূর্ত্ত সকলই রয়ি। রয়ি বিশ্বের চরম উপাদান। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই রয়িকে 'আপ' বলা হইয়াছে। "আপ এব ইমা মূর্ত্তাঃ—যেযং পৃথিবী যৎ অন্তরিক্ষং, যৎ দ্যৌঃ, যৎ পর্ব্বতাঃ...যৎ দেব মনুষ্যা, পশবশ্চ যৎ বয়াংসি চ তৃণবন-স্পতয়ঃ শ্বাপদান্য কীটপতঙ্গপিপীলকম আপ-এ ব-ইমা মূর্ত্তা" (৭।১০।১), পৃথিবী, আন্তরিক্ষ, দ্যৌঃ, পর্ব্বত, দেবমনুষ্যগণ, পশুগণ পক্ষিগণ তৃণ বনস্পতিগণ, শ্বাপদ, কীট-পতঙ্গ পিপীলিকা, এই সকল মূর্ত্ত বস্তুই আপ। ঐ উপনিষদেই আছে :

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। তৎ হি একে আহুঃ অসদেব ইদম্ অগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ সৎ জায়ত।...কথমসতঃ সৎ জায়ত ? সৎ তু এব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ একমেবা দ্বিতীয়ং। তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয় ইত্যাদি। এক অদ্বিতীয় 'সৎ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সংকল্প হইতেই বহুর উদ্ভব হইয়াছিল।

এক সৎ হইতে জগতের উৎপত্তি ইহাই উপনিষদের মত। ব্রহ্মের ভিতরই জগতের—উপাদান বর্ত্তমান ছিল স্বরূপে জগৎ ও ব্রহ্ম এক।

উপরে যে রয়ির কথা বলা হইয়াছে, যাবতীয় অমূর্ত্ত (যেমন বায়ু ও আকাশ) ও মূর্ত্ত বস্তু সেই রয়ি। আদিত্যই প্রাণ—সর্ব্ব প্রাণের প্রতীক। তিনি "প্রাণঃ প্রজানাম্।" চন্দ্রমা রয়ির প্রতীক। আদিত্য যে প্রাণের প্রতীক, তাহা সার্ব্বিক প্রাণ—অক্ষর হইতে উৎপন্ন। মুণ্ডক উপনিষদে (২।১) দিব্য, অমূর্ত্ত, অজ অপ্রাণ, অমনঃ হিরণ্যগর্ভরূপ পর অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠতর পুরুষ হইতে প্রাণের উৎপত্তির কথা আছে। "এই সকল এবং ত্রিদিবে (স্বর্গে) যাহা প্রতিষ্ঠিত, সকলেই প্রাণের বশে আছে" (প্রশ্ন—২।১৩)। প্রাণ ব্রাত্য (অসংস্কৃত অবস্থাতেই শুদ্ধ), একর্ষি ও সৎপতি (প্রশ্ন—২।১১) অথর্ব্ববেদে এই প্রাণকে "সর্ব্বস্য ঈশ্বর, এবং প্রাণেই সকল প্রতিষ্ঠিত" বলা হইয়াছে। (১১।৪)। বৃহদারণ্যকে প্রাণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। (৩।৯।৯)। "প্রাণো বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যৎ ইদং কিঞ্চ" (ছাঃ—৩,১৫।৪) কৌষী তকি উপনিষদে আছে "যো বৈ প্রাণঃ, স প্রজ্ঞা। যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা। যিনি প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা, যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ। বার্গস যে Elan Vital এর কথা বলিয়াছেন, তাহাই এই সার্ব্বিক প্রাণ।

উপনিষদে রয়ি ও প্রাণকে নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কোথায়ও রয়ি ক্ষর এবং প্রাণ অক্ষর, কোথায়ও রয়ি অন্ন, প্রাণ অত্তা, (ভোক্তা), কোথায়ও বা রয়ি স্বধা, প্রাণ প্রয়তি (ভোক্তা)। ঋগ্বেদে (১০।১২৯।৫) স্বধাকে প্রয়তি অপেক্ষা অবর বলা হইয়াছে। "স্বধা অধস্তাৎ, প্রয়তি পরস্তাৎ"। স্বধা—অন্ন, ভোগ্য বস্তু, প্রয়তি ভোক্তা। অধস্তাৎ অবর, নিকৃষ্ট ; পরস্তাৎ উৎকৃষ্ট। মুণ্ডক উপনিষদে আছে উর্ণনাভি যেমন, নিজের শরীর হইতে তন্তু বাহির করে, এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধিগণ জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষের শরীরে কেশও লোম বাহির হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়। (১।১।৭)

তপস্যা (সিসৃক্ষা—কিরূপে সৃষ্টি করা যায়, তাহার জ্ঞান) দ্বারা ব্রহ্ম প্রবৃদ্ধ (স্ফীত) হইলেন। তাহা হইতে অন্ন (জগতের বীজ—অব্যাকৃত প্রকৃতি, রয়ি, আপ) উৎপন্ন হইল। অন্ন হইতে প্রাণ, মন, সত্য (পঞ্চভূত), লোক (ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি লোক) এবং কর্ম্মের অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইল। (১।১।৮) এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে ব্রহ্মই অন্ন, প্রাণ-মন প্রভৃতিতে পরিণত হইলেন। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাহা হইতে ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), নামরূপ ও অন্ন জন্মিয়াছে। ১।১।৯ শ্লোকে যে প্রাণের কথা আছে, বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে, তাহাই সাংখ্যের মহৎ তত্ত্ব। ১।১।৯ শ্লোকের ব্রহ্ম শব্দ ও একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। (হিরণ্যগর্ভই মহৎ-তত্ত্ব।) রয়ি ও প্রাণ প্রজাপতির সৃষ্ট। কিন্তু তাহাদের উপাদান প্রজাপতি নিজেই। ব্রহ্মের সগুণাবস্থাই প্রজাপতি। ব্রহ্ম রয়ি ও প্রাণের যেমন নিমিত্ত কারণ তেমনি উপাদান কারণ। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই। রয়ি ও প্রাণের মধ্যে ব্রহ্ম অনুস্যূত।

স অকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত যদিকং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ। তদনু প্রবিশ্য সৎচ ত্যৎচ অভবৎ—নিরুক্তং চ অনিরুক্তং চ, নিলয়নঞ্চ, অনিলয়নঞ্চ, বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানঞ্চ। ** অসৎ বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ। ততো বৈ সৎ অজায়ত। তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত। (তৈ-উ ২।৬, ২।৭) আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, ইহা তিনি কামনা করিলেন। তিনি তপস্যা করিলেন (মনে আলোচনা করিলেন)। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিলেন। ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন এবং সৎ ও ত্যৎ (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত), নিরুক্ত ও অনিরুক্ত (বচনীয় ও অনির্বচনীয়) আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন হইলেন। ** এই জগৎ অগ্রে অসৎ (নাম ও রূপদ্বারা অপ্রকাশিত) অবস্থায় ছিল। সেই অসৎ হইতে নামরূপে প্রকাশিত (সং) জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি আপনাকে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ নামরূপে প্রকাশিত করিলেন।

পুরুষ সূক্তে এই অনুপ্রবেশের কথা আছে। "স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্" তিনি সর্বত্র আবরণ করিয়া দশঅঙ্গুলি উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত হইলেন। তথাকথিত জড়ের মধ্যে যেমন তিনি অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি জীবের মধ্যেও।

"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ, পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ, পুরঃ স পক্ষীভূত্বা- পুরঃ পুরুষঃ আবিশৎ। ঈশ্বর দ্বিপদের (মনুষ্যের) পুর (দেহ) ও চতুষ্পদের পুর নির্মাণ করিয়া প্রথমে পক্ষী হইয়া সেই সকল দেহে আবিষ্ট হইলেন। (বৃ-আ ২।৫।১৮) ব্রহ্ম জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও জগদতীত। উপনিষদে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব—তিনি জগতের Efficient এবং Material cause.

দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের সগুণ রূপ। ইহার মধ্যে ও ইহার বাহিরে ব্রহ্মের নির্গুণ রূপ। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল ও সমুৎপাদিক) Phenomenal)। ইহা নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহার মধ্যে প্রত্যেক বস্তু নিত্য রূপান্তরিত হওয়ার ফলে নূতন বস্তুর উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের তলদেশে ব্রহ্ম অপরিণামী অবস্থায় বর্ত্তমান—তিনি দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, দেশ ও কালের অতীত। যাবতীয় সমুৎপাদ তাঁহারই মধ্যে সমুৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে, কিন্তু তিনি উৎপত্তি ও লয়হীন। সমুৎপাদিক জগতের মধ্যেই তাঁহার ইচ্ছাময় ও জ্ঞান-বল-ক্রিয়া রূপ বর্ত্তমান। এই রূপে তিনি ঈশ্বর। এই ঈশ্বরেরই অপর রূপ ব্রহ্ম। বেদান্তের একপ্রকার ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের জগতে প্রকাশিত রূপকে অধ্যাস বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের এইরূপ না থাকিলেও, ইহা তাহাতে কল্পিত হয় বলা হইয়াছে। ইহাকে অনির্ব্বচনীয় মায়াও বলা হইয়াছে। এই মায়া সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের আলোচনার সময় আমরা আলোচনা করিব। কিন্তু উপনিষদে অনেকস্থলে দৃশ্যমান জগৎ—নানা ভাগে বিভক্ত জগৎ—সত্য নহে বলা হইয়াছে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এখানে 'নানা' নাই, এই জগৎ নাম ও রূপ মাত্র। মৃত্তিকা নির্মিত নানাবিধ বস্তু ও স্বর্ণ নির্মিত নানাবিধ অলংকারের মধ্যে যেমন মৃত্তিকা ও স্বর্ণই সত্য, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেবল "বাচারম্ভণ" বাক্যমাত্র ইত্যাকার উক্তি পাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্ম তেজ অপ ও অন্ন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, দ্বিপদ চতুষ্পদ দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ইত্যাদি জগতের বাস্তব অস্তিত্ব সূচক উক্তিও পাওয়া যায়। এই জগৎ স্বপ্নের মত অলীক, এবং জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য, এই উভয় মতই উপনিষদের বিভিন্ন উক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায়।

ব্রহ্ম অসঙ্গ (absolute)। অসঙ্গের সহিত জগতের সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু জগতের অস্তিত্ব তো অস্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রিয়-দ্বারপথে যাহা আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে, তাহাকে অস্বীকার করা, তাহার অস্তিত্ব নাই বলা অসম্ভব। কিরূপে জগতের অস্তিত্বের ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যাখ্যার জন্য মায়াবাদের উদ্ভব। এই মায়া অনির্ব্বচনীয়। ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। জগতের ধ্বংস হইলেও তাহারা ব্রহ্মে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রহ্ম জগতের বাহিরে অবস্থিত। জগতের স্রষ্টৃত্ব তাহার তটস্থ লক্ষণ, স্বরূপ লক্ষণ নহে। তিনি সৃষ্টি করেন না, কিন্তু স্রষ্টারূপে প্রতিভাত হন। জগতেরই যখন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তখন তাহার সৃষ্টির কথা অর্থহীন। পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব মায়াবাদে অস্বীকৃত নহে, কিন্তু ব্যবহারিক অস্তিত্বের অর্থ প্রতিভাসিক অস্তিত্ব—অস্তিত্বহীন বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি। এই প্রতীতি হয় অবিদ্যা বা মায়ার জন্য। এই মতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ একরস (homogeneores) ব্যক্তিত্বহীন চিৎমাত্র। তাহার মধ্যে দ্বৈতের লেশমাত্রও নাই। প্রিন্সিপাল থিব (Thibaut) লিখিয়াছেন "উপনিষদে এরূপ উক্তি আছে যাহা হইতে ব্রহ্ম যাবতীয় গুণের অতীত দ্বৈতহীন।ও ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত চিৎ-রাশি রূপে অনুমিত হন। কিন্তু এই বহুত্ব সমন্বিত জগতের বোধকে যখন অস্বীকার করা অসম্ভব, তখন ইহার বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া এই বোধকে মায়া বলাই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। মায়ার সহিত ব্রহ্ম সংযুক্ত কিন্তু মায়া ব্রহ্মের একত্ব ভঙ্গ করিতে অসমর্থ, কেন না ইহার নিজেরই বাস্তব সত্তা নাই।

ডয়সেনের মতে—ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, এবং সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই, ইহাই উপনিষদের মত। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ বলেন—ডয়সেনের নিজের মত তিনি উপনিষদের মধ্যে খুঁজিয়াছেন, এবং সেই অনুসারে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডয়সেনের মতে দেশ ও কালের জগৎ প্রতিভাস, ঈশ্বরের ছায়া, মায়া—ইহাই উপনিষদের মত। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে প্রাতিভাসিক জগতকে বর্জ্জন করিতে হইবে। তাঁহার মতে প্রত্যেক সত্য ধর্ম্মের সার কথা এই যে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। প্রাচীন ভারতের দর্শনে, উপনিষদে, শঙ্করাচার্য্যে, প্রাচীন গ্রীসে পারমেনিদিস, প্লেটো এবং আধুনিক জার্ম্মাণির ক্যান্ট ও সোপেনহয়েরর দর্শনে ডয়সেন আপনার এই মতের সমর্থন খুঁজিয়াছেন, কিন্তু তথ্য (facts) সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন উপনিষদের বিভিন্ন মতের মধ্যে সর্ব্বেশ্বরবাদই (pantheism) প্রধান। কিন্তু তাহার মৌলিক মত (Fundamental doctrine) মায়াবাদ। কিন্তু মায়াবাদই উপনিষদের মৌলিক মত ইহা ডয়সেনের নিজের মত। উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ডয়সেন বলেন যে সাধারণ লোকের অনুভবকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের বিরাগ উৎপাদন পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বেশ্বরবাদ কল্পিত হইয়াছিল (It is a concession to popular clamour and the Empirical demands of the unregenerate man) ডয়সেন বলেন যে উপনিষদের মূল কথা এই যে আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অল্পাধিক পরিমাণে জগতের অস্তিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, তাহা হইলে জগৎ অসত্য। কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত বলিয়া তাহার মধ্যে যে সসীমের স্থান থাকিতে পারে না, ইহা সত্য নহে। অসীম সসীমের বিপরীত নহে। যাহা সনাতন তাহা কালিকের বিপরীত নহে। দেশ ও কালে অবস্থিত
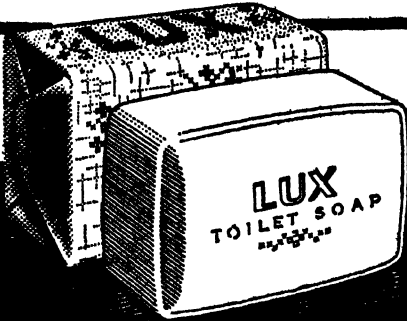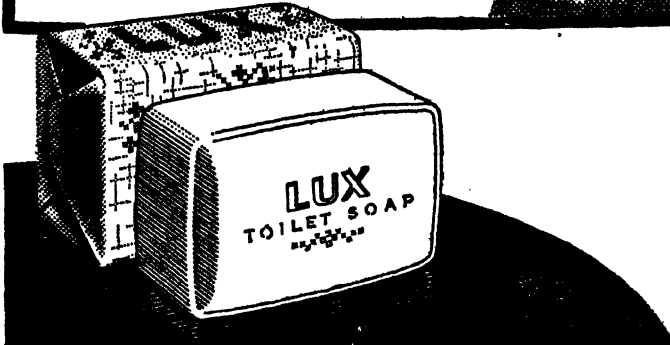
জগৎ এবং অসঙ্গ শাশ্বত জগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব মৌলিক (ultimate) এবং অনতিক্রম্য, ইহা সত্য। কিন্তু সসীম যে অসীমের বাহিরে একথা উপনিষদে কোথায়ও নাই। যেখানেই ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলা হইয়াছে, সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে জগতের মূল ব্রহ্মে প্রোথিত। সুতরাং তাহারও কিছু সত্যতা আছে। কোনও বস্তুকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাতে যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার সত্যতাও স্বীকার করা হয়। "আত্মাকে জানিলে সকলই জানা হয়।" ইহা হইতে আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু নাই, ইহা অনুমান করা যায় না। আত্মার মধ্যে সকলই অবস্থিত বলিয়া আত্মাকে জানিলে সকলই জানা হয়। যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবিশিষ্ট, যদি আত্মার মধ্যে তাহার স্থান না থাকে, তাহা হইলে আত্মা বস্তুত্বহীন বিকল্প মাত্র হইয়া পড়ে। অসঙ্গের মধ্যে যদি বিভিন্ন ভেদ না থাকে, তাহা হইলে তাহা অবস্তুমাত্র। যাহা সনাতন তাহার মধ্যে কালিক কিছু নাই, ইহা বলা চলে না। যাহা কালিক (temporal), তাহার মূল সনাতনের মধ্যে। মানুষের সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মীয় ও নৈতিক অনুভব দ্বারা ইহাই সমর্থিত হয়। জগৎ মায়ামাত্র ইহাই যদি উপনিষদের মত হইত, তাহা হইলে জগতের সত্তা যে আপেক্ষিক, জগৎ যে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল, তাহারা ইহা বলিতেন না। নাম এবং রূপই যে জগতের বৈচিত্র্যের কারণ, এ কথা উপনিষদে আছে সত্য। কিন্তু তাহা দ্বারা জগৎ যে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন, তাহা প্রমাণিত হয় না। নাম রূপের মধ্যে যে সত্তার প্রকাশ, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। নামরূপের আবরণ ভেদ করিয়া সেই সত্তায় পৌঁছিতে হয়। এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ Edward Cerpenter এর Pagan and Christian creed হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"বৃক্ষের প্রত্যেক পাতার স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে, যে—সে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রবস্তু, সূর্য্যালোকে ও বায়ুর মধ্যে সে আপনাকে রক্ষা করিতেছে, এবং যখন শীত আসিবে তখন শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা তাহার মনে হয় না যে বৃক্ষ হইতে যে রস প্রবাহিত হয়, তাহা দ্বারাই তাহার জীবন রক্ষিত হয়, এবং সে নিজেই বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ করিতেছে, এবং সমগ্র বৃক্ষের আত্মাই তাঁহার আত্মা। জগতের জড় ও চেতন প্রত্যেক বস্তুর সহিত সমগ্র বিশ্বের আত্মার সম্বন্ধও এইরূপ।*

জগতে নানা নাই, এ কথা উপনিষদে নানাভাবে বহুবার উক্ত হইয়াছে। কিন্তু নানাত্বের এই অস্বীকৃতি দ্বারা, জগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই।—জগতের একত্বই উক্ত হইয়াছে, জগৎ যে এক অনন্ত ব্রহ্মের প্রকাশ এই কথাই বলা হইয়াছে। জগৎকে যদি খণ্ড খণ্ড সসীম বস্তুর সমষ্টি গণ্য করা হয়, তাহা হইলে সে ধারণা ভুল। সত্য দৃষ্টিতে জগৎ এক অখণ্ড বস্তু, তাহা ব্রহ্মের-অন্তর্ভুক্ত। বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে বিলীন হয়, দ্বৈত তখন থাকে না। "সুষুপ্তিস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ।" জাগ্রৎ অবস্থার নানাত্ব, দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তুর অবস্থা, কালে ব্যবস্থিত পৌর্ব্বাপর্য্যের অবস্থা, কারণ ও কার্য্যের দৃশ্যমান ভেদযুক্ত অবস্থা। এই অবস্থা পূর্ণ সত্য নহে। পূর্ণ সত্য দেশ, কাল ও কার্য্য কারণত্বের অতীত। উপনিষৎ সত্যের ক্রম-ভেদ স্বীকার করেন। জগতের নানাত্ব নিম্নস্তরের সত্য। যখন পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার হয়, তখন নানাত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। নানাত্বের পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলে ও ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে।

* Radha Krishnan's Indian Philosophy p. 189-90

সমালোচকের প্রতি

পুলক আঢ্য

উপল কুড়ায়ে চলেছি রাত্রি দিন,
চাইনে মুক্তি, যেহেতু পাইনি মুক্তার সন্ধান
বেলাভূমে তবু বালিয়াড়িটার পাশে
একটু বসার ঠাঁই করে নেছি—
আতপদগ্ধ ঘাসে।
সেথায় তোমার দৃষ্টি যাবে না জানি,
যেহেতু মোদের কৃষ্টি ভিন্নমুখী।
তবু যদি চোখে চোখ পড়ে যায়, বলো—
নেবে গুণ্ঠন টানি ?
বরণ ক'রতে বাধা আছে বহু বুঝি,
স্বীকার ক'রতে বলো কি এমন ক্ষতি ?
"অনেকেরি মত আমিও চলেছি খুঁজি,
ভিন্ন হ'লেও ব্যাহত নয় সে গতি।"

* * * *

অনেকেরি মত তাই আমি উৎসুক,
বন্ধু, দেখতে তব প্রসন্ন মুখ।

মা

(সমার সেট্ মম্)

অনুবাদক—মৃণালচন্দ্র দেব

বচসার শব্দ কানে যেতে জন দু' তিনেক লোক কোঠা থেকে বেরিয়ে এসে শুনতে লাগ্‌লো কান পেতে।

নোতুন ভাড়াটিয়া—কুলির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতল ভাড়াটিয়া বাড়ী—মধ্যে প্রাঙ্গণ। "লা মেকারীনার" পেছনের রাস্তায় সেভাইলের সবচেয়ে নোঙরা পল্লী।

কোঠাগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে—শ্রমিকদের, অধঃস্তন কর্ম্মচারীদের, পোষ্টম্যান, পুলিশ, ট্রাম কন্‌ডাক্টারদের—যারা ছেয়ে আছে সমস্ত স্পেন নগরী। জায়গাটীতে শিশু কিলবিল করছে। প্রায় বিশটি পরিবার বাস করছে সেখানে। ঝগড়া করছে—আবার মিটমাটও করছে। একে অন্যের মাথা ফাটাচ্ছে—সাহায্যের দরকার হলে আবার একে অন্যকে সাহায্যও করছে। আর যাই হউক এণ্ডালুশিয়ানরা (Andalusian) শান্ত প্রকৃতির লোক। মোটের উপর তারা সদ্ভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। একটি ঘর অনেকদিন ধরেই খালি পড়েছিল। সেদিন সকালে এক মহিলা সেইটী ভাড়া নিল। ঘণ্টাখানেক বাদে জিনিষপত্র নিয়ে মহিলাটি এসে হাজির। নিজে বয়ে এনেছে যতদূর সম্ভব—অন্যান্য মালপত্র গলীয় কুলির মাথায় চাপানো—(স্পেনে গলদেশীয়রাই কুলির কাজ করে থাকে)

কিন্তু কলহটা তুমুল হ'য়ে উঠেছে। দু'জন মহিলা ব্যালকনিতে ঝুঁকে পড়ে উৎকর্ণ হয়ে আছে যাতে সব কিছুই শোনা যায়।

নবাগতাটার ভর্ৎসনার সুউচ্চ কণ্ঠধ্বনি এবং কুলিটীর ক্ষুব্ধ গালিগালাজ তাদের কানে পৌছতে লাগল। মহিলা দুইটী পরস্পরকে কনুইয়ের ধাক্কা দিল ইঙ্গিতসূচকভাবে।

"ভাড়া না মিটিয়ে দিলে কিছুতেই যাব না"—বলে চল্‌লো কুলিটি।

"কিন্তু আমি ত সম্পূর্ণই মিটিয়ে দিয়েছি। তুমি ত বলেছিলে তিন রীলেই চল্‌বে।"

"কক্ষণো নয়—চার রীল দেওয়ার কথা ছিল।" তাদের দর কষাকষি চল্‌ছিল আড়াই পেনিরও কম নিয়ে।

"এই সামান্য মালপত্র বয়ে আনার জন্য চার রীলে? তোমার মাথা খারাপ আছে।"

মহিলাটী ধাক্কা দিয়ে কুলিটাকে সরিয়ে দিতে চাইল।

"ভাড়া না পাওয়া তক্ যাব না"—আবার পুনরুক্তি করে লোকটি।

"আচ্ছা, আর এক পেনি তোমাকে বেশী না হয় দিচ্ছি।"

"আমি কিন্তু তাতেও মান্‌ছি না।"

ঝগড়া তুমুল হতে তুমুলতর হ'তে লাগ্‌লো। মহিলাটী চীৎকার করে অভিশাপ বর্ষণ আরম্ভ করল কুলির উদ্দেশ্যে। শেষটায় ঘুষি বাগিয়ে ধর্‌লে। কুলিটীরও এইবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। বল্‌লে "আচ্ছা—সেই ভালো—পেনিই দাও—আমি চলে যাচ্ছি। তোমার মত বাজেমার্কা স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি আর বকে সময় নষ্ট করতে পাচ্ছি না।"

মহিলাটী কুলিটির পাওনা চুকিয়ে দিলে। লোকটি অতঃপর মাদুরটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। মহিলাটি আর এক দফা তার উদ্দেশ্যে অশ্লীল গালি বর্ষণ করলে। তার পর কোঠা থেকে বেরিয়ে এল মালপত্রগুলি ভেতরে

টেনে নিয়ে যেতে। ব্যালকনিতে দাড়ানো মহিলাদ্বয় নবাগতাটির মুখ দেখতে পেল।

"কেরাই—কি কদাকার মুখ দেখেছ? দেখ্‌লে মনে হয় নরহন্ত্রী।"

একটি বালিকা ঠিক সেই সময়ে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াতেই তার মা তাকে সম্বোধন করে বল্লেন—"রোজালিয়া! মহিলাটিকে দেখেছ?"

মেয়েটী জবাব দিলে—"গলদেশীয় কুলিটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মহিলাটী কোথা থেকে এসেছে। সে শুধু বল্‌লে—মালপত্র ট্রাইআনা (Triana) থেকে বয়ে এনেছে। চার রীলে দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে দেয়নি।"

"সে কি মহিলাটীর নাম তোমায় বলেছে?"

"সে জানে না—তবে ট্রিয়ানাতে মহিলাটিকে লা-কেচিরা বলে ডাকে।"

কোপন-স্বভাব মহিলাটী আবার ভুলে-ফেলে-আসা একটা বোঝা নিতে এল। উপরে তাকিয়ে দেখলো ওর দিকে দুইটী মহিলা নিবদ্ধদৃষ্টি। কিছু বললেও না। রোজালিয়া (Rosalia) কিন্তু কেঁপে উঠ্‌লো, মন্তব্য করলে "ওকে কিন্তু আমার ভয়ই হচ্ছে।"

লা কেচিরার (La Cachirra) বয়স হবে প্রায় চল্লিশ—উদ্‌ভ্রান্ত গোছের এবং খুবই জীর্ণ। হাতের হাড়-গোড়-বেরকরা—অঙ্গুলিগুলি শকুনির থাবার মত। গাল বসে গিয়েছে—চামড়া কুঁচকে-যাওয়া এবং হলদে হয়ে এসেছে। বিবর্ণ ও ভারী ঠোঁট সমন্বিত মুখ খুললে শিকারী জন্তুর মত ধারালো দাঁত দৃষ্টিগোচর হত। চুল ঘনকৃষ্ণ অচিক্কণ—অগোছালো—কাঁধে ঝুকে পড়েছে। কাণের কাছে চুলের একটা গুচ্ছ এসে ঠেকেছে। কোটর প্রবিষ্ট বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দুইটী জ্বল জ্বল করছিল তীব্রভাবে। লা কেচিরার মুখ এমন একটা হিংস্রতা পরিমণ্ডিত ছিল যে তার কাছে কেউ এগিয়ে যেতে সাহস করত না। আপন মনেই থাক্‌ত। প্রতিবেশীদের কৌতূহল এতে উদ্রিক্তই হয়। ও গরীব ওর কাপড় চোপড়ের দুরবস্থা দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল্। রোজ সকালে বেরুত, রাতের আগেও ফিরত না। ওর রোজগারও কত তাও তাদের কাছে অনাবিষ্কৃত ছিল। এক পুলিশকে ওর সম্বন্ধে তদন্ত করতে উস্কানি দেয়। কিন্তু পুলিশ বলে "যতক্ষণ ও শান্তিভঙ্গের অপরাধ না করে—ততক্ষণ আমাদের কিছুই করবার নেই।"

কিন্তু সেভিলে দুর্নাম ছড়ায় দ্রুতগতিতেই। দিন কয়েকের মধ্যেই উপরের প্রকোষ্ঠবাসী এক রাজমিস্ত্রী খবর আন্‌লে যে ট্রাইয়ানাতে (Triana) তার এক বন্ধু ওর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। সবে মাত্র মাস খানেক আগে ও জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। জেলে লা কেচিরাকে (La Cachirra) কাটাতে হয়েছে দীর্ঘ সাত বৎসর—হত্যার দায়ে। ট্রাইয়ানাতে এক বাড়ীতে সে থাক্‌ত। ছেলের দল সমস্ত কিছু জান্‌তে পেরে ওর দিকে ঢিল ছুড়ত এবং গালিগালাজ করত। ও উল্টে রেগে কদর্য্য গালি দিয়ে হাতাহাতি করে এমন এক গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি করে যে—বাড়ীওয়ালা এবং আর যারা ওর বহিষ্করণের জন্যে দায়ী, তাদের উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত উদ্গীরণ করে একদিন ও হঠাৎ ট্রাইয়ানা ছেড়ে চলে এল।

"তা কাকে হত্যা করেছে?" রোজালিয়া জিজ্ঞেস করে।

"লোকে বলে—ওর প্রেমিককে!" জবাব দেয় মিস্ত্রী।

"ওর কোনও প্রেমিক থাক্‌তেই পারে না।" একটা ঘৃণাসূচক হাসি হেসে জবাব দেয় রোজালিয়া (Rosalia)

রোজালিয়ার মা পিলার (Pilar) শান্তা মেরিয়ার নাম উচ্চারণ করলে।

"আমার মনে হয় আমাদের কাউকে সে হত্যা করবে না—আমি মাত্র এই বলেছি যে সে দেখ্‌তে নরহন্ত্রীর মত।"

রোজালিয়া কাঁপতে কাঁপতে হাত দুটি দিয়ে ক্রশ চিহ্ন আঁকলে। ঠিক এমনি সময়ে লা কোচিরা (La Cachirra) সারাদিনের কাজের শেষে ফিরে আসে। আলাপচারীরা এতে বেশ বিব্রত হয়ে পড়লো। সন্ত্রস্ত হ'য়ে জটলা পাকিয়ে ওরা ভয়চকিতভাবেই ওর হিংস্র দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলো। তাদের এই নিশ্চুপতায় অশুভ কিছু দেখ্‌তে পেয়ে ও তাদের দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হান্‌লে। পুলিশ আলাপ জমাবার উদ্দেশ্যে ওকে সান্ধ্য-প্রণাম করলে। ভ্রুকুটি করেই ও অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দেয়। তার পর ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলে। দরজায় তালা দেবার শব্দ তাদের কানে পৌঁছল। ওর

দুষ্ট ও রুষ্ট দৃষ্টি দেখে তারা বিমর্ষ হয়ে গেল এবং ফিস্‌ফাস আরম্ভ করে দিলে যেন এক অনিষ্টকারী মোহে আবিষ্ট।

"ওর মধ্যে একটা শয়তান কাজ করছে" রোজালিয়া উত্তর দেয়।

আমাদের রক্ষার্থে ম্যানুয়েল যে এখানে আছে এতে আনন্দই হচ্ছে—মা পুলিশকে লক্ষ্য করে বল্‌লো।

কিন্তু লা কোচিরার তরফ থেকে বিপত্তি সৃষ্টির কোনও ইচ্ছা দেখা গেল না। ও পথ ধরে চল্ল ঋজু হ'য়ে—কারোও সঙ্গে একটি শব্দ বিনিময় না করে। সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের যে কোনও চেষ্টাই ও ঠেকিয়ে দিয়েছে। ও টের পায় ওর প্রতিবেশীগণ ওর গোপন রহস্য জান্‌তে পেরেছে—জান্‌তে পেরেছে ওর নরহত্যার কথা এবং দীর্ঘকালীন কারাগার-অবস্থিতি। মুখের রেখাগুলি ওর কঠিনতর হয়ে উঠ্‌লো। চোখে ফুটে ওঠে আরো পৈশাচিক ভাব। কিন্তু ওর আগমন যে উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমে মন্দীভূত হয়ে আস্‌লো। শেষটায় এমন হল যে নীরব অন্তঃপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট দলের মধ্য দিয়া নীরবে ক্ষীণ দেহবিশিষ্টা লা কোচিরা যখন চলে যেত তখন বাচাল Pilar পর্য্যন্ত তা গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌ত না।

"আমার ধারণা জেলে গিয়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জেলে থাকার ফল সাধারণতঃ এই।"

কিন্তু একদিন এক ঘটনা ঘট্‌ল যা তাদের জল্পনাকে পুনরুজ্জীবিত করে। এক যুবক "রেজা"—মানে স্যাকভিল হাউসের লৌহনির্ম্মিত সামনের দরজায় এসে "এণ্টোনিয়া মানচেজের" খোঁজ করে। পীলার অন্তঃপ্রাঙ্গণে বসে জামা সারাবার কাজে ব্যস্ত। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিসূচক ভাবে কাঁধ তুলে বল্‌লে—"এই নামের কেহই এখানে বাস করে না।"

"হাঁা করে বৈকি।" যুবকটি উত্তর দেয়—তার পরে কিছুক্ষণ থেমে বল্‌লে "লোকে তাকে La Cachirra বলে ডাকে।"

"ও" বলে রোজালিয়া গেইট্‌টি খুল্‌লে এবং দরজার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বল্‌লে, "তা, ঘরেই আছে।"

"ধন্যবাদ।"

যুবকটি ওর দিকে চেয়ে হাসলে। মেয়েটি দেখ্‌তে সুন্দরী। রঙ চমৎকার। চোখ দুটি সুন্দর ভয়লেশহীন। কৃষ্ণ চিক্কণ চুলে একটা গোলাপী আভা।

"যে মা তোমায় জঠরে ধারণ করেছেন—তিনি ভাগ্যবতীই—" যুবকটি একটা মামুলী প্রবাদবাক্য আওড়ালে।

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন"—পীলার জবাব দিলে। সে এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে। মহিলাদ্বয় তার দিকে সকৌতূহলে তাকালে।

"ও কে হতে পারে?" প্রশ্ন করে পীলার (Pilar)," লা কোচিরার কোনও ভিজিটর ত আগে আস্‌তে দেখি নি।"

তার দরজা ধাক্কার কোনও জবাব মিল্‌লো না। আবার সে ধাক্কা দেয়। এমন সময় শুনতে পেলে লা কেচিরা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করছে "কে?"

'মা?'—সে বলে উঠে।

একটা চীৎকার ধ্বনি শোনা গেল। দরজাটা সশব্দে খুলে দিলে।

"কিউরিটো!"

মহিলাটি তার ঘাড় বাহুবদ্ধ করে তাকে সবেগে চুমু খেতে লাগ্‌লো। সস্নেহে তার সমস্ত মুখমণ্ডল দুই হাতে চাপড়াতে লাগলো, মা ও মেয়ে যারা দেখছিল তারা ভাব্‌তে পারে নি লা কেচিরার স্নেহার্দ্রতা এতদূর হতে পারে।

সবিস্ময়ে রোজালিয়া বললে "আগন্তুকটি লা কেচিরার ছেলেই হ'বে। কিন্তু কে ভাব্‌তে পারত ওর এত সুন্দর ছেলে হতে পারে।"

কিউরিটোর মুখ শীর্ণ—কিন্তু শুভ্র। দাঁতও তেমনি। চুল খুব ছোট করে ছাঁটা—কপালের পার্শ্বদ্বয় পর্য্যন্ত ক্ষৌরিত। তার অকালপক্ক দাড়ি মেটে রঙের নীলাভ ছায়া ফেলছিল। বস্তুতঃ সে ফ্যাসানদুরস্ত বাবুই ছিল। সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি ছিল তার স্বজাতীয় মোহ। ট্রাউজারগুলি আট্‌সাট্। আন্‌কোরা তার জেকেট এবং কুঞ্চিত সার্ট। মাথায় ছিল কিনারা-পাশ হ্যাট্।

শেষটায় লা কেচিরার ঘর খুল্‌লো। ছেলের হাতে ভর করে ওকে এগিয়ে আস্‌তে দেখা গেল।

"আবার পরের সোমবার আস্‌ছ ত?" লা কেচিরা জিজ্ঞেস করে।

"কোনও কারণে যদি আটকে না পড়ি।" রোজালিয়ার দিকে সে একবার তাকালে। মাকে বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে রোজালিণ্ডের দিকে চেয়ে মাথা নুয়ালে। রোজালিণ্ডও প্রত্যভিবাদন জানালে। কিউরিটোর দিকে চেয়ে হাস্‌লে। ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দু'টী তার উজ্জ্বল। চাহনিটা লা কেচিরার দৃষ্টি এড়াল না। যে চরম উল্লাস ওর বিমর্ষতা দূর করে দিয়েছিল তা আবার ওর মুখকে বজ্রগর্ভমেঘবৎ মলিন করে দিলে। সুশ্রী মেয়েটার দিকে চেয়ে হিংস্র ভ্রূকুটি করল।

"তোমার ছেলে নাকি ?" যুবকটী চলে গেলে পিলার জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, আমার ছেলেই"—রুক্ষভাবে জবাব দিয়ে লা কেচিরা আবার ওর নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

কিছুতেই ওর মন গলে না। মন যখন ওর কানায় কানায় আনন্দ-উৎফুল্ল তখনও বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টাকে আমলে আনলে না।

"লোকটা সুদর্শনই"—বল্‌লে রোজালিণ্ড এবং পরের কয়েকদিন একাধিবারই তার কথা ভেবেছে।

ছেলের প্রতি লা কেচিরার ভালবাসা ছিল অদ্ভুত রকমের। সেই ছিল ওর যথাসর্বস্ব। স্নেহ ওর এমনি জলন্ত এমনি তীব্র ছিল যে প্রতিদানে তা দাবী করত অসম্ভব ভক্তি। সন্তানের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য থাক্‌বে এই ছিল ওর ইচ্ছা। কর্তব্যের খাতিরে একসঙ্গে বাস করা তাদের সম্ভব ছিল না। ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেলে সে কি করে, এই কথা কল্পনা করেও মর্ম্মযাতনা অনুভব করত। অন্য কোনও মেয়ে তার দিকে তাকাবে ইহা লা কেচিরার কাছে অসহনীয়ই ছিল। কোনও মেয়ের প্রতি কিউরিটো ভালবাসা নিবেদন করবে এই কথা ভাবতেও 'লা কেচিরা' যাতনায় ছটফট করত। "সেভিলে" সর্ব্বপ্রচলিত আমোদ ছিল গরাদ দেওয়া জানালার পাশে অর্দ্ধযামিনী উপবিষ্ট অথবা সেইটে দণ্ডায়মান প্রেমিকার সোৎসুক কর্ণে প্রেমিকের উল্লাসজ্ঞাপন। লা কেচিরা জিজ্ঞেস করে জানতে চাইত তার কোনও প্রেমিকা আছে কিনা। এরকম সুশ্রী যুবকের পক্ষে মেয়েদের হাস্তপ্রমাদ এ তো ওর এ অজানা নয়। কিউরিটো তাই যখন শপথ করে বলত—সন্ধ্যা তার কেটেছে কর্ম্মব্যাপৃতির মধ্যে তখন বুঝতে পারত তাহা মিথ্যা বলছে। এই অস্বীকৃতিতে তবুও পেত পৈশাচিক আনন্দ।

রোজালিয়ার আপত্তিকর দৃষ্টি ও কিউরিটোর সায়সূচক হাসি দেখে ওর পিত্ত যেত জলে। সুখী প্রতিবেশীদেরও ঘৃণাই করে এসেছে দস্তুর মত। ওর অপরিসীম দুঃখ ওর রোমহর্ষক রহস্যের কথা জেনে ফেলেছে তারা। তারা ওর একমাত্র ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই কল্পনা করে অনেকটা অর্দ্ধোন্মাদের মতই ওর তাদের প্রতি ঘৃণা গেল আরো বেড়ে। পরের সোমবার বিকেলবেলা ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে গেটে এসে দাঁড়াল। ঘটনাটা অস্বাভাবিকই, প্রতিবেশীরা তাই টিপ্পনী সুরু করে দিলে।

"ও কেন এখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছ না ?" চাপা হাসি হেসে Rosalie বল্‌লে—"ওর নয়নের মণি ছেলে আজ আস্‌ছে—চায় না আমরা তাকে দেখি।"

"ও কি মনে করে আমরা তাকে খেয়ে ফেলব ?" কিউরিটো ইতিমধ্যে এসে পৌঁছল। তার মা শশব্যস্তে এসে তাকে ঘরে নিয়ে গেল।

"এমনি আগলে রাখে যে মনে হয় ওর প্রেমিকই" মন্তব্য করে পীলার।

রোজালিয়া রুদ্ধ দ্বারের দিকে হেসে তাকালে—ওর কৌতুকোজ্জ্বল চোখ দুটী দুষ্টুমিতে ভরা। Curritoএর সঙ্গে কথা বল্‌লে বেশ মজাই হবে ভাবলে রোজালিয়া। লা কেচিরার ক্রোধের কথা ভেবে ওর মুক্তাশুভ্র দাঁতে খেলে গেল হাসির ঝিলিক। সে দাঁড়িয়ে রইল গেটে—যাতে তাদের দু'জনকেই তাকে অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু লা কেচিরা তাকে দেখেই পুত্রের পরপার্শ্বে চলে আসলো যাতে তাদের দু'জনের দৃষ্টিবিনিময় না হতে পারে। রোজালিয়া কাঁধদুটী নাড়লে মাত্র। "এত সহজেই তোমার কাছে হার মানছি না" স্থির করলে মনে মনে।

পরের রবিবারে লা কোচিরা গেটে দাঁড়াতেই রোজালিয়া রাস্তায় বেরিয়ে এল। যে দিক দিয়ে কিউরিটোর আসবার কথা সেই দিক দিয়ে পায়চারি সুরু করলে। মিনিটখানেকের মধ্যেই কিউরিটোকে দেখতে পেয়ে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চল্‌তে লাগল।
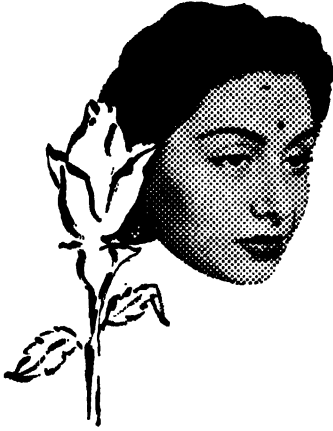
"হ্যালো" কিউরিটো থেমে চীৎকার করে বল্‌লে।

"তুমি নাকি? আমার ত ধারণা আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেও ভয় পাও।"

"ভয় আমি কাউকেই করি না" সগর্ব্বে উত্তর দেয় কিউরিটো "অবশ্য তোমার মা বাদে।"

রোজালিয়া হেঁটে চল্‌ল—ভাবখানা এই যে—কিউরিটো যেন তার সঙ্গে না আসে। কিন্তু রোজালিয়া ভালো করেই জান্‌তো কিউরিটো আসবেই।

"যাচ্ছ কোথায়?" সে জিজ্ঞেস করলে।

"সে খোঁজে তোমার দরকার কি? মার কাছে বরঞ্চ যাও, নইলে কপালে তোমার মার খাওয়া আছে। মার সঙ্গে থাকলে আমার দিকে তাকাবারও ত তোমার সাহস হয় না।"

"কি বাজে বক্‌ছ।"

"সে যাই হউক—আমার এখন কাজের তাড়া।" ভয়ত্রস্তভাবেই সে চলে গেল। রোজালিয়া মনে মনে শুধু হাসলে। মাকে সঙ্গে নিয়ে বের হবার পথে দেখলে রোজালিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে। এবার লজ্জার খাতিরেই সাহস সঞ্চয় করে তাকে বিদায়সম্ভাষণ জানালে। ক্রোধে লা কেচিরার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠ্‌লো।

"আঃ কিউরিটো—কেন অপেক্ষা করছ?" রোজালিয়া তারস্বরেই বল্‌লে।

কিউরিটো কিন্তু চলে গেল। কিছু বলবে এই ভাবে লা কেচিরা রোজালিয়ার সামনে মুহূর্ত্ত খানেকের জন্য দাঁড়াল। কিন্তু সুপরিস্ফুটভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে আপন নীরব অন্ধকারময় কোঠায় চলে গেল।

দিন কয়েক বাদে "স্যাভিলে" সান্‌ ইসিডারো-এ ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। উৎসব-উদ্‌যাপনের জন্যে মিস্ত্রী ও অন্য দু' একজন অন্তঃপ্রাঙ্গণে চাইনীজ লণ্ঠন ঝুলিয়ে রেখেছে। পরিচ্ছন্ন নিদাঘ-রাত্রে জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল এইগুলি। আকাশ মসৃণ—তারকারাজি জাজ্বল্যমান। গৃহ-অধিবাসীরা মধ্যপ্রাঙ্গণে জমায়েৎ হয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। স্ত্রীলোকেরা শিশু কোলে নিয়ে ছোট কাগজের পাখা দিয়ে নিজেদের বাতাস করছিল। তারা অবিশ্রান্ত গল্পগুজবে বিরতি টেনে মাঝে মাঝে দুরন্তপনা-রত অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেদের বকুনি দিচ্ছিল। সারাদিনের নিঃশ্বাসরোধকর গুমটের পর বাতাস ছিল খুবই শ্রান্তিহর। প্রত্যক্ষদর্শীরা বৃষযুদ্ধের বিবরণ দিচ্ছিল তাদের কাছে যাদের দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। বৃষঘাতক "বেলমণ্ট" (Belmonte)এর অদ্ভুত দক্ষতার নিখুঁত বিবরণী তাদের জলন্ত কল্পনামিশ্রণে এমনি বৈচিত্র্যময় এবং বর্ণসমুজ্জ্বল হয়ে উঠে যে মনে হ'ল সেভিল (Seville)এর ইতিহাসে এর চেয়ে চমৎকার "বৃষযুদ্ধ" আর হয়নি কোনও দিন। লা কেচিরা বাদে সবাই ছিল উপস্থিত। ওর ঘরে দেখ্‌তে পেল তারা মোমবাতির আলো।

"ওর ছেলের খবর কি?"

"সে ভেতরেই আছে" জবাব দেয় পিলার, "এক ঘণ্টা আগে মাত্র আমি তাকে যেতে দেখেছি।"

"সে নিশ্চয়ই আমোদে মত্ত এখন" হেসে বলে রোজালিয়া।

"লা কেচিরাকে নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আমাদের একটা নাচ দেখিয়ে দাও।" বল্‌লে অপর একজন।

"হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি তোমার নাচ সুরু করে দাও" চীৎকার করে বল্‌লে অন্য সবাই।

স্পেনের জনসাধারণ স্বভাবতঃই নাচ্‌তে ভালবাসে, দেখতে ও। বহু বর্ষ আগে প্রবাদ ছিল যে নাচ্‌তে জানে না স্পেনে এরকম নারী নেই।

চেয়ারগুলি গোল করে সাজানো হ'ল। রাজমিস্ত্রী ও ট্রামকন্‌ডাক্টার তাদের "গীটার" নিয়ে এসে হাজির। রোজালিয়া বাজানোর যন্ত্র নিয়ে অপর একটি মেয়েসহ এগিয়ে এসে সুরু করলে নাচ্‌।

Currito (কিউরিটো) তার ঘরে কান খাড়া করে গান শুনতে লাগলো।

"তারা নাচ্‌ছে" সে বলে উঠ্‌লো এবং তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে একটা যাতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

পর্দ্দার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে চাইনীজ লণ্ঠনের স্নিগ্ধ আলোয় সমস্ত দলটিকে সে দেখ্‌তে পেল। দেখ্‌তে পেল সে নৃত্যপর বালিকা-যুগলকে। রবিবাসরীয় পোষাকে রোজালিয়া সজ্জিতা; প্রথানুযায়ী ওর কবরীতে ঝলমল করছে এক সুগন্ধি পুষ্প। কিউরিটোর হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হ'তে লাগলো। স্পেনে প্রেমের সূত্রপাত ও পরিণতি দ্রুত

গতিতেই হয়। প্রথম দর্শনের পর থেকেই এই সুদর্শনা নারীটির কথা সে দিন-কয়েকই ভেবেছে। দরজার দিকে এগিয়ে এল সে।

"কি করছ ?" লা কেচিরা জিজ্ঞেস কর্‌লে।

"তাদের নাচ দেখ্‌তে যেতে হচ্ছে। আমি আমোদ-আহ্লাদ করি, এ তুমি কোনও দিন চাও না।"

"নাচ দেখার চেয়ে রোজালিয়াকে দেখ্‌তেই তুমি আগ্রহী।" তাকে থামাতে গেলে সে লা কেচিরাকে সরিয়ে দিয়ে নৃত্যদর্শকের দলে ভিড়ে গেল।

লা কেচিরা দু' এক পদক্ষেপ গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে গা-ঢাকা অবস্থায়। রাগে পিত্ত জ্বলে যাচ্ছিল লা কেচিরার।

রোজালিয়া কিউরিটোকে দেখ্‌তে পেলো। ওকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় রোজালিয়া ফিস্ ফিস্ করে বললে "আমার দিকে তাকাতে তোমার ভয় হচ্ছে না ?"

নাচার দরুণ ওর চপলতা এসে গিয়েছিল—লা কেচিরা তোয়াক্কাই করলে না। নাচ শেষ হবার সঙ্গে ওর "পার্টনার" চেয়ারে বস্‌তেই রোজালিয়া সোজা গিয়ে কিউরিটোর সাম্‌নে দাঁড়ালো ঋজু ভঙ্গিমায়—মাথাটা পিছন দিকে হেলানো—বুক আন্দোলিত দ্রুত স্পন্দনে।

"নাচ্‌তে হয় কি করে নিশ্চয়ই তুমি জান না ?"

"কে বল্লে ? জানি"

"তা হলে চল নাচা যাক্" বলে রোজালিয়া হাস্‌লে—মনে আগুন-ধরিয়ে-দেওয়া হাসি। কিন্তু কিউরিটো ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌লো। ঘাড় ফিরিয়ে সে মার দিকে চাইলে। অন্ধকারে না দেখা গেলেও মার অস্তিত্ব সে আন্দাজ করতে পারলো। রোজালিয়ার কাছে এ দৃষ্টি ও এর অর্থ দুইই ধরা পড়্‌লো।

"ভয় পেয়েছ ?" জিজ্ঞেস করে রোজালিয়া।

"ভয় পাবার কি আছে ?" জবাব দেয় কাঁধ নেড়ে কিউরিটো।

তারপর নাচের দলে সে ভিড়ে গেল। গীটারিষ্ট বাজিয়েই চল্‌ছিল। দর্শকদল হাততালি দিচ্ছে তালে তালে অলি (Ole) ধ্বনি করে। একটি বালিকা কিউরিটোকে এক জোড়া করতালি দিয়ে তার সঙ্গে নাচ সুরু করে দিলে। অন্ধকারেও তাদের কানে এল সাপের মত ফোঁস ফোঁস একটা ধ্বনি। রোজালিয়া মরিয়া হয়ে সহাস্যে তাকালে ছায়ার মধ্য দিয়া পরিদৃশ্যমান ভয়ঙ্কর শুভ্র মুখের দিকে। লা কেচিরা নড়্‌লে না একটুও। নৃত্যভঙ্গী, শরীর আন্দোলন এবং লাস্যময় পদবিক্ষেপ সবই ও লক্ষ্য কর্‌লে। রোজালিয়াকে দেখ্‌তে পেলে—নয়নাভিরাম ভঙ্গীতে হেলে পড়ে কিউরিটোর মুখের দিকে এলো তাকিয়ে দেখ্‌তে। আর কিউরিটো কর্‌তাল বাজিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে ওকে প্রদক্ষিণ করে।

জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ দু'টী থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছিল—নিজেই লা কেচিরা বুঝতে পারছিল যে অক্ষি-কোঠরে ঐগুলি যেন জ্বলছে। কিন্তু ওর দিকে দৃকপাত করলে না কেউ। লা কেচিরা একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে উঠ্‌লো। নাচ শেষ হ'ল। প্রশংসা প্রাপ্তির আনন্দে হেসে রোজালিও কিউরিটোকে জানালে যে সে যে এত ভাল নাচ্‌তে পারে তা তার অজানাই ছিল।

লা কেচিরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। কিউ-রিটো এসে দরজা খুলে দিতে বললেও জবাব দিলে না।

"আচ্ছা, আমি বাড়ী যাচ্ছি" বল্লে কিউরিটো।

লা কেচিরার অন্তর থেকে বেদনার রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কিন্তু একদম নিশ্চুপ রইল। কিউরিটোই ওর যথাসর্ব্বস্ব —এবং দুনিয়াতে কিউরিটোকেই সবচেয়ে বেশী ভাল-বাস্‌তো। কিন্তু আজকে জন্মে গেল চরমতম ঘৃণা। সেই রাত্রে আর সে ঘুমোতে পারলে না—অর্দ্ধোন্মাদের মতই শুয়ে চিন্তা করতে লাগ্‌লো তারা ওর কাছ থেকে একমাত্র ছেলেকে পর্য্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভোরবেলায় আর কাজে যাওয়া হ'ল না, ওৎপেতে রইল রোজালিয়ার প্রতীক্ষায়। রোজালিয়া শেষটায় আস্‌ল সারারাতের উৎসব শেষে বিপর্য্যস্ত অবস্থায়। লা কেচিরার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লো।

"আমার ছেলেকে দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন ?"

"কি বলছো ?" বিস্ময় প্রকাশের ভাণ করে উত্তর দেয় রোজালিয়া।

লা কেচিরা উত্তেজনায় কাঁপতে সুরু করলে। সাম্‌লাতে গিয়ে হাত কামড়ে ধরলে।

"কি বলছি তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ। আমার ছেলেকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছ।"

"তুমি কি ভাব তোমার ছেলেকে আমি কামনা করছি। আমার কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখ না কেন? আমি যেখানে যাই সেখানে যদি আমার পেছনে ধাওয়া করে তবে আমার কিছু করণীয় নেই।"

"মিথ্যে কথা।"

"বরঞ্চ তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।" রোজালিয়ার স্বর এত বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠলো যে লা কেচিরা আর আত্মসংবরণ করতে পারলে না।

"শুধু তাই নয়—আমায় দেখবার জন্তে রাস্তায় অপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তোমার নিজের কাছে তাকে রেখে দিলেই ত পার।" বলে চলে রোজালিয়া।

"মিথ্যে বলছ, বিলকুল মিথ্যে বলছ। তুমিই তার সামনে এসে দাঁড়াও।"

"প্রেমিকের দরকার হলে চাইতে হবে না আমাকে। নরহন্ত্রীর পুত্রকে আমি চাই না।"

সেই মুহূর্তে লা কেচিরার সব কিছু গুলিয়ে গেল। মাথায়ও খুন গেল চড়ে। চোখ দুটী বুজে এল। রোজালিয়ার উপর ঝাপিয়ে পড়ে ওর চুল ছিঁড়তে লাগলো। বিকট চীৎকার করে বালিকাটী আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হল। ঠিক এমনি সময়ে এক পথিক এসে তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিলে।

"কিউরিটোর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন না করলে আমি তোমাকে মেরেই ফেলব।" চীৎকার করে বলে লা কেচিরা।

"মনে কর আমি ভয় পেয়েছি? শক্তি থাকে ত আমার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে রাখ। আহাম্মক, দেখতে পাচ্ছ না কি সে আমায় ভালবাসে, তার নিজের চোখ দুটীর চেয়েও বেশী।"

শিকার বঞ্চিত হিংস্র জন্তুর মত লা কেচিরা চীৎকার করে উঠে রাস্তা দিয়ে হন্ হন করে ছুটে চলে গেল।

সেই নাচের পর থেকে কিউরিটো রোজালিয়ার প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পরের দিন গোটাদিন ভর রোজালিয়ার পক বিম্বোষ্ঠের কথাই শুধু সে ভেবেছে। ওর চোখের দীপ্তি তার হৃদয় জ্বল জ্বল করে জ্বলে একেবারে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। উদগ্রভাবে সে কামনা করতে লাগলো রোজালিয়াকে। দেউড়িতে অন্ধকারের আবছায়ায় রোজালিয়াকে না দেখা অবধি দাঁড়িয়ে রইলো সে। অন্ত প্রান্তে জ্বলছিল তার মার প্রকোষ্ঠের বাতি।

"রোজালিয়া" মৃদু স্বরে সে ডাকলে।

বিস্ময়মিশ্রিত আর্তনাদ চেপে ও ফিরে তাকালো।

"আজকে তুমি এখানে যে?" তার কাণের কাছে ফিস্‌ফিস করে বললে রোজালিয়া।

"তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না বলে।"

"কেন?" মৃদু হাসলে রোজালিয়া।

"কেন? তোমায় যে আমি ভালবাসি।"

"তোমার মা আমায় আজ প্রায় মেরে ফেলেছিল জান কি?"

এনডুলিসিয়ান স্বভাব-অনুযায়ী অলঙ্কার-সহযোগে সমস্ত ঘটনাই রোজালিয়া বিবৃত করলো। বাদ দিলে শুধু শেষ বক্রোক্তিটা যা La Cachirraকে রাগিয়ে দিয়েছিল সহ্যাতীতরূপে।

শয়তানের মতই কোপনস্বভাব ও। তার পরে জাঁক করেই কিউরিটো বললে—"ওকে আমি বলব—তুমিই আমার দয়িতা।"

"শুনে পরিতৃপ্তিই পাবেন"—ব্যঙ্গের সুরে বলে রোজালিয়া।

"তার পর আসছে কাল রেজাতে (Reja) আসছ ত?"

"সম্ভবতঃ" জবাব দেয় রোজালিয়া।

হাসলে কিউরিটো—কারণ রোজালিয়ার গলার স্বর থেকেই বুঝতে পেরেছিল ও আসবে। বাড়ী ফেরার পথে অন্যদিনের চেয়ে বেশী বড়াই করতে করতে চললো। পরের দিন যখন সে আসে রোজালিয়া তখন তার প্রতীক্ষারত। তার পর Sevilleএর প্রেমিক প্রেমিকাদের চিরানুষ্ঠিত প্রথানুযায়ী ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা এক নাগাড়ে গল্প করে চলল—তাদের মাঝে শুধু লৌহ-গেটের ব্যবধান। মনেও হল না তাদের একবার যে গেটটা রচনা করেছে তাদের মধ্যে এক অনাবশ্যক বাধা। তাকে ভালবাসে কিনা জিজ্ঞেস করলে রোজালিয়া উত্তর দেয় প্রণয়সূচক দীর্ঘনিঃশ্বাসের দ্বারা। পরস্পরের চোখের মধ্যে দেখতে চাইল তারা তাদের জ্বলন্ত ভালবাসার প্রতিবিম্ব। এর পর থেকে রোজ রাত্রেই সে যেতে লাগলো।

পাছে তার মা তার এই অভিসারের কথা জান্‌তে পারে এই ভয়ে পরের রবিবার মার সঙ্গে আর দেখা কর্‌তে যায়নি। দুঃস্থা নারী, বেদনার্ত্ত হৃদয়ে তার অপেক্ষাই কর্‌তে লাগলো। নতজানু হয়ে ছেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার মত মানসিক অবস্থায় বৃদ্ধা উপনীতা। কিন্তু ছেলে যখন আমার নামও করলে না, তখন তার প্রতি জন্মে গেল দারুণ ঘৃণা। এমন কি পদতলে ছেলেকে বিগতপ্রাণ দেখলেও আপশোস যায় না। কিন্তু লা কেচিরা মুষড়ে পড়লো এই ভেবে যে আরো এক হপ্তা অতিক্রান্ত না হলে তার সঙ্গে দেখা হবারও আশা নেই।

এক হপ্তা কেটে গেল কিন্তু তবুও তার দেখা মিল্‌লো না। মানসিক যন্ত্রণা হয়ে উঠ্‌লো ওর কাছে অসহনীয়। তাকে মা যা ভালবাসতো কোনও প্রেমিকের পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। এর মূলে রোজালিয়া—এই কথা ভেবে লা কেচিরার ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রইল না। এইদিকে অবশেষে কিউরিটো সাহস সঞ্চয় করে মার সঙ্গে দেখা করতে চল্‌লো। কিন্তু লা কেচিরা ইতিমধ্যে প্রতীক্ষাক্লান্ত। ওর হৃদয়ে পুত্র স্নেহের ঘটেছে পরিসমাপ্তি। কিউরিটো ওকে চুমা দিতে গেলে তাকে দিলে ঠেলে সরিয়ে।

"আগে আস্‌লে না কেন ?"

"আমার মুখের উপরে দিয়েছ দরজা বন্ধ করে! ভেবেছিলাম আমাকে দিয়ে তোমার কোনও প্রয়োজনই নেই।"

"এইটাই একমাত্র কারণ? আর কোনও কারণ এর পেছনে ছিল না ?"

"কাজের তাড়া ছিল।" কাঁধ উচিয়ে জবাব দেয় সে।

"কাজের তাড়া ? তোমার মত একটা মেয়ে-চোরের কাজের তাড়া ? কিন্তু রোজালিয়াকে দেখে যাবার মত সময়ের অভাব হয়নি নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু তুমি রোজালিয়াকে মারলে কেন ?"

"কি করে জান্‌লে আমি ওকে মেরেছি। তুমি দেখেছ ?" বলদৃপ্ত পদক্ষেপে কিউরিটো এগিয়ে এসে বল্লে —"বলে কিনা আমি নরহন্ত্রী" চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছিল ওর।

"তাতে কি হয়েছে ?

"কি হয়েছে ?" চাৎকার করে উঠ্‌লো লা কেচিরা—একেবারে অন্দরমহল থেকে শোনা গেল। "নরহন্ত্রী হলেও সে শুধু তোমার জন্যেই। হ্যাঁ পেপি শান্তিকে (Pepe Santi) আমি হত্যা করেছি—কারণ সে তোমায় মারত। তোমার জন্যেই জেলে আমার পচতে হয়েছে সাত সাতটা বছর। নিশ্চয় তুমি ভাবছ—রোজালিয়া তোমার জন্যে ভেবে মরছে—প্রতি রাত্রেই গেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার করছে।"

"তা আমি জানি"—বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে কিউরিটো।

লা কেচিরা চমকে উঠে প্রবলভাবে। ফ্যাল ফ্যাল করে বিমূঢ়ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। দুঃখে ও রাগে হাঁপাতে লাগলো, বুক চেপে ধরলো—মনে হ'ল যাতনা সহনাতীত।

"তা হ'লে রোজ রাত্রেই Rejaতে আসছ ? অথচ আমার কাছে আস্‌বার মত সময় করতে পার না ? নির্দ্দয়তার প্রতিমূর্ত্তিই তুমি। তোমার জন্যে দুনিয়াতে সাধ্যানুযায়ী কিছু করতে বাকী রাখিনি। তুমি কি মনে কর Pepe Santiকে আমি ভালবাস্‌তাম। তোমার উদরান্নের জন্যেই মুখ বুজে সহ্য করেছি তার প্রহার। তোমাকে মারছিল বলেই হত্যা করেছি তাকে। তোমার জন্যেই শুধু জীবনধারণ করেছি। তোমার জন্যেই কয়েদী-জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা না হ'লে আত্মহত্যাই করতাম্।

"দেখছি, যুক্তির মাথা খেয়ে বসেছ। বয়স আমার সবেমাত্র তিরিশ। রোজালিয়া না হলেও আমার জীবনে অন্য কেউ আস্‌তই।"

"পশু, তোমায় দু'চক্ষে আমি দেখ্‌তে পারি না—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" বলে তাকে সজোরে টেনে বের করে দিলে। কিউরেটো শুধু কাঁধে উচালে।

অন্তঃপ্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে সে নির্ব্বিকারভাবে সটান হেঁটে চলে গেল। তারপরে সজোরে ও সশব্দে গেট বন্ধ করে দিল। এইদিকে লা কেচিরা তার ক্ষুদ্রঘরে পায়চারি করতে লাগলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো। দীর্ঘ সময় বসে রইল জানালার পাশে—লম্ফোদ্যত হিংস্র পশুর ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প নিয়ে তাকাতে লাগলো চারিদিকে। নিঃস্পন্দ হয়ে বসে রইলো প্রবলতম অধীরতা চেপে রেখে।

রিজা হতে হাততালির আওয়াজ আসছিল—বাইরে কেউ এখন দাঁড়িয়ে ইহাই এতে সূচিত হচ্ছিল। গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে—অগ্নিলাল চোখ দু'টী যেন মাথা থেকে বেরিয়ে আস্তে চাইছিল। কিন্তু এ যে রাজমিস্ত্রী। বহুক্ষণ ও অপেক্ষা করে রইল। পীলার—রোজালিয়ার মা—ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। অসহনীয় শ্বাসকষ্ঠ উপশমার্থে গলা চেপে ধরলে। তবুও অপেক্ষা করে থেকে থেকে সারা গা কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো।

অবশেষে গেটে মৃদু টোকার শব্দ শোনা গেল। উপর থেকে শোনা গেল জিজ্ঞেস করছে—"কে ?"

"চুপ কর"

লা কেচিরা রোজালিয়ার গলার স্বর চিন্‌তে পারলে। একটা সাফল্যসূচক হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। উপর থেকে দরজা খোলা হল—রোজালিয়া ঢুকে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করলে সহজ ও উৎফুল্ল পদক্ষেপে। উল্লাস-পরিব্যাপ্ত তার চলার ভঙ্গী। সিঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছে—লা কেচিরা একরকম লাফিয়ে পড়ে রোজালিয়ার গতিরোধ করে দাঁড়ালে। ওর হাত ধরলে দৃঢ়মুষ্টিতে—রোজালিয়া চেষ্টা করেও ছাড়িয়ে নিতে পারলে না।

"কি দরকার তোমার ? যেতে দাও বলছি।" বলে রোজালিয়া।

"আমার ছেলেকে নিয়ে কি কর্চ্ছ ?"

"হাত ছাড় বলছি—নইলে লোক ডাকব।"

"রোজ রাতে রেজাতে (Reja) তার সঙ্গে দেখা হয় তোমার—একথা কি সত্যি ?"

মা—Antonio—চেঁচিয়ে উঠে রোজালিয়া।

"আমার কথার জবাব দাও।"

"ভালো কথা—সত্যি কথা জানতে চাইছ যখন তোমায় খুলেই বলছি। কিউরিটো আমায় বিয়ে করতে যাচ্ছে। আমায় সে ভালবাসে আমিও ভালবাসি তাকে সর্ব্বাঃকরণে। দৃঢ়মুষ্টিবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টিত হয়ে—La Cachirraএর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"তুমি কি মনে কর আমাদের তুমি বাধা দিতে পারবে ? তুমি কি বল তোমার ভয়ে আমরা ভীত ? সে তোমায় দস্তুরমত ঘৃণা করে—তাই আমায় বল্‌লে। জেলেই যাতে তুমি পচে মর—এই তার ঐকান্তিক কামনা।"

"তোমায় এই বলেছে ?"

লা কেচিরা সঙ্কুচিত হয়ে সরে দাঁড়াল। সুযোগটা হাতছাড়া হ'তে দিলে না। রোজালিয়া বলে চল্‌ল—হ্যাঁ সে আমায় বলেছে—শুধু তাই নয়, আরো অনেক কিছু বলেছে। তুমি নাকি Pepe santiকে হত্যা করেছ—সাত সাতটী বছর জেলে কাটিয়েছ। তুমি মরে গেলেই ভালো হত।"

কথাগুলি বল্‌লে রোজালিয়া সাপের বিষ ঢেলে দিয়ে। দুর্ভাগা রমণী একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো—যেন সত্যিকারের আঘাত হান্‌ছে ওর উপর কেউ। লা কেচিরার এই অবস্থা দেখে বিকট হাসি হেসে উঠে রোজালিয়া। "এবং তোমার গর্ব্ববোধ করা উচিত যে—তোমার মত নরহন্ত্রীর ছেলেকেও বিয়ে করতে আমি গররাজী হয়নি।"

তার পর লা কেচিরাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে—সিঁড়িতে লাফ দিয়ে উঠ্‌লো। তীব্র বিদ্রূপে মুহ্যমান নারী এই আঘাতে যেন পুনর্জ্জীবন ফিরে পেল—ক্রোধে চীৎকার করে উঠে রোজালিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঁধ ধরে একেবারে টেনে নামিয়ে আন্‌লে। রোজালিয়া ফিরে ওর মুখে করলে চপেটাঘাত। লা কেচিরা কালবিলম্ব না করে—কক্ষান্তরাল থেকে ছুরি বের করে রোজালিয়ার কাঁধে দিলে বসিয়ে একটা শপথ বাক্য উচ্চারণ করে। রোজালিয়া আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো।

"মা—আমায় মেরে ফেল্লে।"

সিঁড়ির নীচে পড়ে গেল রোজালিয়া। পাথরের উপর পড়ে রইল স্তূপপিণ্ডের মত। মাটিতে রক্তের একটা ছোটখাট পুকুর সৃষ্টি হয়ে গেল।

এই বৈরাগ্যব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ শুনে অর্দ্ধ ডজন দরজা খুলে গেল—ছুটে এল সবাই লা কেচিরাকে ধরতে। কিন্তু দেয়ালে ঠেস দিয়ে এমন একটা হিংস্রভাব ধারণ করলে সে—যে কেউ ওর কাছে এগোতেও সাহস করলে না। কিন্তু এই দ্বিধা সাময়িকই। পীলার গাড়ীবারান্দা থেকে ছুটে গেল চীৎকার করতে করতে। ক্ষণিকের জন্য সবারই মনোযোগ বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল।

লা কেচিরা এই সুযোগে ছুটে ওর ঘরে ঢুকল। তার পর দরজায় তালা দিয়ে খিল বন্ধ করে দিলে।

সহসা প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। পীলার মর্ম্মভেদী বিলাপ করতে করতে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল—কিছুতেই টেনে নিয়ে যেতে দেবে না। একজন ডাক্তারের জন্যে ছুটল—আর একজন পুলিশকে খবর দিতে। রাস্তা থেকে জনস্রোত এসে দরজার পাশে দাঁড়াল। কৃষ্ণবর্ণ ব্যাগ হাতে ডাক্তার হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এল। পুলিশ আসতেই উত্তেজিতভাবে জনকয়েক ঘটনাটা বিবৃত করলে। তারা লা কেচিরার ঘর দেখিয়ে দিলে! পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল। খানিক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর লা কেচিরার হাতে হাতকড়া পড়িয়ে তাকে শুদ্ধ নিয়ে বেরিয়ে এল। জনতা ছুটে এল—কিন্তু পুলিশ লা কেচিরাকে ঘিরে দাঁড়াল—তরোয়ালের খাপ ঘুরিয়ে তাদের ঠেকাতে লাগলো। তারা ঘুষি বাগিয়ে শুধু ওর উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগলো। অবজ্ঞাভরে তাকাতে লাগলো তাদের দিকে কিন্তু শব্দবাদ করলে না। সাফল্যের বিজয়ানন্দে চোখ দুইটা ওর জল জল করছিল। অন্তঃপ্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে পুলিশ তাকে টেনে নিয়ে চল্লো। রোজালিয়ার দেহ অতিক্রম করে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলে লা কেচিরা—"মরেছে ত?"

"হ্যাঁ—" গম্ভীর স্বরে জবাব দেয় ডাক্তার "ভগবানকে ধন্যবাদ"—বলে উঠে লা কেচিরা।

প্রেমিকার প্রার্থনা

(সি. জি. রসেটির কবিতা অবলম্বনে)

সুনীল বসু

মৃত্যু যখন আসবে আমার হে আমার প্রিয়তম,
গেয়ো না তোমার বিষাদমধুর গান,
দিওনা লালিম গোলাপকুসুম আমার মাথার পরে
শোকের তরুর কোর না পত্র দান ;—
শ্রাবণ আষাঢ়ে বর্ষা অথবা শিশির শোভার থরে,
শ্যামল তৃণের আবরণ দিও বুকে,
মনে কোর প্রিয় যদি কখনও স্মরণে আমায় পড়ে—
ভুলে যেও যদি ভুলতে চাও হে সুখে।
আমি কী দেখব আর সে মধুর ঘন নীলিমার ছায়া
অনুভবে কী বৃষ্টি বাজাবে গান,
রাতের পাখিরা আর কী রচনা ক'রবে গানের মায়া
গানের মন্ত্রে বেদনায় দেবে টান!
দেখব স্বপন সেই গোধূলির সোনালী বরণ নীড়ে,
যে গোধূলির রঙ্ থাকবে চিরটা কাল ;
হয়ত আসবে অনেক স্মরণ গোপন বক্ষ চিরে—
ভুলের আঘাতে ছিঁড়বে হয়ত জাল!
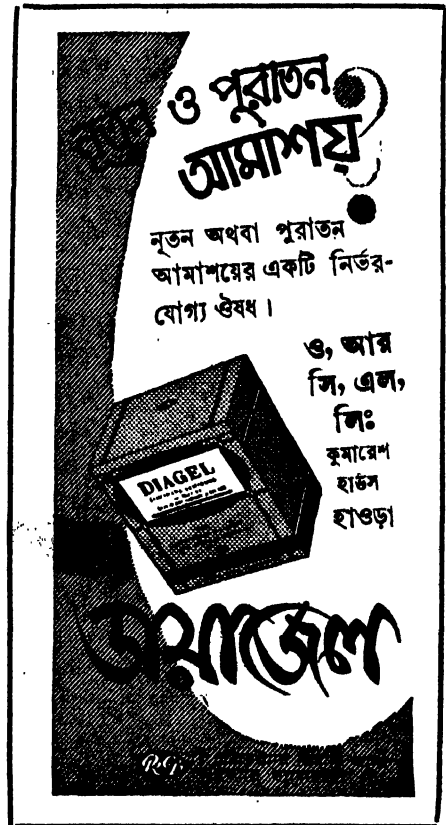
বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে আর একটি মাস অতিবাহিত হইল। মধ্যপ্রাচ্য এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসে নাই। আমেরিকার বাগদাদ চুক্তিতে পুরাপুরি যোগ দিবার সিদ্ধান্ত এই অঞ্চলের রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিমধ্যে সুয়েজ খালের প্রতিবন্ধক প্রায় অপসারিত হইয়া আসিয়াছে; খাল পরিচালনের অধিকার সম্পর্কিত বিতর্ক আবার নূতন করিয়া উত্থিত হইতেছে। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক—সঙ্কট এখনও দূরীভূত হয় নাই। সাইপ্রাস সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মীমাংসার আগ্রহ দেখাইয়াছেন। ক্যানবরায় (অষ্ট্রেলিয়া) দক্ষিণ-পূর্ব্ব চুক্তি সংস্থার (সিয়াটো) এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকার গোল্ড কোষ্ট রাজ্যটি কমনওয়েলথী স্বাধীনতার তিলক মাথায় লইয়া ঘানা নামে আন্তর্জাতিক আসরে আবির্ভূত হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্য—

ইস্রাইলী সৈন্য শেষ পর্য্যন্ত গ্যাজা ও আকাবা উপসাগরের উপকূল হইতে অপসরণ করিয়াছে। ইস্রাইলী সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জাতিসঙ্ঘের সৈন্যাধ্যক্ষ গাজার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব অনুযায়ী এই অঞ্চলে ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত সর্ত্তগুলি পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবার কথা। সে সর্ত্ত অনুসারে গ্যাজা মিশরের হাতে আসা উচিত; তাই মিশরীয় কর্তৃপক্ষ গ্যাজার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং যথাসম্ভব শীঘ্র জাতিসঙ্ঘের সেনাবাহিনীর অপসরণ এবং মিশরীয় কর্ত্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবী করিতেছেন। আকাবা উপসাগরের উপকূল হইতে ইস্রাইলী সৈন্য কি সর্ত্তে অপসরণ করিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে, সুয়েজের মধ্য দিয়া অবাধে ইস্রাইলী জাহাজ যাইতে দিবার কোনও প্রতিশ্রুতি মিশর দেয় নাই। যুদ্ধরত জাতিকে সুয়েজ খাল ব্যবহারে বঞ্চিত রাখিবার পূর্ব্ব নজীর অনুসারে মিশর ইস্রাইলী জাহাজকে এই খাল ব্যবহার করিতে দেয় না। তাহার যুক্তি—ইস্রাইলের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ-বিরতি ঘটিয়াছে, শান্তি-চুক্তি হয় নাই; সুতরাং যুদ্ধরত অবস্থা এখনও বলবৎ। বিষয়টি আমেরিকা আন্তর্জাতিক আদালতে উপস্থাপিত করিতে চাহিতেছে। আর কোনও উচ্চবাচ্য এই সম্পর্কে শোনা যাইতেছে না। ইতিমধ্যে সুয়েজ খালের প্রতিবন্ধক প্রায় অপসারিত হইয়াছে; অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি জাহাজ এখনই খালের পথে চলিতেছে; এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে সর্ব্বপ্রকার জাহাজ চলিতে পারিবে। তখন ইস্রাইলী জাহাজ সুয়েজ খাল ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলে কি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুয়েজ খাল বাধামুক্ত হওয়ায় ইহার পরিচালন সংক্রান্ত প্রশ্ন পুনরায় উঠিতেছে। এই সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্বর্ত্তীকালে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা লইয়াও মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ (বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি) প্রস্তাব করিয়াছে—খাল ব্যবহারকারী জাহাজগুলি বিশ্বব্যাঙ্কের অথবা জাতিসঙ্ঘের নিকট শুল্ক জমা রাখিবে; খালের কাজ চালাইবার ব্যয়ের জন্য উহারা ঐ অর্থের অর্দ্ধেক মিশরকে প্রদান করিবে। মিশর পাণ্টা প্রস্তাব করিয়াছে যে, সমস্ত শুল্ক মিশরকে অথবা তাহার মনোনীত পক্ষকে অগ্রিম দেওয়া হউক; প্রাক্তন সুয়েজ খাল কোম্পানীর নীতি অনুযায়ী মিশর উহার একাংশ খালের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয় করিবে। আমেরিকা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রস্তাবই সমর্থন করিয়াছে।

ইতিমধ্যে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস সুয়েজ সম্পর্কে স্থায়ী মীমাংসার ব্যাপারে হুমকী দিয়াছেন যে, মিশর যদি অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে সুয়েজ খাল এড়াইয়া চলিবার জন্য নূতন পাইপ লাইন বসাইবার এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইবার উপযোগী বড় বড় ট্যাঙ্কার তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইবে।

বাগদাদ্ চুক্তিতে আমেরিকা—

মার্চ্চ মাসের শেষভাগে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান্ ও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। এই বৈঠক শেষ হইবার অব্যবহিত পরে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আমেরিকা বাগদাদ্ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করিবে। এই চুক্তি-সংস্থার অর্থনৈতিক ও নাশকতা-বিরোধী কমিটীতে আমেরিকা পূর্ব্বেই যোগ দিয়াছিল। এখন ইহার সামরিক কমিটীতে যোগ দিয়া সে এই সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সদস্য হইবে। বৃটেনের এবং বাগদাদ্ চুক্তির অন্য চারিটি মুসলমান রাষ্ট্রের বহু কালের সাধ এতদিনে পূর্ণ হইল।

বাগদাদ্ চুক্তিতে আমেরিকা এতদিন যোগ না দিলেও এই চুক্তির পরিকল্পনা তাহারই। বৃটেনের উৎসাহে মধ্যপ্রাচ্যে আরব লীগ গঠিত হয়; এই লীগের সাহায্যে আরব রাষ্ট্রগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সামরিক জোটে ভিড়ানো ছিল বৃটেনের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, আমেরিকা এক একটি আরব রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্রভাবে প্রভাবিত করিয়া সামরিক গোঠে আনিবার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৫৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এই নীতি অনুসারেই তুরস্কের সহিত ইরাকের সামরিক চুক্তি হইয়াছিল। তুরস্ক আমেরিকার সামরিক সাহায্যে পুষ্ট, এবং উত্তর অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার (ন্যাটোর) সভ্য। ইরাক আরব রাষ্ট্র; ইরাকের রাজধানী বাগদাদের পথে "ন্যাটো"কে আরব জগতে প্রসারিত করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে প্রয়াস আর আগাইতে পারে নাই। আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট আরও দুইটি মুসলমান রাষ্ট্রকে (ইরাণ ও পাকিস্থান) বাগদাদ্ চুক্তিতে ভিড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আরব জগতে আর

নাক গলানো সম্ভব হয় নাই। আরবদের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টাতে সমগ্র আরব জগতে পাশ্চাত্য-বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়াছে। বাগদাদ্ চুক্তির প্রতিক্রিয়াতেই মিশর, সৌদী আরব ও সীরিয়ার (আরব রাষ্ট্র) ঐক্য সুদৃঢ় হয়। ইরাকের জ্ঞাতি জর্ডানকে এই চুক্তিতে টানিবার চেষ্টাতে ১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে এখানে আগুন জ্বলিয়া ওঠে; শেষ পর্য্যন্ত বৃটেনকে এখান হইতে তল্পী-তল্পা উঠাইতে হইয়াছে। বাগদাদ্ চুক্তি এবং তজ্জনিত আরব জগতের বিভেদ ও প্রবল পাশ্চাত্য-বিরোধী মনোভাবের জন্যই মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার অনুপ্রবেশের পথ সুগম হইয়াছে।

বাগদাদ্ চুক্তি আমেরিকার পরিকল্পিত হইলেও সে এতদিন দূরে সরিয়া থাকিয়া আরব বিক্ষোভের সম্মুখে আগাইয়া দিয়াছিল বৃটেনকে। বৃটেনের রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা পূর্ব্বানুসৃত বৃটিশ নীতি ত্যাগ করিয়া বাগদাদ্ চুক্তিতে যোগদান করেন, এবং অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার সম্প্রসারিত সামরিক সংস্থারূপে ইহাকে লালন করিবার দায়িত্ব লন। আমেরিকা দূর হইতে বাগদাদ্ চুক্তি-সংস্থাকে উৎসাহ দিয়াছে। গত বৎসর এই সংস্থার সভ্যদের অগ্রহাতিশয্যে সে ঐ চুক্তির অর্থ নৈতিক কমিটীতে যোগ দিয়াছিল। প্রথম দিকে এই চুক্তি-সংস্থার সহিত সর্ব্বপ্রকার প্রত্যক্ষ সংস্রব এড়াইয়া চলিবার এবং পরে শুধু অর্থ নৈতিক কমিটীতে আমেরিকার যোগ দিবার কারণ এই যে, এতদিন সে আরব জগতের বিরাগভাজন হইতে চাহে নাই; সৌদী আরবে বিপুল তৈল-স্বার্থের কথা এবং ধারহানে (সৌদী আরব) শক্তিশালী সোভিয়েট-বিরোধী বিমান-ঘাঁটীর কথা সে স্মরণ করিয়াছে। মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে মার্কিণ-নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল—সৌদী আরব সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতা, এবং পক্ষপতিত্বমূলক আচরণ। সৌদী আরবের বিরুদ্ধে বৃটেনের গুরুতর অভিযোগ আমেরিকা কানে তোলে নাই।

এখন আমেরিকা কেন বাগদাদ-চুক্তির সামরিক কমিটীতে যোগ দিতেছে, সে সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ হাগার্টি বলিয়াছেন যে, ইহা আইসেনহাওয়ারের নব প্রবর্ত্তিত মধ্য প্রাচ্য নীতির যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। এই উক্তির নির্গলিতার্থ—আমেরিকা যখন মধ্য প্রাচ্যে কমুনিজম্ প্রতিরোধের অর্থ নৈতিক ও সামরিক দায়িত্ব লইতেছে, তখন ঐ অঞ্চলের কম্যুনিজম্-বিরোধী বাগদাদ-চুক্তির সামরিক আয়োজন হইতে তাহার দূরে থাকিবার আর কোনও অর্থ হয় না। ইহা ছাড়া, আমেরিকার পূর্ব্ব নীতি পরিবর্ত্তনের আরও একটি কারণ থাকা সম্ভব। সম্ভবতঃ আমেরিকা এখন এই বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়াছে যে বাগদাদ্ চুক্তিতে তাহার যোগদানে সৌদী আরব তাঁহার প্রতি বিগড়াইবে না। টিউনিসিয়ার হাবিব্ বারগুঁবা ও মরক্কোর সুলতান বীন্ ইউসুফের সহিত রাজা সৌদের ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া মিশর-সীরিয়া-জর্ডান জোটের বাহিরে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষিত একটি স্বতন্ত্র আরব-জোট্ গঠন করা সম্ভব হইবে বলিয়াও ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষের হয়ত বিশ্বাস।

সাইপ্রাস্—

সাইপ্রাসের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা গত মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি শান্তির প্রস্তাব করিয়াছিল; সর্ত্ত ছিল—আর্কবিশপ্ ম্যাকারিওকে মুক্তি দিতে হইবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতকাল পরে এইবার "গভীর চিন্তার পর করিয়াছেন স্থির" যে, আর্কবিশপকে তাঁহারা মুক্তি দিবেন; তবে তাঁহাকে সাইপ্রাসে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করিবার জন্য আবেদন জানাইতে হইবে; আর তিনি আপাততঃ সাইপ্রাসে যাইতে পারিবেন না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মার্চ্চ মাসের শেষভাগে আর্কবিশপ্ ম্যাকারিওকে সীচেল্ দ্বীপের অন্তরীণ হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সাইপ্রাস্ প্রসঙ্গ জাতি-সঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটীতে আলোচনার সময় ভারতীয় প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন—এই সমস্যার গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গত মীমাংসার জন্য দুইপক্ষের আলোচনা আরম্ভ হউক। প্রস্তাবটি বিনা প্রতিবাদে রাজনৈতিক কমিটীতে গৃহীত হয়। তাহার পর, আর্কবিশপ ম্যাকারিওকে মুক্তি দেওয়ায় সাইপ্রাস সমস্যা মীমাংসার প্রকৃত চেষ্টা হইতেছে মনে করা যাইতে পারে। ১৯৫৫ সালে এবং ১৯৫৬ সালের প্রথমে সাইপ্রাস সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা এই কারণে ভাঙ্গিয়া যায় যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই দ্বীপটিতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের কোনও সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে অসম্মত হন। ইহার পর এই অভিযোগে আর্কবিশপ ম্যাকারিও ও তাঁহার তিনজন সহকারী ধর্ম্মযাজককে তাঁহারা গ্রেপ্তার করেন যে, তাঁহারা সন্ত্রাসবাদে উৎসাহ দিতেছেন। নেতৃবৃন্দকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া এবং কঠোর হস্তে সন্ত্রাসবাদ দমন করিয়া একটা শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিলে সাইপ্রাস শান্ত হইবে বলিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন। এই আশাতেই লর্ড র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌কে একখানি শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হয়। তাহার উপর নির্দ্দেশ থাকে যে, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগ তো বটেই, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাও গভর্ণরের সংরক্ষিত বিভাগ; এই সব বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ সুপারিশ করিবার প্রয়োজন নাই। আর্কবিশপ্ ম্যাকারিওকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া যেমন সন্ত্রাসবাদ কমে না, তেমনি র‍্যাড্‌ক্লিফের তৈয়ারী "অর্ডারী" শাসনতন্ত্রও গ্রাক্ সাইপ্রেটদিগকে শান্ত করে না। গভর্ণর "স্যার জন্ হার্ডিং সন্ত্রাসবাদীদিগকে চরম আঘাত হানিয়াছেন বলিয়া দাবী করিলেও...... বৎসরের প্রথম হইতে হত্যার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সোমবারে (৪।২।৫৭) সন্ত্রাসবাদীরা ১০০তম বৃটিশকে হত্যা করিয়াছে।" (নিউ ষ্টেটসম্যান, ৯।২।৫৭)। বস্তুতঃ, আর্কবিশপ্ ম্যাকারিওকে নির্ব্বাসনে পাঠাইবার পর সাইপ্রাসের সন্ত্রাসবাদ যে প্রবল আকার ধারণ করে, কঠোর দমন-নীতির প্রয়োগে তাহা হ্রাস পায় নাই; তুর্কি সাম্প্রদায়িকতা জাগাইয়াও কোনও ফল হয় নাই। তুর্কি সাম্প্রদায়িকতা জাগাইবার ফল এতদূর গড়াইয়াছিল যে, ক্ষুদ্র সাইপ্রাস্ দ্বীপের বুকে ছুরি চালাইয়া সেখানেও এক "পাকিস্থান" সৃষ্টির কথা উঠিয়াছিল। সম্প্রতি বৃটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ লেনক্স বয়েড্ সাইপ্রাস্ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন —Partition is not ruled out (রাজ্যবিভাগ অসম্ভব নয়)।

সাইপ্রাসের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময়ে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিলান্ বারমুডায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শোনা যায়, বারমুডায় আইসেনহাওয়ারের চাপেই বৃটিশ

গভর্ণমেণ্ট সাইপ্রাস সম্পর্কে নীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই অনুমান খুবই সঙ্গত। সাইপ্রাসের অশান্তি আমেরিকা পূর্ব্ব হইতেই ভাল চোখে দেখিতেছিল না; কারণ এই অশান্তির ফলে পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরের দুইটি "ন্যাটোর" সভ্য—গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছিল, এবং ঐ অঞ্চলে ন্যাটোর সংহতি সম্ভব হইতেছিল না। ইতিপূর্ব্বে বৃটেন আমেরিকার আপত্তি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মধ্য প্রাচ্যের বৃটিশ তৈল স্বার্থ রক্ষার জন্য বৃটেন্ এখানে একটি স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহিয়াছিল। ১৯৫৬ সালে মার্চ্চ মাসে তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এন্থনী ইডেন্ কতকটা আমেরিকাকে শুনাইয়া বলিয়াছিলেন যে, সাইপ্রাস্ তাঁহারা ছাড়িবেন না; বৃটিশ তৈল-স্বার্থ রক্ষার জন্য দ্বীপটি তাহাদের প্রয়োজন। সম্প্রতি মিশর-বিরোধী সামরিক অভিযানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বৃটেন্ স্বতন্ত্রভাবে সামরিক তৎপরতা অবলম্বনে অক্ষম; "আমেরিকার তৈল, আমেরিকার অর্থ ও আমেরিকার অনুমতি ব্যতীত তাঁহাদের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।" (নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান, ১৫।১২।৫৬) সুতরাং, সাইপ্রাসে স্বতন্ত্র বৃটিশ ঘাঁটী গড়িয়া তুলিবার ব্যাপার লইয়া আমেরিকার সহিত বৃটেনের মন কষাকষি বাড়াইবার আর কোনও অর্থ হয় না। ইহা ছাড়া, মধ্য প্রাচ্যের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় আমেরিকার কর্ত্তৃত্ব এখন বৃটেন মানিয়া লইয়াছে; আমেরিকা বাগদাদ্ চুক্তিতে পুরাপুরি যোগ দেওয়ার কর্ত্তৃত্ব স্বভাবতঃ তাহার হাতে চলিয়া যাইতেছে। সাইপ্রাসের গোলযোগ পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে নাটোকে যেমন দুর্ব্বল করিতেছে, তেমনি আমেরিকার নেতৃত্বে মধ্য প্রাচ্যের সামরিক সংহতির পথেও উহা বিঘ্নস্বরূপ; কারণ মধ্য প্রাচ্যের সামরিক সংহতি সাধনে তুরস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি।

অশান্ত ইন্দোনেশিয়া—

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে যে অশান্তি গত ডিসেম্বর মাসে দেখা দিয়াছিল, তাহা আরও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব এখন শুধু যবদ্বীপের কতকাংশে সীমাবদ্ধ। উত্তর সুমাত্রার কর্ণেল গিম্বিংএর প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব কতকটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এদিকে গত ২রা মার্চ্চ ম্যাকাসার রেডিওর ঘোষণা করা হয় যে, একটি সামরিক গভর্ণমেণ্ট সমগ্র পূর্ব্ব ইন্দোনেশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। সেলিবিস্, মালাক্কা এবং সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ (বালীদ্বীপ ইহার অন্তর্ভুক্ত) লইয়া পূর্ব্ব ইন্দোনেশিয়া। ম্যাকসার রেডিওর এই তিনটি প্রদেশের এবং পশ্চিম ইরিয়ানের (যাহার অধিকাংশ এখনও ওলন্দাজদের অধিকৃত) স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবী করা হয়, এবং বলা হয় যে, প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণর নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রিসভার সহিত এই দাবী সম্পর্কে আলোচনা করিতে সামরিক গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত। ইহার দশ দিন পরে বোর্ণিওর সামরিক অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল বাসরির নেতৃত্বে একটি "বিপ্লবী পরিষদ" বোর্ণিওর শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। অতঃপর, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব শুধু যবদ্বীপে সীমাবদ্ধ হয়। ইহার পর পশ্চিম যবদ্বীপে এক নূতন ধরণের সমস্যা দেখা দেয়; এখানকার অস্থায়ী প্রাদেশিক কাউন্সিল ঐ অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনাধিরের দাবী তোলে, এবং একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবী জানায়।

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহের পশ্চাতে রাজনৈতিক দলের উস্কানি, বৈদেশিক চক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা থাকিলেও এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের দাবী সর্ব্বত্র বিশেষভাবে কাজ করিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকেই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি তাহাদের স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐকিক শাসনব্যবস্থা যে ইন্দোনেশিয়ার উপযোগী নহে—ইহাই হয়ত বর্ত্তমান বিদ্রোহের শিক্ষা। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলির মধ্যে যবদ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল। দ্বীপটি আয়তনে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার এক-দশমাংশ; কিন্তু এখানে এই রাজ্যের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসীর বাস। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করে যবদ্বীপেই; স্বাধীনতা লাভের পর সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রও হইয়াছে এই দ্বীপটি। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর অভিযোগ—যবদ্বীপের অধিবাসীর প্রতি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ বেশী, অন্যান্য অঞ্চল উপেক্ষিত। এমন কি পশ্চিম যবদ্বীপের নেতৃবৃন্দও অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, ঐ অঞ্চলের সুদানী অধিবাসীর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অভিযোগ প্রধানতঃ সামরিক নেতাদের বিদ্রোহে প্রকাশ পাইবার বিশেষ কারণ আছে। ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বিভাগ দেশের রাজনীতির সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক নহে; প্রবীন সামরিক নেতাদের অনেকে প্রথমে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে এবং পরে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সেনাবাহিনী সহ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার সেনা বিভাগে গৃহীত হন। স্বভাবতঃ দেশের রাজনীতির প্রতি তাহাদের সক্রিয় আগ্রহ রহিয়াছে, এবং প্রভাবও রহিয়াছে প্রচুর। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক সঙ্কট দূর করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ সুকর্ণ যে সর্ব্বদলীয় "জাতীয় কাউন্সিল" গঠনের প্রস্তাব করেন, তাহাতে সামরিক নেতৃবৃন্দকে গ্রহণের কথাও ছিল।

ডাঃ সুকর্ণর প্রস্তাবিত "জাতীয় কাউন্সিল" এবং সর্ব্বদলীয় মন্ত্রি-মণ্ডল গঠনের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। বৃহৎ দলগুলির মধ্যে একমাত্র ন্যাশন্যালিষ্ট দল ব্যতীত অন্য কেহ কম্যুনিষ্টদের সহিত একযোগে মন্ত্রি-সভা গঠনে সম্মত নয়,—প্রধান আপত্তি সাম্প্রদায়িক দলগুলির। ডাঃ সুকর্ণ এই আপত্তি অযৌক্তিক মনে করেন। তাহার প্রশ্ন—"যে দল সাধারণ নির্ব্বাচনে ৬০ লক্ষ ভোট পাইয়াছে, তাহাকে কি উপেক্ষা করা যায়?...আমার নিকট 'বাম' ও 'দক্ষিণ' বলিয়া কিছুই নাই। আমার একমাত্র কামনা—ইন্দোনেশীয় জাতি ঐক্যবদ্ধ হউক"। তাঁহার এই আবেদন সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে প্রভাবিত করে নাই। ফলে শস্ত্রমিদ্‌জোজো মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি ন্যাশন্যালিষ্ট দলের (শস্ত্রমিদ্‌জোজোও এই দলের) চেয়ারম্যান মিঃ সুবীর্য্যকে

নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ভার দিয়াছিলেন। তিনি এই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইয়াছেন।

ঘানা—

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের গোল্ড কোষ্ট নামক রাজ্যটিকে বৃটেন্ স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রদান করিয়াছে। গত ৬ই মার্চ্চ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কমনওয়েল্‌থের এই নূতন সভ্যরাষ্ট্রের নামকরণ হইয়াছে ঘানা। স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভ করিবামাত্র ঘানা জাতি-সঙ্ঘে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সে ৮১ তম সভ্যরাষ্ট্র।

"সিয়াটো" কাউন্সিল—

মার্চ্চ মাসে ক্যান্‌বেরার (অষ্ট্রেলিয়া) দক্ষিণ-পূর্ব্ব চুক্তি সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে কম্যুনিজম্ ও কম্যুনিষ্ট-দের প্রতি যথারীতি কটূক্তি বর্ষিত হয়, এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্টদের নাশকতাবিরোধী তৎপরতা নিবারণের ব্যবস্থা কিরূপ সফল হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা হয়। 'এই প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত সামরিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িবার কাজ এক্ষণে বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। Mr. Dulles was really patting himself on the back when he told the members that the organisation is an effctive force against aggression."—Economist. চীন সম্পর্কে সিয়াটোর সকল সভ আমেরিকার নীতির অনুবর্ত্তী নহে। কাজেই, মিঃ ডালেস যখন এই বালিয়া তাল ঠোকেন যে, আমেরিকা কখনও চীনকে স্বীকার করিবে না, তখন বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড হোম্ বলিতে বাধ্য হন যে, ইহা নিছক মার্কিণ নীতি; ইহার সহি বৃটেনের কোনও সম্পর্ক নাই। ২।৪।৫৭

সেঁজুতি

শ্রীবাসনা গোস্বামী

সেঁজুতি, আজকে আকাশে কোথাও মেঘের চিহ্ন নয়;
কুয়াশায় ঢাকা শিমুলের বন; কত কথা কত গান
কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায়; তোমাকেতো, গীতিময়,
খুঁজে পাই নাই সাঁঝের আকাশে, আসেনি সে অঘ্রাণ।
নিশীথ রাত্রি তন্দ্রামগ্ন; জোনাকিরা হাসে নাচে;
রূপোলী জরির ফিতে দিয়ে মোড়া আকাশের সীমানা;
বুনো কলমিরা শীতের প্রহরে তোমার করুণা যাচে:
সেঁজুতি, তোমার প্রতীক্ষাভরে তাহাদের আনাগোনা।
পাণ্ডুর চাঁদ ভোরের প্রহরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ;
স্বাতীতারা জ্বলে উৎকণ্ঠিত পরশ তোমার লাগি':
দুই চোখে তার জাগার কালিমা; রাত হয়ে এল শেষ,—
সেঁজুতি, তবু তো এলেনা এখনো আমি যে রয়েছি জাগি।

মেয়েদের কথা

বৈদিক যুগে

শ্রীমতী সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

নারীশিক্ষার যুগ যেন—মহাকাল সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ। একবার উঁচু হয়ে নেমে যায় ধীরে ধীরে। আবার আসে উঁচু হয়ে আর একটি তরঙ্গ।

নারীশিক্ষার যুগ একদিন স্ফীত উচ্চ হয়ে দেখা দিয়েছিল—মধ্যে নিম্ন তরঙ্গের ব্যবধান। আবার আসছে—আবার মাথা তুলছে আর একটি তরঙ্গ।

কবে দেখা দিয়েছিল? কোন সে যুগ?—যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্য্যাম্?—সেই যে স্বর্ণময় যুগে উচ্চারিত হয়েছিল—সেই যুগের নারীর পরম কামনা—ধন ঐশ্বর্য্য চাই না, আমার কোন পার্থিব সুখই চাই না—শুধু অমৃতা হবার মন্ত্র আমায় দাও। আকুল জিজ্ঞাসা আত্মজ্ঞানের অমৃত পান করার—মেটাও তা। যাজ্ঞবল্ক-পত্নী মৈত্রেয়ী দেবী এমনি করেই স্বামীকে জানিয়েছিলেন তাঁর জীবনের চরম বাসনা।

রাজর্ষি জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক নিজের পাণ্ডিত্যে গভীর আস্থাবান হয়ে জনকের প্রতিশ্রুত স্বর্ণশৃঙ্গ গাভী গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন শিষ্যকে আদেশ করলেন—তখন মহাজ্ঞানী ও গুণী পণ্ডিতগণ তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলেন। অবশেষে পরাজিত হয়ে সকলেই ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু—সেই সভার মধ্যে সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়ে বেজে উঠল একটি নারীকণ্ঠ। তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চললেন। সবগুলির উল্লেখ না করলেও একটির উল্লেখ না ক'রে পারা যায় না—"পণ্ডিতগণ যে সূত্র, এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী এবং যাকে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বরূপ ব'লে নির্দেশ দিয়ে থাকেন—আমি জিজ্ঞাসা করি—সেই সূত্র আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে?" পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং এই তেজস্বিনী নারী দৃঢ়কণ্ঠে যাজ্ঞবল্কের পাণ্ডিত্যে সকলকে নিঃসন্দিগ্ধ হতে বলেছিলেন। এই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ নারী দেবী গার্গী তাঁর প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আপন প্রতিভা চিরপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নারীকে জীবন্তবিত্ত ছাড়া আর কিছুই ভাবা হত না, ভারতে তখন জ্ঞানের দ্যুতি নারী অন্তঃকরণকেও দীপ্ত ক'রে দিয়েছিল। আপন সাধনা ও নিষ্ঠার বলে নিজস্ব আসন নির্দ্ধারিত করেছিলেন তাঁরা। জ্ঞানলাভের অদম্য স্পৃহা আত্রেয়ীকে একদিন উত্তর-ভারত থেকে দক্ষিণ-ভারতে যাবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। অন্তরে জ্ঞানস্পৃহার দ্যুতি। দেহে বল্কল—হাতে কমণ্ডলু, আত্রেয়ী ছুটে চলেছেন। অগস্ত্য আশ্রমের দিকে। কেন এ ছুটে চলা? মহাকবি ভবভূতি তার চিত্র এঁকেছেন—'বনদেবতা' "আর্য্যে আত্রেয়ি, কোথা থেকে আসছেন আপনি? কেনই বা দণ্ডকারণ্যে চলেছেন?" আত্রেয়ী—"সেখানে বেদগুরু অগস্ত্য আছেন, বেদান্তের তত্ত্ব জানতে তাই চলেছি তাঁর কাছে।" বাল্মীকির আশ্রম থেকে চলে যাওয়ার কারণ বলতে গিয়ে নানা কথার পরে লবকুশের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের উল্লেখ ক'রে বলছেন—"এত মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে সহাধ্যয়ন বা Co-education কিছু একটা অভিনব ব্যাপার নয় আমাদের ভারতে। সহাধ্যয়ন করতেই হত গুরুর আশ্রমে থেকে উপনয়ন সংস্কারের পর। উপবীত না হ'লে বেদপাঠের অধিকার ছিল না। হারীত বলেছেন—মেয়েদের দুভাবে ভাগ করা যায়—ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। সদ্যোবধূ যাঁরা উপনয়নের পরই তাঁরা বিবাহিত হবেন। ব্রহ্মবাদিনী যাঁরা—তাঁরা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এমন কি যজ্ঞ প্রভৃতিও করে থাকেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় দেবী বিশ্ববারা-রচিত বৈদিক শ্লোকের মাধুর্য্য মনোহরণ করে। "হে অগ্নি! আপনি প্রজ্বলিত হউন—অমৃতের উপর অধিকার বিস্তৃত করুন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হব্যদাতার মঙ্গলের জন্য তাঁর নিকট প্রকাশিত হউন। হে জ্যোতির্ময়, আমি আপনার পূজা করছি—আপনি যজ্ঞে প্রজ্বলিত থাকুন।" জ্বলন্ত অগ্নির দিকে ঘৃতপাত্র হাতে নিয়ে বিশ্ববারা এগিয়ে চলেছেন, প্রদীপ্ত অগ্নির তেজে দীপ্ত তাঁর জ্ঞানপূত সর্বাবয়ব। ঘোষা, অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা এবং আরও অনেকে বৈদিক মন্ত্র রচনা ক'রে গেছেন। স্বামীর উদ্দেশে রচিত লোপামুদ্রার একটি ঋক্ অপূর্ব। পিতৃগৃহে বা স্বামীগৃহে এমনি ক'রেই প্রাচীন ভারতের নারীমনোমন্দিরে জ্ঞানের দীপটি জ্বালিয়ে রেখে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সমাপন করতেন। ঋষিপত্নী আর ঋষিকন্যারাই কি জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করেছিলেন? ঠিক তা নয়। রাজকন্যা দেবহূতি স্বামীরূপে বরণ করেছিলেন মহাজ্ঞানী ঋষিসত্তম কর্দমকে? তিনি স্বামীর জ্ঞানগর্ভবাণী অমৃতস্বরূপে পান করতেন এবং নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

নারীদের বেদে অধিকার নেই—পরবর্তী যুগের এই যে মত—কি ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—কারণ অনুসন্ধান ক'রে দেখলে মনে হয়—নারীর পক্ষে আচার্য্য গৃহে—(পিতা বা স্বামী ভিন্ন অন্য আচার্য্যের-গৃহে) বাস অসুবিধাজনক এবং ক্রমে উপনয়নের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হওয়ার জন্যই হয়ত বেদ মন্ত্রোচ্চারণ ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু উপনীত না হলেও শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রের যজ্ঞে বহুমন্ত্র মেয়েদের উচ্চারণ করতে হবে—এ বিধান রয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও কৌশল্যা, সাবিত্রী, অম্বা প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেছেন। আশ্বলায়ন, পারস্কর প্রভৃতির মতেও দেখা যাচ্ছে—অনেক সময় পত্নীই প্রথম মন্ত্রপাঠ ক'রে যজ্ঞে আহুতি দেবেন।

কাত্যায়নের বার্ত্তিকে—উপাধ্যায়ী আচার্য্যা প্রভৃতি পদ স্বয়ম্ অধ্যাপিকা অর্থ করেছে দেখা যায়।

পটঞ্জল কাব্যের কন্যা ও স্ত্রীর কাছে ভারতের বহু অঞ্চল থেকে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করতে আসত। তবে তাঁর যুগে মেয়েরা বেদের অধিকার থেকে অনেকটা যে চ্যুত হয়েছিলেন তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে 'স্ত্রিয়াং ন'—এই বার্ত্তিকে আয়ুষ্মতি ভব গার্গি এখানে প্লুত স্বর স্বীকৃত হল না—গার্গি শব্দে, অথচ দেবদত্ত শব্দের বেলায়—তা স্বীকার করা হচ্ছে। অর্থাৎ দেবদত্ত অ-অ-স—এই ভাবে একটা জল দেওয়া হচ্চে আশীর্ব্বাদ করার সময়।

যাই হোক, বেদাধিকার থেকে ক্রমে চ্যুত হলেও জ্ঞানের স্পৃহা যাঁদের অন্তরে প্রবল তাঁদের সে রাজ্য থেকে কোনদিন চ্যুতি ঘটেনি—ঘটবেও না।

বৈদিকধর্ম্ম যখন স্থবিরতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোতও যখন রুদ্ধপ্রায়, এমনি সময়ে অসাধারণ পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। এই শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে মাহিষ্মতি নগরে মণ্ডনমিশ্রের যে বিতর্কের আয়োজন হয়েছিল—তার মীমাংসকরূপে কোন উপযুক্ত পণ্ডিতই পাওয়া গেল না তখন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী উভয়-ভারতী হলেন মীমাংসক। অপূর্ব্ব তেজস্বিতা আর ন্যায়নিষ্ঠা এই নারীর। যথাযথ বিচারে স্বামীর পক্ষপাত না ক'রে তিনি শঙ্করাচার্য্যেরই জয় ঘোষণা করেছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে খনা ও গণিতশাস্ত্রে লীলাবতীর অসামান্য পাণ্ডিত্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে কালের পাতায়।

উপসংহারে—আরও একটু বলা দরকার। বৈদিক-যুগের অনেককাল পরেও সংস্কৃত সাহিত্যে—ভারতীয় নারীর অনেক দানই সঞ্চিত রয়েছে। নাটকাদিতে, মহাকাব্যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্রেও নারী-লেখনী সঞ্চালিত হয়েছিল। সমালোচনা সাহিত্যেও দেখা যায়—মহাপণ্ডিত ঘনশ্যামের পত্নী সুন্দরী ও কমলা নাম্নী দুই পত্নী কালিদাস ভবভূতির প্রভৃতি মহাকবিদেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। টীকাকারিণী হিসাবেও তাঁদের নাম পাওয়া যায়।

নারীশিক্ষাযুগের ঐ উত্তুঙ্গতার অবনমন ঘটে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের পর থেকে। মোগল যুগেও দেখা গেছে—হারেমের অন্তর্ব্বর্তিনী নারী সাহিত্য চর্চ্চায় নিমগ্ন। কিন্তু তারপরে এমন একটা যুগ এসেছিল, যে যুগে মেয়েদের বই পড়াকেও পাপ বলে মনে করা হত।

যাহোক্ সে সঙ্কট কেটেছে। আবার কাল সমুদ্রে নারী শিক্ষার যে তরঙ্গ উঠেছে তার উত্তুঙ্গতা হয়ত স্থির হয়েই থাকবে চিরদিন। অন্ততঃ এ আশা একেবারেই অসমীচীন নয়।

—

মুষ্টিযোগ

শ্রীমতী ইলারাণী সরকার

গত অগ্রাণ ও মাঘ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীমতী ইরা ভট্টাচার্যের কতকগুলি মুষ্টিযোগ বের হয়েছে। মুষ্টিযোগ জানা থাকলে এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে আমরা বহুরোগ বিনা ডাক্তারে নিজেরাই সারাতে বা উপশম করতে পারি। নিম্নে আমারি জানা কতকগুলি মুষ্টিযোগ দিলাম—তন্মধ্যে তারকাচিহ্নিত টোট্‌কাগুলি আমার নিজের পরীক্ষিত।

* **অম্ল**—দু'বেলা আহারের ১ ঘণ্টা পূর্বে একগ্লাস গরমজল পান করতে হবে। খাবার সময় জলপান নিষিদ্ধ। আহারের অন্ততঃ দেড়ঘণ্টা পরে পুনরায় একগ্লাস গরমজল পান করলে যে কোন প্রকার অম্বলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। এটি আমার বহু পরীক্ষিত।

৫।৬টি গোটা হরিতকী গোমূত্রে সেদ্ধ করে, নরম হলে আঁটি বাদ দিতে হবে। সেগুলি রৌদ্রে শুকিয়ে ১ ছটাক সৈন্ধব লবণ গুড়ার সাথে কাগজী লেবুর রস মিশিয়ে রৌদ্রে শুষ্ক করে নিলেই ঔষধ প্রস্তুত হল। প্রতিদিন সকালে ৵০ মাত্রায় ব্যবহার করলে অবশ্য উপকার হবে।

* **কেটে যাওয়া**—শরীরের কোনস্থান কেটে রক্তস্রাব সুরু হলে কেরোসিন তৈলের পট্টি দিলে বা কেরোসিনের পাত্রে ক্ষতস্থান ডুবালে তৎক্ষণাৎ রক্তপড়া বন্ধ হয়। পরে ক্ষতস্থানে জল না লাগালে এতে ঘা পর্যন্ত হয় না। দুর্বা অথবা গাঁদাফুলের পাতার রস দিলেও রক্ত বন্ধ হয়।

* **ক্রিমি**—কোয়াসিয়া ভেজানো জল প্রত্যহ ভোরে আধ ছটাক করে পান করালে ছোট ছোট বাচ্চাদের ক্রিমির উপশম হয়। (কোয়াসিয়া একপ্রকার গাছের ছোট ছোট টুকরা—বাজারে মসলার দোকানে বিক্রি হয়)

* **বসন্ত**—এ রোগে চক্ষু আক্রান্ত হবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। চোখে সামান্য ব্যথা অনুভব করা মাত্র শুশ্রূষাকারী কাঁচা আদা চিবায়ে দিনে ৩।৪ বার ১০।১৫ মিনিট করে রোগীর চোখে ফুঁ দিবেন। এতে ৺মার দয়ায় চক্ষুনাশের আশঙ্কা সম্পূর্ণ দুরীভূত হয়।

শিমুল বীজের শাঁস ১৪টি ৩।৪টি গোলমরিচের সাথে পিষে আখের গুড়সহ প্রাতে খালি পেটে ৭দিন ব্যবহার করলে এক বৎসর পর্যন্ত বসন্ত রোগ হয় না।

৩টি তেঁতুল বীচির শাঁস এক টুকরা কাঁচা হলুদের সাথে বেটে প্রাতে একদিন মাত্র খালি পেটে সেবন বসন্তের প্রতিষেধক।

কলেরার প্রতিষেধক—প্রত্যহ বিশেষতঃ মহামারীর সময় তাম্রপাত্রে রান্না করে খেলে অথবা পানীয় জলের পাত্রে তাম্রখণ্ড ডুবিয়ে রেখে ঐ জল সর্বদা ব্যবহার করলে কলেরার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কোমরে একটি তামার পয়সা ফুটো করে তাগার সাথে বেঁধে রাখলে আরো বেশী উপকার হয়।

জুতা বা মোজার ভেতর গন্ধকচূর্ণ রেখে ব্যবহার করলে কলেরা আক্রমণের ভয় থাকে না। মহামারীর সময় খালিপেটে না থাকাও উহার একটি প্রতিষেধক।

* **মৌমাছির কামড়ে**—মৌমাছি কামড়ালে শরীর থেকে হুলগুলি সযত্নে তুলে ফেলে দষ্টস্থানে মধু লাগালে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

* **বৃশ্চিক দংশনে**—বিচ্ছু কামড়ালে সেটাকে মেরে ফেলে তার পেটটি ক্ষতস্থানে ভাল করে ঘসে দিলে সদ্য জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

* **বদহজম বা পেটফাঁপা**—সাধারণতঃ রাত্রিবেলা আহারের দোষ হলে ভোরের দিকে পেট ফাঁপে বা চোঁয়া ঢেকুর উঠে। এরূপ হলে কয়েকবার ঘন ঘন প্রচুর ঠাণ্ডা জল পান করতে হয়। এতে অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়।

হাঁপানীর প্রতিকার—দু'আনা তেজপাতচূর্ণ আধ তোলা বাসকপাতার রস কিঞ্চিৎ মধুসহ খেলে সদ্য সদ্য হাঁপ নিবারণ হয়।

* ছায়াতে কৃষ্ণ ধুতুরার পাতা শুষ্ক করে তার ধুম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ হাঁপকষ্ট দূর হবে। ধুম যদি মুখে টেনে না লওয়া সম্ভবপর হয় তবে একটি সরাতে আগুন নিয়ে তার উপর অপমার্গ, বাসক, অথবা কৃষ্ণ ধুতুরাপাতা

(যেটি হাতের কাছে পাওয়া যায়) নিক্ষেপ করে ধোঁয়া নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করলেও একই ফল হবে।

হাঁপের সময় বাঁ হাতে (মেয়েরা যেখানে তাগা বাঁধে) শক্ত করে বেঁধে দিলে উপকার হবে।

৩।৪টি আরশুলা সেরখানেক জলে সেদ্ধ করে ঐ জল এক ছটাক মাত্রায় ২।৩ বার পান করলে হাঁপ সত্ত্ব সত্ত্ব কমে যায়। তাছাড়া অনেক সময় একেবারে রোগারোগ্য হয়ে যায়। আরশুলা বিষাক্ত নয়—এতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

কাঁচা রশুনের রস আধ তোলা কিঞ্চিৎ গরম জলের সাথে পান করলে হাঁপকষ্ট সত্ত্ব দূর হয়।

সোরা ভেজানো জলে কাগজ ভিজায়ে উষ্ণ ছায়াতে শুষ্ক করতে হবে। পরে ঐ কাগজ নলের মত করে পাকায়ে আগুন ধরিয়ে ধূমপান করলে অতিশীঘ্র দুরারোগ্য হাঁপকষ্ট দূর হয়।

হাঁপের সাথে বুক ধড়ফড়ানি থাকলে দুইতোলা বিল্ব-বৃক্ষের ছাল একসের জলে সেদ্ধ করে ঐ জল আধছটাক মাত্র পান করলে হাঁপ ও বুক ধড়ফড়ানি দুইই কমে।

* **সর্দি রোগে**—সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে গিয়ে খুবই অসুবিধা হয়। তাছাড়া কোন কিছুর ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। এরজন্য ২।৩ দিন ক্রমান্বয়ে স্নানের সময় ৫।৭ মিনিট করে মাথায় সহ্যমত গরম জল ঢাললে উপশম হয়। মাথায় পরে ঠাণ্ডাজল দেওয়া নিষিদ্ধ। গরমজল ঢালার সংগে সংগে নাক দিয়ে স্রাব বের হতে থাকে এবং নাক পরিষ্কার হয়ে যায়।

* **হাত-পা-মুখ ফাটিলে**—শীতকালে অনেককেই এর কবলে পড়তে হয়। ভোরবেলা ঘাসের উপরের শিশির একটি পাথরের বাটিতে সংগ্রহ করে নিয়ে, তাতে কয়েক ফোঁটা কাঁচা দুধ মিশিয়ে মুখে মেখে দিলে খুব উপকার হয়।

দুধের সর বা মাখম লাগালেও বেশ ফল হয়।

কান পাকিলে—লাউপাতার অথবা আতা-পাতার রস গরম করে দিনে ২।৩ বার কয়েক ফোঁটা কানে দিলে দীর্ঘদিনের কান পাকাও আরাম হয়।

* মাছের বা অন্য কোন সূক্ষ্ম কাঁটা ফুটে থাকলে—অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতসারে অতি সূক্ষ্ম কোন কাঁটা শরীরের কোনস্থানে ফুটে থাকে। কিছুদিন পর স্থানটি খুব শক্ত হয়ে ফুলে উঠে। তখন এতে যন্ত্রণা হয়; কিন্তু কাঁটাটি আর বের করার কোন উপায় থাকে না। এরূপ হলে স্থানটি সূঁই দিয়ে ভাল করে খুঁচিয়ে নিতে হবে। রাতে শোবার সময় পান-সুপারী-চুণ-খয়ের একত্রে চিবিয়ে মোলায়েম করে তৎক্ষণাৎ গরম গরম লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিতে হবে। এরূপ প্রতিরাত্রে করলে প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে বিনা অস্ত্রে কাঁটা বের হয়ে সরে যাবে।

হিক্কা—শুষ্ক হলুদ অথবা মাসকলাই আগুনে পোড়ায়ে তার ধূম গ্রহণ করলে ভাল হয়।

কচি ডাবের জল ঈষৎ গরম করে ২।১ চামচ অথবা কচি তাল শাঁসের জল ২।১ চামচ পান করলে হিক্কার উপশম হয়।

চোর কাঁচকী পোড়ায়ে তার ধূম গ্রহণ করলে সকল রকমের হিক্কা অতি অবশ্য বন্ধ হয়।

গোল মরিচ লৌহশলাকায় বিঁধে—প্রদীপের শীষে পোড়ায়ে সেই ধোঁয়া নাকে ধরলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা বন্ধ হবে।

* **রক্ত প্রস্রাব হলে**—রোগীকে যতটা পারা যায় জলপান করাবে। দিনে অন্ততঃ এক পোয়া চিনি ও ৪।৫ সের জল পান করালে ভাল হয়।

চাকা চাকা করে মূলো কেটে এক হাঁড়ি জলে সেদ্ধ করে কয়েক গ্লাস পান করালে প্রস্রাব পরিষ্কার হবে।

চুল পাকিলে—যে চুলগুলি পেকেছে সেগুলি তুলে ফেলে দিতে হবে। পরে শ্বেত বা রক্ত করবীর মূলের ছাল কাঁচা দুধ দিয়ে বেটে নিয়ে ৫।৬ দিন মাথায় মাখলে ও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ করলে চুল পাকা বন্ধ হয়।

* **পোড়া ঘার ঔষধ**—সমপরিমাণ চুণের জলের সাথে নারকেল তেল অথবা রেড়ীর তেল মিশিয়ে অল্প গরম করে ন্যাকড়ার পট্টি দিলে অন্য ঔষধের কোন প্রয়োজন হয় না।

অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল পোড়ায়ে এর সাদা ছাই ঐ তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে আরো শীঘ্র সুফল হয়।

* **আগুনে পুড়ে গেলে**—তৎক্ষণাৎ সেই

স্থানে গোল আলু বেটে-প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় এবং ফোস্কা পড়ে না।

কাগজী বা পাতি লেবুর রস অথবা ঘৃতকুমারীর শাঁস দগ্ধ স্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হবে।

পোড়ার সাথে সাথে সদ্য গোবরের (ঈষদুষ্ণ অবস্থায়) প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় এবং ফোস্কা পড়ে না। এটি সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক।

অরুচির জিনিষে রুচি

যূথিকা রায়

বর্ষে বর্ষে বনবীথিকায় পত্রে পুষ্পে তৃণ গুল্ম লতায় বসন্ত আসে। কিন্তু নর-নারীর জীবনে বৎসরান্তের মত বসন্ত জাগ্রত হয়না কেন এই কথাই ভাবছিলাম।

লীনার চিঠি এলো। সে লিখছে, আমার ভায়ের বসন্ত হয়েছে। সে সারাদিন মশারি ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে। দেখলে কষ্ট হয়। বাড়ীর সবাই ভয় পেয়ে গেছেন। টিকে সকলেই নিয়েছিলাম। তবু এ রোগ কেন এলো বুঝতে পারছিনা। এবার নাকি মারাও যাচ্ছে সংখ্যায় অনেক বেশী। রোজ সকালে উঠে তেঁতুল বীচি ও কাঁচা হলুদ বেটে এক সঙ্গে মিশিয়ে অল্প অল্প ক'রে সকলেই খাচ্ছি। সত্যিই কি এ জিনিষ দুটো বসন্তের প্রতিষেধক ? জানা থাকলে জানাতে ভুলিস্ না।

বান্ধবীকে লিখলাম: আমি তো দূরের কথা, বৈজ্ঞানিকরাও এর সত্যানুসন্ধান করেছেন কিনা জানিনা। তেঁতুল বীচি বানর ছাড়া কোনো নরনারীকে কখনো খেতে দেখিনি। কাঁচা হলুদ গায়ে মাখতে দেখেছি। খায় শুনেছি শেয়ালে। যে যা বলবে তুই যখন তাই করবি, নিমপাতার চাট্‌নি তৈরী ক'রে কচু পুড়িয়ে তোর নিয়মিত কিছুদিন খাওয়া উচিত।

সংস্কারে আঘাত লাগলে সবাই চটে।

সে উত্তর দিল: তোর ছোট্ট কয়েক লাইন লেখা আমায় বলতে আর কিছু বাকী রাখেনি। যাই হোক, আমি মনে করি, অন্ধ সংস্কার মুক্ত তুইও এখনো হ'তে পারিসনি একথা স্মরণ করিয়ে রাখছি।

পৌষ সংক্রান্তির সকাল বেলায় এক মহিলা সাহিত্যিকার সঙ্গে ধর্মাধর্ম আলোচনা চলছিল। সে আলোচনা উত্তরোত্তর আমাদের উত্তেজিত ক'রে তুলছিল। চায়ের সংগে প্রাত-রাশ সুরু হ'য়ে গেছে। প্লেট থেকে চামচে মুখের ভিতরে দিয়ে পায়েস খাচ্ছি মনে হচ্ছিল। কিন্তু কি দিয়ে তৈরী বুঝতে পারছিলাম না।

সাহিত্যিকা জিজ্ঞেস করলেন: কি খাচ্ছ বলতো ? সঠিক না বলতে পারলেও বুঝতে পারলাম: ফুলের সংগে কী যেন একটা মূলের যোগাযোগ ঘটেছে। বললাম: ক্রিমরোজের পাঁপড়ি, ক্ষীর ও চিনির আস্বাদ পাচ্ছি। কিন্তু মূল জিনিষটা কি বুঝতে পারছিনা।

—না পারবারই কথা। রূপের সংগে রূপার মিলনই তোমরা দেখে আসছো। কিন্তু বুড়োর সংগে তরুণীর প্রণয় কোথাও দেখেছো ?

সবিস্ময়ে বললাম: না তো!

সুচতুরা গৃহিণী বুদ্ধির ঘি দালদায় নয়, আসল ঘিয়ে ভেজে বুড়ো মুলোকে মূলতানি গাইএর দুধ ও গোলাপ পাপড়ির সংগে মিলন ঘটিয়ে দেন।' খেয়ে নিশ্চয় বুঝতে পারছো: মন পরিষ্কার থাকলে অরুচিকর জিনিষেও রুচির শুচিতা আনা যায়।

পৌষ সংক্রান্তিতে মুলো খাওয়ার রীতি বাংলা দেশে কতকাল ধ'রে চলে আসছে বলা শক্ত।

ফেরার পথে মনে হচ্ছিল: হলুদ খাওয়ার জন্যে লীনাকে ঠাট্টা করা অন্যায় হয়েছে। অন্ধ সংস্কার আলো-অন্ধকারে সর্বত্রই সম বিরাজমান।

বাড়ী ফিরেই লীনাকে লিখলাম: সেদিন তোকে যা লিখেছি তার থেকে সত্যিই আমিও মুক্ত নই বোধহয়। বান্ধবীকে ক্ষমা করিস্।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

বাংলা গদ্যভাষার ক্রমবিবর্তন আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রথম উদ্ভবের পর থেকে এই ভাষা কি ভাবে নানা অদল-বদলের মধ্যে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে তার অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব পরিবর্তনের স্তর-পরম্পরার অন্তরে নিহিত বাংলা গদ্যের মূলধারার প্রকৃতি বিচার ও স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষা তথা বাংলা গদ্যভাষা যখন প্রথম জন্ম নিল তখনকার অনুমানের অস্পষ্ট কুহেলিকামাখা ভোরবেলা থেকে যাত্রা সুরু করে বর্তমান সময়ের বাস্তব তথ্য ও প্রমাণের প্রখর রৌদ্রে উদ্ভাসিত মধ্যাহ্নকালের দিকে এগিয়ে আসতে হবে।

এই আলোচনা করতে হলে গদ্যভাষা ও তাতে রচিত সাহিত্য, দুয়েরই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কোন ভাষা প্রথম গঠিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী পরিণতি কি ভাবে ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে তা প্রত্যেক স্তর অনুযায়ী পর্যবেক্ষণের সেরা উপায় হচ্ছে সেই ভাষায় লিখিত সাহিত্য আলোচনা করা। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ বুঝবার জন্যে সমগ্র বাংলা গদ্যসাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা দরকার। আশা করা যায় ঐ সাহিত্যের ভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারলে এবং ঐতিহাসিক প্রণালীতে গদ্যভাষার গতিপথের বিভিন্ন স্তরে যে সব প্রভাব তাদের প্রাণস্পন্দন রেখাঙ্কিতকরণে সমর্থ হয়েছে তাদের মর্মকথা ব্যক্ত করতে সমর্থ হলে বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্যসাহিত্যের মূলধারা যে কি এবং তা কোন্ খাতে প্রবাহিত, তার একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হচ্ছে দুদিক থেকে বাংলা গদ্যভাষার অবস্থা বিচার করা—ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক; আর এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা গদ্যের নিজস্ব গতিপথটি খুঁজে বার করা। যে পথে প্রবাহিত হলে গদ্যভাষার বহতা নদীটির স্বখাত ভ্রষ্ট হবার ভয় নেই, বরং বহুবাঞ্ছিত সর্বভাবরূপায়ণ সামর্থ্য সাগরসঙ্গম লাভ হওয়ার ভরসা আছে সেই পথের দিঙ্‌নির্ণয় প্রয়োজন।

ভাষা ও সাহিত্য পরস্পরের সঙ্গে অর্ধনারীশ্বর সম্বন্ধে আবদ্ধ। ভাবপ্রকাশ-সামর্থ্যের উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। আবার, সাহিত্যিকদের ভাবপ্রকাশ প্রচেষ্টায় ভাষাও যুগে যুগে নানা ভঙ্গিতে গঠিত, পুনর্গঠিত, পরিবর্তিত, সংশোধিত ও পরিণত হয়। সাহিত্যের প্রয়োজনেই ভাষা একটি বিশেষ প্রবণতা পরিত্যাগ করে নতুন আর একধারা বেছে নেয়, ভাষা যখন পরিবর্তনের সন্ধিপথে এসে দাঁড়ায়, তখন সাহিত্যিক স্থির করেন, কোন্ পথ বরণ করে নিলে ভাষার মূলপ্রকৃতি থেকে স্খলনের ভয় নেই; দুই পরস্পরবিরোধী প্রবল প্রভাবের সামনে তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।"

নতুন-পুরোণোর দ্বন্দ্ব সামঞ্জস্যের মধ্যে সব বস্তু ও ভাব নিজের নিজের অগ্রগতি ও বিবর্তন অর্জন করে। ভাষা ও সাহিত্যের বেলাতেও তাই হয়। ক্রমাগত আত্মবিকাশ ও অগ্রগমনের প্রয়াসে নতুনের সঙ্গে পুরোণোর সংঘর্ষ ও সমন্বয় সাধন করা হয়, আর এই ক্রমবিবর্তন ক্রিয়ায় ভাষা ও সাহিত্য পরস্পরের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়, সেই জন্যেই বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝতে হলে তার ভাষাগত ও সাহিত্যিক, দুরকম আলোচনাই অপরিহার্য।

বাংলা গদ্যের মূলধারা খুঁজে পেলে বাংলা গদ্যের বর্তমান প্রবণতা কোন্ দিকে, সে-বিষয়েও একটু চিন্তা করা দরকার। সব সময়ে যে কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিচারণার দ্বারা স্বরূপ উপলব্ধি করে সার্থকতার পথে পা বাড়াতে পারে, তা নয়; ব্যক্তির মতো জাতিও অনেক সময় সাময়িকভাবে হলেও আত্মবিস্মৃত ও পথভ্রান্ত হতে পারে। সেজন্যে প্রত্যেক ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক ও সমালোচকদের সদাসজাগ থেকে কর্তব্য নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত। বাংলা গদ্যের বর্তমান প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ পরিণতি নিরূপণের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে তার বরেণ্য পথ নির্বাচনের চেষ্টা করাও স্বভাষাপ্রেমিকের অবশ্য কর্তব্য। এবিষয়ে প্রবল মতভেদ পরিহার করা বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে অসম্ভব। অনুসন্ধিৎসুকে এমন ক্ষেত্রে কঠিন কাজ হলেও রাগদ্বেষবিবর্জিতচিত্তে পথনির্দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়ের সমস্ত ক্ষেত্রটি সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে এইরকম একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়-পরিকল্পনা রচনা করা যায়:—

প্রথম অংশ:—

বাংলা ভাষা তথা বাংলা গদ্যভাষার প্রথম উদ্ভবকাল; ঐ ভাষার আনুমানিক প্রাথমিক রূপ; ঐ ভাষার আদি ও মৌলিক উপাদানসমূহ।

দ্বিতীয় অংশ:—

বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম ব্যবহার, ব্যবহারক্ষেত্র, আনুমানিক প্রয়োগকাল ও প্রযোজকগণ।

তৃতীয় অংশ:—

বাংলা গদ্যভাষার উপর বহিরাগত প্রভাবসমূহের কাল নির্ণয় ও স্তর বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমিক আলোচনা তথা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ বর্ণনা।

চতুর্থ অংশ:—

বাংলা গদ্যের মূলধারা-নির্ণয়।

পঞ্চম অংশ:—

বাংলা গদ্যের বর্তমান প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাব্যতা।

ষষ্ঠ অংশ:—

বাংলা গদ্যের বরণীয় পথ।

"প্রারম্ভ" শীর্ষক অংশে একসঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের আলোচনা করা হবে। এই দুই অংশের অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গগুলিতে অনুমানের অবকাশ বেশি, বাস্তব তথ্য ও প্রমাণের ভাগ কম। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের আলোচনাও প্রথম দুই অংশের মতো একত্রভাবে করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইতিহাসলব্ধ সাক্ষ্য, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণের অভাব হবে না। এই আলোচনা বিস্তৃততর এবং একেই প্রকৃতপ্রস্তাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস বলা যেতে পারে। বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্যসাহিত্যের নমুনা গুলিতে উদাহৃত রচনাবলীর সমগ্র রচনাকাল ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করে পাঁচটি অধ্যায়ে ঐ ইতিহাসের সারাংশ মোটামুটি ভাবে দেওয়া হবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বাংলা গদ্যের মূলধারা-নির্দেশও বাস্তব তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে আলোচিত হবে। "পরিশিষ্ট" অংশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশের যথাসম্ভব নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যসম্মত আলোচনার পর এই নিবন্ধের উদ্দিষ্ট অনুসন্ধান-কার্য শেষ হবে।

এর আগে পূর্ববর্তী আচার্যবৃন্দ বাংলা গদ্য সম্বন্ধে লেখা তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহে উজ্জ্বল মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তনের স্তরপরম্পরা উদ্ঘাটন করে তার মূলধারা আবিষ্কার করবার প্রয়াস তাঁদের কারও গ্রন্থসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই প্রয়াস অভিনব এবং তার জন্যে নিবন্ধ-লেখককে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে হয়েছে।

প্রারম্ভ

(৮০০-১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)

লেখালেখির কাজে বাংলা গদ্যভাষার ব্যবহার কখন প্রথম সুরু হয়, তা ঠিকভাবে বলতে কেউ পারে না। এ বিষয়ে কোন অনুমান করতে হলে বাংলাভাষার উদ্ভবকাল জানা তো চাই-ই, তা ছাড়াও আর একটা বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার। কোন ভাষা প্রথম গ'ড়ে উঠার সময় সেই ভাষার তখনই গদ্যরচনার ব্যবহার থাক বা না থাক, প্রথমে সেই ভাষা মৌখিক ভাষার আকারেই জন্ম নেয়, কাব্যভাষায় কখনও নয়। আদি বাংলা ভাষার যে নমুনা আমরা প্রথম দেখি তা কাব্যে রচিত হলেও বাংলা ভাষা প্রথম স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে কাব্যে নয়, মুখের কথায়। একদা সমস্ত পূর্বভারতে সংস্কৃত ভাষা রাজকার্যে, সাহিত্যচর্চায়, বিদগ্ধ-মণ্ডলীর সবরকম লেখালেখির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যদিকে মাগধী-প্রাকৃত এবং তা থেকে উদ্ভূত অপভ্রংশ ভাষায় সাধারণ লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করেছে। এই পূর্বভারতের এক বিস্তৃত সমতলভূমির অধিবাসীরা এই অপভ্রংশ ভাষার উপর তাদের নিজ অঞ্চলের বিশিষ্ট উচ্চারণ ও শব্দাবলীর ছাপ মেরে মুখে মুখে যে এক নতুন ভাষার চলন আরম্ভ করে নিল, তাকেই আজ হাজার বছর বিকাশের পর পৃথিবীবাসী বাংলা ভাষা ব'লে জানে। অন্য সব পূর্বভারতীয় এলাকার ভাষা থেকে একান্ত পৃথক ভাবে মুখের কথার আদানপ্রদান থেকে এই নবীন ভাষাটির জন্ম সুরু হয় আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এবং পূর্ণ পার্থক্যসাধন সম্পন্ন হয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

এই নবজাত বাংলা ভাষা তখনকার বাঙালীরা মুখের ভাষার যে-আকারে ব্যবহার করত, তা কাগজ কলম নিয়ে যথাযথভাবে লিখে গেলেই গদ্যভাষার জন্ম হবার কথা। বেশি কিছু সৌষ্ঠববিধান করা হোক বা না হোক, মুখে যে ভাষায় কথা বলা হয় তা হুবহু লিখে গেলেই বেশ সহজ গদ্যভাষা রচনা করা যায়, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নানা কারণে প্রায় হাজার-বারোশো বছর আগেকার সেই আদিকালে, অন্তত সাহিত্যের কাজে, ছন্দোবিহীন গদ্যরচনা লেখকদের অনভিপ্রেত ছিল। তাঁরা কেবল ছন্দোবদ্ধ কবিতাই রচনা করতেন, তার কারণ নিয়ে পরে অনেক কথা বলা যাবে, আপাতত এটুকু দেখা যায় যে, প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে কবিতার পরিমাণ প্রচুর কিন্তু তখন গদ্যসাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের "কাদম্বরী"র মতো গদ্যের কোন নিদর্শন ভাষাসাহিত্যে একেবারে নেই। কিন্তু তাই বলে যে বাংলা ভাষায় সেকালে কোনরকম লেখার কাজে গদ্যের ব্যবহার হত না, তা বলা চলে না। সাহিত্যের কাজে না হোক, চিঠিপত্র লেখার কাজে, দলিল-দস্তাবেজ রচনায় বা ঐ ধরণের প্রাত্যহিক জীবনের বিষয়কর্মে লিখিত আকারে বাংলা মৌখিক ভাষা বা তার কোন শিষ্টরূপ অর্থাৎ গদ্যভাষা প্রথম কখন রূপ পরিগ্রহ করে, তা জানতে হবে। বাংলা গদ্যের প্রথম লিখিত নিদর্শন হল একটা চিঠি, ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, এর অনেকদিন আগে থেকে চিঠি লেখার কাজে বাংলা গদ্যের ব্যবহার চলে আসছিল। প্রথম উদ্ভবের পর ১৫৫৫ সালের পূর্ববর্তী সময়ে এই বাংলা গদ্যের রূপ কেমন ছিল, তা আজ কেবল অনুমানের বিষয়।

মনে হতে পারে, মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, অপরের সঙ্গে কেনা-বেচা লেনা-দেনা চালায়, সে ভাষা তো সেদিনই লৈখিক রূপ পাবে যেদিন মুখে তার প্রচলন আরম্ভ হল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এর অন্যথাচরণ হয়। একটা নতুন ভাষা গ'ড়ে উঠ্‌ছে, তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠ্‌ছে, লোকের মুখে মুখে সেই ভাষার ব্যবহারও চলছে, কিন্তু তবু লেখার কাজে, তা সে দৈনন্দিন জীবনের অসাহিত্যিক লেখার কাজ হলেও, হয়ত অন্য কোন ভাষার প্রচলন রয়ে গেছে, এমন দেখা যায়। দৃষ্টান্ত দেবার জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা চিঠিপত্রের কথা বলা যায়। তখনকার মুখের ভাষার সঙ্গে চিঠিপত্রের ভাষার তেমন কোন মিল নেই। তখনকার চিঠিপত্র সাধারণত ফার্সিবহুল; অথচ অমুসলমান সাধারণ পত্রলেখক মুখের ভাষায় ঠিক ঐ অনুপাতে ফার্সি ব্যবহার তখন আর করত না। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাতেও পুরোনো অভ্যস্ত ভাষায় চিঠি লেখার ব্যবহারকৌশল অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই রকম ব্যাপার বাংলা ভাষার প্রথম উদ্ভবের সময় হয়ে থাকতে পারে। আর, লেখার কাজে ভিন্ন ভাষা ব্যবহারের ঐ অভ্যাস দীর্ঘকালও বজায় থাকতে পারে। বাংলা ভাষা যখন পূর্ণায়ত গঠন নিয়ে অন্যতম নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তখন শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেছেন, আরও অনেকে তাঁদের

মুখ্য রচনাবলী দেবভাষায় লিখে চলেছেন। ইউরোপেও উনিশ শতক পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা লাতিন ভাষায় নিজেদের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করতে ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন, মাতৃভাষা সুপরিণত ইতালীয় ভাষাকে একান্তভাবে উপেক্ষা করেছেন। এ ধরণের সুপরিচিত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আরও আছে।

সুতরাং ভাষার জন্ম হওয়া আর সেই ভাষা গদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া এক কথা নয়। মানুষের মুখে মুখে যে ভাষার উদ্ভব তাকে সাধুরূপ না দিয়ে লেখায় যথাযথভাবে রূপান্তরিত করতে মানুষ সব দেশে সব কালে সঙ্কোচ বোধ করেছে। তাই কোন ভাষার উৎপত্তির পরও গদ্যভাষার প্রচলন হওয়া একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বিশেষত মৌখিক ভাষা অবিকৃতভাবে সাহিত্যসেবায় ব্যবহার করতে বাংলা দেশের পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা চিরকালই এমনভাবে বাধা দিয়ে এসেছেন যে, এদেশে মৌখিক ভাষা লিখিত রূপ লাভ করেছে সাহিত্যের কাজে মাত্র উনিশ শতকের শেষদিকে। মৌখিক ভাষার যে গদ্যরূপান্তরকে তথাকথিত সাধুভাষা নাম দেওয়া হয়, সেই রূপের প্রচলনও প্রথম দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে মুখের ভাষাকে একটা কৃত্রিম বক্রতা না দিয়ে সোজাসুজি সাহিত্যে প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে পণ্ডিতদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা আজও দেখা যায়। লেখার কাজে বাংলা গদ্য ব্যবহারের উৎপত্তি এই কারণেই বিলম্বিত হয়েছে।

মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে গদ্যের প্রতি বিরাগও অতি প্রবল কারণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা প্রবলতম কারণ কিনা সন্দেহ। ছাপাখানার একান্ত অভাব সত্ত্বেও সংস্কৃত সাহিত্যে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষা-সাহিত্যে যে তা যায় না, তার কারণ, শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানপদ ভাষার গদ্যে বই লেখা পছন্দ করতেন না। অবশ্য অন্য কারণগুলি উপেক্ষার বিষয় নয়।

মুখে যে ভাষাতেই কথা বলা হোক না কেন, লেখার সময় রাজভাষা বা দেবভাষা ব্যবহার করা দরকার—এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে নবম শতকে শিক্ষিত অভিজাত বাঙালী সংস্কৃত ভাষায় তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করিয়েছে, পঞ্চদশ শতকে সংস্কৃতে, অষ্টাদশ শতকে ফার্সিতে আর উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজিতে অন্তরঙ্গ জনকেও চিঠি লিখেছে। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক কারণে বাঙালির ভাষায় যুগে যুগে সংস্কৃত, ফার্সি ও ইংরেজির প্রভাব ছায়াবিস্তার করেছে। বাংলা ভাষা গঠনের প্রথম যুগে এই মনোবৃত্তির জন্যে গদ্যরচনা সৃষ্টি হতে বেশ কিছু দেরি হয়েছে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে বাংলাভায় গদ্যরচনা থাকলেও গদ্যসাহিত্য বলতে কিছুই ছিল না। তার অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই ছাপাখানার অভাব। ইংরেজ-শাসন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে আরও কত সময় লাগ্‌ত, কে জানে। ১৪৫০ সালে জর্মনিতে গুটেনবর্গ মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। ১৪৭৬ সালে ইংল্যাণ্ডে ক্যাক্‌স্টন ছাপার কাজ সুরু করেন। কিন্তু ভারতে প্রবলপরাক্রান্ত মুঘল সম্রাটরাও মুদ্রাযন্ত্রের কোনরকম ব্যবস্থা করেন নি। অতি প্রাচীনকালে চীনদেশে একরকম ছাপার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ভারত সে-ব্যবস্থাও গ্রহণ করে নি, ফলে ছাপাখানার অভাবে শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচনাও বেশি প্রচার লাভ করতে পারে নি। স্মরণ করার সুবিধার জন্যে প্রায় সমস্ত রচনাই পদ্যে লেখা হত। সুর ক'রে গাওয়া যায়, ছন্দের দোলার জন্যে মনে রাখতে, আবৃত্তি করতে সুবিধা হয়, এই সব কারণে পদ্য রচনার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। প্রায় সমস্ত প্রাগ্‌-আধুনিক হিন্দু-ভারতীয় ভাষা-গ্রন্থ এই কারণে পদ্যে লেখা—কদাচিৎ গদ্যরচনার দেখা পাওয়া যায়। সাহিত্যে ভিন্ন অন্য সব বিষয়ের রচনাও পদ্যে লেখা হয়েছে। এই পদ্যমুখাপেক্ষিতা আমাদের মনে আধুনিক চিন্তাধারার অভ্যুদয় প্রতিরুদ্ধ করেছিল। কারণ, আধুনিক মন সবচেয়ে সহজে স্ফুরণ লাভ করতে পারে তার স্বাভাবিক ভাষা গদ্যে। এ যুগে কবিদের ভাষাও সেইজন্যে ক্রমশ গদ্যভঙ্গিম হয়ে পড়েছে। যুগধর্মে গদ্যের প্রাধান্যে এখন অনিবার্য।

বাংলা ভাষার প্রথম উদ্ভবকাল সম্বন্ধে ঠিক কোনও অব্দের নির্দেশ আমরা যে করতে পারি না তার প্রধান কারণ, ভাষা হঠাৎ একদিন গ'ড়ে উঠে তার প্রচলন সুরু হয় না ; অতি ধীরে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আগত সম্পদ্ নিয়ে এক বিস্তৃত কালব্যাপী শাব্দ সাধনা ও ভাবার্চনার ফলে তার জন্ম হয়। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সব প্রমাণ ও তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তা থেকে এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বাংলা ভাষার গঠনকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের কিছু আগে থেকে কিছু পরবর্তীকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়ে। বাংলা দেশের ইতিহাস-পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সপ্তম-অষ্টম শতকের প্রবল মাৎস্যন্যায়ের সময়ে এদেশে সমাজের উচ্চ স্তরে শাসনকার্য, শিলালেখ, তাম্রলিপি, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতির জন্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নেওয়া হত এবং এদেশে সংস্কৃত-চর্চার আধিক্যের জন্যে একটি নিজস্ব রচনাশৈলী গ'ড়ে উঠেছিল যার নাম গৌড়ী রীতি। বাংলাদেশে সংস্কৃতভাষার এই প্রভাব ষোড়শ শতক পর্যন্ত অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এই প্রভাব ক্রমশ কমে আসে। কিন্তু আলঙ্কারিক জগন্নাথ প্রণীত "রসগঙ্গাধর" শীর্ষক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রগ্রন্থ এই শতকেই বাংলাদেশে লেখা হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে এই প্রভাব লুপ্তপ্রায় হলেও প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতপ্রভাব ভূগর্ভশায়িনী ফল্গুধারার মতোই প্রচ্ছন্ন ছিল যার নব উৎসারণ বাংলা গদ্যকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পরিপ্লাবিত করে।

মাৎস্যন্যায়ের যুগ শেষ হয়ে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সুবর্ণযুগ পাল রাজাদের আমল যখন আরম্ভ হল, তখন বাংলাভাষা নিজ বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত হয়ে স্বাধীনতার ঔজ্জ্বল্য বিকীরণে সমর্থ হল। সংস্কৃত ও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের কুয়াসার আবরণ ভেদ করে বঙ্গভাষার স্বতন্ত্রতার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হল। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলির শেষ পর্ব সাঙ্গ হল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সহস্র অব্দের শেষাশেষি, এই হচ্ছে ভাষাতাত্ত্বিকের অভিমত।

পাল-রাজত্বের গোড়ার দিকে উচ্চ স্তরের লোকদের মধ্যে দৈনন্দিন কথাবার্তা, কাজকর্ম বাদে সব রকম সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষার চর্চা খুব প্রবল হলেও সাধারণ লোকদের জীবনের সব ক্ষেত্রে এবং সমাজের উচ্চ স্তরের লোকদেরও তেল-নুন লকড়ির ক্ষেত্রে মাগধী প্রাকৃত থেকে সঞ্জাত একরকম অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট ভাষায় কাজ চালাতে হত। সেই ভাষা মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার একেবারে শেষ স্তর অতিক্রম করে সদ্য নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় পরিণতি লাভ করতে চলেছে। The origin and development of the Bengali Language গ্রন্থে আচার্য সুনীতিকুমার অনুমান করেছেন যে, বাংলা ভাষা যখন এই পূর্বভারতীয় আর্যভাষার অপভ্রংশ স্তরের মুক্তিকাভেদ ক'রে উঠে দাঁড়াচ্ছে তখন সময়টা আনুমানিক হিসাবে ৭০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হবে। (ঐ বইএর ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) আচার্য শহীদুল্লাহ্, সম্প্রতি এক প্রবন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ঐ সময়ের পূর্বসীমা আনুমানিক ৬৫০ সাল হতে পারে।

(ক্রমশঃ)

—আট—

ইন্দ্রজিৎ দরজার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে ভিলোঁর কবিতা পড়ছিল। বারান্দা দিয়ে চলে যেতে যেতে মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়ালো সত্যজিৎ। আর তখনই বই বন্ধ করে ইন্দ্রজিৎ ডাকল: সত্য?

—কী বলছিলে?

—বুড়োটা কেমন আছে আজ?

—অনেক ভালো।

—অনেক ভালো!—দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো খানিকটা হিসহিসিয়ে উঠল ইন্দ্রজিৎ: মরল না? কিছুতেই মরল না? আর প্রীতি? সেটাও বেঁচে আছে? গলায় দড়ি দিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েনি এখনো?

—কী পাগলামি হচ্ছে দাদা।

—পাগলামি!—ইন্দ্রজিৎ করকর করে দাঁত ঘষল: ইংল্যাণ্ডের সেই লোকটা—হেগ্ না কী নাম—তার কথা তোর মনে আছে? সেই যে মানুষ খুন করে করে রক্ত খেত? মনে আছে তাকে?

—না।—সত্যজিৎ চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

পেছন থেকে আবার সচিৎকার আবৃত্তি শোনা গেল ইন্দ্রজিতের। এবার ভিলোঁ নয়—বোদ্‌লেয়ার।

"Un cadavre Sans tête épanche,
comme ùn fleuve,
Sur loreiker désaltéré
Un sang ruge et vivant, dont la
toile S'abreuve
Avec l'adivité d'un pré—"

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্যজিৎ আবার দাঁড়িয়ে পড়ল—শক্ত হয়ে গেল স্নায়ুগুলো। ফরাসী সে জানেনা—কিন্তু ওই লাইনগুলোর অর্থ তার জানা—ইন্দ্রজিৎ তাকে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছে এর আগে। একটি ছিন্নমুণ্ড নারীর শব পড়ে আছে বিছানার ওপর—তার টকটকে তাজা লাল রক্ত বিছানাটা শুষে নিচ্ছে তৃষ্ণার্ত মাটির মতো। "un Martyre"—

কী অদ্ভুত—কী বীভৎস একটা মন নিজের মধ্যে বয়ে চলেছে ইন্দ্রজিৎ। থেকে থেকে সত্যজিৎ ভাবে ও যেন এই মুখার্জি ভিলারই গুহানিহিত সত্তা—এই বাড়ির, এই পরিবারের মূল তত্ত্ব। অথবা এই সত্যের বাকী আধখানা আছে শিবশঙ্করের শোবার ঘরের সেই বড় ছবিটায়—পারৎপক্ষে ওরা কেউ সেটার দিকে চোখ তুলেও তাকায়না। রক্ত আর লালসা। শুধু এই বাড়িই বা কেন? এ পৃথিবীর আদিম তত্ত্ব—প্রথম মানুষের প্রথম দর্শন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবরণটা সরে গেলে, সামাজিকতার নীতি-নিয়মের বাঁধনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করবার মতো ইচ্ছাশক্তি না থাকলে—ওই আদিম তত্ত্বটাই আত্মপ্রকাশ করে বার বার। ইন্দ্রজিতের খ্যাপামিতে—শিবশঙ্করের বিকারে।

মনে আছে, রাঁচীর পাগলা গারদ দেখতে গিয়ে তার এক সঙ্গী একটা মন্তব্য করেছিল। বলেছিল, পাগলকে দেখলেই মানুষের আসল উপাদানগুলোকে চেনা যায়। যতক্ষণ স্যানিটি আছে, ততক্ষণ সেটার পেছনে খাঁটি মানুষটা থাকে লুকিয়ে। সেটা যেই সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তুমি দেখতে পেলে কত কিলোগ্রাম ব্রুটালিটি আর কতখানি মনুষ্যত্ব। অথবা ইন্‌স্যানিটি হল একটা

কেমিক্যাল প্রসেস—যার সাহায্যে একটা সম্পূর্ণ হিউম্যান কম্পাউণ্ড থেকে তুমি এলিমেণ্ট্গুলো আলাদা করে নিতে পারো।

শিবশঙ্কর। ইন্দ্রজিৎ। হয়তো সত্যজিৎ নিজেও খানিকটা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে উঠে পড়ে সত্যজিৎ ভাবতে লাগল, আজকে চারদিকেই যেন যৌগিক থেকে মৌলিক উপকরণগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যে নীতি, যে ধর্ম, যে সমস্ত প্রাথমিক সমাজবোধ এই যৌগিকতা সৃষ্টি করেছিল—আজকের আকাশে বাতাসে নিষ্ঠুর আণবশক্তির বিচ্ছুরণে সেগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর বেশিদিন বাকী নেই। এর পরে আবার মানুষ তার মূল উপাদানগুলোর মধ্যেই ফিরে যাবে—তার নির্বাধা নগ্নলোকে, তার নিঃসংকোচ লালসায়, তার নির্লজ্জ রক্তপাতে।

চলতি বাসের ঝাঁকানিতে চমকে উঠল সত্যজিৎ। কী ভাবছে সে এ সমস্ত। নিছক মেণ্টাল এনার্কি। ওপাশের সীটেই তো তরুণ দম্পতী বসে আছে একটি। মেয়েটি থেকে থেকে হাসিতে কলধ্বনিত হয়ে উঠছে। সুন্দরী স্ত্রীকে পাশে নিয়ে চলবার প্রসন্ন গৌরবে ছেলেটি তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। বীথি থাকলে বলত: লাইফ্ ইজ্ ফর্ লিভিং—ছোড়দা।

বীথির আশা আছে, স্বপ্ন আছে, বিশ্বাস আছে। শুধু সত্যজিৎই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে নাকি নৈরাজ্যের মধ্যে? শিবশঙ্কর আর ইন্দ্রজিতের শৃঙ্খল কি প্রসারিত হচ্ছে তার মধ্যেও?

একটা চুরুট ধরাতে পারলে হত। কিন্তু হালের আইনে ট্রাম বাস যাত্রীর ওই নিরীহ আরামটুকু নষ্ট হয়ে গেছে। এলাচ বা লবঙ্গের আশায় সত্যজিৎ পকেটে হাত পুরল—যদিও থাকবার কোন কথা ছিলনা, তবু অসম্ভব আশায় একবার খুঁজে দেখল। এলাচ লবঙ্গ মিলল না—চামড়ার সিগার কেসটাই হাতে ঠেকল। আর একটুকরো ভাঁজকরা কাগজ।

কাগজটা খুলে সত্যজিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করল। অধ্যাপক-সমিতির মীটিঙের একটা নোটিশ।

কলেজের গেটের সামনে পৌছেই সে থমকে দাঁড়ালো।

চারদিকে ছাত্রীদের ভিড়, চিৎকার, গণ্ডগোল। গেট আটকে দাঁড়িয়ে আট দশটি মেয়ে। ধর্মঘট।

কিসের ধর্মঘট?

উত্তর পাওয়া গেল সামনের দেওয়ালের কয়েকটা পোস্টারে।

"শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে—"

শিক্ষক আন্দোলন! তা বটে। এই তিনদিন শিব-শঙ্করকে নিয়ে টানা-পোড়েনের মধ্যে সে কথা তার মনেই ছিলনা। রাজভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট আরম্ভ করেছেন বাংলার শিক্ষকেরা। ন্যায্য বেতন আর ভাতার দাবিতে। আত্মতৃপ্ত 'বুনো রামনাথদের'ও এবার সাধন-নিষ্ঠা টলে উঠেছে। এখন আর তেঁতুল পাতার ঝোল পাওয়াও সম্ভব নয়—হয়তো বাজারে তেঁতুলপাতা পাঁচসিকে সেরে বিক্রী হয়!

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে সুরেলা তীক্ষ্ণ গলায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছে।

"আজ ভেবে দেখুন তাঁদের কথা, যাঁরা চিরদিন বঞ্চনা আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেও দেশের বুকের ভেতরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছেন। আজ ভেবে দেখুন—যাঁদের হাতে জাতিগঠনের দায়িত্ব—আমরা তাঁদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য কতখানি পালন করতে পেরেছি। যাঁরা চিরদিন ধরে শান্ত প্রসন্নমুখে সমস্ত অন্যায়-অবিচারকে মেনে এসেছেন, কোনোদিন কিছুমাত্র প্রতিবাদ করেননি, কতখানি অসহ্য হলে তাঁরা—"

বীথি বক্তৃতা করছে। সত্যজিতের ওপর তার চোখ পড়ল একবার, কিন্তু দেখেও যেন দেখতে পেলো না। তার চোখের দৃষ্টি অনেক দূরে ছড়িয়ে আছে; কপালের ওপর ঝলক রোদ এসে পড়েছে—যেন কোনো নতুন দিগন্তের আলো এসে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে তাকে।

"শুধু কলকাতা নয়—বাংলার দূর-দূর গ্রামান্ত থেকে তাঁরা এসেছেন। আশী বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত আছেন তাঁদের মধ্যে। এই জ্ঞান তপস্বী আচার্যের দল আজ যে প্রকাশ্য পথের ওপর খররৌদ্রে বসে নিজেদের দাবি আদায় করতে চেষ্টা করছেন, এ লজ্জা—এত বড় গ্লানি আমরা কোথায় রাখব?"

চমৎকার বলতে শিখেছে বীথি। কতদিনে আয়ত্ত

করেছে ক্ষমতাটা ? সত্যজিতের আশ্চর্য লাগল। বীথির যে চোখ দুটো তার ছায়া-ছায়া মনে হত এতদিন—সে চোখ কবে থেকে এমন করে জ্বলতে আরম্ভ করল ?

ছাত্রীদের পাশ কাটিয়ে সত্যজিৎ দোতলার স্টাফ রুমে উঠে গেল। যারা পথ আটকে রেখেছিল, মৃদু হেসে রাস্তা ছেড়ে দিলে তারা। ছাত্র ধর্মঘটে অধ্যাপকদের বাধা দেওয়া হয় না।

সত্যজিৎ স্টাফ রুমে এসে ঢুকল।

অধ্যাপকদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হয়ে গেছে।

—শিক্ষকদের আন্দোলনে কলেজের ছেলেমেয়েদের মাথা ব্যথা কেন ?

—শিক্ষক আন্দোলন বুঝি দেশের সমস্যার চাইতে আলাদা ? তাদের সম্পর্কে বুঝি আমাদের কোনো কর্তব্যই নেই ?

—আমার তো মনে হয়, আমাদেরও একদিন সিম্প্যাথেটিক স্ট্রাইক্ করা উচিত।

—ভালো, ভালো !—একজন বিকৃত মুখে বললেন, শুধু স্ট্রাইক্ কেন ? আপনারাও ঝাণ্ডা নিয়ে লেবারদের মতো পথে পথে শ্লোগ্যান দিতে বেরিয়ে পড়ুন না ! খুব স্যাংটিটি থাকবে আপনাদের !

—স্যাংটিটি !—উত্তেজিত হয়ে আর একজন টেবিলে একটা কিল বসালেন, একটা দোয়াত থেকে খানিক কালি ছটকে পড়ল, কয়েকটা খড়ির টুকরো গড়িয়ে পড়ল নীচে : স্যাংটিটি। লেবারারের সঙ্গে আপনার তফাৎ কিসে মশাই ? তিন শিফ্‌টে এই যে ধোপার গাধার মতো খাটেন আর নমিনাল্ অ্যালাউয়েন্স পান—সাধারণ শ্রমিকের চাইতে আপনি কিসে আলাদা ? সম্পত্তির মধ্যে ডিগ্রির ভ্যানিটি, পেটি বুর্জোয়া আত্মবিলাস—

ঠং ঠং করে প্রবল শব্দে ঘণ্টা বাজল। কথার বাকী অংশটা সত্যজিৎ শুনতে পেলো না।

প্রিন্সিপ্যাল এসে ঘরে ঢুকলেন। উত্তেজিত হয়েই এসেছেন।

—এভাবে চেঁচামেচি করবার কী মানে হয় ? এটা কলেজের প্রফেসারস্ রুম, না মেছোহাটা ?

উত্তেজনাটা থমকে গেল। কিছুক্ষণ চুপ চাপ। তারপর বিনীত বিগলিতভাবে হাসলেন।

—আমরা আজকের স্ট্রাইক্‌টা নিয়েই আলোচনা করছিলাম স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল্ বললেন, এটা রাজনীতি আলোচনা করবার জায়গা নয়।

একজন অল্প বয়েসী অধ্যাপকের তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল : স্টাফ্ রুমে আমরা কী আলোচনা করব বা করবনা—আশা করি, য়ুনিভার্সিটি সে-সম্বন্ধে কোনো স্পেশ্যাল্ রেগুলেশন্ তৈরী করে দেয় নি।

প্রিন্সিপ্যাল্ ভ্রূকুটি করলেন।

—তা দেয়নি। তবে আন্‌রিট্‌ন ল আছে একটা।

তরুণ অধ্যাপকের ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল : যদি তা থাকে, তা হলে আপনিই সেটাকে ভুল ইণ্টারপ্রিট্ করছেন। য়ুনিভার্সিটি কোনো ডেমোক্র্যাটিক অধিকারে বাধা দেয় না।

প্রিন্সিপ্যালের কালো মুখ আরো কালো হয়ে উঠল।

—বেশ, আপনাদের ডেমোক্রেটিক বাইরের চর্চা আপনারা করুন। তবে অত চ্যাঁচাবেন না দয়া করে। আর তা ছাড়া ঘণ্টা পড়ে গেছে—আপনারা রেজিস্টার নিয়ে ক্লাসে যান।

যিনি বিগলিত বিনীত হাসি হেসেছিলেন, তিনি বললেন, ক্লাসে তো কেউ নেই স্যার—শুধু নিয়ে—

কড়া গলায় প্রিন্সিপ্যাল্ বললেন, তবু যেতে হবে। একটি স্টুডেণ্ট থাকলেও পড়াবেন। যদি কেউ না থাকে, তবে প্রত্যেককে অ্যাবসেণ্ট মার্ক করে চলে আসবেন।

প্রিন্সিপ্যাল জুতোর শব্দ করে বেরিয়ে গেলেন।

—কেন ওঁকে চটিয়ে দিলেন প্রফেসার সেন।

—সত্যি কথাই বলেছি।—তরুণ অধ্যাপকটি সামনে থেকে খাতা তুলে নিলেন : উনি নিজের জুরিস্‌ডিকশন মেনে চললেই আমাদের এ-সব অপ্রিয় কথা বলবার দরকার হয় না।

—হাজার হোক, বয়েসে বড়—

—যিনি বয়েসে বড়, তাঁরও এ-কথা মনে রাখা উচিত যে ছোটদেরও আত্মসম্মান আছে।

—থামুন মশাই—থাকুন।—সংস্কৃতের শান্তিবাদী অধ্যাপক 'রঘুবংশের' পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, মিথ্যে চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট করে কী লাভ ? ক্লাসে চলুন।

—তাই চলুন। যত সমস্ত ফার্স—একজন পা বাড়ালেন।

—সেই ফার্সে আপনারা ক্লাউন—আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল।

রেজিস্টার নিয়ে বেরুলেন সকলেই। সত্যজিৎ ও। বাংলার নতুন নার্ভাস অধ্যাপক পাশা-পাশি চললেন।

—আপনার কত নম্বর রুম প্রফেসার মুখার্জি?

—বারো।

—আমার দশ।—একটু চুপ করে থেকে বাংলার অধ্যাপক বললেন, আপনার বোনই দেখছি আজকের পাণ্ডা।

সত্যজিৎ মৃদু হাসল: হওয়াই তো স্বাভাবিক। ও বোধ হয় এবার ওদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

—আপনার কিন্তু ওকে বারণ করা উচিত।

—কেন?—সত্যজিৎ চোখ তুলে তাকালো: আমি ওকে বারণ করতে যাব কেন? আর করলেই বা শুনবে কেন?

—তা ঠিক, তা ঠিক।—বাংলার অধ্যাপক থেমে গেলেন।

দু জনে নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন করিডোর দিয়ে। বাইরে বীথির বক্তৃতা থেমে গেছে। সমুচ্চরবে স্লোগ্যান উঠছে এখন।

—শিক্ষকদের দাবি—

—মানতে হবে!

—ছাত্র ঐক্য—

—জিন্দাবাদ!

—ইন্‌কিলাব—

—জিন্দাবাদ।

দশ নম্বর ঘরের সামনে এসে বাংলার অধ্যাপকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—কেউ নেই! আঃ—বাঁচা গেল!

খাতা বগলে নিয়ে তিনি ষ্টাফরুমের দিকে যাত্রা করলেন। সত্যজিৎ জানত—তাকেও ফিরে যেতে হবে। ক্লাসরুম পর্যন্ত যাওয়া নিয়মরক্ষা মাত্র। তারপর ষ্টাফরুমে এসে সবশুদ্ধ অ্যাব্‌সেন্ট করে রাখা।

কিন্তু বারোনম্বর ঘরের সামনে এসেও সত্যজিৎ ফিরে যেতে পারল না। ক্লাসে একটিমাত্র মেয়ে বসে আছে মাথা নীচু করে। পূরবী।

এক মুহূর্তে সত্যজিতের মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ঠেলে উঠল গলার ভেতরে।

তার মানে, এক ঘণ্টা বসে বসে তাকে পূরবীকে পড়াতে হবে।

বাড়িতে সে পূরবীকে পড়িয়েছে কয়েকদিন। কিন্তু সে পড়ানোর আলাদা স্বাদ ছিল। সে পূরবীর আর এক রূপ, তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার মন মগ্ন হয়ে যেত। পাশের জানালা দিয়ে বয়ে আসত সুরের হাওয়া, ঘরের আলোটায় স্বপ্নের রঙ লাগত—সমস্ত কথা যেন কবিতা হয়ে উঠত।

আর আজ? এই ক্লাসে?

বাইরে থেকে আবার চিৎকার উঠল: ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

হঠাৎ সত্যজিতের সমস্তই অত্যন্ত কুৎসিত মনে হল। এই কলেজকে, ক্লাসরুমকে, আর পূরবীকেও।

ক্লাসে ঢুকে সত্যজিৎ চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর সামনে পুরো ক্লাসটাই যেন তার রয়েছে, এম্‌নিভাবেই রেজিষ্টার খুলে নাম ডাকতে আরম্ভ করল: রোল নাম্বার ওয়ান?

মাথা নিচু করে বসে রইল পূরবী। তার হাতের পেন্‌সিলটা কাঁপতে লাগল। সারা শরীরে খানিক ক্লেদাক্ত অনুভূতি আর মুখের মধ্যে একরাশ তিক্ত স্বাদ নিয়ে সত্যজিৎ রোল-কল করে চলল: থ্রী, ফোর, ফাইভ, সিক্স—

ক্রমশঃ

লোকসভার নির্বাচন—

পশ্চিমবঙ্গ হইতে দিল্লীর লোকসভা বা পার্লামেণ্টে ৩৬ জন প্রতিনিধির নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসদল হইতে ২৩ জন, ফরোয়ার্ড ব্লক হইতে ২ জন, কম্যুনিষ্টদল হইতে ৬ জন, স্বতন্ত্র ১ জন, প্রজাসমাজতন্ত্রী ২ জন, আর-এস-পি ১ জন ও লোকসেবক সঙ্ঘ ১ জন নির্বাচিত হইয়াছেন। হুগলী কেন্দ্রে খ্যাতনামা হিন্দুমহাসভা নেতা ও ব্যারিষ্টার শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসদলীয় ব্যারিষ্টার শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরীকে পরাজিত করিয়া শ্রীপ্রভাত করের (কম্যুনিষ্ট) নির্বাচন এক অভিনব ঘটনা। আর-এস-পি শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোন প্রার্থী দেয় নাই —তিনি বহরমপুর কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীবীরেন রায় বেহালা নিবাসী ও সুপরিচিত কর্মী—তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন—এবার দক্ষিণ পশ্চিম কলিকাতা হইতে নির্বাচিত হইলেন। লোকসেবক সংঘের শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (স্বর্গত ঋষি নিবারণচন্দ্রের পুত্র) পুরুলিয়া হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসদলের জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়, ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের বদান্য জমিদার শ্রীনরসিংহ মল্ল উগল সন্দদেব, শ্রীরামপুরের ব্যবসায়ী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার শ্রীঅশোক সেন প্রভৃতি নূতন সদস্য হইলেন। পুরাতন মন্ত্রী শ্রীঅরুণ গুহ, শ্রীঅনিলকুমার চন্দ, ডাঃ মনোমোহন দাস ও শ্রীপূর্ণেন্দু নস্কর পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীসুবিমান ঘোষ ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং পি-এস-পি দলের শ্রীপ্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিমলকুমার ঘোষ নূতন এম-পি হইলেন। নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গের কত জন প্রতিনিধি স্থান পাইবেন, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

নূতন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা—

নূতন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মোট সদস্য সংখ্যা ২৫৬ —তন্মধ্যে ৪ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত ও বাকী ২৫২ জন জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন—কংগ্রেস দল ১৫২ আসন, কম্যুনিষ্ট দল ৪৬ আসন, প্রজা-সমাজ-তন্ত্রী দল—২১, ফরোয়ার্ড ব্লক—১০, আর-এস-পি—৩, স্বতন্ত্র ১১, লোক সেবক সংঘ ৭ ও সোসালিষ্ট ইউনিট সেণ্টার—২টি আসন দখল করিয়াছেন। জেলা হিসাবে মোট সদস্য সংখ্যা এইরূপ—

জেলা	মোট আসন	কংগ্রেস	কম্যুনিষ্ট,	পি-এস-পি	অন্যান্য
হাওড়া	১৫	৫	৪	১	৫
মেদিনীপুর	৩২	২২	৫	৫	০
কলিকাতা	২৬	৮	১০	৪	৪
২৪ পরগণা	৪২	২০	১৪	৪	৪
নদীয়া	১১	১০	১	০	০
দার্জিলিং	৫	১	২	০	২
জলপাইগুড়ী	৯	৭	১	১	০
কুচবিহার	৭	৭	০	০	০
পশ্চিম দিনাজপুর	১০	৮	১	০	১
মালদহ	৯	৬	০	০	৩
মুর্শিদাবাদ	১৬	১৫	০	০	১
বীরভূম	১০	৫	৩	১	১
বর্দ্ধমান	২১	১০	৩	৪	৪
বাঁকুড়া	১৩	১৩	০	০	০
হুগলী	১৫	১১	৩	০	১
পুরুলিয়া	১১	৪	০	০	৭

৭ জনই লোক সেবক সংঘের সদস্য। পুরুলিয়া নূতন জেলা—তথায় লোক সেবক সংঘের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই বেশী তথাপি তথায় কংগ্রেস কেন ৪টি আসন পাইল বুঝা যায় না। নির্বাচিত ২৫২ জনের মধ্যে ১০জন মহিলা—(১) লোক সেবক সংঘের নেত্রী বর্ষীয়সী সদস্যা—নেতা শ্রীঅতুল ঘোষ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

(২) কম্যুনিষ্ট দলের পুরাতন সদস্যা শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন। কংগ্রেস দলের ১০জনের মধ্যে শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি (গতবারে উপমন্ত্রী ছিলেন)ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু (ডাক্তার) (গতবারে ৺বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পর বীজপুর হইতে নির্বাচিতা হন—এবার তিনি কলিকাতা ফোর্ট এলাকা হইতে আসিয়াছেন)। অপর ৬ জনই নূতন—শ্রীমতী অঞ্জলী খান—মেদিনীপুর নাড়াজোলের রাজবংশের বধূ (২) গড়বেতার শ্রীমতী তুষার টুডু সংরক্ষিত আসন (৩) বর্দ্ধমান ভাতারের শ্রীমতী আভালতা কুণ্ডু (৪) কালচিনির শ্রীমতী অনিমা হোড় (৫) রায়পুরের শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত ও (৬) ২৪ পরগণা কাকদ্বীপের শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি। পি-এস-পি দলের নূতন সদস্যগণের মধ্যে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, শ্রীদেবেন সেন, শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস মিত্র প্রভৃতি সর্বজন পরিচিত। কম্যুনিষ্ট দলেরও নূতন আসিয়াছেন—শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীগোপাল বসু, শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতির মত খ্যাতনামা কর্মী। শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী গতবারে তাঁহার দলের (এস-ইউ-সি) একমাত্র সদস্য ছিলেন, এবার আর একজন আসিয়াছেন। সকল দলেরই বহু খ্যাতনামা কর্মী পরাজিত হইয়াছেন। কংগ্রেসী-মন্ত্রী শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ জীবনরতন ধর, উপমন্ত্রী শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন ও শ্রীশিবকুমার রায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোপিকাবিলাস সেন, খ্যাতনামা ব্যারিষ্টর শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, তরুণ কর্মী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা শ্রীকালী মুখার্জি (ছোট), শ্রীদয়ারাম বেরী, শ্রীনির্মল সেন ও শ্রীবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীজামান, বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা মীরা দত্ত গুপ্ত, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির পরাজয় উল্লেখযোগ্য। প্রবীণ কর্মী শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবার পরাজিত হইয়াছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী (গত পূর্ব বারের) শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীভূপতি মজুমদার এবার নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন। মন্ত্রী পান্নালাল বসু ও সত্যেন্দ্রকুমার বসু কাজ করিতে করিতে মারা গিয়াছেন এবং মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা ও শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় এবং উপমন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক ও শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় এবার প্রার্থী হন নাই। মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বিধান পরিষদের সদস্য থাকা সত্বেও বিধান সভার সদস্য হইয়াছেন—পক্ষান্তরে মন্ত্রী কালীপদবাবু এবং মন্ত্রী চিত্তবাবু সেরূপ কাজ করেন নাই। এবারের নির্বাচনে দেখা গিয়াছে যে কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়াতে কংগ্রেসের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে ও বামপন্থীদের প্রভাব বাড়িয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মত প্রবীণ, বুদ্ধিমান ও কর্মী প্রধানমন্ত্রীর একজন নগণ্য ও অখ্যাত কর্মীর সহিত নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামান্য কয় শত ভোটে জয়লাভ—কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাসের উজ্জ্বল উদাহরণ। কংগ্রেস, বাঁকুড়া ও কুচবিহারে সকল আসন, মুর্শিদাবাদে ১৬এর মধ্যে ১৫, জলপাইগুড়িতে ৯এর মধ্যে ৭, পশ্চিম দিনাজপুরে ১০এর মধ্যে ৮, নদীয়ায় ১১এর মধ্যে ১০ আসন পাওয়ায় সে সকল জেলায় কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি দেখা যায়। তেমনই হাওড়ায় ১৫এর মধ্যে ৫, কলিকাতায় ২৬এর মধ্যে ৮ এবং ২৪ পরগণায় ৪২এর মধ্যে ২০ আসন পাওয়ায় বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। যাহা হউক কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে অধিক সংখ্যা পাইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিবে এবং কংগ্রেসদল আবার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কেই দলের নেতা নির্বাচিত করিয়াছেন।

নির্বাচনের পর ভারত—

ভারতরাষ্ট্রে গত সাধারণ নির্বাচনের পর ১৩টি রাজ্যের মধ্যে একমাত্র কেরল ছাড়া ১২টি রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হইতেছে। অন্ধ্র প্রদেশে ৩০১ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২১৫, আসামে ১০৮ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১, বিহারে ৩১৮ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৯, বোম্বায়ে ৩৯৬ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৩২, মধ্য প্রদেশে ২৮৮ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৩২, মাদ্রাজে ২০৫ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৫১, মহীশূরে ২০৮ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৫০, উড়িষ্যায় ১৪০ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৬, পাঞ্জাবে ১৫৪ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১১৮, রাজস্থানে ১৭৬ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১১৯, উত্তর প্রদেশে ৪৩০ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৮৬ এবং পশ্চিম বঙ্গে ২৫২ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৫২ আসন দখল করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রী সভা গঠন করিয়াছেন। উড়িষ্যায়

অন্যান্য দলের সহিত মিলিত হইয়া কংগ্রেস ১৪০ আসনের মধ্যে ৭৫ জনকে দলভুক্ত করিয়াছে। শুধু কেরল রাজ্যে ১২৫ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪৩ এবং কমুনিষ্ট দল ৬০ আসন দখল করায় কম্যুনিষ্ট দল স্বতন্ত্র কয়েকজন সদস্য লইয়া তথায় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীজহরলাল নেহরু—

দিল্লী লোক সভার মোট ৪৮৮জন সদস্যের নির্বাচন শেষ হইয়াছে। হিমাচল প্রদেশে ৪, কাশ্মীরে ৬ ও পাঞ্জাবে ২ জনের নির্বাচন বাকী আছে—সে নির্বাচন পরে হইবে ও তখন সদস্য সংখ্যা হইবে ৫০০ জন। নির্বাচিত ৪৮৮ জনের মধ্যে কংগ্রেস দলের ৩৬৫, প্রজা সমাজতন্ত্রী—১৯, কম্যুনিষ্ট —২৭, জনসঙ্ঘ—৪, স্বতন্ত্র—৪২ ও অন্যান্য দলের ১২ জন নির্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস দলই শতকরা ৭৫টি আসন দখল করায় কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার লাভ করিয়াছে। গত ২৯শে মার্চ নয়াদিল্লীতে লোকসভার নূতন কংগ্রেস দলের এক সভায় শ্রীজহরলাল নেহরু দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীনেহরু গত ১০ বৎসর যাবৎ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতেছেন—আগামী ৫ বৎসরও তাঁহাকে সে কাজ করিতে হইবে। শ্রীনেহরু অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি ভারতে আর কেহ নাই।

উড়িষ্যায় কংগ্রেস মন্ত্রী সভা—

উড়িষ্যা রাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করিলেও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাবের চেষ্টায় কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে ও তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস দলের ৫৬ জন নির্বাচিত হন—তাহার পর স্বতন্ত্র প্রার্থী ও অন্যান্য দলের সদস্য লইয়া ডাঃ মহাতাব নিজ দলে ৬৫ জন সদস্য পান। তাহার পর আরও ১১ জন বিভিন্ন দল হইতে আসিয়া তাঁহাকে সমর্থন করিতে সম্মত হন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা অনুন্নত উড়িষ্যা রাজ্যকে সর্বপ্রকারে উন্নত করার চেষ্টা হইতেছে। কংগ্রেস ঐ পরিকল্পনার স্রষ্টা ও পরিচালক—অন্য কোন দল উহাকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে সমর্থ হইবেন না। সে জন্য উড়িষ্যার বিভিন্ন দলের সদস্যগণ মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ডাঃ মহাতাবও বিচক্ষণ ব্যক্তি—তাঁহার নেতৃত্বে উড়িষ্যাবাসীরা সকলপ্রকার উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে।

হাওড়া মিউনিসিপালিটী—

গত ২৯শে মার্চ হাওড়া মিউনিসিপালিটীর নূতন কমিশনার নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। ৩০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৯টি আসন দখল করায় তথায় কংগ্রেসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বামপন্থীরা ৮টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসন পাইয়াছেন। ১৯৫১ সালে হাওড়া মিউনিসিপালিটীর শেষ নির্বাচন হয়—১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে ৩ বৎসর হাওড়া মিউনিসিপালিটী সরকারের পরিচালনাধীন ছিল।

পরলোকে রূপকথার রাজা—

রূপকথার যাদুকর, শিশুসাহিত্যসম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার গত ৩০শে মার্চ শনিবার বিকালে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দুই কন্যা বর্তমান—স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রবিরঞ্জন পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ৫০ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া তিনি শিশুসাহিত্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত ঠাকুরমার ঝুলি পড়ে নাই—এমন বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। ১৯০৭ সালে তাঁহার ঠাকুরমার ঝুলি প্রকাশের সময় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অনবদ্য ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ। ১৩৫৪ সালে তাঁহার শেষ গ্রন্থ 'চিরদিনের রূপকথা' প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'চারু ও হারু', 'ফার্ষ্ট-বয়, লাষ্ট বয়, উৎপল ও রবি, কিশোরদের সব, বাংলার সোনার ছেলে, আমার দেশ, আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী শিশু-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

কলিকাতা সিটি সিভিল ও সেসন্স্ কোর্ট—

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় উপরোক্ত নগর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই আদালত স্থাপন করাতে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ অল্প খরচে ও অল্প সময়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার পাইবেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ

কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থীদের জন্য যে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে এটর্নী ও কৌসুলী এই প্রকার আইন জীবীদের সাহায্য প্রয়োজন এবং তাহা যেমনি ব্যয়সাপেক্ষ তেমনি সময় সাপেক্ষ ছিল। এই নূতন আদালত স্থাপিত হওয়াতে এখন সকল শ্রেণীর আইনজীবী দ্বারা জনসাধারণ বিচার পাইবেন। এই আদালতে ব্যারিষ্টার, এটর্নী, এডভোকেট, উকিল ও মোক্তার সকল প্রকার আইনজীবী ওকালতি করিতে পারিবেন ও বিচার তরান্বিত হইবে। তবে বর্ত্তমানে এই কোর্টে ৫০০০৲ টাকা অবধি 'মানি-সুট', ১০০০০৲ টাকার পরিমাণ 'পার্টিসন সুট' ও বাৎসরিক ৬০০০৲ টাকার উচ্ছেদের মোকদ্দমা চলিবে এবং এতদ্ব্যতীত Succession certificate, Guardian & wards estatesএর দরখাস্ত এই কোর্টে চলিবে।

কলিকাতা সিটি সিভিল কোর্ট বার এসোসিয়েশন—

কলিকাতা নগর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপনের সংগে সংগেই কলিকাতা হাইকোর্ট, ছোট আদালত, পুলিশ কোর্ট, আলিপুর জজকোর্ট প্রভৃতি আদালতের আইনজীবীগণ গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া নিম্নলিখিত সভ্যবৃন্দকে নিয়া এক 'এড্ হক্' কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং গত ১লা মার্চ্চ তারিখে সিটী কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিকাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত উকীল সভা উদ্বোধন করিয়াছেন। উক্ত উদ্বোধন সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট আইনজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত উকীল সভার নামকরণ হইয়াছে 'কলিকাতা সিটী কোর্টস্ বার এসোসিয়েসন।"

সভাপতি	শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসু
সহ "	শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র
" "	শ্রী এ, আর, মুখার্জী
যুগ্ম-সম্পাদক	শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী
"	শ্রীচন্দ্রনারায়ণ লায়েক
সহকারী	শ্রীঅশোককুমার চক্রবর্ত্তী
"	শ্রীপ্রভাতকুমার বসু

সভ্যবৃন্দ—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সুধীরকুমার ভোস। শ্রীস্নেহাংশু সুর। শ্রীশচীন্দ্র দাশগুপ্ত। শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীজ্যোৎস্নালাল চট্টোপাধ্যায়। অশোক-বসু। যোগেশচন্দ্র বসু। কমলকৃষ্ণ পালিত। বি, কে, গুপ্ত প্রভৃতি।

পরলোকে সুরেশচন্দ্র নন্দী—

সম্প্রতি প্রবীণ সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র নন্দী বরাহনগরস্থ নিজ বাসভবনে ৬৭ বৎসর বয়সে আকস্মিক সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পারস্যের "কবি শেখসদী" ও "ওমর খৈয়ামে"এর জীবনী রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি "স্বর্ণলতা" প্রণেতা "তারকনাথ

সুরেশচন্দ্র নন্দী

গঙ্গোপাধ্যায়এর বিস্তৃত জীবনী লেখেন সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" পত্রে। বাঙ্গালীর গৌরব "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিশের" বিস্তৃত জীবন কথাও তিনি রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থটির রচনা তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এক সময়ে তিনি বিখ্যাত মাসিকপত্র "যমুনা" ও "অর্ঘ্য"এর সহ সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় "অশ্রু" কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। শেষ জীবনে তিনি "ভক্তিতত্ত্ব" "প্রীতিতত্ত্ব" "প্রেমতত্ত্ব" প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে বি-জি-খের—

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, বোম্বায়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও লণ্ডনে ভারতের প্রাক্তন হাই-কমিশনার বালগঙ্গাধর খের

৬৮ বৎসর বয়সে গত ৮ই মার্চ পুণায় পরলোক গমন করিয়াছেন। কাজ করিবার সময় হঠাৎ শ্বাসের কষ্ট হয় ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি মারা যান। তাঁহার পত্নী ১৯৫৪ সালে মারা গিয়াছেন—তাঁহার পাঁচ পুত্র বর্তমান। তিনি সলিসিটার ছিলেন ও ১৯২০ সালে রাজনীতিতে যোগদান করিয়া এতকাল রাজনীতি চর্চা করিতেছিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি ভারত সরকারের ভাষা কমিশনের ও গান্ধী স্মারকনিধির চেয়ারম্যান ছিলেন।

পরলোকে শ্যামনন্দন সহায়—

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামনন্দন সহায় গত ১৪ই মার্চ তাঁহার মজঃফরপুরস্থ গৃহে মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি লোকসভার সদস্য ছিলেন ; এবারও লোকসভার নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। তবে জয়ের সংবাদ প্রকাশের পূর্বেই তাঁহাকে পরপারে চলিয়া যাইতে হইয়াছে।

পরলোকে কুমারস্বামী রাজা—

মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও উড়িষ্যার প্রাক্তন রাজ্যপাল পি-এস কুমারস্বামী রাজা ১৫ই মার্চ মাদ্রাজে ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯৪৭ সালে তিনি মাদ্রাজে প্রকাশম্ মন্ত্রীসভার সদস্য ও ১৯৫২ সালে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯৫৪ সাল হইতে ২ বৎসর তিনি উড়িষ্যার রাজ্যপাল ছিলেন।

বোম্বায়ে নূতন নেতা—

৪২ বৎসর বয়স্ক শ্রীযশোবন্ত চবন গত ৫ই এপ্রিল বোম্বাই বিধান সভার নূতন কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। বৃহত্তর দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্য গঠনের পর গত নভেম্বর মাসেও তাঁহার নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হইয়াছিল। তিনিই প্রধান মন্ত্রীরূপে আবার নূতন মন্ত্রী সভা গঠন করিবেন।

ভারতে লৌহের কারখানা—

রৌরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে যে তিনটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সবগুলিই এখন হিন্দুস্থান ষ্টীল (প্রাইভেট) লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালনাধীন থাকিবে। ভারতে বর্তমানে ইস্পাত ও লৌহের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। তিনটি কারখানায় বৎসরে প্রায় দেড় কোটি টন লৌহ উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহার ফলে লৌহের অভাব প্রায় দূর হইবে।

নূতন রেলপথ—

হাওড়ার নিকটস্থ মৌরীগ্রাম হইতে ডানকুনী পর্য্যন্ত ১০ মাইল নূতন রেল পথের জন্য চূড়ান্ত এঞ্জিনিয়ারিং জরিপ কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করিয়াছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ-কর্তৃপক্ষ ঐ নূতন রেলের ভার গ্রহণ করিবেন। ঐ নূতন রেলপথের দ্বারা যাত্রী ও মাল চলাচলের সুবিধা হইবে।

পূর্বপাকিস্তানে সঙ্কট—

গত ৩রা এপ্রিল ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান বিধান সভায় পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আওয়ামা লীগের মিঃ মহিউদ্দীন আমেদ প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং বিরুদ্ধ দলের মিঃ আবুহোসেন সরকার উহা সমর্থন করেন। প্রায় সকল সদস্য ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও উন্নত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে পৃথক হইতে চাহেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ফল কি হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

বিহারে গণ্ডগোলের অবসান—

বিহারে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব লইয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও অর্থমন্ত্রী অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহের মধ্যে ২৫ বৎসর ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। এবার বিধান সভার নির্বাচনের পর কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠদল হইলে সে বিবাদ আরও প্রকট হয়। সে জন্য দিল্লী হইতে শ্রীসত্য নারায়ণ সিংহ ও শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী পাটনায় যাইয়া —কে নেতা হইবেন—সে বিষয়ে ভোট গ্রহণ করেন— দিল্লীতে ভোট গণনা হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ১৪৫ ও অনুগ্রহ নারায়ণ ১০৯ ভোট পান। কাজেই এখন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আবার প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

মৃণালকান্তি বসু—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও শ্রমিক নেতা মৃণালকান্তি বসু গত ২৪শে মার্চ রাত্রিতে ৭১ বৎসর বয়সে কলিকাতা সুখলাল কার্ণানি হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি যশোহরে ওকালতী করার সময়েই অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন এবং ১৯১৩ সাল হইতে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকায় কাজ করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া ছাপা হইত। ১৯২২ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় কাজ করিয়া তিনি আবার অমৃতবাজার পত্রিকায় ফিরিয়া যান। তিনি এম-এ, বি-এল ছিলেন ও যশোহর জেলার অধিবাসী, ১৯২২ সাল হইতে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং কলিকাতায় ভারতীয় সাংবাদিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা দানের তিনি অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন।

সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক, খ্যাতনামা দেশকর্মী, সংসদ সদস্য সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৩শে মার্চ ৬৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা সুখলাল কার্ণানী হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। এম-এ, বি-এল পাস করিয়া ১৯২০ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল হন ও কিছু দিন পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে জার্মানীতে যাইয়া তিনি শ্রমিক ও সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়া আসেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন ও ১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯৫২ সালে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন ও পরে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

নূতন যক্ষ্মা হাসপাতাল—

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডবেশরে ৩০০ শয্যাযুক্ত একটি হাসপাতাল খোলা হইতেছে। সে জন্য তথায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে জমীসমেত ৩৫ হাজার বর্গ-ফিট আয়তন বিশিষ্ট এক গৃহ ক্রয় করা হইয়াছে। গৃহ সংস্কার করিতে আরও ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা খরচ হইবে। শীঘ্রই তথায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রোগী রাখা হইবে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহাও পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা নহে। দেশবাসীর অর্থার্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

ভারতের প্রস্তুতি প্রয়োজন—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী সমবায় সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—আজিকার বিপদ সঙ্কুল পৃথিবীতে বিপদ আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে: যুদ্ধ বাধিলে অনিবার্য্যরূপেই বিদেশ হইতে সকল প্রকারের সরবরাহ বন্ধ হইবে। অতএব ভারতের পক্ষে খাদ্য ও অন্যান্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যাপারে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিলে যুদ্ধের সময় আমাদের অনাহারের সম্মুখীন হইতে হইবে—সুতরাং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের প্রতিবিন্দু শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে,—আজ ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীর এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য পালনে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

কম্যুনিষ্ট দলের কার্য্য—

গত ২১শে মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বক্তৃতাকালে প্রকাশ করেন—নির্বাচন বৈতরনী পার হইবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্টরা সাম্প্রদায়িকতা ও দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ডাক্তার রায় বলেন যে তিনি নিজ কর্ণে বহুবাজার (কলিকাতা) কেন্দ্রের নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া এক শ্রেণীর নাগরিকদের পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলিয়া চীৎকার করিতে শুনিয়াছেন। তিনি আরও জানান, বহুবাজার কেন্দ্রে প্রচার করা হইয়াছিল যে মহম্মদ ইসমাইল জয় লাভ করিলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইবেন এবং কলিকাতা পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হইবে। কাশ্মীর ও

পাকিস্তানে গিয়াছেই। ডাক্তার রায়কে নির্বাচনে পরাজিত করিবার জন্য এইরূপ প্রচার কার্য্যের ফলের কথা একদল দেশবাসী চিন্তা করেন নাই—ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার—

১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার ২ জন প্রবীণ লেখককে প্রদান করা হইয়াছে। (১) বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র জীবনী রচনার জন্য বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫ হাজার টাকা এবং (২) ইংরাজিতে 'ভারতীয় জনগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থরচনার জন্য খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারকে ৫ হাজার টাকা রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। দুই ব্যক্তিই সর্ব্বজন পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন। তাঁহাদের এ সম্মান বাঙ্গালী জাতির গৌরবের কথা।

মধ্যপ্রদেশ প্রধান মন্ত্রী—

মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী রবিশঙ্কর শুকলার মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু কেন্দ্রের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া গত ৩১শে জানুয়ারী মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। গত সাধারণ নির্বাচনে বিধান সভার ২৮৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৩২টি আসন লাভ করায় ডাঃ কাটজু আবার মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ কাটজুর বয়স বর্ত্তমানে ৭০ বৎসর। তাহার কর্মক্ষমতা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

রাজস্থানে নূতন প্রধান মন্ত্রী—

রাজস্থান রাজ্যে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল জয়লাভ করায় প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়া আবার দলের নেতা ও প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। আর একজন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীটিকারাম পাক্কিয়াল নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হইয়াছেন।

উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী—

উত্তর প্রদেশে গত সাধারণ নির্বাচনে বিধান সভায় কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ করায় প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী স্বামী সম্পূর্ণানন্দ আবার কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া নূতন প্রধান মন্ত্রীরূপে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী ২৪ পরগণা জেলার বেড়াচাঁপার নিকট (বসিরহাট) চন্দ্রকেতুগড়ের আবিষ্কারের জন্য খনন কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ স্থানে কয়েক হাজার বৎসরের পুরাতন একটি সহর মাটীর নীচে পাওয়া গিয়াছে, সুন্দরবনে পরিণত হইবার পূর্বে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে যে সভ্যতা ছিল, চন্দ্রকেতুগড় আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহাই প্রমাণিত হইবে।

সঙ্গীত নাটক একাডেমী—

গত ৩১শে মার্চ নয়া দিল্লীতে নবনির্মিত বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রাসাদ ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, নর্তক, অভিনেতা, নাট্যকার, চিত্র-পরিচালক প্রভৃতিকে কাশ্মীরী শাল, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি উপহার দান করিয়াছেন। বাংলাদেশের চিত্র-পরিচালক শ্রীদেবকী বসু ঐ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অসুস্থতা বশতঃ উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই।

কলিকাতা কর্পোরেশন—

গত ২৯শে মার্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। ৮০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪২টি আসন লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইয়াছেন। ইউ-সি-সি দল ২৬টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২২টি আসনলাভ করিয়াছেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় তেমনই কলিকাতা ও হাওড়ার পৌরশাসনে কংগ্রেস অধিকার লাভ করিয়াছে।

বিরাট দান—

শ্রীকার্নাম সিং হরি নামক এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ৪৫ বৎসর আমেরিকার কানাডায় বাস করিতেছেন।

তাহার বর্তমান বয়স ৭২ বৎসর। তিনি তাঁহার পাঞ্জাবস্থ পৈতৃক গ্রামের উন্নতির জন্য সম্প্রতি ২৯০ হাজার ডলার (এক ডলার প্রায় ৩ টাকা) দান করিয়াছেন। তিনি কানাডার একটি সহরে ১৬০ একর জমী বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা পাইয়াছেন—তথায় এখনও তাঁহার ১২শত একর জমী আছে। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি একজন সামান্য সৈনিকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কানাডার কালগারি সহর বিস্তৃতির সময় তিনি জমী ক্রয় বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি প্রশংসনীয়।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা নাট্যকার ও কথা-সাহিত্যিক শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল যাবৎ অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন। সম্প্রতি সরকার তাঁহার জন্য মাসিক ১০০২ টাকার সাহিত্যিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বহুদিন হইতে রোগ ভোগ করিতেছেন। তিনি পাকিস্তানের লোক, বর্তমানে উদ্বাস্তু। তাঁহার রচিত রীতিমত নাটক, পি-ডবলিউ-ডি, সিঁথির সিঁদুর, প্রাণের দাবী, সত্যের সন্ধান প্রভৃতি নাটক সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিল। তিনি বহু সঙ্গীত ও উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহাকে সরকারী বৃত্তি দানে গুণের আদর করা হইল।

ভারতের উন্নতিতে বিদেশী ঋণ—

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় উৎপাদন মন্ত্রী শ্রীকে-সি-রেড্ডি বিদেশী ঋণ সংগ্রহের চেষ্টায় সোভিয়েট রাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। সকল দেশই এ বিষয়ে ভারতকে অর্থ ঋণ দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই ভাবে দেশের শিল্পোন্নতি দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

উবের কাপ ঃ

মহিলাদের 'উবের কাপ' আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমেরিকা ৬-১ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত ক'রে প্রথম 'উবের কাপ' জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

সেমি-ফাইনাল খেলার ফলাফল :

আমেরিকান-জোন বিজয়ী আমেরিকা ৭-০ খেলায় এশিয়ান-জোন বিজয়ী ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। অপর দিকে ডেনমার্ক ৬-১ খেলায় আয়ারল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে।

অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বোট রেস ঃ

বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৩তম বাৎসরিক বোট রেসে কেম্ব্রিজ ২ লেংথে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে। টমাস নদীর উপর প্রতিযোগিতার দূরত্ব পুটনে থেকে মর্টলেক পর্য্যন্ত ৪¼ মাইল (৪ মাইল ৩৭৪ গজ) পথ প্রতিক্রম করতে কেম্ব্রিজের লেগেছিল ১৯ মিনিট ১ সেকেণ্ড সময়। এ পর্য্যন্ত কেম্ব্রিজ ৫৭ বার এবং অক্সফোর্ড ৪৫ বার জয়ী হয়েছে, একবার ১৮৭৬ সালে প্রতিযোগিতা অমীমাংসিত থেকে যায়। এ নিয়ে কেম্ব্রিজ উপর্য্যুপরি তিন বার জয়ী হ'ল। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলে এই বোট রেসের গুরুত্ব সব থেকে বেশী এই কারণে যে, অপেশাদার সংজ্ঞাকে এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে থাকেন। এতখানি নিষ্ঠা অপেশাদার ক্রীড়া মহলে দেখা যায় না। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে কোন রকম পুরস্কারে সম্মানিত করা, এমন কি সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না।

গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে অলিভ গাছের পাতার মুকুট দিয়ে পুরস্কৃত করার প্রচলন ছিল। কিন্তু অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোট রেসে কোন রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। অথচ এই বোট রেসের সময় প্রতিটি মুহূর্ত্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দল এবং দর্শক সাধারণের মধ্যে কি উত্তেজনা না উদ্রেক করে। বিশ্বের ক্রীড়ামহল প্রতিযোগিতার ফলাফল লাভের অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকে।

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল ঃ

দিল্লীর রোসানারা মাঠে অনুষ্ঠিত ১৯৫৭ সালের জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই এক ইনিংস এবং ৩৮ রানে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে ৯ বার রঞ্জি ট্রফি জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই রঞ্জি ট্রফি জয়া হয়েছে—১৯০৪, ১৯৩৫, ১৯৪১, ১৯৪৪, ১৯৪৮, ১৯৫১, ১৯৫৩, এবং ১৯৫৫ সালে।

২৯শে মার্চ্চ খেলা সুরু হয়। টসে সার্ভিসেস দল জয়া হয়ে ব্যাটিং আরম্ভ করে। এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ের মধ্যে সার্ভিসেস দলের ৬টা উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় ৬ উইকেট পড়ে সার্ভিসেস দলের ৬৭ রান

ওঠে। বোম্বাই দলের পলি উমরীগড় বাঁ হাত দিয়ে কুঙ্গরুর ক্যাচ ধরলে কুঙ্গরু ৫০ রান ক'রে আউট হ'য়ে যান; সেই সঙ্গে সার্ভিসেস দলের ১ম ইনিংসেরও সমাপ্তি ঘটে। সার্ভিসেস দলের এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে উমরীগড়ের যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি ৬৫ রানে ৪টে উইকেট পান এবং ২টে ক্যাচ ধরেন। সার্ভিসেস দলের ১ম ইনিংস শেষ হওয়ার পরই চা-পানের জন্য খেলা স্থগিত থাকে। প্রথম দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল, বোম্বাই দলের ২টো উইকেট পড়ে ৮৪ রান উঠেছে। উমরীগড় ১১ এবং কামাল ৩৮ রান ক'রে বিদায় নিয়েছেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় বোম্বাই প্রাধান্য লাভ করে—৫ উইকেট পড়ে ৩৩৯ রান দাঁড়ায়। ওপনিং ব্যাটসম্যান রেলী ১৫৪ রান ক'রে এবং তামহানে ৫৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন। মন্ত্রী ৬২ রান ক'রে আউট হ'ন। রেলী এবং বোম্বাইয়ের অধিনায়ক মন্ত্রীর ৩য় উইকেটের জুটিতে ১৪৭ রান ওঠে।

নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত খেলা হয় নি, প্রবল বারিপাতের দরুণ ৫০ মিনিট আগে খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়নে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ন।

তৃতীয় দিনে বোম্বাই ৭ উইকেটে ৩৫৯ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। রেলী ১৬২ রান ক'রে নট আউট থাকেন। তামহানে ৬৬ রান করেন।

ভিজে পীচের দরুণ ৩য় দিন দেরীতে খেলা আরম্ভ হয়। ২ ঘণ্টা খেলে বোম্বাই পূর্ব্ব দিনের রাণের সঙ্গে ২০ রান যোগ করে এদিকে আরও ২টো উইকেট পড়ে যায়। অর্থাৎ ৭ উইকেটে রান দাঁড়ায় ৩৫৯। ফলে বোম্বাই প্রথম ইনিংসের রানের ফলাফলে ১৮৮ রানে অগ্রগামী হয়। সার্ভিসেস দল ৫ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৩ রান করে। পাঞ্জরী ১৮ রানে ৫টা উইকেট পান।

৪র্থ দিনের ১০০ মিনিটের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। সার্ভিসেস দলের ২য় ইনিংস ১৫০ রানে শেষ হয়। উমরীগড় ৫৭ রানে ৪টে উইকেট পান। উভয় ইনিংস নিয়ে তিনি ৮টা উইকেট পান ১২২ রানে।

সার্ভিসেস: ১৭১ (সি গাদকারী ৫৩, কুঙ্গরু ৫০। উমরীগড় ৬৫ রাণে ৪ উইকেট) ও ১৫০ (গাদকারী ৪০, পাঞ্জরী ৫৭ রানে ৪ এবং উমরীগড় ৫৭ রানে ৪ উইকেট)

বোম্বাই: ৩৫৯ (রেলী ১৬২ নট আউট, মন্ত্রী ৬২, তামহানে ৬৬)

সেমি-ফাইনাল খেলার ফলাফল:

বোম্বাই এক ইনিংস এবং ৩২৩ রাণে মাদ্রাজকে পরাজিত করে। ১০½ ঘণ্টা খেলা বাকি থাকতে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

বোম্বাই: ৬৩৪ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আর এস মোদী ১৭২, আর. বি কেনী ২১৮)।

মাদ্রাজ: ১৫০ (উমরীগড় ৬২ রাণে ৬ এবং গার্ড ৩১ রাণে ৪ উইকেট) ও ১৬১ (পাঞ্জরী ৩৭ রাণে ৬ এবং উমরীগড় ৩৯ রাণে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া—নিউজিল্যাণ্ড

টেষ্ট ক্রিকেট:

অষ্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ৩য় অর্থাৎ শেষ বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়ী হয়ে মুখ রক্ষা করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ড্র হয়েছিল।

নিউজিল্যাণ্ড: ১৯৮ ও ১৬১ (জন রীড ৫৪)

অষ্ট্রেলিয়া: ৩৫০ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড, নর্মান ও' নীল নট আউট ১০২, ক্যাভেল ৬৫, ক্রেগ ৫৭) ও ১৩ (কোন উইকেট না পড়ে)

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ১৫২ রানে অগ্রগামী হয়। নিউজিল্যাণ্ডের ২ ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার বোলার মার্টিন ৪৬ রানে ৬টা উইকেট পান।

জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ানসীপস:

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সাইক্লিং ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রথম জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ানসীপস প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল:

১,০০০ মিটার স্প্রিণ্ট: পি পিষ্টার (মহীশূর) বোম্বাইয়ের পি সরকারীকে পরাজিত করেন।

৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারস্যুট: পি পিষ্টার (মহীশূর) বোম্বাইয়ের জে কে ইঞ্জিনিয়াকে পরাজিত করেন। সময় ৫ মিঃ ৫৩.৮ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড সময়)

৪,০০০ মিটার দলগত পারস্যুট: বোম্বাই ৫ মিঃ ৫৫.১ সেকেণ্ড সময়ে দূরত্ব অতিক্রম ক'রে মহীশূরকে পরাজিত করে।

জুনিয়ার ১,০০০ মিটার স্ক্রাচ রেস: ১ম জে দালাস (বোম্বাই), ২য় মেওয়ালাল (বাংলা), ৩য় এ তেণ্ডোরকার। সময় ২ মিঃ ১১ সেঃ।

৪,০০০ মিটার ল্যাপ রেস: ১ম জে দালাস (বোম্বাই), ২য় টি কে দাস (বাংলা), ৩য় এ তেণ্ডোরকার। সময় ৭ মিঃ ৪৭.৫ সেঃ।

জুনিয়ার ৪,০০০ মিটার ল্যাপ রেস: ১ম জে দালাস (বোম্বাই), ২য় এ তেণ্ডোরকার (বোম্বাই), ৩য় বি বোটওয়ালা (বোম্বাই)। সময় ৭ মিঃ ১.৮ সেঃ।

১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল: পি পিষ্টার (মহীশূর) ১ মিঃ ১৮.৭ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড সময়)।

এখানে উল্লেখযোগ্য, সুইডিস অলিম্পিক সাইক্লিস্ট পি পিষ্টার মহীশূরের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব ক'রে তিনটি অনুষ্ঠানে প্রথমস্থান অধিকার করেন। বোম্বাইয়ের তরুণ প্রতিনিধি জে দালাস তিনটি অনুষ্ঠানে প্রথমস্থান লাভ করেন, এই তিনটির মধ্যে দু'টি জুনিয়ার বিভাগে এবং ১টি সিনিয়ার বিভাগের ৪,০০০ মিটার ল্যাপ রেসে।

জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

দিল্লীর ন্যাশনাল ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ানসীপস প্রতিযোগিতার ফলাফল:

১,০০০ মিটার স্প্রিণ্ট: ১ম ধরমচাঁদ (দিল্লী), ২য় বি ম্যাল্‌কম (বোম্বাই)। সময় ১৪.৩ সেঃ।

১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল: ১ম মদনমোহন (দিল্লী), ২য় এন সি বসাক (বাংলা)। সময় ১ মিঃ ২৩.৪ সেঃ।

৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারইট: ১ম অমর সিং (দিল্লী), ২য় মদনমোহন (দিল্লী), ৩য় বি ঘোষ (বাংলা)। সময় ৫ মিঃ ৫১ সেঃ।

৪,০০০ মিটার টিম পারইট: ১ম বাংলা (এন সি বসাক, আর ডি শর্ম্মা, ফ্রামজি এবং ঘোষ), ২য় বিহার।

১,০০০ মিটার (মহিলাদের): ১ম মিস শ্যামা ভালা (দিল্লী), ২য় মিস এম ঘোষ (বাংলা)। সময় ১ মিঃ ৩৯.২ সেঃ।

১,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারইট (মহিলাদের): ১ম মিস শ্যামা ভালা (দিল্লী), ২য় এ ঘোষ (বাংলা)।

৭৬½ মাইল রোড রেস: ১ম হেনরী মানটাদির (দিল্লী), ২য় অমর সিং (দিল্লী), ৩য় হরবানস সিং (বিহার)। বাংলার প্রতিনিধি এন সি বসাক ৭ম স্থান লাভ করেন।

হকি লীগ ঃ

ক্যালকাটা হকি লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগের খেলায় মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এই তিনটি দল লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের পাল্লায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ৮ই এপ্রিল তারিখের লীগ তালিকায় এই তিনটি দলের অবস্থান এইরূপ ছিল—

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইষ্টবেঙ্গল	১১	১০	১	০	৩০	০	২১
মহমেডানস্পোর্টিং	১১	৯	২	০	১৮	০	২০
মোহনবাগান	১০	৯	১	০	৩১	২	১৯

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহমেডানস্পোর্টিং এবং রেঞ্জার্স এই চারটি ক্লাবকে অপরাজিত থাকতে দেখা যায়। ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান-স্পোর্টিং কোন দলের কাছ থেকে গোল খায় নি।

ঝিন্দের বন্দী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাসাহিত্য ও চিত্র নাট্যের সুপরিচিত লেখক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাংলা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত। ইনি প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক এন্থনী হোপের বহু প্রচারিত উপন্যাস "দি প্রিজনার অফ্ জেন্দা" অবলম্বনে এই "ঝিন্দের বন্দী" বইখানি লেখেন। অবলম্বনকে ঠিক অনুবাদ বলা চলে না। বিলিতী মাল মশলা ও সাগরপারের সাজ-সরঞ্জামকে তিনি বেমালুম দেশী ছাঁচে ঢেলে এর এমন একটা ভারতীয় রূপ দিয়েছেন যা এদেশের গ্রন্থকীটদের সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছে। বইখানির এই দশম মুদ্রণই প্রমাণ করছে যে এটি একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক শ্রী এ, এইচ, হকিন্স বই লিখতে শুরু করেন "এন্থনী হোপ" এই ছদ্ম নামে প্রায় সত্তর বছর আগে। তাঁর প্রথম বই "এ ম্যান অফ্ মার্ক" তাঁকে যশোমাল্য এনে দেয়নি। কিন্তু, দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দি প্রিজনার অফ্ জেন্দা' ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'এন্থনী হোপ' নামটিও বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে পড়ে। বইখানি এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে দু'বছর যেতে না যেতেই নাটকাকারে রূপায়িত হয়ে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

এদেশে 'ঝিন্দের বন্দী' প্রথম ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তখনই গল্পটি সকলেরই খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। সে যুগে এ ধরণের রাজবংশীয় রোমাঞ্চকর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল ছিল। ১৩৪৫ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ 'ঝিন্দের বন্দী' বইখানিকে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। তারপর থেকে এই আঠারো উনিশ বছর পর বইখানির জনপ্রিয়তা সমভাবে চলেছে! মধ্যে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে বইখানির নাট্যরূপও অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছিল।

মূল্যবান উৎকৃষ্ট কাগজে, বড় হরফে পরিপাটিরূপে মুদ্রিত এ বই। খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীইন্দ্রদুগারের অঙ্কিত সুন্দর সুরঙীন প্রচ্ছদপটে সুশোভিত হওয়ায় বইখানির মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ৩৪৪ পৃষ্ঠার গল্পটির প্রত্যেকটি অংশ এত বেশি রোমান্সে ভরা যে পড়তে বসলে আর ছেড়ে ওঠা যায় না। বইখানি কেনবার জন্য সাড়ে চার টাকা ব্যয় সার্থক মনে হয়।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৪৷৷০]

নরেন্দ্র দেব

নরেশ গ্রন্থাবলী : ১ম খণ্ড

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের রাজগী, কাঁটার ফুল, সতী এই কয়টি কাহিনী এ খণ্ডে সম্বলিত হয়েছে। নরেশবাবুর রচনার খ্যাতি বাঙলাদেশে প্রচুর। সত্যি তাঁর রচনার এমন একটা সম্মোহিনী ক্ষমতা আছে যে কাহিনী শেষ না করে বই ছাড়তে পারা যায় না।

রাজগীর নায়ক জমিদারের দত্তক পুত্র। তার ব্যভিচারের কাহিনীতে সে আখ্যান পূর্ণ। তবু লেখক শেষ পর্যন্ত একটা উচ্চ আদর্শে নায়ককে অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন।

কাঁটার ফুলের গ্রন্থসমাপ্তি একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে পাঠককে চমকিত করে তুলবে।

সতীর আদর্শ অতি উচ্চ। ভূপতির ব্যভিচারের পাশে দাঁড়িয়ে সে মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শুধু বিলাসের প্রতি জ্যোতির ব্যবহারটা সঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয় না। মনে হয় নরেশবাবুর আদর্শ পুরুষের মূর্তি এখানে একটা মিথ্যা উত্তেজনায় ভেঙে-চুরে গিয়েছে।

যাই হোক, পাঠকমহলে এ গ্রন্থাবলীর আদর হবে সুনিশ্চিত।

[প্রকাশক : উত্তরায়ণ (প্রাইভেট) লিমিটেড। ১৭০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

দি ডেথ অব আইভান ইলিচ : লিও টলষ্টয় :

অনুবাদক : মনোজ ভট্টাচার্য

টলষ্টয়ের সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত সমাজ সুপরিচিত। তাঁর লেখা 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস্' ও 'আনা কারেনিনা' বিশ্বসাহিত্যে উচ্চ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি টলষ্টয়ের লেখা একখানি উপন্যাসের অনুবাদ। উপন্যাসখানি আগাগোড়া চিত্তাকর্ষক। টলষ্টয়ের চরিত্রাঙ্কণে দক্ষতা ও দার্শনিকসুলভ মননশীলতা চিন্তাশীল পাঠকের মন সহজেই আকর্ষণ করে। অনুবাদকের ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর—কোথাও আড়ষ্টতা নেই। গ্রন্থের পুরোভাগে টলষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজন ক'রে অনুবাদক টলষ্টয়ের জীবনাদর্শ অনুধাবনে পাঠককে সাহায্য করেছেন। আশা করি, সুধীসমাজে এ গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর হবে।

[প্রকাশক : গ্রন্থজগৎ। ৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯ দাম ২৲ টাকা]

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

পালপার্ব্বণ ছড়াছন্দ : স্বপনবুড়ো প্রণীত

প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও কবি স্বপনবুড়ো আলোচ্যগ্রন্থের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পথ নির্দ্দেশ দিয়েছেন, এরূপ ভাবে অভিনব নির্দ্দেশ ইতিপূর্ব্বে কেউ দিয়েছেন কিনা আমাদের জানা নেই। গ্রন্থকার প্রকৃতই ছেলেমেয়েদের হিতৈষী বন্ধু, বর্ত্তমানযুগে তাদের সংগঠনের কাজে ও চরিত্র-উন্নয়নের পরিকল্পনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন কোন্ পথে অগ্রসর হোলে ছেলেমেয়েরা সংগঠন শক্তি অর্জ্জন করে বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করতে পারে। হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে, পাঠাগার গড়তে, প্রদর্শনী সংগঠন করতে, পালপার্ব্বণ বা ঋতু উৎসব করতে, সভাসমিতির আয়োজন অনুষ্ঠান করতে, মনীষীদের জন্মদিন পালন করে দশজনের প্রশংসালাভ করে ধন্য হোতে, কিরূপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সুষ্ঠুভাবে ছন্দের মধ্যে ছেলেমেয়েদের চলা দরকার, সেই সব কথা তিনি দরোয়া ভাবে আলোচনা করেছেন, তা ছাড়া চিঠি লেখা, ঘর সাজানো এবং সহবৎ শেখারও কায়দাকানুন ছেলেমেয়েদের কাছে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে সুন্দর সুন্দর ছড়াও আছে, পড়ে আর আবৃত্তি করে ছেলেমেয়েরা খুব আনন্দ পাবে। গ্রন্থের ভিতর চিত্রাঙ্কণে শিল্পী শ্রীসমর দে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মনোজ্ঞ সুশোভন গ্রন্থখানি পড়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছি, আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে পড়তে অনুরোধ করি।

[প্রকাশক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর বি, এল : ইউ, এন, ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩৬০

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "প্রিয় বান্ধবী" (১৫শ সং)—৩৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রামের সুমতি" (গল্প—৩০শ সং)—১৲,
"হরিলক্ষ্মী" (৯ম সং)—১৷৹
জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থ "মাসফল" (৮ম সং)—২৲
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নারীর স্বর্গ"—২৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পদ্ম-রাণী"—১৷৹
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মন ভোলানো বাঁশী"—১৷৹
শ্রীসুষমা সেন প্রণীত "হিন্দু নারী"—২৷৹
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত উপন্যাস "মা ও মেয়ে"—২৲
শ্রীসুশান্তকুমার সিংহ প্রণীত উপন্যাস "মণিকাঞ্চন"—১৷৹
ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মৃত-সঞ্জীবনী"—১৷৷৹
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত উপন্যাস "শুভ পরিণয়"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস "কণ্ঠমালা"—২৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "এলো নতুন দিন"—২৲

নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত 'হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েজ' ও কলম্বিয়ার কয়েকখানি রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েজ"

N82728—কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিত কণ্ঠের দু'খানি মনোরম গান—"আমার শ্যাম শুক পাখী গো" এবং "ও গুণের নাইয়ারে।"

N82732—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের "কোথা তুমি ঘনশ্যাম" এবং "ওগো শ্যাম মিনতি তোমায়"—গান দু'খানি শ্রোতাদের মুগ্ধ করবে নিশ্চয়ই।

N82733—শ্রীমতী উৎপলা সেনের অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত কণ্ঠের "সপ্তরঙের খোলা আকাশ পারে" ও "রাঙা মাটীর পাহাড়ে"—দু'খানি আধুনিক গান শ্রোতাদের মনে আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তুলবে।

N82734—"কে তুমি বসি নদীকূলে" ও "একা মোর গানের তরী"—গান দু'খানি সুচিত্রা মিত্রের কোমল ও সুমিষ্ট কণ্ঠে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে।

কলম্বিয়া

GE24829—ভারতের অতি আদরের শিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠের "মেঘ কালো আঁধার কালো" ও "ধিন কেটে ধিন"—দু'খানি গান শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে তুলবে অপার আনন্দ।

GE24830—কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্" ও "নন্দন বন হোতে হে প্রভু" দু'খানি ভক্তিমূলক গান শুনে শ্রোতাদের মনও ভক্তিরসে আপ্লুত হবে।

GE24831—দীপক মৈত্রের "এতো নয় শুধু গান" ও "কত কথা হোল বলা" দু'খানি আধুনিক গান শিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠের ও সুমিষ্ট সুরের স্বাক্ষর বহন করে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—রেণুকা শেঠ

তথাগত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
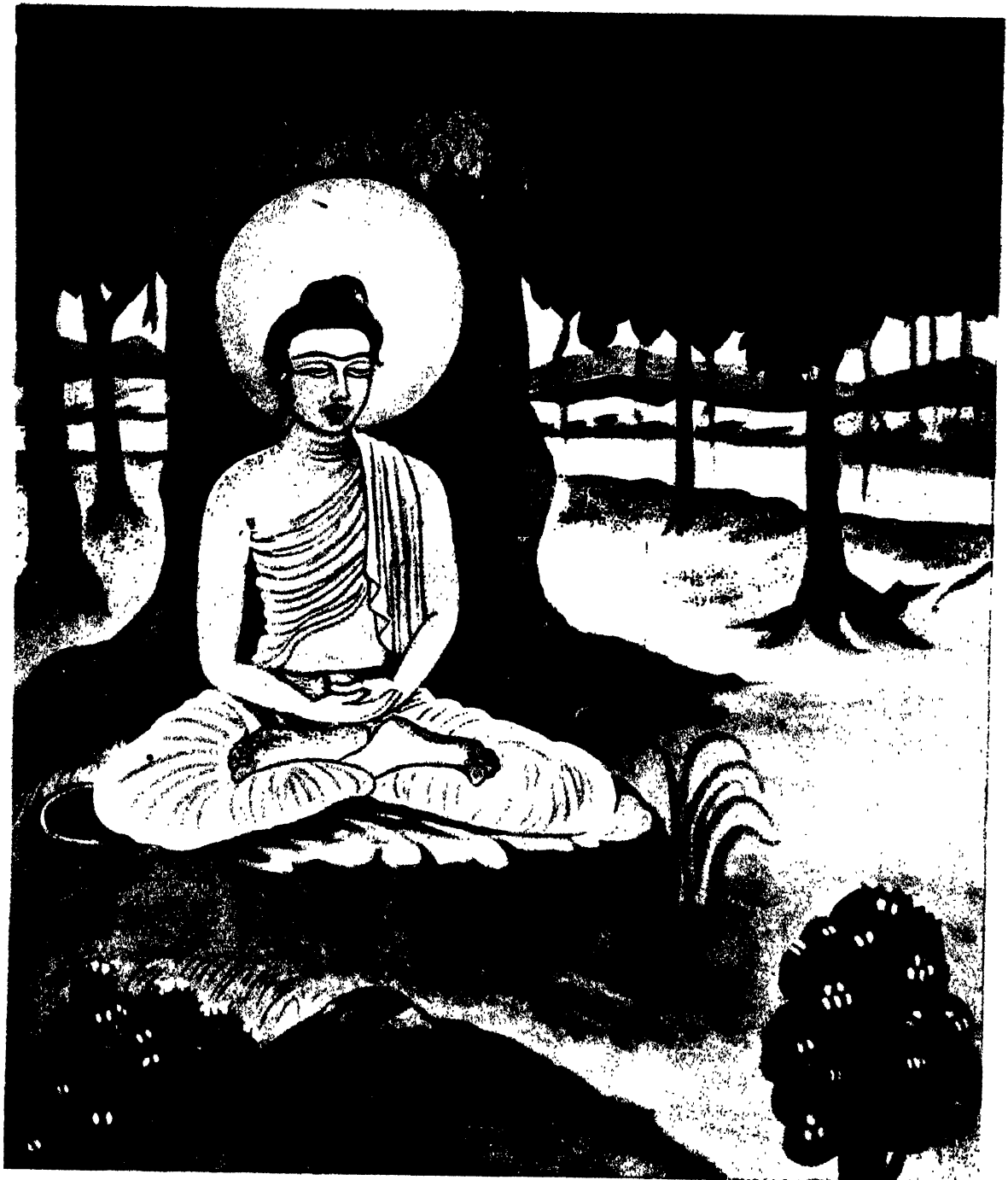
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে উপনিষদের সাহিত্যশ্রী *

শ্রীনলিনীকান্ত সেন

ভাব ও ভাষা

উপনিষদই ভারত-মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান, ভারত-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ, গভীর চিন্তা ও বাক্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবে সাধারণতঃ সাহিত্য বা কাব্য বললে যা বোঝা যায় সে শ্রেণীর রচনা এ নয়, গভীর আধ্যাত্মিক সত্যের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশলব্ধ জ্যোতিঃপ্রপাত হল আমাদের উৎকৃষ্টতম সাহিত্য। তার একটা বিশেষ অর্থ আছে, তা থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় যে আমাদের দেশের মনোবৃত্তি অনন্যসুলভ, তার প্রাণের প্রবৃত্তি অসাধারণ।

উপনিষদ সব একাধারে গভীর ধর্মশাস্ত্র, বোধিদীপ্ত তত্ত্ব-কথা এবং অপূর্ব আধ্যাত্মিক কবিতা। তাতে অতলস্পর্শী সব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে; সত্যের মর্ম উদ্ঘাটন করছে তার বোধিলব্ধ জ্যোতির্ময় শক্তিধর ব্যাপক সব দার্শনিক তথ্য; আর পদ্যেই হক, সুললিত গদ্যেই হক, তার অনুপ্রেরণা অবিতথ ও অনাদিসিদ্ধ, তার শব্দ যোজনা

* The foundations of Indian Culture থেকে অনূদিত।

অমোঘ, তার লালিত্য ও প্রকাশ চমৎকার। ধর্ম, দর্শন ও কাব্য এক হয়ে আছে যে মনীষাতে তাই ফুটে উঠেছে উপনিষদে। কারণ, সে ধর্ম শুধু অনুষ্ঠানে শেষ হয় নাই অথবা একটা নীতিবাদ বা আচারের শাসনে জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টাতেই পর্যবসিত হয় নাই; তার উর্ধ্বগতির প্রবেগ ভগবানকে, পরমাত্মাকে, আমাদের আত্মার ও অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ ও সমগ্র সদ্বস্তুকে অনন্ত বিভাবে আবিষ্কার করেছে এবং প্রদীপ্ত জ্ঞানের পরমানন্দ থেকে পূর্ণ সংসিদ্ধ ও ভাবোচ্ছল অভিজ্ঞতার হর্ষোল্লাস থেকে তার বাণী এসেছে। সে দর্শন পরমসত্য সম্বন্ধে অথবা যুক্তিসিদ্ধ কোন মীমাংসা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির বস্তুবিচ্ছিন্ন আলোচনা নয়, সে হল অন্তরতম আত্মা—দেখেছে, অনুভব করেছে, দ্বিধাহীন আবিষ্কার ও নিশ্ছিদ্র অধিকারের আনন্দে চিত্তপটে রক্ষা করেছে যে সত্য তারই রূপ। আর সে কবিতা সৃষ্টি করেছে সাধারণ মনের ক্ষেত্র থেকে বহু উর্ধ্বে আসীন রসবেদী অন্তর, তাতে ছন্দিত হয়েছে অতি দুর্লভ আধ্যাত্মিক সব অনুভূতি এবং মানবআত্মা ভগবান ও বিশ্ব সম্বন্ধে গভীরতম ভাস্বরতম সব সত্যের পরম সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব। বেদের ঋষিদের বোধিদীপ্ত মনীষা ও অন্তরতম চেতসিক অভিজ্ঞতা চরম পরিণতি লাভ করেছে উপনিষদে। ফলে কঠোপনিষদের ভাষায়, আত্মা তাঁর স্বীয় তনু বিবৃত করেছেন, এমন কি তা প্রকাশের ভাষারও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং তার ছন্দের যে স্পন্দন জাগিয়েছেন আধ্যাত্মিক শ্রবণে তার নিত্য অভ্যাসে, মনে হয় যেন, আত্মাকে গড়ে তোলে এবং তাকে পরিতৃপ্ত ও সম্পূর্ণ করে আত্মজ্ঞানের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করে।

উপনিষদের এই বিশেষত্বের উপর জোর দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ বিদেশী অনুবাদকেরা এ দিকটা উপেক্ষা করেছে। শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থই তারা পরিস্ফুট করতে চেয়েছে কিন্তু তার মূলে যা ছিল সে মনন-দর্শনের প্রাণ বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পুলক তারা আদবেই অনুভব করেনি। অথচ সে সময়ে এবং এখনও যারা সে লোকে প্রবেশ করতে পারে যেখানে এই সব উক্তির স্ফুরণ হয় তাদের শুধু বুদ্ধি নয়, আত্মা ও সমগ্র সত্তা সে সব প্রত্যাদেশের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে ও হচ্ছে। আর তার পুরাতন 'শ্রুতি' নাম সার্থক, কেননা তার বাণী কেবল-মাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা বা বাক্য নয়, আধ্যাত্মিক শ্রবণ, অন্তরের কানে শোনা সত্য, ঈশ্বর-প্রণোদিত ধর্মশাস্ত্র।

তবে উপনিষদের তত্ত্ববস্তুর উৎকর্ষ এখন আর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবার প্রয়োজন নাই, তা সর্ববাদীসম্মত, সব দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তা স্বীকার করেছেন, উপরন্তু দর্শনের সমগ্র ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভারতবর্ষে সব গভীর দার্শনিক মতবাদ ও সব ধর্ম জন্মেছে উপনিষদ থেকে, তাকেই মূল বলে স্বীকার করেছে; সে সবই সেই পরম জ্যোতির উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে—হিমালয়ের ক্রোড়ে লালিত সব মহতী নদীর মত—দেশের মনপ্রাণ সতেজ করে' শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' তার আত্মাকে সঞ্জীবিত রেখেছে, অফুরন্ত প্রাণপ্রদ বারির উৎসমূলে ফিরে এসে নূতন আলোকের রসায়ন সর্বদা দেশে বিতরণ করেছে, রিক্তহস্তে কখনও কাকেও ফেরায়নি। বৌদ্ধধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক সব মতবাদ শুধু নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে, বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞা ও বিচারের নূতন ভাষাতে উপনিষদের অভিজ্ঞতার বিশেষ একটা দিক বর্ণনা করেছে এবং নূতন আকার দিয়ে কিন্তু বিষয়-বস্তু প্রায় অপরিবর্ত্তিত রেখে তাকে সমগ্র এশিয়া খণ্ডে ও পশ্চিমে য়ুরোপের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পিথাগোরাস্ ও প্লেটোর লেখাতে বহুস্থানে উপনিষদের ভাবের আভাস পাওয়া যায় এবং খৃষ্টীয় প্রথম যুগের জ্ঞানবাদের এবং প্লেটোর মতাবলম্বীদের নূতন যোগবাদের (Neo Platonism) গভীরতম তত্ত্বাংশের সেই ত হল উপাদান। ফলে উপনিষদের সাক্ষাৎভাবেই য়ুরোপের দার্শনিক চিন্তাকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে। এদিকে সুফিরা অন্য ধর্মের ভাষায় উপনিষদের অভিজ্ঞতারই পুনরুক্তি করেছে। জার্মান দর্শনের বহুলাংশেই আবার পুরাতন প্রস্থানে যে সব সত্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিল বিচার-বুদ্ধির দ্বারা সে সবেরই বিস্তার করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সুধীরাও সে জ্ঞান দ্রুত গ্রহণ করছে এমন জীবন্ত ও তীব্র আগ্রহে, যাতে ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার জগতে একটা আসন্ন বিদ্রোহের আশা জাগিয়ে তুলছে অচলায়তন জড়বাদের বিরুদ্ধে। অবশ্য সে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে কোথায়ও বা বাঁকা পথে অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্য দিয়ে। কোথাও বা সোজাপথে উন্মুক্ত প্রণালী দিয়ে, কম বেশী মন্থর গতিতে। কিন্তু প্রধান প্রধান দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে

কোথাও এমন একটাও আছে কিনা সন্দেহ, যার মূল বা বীজ বা নির্দেশ এই প্রাচীন রচনাতে নাই; অথচ এই সব অমূল্য গবেষণা যে মনীষার আছে—এক শ্রেণীর পণ্ডিত যারা বলে যে সে মনীষার পুরাকীর্তি, সে মননের পটভূমি, বেদ, অশিষ্ট ও বর্বরোচিত অজ্ঞান প্রকৃতি পূজা ও প্রেতযাজনা! এমন কি বর্তমান জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত প্রকৃতির ব্যাপকতম সাধারণ নিয়মগুলিও—আমরা অবিরাম দেখছি—গভীরতর আধ্যাত্মিক সত্যের জ্ঞান থেকে প্রাচীন ভারতের সুধীরা স্থূল প্রকৃতির সত্যের যে সব সূত্র দিয়েছেন সে সবের মৌলিক ও ব্যাপকতম অর্থের অনুগামী।

তবে, এসব সিদ্ধান্ত বুদ্ধির দ্বারা দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের ফল নয়। তার প্রক্রিয়া হল তত্ত্বগত বিশ্লেষণের দ্বারা বহু আয়াসে সব ধারণার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে তার মধ্যে সত্য ধারণাগুলি নির্ণয় করা, তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সত্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা, অথবা অন্তরের বাঞ্ছিত বা বুদ্ধির পছন্দমত কোন ধারণা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করা এবং বিচার বুদ্ধির দ্বারা স্বীকৃত কোন একটী বিশেষ ধারণা নিয়ে, কেবলমাত্র সেই ধারণার সূত্র ধরে সমস্ত জীবনের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে এবং সব বস্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, সেই কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারা নিরূপিত ক'রে তৃপ্ত থাকা। এ পদ্ধতির কোন স্থান উপনিষদে নাই। সে ভাবের রচনা হলে উপনিষদের প্রাণ এমন মৃত্যুঞ্জয়ী হত না, তার প্রভাব এমন অমোঘ হত না, তার শিক্ষা এমন ফলপ্রসূ হত না, অথবা মানবজ্ঞানের অপরাপর বিভাগের বিভিন্ন, এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের দ্বারা তার উক্তি এমন নূতন করে সমর্থিত হত না। এসব ঋষিরা সত্যকে সাক্ষাৎ দেখেছিলেন, ভেবে বার করেন নি। বোধিলব্ধ প্রত্যয় ও অর্থদ্যোতক রূপক চিত্রে সে সত্যের একটা সুসংহত পরিচ্ছদ তাঁরা দিয়েছেন বটে, কিন্তু এমন আশ্চর্য তার স্বচ্ছতা যে তা ভেদ ক'রে অনির্বচনীয়ের স্বরূপ বিবৃত হয়েছে। কারণ সব বস্তুর সত্যই তাঁরা আমূল দেখেছেন স্বরূপ অস্তিত্বের আলোকে এবং অনন্তের চোখ দিয়ে; সেইজন্যই তাঁদের বাণী চিরকাল অমর ও জীবন্ত হয়ে আছে, নিত্যনূতন তাৎপর্যের সন্ধান তাতে মিলছে, তার প্রামাণ্য অপরিহার্য রয়েছে; সেইজন্যই তাকে যেমন সব বিষয়ে শেষ কথা বলে গ্রহণ করা যায়, তেমনি আবার সেখান থেকে হয় নূতনরূপে সত্যের নবজন্ম; সব গবেষণার সূত্রই চরমসীমা অবধি অনুসরণ করলে সেই সত্যেই উপনীত হয় এবং যে সব যুগে, যে সব সুধীদের অন্তর্দৃষ্টি বেশী খুলেছে, সে যুগের মানুষ, সে সব সুধীরা দেখি আবার সত্যের সেই নির্বচনেই ফিরে এসেছে।

উপনিষদকে 'বেদান্ত' বলা হয়, এমন কি বেদের চেয়েও জ্ঞানের তা মহত্তর আকর, কিন্তু 'জ্ঞান' শব্দের ভারত প্রচলিত গভীরতর অর্থে। জ্ঞান শুধু মনন বা বুদ্ধির বিচার নয়, ধী-শক্তির দ্বারা সত্যের একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ অন্বেষণ ও আবিষ্কার করা নয়; জ্ঞান হল সত্যকে আত্মার প্রদীপে দেখা, অন্তরপুরুষের সব শক্তি ও বৃত্তি নিয়ে সর্বতোভাবে তার মধ্যে বাস করা, জ্ঞেয়ের সঙ্গে একপ্রকার একাত্মতার দ্বারা তাকে চিদ্বস্তুতে ধারণ করা। এবং এভাবের সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায় শুধু সমগ্রভাবে আত্মাকে জানা হলে। সুতরাং বেদান্তের ঋষিরা এই 'আমি'কেই জানতে চেয়েছেন, তার মধ্যে বাস করতে, তার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করেছেন। আর এই প্রয়াসের ফলে তাঁরা সহজেই দেখতে পেলেন যে আমাদের এই 'আমি' সববস্তুর সার্বজনীন সত্তা থেকে অভিন্ন এবং সে সত্তা আবার ভগবান বা ব্রহ্মের—বিশ্বাতীত পুরুষ বা অস্তিত্বের থেকে অভিন্ন। সর্বাঙ্গীণ ঐক্যসাধক এই একাত্মদৃষ্টির আলোকে দেখলেন তাঁরা বিশ্বের এবং মানবের আন্তর ও বাহ্য জীবনের সববস্তুর অন্তরতম সত্য; সে সত্য তাঁরা প্রত্যক্ষ অনুভব করতেন তার মধ্যে তাঁরা বাস করতেন। এই আত্মজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের মহাকাব্যোচিত প্রশস্তিই হল উপনিষদ। দার্শনিক তত্ত্বের বিবৃতি তাতে প্রচুর আছে, কিন্তু সে সব বুদ্ধির গড়া বস্তুবিবিক্ত সাধারণ নিয়ম বা সামান্যপ্রতিজ্ঞা নয়, যার কিরণে শুধু মনই আলোকিত হয়, যা প্রাণবান্ নয়, আত্মাকে যা উর্ধ্বগামী প্রেরণা দেয়না। উপনিষদের তত্ত্ব হল সংবোধি ও প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানসূর্যের আলোক ও উত্তাপ, একমাত্র সদ্বস্তুর, সর্বাতীত পরমদেবের তথা সর্বময় পরমব্রহ্মের সান্নিধ্য ও দর্শন এবং এই বিরাট বিশ্ব অভিব্যক্তিতে সব পদার্থ ও জীবের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আবিষ্কার। ঈশ্বরপ্রণোদিত জ্ঞানের সঙ্গীত সেসব

ভজনের মতই, ভগবন্মুখী অভীপ্সা ও হর্ষোল্লাসই তার প্রাণ, তবে সে উল্লাস ক্ষুদ্রতর আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ থেকে জাত হৃদয়াবেগের সংকীর্ণ ও তীব্র উন্মাদনা নয়, উপচার পূজা ও বিশেষ ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি অতিক্রম করে তা পরিণত হয়েছে স্বপ্রতিষ্ঠ সর্বময় অধ্যাত্মসত্তার সান্নিধ্য ও একাত্মতা থেকে জাত ভগবানের সার্বজনীন আনন্দে। তারপর আবার, উপনিষদের প্রধান উপজীব্য হল আভ্যন্তরীণ বীক্ষণ, মানবজীবনের বাহ্যকর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে তার কোন সম্বন্ধ নাই ; অথচ সত্য প্রকাশ করতে তাকে তাঁরা যে রূপ দিয়েছেন, তাতে যে শক্তি সঞ্চার করেছেন—তার জীবন্ত উদ্দীপনা ও সফুট তাৎপর্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের ও তার পরবর্ত্তী হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সদাচার ও নীতির বিধান—এবং তা'ছাড়াও নীতি বা পুণ্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য সব লক্ষণের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, ভগবানের সঙ্গে এবং সর্বজীবের সঙ্গে একাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক কর্মের মহৎ আদর্শ দেখিয়েছেন। সুতরাং বৈদিক যাগ-যজ্ঞ প্রাণহীন হবার পরেও উপনিষদ সব বেঁচে ছিল, তাদের সৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তা থেকে ভক্তিমূলক সব মহৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম জন্ম নিয়েছে এবং ভারতে বদ্ধমূল ধর্মের সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেছে।

উপনিষদ সৃষ্ট হয়েছে প্রত্যাদেশ ও বোধিদীপ্ত মন ও তার জ্যোতিতে আলোকিত সব অভিজ্ঞতা থেকে এবং তার বিষয় বস্তু, সংগঠন শব্দযোজনা, রূপকচিত্র, ভাব-বিস্তারের ধারা—সবের উপরই তার এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে। সর্বান্বেষী এই সব পরম সত্য, একত্ব-আত্মা-বিশ্বেশ্বরের এই সব সূক্ষ্মদর্শন ব্যক্ত করা হয়েছে, হয়, এমন স্বল্পাক্ষর ও স্তম্ভের মত দৃঢ়সংহত বাক্যে যাতে অন্তশ্চক্ষুর সামনে তখনই সে সব ভেসে ওঠে এবং হৃদয়ের অভীপ্সা ও অভিজ্ঞতার কাছে বাস্তবও অবশ্যগ্রাহ্য হয়, আর না হয়, এমন কবিত্বময় চিত্রে যার সুস্পষ্ট প্রকাশে বা ভাবের বর্ণালির অভিব্যঞ্জনায় সমগ্র অসীমকে সসীমের রূপকে ফুটিয়ে তোলে। পরম অদ্বিতীয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু তার বহু বিভাবও প্রকটিত হয়েছে এবং বর্ণনার ব্যাপকত্বের গুণে উভয়েরই সমগ্র তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ আছে এবং যথাযথ শব্দ-চয়ন ও বাক্য সংযোজনের ফলে স্বতঃই যেন প্রত্যেকটী বিভাব তার নিজস্ব স্থান ও অপরের সঙ্গে তার সম্বন্ধের সন্ধান পেয়েছে। সে অনুপ্রেরণার প্রবাহে আনীত হয়ে মহত্তম সব আত্মিক সত্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চেতসিক অভিজ্ঞতা যেমন জিজ্ঞাসু মনের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে তেমনি অনুসন্ধিৎসু চিত্তের কাছে নূতন পথের অফুরন্ত ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। এখানে ওখানে এক একটা শ্লোক ছড়িয়ে আছে, এক একটা বিশ্লিষ্ট বাক্য বা ক্ষুদ্র বাক্যাংশ আছে, যার মধ্যে বড় একটা দর্শনের বইএর বিষয়বস্তু নিহিত আছে ; অথচ সে সব বলা হয়েছে আনুষঙ্গিক ভাবে, অনন্ত আত্মজ্ঞানের একটা দিক্ বা অংশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে। সব উক্তিই স্বল্পাক্ষর, অর্থেভরা অথচ সম্পূর্ণ প্রাঞ্জল, এত কম কথায় মর্মসত্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এমন অপরিসীম তার সমগ্রতা। ন্যায়ানুগ বুদ্ধির সযত্ন-গ্রথিত, ধীরগতি বাগ্‌বহুল বিবৃতির পদ্ধতি অনুসরণ করা এ শ্রেণীর চিন্তার পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যেকটি বাক্য বা বাক্যাংশ, শ্লোক বা চরণ আসে আগেরটার পরে অনেকটা না-বলা মননের অবকাশ রেখে ; সে নিস্তব্ধতায় তা প্রতিধ্বনিত হয়, সমগ্র বক্তব্যের মধ্যে সে-ভাব উহ্য আছে এবং সে অবকাশের দ্বারাও তা সূচিত হচ্ছে, কিন্তু পাঠককে তা নিজে ভেবে গড়ে তুলতে হবে। আর সে চিন্তার ধারাতে এইসব ভাবগর্ভ নিস্তব্ধতার অবকাশ বেশ প্রশস্ত, যেন কোন অতিকায় যক্ষ সীমাহীন মহাসাগরের উপর দিয়ে চলেছে একটা পাথর থেকে বহুদূরে আর একটা পাথরে লম্বা লম্বা পা ফেলে। প্রত্যেক উপনিষদের সংগঠনেই আছে অটুট সম্পূর্ণতা, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমবায়ী সম্বন্ধের সামঞ্জস্য ; কিন্তু তা বিহিত হয়েছে যে মণীষার দ্বারা তা রাশিকৃত সত্য এক পলকে দেখে এবং ভাবে ভরা নিস্তব্ধতার (মধ্য) থেকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় শব্দটী তুলে নেয়। যেমন শ্লোকে তেমনি সুললিত গদ্যে সে ভাষার গতিচ্ছন্দ সর্বত্রই চিন্তার ও বাক্যের রূপরেখার অনুযায়ী। প্রত্যেক শ্লোক পরিষ্কার চারটী পৃথক্ চরণে ভাগ করা, প্রায় প্রত্যেক শ্লোকার্ধই স্বতঃ সম্পূর্ণ, একটা ভাব তাতে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে—দু চরণের দুটা ভাব বা একই ভাবের দু অংশ সংযোগ করে গোটা শ্লোকার্ধের সে অর্থ আসছে। আর ধ্বনির

গতিও তার অনুরূপ লয়ে চলেছে—প্রত্যেক চরণ সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট মতি দিয়ে ভাগ করা, স্বরপ্রবাহের প্রতিধ্বনি বহুক্ষণ অন্তরের শ্রুতিতে ঝঙ্কৃত হয়, প্রত্যেকটিই যেন অসীমের এক একটা তরঙ্গ যা সে মহাসাগরের সমগ্র বাণী ও কল্লোল বয়ে আনে। এ কবিতাতে মেলে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখা শব্দ, পরমচিত্তের গতিচ্ছন্দ; এ জাতীয় কবিতা এর আগে বা পরে কখনও রচিত হয় নাই।

রূপক ও বিষয় বস্তু

উপনিষদের রূপক প্রয়োগের প্রথা বহুলাংশে বৈদিক প্রথারই পরিণততর রূপ। সাধারণতঃ যে সব চিত্রে বক্তব্য বিষয়ের মুক্তরূপ সাক্ষাৎভাবে উদ্ভাসিত করে সেই সব উপমার ব্যবহারই ঋষিদের বেশী মনঃপূত। তবে অনেক সময় বেদের সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে সেই পুরাতন সাঙ্কেতিক অর্থে এবং বেদের কথঞ্চিৎ কম আনুষ্ঠানিক অংশের প্রয়োগপ্রথার অনুরূপ রীতিতে। উপনিষদের এই অঙ্গ আমাদের চিন্তাপ্রণালীতে সহজবোধ্য নয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তার অর্থবোধ করতে না পেরে র্থতার আক্রোশে রায় দিয়েছে যে এইসব গ্রন্থে উন্নততম দার্শনিক বিচারের সঙ্গে মিশে আছে মানবজাতির শৈশবের অপরিণত মনের অর্থহীন অর্দ্ধস্ফুট বালভাষিত। বৈদিক যুগের মনোবৃত্তি, প্রকৃতি বা মূল ধারণাও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উপনিষদ্ নূতন চিন্তার ধারা ধরে চলে নি; একই পথে চলে ক্রমশঃ সে সবের পরিণতি সাধন করেছে এবং কতকাংশে যে গুপ্ত বিদ্যা বেদের সাঙ্কেতিক ভাষায় আচ্ছাদিত ছিল তাকে উন্মুক্ত আলোকে প্রকাশ করেছে, তাকে রূপান্তরিত করে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারের উপযোগী করেছে। বিষয়ের অবতারণা করেছে বেদ ও ব্রাহ্মণের রূপক চিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্কেত নিয়ে, তবে তার মুখ ঘুরিয়ে আভ্যন্তরীণ লোকাতিগ তাৎপর্য্য প্রকটিত করেছে এবং সেই সব চেতসিক অভিজ্ঞতা থেকে নিজের পরিণততর ও বিশুদ্ধতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিচার আরম্ভ করেছে। অনেক অংশ আছে, বিশেষ করে গদ্য উপনিষদগুলিতে যা অবিকল এই রীতি অনুসরণ করেছে; তাতে জটিল, অস্ফুটার্থ, এমন কি বর্ত্তমান মনোবৃত্তির কাছে অবোধ্য, ভাষায় বৈদিক ধর্মানুসারী মনের সব প্রচলিত ধারণার—যেমন তিন বেদের মধ্যে প্রভেদ, তিন লোকের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সব বিশ্বাসের—আত্মিক তাৎপর্য বলা হয়েছে। কিন্তু উপনিষদের চিন্তা তা থেকে উপনীত হয়েছে গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যে; সুতরাং সে সব অংশকে অর্থহীন বলে অথবা শেষ পর্য্যন্ত যে গভীর চিন্তা এসেছে তার সঙ্গে সম্বন্ধহীন বলোচিত বুদ্ধিবিকৃতি ব'লে বর্জন করা চলে না। পক্ষান্তরে সে সব সঙ্কেতের মর্মে প্রবেশ করতে পারলে দেখা যায় তার তাৎপর্য কত গভীর। তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেহমনের সম্বন্ধ জ্ঞান থেকে উপরে উঠে মন ও আত্মার সম্বন্ধ অনুভব করা হয়। সে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমার গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করি বেশী, বস্তুবাচক বা রূপকবাচক সংজ্ঞা ব্যবহার করি কম; অথচ যোগ-সাধনার দ্বারা যারা দেহাশ্রিত চিত্তের এবং চিত্তাশ্রিত আত্মার সব গূঢ় সত্য পুনরাবিষ্কার করে, তারা জানে যে সে সব বাস্তবরূপক সম্পূর্ণ প্রামাণ্য। এই ধরণের বিশেষ রীতিতে আত্মিক সত্য বর্ণনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল অজাতশত্রুর সুষুপ্তি ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা (বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকী উপনিষদে), প্রশ্ন উপনিষদে প্রাণের তত্ত্ব এবং তার বৃত্তির বর্ণনা অথবা যে সব স্থানে বেদোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধের আধ্যাত্মিক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে অথবা ঋক্ ও সামবেদের মত আবরণ না দিয়ে পরিস্ফুট আকারে বৈদিক দেবতাদের চরিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া ও আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য তাঁদের আহ্বান করা হয়েছে।

বেদের ভাব ও রূপক ফুটিয়ে তোলা হয় কি ক'রে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকে। তার প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ অনুবাকে ইন্দ্রকে স্পষ্টতই দিব্য মনের শক্তি ও দেবতা বলা হয়েছে :

"বেদের যিনি বিশ্বরূপী ঋষভ, পবিত্র ছন্দসমূহের কল্যাণে যিনি অমৃতময় সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছেন সেই ইন্দ্র মেধা দিয়ে আমাকে ধন্য করুন; হে দেব, আমি যেন অমৃতের আধার হতে পারি। অঙ্গের শরীর যেন বিচক্ষণ (সূক্ষ্ম দর্শনে পূর্ণ) হয়, জিহ্বা যেন পরম মধুময় হয়, কর্ণে যেন ব্যাপক ও বহুবিধ শব্দ গ্রহণ করতে পারি। কারণ, তুমি ব্রহ্মের কোষ, মেধার আচ্ছাদনে গঠিত।"

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঈশোপনিষদ থেকে। সূর্যকে সেখানে জ্ঞানের দেবতা বলে আহ্বান

করা হয়েছে। তাঁর সবচেয়ে জ্যোতির্ময় রূপ হল পরা চেতনার সঙ্গে একত্ব। মনের ভূমিতে তার রশ্মি বিক্ষিপ্ত হয়ে তৈরি হয় আমাদের চিন্তা ধারণার উজ্জ্বল প্রভামণ্ডল; আর তাতে ঢাকা পড়ে যায় সূর্যের অনন্ত অতিমানস সত্য, তার নিজের দেহ ও স্বরূপ, পরমাত্মার ও ব্রহ্মের সত্য। বলা হয়েছে :—

"সোনার পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ আবৃত; হে পুষ্টিদাতা সূর্য, সে আবরণ উন্মোচন কর সত্যধর্মের জন্য, দেখবার জন্য। হে পূষণ, হে একমাত্র ঋষি, হে সংযমন-কর্তা যম, হে সূর্য, হে পরম পিতার পুত্র, তোমার রশ্মি সব সুবিন্যস্ত কর, সংহত কর; যে তেজ তোমার কল্যাণতম রূপ সে রূপ দেখি; ওই, ওই যে পুরুষ সে আমিই।"

এ সব বাক্যে বেদের সাঙ্কেতিক প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে পার্থক্য সত্ত্বেও সগোত্রতা সুস্পষ্ট। শেষ শ্লোকে ত হল পরবর্তী যুগের বিষদতর ভাষায় ঋক্‌বেদের একটি মন্ত্রের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা। অত্রিকুলের শ্রুতবিদ্ ঋষির সে মন্ত্রটি হল—

"তোমাদের সত্যে আচ্ছাদিত রয়েছে পরম ধ্রুব সত্য, যেখানে অশ্ব সব রথ থেকে খুলে দেওয়া হয়, সেখানে দশ সহস্র একত্র অবস্থান করে, দেহধারী দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দৈবকে আমি দেখেছি।"

বেদবেদান্তের রূপক চিত্র বর্ত্তমান মনোবৃত্তির অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকারের মনোবৃত্তির সৃষ্টি, সে সবকে সত্যের জীবন্ত সঙ্কেত বলে আমাদের মন মানে না। কারণ, বুদ্ধির শাসনে এখন আর সত্যের অভিব্যঞ্জক কল্পনার এমন সাহস নাই যে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদর্শনের সঙ্গে এক হয়ে তার অকুণ্ঠিত রূপ দেবে। কিন্তু কোন মতেই তা আদিম মানবের বালোচিত বা বর্বরোচিত গূঢ়বাদ নয়। বরং এই প্রাণবান, ওজস্বী ও বোধিদীপ্ত কবিতার ভাষা বেশ উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক প্রকাশ।

উপনিষদের বোধিদীপ্ত চিন্তার অবতারণা করা হয়েছে এই সব স্থূল, বাস্তব চিত্র দিয়ে। প্রথমে বেদের ঋষিরা সে সব ব্যবহার করেছেন সঙ্কেতরূপে, যাতে সে সব প্রত্যক্ষলব্ধ ঋষিবাক্যের অর্থ সত্যদ্রষ্টাদের কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় অথচ সাধারণ বুদ্ধির কাছে তাদের গভীরতম তত্ত্ব আবৃত থাকে। কিন্তু উপনিষদে তার সঙ্গে কথঞ্চিৎ কম গূঢ়ার্থক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরিশেষে সে সব ছাড়িয়ে চমৎকার পরিস্ফুট ও উর্দ্ধলোকের উপযোগী উপমা ও শব্দযোজনার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যের সমগ্র মহিমা সন্থ প্রকটিত করা হয়েছে। গদ্য উপনিষদগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই—কি পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতের মণীষা প্রথম সঙ্কেত ব্যবহার করে তার পর তা থেকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের পরিস্ফুট প্রকাশে উপনীত হয়েছে। গূঢ়ার্থক ওঙ্কার মন্ত্রের শক্তি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদের একটা অনুচ্ছেদে এ পদ্ধতির প্রথম দিককার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় :—

"বৎস সত্যকাম, এই অক্ষর মন্ত্র ওঙ্কার হল পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম, সুতরাং বিদ্বান্ ব্রহ্মের এই আয়তন অবলম্বন ক'রে এ দুয়ের একটিকে পায়। একটি মাত্র মাত্রা বা অক্ষরেয় যে ধ্যান ক'রে, তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সত্বর পৃথিবীতে সিদ্ধিলাভ করে। ঋক্ মন্ত্র সব তাকে মনুষ্য-লোকে নিয়ে যায়, সেখানে তপ: ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে সে আত্মার মহিমা অনুভব করে। দুই মাত্রা বা অক্ষরের দ্বারা মনে যে সিদ্ধিলাভ করে যজুর্মন্ত্র সব তাকে অন্তরীক্ষে সোম লোকে নিয়ে যায় এবং সেখানে আত্মার বিভূতি অনুভব ক'রে আবার সে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আর যে তিন মাত্রাই নিয়ে এই ওঙ্কারের দ্বারা পরম পুরুষের ধ্যান করে সে সূর্যরূপ তেজোময় লোকে সিদ্ধিলাভ করে। সাপ যেমন জীর্ণত্বক্ ত্যাগ করে, তেমনি সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং সামমন্ত্র সব তাকে নিয়ে যায় ব্রহ্মলোকে। এই জীবনঘন লোক থেকে সে এই পুরীতে শয়ান পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করে। এ অক্ষর তিনটি মৃত্যুদুষ্ট, কিন্তু এখন তারা অবিভক্ত ও অন্যোন্য সংযুক্ত-ভাবে প্রযুক্ত হয়, তাতে আত্মার আন্তর, বাহ্য ও মধ্যম ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হয়ে অখণ্ড সমগ্রতা প্রাপ্ত হয়, আর সে জ্ঞান হয় বলে আত্মা আর ত্রস্ত হয় না। ঋক্ মন্ত্রে লাভ হয় ইহলোক, যজুর দ্বারা অন্তরীক্ষ লোক, সামের দ্বারা লাভ হয় সেই তৎস্বরূপ যাঁকে ঋষিরা আমাদের জানিয়েছেন। তাঁরই আয়তনস্বরূপ ওঙ্কারের দ্বারা বিদ্বান সেই পরমপুরুষকে লাভ করেন যিনি শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয়।"

এই সব সঙ্কেত আমাদের বুদ্ধির কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু যে সব সূত্র দেওয়া হয়েছে তাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়, যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিভিন্ন অবস্থাতে নিয়ে যায় যে সব আত্মিক অভিজ্ঞতা, এসব হল তারই প্রতিরূপ। দেখতে পাই যে এ তিনটি হল বাহ্য, মানস ও অতিমানস উপলব্ধি এবং তার শেষ উপলব্ধির ফলে আসে পরম সিদ্ধি, অমর আত্মার শান্ত নিত্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র সত্তার সর্বতোমুখী পরিপূর্ণ ক্রিয়া। তার পরে, মাণ্ডুক্য উপনিষদে পাই সব সঙ্কেত ত্যাগ করে এ রূপকের আবরণমুক্ত সহজ তাৎপর্য। আর তা থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা যে তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন বর্তমান কালের মণীষা তার সম্পূর্ণ পৃথক্ নিজস্ব পথে বুদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আবার তাতে ফিরে এসেছে; সে হ'ল যে আমাদের শারীর চেতনার পশ্চাতে আর একটা মগ্ন চেতনা কাজ করছে, পৃথক্ হলেও প্রকৃতিতে তা অভিন্ন এবং আমাদের জাগ্রত মন তারই উপরিচর ক্রিয়া; আর তা ছাড়াও উর্ধ্বে—আমরা এখনও বলি, হয়ত—আছে আধ্যাত্মিক অতি-চেতনা। আর বেশ সম্ভাবনা রয়েছে যে তার মধ্যেই আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠ অবস্থা এবং সমগ্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রশ্ন উপনিষদের উদ্ধৃত অংশ তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তখনও এ তথ্য জানা ছিল। সুতরাং আমার মতে এ সিদ্ধান্ত মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, প্রাচীন ঋষিদের এই সব ও তার অনুরূপ সব উক্তির বাহ্য পরিচ্ছদ আমাদের বুদ্ধিকে যতই বিভ্রান্ত করুক না কেন, বালোচিত গূঢ়বাদ বলে তাকে বর্জন করা যায় না, বরং সে সব হল তখনকার দিনের মনোবৃত্তির কাছে স্বাভাবিক রূপকবহুল ভাষায় যে সব সত্যের প্রকাশ, সে সব এখন আমাদের বিচারবুদ্ধি তার নিজের পদ্ধতিতে সত্য বলে, অতি গভীর সত্য বলে এবং প্রকৃত জ্ঞানের মূল তত্ত্ববস্তু বলে প্রমাণ করছে।

ছন্দোবদ্ধ উপনিষদগুলিতেও এই রকম ভাবগর্ভ সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতি চলে এসেছে, তবে তার পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত লঘুভার এবং অনেক স্থলেই রূপক ছেড়ে সুস্পষ্ট প্রকাশের ভাষাই নেওয়া হয়েছে। পরমাত্মা, চিৎ, ভগবান, মানুষে, প্রাণীতে ও প্রকৃতিতে অন্তর্যামী ঈশ্বর, এই জগতে, অন্যান্য জগতে অনুস্যূত পরম দেব ও বিশ্বাতীত এক অদ্বিতীয় অমৃত অনন্ত পরম সত্তা—সবের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে মর্মস্পর্শী শ্লোকে, কোন আবরণ না রেখে, তাঁর নিত্য বিশ্বাতীত মহিমায় তথা বহুমুখী আত্মপ্রকাশের মাহাত্ম্যে। কঠোপনিষদ থেকে নচিকেতার প্রতি ধর্ম ও মৃত্যুর অধিপতি যমের উপদেশের কিছু অংশ নিলেই এ বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে:—

"এই অক্ষর ওঁ, এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরম বস্তু; এ অক্ষরকে যে জানে সে যা চায় তাই হয়। এই অবলম্বন সর্বশ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বন সবের উপরে, এই অবলম্বনকে জানলে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়া যায়। এই সর্বজ্ঞ জন্মান না, মৃত হন না, কোথাও থেকে তিনি আসেন নি বা কেহ হন নি। অজাত—নিত্য—শাশ্বত—পুরাতন ইনি, শরীর হনন করাতে তিনি হত হন না।...আসীন থেকেই তিনি বহু দূরে গমন করেন, শয়ান থেকেই তিনি সবদিকে ভ্রমণ করেন। আমি ছাড়া আর কে জানবে এই পরমানন্দে উল্লসিত দেবকে? অস্থায়ী শরীরের মধ্যে স্থির প্রতিষ্ঠ সেই মহান্ প্রভু আত্মাকে যে জানতে পারে সে ধীর ব্যক্তির আর শোক থাকে না। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপন বা মেধার দ্বারা এ আত্মাকে পাওয়া যায় না; যাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁকে পায়, তার কাছে তিনি নিজের তনু বিবৃত করেন। অসংযমী, দুশ্চরিত্র, অশান্ত ও অসমাহিত বা অস্থিরমনা ব্যক্তি মেধার অর্জিত বিদ্যার দ্বারা কখনও তাঁকে পায় না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁর অন্ন, মৃত্যু যাঁর উপচার, তিনি কোথায় কে জানে?......

"স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয় সব বহির্মুখী করে সৃষ্টি করেছেন, তাই লোকে বাহিরের দিকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না; কচিৎ অমরত্বের অভিলাষী কোন সুধী অন্তরের দিকে চোখ ফিরিয়ে আত্মাকে সাক্ষাৎ করে। বালবুদ্ধি লোকেরা বাহ্যকামনা অনুসরণ করে, সর্বতো বিস্তৃত মৃত্যুর জালে পড়ে তারা; কিন্তু ধীর ব্যক্তিরা অমৃতত্বকে জেনে অনিত্য বস্তুর কাছে নিত্য বস্তুকে প্রার্থনা করে না। এই আত্মার দ্বারাই লোকে রূপ—রস—গন্ধ—শব্দ—স্পর্শ এবং মৈথুন সব জানে; আর কি অবশিষ্ট রইল এখানে? জাগরণের মধ্যে ও স্বপ্নের মধ্যে কি আছে? উভয়ই যাঁর দ্বারা জানা

যায় সেই মহান প্রভু আত্মাকে মননের দ্বারা জানে সুধীরা, আর তাদের শোক থাকে না; জীবের অতি নিকটে অবস্থিত এই মধুপায়ী আত্মাকে ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা এই ঈশ্বরকে জানে, তারপর তার আর কোন জুগুপ্সা থাকে না। সে দেখে তাঁকে যিনি পুরাকালে তপঃশক্তি থেকে জন্মেছিলেন, পুরাকালে জলরাশি থেকে জন্মেছিলেন, যিনি হৃদয়গুহাতে প্রবেশ করে অবস্থান করেন এবং সব প্রাণীর চক্ষু দিয়ে সব দর্শন করেন। তিনি জানেন অসীমা জননী অদিতিকে যিনি সব দেবতাদের ধারণ করে আছেন, যিনি প্রাণশক্তি থেকে সম্ভূত হন, হৃদয় গুহাতে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করে, যিনি সব প্রাণীদের সঙ্গে সর্বত্র জাত হন। এই হল অরণীদ্বয়ের অন্তর্নিহিত সর্বজ্ঞ অগ্নি, গর্ভিণীর গর্ভের মত সযত্নে রক্ষিত; সদা জাগ্রত থেকে আহুতির দ্বারা প্রতিদিন এই অগ্নির অর্চনা করা মানুষের কর্তব্য। এ হল সে, সূর্য যাঁর মধ্য থেকে ওঠে ও অস্ত যায়। তাঁতে সব দেবতারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে না। এখানে যা ওখানেও তাই, ওখানে যা তার অনুরূপ এখানকার সব; এখানে যে কেবলমাত্র প্রভেদই দেখে সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যায়।......অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ হলেন অন্তরের আত্মা তিনিই ভূত-ভবিষ্যতের ঈশ্বর, তাঁকে জানলে তার পর আর কোন জুগুপ্সা থাকে না। এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধূমহীন জ্যোতির মত, তিনি ভূত-ভবিষ্যতের ঈশ্বর, অন্ধকার মধ্যে তিনি আছেন, আগামী কালও তিনি থাকবেন।"

উপনিষদে প্রচুর আছে এই সব ভাবের বাক্য যা একাধারে কবিত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা, যাতে বিশদতা ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা এসেছে। কিন্তু অনুবাদ থেকে তার ওজস্বিতা ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার কোন ধারণা করা যায় না, কারণ অনুবাদে মূল শব্দের ধ্বন্যার্থের ইঙ্গিত বা অর্থের উদাত্ত, সূক্ষ্ম ও আলোকপ্রদ প্রতিধ্বনির কোন আভাস থাকে না। আবার, আরও সব অংশ আছে যেখানে সূক্ষ্মতম চেতসিক ও দার্শনিক তত্ত্ব সব সম্পূর্ণ পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু কোথায়ও তাতে কবিত্বের পূর্ণসৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং সর্বত্রই সে উক্তি শুধু বুদ্ধির কাছেই উপস্থাপিত হয় নাই, আত্মা ও সমগ্র অন্তঃকরণের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কয়েকখানা গদ্য উপনিষদে আর একটা জিনিস পাওয়া যায়। জীবন্ত কাহিনী ও আখ্যানের মধ্য দিয়ে তখনকার সমাজের একটা দিকের চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, দেখি অধ্যাত্ম-অনুসন্ধানে অসাধারণ উদ্দীপনা, পরম জ্ঞানের প্রতি তীব্র অনুরাগ, যাতে উপনিষদ সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। দু এক কথাতে সে পুরাতন জগতের সব দৃশ্য আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে—তপোবনে আসীন ঋষিরা নবাগতদের পরীক্ষা করে শিক্ষা দিচ্ছেন; রাজন্য, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সম্পন্ন গৃহস্থেরা জ্ঞানের অন্বেষণে চারিদিকে ঘুরছে; রথারূঢ় রাজপুত্র ও অজ্ঞাতপিতৃক দাসীপুত্র সন্ধান করছে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত চিন্তা ও ভাগবত প্রত্যাদিষ্ট বাণীকে নিজের অন্তরে ধারণ করছে। তাই তখনকার দিনের দৃষ্টান্তস্থানীয় সব বিশিষ্ট ব্যক্তি ও চরিত্রের পরিচয়—রাজা জনক তীক্ষ্ণধী অজাতশত্রু শকটবাহী রৈক, স্থিতধী ও ব্যঙ্গপ্রিয় যাজ্ঞবল্ক্য—সত্যের জন্য যিনি সর্বদা সংগ্রামে প্রস্তুত—যিনি অনাসক্ত ভাবে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ দু হাতে তুলে নিচ্ছেন, আর অবশেষে সব ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে গৃহহীন প্রব্রাজকের জীবন নিলেন—দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যিনি ঋষি ঘোরের মুখের একটি মাত্র শব্দ শুনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন। দেখি সব আশ্রম, আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিপুণ রাজাদের রাজসভা, বড় বড় সব যজ্ঞক্ষেত্র—যেখানে সব ঋষিরা মিলিত হয়ে তাঁদের জ্ঞানের তুলনা করছেন। আর দেখি কি ভাবে ভারতের আত্মা জন্ম নিল, কিরূপে সে জন্মদিনের মহাগীতি উঠল যাতে জাতির আত্মা পৃথিবী ছেড়ে ঊর্ধ্বতম অধ্যাত্মস্বর্গে উন্নীত হতে সক্ষম হল।

বেদ ও উপনিষদ কেবলমাত্র ধর্মের ও দর্শনের নয়, ভারতের সব কাব্য, সাহিত্য-ভাস্কর্য চিত্রকলার সব ধারার পর্যাপ্ত উৎস। তাতে যে আত্মা চরিত্র ও মণীষা গঠিত ও প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেই সব মহৎ দর্শন শাস্ত্র উৎকীর্ণ হয়েছে, ধর্মের তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে, রামায়ণ মহাভারতে তারই যৌবনের বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে, পরিণত বয়সে, কাব্যের শ্রেষ্ঠ যুগে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে সব বুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্রে বেঁধেছে, জড়ে-বিজ্ঞানে বহু মৌলিক আবিষ্কার করেছে, রসবোধি জৈব ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার এমন উজ্জ্বল সম্পদ সৃষ্টি করেছে, তন্ত্রে ও পুরাণে আধ্যাত্মিক ও চেতসিক অভিজ্ঞতা পুনরুজ্জীবিত করেছে, বর্ণ ও রেখার মহিমা ও সৌন্দর্যের প্লাবনে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, পাথরে ও ধাতুতে তার চিন্তা ও সূক্ষ্মদর্শন রূপায়িত করেছে, পরবর্তীকালে সব প্রাদেশিক ভাষাতে নূতন প্রবাহে নিজের আত্মাকে প্রকাশ করেছে, এখন আবার গ্রহণমুক্ত হয়ে, পার্থক্য সত্ত্বেও সেই একই রূপ নিয়ে নূতন প্রাণের নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয়ে জেগে উঠেছে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

গোলক পণ্ডিতের শুইতে আসিবার দৃশ্যটা আমার এখনও মনে আছে। তিনি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া বহুবার গলা-খাঁকারি দিতেন। রাস্তার মোড় হইতেই তাঁহার গলা-খাঁকারি শোনা যাইত। শুধু গলা-খাঁকারি নয়, মাঝে মাঝে—"এই—এইও" বলিয়া হুঙ্কারও ছাড়িতেন। সম্ভবত তাঁহার মনে হইত কাছে-পিঠে চোর বা ডাকাত নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে, তাঁহার সাড়া পাইলেই তাহারা ভয়ে পলায়ন করিবে। সুতরাং সাড়া দিতে তিনি কার্পণ্য করিতেন না। আর একটা কাজও তিনি সঙ্গে সঙ্গে করিতেন। তাঁহার লিক্‌লিকে সরু একটি বেত ছিল। পাঠশালা করিবার সময় প্রয়োজনীয় আসবাব হিসাবে সম্ভবত তিনি সেটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠশালার কোনও ছাত্রের অঙ্গে তাহা তিনি কোনদিন ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সেই বেতটিকে এই ব্যাপারে তিনি কাজে লাগাইয়াছিলেন। পথ চলিতে চলিতে বেতটিকে দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে উঁচাইয়া ধরিয়া "এই—এইও" শব্দ করিতে করিতে তিনি বেতটিকে ঘন-ঘন নাড়িতেন এবং নাড়িতে নাড়িতেই পথ চলিতেন। মনে হইত যেন সেটি কোন অদৃশ্য শত্রুর সম্মুখে আস্ফালন করিতেছে। তাঁহার বাম হস্তে থাকিত ছোট একটি লণ্ঠন। আমাদের বাড়িতে ভাণ্ডার ঘরের সংলগ্ন ছোট যে কুটুরিটি ছিল তাহাতেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি গলা-খাঁকারি দিয়া বেত্র আস্ফালন করিতে করিতেই আমাদের উঠানে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার জন্য বারান্দায় এক ঘটি জল আগে হইতেই রাখা থাকিত। তিনি লণ্ঠনটি বারান্দায় রাখিয়া কোটের পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একজোড়া খড়ম বাহির করিতেন। মায়ের আদেশে আমি তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া দিতাম। পা দুইটি ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া তিনি খড়ম পরিতেন। তাহার পর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিতেন—"মা লক্ষ্মী, এবার তোমরা শুয়ে পড় সব। আমি রইলাম কোন ভয় নেই। তাহার পর কোটটি খুলিয়া আলনায় রাখিতেন এবং বিছানায় বসিয়া চক্ষু বুজিয়া মৃদুকণ্ঠে দীর্ঘ একটি সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেন। কাহাকে প্রণাম করিতেন জানি না। তাঁহার এই প্রণত অবস্থার ছবিটিই আমার মনে আঁকা আছে। তাঁহাকে শায়িত অবস্থায় কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি যখন প্রণাম করিতেন মা তখনই আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন, তাই তাঁহার শোয়াটা দেখিতে পাইতাম না। খুব ভোরে উঠিয়াই তিনি নিজের দোকানে চলিয়া যাইতেন। আমরা যখন তাঁহার নিকট পড়িতে যাইতাম—দেখিতাম তিনি স্নান করিয়াছেন, দোকানে ধূপধুনা জ্বলিতেছে, দুই চারিটি খরিদ্দার আসিয়াছে। আমাদের কার্য্যক্রমও শুরু হইয়া যাইত।

…খেতু-মামার জেল হওয়াতে দিদিমা পুত্রের নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছিরুকে প্রায়ই বলিতেন—দেখতো, কেনারাম বাড়িতে এসেছে কিনা, থাকলে ডেকে আনিস? কেনারাম সরকার ছিলেন দিদিমার বাপের বাড়ির লোক, তাঁহার সহিত হয়তো আত্মীয়তাও ছিল, ঠিক জানি না। কেনারামের বোনের

শ্বশুরবাড়ি শঙ্করায়। কেনারাম ভগ্নীপতির কাছেই থাকিতেন, চাকুরি করিতেন পাশের গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায়। দিদিমার চিঠি লিখাইবার দরকার হইলে কেনারামের ডাক পড়িত। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে দিদিমা নিজে চিঠি লিখিতে পারিতেন না। আমার মা-ও নিরক্ষরা ছিলেন না। কিন্তু মাকে দিয়া দিদিমা চিঠি লেখানো পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, ও বড্ড তড়বড় করে' লেখে। চিঠি একটু গুছিয়ে লিখতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল, কেনারাম বেশ গুছাইয়া বাগাইয়া চিঠি লিখিতে পারে। তাহার হাতের লেখাটিও ভালো। কেনারামকে কিন্তু প্রায়ই বাড়িতে পাওয়া যাইত না। কারণ তাহাকে প্রায়ই তাহার ভগ্নীপতির ফরমাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমাদের চাষী ছিরুর অন্তত তাহাই মত। যাই হোক ছিরু একদিন কেনারামকে ধরিয়া আনিল, দিদিমা তাহাকে দিয়া মামাকে চিঠিও লিখাইলেন। চিঠির মর্ম্ম ক্ষেত্রনাথের জেল হওয়াতে তাঁহারা বড়ই বিচলিত এবং ভীত হইয়াছেন, গ্রামে দুষ্টলোকের উপদ্রবও বাড়িয়াছে, সুতরাং তাঁহারা এখন সাহেবগঞ্জেই যাইতে চান। ধানের বিলি-ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এখন এখানে থাকিবার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। দুই সপ্তাহ পরে মামার উত্তর আসিল। তিনি মাতৃভক্ত লোক ছিলেন, উত্তরে জানাইলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি সকলকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পত্র পাইয়াই তিনি চলিয়া আসিতেন; কিন্তু হাতে দুই তিনটি শক্ত রোগী থাকায় আসিতে পারিলেন না। আরও মাসখানেক কাটিল, কিন্তু মামা আসিলেন না। তখন দিদিমা স্থির করিলেন গ্রামের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেই সাহেবগঞ্জে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহাও খুব সহজসাধ্য হইল না। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন—ট্রেনে বেশীক্ষণ থাকিলে তাঁহার মাথা ঘোরে, 'বমনেচ্ছাও' হয়। এই কথাটিই তিনি বলিয়াছিলেন আমার বেশ মনে আছে। বলিলেন এই কারণেই তিনি নিজের দেশেও যাইতে পারেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় দেশে যাইবার তাঁহার প্রয়োজনও হয় না। একথা শুনিবার পর দিদিমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি তখন পটলকর্ত্তাকে একটি পত্র লিখাইলেন যে তিনি যখন ছুটির সময় বাড়ি আসিবেন তখন ফিরিবার পথে তাঁহাদের যেন সাহেবগঞ্জে রাখিয়া যান। পটলকর্ত্তা সম্মতি জানাইয়া উত্তরও দিলেন, কিন্তু লিখিলেন যে দুই মাসের পূর্ব্বে তাঁহার ছুটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। ততদিন যদি দিদিমারা শঙ্করায় থাকেন ফিরিবার পথে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে পৌছাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না। একদিন অভাবিত উপায়ে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। অতিশয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল একটি।

...একদিন সকালে দুইটি কালো বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ আমাদের বাড়ির উঠানে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, আরক্তিম আয়ত নয়ন, তৈলহীন অবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম, গলায় জবাফুলের মালা, কপালের মাঝখানে রক্তচন্দনের তিলক, প্রশান্ত ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডল, ধুলিধূসরিত নগ্নপদ, একহাতে প্রকাণ্ড একটি সেতার, অন্য হাতে একটি পুঁটুলি। আমি নেবুতলার আড়াল হইতে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। বাবাকে সেই আমি প্রথম দেখিলাম। দিদিমা বারান্দায় বসিয়াছিলেন, বাবা তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। দিদিমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনিও বাবাকে চিনিতে পারেন নাই।

"কে বাবা তুমি—"

"আমি কেদার"

"কেদার! এ সময়ে কোথা থেকে এলে বাবা"

"আমি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে মৃণালপুর গ্রামে একটা গানের আসরে এসেছিলাম। সেখান থেকেই এখানে এলাম। আপনাদের বাড়িটা দেখে যাবার ইচ্ছে ছিল, আপনারা যে এখানে আছেন তা জানতাম না"

"বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ। আমাদের যে কিভাবে দিন কাটছে" দিদিমার গলা কাঁপিয়া গেল, তিনি চোখে আঁচল দিলেন।

বাবার সঙ্গে যে লোক দুইটি আসিয়াছিল বাবা তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "এইবার তোমরা যেতে পার। আমি ঠিক জায়গায় এসে গেছি। এই নাও—"

বাবা মেরজাইয়ের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া

তাহাদের দিতে গেলেন। তাহারা কিন্তু কিছুতেই টাকা লইতে চাহিল না। উভয়েই হাত-জোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার কাছ থেকে একটি কানা-কড়ি আমরা নিতে পারব না। তার চেয়ে বরং আমাদের পুলিশে দিয়ে দিন—"। বাবাও দেখিলাম না-ছোড়, তাহাদের কিছু দিবেনই। অনেক বলা-কহার পর তাহারা অবশেষে একটি করিয়া টাকা লইয়া বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দিদিমা চোখে কম দেখিতেন বলিয়াই বোধহয় কানে বেশী শুনিতেন। উঠানের একপ্রান্তে লোক দুইটির সহিত বাবার যে বাদানুবাদ চলিতেছিল তাহা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

"কার সঙ্গে কথা কইছিলে, পুলিশের কথা বলছিল কেন, কে ওরা"

বাবা সংক্ষেপে বলিলেন, "ডাকাত—"

"ডাকাত! বল কি!"

বাবা যাহা বলিলেন তাহা রোমাঞ্চকর।

"কাল বিকেলের দিকে মৃণালপুর থেকে বেরিয়েছিলাম। মঙ্গল গাঁয়ে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। খিদে পেয়েছিল, একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম করে' তাকে জিগ্যেস করলাম—শঙ্করা যেতে হলে কোন রাস্তা সোজা হবে। সে বললে—মানুষ-লোটন মাঠটা পার হয়ে দবিরগঞ্জ, সেখান থেকে আশনা, আশনা থেকে শঙ্করা দুক্রোশের মধ্যেই। কিন্তু মানুষ-লোটন মাঠে ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে, রাত্রে ও-মাঠ পেরুনো ঠিক হবে না ঠাকুর। তার চেয়ে রাত্রে এইখানেই শুয়ে থাকুন, ভোর-বেলা বেরিয়ে যাবেন। আমি দেখলাম রাত্রের মধ্যেই যদি আশনা পৌঁছে যেতে পারি তাহলে সকালে এখানে পৌঁছে যাব। আরও ভাবলাম, সন্ধ্যা-বেলায় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আরামে হাঁটতেও পারব। মায়ের নাম করে' বেরিয়েই পড়লাম। বিপদটি কিন্তু ঘটল। মানুষ-লোটন মাঠের মাঝামাঝি যখন এসেছি গুটি চারেক কালো কালো মূর্ত্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। একজন বললে—এই চল্ আমাদের সঙ্গে। জিগ্যেস করলাম কে তোমরা। বললে, আমরা মায়ের অনুচর, বলির পশু সন্ধান করতে বেরিয়েছি, তোকেই বলি দেব, চল। বললাম, তোমাদের মা কোথায় আছেন। দূরে খানিকটা অন্ধকার জমাট হয়ে ছিল সেই দিকে দেখিয়ে বললে—ওই গাছতলায়। বুঝলাম, আপত্তি করলে এইখানেই মেরে ফেলবে। গেলাম তাদের সঙ্গে। গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায় প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। গোটা দুই লণ্ঠনও রয়েছে। দেখলাম প্রত্যেকটি লোকের দুষমণের মতো চেহারা, গ্যাঁট্টা-গোঁট্টা, কালো মুশ্কো, মাথায় বাবরি চুল, প্রত্যেকের হাতে বেঁটে মোটা লাঠি একটি করে'। আর গাছের ডালে সত্যিই দেখি মা কালীর পট টাঙানো রয়েছে একটি। পটটি ঘিরে জবাফুলের মালা দুলছে। আমি বুঝলাম আজ আর নিস্তার নেই—"

দিদিমা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলেন।

"তারপর-- ?"

"মৃত্যুর জন্যেই তৈরি হলাম। তাদের বললাম, আমার একটি অনুরোধ আছে কেবল, মরবার আগে প্রাণভরে মায়ের নাম গান করতে দাও আমাকে। আমি ছেলেবেলা থেকে মায়ের নামই গান করেছি, শেষ সময়েও তাই করতে চাই। আশা করি আমার এ অনুরোধটি তোমরা রাখবে। একথা শুনে তারা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস করে' পরামর্শ করলে খানিকক্ষণ। তার পর বললে—বেশ, আমাদের আপত্তি নেই। হোক মায়ের নাম একখানা। আমি ঠিক কালীর পটটির নীচে গিয়ে বসলাম। তারপর সেতারটি বেঁধে ধরলাম একখানা শ্যামাসঙ্গীত দরবারি কানাড়ায়। ডাকাতের দল চুপচাপ বসে' শুনতে লাগল। খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু আর এক কাণ্ড হল। প্রকাণ্ড গাছ, অনেক পাখী ছিল তাতে। তারাও সব একযোগে সঙ্গত করতে লাগল আমার সঙ্গে। সেই অন্ধকার মহাশূন্য সুরে সুরে ভরে' উঠল যেন হঠাৎ। অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল একটা। কিছুক্ষণ পরে আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লাম, তারপর ঠিক যে কি ঘটেছিল তা আমি জানি না, আমার গান যখন শেষ হল তখন চোখ খুলে দেখি সেই পঞ্চাশ জন ডাকাত হাত জোড় করে' আমার সামনে বসে' আছে। আর মা কালীর পটে যে জবাফুলের মালাটা ছিল সেটা আমার গলায়

রয়েছে। আমি যখন তন্ময় হয়ে গান গাইছিলাম তখন মালাটি আপনি নাকি ওপর থেকে আমার গলায় এসে পড়েছে। কখন পড়েছে, কি করে' পড়েছে তা আমি বুঝতে পারি নি। ডাকাতদের বললাম, আমার গান শেষ হয়েছে, মায়ের কাছে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েছি, এবার তোমরা তোমাদের কাজ কর। তারা বলতে লাগল, আপনাকে আমরা চিনতে পারি নি ঠাকুর, আমাদের মাপ করুন। আমরা ভক্ত নই, আমরা ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে। পেটের দায়ে এই মহাপাপ করি। কিন্তু আসল ভক্তকে আমরা চিনতে পারি। আপনার গায়ে আমরা হাত দিতে পারব না। স্বয়ং মা যখন আপনাকে অভয় দিয়ে আপনার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছেন, তখন আমরা কি আর কিছু করতে পারি? আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। কারণ কিছুদূর গিয়ে আমাদের আর একটা ঘাঁটি আছে, তারা হয়তো আপনাকে আটকাতে পারে। ওরাই আমাকে সঙ্গে করে' পৌঁছে দিয়ে গেল—। সবই মায়ের ইচ্ছে—"

বাবা উঠানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলেন। যাহা বলিতেছিলেন তাহা এতই চমকপ্রদ যে তাঁহাকে দিদিমা বসিতে পর্য্যন্ত বলেন নাই। এইবার তাঁহার হুঁশ হইল।

মা কালীর উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন"—সবই মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়া, তিনিই রক্ষে করেছেন। তুমি বাবা উঠে এস, এখানে ব'স। হাত পা মুখ ধোও। ও বারাহী, কোথা গেলি তুই, কেদার এসেছে, জল নিয়ে আয়, পা ধুইয়ে দে, পেন্নাম কর—"

আমি লেবু গাছের আড়াল হইতেই সব শুনিতেছিলাম ও দেখিতেছিলাম। মাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তিনি রান্নাঘর হইতে একগলা ঘোমটা টানিয়া বাহির হইলেন। মাকে এত বড় ঘোমটা দিতে আগে কখনও দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। যদিও একটু অবান্তর হইবে তবু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করিতেছি। মা খুব ভালো অভিনয় করিতে পারিতেন। একবার লুকাইয়া মায়ের অভিনয় আমি দেখিয়াছিলাম। দুপুর-বেলা সইমার বাড়িতে পাড়ার মেয়েদের আড্ডা জমিত। একদিন সন্তোষ ছুটিয়া আসিয়া চুপি চুপি আমাকে বলিল, মায়েরা থিয়েটার করছে, দেখবি তো আয়। গিয়া দেখিলাম সইমার শুইবার ঘরে খিল-লাগানো। কিন্তু কপাটে ছিদ্র ছিল। ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, মা চমৎকার একখানি শাড়ি পরিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। সইমা-ও আর একটি চমৎকার শাড়ি পরিয়া মায়ের মুখের সামনে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া পদ্যে কি বলিতেছেন। সইমার বলা শেষ হইলে মা শাড়ির আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সইমার মুখের দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—তাহার পর তিনিও কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। উত্তেজিত হইয়া আমি মা-কে ডাকিতে যাইতেছিলাম কিন্তু সন্তোষ আমাকে মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল এবং চোখের ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেলাম। সন্তোষ বলিল, তোর মা সীতা সেজেছে, আমার মা সরমা। কাউকে বলিস না যেন। জানাজানি হয়ে গেলে মা ভয়ানক রাগ করবে'। মায়ের একগলা ঘোমটা দেখিয়া সেদিনকার কথা মনে পড়িল। মনে হইল মা সেদিন যেমন সীতা সাজিয়াছিলেন আজ বোধ হয় তেমনি কনে' বউ সাজিয়াছেন। বাবা বারান্দায় তাঁহার ধুলিধূসরিত পা দুইটি ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলেন। মা প্রথমে গিয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর ঘটি ঘটি জল ঢালিয়া তাঁহার পা দুইটি ধুইয়া দিলেন, তাহার পর একটি টুকটুকে লাল গামছা দিয়া পা দুইটি মুছাইয়া দিলেন। বাবা নির্ব্বিকার-ভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন কোন মহারাজা তাঁহার প্রাপ্য সেবা গ্রহণ করিতেছেন।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিলাম এই আগন্তুক কে! তখনও তাঁহাকে আমি বাবা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। চেনা সম্ভব ছিল না। আমার জন্মের পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, এত দিন পরে ফিরিলেন।

(ক্রমশঃ)

কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের আত্মজীবনী

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে এদেশবাসী বিশেষ করে বাঙালী ইংরেজী শিক্ষা করে ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের অমৃত স্বাদলাভ করে মুগ্ধ বিস্মিত হয়। নব্য ইংরেজী শিক্ষিত যুবক কাশীপ্রসাদ ঘোষ Shair and other Poems কাব্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত Captive lady কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্র Raj-Mohons wife উপন্যাস, রমেশচন্দ্র Lays of Ancient India রচনা করে ইংরেজী-সাহিত্যে অমর হবার বাসনা পোষণ করেন। কিন্তু মাতৃভাষা ব্যতীত বিজাতীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করে অমরতালাভ করা সহজসাধ্য নয়। এই সত্যটি কাশীপ্রসাদ ভিন্ন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি পরে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। মধুসূদন, মেঘনাদবধ, তিলোত্তমা সম্ভব, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি কাব্য নাটক, বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, সীতারাম, প্রভৃতি উপন্যাস ও রমেশচন্দ্র 'বঙ্গবিজেতা' 'মাধবীকঙ্কন', জীবন প্রভাত, 'জীবন সন্ধ্যা', "সংসার", "সমাজ" প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে বাঙলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

আর কাশীপ্রসাদ? কাশীপ্রসাদকে আজ আমরা ভুলে গিয়েছি; তাঁর Shair and other poems কাব্যগ্রন্থ বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গিয়েছে। অথচ সে যুগে কাশীপ্রসাদ কবি রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

সাগর পারের দেশ সুদূর ইংলণ্ডে পর্যাপ্ত তাঁর কবি-প্রতিভার সমাদর হয়েছিল। ভারতীয় তথা বাঙালীর মধ্যে কাশীপ্রসাদই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনা করেন।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সুবিখ্যাত কবি-সমালোচক ডি, এল রিচার্ডসন তাঁর Selection from British Poet নামক বিখ্যাত কাব্য-সঙ্কলন গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবির পাশে বাঙালী কবি কাশীপ্রসাদের একটি কবিতা (The Boatmen's song to-Ganga) স্থান দিয়ে যুগপৎ কাশীপ্রসাদ ও বাঙালী জাতিকে গৌরবান্বিত করেন। ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব কাশীপ্রসাদের এই কবিতাটির সম্বন্ধে স্বদেশবাসীর নিকট চ্যালেঞ্জ করে—লিখেছেন, "Let some of those narrow-minded person who are in the habits of looking down upon the native of India with an arrogant and vulgar contempt read this poem with attention and asked themselves if they could write letter verse not in a foreign language, but even in their own.

এ হেন কবি কাশীপ্রসাদের জীবনী রচনার জন্য অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সাহেব কবির নিকট তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জানতে চান। কবি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি জানান পত্রযোগে—১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ সালে। কবির লিখিত সেই আত্মজীবনীমূলক পত্রটির মর্ম্মানুবাদ এই :—

"শনিবার ৫ই আগষ্ট ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে (বাঙলা ২২শে শ্রাবণ ১২১৬ সালে) কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুরে মাতামহের বাড়ীতে আমি জন্ম গ্রহণ করি। আমার মা প্রায়ই বলতেন, অসময়ে সাত মাসে জন্ম হওয়ার জন্য আমার মাথার উপরিভাগ কেশহীন হয়।* আর জন্মের সময় আমার গায়ের রঁঙ ছিল কালো। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল গৌর বর্ণে রূপান্তরিত হয়। বর্ণের এই রূপান্তর আমার কাছে চিরকালই একটা কৌতূহলের বিষয় হয়ে আছে।

ছেলে বেলায় আমি খুব রুগ্ন ছিলাম। আমার এই রুগ্নতার জন্যও বংশের একমাত্র ছেলে হওয়ার জন্য আমার লেখাপড়ায় দিকে কেউ তেমন নজর দেয়নি। চৌদ্দ বছর অবধি আমি ইংরেজী বা বাঙলা কিছুই পড়তে পারতাম না। মনে পড়ে একদিন বাবা ইংরেজী পড়াতে বসলেন; সেদিন তিনি যা পড়তে দিলেন তা আমি পড়তে পারলাম না। ফলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় ভাষণ তিরস্কার করলেন।—তিরস্কৃত হয়ে আমি ঠিক করলাম এ বাড়ীতে আর থাকব না; এ বাড়ীতে থাকলে আমার কিছুই হবে না। কারণ এখানে বহু আকর্ষণীয় জিনিষ রয়েছে যা আমার মনকে সতত বিভ্রান্ত করবে। এ কথা দাদামহাশয়কে জানালাম, তিনি আমার বাবাকে দিয়ে হিন্দু কলেজে টাকা জমা দেওয়ালেন। ফলে ৮ই অক্টোবর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আমি অবৈতনিক ছাত্র-রূপে হিন্দু কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। এই শ্রেণীতে তখন Murray's spelling Book পড়ান হত। তিন বছরের মধ্যেই আমি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হলাম। এই শ্রেণীতে আমি তিন বছর অধ্যয়ন করি। কলেজে ভাল ছেলে বলে আমার সুখ্যাতি ছিল। আর প্রতি বছরই আমি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছি।

* পরবর্ত্তীকালে কাশীপ্রসাদের মস্তকটি কালো-কুঞ্চিত কেশদামে শ্রীমণ্ডিত হয়। তিনি অপরূপ দেহ সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে Fisher's Drowing Room Scrap Album নামক বিখ্যাত চিত্র-পুস্তক বিলাতের অন্যান্য সুদর্শন ব্যক্তিগণের সঙ্গে কুমারী জে, ড্রমণ্ড অঙ্কিত কাশীপ্রসাদের কন্দর্প প্রতিম প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়। এই সঙ্গে কাশীপ্রসাদের কবিপ্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ একটি কবিতা মুদ্রিত হয়।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কলেজের পরিদর্শক এইচ, এইচ, উইলসন সাহেব প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা যাতে ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা করতে চেষ্টা করে সেই দিকে বিশেষ নজর দেন। ক্লাসে একমাত্র আমিই কবিতা রচনা করতে সক্ষম হই।

ছেলেবেলা থেকে আমার কবিতা রচনার ঝোঁক ছিল। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ধারার—সুমধুর সঙ্গীত, ব্রহ্মপুত্রের মর্মর ধ্বনি আমায় আকর্ষণ করে। এই সময় আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তাম। আমার মনে তখন যে ভাবের উদয় হত তা আমি কবিতায় রূপ দিতাম।—

আমার প্রথম কবিতাটি আমি হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক মিঃ হ্যালিফকস্‌কে দেখাই। তিনি কবিতাটির ছন্দ দোষ দেখিয়ে রেকী সাহেবের Prosody পড়তে উপদেশ দেন। কিন্তু বইটি তখন বাজারে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অগত্যা আমি murray রচিত Prosody ও Lord Kames প্রণীত Elements of critisim বই দুখানি খুব মনযোগের সঙ্গে পাঠ করি। ফলে কবিতার পদবিন্যাস প্রকরণ ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পারি। তারপর শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিগণের কাব্যগুলি ছন্দ ও লয় অনুসারে পাঠ করে আমার কান দুটি ইংরেজী কাব্যের তাল, লয় ও ছন্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে। এর পর আমার পূর্ব্ব লিখিত কবিতাটি সংশোধন করে মিঃ হ্যালিফকস্‌কে দেখাই। এবার তিনি কবিতাটি প্রকাশযোগ্য বলে অনুমোদন করেন।

Young man's first attempt আমার প্রথম কবিতা। এটি ১২২৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে রচিত হয়। Hope নামক কবিতাটি ছাড়া আমার কলেজ জীবনের সমস্ত কবিতা আমার Shair and other Poems কাব্য গ্রন্থ থেকে বাদ দিয়েছি।

এই সময় ডক্টর উইলসন সাহেব যে কোন একটি নামকরা পুস্তকের সমালোচনা লিখতে আদেশ করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আমি "Critical Remarks on the four first Chapters of Mr. Mill's History of British India" নামক প্রবন্ধটি লিখে তাঁকে দিই। প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৯ সালের Government Gazette পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে এই প্রবন্ধটিই Asiatic Journal এ পুনঃ প্রকাশিত হয়।

এই সময় আমি কলেজ ত্যাগ করি। কলেজ পরিত্যাগ করবার পর আমি নিয়মিত ভাবে কবিতা রচনা করিতে থাকি এবং ফারসী, নাগরী ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশোনা করি।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরে আমার Shair and other poems কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখন দেখছি এগুলি ছাপতে দেওয়া উচিত হয়নি। কারণ এতে শুধু যে পুনরুক্তি দোষ আছে তা নয়, ব্যাকরণ দোষও রয়ে গেছে। এ কাব্যের সকল দোষত্রুটি সংশোধনে এখন আমি নিযুক্ত আছি। এ কাব্যগ্রন্থ রচনার পরও আমি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেছি।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি পদ্য ছাড়া গদ্য লিখিনি বললেই হয়। Vision নামে একটি উপন্যাস, On Bengale Poetry ও On Bengali Works and writers প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করি। এগুলি ডি. এল. রিচার্ডসন সম্পাদিত Calcutta Literary Gazette পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া আমার Sketches of Rangit Singhe ও Sketches of the kings of Oudo নামক প্রবন্ধ দুটি Calcutta Monthly Journal পত্রে প্রকাশিত হয়। আমার গদ্য রচনাবলীর মধ্যে Native Indian Dynastier সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি মূল্যবান বলে আমার মনে হয়। বেনামেও আমি অনেক কবিতা প্রবন্ধ লিখেছি।

শ্রীরামপুরের পাদরীদের বাইবেলের প্রথম ভাগের বঙ্গানুবাদে ভ্রম প্রদর্শন করে Calcutta Literary Gazette এ একটি প্রবন্ধ লিখি। তাঁরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে সমাচার দর্পণ প্রকাশ করেন। এবং পুনরায় অনুবাদ করে আমার মতামতের জন্য আমার নিকট একটি 'কপি' পাঠিয়ে দেন। আমি সন্তোষজনক মত প্রকাশ করলে তারা অনুবাদটির প্রুফ দেখে দেওয়ার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। আমি তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করি।

আমার বেশীর ভাগ কবিতাই ইংরেজী ভাষায় রচিত। আমি বাংলা ভাষায়ও অনেক গান রচনা করেছি।* তবে বাঙলা অপেক্ষা ইংরেজী ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ। বাঙলা অপেক্ষা ইংরেজী কাব্যের সহিত অধিক পরিচয় থাকার জন্য অথবা ইংরেজী কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস ও চিন্তাধারা অধিক ভালবাসার জন্য এইরূপ হয়েছে কিনা জানিনা। এতে এটা ঠিক যে অন্যান্য ভাষার পুস্তক অপেক্ষা ইংরেজী ভাষায় রচিত পুস্তক পাঠে বেশী সময় ব্যয় করেছি।

কুমারী এমা রবার্টস বিলাত গমনের সময় আমার জীবনী রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাঁকে আমার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিখে দিয়েছি। †

এবার আমার পারিবারিক জীবনের দু-একটি কথা বলি: ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সতের বছর বয়সে আমার প্রথম বিবাহ হয়। ওই পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ওই বছর পত্নী ও পরের বছর পুত্রটি মারা যায়। আমি পুনরায় বিবাহ করি। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে আমার পিতৃবিয়োগ হয় এবং দ্বিতীয় পত্নী একটী কন্যা প্রসব করে পরলোক গমন করেন। পরে কন্যাটিও তার মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

---

* কালীপ্রসাদ প্রায় তিনশত বাঙলা গান রচনা করেন। এই সঙ্গীতগুলি "গীতাবলী" নামক কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটি আজ দুষ্প্রাপ্য, তবে কালীপ্রসাদের ৪০।৫০টি গান অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত "প্রীতিগীতি" নামক কাব্য সংকলন গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।—

† কুমারী রবার্টস লিখিত কবি কালীপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্য পরিচয় Fisher's views in India, China and on the shores of the Red sea নামক চিত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

আমি পুনরায় বিবাহ করেছি; কিন্তু ভগবানই জানেন আমার এ পত্নী কতদিন জীবিত থাকবেন।

আমরা ছয় ভাই ও চার বোন। পিতা ঠাকুরের মৃত্যুর পর আমাদের সম্পত্তি ভাগের জন্য বৈমাত্র ভায়েদের সঙ্গে আমায় একটি মোকদ্দমায় জড়িত হতে হয়। কিন্তু আমার ভায়েরা নাবালক বলে কোর্ট সম্পত্তি ভাগ করতে গররাজী হয়। ফলে মামলাটি অমীমাংসিত রয়ে যায়। এর সুমীমাংসার জন্য আমি পুনরায় সুপ্রিমকোর্টে আপিল করি। সুখের বিষয় এইবার মোকদ্দমার মীমাংসা হয়ে যায়। মোকদ্দমাটি মীমাংসার জন্য আমাদের ২৫০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল।

এখানেই কাশীপ্রসাদের আত্মজীবনী শেষ হয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবন শেষ হয়নি। এর পর তিনি সুদীর্ঘ ৩৯ বছর জীবিত ছিলেন। এই ৩৯ বছর তিনি সাহিত্য, সংবাদপত্র ও জনসেবায় অতিবাহিত করেন। তবে Hindu Intelligencer সংবাদপত্র প্রকাশ ছাড়া এর মধ্যে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। Hindu Intelligencer ১২ই নভেম্বর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অনেকে বলেন, এই Hindu Intelligencerই ভারতীয় কর্তৃক পরিচালিত ও সম্পাদিত সর্ব্ব প্রথম-সার্থক ইংরেজী সংবাদপত্র। কাশীপ্রসাদ এই Hindu Intelligencer পত্রে দেশের অভাব অভিযোগের সকল কথা প্রকাশ করতেন অকুতোভয়ে। সিপাইবিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং যখন সংবাদ পত্রের অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন তখন নির্ভিক সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ এর প্রতিবাদ কল্পে Hindu Intellengencer প্রচার বন্ধ করে দেন। সংবাদপত্রের অসম্মান তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ পরলোকগমন করেন। কবি রাজকৃষ্ণ রায় কবি কাশীপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে লিখেছেন:

ব্রিটনীয় ভাষা শিখি পরিচয় তার,
দিলে তুমি ভাল রূপে গোষজ সুজন!
গাঁথিলা অপূর্ব্ব, চারু কবিতার হার
ইংরাজী ভাষায়। শ্রুতিপথ বিমোহন
কবিতার ছটা তব। দূর বন-জাত
ফুল-ফুল কুলে যথা গাঁথে মালাকার
কমনীয়দাম দাম প্রচুর তাহার
ভুলাতে নয়ন, মন,—হারে পারিজাত।
তেমতি সাগর পার বিদেশী ভাষায়
কবিতা মালিকা তুমি স্বগুণে গাঁথিলে
বঙ্গবাসী হয়ে। পরি অন্তর-গলায়
এ তব গুম্ফিত হার আনন্দ সলিলে
সন্তরে পাঠক সদা; সুধার ধারায়
তব যশঃ গায় সবে। সুকীর্ত্তি রাখিলে।

রূপকথা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শোনো তবে একালের নতুন রূপকথা, ব্যথা দিয়ে তৈরী যা আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। রঙীন্ ফানুসে ভরা স্বপন সায়রে পালতোলা তর তর করে ঘটনার স্রোতে বেয়ে যাওয়া সোনার তরীর গল্প এ নয়, যাতে সার আছে, তার আছে, মরালগ্রীবা হেলিয়ে 'মর‍্যাল' আছে মনোবিনোদন রসিকবন্ধন রস আছে, উপদেশসিঞ্চন নির্দেশ আছে। এ হচ্ছে বুকের রক্ত দিয়ে আঁকা দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভরা বাঁকা সংসারের ফাঁকা সাঁকো পেরিয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নেওয়া। তবু যদি মন দিয়ে শোনো কান পেতে, তাহলে হয়তো শুনতে পাবে ভাঙনের তীরে তীরে, গল্প নদীর কূলে কূলে কলস্বনার কুলুকুলু নাচন্, যার সুরে সুর মিলিয়েছে মনস্বীর ছন্দ, আর তপস্বিনীদের আনন্দ।

রূপকথার প্রথমেই বলতে হয়—এক যে ছিল রাজা আর এক যে ছিল রাণী। আজকালকার রাজারাণীদের যুগ নেই, এমন কি রাণীমার্কা টাকা পর্য্যন্ত অচল, তাই গল্প সুরু করতে হয়, এক যে ছিল ব্যাঙ্গমা আর এক যে ছিল ব্যাঙ্গমী অর্থাৎ সেই চিরকালের নারী আর নায়ক, পুরুষ আর স্ত্রী।

মানববিহঙ্গমের কি নাম দেবো—অরূপ না বিকাশ, সুধীর না দীপক, রজত না শুভ্র—নবঘনশ্যাম তরুণ নওলকিশোর, না অতিক্রান্ত-যৌবনের প্রত্যন্ত সীমায় পা দেওয়া প্রায় প্রাকপ্রৌঢ় পুরুষপুঙ্গব। ইনি মদন-বিমোহন হয়ে ললনা মনকে লোভন করে তুলতে পারেন না, আর এক যৌবনলক্ষ্মী এর মাথায় শ্বেতমল্লিকার মালার ব্যবস্থা করেছেন। সে যাই হোক্, আজকের গল্পের নায়করা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে স্বপন দেশের সুকুমার রাজার কুমার হন্ না, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি থাকে না হাতে, সঙ্গে থাকে না চালাকচতুর মন্ত্রীর পুত্র, তালকাটা বেতাল কোটাল নন্দন বা সাত সমুদ্দুর তেরো নদীতে পাক খাওয়া গজভোক্তৃ কমলেকামিনী দেখা সওদাগর বংশাবতংসের দোললাগা মনচাপা ইতিহাস। আজকালকার রূপকথার রাজপুত্তুররা দিগ্বিজয়ী বীর নন্, প্রচণ্ড পণ্ডিত নন, রাক্ষসনিসূদন পরদেশী নাগর নন, তার জন্য মালা হাতে অপেক্ষা করে থাকে না যৌবনবতী যশোমতীরা। এরা চাকরীর চাকায় কলুর বলদের মত ঘোরেন, না হয় দাঁওয়ের আশায় জনারণ্যের মাঝে ট্যাকে থাকে না রেস্ত, রম্ভা দেখায় সবাই—মায় রূপসী উর্বসী মেনকা রম্ভারা।

আর এক যে ছিল বিহঙ্গমী—কি নামকরণ করবো তার—মল্লিকা বল্লরী, না সাহানা মোহিনী, না তপতী ব্রততী। চম্পকবরণী সে নয়—নেই তার দুধবরণ রং, মেঘবরণ চুল, তপ্ত উজ্জ্বল দীপ্ত সন্নতাঙ্গ, গৌরবরতনু, চেহারায় বা সাজসজ্জায় ঠাটঠমক্ ঠোঁটে লাল চমক্। তমসার তীরে অন্ধকারে ঢাকা সন্ধ্যা-দীপশিখার স্নিগ্ধরূপ চোখে দেখেছো কি কখনো? চোখ ঝলসায় না বটে, আচ্ছন্ন হয় না দেহ, কিন্তু মনকে আপন করে নেয়। রূপকথার নায়িকা বাংলা দেশের ময়লা শ্যামলাদের একজন। বয়সে কচি ও কাঁচা না হলেও তন্বী শ্যামা—পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী কিনা তা এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ অর্থাৎ এখনও সে অনূঢ়া তাই বিলোল অধরের মধুর রসের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় কোন ভাগ্যবানের হয় নি। লেখাপড়ায় মন ছিল বেশ, গান বাজনাতেও তথৈবচ—তাই দুএতেই ভাল করে নিপুণা হতে আটকায় নি।

এই দুজনকে নিয়েই আমার রূপকথা সুরু—একে গল্প বলো ক্ষতি নেই, না বলো ক্ষোভ নেই—রূপকথা ত প্রেমকথা নয়—এ যে বিরহমিলন অতীত গাথা—এর আদিও নেই, অন্তও নেই, পাওয়াও নেই, ছাড়াও নেই। আজকের গল্প লিখিয়েরা বলবে—তুমি কি পাগল না বোকা? না একেবারে সেকেলে বৃদ্ধ জরদগব যে, শুধু ঐটুকু সম্বল নিয়ে উত্তাল তরঙ্গমুখর গল্প নদী পার হতে চাইছো একালের এ্যাটম যুগে—স্থান কাল পাত্র ভেদে ঘন ঘন 'সিচুয়েশন' তৈরী করো, জোর বস্তুতন্ত্র নিয়ে এসো লেখায়, রচনাশৈলীতে নতুন টেকনিক লাগাও, নতুন বুকনী দাও, তবেই ত মডার্ণ পিঁয়াজ রশুনের পাঁচমিশালী খিচুড়ী জমবে ভালো—আর কি আতপতণ্ডুল পবিত্র গব্য ঘৃতের দিন আছে। কামনাক্লেদক্লিন্ন কমপ্লেক্সময় পৃথিবীতে যদি তারই তান তুলতে না পারো, তবে সরে পড়ো তল্পীতল্পা নিয়ে হিমালয়ের গহ্বরে—ভিড় করে দাঁড়িয়ো না আমাদের চোরাগলির পথে। সাহিত্য করতে চাও ত যাও ঐ কার্য্য করে বাজারে যেখানে ধান ভানতে কামায়ণ রামায়ণ গান হয়। বিশ্বাস না হয় ফ্রয়েড আর ইয়ং সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করো। তোমরা ত তিন যুগ পেরিয়ে অথর্ব যুগে পড়েছো, পঞ্চাশোর্দ্ধ বনে না গিয়ে সাহিত্যের উপবনে ছুটেছো—আজকের চালচলন খোঁচখাঁচ, ধরণধারণ দুরস্ত করতে না পারলে শুধু সেকেলে রোমান্টিক কণ্টকবনে সোনার বরণ মায়ামৃগীর পিছনে দৌড়ানই হবে সার—তাড়কা রাক্ষসীদের তাড়নায় যদি জীবনভরা বিড়ম্বনাই না বুঝতে পারলে তবে তোমাদের রচনা রম্য হবে কোথা থেকে—দুধের বদলে পিটুলী গিলে অশ্বত্থামা হত বলেই হাহুতোস্মি করতে হবে।

আচ্ছা, স্থান কাল পাত্রকে কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যে শোধন করে যথাসম্ভব গোত্র নাম দিয়েই গল্প সুরু করা যাক্। হিমালয়ের তুঙ্গশিরে গঙ্গাবারির শিকর সিক্ত সীমানায় কম্পিত দেবদারুর নীচে না হয় তন্বী শ্যামকান্তিময়ীরা নাই বসলেন, অলকার প্রাসাদচূড়ে বিরহিনী যক্ষবধুরা প্রিয়ের কথা স্মরণ করে ভবনশিখীকে নাই বা নাচালেন। স্থানটাকে বদলে দেওয়া যাক্ নিছক গদ্যময়তায়—নিরেট চোদ্দতলা কংক্রীটের ঘরে। পাত্রপাত্রীর কথা পূর্বেই বলেছি, আর কালের কথা একমাত্র মহাকালই বলতে পারেন, বিপুলা পৃথ্বীতে যে কাল নিরবধি, তার চর্চাটা আজকালকার কথাশিল্পে হয়তো অধিকার। হ্যাঁ, তাদের যেদিন দেখা হয়েছিলো, সেদিন কি বার ছিল মনে নেই, বিষ্যুতবারের বারবেলাও হতে পারে, তিথি নক্ষত্র মিলিয়ে তেরস্পর্শও ঘটতে পারে—তবে এটুকু হলফ্ করে বলতে পারি যে সেদিন মেঘমেদুর তমাল বনে আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে নি, বিরহকাতর বরষণমুখর শ্রাবণশর্বরীও সেটা নয়, আর এটাও ঠিক যে হেমন্তের দিনান্তে শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে তাদের যৌথ চরণচিহ্ন পড়ে নি, দখিন হাওয়ায় মাতাল চৈতীরাতে চম্পকবনে আলোড়ন ওঠে নি। আর লেকের ধারে তারা ঘন হয়ে বসে নি, সিনেমার স্বল্প অন্ধকারে তাদের যুগল হাতের রোমাঞ্চিত মিলন ঘটেনি, কাফে রেস্তোরাঁয়, কলেজের কমনরুমে করিডরে পার্টির আফিসে কার্জনপার্কের অনির্জন সন্ধ্যায় বা আলোক-মাতাল গঙ্গার তীরে, তারা নিবিড় করে আলাপ জমায় নি।

তবু তাদের দেখা হয়েছিল এইটেই আশ্চর্য্য। বিহঙ্গমী এসেছিল চাকরীর খোঁজে, পেয়েওছিল একটা। আমি কবি নই, নাম দিইনি তার কমলা বা ক্যামেলিয়া, ট্রামে বসে তার মুখের একপাশের নিটোল রেখাটি দেখিনি, দেখিনি খোঁপার নীচে ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি, বা উজ্জ্বল চোখের অসংকোচ দৃষ্টি। সে আমাকে দোহাই দেইনি একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখার জন্য—যার নাম হবে মালতী, যাকে পাল্লা দিতে হবে পাঁচসাতজন অসামান্যাদের সঙ্গে, খেতে হবে সপ্তরথিনীর মার, আবিষ্কার করতে হবে বিশ্ববিজয়ী যাদু। আমার রূপকথার নায়িকা আরো সামান্যা, আরো অনামিকা। তারপর—রূপকথা কি অতো সহজে এগোয়। একালের গল্প হলে তরতর করে চলে যেতো, কতো ঘটনা ঘটে যেতো, কতো মান অভিমান মনস্তত্বের পালা, কতো দ্রৌপদীরা পঞ্চপতির সাথে দাদার চৌপদী গাইতো, কতো অহল্যারা হল্যা হতো, স্বৈরিনীরা সতী। এ হচ্চে রূপকথা—এর দুধটুকু মরে দাঁড়ায় ক্ষীরে—বাইরের যৌবন নিয়ে এ রঙীণ কারবার নয়, অন্তরের রস যদি না উথলে ওঠে। রূপকথার রাজকন্যার প্রাণ নিকষকালো ভোমরাভোমরীর প্রাণের সঙ্গে গভীর জলের অতলে মণিমাণিক্যের কৌটোয় বন্দী, তাকে পেতে গেলে তো শুধু ফাঁকা আওয়াজে চলে না, চাই বীর্য, শৌর্য, বিশ্বাস, তপস্যা, প্রেম, ক্ষমা তিতিক্ষা আর প্রতীক্ষা। কামুকের হাত হতে ছিনিয়ে নিতে হয় কার্মুক, বীরের হাতে তুলে দিতে হয় দীপ্ত শাণিত তরবার। দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষমাস তার জন্য বসে থাকতে হয়। আজকের এই গতি প্রগতির যুগে রূপকথা তাই অচল, রসকথার পর্য্যায়ে পৌঁছয় না। পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে তিলোত্তমারও সৃষ্টি হয় না। হ্যাঁ, তারপর, তাদের দেখা হয়েছে সাহিত্যের বাসরে, গানের আসরে, জন্মবার্ষিকীর উৎসবে, জয়ন্তী-সভায়।

ছেলেটি বলেছে—কি চমৎকার গান আপনি—

মেয়েটি জবাব দিয়েছে—কি চমৎকার বলেন আপনি—

বিহঙ্গম বলে—এই তো সবে সুরু, মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি,

দুজনকেই দেখছি তাহলে মোহধ্বান্ত বটিকা খেতে হয় না—শূলনাশিনী ত্রিশূল বটিকা—

বিহঙ্গমী উতোর গায়—যখন সব কুঁড়ি উঠবে ফুটে, পূর্ণিমিদমের ইশারাতে, তখন—

ছেলেটি হেসে বলে—তখন—যঃপলায়তে—দেখছেন না আকাশের মহাদিগন্তে ঐ ছায়ানটকে—ঐ নটনারায়ণেরই শিষ্য যে আমরা, সবাই নটুয়া। তবে আমরা বামপন্থী নই, দক্ষিণের দাক্ষিণ্যেই আমাদের জয়ের মালা গাঁথা হয়।

আপনি অতো ভাবেন কেন—জিজ্ঞাসা করে বিহঙ্গমী—

—মহাভাবই যে মহাভাবনার—

—হেঁয়ালী ছাড়া বুঝি কিছুই জানে না—

সে শুধু হাসে।

কিছুদিন পরে ছেলেটি বললে একদিন—শুনেছো আমি যাচ্চি চলে—

বিহঙ্গমী থমকে দাঁড়িয়ে যায়, ছল ছল চোখে শুধু বলে—যাবেন ত জানিই, কিন্তু এতো শীঘ্র শুমিতি তো—

আকাশের দিকে চেয়ে বিহঙ্গম যেন নিজের মনে মনেই বলে—ঐ নীলাম্বরের বাণীর অনেক কিছুই তো শোনা যায় কানে, বুঝে নিতে হয় মনে, জেনে নিতে হয় ধ্যানে—

বিহঙ্গমী শুধু সাহস করে বলে—না শোনার কতটুকু বোঝেন আপনি—

সে শুধু উত্তর দেয়—যতটুকু ধরা যায় স্বপনে—

চলে যায় মেয়েটি প্রণাম করে, পিছন ফিরে একবার তাকায়, চোখ বেয়ে দুফোঁটা জল ঝরছে মুক্তোর মত।

বিহঙ্গম দুঃখ পায় এই ভেবে—তাকে কেন্দ্র করে এই যে কমল কলিকাটি ফুটলো, দীপশিখা জ্বলে উঠলো, সে কী হোমাগ্নিশিখার মত নিত্যশুদ্ধা হয়ে আহিতাগ্নির মত জ্বলবে, না বাড়বাগ্নি হয়ে খাণ্ডবদাহন করবে, না গুমরে চাপা আগুনে সব ছাই করে ফেলবে, হয়তো বা নিজেকে পর্য্যন্ত ?

তারপর চলেছিলো দু'একটা চিঠি, একজন প্রণাম জানায়, আর একজন আশীর্ব্বাদ করে—ক্রমশঃ তারও সুর সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত হয়ে আসে নববর্ষের শুভেচ্ছায়, বিজয়ার প্রণামে।

ছেলেটি একদিন লেখে—তোমার মালা ত বিশেষ কোন পুরুষের ভোগের জন্ম নয়, বহু যুগের ওপার হতে আনা হ্লাদিনীর ডালা যে তোমাদের হাতে, কণ্ঠে নিয়েছো তারি সুর, ফুটিয়ে তোলো তারি গান, তানে লয়ে মানে মীড়ে মূর্চ্ছনায় ব্যঞ্জনায়। তুমি ত কবিকল্পনার আলো-ঘেরা বাসর ঘরের নববধূ ; নও যে আসন্ন প্রত্যাশায় নিবিড়তায় স্পন্দিত হয়ে উঠবে। তোমার স্বপ্নের ধূপ উঠছে ধ্রুবতারার জন্ম নক্ষত্রলোকের দিকে। মনের মণিকোঠায় দেহের প্রতিটি কোষে যে মধু সঞ্চয় করে রেখেছিলে দাও না তাকে রূপান্তরিত করে, বিলিয়ে সবাইকে দুহাতভরে, সেবায় মাধুর্য্যে, শিক্ষায় শুশ্রূষায়, প্রেমে, স্নেহে। সকলেরই সাধনা যে একমুখা হবে তারই বা কি কথা আছে, ব্যক্তিত্বের অনন্ত বিকাশেই যে তার প্রকাশ—শুচিশুভ্র রুচির নিষ্ঠাতেই যে তার—পরিচয়। বিশ্বের চিরবিরহী মহাভৈরবের দল, আদিমতম ভিক্ষুকরা তোমার কাছে হাত পেতে আছেন—তুমি যে অন্নপূর্ণা সদাপূর্ণা তুমি ত অন্নরিক্তা ভীষণা নও।

অনেক ভেবে চিন্তে মেয়েটি উত্তর দিয়েছিলো—সেকালের রূপকথার রাজপুত্র শেষ পর্য্যন্ত রাজকন্মাকে জয় করেই ফিরে আসে—কিন্তু একালের রূপকথার নায়িকারা হয়তো শেষ পর্য্যন্ত ঘুঁটেকুড়ুনীই থাকেন। কপালগুণে আপনি পুরুষ হয়ে জন্মেছেন, আমি হয়েছি নারী, কিন্তু এই পরুষ পৃথিবীতে পারুষ্যের বেশীভাগ রেশই নারীকে সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু ভুলে যান কেন আমারও আশাআকাঙ্ক্ষা, কামকামনা আছে, রক্তমাংসের লাভাস্রোতে জোয়ারভাঁটা আছে, আমিও তো চেয়েছিলাম দেহের প্রতিটি অণু দিয়ে, মনের প্রতিটি স্পন্দন্ দিয়ে একটি নীড় বাঁধতে। আগে বাপমায়া সেটার ব্যবস্থা করতেন, ছেলেমেয়েরা ঘাড় পেতে সেটা মেনে নিতো, আজকাল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ, সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান, বিশেষ করে শিক্ষা পেয়েছে যারা তারা বলবে আমাদের জীবন আমরা নিজেরাই গড়ে তুলবো। বড় বড় কথার হেঁয়ালী দিয়ে পুরুষ নিজের চারপাশে বর্ম সৃষ্টি করতে পারে, উপদেশ দিতে পারে কিন্তু আমি বলবো সে ক্লীব, সে ভীরু, সে নপুংসক, ভোগ করতে ভয় পায় বলেই সে ত্যাগের বুলি আওড়ায়। তাই ঘরে ঘরে এই বঞ্চনাবেদনার ইতিহাস, এই রিক্ততার শুরুনিঃশ্বাস, মেয়েদের যৌবন হয় না সফল, পুরুষদের মন হয় বিকল। দায়িত্বজ্ঞানহীন পলায়নপর মনোবৃত্তি নিয়ে প্রকাণ্ড ধোঁয়ার আশ্রয়ে হয়তো নারীনিরপেক্ষ নিরাপদ দুর্গ গড়ে তোলা যায়—তা সে ধোঁয়া সাহিত্যই হোক, লোক সেবাই হোক্ জনশিক্ষাই হোক্ ধর্ম্ম বা বিজ্ঞানের চর্চ্চাই হোক্ কিন্তু ততঃ কিম্—অমৃতভাণ্ডটি কোথায় মনে রাখবেন ! অনর্জ্জুনদের হাতে গাণ্ডীব নিজেদেরই মৃত্যুবাণ যোজনা করে। হয়তো প্রিয় শিষ্যারও স্থান আছে ললিত মধুরের উপাসনায়, কিন্তু নারীমনের অভিসম্পাত থেকে মদনদ্রোহী রুদ্রেরও মুক্তি নেই—

অনেকদিন পরে ছেলেটির জবাব এলো—আমার রূপকথা কি বলে জানো—জীবন মহত্তর হয়ে ওঠে ব্যথায়, বেদনায়, অপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে—আমরা বাঁচতে আরম্ভ করি তখনই যখন জীবনটাকে কল্পনা করতে পারি একটা ট্র্যাজেডি রূপে—বিয়োগান্ত নাটকই ত জমে ভাল—We begin to live only when we have conceived life as a tragedy. হিমগিরির কোণে কোণে আমার পথ বিস্তৃত নয়, এ্যম্বকের পুঞ্জীভূত মহিমা ওখানে নেই—আজ চলতে হবে জনতার মাঝ দিয়ে যেখানে ক্ষুধিত মানুষ, ব্যথিত দেবতা বসে আছেন এক মুষ্টি অন্নের আশায়, এক গণ্ডুষ জলের জন্ম। আজকের রূপকথা রাজার খিয়াগীর গান, মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্রের কথা বলবে না। এর জন্ম গৈরিক পরার দরকার নেই, নৈনিক সন্ন্যাসীরও প্রয়োজন নেই, নিরঞ্জন ধ্রুবকে পাবার জন্ম পূর্বাস্ত হয়ে পদ্মাসনে বসবার। আজ স্বপ্ন জেগে উঠুক গানে প্রেমে সুরে, বিজ্ঞানের শক্তিতে, জ্ঞানের তপস্যায়—আজ চলনে

মানুষ সেই সার্থকতার তীর্থে—দেবতা নেমে আসবে ধরায়, মানহারা মানব মানবীরা উঠবে ঊর্ধ্বে—সেই অভীপ্সা নিয়েই তুমি তোমার গান শোনাও, আমি আমার কলম ধরি, বিপ্লবী শক্তির উপাসনা করুক কবি আসুক কথা, শিল্পী তুলুক মূর্চ্ছনা। অনাসক্তি মানেই আসক্তি-হীনতা নয়—আসক্ত না হওয়া—পাঁকে না নামা, কাদা না ছিটানো। কারণ আসক্তির মাঝেই আছে জীবননিষ্ঠ সত্যের লীলা, প্রাণের নব রূপায়নের সংকেত, বহু হবার চেষ্টা। কোনদিন যদি ফিরে আসি সেদিন সিংহদ্বার রুদ্ধ হোক্ ক্ষতি নেই, বাতায়নে যেন তপ্ত লাভায় গলিত কামনার শত প্রদীপ না জ্বলে, সেদিন বর্ণে রসে রূপে আলিঙ্গনে যেন প্রকাশের ব্যাকুলতা না ফোটে, অনির্বচনীয়ের ছন্দ থাকে যেন ব্যঞ্জনায়, অপ্রাপনীয়ের উপলব্ধির নিবিড়তা। দুরূহ দুরাশার অনুচ্চারিত ভাষার মাঝেই আমার জীবনে তাঁরই আসন পাতা হোক গভীর অন্ধকারে। তুমি শুধু একটি ছোট দীপ দূর থেকে জ্বেলে দিয়ে চলে যেয়ো সঞ্চারিণী লতার মত তাঁরই ছায়ায় তারই যাওয়া আসার পথ যেন, তারপর—এক যে ছিল রাজা, এক যে ছিল রাণী এক যে, ছিল বিহঙ্গম, এক যে ছিল ব্যাঙ্গমী। এ গল্প ত ফুরোয় না, নটে গাছটিও মুড়োয় না। জীবন ইতিহাসের পাতায় পাতায় রূপকথার ইঙ্গিতটি রসকথা হয়ে তোলা থাকে দু ফোঁটা চোখের জলের সঙ্গে। আর থাকে রক্তঝরা নাম, বেদনভরা প্রণাম, দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রাণের পূর্ণ পরিণাম।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু

জননী জন্মভূমি রত্নপ্রসবিনী, যুগে যুগে তিনি রত্ন প্রসব করে এই বঙ্গভূমিকে সকল বিষয়ে নতুন প্রাণ দান করেন। বাংলাদেশে সকল বিষয়েই গৌরব-উজ্জ্বল মানব জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতিভায় সমস্ত ভারত প্রদীপ্ত হয়েছে। তাঁদের ঋণ সর্ববিষয়ে অপরিশোধ্য হয়ে রয়েছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাদেরই একজন।

ঈশ্বর গুপ্ত যখন মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন বঙ্গসাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবপদাবলী, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা বাঙ্গালীর নিকট ঘৃণ্য ও ব্যঙ্গের বস্তু. তাই তিনি অতিশয় হতাশায় বলেছিলেন—

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনমতে কেহ নাহি সমাদর করে॥

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিক ইতিহাস পর্য্যন্ত আলোচনা করলে দেখা যায় বাংলার আধুনিক সাহিত্য প্রধানত সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এর প্রথম যুগে সমাচারদর্পণ, সংবাদকৌমুদী, সমাচার-চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত ও সংবাদপ্রভাকর ইত্যাদিতে সাহিত্য রচনা করেছেন প্রথম যুগের রামমোহন রায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বর গুপ্ত। তখন বাংলা কবিতায় ইয়ুরোপের শাসন শুরু হয়েছে বলা যায়। ইংরাজী কাব্য ও সাহিত্যরসের প্রভাব সে সময়ের বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাদের চিত্তে কিরূপভাবে পরিবেশন করা হোত তা সঠিক জানা যায় না, তবে সাহেবিয়ানার প্রবেশ লক্ষ্য করে কবি খাঁটি বাংলাভাষায় বাংলা ভঙ্গীতে বলেছেন :—

যত কালের যুবো, যেন সুবো
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে॥

বিশেষতঃ কাব্যরস প্রচারের জন্য ইঙ্গবঙ্গ মিশ্রিত একপ্রকার ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিলো এবং এই সকল রচনা সম্পূর্ণ প্রাচীন ধরণের ছিল না, অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছিলো।

হরিয়া লইবে শশী করিয়া ফাইট (Fight)
মনে এই ভাবিয়াছে হইলে নাইট (Night)
কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের রাইট (Right)
চলেছে নতুন কাল জ্বেলেছে লাইট (Light)

এই বিরাট পরিবর্ত্তনশীল রচনার মধ্য দিয়ে যিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাংলাদেশের কবি, এইজন্যই তিনি চিরস্মরণীয়। তার সাহিত্যজীবন আলোচনা করলে আমরা বাংলাদেশের সাহিত্যের মূলসূত্র খুঁজে পাই।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্ব নানা দিক থেকে অতুলনীয়। প্রায় ২০ বৎসর তিনি বাঙ্গালীর প্রিয় কবির মর্য্যাদা পেয়েছেন। আধুনিক গীতিকাব্য তখনও দেখা দেয় নাই, তা সত্ত্বেও কাব্যের মাধ্যমে ব্যঙ্গবিদ্রূপে, উপদেশদানে, বাস্তবদৃষ্ট ঘটনা ও লোকচরিত্র বর্ণনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

ঈশ্বর গুপ্ত স্বাধীনজীবী ছিলেন। সাহিত্যচর্চ্চাছাড়া আর কোন পেশা ছিলো না। স্বীয় প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্খার গুণে জনসমাজে

প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। সাহিত্য সাধনা ছাড়াও তিনি ছিলেন অনেকগুণে গুণী। সমাজসংস্কার ব্যাপারে তিনি গোঁড়া মত পোষণ করতেন। তার রচনার বহুস্থানে অশ্লীলভাষা সত্ত্বেও তার মধ্যে সুস্পষ্ট মানবপ্রেম ও নিজ বাংলাভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগ ও অকৃত্রিম ভক্তি ছিল। কাব্যে পরিহাস পরিবেশনের জন্য তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি বলে গণ্য হয়েছেন। প্রাচীন ও মধ্য যুগে যে খাঁটি বাঙ্গালীভাব বাংলা কবিতার সর্বাঙ্গে জড়িত ছিল ঈশ্বরগুপ্ত তার শেষ প্রতিনিধি। তিনি সেকালের শেষ ও একালের সূচক।

ঈশ্বরগুপ্ত ১৮২২ সালের ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার কাঁচরাপাড়ায় (অধুনা কল্যাণীতে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিনারায়ণ ও মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। ঈশ্বরগুপ্ত বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া করেন, কিন্তু খেলাধূলায় ও মুখে মুখে পদ্য রচনায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। ১৭।১৮ বছর বয়সে দেড় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অনেকখানি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেশচন্দ্র একজন স্বভাবকবি ছিলেন। কৈশোরে ঈশ্বরগুপ্ত তার সাথে কবিতার লড়াই করতেন।

দশবছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয় এবং পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় বিরক্ত হয়ে তিনি কলিকাতায় মামার বাড়ীতে আসেন। সে সময়ে তাকে খুব মশার উপদ্রব সহ্য করতে হোত বলে স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় তিনি লিখলেন—

রেতে মশা দিনে মাছি
এই তাড়িয়ে কলকাতায় আছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সমাগত সুধীগণ

পনের বছর বয়সে গুপ্তিপাড়ায় গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সাথে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, কিন্তু যে কারণেই হোক তিনি বিবাহের পর হতে তার সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এবং এই সূত্রে তিনি আজীবন নারীবিদ্বেষী ভাব পোষণ করতেন।

মাতুলালয়ে থাকাকালীন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশের যোগীন ঠাকুরের সহিত খুব বন্ধুত্ব হয় এবং শোনা যায় তাঁর সাহচর্যে যোগীঠাকুরের কবিত্বশক্তি জন্মেছিল! দৃঢ় বন্ধুত্বের ফলে ১২৩৭ সালে ১৬ই মাঘ (জানুয়ারী ১৮৩১) ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় ও যোগীন্দ্রঠাকুরের অর্থানুকূল্যে 'সংবাদপ্রভাকর' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন অল্পদিনের মধ্যে সংবাদপ্রভাকর খুবই জনসমাদর লাভ করেছিলো। সংবাদ প্রভাকরই বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র। দেড় বছর পর হঠাৎ যোগীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হওয়ায় ১৮৩২ সালে ২৫শে মে সংবাদপ্রভাকর বন্ধ হয়ে যায়! কিন্তু তাঁর রচনাশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে আন্দুলের জমিদার মহাশয় 'সংবাদ রত্নাবলি' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার ভার তার হাতে দেন। এর কিছুদিন পর ঈশ্বরগুপ্ত তীর্থভ্রমণে যান এবং ফিরে এসে কানাইঠাকুরের সাহায্যে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রতি দুইদিন অন্তর প্রকাশ করতে থাকেন।

১৮৫৩ সাল থেকে ঈশ্বরগুপ্ত প্রতিমাসে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন—এতে গদ্য, পদ্য, নানা বিষয়ের প্রবন্ধ স্থান পেত; এই কাগজেই তিনি প্রাচীন কবিওয়ালা ও আখড়াইদের জীবনী ও গীতি প্রকাশ করেন।

এর কিছুদিন পর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশাই বিধবাদের পুনঃবিবাহের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন—কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাকে ব্যঙ্গ করে নানা কবিতা লিখে বিরুদ্ধমতাবলম্বী পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করেন—

বিদ্যাসাগর নাহি তথা।	কে কবে বিয়ের কথা॥
বিয়ে হলে বেঁচে যেত।	সাধপুরে খেতে পেত॥
গহনা উঠিত গায়।	এড়াতো সকল দায়॥

এরপর ১২৫৩ সালে তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সাথে গৌরিশংকর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত রসরাজ পত্রিকার কবিতার লড়াই হয় এবং মাস দুই পরে দুখানি পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়। এতেও না দমে ১২৫৪ সালে ঈশ্বরগুপ্ত সাধুরঞ্জন নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদক হন, সম্পাদকীয় কাজ ছাড়াও তিনি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সভাসমিতিতে (যথা প্রকাশরঞ্জনী ও বঙ্গভাষারঞ্জনী সভা) বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করে

জনসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করতেন। এখানে কয়েকটি কবিতার উদাহরণ দেওয়া গেল।

উড়ন্ত ফানুস দেখে কবি আটপৌরে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :—

কেহ বলে দেখা যাবে এইখানে রই।
কেহ বলে এতক্ষণে হোল চাঁদ সই॥
হেলে দুলে নেচে নেচে চলে থরে থরে।
মহাবেগে উঠিয়াছে মেঘের উপরে॥
উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু কানন।
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্ল মানস॥
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়।
যত ওঠে তত মনে সুখের উদয়॥

নিদারুণ গ্রীষ্মের কষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :—

দিশিপাতি নেড়ে যারা তাতে পুড়ে হয় সারা
মলাম মলাম মামু কয়।
হাঁড়ি বাড়ী খেনু ব্যাল প্যাটেতে মাখিনু তেল
রাতি তবু নিদ নাহি হয়॥

ঈশ্বরগুপ্তের নানাবিধ রচনা থেকে দেখা যায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তব-পক্ষপাতী কবি। মানুষের হৃদয়ের সকল সময়ের সকলভাবের অবস্থাকে তিনি রূপদান করতেন কাব্যে. সব সময় তাতে শুদ্ধতা বা সৌন্দর্য্য হয়তো থাকতো না, তবু এ সকল দোষ সত্ত্বেও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তার নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে—তার হৃদয়বত্তা, চরিত্রমাধুর্য্য এবং দেশপ্রেমের জন্য। সত্যিই তার কীর্ত্তির চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক বেশী মহৎ। গুপ্ত কবির দেশবাৎসল্য কিরূপ তীব্র ও বিশুদ্ধ ছিল তা সামান্য কয়েকছত্রের মাধ্যমে বুঝতে পারি।

ভ্রাতৃভাবভাবি মনে দেখদেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

ঈশ্বরগুপ্তের মহত্ত্বের কীর্ত্তির প্রমাণ তার ধর্ম্মমতের উদারতা ও আন্তরিক অভিব্যক্তি। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও তত্ত্ববোধিনীসভার সভ্য হয়েছিলেন। তিনি মহাকালীর স্তব রচনা করেছিলেন—

শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয় কতজনে কত কয়
কিছু নয় সে সব বিচার।
জননী জনমভূমি ঈশের ঈশ্বর তুমি
একবস্তু সকলের সার॥

দৈনিক পত্রিকার কাজ কিছু কিছু অন্যের ওপর দিয়ে তিনি মাসিক পত্রিকার ওপর বেশী নজর দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবোধ প্রভাকর' "হিত-প্রভাকর" ও 'বোধেন্দু বিকাশ' নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশ্বরগুপ্ত প্রতি বৎসর ৺দুর্গাপুজার পর দেশ ভ্রমণে বের হতেন এবং এই ভ্রমণকালে দেশের সকল মান্যগণ্য নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে সাহিত্য আলোচনা করতেন। এইভাবে সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেও রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রামমোহন, রামনিধি গুপ্ত, হরু ঠাকুর, নিত্য বৈরাগী এবং অন্যান্য কবিদের জীবনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। তিনিই বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করেন (১২৫৭ সন—ইং ১৮৫১ সালে)।

অত্যধিক পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করেন। মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ কর পরই বিকার-রোগে ১২৬৫ (১৮৫৯ ইং) ১০ই মাঘ ধরাধাম ত্যাগ করেন।

গুপ্ত কবির সাহিত্য প্রতিভার চেয়ে কাব্যপ্রতিভা প্রখর ছিল। তাঁর সাহিত্য অনুরাগে অনুরাগী যে কয়জন সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

'তাঁহার বাংলাভাষা সাহিত্যে অতুলনীয়। তিনি যে ভাষায় পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি ভাষায় বাঙালীর প্রাণের কথা কেহ পদ্যে বা গদ্যে লেখে নাই, তাহাতে সংস্কৃত বা ইংরাজীর বিকার নাই, সোজাপথে পাঠকের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাংলা ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন আর কেহ লিখিবে এইরূপ সম্ভাবনা নাই।"

বাংলার দুইজন বৈষ্ণসাধক ও কবি—দুইজনই আমাদের অতি প্রিয়। একজন রামপ্রসাদ সেন ও অন্যজন ঈশ্বরগুপ্ত। রামপ্রসাদ মাতৃভাবে ও ঈশ্বরগুপ্ত পিতৃভাবে ঈশ্বরকে আরাধনা করেছিলেন।

তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল ও দীনবন্ধুমিত্রের গুরু। ইংরাজী সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়েও এই সকল যুবকেরা ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শে সাহিত্য সেবা শুরু করেন, গুপ্তকবির এ এক অলোকসামান্য প্রভাব। তিনি প্রভাকর পত্রিকায় নানাপ্রকার দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করে বাংলায় যে সুপ্রভাত সঞ্জীবন করেন, তাঁর প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট। বঙ্গসাহিত্যের তিনি এক যুগান্তকারী কবি, তার রচনায় বিষয়-বস্তু নিত্য নতুন ও সময়োপযোগী ছিল। তাই সব কবিতায় শিরোনামা অদ্ভুত ধরণের হোত—যেমন "সব হ্যায় ক্যাঁক" খল নিন্দুক. নির্গুণ ঈশ্বর, নীলকর, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি।

সুখে দুঃখে আনন্দে উৎসবে আজও আমরা গুপ্ত কবির ব্যঙ্গ রচনার দুচার লাইন আবৃত্তি করে নানা কৌতুক উপভোগ করি। বর্ত্তমানে ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হলেও গুপ্ত কবির মত কেউ সরলপ্রাণ ও বাস্তববাদী রচয়িতা নন। তাই সাহিত্যসেবী বাংলাদেশ, সামান্য পল্লীবাসী কবির সাহিত্যও কাব্য প্রতিভায় আলোকিত হয়ে রয়েছে।

শিল্প ও ভারতের অর্থ-নৈতিক কাঠামো

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

আমরা যদি ইংরেজ-শাসিত ভারতের অবস্থার সাথে স্বাধীন ভারতের অবস্থা তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব, ইংরেজরা যে উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মসূচী নিয়ে ভারতের শিল্পগুলোকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মসূচীর সাথে স্বাধীন ভারতের উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মসূচীর কোন মিল নেই। পরাধীন ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা সরকারের উদাসীন মনোভাবের সুযোগ নিয়ে কিভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছেন সে সম্বন্ধে নূতন করে কিছু বলার নেই। এঁদের অত্যাচারে শ্রমিকদের জীবন জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছিল। তাই দেখি, ভারত স্বাধীন হবার পরে জাতীয় সরকার বৃটিশ সদাগরগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছেন। জাতীয় সরকারের চেষ্টার ফলে শ্রমিকদের অবস্থার ও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে অর্জ্জিত মুনাফার যেটুকু অংশ এদের ন্যায্য পাওনা সেটুকু এরা আজও সর্ব্বক্ষেত্রে পাচ্ছে না। কাজেই সরকারের পক্ষে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে অধিকতর উদার নীতি অবলম্বন করা দরকার। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের উপর ইংরেজ প্রভুত্ব বিদ্যমান ছিল ততদিন পর্য্যন্ত শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা কখনও উন্নত ছিল না। কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজন মিটে গেলেই ইংরেজ ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট থাকতেন। এদেশের লোকের দুঃখ দূর করার জন্য এরা চেষ্টা করতেন না। তাই দেখা গিয়েছে, দেশের জনসাধারণের বেশীর ভাগের জীবন দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত ছিল। অভাব-অনটনের হাত থেকে এঁরা রেহাই পাননি। অবশ্য মাত্র কিছু সংখ্যক লোকের হয়ত আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল। তবে এঁদের আর্থিক স্বাচ্ছল্যও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকার এবং সদাগরদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত এবং যেখানে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না সেখানে কোন অনুগ্রহ দেখান হত না। অবশ্য আজ স্বাধীন ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রভাব অনেক কমে গেছে। এখনও পর্য্যন্ত এঁদের যেটুকু প্রভুত্ব দেখা যাচ্ছে সেটুকু মাত্র কয়েকটা শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ জ্বালানী তৈল শোধন কিম্বা চা বাগানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হল, যে সব কৃষক কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং যে সব শ্রমিক কারখানার কাজে নিযুক্ত—তারা বর্ত্তমান ভারতের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় স্বদেশী সওদাগরদের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে কিনা, কিম্বা বিদেশী সওদাগরদের মত স্বদেশী সওদাগরদেরও এই ব্যাপারে উদাসীন মনোভাব অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে কিনা। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, সর্ব্বক্ষেত্রে আজও ভারতীয় চাষী এবং শ্রমিক ন্যায্য পাওনা লাভ করতে সমর্থ হয়নি। ভারতীয় বে-সরকারী পরিচালকরা এই মর্ম্মে অভিযোগ করে থাকেন যে, যোগ্যতা এবং উৎপাদনক্ষমতার দিক থেকে ভারতীয় শ্রমিকরা পশ্চিমী শ্রমিকদের সমকক্ষ নয়। অথচ তাঁরা স্বীকার করতে চান না, ভারতীয় শ্রমিকের দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতাই এজন্য মুখ্যতঃ দায়ী। আজ যদি পশ্চিমী শ্রমিকদের মত ভারতীয় শ্রমিকরা শিক্ষিত হতে পারে, যদি এমন পারিশ্রমিক পাওয়া যায় যার সাহায্যে ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে সংসার খরচ চালান সহজ হবে এবং যদি এমন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় যার ফলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারতীয় শ্রমিকদের উদ্বেগের কারণ থাকবে না—তাহলে ভারতীয় শ্রমিকদের কর্ম্মপটুতা অনেকখানি বেড়ে যাবে এবং পশ্চিমী শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতার চাইতে এদের উৎপাদন ক্ষমতা কম হবে না।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেভাবে শিল্পের প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এই প্রসারের উদ্দেশ্যে যেভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে তা'তে একটি নূতন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। এর আগের পরিকল্পনা অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের প্রত্যেক ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি। সে পরিকল্পনায় কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ এবং কৃষির উপর সব চাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচয়িতারা স্বীকার না করে পারলেন না, দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। সে জিনিষটি হ'ল এই যে, প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার উপর পরিকল্পনার রচয়িতারা যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভোগ্যপণ্যের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। এছাড়া মূলধনী সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তার উপর যেভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজনীয়তার উপর রচয়িতারা সেভাবেও জোর দিতে চাননি। আরো দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রের হাতে যতটা দায়িত্ব ন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে সরকারী মহলের উপর ততটা দায়িত্ব চাপান হয় নি। তাছাড়া বে-সরকারী মহলের ক্ষেত্রে আবার বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলোর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পরিকল্পনার রচয়িতারা দ্বিধা করেছেন। এঁরা সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান কিম্বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের শিল্প সম্বন্ধীয় সংস্থাগুলোর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে চেয়েছেন। তাই মনে হচ্ছে, গোটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে একটা পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন ও যথেষ্ট রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের দেশের শিল্পের ক্ষেত্রে সংগঠন সম্বন্ধীয় অনেক দোষত্রুটি আছে। কাজেই এইসব

দোষত্রুটি যদি দূর করতে হয় তাহলে শিল্প সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করা ছাড়া উপায় নেই।

স্মরণ থাকতে পারে, জাতীয় সরকারের হাতে দেশ শাসনের দায়িত্ব এসেছিল বিগত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। এর পর থেকে সরকার যে সব বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন সে সব বিষয়ের মধ্যে শিল্প হল অন্যতম। বিগত ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে শিল্প সম্বন্ধে জাতীয় সরকার কর্তৃক একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ঘোষণার ভিতর দিয়ে সরকার দেশের জনসাধারণকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে তাঁর শিল্পনীতির সাথে পরিচিত করলেন। নীতিটির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কেবলমাত্র সরকারী প্রয়াসের উপর জোর দেওয়া হয়নি। যে সব প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে বে-সরকারী, কিম্বা আধা-সরকারী সে সব প্রয়াসের গুরুত্বও স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র যা'তে প্রসারিত হতে পারে সেজন্য সরকারী প্রয়াস ছাড়াও অন্যান্য ধরণের প্রয়াসের সুযোগ গ্রহণ করতে জাতীয় সরকার রাজী। মোট কথা হল এই যে, সরকারী নীতিতে মিশ্র অর্থনীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে আর্থিক লেনদেনের কাঠামো তৈরী করবার জন্য সরকার সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশের জনসাধারণের চাহিদা বিভিন্ন ধরণের। অর্থাৎ এটা বহুমুখী। কাজেই এই চাহিদা মেটাতে হলে শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার দরকার। তাছাড়া একথা অনস্বীকার্য্য যে, এই বিরাট দেশে শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের প্রচুর সুযোগ আছে। অবশ্য জাতীয় সরকার কর্তৃক বিগত ১৯৪৮ সালে প্রচারিত শিল্পনীতিতে বৃহৎ এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্প সম্বন্ধে এমন নির্দ্দেশ ছিল—যার ফলে এককভাবে বে-সরকারী তরফের পক্ষে শিল্পের প্রসারের জন্য নূতন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করা অসম্ভব ছিল। তবে এই ধরণের শিল্পের সংখ্যা বেশী ছিল না। শুধু তাই নয়। দেশের মধ্যে এমন অনেক শিল্প ছিল যেগুলোর প্রসারের জন্য বে-সরকারী মহল এককভাবে চেষ্টা করতে পারতেন। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বে-সরকারী মহল তেমন উৎসাহ দেখাননি। এর প্রধান কারণ হল এই যে, লগ্নী করার মত প্রয়োজনীয় মূলধন বে-সরকারী পরিচালকদের ছিলনা। কিন্তু প্রশ্ন হল, বৃহৎ এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের ব্যাপারে বে-সরকারী তরফের পক্ষে নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল কিনা। দো-তরফাভাবে সরকার এবং বে-সরকারী পরিচালকরা নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারতেন, যদিও এককভাবে বে-সরকারী পরিচালকদের কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অধিকার ছিলনা। অবশ্য সরকার যা'তে এককভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন সেজন্য উল্লিখিত শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মোট কথা হল এই—যদিও বিগত ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে জাতীয় সরকার মিশ্র অর্থনীতির উপর জোর দিয়ে যে *শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিলেন সে নীতির ফলে শিল্প এবং ব্যবসা-*বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে সন্দেহ নেই, তবুও একথা বোধহয় বিনা প্রতিবাদে বলা যেতে পারে, সে প্রসার মোটেই আশানুরূপ নয় এবং দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এটা খুব সামান্য।

ভারতীয় শিল্পের অতীত ইতিহাস যাঁরা অধ্যয়ন করবেন তাঁরা দেখতে পাবেন, উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকরা যে বৈষম্যমূলক মনোভাব অবলম্বন করে আসছিলেন সেটা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। প্রধানতঃ এর পিছনে দুটো কারণ ছিল। প্রথম কারণ হল এই যে, তখন ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষ দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজ শাসকরা আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর চাপ এড়াতে পাচ্ছিলেন না। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছরের মধ্যে কাগজ, চিনি, কাপড়, ইস্পাত ইত্যাদি কয়েকটা বৃহৎ শিল্পকে সংরক্ষণ-শুল্কের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা হল। ফলে শিল্পগুলো সংরক্ষণশুল্কজনিত সুবিধা উপভোগ করতে লাগল। এখানে বলে রাখা দরকার, সে সময়ে কাগজ এবং শর্করা শিল্পে ইংরেজদের যতটা কায়েমী স্বার্থ ছিল, বস্ত্র কিংবা ইস্পাত শিল্পে ততটা স্বার্থ ছিলনা। কিন্তু যখন কাগজ এবং শর্করা শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা হল তখন এই দুটো শিল্পে ধীরে ধীরে বহু ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল। আসল কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে ইংরেজ শাসকরা শিল্প সংগঠিত করতে গিয়ে সর্ব্বদা একই ধরণের নীতি গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে এঁদের নীতি পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন প্রয়োজন মেটাবার জন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভারতে শিল্প স্থাপন করতে অতটা আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন? ভারতে তখন প্রচুর কাঁচামাল ছিল এবং খুব কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভারতীয় মজুরদের কাজে লাগান যেত। কাজেই ইংরেজ ব্যবসায়ীদের পক্ষে খুব কম খরচে মাল তৈরী করা অসুবিধাজনক ছিলনা। অথচ তখন অন্যান্য দেশে মাল তৈরী করতে বেশী খরচ পড়ত। এই সব দেশে তৈরী মালের সাথে প্রতিযোগিতায় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা অনায়াসে চড়াদরে ভারতে তৈরী মাল বিক্রী করে প্রচুর মুনাফা অর্জ্জন করতে পারতেন।

কেন বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ইংরেজরা তাঁদের অনুসৃত নীতি পরিবর্ত্তন করতে চাইলেন সেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছিল তখন থেকে অনেকগুলো শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল। এই ঝোঁক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য সবগুলো শিল্প সরাসরিভাবে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা পায়নি। কোন কোন শিল্প পরোক্ষ সুবিধা পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, যে কারণে ইংরেজ শাসকরা সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেছিলেন সে কারণে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার এই ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন কিনা। ইংরেজদের মনোভাব যাই থাকুক না কেন, জাতীয় সরকারের মনোভাব খুব সুস্পষ্ট। জাতীয় সরকার পরীক্ষা করে দেখেছেন, ভারতে এমন অনেক শিল্প আছে যেগুলো জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো গড়ে তোলার

প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অথচ সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় এগুলো গড়ে তোলা যাচ্ছে না। তাই সরকার সংরক্ষণ-শুল্ক ব্যবস্থার মারফৎ এগুলোকে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য দিতে চেয়েছেন। দেখা গিয়েছে, প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অনুযায়ী কোন শিল্পকে সরাসরি সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যে সরকার সংরক্ষণ শুল্ক বসিয়েছেন। অন্যদিকে আবার কতকগুলো শিল্পকে সরকার পরোক্ষ সাহায্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী জাতীয় সরকার প্রধানতঃ দুটো ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমতঃ সরকার আমদানী-শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আমদানীর পরিমাণ সঙ্কুচিত করা হয়েছে। তবে বর্তমানে ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা যে স্তরে এসে পৌঁচেছে সে স্তরে শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের সবটা দেশের অভ্যন্তরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই যদি শিল্পের প্রসার অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে বাইরে থেকে সাহায্য এবং ঋণ সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। তাছাড়া ফালতু নোট ছড়িয়ে মূলধনের অভাব দূরীভূত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এইভাবে সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে ভারতের পক্ষে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয় কিনা। আজও যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার ব্যাপারে ভারত বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর উপর নির্ভরশীল। অথচ সরবরাহকারী বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর কারখানায় যা উৎপন্ন হচ্ছে তার বেশীর ভাগ অংশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ক্রয় করে নিচ্ছেন। ফলে ভারতকে যা সরবরাহ করা হচ্ছে সেটা ভারতের বিরাট চাহিদার তুলনায় খুবই সামান্য। যেহেতু ভারত সরবরাহকারী বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে নিয়মিতভাবে ক্রয় করবেন না—সেহেতু যে সব রাষ্ট্র নিয়মিত ক্রেতা, সে সব রাষ্ট্রের চাহিদাকে সরবরাহকারী রাষ্ট্রগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বাহির থেকে ভারত যে সব যন্ত্রপাতি আমদানী করবেন সে সব যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ করার জন্য ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে। তাই ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার ক্ষমতা কতটুকু সেটাও এক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

পরিবেশের মূল্য

শ্রীকালিদাস রায়

ব্রহ্মপুত্র বক্ষে আমি চলিয়াছি আরোহি তরণী,
সন্ধ্যাকাল। ঘন ঘন শুনি শঙ্খধ্বনি,
নীলাকাশে অকস্মাৎ জাগে কোটি তারা
বায়ুবয় ঝিরি ঝিরি ধূলিধূম হারা।
কূলে কূলে ভরা নদ কলকল ছল ছল জলে
নৌকাখানি দাঁড় বেয়ে চলে।

দূর গ্রামখানি হ'তে শুনিতে পেলাম তারপর
দেবের মন্দিরে বাজে কাঁসর ঝাঁঝর।
আরতির পরে
হরিকীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিল অম্বরে।
দূর হ'তে পশিল শ্রবণে
ভুলি নাই সেই সন্ধ্যা আজো আছে মনে।

সারাটি গ্রামের সেই হৃদয়ের ধ্বনি আবেদন
কী মধুরই লেগেছিল! স্মৃতি তার শুচি করে মন।

তখন তরুণ আমি—আজ আমি জরায় দুর্ব্বল,
শিরে কেশ হয়েছে ধবল।
আজিকে নিকটে চলে নগরের উদ্দণ্ড কীর্ত্তন
বাধ্য হয়ে করি তা শ্রবণ।
এমনি পাষণ্ড আমি তাহাতে হয়না ভাবাবেশ,
জনমে না প্রাণে ভক্তিলেশ।
এ শ্রবণ জুড়াবার ঠাঁই দূরে খুঁজি,
দূরত্বের মূল্য আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি।
হায় আমি আজো রোমান্টিক,
হইতে পারিনি আজো আধ্যাত্মিক অথবা সাত্ত্বিক।

আশ্রয়

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

সোনাডাঙা রেল স্টেশনের পথ ধ'রে হন হন ক'রে হেঁটে চলেছে কানাই সরকার। মন তার ভারাক্রান্ত। এত বড় অপমান জীবনে আর কখনও হয় নি। বলাই তাকে রেলের কুলি বলেছে। বৌমাকে বলেছে—তুমি যদি রেলের কুলিকে ভাত দাও তো তোমার হেঁশেলে আমি খাব না।

কানাই ও বলাই যমজ ভাই। কানাই বলাইয়ের চেয়ে দশ মিনিটের বড়। তাদের চেহারায় কোন মিল নেই। কানাই বেঁটে, বলাই লম্বা। কানাই ময়লা, বলাই ফরশা। কানাইয়ের মাথায় কাঁচা পাকা চুল, বলাইয়ের মাথায় চকচকে টাক। তফাত শুধু আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতেও। কানাই শান্ত, মিষ্টভাষী, উদার; বলাই রগচটা, মুখ আলগা, প্যাঁচোয়া। এর কারণও আছে। কানাই রেলে চাকরি করেছে, দেশ বিদেশ ঘুরেছে, বৃহত্তর সমাজে মিশেছে। বলাই চিরকাল গ্রামে বাস করেছে, জমি জমা নিয়ে বিবাদ বাধিয়েছে, সামাজিক ব্যাপারে ঘোঁট পাকিয়েছে। দুভাইয়ের কথা-বার্তায় সম্বন্ধ বোঝা যায় না—একজন আর একজনকে 'বাবু' ব'লে সম্বোধন করে। তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি লেগেই থাকে কিন্তু ব্যাপারটা কোন দিনই এতদূর গড়ায়নি। আজ সামান্য জিনিস থেকে ঝগড়াটা চরমে দাঁড়িয়েছে। বলাই রাগের মাথায় কানাইকে মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছে।

পথ চলতে চলতে কানাই ভাবে সে আর বাড়ি ফিরবে না, যেমন ক'রে হোক অন্য কোথাও শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবে। বুড়ো বয়সে প্রিয়জনের লাঞ্ছনা সহ্য হয় না। মায়ের পেটের ভাই হয়ে কেউ এমন কথা বলতে পারে! রেলের কুলি সে কোনদিনই ছিলনা, ছিল পি, ডবলিউ, আই, অফিসের বিল ক্লার্ক। কুলিগিরি আর কুলিদের মজুরির হিসাব করা কি এক কাজ? তার বাসাতে কাজ করেছে চার পাঁচটা কুলি—কেউ জল তুলেছে, কেউ বাসন মেজেছে কেউ বাজার করেছে, কেউ তেল মাখিয়ে দিয়েছে। বলাইবাবুই বা কি এমন হোমরা চোমরা লোক? সে তবু হাইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস অবধি প'ড়েছিল, বলাইবাবুর বিদ্যের দৌড় তো উচ্চ প্রাইমারী পর্যন্ত। জমিদারদের মোসাহেবি ক'রে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর হয়েছে, বিচারের ক্ষমতা পেয়েছে। মেঠো হাকিম হওয়াতেই এত মাথা গরম। ছি ছি, যেমন গাঁয়ের ভোটদাতারা, তেমনি তাদের প্রতিনিধি। এ গাঁয়ে কি ভদ্রলোকের পোষায়?

চৌমোর বিলে জল নেই, জায়গায় জায়গায় কাদা। জুতো হাতে ক'রে কাদার মধ্যে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কানাই। কাছেই বনপলাশি গ্রাম। এমন স্নিগ্ধশ্রী গ্রাম কমই দেখা যায় এ অঞ্চলে। একদিকে সারি সারি অড়রের খেত, তিন দিক সরষের হলদে। পথের ধারে একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে কানাই। অদূরে বটতলার ছায়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বন ভোজনে ব্যস্ত। একটা আতা গাছে চঞ্চল ফিঙের দল এ ডাল থেকে ও ডালে লাফালাফি করছে। শীতের উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। পল্লী পরিবেশ অপ্রতিম পবিত্রতায় ভরা। আজ যেন আকাশের সংগে পৃথিবীর বিয়ে। মুহূর্তে কানাইয়ের শরীরের শ্রান্তি ও অন্তরের গ্লানি দূর হয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে যৌবনের সেই শুভ দিনটি। তখন বাবা মা বেঁচে ছিলেন, বলাইবাবুও ছিল অন্য মানুষ। সে সব যেন স্বপ্ন রাজ্যের ঘটনা, অস্পষ্ট, অবাস্তব। মনের আকাশ বিস্মৃতির কুয়াশায় মলিন।

কানাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। চৌষট্টি বছর বয়সে

বলাইবাবুর ব্যবহার তাকে ঘর ছাড়া করেছে। পকেটে মাত্র তিরিশটি টাকা। তাই নিয়ে যা হোক একটা উপায় করতেই হবে। মনে পড়ে কর্ম জীবনের কথা। লালগোলায় থাকতে তার যেমন ছিল রোজগার, তেমনি ছিল প্রতিপত্তি। দুহাতে খরচ করেছে, বন্ধুবান্ধবদের খাইয়েছে, দেশে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছে। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। বাবার সম্বল তের টাকা পেনশন। সাহায্য না করলে কি চলে? একে একে বাবা-মা স্বর্গে গেলেন। তারপর অকালে সংসারের মায়া কাটালেন স্ত্রী। ইশ কী নিঃসংগ জীবন! সারাদিন রাশি রাশি বিল তৈরি ক'রে সন্ধ্যায় শূন্য ঘরে ফিরে আসা। সস্তায় পুরোনো বই কিনে রীতিমতো পড়াশুনা আরম্ভ করে সে। মাসে মাসে বেশী ক'রে টাকা পাঠায় বলাইবাবুকে। বলাইবাবুর আয় নেই, অথচ ছেলেমেয়ে অনেকগুলো। বিপত্নীক নিঃসন্তান সে—কতটুকুই বা তার প্রয়োজন? অবসর গ্রহণের পর সে বলাইবাবুর কাছেই থাকে। গ্র্যাচুয়িটির টাকা খানিকটা খরচ হয়েছে কাঁঠাল বেড়ের বিধবা বোনের জন্য, কিন্তু বেশীর ভাগ ব্যয় হয়েছে বলাইবাবুর সংসারে। তার দৌলতেই আজ বলাইবাবুর পাকা বাড়ি, আসবাবপত্র, গরু বাছুর। এই তার প্রতিদান! বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে কানাইয়ের হৃদয়। সে নিজেকে শুনিয়েই বলে—না, ও বাড়িতে আর পা দিচ্ছিনে, না খেয়ে মরি সেও ভালো।

হঠাৎ মনে পড়ে হরদয়ালবাবুর ছেলে শ্যামলালের কথা। সে এখন কাঁচড়াপাড়ার পি, ডবলিউ, আই। চমৎকার ছেলে—অল্পবয়সে বেশ উন্নতি করেছে। ভগবানগোলার ট্রলি দুর্ঘটনায় হরদয়ালবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর পর শ্যামলাল একবছর তার বাসায় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ছিল। সে কথা সে ভোলেনি। খুব শ্রদ্ধা করে তাকে। গত বছর ছোট ভাইয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিল। ঠিক হয়েছে। তার কাছে যাওয়া যাক। একটা সুরাহা হবেই।

জোরে হাঁটতে শুরু করে কানাই। চারটের ট্রেন ধরা চাই। এক জায়গায় কুঁচের ঝাড় রাস্তা আলো ক'রে রেখেছে। শৈশবের স্মৃতি জাগে কানাইয়ের। পবন পণ্ডিতের পাঠশালায় যে সব মেয়ে পড়ত তার সংগে, তারা কুঁচের মালা পরত গলায়। পাড়াগাঁয়ের সেই পছন্দসই অলংকার বিক্রি করত বোষ্টম পাড়ার বামি। বর্তমানের হালচাল আলাদা। চিত্রতারকারা যদি কুঁচের মালা পরা আরম্ভ করে তাহলে পুরনো যুগ ফিরে আসতে পারে।

সোনাডাঙা গ্রাম। রোদ রাঙা হয়ে ওঠে আমবাগানের মাথায়। জমিদারবাবুদের সাবেক আমলের বাড়ির দোতলার জানলার ঝিলমিলিতে যেন হীরে মাণিক ঝিকমিক করে। মাঠ থেকে ঘরে ফেরে ভেড়ার পাল, কুকুর-শোঁকা ও শেয়াল-কাঁটার ঝোপ এড়িয়ে। বাচ্চা শুয়োর ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় কানাই। নিষ্পলক নয়নে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। কী করুণ সুর তাদের কণ্ঠে! কী অসহায় ভাব তাদের দৃষ্টিতে! বৃদ্ধের অপত্য স্নেহের রুদ্ধ দ্বারে কোথায় যেন কোমল আঘাত লাগে। স্টেশনে এসে কানাই দেখে ট্রেনের পাখা পড়েছে। তাড়াতাড়ি কাঁচড়াপাড়ার টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মের ওপর গাঁদা গাছের ধারে কণ্টেনারটা রেখে বসে পড়ে। ছোট স্টেশন, যাত্রীর ভিড় নেই। একমিনিটের 'স্টপেজ' হলেও গাড়িতে উঠতে কষ্ট হয় না।

থার্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্টে কোনের দিকে জায়গা ক'রে নেয় কানাই। আলোয়ান বার ক'রে গায়ে জড়ায়। কামরাসুদ্ধ লোক কল্যাণী কংগ্রেসের আলোচনায় মশগুল। ১৯১১ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন এলাহী কাণ্ড ঘটেছিল, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন ঔৎসুক্য জাগেনি। কানাইয়ের তাই ধারণা হয়। তবে বেশীক্ষণ এ নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মেজাজ তার নেই। তার নগণ্য জীবনের ইতিহাসের মধ্যেই সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ভাবে —শেয়ালদা লালগোলা লাইন তার 'হোম' লাইন। এই লাইনে তাকে কখনও টিকিট কাটতে হয় নি। বরাবরই পি. টি. ও. তে যাতায়াত করেছে। তাও কোন সময়ে দেখতে চায়নি। সকলের সংগেই তো জানাশোনা। কয়েক বছর ঈশ্বরদি-সিরাজগঞ্জ লাইনে ছিল। বাকী চাকরি জীবনটা কেটেছে কাঁচড়াপাড়া, রাণাঘাট আর লালগোলাতে। কোথায় গেল সে সব দিন! কাজ ফুরুলে খাতিরও চলে যায়। চাকরির নিয়মই এই। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে কানাই। কখন রাণাঘাট

এয়েছে জানতে পারেনি। যখন 'চেকার' এসে ধাক্কা দিয়ে বলে—'টিকিট কই মশাই?'—তখন সে চোখের জল রাখতে পারে না।

রাত্রি সাড়ে সাতটায় কাঁচড়াপাড়ায় নেমে কানাই সরাসরি হাজির হয় পি. ডবলিউ. আই-এর কোয়াটারে। শ্যামলাল ছেলে-মেয়েদের সংগে বাইরের বারান্দায় বসে গল্প করছে। বিস্মিত হয়ে বলে—আরে, জ্যাঠামশাই এতকাল পরে। আসুন, আসুন। রামুর বিয়েতে আসেননি, ভেবেছিলাম আপনার শরীর খারাপ হয়ে থাকবে। কল্যাণী দেখবেন বুঝি?

কানাই অপ্রস্তুত হয়ে যায়—'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলতে পারে না। শ্যামলাল তার পায়ের ধুলো নিয়ে হাসতে হাসতে বলে—দেখবেন বই কি। দেখবার মতো জিনিসই তো। বিরাট ব্যাপার। সত্যি জ্যাঠামশাই, কল্যাণী পল্লী বাংলার বুকে আধুনিক বিজ্ঞানের বিজয় বৈজয়ন্তী। আপনি আগে এসে ভালোই করেছেন—আস্তে আস্তে দেখবেন।

শ্যামলাল ছেলেমেয়েদের বলে—দাদুকে প্রণাম কর, মা'কে ডেকে আন।

নিমু, বিমু, বেণু, রেণু একে একে কানাইকে প্রণাম ক'রে বাড়ির মধ্যে চলে যায়। একটু পরেই শ্যামলালের স্ত্রী এসে কানাইকে প্রণাম করে। কানাই অভিভূত হয়ে পড়ে—হাত জোড় ক'রে ভাষাহীন আশীর্বাদ জানায়। নীরবতা ভঙ্গ করে শ্যামলাল—বহুদিন পরে জ্যাঠামশায়ের দর্শন পেয়েছি। বড়ই ভাগ্যের কথা। বুঝলে রমা, দুঃসময়ে জ্যাঠামশাই সাহায্য করেছিলেন বলেই আমি আজ সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি। আত্মীয়-স্বজন ছিলনা তা নয়, কিন্তু কেউ মুখ তুলে চায়নি আমার পানে। এমন মানুষ বড় একটা মেলে না।

কানাই মাথা নিচু ক'রে ধরা গলায় থেমে বলে—না না, ও কথা ব'লে লজ্জা দিওনা শ্যামলাল। আমি আর কি করেছি? তোমার বাবার সংগে কাজ করেছি বছরের পর বছর। এটুকু না ক'রে কি মানুষ পারে?

খাওয়ার ডাক পড়ে। রমা কাছে বসে থাকে, ছেলেমেয়েদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়। শ্যামলাল রেলের পুরনো লোকদের নতুন খবর জানায়। সারাদিন উপবাসের পর পেট ভ'রে খেয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে কানাই।

বৈঠকখানার পাশের ঘরে কানাইয়ের শোওয়ার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তার ঘুম আসে না। বহুদিন পথ হাঁটার পর পুণ্যস্থানে পৌছে তীর্থযাত্রীর মনের অবস্থা যেমন হয় কানাইয়ের মনের অবস্থা কতকটা সেই রকম। দেহ অবসন্ন, মন পরিপূর্ণ। এ যে অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা। রেলের মর্যাদা রেলের লোকই বোঝে, গেঁয়ো হাকিম বলাইবাবু বুঝবে কি ক'রে? কী মিষ্টি কথা শ্যামলালের! কী মিষ্টি হাসি রমার! বেদনাময় জগতে এসব অমূল্য সম্পদ। এরাই রচনা করে জীবনের ইন্দ্রজাল, এরাই বহন ক'রে আনে অলৌকিকের আভাস।

আনন্দে দিন কাটে কাঁচড়াপাড়ায়। সংকট সমস্যা সব যেন সরে গিয়েছে জীবন থেকে। তিন চার বার কল্যাণী ঘুরে আসে কানাই। কত কি দেখে—বিধান পার্ক, গান্ধী গ্রাম, নেতাজীর মূর্তি। সব চেয়ে ভালো লাগে তার প্রদর্শনী ট্রেন। চিত্তরঞ্জনে তৈরী ইঞ্জিন দেখে তার যেন আর আশা মেটে না। রেল-কর্মচারী হিসাবে খানিকটা গর্বও বোধ করে।

কয়েক দিনের মধ্যেই নিমু, বিমু, বেণু ও রেণুর অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে কানাই। ছেলে-ভুলনো গল্পের ভাণ্ডার তার অফুরন্ত—বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, রাক্ষস-খোক্কস, বাঁশ গাছের পেতনী, বেলগাছের ব্রহ্মদৈত্য—আরও কত কি। তারা বলে—দাদু, আপনি বাড়ি যাবেন না, এখানে থাকুন। দিন রাত ট্রেন চলাচল করে, কত লোক আসে যায়, আমাদের বাড়ি কেউ আসে না। আমাদের একলা মনে হয়। কাকা কাকীমাকে নিয়ে সেই যে চলে গিয়েছেন, আর আসেন নি।

একদিন আপিস থেকে এসে শ্যামলাল বলে—জ্যাঠামশাই, আপনি আছেন ভালোই হয়েছে। আমাকে আসানসোল যেতে হবে কন্‌ফারেন্সে। ভাবছি এই ফাঁকে দুদিন রামুর কাছে কাটিয়ে আসব। বার বার যেতে লিখেছে।

মাথা চুলকে কানাই বলে—আচ্ছা, ঘুরে এস। রামলালকে আমার কথা ব'লো, বৌমাকে আশীর্বাদ দিও।

এককালে কানাইয়ের বাগানের সখ ছিল। শ্যাম-

লালের বাগানটা বিশ্রী হয়ে আছে, পরিষ্কার করা দরকার। বয়স হলেও কানাই কর্মঠ। সে কাজে লেগে যায়। উৎসাহে মেতে ছেলেমেয়েরাও তাকে সাহায্য করে। তারা যখন পড়াশুনা করে—আর সে থাকে একা, তখন ভবিষ্যতের ভাবনা ঘনিয়ে ওঠে। অনেক দিন হয়ে গেল, এখন কাজের জন্য শ্যামলালকে বলা উচিত। সে আসানসোল থেকে ফিরেছে রামুর সংগে দেখা ক'রে, খোশ মেজাজে রয়েছে। একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নিরিবিলিতে কানাই বলে—একটা কথা আছে। বলি বলি ক'রেও এতদিন বলতে পারি নি। আমার একটা চাকরি ক'রে দাও। 'রিটায়ার্ড হ্যাণ্ড' তো নিচ্ছে। সামান্য কিছু মাইনে হলেই চলবে। ভাইয়ের বাড়িতে অসুবিধে। কষ্টের সংসার।

চমকে ওঠে শ্যামলাল। বলে—সে কি জ্যাঠামশাই, এই বয়সে চাকরি করবেন! আমরা রয়েছি কি করতে?

—নিষ্কর্মা হয়ে থাকা কি ভালো দেখায়?

—আপনি তো যথেষ্ট কাজ করেন। আমার বাগানের চেহারাই তো বদলে দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশী পরিশ্রম শরীরে সইবে কেন?

—বুড়ো মানুষকে নিয়ে বৌমাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়।

—আমার বাবা বেঁচে থাকলে কি হ'ত?

ভাবাবেগে বাক্যস্ফূর্তি হয় না কানাইয়ের। একটু সামলে নিয়ে বলে—ভাবছি আজ রাতের গাড়িতে যাব। মাসখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসব। অনেক দিন ঘরছাড়া।

—কই, আপনার বাড়ি থেকে চিঠিপত্র আসে না তো।

—তোমার কাছে এসেছি, রাজার হালে রয়েছি। সেই জন্য বোধ হয় সকলে নিশ্চিন্ত।

—বেশ, ঘুরে আসুন একবার। চাকরি বাকরির কথা মন থেকে একদম ঝেড়ে ফেলে দেবেন কিন্তু।

বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি। শ্যামলাল আপিসে। রমা ও ছেলেমেয়েদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কানাই। কিছুদুর এগিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশে সাঁকোটার ওপর বসে পড়ে। কেষ্টপুর আসবে সাতটায়—অনেক দেরি। ভাবে—যা বলেছি তার চেয়ে বেশী কি বলা যায়? মানুষের আত্মসম্মান আছে তো। এখন যাব কোথায়? কাঁঠালবেড়েতে ধর্মদাসার বাড়ি সপ্তাহখানেক থাকতে পারি। তার পর? মনে পড়ে বলাইবাবুর উগ্রমূর্তি, কদর্য কথা। না না, ওখানে মুখ দেখানো অসম্ভব। শ্যামলাল অন্যায় কথা বলে নি। সে বসে খায় না—বাগানে খাটে—রীতিমতো মালীর কাজ করে। কুলি মালী হলে মানহানি হবে কেন? বলাইবাবু দেখুক তার দাঁড়াবার জায়গা আছে—যেখানে দুখানা লাইন পাতা আছে সেখানেই রেলের লোকের আশ্রয়।

বেলা শেষ হয়ে আসে। অস্তরাগ ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে। আমের বউলের গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে। সরস হয়ে ওঠে কানাইয়ের মন। সে যেন নতুন ক'রে উপভোগ করতে চায় জীবনটাকে। বার্ধক্যে এমনিই হয়। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ মানুষকে বাঁধবার চেষ্টা করে নতুন মায়ার বাঁধনে। রমার সেবা আর ছেলে-মেয়েদের ভালোবাসা ছেড়ে কোথায় যাবে কানাই। সে ধীরে ধীরে ফিরে আসে শ্যামলালের বাসায়। নিনু, বিনু, বেণু, রেণু মলিন মুখে দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে। তাকে ফিরতে দেখে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে—দাদু, কোন জিনিস ফেলে গিয়েছেন বুঝি?

—না রে, না। তোদের ফেলে যেতে পারলাম না। মন কেমন করতে লাগল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। অসীমের বিপুল অংগন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অসংখ্য নক্ষত্রের দীপ্তিতে। আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পি. ডবলিউ. আই-এর ক্ষুদ্র অংগন স্নেহ-বিগলিত বৃদ্ধ ও স্নেহ-বিকশিত শিশুদের পুনর্মিলনের মহিমায়।

শিবাজী ও ভারতবর্ষ

কালীপদ মণ্ডল

মানুষের চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা যে সবই হয় একমাত্র ইতিহাসই তার নজির রাখে। সেইজন্য ইতিহাস সুধীজনের কাছে এত আদরের বস্তু। যেমন একটি সুন্দর সুগন্ধি ফুলকে হেলায় ফেলে দিলে তার পাপড়িগুলিকেও অনুরূপ অনাদর করে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, সেইরূপ ইতিহাসকে অবহেলা করলে পৃথিবীর প্রচুর সৌন্দর্য্যবোধকে হারাতে হয়। বিচার শক্তির লোপ হয়। ইতিহাস মানুষের সার্ব্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে। সেই জন্য ইতিহাস শাশ্বত হয়ে উঠে। আবার মিথ্যা প্রচারেও ইতিহাস কলঙ্কিত হয়। তার জন্য ইতিহাস দায়ী নয়, যাঁরা সেই মিথ্যা কাহিনী অবলম্বনে ইতিহাস রচনা করেন তাঁরাই দায়ী। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আজও প্রাথমিক ইতিহাসের একান্ত অভাব আছে।

ভারতবর্ষের ভাগ্যবিড়ম্বনা শত শত বৎসর ধরে। কবে মামার বাড়ী ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিল আজও তাই হাতে ঘিয়ের গন্ধ আছে। ভারতবাসীর অবস্থাও কতকটা সেই রকম। কবে কোন কালে ভারতবর্ষ ধনে ধান্যে পূর্ণ ছিল, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অখণ্ড হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল—সেই কথা আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বসে ভাবি আর গর্ব্বে বুক ফুলাই। আমরা ভাবি প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা—ইংরেজ ভাবে আগামী দিনের কথা—আজকের কথা। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটি কাজে লাগিয়ে তারা এগিয়ে যেতে চায় সামনে। এই তাদের জাতীয় ধর্ম্ম। আর আমরা মন্দিরে চামর-ঘণ্টা বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দল পাকিয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে আনি।

আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ি, কিন্তু তার অধিকাংশই দাস—মোগল—পাঠানদের উত্থান-পতন নিয়ে রচিত। হিন্দুপ্রধান বিশাল ভারতবর্ষে কেমন করে মুসলমানেরা এসে দিল্লীর মসনদ অধিকার করলো, কেমন করে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করলো, কেমন করে হিন্দুর রক্তে হিন্দুর শত শত দেবমন্দির রঞ্জিত হলো, কেমন করে হিন্দু নারী-পুরুষের উপর মুসলমানদের অমানুষিক অত্যাচার হলো—তারই মর্ম্মান্তিক কাহিনী আজও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই বিশাল হিন্দুরাজ্যে যে তৎকালীন দুটি হিন্দু জাতি অতুলনীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়ে হিন্দুরাজ্য গঠন করেন তন্মধ্যে পাঞ্জাবের শিখ ও মহারাষ্ট্র দেশের মারাঠা জাতি। আমরা এই মারাঠা জাতি ও ছত্রপতি শিবাজী সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবো।

যে সময়ে শিবাজীর আবির্ভাব হলো দক্ষিণ ভারতে, তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। সেই সময় মোগল সম্রাট আকবর দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তার করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। ১৫৯৬ খৃঃ আকবর আমেদনগর আক্রমণ করেন। চাঁদ বিবি প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে আকবরকে পরাজিত করেন। অতঃপর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে চাঁদবিবি নিহত হলেন ১৫৯৯ খৃঃ। মোগল সৈন্যেরা আমেদনগর দুর্গ অধিকার করলেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে শেষ পর্য্যন্ত মোগলেরা আমেদনগর অধিকার করলেন। মোগলেরা ক্রমে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করেন।

মহারাষ্ট্রদেশের প্রাকৃতিক গঠন এদেশবাসীদের স্বাধীনতাপ্রিয় করে তুলবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কোন বিখ্যাত সৈনিক মহারাষ্ট্র দেশের প্রাকৃতিক গঠন দেখে বলেছিলেন—"In a military point of View, there is probably no stronger country in the world" সত্যই এমন বন্ধুর ও দুর্গম দেশ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই। আর্য্য ও অনার্য্যদের সমন্বয় সাধন মহারাষ্ট্র দেশের রাজনৈতিক উন্নতির আর একটি কারণ। উত্তর ভারত আর্য্যপ্রধান। সেখানে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত উগ্র। আবার দক্ষিণভারত অনার্য্যপ্রধান। কাজেই সেখানেও নানা জাতির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে বিভেদও মারাত্মক। কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশটি আর্য্য ও অনার্য্যদের সীমারেখায় অবস্থিত। সেই জন্য এখানে জাতিভেদ প্রথা খুব বেশী নয়। এখানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র যেমন মিলেমিশে বাস করে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। মারাঠা জাতির ঐক্যের ইহা অন্যতম কারণ। কেহ কেহ বলেন—শিবাজী লুণ্ঠনকারী এবং বিশেষ করে মুসলমান ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু একথা সত্য নহে। শিবাজী কোন ধর্ম্মকেই ঘৃণা করতেন না। এক অখণ্ড হিন্দুরাজ্য গঠন করবার স্বপ্ন ও সাধনা ছিল তাঁর জীবনে। বহু মুসলমান শিবাজীর সৈন্যদলে কাজ করতেন। এই সব কারণে দেখা যায় মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম্ম ও সমাজে সাম্যভাব বিলক্ষণ।

শিবাজী আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, জর্জ্জওয়াশিংটন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ন্যায় মাতৃভক্ত ছিলেন। জীবনে কোন বাধাকে তিনি বাধা বলে মনে করতেন না। সর্ব্বত্রই তিনি তাঁর মায়ের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করতেন। এইজন্য দেখা যায়—সমগ্র নারীজাতির প্রতি শিবাজীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপন্ন নারীদের তিনি সসম্মানে তাঁদের স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। দাদাজী কোণ্ডদেব শিবাজীর বাল্যশিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেব শিবাজীকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পিতা শাহজী ও মাতা জীজাবাই উভয়েই মারাঠা বীরবংশসম্ভূত। শিবাজীর ধমনীতে ধমনীতে সেই বীর রক্তের ধারা প্রবাহিত ছিল; সেইজন্যই শিবাজী শৌর্য্যে বীর্য্যে আলোক বর্ত্তিকা স্বরূপ মহারাষ্ট্রদেশে দেশনায়ক। মোরেপন্ত পিঙ্গলে, যে সাজীকর, নিরাজি

পণ্ডিত, রঘুনাথ পন্ত, শ্যামরাজ পন্ত ও আবাজী সোনদেব প্রভৃতি স্বদেশ-সেবক শিবাজীর সহযোগী ছিলেন।

শিবাজীর দক্ষিণ হস্ত ছিল মাওলী সৈন্যদল। পুণার আশে পাশে নিম্নশ্রেণীর মাওলীদের বসতি। বাল্যকাল থেকে শিবাজী তাদের সংগে মিশতেন। মাওলীরা বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু ও বিশ্বস্ত। শিবাজী তাদের নিয়ে একটি সুশিক্ষিত সৈন্যদল গঠন করেন। শিবাজী সুচতুর ও বিশেষ বুদ্ধিমান ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। প্রতাপগড়ে আফজল খাঁ ও শিবাজীর পরস্পর সাক্ষাৎ বিশেষ অভিসন্ধিমূলক ছিল। শিবাজী সেইজন্য প্রস্তুত হয়েই খাঁ সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করেন। কেহ বলেন, খাঁ সাহেব শিবাজীকে প্রথম আক্রমণ করেন, আবার কেহ বলেন, শিবাজীই প্রথম খাঁ সাহেবকে আক্রমণ করেন। যাহাই হোক না কেন, উভয়েই যে ছদ্মবেশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পাঠানবীর আফজল খাঁ সেদিন শিবাজীর হস্তে নিহত হলেন।

সায়েস্তা খাঁ পুণা অধিকার করে শিবাজীর বাল্যভবনটি দখল করে বেশ আরামে দিন কাটাতে লাগলেন। বুদ্ধিমান সায়েস্তা খাঁর আদেশ মত কোন মারাঠা পুণা শহরে প্রবেশ করতে পারতেন না। শিবাজী সুযোগ খুঁজছিলেন কী করে সায়েস্তা খাঁকে শায়েস্তা করা যায়। সুযোগও এলো একদিন। এক বরযাত্রীর সংগে মিশে পঁচিশজন বীরপুরুষ নিয়ে একরাত্রে সুচতুর শিবাজী পুণা শহরে প্রবেশ করলেন এবং অতর্কিতভাবে সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করলেন। সায়েস্তা খাঁর পলায়ন পথে শিবাজীর দ্রুত তরবারির আঘাতে তার তিনটি আঙুল ছিন্ন হলো।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাটবন্দর আক্রমণ করেন। সুরাট তখন মোগলদের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। মোগল সৈন্য যুদ্ধে নিহত হলো এবং শিবাজী জয়ী হলেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর একদল নৌসৈন্য গোয়ায় দক্ষিণে একটি সমৃদ্ধ বন্দর লুণ্ঠন করলো। এইভাবে শিবাজী উত্তর কর্ণাটে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করলেন।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শিবাজীর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে দমন করবার জন্য অম্বরের রাজা জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে পাঠালেন। জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করলেন। মারাঠা বীর মুরার বাজী প্রভু মাত্র দু হাজার সৈন্য নিয়ে বীরবিক্রমে অসংখ্য মোগল সৈন্যের সংগে যুদ্ধ চালালেন। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা খারাপ বুঝে শিবাজী জয়সিংহের সংগে সন্ধি করলেন এবং সন্ধির সর্ত্তানুসারে শিবাজী কুড়িটি দুর্গ মোগলদের দিলেন। মাত্র বারোটি দুর্গ তাঁর অধীনে রইলো। কেহ কেহ বলেন, মহাত্মা শিবাজী এক্ষেত্রে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। মোগল সৈন্যের কাছে এতখানি নতি স্বীকার করবার কোন কারণ ছিল না তাঁর পক্ষে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় শিবাজী নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন।

শিবাজী ভেবেছিলেন দিল্লীর সম্রাট তাঁকে রাজসম্মান দিবেন। কিন্তু সসৈন্যে দিল্লীর দরবারে উপনীত হলে তিনি দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক অপমানিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই নজরবন্দী হলেন। পূর্ব্বেই বলেছি শিবাজী বুদ্ধিমান, কিন্তু এইখানেই শিবাজীর ক্ষুরধার বুদ্ধি হার মানলো। তিনি বুঝলেন মোগল সম্রাটের কাছে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। মারাঠারা এই সংবাদ পেয়ে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠলো। তারা দেশনেতার মুক্তির প্রতীক্ষা করতে লাগলো—এদিকে শিবাজী তাঁর সমস্ত সৈন্যকে দেশে ফিরে যেতে বললেন এবং তারা তাদের প্রিয় নেতাকে ফেলে চোখের জলে মহারাষ্ট্রদেশে ফিরলো। শিবাজী বিপদে কখনও আত্মহারা হয়ে পড়তেন না। তিনি ও তাঁর পুত্র শম্ভাজী পলায়নের চেষ্টা করতে লাগলেন, বুদ্ধিমান শিবাজী আবার নতুন বুদ্ধির জাল পাতলেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনি মহাধুমধামে ঠাকুর পূজা আরম্ভ করলেন। এই উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ, সাধু ও ভিখারীদের বড় বড় চুবড়ীতে করে নানাবিধ খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম দ্বাররক্ষকেরা চুবড়িগুলি পরীক্ষা করে বাহিরে যেতে দিতো। কিন্তু এই ব্যাপার দীর্ঘদিন ধরে চলতে লাগলো। ফলে দ্বাররক্ষকেরা আর চুবড়ী পরীক্ষা করতো না। সুযোগ বুঝে এক বৃহস্পতিবার শিবাজী অসুখের ভান করলেন এবং নির্দ্দিষ্ট কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারো সহিত দেখা করবার অনুমতি ছিল না। শিবাজীর রোগমুক্তি কামনায় সেদিন আবার প্রচুর মিষ্টান্নের আয়োজন করা হয়েছিল। পরদিন শুক্রবার সকাল থেকে মিষ্টান্ন বিতরণ শুরু হলো। শিবাজী ও তার পুত্র শম্ভাজী রাত্রিকালে দুটি বড় চুবড়ীতে প্রবেশ করে নগরের বাহির হলেন। এইভাবে শিবাজী মুক্তিলাভ করলেন। শিবাজী দিল্লী থেকে মথুরায় এসে মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মহারাষ্ট্রদেশের দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন। দশ মাস পরে তিনি মহারাষ্ট্রদেশে ফিরে এলেন। দীর্ঘদিন পরে মারাঠারা তাদের দেশনায়ককে ফিরে পেয়ে প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো মোগল সৈন্যের উপর এবং একে একে আবার সমস্ত দুর্গ অধিকার করলো। মোগল সম্রাট শিবাজীকে দমন করবার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠালেন, কিন্তু শিবাজীর কাছে তারা হারমানলো। তানাজী ও সূর্য্যাজী বীরবিক্রমে আক্রমণ করেন সিংহগড়। ক্রমে পুরন্দর, লৌহগড় শিবাজীর করায়ত্ত হলো। শেষ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট শিবাজীকে 'রাজা' উপাধি দিলেন।

মানুষ স্বীয় বুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা কেমন করে সামান্য অবস্থা থেকে একেবারে উন্নতির শীর্ষস্থানে উন্নীত হতে পারে শিবাজীর জীবনী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ১৬৪০ খৃঃ থেকে ১৬৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত কালই প্রকৃত পক্ষে শিবাজীর কর্ম্মময় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ। এই সময়ে যদি শিবাজীর মত আরও পাঁচজন বীর ও দেশপ্রেমিকের আবির্ভাব হতো ভারতবর্ষে, তাহলে হয়তো আর দীর্ঘদিন ভারতবর্ষকে বিদেশীর কবলে থেকে নিষ্পেষিত হতে হতো না এবং ভারতের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হতো। ইহা ভারতবর্ষেরই দুর্ভাগ্য। এখানে বীর বিনায়ক সাভারকরের কথাটি মনে পড়ে—'দেশের সমস্ত জাতিকে একটি সামরিক জাতিতে পরিণত করা দরকার। অন্যথায় জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না।' কথায় বলে—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। কথাটি অতিসত্য। শুধু কথায় জালবুনে দেশ ও জাতিকে সংঘবদ্ধ করা যায় না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বড় বড় নেতারা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েই বাজী মাৎ করতে চান, কিন্তু বিশেষ করে এই আধুনিক শক্তির যুগে আর মানুষকে ধোকা দেওয়া চলে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পণ্ডিতের অভাব নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের সংগে অন্য দেশের প্রভেদ এই যে—সে সব দেশের কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিল্পী ও পণ্ডিতেরা সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত। নিজের দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার জন্য যে হাতীয়ার দরকার সেই হাতীয়ার যার নেই সে নিশ্চয়ই দুর্ব্বল। তার দৌর্ব্বল্যের সুযোগ নেবে যে কোন শক্তিশালীজাতি। আজ এই কারণেই দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিড়ম্বনা। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় মুসলমান, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশীরা ভারতের এই ক্লীবতারই সুযোগ নিয়েছে।

শেষ দিনের পাঠ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

রাত্রে বিরাট ঝড় বহিয়া গেলে বাগান ও পথের দুইধারের গাছপালার যে অবস্থা হয় আজ সারা দেশের অবস্থা তেমনি হইয়াছে। যেন বড় বড় ফুলগাছের ফুল সুদ্ধ ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ছোট ছোট ফুলগাছ ফুলের গুচ্ছ বুকে লইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, ফুলের পাপড়ি, গাছের পাতা ও ছিন্নপল্লব বর্ষণসিক্ত মাটির উপর ছাইয়া গিয়াছে, পথিপার্শ্বস্থ ছায়াতরুর শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পথরোধ করিয়াছে। দেশের আকাশ-বাতাসে এক ম্লান বিষণ্ণ-উদাস ভাব ছাইয়া গিয়াছে। দেশের বালক, বৃদ্ধ, যুবা—পুরুষ, নারী সবারই মুখে কারণে অকারণে এক ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যালয়ের অবস্থাও আজ তদ্রূপ। সে আগ্রহ নাই, সে উৎসাহ নাই—অধ্যয়নে সে অনুরাগ নাই। কি পড়ানো হইবে, কি করিয়া পড়ানো হইবে তাহারও যেন স্থিরতা নাই।

বিদ্যালয় আরম্ভ হইবার ঘণ্টা তখনও বাজে নাই। ছেলেরা এক এক করিয়া ক্লাশের মধ্যে আসিতেছে। যে আসিতেছে সেই একবার শিক্ষকের আসনের দিকে চাহিয়া পরম বিস্ময়ের সহিত নিঃশব্দে আপন আসনে বসিয়া পড়িতেছে। চিরদিন তাহারা দেখিয়া আসিতেছে—আগে তাহারা ক্লাসে আসে, কত হৈ চৈ করে, তারপর ঘণ্টা বাজে, তাহারা আপন আপন স্থানে আসিয়া বসে, তারপর শিক্ষক আসেন। আজ শিক্ষক তাহাদের আসিবার পূর্ব হইতেই ক্লাশে আসিয়া বসিয়াছেন। এমন তো কোনদিন হয় নাই! ছাত্রদের প্রথম বিস্ময়ের কারণ ইহাই।

শিক্ষকের মুখ ম্লান, গম্ভীর। তাই তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না—আজ তিনি আগে আসিয়াছেন কেন। তাহারা ঘণ্টা বাজিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

একটু পরে কার্য্যারম্ভের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। ঘণ্টা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেদিনকার পঠিতব্য বিষয়টুকু আবেগের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। তারপর একবার সকলের দিকে চাহিলেন এবং পরে নূতন সুরে নূতন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার প্রথম কথা হইল—আজ আমি তোমাদের বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে শেষবারের মত' দুটি কথা বলে যাব—তোমরা মন দিয়ে শোন।

এ যেন বহুকাল আগেকার গুরু গৌতমের অধ্যাপনার সূত্রপাত। গুরু যেন আশ্রমবাসী শুচিস্নাত ছাত্রদের ডাকিয়া বলিলেন—

"বৎস্যগণ ব্রহ্মবিদ্যা কহি কর অবধান।"

ছাত্রেরা স্তব্ধ হইয়া শিক্ষকের মুখপানে চাহিল। শিক্ষক বলিতে লাগিলেন—

আমি প্রায় ৪০ বৎসর ধরে তোমাদের এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। তোমাদের বাপ কাকাদের একদিন আমি যেমন করে পড়িয়েছি, আজ তোমাদের তেমনি পড়াচ্ছি। সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি ইতিহাস ও বাংলা পড়িয়ে আসছি। আজ আমার বাংলা পড়ানোর শেষ দিন—আজ তোমাদের বাংলা পড়বার শেষ দিন। কাল থেকে এ বিদ্যালয়ে আর বাংলা পড়ানো হবে না। বাংলার বদলে তোমাদের অন্য ভাষা শিখতে হবে, শুনতে হবে, পড়তে হবে, বলতে হবে। যে ভাষা তোমরা মায়ের কাছ থেকে শিখেছ, যে ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে তোমাদের মানুষ করেছে, তোমাদের উপর তার আর কোন অধিকার থাকবে না। যেথানে বাংলা ভাষার স্থান নেই, বাংলা ভাষার মর্য্যাদা নেই—সেখানে আমারও স্থান নেই। কাল থেকে আমি আর এ বিদ্যালয়ে আসব না—তোমাদের মুখের দিকে আর চাইতে পাব না—তোমাদের বাংলা ভাষায় আর কিছু বলতে পাব না। তাই কাল থেকে আর আমি এখানকার কেউ নই।

বাম দিকের খোলা জানালা দিয়া দিগন্তের মুক্ত আকাশের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। তিনি ক্ষণকালের

জন্য সেই আকাশের দিকে চাহিয়া লইয়া আবার ছাত্রদের পানে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—

কিন্তু আজ আমার বাংলায় পড়াবার, বাংলায় কথা বলবার, বাংলায় তোমাদের আদর করবার, ডাকবার, বাংলা সাহিত্যের অমৃত মধুর কাব্যকথা উদ্ধৃত করবার অধিকার আছে। সে অধিকার আমি খর্ব করব না।

আমাদের—তোমাদের এই বাংলা ভাষার বেদ মন্ত্রের মত একদিন বন্দেমাতরম মন্ত্র রচিত হয়েছিল। বৃটিশের শাসন-রজ্জুতে যখন সবারই মুখ-বন্ধ তখন সেই রজ্জু ছিন্ন করে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ থেকে বাহির হয়েছিল বাংলা ভাষায় সারা ভারতের মুক্তি মন্ত্র বন্দেমাতরম্।

সেই—সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।

শুনে মায়ের পানে আমরা প্রথম মুখ তুলে মায়ের অসামান্য রূপ দেখেছিলাম।

সেই—বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

শুনে আমাদের প্রতি হৃদয়ে মায়ের মূর্ত্তি গড়ে উঠেছিল।

এই বাংলা ভাষায় আরও সহজ করে স্বামী বিবেকানন্দ কতকাল আগে বলে গেছেন—এই নিঃস্ব ভারতবাসী এই অশিক্ষিত ভারতবাসীই আমার ভাই। বাংলা ভাষাতেই তিনি প্রথম মমতাভরা ভাষায় দৃপ্ত কণ্ঠে বলে যান—এ দেশের মুচি, মেথর, ডোম সবাই আমার ভাই। এদেশে এই বাংলা ভাষাতেই প্রথম এমন নির্ভীক সত্য কথা ফুটে উঠেছিল। অপর কোন ভাষাতে এমন মধুর সুরে অমন সাহস করে এই সত্য কথা কেউ তার আগে বলে নি, শোনে নি।

এই ভাষায় ভারতীয় কল্পবৃক্ষ রামায়ণ ও মহাভারত হতে কত কাহিনী গৃহীত হয়ে কত অনবদ্য কাব্য ও মহাকাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ভাষায় রাজস্থানের বীরত্বের অজস্র কাহিনী গদ্যে ও পদ্যে রচিত হয়ে সারা ভারতকে মহিমান্বিত করেছে, সারা জগৎকে বিস্মিত করেছে—উষর, রুক্ষ কিন্তু বীর-প্রসবিনী রাজপুতানাকে ও স্নিগ্ধ শ্যামল কোমল শস্যপূর্ণ বাংলা দেশকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে, মহারাষ্ট্রের বীরত্বগাথা বাংলা ভাষায় অপূর্ব গৌরবে ফুটে উঠেছে! ভারতের যেখানে যে মাধুর্য্যময়ী ঘটনা, যে বীরত্বপূর্ণ কার্য্য তা বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বিজ্ঞানের বিষয় ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষায় অপরূপ রূপচ্ছটায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। মৌলিক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছে, বাংলা ভাষায় লিখিত নাটক ও সঙ্গীত আজও অননুকরণীয়, ভারতে বাংলা সাহিত্যই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সম্মানলাভ করেছে। সবচেয়ে দুঃখ, লজ্জা ও কলঙ্কের কথা এই যে ভাষায় তোমরা বাল্যকাল থেকে কথা কয়ে এসেছ, আজও যে ভাষায় তোমরা কথা কইছ—কাল থেকে সে ভাষা তোমাদের শিক্ষণীয় নয়, সে সাহিত্য তোমাদের পঠনীয় নয়।

কয়েকজন ছাত্র আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—আমরা তাহলে কোন ভাষা পড়ব?

শিক্ষক হতাশাব্যঞ্জক ভাবে আপনার দক্ষিণ হস্ত বারেকের জন্য শূন্যে উঠাইয়া বলিলেন—আমি সে কথা বলার অধিকারী নই, কোন ভাষার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলতে চাইনে। আমার বক্তব্য শুধু এই—যে ভাষা এতদিন জাতিধর্ম নির্বিশেষে গড়ে উঠেছে, যে ভাষা তোমাদের মুখের কথা ফোটার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তোমাদের মনের ভাব বহন করে এসেছে, যে ভাষায় রচিত বহুমুখী সাহিত্য এই অতি দীর্ঘকাল তোমাদের দেশের, তোমাদের পিতৃপুরুষের এবং তোমাদের গৌরববৃদ্ধি করে এসেছে, সে ভাষা যেন তোমাদের কোনদিন ছাড়তে না হয়। তোমরা অন্য ভাষা প্রীতির সঙ্গে শিখতে পার কিন্তু তা যেন তোমাদের মায়ের মত পবিত্র ও প্রিয় বাংলা ভাষাকে পরিত্যাগ করে শিখতে না হয়। একথা বলবার মত বুদ্ধি ও শক্তির তোমাদের যেন কোনদিন অভাব না হয়।

একজন ছাত্র দুইবার উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে না পারিয়া তিন বারের বার উঠিয়া কাতরস্বরে বলিল, মাষ্টার মশায়?

শিক্ষক বলিলেন—কি বল!

ছাত্রটি শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি তাহলে এখন কোথায় থাকবেন—কি করবেন?

শিক্ষক গাঢ়স্বরে বলিলেন—আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি। আমি গ্রামে গ্রামে যাব—যেখানে

দু-চার জনকে একত্র দেখব—বাংলা ভাষার মাধুর্য্যের কথা, বাংলা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সম্পদের কথা বলব। যতক্ষণ এই কণ্ঠ রুদ্ধ না হয়ে যায় বাংলা ভাষায় যা কিছু কণ্ঠস্থ আছে আবৃত্তি করে যাব, যে গান গাইতে শিখেছি গেয়ে যাব, মনে যদি নতুন ভাব আসে, যতটুকু প্রেরণা পাব এবং যতক্ষণ হাতে শক্তি থাকে লিখে যাব। সেই লেখা সকালে উঠে লোককে শোনাব, লোককে বুঝাব।

একটি ছাত্র ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মাষ্টার মশায়, এতে যদি রাজ-শক্তি আপনাকে বাধা দেয়—আপনাকে বন্দী করে।

শিক্ষক বলিলেন—তাহলে কারাগারে গিয়েও এই এক কথা বল্‌ব, এক কাজ করব। আমায় যদি কেটেও ফেলে, আমি চাই রামায়ণের তরণীসেনের কাটা মুণ্ড যেমন রাম নাম উচ্চারণ করেছিল আমারও কাটা মুণ্ড যেন বাংলাভাষা—বাংলা সাহিত্য এই বাক্য উচ্চারণ করে।

আজ তোমাদের কাছে শেষ বারের মত বাংলা ভাষায় অতুলপ্রসাদের বাংলাভাষার শেষ কথাটি বলে যাই :

মোদের গরব, মোদের আশা
আমরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা।
কি যাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনলে দেশে ভক্তিধারা
আছে কই এমন ভাষা
এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা!
বিদ্যাপতি চণ্ডী গোবিন
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন
ঐ ফুলেরই মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা!
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগত জিনে
(তাই) তোমার চরণ-তীর্থে আজি।
জগৎ করে যাওয়া আসা।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে 'মা মা' বলে;
ঐ ভাষাতেই বল্‌ব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা!

কবিতার আবৃত্তি শেষ হল। শিক্ষকের দুটি চক্ষের জলধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল ভিজিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পঠনের সময় উত্তীর্ণ হইবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। শিক্ষক কক্ষ পরিত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হইলেন।

ক্লাশের সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্রটি শিক্ষকের পায়ের কাছে জানু পাতিয়া প্রণাম করিয়া—'আপনি আর আমাদের পড়াবেন না'—কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

গুরু সেই পূর্বদিনের মতই বাহু মেলিয়া বালকেরে আলিঙ্গন করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—আমি যতদিন বেঁচে থাকব তোমাদের মধ্যেই থাক্‌ব। আর মরণের পরও তোমাদের কারো বাড়ীতেই ছোট ভাই হয়ে বা ছোট ছেলে হয়ে জন্মাব। আবার বাংলাভাষা নতুন করে শিখ্‌ব। সেই আমার আবার নতুন করে শেখা ভাষায় তোমাদের সঙ্গে কথা কইব। তোমাদের বাংলা গল্প-কবিতা পড়ে শোনাব—বাংলা গান গেয়ে তোমাদের আনন্দ দেব। আবার মরে আবার বাংলাদেশে জন্মাব, বাংলা শিখ্‌ব, বাংলা শেখাব। আমি কখনও তোমাদের ছেড়ে যাব না। আমার যাবার সময় তোমরা সবাই আমায় একবার শুনিয়ে দাও—মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!

ছেলেরা সবাই দাঁড়াইয়া উঠিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গাহিল—

মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা!

গুরুর গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি তাহা মুছিতে ভুলিয়া গেলেন এবং শেষবারের মত হাত তুলিয়া ছাত্রদের তাঁহার শেষ আশীর্বাদ দিয়া ধীরে ধীরে সেই পরম প্রিয় পাঠ-কক্ষ হইতে চিরদিনের মত বাহির হইয়া গেলেন।

মিশরীয় কথা

বিচিত্রা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সরু সিঁড়ি বেয়ে আমরা সাবধানে নেমে যাই। দেয়ালে মালার মত করে ঝোলানো তারে অতি ক্ষীণ বিদ্যুতের আলো। সেই আবছা আলোয় আমাদের নিজেদের ছায়াগুলি, বড় বেশী অন্ধকার করে পথ রোধ করছে। খুকুর কলকণ্ঠ অনেকক্ষণ স্তিমিত হয়ে থেমে এসেছে। —অকারণ একটা অখুশীর বোঝা, স্যাঁৎস্যাঁতে কাপড়ের একরাশ স্তূপের মত প্রাণের উপরে যেন চেপে আছে। আমরা একটী একটী করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি আর নামছি ;—ফিরে চলেছি এই গগনচুড় মৃত্যুনিকেতনের গর্ভ থেকে।

দরজার মুখ থেকে বাইরে পা দেবা মাত্র আলো আর হাওয়া, রং আর সুখ আমাদের দুই হাতে আলিঙ্গন করে ধরল। অদূরেফারুক সাহেবের প্রমোদভবনের বাগানে রঙীণ ফুলের আল্পনা। এদিকে ছোট্ট লালীর হাসিমুখের অভ্যর্থনা। দলে দলে মিশরী বালিকা ও তরুণী রঙীণ ফ্রক পরে, প্রজাপতির মত যেন উড়ে উড়ে চলেছে। ওদের চলায় বলায় চোখের চাওয়ায় জীবনের বিচিত্র ছন্দের সুর।

ওরা আমাদের দেখে চাওয়া চাওয়ি করে একটু হাসাহাসি করে উঠল। একজন আমার বিচিত্র বেশবাসের দিকে ইসারা করে কাণে কাণে কিছু বলল। আরেকজন খুকুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি তার গাল টিপে বল্লুম, তোমার নাম? সে হেসে গড়িয়ে পড়ল। আরেকজন সাহসিনী বলল, কোথায় তোমার দেশ? আমার উত্তরের আগেই ওদের পুরুষ রক্ষীদের একজন বললে,—দেখছ না—পাকিস্থান?

—'না ভারতবর্ষ।'

—ও তো একই। 'হাঁ, সবই তো এক ভাবলুম, এই সুযোগে এদের Social conditionটা আরেকবার জানার চেষ্টা করা যাক। কৌতূহল মেটানো নারীধর্ম্মানুগ। একটী তরুণীর সঙ্গে ভাঙা ইংরেজী ও গুঁড়িয়ে যাওয়া ফরাসীতে দুএকটা বাৎচিৎ করতে করতে ফস্ করে বলে বসলুম, তোমাদের জেনানারা তো দেখছি সব এখন স্বাধীন হয়ে গেছে। এই তো কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছো ঘোমটা খুলে, পর্দ্দা তো আর নেই? ওরা হাসলে। শুধু কুমারীদের পর্দ্দা নেই। বিয়ের পরে বেপর্দ্দা ঘোরা এখনো এখানে বিষম বেদস্তুর। আমি বল্লাম,—"কিন্তু তোমরা গাউন পরেচ, চুল কেটেছ? সবই তো মেমেদের মত?" একটী মেয়ে গলায় খানিকটা ঝাঁজ মিশিয়ে বললে—"হাঁ মেমেদের কাছে অনেক কিছুই তো শিখছি। তবে ওদের কাছে ফ্যাসন শিখতে, কায়দা শিখতে দস্তুরী শিখতে রাজী আছি বটে, কিন্তু বেচাল বেদস্তুরী শিখতে চাইব না, বেসরম বেপর্দ্দা হতে শিখব না। আমাদের দলকর্ত্তা দূর থেকে চোখ টিপে পা চালাতে বল্লেন। পথের মধ্যে সমাজনীতির আলোচনা ফস করে বেদস্তুরের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

তাই চুপ করলুম। সমাজনীতি বন্ধ করে, প্রখর সূর্য্যানীতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলাম। তারপরে আবার সেই মনোরম রাস্তা দিয়ে ফিরে চল্লাম হোটেলে। পৌছলাম যখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ-প্রায়। মধ্যাহ্নভোজের বিপুল আয়োজন নিঃশেষিত প্রায়। অবশ্য এই দীর্ঘ উত্তপ্ত ভ্রমণের পরে। মিশরী অথবা আরবী পারসী কোনরকম খাবারই উপযুক্ত নয়। তাই অর্ডার করলুম ঠাণ্ডা স্যালাড আর মাছ। ফরাসী নামতালিকা ঘেঁটে মাছের যে নামটা চোখে ঠেকল সেটা যে মাছ ভাজারই ফরাসী নামান্তর, একথা বোঝা যায়নি আগে। তারপরে এল মাছ ভাজা। দেখে মুখ শুকিয়ে এল, কী প্রচুর কী প্রভুত। রীতিমতো অভিভূত হয়ে যাবার যোগাড়। আসছে তো আসছেই, মাছের পরে মাছ, ভাজার পরে ভাজা। এত মাছ কেউ খেতে

স্ফিনিক্স্

পারে? এর, সিকিতে আমাদের চারজনের বেশ ভালোরকম পেট ভরবে। বাকীগুলো? কী আর হবে? মিশরী খানসামারা নিয়ে যাবে। কিন্তু দাম দিতে হবে সবগুলোর জন্যেই। হাঁ সে তো জানিই। সেই দুঃখেই তো চুপ করে আছি।

—সন্ধ্যেবেলা দোকান দেখতে গেলুম, দেশী পাড়ায়। দেশী হলেও বোধহয় পুরোপুরি দেশী নয়। কারণ সঙ্গে ছিলেন সেই প্রফেসর গাইড। বিদেশীদের নিয়েই যার কারবার।

দোকানে যাবার আগে দেখতে হোল আরো যা যা আছে দ্রষ্টব্য। গোলাপী অ্যালবেষ্টার পাথরের বিশাল মসজিদ। সেখানে ঢুকতে জুতো খুলতে হবে কিনা ভাবছি, ওরা কম্বলের আবরণ দিয়ে জুতো মুড়ে দিল। সেই মসজিদের ভিতরটা ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় চার্চের অনুকরণে সাজানো—বিশেষ করে জানলার চিত্রিত রঙীণ কাঁচগুলি। মসজিদের বিরাট বাঁধানো উঠোনে বহু লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হেঁটে যেতে আমাদের পা টন্ টন্ করতে লাগল। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে গম্বুজের পাশেই দেখি ছাদের একটি ছোটখাট নিভৃত কোনায় কোন এক নাম না জানা গাছের ঝাঁকড়া মাথায় একটা ঝির-ঝিরে ঠাণ্ডা ছায়া। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই আজানের সুরে যায়গাটা ভরে উঠল। তাকিয়ে দেখি, পশ্চিম দিক থেকে লাল সূর্য্য সারা আকাশে সোনা ছড়িয়ে পিরামিডের রেখায় রেখায় একটা ধূসর বেগুনি মিশ্রিত রঙের আভা ফুটিয়ে তুলেছে।

রঙিন হংসচিত্র

মসজিদ থেকে মৃত সহরের ধার দিয়ে আমরা জীবিত নগরের হাটবাজারের কেন্দ্রে এসে পৌঁছলাম। মৃতনগর অথবা city of the dead কায়রোর পশ্চিম দিকে মাইল দেড়েক লম্বা একসারি ছোট ছোট পাহাড়। সহরের সবলোকের কবর এইখানেই হয়ে থাকে। এই একটা যায়গায় সকলের মাটি কেনা আছে। প্রফেসারের ইচ্ছে ছিল ওখানে আবার আমাদের নিয়ে একটু ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সকাল থেকে কবর দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি। আর সখ নেই। একী দেশ! খালি মৃত্যু মৃত্যু আর মৃত্যু, সারা দেশটা জুড়ে কেবল কবর। এখন এখান থেকে পালিয়ে একটু আলো, একটু কথা, একটু চেঁচামেচি, জীবিত মানুষের স্পর্শের মধ্যে ফিরে যেতে চাই। চল চল, গাড়ী চালাও জোরে। ফিরে চল মানুষের মাঝখানে। যে মানুষ বেঁচে আছে। সেইখানেই এলুম অবশেষে। লোকজন গাড়ীঘোড়া উট সব কিছুই আছে সেখানে। চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলিরও অভাব নেই। তবু সব কিছুর উপরে যেন একটা মৃত্যুভার চেপে আছে। আঁকা বাঁকা অলি গলির ভিতরে বাঁকা চোরা উঁচুনীচু দোকানবাড়ীগুলির ভিতরে যদিও আলো জ্বলছে। পেঁয়াজ রসুন মসলা মাংসের গন্ধ আসছে, তবু যেন প্রাণ হাঁপিয়ে আসছে। ছোট সরু সিঁড়ি বেয়ে দোকানের নীচের তলায় নেমে এলুম। কী অজস্র কী বিচিত্র দ্রব্য সম্ভার। কোনটা ফেলে কোনটা কিনি। কোনটা রেখে কোনটা দেখি। এত হাঙ্গামার চেয়ে best হচ্ছে কিছুই না কেনা। উনি বল্লেন,—হর্‌য়া! ধরেছ ঠিক—সেই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পথ;—একঢিলে একেবারে দুপাখী। পছন্দ করার এই বিষম strain থেকে brainকে বাঁচানো, আবার খরচের দায় থেকে পকেটকে বাঁচানো।—আমি মুখে বল্লাম হুঁ। সারাদিনের পরিশ্রমে তখন গা গুলোচ্ছে এই ছোট ছোট খুপরি ঘরের অজস্র ঝক্‌মকে জিনিষের ভীড়ে ক্লান্ত চোখ যেন বুজে আসছে। তবু আমি মনে মনে হাসতে ছাড়লুম না। সঙ্গে সঙ্গে বিধাতাপুরুষও বুঝি হাসলেন।

পরদিন সকালবেলা পায়ে পায়ে হেঁটে নদীর তীর দিয়ে মিউজিয়ামের বাগান পার হয়ে একটু ঘুরতেই দেখি—সারি সারি কয়েকটা দোকানে কালকের দেখা জিনিষ গুলি উঁকি দিয়ে হাসছে। ভোর-বেলাকার স্নিগ্ধ আলোয়, খোলা হাওয়ায় তাদের দেখে আর বিরক্তি এল না। সরাসরি ঢুকে গেলাম ভিতরে। আধা ফরাসী, আধা ইটালীয় এবং আধা মিশরিনী একটী সুন্দরী তরুণী আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। যত্ন করে এগিয়ে দিল নরম কোচ। রূপার আধারে দামী কাঁচের পান পাত্রে যত্ন করে নিয়ে এল ঘন সুগন্ধী টার্কিস কফি। আমাদের আশে পাশে টেবিলের উপরে ক্রমশে লাগল জিনিষের পাহাড়। টুকিটাকি কত অজস্র খেলনা। কত বিচিত্র সাজ সজ্জা খুঁটিনাটি কত সৌখীন উপকরণ। দামও যেন গত সন্ধ্যার চেয়ে কম বলেই মনে হল। তবে তার জন্যে হয়ত এই পরিবেশ আর ভোর বেলাকার এই খোসমেজাজটাই দায়ী।

আমাদের হোটেলের দক্ষিণ দিকের দরজা খুললেই নীলনদ। তার তটরেখা ধরে চলেছে রেলিংএ ঘেরা সুদৃশ্য প্রমোনাড, কংক্রীটে বাঁধা। সেই পথ দিয়ে পায়ে পায়ে চলে ছোট একটু বাগান পেরিয়ে কায়রো মিউজিয়াম। মিশরী ষ্টাইলের স্থাপত্যরীতি অনুসারে পাথরের বিশাল প্রাসাদে মিউজিয়মে সাজানো আছে। ঢুকতেই প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মাঝখানে ছোট্ট একটু বাঁধানো জলের ধারা। তার ভিতরে অনেক যত্নে লাগানো আছে কয়েক গুচ্ছ পাপিরাসের চারা। কায়রোর ধারে কাছে পাপিরাস নেই। অনেক দক্ষিণে নীলনদীর দুইধারে তীরের কাছ ঘেঁসে স্বল্পজলের বদ্ধজলায় পাপিরাসের জঙ্গল।

কোন আদিকাল থেকে এই সরু সরু পাপিরাস মিশরের সব প্রয়োজনের দায় মেটাচ্ছে কে জানে। পাপির ঘাসের শিকড় সেদ্ধ খেতে মন্দ নয়, সাধারণের পেট ভরানোর কাজ চলে। আর তার ডাঁটায় হয় দড়ি, সরু নৌকো, ঘরের বেড়া, আরো কত কী? আর সেগুলিকে সরু সরু করে চিরে আড়াআড়িভাবে রেখে জোরে চেপে চ্যাপ্টা করে তৈরী হয়েছিল, ঈষৎ হলদে রংএর প্রথম কাগজ। আজো কাগজ আপন নামের মধ্যে পূর্বপুরুষের নামের স্মৃতি বহন করে চলেছে—'পেপার।'

পিরামিডের কঠিন পাথরের চেয়েও এই তুচ্ছ ঘাসের মূল্য কম নয়। ওরই মত এই ঘাসের-চাপড়াও বহন করে চলেছে, ছ'হাজার বছর আগের মানুষের ইতিহাস। পাপিরের চ্যাপ্টা পাতায়, পাপিরেরই খাগড়া কলম অথবা তুলি দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ ছবির সারিতে প্রতি রাজা লিখে রেখেছে আপন মহিমার ইতিবৃত্ত, উজীর লিখেছে হিসেব। লক্ষ লক্ষ পাপিরের লেখন নানা মন্দিরের গর্ভগৃহে পড়ে থেকে আজ নিঃশব্দ মুখরতায় ব্যক্ত করছে মিশরের ইতিহাস। আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন রাজা কত ধনের মালিক ছিল। কার কত ছাগল, কত গরু। এরা পশুপ্রিয় জাত। এক একটা পশু ছিল এক একজনের অধ্যক্ষ দেবতা, তারই নামে নামকরণ হোত। গলায় দুলত তার ছবির তবক। গরু গাধা ছাগল, কুকুর বেড়াল সকলেরই বিশিষ্ট স্থান ছিল মানুষের জীবনে এবং সমাজে। পোষা বিড়ালটা মরলেও ওরা দুই ভুরু কামাত, আর কুকুর মরলে কামিয়ে ফেলত মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর। ইসলামের আওতায় সেই কুকুর অস্পৃশ্য হয়ে অচ্ছুৎ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ তাদের আর ঘরে ঠাঁই দিল না। অবস্থার গুণে আজ যেরাজা কাল সে ভিখারী। আজ যে দেবতা কাল সে ঘৃণিত পশুমাত্র।

মরু পথিক

কায়রো মিউজিয়ামটা বিশাল বিপুল। রোমের ভ্যাটিকানের মত অত বিস্তৃত হয়ত নয়,—কিন্তু আরো বিরাট, আরো গভীর, আরো মর্মভেদী তার প্রভাব। ঘরগুলি বোধহয় ৪০।৫০ ফুট উঁচু। পাথরের সব বিরাট মূর্তিগুলি ছোট ছোট বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে। তাদের গায়ের রং পুরাণো তামার মত। কপালে ঝালর দিয়ে নেমে আসা কাণঢাকা বাবরী করা চুল। প্রকাণ্ড কঠিন ঠাস বুনট চেহারা। বড় বড় টানা চোখে মোটা সুর্মা আঁকা—তারা হয় দুই হাত দুই হাঁটুর উপরে রেখে চেয়ারে বসে আছে। নয়ত একটা পা একটু ফাঁক করে এগিয়ে যাবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই পরণে কটিবাস, কারো বা ঝুল নেমেছে হাঁটুর নীচে। মন্দির থেকে তুলে চিত্রিত অংশগুলি দেয়ালে লাগানো রয়েছে। রোদ লেগে পাছে রং জ্বলে যায় তাই ঘরগুলি অসূর্য্যম্পশ্যা। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের বিষণ্ন ছায়া যেন বোঝার মত প্রাণের পরে চেপে থাকে। এইখানেই গ্রীক ভাস্কর্য্যের সঙ্গে মিশরের তফাৎ। গ্রীক ভাস্কর্য্যের প্রধান উপাদান মার্বেল। পাথর নয়, সে যেন আলো। মার্বেল যেন নিজেই তার স্বরূপের প্রতিবাদ। যদিও সে নিজেই জড়প্রস্তর,—তবু সে যেন জড় নয়, বরং তার বিপরীত। সে আলো, সে বাধা নয়। সে বহন করছে রূপের আহ্বান;—আলোর ডাক। মার্বেল পাথরে গ্রীক ভাস্করের মূর্তি তাদের প্রস্তররূপ পরিত্যাগ করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পীর হৃদয়াবেগ পাথরে করেছে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। পাথর ফেটে বেরিয়ে এসেছে লাবণ্যময়ী নারী, বলদর্পিত বীর, লতাপাতা ফুল। প্রকৃতি তার সহস্রবিচিত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন পাথরে। কিন্তু মিশরে লীলাময়ী অহল্যা পাষাণী হয়ে গেছে। পাথরের মধ্যে এসে প্রকৃতিও হারিয়েছে আপন প্রকৃতি। এই ঈগল, ওই নরসিংহ স্ফিঙ্কস্, এই সব বিশাল রাজমূর্তি—যেন শুধু উপাদানে প্রস্তর নয়,—এদের আত্মাও যেন জড় হয়ে গেছে। এদের সকল প্রকাশে রুক্ষ কঠিন ধূসর পাথর তার বিষাদাচ্ছন্ন জড়প্রভাব বিস্তার করে আছে। মানুষের দেহ যেমন 'মমি' হয়ে আছে, মানুষের মূর্তিও তেমনি পাথর হয়েই আছে। পাথর মানুষ হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু ছবিতে ঠিক উল্টো। প্রাচীন মিশরের যেটুকু আনন্দ তার সবটুকুই যেন ধরা আছে তার চিত্রকলায় আর চিত্রলিপিতে। নীলনদবিধৌত যত পাপিরঘাসের জঙ্গলে আর শস্যক্ষেত্রে, কত পাখী, কত মাছ, কত হাঁসবলাকার পাখার ঝটপট। কত সরু সরু ঘাসের নৌকোয় কত অঙ্কবালা কেশবতী কন্যাদের দল। [illegible]

কেউ নর্তকী, কেউবা শুধু ফলপুষ্পবাহিনী। গাঢ় সাদা এবং ঘননীলের সঙ্গে আরো নানা রঙের মিশ্রিত বর্ণিকাভঙ্গে এগুলি যেন সেই প্রাচীন কালের রসমূর্তির ছবি। প্রাচীনকালে শুধুই যে কবর খোঁড়া আর মমি করা হোত, তা নয়, সে যুগেও জীবন দুলত আনন্দে ;—নৃত্যগীত বাজনায় মুখর ছিল অন্তত কতগুলি লোকের দিন। ছবিগুলি সূক্ষ্ম তুলিতে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে উজ্জ্বল 'টেম্পারা'য় আঁকা। দেখে মনে হয়, এ ছবি যদিও পাষাণ ফলকে জড় রং তুলি দিয়েই আঁকা, তবু যেন এর মধ্যে প্রাণের চকিত লীলা থেমে থাকেনি ;—কাল থেকে কালান্তরে পাখা মেলে উড়ে চলেছে। যারা ওই পাথরের মূর্তি গড়েছে, এই ছবিও যে তাদেরই সৃষ্টি একথা হঠাৎ মানতে চায় না মন। মনে হয়, হয়ত ছবিগুলো পরবর্তীযুগের এশিয়ার শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত।

কবরের দেওয়ালের ফ্রেস্কো-চিত্র

রং তুলিতে আঁকা শুধু ছবি নয়, ছবি লেখা। এই চিত্রলিপিতে লেখা বিচিত্র প্রেমের কবিতার একটা বই হাতে পড়ল ওখানেই। ইংরেজী অনুবাদ পাশে পাশে দেওয়া। মিশরী প্রেমের পাত্রপাত্রী ভাই বোন। এই ধর্মবিদ্রোহী সমাজবিরুদ্ধ কাজ সে যুগের মিশরে ধর্ম এবং সামাজিক রীতি হিসেবেই পালিত হোত। সম্পত্তির লোভে দুর্নীতিও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি আলেকজাণ্ডার এদেশে যে গ্রীকরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তারাও ক্রমশ মিশরী ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের সমস্ত প্রথাগুলিই গ্রহণ করেছিল। তাই রোমান সীজার এসে দেখলেন, গ্রীকটলেমিবংশজাতা সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা তার বালক ভ্রাতা ও স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। মিশরে কোন মহাকাব্যের সন্ধান পাওয়া না গেলেও ছোট ছোট গল্প উপকথা অনেক আছে। তার মধ্যে ওদের যে জীবনী দেখতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে সে যুগের অন্য দেশের কাহিনীর বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

সমাজ এবং ধর্মনীতি যদিও দেশকাল সাপেক্ষ, তবুও মানুষের জীবননীতি বোধ হয় যুগে যুগে একই পথ ধরে চলেছে। তার যে বিশেষ কোন বদল হয়েছে এমন মনে হয় না। তেমনি বীজ বোনা, ক্ষেতচষা, শস্য তোলা, ছাড়ান নাড়ান, গোলাজাত করা। এ সব চিরকালই এক ;—যদিও পদ্ধতির হয়ত কিছু বদল হয়েছে আজকাল। শত সহস্র সাধারণ লোকের জীবন তখন যেমন চলত আজো প্রায় তেমনি চলছে। ধনীদের জীবনও বোধ হয় এক ছাঁচেই চলেছে সেই পুরাকাল থেকে,—তেমনি বিলাসবহুল, অলস আরামে নিষ্ক্রিয়।

ছোট ছোট মডেলে এই সব বিভিন্ন জীবনের ছবি ধরে রাখা আছে। মিউজিয়ামের বিরাট ঘরগুলি ভরে উঠেছে অসংখ্য ছোট বড় ফিগারে। বড় মূর্তিগুলি রাজা, রাণী, উজীর এবং পুরোহিতের। আর ছোট মূর্তিগুলি বয়ে নিয়ে চলেছে সেযুগের জীবনযাত্রার রূপ। সেযুগের দিনপঞ্জী যেন পড়ে নেওয়া যায় ;—ঐ ঝি চলেছে কাপড় নিয়ে, শিল নোড়াতে বাটনা বাটছে চাকর। এদিকে যুগলমূর্তি চলেছে ঘাসের বোঝা নিয়ে। ওদিকে নৌকো নেমেছে জলে, দাঁড় বাইছে যোলো দাঁড়ী। আর দেখলাম, একটী কালো-কোল ছোট মানুষের নেড়া মাথায় পরিষ্কার একটি টিকি।

ওপাশের তাকের মাঝখানে বসে আছে কাঠের একটা বালক রাজা। তার চোখ দুটীতে জ্বল জ্বল করছে, কোন নাম নাজানা পাথর।

কত বিচিত্র অলঙ্কার বাসন অস্ত্রশস্ত্র। হাতলগুলি সোনার পাতে মোড়া। দেয়ালের খাঁজে খাঁজে প্রতি ঘরেই মৃতদেহের মমি। দেহগুলি কঙ্কালের মতই শুধু তাতে কালো কাপড় জড়ানো। ওরা ওষুধ ভেজানো কাপড় দিয়ে মৃতদেহ টেনে বেঁধে রাখত। তখনকার দিনে আরো কোন দেশে এইরকম নিয়ম ছিল কে জানে? আমাদের দেশের মহাভারত রামায়ণ অথবা পুরাণ ইত্যাদিতে এর কোন নির্দেশ আছে বলে শুনিনি। শুধু মহাপরিনির্বাণসূত্রে, গৌতমের নিজ মুখের বাণীতে যেন এর খানিকটা ইসারা পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বলেছেন,—"হে আনন্দ, এই কুশীনাড়াতেই এই শালবৃক্ষতলায় আমি এখন শেষ শয্যা পাতলাম। কাজেই এখন এই জনপদবাসী মল্লদের প্রথামতই আমার সৎকার কোর। মল্লরা যেমন করে তাদের রাজচক্রবর্তীদের নিয়ে যায়, তেমনি করে মহার্ঘ্য নববস্ত্র দ্বারা আমার দেহ সপ্তবার বন্ধন করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন কোর।

আজকাল আমরা শুধু একখানি মাত্র নূতন কাপড়ে মৃতদেহ ঢাকা দিয়ে থাকি। কাপড় র‍্যাশনের দিনে তাও পাওয়া শক্ত হোত।

মিশর এখন তুলার দেশ। তুলা রপ্তানী করেই আজকের মিশরের যা কিছু ধনসম্পদ। সে যুগে মিশর ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শস্যখনি। আজ ওরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঁধ বেঁধে বন্যার জোর চাপে ব্যবস্থা করেছে। তাতে বন্যার জল নামতে চায় না। তার সেই

সোনাভরা পলিমাটির চাদর বিছিয়ে দিয়ে যেতে পার না। তাই শস্তের বদলে তুলোর চাষেই আজকাল মিশরের ঘর ভরে ওঠে। অথচ সেযুগে মিশরের তাঁতী তাঁত বুনত বোধহয় ভারতের তুলোয়। তমলুক অথবা মসলীপট্টম থেকে তখন মসলিন রপ্তানী হোত কি না কে বলতে পারে? মমিদের গায়ে জড়ানো একরকম অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি বাংলার মসলিনের সমগোত্রীয়। আশ্চর্য্য, প্রাচীন মিশরী চেহারাতেও যেন বাংলা দেশের পলিমাটির ছাপ। অবশ্য ঠিক আধুনিক বাংলা নয়—যে বাংলা জোলো দুধ, পুলিশের লাঠি, আর হাওয়া খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেছে, সেই বাংলা নয়। এই শ'খানেক বছর আগেও যে বাংলা তেলমালিসে পালিসকারী ঘাড়েগর্দ্দানে ঠাসামাথা কালো কালো গাঁট্টাগোট্টা চেহারায়, কদমছাঁটা চুলে, হাঁটুর উপরে ঠেঁটে তুলে, টানা টানা কালো চোখে, দূরবিস্তৃত বহুবিস্মৃত অতীত জীবনের আভাষ বয়ে, রোদে জলে চাষ করে বেড়াত, সেই বাংলার আদল যেন দেখতে পেলাম এদের মূর্ত্তিতে। শুধু যেন আর একটু বিষণ্ণ, আর একটু গম্ভীর ছায়া ফেলা। বহু সহস্র বছরের জড়মৃত্যু যেন তাদের অন্ধকার পাষাণের মূঢ়বিষাদে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মাথায় সাদা গামছা জড়িয়ে, কোমরে কৌপীন কষে বেঁধে ঐ যারা ঝুড়ি বয়ে পাথর নিয়ে যাচ্ছে, ওদের মধ্যে যে বিশেষ পরিচিত ভাব দেখছি, গ্রীকমূর্ত্তি দেখে তা মনে হয়নি। নীলনদের মোহানায় যারা থাকত, গঙ্গানদীর মোহনার দেশের মানুষের সঙ্গে তাদের মিল থাকা আশ্চর্য্য নয়। কিম্বা হয়ত দুইই মিশ্রজাতি বলে চেহারার এই মিল;—দুই দেশেই সাদার সঙ্গে কালো মিলেছে। কিন্তু সে মিশ্রণ তো ভারতের সর্বত্রই ঘটেছে। আধুনিক ঈজিপ্টেও সেই একই প্রভাব। কিন্তু আধুনিক ঈজিপ্টের সঙ্গে বরং উত্তর ভারতের পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশের সঙ্গে মিল আছে. অথচ প্রাচীন ঈজিপ্টে মিশরীকে পাঞ্জাবী বলে ভুল করার যো নেই। কিন্তু, যদি বল, বাঙালী নয় তো? তবে একবার দ্বিধাভরে দেখে তোমায় বলতেই হবে, হবেও বা। কালীঘাটের কাঠের পুতুলের সাদৃশ্যমাখা অনেক কিছু দেখা গেল। কে জানে এ দেখা শুধু কি ভ্রম, না,—এর মধ্যে কোন সত্যের বীজ আছে। নির্বাক কালসমুদ্রের নিঃশব্দ অন্ধকার তরঙ্গগর্জনের ভাষা শুনে এখবর কে উদ্ধার করবে?

অবশ্য মিশরের অতীত ভারতের মত বোবা নয়। সে তার অনেক কথাই পুঁতে রেখে গেছে, মাটির নীচে। নিজের আত্মাকে মৃতদেহের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার দুঃসাধ্য প্রয়াসে প্রাচীন মিশরের প্রত্যেকটী রাজা তার নিজের কালের অসংখ্য মানুষের জীবনকে অহোরাত্র ত্রস্ত করে মৃতের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছিলো বটে, তবু তার সেই অর্থহীন ব্যর্থ প্রয়াস একরকমভাবে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বই কী? শুধু রাজাদের নয়,—সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও বাঁচিয়ে রেখেছে সেদিন যাদের কথা কেউ কখনো ভাবেনি, যারা শুধু পরের জন্তে কবর খুঁড়ে আর পাথর বয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে, মৃত্যুর পরে পাপির ঘাসের মাদুর-জড়ানো বালির নীচে পড়ে থাকত,—শোকতপ্তা ধরণী যাদের ফিরে নিত নিজের গর্ভে,—দীপ্ত সূর্য্য যাদের ধীরে ধীরে গ্রহণ করত নিজের তেজের মধ্যে। সেই যে লক্ষ কোটি মানুষ, যাদের নামহীন কর্ম উপহারে গড়ে উঠেছে ফ্যারাওদের কীর্ত্তিদীপ্ত নাম, তাদের জীবনও কিছু কম বেঁচে নেই তাদের প্রভুদের কবরের মধ্যে। তারা চাষী মজুর শিল্পী এবং দাস। ওরা চিরকাল প্রভুর প্রয়োজন মেটাতে জীবন কাটিয়েছে, বিনিময়ে পেয়েছে ওদের আত্মাহীন জড়জীবনের শুধু আয়ুষ্কালটুকু বেঁচে থাকার অধিকার। তবু সেই ওরাও পেল অনেক আয়ুর অমরতা;—আজো রইল বেঁচে ছোট ছোট মডেল মূর্ত্তিতে সেজে। ঐ তো ওরা চলেছে মৃত প্রভুর প্রয়োজন মেটাতে। প্রভুর সঙ্গেই ওদের আত্মাও বাঁধা হয়ে গেছে অচ্ছিন্ন বাঁধনে। ঐ যে গিল্টী করা নৌকায় দাঁড় বাইছে দাঁড়ী, প্রভুর আত্মাকে স্বর্গের নীলনদী পার করাবে বলে। শোনা যায় আগে নাকি প্রভুদের সঙ্গে তাদের কিছু দাসদাসীকে কবর দেওয়া হোত, পরপারে মৃতের প্রয়োজন মেটানোর জন্তে। ক্রমে সে
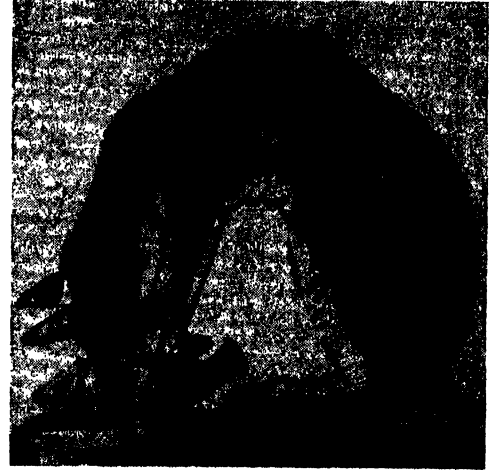
অতিথির অভ্যর্থনা

প্রথার বদলে দাসদাসীদের মডেলমূর্ত্তি এল কবরে। শুধু দাসদাসী বা প্রত্যক্ষ নিত্যব্যবহারের জিনিষগুলিই নয়। সেই সঙ্গে এল সমস্ত মিশরের সাধারণ জীবন। ছোট ছোট মডেল করা খুঁটিনাটি সব কিছু।

সে যুগের ধনীগৃহের সঙ্গে সবকালের ধনীগৃহের কোন বিশেষ প্রভেদ নেই। গেট খুলতেই বেক্ট্যাঙ্গুলার গড়নের ঘাসের বাগান, তার চারিধারে ফুলের কেয়ারী। মাঝখানে হয়ত ছোট্ট একটু জলাশয়, তার বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি নেমেছে জলের তলায়। কোনটা হয়ত সবটাই বাঁধানো। বাড়ীর সামনের দিকে বড় বড় বৈঠকখানা-ঘর। ভিতর দিকে ভাঁড়ারঘর রান্নাঘর ইত্যাদি। পিছন দিকে উঠোন,—সেখানে শস্ত ছড়ানো মাড়ানো পেষা ইত্যাদি হয়ে থাকে। ওরা আটায় ঈস্ট দিয়ে রুটী বানাতো—ইয়োরোপীয় রুটীর আদিপুরুষ। ওরা বড় বড় গামলায় রুটীর জন্তে আটা ঠাসত। আর শিলনোড়ায় বাটনাজাতীয় কিছু বাটত। রাজা রাণীরা চেয়ারে বসে নক্সাকাটা সোনার

বাটীতে করে পান করতেন সরবৎ অথবা সুরা, স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে দেবীরা এসে রাজার প্রসারিত পাত্রে ঢেলে দিত সুরা। দাসীরা নিয়ে আসত থালাভরা ফলের অর্ঘ্য, তরমুজ কলা আর খেজুর, আঙুর ছিলো কোন কোন পাত্রে। আঙুর ফলত উত্তর মিশরে মোহনার অন্তর্বর্তী দেশে।

লোহিতসাগরের ওপার থেকে এশিয়ার যাযাবর রাজারা যখন ঘোড়ায় চড়ে প্রচণ্ড ঝড়ের মত মিশরের বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, তখন ওরা সঙ্গে করে এনেছিলো আঙুর। আঙুর নইলে এশিয়াবাসীর কোনকালে চলে না। আঙুরের গেঁজে যাওয়া রস নইলে ওদের প্রাণ জেগে উঠতে চায় না। তাই ক্রমশ মিশরের উত্তরপ্রান্তে দেখা দিল কিছু কিছু আঙুর ক্ষেত। শস্য পচানো বীয়ার মদের সঙ্গে চলন হোল অভিজাতবরণী আঙুর রস মদিরার।

মৃত রাজাকে খুসী করতে মডেল নটীরা নাচছে। গায়ে গয়না ঝল্‌মল্ করছে, কোমরের স্বল্পবাস ঝক্‌ঝক্ করছে। মাথার উপরে পা তুলে, ধনুকের মত পিঠ বাঁকিয়ে, দুহাত মাথার উপরে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে মাটিতে পেতে একপা আকাশে তুলে' অন্য পায়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে পিছিয়ে দলে দলে মিশরাণী নটীরা নাচছে। সঙ্গে সঙ্গে কেউ বাজাচ্ছে গ্রীক lyre-এর মত কোন যন্ত্র, কেউ বাজাচ্ছে বাঁশী। এতরকম, এত অজস্র এত বিচিত্র জিনিষ, এত অজস্র মৃতদেহ। মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়া আছে, লেখা আছে সব মৃত্যুর ইতিহাস। কোন রোগে কে মরেছে তার সব খবর। আশ্চর্য্য, এদের এই মৃত্যু যজ্ঞই কিন্তু এদের জীবনকে বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছে। এই যজ্ঞেই প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে শিল্প। মূর্ত্তিতে যদিও তেমনি মিশরীয় কাঠিন্য, তবু তার মধ্যে ভাবের প্রকাশ তাকে যেন সুন্দর অসুন্দরের অতীত শুদ্ধ শিল্পসত্বের অমৃতে ডুবিয়ে তুলেছে। অষ্টাদশ রাজবংশের সময়কার একটী মস্তকের প্রস্তর অনুকৃতি দেখলাম। ক্ল্যাসিকাল ইয়োরোপের যে কোন মাষ্টারপীসের সঙ্গে ত তুলনীয়। শেষ যুগের মিশরী শিল্প যে গ্রীসের মাধ্যমে ইয়োরোপকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রীক ভাস্কর্য্যের বহু অবদান, মিশরের পরবর্তী যুগের অমর্ণা শিল্প পদ্ধতির সঙ্গে বহুলাংশে তুলনীয়। ধর্মে দর্শনে এবং শিল্পকলায় মিশর বাস্তববাদী। এইখানেই ভারতের সঙ্গে তার প্রভেদ। মিশরের মূর্তিগুলির প্রতিভঙ্গীতে বাস্তব প্রকৃতির অনুকৃতি পাথরের কঠিন সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও ফুটে উঠেছে। মিশরের শিল্প, কবর ও মন্দিরের জন্যে একই ভাবে, প্রায় একই বিষয় নিয়ে রচিত। শিল্প পদ্ধতি প্রায় এক বলে মনে হয়। তাই অনেকে মনে করেন মিশরী শিল্পে গতির বিচিত্রতা নেই। তা একই ধরণে একই ঢঙে চিরকাল ধরে রচিত। কিন্তু আমার তা মনে হয় না।

—আমাদের দেশের কথাই যদি ধরি, আর ইয়োরোপের কথাও। দুহাজার বছর ধরে ইয়োরোপে এবং ভারতে শিল্প দুই ভিন্ন পথে যাত্রা করেছিল। আজো পর্য্যন্ত তাদের বিষয়গুলি এক। অর্থাৎ ইয়োরোপের শিল্প খৃষ্ট বিষয়ক এবং ভারতের শিল্প বুদ্ধের জীবনী অথবা দেবদেবী বিষয়ক। কিন্তু এই দুটি হাজার বছরের কাল পথ অতিক্রম করতে তাদের অনেক আলোকিত এবং অন্ধকার আশ্রম পার হতে হয়েছে। চার হাজার বছর পরে যদি কেউ এই সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে এই দুহাজার বছরের শিল্পকলাকে চোখের সামনে মেলে ধরে, তবে এর উত্থান পতনের ইতিহাস নিয়েও তাকে এমনি মাথা ঘামাতে হবে। কাছ থেকে যে তফাৎগুলি প্রকট হয়ে দেখা দেয়, দূর তার মস্ত র‍্যাঁদা চালিয়ে তার সমস্ত খোঁচখাঁচ মিলিয়ে তাকে অনেকটা একাকার করে আনে।

প্রাচীন মিশরের সঙ্গে আজকের মিশরের কোন অংশে মিল আছে বলে মনে হয় না। না চেহারায়, না কর্মে না ধর্মে; তবু দেশটা তো এক। এই দেশেই তো মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে ঐ রাজা আর উজীর আর ঐ পুরুতরা ঐ মানুষদের চরিয়ে নিয়ে বেড়াত। এই দেশ যদি সেই দেশ, তবে এই কাল সেই কাল নয় কেন? একই দেশে, দুই যুগে কেন এত আশ্চর্য্য প্রভেদ?

—কে বলবে কেন?—কে দেবে উত্তর। শুধু এই মিউজিয়ামের সারা দোতালাটা জুড়ে তুতেন খামেনের কবরের ঐশ্বর্য্য স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকবে। কতযুগ ধরে এমনি তারা চেয়েছিল, অন্ধ ভূমিগর্ভে ১৯২২ সালে সহসা উদ্‌ঘাটিত হোল মাটির ঢাকনা—পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল,—তিন হাজার বছর আগের রাজৈশ্বর্য্য তার সমস্ত বৈভব, তার খুঁটিনাটি বিচিত্র বিলাসোপকরণ এবং তার তরুণ বীর রাজা ও তরুণী রাণীর অসংখ্য মূর্তি প্রতিকৃতি নিয়ে আবার এযুগের ধরণীতে প্রবেশ করছে।

নিতান্ত তরুণ বয়সেই তুতেন খামেন এশিয়ার কবল থেকে ঈজিপ্টকে উদ্ধার করে বীরত্বের প্রতীক স্ফিংকসরূপে নিজের মূর্তি গড়তে সমর্থ হয়েছিল। মিশরের শিল্পকলা এশিয়ান শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এই যুগে তার চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল সন্দেহ নেই। শিল্পের এত বহুল এত ব্যাপক এত বিচিত্র নিদর্শন অকস্মাৎ কবরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বিংশ শতাব্দীর চোখের সামনে প্রমাণ করে দিল যে মানুষের সভ্যতার অনেক রদবদল, রকমফের হয় বটে, কিন্তু তার উঠতি পড়তির একটা নির্দ্দিষ্ট মান বরাবরই আছে।

সারি সারি 'মামি',—এবং তাদের অনুরূপ ঢাকা দেওয়া কাঠের বাক্স। তার উপরে কত কী চিত্রলিপি লেখা।

তুতেনখামেনের দেহ পর পর চারটী সিন্দুক-বন্ধে রাখা ছিল। প্রত্যেকটী মোটা সোনার পাতে মোড়া রত্নখচিত আবরণ। সেগুলি সব সযত্নে সাজানো আছে মিউজিয়ামে। ওরই পাশে পাশে রয়েছে সোনার রথ, সোনার চতুর্দ্দোলা। কত অসংখ্য মহার্ঘ্য জিনিষ, আর সারি সারি কত কালের কত মানুষের মৃতদেহ। এই মৃতের রাজ্যে ধীরে ধীরে পার হয়ে আসতে আসতে, এক যায়গায় দেখি দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের প্যানেলে, তুতেথামেন তার নবোঢ়া রাণীর হাত ধরে তার মুখের দিকে প্রোফাইলের বিশাল একচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে। সমস্ত মৃতরাজ্যের জড় আঁধারের মাঝখানে হঠাৎ যেন এক টুকরো জীবনের আলো কেঁপে কেঁপে উঠল।—শোনা যায় তুতেখামেনের মৃত্যুর পরে তাঁর নবীনা বিধবা পত্নী, এসিয়াবাসী শত্রুপক্ষের হিটাইট রাজকুমারকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানান। প্রজারা

টের পেয়ে বিধবা রাণীর ভাবী স্বামীকে পথের মধ্যেই হত্যা করে। কে জানে এ কাহিনী সত্য কিনা। যদি সত্যও হয়, তবু সেদিনের সেই তরুণতরুণীর প্রথম প্রেমের দৃষ্টি বিনিময়টুকুও মিথ্যে নয়। আজো তার শাশ্বত সত্য কালের হাত এড়িয়ে, কালেরই বুকের উপরে চিত্রলেখায় জ্বলজ্বল করছে।

ফিরে এলাম যখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে গাঢ় হয়ে। ঘরে এসে দেখি খুকু লালী দুজনেই অসুস্থ। নীল নদীর মাছ ওদের সহ্য হয় নি। হোমিওপ্যাথীর টুকিটাকি সঙ্গে থাকত। সেই সব দিয়ে টিয়ে, নিজেরা অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনো বেশী রাত হয়নি। অদূরে মিউজিয়ামের থ্যাবড়া মাথায়, একটুকরো বাঁকা চাঁদ হেলে পড়েছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, ঘুমের মধ্যে তাকে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করলাম।

পাশাপাশি খাটে আমরা কজনে শুয়ে আছি। এসেছি কতদূর থেকে, —তিন সমুদ্র পার হয়ে। এ কোন দেশ? আবার সেই অর্থহীন প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে বর্ণহীন কালের ঘূর্ণাচক্রের মত ঘুরতে লাগল।

কে বলেছে দেশ স্থাবর;—আর গতি আছে শুধু কালের। দেশ চলেছে ছুটে, কাল থেকে কালে;—পথে পথে বদল করেছে বেশ। উত্তর আফ্রিকার এই প্রান্তজুড়ে বনভূমি কেন হঠাৎ কালের নিঃশ্বাসে শুকিয়ে শুকিয়ে রিক্ত সাহারার গৈরিক বসনে ঢাকল নিজেকে। কেমন করে কালের হাওয়া মেঘ টেনে নিয়ে বৃষ্টি ঝরাল, দক্ষিণ আফ্রিকার নীলনদের উৎসপথে। সেই জল বয়ে বয়ে কেমন করে আসোয়ানের বাঁধ ডিঙিয়ে বন্যা হয়ে ভাসিয়ে নিল তটরেখা, গড়ে তুলল সুন্দরী মিশরী ভূমিকে। কেমন করে ক্রমে ক্রমে কোথা থেকে দলে দলে মানুষ এল ধীরে ধীরে;—গড়ে উঠল মিশর জাতি। হাজার চারেক বছর ধরে উন্নতাবনত পথে পথে বার বার বেশ বদল করে করে মিশর এসে পৌছল আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কাল সীমার প্রান্তে। এরমধ্যে কতবার কতরকম ভাবে বিপর্য্যস্ত হল মিশর। এশিয়া থেকে দলে দলে এসে পৌছল হিক্সস্ রাখালের দল। মিশর দেশটা ছিল জলে ডোবা ডোবা, আল বাঁধা বাঁধা। সেই সব আলের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা ধ্বস্তবিধ্বস্ত করে দিল সে যুগের মিশর। কতদিন মাথা তুলতে পারল না দেশ,—তা প্রায় শ'পাঁচেক বছর ধরে তো বটেই। সর্বত্র অসুস্থ দেহ মনের চাপা যন্ত্রণার গোঙানি উঠতে লাগল। ক্রমে মিশরের প্রাণশক্তি আগন্তুককে সরিয়ে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করল নিজেকে। আবার নতুন সাজে সাজল দেশ। শিল্পকলায় এল নতুন আবেগ। জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় এল নতুন জোয়ার। এমনি করে হাজার খানেক বছর কাটার পরে আবার যখন কালের একটা অন্ধ সুড়ঙ্গ পার হয়ে চলছিল দেশ। সর্বত্র চলছিল ভগ্নমনোরথের নিরুৎসাহ বিষন্নতা, তখন আলেকজাণ্ডার এলেন এদেশে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীরের আগমনে বহুদিন পরে মিশর বুঝি তার ভূমিশয্যা ছেড়ে চকিতে উঠে বসল। নীলপদ্মের মালা গেঁথে অর্ঘ্য সাজিয়ে নীলনদের জলের অভিষেকে, মিশর তাকে বরণ করে নিল। এতদিন ধরে দুই সভ্যতার গুপ্ত প্রণয় চলছিল সন্দেহ নেই,—সেদিন থেকে প্রকাশ্য মিলনের গ্রন্থি পড়ল বাঁধা। মিশরে গ্রীসের যত প্রভাব পড়েছিলো, গ্রীসে মিশরের প্রভাব পড়ল তারো চেয়ে অনেক বেশী। শুধু শিল্প স্থাপত্য এবং চিকিৎসাতেই নয়। গ্রীকদর্শনেও নাকি মিশরের প্রভাব সুপরিলক্ষিত। অনেকে বলেন—মিশরী গুরুর পদপ্রান্তে বসেই এরিস্টটলের জ্ঞানশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। মিশরের ধর্মে কর্মে সমাজ বন্ধনে একটা অতি প্রত্যক্ষ বাস্তবের তীব্র প্রভাব। তার দর্শনও সেই প্রভাবের ছায়ামাখা।

গ্রীকরাজপ্রতিভূ যখন মিশরী সুন্দরীর গর্ভে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন দলে দলে গ্রীক এসে পত্তনি গাড়ল মিশরে। 'মমি'কারদের কাছে শিক্ষানবীশ করে গ্রীক সার্জনরা মৃতদেহ ডিসেকশন করতে শিখল, যে প্রথার প্রতি ঘৃণার অন্ত ছিল না সে যুগের পৃথিবীর;—বীভৎস ধর্মবিরুদ্ধপ্রথা বলে। ঈজিপ্টই ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন করল।

রোমান এল পরযুগে। তখন মিশর গ্রীকের বিচিত্র মিশ্রিত কামনা বিলাসের প্রাচুর্য্যে, উন্মত্ত দেশের ধনীসমাজ। সত্য ও সততা লুপ্তপ্রায়। সেই মূঢ় অন্ধযুগ থেকে আবার ধীরে ধীরে অভ্যুত্থিত হোল দেশ খৃষ্টধর্মের অধীনে। রোম্যান বাইজানটীনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। এবারে মিশর জেগে উঠল ধর্মের মাধ্যমে। মিশরের খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের কঠোর তপশ্চর্য্যা সে যুগের পৃথিবীতে এনেছিল বিস্ময়। কিন্তু শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত অথবা বিজ্ঞানচর্চায় মিশর আর কোনমতেই তার পূর্ব আসন ফিরে গেল না। ক্রমে তার ধর্মের আবেগও নিস্তেজ হয়ে এল নীলনদের নেতৃত্বে। অতি প্রাচীনকাল থেকে দেশব্যাপী যে একতাসূত্র গ্রথিত হয়েছিল, দুর্বল রাজনীতি তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এল আরব নওযোয়ানের দল। ঘোড়া ছুটিয়ে বন্দুক নিয়ে নবধর্মে দীক্ষিত আরব লুটতে এল কবরের চোরা ধন কিন্তু শুধু মৃতের ধন নয়, দেখতে দেখতে দুর্বল জীবিত রাজ্যটাও এসে পড়ল ওদের হাতের মুঠোয়। বহুকাল ধরে সভ্যতার দায় বহন করে মিশর তখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বার বার আক্রমণে ধ্বস্তবিধ্বস্ত হয়ে এসেছিল তার মজ্জা। এমন সময় ইসলাম তার তীব্র, দীপ্ত, তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ঝিলিকে রক্ত ক্ষরণ করতে করতে সমস্ত মিশর পরিব্যাপ্ত করে বিস্তৃত করলে তার প্রভাব—দেখতে দেখতে জোয়ার এল মরা গাঙে। ওরা ভেসে গেল, ডুবে গেল, মরল শত শত। ঐ চাষী, ঐ মজুর ঐ মৎস্যশিকারী জেলে, বদলে নিল তাদের ধর্ম, তাদের বেশবাস আচার ব্যবহার। ক্রমে এই তেরশ' বছর ধরে, প্রাচীন মিশর তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নীলনদের জলে বিসর্জন দিয়ে আজ আধুনিক যুগের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ান এসে তার হাত ধরেছিলেন,—কিম্বা বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীরের হাতে সেধেই হাত মিলিয়েছিল প্রাচীন মিশর—তার বুকছেঁড়া ছোট্ট একটু পাথরের অর্ঘ্য দিয়েছিল বীরকে। সেই দানের মহিমায় আধুনিক যুগ তাকে চৌকাঠ পার করে একেবারে তার বড় বৈঠকখানার ঘরের ভিতর বরণ করে নিয়ে এল।

যায়গাটার নাম রসেটো,—নেপোলিয়নের শিবির পড়েছে তারই কাছে! পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে পিরামিডের দিকে মুখ করে সূর্য্যাস্ত দেখছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। মরুভূমির রক্ত রঙীণ সূর্য্যাস্ত,—ছুটে এল তরুণ বালক,—সৈন্য হলেও ফরাসী;—জ্ঞান কৌতূহলে উৎসুক চিত্ত। ছুটে এসে সেনাপতিকে অভিবাদন করে হাতে দিল ঐ পাথর। কী আছে এতে—প্রাচীন মিশরের রহস্য যবনিকা উদ্ঘাটনের কোন গোপন মন্ত্র কী? সেনাপতি শুধু বীর নন,—জ্ঞানোৎসাহীও বটে। তিনভাগে ভাগ করা লেখা বোধহয় কোন একটা বিশেষ কথাই বলতে চাইছে। একটা ভাষা যেন চেনা চেনা,—পরিচিতির ছায়ামাখা ওকি প্রাচীন গ্রীক ভাষা না কি? হাঁ তাইতো বটে। তবে কি এই চিত্রলিপি, হায়রোগ্লাফি এবং এই তিন ভাষাতে কোন একই কথা লেখা আছে বোধহয়। একথা নিশ্চিত স্থির করতে এবং গ্রীকের সঙ্গে মিলিয়ে বাকী ভাষাগুলি পড়তে যদিও বহু বৎসরের সাধনা ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছিল,—তবু ঐ পাথরের টুকরোই সেই গৌরবের প্রথম অধিকারী।

ইয়োরোপের ছোঁয়ায় দেশটা বদলাতে লাগল দ্রুত। তার কিছু ভালো, কিছু মন্দ। তৈরী হোল সুয়েজ খাল,—ফরাসী বিজ্ঞানীর চেষ্টায়। নতুন প্রথায় বাঁধ উঠল গড়ে,—কিন্তু কোন গূঢ় কারণের প্রভাবে নতুন যুগ আসি আসি করে আজও যেন ঠিক এসে উঠতে পারছে না। অর্থাৎ তার সদরমহলেই যেন কেবল জায়গা পাওয়া গেছে;—যেখানে তার রূপমহল,—তার form, তার ইমারতের কাঠামো। কিন্তু তার ভিতর মহলের চাবী যেন আজো খোলা হয় নি;—যেখানে, তার খাস অন্তঃপুরে, নতুন আদর্শ, নতুন চিন্তার উৎস নবজাতকের নবজাগ্রত চোখের আভায় মিলিয়ে আছে। তাই মনে হচ্ছে সমস্ত দেশটা যেন মরে যাওয়া বিত্তের ভারে কঠিন পাষাণ হয়ে আছে। এই অন্ধকার রাত্রে আমার ঘুম না আসা, হাঁপধরা প্রাণের যেন দম বন্ধ করে দিচ্ছে। একটা অর্থহীন ঠাণ্ডা কালো ভয়, ধূসর পাথরের স্তব্ধ কঠিন মূর্তিগুলির সেটকরা চোখের ভিতর থেকে, ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে। আমার পাশে পাশে শুয়ে আছে, জীবন আর আনন্দ। আমার বুকের উপরে জমাট হয়ে জড়ো হচ্ছে, দুঃখ আর মৃত্যু।—হয়ত এ আমার মনের ভুল—হয়ত কেন নিশ্চয়। মৃত্যুকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে বটে, তবু মৃত্যু এখানে জমে থাকে নি। জীবন তাকে প্রতিপদক্ষেপে অতিক্রম করে গেছে। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি, নিজের অধিকার নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে ঈজিপ্ট, বাঁচার অধিকার। নিজের কর্মশক্তির পরে অখণ্ড আত্মবিশ্বাস না থাকলে,—এই মনোবল সংগ্রহ করা কঠিন। যে কাজ করে, সে মরে না। ঈজিপ্টও মরে নি। যা দেখেছি, তা শুধু মৃত মানুষের কঙ্কাল। শাশ্বত মানুষ আজো ঈজিপ্টের সদ্যনিদ্রোত্থিত প্রভাতী চিত্তের মধ্যে বসে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে। তবু সেদিন আমার প্রাণ-হাঁপানো বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল কবর খোঁড়া মৃতদেহের সারি। মাঝে মাঝে কষ্ট করে অন্ধকারের মুখোমুখী দুচোখ মেলে দিতে চেষ্টা করলাম, জানলার বাইরে। ঘরের চেয়ে দূরের চাওয়ায় আরাম বেশী চোখের।

দেখতে দেখতে চাঁদ ডুবে গেল,—নীরন্ধ্র অন্ধকারে প্লাবিত হোল দিক। জন্মমুহূর্ত থেকে যে মৃত্যু-প্রাণের উপরে চেপে বসে আছে, তার ভার মর্মে মর্মে পীড়িত করতে লাগল। তখন বিনিদ্র রাত্রিশেষে দয়াপরবশ বিধাতা কোটি যোজন দূর থেকে শান্ত একটা নরম আলো ঘর ভরে পাঠিয়ে দিলেন আমার জন্যে। সেই আলোর অমৃত আস্বাদ গ্রহণ করে সর্বচেতনার দ্বারা শান্ত জীবনরস পান করতে আমার ক্লান্ত চোখ আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

যে পৃথিবী

প্রভাকর মাঝি

যে পৃথিবী দিল দুঃখ ও হাহাকার
পাথুরে পথের রুক্ষ রৌদ্র-দাহ।
নিঃশেষে কেড়ে নিল যে চঞ্চলতা
বিলুপ্ত করে সবটুকু উৎসাহ।
কিশোর-কালের তরুণী প্রিয়ার মতো
সুখের সুরে ডাকলো, কাঁদালো শেষে।
দুমড়ে মুচড়ে আছড়ে দিল যে পথে
সেই পৃথিবীকে তবু যাব ভালবেসে।
কে এলো ব্যথায় সান্ত্বনা ঢেলে দিতে?
কেউ না কেউ না। বাতাসের হাঁসফাঁস।

আহা তবু জানি এখনো এখানে আছে
এক ফোঁটা নীল, এক ফালি নীলাকাশ।
আমাকে নিয়ত অস্থির করে তুলে
উদয়াস্তের জীবিকার সংগ্রাম।
জানি না, সে কোন্ চুম্বক-শক্তিতে
পৃথিবীর প্রেমে তবু বাঁধা পড়লাম!
দুঃখের সাথে স্বপ্ন দিয়েছে সবে,
বিদ্যুৎটুকু দিয়েছে সে চক্ষেই।
পৃথিবীকে তাই ভালবাসতেই হয়,
জীবন তো ভালবাসবার জন্যেই।
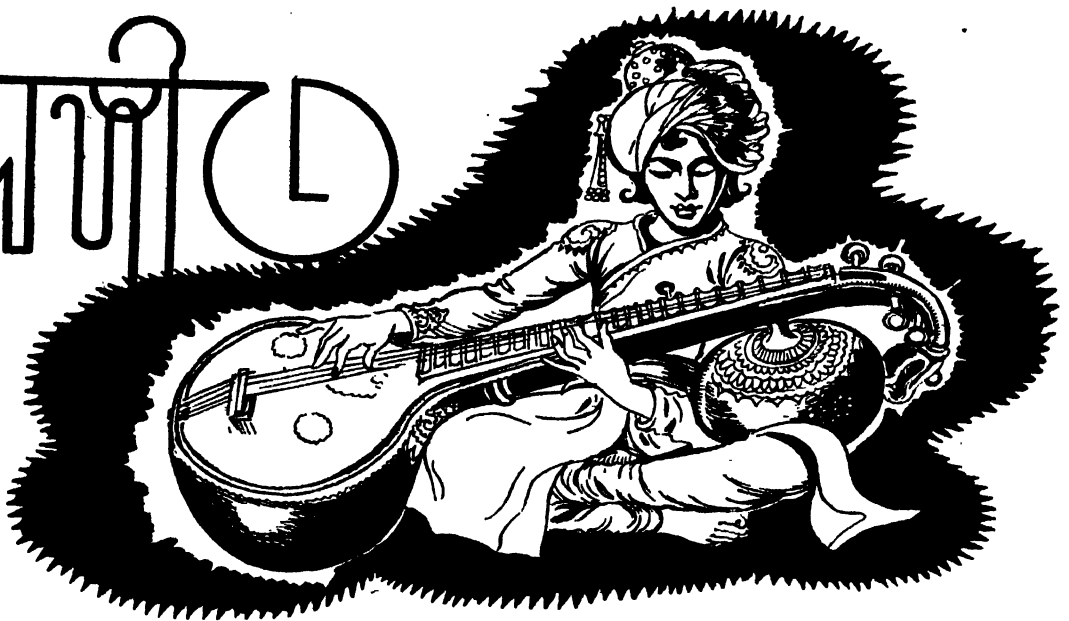
ইমনকল্যাণ—দাদ্‌রা

দুঃখে যেদিন কাঁদি সেদিন
তোমার অপমান—
ধূলায় সে কি লুটিয়ে রবে
আনন্দ সন্তান?

পিতার রাজ্যে এসেছি যে
ভুল্‌ব কি তা এক নিমেষে—
তুচ্ছ ধূলাখেলায় হবে
জীবন অবসান?

আপনাকে মোর জান্‌তে হবে
পিতার আদেশ মান্‌তে হবে

পিতার ইচ্ছা সফল করে'
জীবনে সুর আন্‌তে হবে।

তবেই হবে সফল জীবন
আনন্দেতে পূরিবে মন
মরণ হবে নূতন লোকে
বিজয় অভিযান—

ধূলায় সে কি লুটিয়ে রবে
আনন্দ সন্তান?

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
II { র্সা -া র্সা | ধা ধা -া I পা পা -া | গা গা -রা I সা সা -া | -া সা পা I
দুঃ ০ খে যে দি ন্‌ কাঁ দি ০ সে দি ন্‌ তো মা র্‌ ০ অ প

গা -া -া | -া -া -া I পা পা -া | পা পা -া I রা রা রা | রা রা -া I
মা ০ ০ ০ ন্ ০ ধূ লা য় সে কি ০ লু টি য়ে র বে ০

গা গা -রা | ন্া রা -া I সা -া -া | -া -া -া } II
আ ন ন্ দ স ন্ তা ০ ০ ০ ন্ ০

II { পা পা -গা | পা -া ধা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I র্সা -র্গা র্রা | র্গা র্গা র্মা I
পি তা য় রা ০ জ্যে এ সে ০ ছি যে ০ ভু ল্ ব কি তা ০

র্রর্গা -া র্গা | র্রা র্সা -া } I পর্সা -া র্সা | ধা ধা -া I পা পা -া | গা গা -রা I
এ০ ক্ নি মে যে ০ তু ০ চ্ছ ধূ লা ০ খে লা য়্ হ বে ০

সা সা -া | -া স্া পা I গা -া -া | -া -া -া I
জী ব ০ ন্ অ ব সা ০ ০ ০ ন্ ০

"ধূলায় সে কি লুটিয়ে রবে····· আনন্দ সন্তান" পূর্বের মত।

II { সা -া ধ্া | সা সা -রা I রা -া গা | গা গা -া I রা রা -া | রা রা -া I
আ প্ না কে মো র্ জা ন্ তে হ বে ০ পি তা য়্ আ দে শ্

সা -া গা | রা সা -া I সা সা -পা | পা -া পা I ধা ধা -স্া | স্া গা -া I
মা ন্ তে হ বে ০ পি তা য় ই ০ চ্ছা স ফ ল্ ক রে ০

গা গা -রা | গা পা -া I ন্া -া রা | রা সা -া } II
জী ব ০ নে সু য় আ ন্ তে হ বে ০

II { পা পা -গা | পা ধা -া I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I র্সা র্গা -র্রা | র্গা র্গা -র্মা I
ত বে ই হ বে ০ স ফ ল্ জী ব ন্ আ ন ন্ দে তে ০

গর্রা র্গা -া | র্রা র্সা -া } I পা র্সা -া | ধা ধা -া I পা পা -া | গা গা -রা I
পূ রি ০ যে ম ন্ ম র ণ্ হ বে ; নূ ত ন্ লো কে ০

সা সা -া | -া সা পা I গা -া -া | -া -া -া I
বি জ ০ য়্ অ ভি যা ০ ০ ০ ন্ ০

"ধূলায় সে কি লুটিয়ে······আনন্দ সন্তান" পূর্বের মত।

কৃষ্ণকলি

শ্রীশীতল সেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রজতের ড্রয়িং রুম্। সকাল বেলা। ভিতর হইতে ডাক্তার ও রজত কথা কহিতে কহিতে আসিল। তাহাদের পিছনে আসিল অনিমেষ

রজত॥ আজ কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার॥ দেখাদেখির আর কী আছে বলুন মিষ্টার বাসু। কালও যা' দেখেছি, আজও তাই দেখলাম—একই রকম। আপনাকে তো আগেই বলেছি মিষ্টার বাসু, ওষুধে এ-রোগ সারবার নয়।

অনিমেষ॥ তাহ'লে উপায়?

ডাক্তার॥ 'গুড্ নার্সিং ইজ্ হিজ্ ওন্লি মেডিসিন', —আমি তো মিষ্টার বাসুকে আগেই বলেছি।

রজত॥ দু'জন ভালো নার্স তো রেখেছি ডাক্তারবাবু। একজন দিনে, আর একজন রাতে—সব সময়েই রোগীর কাছে রয়েছে, সেবা-শুশ্রূষা করছে। কিন্তু 'ইম্প্রুভ্মেন্ট্' তো কিছুই দেখছি না।- জ্বরটা একবারও ছাড়েনি। জ্বরের ঘোরে কেমন যেন 'সেন্স্লেশ্' হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে শুধু 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করে ওঠে। আর তারপরেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ডাক্তার॥ 'রাইট্ ইউ আর্'! একথা আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি মিষ্টার বাসু—'দি পেসেন্ট্ নীড্স্ মাদার্স য়্যাফেক্‌সান্'। ছোট ছেলে কিনা—মাকে হারিয়ে যে ব্যথা ও পেয়েছে, মুখ ফুটে তা' প্রকাশ করতে পারছে না। একটা চাপা কান্না ওর ভেতরে গুমরে রয়েছে। আর তাই থেকেই ওর এই অসুখ।

অনিমেষ॥ এ অসুখ তাহ'লে সারবে কিসে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার॥ সেইজন্যেই তো আমি মিষ্টার বাসুকে বলছিলাম,—এ কেসে এমন 'নার্সিং' দরকার, যাতে থাকবে সত্যিকার আন্তরিকতা। মায়ের মতো স্নেহ-মমতা দিয়ে, আদর-যত্ন করে মায়ের অভাব ওর ভোলাতে হ'বে। আচ্ছা, এক কাজ করুন না মিষ্টার বাসু।

রজত॥ বলুন কী কাজ।

ডাক্তার॥ এই ধরুন—আমি বলছিলাম কি—আপনার কোন নিকট আত্মীয়াকে কিছুদিনের জন্যে না হয় এ বাড়ীতে নিয়ে আসুন—মানে, এমন একজনকে রোগীর কাছে রাখুন—যার মাঝে হারানো মাতৃ-স্নেহ ও আবার খুঁজে পায়। আমার মনে হয়, তাহ'লেই রোগী তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

রজত॥ সেই ব্যবস্থাই করবো ভাবছি, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার॥ আর ভাবাভাবি নয় মিষ্টার বাসু। যাতো শীগ্‌গীর পারেন, সেই ব্যবস্থাই করে ফেলুন। নইলে রোগীকে সারিয়ে তোলা মুস্কিল হ'বে। আচ্ছা, এখন আমি চলি মিষ্টার বাসু। আবার সন্ধ্যেবেলায় আসবো। নমস্কার।

রজত ও অনিমেষ॥ নমস্কার।

ডাক্তার চলিয়া গেল। রজত তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। মুখে তাহার চিন্তা ও উদ্বেগের ছাপ।

অনিমেষ॥ (অল্প কিছুক্ষণ পরে) আমি তাহ'লে আজই বোম্বে চলে যাই, রজত।

রজত॥ (সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া) বোম্বে! কেন?

অনিমেষ॥ বোম্বে গিয়ে লালীকে নিয়ে আসি।

রজত॥ (কঠিনভাবে) না, তার দরকার হ'বে না।

অনিমেষ॥ কিন্তু ডাক্তারবাবু তো বললেন, তারই একান্ত দরকার।

রজত॥ (আরো কঠিনভাবে) না। তাহ'লেও এ-বাড়ীর দরজা তার কাছে চিরকালের জন্য বন্ধই থাকবে।

অনিমেষ॥ ছিঃ রজত! এখন তোমার রাগ বা

অভিমান করার সময় নয়। শুনলে তো—ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, মাকে কাছে না পেলে খোকনকে সারানো মুস্কিল হ'বে। মাতৃস্নেহই ওর অসুখের একমাত্র ওষুধ।

রজত॥ কিন্তু তুমিই বল অনিমেষ, যে মা তার নিজের ছেলেকে—অতোটুকু দুধের ছেলেকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, তার অন্তরে কী স্নেহ-মমতা বলে কোন জিনিস আছে? (উত্তেজিতভাবে) তুমি কি কোনদিন শুনেছো অনিমেষ, নিজের ছেলের চেয়েও মার কাছে বড় হ'য়েছে ফিল্মে অভিনয় করা? সিনেমার টান স্বামী-পুত্রের টানের চেয়েও বেশী?

অনিমেষ॥ মনে কিছু করো না ভাই—আমি বলবো, এ সবের জন্যে তুমিও কম দায়ী নও।

রজত॥ (সাশ্চর্য্যে) আমি দায়ী! কেমন করে?

অনিমেষ॥ তুমি যদি গোড়া থেকে রাশ্‌ একটু টেনে ধরতে—

রজত॥ হাঃ হাঃ হাঃ! ওইখানেই তোমার ভুল অনিমেষ—ওইখানেই তোমার ভুল। লালীর মতো অতি-আধুনিক মেয়েরা যে ঘোড়া আজ ছুটিয়েছে, তার রাশ্‌ টেনে ধরার ক্ষমতা কারোরই নেই—ওদের নিজেদেরও নেই। ওদের এই উদ্দাম প্রগতির রেশের শেষ কোথায় ওরা নিজেরাই জানে না।

অনিমেষ॥ কিন্তু বোম্বেতে যাবার আগে লালী কলকাতায় প্রথম যখন ফিল্মে নামলো, তখন তো তুমি তাকে নিষেধ করতে পারতে।

রজত॥ নিষেধ! ওসব মেয়েরা স্বামীর বাধা-নিষেধকে থোড়াই 'কেয়ার' করে।

অনিমেষ॥ বোম্বে যাবার সময় খোকনকে লালী নিয়ে যেতে চায় নি?

রজত॥ চেয়েছিল। কিন্তু আমি ওকে স্পষ্টই বলে দিলাম—"আমার ছেলেকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না।" লালী বললে—"ওতো আমারও ছেলে।" বেশ কঠিন ভাবেই ওকে আমি জানিয়ে দিলাম—"তাহ'লেও খোকনের পরিচয় হ'লো, 'ডিষ্ট্রিক্ট্‌ জাজে'র ছেলে ও—অভিনেত্রীর ছেলে নয়। সন্তানের অধিকার পেতে গেলে এ বাড়াতে থাকতে হ'বে স্নেহময়ী জননীরূপে—উচ্ছৃঙ্খলা অভিনেত্রীরূপে নয়।"

অনিমেষ॥ সে কথার লালী কী জবাব দিলে?

রজত॥ তখন কিছু বললে না। তবে যাবার দিন খোকনকে জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। আমিও জোর করে খোকনকে আট্‌কে রাখি। শেষে আমাকে কোর্ট-পুলিশের ভয় দেখিয়ে একাই চলে গেল।...এ সবের পরেও তুমি কি বল অনিমেষ, লালীকে বোম্বে থেকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়া আমার উচিত?

অনিমেষ॥ তবুও খোকনকে সারিয়ে তুলতে হ'বে তো?

রজত॥ হ্যাঁ, ওকে সারিয়ে তুলতে হ'বে—আমার খোকনকে বাঁচাতে হ'বে—যেমন করে হোক্‌ বাঁচাতে হ'বে।

অনিমেষ॥ তাহ'লে ডাক্তারবাবু যা বলে গেলেন, তার ব্যবস্থা কী করবে?

রজত॥ সে ব্যবস্থাও আমি ঠিক করে ফেলেছি অনিমেষ। এ বিষয়ে তোমাকে শুধু একটু সাহায্য করতে হ'বে। আর সেই জন্যেই তোমায় আজ সকালে ডাকিয়ে আনলাম। আমার এই একটি অনুরোধ তোমায় রাখতেই হ'বে ভাই।

অনিমেষের হাত ধরিল

অনিমেষ॥ আহা, অনুরোধের কথা বলে আমায় আর লজ্জা দিও না রজত। আমায় কী করতে হ'বে, তাই বল।

নেপথ্যে রমেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল

রমেন॥ (নেপথ্য হইতে) রজত—রজত আছো নাকি?

অনিমেষ॥ ওই মামাবাবু আসছেন বোধ হয়। আমি ভেতরে যাই।

রজত॥ কেন? ভয় নাকি?

অনিমেষ॥ না, ভয়ের কথা নয়। লালীর সব ব্যাপার শুনে আমার মাথা গরম হ'য়ে গেছে। শেষে কী বলতে, কী বলে ফেলবো। তার চেয়ে সরে পড়াই ভালো। আমি তোমার লাইব্রেরীতে গিয়ে বসছি।

অনিমেষ দ্রুত ভিতরে চলিয়া গেল। বাহির হইতে রমেন ও এলা আসিল। রমেন আসিয়া রজতের সহিত কথা কহিতে শুরু করিল। আর সেই ফাঁকে এলা ভ্যানিটী ব্যাগ হইতে পাউডার-পফ্‌টি বাহির করিয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া অভ্যাসমত প্রসাধনে ব্যস্ত হইল।

রমেন॥ এই যে রজত! ব্যাপার কী বলতো? 'আই মীন্'—পাটনা থেকে আজ সকালে ফিরে এসে দেখি লালী বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে। 'আই মীন্'—লালী নাকি বম্বে চলে গেছে।

এলা॥ (প্রসাধন করিতে করিতে) বলা নেই, কওয়া নেই, লালী হঠাৎ বোম্বে চলে গেল কেন?

রজত॥ (গম্ভীরভাবে) জানি না।

রমেন॥ জানো না? 'হোয়াট্ ডু ইউ মীন্ বাই ত্বাট্'? 'আই মীন্'—জানো না মানে?

রজত॥ (সহজ কণ্ঠে) জানি না মানে—জানি না।

এলা॥ তোমায় কিছু বলে যায় নি?

রজত॥ বলা হয় তো প্রয়োজন মনে করেনি।

রমেন॥ তুমি কী বলছো রজত? 'আই মীন্'—তুমি তার স্বামী—

রজত॥ সে তো নামে মাত্র।

এলা॥ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি নিশ্চয়ই লালীর সঙ্গে ঝগড়া করেছো।

রজত॥ ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়।

এলা॥ তা হ'লে নিশ্চয়ই তার এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছিলো।

রজত॥ অসুবিধে হবার তো কোনো কথা নয়। অসুবিধে হচ্ছিলো বলেই নতুন একখানা গাড়ী কিনে দেওয়া হলো। অসুবিধে হচ্ছিলো বলেই পৈতৃক পুরোনো বাড়ী ছেড়ে আলিপুরের এই নতুন বাড়ীতে আসা হ'লো। অসুবিধে হবে বলেই এ বাড়ীতে পুরোনো চাকর-বাকর ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন বয়-বাবুর্চি রাখা হলো। সব দিক দিয়েই সুবিধে যাতে হয়, সেই ব্যবস্থাই করে দেওয়া হয়েছিল।

রমেন॥ তা হ'লে চলে গেলই বা কেন?

রজত॥ আমি তা' কেমন করে জানবো বলুন?

এলা॥ কবে ফিরবে বলে গেছে?

রজত॥ না। কবে ফিরবে—তা' সে বলে যায় নি বটে, তবে আমি তাকে বলে দিয়েছি—এ বাড়ীতে ফেরার পথ তার বন্ধ।

রমেন ও এলা॥ (চমকাইয়া) বন্ধ!

রজত॥ হ্যাঁ, বন্ধ। এ বাড়ীর দরজা তার কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ।

রমেন॥ এ তুমি কী বলছো রজত? 'আই মীন্'—লালী তোমার বিবাহিতা স্ত্রী—

রজত॥ হ্যাঁ। আমার বাড়ীতে থাকতে গেলে আমার বিবাহিতা স্ত্রীর মতোই থাকতে হ'বে। নইলে এ বাড়ীতে তার স্থান হ'বে না।

এলা॥ কী! তোমার স্পর্দ্ধা তো বড়ো কম নয়। তুমি আমাদের মেয়েকে অপমান করেছো। বাড়ী থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছো!

রমেন॥ আমার মেয়েকে অপমান করার তোমার কোনও অধিকার নেই। তাকে যখন তোমার ভালো না লাগছিলো, 'ইউ কুড্ হ্যাভ্ ডাইভোর্স্‌ড্ হার্।' 'আই মীন্'—তুমি লীলাকে স্বচ্ছন্দে 'ডাইভোর্স' করে দিতে পারতে।

এলা॥ জানোই তো বামুন-কায়েতের বিয়ে—তিন আইনের বিয়ে। সে বিয়ে বাতিল করতে তিন মিনিটও লাগে না।

রজত॥ হ্যাঁ, সেই করলেই বোধ হয় ভালো হ'তো।

এলা॥ তাই যদি ভালো হতো, আমাদের মেয়েকে তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

রজত॥ ভুল করেছি—ওকে বিয়ে করে জীবনে আমি মস্ত বড় ভুল করেছি।

রমেন॥ ভুল তুমি করোনি। ভুল করেছি আমরাই। 'আই মীন্'—তোমার মতো একটা 'আন্‌কাল্‌চার্ড্', 'আন্‌সোশ্যাল্'—একটা 'ব্যাক্‌ডেটেড্' ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমরাই ভুল করেছি। আমি আজই বোম্বে চলে যাচ্ছি। লালীকে দিয়ে 'ডিসোলিউসান্ অফ্ ম্যারেজে'র একটা 'পিটিসান্' কোর্টে করিয়ে দেবো। আমি আবার ওর বিয়ে দেবো।

এলা॥ আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম—'হি ইজ্ নো ম্যাচ্ ফর্ আওয়ার লালী'। লালীর স্বামী হ'বার যোগ্যতাই ওর নেই। না গেছে য়্যামেরিকায়—না গেছে বিলেতে।

রজত॥ বিলেতে বা য়্যামেরিকায় যাইনি বলে আমার এতোটুকুও লজ্জা নেই। স্বাধীন ভারতের ছেলে আমি—

বড় চাকরী করলেও খাঁটী ভারতবাসী হ'য়েই আমি থাকতে চাই।

রমেন॥ কেন? বিলেত-ম্যামেরিকা ঘুরে এসেছি বলে আমরা কী আর ভারতবাসী নই?

রঞ্জত॥ না। আপনারা ইংরেজও নন্, ভারতবাসীও নন্। আপনারা হ'লেন ইংরেজের খোলশ। ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে গেলেও আপনাদের মতো যে খোলশ তারা এখানে ছেড়ে রেখে গেছে, সাপের খোলশের মতোই আমাদের সমাজকে তারা আজও বিষাক্ত করে তুলছে।

রমেন॥ কী তুমি আমাদের অপমান করছো? আমি তোমার বিরুদ্ধে 'ডিফামেশান্ চার্জ্জ' আনবো।

এলা॥ আজই—এক্ষুণি—

রমেনের হাত ধরিয়া সজোরে টান মারিল

রমেন॥ উহু-হু—বাত—বাত—

রমেনকে টানিয়া লইয়া এলা সদর্পে বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলকণ্ঠ মিত্রের বাড়ীর দালান। পাশেই দোতালায় যাইবার সিঁড়ি। তখন বেলা দশটা বাজে। কনক বাহির হইতে আসিয়া ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল। সিড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কুন্তলা কনককে দেখিয়া বলিয়া উঠিল

কুন্তলা॥ কীগো! সকালে উঠেই চা না খেয়ে বেরিয়েছিলে?

কনক॥ 'জন্সন্ কোম্পানী'র বড় সায়েবের বাড়ীতে গিয়েছিলাম—একটা টেণ্ডারের খবর নিতে!

এতোক্ষণে কুন্তলা নামিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

কুন্তলা॥ টেণ্ডারের খবর তো নিতে গিয়েছিলে, কিন্তু এধারের খবর জানো?

কনক॥ এ ধারের আবার কী খবর কুন্তলা?

কুন্তলা॥ শুধু খবর? জো-র খবর।

কনক॥ এ ধারের খবর—মানে, আমাদের এই বাড়ীর খবর?

কুন্তলা॥ হ্যাঁগো হ্যাঁ। খবরের মতো খবর।

কনক॥ কী খবর?

কুন্তলা॥ ওঃ! সে একেবারে ভীষণ খবর।

কনক॥ ভীষণ খবর!!

কুন্তলা॥ উঃ! সে যা' ভীষণ খবর, ভাবতেও আমার সারা গা শিউরে উঠছে।

কনক॥ কী হলো আমাদের বাড়ীতে কুন্তলা? এমন ভীষণ খবর?

কুন্তলা॥ ওরে বাপ্‌রে! এমন ভীষণ খবর জীবনে আমি কখনো শুনিনি।

কনক॥ আহা, ব্যাপারটা কী হয়েছে বলবে তো?

কুন্তলা॥ ব্যাপারটা যা' হ'য়েছে, তা' বলবার মতো নয়—শোনবার মতোও নয়।

কনক॥ আঃ! কী মুস্কিল! কী হয়েছে বলবে তো?

কুন্তলা॥ বলবো আর কোন্ মুখে?

কনক॥ তোমার ওই শ্রীমুখেই বল, আমি শুনি।

কুন্তলা॥ আহা, বলবো কী করে? সে কথা বললেও পাপ—শুনলেও পাপ।

কনক॥ আরে গেল যা! এর মধ্যে আবার পাপ-পুণ্যি এলো কোথা থেকে? যা ঘটেছে, তাই বলবে তো।

কুন্তলা॥ বলবো আর কী? একেবারে অঘটন ঘটে গেছে।

কনক॥ নাঃ! তোমায় নিয়ে আচ্ছা বিপদে পড়লাম তো। তোমার যে কী একটা ওই বদ্‌স্বভাব—প্যাঁচানো কথা ছাড়া কিছুতেই তুমি আর সাদা কথা কইতে শিখলে না!

কুন্তলা॥ এতো আর সাদা কথা নয়গো। এ যে রঙীণ কথা।

কনক॥ রঙীণ কথা? তুমি কার কথা বলছো কুন্তলা?

কুন্তলা॥ বলছি তোমার বোনের কথা গো—তোমার গুণবতী বোনের কথা।

কনক॥ মানে—কৃষ্ণার কথা?

কুন্তলা॥ হ্যাঁগো হ্যাঁ, কৃষ্ণার কথা।

কনক॥ কী হয়েছে কৃষ্ণার?

কুন্তলা॥ হবে আর কী। কৃষ্ণা কৃষ্ণ পেয়েছেন।

কনক॥ কুন্তলা। হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে ব কী হ'য়েছে কৃষ্ণার? কোথায় সে?

কুন্তলা ॥ (অর্থপূর্ণ হাসির রেখা টানিয়া) কোথায় সে ? আমিও তো তাই বলছি, কোথায় সে ?

কনক ॥ কৃষ্ণা বাড়ীতে নেই ? কোথায় গেছে সে ?

কুন্তলা ॥ কোথায় গেছে তা' আমি কী করে জানবো বল ? এতো বেলা হয়েছে, এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি দেখে আমি গেলাম ওপরে ওকে ডাকতে। গিয়ে দেখি, ওর ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করলাম। তবুও কোন সাড়াশব্দ নেই।

কনক ॥ বল কী ! কোন সাড়াশব্দ নেই ? তারপর ?

কুন্তলা ॥ দরজায় ধাক্কা দিতে গেলাম—দরজা গেল খুলে।

কনক ॥ (রুদ্ধশ্বাসে) তারপর ? তারপর ?

কুন্তলা ॥ ঘরে ঢুকে দেখি, কেউ নেই।

কনক ॥ (বিবর্ণ মুখে) য়্যাঁ। কেউ নেই ?

কুন্তলা ॥ না, কেউ নেই। ঘরে দেখলাম, বিছানার ওপর কাঁচের গেলাসটা এমন ভাবে রয়েছে, যাতে সবার নজর সেইদিকেই পড়ে। আমি এগিয়ে গেলাম।

কনক ॥ গিয়ে কী দেখলে ?

কুন্তলা ॥ দেখলাম, কাঁচের গেলাস চাপা রয়েছে—

কনক ॥ কী চাপা রয়েছে ?

কুন্তলা। জোর খবর।

কনক ॥ কী জোর খবর ?

কুন্তলা ॥ (আঁচল হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া কনককে দিতে দিতে) পড়েই ছাখো কী খবর।

কনক কাগজটি খুলিয়া পড়িতে লাগিল

কনক ॥ (পাঠ) "দাদা ও বৌদি !

তোমাদের গলগ্রহ হইয়া আর আমি থাকিতে চাহিনা। তাই আমি নিজেই আমার নিজের পথ বাছিয়া লইলাম। প্রণাম নিও। ইতি—

কৃষ্ণা।"

চিঠিখানি পড়িয়া কনকের মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল।

কনক ॥ (অস্ফুটস্বরে) "নিজেই আমার নিজের পথ বাছিয়া লইলাম।"

কুন্তলার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল।

কুন্তলা ॥ (কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তা' ছাড়া আর করে কী বল ? বাপ-দাদারা তো আর তার কিছু কিনারা করলেন না। বাধ্য হ'য়েই বেচারাকে নিজের পথ নিজেকেই বেছে নিতে হ'লো।

কনক ॥ তার মানে ?

কুন্তলা ॥ মানে—বাবা মারা গেলেন—মা কাশীতে চলে গেলেন তাঁর ভায়ের কাছে, আর দাদাতো দিনরাত কাজ কাজ করেই ব্যস্ত। কিন্তু তার মনেও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে।

কনক ॥ কিন্তু কৃষ্ণাতো নিজেই বলেছিলো যে, সে বিয়ে করবে না।

কুন্তলা ॥ তা হ'লেই বুঝে ছাখো, বোনটি তোমার কীরকম ডুবে ডুবে জল খায়। মুখে বলে, বিয়ে করবো না, আর এধারে—

কনক ॥ না, না, কুন্তলা, তুমি যা ভাবছো, তা' নয়। কৃষ্ণা অতোটা খারাপ কাজ করতে পারে না। হাজার হোক্, বেণেটোলার মিত্তির-বাড়ীর মেয়ে সে।

কুন্তলা ॥ বেণেটোলার মিত্তির-বাড়ার মেয়েদের বয়েস বুঝি বাড়ে না ? দিনে দিনে কমে যায় ? ওদের মনে কামনা বলে কোন কিছুই থাকে না বুঝি ?—না বাপু, এমন মেয়ে আমি কস্মিন্‌কালে দেখিওনি—শুনিওনি। বাপ-দাদার বংশে কালি দিয়ে এভাবে পালিয়ে না গিয়ে বললেই পারতো—কাকে সে বিয়ে করতে চায়।

কনক ॥ তুমি খালি পালিয়ে যাওয়ার কথাই ভাবছো। এমনওতো হ'তে পারে যে, কৃষ্ণা আত্মহত্যা করেছে।

কুন্তলা ॥ (শ্লেষ সহকারে) আত্মহত্যা ? কেন গো ? কোন দুঃখে ?

কনক ॥ (রাগান্বিত হইয়া) তোমার ওই মুখের জন্যে।

কুন্তলা ॥ আমার মুখের জন্যে ?

কনক ॥ (সক্রোধে) হ্যাঁ, তোমার কথার জন্যে। বিয়ে হচ্ছিলো না বলে কৃষ্ণাকে তুমি কম কথা শোনাওনি। তার পর—মা কাশীতে চলে যাবার পর থেকেই উঠতে-বসতে তুমি যে ভাবে কৃষ্ণাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা করতে—সে কী আর আমি শুনিনি ? কতোদিন তোমাকে বলেছি—

কুন্তলা। আমিতো আর অন্যায় কিছু বলিনি। উচিত কথাই বলেছি। আইবুড়ী যুবতী হ'য়ে দাদার ঘাড়ে বসে যে মেয়ে অন্নধ্বংস করে, আমি বলে তাকে শুধু দুটো কথাই বলেছি, অন্য কেউ হ'লে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতো।

কনক ॥ কৃষ্ণা আমার বোন কিনা, তাই তুমি একথা বলতে পারলে। তোমার বোন হ'লে তা' বলতে পারতে না।

কনক রাগান্বিতভাবে বাহিরে চলিয়া গেল

কুন্তলা। যার জন্তে করি চুরি, সে-ই বলে চোর।

অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

রঞ্জতের ড্রয়িংরুম্। সন্ধ্যা সবে মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। রঞ্জতের পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স্ক শিশু-পুত্র খোকন বাড়ীর ভিতর হইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিল

খোকন ॥ না, না, আমি খাবো না—আমি খাবো না—

খোকনের পিছনে পিছনেই প্রবেশ করিল কৃষ্ণা। অতি সাধারণ বেশ তাহার। মুখে মলিনতার ছাপ। দুশ্চিন্তায় ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তাহার বয়স যেন অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার হাতে এক গেলাস দুধ

কৃষ্ণা ॥ (খোকনকে ধরিয়া) ছিঃ খোকন। এমনি ভাবে ছুটোছুটি করে? আজ একটু ভালো আছো, অমনি দুষ্টুমী শুরু করেছো? ডাক্তারবাবু শুনলে কতো বকবেন তোমায়।···বেসো এইখানে।

সেণ্টার টেবিলের সম্মুখস্থ সোফায় খোকনকে ধরিয়া বসাইল

কৃষ্ণা ॥ নাও, এই দুধটুকু খেয়ে ফেলোতো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তোমার খাবার সময় হয়েছে।

খোকন ॥ (উঠিয়া পড়িয়া) না, আমি কিছুতেই খাবো না।

কৃষ্ণা ॥ (দুধের গেলাস টেবিলের উপর রাখিয়া খোকনের নিকট গিয়া) লক্ষ্মীটি সোনা আমার। খাবো না বলতে আছে? এই ক'দিন তুমিতো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো খাচ্ছিলে। আজ আবার খাবে না কেন বলছো?

খোকন ॥ আগে বল, আমার মা কোথায়?

কৃষ্ণা ॥ তোমার মা?

কৃষ্ণাকে চিন্তান্বিত দেখাইল

খোকন ॥ হ্যাঁ, আমার মা? আমার বাবা?

কৃষ্ণা ॥ তোমাকেতো আজ সকালেই বললাম, তোমার বাবা আফিসের কাজে অ-নে-ক দূরে গেছেন।

খোকন ॥ আর আমার মা?

কৃষ্ণা ॥ তোমার মা? তোমার মা খোকন? (তার পর হঠাৎ) তোমার মাতো এইখানেই রয়েছে।

খোকন ॥ কই? কোথায় আমার মা?

কৃষ্ণা ॥ (মৃদু হাসিয়া) কেন? এই যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খোকন ॥ (খানিকটা সরিয়া গিয়া) দূর! তুমি আমার মা হ'তে যাবে কেন? আমার মা ক-তো-ফর্সা। আর তুমি তো কালো।

কৃষ্ণা। তোমার যে দুটো মা—একটা ফর্সা-মা আর একটা কালো-মা!

খোকন ॥ বারে। তাও বুঝি কখনো হয়? লোকের ছেলেদের বুঝি দুটো করে মা থাকে?

কৃষ্ণা ॥ তুমি যে আমার লক্ষ্মীছেলে বাবা—তুমি যে আমার সোনার চাঁদ। তাই তো তোমার দুটো মা। তোমার সেই ফর্সা-মা যেমন মা, আমিও তোমার তেমনি মা।

খোকন ॥ (মহানন্দে কৃষ্ণার নিকটে আসিয়া) মা? তুমিও আমার মা?

কৃষ্ণা ॥ হ্যাঁ, আমিও তোমার মা—তোমার কালো-মা।

খোকন ॥ কালো-মা! তোমায় তাহ'লে কী ব'লে ডাকবো?

কৃষ্ণা ॥ (খোকনকে নিবিড়ভাবে কাছে টানিয়া) কেন? মা বলে ডাকবে। যতো দিন না তোমার সেই ফর্সা-মা ফিরে আসেন, ততো দিন আমায় শুধু মা বলেই ডাকবে।

খোকন ॥ আমার ফর্সা-মা কবে আবার আসবে?

কৃষ্ণা ॥ তুমি যদি আর দুষ্টামী না কর—আমার সব কথা যদি তুমি শোনো, তাহ'লে তোমার ফর্সা-মা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। আর যদি আমার কথা না শোনো—

খোকন ॥ বারে! তোমার কথা আমি শুনিনা বুঝি?

কৃষ্ণা ॥ বেশ! তাহলে লক্ষ্মী ছেলের মতো দুধটা এবার খেয়ে ফেল।

খোকন॥ কই, দাওনা দুধ। এক্ষুণি খেয়ে ফেলছি।

কৃষ্ণা খোকনকে পূর্ব্বোক্ত সোফায় বসাইয়া নিজেও তাহার পাশে বসিল ও তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া দিল। এমন সময়ে অনিমেষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনিমেষ॥ খোকন কেমন আছে?

কৃষ্ণা॥ ও-আপনি! (উঠিয়া দাঁড়াইল)

অনিমেষ॥ এ বেলা খোকন কেমন আছে?

কৃষ্ণা॥ বেশ ভালোই আছে। পরশু থেকে জ্বরটা তো আর আসেনি। আর সেইজন্যই আজ দুষ্টুমী। দুধ খাবে না বলে ছু-টে পালিয়ে এলো এখানে।

অনিমেষ॥ তা'হলে তো বলতে হয়, চমৎকার আপনার সেবা-গুণ। এই ক'দিন আগেও যে ছেলে শয্যাশায়ী ছিল, সে কিনা আজ ছুটোছুটি করছে। আর সে শুধু আপনারই সেবা-যত্নের গুণে।...দেখুন তো আমার কীরকম 'সিলেক্‌সান্'! কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'লো, —"মাতৃহারা শিশুর সেবা ও লালন-পালনের জন্য স্নেহময়ী নারীর প্রয়োজন।" বিজ্ঞাপনের উত্তরে কতো আবেদন-পত্র এলো, কিন্তু অতো-জনের মধ্যে বেছে বেছে আপনাকেই ঠিক করলাম—সত্যিকারের স্নেহময়ী নারীকে বেছে নিলাম। ডাক্তারবাবুকেও তাই আজ বলছিলাম—"আওয়ার কৃষ্ণা দেবী ইজ্ এ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।"

কৃষ্ণা॥ এটা আমার সম্বন্ধে বেশ বাড়িয়েই বলেছেন, অনিমেষবাবু।

অনিমেষ॥ না, না, বাড়িয়ে আমি মোটেই বলিনি। সত্যি বলছি কৃষ্ণাদেবী, খোকনের জীবন সম্বন্ধে আমাদের কেমন সন্দেহ হ'য়েছিল। বাঁচবার আশা ওর ছিল না বললেই হয়। ও যে আজ সেরে উঠেছে, সে শুধু আপনার আন্তরিক সেবা-যত্নের গুণে। মায়ের মতো স্নেহ-মমতা দিয়ে এই মাতৃহারা ছেলেটির পুনর্জীবন আপনিই এনে দিয়েছেন।

কৃষ্ণা॥ আচ্ছা, আপনার বন্ধুটি কী রকম লোক বলুন তো? ছেলের এই রকম ভারী অসুখ, আর তিনি চলে গেলেন বিদেশে?

অনিমেষ॥ কী করে বলুন? সরকারী কাজ—বাধ্য হ'য়েই যেতে হ'য়েছে। অবশ্য আমার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছে। উঃ, কী দুর্ভাবনারে বাবা! এ ক'টা দিন যে কী ভাবেই কেটেছে, তা শুধু ভগবানই জানেন। এখন যার ছেলে, তার হাতে ভালোয় ভালোয় তুলে দিতে পারলেই বাঁচি।...ওই যে নাম করতে করতেই এসে পড়েছে।

ইহাদের কথার মাঝে খোকন কোন্ ফাঁকে ভিতরে পলাইয়া গিয়াছে। সেইদিকে হঠাৎ অনিমেষের নজর পড়িল

অনিমেষ॥ আরে-আরে—খোকন পালালো কোথায়? খোকন—খোকন—

খোকনকে ডাকিতে ডাকিতে অনিমেষ ভিতরে চলিয়া গেল। বাহির হইতে ধীরে ধীরে রজত ইতিমধ্যে আসিয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। রজতকে দেখিয়া কৃষ্ণা চমকিয়া বজ্রাহতার ন্যায় স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বিস্ময়পূর্ণ চোখ দুইটি রজতের উপর নিবদ্ধ। রজতও কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়েই কিছুক্ষণ কোনও কথা কহিতে পারিল না

কৃষ্ণা॥ (অস্ফুটস্বরে) তু-মি—!

রজত॥ হ্যাঁ, কৃষ্ণকলি।

কৃষ্ণা॥ কৃষ্ণকলি ঝরে গেছে—সে মরে গেছে অনেক দিন। আমি কৃষ্ণা। কিন্তু তুমি—

রজত॥ হ্যাঁ, আমিই খোকনের বাবা।

কৃষ্ণা॥ তুমি? তুমিই খোকনের বাবা? কেন—কেন তবে তুমি আমাকে এভাবে প্রতারণা করলে?

নিদারুণ রাগে অপমানে ও অভিমানে কৃষ্ণা ফুলিতে লাগিল

রজত॥ (সবিস্ময়ে) প্রতারণা!

কৃষ্ণা॥ হ্যাঁ, প্রতারণা। সেবার আমাদের বাড়ীতে গিয়ে আমাকে প্রতারণা করে এসেছো; তাতেও তোমার সাধ মেটেনি। এবার তোমার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এসে আমায় প্রতারণা করেছো। কেন-কেন? আমি তোমার কী এমন করেছি যে' তুমি এইভাবে আমাকে বার বার প্রতারণা করছো—অপমান করছো?

শেষের দিকে কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল

রজত॥ না, না, কৃষ্ণা, আমায় তুমি বিশ্বাস কর। সত্যিই আমি তোমায় প্রতারণা করিনি। কাগজে যা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেম, তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। খোকনের মা মারা না গেলেও সত্যিই ও আজ মাতৃহারা।

আর মাকে হারিয়ে ওর যা অবস্থা হ'য়েছিল, তাতো তুমি এসে নিজের চোখেই দেখেছো। ডাক্তারে বললে, মাতৃ-স্নেহ ছাড়া ওকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম,—"মাতৃহারা শিশুর সেবা ও লালন-পালনের জন্ম স্নেহময়ী নারীর প্রয়োজন।"

কৃষ্ণা॥ (শ্লেষ সহকারে) সে বিজ্ঞাপনের উত্তরে অনেক মেয়েই তো দরখাস্ত করেছিল। তা' বেছে বেছে আমাকেই বা এ চাকরীটা দিলে কেন? সে কী শুধু দয়া করে আমাকে গোটা কয়েক টাকা দিয়ে সাহায্য করবার জন্যে? না, আমার বাবার ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে?

রজত॥ না, না, আমায় তুমি অতোটা ছোট ভেবো না কৃষ্ণা। আমি তোমার ওপর অন্যায় করেছি সত্যি,—তোমার উপর অবিচার করেছি সত্যি, কিন্তু তাই বলে আমি অতোটা নীচ নই।

কৃষ্ণা॥ তাহ'লে কেন—কেন তুমি অতো মেয়ের মধ্যে আমাকেই বা এ কাজের জন্যে বেছে নিলে?

রজত॥ বললে তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কিন্তু সত্যিই বলছি কৃষ্ণা, অতোগুলো মেয়ের মধ্যে এক-মাত্র তুমিই ছিলে আমার পরিচিতা—একমাত্র তোমাকেই আমি জানতাম, যার অন্তরে আছে অগাধ স্নেহ-মমতা। তোমায় তো আর আজ আমি নতুন দেখছি না, কৃষ্ণা। কতোকালের চেনা-জানা তুমি! সেই এতটুকু বেলা থেকে—

কৃষ্ণা॥ থাক্! অতীতের কবর খুঁড়ে সে সব পুরোনো কথা আর না তোলাই ভালো।

রজত॥ না কৃষ্ণা, পুরোনো দিনের সেই মধুর স্মৃতিগুলো অতীতের অন্ধকারে আজও হারিয়ে যায়নি,—বর্ত্তমানের মতো আজও আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল ও সুন্দর হ'য়ে রয়েছে। তোমার স্নেহ-মমতার কথা,... তোমার আদর-যত্নের কথা...তোমার আন্তরিক ভালবাসার কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি, কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা॥ (বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া) আমাকে দেখেই বুঝি সেই সব পুরোণো কথা তোমার মনে আজ উথ্‌লে উঠছে?

রজত॥ পরিহাস তুমি আজ আমায় করতে পারো কৃষ্ণা, কিন্তু তুমি যদি আমার সব কথা শুনতে—

কৃষ্ণা॥ (কঠিনভাবে) না। তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই, কেন তুমি এই চাকরীর লোভ দেখিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এলে?

রজত॥ কারণ,—আমি জানি—আমি ভালো করেই জানি, তোমার মতো আন্তরিকতা আর কারোর কাছ থেকেই পাওয়া যেতো না। আর সবার মধ্যে থাকতো কৃত্রিমতা, অভিনয়—কেমন একটা পেশাদারী মনোভাব। কেন না, আমার সঙ্গে তাদের শুধু পয়সার সম্বন্ধ, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ—

কৃষ্ণা॥ থাক্। আর যা বল, তা বল। ওই সম্বন্ধের কথা আর বলো না। তোমার মুখে ও কথা আজ আর সাজে না।

রজত॥ সম্বন্ধের কথা ছেড়ে দিলেও আমি জানতাম, সত্যিকারের স্নেহ-মমতার পরশ দিয়ে আমার ছেলেকে কেউ যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারে, সে শুধু একা তুমিই। আর তা তুমি পেরেওছো,—সে খবরও আমি অনিমেষের কাছ থেকে পেয়েছি। এই জন্যেই আর সব মেয়েকে বাদ দিয়ে তোমার ওপরই আমার ছেলের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি।

কৃষ্ণা॥ আমি যদি আগে জানতাম, এটা তোমার বাড়ী—এ ছেলে তোমার ছেলে, তাহ'লে আমি কিছুতেই একাজ নিতাম না—কিছুতেই নয়।

রজত॥ তা' আমি জানি। আমি তো তোমায় চিনি। তোমার অভিমান যে কী নিদারুণ, তাও আমি জানি। আর তা' জানি বলেই আমার বন্ধু ওই অনিমেষকে এ বাড়ীতে রেখে এই ক'দিন আমি অনিমেষের বাড়ীতে ছিলাম। পাছে তোমার চোখে ধরা পড়ে, সেইজন্যে এ বাড়ীতে আমার কোন চিহ্নই রাখিনি।

কৃষ্ণা॥ এর পরেও কী তুমি বলতে চাও যে, তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করোনি?

রজত॥ আমায় তুমি বিশ্বাস কর, কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা॥ কথার জাল বুনে আর মিথ্যেকে ঢাকবার চেষ্টা করো না। আমি বেশ বুঝেছি, তুমি আমাকে প্রতারণা করেছো—তুমি আমায় অপমান করেছো। এখানে আর আমার থাকা চলে না। আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

চলিয়া যাইবার জন্য কৃষ্ণা বাহিরের দিকে পা বাড়াইল

রজত॥ দাঁড়াও কৃষ্ণা। আমার একটা কথা শুনে যাও।

কৃষ্ণা॥ (ফিরিয়া) এতোক্ষণ ধরে অনেক কথাইতো শোনালে। তোমার আর কোন কথা শোনার আমার প্রয়োজন নেই—শোনবার মতো আমার ধৈর্য্যও নেই।

কৃষ্ণা পুনরায় চলিয়া যাইতে গেলে রজত তাহার একখানি হাত ধরিল

রজত॥ না, না, কৃষ্ণা, তুমি চলে যেও না। আমি তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি—যে অবিচার করেছি—তার জন্যে তুমি এমনিভাবে আমায় শাস্তি দিও না। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমায় তুমি ক্ষমা কর, কৃষ্ণা। তুমি চলে যেও না।

কৃষ্ণা॥ (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) যেতে আমাকে হ'বেই। ভাগ্যে আমার যাই থাকুক, তবুও তোমার অনুগ্রহের প্রার্থী হ'য়ে এখানে আমি থাকতে পারি না।

রজত॥ আহা, আমার অনুগ্রহের প্রার্থী হ'য়ে তুমি এখানে থাকতে যাবে কেন? যে ঘরে আজ তুমি এসেছো, সেই ঘরের লক্ষ্মী হ'য়ে চিরদিনের মতো তুমি এখানে থাকো।

কৃষ্ণা॥ কিন্তু তোমার ঘরে লক্ষ্মীর অভাব নেই বলেই তো আমি জানি।

রজত। না, না, কৃষ্ণা, আজ আমি লক্ষ্মীছাড়া। তুমি হয়তো জানো না, আজ ক'দিন হলো লালী 'মোটর য়্যাক্‌সিডেণ্টে' বোম্বেতে মারা গেছে। তাই তোমায় বলছি—

কৃষ্ণা॥ না, তবুও আর তা' হয় না। হ'বার হ'লে, অনেকদিন আগেই তা' হ'তে পারতো। আর তা' যদি হ'তো, তাহ'লে আমাকে কী আর আজ এমনিভাবে অসহায় হ'তে হতো? অকালে বাবাকে হারিয়ে—

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গেল

রজত॥ কী বললে কৃষ্ণা? কাকাবাবু নেই?

কৃষ্ণা॥ না। আর তাঁর এই অকাল মৃত্যুর কারণও আমি। আমার বিয়ের কথা ভেবে ভেবেই তিনি মারা গেলেন।

রজত॥ কাকামা কোথায়?

কৃষ্ণা॥ বাবার মৃত্যুর পর মারও স্বাস্থ্য গেল ভেঙে। কিছুদিন হলো মামাবাবু এসে মাকে কাশীতে নিয়ে গেছেন। তারপর—(ক্ষণিক থামিয়া) বাবা-মা না থাকলে অরক্ষণীয়া মেয়ের ভাগ্যে যা' ঘটে, আমার ভাগ্যেও তাই ঘটলো। দাদা-বৌদির সংসারে আমি হ'য়ে উঠলাম ভারী বোঝা। নিত্য লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে না পেরে বাধ্য হ'য়েই আমাকে ঘর ছাড়তে হ'লো।

রজত॥ তোমার দরখাস্ত পেয়ে আমি ঠিকই ধরেছিলাম, তোমাদের সংসারে নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটে গেছে। আর তার সবটার জন্যে আমিই হ'লাম একমাত্র দায়ী। অথচ তোমাদের কাছে যাবার আমার আর মুখ ছিল না। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, কৃষ্ণা।

কৃষ্ণার হাত দুইটি নিজের হাতের মধ্যে ধরিল

কৃষ্ণা॥ আমায় অনেক অপমান করেছো। আবার ক্ষমা চেয়ে আর আমায় অপমান করো না। আমায় যেতে দাও—আমায় যেতে দাও—

রজত॥ (কৃষ্ণার হাত ছাড়িয়া দিয়া) বেশ! তুমি যেতে চাইছো—যাও। কিন্তু আমার খোকন?

কৃষ্ণা॥ খোকন?

রজত॥ হ্যাঁ, খোকন। এই ক'দিনে আমার খোকনকে তুমি স্নেহ-মমতার যে বন্ধনে বেঁধেছো, সেই বন্ধন তুমি এতো সহজে ছিঁড়ে যেতে পারবে কৃষ্ণা? তোমার কী এতোটুকুও কষ্ট হ'বে না?

কৃষ্ণা॥ খোকনকে ছেড়ে যেতে সত্যিই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কী করবো বল? এ ছাড়া আমার আর কোন উপায়ই নেই।

রজত॥ কিন্তু আমার খোকনের উপায়? আমি আড়াল থেকে শুনেছি, একটু আগেও তুমি মাতৃহারা ওই অবোধ ছেলেটিকে বোঝাচ্ছিলে—তুমি ওর মা।

কৃষ্ণা॥ তা' না হ'লে ও যে দুধ খেতে চাইছিলো না।

রজত॥ তাহ'লে তুমি চলে গেলে মায়ের মতো আদর করে ওকে আর কে দুধ খাওয়াবে বল?

কৃষ্ণা॥ আমি তো শুধু ওকে ভোলাবার জন্যেই বলেছিলাম।

রজত॥ তুমি হয়তো ওকে ভোলাবার জন্যে মিথ্যে কথাই বলেছিলে। কিন্তু ওই সরল শিশু সত্যি সত্যিই

বিশ্বাস করেছিল যে, তুমি ওর মা। এক মা হারিয়ে আর এক মা ও পেয়েছিল। এ মাকেও যদি আবার ও হারায়, তাহ'লে আমার খোকন আর বাঁচবে না কৃষ্ণা—আমার খোকন আর বাঁচবে না।

রজতের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল

* *
*

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা

রজত॥ আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি সত্যি, কিন্তু ওই অসহায় অবোধ শিশুটি? সে তো তোমার কাছে কোনো অপরাধ করেনি।

হঠাৎ নেপথ্যে খোকনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল

খোকন॥ (নেপথ্য হইতে) মা—মা—

একটি খেলনা হাতে খোকন দৌড়াইয়া আসিল। তাহার চোখে-মুখে আনন্দ

খোকন। কাকু আমায় কেমন খেলনা দিয়েছে দেখ মা।

খোকন কৃষ্ণার নিকটে গেল

রজত॥ তোমার মা চলে যাচ্ছে খোকন।

খোকন॥ (কৃষ্ণাকে জড়াইয়া ধরিয়া) তুমি চলে যাচ্ছ মা? কোথায় যাচ্ছো?

কৃষ্ণা পূর্ব্ববৎ মুখ ফিরাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল

খোকন॥ (কৃষ্ণাকে ধাক্কা দিয়া) মা—মাগো—তুমি কোথায় যাচ্ছো মা?

কৃষ্ণার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সে খোকনকে কোলে তুলিয়া লইল

কৃষ্ণা॥ না বাবা, তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাবো? তোমায় ছেড়ে আমি কী কোথাও যেতে পারি? তুমি যে আমার খোকন—আমার সোনার খোকন—

কৃষ্ণা সস্নেহে খোকনকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার গালে নিজের গালটি রাখিল। * * *

রজত মুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিল।

যবনিকা

অজন্তা-এলিফ্যাণ্টা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

"আমাদেরি কোন সপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়,
আমাদেরি পট অক্ষয় করি রেখেছে অজন্তায়।"

অজন্তা, অজন্তা—বহুশ্রুত নামটি! খুব ছেলেবেলা থেকেই নামটির সঙ্গে পরিচয়। চিত্রকলার উৎকর্ষ বোঝবার মতো বয়স তখনো হয় নি, আজও যে সে যোগ্যতা হয়েছে সে দাবী করবার ধৃষ্টতা রাখি না। কলা রসিকও নই আমি। কিন্তু সেই ছেলেবেলাতেও বুঝতাম, আর এখনও বুঝি যে এই 'অজন্তা' নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন ভারতের এক গৌরবময় যুগের স্মৃতি।

ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের ইতিহাসে কতোই না ঘটেছে অঘটন, কতোই না হয়েছে রক্তস্রাবী হানাহানি! আবার এই ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষ গড়ে তুলেছে উচ্চতর, মহত্তর জীবনের সৌধ। ধর্মই জুগিয়েছে উন্নতির অনুপ্রেরণা! যুগে যুগে শিল্প, ক্লিষ্ট জীবনের পরাভব-গ্লানির ঊর্ধ্বে উঠেছে জীবনের জয়গান—ধর্মই জাগিয়ে তুলেছে নতুন ভাবের উদ্দীপনা। ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ-শংকর-চৈতন্ত হতে রামমোহন-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অবধি প্রতি যুগসন্ধিক্ষণেই ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

বুদ্ধ প্রবর্তিত অহিংসা ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতে ও বহির্বিশ্বে। আর সেই ধর্মকে অবলম্বন করেই এসেছিল এত অভূতপূর্ব রেণেসাঁসের নতুন জোয়ার। ইতালীয় রেণেসাঁসের মতোই এই ভারতীয় রেণেসাঁসের ধারা ছিল বহুমুখী, স্পর্শ করেছিল জাতীয় জীবনের নানান দিক। সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নানা দিক দিয়েই রেণেসাঁস আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠেছিল। বাঙালী কবির দাবীর কোন ইতিহাসসিদ্ধ ভিত্তি আছে কিনা—আমার জানা নেই। অজন্তাগুহার চিত্রাবলীর স্রষ্টা সত্যই বাঙালী শিল্পী কিনা সে বিষয়েও প্রামাণ্য তথ্যের সন্ধান আমি পাই নি। রাজর্ষি অশোকের উদ্যমেই বৌদ্ধধর্মের দিক্-বিস্তার ঘটেছিল। বৌদ্ধ শ্রমণেরা ছিলেন একাধারে প্রচারক ও লোকশিক্ষক। তাঁরা জনপদে বহন করে নিয়ে যেতেন ভগবান তথাগতের শান্তি-বাণী, মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। অষ্ট মার্গের তত্ত্ব এবং নিজেদেরই

সংযত জীবনের আলোক সম্পাতে মানুষের সামনে তুলে ধরতেন এক উজ্জ্বল সামাজিক আদর্শ। ভারতের নানা পথে-প্রান্তরে, জনসমাগম-স্থলে সম্রাট অশোক প্রস্তর স্তম্ভ ও শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন ধর্মোপদেশ ও নীতিকাব্য। লোক শিক্ষার এতো বড়ো ব্যাপক অভিযান সে যুগের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। মনে হয় অজন্তার ২৫টি গুহা এবং পাঁচটি চৈত্য সম্বলিত যে বিরাট প্রতিষ্ঠানটি সে যুগে গড়ে উঠেছিল তা মূলতই ছিল একটি সজীব, ক্রিয়াচঞ্চল শিক্ষা-কেন্দ্র। এখানে দেখা যায় পর্বত গুহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, শিলাসন, শিলাশয্যা, এমন কি শিলা-উপাধান। এই সব নিঃসজ্জা শিলা-প্রকোষ্ঠেই বাস করতেন ব্রতচারী শ্রমণের দল। কৃচ্ছ্র সাধন ছিল তাঁদের শিক্ষণের এক প্রধান অঙ্গ। কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর দিয়েই তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতেন ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য। 'আজিবক' সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ শ্রমণরাই নাকি অজন্তা গুহার নির্মাতা ও অধিবাসী। বৌদ্ধশ্রমণগণের শিক্ষাপীঠ বা বিহারগুলি সেইকালে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডের নানা দেশ হতে আসত বিদ্যার্থীর দল, আসত তীর্থঙ্কর, আসত পরিব্রাজক। অন্য বৌদ্ধ বিহারগুলির সহিত অজন্তা বিহারের সে হিসাবে খানিকটা সাদৃশ্য থাকলেও, অজন্তার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। অজন্তা শুধু বিহার বা শিক্ষা-কেন্দ্রই ছিল তা নয়। ললিতকলার এতো বড় অনুশীলনকেন্দ্র সেদিনের ভারতে, আর সেদিনেরই বা বলি কেন, আজকের দিনেই বা কোথায় আছে? অজন্তা যেন সেই অতীত যুগে ভারতের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী। লোকালয় হতে বহুদূরে, নিভৃতে সত্য শিব ও সুন্দরের অনুধ্যানের পীঠরূপেই অজন্তার সৃষ্টি। দীর্ঘ-প্রসারিত অর্ধচন্দ্রাকার পর্বতের পার্শ্ব বিদারণ করে সারি সারি গুহা তৈরি করা হয়েছে। গুহাগুলি দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় এক একটা বিরাট হলঘরের মতো। গুহাভ্যন্তরের সুমসৃণ পাষাণ-দেওয়াল ও ছাদের ফ্রেস্কোপেইন্টিং সারা জগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সেই ছেলেবেলায় দেখা 'প্রবাসী'র পাতায় ছাপা মা ও সন্তানের ছবি, বুদ্ধ ও রাহুলের ছবি—শাখামৃগের ছবি সবই এবার মৌলিক ও অবিকল দেখা গেল। অজন্তা গুহায় ভারতীয় ললিত-কলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন যে অজন্তাগুহার চিত্রাবলী—সেই কথাটাই চিত্ররসিক না হয়েও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। বুদ্ধের জীবন—মায়া দেবীর স্বপ্নে শ্বেতহস্তী দর্শন ও লুম্বিনি উদ্যানে গৌতমের জন্ম হতে শুরু করে কুশীনগরে মহাভিনিষ্ক্রমণ অবধি বুদ্ধজীবনের প্রতিটি উল্লেখ্য ঘটনাই চিত্রিত রয়েছে পর্বতগাত্রে। জাতকের কাহিনীগুলি সূক্ষ্মতুলিকা সম্পাতে রূপ পরিগ্রহ করেছে অপরূপ আলেখ্যে। দেড়হাজার বৎসরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে—কোথায় সেই বিগত গৌরব বৌদ্ধযুগ—আর সেই লোক-শিক্ষক শ্রমণকুল! বিস্মৃতির অতলে সবই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে অজন্তার চিত্রাবলী। নিরেট পাষাণের গায়ে চুণ-সুরকী সিমেণ্ট ছাড়া এমন কি উপাদানের প্ল্যাস্টারিং লেপন করে নিয়ে তার উপরে রূপকার রং ও তুলির সাহায্যে এই অপূর্ব ছবিগুলি এঁকেছেন সে কথা আজও বিশেষজ্ঞদের কৌতূহলের কারণ। অনেকে বলেন যে এই উপাদান ছিল অতি সহজলভ্য গোময়, যার সঙ্গে এমন একটা কিছু মশলা মিশিয়ে আটা তৈরি করা হয়েছিল, যে আটা হাজার বছরেও চটে যায় নি! আর রঙের স্থায়িত্বও কী অদ্ভুত! এতোদিনের আঁকা ছবি এতটুকু ম্লান হয়নি! অবশ্য সবগুলি গুহার ছবিই যে অটুট অক্ষত আছে তা নয়—কিন্তু সে ক্ষয়িষ্ণুতা অনেকটা ঘটেছে অযত্নে ও অসাবধানী হাতের স্পর্শে। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর ইতালীয় চিত্রকর নিযুক্ত করে ছবিগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এক অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতির আশঙ্কা দূর করেছেন।

দীর্ঘ হাজার বৎসর অজন্তার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়েছিল। পরধর্মদ্বেষী ইসলামের আক্রমণে যে সময়ে হিন্দুর মঠ, মন্দির ও বৌদ্ধবিহারগুলি বিপন্ন সেই সময় সম্ভবতঃ গুহাচিত্রগুলিকে চরম বিনষ্টির হাত হতে রক্ষামানসে অজন্তাবাসিগণ গুহামুখে পাথরচাপা দিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল। মোট কথা, হাজার বৎসর অজন্তা জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় আত্মগোপন করে নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পণ্ডিতপ্রবর ফার্গুসন সাহেব ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম জগৎ সমীপে অজন্তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। কথিত আছে, দূর পাহাড়ের সানুদেশে একদল সৈন্য ছাউনি ফেলে কুচকাওয়াজ করছিল, তারাই প্রথম সারিবদ্ধ গুহাগুলির সন্ধান পায় এবং তারাই গাছপাথর সরিয়ে গুহামুখ মুক্ত করে।

অজন্তা ও এলোরা উভয়ই হায়দ্রাবাদ রাজ্যে অবস্থিত। ঔরঙ্গাবাদ থেকে শ' দেড়শ' মাইল মোটর পরিক্রমায় এলোরা-অজন্তা উভয়ই এক যাত্রায় পরিদর্শন করা চলে। হায়দ্রাবাদ সরকার এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। বৎসরে পরিভ্রমণকারীর সংখ্যাও নেহাৎ কম হয় না, আর তাতে মুনাফাও বেশ হয়।

আমি অবশ্য ঔরঙ্গাবাদের পথে যাইনি। এলোরাও দেখা হয়নি। বোম্বাইগামী ট্রেন থেকে নামলাম জলগাঁও স্টেশনে। তখন ভোর হয় হয়। আর একজন মাত্র সহযাত্রীকে জলগাঁওয়ে নামতে দেখলাম। এঁর সঙ্গে পরে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, একই পথের পথিক, অর্থাৎ অজন্তাদর্শনাভিলাষী। ভদ্রলোক অন্ধ্রদেশীয়, নাম শ্রীহরিনরোত্তম রাও। বয়স সত্তরের উর্ধ্বে। দেহের বাঁধন বেশ পোক্ত, স্বাস্থ্যটি খুবই ভাল, এতোখানি বয়সেও যৌবনোচিত উৎসাহে ভরপুর। ভারতের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেছেন। বোম্বাই যাচ্ছিলেন নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করতে। পথিমধ্যে নেমে পড়েছেন জলগাঁওয়ে অজন্তাদর্শন মানসে। বেশ ভাল হ'ল আমার পক্ষে, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

প্রাথমিক আলাপাদির পর স্ব স্ব পরিচয় দেওয়াই বিধি। রাও মশায় নিজেকে "অন্ধ্র কেশরী" (Lion of Andhra) বলে পরিচয় দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিস্তি দিলেন তিনি কতগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত—একখানা ছাপান লেটারহেড বের করে আমায় ভাল করে ওঁর পদবীগুলি অনুধাবন করতে বল্লেন।

বুঝলাম বেশ একটু ইন্টারেস্টিং ধরণের লোক। একখানা পুরা ফুলস্কেপ সিট কাগজের প্রায় অর্ধাংশব্যাপী রাও মশায়ের নাম-ধাম-উপাধি-পদবী ইত্যাদির বহর। সবটা পড়তে বেশ খানিকটা সময় লাগল। দেখলাম রাও মশায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ী উপাধি বি.এ. অনার্স হাই সেকেণ্ড ক্লাস হতে শুরু করে প্রায় গোটা ছয়েক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের এক্স বা ভূতপূর্ব একটা কিছু, বর্তমানে সাত-আটটা ঐ জাতীয় সংস্থার অ্যাক্টিং ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জয়েন্ট সেক্রেটারী, অনরারি ট্রেজারার ইত্যাদি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা-প্রযুক্ত ঐরূপ আরও চার পাঁচটা পদবীর লেজুড় জুড়ে দিয়ে এক মহামারী কাণ্ড! আগামী নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনে পদাধিকার বলে কার্যকরী সমিতির সদস্য সর্বশেষে তারও উল্লেখ ছিল। এতো বড়ো ফিরিস্তিগঠন বেশ ধৈর্য সাপেক্ষ।

রাও মশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম লেটারহেডটি বুঝি সম্প্রতি ছাপিয়েছেন। অনেকটা তাচ্ছিল্যমিশ্রিতস্বরে বললেন, "An admirer got it printed for me।" বলা বাহুল্য রাও মশায়ের সঙ্গে আগাগোড়া ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলল। আমার পরিচয় শুনে অনুকম্পাজ্ঞাপক উক্তি করলেন "Poor government servants! They have yet to know many things. It is good you have come to see Ajanta।" রাও মশায়ের এই নির্লজ্জ মোড়লির আরও প্রমাণ পরে পেয়েছিলাম।

যা'হোক এই আলাপ আলোচনা আর বেশীদূর চালানো নিরর্থক ভেবে আসল কাজ, অর্থাৎ অজন্তা যাওয়ার উপায় দেখতে লাগলাম। জলগাঁও শহর থেকে বাস যায় অজন্তা অবধি, যথেষ্ট সংখ্যক যাত্রী পেলে পর। যথেষ্টসংখ্যক যাত্রীর অপেক্ষা করতে হবে অনেক বেলা পযন্ত। আমার সময় সঙ্কীর্ণ। অজন্তা দেখা শেষ করে আবার বৈকালে বোম্বাইগামী গাড়ী ধরতে হবে। খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর একদল ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎ মিলল। এরা এসেছে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হতে অজন্তা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। পূর্বদিন এসে জলগাঁও শহরে এক হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিল। এক হাফ্-টন স্টেশন-ওয়াগনের সন্ধানও মিলল। অজন্তা যাতায়াতে ত্রিশ টাকা দাবি করল। জলগাঁও থেকে অজন্তা ছত্রিশ মাইল। দর কষাকষি চলল খানিকক্ষণ। রাও মশায় তুরীয় ভাব অবলম্বন করে রইলেন। শেষটায় রফা হল পঁচিশ টাকায়। আমারি গরজ বেশী, আমি দশ টাকা দিতে রাজী হলুম, ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যায় আটজন—ওরা বাকিটা চাঁদা করে দেবে। রাও মশায় চুপচাপ। কিন্তু গাড়ী ছাড়বার সময় দেখা গেল তিনি বিনা আড়ম্বরে সম্মুখের ভাল আসনটি অধিকার করে বসে আছেন, যেন এটাই তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। পরেও একাধিকবার দেখেছি কাজের সময় রাও মশায়ের দেখা নাই, কিন্তু গ প-ফটো তোলবার সময় ঠিক সামনের সারিতে মধ্য-আসনটি তাঁরই অধিকার। দু'চারটা মিটিংএ হরিনরোত্তম রাও মশায়ের সঙ্গে যোগদান করেছি। সভার পুরোভাগে সভাপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য নির্ধারিত মঞ্চাসন। আমরা সভাপতির মঞ্চের নিচে সাধারণ আসনে বসে আছি। রাও মশায় উস্‌খুস্ করছেন, আর অনবরতই যতো বাজে কথা নিয়ে ভারি মাতামাতি করছেন, সভার কাজে বেশ বিঘ্ন ঘটছে। পরে কেউ হয়তো রাও মশায়কে লক্ষ্য করে "আরে আরে আপনি এখানে! আসুন, আসুন" ইত্যাদি বলে সভাপতির মঞ্চে তাঁকে বসিয়ে দিলেন—ব্যস সব চুপ—রাও মশায় একেবারে ঠাণ্ডা—আর তাঁর কোন অভিযোগ নাই। পরে দু' চারটে মিটিংএর উদ্যোক্তাদের কানে কানে এই গোপন কথাটা বলে আমি তাঁদের আগেই সাবধান করে দিয়েছি। রাও মশায়কে শান্ত রাখবার অমোঘ ওষুধ। ভদ্রলোকের আরও একটা বাতিক লক্ষ্য করলাম। কথায় কথায় খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে তুইতোকারি বন্ধুত্বের উল্লেখ করা। বর্তমান ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই তার কাছে নেহাৎ ছেলে ছোকরা? টেগোর, অরবিন্দ, গান্ধী—হ্যাঁ এঁরা অন্তরঙ্গ ছিলেন বটে রাওমশায়ের, তবে এঁদের কারুর সঙ্গেই মতে মিলত না। শ্রীঅরবিন্দ নাকি হরিনরোত্তমকে বলেছিলেন: "You take charge of the political front. let me be on the spiritual side." এ জাতীয় বুলি কপ্‌চাতে ভদ্রলোক ওস্তাদ। আর এক মুদ্রাদোষ হচ্ছে কথায় কথায় বারো'শ, পনর'শ, দু'হাজার, আড়াই হাজার ইত্যাদি অঙ্ক বলে যাওয়া। তাঁর অমুক আত্মীয়, শ্রীনাগরাজম—আঠার'শ, শিবশেখরম—দু'হাজার, অবিনাশলিঙ্গম—আড়াই হাজার, অনর্গল এই ভাবে নামের সঙ্গে মোটা অঙ্কযুক্ত করে কথা বলে যাচ্ছেন। প্রথমটা বুঝতে পারি নি ব্যাপারখানা কি? একটু ভয়ে ভয়েই একবার এর অর্থ জিজ্ঞেসা করলাম। ভদ্রলোক মুখব্যাদন করে যে ব্যাখ্যা দিলেন তাতে থ'খেয়ে গেলাম। ঐ অঙ্কগুলি হচ্ছে লোক বিশেষের মাসিক বেতন। অর্থাৎ বেতনের পরিমাণ দিয়েই ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক মর্যাদা ও কথার গুরুত্ব ইত্যাদি ধরে নিতে হবে। মানুষের পরিচয় দিবার কি অভিনব পন্থা! কাঞ্চন-কৌলীন্যের দিনে এর চাইতে আর বড় পরিচয় কি থাকতে পারে।

যাক রাওমশায়কে সঙ্গে নিয়ে ত বেরিয়ে পড়া গেল। যথাসময়েই অজন্তায় পৌঁছলাম। অনেকগুলি গুহা আর অজস্র চিত্র। সবগুলি বেশ ভাল ভাবে বুঝে সুঝে দেখতে গেলে একদিনে হয় না। দিনকয়েক হলে ভাল হয়। তা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আরও বহু ব্যস্তবাগীশ ট্যুরিস্ট জুটেছে—জনকয়েক আমেরিকান পুরুষ ও মহিলা। এঁরা যা দেখছেন তাতেই বলছেন 'splendid' অথবা 'wonderful' গাইডরাও বেশ ফলাও করে অনেক কাল্পনিক কাহিনী তোতাপাখীর মত বলে যাচ্ছে—মোটা বকশিসের আশ্বাসে। এদিকে রাওমশায়কে নিয়ে আর এক বিপদ। তাঁর পেয়েছে দুর্নিবার কফির তেষ্টা। অথচ ধারে-কাছে কফির নামগন্ধও নেই। রাওমশায় ভারী বিরক্ত। অজন্তা দেখতে কেন যে মানুষ আসে, সেই প্রশ্নই তিনি বারবার করতে লাগলেন। তিনি কেন এলেন? "The fools have bluffed me"। অর্থাৎ কফি না পাওয়া পর্যন্ত রাওমহাশয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা হবে না।

এদিকে রাওএর দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে অন্য সহযাত্রীদের দিকে ততোটা নজর দিতে পারি নি। পাঁচজন তরুণ আর তিনজন তরুণী

এই নিয়েই ছাত্র-ছাত্রীর দল। তরুণী তিনটি মধ্যে শ্রীমতা কমলা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুরূপা, সুবেশা তরুণী। বেশভূষায় উগ্র আধুনিকতার ছাপ। কথাবার্ত্তায় খুবই স্মার্ট। মহীন্দ্র আর কমলা যুগলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—অন্য সকলের থেকে একটু আলাদা। মহীন্দ্ প্রাণপণে কমলাকে খুসি করবার চেষ্টা করছে। কোথা থেকে এক কাপ দুস্প্রাপ্য চা নিয়ে এলো, রোদ উঠেছে প্রচণ্ড—গুহার বাইরে যেন আগুন ছুটচে—মহীন্দ্ এগিয়ে এসে কমলার মাথায় ছাতি ধরল। সাথে আছে ক্যামেরা—বার দুই তিন ফটো তোলাও হল। কমলাও বেশ সুচতুরা ফ্লার্ট—অপাঙ্গ দৃষ্টি আর উচ্ছল হাসিতে মহীন্দ্র বেচারাকে জর্জ্জরিত করে তুলেচে।

আমাদের অজান্তা পরিক্রমা শেষ হতে প্রায় চারঘণ্টা সময় লাগল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সকলেই কাতর। রাও মশায়ও ফিউরিয়স।

বেলা তখন প্রায় ১টা। আবার ছত্রিশ মাইল দূরে জলগাঁও না ফিরে গেলে আহার মিলবে না! মহীন্দ্ ও কমলার উচ্ছলতাও যেন কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে এসেছে। এমন সময় আকস্মিক ভাবে দেখা দিলেন এক দ্বিতীয় পুরুষ—কমলার পূর্ব-পরিচিত বন্ধু জীওনলাল। বেশ শাসালো যুবক—নিজের গাড়ী হাঁকিয়ে এসেছে। কমলার ভাবান্তর ঘটতে দেরি হল না। কমলা ফিরে যাবে জীওনলালের গাড়ীতে, জীওনলালের পাশেই বসে। বেচারা মহীন্দ্ আশা করেছিল অন্ততঃ তাকে জীওনলালের গাড়ীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাবে কমলা। কিন্তু হায়, জীওনলালের গাড়ী ধূলির ঝড় উঠিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই উৎক্ষিপ্ত ধূলি-রাশির আবছায়ায় মহীন্দের মুখখানা বড়ই আশাহত ও করুণ দেখাচ্ছিল! নারী চরিত্র সত্যই দুর্জ্জেয়!

অজন্তার স্মৃতি তখনো তাজা। বোম্বাই থেকে মাত্র মাইল ৭।৮ দূরে সমুদ্রের বুকে ছোট্ট এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ। দ্বীপের প্রবেশ মুখেই এক বৃহদাকার শিলাময় গজমূর্তি। সেই থেকেই দ্বীপের নাম এলিফ্যাণ্টা। ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখে মনে হয় গুপ্ত যুগীয়। নিরেট পাহাড়ের গাত্র-দেশে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে বিরাট বিরাট মূর্তি। এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ বোম্বাইয়ের উপকূল হতে ষ্টিমলঞ্চে ঘণ্টা খানেকের পথ—মাইল পনর-বিশ মাত্র। আরব সাগরের মাঝে ছোট্ট একটি দ্বীপ শ্যামশোভায় সুদর্শন। মাথার উপরে ভাদ্রমাসের সূর্যের প্রচণ্ডপ্রতাপ। মৃদু তরঙ্গা-ঘাতে সমুদ্রের জল ঈষৎ আন্দোলিত। বিচিত্র ভঙ্গে সূর্য কিরণের ঝিকিমিকি। অজস্র মৎস্যলোভী সী-গাল পক্ষীর অবাধ সঞ্চরণ। ভারতীয় নৌবাহিনীর দু'টি ক্রুজার মহড়ায় রত। বহু বিদেশগামী জাহাজের ইতস্ততঃ আনাগোনা, আর সমুদ্র বক্ষে ভাসমান অসংখ্য আরবীয় ঢাও (Dhow)। বাহির দরিয়া হতে পেছন ফিরে বোম্বাই উপকূলের দৃশ্যটি দেখবার মতো। অ্যাপোলো বন্দর, ম্যারিণ ড্রাইভ, আরও দূরে বোম্বাইয়ের অভিজাত অঞ্চল মালাবার হিলস্—এত অবিচ্ছিন্ন তটরেখা যেন ব্যগ্র দু' বাহু প্রসারিত করে অসীমকে সীমার বাঁধনে বন্ধন করবার স্পর্ধা প্রকাশ করছে। সংক্ষিপ্ত হ'লেও এই সমুদ্র ভ্রমণটুকু বেশ উপভোগ্য।

এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ ও অজন্তা গুহার মতোই বহুদিনের বিস্মৃতির পর আবার মানুষের জ্ঞান গোচরীভূত হয়েছে। বিদেশী পর্তুগীজেরা প্রথম এই দ্বীপটিকে আবিষ্কার করে। পর্তুগীজেরা এখানে শুটিং-প্র্যাক্‌টিস করত—এলিফ্যাণ্টার শিলামূর্তির ভগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের সেই দুষ্ক্রিয়ার নিদর্শন আজও বহন করছে।

সমবায় সংগঠনে বিদ্যাধরীর মৎস্যজীবী-সম্প্রদায়

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন শনিবার। ছুটীর সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য—বিদ্যাধরিতে মৎস্যচাষ পরিদর্শন। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে। কলকাতার শেষপ্রান্তে নিউকাট ক্যানেলের ধারে এসে হাজির হলাম। সঙ্গীরা অপেক্ষা করছিলেন যথাস্থানেই। দুয়ারে প্রস্তুত নৌকা। খাল পেরুনো দরকার, "চলে এসো"—তাড়া এলো—সম্পাদক সুধীর বাবুর কাছ থেকে। নৌকায় গিয়ে উঠে পড়লাম। হেল্‌তে দুলতে নৌকা চল্‌তে লাগলো। এলাম খালটির অপর পারে।

দমদমের অন্তর্গত 'দত্তাবাদ' গ্রাম। লোকে কিন্তু 'বিদ্যাধরী' বলেই জানে। বিদ্যাধরীর গৌরবে ঢাকা পড়ে গেছে 'দত্তাবাদ' নামটি। যেমন ঢাকা পড়ে গেছেন "মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী"—'মহাত্মাজী' নামের আড়ালে। নাম তো এখানে শুধু অভিধা মাত্র নয়। সঙ্গে এর জড়িয়ে আছে আরও কত মহিমা।

সামনে বাংলো প্যাটার্ণের সুন্দর একটি বাড়ী, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কার্য্যালয়। এই সমিতির আমন্ত্রণেই আমরা ২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ সেখানে হাজির হলাম। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের নেতৃত্ব ভার নিয়েছিলেন। দলে মোট চোদ্দজন সাংবাদিক, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে যোগ দিয়েছেন। পরম আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন সমিতির সদস্যরা। আলাপ পরিচয়-পর্ব যথারীতি সম্পন্ন হল। ক্যামেরাও রেডি ছিল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই দেরী হল না দলের ফটোগ্রাফারদের।

বিদ্যাধরী,—যে নদী বহুকাল আগে থেকে বহন করে নিয়ে এসেছে মহানগরী কলকাতার পরিত্যক্ত আবর্জনারাশি বঙ্গোপসাগরের গর্ভে,—তা' আজ মৎস্য চাষের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে নিয়োজিত হয়েছে এই সমিতির

একান্ত প্রচেষ্টায়। মনুষ্যকুলের কাছে যা পরিত্যক্ত, বিপুল মৎস্যকুলের কাছে তাই আজ প্রয়োজনীয়। বিদ্যাধরীকে ঐ আবর্জনারাশি এখন আর বঙ্গোপসাগরের বুকে ক্ষেপণ করতে হয় না। নিজেই তা ধারণ করে হয়ে উঠেছে—"নীলকণ্ঠ"। অবশ্য নীলকণ্ঠের মত এগুলোকে আপন কণ্ঠে পুরোপুরি সঞ্চিত তাকে রাখতে হয় না। বুভুক্ষু মৎস্যকুল সেগুলোকে আহার্য্য হিসাবে গ্রহণ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর তারপর মনুষ্য সমাজের পরিতৃপ্তি বিধানের জন্য চলে আসে তারা কলকাতার বাজারে অতি নিয়মিত। পরিমাণ ও এক্ষেত্রে নেহাত কম নয়, বৎসরে দশ হাজার মণেরও বেশী মৎস্য জোগান হচ্ছে এখান থেকে।

শুনলাম, মধ্যপথে মজে গিয়ে বিদ্যাধরীর যাত্রাপথ আছে বাধাগ্রস্ত। ফলে নদী রূপান্তরিত হয়েছে বিরাট হ্রদে। লবণ হ্রদ। লোকে বলে 'সল্ট লেক'। তবু বিদ্যাধরীর নাম এতটুকুও মুছে যায় নি। ষাট সত্তর মাইল বিস্তীর্ণ এই লবণ হ্রদ। পূর্বে হোগলা, নলখাগড়া আর নানা প্রকার আগাছায় আবৃত ছিল এর কিয়দংশ। স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল এখানে "বিদ্যাধরী স্পিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি", এক মন এক প্রাণ নিয়ে কর্মীরা কাজে লেগে গেলেন, সমিতির নির্দেশ মত পন্থায়। বন জঙ্গল হোল সাফ,—স্থানটি হয়ে উঠল মনোরম,—হয়ে উঠল মৎস্য চাষের একান্ত উপযোগী,—শুরু হলো মৎস্য চাষ। দিনে দিনে উন্নতির মধ্য দিয়ে সমিতির হতে লাগলো শ্রীবৃদ্ধি। নিরন্নের মুখে ফুটে উঠলো হাসি, স্বাবলম্বনের দৃঢ় প্রত্যয়। গ্রামটি এগিয়ে চললো আপন শ্রী সমৃদ্ধির ঋজুপথে। এরা পানীয় জলের অভাব মেটাতে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে খনন করিয়েছে টিউবওয়েল, যাতায়াতের অসুবিধা দূর করতে নির্মাণ করিয়েছে কাঁচা ও পাকা রাস্তা। দারিদ্র্য হলো দূর। দূর হলো গ্রামবাসীদের বেকারত্বের গ্লানি। গ্রামের ছেলে বৌ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি মানুষই নিজের নিজের যথাযোগ্য শক্তি দিয়ে সমিতির সার্থক রূপায়ণে প্রাণপণ করে এগিয়ে চললো।

এখানে সমিতির সদস্য তালিকা পুঁজিপতিদের নামাবলীতে সুশোভিত হয় নি; সমিতির অর্থভাণ্ডারও স্ফীত হয়ে ওঠেনি তাদের অর্থ কল্যাণে। সমিতিটি গড়ে উঠেছে, সামান্য মাছ ধরা আর জালবোনা দলের লোকেদের নিয়ে, আর নিয়ে তাদের নিজশ্রমে অর্জ্জিত অর্থের সামান্য অংশ। তাই সমবায় সমিতি সংগঠন শক্তি বলতে—আমাদের চোখের ওপর ভেসে ওঠে যে আদর্শের ছবি, এখানে দেখা গেল তারই বাস্তব রূপায়ণ। আর এই সমবায় সমিতির কর্ম প্রচেষ্টাই বিদ্যাধরীকে দান করেছে অমরত্ব;—দান করেছে তাকে অসীম মর্য্যাদা।

গ্রামোন্নতির কাজে সমিতির অবদান অপরিমিত।* এরা পানীয় জলের অভাব মেটাতে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে খনন করিয়াছে টিউবওয়েল, যাতায়াতের অসুবিধা দূর করতে নির্মাণ করিয়েছে কাঁচা ও পাকা রাস্তা। এদেরই পরিচালনায় রয়েছে এখানে অবৈতনিক বিদ্যালয়। শিল্প কার্য শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছে। স্থানীয় লোকেদের হাতের কাজ দেখা হল: ঘুনি, আটোল ইত্যাদি থেকে সুরু করে জালবোনা পর্য্যন্ত কোন কিছুই বাদ নেই। দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় বড় ছবি। ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করেছে কোন কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতীতকাল থেকে ধাপে ধাপে বর্ত্তমান পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে এ গ্রামটি। স্বার্থবাদী ধনিক সম্প্রদায়ের অত্যাচার;—প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র সরল গ্রামবাসীদের একদিন করেছিল প্রবঞ্চনা। তাদের অসহয়তালব্ধ সুযোগগুলোকে ব্যবহার করেছে তারা নিজ নিজ স্বার্থে। কিন্তু সেদিন আজ বিগত। আজ তাদের প্রলোভন দেখিয়ে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। দুই যুগ পূর্ব্বে রোপিত চারা গাছটি নানা ঝড় ঝাপটা অতিক্রম করে দীর্ঘ দিন পরে আজ পত্র পুষ্পে শোভিত হয়ে গ্রামবাসীদের তৃপ্তি দানে সক্ষম হয়েছে।

নৌকা করে এরা ঘুরিয়ে দেখাল নিজেদের কর্ম্মরাজ্যটিকে। জাল ফেলা মাছ ধরা থেকে কচুরীপানা পরিষ্কার করা সব কিছুই দেখলাম—অনন্ত জলাধারের সীমারেখায় মার্ত্তণ্ডদেবের বিপুল আয়োজনের মধ্যে অস্তাচলগমন। হ্রদের জলের বুকে সেই অস্তমিত রবির বর্ণচ্ছটা, মুক্ত আকাশের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে বলাকার দল—সাদা ডানামেলে মাছরাঙ্গারা গাছের ডালে ঝিমুচ্ছে;—যেন তাদের চোখেও লেগেছে এই বর্ণচ্ছটার ইন্দ্রজাল। এদিকে নৌকায় বসে টাল খাচ্ছি আমরা সাংবাদিকের দল। নৌকা যখন চলছে ডানদিকে আমরা সরে যাচ্ছি বাঁদিকে, আর বাঁদিকে হেলে যাচ্ছি ডানদিকে। আমাদের এই অবস্থা দেখে হাসছে হাল হাতে মাঝি। অবশ্য সংগোপনে।

সন্ধ্যার আবছাওয়া আলোতে ফিরে চলো সাংবাদিকের দল আপন গৃহাভিমুখে; বাক্যহীনমুখে; কোন ভাষায় যে আমাদের প্রাণের প্রশংসা সমিতিকে জানাব খুঁজে পেলাম না তা। শুধু বললাম—"অপূর্ব্ব এই সৃষ্টি প্রয়াস আপনাদের দীর্ঘজীবী হোক্।—অধিকতর আলোকোজ্জ্বল হোক, এই কর্ম্মভূমি;—এই পুণ্যতীর্থ।"

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সাদা ও কালো

ফটো : বিনয়ভূষণ দাস

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন

(এডগার এ্যালেন পো)
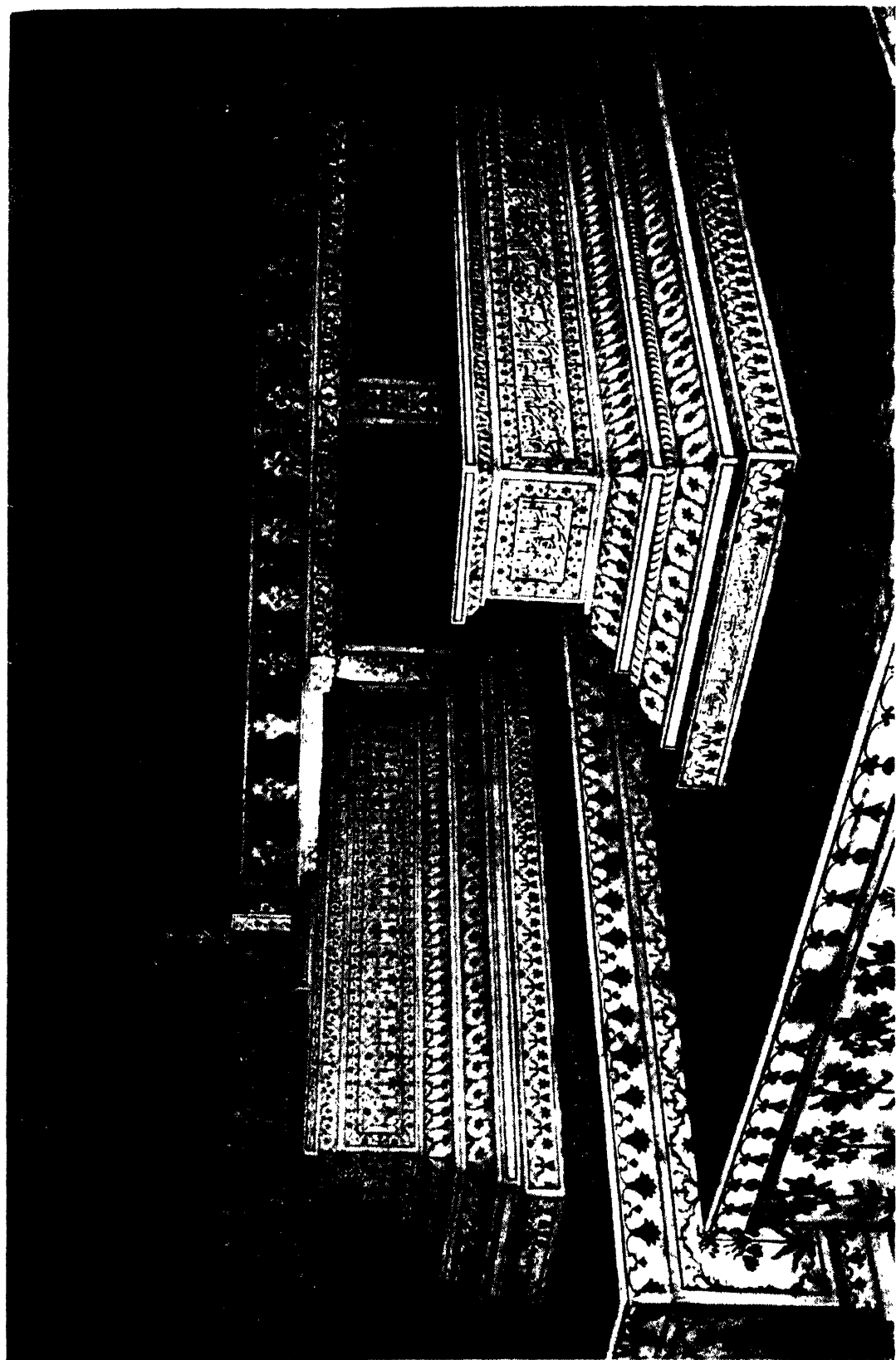
অনুবাদক ঃ শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

সত্যিই আমি খুব ভয় পেয়েছি। ভীতিগ্রস্ত ও শঙ্কাকুল আমার মন। আপনারা আমাকে তা হ'লেও পাগল বলবেন কেন? এই উন্মাদ রোগ আমার ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলোকে আরও প্রখর ক'রে তুলেছে। রোগের জন্য আমার বৃত্তিগুলো হীনবীর্য্য হ'য়ে পড়েনি। সব কিছু আমি বেশ ভালভাবেই শুনতে পাই। স্বর্গে ও মর্ত্তে কী হচ্ছে—তাও আমি শুনতে পাই। নরকের অনেক খবর আমার কানে আসে। এরপরও আমাকে আপনারা পাগল বলবেন? শুনুন—দোহাই আপনাদের আমার ব্যক্তিগত কাহিনীটা আপনারা শুনুন। তা হ'লে বুঝতে পারবেন, কেমন নিপুণভাবে আমি গল্প বলতে পারি।

আমার মাথায় হত্যা করবার চিন্তা কী ক'রে ঢুকেছিল তা আমি বলতে পারব না। বেশ বুঝতে পারলাম সেই একই চিন্তা আমার মাথায় অহরহ ঘুরঘুর করছে। এর পেছনে কোন যুক্তি বা উদ্দেশ্য ছিল না। সেই বুড়ো লোকটাকে আমি ভালবাসতাম। আমার প্রতি সে কোনদিন খারাপ ব্যবহার করে নি। কোনদিনও বুড়ো লোকটা আমাকে অপমান করে নি। তার অর্থের প্রতি আমার কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তার চোখ···হ্যাঁ তার চোখ আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তার চোখ দুটো শকুনের মতন। বিবর্ণ, নীলাভ সেই চোখ—সেই চোখের মণির উপরে ছিল চোখের চিকণ পাতা। তার সেই বিবর্ণ, নীলাভ চোখ দেখে আমার অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম করত। সমস্ত শরীর আমার ঠাণ্ডা হিমশীতল হত। এর পর থেকেই সেই বুড়ো লোকটার জান বরবাদ ক'রে দেবার জন্য ঠিক করে ফেললাম। সেই নীলাভ, বিবর্ণ চোখের দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পাকাপাকিভাবে মনে মনে ফয়শালা করে ফেললাম।

হত্যা করার এটাই হচ্ছে মূল কারণ। আপনারা আমাকে বদ্ধ পাগল ব'লে কল্পনা করছেন। পাগলরা অবশ্য কিছুই জানে না। আমাকে আপনাদের চেনা অবশ্যই কর্ত্তব্য। বিচার ও বিবেচনা করে কেমন নিপুণভাবে আমি এ কাজ করেছিলাম তা আপনাদের জানা দরকার। এ বিষয়ে আপনাদের ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। খুব সতর্কতা ও চোখ কান খোলা রেখে আমি এ কাজে নেমেছিলাম।

তাকে মারবার এক সপ্তাহ আগেও তাকে দয়া দেখাই নি আমি। প্রত্যেক নিশুতি আঁধার রাতে তার শোবার ঘরের খিল খুলে আমি গলা বাড়িয়ে তার দিকে তাকাতাম। ওঃ! তার কী শান্ত মহিমা। তারপর দরজার ফাঁক দিয়ে আমি আমার গলা উটের মতন বাড়িয়ে দিতাম। তারপর একটা লণ্ঠন তার খুব কাছ ঘেঁসে ধরতাম। সেই অন্ধকার নিশুতি রাতে ভয়ে আমি মাথা চাপড়াতাম। ওঃ! উঃ!! আপনারা বেশ নারকী আনন্দ পাচ্ছেন—যেহেতু আমি ভয়ে মাথা চাপড়াতাম। খুব সন্তর্পণে আমি এ কাজ করতাম। লক্ষ্য থাকত আমার, বৃদ্ধের ঘুম যেন না ভাঙে। ঘুমের ব্যাঘাত সেই বৃদ্ধের যেন আর না হয়। সেই দরজার ফাঁকে একঘণ্টা ধ'রে গলা বাড়িয়ে বিছানায় শায়িত বুড়োটাকে দেখতাম। হাঃ! হাঃ! এরকম সেয়ানা পাগল আর ক'জন

আছে? তারপর মাথাটা সেই দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে সেই লণ্ঠনের আলো আমি কমিয়ে দিতাম খুব সাবধানে। তারপর অতি সাবধানে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিতাম। এইজন্য—পাছে লণ্ঠনের কব্জার শব্দ হয়।

আলোটা এমনভাবে কমিয়ে দিতাম যে একটা ক্ষীণ-দ্যুতির আলোকশিখা সেই জড়দগব শকুনির মতন চোখওয়ালা বুড়ো লোকটার সর্ব্বাঙ্গে পড়ত। দীর্ঘ সাত রাত ধরে এই রকম পরখ তার ওপর করেছি। অন্ধকার নিশুতি রাতে এ কাজ আমি করতাম। তার চোখ সব সময়ই মুদিত দেখতাম। সেইজন্যে তাকে আমি সহজে খুন করতে পারি নি। জেগে বুড়ো লোকটা আমাকে বিরক্ত করে নি। তার সেই কুটিল চোখ দেখলেই আমার মাথায় খুন চাপত। পরদিন সকালে তার ঘরে ঢুকে নিঃশঙ্কচিত্তে তার সঙ্গে আমি আলাপ করতাম। প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা চলত। তাকে নাম ধরেই আমি ডাকতাম। বুড়ো রাত কেমন করে কটিয়েছে—এ প্রশ্নও করতাম। সেই বুড়ো লোকটা বিচক্ষণতা দেখাতে পারত যদি অন্ধকার রাত বারটার দুঃসহ ও অসৎ প্রহরগুলোকে সন্দেহ করত। কারণ সেই সময় অপলকভাবে সেই নিদ্রিত বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

অষ্টম দিনে দরজা খোলার সময় আমি নিজেকে খুব বেশী সাবধান করেছিলাম। ঘড়ির কাঁটা আমার হাতের চেয়ে বেশী সচল। সেই রাতের আগে আমি আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাই নি। বিজয় গৌরবের ইংগিত আমি সেদিন কদাচিৎ বুঝতে পেরেছিলাম। আমি আপন মনে ভাবতে ভাবতে সেই দরজা খুলি—ধীরে অতি ধীরে। আমার গোপন কার্য্যকলাপ বিষয়ে তখনও সেই বুড়ো কিছু খুঁজতে পারে নি। এই কথা ভাবছি আর মনে মনে হাসছি। ঠিক সেই সময় বুড়ো আমার গলার স্বর শুনতে পেয়েছিল। চমকিয়ে সেই বুড়ো বিছানায় উঠে বসল। আপনারা ভাবছেন ভয়ে আমি পিছিয়ে গেলাম—পাগল হয়েছেন আপনারা? আমি পিছু হটিনি। পিচের মতন নিকষ অন্ধকার সেই ঘর। ঘরে অন্ধকারের ঘনীভূত রহস্য। সেই ঘরের জানালাগুলো চোরের ভয়ে বন্ধ করা থাকত। আমি ভেবেছিলাম এই গাঢ় অন্ধকার ঘরে থাকার দরুণ দরজা খোলা অবস্থায় সেই বুড়ো দেখতে পারবে না। খুব আস্তে আস্তে দরজাটা তাই খুলতে লাগলাম। ঘরের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিচ্ছি। টিনের আস্তরণ দ্বারা আচ্ছাদিত মেঝের ওপর লণ্ঠনটা পড়ে যেতেই বুড়ো ভয়ে চীৎকার করে বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে বলে: কে? কে? ওখানে কে? আমি চুপ করে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। প্রায় একঘণ্টা আমি একবিন্দু অগ্রসর হইনি। একঘণ্টার মধ্যে বুড়োকে আমি শুতে দেখলাম না। বিছানায় বসে সেই বুড়ো কোন শব্দ শোনবার জন্য প্রতীক্ষা করছে। নিশ্চল স্থাণুর মতন সে বসে আছে। আমি এই রকম নিশ্চুপ ও নিশ্চল হ'য়ে রাতের পর রাত বৃদ্ধের শিয়রে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। দেওয়ালসংলগ্ন ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করছে।

মরণ-ভীতির মধ্যে ঘড়িটার ভীরু স্পন্দন!

সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা ক্ষীণ গোঙরাণি শুনতে পেলাম। এ এক রকম ভয়। এ ভয় মানুষ পেয়ে থাকে। এ দুঃখ বা ভীতির আর্ত্তনাদ নয়—না—না—এ আর্ত্তনাদ। মানুষ খুব ভয় পেলে অন্তরাত্মা হতে এ আর্ত্তনাদ ভেসে আসে। খুব ভয় পেলে এ ভাত আর্ত্তনাদ বার হয়। এ শব্দের রহস্য আমি ভাল করেই জানি। নিশুতি রাতে আমার বুকের স্পন্দন এ-রকম অনেকবার আমি শুনেছি। এ সময় সব লোক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। বুকের স্পন্দনের প্রতিধ্বনি শুনে রহস্য আর ভয় আরও ঘন হয়ে উঠত। এই শঙ্কা আর ভয় আমার মোটেই ভাল লাগত না। 'সত্যই সেই শব্দের রহস্যময়তা ভাল করেই আমি জানি ও বুঝি।

বুড়োলোকটা কী ভাবছে তা আমি বুঝতে পারি—তার ওপর আমার করুণা হয়। আবার আমার ভয়ও লাগে। আমি বুঝতে পারলাম সেই ক্ষীণ শব্দের আওয়াজের পর থেকে বুড়ো বিছানায় শুয়ে জেগে আছে। বিছানায় বুড়ো আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ভয় কিন্তু তার আরও বাড়ছিল। সে এগুলো অলীক বলে কল্পনা করবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাকে সে অস্বীকার করতে পারে না। নিজে নিজেই সে বলছিল: চিমনীর মধ্যে বায়ু ঢুকেছে, একটা নেংটী ইঁদুর বোধহয়

মেঝেটা পার হতে যাচ্ছিল। একটা ঝিঁঝিঁপোকা হয়ত ঝিঁ ঝিঁ করছে। হ্যাঁ—এই বলে সে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার সব কিছুই বৃথা হল। বৃথা—তার সব চেষ্টাই বৃথা—কারণ করাল মৃত্যুর পদধ্বনি যে এগিয়ে আসছিল। একটা কালো আবরণ দিয়ে অসহায় লোকটাকে মরণ গ্রাস করছিল। একটা অজানা ছায়া তার ওপর বিষাদ রাগিণীর বিচ্ছুরণ প্রভাব বিস্তার করছিল এ বেশ বুঝতে পারছিল সে। তবু আমার গলানো মাথা সে দেখতে অথবা কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি যে তার ঘরে আমি ঢুকেছি। অত্যন্ত ধৈর্য্য ধরে আমি সেখানে বহুক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। তার শোবার শব্দ আমি শুনতে পায়নি। লণ্ঠনের একটু সামান্য শিখা উস্কিয়ে দেবার আমি মনস্থ করি। আমি ধীরে—অত্যন্ত ধীরে—অতি সন্তর্পণে—খুব লুকিয়ে—গোপন করি নিজেকে। আলোকের একটা ক্ষীণশিখার দ্যুতি একটা মাকড়সার জালের সরু সুতোর মতন ঠিকরিয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে আলোর শিখা উসকিয়ে দেওয়া হল। আমি সেই দৃষ্টি দেখে বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বিবর্ণ ও ভীষণাকৃতি সে-চোখের চাহনি আমার অস্থি-পঞ্জরগুলোকে হিমশীতল ও অসার করে ফেলল। সেই বুড়ো মানুষটার মুখ আর দেহ ছাড়া আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ প্রবৃত্তির তাড়নায় বেশ স্পষ্টভাবে অভিশপ্ত স্থানটার দিকে সে আলোকশিখা আমি সঞ্চারিত করেছিলাম।

আমি কী আপনাদের বলিনি যে পাগলামির কারণ হিসাবে আপনারা যা ভুল করেন, সেটা মানুষের অতিরিক্ত অনুভূতি? এখন আমি আরও জানাচ্ছি তুলোর মধ্যে ঘড়ির কাঁটার শব্দের মতন কানের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত নীরস অথচ দ্রুতসঞ্চারী সুর আমি শুনতে পেলাম।

আপনারা আমাকে লক্ষ্য করেছেন ত'। আমি আপনাদের বলেছি আমি খুব ভীতু। এখন সেটা স্পষ্ট অনুভব করি। এই নিশুতি রাতে জীর্ণ বাড়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে সেই অদ্ভুত শব্দ আমাকে এমন ভীষণভাবে উত্তেজিত করল যে আমি আর নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারলাম না। তবু নিজেকে সংযত করি। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আরও দ্রুততর হতে থাকে। আমার মনে হল হৃৎপিণ্ড বুঝি বা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। একটা নতুন চিন্তা আমাকে সমস্যায় ফেলল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয়ত প্রতিবেশীরা শুনতে পারে। বুড়োলোকটার অন্তিমক্ষণ আগত। একটা তীব্র আর্তনাদ করে লণ্ঠনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই ঘরে লাফিয়ে ঢুকি। বুড়োটা আবার চীৎকার করল। সেই শেষ চীৎকার। মুহূর্তের মধ্যে বিছানা থেকে আমি তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে সেই ভারী বিছানা বুড়োর ওপর চাপিয়ে দিলাম। কাজ করা হয়েছে দেখে বেশ আত্মপ্রশংসার হাসি আমি হাসলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ভয়চকিত শব্দ করে হচ্ছিল। অবশ্য আমার মধ্যে এ-শব্দ বিরক্তি আনে নি। দেওয়াল ভেদ করে সে-শব্দ আর বার হবে না, শোনা যাবে না। তারপর হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দ থেমে গেল। লোকটা মরে গেছে। বিছানা সরিয়ে সেই মৃতদেহটা আমি দেখতে লাগলাম। হ্যাঁ নিথর পাষাণের মতন তার দেহ। কয়েক মিনিটের জন্যে তার হৃৎপিণ্ডের কাছে হাতটা রেখে পরখ করলাম। স্পন্দন আর নাই। নিথর পাষাণের মতন মরে পড়ে আছে সে। তার চোখ আর আমাকে কষ্ট দেবে না।

আপনারা যদি এখনও আমাকে পাগল ভাবেন—তা হলে আমাকে আর পাগল ঠাওরাতে পারবেন না। কারণ সে শবটাকে পাচার করবার জন্য আমি যে কী মতলব ঠাওরেছিলাম! রাত শেষ হয়ে আসে। দ্রুত অথচ নীরবে আমি আমার কাজ করে যেতে লাগলাম। সেই শবটা আমি টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্ন করলাম। মাথাটা কাটলাম। তার পর হাত ও পা দুটো কাটলাম। সেই ঘরের মাঝ থেকে কয়েকটা তক্তা তুলে নিয়ে সেই গর্তের মধ্যে আমি সব কিছু রেখে দিলাম। তারপর সেই তক্তাগুলো খুব বিচক্ষণতার সাথে ধীরে সুস্থে বেশ বুদ্ধি করে রাখলাম। মানুষের নজরে, এমন কি সেই বিগত বৃদ্ধের নজরে যাতে না আসে। পরিষ্কার করবার খুব প্রয়োজন ছিল না। হত্যার কোন চিহ্নই সেখানে নাই। রক্তের কোন চিহ্ন নাই, কারণ আগে থেকেই খুব

সতর্ক ছিলাম। একটা গামলায় সব রক্ত জমা করে রেখেছিলাম। হাঃ হাঃ, এসব কাজ যখন শেষ করলাম তখন রাত চারটে। গভীর আঁধার রাত। ঘণ্টার শব্দ প্রহর গুণে চলে যেতেই দরজায় করাঘাত শুনতে পেলাম। খুব সহজ ও হাল্কা ভাবে দরজা খোলবার জন্য আমি অগ্রসর হলাম। এখন আর আমার ভয় করবার কী আছে? তিন জন লোক ঢুকল।

নিজেদের তারা পুলিশ কর্মচারী হিসাবে পরিচয় দিল। তাদের খুব ভদ্র ব্যবহার। অন্ধকার রাতে তার ভীত আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়েছে। একটা জঘন্য ক্রিয়া-কলাপ এর সঙ্গে জড়িত। তাই সন্দেহ। পুলিশ অফিসে কয়েকজন লোক তাই এ খবর দিয়েছে। সেজন্য পুলিশ কর্মচারীদের এ-গৃহ তল্লাস করতে পাঠান হয়েছে।

আমি হাসলাম। ভয় করবার কী আছে? তাদেরকে স্বাগত অভ্যর্থনা আমি জানালাম। আমি বললাম, স্বপ্নে সেই আর্ত্তনাদ আমি নিজেই করেছি। আমি আরও বললাম, বুড়ো লোকটা এখানে অনুপস্থিত। সেই আগন্তুকদের আমি সারা বাড়িটা দেখালাম, তারা ভাল করে অনুসন্ধান করুক। তারপর সে-বুড়ো লোকটার ঘরে তাদের নিয়ে গেলাম। বুড়োটার টাকাকড়ি দেখালাম। নিরাপদেই সমস্ত ধনরত্ন আছে। কোন কিছুরও ক্ষয় এবং ক্ষতি হয় নি। কতকগুলি চেয়ার সে-ঘরে এনে তাদের জানালাম, তাদের ক্লান্তি তারা এ-ঘরে বিশ্রাম করে দূর করতে পারে। আমি অবশ্য নিজেই এক বন্য, হিংস্র ও আদিম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলাম নিজের জয় হিসাবে—ঠিক যেখানে, যে-স্থানটীর ওপরে বুড়োটার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে রাখা হয়েছে।

পুলিসের লোকেরা সন্তুষ্ট হল। আমার হাবভাব তাদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। সম্পূর্ণ নিরাপদ আমি। তারা বসল। নানা ঘরোয়া আলোচনার কথা তারা আমার সঙ্গে বলাবলি করছিল। আমি আনন্দের সঙ্গে উত্তর দি।

কিন্তু একটু সময় অতিবাহিত হতে না হতে আমি বুঝতে পারলাম, আমি বিবর্ণ হয়ে পড়েছি। তারা চলে যাক এই-ই আমি চাই। আমার মাথা ধরে। বেশ বুঝতে পারলাম কানে ঝালাপালা শব্দ ভেসে আসছে। তবুও তারা বসে আলাপ-আলোচনা করছে। সেই ঝালাপালার সুর আরও স্পষ্ট হয়। সে শব্দ থামে না, আরও বেড়ে চলে। সেই বিভীষিকা থেকে রেহাই পাবার জন্য আরও খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করি। কিন্তু সে-শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে আমার কানে ভেসে আসে, শেষে বুঝলাম সে-শব্দ আমার কানের পর্দার ভেতরেও যেন আর কমছে না।

আমি আরও বিবর্ণ হয়ে উঠতে লাগলাম। বেশ জোরালো গলায় আরও অনর্গলভাবে তাদের সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা সুরু করি। তবু সে-শব্দ আরও বাড়তে থাকে। আমি এখন আর কী করতে পারি। ক্ষীণ, বিষাদময় দ্রুতসঞ্চারী শব্দ। একটা ঘড়ি তুলোর মধ্যে রাখলে যেমন শব্দ করে—ঠিক সে-রকম শব্দ। আমি আরও দম নেই। পুলিশ কর্মচারীরাও আমার দম নেওয়ার শব্দ শুনতে পায় যে। আরও দ্রুতভাবে পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে অনর্গলভাবে আমি কথা বলতে সুরু করি। সে-শব্দ ক্রমবর্দ্ধমান। ভীষণ ভাবে বেশ ধীরে ধীরে বাড়ে। সামান্য কথা নিয়ে আমি তর্ক করতে লাগলাম। আমার হাবভাবের মাঝে বেশ চাঞ্চল্য। তর্কে চোখা চোখা যুক্তি।

এরা কী যাবে না? ঘরের মেঝের ওপরে আমি ইতস্ততঃ পায়চারি করি। এ-সব লোকদের দেখে আমি যেন বিরক্ত হয়েছি, সে-শব্দটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। হায় ভগবান! কী এখন করি। আমি ক্রুদ্ধ হই, রেগে যাই ও অভিশাপ দিই। যে-চেয়ারের ওপর বসেছিলাম সেখান থেকে ছিটকে দূরে সরে যাই। বিরক্তি এসেছে। আমার হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা হবার উপক্রম করেছে। পাটাতনের ওপর সে-চেয়ার পড়ে যায়। কিন্তু সে-শব্দটা আরও বেড়ে যায়, ক্রমেই বাড়ে সে-শব্দ। আরও স্পষ্ট হয়, বেশ স্পষ্ট হয় সে-শব্দ। সে-লোকগুলো তখনও খুচরো আলাপ করতে থাকে। মুখে তাদের স্মিত হাসি। তারা এ-শব্দ কী শোনে নি? এ কী সম্ভব? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! না! না! তারা শুনেছে। তারা সন্দেহ করেছে! আমি এ-গুলো ভাবছিলাম। গভীর ভাবে চিন্তা করি। এ রকম মানসিক উৎপীড়ন সহ্য করার চেয়ে পৃথিবীর আরও যে-কোন কিছু সহনীয়। এ-রকম ছলনার চেয়ে যে-কোন যন্ত্রণার বিনিময়ে রেহাই পাওয়া ভাল। সেই

শয়তানী হাসি আমি আর সইতে পারি না। না সে-ছল-চাতুরী হাসি আমার আর সহ্য হয় না। তাদের দিকে ভ্রূকুটী করব নতুবা মরব।

হ্যাঁ আবার ওই শুনুন—সে-শব্দ দ্রুততর—আরও দ্রুততর হচ্ছে। 'শয়তানরা' আমি চীৎকার করে বললাম। আর ভাণ কর না আমি সে-কাজ করেছি! পাটাতন-গুলো খুলে ফেল! হ্যাঁ এখানে—এ-হচ্ছে সেই হৃৎপিণ্ডের ভয়াবহ স্পন্দন!

জীবনায়ন

(উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতার অনুবাদ)

শ্রীভবতোষ পতি বি-এ

পুরাতন যেইক্ষণে অন্তরের টানে
নবীনেরে দেয় আলিংগন
সেইক্ষণে পরিপূর্ণ অনন্ত জীবন;
সেই তো সুন্দর, অর্থ তার নাই অভিধানে।
যে জীবন ফুটে উঠে বাস্তবের বৃন্তে মধুময়
প্রকাশ রহস্যভরা তার।
আকাশের গর্ব অহংকার
তার কাছে হীন অতি, সে চির বিস্ময়।
অরণ্য প্রান্তর মাঝে সুন্দরের হাসি
এতদিনে হত আরো দীন;
সে সৌন্দর্য্য সাথে যদি না হ'ত বিলীন,
মানুষের প্রশংসা ও প্রেম রাশি রাশি।

ভিক্টর হিউগো

শ্রীসত্যভূষণ সেন

(১৮০২-১৮৮৫)

সার্থক নামা সাহিত্যিক ভিক্টর হিউগো; ইংরেজ কবি টেনিসন্ তাঁর অনবদ্য ভাষায় ভিক্টর হিউগোর প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—উপন্যাস ও নাট্য রচনা ক্ষেত্রের বিজয়ী বীর (Victor in Drama, Victor in Romance)। নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে যে হিউগোর প্রতিভা মূলতঃ কবি-প্রতিভা, তিনি ছিলেন জনগণের কবি; জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম্মকৃতিত্ব ও আদর্শ সবই তিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে মুখরিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য শুধু জনগণকে উদ্দীপ্ত করবার জন্ত-ভেরী-নিনাদমাত্র ছিল না; মানবচিত্তের সকল প্রকার বিচিত্র অনুভূতি, মানব অন্তরের সকল অভিব্যক্তি ও দীপ্তি, মানব জীবনের সকল রহস্য ও গরিমা এই সমস্তই তাঁর সাহিত্যে মন্ত্রিত হয়েছিল। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দরুণ তাঁর চিত্তের কতকটা অসামঞ্জস্য এবং নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ববোধের প্রভাবে তাঁর প্রতিভারও হয়ত কিছু খাদ মিশ্রণ ঘটেছিল, তথাপি সাহিত্যিক প্রতিভা হিসাবে তাঁকে এস্‌কাইলাস, শেক্সপীয়র এবং গ্যয়ঁথের সমানধর্ম্মী বলা চলে। অনেকের মতে ফরাসী দেশে ভিক্টর হিউগোর মত এত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা আর দেখা দেয়নি।

হিগোর জন্ম হয় ফরাসী দেশের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি সহরে ১৮০২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন একজন কৃষি-জীবী ও চাষী, পিতামহ ছিলেন সূত্রধর; তার পিতা ছিলেন জনশাসিত ফরাসী রাষ্ট্রের একজন সামরিক কর্ম্মচারী। তিনি ছিলেন নেপোলিয়নের একান্ত অনুগত, অপর পক্ষে তাঁর স্ত্রী ছিলেন জন্মাধিকার সূত্রে এবং ভাবপ্রবণতায় ও প্রাচীন রাজানুগত্যে নিষ্ঠাবতী।

বিজয়ী নেপোলিয়ন তখন ইউরোপের দেশে দেশে অভিযানে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন; এরই আনুসঙ্গিক ফলে পিতা মাতার সঙ্গে হিউগোরও শৈশবকাল অতিবাহিত হয় স্থান থেকে স্থানান্তরে পর্য্যটনে—স্পেনে, ইতালীতে এবং ফরাসীদেশেরও নানা স্থানে। হিউগোর নিজের কবিতাতেই দেখা যায় যে কখনও তাঁর শিশু শয্যা বিস্তৃত হত রণভেরীর গাত্রোপরি,

কোনও পার্ব্বত্য ঝরণা থেকে সৈনিকের টুপীতে করে জল এনে শিশুকে পান করান হত, তাঁর শিশু শয্যার আস্তরণে হয়ত ব্যবহৃত হত ছিন্ন যুদ্ধ পতাকা। নেপোলিয়নের সঙ্গে সঙ্গে হিউগো পরিবারের ও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। স্পেনে তারা বিশিষ্ট অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতেন। ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের ভাগ্য বিপর্য্যয় আরম্ভ হল, হিউগো পরিবারও দুরবস্থায় পড়লেন এবং তারা ফরাসী রাজধানী প্যারিতে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য পতনের পরে হয়ত রাজনৈতিক মতানৈক্যের দরুণই ভিক্টরের পিতামাতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তার শৈশব ও বাল্যজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ভাগ্য বিপর্য্যয় এবং পিতামাতার পরস্পরের আদর্শ ও মতদ্বৈধতা হিউগোর জীবনে এবং মানসে যেমন বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিল তেমনই তার চিত্তকে বিক্ষিপ্তও করেছিল ; মোটের উপরে তার মানস গঠনে এর প্রভাব বড় সামান্য ছিল না।

পিতা তার জন্য ব্যবহারিক বিদ্যা এবং সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। হিউগো গণিত বিদ্যায় অনুরাগ এবং পারদর্শিতারও পরিচয় দিলেন। কিন্তু তার সাহিত্যিক মন এসব ব্যবহারিক বিদ্যা অনুশীলনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে স্বীকৃত হল না ; অগত্যা তার পিতাও আপত্তি করলেন না।

বাল্য বয়স থেকেই হিউগোর সাহিত্যে অনুরাগ দেখা যায়, পাঠানুরাগও ছিল অসাধারণ। তিনি ভলটেয়ার (Voltaire) কালডেরণ (Calderon) এবং শ্যাতোব্রিয়ার (Chatentriand) সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে ; শ্যাতোব্রিয়ঁ হয়ে উঠলেন তার সাহিত্যিক কামনার আদর্শ-পুরুষ। বাল্য বয়সেই তিনি কবিতা রচনাও আরম্ভ করেছিলেন ; পনেরো বৎসর বয়সে রচিত একটি কবিতা ফরাসী অ্যাকাদেমীর প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল। কিন্তু কবি তার বয়স সম্পর্কে অসত্য উক্তি করেছিলেন অনুমান করে তারা এই কবিতাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করলেন না।

১৮১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভিক্টর হিউগো তার ভাইয়ের সহিত সহযোগিতায় একটি সাময়িক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন ; এই পত্রিকায় কবিতা, রাজনীতি, ইতিহাস সবই অজস্রধারায় প্রকাশিত হতে লাগল, প্রধান লেখক ছিলেন ভিক্টর স্বয়ং। এই সময়ে তার একখানা উপন্যাসও প্রকাশিত হয়।

১৮২১ সালে হিউগোর মার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তার আর্থিক দুরবস্থার দরুণ তাঁকে অনেক দুঃখ কষ্টও সহ্য করতে হয় ; তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত উপন্যাস "লে মিজারেব্‌ল্‌স্‌" এ হয়ত তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, অন্ততঃ তার ছায়া পড়েছে।

১৮২২ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ; এই সকল কবিতার লিপিরীতিতে ক্লাসিক আদর্শের পরিচয় পরিস্ফুট, ভাবধারাতে দেখা যায় রাজানুগত্য ও রাজানুরক্তি, যা কবি তাঁর মার নিকট থেকে পেয়েছিলেন। এই কবিতা গ্রন্থ সম্রাট অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি খুশী হয়ে কবিকে বার্ষিক এক হাজার ফ্রাঁ (Frane) পেনশন দেন, এই পেনশনের পরিমাণ পরবর্ত্তীকালে দ্বিগুণিত করে দেওয়া হয়। এই অর্থাগমে শুধু তাঁর দারুণ অর্থাভাবই মোচন হয় না, তিনি তাঁর আবাল্য সখী ও প্রণয়িনী অ্যাডেলে ফুশারকে (AdeleFoucher) বিয়ে করতেও সমর্থ হন। ভিক্টর এবং অ্যাডেল ছিলেন বাল্য বয়স থেকে পরস্পরের খেলার সাথী, যৌবন বয়সে তাদের মধ্যে একনিষ্ঠ প্রেমের সঞ্চার হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভিক্টরের ভাইও এই মেয়েটির প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হ'ন, এদের বিয়ের সময়ে তার মস্তিষ্ক বিকার দেখা দেয়, তখন থেকে তাকে আবদ্ধ করে রাখতে হয়, ১৮৩৭ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৮২৫ সালে হিউগোর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ; কাব্য-হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী রচনার চেয়ে এইটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এই কাব্যের মধ্যে তার বিপ্লবী মতবাদেরও সূচনা দেখা যায়।

১৮২৯ সালে প্রকাশিত হয় ওরিয়েন্টেলস (orientales) নামে কাব্যগ্রন্থ, এর মধ্যে ছিল প্রাচ্য-দেশের জনগণের জীবনধারার ছায়া, এই সকল কবিতার মধ্যে ছিল দুর্দ্দমতা ও আবেগ প্রাধান্য। এর জন্য তাকে অত্যন্ত তীব্র সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু এই সকল কবিতার মধ্যে অনেকগুলির কবিত্ব মাধুর্য্য অনেকটা ইংরেজ কবি শেলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুসম্পূর্ণ শিল্প কারুকার্য্যে এগুলি কীট্‌স্‌ বা টেনিসনের কবিতার সমানধর্ম্মী।

শ্যাতোব্রিয়াঁ এবং লামার্তিন ছিলেন ফরাসী সাহিত্যে "রোমান্টিক" আদর্শ ও ভাবধারার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২৬ সালে এরা দুজনেই সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করে রাজনীতিতে যোগদান করেন ; ফলে হিউগো এই ক্ষেত্রে আধিপত্য লাভের সুযোগ পেলেন। ১৮২৭ সালে সেখানে শেক্সপীয়রের নাট্য অভিনয়ের ফলে প্যারীর জনসাধারণের মধ্যে কিছু চমকপ্রদ সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্য আগ্রহ জন্মে। প্রায় দু'শতাব্দী ধরে ফরাসী নাট্য সাহিত্যে ক্লাসিক আদর্শের আধিপত্য চলে আসছিল ; র‍্যাসিনি (Racine) এবং তার অনুকারীদের দ্বারা নাট্যরীতির আদর্শ যেন একেবারে বিধিবদ্ধ হয়েই ছিল। ফলে ফরাসী নাট্য সাহিত্যের ধারা যেন বদ্ধ জলাশয়ে এসে একই ক্ষেত্রে আবর্ত্তিত হয়ে চলছিল। হিউগো স্প্যানীয় নাট্যকার কালডেরণ এবং ইংরেজ সেক্সপীয়রের প্রভাবে "রোমান্টিক" আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেন। ক্লাসিক আদর্শ ছিল—সাহিত্যের রসবস্তু হবে সুন্দর এবং তা প্রকাশিত হবে সংস্কৃত বা মার্জ্জিত 'ভাষায়'—কারণ আদর্শ সাহিত্য হবে সংস্কৃত সমাজের প্রতিরূপ। হিউগো তার মতবাদ প্রচার করলেন—ক্লাসিক রীতির অত্যাচারে সাহিত্য হয়ে আছে জর্জ্জরিত, হয়ে পড়েছে রুদ্ধগতি ; শিল্প সাহিত্যের মধ্যে থাকবে ক্রমাভিব্যক্তি, প্রগতি। আদর্শ সাহিত্যকে শুধু সুন্দরের প্রতিরূপ হলেই চলবে না। শুধু মার্জ্জিত ভাষায় প্রকাশিত হলেই চলবে না ; আদর্শ সাহিত্য হবে সত্য, স্বাভাবিক জীবনের প্রতিরূপ এবং তাকে প্রকাশিতও হতে হবে স্বাভাবিক স্বচ্ছ ভাষায়, কারণ সাহিত্য হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনেরই রূপায়ণ। মোটকথা সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দরের আরাধনা নয়, জীবনের প্রকাশ। এই আদর্শ

নিয়ে তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেন, কারণ কবিতার চেয়ে নাট্য রচনার মধ্য দিয়েই মানব জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

প্রথম নাটক "ক্রমওয়েল" (Cromwell) প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সালে। এই নাটকেই র‍্যাসিনী প্রভৃতি অনুসৃত নাট্যপদ্ধতি এবং আদর্শের বিরুদ্ধে প্রথম বিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশিত হয়।

নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "রাজার আমোদ" (Le Roi S' Amuse ; The King's Amusement) এই নাট্যকাব্যে পূর্ব্বতন আদর্শের বিরুদ্ধ মতবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট। নাটকের নায়ক রাজার বিদূষক এবং নাটকের প্রধান দুর্ব্বৃত্ত রাজা স্বয়ং। নায়কের একমাত্র কন্যা অসংযত-চরিত্র রাজা কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হয়—ইহাই নাটকের আখ্যায়িকা। এই নাটকে মানুষের অন্তরের মর্ম্মবেদনা এবং ভাবাবেগ যেরূপ দরদের সহিত এবং সার্থকভাবে প্রকাশিত তাতে এই নাটকখানা এক বিস্ময়কর রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বয়ং রাজা দুর্ব্বৃত্তরূপে চিত্রিত, সেজন্য প্রথম অভিনয়ের পরেই সরকার কর্ত্তৃপক্ষ এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেন ; পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে ঐ নাটকের আর দ্বিতীয়বার অভিনয় হতে পারে নি, আরও পরে অবশেষে "রিগোলেত্তো (Regoletto) নামে এই নাটক পৃথিবীতে বহুল প্রচারলাভ করেছে।

আর একখানা নাট্য-কাব্য "হারণানি" (Hernani) প্রকাশিত হয় ১৮৩০ সালে। এই নাটকে পূর্ব্বতন পদ্ধতির সহিত যে আদর্শ সঙ্ঘাত দেখা দেয় তাতে প্রথম অভিনয়ের পরেই প্রাচীন ও নবীন এই দুই দলের মধ্যে সংগ্রাম দেখা দেয় এবং এই নিয়ে রাজধানীতে গভীর ভাবে সাড়া পড়ে যায়। এমন কি ফরাসী অ্যাকাদেমী থেকে কবির বিরুদ্ধে রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত হয় ; রাজা কোনও প্রকার প্রতিকার-দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হন ; তিনি বলেন যে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিও একজন সাধারণ ব্যক্তি মাত্র, সে ক্ষেত্রে রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনার কোনও প্রশ্ন আসতে পারে না।

নাটক হিসাবে এবং কবিত্ব মাধুর্য্যেও এই গ্রন্থ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা। নায়ক হারনানি একজন অসাধারণ বীর পুরুষ, পিতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে সে বদ্ধ পরিকর, সেজন্য তাকে বিপ্লবী এবং সমাজচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। তার অর্থ দুর্গত এবং হীন অবস্থা সত্ত্বেও তার প্রতি তার প্রণয়িনী দোনা সল (Dona Sol)এর প্রেমনিষ্ঠা কাব্যখানাকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে উন্নীত করেছে। দোনা সল তার প্রণয়ীর প্রতি প্রেমানুরাগের নিষ্ঠায় পদ-মর্য্যাদাসম্পন্ন ডিউকের বিবাহ প্রস্তাবের প্রলোভন অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রত্যাখ্যান করল। পরিশেষে প্রণয়ী প্রণয়িনী সলিখিত ভাবে বিষ-পানে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধাবস্থায় জীবন বিসর্জ্জন দেয়।

এই নাটকখানা কবির জন্য সার্থকতা আনয়ন করে। তিনি আর্থিক মূল্য পান পনেরো হাজার ফ্রাঁ। প্যাত্রেরিয়াঁ হিউগোকে উদীয়মান সূর্য্য বলে সম্বর্দ্ধিত করেন।

নাট্য সাহিত্য রচনায়ও তার প্রতিভা এবং প্রকাশ ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি ; তিনি এতে পূর্ণ তৃপ্তি না পেয়ে উপন্যাস রচনায় মন দিলেন। তার প্রথম উপন্যাস "নোতার ডাম" (Notre Dam De Parts) প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ; তার পরবর্ত্তী দুখানা উপন্যাস "লে মিজারেবল্‌স্‌" (Les Miserables) ১৮৬২ সালে প্রকাশিত এবং "টয়লার্স অফ দি সি" (Le Travailleurs di Le Mer) ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত। গদ্য-সাহিত্য রচনায় হিউগো কিরূপ উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এই তিনখানা উপন্যাসই তার প্রকৃষ্ট পরিচয়, বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্যে এই তিনখানা গ্রন্থ স্থায়ী আসন দাবী করতে পারে। মানব জীবনই এই সকল উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। মানুষের সুখ দুঃখ পাপ তাপ বেদনা চেতনা সহ পার্থিব জগতে মানব জীবনধারার পরিপূর্ণ ইতিহাস যেন এইসকল কাহিনীর মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাস্তব মানব জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় চিত্রণ বিষয়ে অনেকে ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার সহিত হিউগোর তুলনা করেন। একজন সমালোচক যথার্থ-ই বলেছেন যে জোলা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে মানুষকে নিয়ে ফেলেছেন পশুর স্তরে, হিউগোর দৃষ্টিতে মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দেবতার সমান। হিউগোর বিশ্বাস যে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ তাপ, তার অন্তরের দুষ্প্রবৃত্তি তাকে যতই কলুষিত করুক বা হীনতার পঙ্কে এনে ফেলুক—তার অন্তরে যে আছে ভগবৎ প্রেরণার স্ফুলিঙ্গ তার কখনও বিনাশ সাধন হতে পারে না। একদিন ভগবানের করুণা স্পর্শে আবার তার চিৎশক্তি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং ভগবদ্দত্ত তার স্বাধিকারে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কবির চিত্তে মানুষের প্রতি অসীম দরদ না থাকলে তার চিত্রে মানুষের গরিমা এমন দীপ্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হতে পারত না ; তার অপূর্ব্ব রচনা শক্তির দৌলতে তার উপন্যাসও যেন কাব্যের স্তরে গিয়ে উন্নীত হয়েছে।

উপন্যাস পাঠকদের নিকট তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে পরিচিত হয়ে থাকলেও ভিক্টর হিউগো মূলতঃ কবি। নাট্যকাব্য ছাড়া এই সময়ে দশ বৎসর ধরে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করে গেছেন তার মধ্যে অনেকগুলি কবিতা ভাবমাধুর্য্যে এবং রচনা কৌশলেও সঙ্গীতের স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে। তার উপন্যাসের মধ্যে যে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের জন্য কবিচিত্তের অন্তহীন দরদ, তেমনই তার একটি কবিতার মধ্যেও পতিতার জন্য তার চিত্তের সহানুভূতি ও কবিত্ব মাধুর্য্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে "Insult not the Fallen."

পতিতা ! হাঁ পতিতা বটে এবং তার মত আছে আরও কত শত। এরাও একদিন ভালবেসেছিল, কিন্তু এখন তারা যে মর্ম্মন্তুদ জ্বালার দহনে ভুগছে একমাত্র ভগবান জানেন কি তার মর্ম্মান্তিক বেদনা। কিন্তু কার জন্য তাদের এই পতন ? তোমাদেরই সম্পদের দীপ্তিতে তাদের তোমরা প্রলুব্ধ করে এনেছ অথবা আয়ত্ত করে ফেলেছ। কিন্তু তাদের কি এই পাপ থেকে মুক্তি হতে পারে না। বৃষ্টিধারার পবিত্র জলরাশি মাটির সঙ্গে মিশে কাদার সৃষ্টি করে নিজেরও পবিত্রতা হারিয়েছে,

আবার সূর্য্যের উত্তাপে পঙ্কশয্যা থেকে উঠে সেই জলই পরিশ্রুত হয়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে ; তেমনই প্রকৃত প্রেমের প্রভাবে অথবা ভগবানের করুণা সিঞ্চনে এদেরও মুক্তিলাভ ঘটবে, এদের নিষ্কলুষ স্বরূপ আবার প্রকাশ পাবে। শরতের পত্রাবলী (Antumn Leaves) কাব্য-গ্রন্থের মধ্য একটি কবিতা আছে "সকলের জন্য প্রার্থনা" (Prayer for all)—এই কবিতার ভাবমাধুর্য্য বড়ই সুন্দর।

পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই কোনও না কোনও দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে ; নদীর প্রবণতা সমুদ্রাভিমুখী, মধুমক্ষিকার প্রবণতা গন্ধবিকীরণকারী পুষ্পের দিকে, ঈগল পাখীর গতি সূর্য্যাভিমুখী, শকুনির দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে, চাতকের দৃষ্টি জলের জন্য পিয়াসী, মানবচিত্তের প্রার্থনার চিরন্তন প্রবণতা ভগবদাভিমুখী।

যারা পাপে নিমজ্জিত তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে শিশুরা, ফুলের সৌরভের ন্যায় ধূপ থেকে নির্গত গন্ধের ন্যায় শিশুর নিষ্কলুষ চিত্তের প্রার্থনা ভগবানের নিকট গিয়ে পৌঁছে।

হে শিশু-মুষ্টি ভিক্ষাদানের ন্যায় তুমি সকলের জন্য দাও তোমার প্রার্থনা। তোমার পিতামাতা, জ্ঞাতিবন্ধু, ধনী-নির্ধন, বিধবা, যারা হীন পতিত—যারা সকলে তোমার পূর্ব্বেই ইহজগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাদের সকলের জন্য দাও তোমার প্রার্থনার দান এবং তাদের সকলকে তুমি সমর্পণ কর ভগবানের চরণে। একটি কবিতা "মধ্যাহ্নে সিংহের নিদ্রা" (The Lions sleep at Noon) ; সিংহ—ঘুমিয়ে আছে তার চমৎকার বর্ণনা। মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা, সিংহ ঘুমিয়ে আছে, সকলেই যেন নিশ্চিন্ত। নিজের গহ্বরে সিংহ শায়িত, তার মুখ বিবর যেন একটা গুহার ন্যায়, তার কেশর যেন বনভূমি, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তার শরীর আন্দোলিত, তার রক্তচক্ষু যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার শান্তভাব ও তার প্রশস্ত ললাট যেন একজন ঋষির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার তৃপ্তিহীন হিংসা যেন ক্ষণকালের জন্য শান্ত, সে যেন স্বপ্নে অভিভূত। ইত্যাদি।

একটি কবিতা "পাঠাগার দাহন" (The Burning of a Library) অল্পকথায় বিস্ময়কর তার বর্ণনা ও ভাবব্যঞ্জনা। তোমরা দগ্ধ করে ফেলছ আবহমান কালের সকল সত্যের বাণী, সময়ের পুঞ্জীভূত সকল সম্পদ, অতীত থেকে চলেছে যে ইতিহাসের অভিযান। এই সকল পুস্তকের মধ্যে আছে তোমাদের মুক্তির বাণী। তোমাদের ঈর্ষা দুষ্প্রবৃত্তিকে শান্ত করতে পারে এই সকল বাণী। যাদের বাণী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এখানে সেই সকল মহাত্মাদের প্রেরণায় তোমাদের আত্মা কি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে না? ইত্যাদি।

ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরে দেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে প্রকার অব্যবস্থা চলছিল হিউগোর জীবনে তার প্রভাব পূর্ণমাত্রায়ই পড়েছিল, তথাপি তার চিত্তে দেশানুরাগ, পারিবারিক বন্ধনের নিবিড়তা বোধ, শিশু প্রীতি প্রভৃতি ফরাসী জাতি সুলভ সদ্গুণেরও পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটেছিল। তার দেশাত্মবোধ, তার রাজনৈতিক কর্ম্ম চেষ্টা এবং মানুষের জন্য দরদ বা সহানুভূতি তার কাব্য সাহিত্যের মধ্যে ফুটে-উঠেছিল। এই সকল সঙ্কট-সমস্যা-সঙ্কুল চিন্তা এবং কর্ম্মচেষ্টার মধ্যেও যে শিশু প্রীতির একটি স্বচ্ছ নির্ম্মলধারা তার অন্তরে ফল্গুধারার ন্যায় চির প্রবাহিত ছিল তার অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়। তার নাতনী জীন সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। যিনি ছিলেন গৃহকর্ত্রী, তিনি একদিন জীনের অশিষ্ট আচরণের জন্য তাকে একটি ছোট ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন ; হিউগো শিশুর দুঃখ অপনোদনের জন্য কোন মতে এক শিশি জ্যাম তার নিকট পৌঁছে দিয়ে আসেন, পরে গৃহকর্ত্রী জানতে পেরে অনুযোগ প্রকাশ করে হিউগোকে বলেন "তোমার জন্য ছেলে মেয়েদের শাসন করবারও উপায় নেই, তুমি সব নষ্ট করে দাও, তোমার কাছে প্রশ্রয় পায় ওরা, তোমাকেই ওঘরে আবদ্ধ করে রাখা উচিত।" জীন শুনতে পেয়েছিল। দাদুর জন্য তার চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠল। সে তার কানে কানে গিয়ে বলল—"দাদু, তুমি ভয় পেও না। তোমাকে ওঘরে আবদ্ধ করে রাখলে আমি চুপি চুপি তোমাকে জ্যাম দিয়ে আসব।"

শুধু নিজ পরিবারের শিশু নয়, সকল শিশুর জন্য-ই তার অন্তরের দরদ ছিল অসীম। হিউগোর প্রীতি অথবা সহানুভূতি আকর্ষণ করবার সহজ উপায় ছিল কোনও শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। হিউগো যখন রাজনৈতিক কারণে একটি দ্বীপে নির্ব্বাসিত অবস্থায় ছিলেন সেখানে সে অবস্থায়ও তিনি স্থানীয় গরীব লোকদের শিশুদের প্রতি সপ্তাহে একবার করে ভোজ খাওয়াতেন।

তার নিজের নাতি নাতনীদের প্রসঙ্গ নিয়ে যে সব কবিতা লিখেছিলেন তাতেও একখানা কাব্য-গ্রন্থ পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। তা ছাড়া সাধারণ ভাবে শিশুদের নিয়েও তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য "সিংহকাব্য" (The Epic of the lion) কবিতার আখ্যায়িকা এইরূপ—এক সিংহ রাজবাড়ীর বাগানে এসে রাজকুমারকে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল, এমন ভাবে নিয়ে গেল যে বালকের শরীরে কোনও আঘাত লাগল না। রাজসভার এক এক জন শিকারী বালকটিকে উদ্ধার করে আনবার জন্য গেল, সিংহ একে একে সকলকে হত্যা করে তার হিংসা প্রবৃত্তি এবং ক্ষুধারও নিবৃত্তি সাধন করল। তার পরে, একদিন সেই সিংহ কি মনে করে বালকটিকে নিয়ে আবার রাজবাড়ীর বাগানে এসে দেখা দিল, তার মতলব ছিল সেখানে বসে সে বালকটিকে খেয়ে ফেলবে। বাগানে একটি খাটের উপরে বসে রাজকন্যা—দু বৎসর বয়স্ক শিশু খেলা করছিল। সে তার ভাইকে দেখে এমনই উল্লসিত হয়ে উঠল যে সিংহের ভয়াবহ মূর্ত্তি তার নিকট কিছুমাত্র ভয়ঙ্কর মনে হল না। সে চীৎকার করে উঠল—"ভাই এসেছে আমার ভাই," তার পরে সে দাঁড়িয়ে উঠল ; নগ্নগাত্র, শুষ্ককায়, সুন্দর শিশু, সে তার বাহু উন্নত করে সিংহকে শাসন করতে লাগল। সিংহ পূর্ণ-দৃষ্টিতে শিশুকে দেখে নিল ; তার পরে ধীরে ধীরে সেই বালকটিকে শিশুর পদ-প্রান্তে নামিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। কাহিনীটি রূপকথা জাতীয়, বর্ণনাও অতি চমৎকার, কাব্যের তত্ত্বকথা হ'ল—শিশুর সরলতা, তার চিত্তের আগ্রহের ঐকান্তিকতার দরুণ সিংহের ভয়াবহ মূর্ত্তি সম্বন্ধে তার নির্লিপ্ততা ; অপর পক্ষে শিশুর সুন্দর নগ্ন মূর্ত্তি এবং তার সহজ সরল অকৃত্রিম ভাব প্রকাশে হিংস্র পশুও কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয় তারই চিত্র।
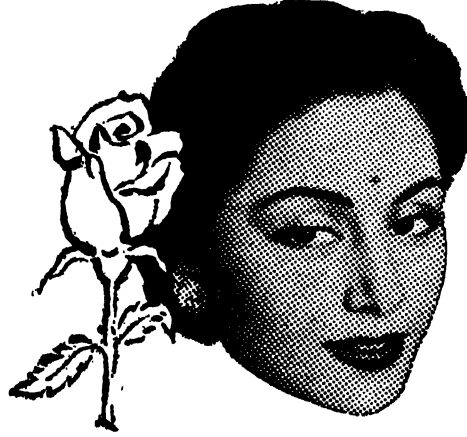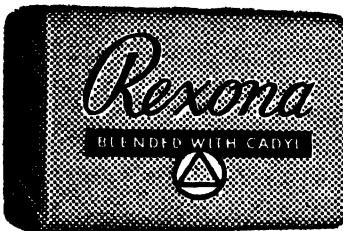
এ কথা বললেও হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে হিউগোর রচনায় শিশু চিত্তের নানা রূপ, ভাব ও কল্পনার কাব্য যেমন অনবদ্য ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার পূর্ব্বে ফরাসী কাব্য-সাহিত্যে আর কারও হাতে এই ধারায় রূপায়ণ লাভ করে নি।

১৮৪৫ সালে সম্রাট লুই ফিলিপ হিউগোকে লর্ড শ্রেণীভুক্ত করেন। সম্রাটের পতনের পরে ১৮৪৮ সালে বিপ্লব মতবাদের সমর্থক হিসাবে তিনি জাতীয় সংসদের (National assembly) সদস্য নির্ব্বাচিত হন; এই সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন লুই নেপোলিয়ন। ১৮৫১ সালে এই নেপোলিয়নই দেশের সর্ব্বময় প্রভু হয়ে বসলেন। হিউগো এই স্বেচ্ছাচার শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল, তাঁকে পালিয়ে যেতে হ'ল ব্রুসেলস্ এ (১৪ ডিসেম্বর)। সেখানে গিয়েও দেশের জনগণের স্বার্থচিন্তা তাঁর অন্তরে প্রধান স্থান অধিকার করে ছিল, তিনি সম্রাটের স্বেচ্ছাচার শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন, ফলে তাঁকে বেলজিয়ম থেকেও নির্ব্বাসিত হতে হ'ল; তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন ক্ষুদ্র একটি ব্রিটিশ দ্বীপে। সেখানে গিয়েও তার চিত্ত শান্তি পেল না, তার লেখনীও শুষ্ক হল না। তিনি দেশের রাষ্ট্র বিপ্লবে উত্তেজিত হয়ে লেখনীর মধ্য দিয়ে অনল উদ্গীরণ করতে লাগলেন। তারই লেখনী থেকে যে শিশুচিত্তের আনন্দ সম্বর্দ্ধনায় অমৃত ক্ষরিত হয়েছিল তাও এক অপরূপ বিস্ময়—যেন সিংহের মুখ থেকে মধু ক্ষরণ। তবু স্বরূপতঃ তিনি সিংহই ছিলেন, তার ভ্রূকুটিতে যেন সম্রাটের গরিমাও বিপর্য্যস্ত; এই সময়কার দু'খানা কাব্যগ্রন্থ "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন" (Napoléan the Little) এবং "তিরস্কার" (Les Chatiments, The Chastisements) যথাক্রমে ১৮৫২ এবং ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত। এই কবিতাগুলিকে বলা হয়েছে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ উত্তেজিত সিংহের গর্জ্জন। একজন সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে লুই নেপোলিয়নের জীবন সাধনা সার্থক হয়েছে যে—তারই স্বেচ্ছাচার শাসনের পরোক্ষ ফলেও ফরাসী সাহিত্যে এমন তীব্র জ্বালাময়ী কবিতার সৃষ্টি হয়েছে; তিনিই তো ছিলেন এই সকলের নিমিত্তভাগী। কবি তখন হয়ত কল্পনাও করতে পারেন নি যে একদিন এই নেপোলিয়নকেও বিজয়ী জার্ম্মানদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। যতদিন এই নেপোলিয়নের অধীন ছিল ফরাসী দেশের শাসন, ততদিন হিউগো মুক্ত থাকলেও দেশে ফিরে আসেন নি।

দেশে ফিরে এসে তিনি জনগণের নিকট থেকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন (১৮৭০); ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন শাসন ব্যবস্থার আমলে তিনি অন্যূন দু'লক্ষ লোকের সমর্থনে দেশের শাসন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সেখানেও তিনি দেশের স্বাধীনতা-রক্ষাকল্পে দেশের জনগণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তার চেষ্টা সার্থক হয় নি।

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির দরুণ তার শান্তিতে থাকবার উপায় ছিল না, তার চিত্তে দেশাত্মবোধ ছিল প্রগাঢ়, মনে কর্ম্মোন্মাদনা ছিল, তিনি অত্যাচার বা স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না, তার চিত্তের দৃঢ়তাও ছিল; কিন্তু তার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনও খুব শুদ্ধ শান্ত ছিল না।

১৮৩৩ সালে তার লুক্রেজিয়া বর্জিয়া (Lucrezia Borgia) নাটক প্রকাশিত হলে তিনি দেশের জনগণের নিকট থেকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন, জুলিয়েত দ্রুয়ে (Juliette Douet) নামক একজন নটী এই অভিনয়ে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই জুলিয়েত কবির একান্ত আশ্রয়ে এসে বাস করতে লাগলেন, যে গৃহে একে স্থান দেওয়া হল সেখানে একমাত্র কবি ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না; কবি পত্নীকেও এ ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। এদিকে খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিক স্যাঁত্ বোভ্ (Saint Beanve) কবি-পত্নীর প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিলেন, কিন্তু কবি-পত্নী কোনও প্রকার স্বাধীনতা উপভোগ করতে পেতেন না। জুলিয়েতের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সালে; তিনি এই পঞ্চাশ বৎসর কাল নিষ্ঠাগতভাবে কবির সেবা করে গিয়েছেন।

দেশের রাষ্ট্র-বিপ্লবে, রাষ্ট্রনৈতিক নানা প্রকার দুর্য্যোগময় পরি-স্থিতিতে, সংকটে, আবর্ত্তে, নির্ব্বাসনে জীবনের সকল প্রকার তিক্ততায় তার দৃষ্টি এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে হিউগো ভগবানের প্রতি বিশ্বাসও যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে সকল কর্ম্ম চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারলেন, তখন যেন তিনি আবার বীতস্পৃহ হলেন। তার অন্তর শান্ত হল, তিনি ভগবানের প্রতি বিশ্বাসে এবং নির্ভর-শীলতায় পরম শান্তি লাভ করলেন। তার সাহিত্য চিন্তাও এই ধারাতেই প্রবাহিত হল; জীবনের এই শেষ তের বৎসরে যে সকল কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল তার মধ্যে তার কবিত্ব প্রতিভার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় "Contemplations" The Legend of the Ages. "The songs of the Spirit." Street and woods. "The four winds of the spirit". তার জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তার কবিত্ব প্রতিভা এবং ভাব প্রকাশ ক্ষমতাও ছিল অব্যাহত—এই সকল কাব্যগ্রন্থই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তার ভগবানে বিশ্বাস এবং ভগবানের উপরে নির্ভরশীলতা কত প্রগাঢ় এবং কত ঐকান্তিক ছিল তার নিজের উক্তি থেকে তার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—

"ভগবানে অবিশ্বাস কি অসম্ভাব্য ব্যাপার! ভগবান আছেন। আমার অস্তিত্ব বিষয়ে যেমন আমি নিশ্চিত বোধ করছি, তার অস্তিত্ব বিষয়ে আমি তার চেয়েও বেশী নিশ্চিত। আমি প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় তার নিকট প্রার্থনা করি। ভগবান আমাদের আবেষ্টন করে আছেন। আমরা তারই মধ্যে অবস্থিত বা বিধৃত। তার নিকট থেকেই আমাদের অস্তিত্ব। সকলই তারই সৃষ্টি। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন একথা সত্য নয়, তিনি নিরন্তর সৃষ্টি করে চলেছেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা।"

আমাদের যুগের দুর্ভাগ্য যে আমরা ইহজীবনের উপরেই সব জোর করে রাখি। আইনের বিধানদাতা, ধর্ম্মযাজক, কবি আমাদের

সকলেরই কর্ত্তব্য সকল শক্তিকে ভগবদভিমুখী করে তুলতে সাহায্য করা এবং সকল আত্মাকে পরবর্ত্তী জীবনের দিকে নির্দ্দেশ দেওয়া। আমরা যেন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলতে পারি যে কেউ অযথা বা অন্যায় ভাবে দুঃখ ভোগ করে না, মৃত্যুতে সকলেরই আসান। সর্ব্বশেষে আছেন ভগবান। আমাদের মৃত্যু যদি হত একেবারে নিঃশেষে মৃত্যু, তা হলে আমাদের বেঁচে থাকারও কোনও অর্থ হত না। এ জীবনের চেয়েও পরবর্ত্তী জীবন আমার নিকট বেশী সত্য, সে জীবন আছে এ জীবনের অন্ধকারের পরপারে।"

হিউগোর চেহারাতে লক্ষণীয় ছিল তার প্রশান্ত দৃঢ়বদ্ধ মুখের উপরে প্রশস্ত উন্নত ললাট। যেন স্বর্ণ মুকুট ধারণেরই উপযুক্ত, যে মুকুট শোভা পেতে পারে একজন সীজার বা একজন দেবতার মস্তকে। এরূপ প্রশস্ত ললাটের উপযুক্তই ছিল তার চিন্তাশক্তির প্রসার। পরবর্ত্তী কালে দেশে যে সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল তার প্রায় সকলেরই মূল বীজ ছিল হিউগোর সাহিত্যের মধ্যে। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা। তার প্রভাব ছিল যেমন প্রগাঢ় তেমনই ব্যাপক; ভাষার উপরে তার অধিকার ছিল অসীম। তার নাট্য-সাহিত্য এখন বিস্মৃতপ্রায়, তার উপন্যাস সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে, কেউ কেউ এমন মতও পোষণ করেন যে ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যালজ্যাক, জর্জ্জ স্যাণ্ড, এমন কি ডুমার সঙ্গেও তার তুলনা হয় না। কিন্তু কাব্য সাহিত্যে হিউগোর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। যারা বিশেষভাবে হিউগোর ভক্ত ছিলেন না তাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসা-কবি-দুর্ভাগ্যক্রমে ভিক্টর হিউগো—Unfortunately Victor Hugo।

ভিক্টর হিউগো শেষ জীবনে তার চিন্তা সাধনায় বেশ শান্তিতে ছিলেন। তার মৃত্যুও ঘটে অতি শান্তভাবে এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে—১৮৮৫ সালের ২২ শে মে তারিখে। দেশের সকল শ্রেণীর লোক তার জন্য গভীর ও আন্তরিক শোক প্রকাশ করেন। দশ মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রায় তার শবাধার বাহিত হয়ে চলে, দশ লক্ষ লোক শেষ বিদায় ক্ষণে সেই শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য সম্মিলিত হয়। দেশের সার্ব্বজনীন ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এরূপ বিপুল শোভাযাত্রাও পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখা যায়। তার দেহ সমাহিত হয় প্যান্থিয়নে (Pantheon)।

ভিক্টর হিউগো সম্বন্ধে ইংরেজ কবি সুইনবার্ন যে কবিতা লিখে গেছেন তার একটি ছত্র স্মরণীয়—"যতদিন সময়ের নিঃশেষ না হবে, ততদিন এই ব্যক্তির মৃত্যু হবে না—"

"That not till time be dead, shall this man die"

জীবন-শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসতীরঞ্জন রায়

বাংলা সাহিত্যে ভাববাদ ও বাস্তববাদের চিরন্তন দ্বন্দ্বের সুসমগ্রস বিচার-বিশ্লেষণ অদ্যাবধি মীমাংসিত হ'য়ে ওঠে নি। যেমন-তেমন একটা বস্তুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে খতিয়ে দেখে নতুনত্বের অনুসন্ধান যেমন করা চলে, আবার সেই বস্তুকে রঙে-রসে কল্পনার জাল বুনে সুবিন্যস্ত রেখায়নে রেখাঙ্কিত করাও তেমন দুঃসাধ্য নয়। অপরাজেয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তুচ্ছতম ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের অনুরণন তুলেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই বিচার-বিশ্লেষণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রঙে-রসে পূর্ণ হ'য়ে কল্পনা যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল। বর্তমানকালে শরৎচন্দ্রের পর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ধারক ও বাহক হিসেবে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই উল্লেখ করা চলে। জীবন-শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় জীবন-সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র-চিত্রণের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যায়। জীবনের অলিগলিতে কুৎসিত কদর্য অপ্রিয় আলেখ্য উদ্‌ঘাটন অনুসন্ধিৎসু এই লেখকের মর্ম-মূলে ভাব-বিলাসের অস্তিত্বের সন্ধান না পেলে তাঁকে ও দোষ দেওয়া চলে না।

মানব-জীবন-সমুদ্রের উর্মিমুখর ইঙ্গিত লেখকের মর্মতটে ছলাৎ ছলাৎ করে ছন্দের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে দিতো। সাহিত্য-জীবনের প্রথম ধাপে—১৩৪২ থেকে সুরু করে ১৩৪৭ সালের শহরতলী উপন্যাসে পর্যন্ত—উচ্ছৃঙ্খলতার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। এই দিকটি লক্ষ্য করেই কোন কোন ব্যক্তি তাঁর চারিত্রিক দৌর্বল্যের প্রতি অযৌক্তিক ইঙ্গিত করছেন। বিশেষ সমাজের জীবনালেখ্যের রূপদান করতে গিয়ে যে বিষ তিনি আহরণ করেছিলেন, সেই বিষই তাঁকে পান করে নীলকণ্ঠ সাজতে হয়েছিল। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পণ হয়েই থাকে, তবে সেই সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের কুৎসিত ও কদর্য দিকটিকে যথাযথভাবে রূপদান করতে গিয়ে 'পাছে লোকে কিছু বলে' ভেবে পশ্চাদপসরণ করেন নি। দূর থেকে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের পাতায় পাতায় জীবনের নগ্নদিকটিকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন সমাজের দশজনের মধ্যে। তিনি জীবন দিয়েই অনুভব করেছিলেন, অন্ত্যজের মত দূরে নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জীবনকে বোঝবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন নি। তাই তাঁর জীবনেও কদর্যতার গ্লানি পূতিগন্ধময় আবেষ্টনীর জাল রচনা করেছিল।

দ্বিতীয় ধাপে যৌনচেতনার আতিশয্যে মানবমনে যে বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিতে পারে, তাকে কেন্দ্র করে বৈচিত্র্যময় ঘটনার উদ্‌ঘাটন করতে লাগলেন। বাড়ীর ভাড়াটে ঠাকুরের সঙ্গে দিদিমণির হৃদয় বিনিময়ের যে মর্মন্তুদ কাহিনী তাঁর গল্পের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে, তা' হয়ত বর্তমান সভ্যতা স্তম্ভিত হ'য়ে শুনবে। অথচ এমন সত্যকে অবিশ্বাস করবারও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। যৌনবিকৃতির তাৎপর্যপূর্ণ দিক্‌টি লেখকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নি। জীবনের এই ব্যর্থতার মধ্যেও বাঁচবার যে একটি শক্তি নিহিত রয়েছে, লেখক তাঁর সন্ধান দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। মিথ্যা কল্পনার বেসাতি নিয়ে যিনি গল্পের ফাঁদ পাতেন নি, তাঁর কাছে জীবন ফাঁকা নয়।

'পদ্মানদীর মাঝিতে' তাঁর প্রতিভার যে স্বাক্ষর আমরা দেখেছি, তা' যেন 'পুতুল নাচের ইতিকথায়' উজ্জ্বল হ'য়ে বিকাশের পথ খুঁজে পেলো। সভ্যতার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এই সমাজের মর্মতলে যে বিষ যৌনশক্তির লালসায় সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে, তাকে কশাঘাত করতে না পারলে উন্মুলনের পথ পরিষ্কার হবে কিরূপে? তাই, লেখক চাবুক হাতে নয়, সংস্কারকের ভূমিকায় নয়, দর্শক হিসেবে নয়—বিষগ্রহণকারী হিসেবে অবতীর্ণ হ'য়ে ব্যাণ্ডেজের অন্তরালে পচা কুৎসিত জিনিষগুলোকে ঘেঁটে বার করেছিলেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যে রাজনীতির ঢেউ এসে লেগেছে। সমাজের বিচিত্র ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মনের ও ধনের দৈন্য নিয়ে পৌঁচেছে সংকীর্ণতার অন্ধ-গলিতে। ব্যর্থতার আবর্জনা সরিয়ে অগ্নি জ্বালবার সংকল্প তাদের নেই। সাধারণ ভাবেই বা বেঁচে থাকার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হবার তাদের সাহস কোথায়? দৈন্যের দায়ে যাদের সব যেতে বসেছে; যেতে বসেছে যাদের মানসম্ভ্রম, তাদের যে সব কিছু নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল না—সেই কথাই তাঁর শেষের দিকের সাহিত্যে রূপ পেয়েছে। সর্বহারা দুঃস্থের কথা বলতে গিয়ে যদি বিশেষ কোন রাজনীতিগত মতকে গ্রহণ করা সমীচীন বলে লেখক মনে করেন, তাতেই বা দোষ কি? সর্বহারাদের কথা বলে কি ম্যাক্সিম গোর্কি বড় হ'য়ে ওঠেন নি? এ প্রসঙ্গে ইলায়া এরেন্‌বুর্গকে কি ছোট করে দেখার কোন কারণ আছে?

সাহিত্যের মাপকাঠিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক লেখাই হয়ত অচল বলে মনে হবে। কিন্তু ব্যর্থতার বহ্নিজ্বালা যাঁকে দগ্ধ করেছে, স্বল্প অর্থের চাহিদায় সস্তা সাহিত্য সৃষ্টি করে সংসারের ভার যাঁকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে, তাঁর এ ছাড়া উপায় কি? ভাওয়াল কবি বড় দুঃখে বলেছিলেন:

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ। জীবিত অবস্থায় যাঁর প্রতি কারো দৃষ্টি পড়েনি, আজ তাঁর সাহিত্যের বিশ্লেষণ হ'য়ে গেল, তাঁকে পুরস্কার দেবার আয়োজন সরকারের নিকট ব্যক্ত করা হয়েছে। আজকে তাঁর চিতায় মঠ দেবার ব্যবস্থা বুঝি এমনি করেই রচনা হলো।

বিপুলায়তন আলোড়নের সজাগ ইন্ধন জনমনে প্রধূমিত করে তুলেছে, যে লেখকের শক্তিশালী লেখনী—সৃজনশীল মননশীলতা, আজ তাঁকে অবনত সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

অনামিকা

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

মাঝে মাঝে
দেখা হ'য়ে যায়,
লুকাতে গিয়েও লুকাতে পারনা হায়;
বিস্ময়ে শুধু চেয়ে থাকি—ভাবি মনে,
নিজেরে লুকাবে
আর কত অকারণে!
যে গানে একদা ভরেছিলে তনু মন
সে গানের কলি
আজো কী হৃদয়ে বাজে—
কত বসন্ত
বৃথাই কাঁদিয়া গেল,
তারি রেশটুকু নিভেছে কী সব কাজে?
মেঘ জমে আর মেঘ চ'লে যায় জানি,
তবু কী স্মৃতির চিহ্ন নিভিয়া যায়—
তোমার আকাশে
ফেলে আসা দিনগুলি
ক্ষণিকের তরে ভরে নাকি বেদনায়?
নিজেরে লুকালে. নিজেরে হারালে
ক'রে দিলে শুধু ক্ষয়—
বেঁচে আছো তুমি
বেঁচে আছো আজো?
লাগে যেন বিস্ময়!

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারন !

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটা সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিস্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।
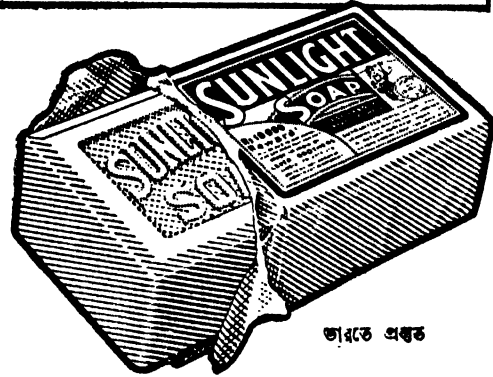
ভারতে প্রস্তুত

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 249-X52 BG

পরিচালক—উপানন্দ

শিশুদের প্রতি কর্ত্তব্য

সন্তান পালনের রীতি ও পদ্ধতি আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবকই জানেন না—যাঁরা জানেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে উদাসীন। যারা জাতির ভবিষ্যৎ জনক জননী, তারা শৈশবকালে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হোলে, উত্তরকালে সারাজীবন ধরে তাদের নানাভাবে কষ্ট পেতে হয়। শিশুকে বেশীমাত্রায় শাসন, আদর দেওয়া বা বশে রাখা, আর বিলাসী করে তোলা শুধু গর্হিতকার্য্য নয়, তার উন্নতির পথে বাধাস্বরূপও বটে। প্রীতি ও যুক্তির দ্বারা তাকে বশে আনা উচিত। প্রহার, ভৎর্সনা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা সন্তান শাসন পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়। 'অমুক ছেলেটি কেমন ভালো ছেলে, তুমি একটি গাছ বাঁদর' 'অমুক ছেলেটি তোমার চেয়ে ভাল' 'তোমার মাথায় গোবর পোরা, কিছু হবে না—এরপর তোমাকে গরুর লেজ মুলে যেতে হবে' 'খুব সকালে উঠেছ তো, আর একটু ঘুমোও না'—এই সব শ্লেষাত্মক মন্তব্য করলে ছেলেমেয়েদের মন ভেঙ্গে যায়—এদের মধ্যে কেউ চেঁচামেচি করে, কেউ বা মনের মধ্যে আঘাত পেয়ে ব্যথায় গুমরে ওঠে। অনেকেই নিজের মত বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। শৈশবে এই সব মন্তব্য পেয়ে পেয়ে ছেলেমেয়েরা অন্তরে একটা হীনভাব বা Inferiority complex পোষণ করে। পরবর্ত্তীকালে পরিণত বয়সে এরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে অপরের চেয়ে নিজেদের হীন মনে করে। অন্তরে সঙ্কোচন হোলেই মানসিক মৃত্যু ঘটে।

বহু বিদ্যালয়ে বেশীবয়স্ক ছেলেমেয়ের পড়াশুনায় ত্রুটি দেখলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা তাদের প্রতি এরূপ [illegible]ব্য করেন বা বিদ্রূপাত্মক শব্দ প্রয়োগ করেন—যা তাদের মানসি[illegible] চিত্তবৃত্তির স্ফুরণের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসু হ'য়ে কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তর [illegible]য়ে [illegible] দেওয়া ভাবটা আমাদের দেশের সাধারণ অভিভাবক ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন অন্যায় কাজ করলে রূঢ়ভাবে বাক্য প্রয়োগ ও প্রহার করে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়ে থাকে, কিন্তু অন্যায়ের পরিণতি যে কতখানি খারাপ হয়ে উঠতে পারে তা বুঝিয়ে মিষ্টি কথায় বললে, ফল খুব ভালো হোতে পারে—এ সম্বন্ধে ক'জন অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী—বোঝেন বা ভাবেন?

বাল্য জীবনের মানসক্ষেত্রে যে অভ্যাস ও ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় তা প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, আর সমগ্র হৃদয়-ভূমি অধিকার করে তোলে। পিতামাতা থেকে সন্তান দেহ ও মানসিক প্রকৃতি লাভ করে। প্রত্যেক পিতামাতারই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক। বংশগত প্রভাবের ওপর এখন পর্য্যন্ত কারও কোন হাত নেই, হয়তো একদিন হোতে পারে। কিন্তু পরিবারগত প্রভাবের ওপর একথা বলা চলে না। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পিতামাতা বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দৃষ্টির ওপর নির্ভর করছে। অনেকের মুখে বেশীর ভাগ সময়ে শোনা যায় যে, এত কাণ্ড না করেও তো ছেলে মানুষ হচ্ছে। এর উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, তাঁরা কোন কারণেই অস্বীকার করতে পারেন না যে, এতকাণ্ড করলে তাঁদের মতে যে ছেলে মানুষ হয়েছে, সে হয়ত আরও ভালো হোতে পারতো—আর যে হয়নি বা যার হবার আশা তাঁরা রাখেন না, সে হয়তো মানুষ হোতে পারে।

মনের দুইটি অংশ—সজ্ঞান আর নির্জ্ঞান। সজ্ঞান স্তরে মানুষের স্মরণে অনেক কথা না থাকতে পারে, কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরে থেকে যায় অনেক কিছু—যার ফলে মানুষ অনেক কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসে। বাল্যকালে ছেলেমেয়েরা উদগ্র শাসনের ফলে ভয়ে ভয়ে কোন প্রতিবাদ করতে পারে না, কিন্তু মনে মনে অভিভাবকদের সম্পর্কে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করতে থা[illegible]। কালক্রমে সে ভুলে গেলেও ভেতরে সে সংস্কার থেকে যায়, ফলে [illegible] বয়সে সমাজের অনুশাসন মানবার যখন সময় আসে, সে তখন তা মানতে চায় না, বা পারে না। তার অসামাজিকতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, শৈশবে পিতামাতা, অভিভাবক বা

শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের অনুশাসন সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব ও তিক্ততাই—সমাজের অনুশাসনের ওপর এসে প্রতিফলিত হয়। বয়স্কদের সমাজ শৈশবের পিতারই প্রতীক। সমাজের প্রতি বিরুদ্ধভাব যে শৈশবের অভিজ্ঞতার ফল, তা সাধারণের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ প্রথমতঃ শৈশবের কথা সকলের মনে রাখা সম্ভব নয়, দ্বিতীয়তঃ ব্যথা, বেদনাপ্রদ ঘটনাগুলিকে প্রত্যেকেই ভুল্বার চেষ্টা করে থাকে। মনো-বিশ্লেষণের দ্বারা নির্জ্ঞানের স্তর থেকে সজ্ঞানের স্তরে যারা চাপা পড়ে আছে, তাদের টেনে এনে ভেবে দেখ্লে এক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকৃত হওয়া যায়।

ভালোমন্দ যা কিছুই ঘটুক না কেন, প্রত্যেক কাজের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার পেছনে একটা প্রেরণা আছে। শিশুর ও ভালোমন্দ কাজের পেছনে একটা প্রেরণা আছে। কাজের ফলাফল কি রূপ ধারণ করবে আর সাধারণের কাছে সেটা কিরূপভাবে গৃহীত হবে, তা নিহিত আছে এই সব প্রেরণার মূলে। যে লোকটা গর্হিত কার্য্য করছে আর বা জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতি করছে—তা পর্য্যালোচনা করে, যে লোকটাকে যখন নানারকম যুক্তি দেখিয়েও এরূপ কাজ থেকে বিরত করা যাচ্ছে না, তখন মারধর করে বা ঘরে আটক না রেখে তার মনের গতি-বেগের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ সে কাজে প্রচণ্ড বাধা পেলে মনে বিদ্রোহভাব পোষণ করবে আর পূর্ব্বের চেয়ে বেশী তীব্রতার সঙ্গে গর্হিত কাজ করতে থাক্বে। এক্ষেত্রে তার প্রেরণা বিধ্বস্ত না করে অন্যদিকে পরিচালিত করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। নদীর বেগ যখন বাঁধ-ভেঙে ফেলে তখন তার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সৃষ্টি করে তার গতি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় আর বেগ কমিয়ে দেওয়া হয়। নদীর বেগ রক্ষা করে গ্রামপ্লাবিত না হোতে দেওয়ার যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে, সেই পদ্ধতি মানুষের নদীরূপ মনের বেগ ব্যাহত করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা উচিত। ছেলেমেয়েদের মনের নদী ভাঙন-মুখী হোলে তাকে নানাদিকে চালিত করে দিলে, ভাঙনের ভয় থাকে না, বেগও হ্রাস পায়।

শিশু ও সামাজিক জীব। সেও সঙ্ঘবদ্ধ হোতে চায়। তার মধ্যে অতি-চঞ্চলতা, খিট্খিটে মেজাজ, অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি, অলসতা, দুষ্টবুদ্ধি, লোকের সঙ্গে কথা বলতে অনিচ্ছা ও অহেতুক লজ্জা প্রভৃতি প্রকাশ পেলে, বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এসব দোষ সংশোধন করিয়ে নেওয়া দরকার। এগুলি মানসিক ব্যাধি এবং কুসঙ্গ প্রভাবে সংক্রামক। বিশেষজ্ঞরা শিশুর জন্মকাল থেকে তার আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে সে অদূর ভবিষ্যতে কিরূপ প্রকৃতির হবে তা বুঝতে পারেন। কার্য্যকালে কোন মানুষের মধ্যে জম্বুকের শঠতা বা মেষের ভীরুতা প্রকাশ পাওয়ার জন্য দায়ী তার বাল্য জীবন। এই জীবনের সুগঠন না হোলে পরিণাম ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এজন্যে সুন্দর মানসিক শক্তির বিকাশ যাতে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় তার জন্যে পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর দৃষ্টি দেওয়া প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক। শরীর ও মনের বিকাশ এখানে যেমন দ্রুত, তার অবনতি বা বিনাশও তেমনই দ্রুত। অল্প বয়সেই এখানে মানুষ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, মনের সমস্ত প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, আবার অল্পদিনের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক জরা তাকে অকালবৃদ্ধ করে তোলে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে-কলেজে ও গৃহে কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি আয়ত্ত করে অন্যায় ভাবে শারীরিক বলবীর্য্য নষ্ট করে, এদিকে অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর তীব্র দৃষ্টি রাখা দরকার। এদেশের আবহাওয়া এমনই যে, মানুষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সামান্য কারণেই তার ক্রোধ হয়, আবার পরক্ষণেই তার ক্রোধ শান্ত হয়—অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতা তার বৈশিষ্ট্য। ভাবের আবেগ সে নিরোধ করতে পারে না।

শৈশব হৃদয়ে যে সব প্রবৃত্তির অঙ্কুর উদ্ভূত হয়, যৌবনে তা পূর্ণাবয়ব, প্রাপ্ত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় ফলে ফুলে সুশোভিত আর বার্দ্ধক্যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হোতে থাকে। তাই শৈশবেই ছেলেমেয়েদের অন্তরে সৎপ্রবৃত্তি যাতে জন্মলাভ করে, তার জন্যে সকলেরই লক্ষ্য নেওয়া দরকার। বাল্য-কালে যেটা অভ্যস্ত হ'য়ে যায়, উত্তরকালে সেটি ত্যাগ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সদভ্যাস যাতে ছেলেবেলা থেকেই অনুসৃত হয়, তার জন্যে ছেলেমেয়েদের প্রতি দৃষ্টি নেওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। শিক্ষাদানের সময়েই হোক্ বা চরিত্রদোষ সংশোধন প্রয়াসেই হোক্, কোন ক্রমে অতি-কঠোর শাসননীতি অবলম্বন করা গর্হিত কাজ। উন্নত ধরণের ভালোবাসা ও ভক্তি বিশ্বাসের মাধ্যমে শিশুর হৃদয়ে শিক্ষার প্রকৃত অঙ্কুর উদ্ভূত হোতে পারে। কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন বয়স্কারা হীন ছেলে-মেয়েদের নৈতিক চরিত্র দূষিত করে, এজন্যও সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষাদান বিষয়ে মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছেলেদের কায়িক দণ্ডের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক একদা একটি ছাত্রকে প্রহার করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ সেই শিক্ষককে পদচ্যুত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সস্নেহ মধুর উপদেশ দানে যেরূপ সুফল হয়, কঠোর শাসনে অনেক সময়ে তার বিপরীত ফল ফলে থাকে। প্রহার বা অন্যবিধ কায়িক দণ্ডের ভয়ে ছেলেমেয়েরা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বা অভিভাবকবর্গের কাছে শিষ্টশান্ত হয়ে থাক্লেও তারা অনেক স্থলেই অসাক্ষাতে যথেচ্ছ আচরণ করে, এমন কি অনেক স্থলে অসাক্ষাতে নানারকম অপ্রীতিকর মন্তব্য ও অকথ্য কটূক্তি প্রয়োগ করতে ও ক্রটি করে না, ফলে তাদের স্বভাব উত্তরোত্তর কদর্য্য হয়ে ওঠে। এজন্যে তাদের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার দেখানো দরকার। ছেলেমেয়েরা যাতে কোন অন্যায় না করে বা অসৎ পথে না চলে, তার প্রতিবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য—কিন্তু তা'তে অযথা কঠোর নীতি অবলম্বন কোন রকমেই উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা যদি বুঝতে পারে যে, তাদের অভিভাবক বা শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী তাদের যথার্থই ভালোবাসেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্যেই চেষ্টা করছেন, তা হোলে তারা কদাচ তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করতে প্রবৃত্ত হবে না।

প্রত্যেক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের ভেতর পরস্পর প্রীতি ও পরি-চর্য্যার বিনিময় প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন ছেলেবেলা থেকে

যাতে সম্ভব হয় তার জন্তে অভিভাবকদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে পরিবারের মধ্যে ইচ্ছা, রুচি ও স্বচ্ছন্দতা পরস্পর বিরোধী হোতে পারে। অতএব যাতে মনোভঙ্গের কারণ না ঘটে, তার জন্তে প্রত্যেকেরই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা বাদ বিসম্বাদে গৃহের সুখ ও শান্তি বিনষ্ট হয়ে পারিবারিক উচ্ছেদ সাধনের পথ উন্মুক্ত হতে পারে। যে পরিবারে সর্ব্বদা অশান্তি দেখা যায়, সে পরিবারের ছেলে মেয়েরা উগ্রস্বভাব বিশিষ্ট হয় এবং সহজে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। এজন্তে সহিষ্ণুতা দ্বারা পরিবার মধ্যে কিরূপে শান্তি রক্ষা করা যেতে পারে, তার একটি সুন্দর গল্প নিয়ে দেওয়া গেল—

কথিত আছে একদা চীন দেশের একজন সম্রাট ছদ্মবেশে নিজের রাজ্যের ভেতর ভ্রমণ করতে করতে জনৈক সামান্ত গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হোলেন। গৃহস্বামী সমাদর করে তাঁর অভ্যর্থনা ও যথোচিত অতিথি সৎকার করলেন। ছদ্মবেশী সম্রাট গৃহস্থের বহু পরিবার ও পারিবারিক শান্তি দেখে বিস্মিত হোলেন। তিনি কৌতূহল বশতঃ এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্বামী মৌখিক কিছু না বলে পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে তা'তে পেনসিল দিয়ে লিখলেন—
—'সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা।'

ছেলে মেয়ে মানুষ করতে হোলে এদিকে প্রত্যেকেরই অবহিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশের অভিভাবকরা অসহিষ্ণু বলেই ছেলে মেয়েদের দুর্গতি হয়ে থাকে, এজন্তে প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল।

বেড়াল ছানার বিয়ে

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

খুকু (বেড়াল)—মিউ মিউ মিউ।
মা— দূর হয়ে যা, মরণ নেই কি তোর ?
মেয়ে—ষাট্ ষাট্ ষাট্ !
মা— সবটুকু দুধ শেষ করেছে, চোর।

মেয়ে—মাগো, আমার খুকুমণির বিয়ে হচ্ছে কাল !
অমনি করে তুমি ওকে দিচ্ছ কেন গাল ?
একটু না হয় দুধ খেয়েছে, অবুঝ শিশু তাই—
তোমার কি মা দয়া-মায়ার একটুও লেশ নাই ?
মা— থামরে বাপু ! আমিই না হয় চির-নির্মম আছি ;
সবাই বলে—"অমন আপদ মরলেই তো বাঁচি !"

মেয়ে—এমন দিনে মিথ্যে তুমি করছ কোলাহল ;
হয়তো ওতে বাছার আমার হবেই অমঙ্গল !
তুমিও তো 'মা'—আপন ছেলে মেয়ের ব্যথা বোঝো ;
সকল সময় কেন তবে ওর দোষটি-ই খোঁজো ?

মা—খাবার জিনিষ করবে চুরি—দোষ নেই কো তার ;
গাল দিয়েছি, আমারি দোষ—বিচার চমৎকার !
মেয়ে—আমিই যদি একটা কিছু খেতুম চুরি কোরে,
অমনি তুমি বকৃতে নাকি ? মারতে আমায় ধোরে ?
তুমিও দেখি ছেলেমানুষ আমার খুকুর মত—
রাত্তির দিন জ্বালাও শুধু, বোঝাব আর কত !
মা—সেয়ানা ওই বেড়াল ছানা, বড় ভীষণ পাজি।
যেথায় খুসী দূর করেদে, এই মুহূর্তে আজ-ই !
মেয়ে—কালকে বিয়ে, বাছা আমার শ্বশুরবাড়ী যাবে ;
কতদিন যে থাকৃতে হবে ! কত দুঃখ পাবে !
তাই ভেবেই কেঁদে আকুল, চোখ করেছে লাল,
দোহাই তোমার ! এর পরেও দিও না আর গাল !
খুকু (বেড়াল)—মিউ মিউ মিউ !
মা— ঢের হয়েছে, এবার তোরা থাম !
মেয়ে—চলরে খুকু !
মা— সব তা'তে যে আমারই দুর্নাম !

(২)

নীল আকাশে কৃষ্ণ মেঘের চলাচল শুরু হয়েছে। ঝড় উঠেছে বেণু বনে। পল্লীবালার কাঁকন-বাজা পথে কল্‌সী কাঁখে কেউ আসেনি। আমড়া ডালে কাজল কালো কাক ঘূর্ণিহাওয়ায় ঘুরবার জন্যেই যেন অপেক্ষমান হ'য়ে রয়েছে।

ঘুমন্ত নীলুকে কোলে তুলে নিয়ে চলন্ত ট্রেণের বাতায়নের পাশে একান্তে ব'সে ভাবছিলেন শ্রীপতি। যদিও সুপ্রভা তার বোনের কাছে নীলুকে রাখার কথা বলেছে, সেখানে রাখা এখন ঠিক হবেনা। বড় লোকের বাড়ীতে করুণা ছাড়া স্নেহ সে নাও পেতে পারে। নিজের বাড়ীতেই এখন থাকুক। পরের ব্যবস্থা পরে স্থির করা যাবে।

খেতে ব'সে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ সুনন্দাকে শ্রীপতি বললেন: ছোটবৌ নীলুকে তোমার কাছেই পাঠিয়ে দিল।

সুনন্দা চুপ ক'রে শুন্‌লো। এ কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে: তুমি কি আজ-ই ফিরবে?

: বুঝতেই তো পারছো, আজ না গেলে যাওয়ার হয়তো আর প্রয়োজন হবেনা। অমিকে নিয়ে রাত্রে কাটোয়ায় থাকবো। ভোরে রওনা হবো। ম্যাকলাউড কোম্পানীর বর্ধমান কাটোয়া রেলওয়ের তখনো জন্ম হয়নি। উটের গাড়ীতে যাতায়াত ক'রতে হ'তো। বেলা থাকতেই অমিকে নিয়ে শ্রীপতি রওনা হ'লেন। পরদিন সকালে রান্না ঘরের দাওয়ায় পিঁড়ির উপরে নীলু ব'সে আছে। সাম্‌নে মুড়ির বাটি। হাতে একটি নারকেলের সন্দেশ। সুনন্দা রন্ধন-শালায় ব্যস্ত। আস্‌তে যেতে দেখা যাচ্ছে নীলু কি করছে। ডাল সাঁত্‌লে ভাত চড়িয়ে এসেও দেখলে একটা মুড়িও সে খায়নি। একটা কাক তার লম্বা ঠোঁটের ঠোক্করে সব মুড়ি মাটীতে ছড়িয়ে দিয়ে একটি একটি ক'রে ঠুক্‌রে খাচ্ছে।

সুনন্দা মুখে 'হুস্' শব্দ ক'রে কাকটিকে তাড়িয়ে দিয়ে হাতের সন্দেশটি ভেঙে খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন: এ মুড়ি আর খেয়োনা। খেলা ঘরের দিকে চেয়ে বললেন: সে পোড়ারমুখা আজ গেল কোথায়—

শুভা তখন খিড়কীর দরজা দিয়ে ছোট্ট একটা মাটীর কল্‌সী কাঁখে পল্লীবধূ-বেশে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বাড়ী ঢুকছিল। সামনের দিকে ঘোম্‌টা বেশী টান্‌তে গিয়ে পিঠের কাপড় ঘাড়ে উঠে গেছে। একমাত্র কন্যার উদ্দেশে সুনন্দা বললেন: আট বছরের ধিঙ্গী মেয়ে ছোট ভাইকে একটু নিতে পারে না। মেয়ে মানুষের সারাদিন খেলা ক'রলে চলে? না, দেখতে ভালো লাগে।

জলের কলসী নামিয়ে শুভা ব'ললে: তোমার তো বাপু রান্নাবান্না সব হ'য়ে গেল। আমার এখনো ঘর নিকানো বাসিপাট কিছুই সারা হয়নি। আমার ছেলে-মেয়েরও তো ইস্কুল পাঠশালা আছে। তারা মুখ্যু-বিদ্যেসাগর হ'লে তোমার আর কি? যার ভাবনা তাকেই তো ভাবতে হবে?

সুনন্দা বললেন: যার সংসারে এতো কাজ সে এত বেলা ক'রে ওঠে কেন?

: বড়লোকের মেয়ের ঝি আছে, লোকজন আছে। গরীবের একলার ঘর একাই সব ক'রতে হয়। তাতে পাড়া-পড়্‌শীর চোখ টাটায় কেন? খেলা-ঘর ঝাঁট দিতে দিতে সে আপন মনে ব'লতে লাগলো—

নিজের বেলায় আঁটীসুটি, পরের বেলায় চিম্‌টী কাটি।

সুনন্দা মুখের কৌতুক রেখা লুকিয়ে বললেন : যে রাঁধে সে বুঝি আর চুল বাঁধেনা।

মুখরা মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল : যে চুল বাঁধে, তার ছেলের খাবার কাকে-কুকুরে খায় কেন ?

: বুড়ো শাশুড়ীর তো দেখা উচিত বৌ-ঝি কি পারছে না পারছে! অনুনয়ের সুরে বললো : ভাত পুড়ে যাবে, আয় মা শিগ্‌গির আয়! নীলুকে একটু খাইয়ে দে। বেচারা সকাল থেকে কিছু খেতে পায়নি। হাতের কাজ সেরে আমি তোর সব রান্নার যোগাড় ক'রে দেবো। দুপুরে তোর ছেলে-মেয়ের বিছানা বালিশ ও তৈরী ক'রে দেবো।

সুপক্ক গৃহিণীর মতো ভারিক্কি চালে চ'ল্‌তে চল্‌তে এসে বল্লে : দাও তোমার ছেলেকে কি খাওয়াতে হবে দাও।

জলের গ্লাস, মুড়ির বাটি ও নীলুকে নিয়ে সে তার খেলা-ঘরে চলে গেল।

মনের আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগলো সুনন্দা। কতবেলা, কত দীর্ঘ দিনমান এম্‌নি কেটে গেছে, যমপুকুর পুণ্যিপুকুরের পূজা আয়োজনে। যাদের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হ'য়ে অতি নিকটে ছিলাম তারা দূরে চলে গেছে। কে আপন কে পর চিনবার আগে যে অচেনা চির-চেনার মতো কাছে এসেছিল সেও চলে গেছে। জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শুধু সংযোগহীন সম্পর্ক। যতদিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে, সংসারের মতো এমন বৈচিত্র্যময় স্থান হিমগিরির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, অতল জলধির নিতল গহ্বরে, স্বর্গ-নরকে কোথাও নেই।

দিনের পর দিন নীলুকে ভোলাবার চেষ্টার কোনো ত্রুটী ছিল না। কিন্তু সেই নিথর পাথরের মূর্তিতে হাসি-কান্নার কোনো চিহ্ন পড়ে না, স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে সে মনের মণিকোঠায়। কোনো উদাসী বৈরাগী ব'সে আছে যেন জীবনের খেলা-ঘরে।

সুনন্দা চেয়ে চেয়ে ছাখে, আর মনে মনে বলে : একি মহা পরীক্ষায় নতুন ক'রে টেনে নিয়ে চলেছো নিঠুর! এ শিশুকে আমি কী ক'রে মানুষ ক'রবো ?

সন্ধ্যা হ'লেই কোলে ওঠে। গোপীনাথের মন্দিরে গিয়ে দেবতার চরণামৃত পান ক'রে প্রার্থনা করে আমার মায়ের রোগ ভালো ক'রে দাও ঠাকুর! মন্দিরের পূজারীও এই প্রার্থনায় যোগ দেন প্রতি সন্ধ্যায়। কিন্তু, আয়ু যেখানে নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে আসে পৃথিবীর সমস্ত আয়ু-র্বিজ্ঞান সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই অদৃষ্ট শক্তির কাছে মানুষের অফুরন্ত প্রার্থনার অন্ত নেই। বারবার নিষ্ফল হয়েও তো তার কামনা ও কল্পনার বিরাম নেই।

সুনন্দা পূজারীকে বললেন : কাল ওর মার আরোগ্য কামনায় বিশেষ পূজা দেবো মনে ক'রছি।

পূজারী বললেন : বেশ তো। কাল তোমাদেরই ঠাকুর সেবার পালা রয়েছে যখন, সব তোমার ইচ্ছা মতোই হবে। এ আর বেশী কথা কি! বাড়ী ফিরে কোল থেকে নীলুকে নামিয়ে সুনন্দা ডাকলেন : শুভু!

: আমায় ডাক্‌ছো মা—

: কাল সকালে উঠেই যেন বেরিয়ে যেওনা, অনেক কাজ আছে, ভোরে উঠে তুমি ও নীলু ফুল তুল্‌সী দুব্বো তুলে আনবে।

: বাড়ীতে পূজো হবে ?

: আমাদের বাড়ীতে তো কোনো পূজো হয়না তুমি জানো—

: কেন হয়না মা! বেনে বাড়ীতে তো হয়।

: তোমাদেরই একজন পূর্বপুরুষের ধারণা ছিল সংসারের ভিতরে পূজার শুচিতা থাকে না। সেবা অপরাধ হয়। সেই থেকেই এ রীতি চলে আসছে এ বাড়ীতে।

: মন্দিরে পূজো তো রোজই হয়, তবে আমাদের ফুল তুলতে ব'লছো কেন ?

: কাল নীলুর মা'র রোগ ভালো হওয়ার জন্যে ভালো ক'রে পূজো হবে।

: তাতে খুড়িমা ভালো হ'য়ে যাবেন? কবে খুড়িমা আসবেন মা ?

: ভালো হয়ে গেলেই তোমার কাকা নীলুর মাকে বাড়ী নিয়ে আসবেন।

সুনন্দা কথা বলছিলেন শুভার সঙ্গে, দৃষ্টি ছিল নীলুর দিকে। ভোর না হ'তেই শুভা বল্‌লো : শিগ্‌গির ওঠ—

যাকে উদ্দেশ ক'রে ডাক, সে জেগেই শুয়ে ছিল। মুখধুয়ে ছোট্ট একটা গরদের কাপড় পরালো নীলুকে, নিজে পরলো মা'র মট্‌কার শাড়ী। শূন্য সাজি হাতে দুলিয়ে

বললো: তাড়াতাড়ি চল্—অনেক ফুল তুলতে হবে। তবে তো ভালো করে পূজো হবে।

খুড়িমা তাড়াতাড়ি সেরে উঠে বাড়ী এসেই আগে কাকে কোলে নেবে বলতো?

নীলু বললে: আমাকে—

বেশ! তারপর আমায় নেবেন, কেমন?

: বেশ—

: তাড়াতাড়ি না চল্‌তে পারলে কিন্তু আমায় আগে কোলে নেবে।

শিগ্‌গির চল্ ব'লতে ব'লতে নীলুর হাত ধরে এক রকম ছুটিয়েই নিয়ে গেল শুভা।

অস্ফুট কুঁড়ির একটু মৃদু হাসির রেখা ক্ষণিকের জন্যে দেখা গেল নীলুর মুখে।

সুনন্দা সানন্দ চিত্তে—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি তারা মন্দোদরি প্রভৃতি সতীদের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে স্নান ক'রতে চ'লে গেলেন।

শুভার কাজের আজ আর শেষ নেই। আত্মীয়-স্বজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ থেকে আরম্ভ ক'রে নুন জল লেবু সে একাই পরিবেশন ক'রলো, খাওয়ার পর নীলুকে হাতে একটা লাঠি দিয়ে সদর দরজার কাছে বসিয়ে বললে: কুকুর আসলেই দেওয়ালে লাঠি মেরে শব্দ করবি। কিন্তু গায়ে মারিস্ নে যেন। খেঁকি কুকুরগুলো ভীষণ দুষ্টু। কামড়ে দিতে পারে। পূজোর বাসনগুলো একটা একটা ক'রে নিয়ে আসি। আমি যাবো আর আসবো—বলেই বিদ্যুৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। নীলু তার চলার পথের দিকে চেয়েছিল। পদশব্দে পিছন ফিরে দেখলো বাবা আসছেন। থামের আড়ালে সে লুকিয়ে পড়লো। এম্‌নিতেই বাবাকে অস্বাভাবিক ভয় করতো। তাঁর এলোমেলো রুক্ষ চুল, একমুখ দাড়ি ও রক্তবর্ণ চোখ দেখে সে আরো বেশী ভয় পেয়ে গেল। থামের ফাঁক দিয়ে দেখলো দাদাও আসছে পিছু পিছু। দুজনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর দাদার কান্নার শব্দ শুনে ভাবলো, দাদা নিশ্চয় কোনো অন্যায় ক'রেছে, বাবা মারতে শুরু ক'রেছেন।

পাশের সরু গলিতে দিদির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো, দিদি এলোনা। দাদার কান্না উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। দিদি বলেছিল বাবার সঙ্গে মা আসবেন। কৈ এলোনা তো! বাবা ও দাদাকে হেঁটে আসতে অনেকবার দেখেছে সে। মা'র সঙ্গে এর আগে যখন গিয়েছে এসেছে গরুর গাড়ীতে চ'ড়ে। মাকে কখনো হেঁটে আসতে দেখেনি। মা গরুর গাড়ীতেই নিশ্চয় আসছে। কিন্তু, দিদি এখনো এলো না কেন? সে আগে কোলে চাপবে বলে নিশ্চয় ছুটে এতক্ষণ চলে গেছে। সেও গরুর গাড়ীর পথ ধরলো।

শুভাকে সুনন্দা জিনিষ-পত্রের কাছে বসিয়ে রেখে ঠাকুরের ভোগের থালা-বাসন বাড়ীতে রাখতে এসে যা দেখলেন, না দেখাই ছিল ভালো।

দুঃসংবাদ প্রকাশ হ'তে দেরী হয় না। বাড়ী লোকারণ্য হ'য়ে গেল নিমেষের মধ্যে।

মা'র আসতে দেরী হ'চ্ছে দেখে মন্দিরের পরিচারিকাকে ধরে জিনিষপত্র দেখতে ব'লে বাড়ী এসে দেখলো, কান্নার বন্যা বয়ে চলেছে সারা আঙিনায়। পাড়া প্রতিবাসীদের কেউ বাকী নেই আস্‌তে।

ন'মাসীর কোলে অমি শুয়ে কাঁদছে। মাসীমা তার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন ও নিজের চোখের জল মুচছেন।

মার কাছে এসে নিম্নস্বরে জিগ্যেস করলো—মা! নীলু কোথায়?

সবিস্ময়ে সুনন্দা বললো: তোর কাছেই তো ছিলো।

না-তো?

স্থাথ স্থাথ বলতে বলতে সুনন্দার সঙ্গে আরো অনেকে বেরিয়ে পড়লেন। সমস্ত গ্রাম তোলপাড় ক'রেও তার সন্ধান মিললো না। শুভা হতাশ হ'য়ে ফিরে এসে দেখলো মালিকহীন লাঠি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। যার সঙ্গে ইহজীবনে কোনোদিন দেখা হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই তার-ই কোলে আগে উঠবার জন্যে ছুটে চলেছে সে পথে প্রান্তরে।

(চলবে)

পূর্ব-বাংলার বর্ষার ছড়া

শ্রীসত্যগোপাল পাল

বাংলায় বসন্ত আসে। ফুলে ফুলে গাছ ছেয়ে যায় নানা রঙে। বনে বনে কোকিলের কুহু রব ভুলিয়ে নিয়ে যায় মন। ফুরফুরে ফাগুন হাওয়া উদাস ক'রে দেয় প্রাণ। বসন্তে বাংলা এমন সুন্দর! এমন মায়াময়!

সুখের পর দুখ, ভালোর পর মন্দ সর্বদা লেগেই আছে। বসন্তের এই মোহন বাঁশরি বেজে ওঠা সারা না হ'তেই বাংলায় সুরু হয়ে যায় গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতার উন্মত্ত উল্লাস। সৃষ্টি নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মেতে ওঠেন মাতা বসুন্ধরা।

চৈত্রের শেষে সুরু হয় এই খেয়ালের খেলা। সারা বৈশাখ চলে। জ্যৈষ্ঠেও থাম্‌তে চায় না।

গ্রীষ্মের দুপুর কি ভয়ঙ্কর! শ্মশান পুরীর মত চারিদিক খাঁ খাঁ করতে থাকে—অনন্ত শূন্যতা। রাস্তায় জনপ্রাণী দেখা যায় না। রাখালের মন ভুলানো বাঁশি বন্ধ হয়ে যায় মাঠে। রৌদ্রে অবসন্ন হয়ে শস্যশূন্য মাঠে গরুর পাল ধুকতে থাকে নিরাশ হয়ে একা একা।

এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্যে কতো মিনতি জানায় মানুষ উপর দিকে চেয়ে। ঠাকুর দেবতার কাছে মানতও বা করে কতো। কিন্তু কার কথা কে শোনে?

মাথাফাটা রোদে গলদঘর্ম হয়ে যায় মানুষ। ঘাম যেন নাইয়ে দেয় সকলকে। ঘামাছির চুলকুনি পাগল ক'রে তোলে॥ গ্রীষ্মের এই সাজার মধ্যেও মজা লোটে ছেলের দল। দল বেঁধে সারাদিন ডুবাডুবি আর লাই খেলা, সে কি কম মজা!

তোমাদের মতো আমার তখন বয়সটি। বৃষ্টি বিহীন এমন গ্রীষ্মের দিনে দেশের মেয়েদের দেখতুম কেমন সুন্দর ক'রে বর্ষার গান গাইতে। কি অপূর্ব তাদের নৃত্য ভঙ্গি! কেমন অপরূপ তাদের

পাড়ার মেয়েরা সব একত্র জড়ো হ'ত। একজন সাজত বুড়ী। তার পরণে মেঘবরণের নীল শাড়ী। কপালে চন্দন। চোখে কাজল। গলায় ফুলের মালা। আল্‌তা-পরা পায়ে ঘুঙুর অথবা নূপুর। অন্য মেয়েরাও নূপুর পরে পায়ে।

বড় একটি কুলো নেয় বুড়ী তার মাথায়। কুলোটিতে থাকে নানা আল্‌পনা আঁকা। কুলোতে কচুরিপানা রেখে তার উপর মঙ্গল ঘট স্থাপন করা হয়।

বর্ষা পাগলিনীরা দল বল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি। তাদের নূপুরের রুমুঝুমু—আনন্দোচ্ছল স্বচ্ছ কচি হৃদয়ের মত্ত উল্লাস মুখরিত ক'রে তোলে বাড়ির উঠোন। মহানন্দে মেতে ওঠে ছেলে বুড়ো সকলের প্রাণ। ভীষণ ভিড় জমে যায় বাড়ির উঠোনে।

এগিয়ে আসেন বাড়ির মেয়েরা। উলু দিয়ে উঠেন অনেকে এক সঙ্গে। তারপর বাল্‌তি ভরতি জল এনে ঢেলে দেন বুড়ীর মাথার কুলোর মধ্যে। সঙ্গিনীরা বুড়ীকে ঘিরে ব্রতচারীর মত নেচে নেচে ছড়া গায়:—

ঠাকুদ্দাদার বাঙা গর,
বৃষ্টি নামে আড়াই কর।
ঠাকুদ্দাদারে বাই,
ছিটি ছিটি জল দে
জাপ্পরি খেলাই॥
চিনা খ্যাতে চিন চিনানি,
দান খ্যাতে আঠু পানি,
ঠাকুদ্দাদারে বাই,
ছিটি ছিটি জল দে
জাপ্পরি খেলাই।
আড়াই ফুটি জল দে
নাইয়া ধুইয়া যাই॥

তারপর দুষ্টু মেয়েগুলো করে না কি, চুপি চুপি হঠাৎ নানাদিক থেকে বেমালুম পাঁক ছুড়ে মারে সকলের গায়ে। আর বেধে যায় হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। কেউ কেউ বা কাদার বদলে ছুড়ে মারে মুখাওয়ালা কচুরিপানা। আর যা চুলকুনি না! বাপরে বাপ,—পরাণটা বেরিয়ে যায় আর কি!

ছড়ার মধ্যে ঠাকুর্দাদের টিপ্পনী কাটা হয়েছে ব'লে পাড়ার পরিহাস-প্রিয় ঠাকুর্দদের সঙ্গেই পাঁক মাখামাখিটা জমে বেশ ভালো। ঠাকুর্দরাই বা ছাড়বেন কেন! তাঁরা কাদার উত্তর দেন নাত্‌নীদের গায়ে হলুদ গোলা জল ছিটিয়ে দিয়ে। নাত্‌নীরাও কি জানে কম না কি! এবার তারা নতুন ছড়া কাটা:—

বিষ্টি পড়ে ফোঁটা ফোঁটা—
ঠাকুদ্দাদার প্যাট্‌টা মোটা।

খু-ব ক্ষেপে যান বুড়োর দল। চরমে চড়ে যায় বেচারীদের মেজাজ। মেজাজ। নাত্‌নীদের মাথায় বাল্‌তি বাল্‌তি গোবর গোলা জল উপুড় ক'রে দিয়ে তবে ঠাণ্ডা হন।

বুড়োদের ক্ষেপিয়েই ক্ষান্ত হয় না ওরা। বড় বউর পেছনে লাগে আবার। সবে মিলে চেঁচিয়ে ওঠে:—

বিষ্টি আইল রে—
কাউয়ায় খাইল দান।
বড় বউর চুলে দইয়্যা টান॥

শুনে মেয়ের মতো কালো বরণ ধারণ করে বাড়ির বড় বউয়ের রাঙা টুকটুকে মুখখানা !

বড় বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই সাধ মেটে না পাগলীদের। এবারে যে ছড়া কাটে তারা তাতে ঘায়েল হয়,দেশের জামাইয়ের দল। অবশ্য ইয়ারকি করার মত জামাই কোন বাড়ি উপস্থিত থাকলেই এই ছড়াটি কাটা হয়ে থাকে। ওটি হচ্ছে,—

আর বিষ্টি ঝাইপ্যা,
দান দিমু মাইপ্যা,
দানের মইদ্দে পোকা,
জামাই শালা বোকা।

কেবল এই সকল ফোড়ন দেওয়া ছড়াই নয়। রকমারি রকমারি প্রচুর ছড়া জানা থাকে বর্ষা ব্রতিনীদের। আর আসর বুঝে এই সব ছড়া গেয়ে মহানন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দেয় সারা গ্রামখানাকে।

কাঁচা আমের দিন সেটা। বর্ষার গান গেয়ে প্রত্যেক বাড়ি থেকে চাল, ডাল আর প্রচুর কাঁচা আম পায় মেয়েরা। তারপর বকুল তলায় অথবা কালীর বাগানে গিয়ে আমের ডাল আর ভাত রান্না করে মহানন্দে বনভোজন করে।

সরষে দিয়ে 'কাসন্দ' তৈরি করবার ধুম পড়ে যায় এই সময়টায় পূর্ববাংলার ঘরে ঘরে। কাঁচা আম, কাঁচা লঙ্কা, 'কাসন্দ' আর কী লাগে এর কাছে। তারা খায় আর গায়,—

কাঁচা মরিচ কাসন্দ।
পোলাপানের আনন্দ॥

মেয়েদের এই বর্ষার গানের ওপোর সরল বিশ্বাসী পাড়া গাঁয়ের প্রতিটি মানুষেরই অগাধ বিশ্বাস। তারা মনে মনে স্থির নিশ্চয় যে, 'এবারে বৃষ্টি না হ'য়েই পারে না।' ভাগ্যিস সত্যি সত্যি বৃষ্টি নেবে গেলে শেষ কালে মুশ্‌কিলে পড়ে গান পাড়ার ঠাকুর্দার দল। নাতনীরা গিয়ে চেপে ধরে তাঁদের চিড়ে আর নারকেল বকশিশ আদায় করবার জন্যে।

মেয়েদের মতো ছেলেরাও বৃষ্টির জন্য সাধ্য-সাধনা করে অনেক। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বৃষ্টিকে ডাক্‌লেই হুকুমের চাকরের মতো হাজির হবে সে এসে।

বৃষ্টি বিহীন মেঘলা দিন দেখা যায়। এমন দিনে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই স্কুল পালানো ছেলেদের মাথায় এক ফন্দি এঁটে যায়। দু' চার জনে যুক্তি ক'রে নিরিবিলিতে গিয়ে মনে-প্রাণে হরিনামের মালার মতো জপ্‌তে সুরু ক'রে দেয়,—

আয় বিষ্টি গম গম,
কাইল বিয়ানে মহাচ্ছোব।

গম গম শব্দে বৃষ্টি এসে গেলেই ব্যস ! স্কুলে আর যেতে হবে না ! জানাই আছে জলের মাছ সব ডাঙ্গায় উঠে যাবে। আর সেই মাছ ধ'রে ধ'রে সারাটা দিন যে কেমন ক'রে চলে যাবে একটু টেরও পাওয়া যাবে না !

কেবল এ-ই নয়। তারা আরও বলে।

এক পয়সার অল্‌দি।
বিষ্টি নাম জল্‌দ॥

স্কুল-পালানো ছেলে ছাড়া বর্ষার এই রকম কর্মনাশা ছড়া আর কেউ বুঝি বলেনা। ছেলেরা বলেও খুব চুপি চুপি, আর অতি নীচু গলায়। অন্যের কানে গেলে সর্বনাশ। বাবার কানে গেলে আর রক্ষে আছে? অমনি পেছন দিয়ে এসে কানে ধ'রে বল্‌বেন—'হতভাগার স্কুল পালানোর ফন্দি খোঁজ হচ্ছে বুঝি?' আর ভালো ছেলেরা টের পেয়ে গেলে তো সবই পণ্ড! তারা আবার গেয়ে উঠ্‌বে যে, রৌদ্র উঠ্‌বার ছড়া;—

অল্‌দি দিমু বাইট্যা,
রৌদ ওঠ ফাইট্যা,
আগ্রা গাছে বাগ্রা ফুল
চম্ চমাইয়া রৌ-দ ওঠ।
বুড়ীলো বুড়ী বকুল তলায় যাবি?
সাতখান কাপড় পাবি—
সাত বউরে দিবি,
নিজে নিবি ত্যানার খোট্,
চম্ চমাইয়া রৌদ্ ওঠ্॥

ভালো ছেলেদের শুভ চেষ্টার কাছে বিশ্ব-বখাটেদের অপচেষ্টা কি আর টিকবে তা' হ'লে?

ছেলেরা ডাক্‌লেই সবসময় বৃষ্টি এসে হাজির হয় না। এদিকে স্কুলেরও সময় হয়ে যায়। শেষকালে তাড়াতাড়ি কোনো রকমে এক গেলাস জলে মাথাটা ভিজিয়ে নিয়ে মুখভার ক'রে চলে যেতে হয় স্কুলে। সারা সকাল তো বৃষ্টির উমেদারিতেই কেটেছে। বইয়ের পাতা তো আর খোলা হয়নি। ফল যা হবার তা-ই হয়। সপাং সপাং পিঠে কয়েক ঘা পড়ে। তারপর হয়ত ছুটির ঠিক পূর্ব মুহূর্তটিতে গম গম ক'রে নেমে যায় 'গা ছাড়া' বৃষ্টি। সব পণ্ড! স্কুলে যাওয়ার জন্যই এত সাধনা—কর্মফেরে ছুটির পরও স্কুলে বন্দী! কিছু কইতেও পারে না সইতেও পারে না। নিজেদের সকাল বেলাকার অকর্মের কথা স্মরণ করে এ ওর পানে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এতো গেল বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা। বৃষ্টি নামলে পরও বর্ষার গান থামেনা। ছেলেমেয়েরা কাঁথা মুড়ি দিয়ে পচুটি মেরে ব'সে ছড়া আওড়ায়,—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী আইল বান্।
শিবঠাকুরের বিয়া অইল তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রান্ধে বাড়ে আর এক কন্যা খায়।
এক কন্যা গাল ফুলাইয়া বাপের বাড়ি যায়॥

এই ছড়াটি কবি দাদু রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর কবিতার মধ্যে তিনি এই ছড়াটির সম্বন্ধে তোমাদের মত অধীর আগ্রহে কতো কি জিগগেস করেছেন। শোন তাঁর সেই কথা :—

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এলরে কোথা
শিবঠাকুরের বিয়ে হল কবে কার সে কথা!
সেদিনও কি এমনি তরো মেঘের ঘটাখানা।
থেকে থেকে বাজ-বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা!
তিন কন্তে বিয়ে ক'রে কী হল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদের এল বান॥

গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা এখন যে আর নেই তা নয়। প্রকৃতি আপন মনে ক'রে চলছে তার কাজ। কিন্তু মাঝখান থেকে পালটে গেছে আমাদের মতিগতি। বদলে গেছে মানুষের মনের রুচি। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আজকাল আর তাই ব্রত নেই। নেই নিয়মের নাম গন্ধ। ফলে বর্ষার এই রকম ছড়াগুলিকেও ভুলে গিয়েছে মানুষ। তবে অনেক ঠাকুমা, দিদিমায়ের মনে এখনো এই সকল অনেক গাথা গেঁথে রয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে এই সকল মূল্যবান ছড়া আমাদের প্রত্যেকেরই সংগ্রহ ক'রে রাখা উচিত।

দেবীর আশীষ

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

মা রান্নাঘর হ'তে ডাকলেন "মিতা ও মিতা!" মার ডাক শুনে মঞ্জু এসে বললো, "কি বলচো মাগো! দিদি এদিকে নেই—বাগানে গেলো বই হাতে"—"তাকে তো কখনওই পাওয়া যাবেনা—কোনদিন দেখলুম না এতো বড়ো মেয়ে মাকে একটু সাহায্য কোরলো—সর্বদা বই হাতে বাগানে ঘুরচেন!" ভীষণ বিরক্ত হয়ে মা বলতে লাগলেন। "বাবলু পড়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে—তা ছোট-ভাইটিকে একটু সকালবেলা মুখ-চোখ ধুইয়ে দেয়া—কি জামা-কাপড় পরিয়ে দেয়া—কি একটু দুধ খাইয়ে দেয়া—কোনোদিকে তার হুঁশ নেই। এখুনি উনি আসবেন 'ভাত দাও' বলে—মেয়ে বাগানের শোভা দেখবেন।" মা খুবই রেগে গেছেন দেখে মঞ্জু ভয়েতে তাড়াতাড়ি ছুটলো ভাইকে আনতে। বাবলুর তখন সবে ঘুম ভেঙে উঠে, অনেকটা "হিসী" করে বেদম হাত-পা ছুঁড়ে খেলা হচ্ছে, আর মাঝে মাঝে গায়ে ভিজে ঠাণ্ডাটা লেগে খুব চেঁচিয়ে উঠছে। ছোট্ট দিদিকে দেখেই বাবলু চেঁচানো বন্ধ করে একমুখ হেসে "দ্যা দ্যা" করে উঠলো। মঞ্জু ভাইকে আদরের চুমো দিয়ে ভিজে জামা ছাড়িয়ে গরম জামা পরিয়ে মার কাছে নিয়ে চল্লো।

শীতের সকালে সোনা রং মিষ্টি রোদ ঘাসের ওপরের হিমবিন্দু গুলির ওপর ঝলমল করছে। অমিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের ছোট্ট বাগানটির চারদিকে চেয়ে গায়ে ভালো করে আঁচল জড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভেজা ঘাসের ওপর। সরস্বতী পূজার আর চার পাঁচ দিন মাত্র বাকী। অমিতা হাসিভরা মুখে ফুটন্ত গোলাপগুলিতে হাত দিয়ে দেখছিলো।

মাঘ মাসের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফুলগুলি মুষড়ে গিয়েছিলো একটু রোদ এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সারা বাগান হেসে উঠলো। বাগানে কিছু ফলের গাছও আছে। ল্যাংড়া ও ফজলী আমের গাছ, কমলা লেবু, নারকোলী ও টোপা কুল, পেয়ারা—এই ধরণের কয়েকটি গাছও সতেজে বাড়ছে বাগানের এক এক দিক অধিকার করে।

এই বাগানটি অমিতার প্রাণ। বেশীর ভাগ সময়ই ওর কাটে এর পরিচর্যায়। সব গাছের খবর নেওয়া, শুকনো পাতা ও ঘাস তুলে পরিষ্কার করা, গোড়া খুঁড়ে দেওয়া—অনেক সময় জলও নিজে হাতে দেয়। রান্না ঘরের খবর রাখে না—কিন্তু কোথা হতে মাছের আঁশ আর চুণ এনে দেবে কমলা লেবু গাছের গোড়ায় পরিপাটি করে, গোলাপের গোড়ায় শুকনো ঘুঁটে গুড়িয়ে দেবে! বাবাকে বলে শিউলী তলাটা বাঁধিয়ে নিয়েছে—সেইখানে বই হাতে ছুটির দিনে বসে থাকবে—প্রাণ গেলেও কাউকে একটি ফুলে হাত দিতে দেবে না অমিতা!

সখের লাগানো চারটি ডালিয়া গাছ আলো হয়ে উঠেছে ফুল ফুটে। খুশী মনে অমিতা বাগানে পায়চারী করতে করতে কুলগাছ দুটির কাছে এসে দাঁড়ালো—ওমা! কুল অনেকগুলি পেকে টুসটুস করছে। অন্যমনস্কভাবে দুটি কুল অমিতা পেড়ে ফেলে হঠাৎ মুখে দিয়ে ফেললো—সর্বনাশ! আর একটু হলেই খেয়ে ফেলেছিলো—দাঁতের লাগা কুলটা চমকে অমিতা ফেলে দিলো। ঠিক সেই সময়ে মার বকুনা শুনতে পেলো, "সে মেয়ের জল খাবারটাও

কি বাগানেই পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে ?" অমিতার তখন একেবারে মন খারাপ হয়ে গেছে—চোখের সামনে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার কোশ্চেন পেপারগুলি ভেসে উঠেছে সবই যেন সর্ষে ফুলের মতো ঝাপসা হলদে। অমিতা ভয়ে ভয়ে কোনো রকমে রান্নাঘরে পৌঁছতেই মা তার জলখাবারের থালা ও দুধের বাটি দিয়ে বকে উঠলেন। অমিতা হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। বাবলুর দুধ খাওয়া হতে মঞ্জু ভাইকে কোলে করে দাঁড়িয়েছিলো—দিদির অবস্থা দেখে মঞ্জু খুব দুঃখিত হয়ে বললো, "দিদি কাঁদিস না ভাই—মা কাজের সময় অমন রেগে যান—তুই এতো দেরী করলি কেন ?" অমিতা চোখের জল মুছে বললো, "ছাখ না ভাই, পরীক্ষায় ফেল হয়ে গিয়েচি—মন কি কোরে ভালো থাকবে বল ?"

সরস্বতী পূজা হয়ে গেছে। অঞ্জলি দিয়ে অমিতা অনেক কোরে প্রার্থনা করলো—"সরস্বতী দয়াময়ী মাগো! এবারকার মতো ফুল মুখে দেয়ার অপরাধটা ক্ষমা করো। এবার থেকে মার সঙ্গে সব কাজ করবো—বাগানে কেবল বিকেল বেলাটা বসে থাকবো—পরীক্ষাটায় যেন ফেল না করি মা!" কিন্তু হায় বেচারী অমিতার ক্লাশে প্রায়ই পড়া খারাপ হতে লাগলো। ওর মন একেবারে খারাপ হয়ে থাকতো। মার পেছনে পেছনে ঘুরতো কাজের সময়। মা নিজেই শেষে বলতেন—"না রে মিতা, যা আর কিছু করতে হবে না—যা না একটু বাগানে।"

পরীক্ষা হয়ে গেছে। অমিতা এখন কাজের মেয়ে হয়ে মার কাছে আর বকুনী খায় না। অনেকদিন পর শিউলীতলায় চুল ছড়িয়ে শুয়ে বই পড়ছিলো—হঠাৎ বাবা একেবারে বাগানে ওর কাছে এসে দাঁড়ালেন—"মিতা নে মা—ধর, এবার আর কি কি গাছ চাই ?" বলে হাসিমুখে হাতভরে অনেক রকম ফুলের বীজের মোড়ক ও সঙ্গে সঙ্গে একটি পরীক্ষার ফল বেরোনো কাগজ দিলেন। অমিতা এক নিঃশ্বাসে দেখলো অমিতা রায়ের নাম প্রথম বিভাগেই লেখা আছে!

(পূর্ব্ব প্রকাশিকের পর)

অবন্তীপুর-পাম্পুর-শ্রীনগর

কাশ্মীরের মাটীর চেহারাটা একটু মজার। দেখলেই মনে হয় নরম মাটী, চাষার স্বর্গ। ঈষৎ হলদে আভা, চট করে শুকোয়, ধুলো ওড়ে বাতাস পেলে, তবু যেন প্রাণশক্তিতে ভরাট। হলদে আঁচের এতো নরম মাটী পাহাড়ের ওপর পড়ে আছে প্রায় ৯৮০ বর্গ মাইল। একদিকে সোজা-সুজি গেলেই প্রায় ৭০ মাইল। এটা অভিনব বটে। দিল্লীর সমতলের

হরি পর্বত

জ্ঞান যাদের আছে, সহর দিল্লীর পথঘাটের চেহারা যাদের জানা তাঁরা জানেন যে কেবল পাহাড় চড়া আর নামা নিয়ে সাইকেল মোটরের নাকালের অন্ত নেই। অথচ এই কাশ্মীরের পথঘাট সমতল তো সমতল।

আর পথে পথে ছোটো খাল দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। খালের পাশে পাশে লম্বা লম্বা পপ্‌লার দুলছে। নীল আকাশ, শাদা মেঘের টুকরো, পপ্‌লারের চঞ্চলতা সবই ছায়া ফেলছে এই 'স্থির' জলে। জলটা বয়ে যাচ্ছে সবেগে, অথচ বল্লাম 'স্থির'—সত্যই তাই "চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে"। জলের বেগ জল না ছুঁলে মালুম হয় না। দূর থেকে দেখতে স্থির। ফলে ছায়া ছবিগুলি যদিচ নিখুঁত ভাবে পড়ছে, তবুও তার ওপর দিয়ে কে যেন 'ওয়াশ' বুলিয়ে দিয়েছে।

আসলে ভেরনাগ থেকে ঝিলম বয়ে যাচ্ছে শ্রীনগরের দিকে। ঝিলমের পাশে পাশে পথ। পথ আর ঝিলমের মাঝে ব্যবধান এক সার, দু সার, কোথাও কোথাও তিন সার পপ্‌লার গাছ। এই পথে যেতে যেতে বেশ খানিক পরে দু পাশের মাটী উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো, মাঝ দিয়ে পথ গেছে। যেন মাটী ঢাকা গ্রাম, জনপদ ঘুমিয়ে আছে প্রত্নতাত্ত্বিকের গাঁইতির চোট কামনা নিয়ে। পার হচ্ছি ইসলামাবাদ।

আশা করছিলাম একটা কিছু চিহ্ন দেখব এখানে। খানিকটা জায়গা ঘিরে কয়েকটা ধ্বংসাবশেষ।

রামসিং বললে—"পাণ্ডবোঁকা চবুত্‌রা"—পাণ্ডার শেখানো বুলি। এইখান থেকে যে পথটা বেরিয়ে গেল সেই পথে পাওয়া যাবে অবন্তীপুর, অবন্তী স্বামীর মন্দির!

শ্রীনগর আর ১৮ মাইল। এইখানে এখনও আছে "আওন্তুর" গ্রাম আর "নওনাগর" গ্রাম। বেহাতের উভয় তীরে দুটী গ্রাম। এ গ্রামের দরিদ্র দীন ভিখারী জানেনা, এ গ্রামের চাষী, মেষ পালক জানেনা বেহাতের দুই তীর ব্যাপী ছিল নবনগর আর অবন্তীপুর, ইওরোপে দান্যুবের দুধারে বুদা আর পেষ্টের মতো একই সহরের দুই খণ্ড। কলকাতা আর হাওড়ার মতো। অবন্তী বর্মন রাজা ছিলেন ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। রাজা হবার কথা নয় তাঁর। বড় ভাই অত্যাচারী, কদাচারী, উচ্ছৃঙ্খল। অবন্তীবর্মন সৎ, সুশীল তবু ছোটো। মন্ত্রী শূর দেশের দুঃখ দুর্দশা সইতে পারলেন না। অবন্তীবর্মনকে রাজা করে অভিষিক্ত করলেন। তাঁর সময়ে বার বার প্লাবন এসে সমূহ সঙ্কট সৃষ্টি করলো। বন্যা ছিল কাশ্মীরের এক অভিশাপ।

প্রকৃতপক্ষে এই অভিশাপ থেকেই কাশ্মীর সৃজন। সে কথাও নীলপুরাণের কথা। জলোদ্ভব অসুরের কথা। সব দেবতাদেরই একটা একটা 'মুড্' আছে; কখনও 'মেজাজে' আছেন, কখনও 'তবিয়তে' আছেন; কখনও 'রং' কখনও 'টং'; কখনও যুদ্ধের সাজ, কখনও লীলায় খোশ মেজাজ। বিষ্ণু, পর্জন্য, বাসব, সবার জন্যেই নন্দন কাননে কোনো বাধা। কেউ ক্ষীরোদ সাগরে, কেউ প্রলয় পয়োধি জলে। মনে মনে ভাবছেন পার্বতী "আমার তো এই পাহাড়ে পাহাড়েই হাড় কালি হোলো। আচ্ছা এর মধ্যেই কি তবু একটু বেড়াবার সখ হয়না কারুর?

হিমগিরির তুষার আর হিমানী গায়ে মেখে মেখে আর যেন পারা যায় না। শিবের ঐ এক রোগ ছিল। কোঁদল করতে যেতেন—নেশাখোর যেমন যায়; কিন্তু শ্রীমতীর তাড়া খেলেই আর রা-টী নেই। এ বিষয়ে উদাসীন শঙ্করকে স্ত্রৈণ বলা চলে। কী না করেছেন গিন্নির তুষ্টি বিধান করতে? বুকে তুলে উলঙ্গ করে নাচিয়েছেন, মাথায় করে নেচেছেন। কাজেই পার্বতীকে খোসামোদ—করবেনই না বা কেন? দ্বিতীয়, তৃতীয় পক্ষে অমন বেলেল্লা পনা কে-না করে?

পার্বতী বল্লেন—"ভালো ভালো জায়গা কোথায় সে কি আমার জানার কথা? যে ছোকরা জানতো তাকে তো সাবড়ে দিলে একবার চেয়েই। তার সঙ্গীটাকে দাবড়ে দিলে। অনঙ্গ তো অঙ্গে নেই যে ধরবো গিয়ে, ভাল দুচারটে জায়গার নাম করতে; বসন্ত না যেথো কি নাম তার, সেও আর এদিকে উঁকিটী মারে না। পড়ে আছো এই বরফের মধ্যে। ম্যা-গো, একটু সাধ আহ্লাদ করবো, তো কাকে নিয়ে করবো!"

"এই নন্দে!" বলে হাঁক পাড়লেন আশুতোষ। "দেখেআয় মধু আজকাল কোথায় আড্ডা গেড়েছে। আমরাও সেখানে যাবো, থাকবো, যখন খুশী, যতক্ষণ খুশী।"

ভৃঙ্গীটা অড়োল থেকে নন্দীর অবস্থাটা অনুমান করছিলো আর হয়তো খৈনী টিপছিলো। মুখ কাচুমাচু করে নন্দী যেই বেরিয়েছে, অমনি ভৃঙ্গী দিলে তার হাতে খৈনী গুঁজে। "মুখে ফেল্। মন খানিক মেজাজ তর্ হবে। তোরও যেমন বুদ্ধি। কোথায় যাবি খুঁজতে? মধু-দা থাকে তো একটা সরোবরে, হরমুখ পাহাড়, কোসর-নাগের মাঝামাঝি। ঐখানে গেলেই হয়।"

মস্ত বড় সরোবর। চারধারে বনঘেরা। তার ওপরে বরফের টুপী ঢাকা পাহাড়। পার্বতী খবর পেয়ে শিবকে নিয়ে ছুটলেন। দিব্যি জায়গা। মাঝে মাঝে হ্রদ, বড় বড় নদী, গাছ, ফুল। মনে মনে ভাবছেন, "ছোকরা বয়স নৈলে সখ আসবে কেন? বুড়োর জন্যে কৈলাস, আর মধুর জন্য এই দেশটা! খুব লীলা করে বেড়াল পার্বতী। শিব সঙ্গে সঙ্গে তালে তাল দিয়ে বেড়ান।

জলের মধ্যে হ্রদের তলায় থাকতো এক অসুর। নাম জলোদ্ভব। পার্বতীকে দেখে তার মন উসখুস করে। অথচ শিবের ভয় মস্ত ভয়। কিন্তু সে উৎপাত আরম্ভ করলো। আজ এখানে জলে ভাসায়, কাল সেখানে। পার্বতীর লীলাভূমি, বসন্তের বাসস্থান সেই ভূখণ্ড জলে প্লাবিত হয়ে গেল। মানুষের দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই।

একদিন তাড়া লাগালেন পার্বতী শিবকে—"এমনি থাকবে নাকি? শেষে বুড়ো বয়সে বাত শ্লেষ্মায় মরবো নাকি? তোমার কি, তোমার তো ছিলিম ছিলিম তামাক আছে, ভাঙ, চরস, কি নেই? আমি ছেলেপুলে-গুলোকে নিয়ে মরবো?"

মরীচিপুত্র কশ্যপ ভোলেন নি ছেলে নীলের কথা। একদিন খবরা-খবর করতে এসে দেখেন সব জলে থৈ থৈ। নীল নিজে গুহার মধ্যে থর থর করে কাঁপছেন। কশ্যপ তার কাছ থেকে জলোদ্ভবের কাহিনী শুনে রেগে আগুন। অদিতিকে ডেকে সে যা ধমক দিলেন—বলে কাজ নেই; "কতকগুলো অপোগণ্ড পেটে ধরেছো। তেত্রিশ কোটীর

বানিহাল থেকে শ্রীনগরের পথে

অত্যাচারে কল্পতরুর একটা ফল পাইনা, কামধেনুর দুধ এক চুমুক পাই না। সব পাখী, জানোয়ার ভাগ করে নিয়ে বসে আছে, সব ফুল ফল ভাগাভাগি। সবই সহ্য করেছি। এখন হরু:আর পারু গেছে ফুর্তি করতে সতীসরে। সেখানে নীলের দুঃখ দৈন্যের চরম। গুণ্ডা সামলাতে পারিস না, বিদেশ বিভুঁয়ে বুড়ো বয়সে বৌ নিয়ে গেলি কেন চলাচলি করতে?"

অদিতি বেচারা শুনে কাঠ। "বলো কি! নীলের ওপর অত্যাচার! সে তুমি সইবে কেমন করে? নীল তো আমার পেটের নয় যে লাথি-ঝাঁটার বশ হবে! সে তোমার গোপন সোহাগের···

কশ্যপ দাড়িতে হাত দিয়ে বলে উঠলেন—"আহা আহা থাক্-থাক্-ওসব কথার কাজ নেই। দেখি বিষ্ণু, ব্রহ্মা এরা কি করে!

কশ্যপ ডেকেছে শুনে সবাই হাজির। সকলকে বললেন' "যাও

পাঞ্জর আর নীলের ভারি কষ্ট হচ্ছে জলোদ্ভবের উপদ্রবে, সব সামলে দিয়ে এসে আমায় রিপোর্ট দিয়ে যাবে।"

চললেন দ্রুহীন, উপেন্দ্র আর রুদ্র—অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর রুদ্র। পার্বতীকে দেখে ব্রহ্মা আর রুদ্র বলেন—"কি দরকার এখানে থাকা আপনাদের? বাড়ী যান। যেখানে সেখানে গিয়ে ফূর্ত্তি করার দায় আছে। গুণ্ডা থাকবেই, আছেই। তাদের খপ্পরে এসে পড়া কেন?"

কেন তা ওঁরা জটাধারী হয়ে বুঝবেন কি! একগাল দাড়ি রাখবেন কেন তাহলে? বিষ্ণু চালাক চতুর ফূর্ত্তিবান ছেলে। তিনি বুঝলেন পার্বতীর অন্তর্বেদনা। তিনি বল্লেন—"বড় বৌদির সখ হয়েছে এখানে দাদাকে নিয়ে দুদণ্ড একটু থাকবেন! গুণ্ডারা বাধা দেবে তাতে? আমরা থাকতে? এ যদি মানতেই হয় তার চেয়ে দাড়ি রাখা ঢের শ্রেয়ঃ! আমি কর্‌ছি ব্যবস্থা।"

কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—কুম্‌কুম্‌ গাছ

ব্যস্‌। অমন ওস্তাদ বহুরূপী তো লন্‌চ্যানীও হতে পারেনি। ফস্‌ করে শরীরটা বদলে একেবারে বরাহ। এই বড় দাঁত। কাদা ঠেলে ঘোঁৎ ঘোৎ করতে করতে একেবারে পীর পঞ্জেলীর তলায় গিয়ে দাঁত দিয়ে চুয়ের পর চু। ব্রহ্মা আর রুদ্র চেঁচান—"আরে করো কি! করো কি! হয়তো ধরা দেবীর কবরীবন্ধন বা শৃঙ্গার তিলক এটা। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ চুঁদিতে আরম্ভ করলে কেন? দেহে ক্ষত চিহ্ন জন্মাবে যে?"

বরাহ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনার্য্য ভাষায় বলতে লাগলো "যাও, যাও—ধরা দেবীর জন্যে তোমাদের এতো কুটানী কেন হে শুনি? ধরা দেবীর চুঁয়েতেই সখ-বেশী সে কি আমার চেয়ে তোমরা জান বেশী? এটা ধরা নদীর কবরী না শৃঙ্গার তিলক খোঁজ করো. লজ্জা করে না। তাদের বৌকে নিয়ে এয়ারকি? এটা তার দুষ্টব্রণ, ঘামাচী। চুলকে দিচ্ছি আরাম লাগছে। গেলে দেব, জলটুকু বেরিয়ে যাবে, শরীর দেখবে ঝরঝরে হয়ে রূপ ফেটে পড়বে!"

সত্যিই তাই। বিতস্তার যতো জল আটকে ছিল, সেই বরাহ দন্তের আঘাতে যে গর্ত্ত হোলো তা দিয়ে হুড় হুড় করে বেরিয়ে গেল। বরাহমূলের সেই গর্ত্ত আজও আছে। কাশ্মীর থেকে বিতস্তার জল সেই পথে বেরুচ্ছে। এখন নাম বারামুলা।

জল বেরিয়ে গেল। বসন্তর দেশ আবার খট্‌খটে হয়ে উঠলো। আর অসুর জলোদ্ভবের জারি জুরি গেল।

এবার পার্বতীকে আর সে এড়াতে পারলো না। লেগে গেল লড়াই। সে লড়াই দেখতে দেবতারা এলেন। রাগ হবার কথাই। চুপিসাড়ে বুড়োবুড়ী এসেছেন একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, ছোকরারা সবাই জেনে গেল; সবচেয়ে লজ্জার কথা কেতো—গণশা জানলো, আর ঐ ফাজিল বিষ্ণু জানলো! জলোদ্ভবকে না মারলে মান থাকে না।

মারাও সোজা নয়। প্রতিবার সে গিয়ে জলের মধ্যে লুকোয়। সতীসর সরোবর, সেটা একটা সমুদ্র যেন। তার মধ্যে গিয়ে কোথায় আটকে থাকে।

পার্বতী তখন পাখী হয়ে জলের ওপর উড়ে উড়ে দেখতে থাকেন কোথায় আছে জলোদ্ভব। মুখে ধরা টুকরা পাথর।

যেই না দেখতে পাওয়া পাথরটি দিলেন তাক করে ছেড়ে। খুব উঁচু থেকে সেটি পড়তে পড়তে জলোদ্ভবের মাথায় যেই পড়া, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব লাভ।

সেই পাথরের টুকরোটাই 'শারিকা পর্বত', 'শারি পর্বত বা সাম্প্রতিক 'হরিপর্বত'। সব দেবতারা এখানে বসেছিলেন যুদ্ধ-বিজয়িনী পার্বতীর গুণগান করতে, তাই সারিকা পর্বত কাশ্মীরের বড় তীর্থ। সতীসর সরোবর পার্বতীর অঙ্গধৌত জলে সুপবিত্র।

কাশ্যপ এসে এই অসুর-ত্রাসিত স্থানকে অমর করে গেলেন তাই নাম কাশ্যপামর—বা কাশ্মর—যা থেকে কাশ্মীর নাম হোলো। নীল পুরাণের কাহিনীতে এ নামের এই তত্ত্ব লেখা।

প্লাবন তা বলে এই শেষ হয়নি। তবে সমগ্র কাশ্মীর যে জলের তলায় ছিল; এই জলই যে কাশ্মীরের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ অসুর বা শত্রু ছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই। জলোদ্ভব এই ক্ষতিকে কাশ্মীর প্রাচীন কালে জয় করেছে বরাহমূল গিরিবর্ত্ম পথে জল নিষ্কাসিত করে-পুরাণে এর যত মুখরোচক বর্ণনাই থাক, মূলতঃ ঘটনাটা সত্য। সমগ্র কাশ্মীরের ভূখণ্ড আজ সাক্ষ্য দেয় যে এই বৃহৎ জলাধার পাত্রটী একদিন জলে ভরা ছিল। এই মাটী জলের মধ্যকার মাটী, তাই এতো নরম, তাই এতো বড় বড় শুধু মাটীরই পাহাড়। তাই প্রত্যেক পর্বতমালার উপরে আরোহণ পথের অনেকখানি মাটীতে ঢাকা। এলুভিয়াল সয়েল জল নৈলে হবে কেন?

তবু জল এর শত্রু হয়ে রইল। একটু বাধাতে কাশ্মীর বন্যায়

ভেসে যায়। সেইজন্ত এক শ্রীনগরকেই বারংবার স্থান পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে; সেইজন্যই যুগযুগান্তস্থায়ী অভিজ্ঞতা-পুষ্ট কাশ্মীরী নাগরিক নৌকার বাসকে গ্রহণ করেছে অন্তর দিয়ে, নৌকার জীবনকে সার্থকতা দিয়েছে পুরোপুরি নদীকে, জলকে জীবনধারার মধ্যে টেনে এনে।

অবন্তীবর্মনের সময়ে এই ধরণের বন্যার পর বন্যা। রাজা আর দুঃখ কষ্ট দেখতে পারেন না। হঠাৎ তাঁর সময়ে কাশ্মীরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ প্রেমিকের জন্ম, কীর্ত্তিমান্ পূর্ত্ত বিশারদ তিনি। সমগ্র কাশ্মীরের বন্যার সমস্যা চিরদিনের মতো তিনি সমাধান করে দিয়ে গেলেন। সেই খ্যাতিমান ব্যক্তিটির নাম ছিল সূর্য্য যার নামে সূর্য্যপুর। এর কথা পরে বলতে হবে আমাদের।

অবন্তীবর্মন ও তাঁর মন্ত্রী দুটী মন্দির করলেন। শিব মন্দির অবন্তীশ্বর, বিষ্ণু মন্দির অবন্তীস্বামী মন্দির। বিষ্ণু মন্দিরটীই কারু ও শিল্পে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এ মন্দিরের প্রশংসা বহু পর্যটক, বহু কবি, বহু কিম্বদন্তী করে গেছে। আজ তার কিছু নেই, আছে শুধু নাম ও ধ্বংসাবশেষ। দেখলে এখনও গা শির শির করে এমন অভিনব এর সংগঠন।

এরা পাথর ব্যবহার করেছে ভুবনেশ্বর মন্দিরের পাথরের মতো—তেমনি তামাটে গ্রাণাইট্, বড় বড় দানা তাতে। তার মধ্য থেকেও যা কারিগরী দেখিয়ে গেছে তা অপূর্ব, চমৎকারিত্বে অনুপম।

এমনি আর একটী কীর্ত্তি দেখা যায় শ্রীনগর থেকে আট মাইল দূরে, এ পথের বাঁকেই পড়ে। এখন নাম পাম্পুর। প্রাচীন নাম পদ্মপুর। পদ্মেশ্বর স্বামীর বিরাট বিষ্ণু মন্দির। এ মন্দিরও সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। অনুভূতি প্রবণ, সচেতন পর্য্যটকের চক্ষে পদ্মপুরের মায়া আজকের পাম্পুরও বুলিয়ে দেয়। রাজার নাম বৃহস্পতি, তাঁর মন্ত্রী পদ্ম নির্মাণ করেন এই মন্দির। কেউ কেউ বলেন পদ্ম ছিলেন ললিতাদিত্যের মন্ত্রী। সময়টা যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী সে বিষয়ে পণ্ডিতরা দ্বিমত নন্।

এককালে রাজা হর্ষ পদ্মপুরে কেশরের, জাফ্রাণের (saffron) চাষ করেছেন। কুঙ্কুম বলতো তখন। সেই চাষই এখন প্রাচীন পদ্মপুরের একমাত্র ছায়াছবি। সেদিনের পদ্মপুর হয়েছে পাম্পুর, সেদিনের কুঙ্কুম হয়েছে জাফ্রাণ, সেদিনের হিন্দু হয়েছে মুসলমান, সেদিনের ঔজ্জ্বল্য হয়েছে দুরন্ত দারিদ্র্য। সেদিনের বিগ্রহ নেই, মন্দিরের কঙ্কাল আছে। আর আছে কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কুঙ্কুমের চাষ।

ইসলামবাদে চা খেয়ে নিয়েছিলাম। আর থামা নয় এখন, কোথাও নয়। এখন সোজা শ্রীনগর!

কে কোথায় বাস্ থেকে বললে "চিনার বাগ।" দুধার দিয়ে ডালের জলকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে; মাঝখানে দ্বীপের মতো জায়গা। সেই জল সাঁকোর তলা দিয়ে, বসতির মধ্য দিয়ে, ঘাটের ধার দিয়ে গিয়ে মিশেছে ঝিলমে।

রামসিং ও বাস—পিছনে ক্লীনার খজুরা

মনে ভাসতে লাগলো জাহাঙ্গীরের সময়। সখ করে এই সব চিনার গাছ লাগিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর নাতি আওরঙ্গজেবের সময়েও চিনার-বাগে নৌকার বাড়ীতে থেকে সিরাজী আর সাকী নিয়ে বহু রজনী অতিবাহিত করেছেন মোগলদের আয়েস-নবীশরা! চিনার বাগ আমার মানসপটে একটা নওরোজ-বাজারের ছবি তুলে ধরলো।

কিন্তু আসল চিনার বাগে এসে মনটা দমে গেল।

৯

—চিনার বাগ

বিকেল সাড়ে ছটা। মোড়ের মাথায় কাশ্মীরী সিপাহী দাঁড়িয়ে। ডান্ ধারে শ্রীনগরের সব চেয়ে উঁচু পাহাড় শঙ্করাচার্য্য হিল্স। বাঁ ধারে

একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে চিনার—কিনারা পথ দিয়ে বাস চলেছে।

এর পরে বেঁকবে আবার ডান ধারে। বিরাট বিরাট চিনারের বীথি ভেদ করে পথ। মোড়ে এখনও পুলিশ। রামসিং তাকে বেশ ধমকেই দিলো।

বিস্মিত বাসন্থ তাবৎ কুলীন দৈনিক নাগরিক! ড্রাইভার বকে পুলিশকে! এ যেন যোগীন্ সরকারের মজার দেশ। বল্লে রামসিং "বকবোনা? বলে 'বক্সি সাহেবের গাড়ী আসছে।' বক্সী সাহেব আগে, না মেহমান্ আগে?"

তাজ্জব ব্যাপার। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীরও আগে কাশ্মীরের 'মেহমান'! ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা বটে! অল্প পরিসর রাস্তার বাঁ ধারেই সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলো। গেটে সান্ত্রী দাঁড়িয়ে। বক্সীর বাড়ী। অনাড়ম্বর রমনীয় বাড়ী।

তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে আমরা কাশ্মীরের অভিজাত পাড়ায় আছি। এর পরেই পোলো খেলার মাঠ। বিরাট ক্লাব। একধারে কাশ্মীর সরকারের বাস-চলাচল দপ্তর। এই দপ্তরের পিছনেই বাস থামলো। দেখি খান চার বাস আগেই এসে গেছে।

সামনে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। আর পথ নৈব চ। মনে হোলো বাঁধ। একী কাশ্মীর? দুধারে বাড়ী, সামনে বাঁধের দেয়াল! "কোথা হা হন্ত চির বসন্ত—" দুরন্ত ধুলে মরি! বাঁধের মাথায় দেখলাম স্বর্ণদন্ত অবিনাশ মাষ্টার ঘন ঘন হাত নাড়ছে, 'উঠে আসুন। মালপত্র ছড়ান।

বাঁধটায় দাঁড়াতেই সামনে দেখি জল, জলের ওপর পপলারের ডালের সাকো; সাকোটা নেমেছে একটা দ্বীপের মতো জায়গায়, প্রাচীন চিনারে ছায়া নিবিড়! চারি ধারে তার জল। এমনি ডিমের আকারের দ্বীপ পর পর দুটো।

আমায় অবিনাশ বললো,—"ত্রিশখানি নৌকো এক জায়গায় জড়ো করা এবং তাদের বাসিন্দাদের রান্না খাবার ব্যবস্থা করার মতো পরিসর স্থান পাওয়া দুষ্কর। অনেক ভেবে চিন্তে এই জায়গা বাছা হয়েছে। এখন কে কোথায় থাকবে ব্যবস্থার ভার আপনার।"

পতিরাম বললো,—"বাঙ্গালীর খোপ্‌ড়া কেমন দেখবো এইবার।"

"খোপ্‌ড়ার তো বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে; দেখছি চামড়ার। গণ্ডারের মতো চামড়া যার সে পারবে এই কাজ করতে। গালাগাল খেতে খেতে জান্ যাবে। কেউ বলবে দল বেঁধে থাকবো, কেউ বলবে বন্ধু নিয়ে থাকবো, কেউ বলবে স্কুল হিসাবে থাকবো। এর ব্যবস্থা করা দুরূহ। মনে আছে বাসে চড়ার কথা।

আমরা বাসে আসছিলাম যখন আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিলো—আমাদের দল আর ভাঙ্গা হবে না। দুঃখে সুখে এ যাত্রা আমরা এক-কাট্টা হয়েই থাকবো।

এমনি বোঝা পড়া না জানি কতো বাসে হয়েছে।

অবিনাশ প্রশ্ন করে মেয়ে পুরুষ আলাদা থাকবে—অর্থাৎ দুটো দ্বীপের একটায় মেয়ে, একটায় ছেলে, না মিলে মিশে থাকবে?'

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলাম। "এপথ ক্যাম্প করার পথ নয়। মেয়েদের মধ্যে স্বভাব-সিদ্ধ কতকটা সঙ্কোচ, নম্রতা আছে। খানিকটা গোপনতাও ওদের মনোধর্মে মানায়। তাই ওদের একটু স্বতন্ত্র রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে, তা বলে, এখানে মেয়ে আর পুরুষ বলে 'দুটো' ক্যাম্প করার কথা উঠলে ক্যাম্প জীবন আড়ষ্ট হয়ে উঠবে। মেয়ে আর ছেলেরা এক বোটে না থাকলেই হোলো। বাকী সব সহজ ভাবে ভাগাভাগি করা হোক্।"

তাই হোলো। দেখা গেল আরও চারখানা অন্ততঃ বোট না হলেই হয় না। সে রাতের মতো চিনারের তলায় একটা তাঁবু খাটিয়ে কর্মকর্তারা এদিক ওদিক পড়ে থেকে চারখানা বোটের অভাব নয় ভোগ করবেন। পরের দিন অবশ্য বোটের ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

বোট ভাগ করার পর প্রধান কাজ ঐ নশো প্রাণীকে নিজের বোটের ঠিকানা বলে দেওয়া। এই ভার কেউ নিতে চায়না। স্কুল গুলোকে এক একটা বোটে চালনা করে দিতে কষ্ট তেমন পেতে হয়নি। কিন্তু ছাত্রদল না নিয়ে যে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর দল এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কার সঙ্গে কার অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে সে কথা জানার তো কোনও উপায় ছিলনা। কাজেই পুরো দু' ঘন্টা ঐ বাঁধের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে যে কঠিন ও কর্কশ ব্যবহার করতে হয়েছিল আমায় তার ফলে পরদিন প্রাতে জেগে উঠে দেখি আমি ক্যাম্পের সর্বাধিক কুখ্যাত ব্যক্তি!

সেদিন কঠিনই হতে হয়েছিল।

জগজীবন বললে.—"সব চেয়ে ছোটো বিশ্রী বোটটা আমাদের দিলেন দাদা?"

কটমট করে চেয়ে বল্লাম, "সে কথা রাতে হবে। এখন ঐ বোটে জিনিষ নিয়ে চলে যান্। জিনিষ নিজেরাই বয়ে নিয়ে যান্।"

মেয়েরাও নিজেদের লাগেজ বইছে। বয়ে নিয়ে যাবার নেশা এসে গেছে। সেই আনন্দে জিনিষ চলে যাচ্ছে স্ব স্ব বোটে।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে মেয়েটী—লম্বা চেহারার কালো মেয়ে। শিক্ষয়িত্রী, বিবাহ হয়নি। সঙ্গে একটী কচি বয়সের কোমল শ্রীর মেয়ে, দেখতে খাটো খাটো নিটোল গড়ন। বড়টীর চোখ বড় বড়, বসা, চোয়ালের হাড় বেশ শক্ত। চুল বব করা। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলেছে। ছোটোটী কাঁদেইনি, এই যা। লাল গুমোট ভরা মুখে দাঁড়িয়ে আছে জড়ো সড়ো হয়ে।

অপর দুচার জন শিক্ষয়িত্রী দেখে হেসে যাচ্ছে মুখ বাঁকিয়ে। ফিস্ ফিস্ করে যে আলোচনা করতে করতে যাচ্ছে তার অর্থ এই যে 'এখানে কান্নাকাটি হুবিধের হবে না। এ বড় শক্ত ঠাঁই।'

ভাবতে অবাক মানি—মেয়েরাই মেয়েদের ওপর এতো নির্মম কেন?

"আমরা এখানে বোটে থেকে আলাদা থাকবো, ভাবতে পারিনা। একটু কিছু ব্যবস্থা করা আপনার পক্ষে দুরূহ হবেনা। আপনাকে এর ব্যবস্থা করে দিতেই হবে!"

"আমাকে? বহু লোককে আজ এই ভাবে বিদায় করেছি। তাদের কাছে অপরাধী হতে পারব না।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। এলো সুভদ্রা কুমারী আর জয়শঙ্কর। এরা ভাইবোন। কিন্তু এরাও এক বোটে হোলোনা। জিনিষপত্র এক বাক্সে। জয়শঙ্কর বললে—"কিছুনা, কাল সকালে ঠিক করে নেব সুভদ্রা। আজ আমি রমেশের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। কেমন?"

সুভদ্রা ছোট ভায়ের পানে চেয়ে বললো—"একটা রাত তো। কাল ঠিক করে নেবো। তোর বালিশটা নিয়ে যাস্। এক বালিশে তোর ঘুম হবে না।"

আমি বোটে ফিরলাম রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে।

বৈদ্যুতিক আলো লাগানো বোট। কিন্তু কাশ্মীরে বৈদ্যুতিক আলো নাম মাত্র আলো। ছোটো বোটে একশো পাওয়ার লাগিয়ে হার মেনে শেষ অবধি দুটো মোম-বাতি জ্বেলেছি। বিদেশে গেলে মোমবাতি, দেশলাই, টর্চ, ছুরি, দড়ি, পেরেক একটা জিনিষ আমি সঙ্গে রাখবোই। ওরা হাসাহাসি করে। কিন্তু বেণু এখানে এসে সৎশিক্ষা পেলো।

অসিত হেসে বললে—"দাদাকে মাঝে মাঝে চুমড়ে না দিলে চলবেনা, জানো বেণুদি।"

বেণু বললে—"বাড়ীতেও তাই, ভারি তোষামোদ প্রিয়।"

কাশ্মীরে গান্ধরবনে এখন বিরাট হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক প্ল্যাণ্ট তৈরী হয়েছে। আর দু এক বছরের মধ্যেই বিজলীর কষ্ট দূর হবে। দেশ জাগছে। বাড়ছে।

জগজীবন চটে গেছে জানাচ্ছে না। সবার হয়েছে বড় বড় বোট, আর আমাদের একটা ছোট বোট। কাশ্মীরের বোট সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা দুরূহ ব্যাপার। এক একটা বোটে ড্রয়িং রুম, দুটো তিনটে শোবার ঘর, ড্রেসিংরুম, ডাইনিং রুম, বাথরুম, কোনও কোনওটায় নাচের ঘর। পাশে ছোট বোটে রান্নাঘর, চাকরের ঘর। আর একখানা ছোটো সাল্‌তি মতো, নাম শিকারা। সুসজ্জিত নৌকা, চারধার ঝালর দিয়ে ঢাকা; স্প্রীং দেওয়া বনাত ঢাকা গদি, পেছনে হেলান দেবার সুব্যবস্থা। এতে করে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো যায় জলে। চাকর-খানসামা সহ নৌকাভাড়া। হরতনের আকারের ছোটো ছোটো বৈঠা বেয়ে জলে ভেসে চলা। নৌকাগুলি এক জায়গায় স্থির; চলে বেড়ায় না। এই সব অট্টালিকা-সংস্করণ নৌকা দিয়েই শ্রীনগরীর উৎকর্ষ। এই নৌকার আসে পাশেই অপর নৌকায় কেনাবেচার লোকেরা সামগ্রী—যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে ভেসে বেড়ায়। শাল দোশালা থেকে নিয়ে আলু পেঁয়াজ পর্য্যন্ত। সখের জিনিষ থেকে প্রয়োজনের সামগ্রী, মায় দরজী, নাপিত, ধোবা, জ্যোতিষী, ডাক্তার সবই ঘোরা ফেরা করছে। লোটাস্-ঈটার্সের জন্য প্রশস্ত ব্যবস্থা। খালি মিডিয়ম অব এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ রৌপ্য-সঙ্গতি থাকলেই হোলো। এদের এইসব ব্যবস্থা দেখলে অনুমান করতে বেগ পেতে হয়না যে আভিযাত্রিকদের ওপর কাশ্মীরীদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছল্য কতখানি নির্ভর করে।

নারী বুক দিয়ে লগি ঠেলে

বোটের ভিতরটা কাশ্মীরীরা খুব সাজিয়ে রাখে। কার্পেট, বড় বড় আয়না সোফাসেট্, ড্রেসিং টেবল্ কিছু বাদ নেই। বোটের ছাদের ওপরের কাজ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। পাইন আর দেবদারুর পাত্‌লা পাত্‌লা কাঠ দিয়ে নানা রকমের নক্সী। মাছের আঁশের মতো, আলপনার মতো, ঘরকাটা চৌকো চৌকো কার্পেটী কাজের মতো—নানা রকমের কাজ। কত মধ্যাহ্ন এই কাজের দিকে চোখ মেলে দিয়ে কেটে গেছে। বাইরে ঘিরে সরু রেলিং। সেই রেলিংয়ে, ছাদে মরশুমীফুলের টব। কাশ্মীরের নৌকাবাড়ী বিলাসী মনের সুযোগ্য নিকেতন।

এরা ঐ রান্না নৌকার মধ্যে একখানা ঘরে বাস করে। প্রকৃত কাশ্মীরী রক্ত এদের। ফুট ফুটে বাচ্চাগুলো খেলা করে। কাশ্মীরী বধূ

আগাগোড়া আলখাল্লা ঢাকা, মাথায় একটা কাপড় কপালের ওপর দিয়ে বেঁধে মাথার পেছনে গোঁজা। ঘাড়ের দিকে কাপড়টা ঝুলে থাকে খানিকটা। কাণ দুটো বার করা; তাতে রূপার গহনা। বেশীর ভাগই কাশ্মীরী পাথর, প্রবাল বসান। বড় বড় কালো তারার চাহনি দিয়ে চেয়ে দেখে। তার ভেতরে লাস্য নেই। আছে একটা সুপ্ত বিদ্রোহ। যুগ যুগান্ত পর সেবায় আত্ম নিয়োগ করে, যুগ যুগ ধরে চোখের ওপর বিলাস ব্যসনের উপকরণ, উপচার এগিয়ে দিয়ে, ভরা পৃথিবীর এক কোণে এরা পড়ে আছে মাত্র দর্শক হয়ে। পুরুষদের চোখে এই বিদ্রোহ এই রসাভাব প্রত্যক্ষ করিনি। নারীদের মধ্যে করেছি। এরা এদের নৌকার ভেতর বসে. একটী জানালার মধ্য দিয়ে চোখ রেখে সব জিনিষ এরা খুটিয়ে দেখে; আর বঞ্চিতের ক্ষুধা নিয়ে মনে মনে যা জল্পনা করে তাকে ভাষা দেবার পথ খুঁজে পায় না। তাই এরা কথা কয় কম। তা বলে সেই কম কথা বলার খাঁই পুষিয়ে নেয় নিজেদের মধ্যে কথা বলে। নিজেদের কাশ্মীরী মেয়েদের কথা অন্তহীন। মনে পড়ে না কখনও দুটী কাশ্মীরী মেয়ে দেখেছি যারা চুপ করে বসে আছে। অসম্ভব কথা বলে এরা। এই কারণেই আমায় দেখে হঠাৎ এরা যখন কথা থামিয়ে দেয়, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুভব করি যে চুপ করে কেউ আমাদের প্রত্যেক কাজ; প্রতি গতিবিধি লক্ষ্য করছে, তখন অস্বস্তি বোধ করি।

অথচ এরা সুন্দরী। সুন্দরী বলতে কাশ্মীরে এতো দেখেছি, এত সহজে, এবং ঝিলমের তীরে মাঝে মাঝে এমন নিরাবরণরূপে যে সুন্দরীর সংজ্ঞা এদেশে এসে একটু বদলাতে হয়। এদেশে যাকে সুন্দরী বলবে তার সৌন্দর্য্য সত্যিকার অপূর্ব সৌন্দর্য্য হবে বোঝা যায়।

বড় বড় মালবাহী নৌকা উজান দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লম্বা লম্বা পপ্‌লারের লগি মেরে এই সব সুন্দরীরা। বুকের মাঝে লগির একটা দিক ঠেকিয়ে দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ করে, বুকে ঠেলে ঠেলে এরা এগিয়ে নিয়ে যায় কাঠের গুঁড়ি বোঝাই অনেক টনের নৌকা। এই দুরন্ত পরিশ্রমের পর এদের সৌন্দর্যে কতটুকু কমনীয়তা অবশিষ্ট থাকবে? তাই ওদের চোখে দেখছি ক্ষুধা, জ্বালা, এবং সন্দেহ হয়েছে অবকাশ মতো এরা বিদ্রোহ করবে না কেন?

সুন্দর নৌকা অবশ্য আমাদের ভাগ্যে জোটে নি। তবু দলের অন্যদেরও যা জুটেছিল সে সব নৌকার চেহারাই জগজীবনের টাক-মাথায় জগঝম্প লাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই মুখ বেজার করার যথেষ্ট কারণ আছে ওর। বিবাহ করেনি. করবো করবো করছে; সৌখীন লোক, ছিমছাম থাকা পছন্দ করে। ওর মতের সঙ্গে মত দেবার মতো বয়স আর ধর্ম অসিতের। কিন্তু অসিত ছিমছাম নয়, ফিটফাট। এবং অসিতের আসল খোরাক দেহের জৌলষ নয়, মনের কৌতুক। ইংরাজীতে যাকে বলে 'ইম্পিশ্‌' সেই রোগে ও চিত্তজয়ী। রামদাস গুপ্তা, বিহারীলালজী আর আমাকে ওরা চলেশ্‌পোরী দূরদর্শীদের দলে ফেলেছে। নিকটে কিছু আমরা দেখতে চাই না। কিন্তু অসিতের নালিশ নেই এই বোটের জন্য। বড় বোটের সঙ্গে যে রান্না নৌকা থাকে তার চেয়ে একটু বড় হবে। দুখানা ঘর—ছোটো ছোটো। একখানায় আমরা বড়রা ছয়জন। অন্যটায় ছেলেরা তেরো জন।

আমি বল্লাম,—"কেন এ নৌকা নিলাম বল তো?"

বিহারীলালজী বললেন—"জগজীবনের অতো ধৈর্য নেই সে কথা ভাববার। অন্য ঘরে আসবাব, আয়না, ফুলদানী, সেফাসেট দেখে ওর মন খারাপ হয়ে গেছে।"

রামদাস গুপ্তা একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টা-ছিলো। একটু হাসলো।

জগজীবন বল্লে—"বুঝবনা কেন। আমরা এই দলটা একটা পুরো ইউনিট পেলাম। কারুর সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে না। এই তো! ভেবেও আরাম। আঃ"

ওর অবস্থা ও কণ্ঠস্বর শুনে সকলেই হেসে ফেলি।

লোকটা এসে সেলাম করে দাঁড়ালো। হাতে একখানা কালো টিনের চাক্‌তির গায়ে শাদা হরফে কি সব লেখা। পড়ে দেখি ওর লাইসেন্স। বোটের নাম 'প্যানসী'। মালিক ও মাঝির নাম 'রমল্লা'। আসল নাম রহ্‌মান। কাশ্মীরে এই 'আকার দেওয়া মুসলমানী নামের খুব প্রচলন। আবদুল—আবদাল্লা, ফকির—ফক্কিরা, হনিফ্‌—হনিফা, রহমান—রহমাল্লা, রসিদ—রসিদ্দা এই ভাবের। লম্বা চেহারা, হাস্যমুখী বিনয়ে ভরা, মূর্ত্তিমান সেবা। তিনটে ছেলে। বৌ আর মা। পাশের নৌকায় থাকে।

"কাল সকালে সব সাজিয়ে রাখবো। ছোটো নৌকা বলে কষ্ট পেতে দেবো না। রহ্‌মাল্লা বলে, রাত বারটায় ডাকলেও বান্দা হাজির থাকবে। বাজার থেকে কিছু আনতে হবে তো বলে দিন, এনে দিচ্ছি।"

জগজীবনের ছাত্রমণ্ডলী বিছানাগুলো বিছিয়ে ফেলেছিল। জগজীবন পা ছড়িয়ে বলে উঠলো, "রমল্লা—চা"

"অভি লিজিয়ে সাব্‌"—বলেই রমল্লা অন্তর্দ্ধান।

(ক্রমশঃ)

প্রণতি ঘোষ গুণী শিল্পি এবং সুন্দরী। কিন্তু তিনি জানেন যে, জনসাধারণের তাঁকে ভাল লাগার জন্যে তাঁর ত্বকের লাবণ্যও অনেকখানি দায়ী। সেইজন্যে তিনি সবচেয়ে মোলায়েম ও নিরাপদভাবে প্রতিদিন শুভ্র বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে তাঁর ত্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন।

আপনারও সেই একইভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিৎ। লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধ সরের মত ফেণার রাশি আপনার সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 615-50 BG

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে গোপালদেব পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করার পর দেশে যে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ এল তার পরিণামে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বৃদ্ধিলাভ করল, সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হল। আবার, অন্যদিকে, বৌদ্ধ পালরাজবংশের সহায়তায় সমগ্র পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এই বৌদ্ধধর্ম বিস্তার পরবর্তীকালে অনেকগুলি মঠ, বিহার ও সংঘারাম গড়ে তোলে। ঐ সব বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠান মহাযানপন্থী সাধক-বৃন্দের আশ্রয়স্থলও ছিল, আবার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কাজও করত। এই সব বৌদ্ধ সাধক যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করলেও ধর্মীয় প্রয়োজনেই তাঁদেরকে মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা পালি এবং প্রাকৃতসমূহের প্রবল অনুশীলন করতে হত। তাছাড়া, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, ধর্মপ্রচার করার দরকারে তাঁরা লৌকিক অপভ্রংশ বা তার অনুরূপ সদ্য গড়ে-তোলা নবীন ভাষায় নিজেদের মতামত ও নীতিশিক্ষা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতেন। এই কারণে মাগধী অপভ্রংশ থেকে নতুন ভাষা বাংলার গঠন কার্যে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে এবং সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সাহায্যে করতে পেরেছিলেন। উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত-ভাষার চর্চা এক মুহূর্তের জন্যেও ছাড়তে পারতেন কিনা, সন্দেহ। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের বা ছোট জাতের লোক অনেক ছিলেন যাঁরা সাধারণ লোকদের মুখের ভাষায় বা মাতৃ-ভাষায় সবরকম কাজই চালাতেন। পরে, আনুমানিক দশম-একাদশ শতকের মধ্যেই, তাঁদেরই একদল ঐ সদ্য গ'ড়ে-উঠতে-থাকা ভাষায় খুব উৎসাহের সঙ্গে কাব্যচর্চাও করেছিলেন। সেই কাব্য ধর্মসাধনার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত রচনা ; তা আবার এমন দুর্বোধ্য রীতিতে কৌশলের সঙ্গে রচিত যে, সে-কাব্য অল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকের উপযুক্ত নয়। তার প্রচার কবিদের অনভিপ্রেত ছিল যা না হলে অমন হেঁয়ালির ভাষায় সে-কাব্য লেখাই হত না। অন্তত এটুকু মানতে হবে যে, ঐসব কবিতার বাচ্যার্থ জনসাধারণের জন্যে উদ্দিষ্ট হলেও গূঢ়ার্থ আদৌ তাদের জন্যে পরিকল্পিত ছিল না। কিন্তু এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, ঐ সব তন্ত্র-শাস্ত্রপ্রভাবিত গুপ্ত সাধনায় নিমজ্জিত বৌদ্ধ মহাযানপন্থী সাধকেরা যখন কেবল নিজেদের পড়বার জন্যে অতিগোপন সাধন-সঙ্কেত রচনা করতেন তখন সাধারণ পাঠক তাঁদের লক্ষ্য না হলেও ঐ অন্তরঙ্গ রচনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরা দেবভাষার আনুগত্য ত্যাগ ক'রে মাতৃভাষার শরণাপন্ন হতেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের এই অনুরাগ শ্রদ্ধার বিষয়, সন্দেহ নেই।

এই বৌদ্ধ সাধকবৃন্দ, যাঁরা তান্ত্রিক ও সহজিয়া মতের দ্বারাও কম-বেশি প্রভাবিত ছিলেন, যে কাব্যরচনার নমুনা রেখে গেছেন তা থেকে আদি বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডার কোন্ কোন্ জাতের শব্দসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল, যেমন তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তখনকারকালের মৌখিক ভাষারও একটা আনুমানিক রূপ গঠন করা যায়। সেই আনু-মানিক রূপ সর্বাংশে তখনকার প্রকৃত মৌখিক ভাষার মতো যদি নাও হয়, অন্তত তার কাছাকাছি যাবে, এটা স্বচ্ছন্দে ধ'রে নেওয়া যায়। কেন না চর্যাপদের অন্তরঙ্গ ভাব যতই দুর্বোধ্য হোক না, বহিরঙ্গ ভাষা সাধারণ লোকদের জন্যেই ছিল। সুতরাং সেই ভাষা সাধারণের মৌখিক ভাষার কাছ ঘেঁষে যাবার কথা। চর্যাপদের অধ্যাত্মসঙ্কেত যাদের জন্যেই হোক না কেন, বাচ্যার্থ সাধারণ লোকদের জন্যেই অভিপ্রেত ছিল। বাহ্য অর্থে যে-জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় তাও যেমন সাধারণ লোকদের,তেমনি সে-অর্থের বহিরাবরণও তাদের আকৃষ্ট করার জন্যেই রচিত।

চর্যাকার সিদ্ধাচার্যগণ যে শ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিতছিলেন, তাদের সঙ্গে মেলামেশা থাকায় সম্ভবত তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্যেই তাঁরা মুখের কথায় যে-ভাষা ব্যবহার করতেন তার অনুরূপ শব্দাবলী নিয়ে গঠিত গদ্যভাষারও সাহায্য নিতেন। অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে তখনকার কালের সাধারণ মানুষ এখনকার মতোই বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যায় অশিক্ষিত ও নিরক্ষর ছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক সে যুগে লেখার কাজে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যই নিত। কিন্তু অন্যদিকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, যারা নিরক্ষর ছিল না তারা সকলেই যে সমস্ত লেখার কাজ সংস্কৃতে চালাবার মতো শিক্ষিত ছিল, তা কখনও সম্ভবপর নয়। শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকদের মধ্যেও সব দেশে সব কালে শ্রেণীবিভাগ থাকতে বাধ্য। সে যুগেও সামান্য শিক্ষিত সাধারণ দেশবাসী নিশ্চিতরূপে মাতৃভাষায় অর্থাৎ মুখের ভাষায় বা তার কোন শিষ্ট-লিখিতরূপে চিঠিপত্র প্রভৃতি নিত্যকার লেখার কাজ সম্পন্ন করত। কাজেই, তাদের প্রতি আকৃষ্ট, তাদের সম্বন্ধে উৎসুক, তাদের বিষয়ে দরদী সহজিয়া কবি গোষ্ঠী দৈনন্দিন জীবনে লেখার দ্বারা এদের সঙ্গে সংযোগ রাখার সময় সংস্কৃতের পরিবর্তে যে ভাষায় কাব্য রচনা করতেন সেই ভাষার গদ্যরূপের সাহায্য নিতেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করা অযৌক্তিক।

সিদ্ধাচার্যদের পূর্বোক্ত ধর্মসাধনাবিষয়ক গীতিকাগুলি পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর পূর্বপুরুষ বলা যায় ; আকৃতিতে সেগুলি গীতি-কবিতা তো বটেই, রাগ ও তালের উল্লেখের জন্যে পুরোপুরি গান বলাই ঠিক। কিন্তু প্রকৃতিতে বা ভাবের দিক দিয়ে উপলব্ধি করার ব্যাপারে ঐ গীতিকাবলী অস্বচ্ছ ও জটিল। তার কারণ আগে আলোচনা করা হয়েছে ; অদীক্ষিত কোন লোককে চর্যাকার সাধনরহস্য বুঝতে দিতে চান না। কিন্তু অধিকাংশ বৈষ্ণব পদের মতো চর্যাপদও তার যৌনভাবাত্মক

বাহ্য আবরণের জন্যে কাব্যামোদী সমাজে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিল। এই পরিচিতির বিস্তর প্রমাণ আমরা পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে পাই। লৌকিক জীবনের সাধারণ ও সুপরিচিত বিষয়ের বর্ণনা, তুলনা প্রভৃতির আকর্ষণে চর্যাপদ ও দোহাগুলি সাধারণ পাঠক সমাজে বরং বহুলপ্রচলিত ছিল। প্রায় সমস্ত শিক্ষিত কবিই সমস্ত উত্তর ভারতে প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ঐ বহুল প্রচারের প্রমাণ রেখে গেছেন। কবিরের লেখা কবিতাতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চর্যাগীতির ভাষা নিতান্তই বাংলা ভাষা, আর রচনাকাল খুব বেশি দেরি হলে দশম-একাদশ শতক—একথা এখন অপ্রতিবাদ্য। সুতরাং দেখা গেল যে, যখন দশম শতকেই বাংলাভাষায় এক বিরাট কাব্যসাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে তখন লোকমুখে ব্যবহৃত ভাষার মর্যাদা রাজদরবারে যেমনই হোক না কেন, মাগধী প্রাকৃত তথা অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্মলাভ ও অনুরূপভাবে জাত অন্য সব পূর্ব ভারতীয়-আর্যভাষা থেকে তার আলাদা হয়ে যাওয়া, এই দুটি ব্যাপার দশম শতাব্দীর মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। উড়িয়া ও অসমিয়া ভাষা এই সময়েও বাংলা ভাষার অন্তর্লীন ছিল। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পর উড়িয়া এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পর অসমিয়া ভাষা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বাংলা ভাষা নিজে মাগধী অপভ্রংশের পূর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্য থেকে পৃথক্ হয় ঐ দশম শতকের মধ্যেই।

একটি মূল ভাষা থেকে যখন অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হয় তখন তাদের পারস্পরিক প্রভেদের কারণ হয় এক এক ভাষায় অঞ্চলবিশেষে ব্যবহৃত বিশিষ্ট তদ্ভব, দেশজ ও ভগ্নতৎসম শব্দাবলীর প্রাধান্য। বাংলাভাষা যাদের মাতৃভাষা তারা বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই এলাকায় যে-ভূখণ্ড শিলচর থেকে দেওঘর ও দার্জিলিং থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভূভাগে ব্যবহৃত দেশজ শব্দাবলী, এখানে সঞ্জাত তদ্ভব শব্দসমষ্টি, এই অঞ্চলের বিশিষ্ট উচ্চারণপদ্ধতির ফলে গড়ে-উঠা ভগ্ন-তৎসম ও পরিবর্তিত-ধ্বনিবিশিষ্ট তৎসম শব্দগুলি এবং এক পৃথক ভাষাবিন্যাস ও বাক্যরচনাপদ্ধতিসম্বলিত স্বকীয় ব্যাকরণ নিয়ে বাংলাভাষা অপভ্রংশ স্তর ভেদ করে উঠল মাৎস্যন্যায়ের যুগের অব্যবহিত পরে আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই; একথা আমাদের না মেনে উপায় নেই এইজন্যে যে, তা না হলে বাংলাভাষায় মাত্র দশম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যে একটা অত জোরালো প্রাণপূর্ণ গীতিকাসাহিত্য কখনই অমন সম্পূর্ণরূপে ও প্রভাবশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সেই সময়ে পণ্ডিত সমাজের অবজ্ঞায় হয়ত সূত্রবদ্ধ হতে পারে নি। কোন পানিনি, বররুচি বা হেমচন্দ্র সূরীর করুণাবঞ্চিত ঐ অবহেলিত ভাষাতেই গড়ে উঠল অব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যসংস্কৃতিবিবর্জিত সাধকবৃন্দের প্রয়াসে এক ধর্মীয় অথচ লৌকিক জীবনের আবরণের বৈচিত্র্য সংযুক্ত গীতিকাসাহিত্য।

ঐ সাহিত্য থেকে প্রমাণিত হল যে, বাংলাভাষা তার নিজস্ব শব্দ-ভাণ্ডার নিয়ে একটা বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে নবম শতকের কাছাকাছি সময়ে। এর পর, বাঙালি জনসাধারণের প্রাণের কথার রূপায়ণ-কাজে অগ্রসর বাংলাভাষা যে ঐ প্রয়াসে মোটামুটি একাদশ শতকের মধ্যেই বহু পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছে তাও বেশ বোঝা যায়। ঐ সাহিত্য থেকে আন্দাজ করা যায় জনসাধারণ সে-সময়ে যে-ভাষায় কথা বলত তার শব্দগত রূপটা কিরকম। তখন চিঠিপত্রে বা ঐ ধরণের গদ্যব্যবহার সংক্রান্ত কাজ-কর্মে যে গদ্যভাষা ব্যবহার করা হত, তা নিশ্চয়ই ঐ শব্দরূপের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চর্যাগীতির কবিরা যখন তাঁদের কাব্যে লৌকিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তখন তাঁদের গদ্যরচনাতেও—সে-গদ্যরচনা যতই গদ্যময় কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাক না কেন—নিশ্চয় লৌকিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁরা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে যে-গদ্য ব্যবহার করতেন তার শব্দউপাদান যে চর্যাপদের ভাষায় ব্যবহৃত উপাদানের অনুরূপ, একথাও নিঃসংশয়ে বলা যায়। শব্দপ্রয়োগের রীতি হয়ত গদ্যরচনার ক্ষেত্রে এসে কিছু বদলে যেতে পারে। কিন্তু উপাদানের তারতম্য ঘটবার কোন কারণ নেই।

শব্দ উপাদানের কথা বাদ দিলে অন্য সব দিক দিয়ে তখনকার কালের দৈনন্দিন লেখার কাজে ব্যবহৃত গদ্যের রূপ যে কেমন ছিল, তার শক্তি, সৌন্দর্য ও বিন্যাসকৌশল বা কেমন ছিল, তা আজ আর জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। যে কোন আকারে হোক, সেই সময়ের গদ্যভাষার লিখিত নিদর্শন না পেলে তা বলা কোনদিনই সম্ভবপর হবে না। কিন্তু কোন সময়ের কবিতার ভাষা থেকে, বিশেষত লোক-সাহিত্য-ঘেঁষা কবিতার ভাষা থেকে, কিম্বা আরও ভালো করে বলতে গেলে লৌকিক ভাষায় রচিত কবিতার ভাষা থেকে সেই সময়ের কথ্যভাষা লেখার কাজে ব্যবহৃত গদ্যভাষার খানিকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণত বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায় বা কথ্যভাষায় লৌকিক ছন্দে বা ছড়ার ছন্দে রচিত এই কবিতাটির ভাষা :—

পুষ্প দিয়ে মারো যারে চিন্‌ল না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে।

অনুধাবন করে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মৌখিক ভাষা ও গদ্যের রূপ এইরকম নিদর্শনের তুল্য ব'লে মনে করেন :—

"যারে পুষ্প দিয়ে মারো সে মরণকে চিন্‌ল না; যে বাণ খেয়ে পড়ে সে যে তোমার চরণকে ধরে।"

তাহলে তাঁর অতি সামান্যই ভুল হবে। একমাত্র "যারে" শব্দটির ঈষৎ রূপান্তরের কথা বাদ দিলে ঐ গদ্যান্বয় যে সমকালীন বাংলা গদ্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। "যারে" শব্দটিও অঞ্চল বিশেষের কথ্যভাষায় শোনা যায়। আর কথ্যভাষাই তো লেখার ভাষা গদ্যের জন্মভূমি।

এখন কেউ যদি মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ" কাব্যের ভাষার গদ্যান্বয় দেখিয়ে বলেন যে, সে-ভাষা কি সমকালীন মৌখিক ভাষা ও গদ্যরচনার ভাষার তুল্য?—তাহলে সবিনয়ে নিবেদন করা যায় যে, "মেঘনাদ বধ"

কাব্যের ভাষার গদ্যান্বয় থেকে সেকালের মুখের ভাষা ও তার ভিত্তিতে রচিত গদ্যের সন্ধান পাওয়া না গেলেও সেকালের তথাকথিত সাধু লেখ্যভাষার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় বৈকি। ঐ কাব্যের গদ্য রূপান্তর এবং বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রভৃতির রচিত সাধু গদ্য ভাষা কেবল উপাদানের দিক থেকে নয়, ধরণ-ধারণ রীত-করণের দিক থেকেও তুলনীয়। ঐ কাব্যে খুলনা-যশোর অঞ্চলের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের প্রয়োগও লক্ষণীয়।

উনিশ-বিশ শতকের যে কোন সময়ের বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পদ্যরচনার গদ্যান্বয় থেকে সমকালীন প্রকৃত গদ্যের আদলটা অনেকখানি ধরা পড়ছে। চর্যাপদের যুগেও এর ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তাঁর গদ্যরচনার ভাষা যদি আন্দাজ করা যায়, তাহলে ডোম্বীপাদর রচনা থেকেও সমকালীন মৌখিক ভাষা ও চিঠিপত্রাদির মামুলি গদ্যভাষা আঁচ করা যাবে। অবশ্য, কেবল অনুমান করাই যাবে, জোর করে প্রমাণস্বরূপ কিছু বলা যাবে না। তবে, ঐ অনুমান অযৌক্তিক হবে না। অস্বাভাবিক কোন বহিঃপ্রভাব কাজ করে না থাকলে চর্যাপদের মতো লৌকিক গীতিকার ভাষাও যা, তখনকার কালের অসাহিত্যিক কাজে ব্যবহার্য গদ্যের ভাষাও তাই হবার কথা। অবশ্য, সেটা সম্ভবপর এই জন্যে যে, চর্যাপদ বা রবীন্দ্রনাথের ছড়ার ছন্দে লেখা কবিতার ভাষা মোটামুটি লৌকিক। লৌকিক গদ্যের রূপ স্বভাবতই তার কাছাকাছি না গিয়ে পারে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ফার্সিকণ্টকিত বাংলা চিঠির ভাষার ক্ষেত্রে একথা খাটবে না। সেখানে এক অদ্ভুত বহিঃপ্রভাবের অধীনে সমসাময়িক বাংলা পদ্যের ভাষা থেকে দৈনন্দিন লেখার কাজে ব্যবহৃত গদ্যভাষা, যথা, আইন-আদালতের কাজে লিখিত দলিল বা চিঠিপত্রের গদ্যভাষা, অনেকদূরে সরে গেছে। ইংরেজি সাহিত্যে অনুরূপ এক দৃষ্টান্ত দেখা যায় চসারের মধ্যে। তাঁর পদ্য ও গদ্যের ভাষায় মিল নেই। কিন্তু তারও কারণ, চসারের উপর পতিত অস্বাভাবিক টিউটনিক বহিঃ-প্রভাব। চর্যাপদের ক্ষেত্রে ফার্সি বা টিউটনিক ধাঁচের কোন বহিরাগত কৃত্রিম প্রভাবের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, "চসারের গদ্য তাঁর পদ্যের কাছাকাছি গদ্যান্বয় নয়।...চসারের গদ্য ও পদ্য, দুই স্বতন্ত্র লেখকের রচনা বলে মনে হবে।" তার কারণ, চসারের যা পেশা ছিল তাতে তাঁর গদ্যের উপর টিউটনিক প্রভাব খুব বেশি পড়েছিল। অথচ তাঁর পদ্যের উপর ছিল লাতিনিক প্রভাব। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ফিশার বলেছেন, "While our aristocratic and literary connections were with a Latin people, our trading connections were mainly with peoples of the same Teutonic stock as ourselves. In this area our English speech must have been always a better commercial language than French. It is significant that Chaucer, the father of English poetry, was a Londoner and a Commissioner of Customs."

কিন্তু চর্যাকারদের সময়ে এদেশে কবিতার ভাষা ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য গদ্য ভাষার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকার কারণ দেখা যায় না। চর্যাগীতির ভাষা অভ্রান্তভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, তা লৌকিক ভাষায় লেখা। সুতরাং চর্যাপদের ভাষা একটু বিশ্লেষণ করে আমরা যে গদ্য ভাষা গড়ে তুলতে পারি তা সর্বাংশে না হলেও বহু পরিমাণে সে যুগের মৌখিক ভাষা এবং রাজদরবার ভিন্ন অন্যত্র চর্যাকার-ব্যবহৃত লেখ্যভাষার প্রতিচ্ছবি, একথা অপ্রমাণ করা যায় না। পদ্যের ভাষায় কিছু কিছু বক্রিমা থাকে যা কাব্যিক চারুতার প্রয়োজনে কবি-স্বীকৃতি লাভ করে। সুতরাং পদ্যের অবিকল বা যথাযথ গদ্যান্বয় নিখুঁত গদ্য ভাষা না হতেও পারে। কিন্তু গদ্য রচনাতেও যে চারু বক্রিমার স্থান আছে, সে কথা ভুললে চলবে না। এই জন্যেই মধুসূদনের কাব্যের গদ্যান্বয় সে যুগের সাধুভাষার অনুগামী।

চর্যাপদের সময়ের গদ্যভাষায় একমাত্র যে বহিঃপ্রভাব কাজ করতে পারত তা হচ্ছে সংস্কৃত প্রভাব। কিন্তু সেযুগে রাজদরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত; যাঁরা বেশ শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা সাধারণত রাজকার্যে কেবল সংস্কৃত ব্যবহার করতেন এবং বাংলার মতো নবজাত দেশজ ভাষা খুব বেশি পছন্দ করতেন না বা তার কোন চর্চাও করতেন না। যারা সংস্কৃত প্রভাব পছন্দ করত না প্রধানত তারাই মাতৃ-ভাষার চর্চা করত এবং তাদের কাব্যে যতখানি সংস্কৃত প্রভাব ছিল, গদ্যে তার চেয়ে বেশি থাকার কথা নয়। অন্তত সিদ্ধাচার্য চর্যাকার-গণ যে সংস্কৃতের খুব বেশি ভক্ত ছিলেন না সে তো তাঁদের কাব্যের ভাষা থেকে বোঝা যায়। তাঁরা রাজদরবারে হয়ত বাধ্য হয়ে সংস্কৃত ব্যবহার করতেন; কিন্তু অন্যত্র নিশ্চয়ই বাংলা এবং চর্যাপদের অনুরূপ সংস্কৃত প্রভাববিবর্জিত সরল বাংলাই ব্যবহার করতেন। চর্যাপদের ভাব জটিল হলেও ভাষা সরল এবং দেশজ ও তদ্ভব শব্দ পরিপূর্ণ।

অতএব চর্যাগীতির গদ্য রূপান্তর যে সেযুগের বাংলা গদ্যের প্রতি-রূপ, এই উৎপত্তি ঠিক। তবে, ঐ গদ্যভাষার ব্যবহার ছিল খালি অসাহিত্যিক কাজে। একথাও মনে করা যায় যে, ঐ গদ্য প্রতিরূপ সেকালের মুখের ভাষার অনুগামী।

এখন দেখা যাক চর্যাগীতির গদ্য রূপান্তর কেমন হয়। শ্রীকুমার-বাবুর মতে, "কবিতার ভাষা সোজা, ঋজু, পয়ারের ঠেকাতে সংহত। গদ্যের ভাষা অনেকটা অনভ্যস্ত বলে ও ছন্দ-অবলম্বনহীন বলে ন্যুব্জপৃষ্ঠ, আঁকাবাঁকা ও অনিয়মিত বিস্তার।" সুতরাং চর্যাপদের সময়ের চিঠি-পত্র প্রভৃতির গদ্য হয়ত খুবই শিথিলবদ্ধ ছিল। যদিও তখন গদ্য রচনা আমরা যতটা অনভ্যস্ত ছিল বলে মনে করছি হয়ত ঠিক ততটাই অনভ্যস্ত ছিল না। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি বাংলা চিঠির ভাষা সাক্ষ্য দেয় যে, লোকব্যবহারে অনেকদিন থেকে বাংলা গদ্য বেশ শক্তি-শালী হয়ে উঠেছিল। সে যাই হোক, চর্যাপদের সমকালীন গদ্যের

আনুমানিক রূপটা ধরা শক্ত নয়। প্রথমে ডোম্বীপাদ-বিরচিত একটি গীতিকায় আলোচনা করা যাক। কবির নাম থেকে মনে হয়, তিনি অনভিজাত অব্রাহ্মণ এবং তাঁর রচনা থেকে বোঝা যায়, তিনি সহজিয়া মতের সাধক; বৃত্তিতে মাঝি হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথমে মূল পদটির দেশি ও তদ্ভব শব্দময় রূপটি দেখা যাক :—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅ পসাএ জাইব পুণু জিণ উরা॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পানী ন পইসই সান্ধি॥
চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিধি সংহার পুলিন্দা।
বামদাহিন দুই মাগ ন চেবই বাহতু ছন্দা॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই॥

এর অবিকল গদ্য রূপান্তর হবে এই রকম :—

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে নাঈ বহই। তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী লীলে জোইআ পার করেই। ডোম্বী! বাহতু। ডোম্বী! বাহলো। বাটত উছারা ভইল। পুণু সদগুরু পাঅ পসাএ জিণ উরা জাইব। মাঙ্গে পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তে, পিঠত বান্ধী কাচ্ছী; গঅণ দুখোলে পানী সিঞ্চহু, (জহিঁ) সান্ধি ন পইসই। চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিধি সংহার পুলিন্দা। ছন্দা বাহতু; বামদাহিন দুই মাগ চেবই ন। (মাতঙ্গী) কবড়ী লেই ন, বোড়ী লেই ন, সুচ্ছড়ে পার করই। জো রথে চড়িলা, (সো) বাহবা জাই ন, কুলে কুলে বুলই।"

মোটামুটি এই ছিল হাজার বছর আগে সদ্যোজাত বাংলা গদ্য ভাষা যা তখনকার সাধারণ লোকে নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা বা ধর্মনিবন্ধ রচনার কাজে অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহার করত। তারা ঐ গদ্যের ব্যবহারে কতটা অভ্যস্ত ছিল বা ছিল না, তা আজ জোর করে বলা যায় না। সেটা বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ; হয়ত সংস্কৃত-বিমুখ জনসাধারণ বাংলা গদ্য বেশি করেই ব্যবহার করত। পরে সেন-রাজত্বকালে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে তার ব্যবহার প্রচলন কমে গিয়ে থাকতে পারে। মোট কথা, অসাহিত্যিক কাজে সামান্য পরিমাণে হলেও গদ্যের ব্যবহার নিশ্চয়ই ছিল। পূর্ববর্তী সংস্কৃত ভাষায় যখন যথেষ্ট পরিমাণে গদ্যের ব্যবহার ছিল এবং প্রাকৃত গদ্যের নমুনাও পাওয়া যায় আর পালিভাষার তো কথাই নেই, তখন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের গদ্যভাষার অনুকরণে যে বাঙালি সিদ্ধাচার্য ও শিক্ষিত বৌদ্ধগণ দেশীয় ভাষায় গদ্য রচনা করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর, সেই গদ্যের ভাষাও ঐ গদ্য রূপান্তরের মতো হওয়াই সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক। চোখের সামনে বৌদ্ধ জাতক ও ধর্মগ্রন্থের উৎকৃষ্ট গদ্য নিদর্শন থাকার জন্যেই তার অনুসরণ ও অনুকরণে বাঙালি বৌদ্ধদের উৎসাহিত হবার কথা। আর সেই কারণে তাঁদের রচনা খুব শিথিলবদ্ধ হবার আশঙ্কাও ছিল না। চসারের সময়ের গথিক ভাষার গদ্যের চেয়ে পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার গদ্য যে খারাপ ছিল না, সামান্য দু একটি নমুনা আলোচনা করলেই তা ধরা পড়ে। সুতরাং চর্যাকারদের সমকালীন গদ্য খুব খারাপ হবারও কথা নয়। সাহিত্যে গদ্য তখন প্রচলিত ছিল না। কিন্তু পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব সাধকদের লেখা গদ্য কড়চাগ্রন্থের মতো চর্যাকার তান্ত্রিক সহজিয়াদের লেখা সহজ সাধনাবিষয়ক গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ থাকা স্বাভাবিক। যদি তা থেকে থাকে, তবে তার ভাষাও ঐ গদ্যদ্বয়ের কাছাকাছি যাবার কথা। তখন ব্যবসাবাণিজ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চিঠিপত্র লেখার কাজেও সংস্কৃতভাষাই চলত, এটা বোঝা যায়। কিন্তু বাংলাভাষী এলাকায় স্থানীয় কাজকর্মে ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ লোকেরা ঐ গদ্য ভাষাতেই লিখত। বিবর্তনের ফলে হাজার বছর পরে এর বর্তমান রূপ হয়েছে এই রকম :—

"গঙ্গা যমুনার মাঝে নাও বয়। তাতে-ডোবা মাতঙ্গী অবলীলাক্রমে যোগীকে পার করে। ডোম্বী! তুমি বাও। ডোম্বী! বেয়ে যাও। পথে দেরি হল। পুনরায় সদ্গুরু পাদ প্রসাদে জিনপুর যাবে। মার্গে পাঁচটি কেরোয়াল পড়ছে, পীঠে কাছি বাঁধা; গগন-সেঁউতিতে জল সেঁচে নাও যেন সন্ধিতে প্রবেশ না করে। চন্দ্রসূর্য দুই চক্র সৃষ্টিসংহার প্রতিরূপ। স্বচ্ছন্দে বাও, বাঁ ডান দু দিক না চেয়ে। মাঝি কড়ি নেয় না, বুড়ি নেয় না, স্বেচ্ছায় পার করে। যে রথে চড়ে, সে বাইতে পারে না, কূলে কূলে বেড়ায়।"

মধ্যবর্তী সহস্র বর্ষের এই বিবর্তনের স্তর-পরম্পরা উদ্ঘাটন ও সেগুলির পরীক্ষা আমাদের সাধ্য বিষয়।

দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত প্রাকৃত গদ্য তৎকালীন বাংলা গদ্যের রূপ নির্ণয়ে আমাদের বেশি কিছু সাহায্য করতে পারে না। তার কারণ, সাহিত্যিক প্রাকৃত একটি কৃত্রিম লেখা ভাষা মাত্র। লোকের মুখে মুখে প্রচলিত মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার উপভাষাসমূহের উপর ভিত্তি করেই মাগধী, শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃত গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সংস্কৃত নাট্যকারেরা সেগুলিকে ব্রজবুলির মতো কৃত্রিমতাময় এবং ব্যাকরণবন্ধনে নিতান্ত আবদ্ধ লেখ্য ভাষাসমূহে পরিণত করেন। সংস্কৃত নাটকের মাগধী প্রাকৃতে পূর্বভারতের লোক কথা বলত না, বিশেষত দশম একাদশ শতকে। পালি ভাষার সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। বড় জোর, পালি গদ্য বাঙালি গদ্য লেখকদের প্রেরণা ও আদর্শের জোগান্ দিয়ে থাকতে পারে। পাল রাজাদের যুগে লোকের মৌখিক ভাষা আর প্রাকৃত বা অপভ্রংশ-ঘেঁষা নয়, বরং চর্যাপদের ভাষার অনুরূপ। সেই সময়ের অনুমেয় গদ্যভাষা প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকে প্রভূত পরিমাণে এগিয়ে গেছে। বিশেষত পালসাম্রাজ্যে বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল হওয়ায় সংস্কৃত প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম হবার কথা। এইজন্য বাংলা ভাষার জন্মলাভ এযুগেই সম্ভবপর হয়। এ সময় বাংলাভাষার নিজস্ব শব্দ-উপাদান নিয়ে স্বাধীন অগ্রগতির সময়; বররুচির ব্যাকরণে

বাঁধা ভাষার স্বরূপ দিয়ে সেই বাংলাভাষার বৈপ্লবিক অগ্রগতির পরিমাপ করা অসম্ভব।

চর্যাপদের গদ্যান্বয় ও বর্তমান যুগের ভাষায় তার অনুবাদ—দুটি স্তরের মালমশলা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখা যায়, হাজার বছর আগেকার বাংলা গদ্যভাষার ও আজকের গদ্যভাষার শব্দগত উপকরণ ঠিক এক নয়। ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অন্য বৈয়াকরণিক পরিবর্তন যা ঘটেছে তা ছাড়াও শব্দের মূল ভাণ্ডারেই একটা মস্ত বদল হয়ে গেছে। এই বদলে-যাওয়ার রহস্য যবনিকা উন্মোচন করলেই পাওয়া যাবে বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্য সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস। এই পরিবর্তনের কার্য্যকারণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে বাংলা গদ্যের মূলধারার সন্ধান পাওয়া যাবে।

চর্যাগীতির সময়ের বাংলা গদ্যের যে আনুমানিক রূপ আমরা গড়ে নিতে পারি তা থেকে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে যখন চর্যাগীতিকোষ, প্রাকৃতপৈঙ্গলের কবিতানিচয়, দোহা প্রভৃতি রচিত হয়, তখন বাংলাভাষায় লিখিত সর্ব শ্রেণীর রচনায় দেশজ ও তদ্ভব শব্দের আধিক্য বর্তমান কালের চেয়ে অনুপাতে অনেক বেশি ছিল। তৎসম শব্দের অনুপাত দেখে এই আধিক্য বুঝে নিতে হবে। বর্তমান কথ্য ভাষায় ও ঐ কথ্যভাষায় লিখিত গদ্যে তৎসম শব্দের অনুপাতে অ-তৎসম শব্দাবলীর পরিমাণ যা, তখনকার বাংলা গদ্যে তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এই ভাবে এক একটা অঞ্চলে আঞ্চলিক উচ্চারণপদ্ধতির প্রভাবে গঠিত তদ্ভব ও দেশজ শব্দগুলির প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়ে যখন ঐ সব শব্দ নিয়ে গঠিত লোক মুখের ভাষা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা থেকে নিজ পার্থক্য প্রকটিত করল তখনই একই তৎসম শব্দ ভাণ্ডার সব ভাষার সাধারণ সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেল। মৈথিল, মগহি, ভোজপুরি, উড়িয়া, অসমিয়া এবং বাংলা এইভাবে আলাদা ভাষায় পরিণত হয়েছে, এক মূলভাষা থেকে উদ্ভব সত্ত্বেও আর তৎসম শব্দাবলীও সর্বত্র অনেকটা একরকম হলেও, প্রধানত অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশীয় শব্দ সম্ভারের পার্থক্যের জোরে। অবশ্য, তৎসম শব্দসমূহও এই সব ভাষায় কেবল বানানের দিক থেকে চোখে দেখতেই এক, উচ্চারণের দিক থেকে মোটেই এক নয়। ইউরোপীয় আধুনিক ভাষাগুলিতেও এই ধরণের ব্যাপার দেখা যায়। লেখায় অর্থাৎ চোখে দেখতে কোন শব্দ বিভিন্ন ভাষায় একই রকম হলেও উচ্চারণের সময় প্রত্যেক ভাষায় আলাদা রকম। একই গোষ্ঠীর ভাষা হলেও এইভাবে ভাষায় ভাষায় পার্থক্য শব্দ সম্ভারের দিক থেকে ও উচ্চারণ-গত প্রভেদে, দু রকমেই হয়। এইভাবে উপাদান ও উচ্চারণ গত তারতম্যের জন্য যুগে যুগে ভাষার স্তর-বদল হয়, কখনও ভাষা উপভাষায় পরিণত হয়, উপভাষা ভাষার মর্যাদা অর্জন করে, এক ভাষাবিশিষ্ট এলাকা সঙ্কুচিত হয়ে অন্য ভাষার বিস্তারলাভের পথ ছেড়ে দেয় অথবা প্রসারিত হয়ে অপর কোন ভাষার বিস্তার ব্যাহত করে। প্রধানত ভাষার আদি ও মৌলিক উপাদানগত তারতম্যের জন্যেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেশজ, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ ঐ মূল উপাদানগুলি গঠন করে। ব্যাকরণের পার্থক্যও অনেক পরিমাণে এই উপাদানবিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। কেবল তৎসম শব্দাবলীর সাদৃশ্যের জোরে দুটি অন্যথা পৃথক্ ভাষাকে এক করে রাখা চলে না। সুতরাং সংস্কৃতের সাহায্যে ভারতের আধুনিক ভাষাগুলিকে একত্র করা সম্ভবপর নয়। অ-তৎসম শব্দাবলীর প্রভেদের জন্যেই উড়িয়া ও অসমিয়া ভাষা বাংলা ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অকস্মাৎ এই উপাদানগত প্রভেদ বৃদ্ধির জন্যে মুসলিম অভিযানও অনেকটা দায়ী। অসমিয়া ভাষাকে বাংলা থেকে স্বতন্ত্র ভাষা রূপে দাঁড় করাবার জন্য বাংলাভাষার এই উপভাষাটিকে ক্রমশ দেশি শব্দ বহুল করে তোলা হচ্ছে। এক সময় মৈথিল, মগহি, ভোজপুরি, উড়িয়া ও অসমিয়া বাংলার সগোত্র ভাষা বলে গণ্য হত। কিন্তু মৈথিল, মগহি ও ভোজপুরিয়ার উপর হিন্দিভাষার প্রভাব দিন দিন বেড়ে যেতে যেতে ভাষাগত উপাদানের তারতম্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে এখন ঐ ভাষা তিনটিকে বাংলার জ্ঞাতিভাষা না বলে হিন্দির উপভাষা বলাই ঠিক। অথচ এক সময় স্বয়ং গ্রিয়ার্সন বলেছেন যে, একমাত্র বাংলার ব্যাকরণের সাহায্যেই ঐ ভাষাগুলিরও কাজ চলে যেতে পারে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভবপর নয়। ঐ ভাষা তিনটি এইভাবে শুধু যে গোষ্ঠী বদল করেছে তা নয়, উপভাষায় পর্যবসিত হয়েছে। অন্যদিকে অসমিয়া উপভাষা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা আয়ত্ত করেছে। বিভিন্ন কালে বেগবতী নদীর মতো পরিবর্তনশীলা ভাষা নানা রূপ ধারণ করে এই ভাবেই। বাংলা গদ্য ভাষার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। (ক্রমশঃ)

ঋণং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্যে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরূহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্তার, গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণং কৃত্বা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্যে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

HVM. 293A-X52 BG

শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-পরিচয়

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় জানে সকল ভক্ত—যে মানে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। তিনি স্বয়ং ভগবান। ভগবান শব্দে কী তত্ত্ব নিহিত তিনি সাকার না নিরাকার, অরূপ না স্বরূপ, কোন বিভূতির প্রতীক গীতার শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি নানা তর্ক তুলেছেন যুগে যুগে জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মতবাদী, দার্শনিক। পথ-হারায় সাধারণ ভক্ত ও ভাবুক সে আলোচনার গোলক ধাঁধায়। কিন্তু গীতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং—এ তত্ত্বে তর্ক নাই, কারণ সে আত্ম-পরিচয় শ্রীমুখে ব্যক্ত।

পরমহংসদেব বলতেন—গাছের ফল খাবে, ফল পেড়ে খাও, তুষ্ট হও তার স্বাদে, গন্ধে, রূপে। বাগানে কটা গাছ আছে, তাদের কী রূপ, প্রতি গাছে কত ফল, কত ফুল, সে অনুসন্ধানে ফলের স্বাদ বাড়ে না, ফল খাওয়ার ভোগের রূপ বদলায়।

সত্যই তো শুনেছিলেন বিল্বমঙ্গল—কৃষ্ণ দেখার ফল কৃষ্ণ-দর্শন। বাংলার প্রবচন বলে—বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

তবে কেন আবশ্যক কৃষ্ণ-পরিচয়ের। অচলা ভক্তি চায়না সে কথা শুনতে। কিন্তু সংসারের নানা টানে ভিন্ন স্রোতে ঘুরে বেড়ায় লোক। তর্ক এবং পরিপ্রশ্ন জ্ঞানের লক্ষণ। বিনষ্ট হয় সংশয়াত্মা। কিন্তু অনন্যভক্তি বিনা তো পরম পুরুষ লভ্য নন্। অনন্যভক্তি কর্মী এবং জ্ঞানীর পক্ষে বহুক্ষেত্রে অর্জন করতে হয় জন্মজন্মান্তরের সাধনায়—যার পথে থাকে সম্যক জ্ঞান, পূর্ণ বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণ বহুবার গীতায় বলেছেন আমাকে ভজনা কর, আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, দর্শন কর সবার মাঝে আমাকে। কে তিনি? তর্ক হয় বন্ধ। সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয় না যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে চিত্তের গভীরে যে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। গাছের সংখ্যা নির্ণয় অনাবশ্যক হয় ফল ভোজনের সৌভাগ্যে।

তাই প্রয়োজন গুরুর স্বরূপ নির্ণয়। শাশ্বত সনাতন গুরুর মুখে ব্যক্ত জীবন মরণের প্রকৃত রহস্য। সমাধান মানতে হয় শ্রীকৃষ্ণকে মানলে। কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান বা ভক্তির রূপ কি তা' জানতে পারা যায় তাদের বর্ণনা হতে। সন্দেহ বন্ধ হয় তত্ত্ব সম্বন্ধে। নিজ নিজ বুদ্ধি স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় পথ, মনে যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে বক্তার ঈশ্বরত্বে।

আত্মা অবিনশ্বর এ তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। স্থিত-প্রজ্ঞা, একাগ্রতা, স্থিরতা, ধীরতা প্রভৃতির সহায়তায় ব্রহ্ম-নির্বাণ-লাভের উপায় বর্ণনা করলেন। এবার সে শিক্ষার মাঝে ভক্তি-তত্ত্বের সঙ্কেত দিলেন। এমন কাজ করব না, এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারে মানব মন। তাতে মনে আসে শূন্যতা। সেই ফাঁকে আবার প্রবেশ করে ভাব, যে নিজে শুদ্ধ নয়। করবনা—কাজ বন্ধ করে। কিন্তু করবার সঙ্কল্প মনের মাঝে নূতন রূপ জাগায়। ভক্তি যদি সেথায় আরাধ্যকে বসিয়ে দেয়—তাঁর নিজ জ্যোতি ভরিয়ে রাখে মন প্রাণ, জ্বলে ওঠে আঁধার-ভরা গৃহ-কোণ। দুঃসহ লাজে মরে কু-প্রবৃত্তি, কারণ সে আঁধার ঘরের অধীশ্বর। তাই স্থিত-প্রজ্ঞের বর্ণনা দিয়ে তিনি বল্লেন—যিনি এইসব বলবান ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ক'রে "মৎপর" হয়ে সমাহিত হন, ইন্দ্রিয়গণ যাঁর বশে তাঁর প্রজ্ঞা সমাহিত।* ইন্দ্রিয়কে সংযত ক'রে রাখে কে? তাদের রাখতে পারে মনের প্রভু-শক্তি। কোন শক্তিমানের শক্তি? সে শক্তি আসে তার যে মৎপর। ইন্দ্রিয়ের দাবীকে বন্ধ করতে পারে স্থির মতি। কিন্তু আর এক দলের অভিযান বন্ধ হয় না মনের ফাঁক বন্ধ না করলে।

মৎপর কেন হবে লোক। দুর্বৃত্ত অসুরও আমিত্বের গর্ব্ব করে। এখন "আমি" বহুবার বল্লেন পার্থ-সারথি বন্ধুর কাছে। বড় বড় তত্ত্ব, মহা মহা ধারণা। তাদের নিয়ে তর্ক চলে। এমন এক তর্কও অর্জ্জুন তুললেন—সন্দেহের প্রশ্ন। মানব মাত্র এ প্রশ্ন করে যখন কেহ শিক্ষা দেয়। কে তুমি যে তোমার কথা মানব।

---

* তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশেহি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।২।৬১

শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন অর্জ্জুনকে যোগের কথা। বল্লেন—যোগ সাধনের সত্য জগতে বহু যুগে বিবৃত হয়েছে। সে বিবৃতির মূলে আসবে শিক্ষা। আমিই শিখায়েছি তত্ত্ব।

তিনি নাম করলেন বিবস্বত, মনু এবং ইক্ষাকুর। সে যোগ বিলুপ্ত হয়েছিল কালের গতিতে। অর্জ্জুন তাঁর ভক্ত, তাঁর সখা। তাই সে লুপ্ত-তত্ত্ব বিবৃত করলেন আবার শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের নিকট।

আবার অর্জ্জুন ভুলে গেলেন তাঁর সখার পরিচয়। অন্ততঃ কুরুক্ষেত্রে একবার "মৎপরঃ" শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই বিবৃতিতে প্রহেলিকার আভাস পেলেন ধনঞ্জয়। ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট বুঝলেন না তিনি—যাঁর চিত্ত তখন মোহ-ঘেরা। ক্ষত্র-কুল-তিলক জাতি ধর্ম্ম উপেক্ষা করে বলেছেন—যুদ্ধ করব না। কুলক্ষয় হবে যুদ্ধে, স্ত্রীজাতির অসম্মান হবে যুদ্ধ শেষে। তিনি প্রশ্ন করলেন—বিবস্বত, মনু, ইক্ষাকু—তাঁরা তো বহু পূর্ব্বে জন্মেছিলেন। সখা তুমি তো মাত্র সেদিন জন্মেছ মথুরায় কংসের কারাগারে। মনুকে তুমি কবে উপদেশ দিলে? তোমার নিকট শিক্ষালাভ করে তাঁরা যোগ শিক্ষা দিলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে? কর্ম্মযোগ? জ্ঞান যোগ?

উত্তরে জীবধর্ম্মের পরিচয় দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বল্লেন—হে পরন্তপ, আমার ও তোমার বহু জন্ম ব্যতীত হয়েছে। আমি সমুদয় জানি। কিন্তু তুমি তা জাননা।

এ উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-পরিচয় হল না। পূর্ব্বজন্ম-বাদ ভারতের প্রাচীন শিক্ষা। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে মানুষ, কিন্তু স্মৃতি জাগে না পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের। তবে এক শ্রেণীর অতি মেধাবী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা জাতিস্মর। শ্রীকৃষ্ণ যে পরিচয় দিলেন তাতে বোঝাগেল তিনি জাতিস্মর। পূর্ব্বজন্মের কথা বিদিত শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুনের মন তখন সূক্ষ্মজ্ঞানবিশিষ্ট নয়। তিনি বিবৃত করলেন অভিব্যক্তির ক্রম। জন্মজন্মান্তর পৃথিবীতে যাতায়াত করে জীব নানারূপে, নানা দেহে, নিজ নিজ কৃত-কর্ম্মের ফলে। নরের মুক্তি হয় উন্নয়নে—নানা যোনি ভ্রমণ করে, পুণ্যের পর পুণ্য সঞ্চয় করে, জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করে অজ্ঞানের বিভিন্ন রূপকে। ক্ষুদ্রত্বকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিরাট আমিত্বকে প্রসার করলে, মহত্বের শিখরে ওঠা যায় নিজের কর্ম্মফলে, আপনার উদ্যমে। আবার পাপ ক'রে পড়তে হয় হীন অবস্থায়। আবার চেষ্টা। হয়তো উন্নয়ন। পতন—অভ্যুত্থান বন্ধুর পন্থা, যুগে যুগে ধাবিত যাত্রী।

এ উত্তরে প্রকাশ পেলে না শ্রীকৃষ্ণ উন্নয়নের ফলে মহাপুরুষ না অবতরণ করেছেন উপর হ'তে—মানব দেহে। তিনি কি সুকৃতির ফলে এমন অবস্থায় পৌচেছেন যেথায় তিনি বল্‌তে পারেন—"তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ" আমি সেই অতীত-জন্মের সমুদয় জানি। তুমি জাননা তোমার অতীতের কথা।

শ্রীকৃষ্ণ যুগের বহু যুগ পরে উদয় হয়েছিলেন ভারত-আকাশে পুণ্য ভাস্বর রাজপুত্র সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহ। তিনি নিজের সাধনার ফলে মনুষ্য জীবন লাভ করে চরম উন্নতির স্তরে পৌচেছিলেন। লাভ করেছিলেন পরমপদ নির্ব্বাণ, হয়েছিলেন ভগবান বুদ্ধ। সম্যসম্বুদ্ধ স্পষ্ট বলেছিলেন পুণ্যের পর পুণ্য সঞ্চয় করে লাভ করা যায় অর্হত্ব। তিনি বলে-ছিলেন তাঁর উন্নয়নের কথা। তিনি জগতে বহু যুগ বহুরূপ পরিগ্রহণ করে লাভ করেছিলেন অর্হত্ব। তিনি বলেননি যে তিনি অবতরণ করেছিলেন। তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর উন্নয়নের বাণী। তবে যুগে যুগে অর্হতের আবির্ভাব হয় ধরায় এ কথা তিনিও ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের অবতার নন্।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সংশয় করলেন দূর, তিনি ব্যক্ত করলেন নিজের রূপ।

"আমি জন্ম-রহিত, অবিনশ্বর, প্রাণী সকলের প্রভু। আমি নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে নিজ মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি।*

এবার তিনি দিলেন আত্ম-পরিচয়।

তিনি অজ জন্ম-রহিত, স্বয়ম্ভু। তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজিত। তিনি তাদের অন্তরে থাকিলেও বাহিরে। ভূতগ্রাম জন্মগ্রহণ করে দেহ বদলায়। অনাদি পরব্রহ্মের আদি অন্ত নাই। তাই তিনি অব্যয়াত্মা—অবিনশ্বর জ্ঞানশক্তি তাঁর। তাঁর আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকালস্থিত, কালাতীত। সে জ্ঞানের বা অস্তিত্বের ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই···

* অজোপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। ৪।৫

সদানন্দ ভজেম। ক্ষয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় মায়া রচিত আধার জীব-জীবনে। কেন হয় জীবের জ্ঞান অপূর্ণ সে কথা তিনি পরে বলেছেন—লীলাময়ী মায়ার কথা। তিনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সারা সৃষ্টির অধীশ্বর। সকলই তাঁহাতে,তিনি সকলের মাঝে। কিন্তু তিনি পূর্ণ—অথচ সকল অপূর্ণতায় অধিষ্ঠিত। পূর্ণ হতে পূর্ণ নিলে পূর্ণ থাকে অবশিষ্ট।

মানুষ তো অপূর্ণ। মানবতা পূর্ণত্ব লাভ করলে তো লীন হয় পরমপূর্ণ পরব্রহ্মে। তাই তিনি রহস্য ভেদ করলেন তাঁর মনুষ্য দেহে অবতরণের।

মায়া ঘিরে পূর্ণকে অপূর্ণ করে। সে মায়াও বাহিরের শক্তি নয়। মায়া তাঁর প্রকৃতি—স্বভাব। তাই বল্লেন ভগবান কেমন করে অসীম তিনি সীমাবদ্ধ হলেন, অরূপ তিনি রূপ গ্রহণ করলেন, পূর্ণ তিনি অপূর্ণতার গণ্ডীর মাঝে প্রবিষ্ট হলেন।

বল্লেন—নিজের প্রকৃতি অবলম্বন করে তিনি নিজের মায়ায় জন্ম গ্রহণ করেছেন।

প্রকৃতি পরব্রহ্মের প্রকৃতি স্বভাব। অভিন্ন পুরুষ ও প্রকৃতি। যিনি পুরুষ তিনি প্রকৃতি—বাক্য ও অর্থের মতো সম্পৃক্ত।

প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন—এ শিক্ষা গীতার। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিভিন্ন শক্তি। পরস্পরের সহায়তায় পঙ্গু এবং অন্ধের সহযোগের মত সম্মিলনে জগতের বিকাশ। সে তত্ত্ব এ আলোচনার বিষয় নয়।

ভগবান বলেছেন আমার নিজের প্রকৃতি অধিষ্ঠান করে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দ্বৈত-ভাবের কথা ওঠেনা।

পরে অর্জ্জুন জানতে চেয়েছিলেন প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সে বর্ণনা আছে। তার সঙ্গে বোঝান হ'য়েছে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের কথা। সে তত্ত্ব সম্যকরূপে জ্ঞানগম্য হ'লে সহজ হবে প্রকৃতি ও পুরুষের বিচার।

মোট কথা তিনি বোঝালেন—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই অনাদি। বিকার সব এবং সকল গুণ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয়, এ-কথা বিদিত হত।*

* প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্। ১৩।২০

সত্ত্ব, রজ, তম—তিন গুণের অঙ্গাঙ্গিক বাঁধন প্রকৃতি। আমি বিভিন্ন প্রবন্ধে সাধ্যমত এসব বিষয় আলোচনা করেছি।

ভগবানের আত্ম পরিচয়ে বোঝা গেল তিনি অবতরণ করেছেন—অবতার, তিনি প্রকৃতিকে সচল করেন। দেহ ধরেন নরের। ত্রিগুণ আশ্রয় করেন জীবের মত। যখন অবতীর্ণ হন,লোক সংগ্রহের জন্য,তিনি মানব-লীলায় আত্ম-প্রকাশ করেন। অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষম্ দেহমাশ্রিতম্—ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করবার উদ্দেশ্য—ভগবানের নরদেহ ধারণ।

প্রত্যেক মানুষ তো সমান নয়। সংসারের বিচারে কেহ জ্ঞানী কেহ জ্ঞানহীন। দেবোপম কারও চরিত্র। কাজে, কথায় ভাবের বিকাশে কারও চরিত্র পশুর সমান। প্রচুর-পার্থক্য দৃষ্ট হয় নরে নরে, অথচ সবার অন্তরে দৃষ্ট হয় একস্রোত, মায়া মমতা, হর্ষবিষাদ, পরার্থপরতা ও স্বার্থ-পরতার। সাধনায় লাভ করে মানুষ সাধুতা, আবার নিজের দোষে পতিত হয় অসাধুতার নিম্নস্তরে। দস্যু হয় সাধু অসুর-প্রকৃতিকে দমনের ফলে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ভিত্তিকরে ব্রহ্মার মুখে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণকে—

প্রাকৃতাপ্রকৃত সৃষ্টে যত জীবরূপ—
তাহার সে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতে বিরাজেন এ কথা বহুস্থলে শুনি গীতায়। দশম অধ্যায়ে শুনি বিভূতির কথা বলেছেন। এক কথায় শেষে বুঝিয়েছেন—হে অর্জ্জুন অধিক কী বলব। আমি এক অংশে পরমাত্মারূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হয়ে অবস্থিত।* একথা প্রকট করেছেন গোস্বামী ঠাকুর—

অনন্ত সৃষ্টিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।

গোবিন্দ নিজের গড়া নিয়ম নিগড়ে নিজেকে বেঁধেছিলেন।

যেমন আপন মায়াতে জগত সৃষ্টি করেছেন ভগবান, তেমনি তিনি নররূপে অবতরণ করে—মানুষকে কর্ত্তব্য পথ দেখিয়েছেন। সেই দর্শিত উচ্চপথে যে ভ্রমণ করে সে

* অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগত। ১০।৪২

বোঝে অবতার লীলার তাৎপর্য্য। কবিরাজ ঠাকুর ইঙ্গিত দিয়েছেন—

আপনি করিমু ভাবভক্তী অঙ্গসারে—
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে।

আত্ম-পরিচয়ের এই কারণ। একবার তাঁকে অবতার-রূপে মেনে নিলে আর অবকাশ থাকে না তাঁর শিক্ষা সত্য কি মিথ্যা—বিচারের। তিনি প্রকাশ করবেন তাঁকে। শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত স্পষ্টই শিখিয়েছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর।

আরও বলেছেন কবিরাজ মহাপ্রভুর মুখে—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন—
অবরজ্ঞানতত্ব—ব্রজে ব্রজান্দ্র-নন্দন
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ—গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম।
জ্ঞান যোগ ভক্তি এই তিন সাধনের বতে
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেমন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

রমণী সম্বন্ধে মনু

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনেকে বলেন যে হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রী-বিয়োগ হইলেও পুরুষকে পুনরায় বিবাহ করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে বিধবাকে পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, ইহা হইতে বোঝা যায় যে হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্র-কার নারীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। কিন্তু সকল শাস্ত্রবাক্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নারীর প্রতি শাস্ত্রকারের কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। মনু বলিয়াছেন—যেখানে নারীদের পূজা হয় সেখানে দেবতারা আনন্দিত হন, যেখানে নারীদের পূজা হয় না, সেখানে সকল কার্য্য নিষ্ফল হয়।

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মনুসংহিতা ৩।৫৬

মনু একথা বলিলেন না যে যেখানে পুরুষদের পূজা হয় সেখানে দেবতারা আনন্দিত হন। সম্পর্কে ছোট হইলেও নারীকে পূজা করিতে বলা হইয়াছে। পিতা কন্তাকে পূজা করিবে, স্বামী স্ত্রীকে পূজা করিবে, ভ্রাতা ভগিনীকে পূজা করিবে, দেবর ভ্রাতৃবধূকে পূজা করিবে,

পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ॥

মনুসংহিতা—৩।৫৫

যেমন পূজার প্রতিমাকে বসন-ভূষণ দিয়া সাজাইতে হয়, সেইরূপ কন্তা, ভগিনী, পত্নী, ভ্রাতৃজায়ারূপ দেবীদিগকে বসন ভূষণ দ্বারা সাজাইতে হইবে, ইহাই মনুর বিধান।

আর যদি পূজা না করিয়া নারীকে নিগ্রহ করা হয়, তাহার কি ফল হয়? মনু বলিয়াছেন, যেখানে নারীদের দুঃখ দেওয়া হয়, নারীরা শোক করে, সে বংশ বিনষ্ট হয়, যেখানে তাহারা আনন্দের সহিত কালযাপন করে সে বংশের উন্নতি হয়,

শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলং
ন শোচন্তি তু যত্রৈতাঃ বর্দ্ধতে তদ্ধিসর্ব্বদা॥

মনু—৩।৫৭

অবলা রমণীর প্রতি এই যে দরদ দেখান হইল, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিলে তাহা হইত না।

মনু বলিয়াছেন যে মাতার গৌরব পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক।

সহস্রং তু পিতৃন্ মাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে

মনু—২।১৪৫

যদি নারীর প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিত তাহা হইলে মনু বলিতেন যে মাতা অপেক্ষা পিতার গৌরব বেশী। কোনও ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর যদি তাহার পিতার সহিত দেখা হয়, তা হইলে সে সন্ন্যাসী পিতাকে প্রণাম করিবে না, কিন্তু মাতার সহিত দেখা হইলে মাতাকে অবশ্য প্রণাম করিবে, কারণ মাতার প্রতি ঋণ কখনও শোধ হয় না। ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের বিধান, সুতরাং ইহা কিরূপে বলা যায় যে হিন্দু শাস্ত্রকার নারীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন?

পুনরায় মনু বলিয়াছেন "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোস্তি কশ্চন"

(মনুসংহিতা ৯।২৬)। অর্থাৎ গৃহে স্ত্রী ও শ্রী (লক্ষ্মী)র মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত "দেবী মাহাত্ম্য" বা চণ্ডীতে দেবগণ জগদীশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" ৩।১১।৫

অর্থাৎ জগজ্জননী সকল নারীদেহ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। দুর্গাপূজার সময় এবং তীর্থক্ষেত্রে কুমারীপূজা করা হয়। সুতরাং শাস্ত্রীয় উপদেশ সকল বাস্তবজীবনে প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থাও আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি নারীর প্রতি বিদ্বেষভাব না থাকিবে তাহা হইলে বিধবা বিবাহের নিষেধ করা হইয়াছে কেন? মনু কেন বলিয়াছেন,

"নারী পবিত্র ফলমূলপুষ্প ভোজন করিয়া দেহ ক্ষীণ করিবে, কিন্তু পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না?"

কামং তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ
নতু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্তু"

মনু ৫।১৫৭

ইহার কারণ এই যে ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন যে বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট হয়। কোন্ কার্য্যের কি ফল হয় তাহা সকলে সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় কর্মফল ইহজীবনে আত্মপ্রকাশ না করিয়া মৃত্যুর পর আত্মপ্রকাশ করে। পূর্বে সে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হইয়াছে যে নারীর প্রতি বিদ্বেষ ইহার কারণ হইতে পারে না, অকারণে নারীদিগকে কষ্ট দিবার জন্য এই ব্যবস্থা রচনা করা হয় নাই। সাধারণ মানবও ভগিনী বা কন্যাকে দুঃখী দেখিলে দুঃখিত হয়, অকারণে তাহাদিগকে ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেয় না। ঋষিগণের এই সহজ ও স্বাভাবিক স্নেহের ভাব দিল না। তাঁহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন ইহা কখনও হইতে পারে না। বিশেষতঃ মনু সকলপ্রাণীর মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের মধ্যে সকল প্রাণীকে দর্শন করিয়াছিলেন—

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি (মনু ১২।৯১)—

তিনি কখনও কাহারো বিষয়ে এইরূপ অনাবশ্যক কঠোর ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এই কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন বুঝিয়াই তিনি করিয়াছিলেন।

ইহাও মনে করা ভুল হইবে যে মনু সংহিতাতে যে সকল ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে সে সকল মনুর নিজের বুদ্ধি বা কল্পনা অনুযায়ী। মনু যাহার জন্য যাহা ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন সে সকলই বেদ মূলক। একথা মনুসংহিতাতে বলা হইয়াছে—

সঃ কশ্চিৎকস্যচিদ্ধর্মো মনুনাপরিকীর্ত্তিতঃ
স সর্বোভিহিতো বেদে—

(মনু ২—৭)

অনেক ক্ষেত্রেই মনুসংহিতার ব্যবস্থার সমর্থক বেদবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল স্থলে পাওয়া যায় না, সে সকল স্থলে বুঝিতে হইবে যে কালপ্রবাহে বেদের অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, যে সকল অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই সকল ব্যবস্থার সমর্থক বেদবাক্য ছিল। কারণ মুক্তিকোপনিষৎ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে বেদের সহস্রাধিক শাখার উল্লেখ আছে, এক্ষণে মাত্র কয়েকটি (১০।১২ টি) শাখা পাওয়া যায়। এই সকল বেদের বিলুপ্ত অংশকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, "শ্রুতিঃ দ্বিবিধা লৌকিকী তান্ত্রিকী চ" (মনুসংহিতা ২।১, কুল্লুক ভট্ট প্রণীত টীকায় উদ্ধৃত হারীত বাক্য) —বেদ দুই প্রকার—লৌকিক, (যাহা দেখিতে পাওয়া যায়) এবং তান্ত্রিক, (যাহার অস্তিত্ব অন্য শাস্ত্র গ্রন্থ উল্লিখিত বাক্য হইতে অনুমান করিতে হয়) সেই সকল শাস্ত্রবাক্যের সমর্থক বেদবাক্য অবশ্য এককালে বিদ্যমান ছিল।

মনু যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন সে সকল ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া বেদ বলিয়াছেন

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজং

অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। বেদে চারিস্থলে এই বাক্য পাওয়া যায়—কাঠক সংহিতা ১১।৫, মৈত্রায়ণীয় সংহিতা ১১।১।৫, তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২, এবং তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ ২৩।১৬।৭। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে মনু পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে যে মনু বিধবাকে পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ইহার কারণ এই যে স্ত্রীজাতির প্রতি মনুর বিদ্বেষভাব ছিল। বিধবাকে যেভাবে জীবন যাপন করিতে বলা হইয়াছে তাহা আপাততঃ কর্কশ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু মনু কেন এই প্রকার কর্কশ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার প্রকৃত কারণ পাওয়া যাইবে বেদ মনুর বিধান সম্বন্ধে যে "ভেষজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ঐ শব্দের মধ্যে। চিকিৎসক রোগীর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন তাহা অনেক সময় কর্কশ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে রোগীর প্রতি চিকিৎসকের বিদ্বেষভাব আছে এবং সেজন্য যদিও রোগের যন্ত্রণায় রোগী অস্থির তথাপি তাহার উপর চিকিৎসক তাহাকে তিক্ত ঔষধ বা কষ্টকর ইঞ্জেকশন দিয়াছেন। রোগের কারণ দূর করিবার জন্য এই সকল কষ্টকর ঔষধ প্রয়োজন বলিয়াই চিকিৎসক এইরূপ ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ পূর্ব্বজন্মের যে পাপের ফলে রমণী বৈধব্য প্রাপ্ত হয়, সেই পাপের ফল শীঘ্র এবং সম্পূর্ণভাবে দূর করিবার জন্য মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন যে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ইহজীবনে হয়ত তাহার সুখ কম হইবে, কিন্তু মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন সেই জীবন তাহার সুখময় হইবে।

মনু রমণীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন এই উক্তির সমর্থনে মনুসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক ও উদ্ধৃত করা হয়।

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥

মনু ৯।১৪

"এই সকল স্ত্রীলোক রূপ পরীক্ষা করে না, বয়স পরীক্ষা করে না, সুরূপ হউক বা বিরূপ হউক, পুরুষ বলিয়াই ভোগ করে।" বলা বাহুল্য দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক সম্পর্কে ইহা বলা হইয়াছে। সকল স্ত্রীর এইরূপ স্বভাব, ইহা বলা মনুর অভিপ্রায় হইতেই পারে না। সকল স্ত্রীর এইরূপ স্বভাব হইলে সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতিরও এরূপ স্বভাব বলিতে হয়। তাঁহাদের যে এরূপ স্বভাব ছিল না রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি তাহার সাক্ষী। এজন্য এরূপ মনুর অভিপ্রায় হইতে পারে না যে সকল স্ত্রীলোকের এইরূপ স্বভাব। মনুর উদ্দেশ্য এই যে দুশ্চরিত্র স্ত্রী লোকের ইহা স্বভাব। মনু যে দুশ্চরিত্র স্ত্রী-লোকে সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বের শ্লোক দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়। ইহার ঠিক পূর্ব্বের শ্লোকে মনু বলিয়াছেন কি কি কারণে স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট হয়।

পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্॥

মনু ৯।১৩

"মদ্যপান, দুষ্টলোকের সংসর্গ, স্বামীর নিকটে না থাকা, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকাল নিদ্রা ও অন্যের গৃহে বাস, এই ছয় কারণে স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট হয়।"

তাহার পরের শ্লোকে (পূর্ব্বোদ্ধৃত ৯।১৪ শ্লোকে) মনু বলিয়াছেন, যে স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট হয় সে কিরূপ ব্যবহার করে।

মনুর প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা জানিতে হইলে মনু যে দুই প্রকার কথা বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩।৫৫ ও ৫৬ শ্লোকে মনু বলিয়াছেন যে নারীদিগকে পূজা করা উচিত। ৯।১৪ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে স্ত্রালোক ব্যভিচার করে ইহা কখনই মনুর অভিপ্রায় হইতে পারে না। মনুর উদ্দেশ্য এই যে, দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকগণ ব্যভিচার করে এবং সচ্চরিত্র স্ত্রীলোককে পূজা করা উচিত। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে উভয় বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয় এবং উভয় বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়।

আর্য্য ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে রমণীগণ কেবলমাত্র পাতিব্রত্য ধর্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অন্য কোনও সাধনার প্রয়োজন নাই। পাতিব্রত্য ধর্মের অর্থ স্বামীকে দেবতারূপে পূজা করা, যাহাকে দেবতারূপে পূজা করিতে হইবে তাহার দোষ দেখিলে চলিবে না। এজন্য মনু বলিয়াছেন যে স্বামী যদি চরিত্রহীন হয়, কামুক হয়, গুণহীন হয় তথাপি সাধ্বী স্ত্রী-তাহাকে দেবতার ন্যায় সেবা করিবে।

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্বা সততং দেববৎ পতিঃ॥

মনু ৫।১৫৪

বাল্মীকি আরও বেশী করিয়া বলিয়াছেন যে স্বামী যদি দুষ্ট স্বভাব-যুক্ত, কামুক এবং ধনহীন হয়, তথাপি আর্য্য-স্বভাবযুক্ত স্ত্রীর নিকট সেই স্বামীই পরম দেবতা।

দুঃশীলো কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
স্ত্রী-ণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥

অযোধ্যা কাণ্ড ১১৭।২৪

বাল্মীকি অনুসূয়ার মুখ দিয়া ইহা বলিয়াছেন এবং সীতাদেবীর দ্বারা ইহা সমর্থন করাইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ-পরমহংস বলিয়াছেন যে ইহাও ঈশ্বর-লাভের একটা উপায়। "যদি একটা পাথরকে পূজা কোরে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটা মানুষকে পূজা কোরে পাওয়া যাবে না কেন?"

সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে এই সাধনপথ গ্রহণ করা বেশী দুরূহ হয় না, বরং প্রীতিপ্রদ হয়। এজন্য ব্যাসদেব বলিয়াছেন,

"স্ত্রিয়ো ধন্যাঃ" (বিষ্ণুপুরাণ)
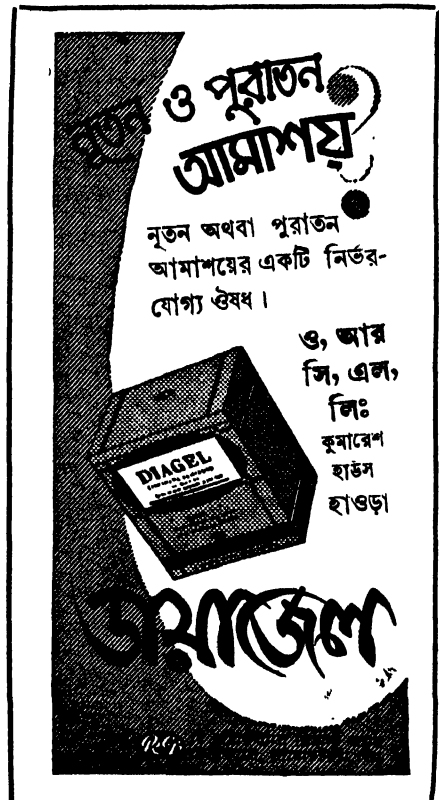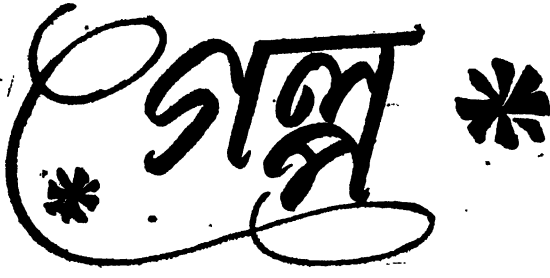
বান্ধবী

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

পাকুর্লার গার্ডেন রিচ রোডের অতি জীর্ণ একটা বাড়ীতে বাস করে ওয়াদা। জাপানী যুবক। বয়স বছর কুড়ির কাছাকাছি। গার্ডেন রিচের কোন এক কারখানায় সে মেকানিকের কাজ করে। মাতৃভাষা ছাড়া অল্প-স্বল্প ইংরেজিও সে জানে।

চেহারা তার খাঁটি জাপানী ধরণেরই। কিন্তু মাথায় সে লম্বা চুল রাখে এবং সাধারণ জাপানীদের তুলনায় সে তার নৈশ বেশ-ভূষায় বেশ খানিকটা পারিপাট্যের পরিচয় দেয়। মদ তার অতি প্রিয় বস্তু। দিনে রাতে তেষ্টা পেলে সে বিয়ার দিয়ে তা নিবারণ করে। কঠিন পরিশ্রমে অর্জিত পয়সার একটি কপর্দকও কোন মাসে তার অবশিষ্ট থাকে না।

ওয়াদার আপন বলতে কেউ নেই এ পৃথিবীতে। অন্ততঃ সে নিজের কাউকেই তেমন জানে না। মা-বাবাকে সে হারিয়েছে জার্মানীর সংগে যুদ্ধের সময়। তাঁদের কথা তার ভাল করে মনেও নেই। তখন সে নিতান্তই শিশু ছিল। জন্মস্থান তার ফরমোসার কোন এক গ্রামে। টোকিও থেকে জাহাজে সুপারকারগোর চাকরি নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে তার বিগত কয়েক বছর কেটেছে বেশ আনন্দে।

সুঠাম দেহটি তার যে-কোন মানুষের চোখে পড়ার মত। দীর্ঘ অবয়বে শক্তি তার যথেষ্ট। বেপরোয়া জীবনযাপনেই তার আনন্দ। জীবনে স্থিতি অপেক্ষা গতিই তার কাম্য। বড্ড বদমেজাজী মানুষ।

প্রায় বছর খানেক আগেকার কথা। সিঙ্গাপুরে তখন তাদের জাহাজ নোঙর করেছে। রাত্তিরে একদিন মাল-ওঠা-নামার তত্ত্বাবধান করবার সময় কথা কাটাকাটি হয়ে জাহাজের চীফ্ অফিসারকে বেশ দু'ঘা মেরে বসল। তাতে তার শাস্তি হল ক্যাপ্টেনের হাতে—এক বছরের জন্যে সাসপেন্সন্, এবং চীফ্ অফিসারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। এই দু'টো শাস্তির কোনটাই সে মেনে নেয়নি। তাই পালিয়ে গেল জাহাজ ছেড়ে সিঙ্গাপুরের শহরের মিছিলে। গা ঢাকা দিল দিন-পনেরোর জন্যে একটি জাপানী মেয়ের আশ্রয়ে।

ইয়োসিকো। সে-ও ওয়াদার মত নাম-গোত্রহীন কোন জাপানী-কুলের মেয়ে। তার জন্মইতিহাস সে জানে না। ওয়াদার সংগে আলাপ, পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হল তার অনতিকাল মধ্যেই। এ পৃথিবীতে ওয়াদার মত আপন বলতে তারও কেউ নেই। সে-ও যেন স্রোতে ভাসতে ভাসতে জাপান ছেড়ে সিঙ্গাপুরে এসে বাস করছে বছর তিনেক ধরে। জাপানী এক জাহাজী অফিসারের সংগে সে নাম ভাড়িয়ে পাসপোর্ট বের করে সিঙ্গাপুরে এসেছিল! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সে-অফিসারটি মারা যায়। ইয়োসিকো তখন নিরুপায় হয়ে ব্যবসায় নামে। আঠের বছরের যুবতী ইয়োসিকোর পয়সার অভাব দু'চারদিনেই মিটে গেল।

ইয়োসিকো ব্যবসা করলেও আছে তার নারী-সুলভ কোমল মন। ওয়াদাকে সেবা-যত্নের সে কোন ত্রুটিই রাখে নি সেই কয়েক মাসের মধ্যে। ওয়াদার বলিষ্ঠ দৈহিক গঠন ও সুপুরুষসুলভ ব্যক্তিত্ব তাকে মুগ্ধ করেছিল হয়তো। তাই যখনই কোন জাহাজী অফিসার এসেছে তার সুসজ্জিত ঘরে তার কিছুক্ষণের সৌখীন সময় নির্বিরোধ বশ্যতা ক্রয় করবার জন্যে, তখনই সে ওয়াদাকে লুকিয়ে রেখেছে অন্য কোন ঘরে, কিংবা তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে পেছনের দরজা দিয়ে। কারণ কোন জাহাজী অফিসারকেই সে ওয়াদাকে চিনবার সুযোগ দিতে চায় নি।

ইয়োসিকো সত্যিই বড় মিষ্টি মেয়ে। হোক্-না সে পণ্যা, তবু ওয়াদার সংগে সে কোনদিনই কোন কুশ্রী
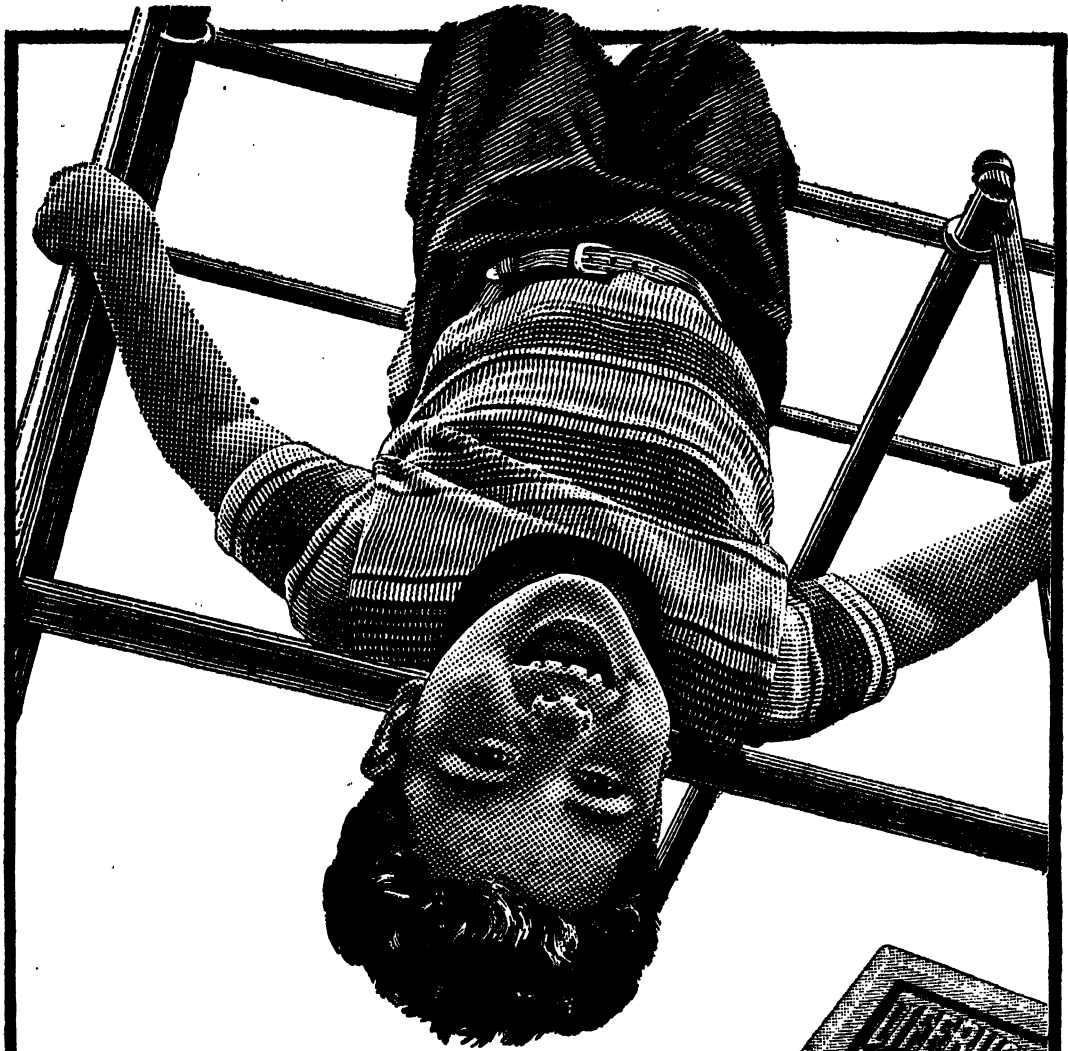
সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
—এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে-দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
ভারতে প্রস্তুত

ব্যবহার করে নি। সে যেন ছিল তার বান্ধবী। শুধু বান্ধবীই। ওয়াদার মনেও তার প্রতি কোনরকম অসংযত কামনার উদ্রেক হয় নি, সে পণ্যা, একথা জেনেও। ইয়োসিকোর যত্ন, আদর ও সাহায্যের জন্যে সে মাঝে মাঝে নিজের মনে কিছুটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। কলকাতার খিদিরপুর এলাকার অতি জীর্ণ বাড়ীটার জীর্ণতর ইঁট-কাঠের দিকে তাকিয়ে কোন কোন নির্জন দুপুর কিংবা হাল্‌কা সকালে আজ প্রায় বছর খানেক পরে ওয়াদার মনে পড়ে ইয়োসিকোর কথা। কতবার সে ভেবেছে যে, সে ফিরে যাবে সিঙ্গাপুরে অন্ততঃ একবারের জন্যেও। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবে ইয়োসিকোকে তার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও মধুর ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু যেতে পারে নি। কলকাতার বুকে নিবিড় করে তাকে আঁকড়ে ধরেছে গার্ডেন রিচের কারখানা, আর লিণ্ডসে স্ট্রীটের এক হোসিয়ারী দোকানের এ্যাংলো-বার্মিজ সেল্‌স্‌-গার্ল জেনেভা। জেনেভার সংগে সপ্তাহে একটা সিনেমা ও একবার হোটেলে খাওয়া, আর তা'ছাড়া কখনো কখনো খিদিরপুরের সস্তা বস্তিতে রাত কাটিয়ে আর প্রচুর পরিমাণে দেশী মদ গিলে জীবনটা ওয়াদার একটানা কাটছে। তার মাঝে মাত্র কয়েকদিন আগেও তার মনে পড়েছিল গভীরভাবে ইয়োসিকোর একটি মধুর স্মৃতি। কত যত্ন করেই-না সে একদিন রাত্তিরে তাকে খাওয়াতে বসেছিল তার টেবিলের সামনে!

এমন করলে তোমার এ জোয়ান শরীর, ওয়াদা, দু'দিনেই ভেংগে পড়বে। লক্ষীটি, আর খানিকটা ওভাল্‌টিন খাও! আর দু'পিস্‌ রুটি—

ইয়োসিকোর নিজের কলংক-উপার্জিত অর্থে কেনা ওভাল্‌টিন বা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। তবু একটি কড়িও সে ওয়াদার কাছে কখনো চায় নি তার থাওয়া-থাকা ইত্যাদির জন্যে। সে-কথা ভেবে ওয়াদার মত কঠিন হৃদয় মানুষেরও নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তার মনে পড়ে, ইয়োসিকোরই অনুরোধে তার অতিথি একজন অস্থায়ী সারেং-এর পদে নিযুক্ত করে ভারতে নিয়ে আসে। ইয়োসিকো বার বার করে তাকে অনুরোধ করেছিল যে, ভারতে আস্তানা পেতে সে যেন তাকে তার ঠিকানা জানিয়ে একখানা চিঠি লেখে। কিন্তু ওয়াদা তা-ও করে নি। ওয়াদার আরো মনে পড়ে, সে যখন জাহাজে এসে উঠল ভারতে আসবার জন্যে—সারেং-এর পোষাক তখন তার পরিধানে। ইয়োসিকো ডকে পৌছে দিতে এসে তার সংগে অতি আন্তরিকতার সংগে করমর্দন করল। তখনও দিনের আলোয় ওয়াদা স্পষ্ট দেখেছিল ইয়োসিকোর দু'টো চোখের কোণই ছলছল করে উঠতে। তার কারণ ওয়াদা তখন খুব ভাল করে বুঝতে পারে নি। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে যে, ইয়োসিকো হয়তো একটু দুঃখ পেয়েছিল তার চলে আসার জন্যে। মন বা হৃদয় বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াদার কখনো কোন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয় নি। এ পৃথিবীতে দয়া, মায়া, স্নেহ বা প্রেম বলে যে কোন বস্তু থাকতে পারে, ওয়াদার তা জানবার কথাও নয়। পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়-বন্ধুবিবর্জিত সামাজিক জীবনের বহির্গত বন্ধনহীন অশান্ত জীবন তার। ইয়োসিকোই হয়তো তার মনে কিঞ্চিৎ নাড়া দিতে পেরেছে এই সর্বপ্রথম, সে-ই তাকে হৃদয়ের কোমল বৃত্তির সূক্ষ্ম স্পর্শ এই সর্বপ্রথম অনুভব করতে শেখাল। ওয়াদা তার ছন্নছাড়া জীবনে এই সর্বপ্রথম ক্ষণিকের জন্য হলেও ভাবছে অন্য কোন মানুষের জন্যে। সারা পৃথিবীকে ইদানীং যখন তার শূন্য ও বিস্বাদময় মনে হয়, তখন নিজের অজ্ঞাতেই একটা অতি সূক্ষ্ম ও প্রীতিকর স্মৃতির মত তার মনে উদিত হয় ইয়োসিকোর কথা।

ওয়াদা তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের এত ঋণ-দারিদ্র্যের মধ্যেও একরকম সহসাই ইয়োসিকোর নামে ডাকযোগে সাড়ে পাঁচ ডলার পাঠিয়ে দিল তার সেবা-যত্নের কৃতজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ। এ অর্থ সে সংগ্রহ করল তার কারখানার সহকর্মীর কাছ থেকে ধার করে। কিন্তু অচিরেই সে-টাকা ফেরৎ এল। সংগে ডাকযোগে ছোট্ট একখানা চিঠি:

প্রিয়তম ওয়াদা,

তোমার বন্ধুত্বের অমর্যাদা তুমি করেছ টাকা পাঠিয়ে। বড় দুঃখ পেলাম। ইতি—

তোমার ইয়োসিকো।

এই সামান্য ও অতি সাধারণ চিঠিখানা ও ফেরৎ টাকা একই সংগে ওয়াদা পেল সন্ধ্যের কিছু আগে তার জীর্ণ

ভাড়াটে বাড়ীর দীনতম ঘরে বসে। তার ভীষণ রাগ হল ইয়োসিকোর দাম্ভিকতার কথা ভেবে। দূর্ তেরি ছাই, টাকা না নিলে তো বয়েই গেল! এই রকম মনোভাব নিয়ে ফেরৎ-আসা টাকা ক'টা পকেটে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। সে-রাত্রে সে খুব মদ খেল। শুধু তাই নয়, জেনেভার সংগে প্রায় সারা রাত হোটেলে কাটিয়ে ভোর রাত্তিরে বাড়ীতে ফিরে অসাড় হয়ে শুয়ে ঘুমোতে লাগল।

এই কিছুদিনের মধ্যেই ওয়াদার অমন সুঠাম দেহটির সুগঠন নষ্ট হয়ে ভেংগে পড়েছে। উচ্ছৃঙ্খলতায় ও শারীরিক অত্যাচারে তার চোখ দু'টো কোটরগত হয়েছে, গালের চোয়ালের মাংস শুকোতে সুরু করেছে, মুখখানা লম্বাটে হয়ে বিশ্রী দেখাচ্ছে তাকে। ভগ্নপ্রায় দেহটা নির্জীবের মত এলিয়ে রয়েছে মলিন শয্যার ওপর। ইয়োসিকো ওয়াদার খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখল ওয়াদার এই চেহারা ভোরের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে। তখনও ওয়াদা অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। ইয়োসিকোর মনে বড় আঘাত লাগল। বিচলিত হৃদয়ে সে ওয়াদার ঘুম ভাংগাবার জন্যে তার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু সহসা তার নজরে পড়ল ঘরের কোণে সস্তা একটা প্যাকিং বাক্সকে ওয়াদা টেবিল বানিয়ে খুচরো জিনিষপত্র অগোছালোভাবে রেখেছে তার ওপর। আর সেই অভিনব টেবিলের ওপরই তার সিগারেটের টিন, বিয়ারের বোতল, সেভিং সেট্ ইত্যাদির পাশে একটা অল্পদামী ফটোফ্রেমে বাঁধানো মধ্যবয়স্কা ও সাধারণ চেহারার একটি মেয়ের ফটো। ইয়োসিকো পিছিয়ে এল দরজার চৌকাঠের ওপর। সে জানে না যে ওটা জেনেভার ফটো। জেনেভার সংগে ওয়াদার কি ধরণের সম্পর্ক, তা-ও সে জানে না। তবু সে বেরিয়ে গেল হন্ হন্ করে ওয়াদার ঘর থেকে সেই অপ্রীতিকর ভোরের আলোয়। সিঙ্গাপুর থেকে সে বড় আশা নিয়ে তার ব্যবসার পাট তুলে দিয়ে এসেছিল কলকাতায় ওয়াদার কাছে তার ঠিকানার সন্ধান পেয়ে। কিন্তু তার সব ভাবনা কেমন যেন ওলোট্-পালোট্ হয়ে গেল এক নিমেষে। তবু সিঙ্গাপুরে সে আর ফিরবে না। কলকাতায় আবার নতুন করে ব্যবসা পাত্‌বে কিনা, সেই কথাই সে ভাব্‌ছিল ট্যাক্সিতে তার সুশ্রী দেহটাকে সম্পূর্ণভাবে এলিয়ে দিয়ে। ময়দানের প্রশস্ত পথে এসে ইয়োসিকো বোধ হয় প্রথম দীর্ঘশ্বাস ফেলল এতক্ষণ পরে।

অপ্রসন্ন সকালটাকে তার মনে হতে লাগল বড় ভারাক্রান্ত, বড় বিস্বাদময়।

ইয়োসিকো পারল না ধৈর্য ধরে ওয়াদার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। সিঙ্গাপুর থেকে যে উদ্দাম মন নিয়ে সে কলকাতায় এসেছে, হোটেলে ফিরে সে-মন তাকে সারাটা দিন এক অসহ্য দাহনে দগ্ধ করেছে। তাই সন্ধ্যে হয়ে এলে সে সুসজ্জিতা হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে খিদিরপুরে ওয়াদার ঘরে এল। ওয়াদা তখন তার সান্ধ্য-পোষাক পরে দেয়ালে টাঙান সস্তা ছোট্ট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। নিঃশব্দে ইয়োসিকো গিয়ে দাঁড়াল জেনেভার ফটোটার সামনে। ফটোটার দিকে তাকিয়ে তার ভীষণ ঈর্ষা হচ্ছিল।

সহসা ওয়াদা পেছন ফিরে দেখতে পেল ইয়োসিকোকে। অস্বাভাবিক মানসিক উচ্ছ্বাসে সে ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরল নিজের হাতের মুঠোয়।

: তুমি এখানে কেমন করে এলে, ইয়োসিকো?

: কেমন করে এলাম, জানি না। তবে এসেছি তোমার জন্যে। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার, ওয়াদা? তোমাকে যে একেবারে চেনা যায় না? কে তোমার এত বড় সর্বনাশ করেছে?

ইয়োসিকো দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকাল একবার জেনেভার ফটোটার দিকে, আর একবার ওয়াদার মুখের দিকে। তারপর ইয়োসিকো যা করল, তা ছিল ওয়াদার স্বপ্নেরও অতীত। ইয়োসিকো হাতে তুলে নিল জেনেভার ফটোখানা। সে তার হাতখানাকে যথাসম্ভব উর্ধ্বে তুলে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলল ছবির ফ্রেমখানাকে। তারপর ফটোখানা বের করে এনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিল মেঝের ওপর।

আশ্চর্য! ওয়াদা তাতে একটি কথা বলল না। একটুও বিচলিত হল না। শুধু মৃদু হেসে ইয়োসিকোর কাঁধে হাত রেখে বলল: সিনেমায় যাব বলে পোষাক পরছিলাম। চল, মেট্রোতে দু'জনে যাই। মরুক্-গে

জেনেভা রিগাল্যের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। তার পর কোন হোটেল থেকে নৈশ-খাওয়া সেরে একেবারে বাড়ী ফিরব।

: কিন্তু তুমি বেশী গিলতে পারবে না, এই সর্তে যেতে পারি। ফেরার পথে হোটেল থেকে আমার জিনিষপত্র-গুলো এখানে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু শোন, ওয়াদা, কালই তুমি একটা ভাল বাড়ী দেখ। এমন বিশ্রী বাড়ীতে আমি কিন্তু থাকতে পারব না।

ওয়াদা প্রথমটাতে একটু অবাক হল। তারপর ঘাড়টা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ইয়োসিকোর চোখের দিকে নির্ভরশীল দৃষ্টি ফেলে বলল: উঃ, কতদিন তোমায় দেখি নি বল তো?

ওয়াদার ওপর আপন শাসন ও অধিকার চালিয়ে ইয়োসিকোও মনে মনে কম খুসী হয় নি। সে হাসতে হাসতে বলল: কিন্তু, মনে রেখ, আমি শুধু তোমার বান্ধবী হয়েই থাকতে এসেছি। তার বেশী কিছু আশা কর না, লক্ষ্মীটি। তার বেশী কিছু তোমাকে দেবারও আমার নেই।

একটি মধুর রাত্রি ঘনিয়ে এল ওদের দু'টিকে ঘিরে একটু একটু যেন কয়েকটি মিষ্টি মুহূর্তকে তার আঁচলে বেঁধে নিয়ে।

অপ্রাপ্তাসু

প্রশান্ত মিত্র

তোমার কৌমার্য্য মাঝে সৌকুমার্য্য দেখেছিনু কবে
মুগ্ধ হ'য়ে ভালোবেসে, হায় সেটা কতদিন হ'বে!
প্রহর চঞ্চল কত মনোরমা আজো তা' ভুলি নি',
অন্য কোনো নারী মাঝে সে সৌন্দর্য্য কথনো খুঁজিনি।
কত কে আসিয়াছিল হৃদয়ের একান্ত সমীপে,
জ্বেলে গেছে মায়াময়, ছায়াময় আরতি প্রদীপে,
সেই কল-অঞ্জলিতে দিই নাই কোনোদিন সাড়া,
প্রাণের মন্দিরে মোর দেয়নি তো তারা কোনো নাড়া।

শুধু মোর অন্তরের রূপ-ধরা বিষণ্ণ নয়ন,
অতীত তোমার পানে চেয়ে রচি যে স্নিগ্ধ স্বপন,
তা'র স্পৃহা পরিপূর্ণ অন্তরের সীমান্ত আমার—
দিয়ে গেছো মোরে তুমি মেঘম্লান অনন্ত আঁধার।
সে আঁধারে আলো খুঁজি বেদনার সান্ত্বনা নির্ঝর।
মায়ের স্নেহের মত অবিনাশী পথিক উত্তর—

সর্ব্বকালে পরিব্যাপ্ত সর্ব্বদেশে পথসঞ্চারী
তোমারি সে প্রতিধ্বনি হে অপ্রাপ্তা নেপথ্যের নারী।
তুমি চলে গেছো জানি আর মানি তোমার প্রেরণা,
তোমার চোখের আলো মধুক্ষরা বাণীর সে কণা,
এই কালান্তরে যেন সবেমাত্র দিয়েছে পরশ
মৃত্যুময় পৃথিবীতে একি সখি সামান্য হরষ!
বিচিত্র বিহানবেলা এই শক্তি আনন্দরূপিনী
দূর কোনো পথে চলো আর কারো শুভা সীমন্তিনী।

আর কারো তুমি আছ, তবু কি আমার তুমি নহ?
কেবলি কি নিঃসম্পর্কে অনধিকারের মাঝে দহ,
এ-ও এক আত্মীয়তা, সমাজের পক্ষপাতী ধারা
বুঝি অপহরিয়াছে ইহার সম্মান মূল্য তারা,
আপন দৃষ্টির কোণে ভুলিয়াছে অন্য দৃষ্টি প্রীতি
দেয় নাই সঙ্গত বিচার; বুদ্ধি তৌলে ইতি

ক'রে গেছে সব—খোঁজে নাই আরো অন্তরাল
সুন্দরতরের মাঝে বিভাসিত রবিরশ্মিজাল!

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

বিজ্ঞানী ডাঃ আইনষ্টাইন এক সময় বলিয়াছিলেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি হয়, তাহা হইলে চতুর্থ মহাযুদ্ধে শুধু গদা ব্যবহৃত হইবে। অর্থাৎ তৃতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হইবে; ধরাবক্ষে মানুষের জীবনযাত্রা আবার আরম্ভ হইবে প্রস্তরযুগ হইতে। তৃতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এই বিধ্বংসী অস্ত্র নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতার কথা সাধারণ মানুষ তাহার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ভুলিয়া থাকে। সময় সময় আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে আলোচনা তাহাকে এই ভয়াবহ আয়োজন ও তাহার ভয়াবহ পরিণতির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। বৃটেনে প্রস্তুত হাইড্রোজন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ গত এপ্রিল মাসে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতিকে আবার বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, তাহাদের পায়ের নীচে ভীষণ আগ্নেয়গিরি ধূমায়িত হইতেছে; যে কোনও সময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মানুষের শত সহস্র বৎসরের সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। এই সম্পর্কে একটি বিষয় এবার নূতন করিয়া উপলব্ধ হইয়াছে: এটম্ বোমা ও হাইড্রোজন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে বিশ্বযুদ্ধে চূড়ান্তভাবে এই সব অস্ত্র ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বেই বিষাক্ত জলবায়ু মানব জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করিবে; মানুষের আয়ু কমিবে, তাহাদের সন্তান সন্ততি স্বল্পায়ু হইবে, ক্যান্সার প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামকভাবে দেখা দিবে।

হাইড্রোজন বোমার বিস্ফোরণ—

বৃটেনে প্রস্তুত হাইড্রোজন্ বোমা প্রশান্ত মহাসাগরে কৃষ্টমাস্ দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আয়োজনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছিল জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত প্রভৃতি। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করেন নাই। এই সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আলোচনা চলিবার সময় সোভিয়েট রুশিয়া সাইবেরিয়ায় পর পর পাঁচটি হাইড্রোজন বোমা ফাটাইয়াছে। জাপান ইহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। সোভিয়েট রুশিয়া এই যুক্তিতে সে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে যে, তাহার নিজ ভূমিতে এই বিস্ফোরণে জাপানের আপত্তি করিবার সঙ্গত কারণ নাই; আর বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইবে বলিয়া তাহার আশঙ্কাও অমূলক। তা ছাড়া, হাইড্রোজেন বোমা ও এটম্ বোমা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ হইতে পারে না। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তিকারী রাষ্ট্রগুলিকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, বায়ুমণ্ডলে ও সাগরের জলে বিষক্রিয়া যাহাতে যথাসম্ভব কম হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

হাইড্রোজেন্ বোমার বিধ্বংসী শক্তি প্রায় অপরিসীম; ইহার বিস্ফোরণে বিচ্ছুরিত বিষের ক্রিয়াও খুবই ব্যাপক। গত ১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার যে হাইড্রোজেন্ বোমার বিস্ফোরণ হয়, তাহাতে সাত হাজার বর্গমাইল অঞ্চল মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হইয়াছিল। ঐ সময় বিজ্ঞানীরা প্রশান্ত মহাসাগরের যে অঞ্চলকে নিরাপদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেখানে তেইশ জন জাপানী ধীবর ভীষণভাবে আহত হয়। ইহা ছাড়া, বিশাল এলাকার জল দূষিত হওয়ায় জাপানীদের মাছের ব্যবসা বন্ধ হইয়াছিল। জাপানবাসীর খাদ্য তালিকার প্রধান বস্তু মৎস্য তাহাদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে হয়। ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা ও নাগাসাকি এক একটি এটম্ বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়; অপরিসীম যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া মরিয়াছিল প্রায় দুই লক্ষ নর-নারী। ১৯৫৪ সালে যে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হয়, তাহার বিধ্বংসী শক্তি নাকি ঐ প্রথম এটমিক বোমা হইতে পঁচিশ হাজার গুণ বেশী। গত তিন বৎসরে এই বিধ্বংসী শক্তি নিশ্চয়ই আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাইড্রোজেন বোমা ও এটম বোমার প্রত্যক্ষ আঘাতে যে ধ্বংসকাণ্ডের সৃষ্টি হয়, জলবায়ু বিষাক্ত হওয়ায় জীবদেহে উহার দীর্ঘস্থায়ী ধ্বংসাত্মক প্রভাব তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। বস্তুতঃ, এই প্রভাব কত ব্যাপক, কত মারাত্মক এবং কত কাল পর্য্যন্ত উহা চলিতে পারে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। কোনও কোনও বিজ্ঞানী এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইতিমধ্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন্ বোমার বিস্ফোরণ হইয়াছে, তাহাতেই হাজার হাজার লোকের হাড়ে ক্যানসার হইতে পারে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অধিবাসী এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আয়ু স্বল্প হইবার আশঙ্কাও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে রহিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে একমাত্র আমেরিকার আনবিক অস্ত্র ছিল; পরীক্ষাকার্য্য চলিত তাহার একলার। তাহার পর হইল সোভিয়েট রুশিয়ার; সাইবেরিয়ার ঊষর প্রান্তর তাহার রাজ্যভুক্ত হইলেও উহা ধরাবক্ষেই অবস্থিত। সেখানে বিস্ফোরিত এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলকেই দূষিত করে। এখন হাইড্রোজেন বোমা বৃটেনে তৈয়ারী হইয়াছে, এবং তাহার পরীক্ষা আসন্ন। কাল ফ্রান্সে উহা তৈয়ারী হইবে, পরশু হয়ত পশ্চিম জার্ম্মানীতে, তাহার পর দিন ইতালীতে। এই সব অস্ত্র তৈয়ারীর জন্য প্রচুর অর্থনৈতিক সঙ্গতি প্রয়োজন, সত্য। কিন্তু সামরিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার যুক্তিতে আজ বৃটেনে

যদি উহা তৈয়ারী হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে অন্যান্য দুর্ব্বল রাষ্ট্রও জাতিকে কৃচ্ছ্র সাধনে বাধ্য করিয়া কাল উহা তৈয়ারীতে মনোযোগী না হইবে কেন? বস্তুতঃ ফ্রান্স ইতিমধ্যেই এই দিকে মনোযোগ দিয়াছে। এইভাবে এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন্ বোমার বিস্ফোরণ যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বেই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের গুঁতায় ধরাপৃষ্ঠ মনুষ্যজাতির বাসের অনুপযুক্ত হইবে।

হাইড্রোজেন বোমা আক্রমণমূলক অস্ত্র; দেশরক্ষার জন্য ইহার কোনও উপযোগিতা নাই। যতদিন আক্রমণমূলক যুদ্ধের আয়োজন বন্ধ না হইবে, ততদিন হাইড্রোজন বোমার তৈয়ারীও বন্ধ হইবে না, এবং উহা যদি তৈয়ারী হয়, তাহা হইলে উহার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণও অপরিহার্য্য বিবেচিত হইবে। তৈয়ারী বোমা ফাটে কি ফাটে না এবং ফাটিলে কি পরিমাণ বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। পরীক্ষা করিয়া তৈরী অস্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে যদি জ্ঞান অর্জ্জন করা না যায়, তাহা হইলে অস্ত্র নির্ম্মাণ বৃথা। ইহা ছাড়া, এই "শীতল সংগ্রামের" সময়ে নিজ নিজ অস্ত্রবলের বহর দেখাইয়া প্রতিপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিবার চেষ্টা চলিয়া থাকে। বৃটেনের হাইড্রোজেন্ বোমার বিস্ফোরণ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা সৃষ্ট হইবামাত্র সোভিয়েট রুশিয়া পর পর কতকগুলি বোমা ফাটাইয়া তাহার শক্তির বহর দেখাইয়া দিল। অবিলম্বে আমেরিকা আবার তাহার উপরে টেক্কা দিবার চেষ্টা করিবে। বস্তুতঃ, এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ হইবার প্রশ্নটি যুদ্ধায়োজন বন্ধ হইবার প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট। সে আয়োজন যদি এখনই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইতে না পারে, তাহা হইলে এই সব ভয়াবহ অস্ত্র অবিলম্বে নিষিদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সম্পর্কে বৃটিশ শ্রমিক দলের মুখপত্র 'ডেলী হেরাল্ডের' নিম্নলিখিত মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ:

"...There is no known defence against H. Bomb and rockets. The bomb is a suicide weapon. It is Samson's last resort—to pull down the roof on himself and his enemies....came the grimmest warning yet from atomic scientists that the poison already released by bomb tests may inflict bone cancer on tens of thousands of people. These warnings justified Labour's policy of seeking to delay our own explosions and using the delay for a great effort to halt the arms race. While we have not exploded a bomb, we can exert moral leadership. Once we let off the bomb more countries will follow. The H. Bomb race is nearer the point of no return. There is a chance now. There may be no other."—Daily Herald. 18. 4. 57.

সিঙ্গাপুরের স্বায়ত্তশাসন—

সিঙ্গাপুরের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সিঙ্গাপুরের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের একটা আপোষ হইয়াছে। গত ১১ই এপ্রিল লণ্ডনে সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিমণ্ডল এই সম্পর্কিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আলোচনা শেষ হইবার মুখে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সর্ত্ত উপস্থাপিত করেন যে, নাশকতামূলক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। সিঙ্গাপুরী প্রতিনিধিমণ্ডল প্রথমে এই অগণতান্ত্রিক সর্ত্ত মানিয়া লইতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, প্রথম বারের নির্ব্বাচন সম্পর্কেই শুধু এই সর্ত্ত প্রযুক্ত হইবে। প্রতিনিধিমণ্ডল এই ব্যবস্থা অপ্রসন্ন চিত্তে মানিয়া লইয়াছেন। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিঙ্গাপুরের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। তবে, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবে বৃটেন। ইহা ছাড়া, বহির্ব্বাণিজ্যে এবং অন্য দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ব্যাপারেও কর্ত্তৃত্ব থাকিবে বৃটেনের, কারণ "যেহেতু পররাষ্ট্র বিভাগ বৃটেনের হাতে থাকবে, সে জন্য আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে সিঙ্গাপুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত চুক্তির জন্য বৃটেন দায়ী হইতে পারে।" আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষদের তিন জন সদস্য হইবে বৃটিশ, তিন জন সিঙ্গাপুরী এবং একজন মালয় যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী। বৃটেন পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছে যে, কমনওয়েলথের দায়িত্ব এবং আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্ব পালনের জন্য সিঙ্গাপুর দ্বীপের ঘাঁটিতে ও অন্যান্য সামরিক সাজ সরঞ্জামে কর্ত্তৃত্ব করিবার পূর্ণ অধিকার বৃটেনের থাকিবে। ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে এই ব্যবস্থা হইবে যে, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিতে পারিবেন; তখন সমস্ত ক্ষমতা বৃটিশ হাইকমিশনারের হাতে যাইবে। এই নির্দ্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে একখানি শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া আগামী বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে উহার বিধানগুলি প্রবর্ত্তিত হইবে।

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের সন্নিকটবর্ত্তী সিঙ্গাপুর দ্বীপটির আয়তন ২১৭ বর্গ মাইল। পাঁচ মিশালী (চীনা, মালয়ী, ভারতীয় ও ইউরোপীয়) অধিবাসীর সংখ্যা বার লক্ষের কিছু বেশী। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিতির জন্য এই দ্বীপটীর সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। বৃটেন এখানে বিশাল নৌঘাঁটী স্থাপন করিয়াছে, গড়িয়া তুলিয়াছে বিরাট সামরিক বিমানক্ষেত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুর বৃটিশ ষ্ট্রেট্স্ সেটলমেন্টের অংশ ছিল। যুদ্ধের পর ইহাকে পৃথক করা হয়, এবং কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হয়। তারপর, ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় দাবী মিটাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে সিঙ্গাপুরে এক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। উহার বিধান অনুসারে ঐ বৎসর এপ্রিল মাসের নির্ব্বাচনে সংখ্যাধিক্য লাভ করে শ্রমিক ফ্রণ্ট দল। এই দলের নেতা মিঃ ডেভিড্ মার্শাল মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন। দৈনন্দিন শাসন কার্য্য সম্পর্কে তাঁহার সহিত বৃটিশ গভর্ণরের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় বৃটিশ উপনিবেশ সচিব লিনক্স বয়েড্ সিঙ্গাপুরে আসেন। তিনি এইরূপ আশ্বাস দিয়া যান যে, শাসনতন্ত্রে গভর্ণরকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সবগুলি তিনি কার্য্যতঃ ব্যবহার করিবেন না। ইহা ছাড়া, নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে সিঙ্গাপুরের

শাসন কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি প্রতিনিধিমণ্ডলকে লণ্ডনে যাইতে অনুরোধ জানান হয়। এই আমন্ত্রণ অনুসারে ১৯৫৬ সালে এপ্রিল মাসে মিঃ মার্শালের নেতৃত্বে একটি সিঙ্গাপুরী প্রতিনিধিমণ্ডল লণ্ডনে যান। ঐ সময় সিঙ্গাপুরের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কর্তৃত্ব বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কিছুতেই হাতছাড়া করিতে চান না। এবার যে সব সর্ত্তে সেই বিষয়ে মীমাংসা হইয়াছে, এই সব সর্ত্ত মিঃ মার্শালই উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন উহা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। মিঃ মার্শাল ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন, এবং পদত্যাগ করেন। এবার সিঙ্গাপুরের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিম্‌য়িউ হকের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিমণ্ডলের সহিত বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তরের যে আপোষ-মীমাংসা হইয়াছে, তাহাতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে মিঃ মার্শালের প্রস্তাবই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মানিয়া লইয়াছেন। তিন পক্ষের প্রতিনিধি লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব তাঁহারই ; জরুরী অবস্থায় শাসনতন্ত্র বাতিল করিবার প্রস্তাবও তাঁহার। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জাতির পক্ষে এই ব্যবস্থা যতই অমর্য্যাদাকর হউক, সিঙ্গাপুরী প্রতিনিধিমণ্ডল ইহাতে রাজী হইয়াছেন ; গত বৎসরের প্রতিনিধিমণ্ডলও ইহাতে রাজী ছিলেন। কিন্তু নাশকতামূলক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে না দিবার ব্যবস্থাটা সিঙ্গাপুরের রাজনীতিকরা নির্ব্বিবাদে হজম করিতে পারিতেছেন না। সিঙ্গাপুরের আইন সভায় এই সর্ত্তটি বাদ দিয়া লণ্ডন চুক্তির অবশিষ্টাংশ গত ৩০শে এপ্রিল অনুমোদিত হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সময় পূর্ব্বের চরম উগ্রপন্থী রাজনীতিকদের উপর হইতেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া তাহাদিগকে এই শাসনতন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করিতে দেওয়া গণতান্ত্রিক রীতি। ইহা ছাড়া সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রতিপন্ন হয়—কোন্ দল ও কোন্ নীতির প্রতি জনসমর্থন বেশী। সিঙ্গাপুরের এক শ্রেণীর রাজনীতিককে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে না দিবার সিদ্ধান্তে ইহাই পরোক্ষে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে যে, ঐ শ্রেণীর প্রতি জনসমর্থন বেশী, এবং তাহার সুযোগে উহারা শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য নষ্ট করিয়া দিতে পারিবে। এই স্বীকৃতি সিঙ্গাপুরের নরমপন্থী রাজনীতিকদের পক্ষে অবমাননাকর। এই গুরুতর ব্যাপারটি এই বলিয়া ধামাচাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, প্রথম নির্ব্বাচনের তিন মাস পরে আইন পরিষদ ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিলেই এই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা যাইবে। ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হয়, তাহা হইলে এই প্রহসনের প্রয়োজন কি ? তিন মাসের মধ্যে অবস্থার এমন কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

সিঙ্গাপুরের অধিবাসীকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যে শাসন ক্ষমতা দিতে চাহিয়াছেন, উহা ঔপনিবেশিক শাসনক্ষমতা (Dominion Status), নহে ;—পূর্ণ স্বাধীনতা তো নহে-ই। ইহা সাম্রাজ্য বাদীর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত এক আজগুবি ব্যবস্থা। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনও আত্মসচেতন জাতিকে এইভাবে ধাপ্পা দিয়া বেশী দিন শান্ত রাখা যাইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

জর্ডান কোন্ পথে-

মধ্য প্রাচ্যের ক্ষুদ্র জর্ডান রাজ্যটি অকস্মাৎ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। ইহার পরিণতি কোথায় এবং কিভাবে ঘটিবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত।

প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কি সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, জর্ডান্ তাহাদের অন্যতম। ১৯২০ সালে বৃটেন এই রাজ্যটিকে (তখন ট্রান্স জর্ডান বলিয়া পরিচিত) প্যালেষ্টাইন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অনুগত আমীর আব্দুল্লাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯২৩ সালে বৃটিশ অভিভাবকত্বে (ম্যাণ্ডেট্) জর্ডানের স্বাধীনতা বৃটেন মানিয়া লয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ ১৯৪৬ সালে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসান হইয়া জর্ডান পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ; আব্দুল্লা রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। রাজা আব্দুল্লার পরীক্ষিত বৃটিশ প্রেমে লণ্ডনের কর্তৃপক্ষের গভীর আস্থা ছিল। ইংরাজ সেনাপতি গ্লাব পাশার তত্ত্বাবধানে বৃটিশ অর্থে এখানে আরব লিজিয়ন নামক সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। জর্ডানের রাজধানী আম্মানে বৃটিশ বিমান বাহিনীর ঘাটী স্থাপিত হয়, এবং মাফ্রাকে ও আকাবায় কিছু কিছু সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক নৃপতিটির অকৃত্রিম বৃটিশ অনুরক্তি এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৃটিশ কর্তৃত্বাধীন এই সব সামরিক ব্যবস্থা জর্ডানকে মধ্য প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থরক্ষার শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করিয়াছিল। আব্দুল্লা যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আরব জগতে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চেতনা ও পাশ্চাত্য বিদ্বেষ সত্ত্বেও বৃটিশের এই দুর্গ একরূপ নিরাপদ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৮ সালে ইস্রাইলের বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত আক্রমণ ব্যর্থ হইবার অন্যতম কারণ মিলিত সামরিক তৎপরতায় জর্ডানের (হয়ত কোনও গোপন ইঙ্গিতে) ঐকান্তিক সহযোগিতার অভাব। ইহার কিছুকাল পরে—১৯৫১ সালে রাজা আব্দুল্লা আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। হত্যার অপরাধে যাহারা দণ্ডিত হয়, তাহাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট আরব জাতীয়তাবাদী ডাঃ মুসা হোসেনী। এই দণ্ডাদেশে আরব জগতে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল।

ইহার পর মিশরে রাজা ফারুকের সিংহাসনচ্যুতি, ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থান প্রভৃতি আরব জাতীয়তাবাদে নূতন প্রেরণা যোগায়। জর্ডানে এই জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি আমরা ১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে বাগদাদ-চুক্তি বিরোধী প্রবল গণ-অভ্যুত্থানে দেখিতে পাই। ইহার পর, জনগণের দাবীতে গ্লাব পাশার পদচ্যুতি জর্ডানে জাতীয় চেতনার পরিচয় আরও বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। তাহার পর, বৃটিশের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ইহার জন্য জর্ডানের জনগণের আন্দোলন আরম্ভ হয়। গত অক্টোবর মাসে নির্ব্বাচিত জর্ডানের নূতন পার্লামেণ্ট জনগণের নিকট ইঙ্গ-জর্ডান চুক্তি বাতিল করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে জর্ডান বৃটেনের নিকট হইতে প্রতি বৎসর ১ কোটী ২৮ লক্ষ পাউণ্ড পাইত এবং উহার বিনিময়ে আম্মান, মাফ্রাক ও আকাবায় ঘাঁটী বৃটেন ব্যবহার করিত।

সৌদী আরব, সীরিয়া ও মিশর জর্ডানকে এই পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হওয়ায় ইঙ্গ-জর্ডান চুক্তি সম্প্রতি বাতিল হইয়াছে।

রাজা আবদুল্লার পৌত্র একুশ বৎসর বয়স্ক হুসেন এখন জর্ডানের রাজা। এতকাল তিনি দেশের প্রগতিশীল জনমত মানিয়া চলিতে-ছিলেন ; বিশেষতঃ বৃটিশ-বিরোধী জনমতের তিনি বিরোধিতা করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি তিনি বলিতে আরম্ভ করেন যে, জর্ডানের রাজনীতিক্ষেত্রে কম্যুনিষ্টদের আশঙ্কাজনক অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি অকস্মাৎ নেবুলসি-মন্ত্রিমণ্ডলকে পদচ্যুত করেন। রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল—এই অভিযোগে সামরিক বিভাগে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার চলিতে থাকে। চীফ্ অব্ ষ্টাফ্ জেনারেল আবু নুওয়ার (গ্লাব পাশা পদচ্যুত হইবার পর এই তরুণ কর্ম্মচারীর পদোন্নতি হয়) সিরিয়ায় পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। সাত দিন পরে ডাঃ হুসেন্ খালিদির নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয় ; নূতন চীফ্ অব ষ্টাফ হন আলি হিয়ারি। কিন্তু এই ব্যবস্থাও এক সপ্তাহ টেঁকে না ; এই দুই ব্যক্তিও সিরিয়ায় পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে জর্ডানে প্রবল গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কড়া সেন্সর-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া বাহিরের জগৎ হইতে জর্ডানকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, এবং সামরিক আইন জারি করিয়া গণ-বিক্ষোভ দমনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক বিভাগে আর এক দফা ধরপাকড় চলে। দেশরক্ষা মন্ত্রী মিঃ সুলেমান তুকান্ জর্ডানের সামরিক গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। রাজা হুসেন জর্ডানের সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

জর্ডানের এই ঘটনাবলীর পশ্চাতে বৈদেশিক হস্ত কাজ করিতেছে বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। মিঃ নেবুলসি, জেনারল হিয়ারি, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী কর্ণেল মৌসী প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, আম্মানের বৈদেশিক দূতাবাসগুলি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ; সাম্প্রতিক গোলযোগের পশ্চাতে গভীর বৈদেশিক ষড়যন্ত্র ছিল। তাঁহারা কেহই অবশ্য নির্দিষ্টভাবে বৈদেশিক দূতাবাসের নাম করেন নাই। তবে, অনভিজ্ঞ তরুণ নৃপতি হুসেনের সমগ্র তৎপরতার পশ্চাতে যে অত্যন্ত উর্ব্বর রাজনৈতিক মস্তিষ্ক সক্রিয় রহিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। নেবুলসি গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই রাজা হুসেন রাজনৈতিক দলগুলিকে আঘাত করেন ; এবং আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজম জর্ডানকে গিলিতে আসিতেছে বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করেন। আইসেনহাওয়ার নীতির বিঘোষিত উদ্দেশ্য—অর্থ দিয়া, অস্ত্র দিয়া, প্রয়োজন হইলে মার্কিণ সৈন্য দিয়া মধ্যপ্রাচ্যকে কম্যুনিজমের গ্রাস হইতে রক্ষার চেষ্টা হইবে। রাজা হুসেন রাজনৈতিক দলগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া এবং কঠোর হস্তে গণ-বিক্ষোভ দমন করিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হন যে, জর্ডানের সমস্ত রাজনৈতিক দল আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের প্রভাবাধীন, দেশের রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ছেলে-বুড়ো সকলেই প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্ট !—সুতরাং, জর্ডান সম্পর্কে আমেরিকার চিন্তিত হওয়া উচিত, এবং আইসেনহাওয়ার নীতি প্রয়োগের কথা বিবেচনা করাও প্রয়োজন। রাজা হুসেনের এই চতুরতার ফলও সঙ্গে সঙ্গে ফলে। প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেসের সহিত জরুরী পরামর্শ করিয়া বলেন যে, তিনি জর্ডানের "স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছেন।" একখানি বিশাল বিমানবাহী রণপোত সহ আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবাহিনী, তাহার দেড়শত নাবিককে প্যারিসে ফেলিয়া দিয়া হন্তদন্ত হইয়া জর্ডানের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রাংশে ছোটে। গত ৩০শে এপ্রিল আমেরিকার সামরিক সেক্রেটারী মিঃ ব্রুকার টেলিভিসান বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে সঙ্গে সঙ্গে জর্ডানে প্যারাসুটের সাহায্যে মার্কিণ সৈন্য নামাইবার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। জর্ডানকে তাহার ইচ্ছামত ব্যয় করিবার জন্য এক কোটী ডলার প্রদান করিবার প্রস্তুতিও মার্কিণ কর্তৃপক্ষ জানাইয়া-ছেন। বলা বাহুল্য, ইহা "আইসেনহাওয়ার নীতি" প্রয়োগের প্রথম ধাপ।

জাতি-সঙ্ঘে সুয়েজ প্রসঙ্গ—

সুয়েজ খাল এখন বাধামুক্ত হইয়াছে। সুয়েজ সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত শুল্ক মিশরকে অথবা তাহার মনোনীত কোনও পক্ষকে অগ্রিম দেওয়া হউক বলিয়া মিশর গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, খাল ব্যবহারকারী শক্তিগুলি তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন। এই সর্ত্ত না মানিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে জাহাজ ঘুরাইয়া লইবার ব্যয়সাধ্য পন্থা ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। খাল ব্যবহারকারী দেশগুলির নিজেদের মধ্যেও তীব্র মতভেদ দেখা দিয়াছে ; ইতালী, গ্রীস, জাপান প্রভৃতি দেশ এই সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত একমত হইতেছে না,—তাহারা মিশরের সর্ত্তে সুয়েজ ব্যবহারের পক্ষপাতী। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ জাহাজগুলিকে মিশরের সর্ত্তে খাল ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ জাহাজ-কোম্পানীগুলি তাহাদের গভর্ণমেণ্টের এই নিষেধাজ্ঞা মানিতেছে না ; তাহারা বিদেশে জাহাজ রেজেষ্ট্রী করিয়া অন্য দেশের পতাকা উড়াইয়া সুয়েজ খাল ব্যবহার করিতেছে।

বর্ত্তমানে জাতি-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে সুয়েজ প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। গত বৎসর অক্টোবর মাসে জাতি-সঙ্ঘে সুয়েজ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ছয়টি মূলনীতি স্থির হইয়াছিল : (১) সুয়েজের মধ্য দিয়া অবাধে জাহাজ চলাচল করিবে ; কোনরূপ বৈষম্যের অথবা প্রকাশ্য বা গোপন বাধার সৃষ্টি করা হইবে না ; (২) মিশরের সার্ব্বভৌমত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে ; (৩) খাল পরিচালনার সহিত কোনও দেশের রাজ-নীতি সম্পৃক্ত হইবে না ; (৪) মিশরের সহিত খাল ব্যবহারকারী শক্তিগুলির চুক্তির দ্বারা শুল্ক ও মাশুল স্থির করা হইবে ; (৫) শুল্ক বাবদ আয়ের এক সঙ্গত অংশ খালের উন্নতির জন্য বরাদ্দ করা হইবে ; (৬) কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে সুয়েজ খাল কোম্পানী ও মিশর গভর্ণমেণ্টের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়গুলি মীমাংসা করিবার ভার সালিশের উপর দেওয়া হইবে। সম্প্রতি মিশর এই মূলনীতির ভিত্তিতে সুয়েজ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা জাতি-সঙ্ঘে উপস্থাপিত করিয়াছে। উল্লিখিত মূলনীতিগুলির মধ্যে তৃতীয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; সুয়েজ খালকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখিবার ব্যাপারটিতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সর্ত্ত পূরণের জন্য মিশর প্রস্তাব করিয়াছে যে, একটি স্বতন্ত্র কোম্পানী গঠন করিয়া তাহার উপর সুয়েজের পরিচালনাভার দেওয়া হইবে ; উহার নিজস্ব বাজেট থাকিবে। শুল্ক ও মাশুল সম্পর্কে, এবং পরিচালনার ব্যাপারে কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে সালিশীর ব্যবস্থা মানিয়া লইতেও মিশর প্রস্তুত বলিয়া জানাইয়াছে।

দাসদাসী সমস্যা

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

যত দিন যাচ্ছে ততই দাসদাসী সমস্যা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠ্‌ছে। দেশ বিভক্ত হবার পর থেকে আরও যেন জটিলতা অকটোপাসের মত আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বাস্তুহারারা সরকারের অর্থে পুষ্ট হওয়ায় পরিশ্রম কর্‌তে চায়না, এর ওপর প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা হেতু ভিন্ন প্রদেশের লোক এদেশের গৃহস্থের বাড়ীতে পূর্ব্বের মত থাকে না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তারা নিজেদের রাজ্যসরকারের আশ্রয়ে থেকে জীবিকা উপার্জ্জনের পথ খুঁজে পাচ্ছে। সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালীর সংসারে রন্ধনশালার ভার নিয়ে এসেছে উড়িয়া সন্তান, দ্বারপালের কর্ম্ম গ্রহণ করেছে পশ্চিমা লোকে—বহুকাল আগে বাঙালীর ঘরে পাচক পাচিকার কাজ নিত বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলের লোক, কিন্তু যেদিন উড়িয়্যাবাসীর হাতে চলে গেল আমাদের রন্ধন শালা, সেদিন থেকে এরা আর স্থান পেলো না। পূর্ব্ববঙ্গের রাঁধুনী সংখ্যা-লঘু এদানীং পাওয়া যায়না বল্‌লেই চলে। ঠিকা ঝিরও গোমর বেড়েছে, সব সময়ে পাওয়া যায় না। বস্তিলোপ সাধনের দিকে সরকারের সহৃদয় দৃষ্টি পড়ার পর থেকে এরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, তাছাড়া অনেক কলকারখানায় এরা কাজ পাচ্ছে। দু'বেলা চা জলখাবার, মুহুর্মুহু পান দোক্তা আর উপাদেয় ভোজ্য, কাপড় চোপড় দিয়েও ঝিচাকরের মন পাওয়া যায় না। এরা কাজের চেয়ে গল্প গুজব করে সময় কাটাতে আর ঘুমিয়ে কর্ত্তব্যের অবহেলা কর্‌তে বেশি পটু। সাম্যবাদের বাণী প্রচারের ফলে এরা আর গৃহস্থের প্রতি পূর্ব্বের মত মান মর্য্যাদা দেখাতে বা গৃহস্থের মুখের দিকে চেয়ে টেনে কাজ কর্‌তে ইচ্ছুক হয় না। বেতন বৃদ্ধি করে নেওয়ার চেষ্টায় এরা থাকে, সময়ে সময়ে অসহযোগের জাঁতি কলে ফেলে গৃহস্থকে বিপন্ন, বিব্রত ও বিরক্ত করে তোলে। আমরা স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাই আজ ঘরে বাইরে ঘাত প্রতিঘাতে দৈনন্দিন জীবন ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছি। দাসদাসীর জন্যে আমাদের অবস্থা শোচনীয়। দাসদাসী রেখে তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পাওয়া উচিত, তা পাইনে। তারা আমাদের সংসারে উদ্ধত প্রকৃতি ভাবাপন্ন, বাচাল ও স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে ওঠে—অনেক সময়ে মনিবের উপরই কর্ত্তৃত্ব করে, যখন ইচ্ছে কাজ বন্ধ করে চলে যায় আর আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। বাঙালীর সংসারে দাসদাসীর পাওনা অধিক, লোক-লৌকিকতায় সামাজিকতাদি ব্যাপারে তারা অনেক পুরস্কার পায়, বেতন খাওয়া পরার তো কথাই নেই তাছাড়া ছেলের পড়ার জন্যে সাহায্যকরা, মেয়ের বিয়ের জন্যে সাহায্যকরা এসব তো আছেই—মাসের মধ্যে দশদিন ছুটি নিয়ে যাওয়া বা কামাই করা স্বভাবগত হয়ে গেছে। মাইনে কাট্‌তে গেলেই কান্না, চোখের জলে গৃহস্থের মন ভিজিয়ে দেয় কিন্তু কাজে এরা যেভাবে ফাঁকি দেয় সেদিকটাই বিচার কর্‌লে দেখা যায় কাজের চেয়ে ফাঁকির ভাগ অনেক গুণ বেশী।

কিন্তু সাহেবদের বাড়ীতে এই চাকর চাকরানী ঠিক থাকে—ঠিক মত কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করে। এক খানা চিঠি পর্য্যন্ত কোন পাত্রে না রেখে মনিবের হাতে দেয় না, ডাক্‌লেই হুজুর বলে সেলাম দিয়ে এসে দাঁড়ায়—এর মানে কি? কোথায় আমাদের গলদ?

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের নিয়ম, অতি অপরিহার্য্য নিয়ম, তারা Certificte of good behaviour বা সদ্ব্যবহারের প্রশংসা পত্র না দেখালে কদাচ কেউ দাসদাসী রাখে না। যেখানে সে আগে কাজ করেছিল, সেখানকার প্রশংসা পত্র এবং কেন সে ছেড়ে এসেছে তার সন্তোষ-জনক নিদর্শনী বা চিঠি না পেলে কোন দাসদাসী অন্য এক জনের চাকুরীতে নিযুক্ত হোতে পারে না। একারণে দাসদাসীর

গোময় কমে যায়, তারা যথাসাধ্য প্রভুর মন জুগিয়ে চল্‌বার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে নতুবা সে যেদিন বিনা অনুমতিতে চাকুরী ছাড়্‌বে পরদিন থেকেই সে আর কোথাও কোন চাকুরী পাবে না—কেউ তাকে রাখ্‌বে না। তার ভিক্ষা কর্‌বার জো নেই, বিলাতে সামর্থ্যবান লোকে ভিক্ষা কর্‌তে পায়না, পুলিসে ধরে বিচারালয়ে দেয়—জেল হ'য়ে যায়। তাই ও দেশে জীবিকা নির্ব্বাহের ভাবনা উৎকট।

এবার আমাদের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে কতক-গুলি গলদ ধরা পড়ে। আমাদের দেশে চাকর চাকরাণীর স্বভাবচরিত্র আমরা কিছুই দেখি না, কার নিকট চাকুরী করেছিল, সে অনুসন্ধানও করি নে। আপনার ঝি চাকর আমি ভাঙিয়ে নিই, আমার ঝি চাকর আপনি ভাঙিয়ে নেন—আমরা উভয়েই স্বার্থ গৃধ্নু। তাই এদেশের দাস দাসী বলে—'এক দরজা বন্ধ, হাজার দরজা খোলা—' আপনি হয়তো ঝগড়ার মুখে বললেন—'ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব?—' কথা ঐ পর্য্যন্ত, হাওয়ায় উড়ে যায়। কাজেই কোন লোকের চাকুরীতে এদের আস্থা থাক্‌তেই পারে না, সেইজন্য এরা সাধারণতঃ অবাধ্য উদ্ধত, বাচাল, কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন অসভ্য হয়ে উঠ্‌তে থাকে। যে চাকরের ওপর বাজার করার ভার দেওয়া থাকে, সে এদিকে খুব মনোযোগী হয় কিন্তু যে চাকর বাবুর সঙ্গে বাজারে যায়, তার কাজ কর্‌তে ভালো লাগে না। অনেক বাড়ীতে ঝিয়েরা খেয়ে আবার এক গামলা ভাত ও তরি-তরকারী নিয়ে তবে দু'বেলা বাসায় যায়—গামলা ভর্ত্তি করে না দিলে আর কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

সুযোগ সুবিধা পেলে গহনা কাপড় চুরি করে পলায়ন বা গৃহস্থ বধূ বা গৃহিণীকে খুন করে নিখোঁজ হওয়া, এদানীং এদের মধ্যে বেশ দেখা যাচ্ছে। পূর্ব্বের মত অধুনা কোথাও দাস দাসী পুরুষানুক্রমে থাকে না বা সুদীর্ঘ দিন ধরে গৃহস্থের কাজে মন বসায় না। এদেশে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করেই ভিক্ষা দেবার রীতি আছে—এটাও অত্যন্ত অশোভন। হরি বল্‌লেই কাঁড়া চাউল মিল্‌তে পারে—বাগু মার্কা চেহারা তিলক কেটে খোল কর্‌তাল নিয়ে এসে দাঁড়ালেই অমনি সমাদর করে ভিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। দৈনিক কিছু ঘর হরেকৃষ্ণ বলে ঘুরে বেড়িয়ে মুষ্টি ভিক্ষা করে আন্‌তে পার্‌লেই দু পাঁচ সের চাউল ঝুলিতে এসে পড়ে, তাছাড়া খুচরা পয়সা তো বেশ কিছু এর সঙ্গে জুটে যায়, ফলে তার অবস্থা সাধারণ চাকুরে বাবুর চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। কাজেই বাবুদের মুখের ওপর এদের বল্‌তে শোনা যায়—'তোমাদের মতন বাবু ঢের দেখেছি—ভাল দাসদাসী ও মজুরের অভাব ও বিশৃঙ্খলায় কাজকর্ম্ম কারবার নষ্ট হয়ে যায়, এর ওপর সরকারের প্রশ্রয় আছে, কম্যুনিষ্ট উস্কানি আছে আবার ট্রাইবিউন্যালও আছে—কথায় কথায় ধর্ম্মঘট, কাজ বন্ধ করা আর ছাপ্পান্নটা দাবী দাওয়া নিয়ে চীৎকার করাই এখন হয়েছে এদের একমাত্র অবলম্বন। এরা দলপাকিয়ে মানুষ ডাকাতি করতে পারে আর গৃহস্থের সংসার ও চালু কার্‌বার প্রভৃতিতে লাল বাতি জ্বালাতে পারে না?—খুব পারে। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতির নিয়ম নিন্দনীয় বলা যায় না, বরং অনুকরণীয়। যদি ওরা এতটুকু না করতো, তাহোলে দাসদাসীর অভাবে খেতে পেতো না। অন্নবিস্তর কাজকর্ম্ম মাটি হোতো।

সিষ্টেম বা সুশৃঙ্খলা জাতি গঠনের অতি অপরিহার্য্য উপকরণ। বল, বিক্রম, অর্থ, সামর্থ্য থাক্‌লে কি হবে? সুশৃঙ্খলার অভাবে সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। সেকালেও দাস-দাসী ছিল কিন্তু তাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল, চারিত্রিক বিশুদ্ধি ছিল। এখনকার দাসদাসীদের বারো আনা ভাগের ধর্ম্ম জ্ঞান নেই, অসৎ কাজ সবই করতে পারে, দরজা খুলে চোর ডাকাত ঢুকিয়ে দিতে পারে, চাকুরিতে না পোষালে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, এর ওপর যারা বাস্তহারা তারা তো সরকারের পোষ্য পুত্রপুত্রী হয়ে বহাল তবিয়তে আছে—কোন কিছুর অভাব নেই। কাজেই মনিব চাকুরীর তোয়াক্কা ওরা করে না। তবে যে সব বাড়ীর সঙ্গে ঝিয়েদের অবৈধ যোগাযোগ হয়ে যায়, সেখানে ঝিয়েরাই গৃহিণীর অধিকার কেড়ে নিয়ে সংসার জ্বালিয়ে দেয়। এদের উপদ্রবে গৃহিণীদের মুখ বুঁজে হাতী গিল্‌তে হয়। অনেকের আবার থাকে যৌন ব্যাধি, তা সংক্রামক হয়ে গৃহস্থের স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি নষ্ট করে। ওদের নিয়েও মুস্কিলে পড়তে হয়।

এখনকার দিনে চাকর চাকরাণী ভাঙিয়ে নেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ কর্‌তে হবে। প্রত্যেকের ভূতপূর্ব্ব মনিবের সার্টিফিকেটের মন্তব্য দেখতে হবে, তবে চাকর চাকরাণী রাখতে হবে। তার ওপর যখন দু' চার বছরের মধ্যে

বুঝ্‌বে, প্রশংসাপত্র না পেলে চাকুরী হবে না, খেতে পাবে না, সে মরবে, তখন তার চৈতন্য হবে। পাত্রাপাত্র বিচার না করে ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে, আর সরকারের আস্কারা বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। পেটের দায়ে দাসদাসী নম্র, ভদ্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ হোতে বাধ্য হবে। পাশ্চাত্য দেশে চাকর চাকরাণীগিরি শিখবার বিদ্যালয় আছে। চাকর চাকরাণীর এজেন্সী আছে, এই এজেন্সীকে বলে চাকর সরবরাহ এজেন্সী, এরা চাকর সরবরাহ করে তাদের বেতন থেকে কমিশন কেটে নিয়ে থাকে। এই সকল এজেন্সীতে কোথায় কাজ খালি আছে, তারও সংবাদ আসে। এরা সেইসব প্রশংসা পত্র নিয়ে তাদের বাড়ী ঘর দেখে লোকের বাড়ীতে দাসদাসী সরবরাহ করে দেয়। এভাবেই ঐসব দেশের লোক কাজ চালাতে থাকে ও বাস্তবিক সুখে থাকে। এদেশের লোকেও সার্টিফিকেটের পদ্ধতি যদি চালাতে পারেন তাহোলেও অনেকটা সমস্যা দূর হয়, ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস পায়, লোকে শ্রমশীল হয়ে পড়ে। সৎ উপায়ে কর্ত্তব্য জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ কর্ম্মী হোলে অধঃপতন না হয়ে ক্রমোন্নতিই হয়—এসব সদ্বিবেচনা হওয়া আবশ্যক, নতুবা শোচনীয় নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে অনুতপ্ত হোতে হবে। বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা যেরূপ হয়ে উঠছে তাতে মনে হয় আমাদের মহিলা সমাজের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক, অন্যথা বহু দুর্ভোগের আশঙ্কা আছে।

আল্পনা—
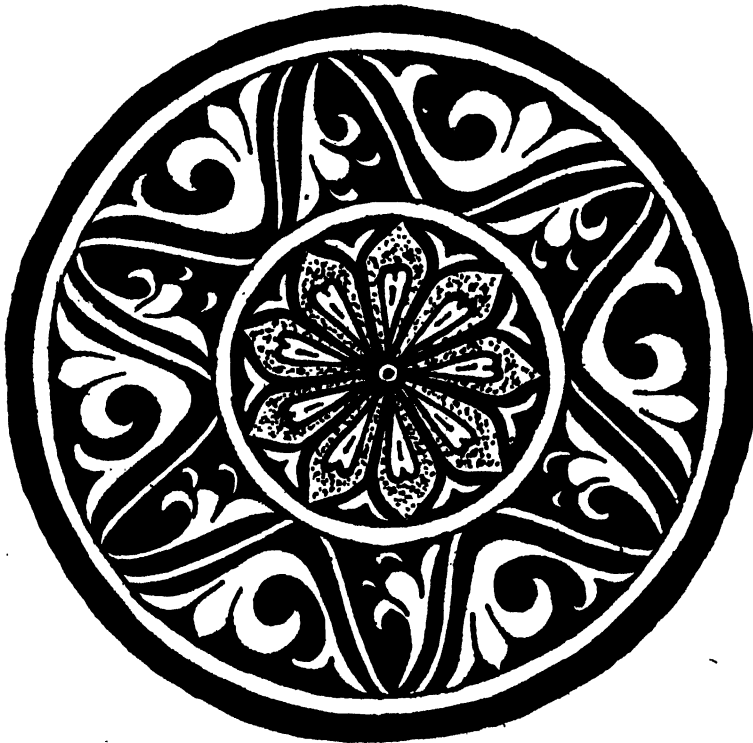
—ইন্দিরা রায়

হাতের কাজ

দু-কাঁটার লেস্

প্রথম ৯ ঘর তুলে নিতে হবে।

১ম কাঁটা—২ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া, ২ সোজা কাঁটায় এক প্যাচ দিয়ে সামনে সূতা ১ জোড়া ১ সোজা। (১০ ঘর হবে)

২য় কাঁটা—৩ সোজা, ১ উল্টা (প্যাচের ঘর), ৩ সোজা সামনে সূতা ১ জোড়া, ১ সোজা। (১০ ঘর)

৩য় „—২ সো, সামনে সূতা ১ জোড়া, ৬ সোজা, (১০)

৪র্থ „—৭ সো, ঐ „ ১ সোজা, (১০)

৫ম „—২ সো, ঐ „ ঐ „ কাঁটায় এক প্যাচ দিয়ে ১ জোড়া, পুনরায় ঐরূপ একজোড়া, ১ সোজা (১২)

৬ষ্ঠ কাঁটা—৩ সোজা, ১ উল্টা, ২ সোজা, ১ উল্টা, ২ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া, ১ সোজা। (১২)

৭ম কাঁটা—২ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া, ৮ সোজা। (১২)

৮ম কাঁটা—৩ ঘর বন্ধ, ৬ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া, ১ সোজা। (৯)

এই লেস সরু কাঁটা দিয়ে সূতার সাহায্যে বুনে সায়া, ফ্রক ইত্যাদিতে ব্যবহার করা চলে।

—কমলা ভাদুড়ী

ভেনিলা আইস্‌ক্রীম্

উপকরণ—দুধ ½ সের, ডিম্—২টি, ক্যাস্টর চিনি (castor sugar) অথবা খুব মিহি চিনি ৩ আউন্স, ক্রীম্ ½ পাইণ্ট, কর্ণফ্লাওয়ার (cornflour)—১ আউন্স, ভেনিলা সুগন্ধি —চায়ের চামচের ½ চামচ।

প্রণালী—দুধে চিনি দিয়ে অল্প আঁচে গরম করুন। একটি পাত্রে কর্ণফ্লাওয়ার ও একটু ঠাণ্ডা দুধ একত্রে মিশিয়ে মেখে নিন্। তারপর এটি গরম দুধে দিয়ে বেশ করে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘন হচ্ছে। এবার আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা হতে দিন্, তবে নেড়ে যাবেন, যেন দুধে সর না পড়ে। ডিম্ দুটি এবার ভালভাবে ফেটিয়ে নিন্ আর তাতে এই ঘন দুধ অল্প করে আস্তে আস্তে ঢেলে নাড়তে থাকুন। এবার এতে সুগন্ধি আর ক্রীম মিশিয়ে দিয়ে জুড়োতে দিন্। জুড়িয়ে গেলে রেফ্রিজারেটারের ট্রেতে ঢেলে ভেতরে রেখে জমতে দিন্। একটি পরিষ্কার খালি পাত্রও রেফ্রিজারেটারের মধ্যে রেখে ঠাণ্ডা হতে দিন্। যখন দেখবেন যে আইস্‌ক্রীম্ খানিকটা জমেছে, তখন বার করে নিয়ে এই ঠাণ্ডা পাত্রে ঢেলে খুব ভাল করে ফেটিয়ে নিন্। তারপর আবার ট্রেতে ঢেলে জমতে দিন্, তবে যেন খুব বেশী জমে না যায়।

—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
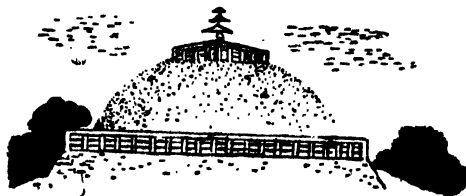
পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ২৮শে এপ্রিল দার্জিলিংয়ে নূতন পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—তাহাতে ১৩ জন মন্ত্রী, ৩ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১২ জন উপমন্ত্রী গৃহীত হইয়াছেন—(১) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী—পুলিস ও প্রতিরক্ষা ব্যতীত স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিক্ষা, উন্নয়ন, সমবায়, কুটীর ও ছোট শিল্প বিভাগের ভার প্রাপ্ত (২) প্রফুল্লচন্দ্র সেন খাদ্য, সাধারণ সাহায্য ও সরবরাহ এবং উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বাসন (৩) শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও বাসগৃহ সাহায্য (৪) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—পুলিস ও প্রতিরক্ষা (৪) শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়—সেচ ও জল পথ (৫) শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—মৎস্যচাষ ও বন বিভাগ (৬) শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্মন—আবগারী (৭) ডাঃ আর-আহম্মদ—কৃষি, পশুপালন (৮) ঈশ্বরদাস জালান—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েৎ (৯) শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—ভূমি ও রাজস্ব (১০) শ্রীভূপতি মজুমদার—শিল্প ও বাণিজ্য (১১) শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়—আইন, বিচার ও উপজাতি উন্নয়ন (১২) আবদুল সাত্তার—শ্রম। রাষ্ট্রমন্ত্রী ৩ জন—(১) শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়—উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বাসন (২) শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—উন্নয়ন, উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বাসন (৩) ডাঃ অনাথবন্ধু রায়—স্বাস্থ্য। উপমন্ত্রী ১২ জন—(১) শ্রীসতীশচন্দ্ররায় সিংহ—পরিবহন (২) শ্রীসৌরীনমিশ্র—শিক্ষা (৩) শ্রীতেনজিং ওয়াংদি—উপজাতি উন্নয়ন (৪) শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষি, পশুপালন ও বন (৫) শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক—সাধারণ সাহায্য ও সরবরাহ (৬) শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—সমবায় (৭) সৈয়দ কাজিম আলি মির্জা—কুটীর ও ছোট শিল্প (৮) মিঃ জিয়াউল হক—স্বাস্থ্য (৯) শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়—উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বসতি (১০) শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি—খাদ্য (১১) শ্রীজগন্নাথ কোলে—প্রচার (১২) শ্রীনর বাহাদুর গুরুং—শ্রম। ১৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে প্রথম ৯ জন পূর্ব মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন; বিমলবাবু ও ভূপতিবাবু তৎপূর্ব মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। সিদ্ধার্থবাবু ও সাত্তার সাহেব নূতন লোক। সিদ্ধার্থ শঙ্কর খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দৌহিত্র। সাত্তার সাহেব বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও এম-পি ছিলেন। ২ জন নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী ও তরুণকান্তি পূর্ব মন্ত্রিসভায় উপমন্ত্রী ছিলেন—তাঁহাদের পদোন্নতি হইল। ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় বাঁকুড়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সমাজ-সেবক কর্মী। ১২ জন উপমন্ত্রীর মধ্যে ৬ জন পুরাতন ও ৬ জন নূতন। নূতন ৬ জন—(১) সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা—মুর্শিদাবাদের নবাবের পুত্র (২) জিয়াউল হক—২৪ পরগণা বাদুড়িয়া হইতে নির্বাচিত (৩) শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪ পরগণা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক ও খ্যাতনামা সমাজ-সেবিকা (৪) শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি—মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি (৫) শ্রীজগন্নাথ কোলে—বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী—পূর্বে এম-পি ছিলেন, (৬) নরবাহাদুর গুরুং দার্জিলিংএর অধিবাসী। পূর্ব মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ২ জন—শ্রীযাদবেনাথ পাঁজা ও শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় নির্বাচনপ্রার্থী হন নাই এবং ৩ জন শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ জীবনরতন ধর নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। উপমন্ত্রীদের মধ্যে শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌখিক নির্বাচন প্রার্থী হন নাই এবং শ্রীগোপিকাবিলাস সেন (পরে রাষ্ট্রমন্ত্রী হইয়াছিলেন), শ্রীবীরেশচন্দ্র সেন ও শ্রীশিবকুমার পরাজিত হইয়াছেন। শ্রীআবদুল সুকুর নির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্বেও পুনরায় উপমন্ত্রী হইতে পারেন নাই। মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় এম-পি হইয়া গিয়াছেন। আগামী ৫ বৎসর এই ২৮ জন কি ভাবে কাজ করিবেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

ভ্রম সংশোধন—

এই সংখ্যার ৬৭৩ পৃষ্ঠায় "মিশরীয় কথা" ভ্রমণ কাহিনীর লেখিকা চিত্রিতা দেবী। মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ বিচিত্রা দেবী ছাপা হইয়াছে; সে জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

ভাঃ সঃ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা—

গত ১৭ই এপ্রিল শ্রীজহরলাল নেহরু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। তিনি নিজে দলপতি, কাজেই প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তাহা ছাড়া ১২ জন মন্ত্রী হইয়াছেন। সর্বসমেত ১৩ জন মন্ত্রী, ১৪ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১২ জন ডেপুটী মন্ত্রী গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রী হইয়াছেন—(১) আবুলকালাম আজাদ (২) গোবিন্দবল্লভ পন্থ (৩) মোরারজী দেশাই (৪) জগজীবন রাম (৫) গুলজারিলাল নন্দ (৬) টি-টি কৃষ্ণমাচারী (৭) লালবাহাদুর শাস্ত্রী (৮) সর্দার শরণ সিং (৯) কে-সি রেড্ডি (১০) অজিতপ্রসাদ জৈন (১১) ভি-কে কৃষ্ণমেনন (১২) এস-কে পাতিল। রাষ্ট্র মন্ত্রী হইয়াছেন—(১) সত্যনারায়ণ সিংহ (২) বি-ভি কেশকার (৩) ডি-পি কর্মকার (৪) পি-এস দেশমুখ (৫) কে-ডি মালব্য (৬) এম-সি খান্না (৭) নিত্যানন্দ কানুনগো (৮) রাজ বাহাদুর (৯) বি-এন দাতার (১০) এম-এম সাহ (১১) সুরেন্দ্রকুমার দে (১২) কে-এল শ্রীমালি (১৩) অশোককুমার সেন ও (১৪) হুমাউন কবীর। উপমন্ত্রী হইয়াছেন—(১) এস-এস মাজিথিয়া (২) আবিদ আলি (৩) অনিলকুমার চন্দ (৪) এম-ভি কৃষ্ণাপ্পা (৫) জয়সুখলাল হাতি (৬) সতীশচন্দ্র (৭) শ্যামনন্দন মিশ্র (৮) বলিরাম ভগত (৯) মনোমোহন দাস (১০) সাহ নওয়াজ খান (১১) শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ও (১২) শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা।

পূর্ব মন্ত্রিসভায় ছিলেন—১৪ জন মন্ত্রী, ১৩ জন রাষ্ট্র মন্ত্রী ও ১৪ জন উপমন্ত্রী। নূতন মন্ত্রিসভায় ৫ জন নূতন লোক গ্রহণ করা হইয়াছে—(১) এস-কে পাতিল (২) অশোককুমার সেন (৩) হুমাউন কবীর (৪) লক্ষ্মী মেনন ও (৫) ভায়োলেট আলভা। এক অশোক সেন ছাড়া অপর ৪ জন সংসদের সদস্য ছিলেন। রাজকুমারী অমৃত কাউর, চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও খান্দুভাই দেশাই পুরাতন মন্ত্রি সভার সদস্য ছিলেন—নূতন মন্ত্রি সভায় নাই। লালবাহাদুর শাস্ত্রী মধ্যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন—আবার নূতন করিয়া আসিলেন—এস-কে পাতিল নূতন। পুরাতন রাষ্ট্র মন্ত্রী বাদ পড়িয়াছেন—এচ-ভি পটাসকর, ডাক্তার সৈয়দ মামুদ, অরুণচন্দ্র গুহ, এন-সি সাহ ও মহাবীর ত্যাগী। বাঙ্গলা দেশ হইতে কোন পুরা মন্ত্রী লওয়া হয় নাই—৩ জন রাষ্ট্র মন্ত্রী—(১) সুরেন্দ্রকুমার দে (২) অশোককুমার সেন ও (৩) হুমাউন কবীর এবং ২ জন উপমন্ত্রী—(১) অনিলকুমার চন্দ ও (২) মনোমোহন দাস গৃহীত হইয়াছেন। ২ জন মহিলা উপমন্ত্রী হইয়াছেন—পুরাতন উপমন্ত্রী ও-ভি আলগেসন্ এবং শ্রীমতী চন্দ্রশেখর বাদ গিয়াছেন। অরুণচন্দ্র গুহ গত মন্ত্রি সভায় ভাল কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল তিনি এবার কেন বাদ গেলেন, বুঝা গেল না।

কলিকাতায় নূতন মেয়র—

গত ২৯শে এপ্রিল সোমবার কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর প্রথম সভায় খ্যাতনামা অধ্যাপক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ ত্রিগুণা সেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীসুশীলকুমার রায়কে পরাজিত করিয়া (৪৪ ও ৩৭ ভোট) কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীকেশবচন্দ্র বসু ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হন। উভয়েই কংগ্রেস পক্ষের লোক। গত নির্বাচনে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে ৪২ জন সদস্য লাভ করিয়া কংগ্রেস দল জয় লাভ করিয়াছেন। তাহার পর ৫ জন অল্ডারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন ও কলিকাতা ইনপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে কমিশনার। কেশব বসুও খ্যাতনামা সলিসিটার ও কলিকাতায় সুপরিচিত। ডাক্তার সেন মেয়র হইয়াও নিজের ছোট গাড়ী নিজে চালাইয়া থাকেন—তিনি কর্পোরেশনের ২৫ হাজার টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী ব্যবহার করেন না—ডাঃ সেনকে কিছু কাল ট্যাক্সি চালকের কাজ করিয়া জীবিকার্জন করিতে হইয়াছিল। মেয়র নির্বাচনের দিন নির্বাচন সভায় যে হট্টগোল হইয়াছিল তাহাতে সকলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কর্পোরেশনের মত স্থানে ঐরূপ বিশৃঙ্খলা জাতির অগৌরবের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

হাওড়ায় মিউনিসিপ্যালিটী—

গত ৩০শে এপ্রিল মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম পৌরসভা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর নব-নির্বাচিত ৩০ জন সদস্যের প্রথম সভায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কংগ্রেস পক্ষের সদস্য শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ চেয়ারম্যান এবং শ্রীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। গত ৩ বৎসর কাল হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী সরকারী

পরিচালনাধীনে ছিল। গত নির্বাচনে ৩০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৯টি আসন লাভ করায় কংগ্রেস দলই কর্মকর্তার আসন লাভ করিয়াছেন। বামপন্থী দল ৮টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসন লাভ করিয়াছে। হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্টও গঠিত হইয়াছে—কাজেই আশা করা যায় নূতন চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্যকারিতায় হাওড়া সহর উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। রবীন্দ্রবাবু প্রাক্তন চেয়ারম্যান ৺ চারুচন্দ্র সিংহের পুত্র এবং শঙ্করবাবু পূর্বেও ভাইস-চেয়ারম্যানের কাজ করিয়াছেন।

সমবায় কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা—

গত ২৯শে এপ্রিল মুসোরী সহরে সারা ভারতের উন্নয়ন কমিশনারদিগের এক সম্মিলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে আবেদন জানাইয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশনে সমবায় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দানের প্রস্তাব আছে। দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাহা করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করা প্রয়োজন, সে জন্য বড় বড় জমী পাওয়া দরকার। গ্রামের মানুষকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার কর্মসংস্থানের জন্য সমবায় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চাষ প্রবর্তন প্রয়োজন—তাহার ফলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়িয়া যাইবে। শ্রীনেহরুর এই কথা গুলি দেশের শিক্ষিত বেকার তরুণদের চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি এ বিষয়ে শ্রীনেহরুর সহিত একমত। আমাদের বিশ্বাস বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়ন কমিশনারগণ এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে সমবায় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন—

রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে মানভূম জেলার সদর অর্থাৎ পুরুলিয়া মহকুমা এবং পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি থানার অংশ আসিয়াছে। ঐ নূতন এলাকার পরিমাণ ৩ হাজার বর্গমাইল ও তাহার লোক সংখ্যা ১৪ লক্ষ ১০ হাজার। নূতন এলাকায় উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার পরিকল্পনা বাবদ ৪ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে দিতে সম্মত হইয়াছেন। যে স্থানগুলি বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই অনুন্নত ও অনুর্বর। যাহাতে সত্বর সে সকল স্থান উন্নত হয় সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের উৎসাহের সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। মানভূমের বহু অংশে এখনই কার্য্যারম্ভ হইলে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু লোক তথায় যাইয়া বাস করিতে পারিবে।

মধ্যপ্রদেশে নূতন মন্ত্রি সভা—

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে গত ১৫ই এপ্রিল রাজ্যপাল ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া নূতন মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহার অধীনে ১১ জন মন্ত্রী ও ৯ জন উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন মধ্যপ্রদেশের আয়তন ছোট নহে—সে জন্য ডক্টর কাটজুকে তথায় যাইয়াপ্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

উৎকলে বাঙ্গালী সভাপতি—

উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ দাস পদত্যাগ করায় গত ২৬শে এপ্রিল উড়িষ্যা বিধান সভার সদস্য শ্রীবীরেন মিত্র উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। উৎকলবাসী বাঙ্গালীরা শ্রীমিত্রের এই সম্মান লাভে আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শতায়ু শিক্ষাব্রতী—

গত ১৭ই এপ্রিল মহারাষ্ট্রের শিক্ষাব্রতী ডক্টর ডি-কে কার্ভের বয়স ৯৯ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় পুনরায় তাঁহাকে স্বগৃহে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল পুণা ফার্গুসন কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন এবং পুণায় মহিলাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলিতে অর্থ সাহায্যের জন্য তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুরা এক কমিটী গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ডক্টর কার্ভে এখনও কর্মক্ষম আছেন ও সর্বদা কাজ করেন। সকলের সহিত আমরাও প্রার্থনা করি, তিনি আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি—

খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীসুশীলকুমার দত্ত সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচন—

পশ্চিমবঙ্গ হইতে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার তিনটি সদস্যপদ খালি হইয়াছিল। সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু প্রভৃতিতে ৩টি খালি আসনে অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও প্রাক্তন মেয়র শ্রীসন্তোষকুমার বসু ও শ্রীসীতারাম দাগা নির্বাচিত হইয়াছেন। তিন জনই কংগ্রেস প্রার্থী—অন্য দলের কেহ নির্বাচিত হইতে পারেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব—

এ বৎসর মাঘ ফাল্গুন মাস হইতেই চাউলের দাম বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে—সাধারণত ঐ সময়ে চাউলের দাম কমিয়া যায়। পূর্ব বৎসরে ঐ সময়ে যে চালের মণ ছিল ১৯ টাকা—এ বৎসরে তাহার দাম হয় ২৩ টাকা—ক্রমে তাহা বাড়িয়া বৈশাখের শেষে ২৭ টাকা মণ হইয়াছে। গত বৎসরের ভীষণ বন্যায় বহু জেলায় ধান হয় নাই। সরকারী হিসাবে যাহাই বলা হউক না কেন, বাজারে চাল নাই। হয়ত ধনী ব্যবসায়ীরা চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়াছে—তাহারা চায় চালের মণ ৪০ টাকা হউক—তাহারা কিছু লাভ করিয়া লইবে। সাধারণ মানুষের দুঃখের শেষ নাই। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলার অবস্থা চরম হইয়াছে—লোক বাজারে চাল পায় না—এত বেশী দাম দিয়া চাল কিনিবার সামর্থ্যও লোকের নাই। গত নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে বন্যার ঠিক পরেই সরকার কতকগুলি সস্তা দামের দোকান স্থির করিয়া ১৭৷৷০ টাকা মণ দরে ব্রহ্মদেশের আতপ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল—গরীব লোকরা তবু সস্তায় আলো চাল খাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে—এখন সে ব্যবস্থা বন্ধ—প্রতি দোকানে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ২ মণ আলো চাল দেওয়া হয়—তাহা তখনই বিক্রয় হইয়া যায়—অতি অল্প লোক পায়। শুনা যায়, সরকারী গুদামে প্রচুর আলো চাল জমা আছে—সেগুলি হয়ত নষ্ট হইয়া যাইবে—বর্ত্তমান দুঃসময়ে সেগুলি সস্তায় পাইলে লোক বাঁচিতে পারে। গ্রামাঞ্চল হইতে খবর আসিতেছে, লোক না খাইয়া মারা যাইতেছে—কাজ করাইয়া কোন কোন স্থানে মজুরী দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু অভাবের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। আমরা প্রত্যহ কাগজে সরকারী সম্মিলন ও পরিকল্পনার সংবাদ পড়িতেছি—তাহাতে কোন লাভ হয় না। পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়া আবার রেশানিং প্রথা চালু না করিলে আগামী ৭।৮ মাসে বহু লোক না খাইয়া মারা যাইবে। কি কারণে জানি না, গম সরবরাহের অব্যবস্থার ফলে গত জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে লোককে ১০ আনা ১২ আনা সের দরে গম কিনিতে হইয়াছে। সাধারণতঃ গমের সের সাড়ে ৬ আনা—২ পয়সা ভাঙ্গানি দিয়া ৭ আনায় এক সের আটা পাওয়া যায়। কিন্তু গমও প্রয়োজন মত পাওয়া যাইতেছে না। চাল ও গমের দাম বাড়ার ফলে সকল জিনিষের দাম বাড়িয়াছে - আলু গত মাঘ মাসে ৮ টাকা মণ ছিল—এখন ২০ টাকা মণ। আলুর জন্য এত ঠাণ্ডা-ঘর করা হইল—তবুও কেন আলুর দাম এত বাড়িল বুঝা যায় না। অন্যান্য তরী-তরকারীর মূল্যও বাড়িয়াছে। সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা সেরের কম নহে—কোন কোন সময়ে তাহা অপেক্ষাও বেশী হয়, যেখানে বেশী মাছ পাওয়া যায় সেখানে তেলের অভাবে লোক মাছ খাইতে পারে না। স্বাধীনতার পর ১০ বৎসর কাটিয়া গেল—এখনও খাদ্যাভাব দূর হইল না। কাজেই জনসাধারণ বর্ত্তমান শাসকদের উপর আস্থা রাখিতে পারিতেছে না—গত সাধারণ নির্বাচনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভা—যদি শুধু খাদ্য সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হন এবং যাহাতে সর্বত্র সকল লোক প্রয়োজনীয় খাদ্য ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারে, সে বিষয়ে মনোযোগী হন, তবেই দেশের লোক বাঁচিবে—নচেৎ এই দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা যাইবে। সরকারী ব্যবস্থার অভাবের সুযোগ লইয়া একদল চক্রান্তকারী দুঃস্থ মানুষকে ক্ষেপাইয়া তাহাদের বিপন্ন করিতেছে। ইতিমধ্যে বহু জেলায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা মহকুমা হাকিমের বাংলো ঘেরাও করিয়া সাহায্য দানে তাঁহাদের বাধ্য করা হইয়াছে। সহরে প্রচুর খাদ্য আছে—এইরূপ মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া গ্রামাঞ্চল হইতে অভাবগ্রস্তের দল সহরে আনিয়া মিছিল ও শোভাযাত্রা

করিয়া সে বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এবার এখনও বর্ষা নামে নাই—পল্লীতে দারুণ গরম ও রৌদ্র—তাহার মধ্যে টেষ্ট রিলিফের কাজ দিলেও মানুষের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হইতেছে না। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে গৃহহীন লোকদের নূতন গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নাই। ৩ মাস সাধারণ নির্বাচনে সকল লোক ব্যস্ত ছিল—এপ্রিল মাস হইতে অন্য কাজ আরম্ভ হইয়াছে। যে কারণেই হউক, কাজ দ্রুত অগ্রসর হয় না। বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার বহু স্থানে এখনও মানুষ অস্থায়ী গৃহে বাস করে—বর্ষা নামিলে তাহাদের বাসগৃহ সমস্যা আরও দারুণ হইবে। নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের এখন গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া গ্রামবাসীর সমস্যায় অবহিত হওয়া অধিক প্রয়োজন। রেশনিংএর ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছিল, কেন, এখনও নির্দ্দিষ্ট দরে চাল ও গম দেওয়া আরম্ভ হয় নাই জানি না। সহর ও শিল্পাঞ্চল সহরতলীগুলিতে অবিলম্বে রেশনিং হওয়া প্রয়োজন। এ কথা সত্য যে ধনী ও মুনাফা-খোরদের জন্যই বাজারে সকল জিনিষ চড়া দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। এ কথা সকল খাদ্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এ বিষয়ে সরকার-পক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, দেশবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই কামনা করে।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন রেলপথ—

হুগলী জেলার তারকেশ্বর হইতে আরামবাগ হইয়া বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ৬৫ মাইল দীর্ঘ একটি নূতন রেলপথ স্থাপনের জন্য তারকেশ্বর রেল সম্প্রসারণ সমিতির সদস্যগণ বহু বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। ঐ অঞ্চলগুলিতে যাতায়াতের অসুবিধা এবং কাঁচা মাল প্রেরণের অসুবিধা অত্যন্ত বেশী—ফলে ঐ অঞ্চলের উন্নতির বিধান সম্ভব হয় না। বর্তমানে ঐ অঞ্চলে কয়েকটি নূতন পাকা রাস্তা হওয়ায় কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু মাল যাতায়াতের খরচ অত্যন্ত বেশী বলিয়া লোক কৃষিকার্য্যেও উৎসাহ পায় না। ঐ অঞ্চলে প্রচুর পাট ও আলু হইয়া থাকে—কিন্তু কৃষকগণ ঐ পাট বা আলুর উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ সকল অঞ্চলে কয়লা বা লোহা লইয়া যাওয়া ও খুব ব্যয়সাধ্য। আমাদের বিশ্বাস, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকর্তারা এইবিষয়টি উপযুক্তভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীজহরলাল নেহরু—

আগামী জুন মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনে বৃটীশ কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীদের এক সম্মিলন হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু সে সম্মিলনে যোগদান করিতে যাইবেন। লণ্ডন যাওয়ার পূর্বে তিনি নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ডে ১০ দিন ঘুরিয়া বেড়াইবেন। অন্যান্য দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থা পরিদর্শনই শ্রীনেহরুর ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইবে।

ভারতে উপরাষ্ট্রপতি—

গত ২৩শে এপ্রিল দিল্লীতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছে। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না—তিনি বিনা বাধায় উপরাষ্ট্রপতি হইলেন। গত ৫ বৎসর তিনি উপরাষ্ট্রপতির কাজ করিয়াছেন ও এবার আর ঐ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না। নেতৃবৃন্দের একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে ঐ পদগ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে উপরাষ্ট্রপতিরূপে পাওয়া ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা।

বাংলা সাহিত্যের পুরস্কার ঘোষণা—

গত ২০শে এপ্রিল শনিবার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক এম-সি-সরকার এণ্ড সন্সের উদ্যোগে দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কের উত্তরে ন্যাশানাল হাই স্কুল ভবনে এক সাহিত্য আসর বসিয়াছিল। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত তাহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীরাজশেখর বাবু, শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীনরেন দেব, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাহাতে দুঃখ করিয়াছিলেন—বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য দিল্লী হইতে একজন অবাঙ্গালী বৎসরে হাজার টাকার একটি পুরস্কার দিয়া থাকেন—কিন্তু কোন বাঙ্গালী কিছু দেন না। তাহার পর শ্রীপ্রমথনাথ বিশি ঘোষণা করেন, অতঃপুর আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের পরিচালক শ্রীঅশোককুমার সরকার

এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরের পরিচালক শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ প্রত্যেক বৎসরে ২টি করিয়া মোট ৪টি এক হাজার টাকার পুরস্কার বাংলা সাহিত্যে বছরের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য দান করিবেন। পত্রিকা ৪টির কর্তৃপক্ষ সে জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিয়া পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা স্থির করিবেন। তাহার পরই ঘোষণা করা হয় 'উল্টো-রথ' মাসিকের পক্ষ হইতে পূজাকালীন শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য এবং মৌচাক মাসিকের পক্ষ হইতে বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যের জন্য ৫ শত টাকার করিয়া আরও দুইটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। বাংলাদেশে এতদিন পর্য্যন্ত এই ভাবে শ্রেষ্ঠ লেখকগণকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা ছিল না। দিল্লীর অনুকরণে বছরে বাংলা সাহিত্যের ৬ জন শ্রেষ্ঠ লেখক এখন পুরস্কার পাইয়া উৎসাহিত হইবেন। আমরা এই আসরের উদ্যোক্তাদের ও যাহারা পুরস্কার দিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহাদের বাঙ্গালী সাহিত্যিক সমাজের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করি। ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া সাহিত্যিকগণ চিরদিন উৎসাহিত হইয়াছে—আজও সে ব্যবস্থা বন্ধ হয় নাই। দাতাদের কার্য্য আরও বহু ধনী কর্ত্তৃক অনুকরণ করা হইলে, দেশ সমৃদ্ধ ও সাহিত্য পুষ্ট হইবে।

বিহারে নূতন মন্ত্রি সভা—

বিহার বিধান সভার সদস্য নির্বাচনের পর ২জন নেতার মধ্যে দলাদলি হয়—শেষ পর্যন্ত দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতারা যাইয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন—অধিকাংশ সদস্যের ভোট পাইয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ পুনরায় বিহার পার্লামেণ্টারী কংগ্রেস নেতা নির্বাচিত হন—শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ভোটে পরাজিত হন। এক মাস কাল ধরিয়া উভয়পক্ষে আলোচনা ও সে বিষয়ে দিল্লীর কর্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণের পর গত ৬ই মে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রধান মন্ত্রী হইয়া শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ ও তাহার দলীয় ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিয়াছেন। বিহারের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই বিবাদ বহু বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহার অবসান কবে হইবে, কেহ জানে না।

ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী গত ৪ঠা মে শনিবার কলিকাতা বালীগঞ্জে নিজ বাটীতে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবনে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন—তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি ছিল বরিশাল জেলার পোনাবালিয়া গ্রামে। তিনি ইতিহাসে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ও ১৯৫০ সালে নাগপুরে নিখিল ভারত ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ জি-সি রায় চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল অফ্ আর্টস এণ্ড কমার্সের সেক্রেটারী।

পরলোকে জগদীশ গুপ্ত—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি জগদীশ গুপ্ত গত ২রা বৈশাখ সোমবার ভোরে তাঁহার কলিকাতা পরাশর রোডস্থ বাসভবনে ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার দুটি চক্ষুই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ও গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে সাহিত্যিক বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৮৬ সালে কুষ্টিয়ার মেথহাসী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়—তিনি ৩০খানি গল্প, উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা প্রায় সকল সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হইত। তাঁহার গল্প নূতন ধরণে লিখিত হইত ও পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইত।

পরলোকে কুমুদভূষণ রায়—

খ্যাতনামা রেল ইঞ্জিনিয়ার ও নদী সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, সুলেখক কুমুদভূষণ রায় গত ২০শে এপ্রিল ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে বি-ই পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া তিনি দেশের নদী সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। নদী সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার বিরাট শেষ পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, এখনও প্রকাশিত হয় নাই; তিনি 'ভারতবর্ষের'ও লেখক ছিলেন।

দিল্লিতে 'ফার্মার্স' ফোরাম ইণ্ডিয়া'র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধি দল

পুরুলিয়া "শিল্পাশ্রমে" গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ

দিল্লিতে 'ফার্মার্স' ফোরাম ইণ্ডিয়া'র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন—

গত ২০শে মার্চ্চ হইতে ২৫শে মার্চ্চ নয়াদিল্লী তাল-কোটরা উদ্যানে ফার্মার্স ফোরাম ইণ্ডিয়ার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী ডক্টর পাঞ্জাবরাও দেশমুখ সভাপতিত্ব করেন। শ্রীএস, কে, দে, শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈন, শ্রীকৃষ্ণমাচারী, ডক্টর জে, সি, ঘোষ, শ্রীইউ, এন, ধেবর প্রভৃতি সভায় উপস্থিত থাকেন ও কৃষি-সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এতৎসহ ভারতীয় গ্রামীণ মহিলা সংঘের আর একটী অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করেন শ্রীমতী রাজবংশী দেবী (ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্ত্রী)।

পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ডক্টর আর, আহমেদ ও শ্রীদেবনাথ দাস এবং শ্রীসুশান্ত পাঠক ইহার প্রচার সচীব হ'ন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
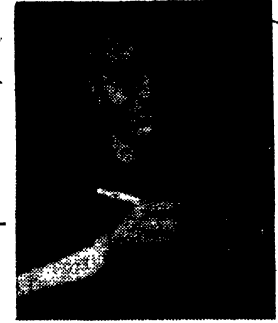
হকি লীগ :

১৯৫৭ সালের ক্যালকাটা হকি লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে মোহনবাগান অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে ভারতীয় হকিদলের মধ্যে প্রথম উপর্যুপরি তিন বছর হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের গৌরব লাভ করেছে। এবার নিয়ে মোহনবাগান ৬ বার হকি লীগ বিজয়ী হ'ল। তারা লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৩৫, ১৯৫১, ১৯৫২ ১৯৫৫,১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে। প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত এই চারটি দল উপর্যুপরি তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের মর্য্যাদালাভ করেছে—রেঞ্জার্স (১৯১৪-১৭), কাস্টমস (১৯৩০-৩৩, ১৯৩৬-৩৯), পোর্টকমিশনার্স (১৯৪৬, ১৯৪৮-৪৯ ; ১৯৪৭ সালে খেলা স্থগিত ছিল) এবং মোহনবাগান (১৯৫৫-৫৭)।

মোট আঠারটি খেলায় মোহনবাগান ১৭টিতে জয়ী হয় এবং ০-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে একটি খেলা ড্র ক'রে একটা পয়েন্ট নষ্ট করে। মোট আঠারটি খেলার মধ্যে ১৭টি খেলার ফলাফলের উপরই মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে যায়। হকি লীগে রানার্স-আপ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ১৮টা খেলায় তাদের ১৩টা জয়, ৪টে ড্র এবং একটা পরাজয়।

ফুটবল খেলার মত হকি খেলাতেও মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ বছর দুই দলের সমর্থকদের বেশ উত্তেজিত এবং উৎসাহিত করেছিল। খেলার একটা অবস্থায় দুই দলের পক্ষেই লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পথ সমান উন্মুক্ত ছিল। শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গলকে পেছনে ফেলে লীগ বিজয়ী হয়েছে।

	খেলা	জয়	ড্র	পরা:	স্ব:	বি:	প:
মোহনবাগান	১৮	১৭	১	০	৪৫	৩	৩৫
ইস্টবেঙ্গল	১৮	১৩	৪	১	৩৬	২	৩০
মহা: স্পোর্টিং	১৮	১৩	২	৩	২৫	৮	২৮
কাস্টমস্	১৮	১১	৫	২	২২	৪	২৭
রেঞ্জার্স	১৮	৯	৪	৫	২০	১৪	২২
ভবানীপুর	১৮	৮	৫	৫	১৫	৮	২১
ডব্লিউ বি পুলিশ	১৮	৫	১০	৩	২৩	১২	২০
পুলিশ	১৮	৬	৮	৪	১৬	১৮	২০
গ্রীয়ার	১৮	৭	৫	৬	১৮	১৭	১৯
পাঞ্জাব স্পো:	১৮	৫	৮	৫	১৬	১০	১৮
পোর্ট কমি:	১৮	৬	৬	৬	১৮	১২	১৮
এরিয়ান্স	১৮	৫	৭	৬	৭	১১	১৭
রাজস্থান	১৮	৫	৬	৭	১৪	২০	১৬
উয়াড়ী	১৮	৪	৬	৮	১০	১৮	১৪
মেসারার্স	১৮	৪	৩	১১	১০	৩২	১১
জেভেরিয়ান্স	১৮	২	৫	১১	৬	২০	৯
বি জি প্রেস	১৮	৩	৩	১২	১০	৩৩	৯
আদিবাসী	১৮	১	২	১৫	৬	৩৯	৪
আর্মেনিয়ান্স	১৮	২	০	১৬	৮	৪৯	৪

১৯৩৫ সাল থেকে হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান।

১৯৩৫ মোহনবাগান, ১৯৩৬-৩৯ কাস্টমস, ১৯৪০ বি জি প্রেস, ১৯৪১ পুলিস, ১৯৪২ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৪৩

রেঞ্জার্স, ১৯৪৪ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৪৫ মহামেডান-স্পোর্টিং, ১৯৪৬ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৪৭ খেলা হয়নি, ১৯৪৮-৪৯ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৫০ কাস্টমস, ১৯৫১-৫২ মোহনবাগান, ১৯৫৩-৫৪ ভবানীপুর, ১৯৫৫-৫৭ মোহন-বাগান।

বাইটন কাপ ঃ

১৯৫৭ সালের বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা এবং প্রথম বাইটন কাপ জয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ-যোগ্য, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছরের হকি লীগের খেলায় ১-০ গোলে এবং লক্ষীবিলাস কাপের ফাইনালে ২-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। গত ২৭ বছরের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ক'লকাতার দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'ল। ১৯৩০ সালে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কাস্টমস এবং পোর্ট কমিশনার্স। কাস্টমস ৪-২ গোলে জয়ী হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম বাইটন কাপের ফাইনালে ওঠে ১৯৪৫ সালে। তারা ১-৩ গোলে বি এন রেল দলের কাছে হেরে যায়। বাইটন কাপের ফাইনালে প্রথম খেলবার অধিকার পেয়ে খুব কম সংখ্যক দলই জয়ী হয়েছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটা সংস্কার আছে, যে দল প্রথম বাইটন কাপ খেলার অধিকার পায় তাদের পরাজয়ের অভিশাপ বরণ করতে হয়। ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব প্রথম চেষ্টায় জয়ী হয়ে এই সংস্কার অসত্য প্রতিপন্ন করেছে। ইস্টবেঙ্গল দলের জগদীশ জয়সূচক গোলটি করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, জগদীশ ১৯৫৭ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানলাভ করেছেন। সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম দিন ১-১ গোলে ইউ-পি একাদশের সঙ্গে খেলা ড্র করে। ইস্টবেঙ্গল ভাগ্যদোষে এইদিন জয়লাভ করতে পারেনি। দ্বিতীয় দিন ১-০ গোলে জয়ী হয়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কাস্টমসের বিপক্ষে দু'দিন খেলতে বাধ্য হয়। প্রথম দিন ২-২ গোলে খেলা ড্র যায়। কাস্টমস ২-০ অগ্রগামী থেকেও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ১-০ গোলে জয়ী হয়।

কোয়ার্টার ফাইনালে উপর্যুপরি তিন বছরের হকি লীগ বিজয়ী এবং ১৯৫২ সালের বাইটন কাপ বিজয়ী মোহন-বাগান অপ্রত্যাশিত ভাবে ০-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে হেরে যায়। বিশ্রামের কয়েক সেকেণ্ড আগে গোলটি হয়। লীগের খেলায় মোহনবাগান শোচনীয় ভাবে ৩-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করেছিল।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪-০ গোলে ঝাড়খণ্ডকে, ০-০ ২-০ গোলে পাঞ্জাব স্পোর্টসকে এবং ১-১, ১-০ গোলে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে জামালপুরকে, ১-০ গোলে মোহনবাগানকে এবং ২-২, ১-০ গোলে কাস্টমসকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়।

গত ১০ বছরের বাইটন কাপ বিজয়ীদল: ১৯৪৬ পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৪৭ খেলা হয়নি, ১৯৪৮ উত্তর প্রদেশ এবং পোর্ট কমিশনার্স (যুগ্মভাবে) ১৯৪৯-৫০ টাটা স্পোর্টস ক্লাব (বোম্বাই), ১৯৫১ হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফট (বাঙ্গালোর), ১৯৫২ মোহনবাগান, ১৯৫৩-৫৪ টাটা স্পোর্টস ক্লাব (বোম্বাই), ১৯৫৫ উত্তর প্রদেশ এবং ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে (যুগ্মভাবে), ১৯৫৬ সার্ভিসেস হকেটস্ ও ১৯৫৭ ইস্টবেঙ্গল।

বাইটন কাপের সেমি-ফাইনালে পরাজিত ইউ পি একাদশ ও কাস্টমস দল ডি এন গুহ কাপ জয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইউ পি একাদশ ৩-০ গোলে জয়ী হয়।

এফ এ কাপ ঃ

ইংলণ্ডের এফ এ কাপের (ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ) ফাইনালে অ্যাস্টন ভিলা ২-১ গোলে ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড দলকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয়বার এফ এ কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। তারা প্রথম এফ এ কাপ পায় ১৮৯৭ সালে। মজার কথা, ১৮৯৭ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে অ্যাষ্টন ভিলা একই বছরে লীগ কাপ এবং এফ এ কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য বছরের ফুটবল লীগের খেলায়

ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। একই বছরে লীগ কাপ এবং এফ এ কাপ জয়লাভের সুবর্ণ-সুযোগ তাদের বিফলে গেল। গত ৩০ বছরের ইতিহাসে এই সুবর্ণসুযোগ কেবল ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড দলের ভাগ্যাকাশে উদয় হয়েছিল।

বোম্বাই গোল্ড কাপ হকি ঃ

বোম্বাইয়ের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ২—০ গোলে পাঞ্জাব হস্তদলকে পরাজিত ক'রে ১৯৫৭ সালের গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে।

ডেভিস কাপ ঃ

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ফিলিপাইন ৩—২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। পাঁচটি খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ তিনটি সিঙ্গলস খেলায় পরাজিত হয়। জয়ী হয় ডাবলসে এবং একটি সিঙ্গলসে। প্রথম দিন ফিলিপাইন দুটি সিঙ্গলসে জয়ী হয়। দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় রামনাথন কৃষ্ণাণ এবং নরেশকুমার জয়ী হ'ন। ভারতবর্ষের পক্ষে সিঙ্গলসে জয়ী হ'ন রামনাথন কৃষ্ণাণ। তিনি ফিলিপাইনের ৩নং খেলোয়াড়কে পরাজিত করেন।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতীয় রেলদল ২-১ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত ক'রে রঙ্গস্বামী কাপ জয়ী হয়েছে। রেলদল আর একবার জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছিল ২৭ বছর আগে, ১৯৩০ সালে। বোম্বাই পেয়েছিল দু'বার, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে। তাছাড়া বোম্বাই দু'বার রাণার্স-আপ হয় ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে। বোম্বাই দল গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দলকে সেমি-ফাইনাল খেলায় ৩-১ গোলে পরাজিত ক'রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, খেলা অমীমাংসিত হওয়ার সংখ্যাধিক্য। রেলওয়ে বনাম বাংলার খেলা চারদিন ড্র হওয়ার পর পঞ্চম দিনের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। মহীশূর দল বনাম বোম্বাই দলের খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হ'তেও পাঁচ দিন লাগে। ফাইনাল খেলায় রেলওয়ে দলের পক্ষে গোল করেন বলবীর সিং ও সরপাল সিং। বোম্বাইদলের ব্রিট্টো একটি গোল শোধ করেন।

রেলওয়ে দল ৩-০ গোলে বিহারকে, ১-১, ০-০, ১-১ ০-০ ও ৩-১ গোলে বাংলাকে ও সেমি-ফাইনালে ৩-১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকে বোম্বাই দল ৩-০ গোলে বরোদাকে, ২-১ গোলে রাজস্থানকে, ০-০, ১-১, ১-০, ১-১ ও ২-১ গোলে মহীশূরকে ও সেমি-ফাইনালে ০-০, ১-১, ১-০ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত ক'রে ৯ বছর পর ফাইনাল খেলার যোগ্যতা লাভ করে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে পাঞ্জাব সাত বার জয়লাভ ক'রে সর্ব্বাধিক বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করেছে।

১৯৫৭ সালের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে দলকে সব থেকে বেশী বেগ পেতে হয়েছিল বাংলার কাছে। কোয়ার্টার ফাইনালে রেলদলকে বাংলার সঙ্গে পাঁচ দিন খেলতে হয়। জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'তে ৩৭০ মিনিট সময় লাগে।

আলোচ্য জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দল-গুলি একাধিকবার খেলা ড্র করেছে; কোন কোন খেলায় নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষই গোল করতে পারে নি, গোল দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেছে। এই সব ঘটনা থেকে হকি খেলার বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা হয়েছে, আগের থেকে ভারতীয় হকি খেলার মান দিন দিন নিম্নগামী হচ্ছে। জাতীয় হকি খেলায় খেলোয়াড়দের প্রদর্শিত ক্রীড়ানৈপুণ্য বিচার ক'রে ভারতীয় হকি দল গঠন করা হয়। সুতরাং চিন্তার কারণ সন্দেহ নেই।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

চিকাগোতে অনুষ্ঠিত মুষ্টি যুদ্ধে সুগার রে রবিনসন ৫ম রাউণ্ডে জিনি ফুলমারকে পরাজিত ক'রে মিডল ওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন।

বিগত ১৬ বছরের লড়াইয়ের ইতিহাসে রবিনসন কখনও একই ব্যক্তির কাছে দু'বার পরাজিত হন নি। এই নিয়ে রবিনসন ১৪৮টি পেশাদার লড়াই করলেন, তাঁর জয়লাভের সংখ্যা ১৩৯ বার।

ইংলিশ টেবল টেনিস ঃ

১৯৫৭ সালের ইংলিশ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পাঁচটি অনুষ্ঠানের ফাইনালেই জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে চারটিতে জয়লাভ করে। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে হাঙ্গেরীর বার্কজীগ ২১-১০, ২১-১০, ২০-২২ পয়েণ্টে জাপানের ওগিমুরাকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান মিস ফুজি এগুচি, মহিলাদের ডাবলসে মিস ওকাওয়া এবং মিস নাম্বা, মিক্স ডাবলসে কে সুনোদা এবং মিস নাম্বা জয়লাভ করেন।

সাহিত্যিক : শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পৃথ্বীশবাবু খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সাহিত্যিক তাহার নবতম উপন্যাস। সাহিত্যিক জীবনের একটা গভীর প্রচ্ছন্নবেদনা এই উপন্যাসে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য জীবনে বহুসংগ্রামের পর কৃতকার্য্যতা যখন আসে তখন তার আর প্রয়োজন থাকেনা। সেটা একান্তই বিড়ম্বনায় পরিণত হয়—হয়ত খ্যাতি ও সমৃদ্ধি আসে মৃত্যুর পর। তার মৃত্যু বার্ষিকীর স্মরণোৎসব হয় কিন্তু জীবনে তাহার রহিয়া যায় দৈন্য ও অবমাননা। কারণ, লেখক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ভবিষ্যৎ তাহাকে চিনে কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাকে অবহেলা করে।

শিবনাথ এমনি এক সাহিত্যিক। কলিকাতার বুকে দীর্ঘ সংগ্রামের সময়ই তাহার জীবনে আসিয়াছিল একটি নারী, তাহার আলোকে সে লিখিয়াছিল অনেক কিছু। দেখিয়াছিল জগতকে, কিন্তু সে নারী রূপালিপর্দ্দার মোহে তাহাকে ছাড়িয়া গেল। সে দুর্জ্জয় অভিমান ও অখ্যাতি লইয়া চলিয়া গেল অরণ্যে। অরণ্যের অন্ধকারে বসিয়া লিখিল সারা জীবন। জীবনের শেষ প্রান্তে আসিল খ্যাতি, কিন্তু তখন তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, ফিরিয়া আসিল নারী কিন্তু তাহারও প্রয়োজন আর নাই। সাহিত্য জীবনের গভীর একটা নিষ্ফলতা এমনি করিয়া শিবদাসের জীবনকে ঘিরিয়া ক্রমে ক্রমে অন্তরাকাশ ছাইয়া ফেলে। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বইএর পাতা বন্ধ করিয়া ভাবিতে হয়—এই পৃথিবী!

উপন্যাসখানি কেবল মাত্র সুখপাঠ্য নয়, বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনব ও গভীর। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক : দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ, ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড। দাম ২৷৷৹ টাকা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

GOTAMA THE BUDDHA :

আনন্দ, কে, কুমারস্বামী ও আই, বি, হর্ণার

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই মনীষী মিলে রচনা করছেন ভগবান্ বুদ্ধের এই অমর জীবন কাহিনী—লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অমৃত উপদেশাবলী। পুস্তকটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছেন কেসেল্ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্, লণ্ডন থেকে। ভগবান্ বুদ্ধের অহিংসার বাণী প্রচার হবে সারা বিশ্বে, হিংসার উন্মাদনায় দলিতা, ক্রন্দনরতা ধরিত্রীর বুকে পড়বে শান্তির কোমল প্রলেপ। কিন্তু তবু কি যুদ্ধোন্মাদ, ক্ষমতাগর্ব্বী এই মানুষের মন হবে শান্ত? স্থায়ী শান্তি কি আসবে জগতে? জানিনা, বলতে পারি না। শুধু বলতে পারি লেখকদ্বয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। শান্তির আশাই জাগিয়ে তুলেছে প্রকাশকের এ গ্রন্থকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস। সে প্রয়াস সার্থক হোক, গ্রন্থের সমাদর হোক সর্ব্বত্র—এইটুকুই শুধু কামনা।

[ভারতীয় প্রচারক—রূপ এণ্ড কোং—কলিকাতা—১২। মূল্য—৯৷৹

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

কোমা গরদিয়েফ : মাকসিম্ গর্কি, অনুবাদ—সত্য গুপ্ত

বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোমা গরদিয়েফ। জগদ্ বিখ্যাত উপন্যাসিক গর্কি এ গ্রন্থ লিখেন ১৮৯৮ সালে। নবীন রুশ সাহিত্যিকের সাহিত্য যশ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল তখনি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাশিয়ায় পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের বিপুল সমৃদ্ধি। অপরদিকে তেমনি অজস্র শ্রমিকের নিষ্পেষণ, নির্যাতন, রক্তশোষণ—অবর্ণনীয় দুর্দশা। মুনফাশিকারী ব্যবসায়ী দলের লালসার অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়েছে তারা। এক ব্যবসায়ীর ছেলে কোমাকেই এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন গর্কি। তার কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল রুশীয় পুঁজিবাদীদের প্রতি সতর্কবাণী রুশ বিপ্লবের অনেক আগেই।

ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীসত্য গুপ্ত। অনুবাদের ভাষা অনবদ্য, তা যথার্থই মূল গ্রন্থের যোগ্য হয়েছে। এর সমাদর হবে নিশ্চিত আশা করা যেতে পারে।

[প্রকাশক—সংস্কৃতি ভবন, ১১৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৫৲]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বায়ু রশ্মি বিজ্ঞান : তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

আমরা সৌর জগতের অধিবাসী। এজন্য সূর্য্যের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ, জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য্যকে কালের আত্মা ও পিতা বলা হয়েছে। সূর্য্য রশ্মির সপ্তবর্ণ নিয়েই আমাদের মর্ত্তকায়ার জৈবলীলা। সূর্য্যরশ্মি তাপে জীবনীশক্তি লাভ, প্রজননশক্তি, বীজাণুনাশকশক্তি, নিষ্ক্রিয়গ্রন্থি ক্রিয়াশীলতা, রক্তসংবহন, সুষ্ঠুভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস, হজমশক্তি, শীত-গ্রীষ্ম সহন ক্ষমতা, দেহ মনের স্বাচ্ছন্দ্যভাব, দৈহিক বর্ণকণিকা বৃদ্ধিতে বর্ণ—রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি, স্নায়ুশক্তি, পেশীর উন্নতি, দৈহিক স্বাভাবিক গঠন প্রভৃতি হয়। সৌর বর্ণরশ্মির মধ্যে যে কোন একটির অভাব ঘটলে কোন না কোন ব্যাধি হয়। আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রসঙ্গই অবতারণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে শ্বাস-প্রক্রিয়া পালন, সূর্য্যরশ্মিতে জল প্রস্তুত করে সেবন, সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে নিরাময় সম্ভব। এজন্য সুবিস্তৃত একখানি সারণী ও গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে, যেটি দেখে নিত্য শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের দ্বারা রোগমুক্ত

হওয়া যেতে পারে ও স্বাস্থ্য সম্পদ লাভ হোতে পারে। শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, দেহে যতক্ষণ বায়ু, ততক্ষণ জীবন, বায়ু বাহির হলেই মৃত্যু। সুকৌশলে দেহের ভিতর বায়ু নিরোধ করতে পারলেই দীর্ঘকাল বাঁচতে পারা যায়। এ সম্পর্কেও আলোচ্য গ্রন্থে কিছু বলা হয়েছে। অবশেষে নিজেদের আশ্রমে প্রস্তুত ঔষধটির তালিকা আছে। যাঁরা শ্বাস-প্রধান ক্রিয়াযোগের দিকে আকৃষ্ট, তাঁরা সারনীর সাহায্যে কিছুটা জানতে পারবেন। গ্রন্থে বিশদভাবে প্রসঙ্গের আলোচনা থাকা উচিত ছিল।

[প্রকাশক : তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। মাতৃকাশ্রম প্রণবসঙ্ঘ, ১৫ বি, ঈশ্বর গাঙ্গুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৬। মূল্য—১৲ টাকা।]

উপানন্দ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প গ্রন্থ "স্বপ্নমঞ্জরী"—৩৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "বিবর্তন" (২য় সং)—৪৲
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সংকলিতা"—৪৲
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বান্ধবী"—২৲
শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "সাধক-জীবন কাহিনী—৷৵৹
দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত ইতিহাস "ফরাসী দেশ"—১৷৹
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত নাটক "মহারাজা নন্দকুমার"—১৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তোমায় আমি ভালোবা স"—৩৲

নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত 'হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েজ' ও কলম্বিয়ার কয়েকখানি রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েজ"

N82735—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুললিত কণ্ঠের দুখানা মনোরম গান—"সেই ভালো, এই বসন্ত নয়" এবং "ঘুমালো রাতের চাঁদ।"

N82736—"ঢেউ ওঠে সাগরে" ও "পথিক মেঘের দল চলেছে" দুখানা আধুনিক গান সুপ্রীতি ঘোষের সুমিষ্ট কণ্ঠে সুশ্রাব্য হয়ে উঠেছে।

N82737—শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তার "বঁধু! ধর ধর মালা, পর গলে" ও "যাবনা—যাবনা —যাবনা ঘরে" দুখানা গান আমাদের দিয়েছে প্রচুর আনন্দ।

কলম্বিয়া

GE24832—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠে "ভ্রমরা গুণ্ গুণ্ গুঞ্জরিয়া আসে" এবং "তোমার দু-চোখে আমার স্বপ্ন" দুখানা আধুনিক গান শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে তুলবে অপার আনন্দ।

GE24833—"সূর্য আঁকে ইন্দ্রধনু" ও "আকাশে দেয়ালীর লগ্ন আজ" দুখানা গান শিল্পী অমল মুখোপাধ্যায়ের উদাত্ত কণ্ঠের ও সুমিষ্ট স্বরের পরিচয় বহন করে।

GE24834—শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ওরে রঙিলা নাইয়ারে" ও "গোকুল আন্ধার হইয়াছে" গান দুখানা শুধু আমাদের নয়, সবাইকে আনন্দ দেবে নিশ্চয়ই।

GE24835—জনপ্রিয় শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে "মাগো মা, বুকভরা এই ব্যথার কুসুম" ও "আমি যদি ভুল করি মা" দুখানা শ্যামাসঙ্গীত শুনে আমরা সত্যিই মুগ্ধ হ'য়েছি।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত